রম্যরচনা ৩৬৫

তারাপদ রায়

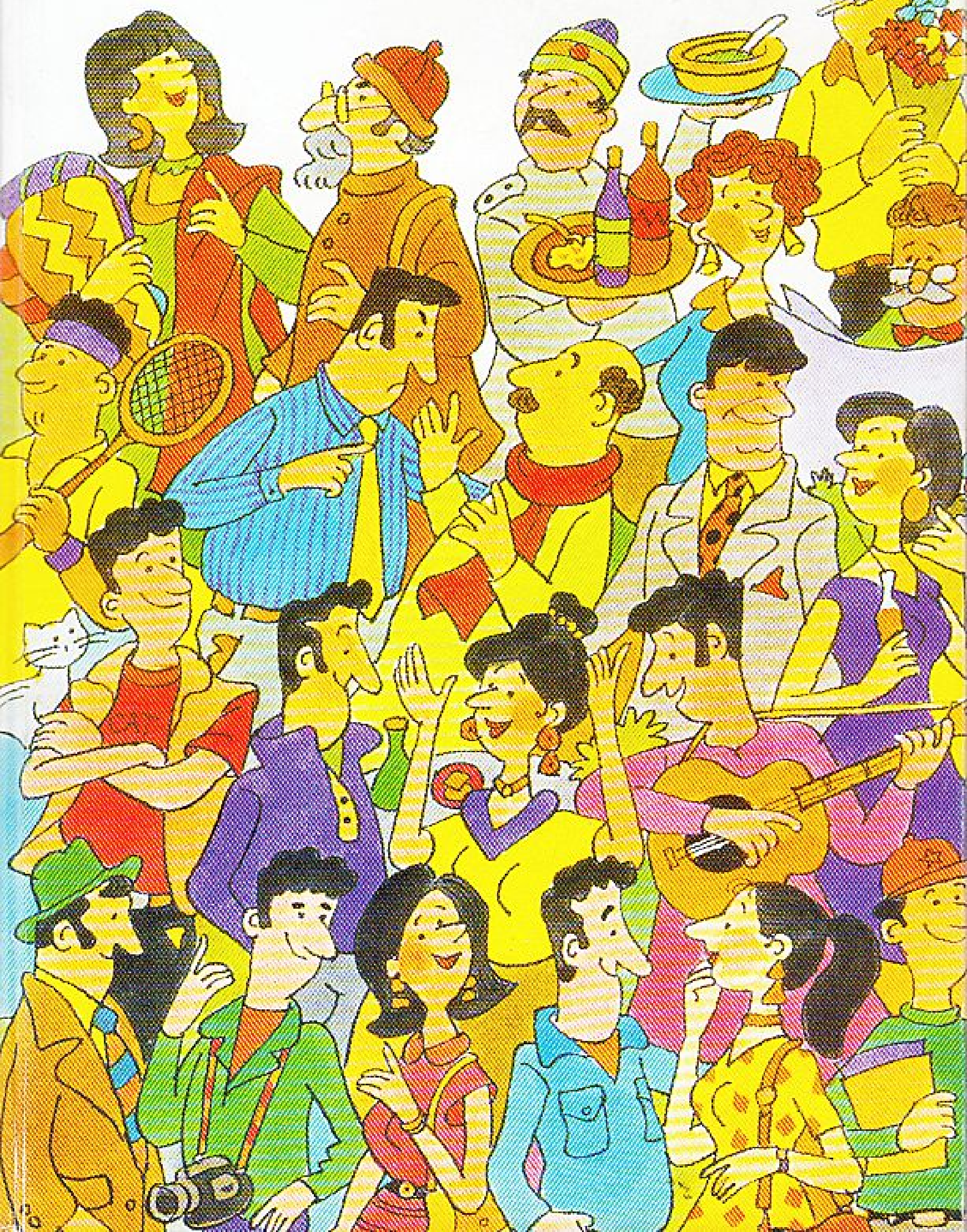

এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো রমণীয় রচনা সম্পর্কে সিরিয়াস প্রবন্ধ পাঠকও উৎসুক। এমন রচনা লেখা আদপে সহজ নয়, যদিও দেখে মনে হয়, এ আর এমনকী! কিন্তু একটি শিল্পোত্তীর্ণ রম্যরচনা লেখা বেশ কঠিন। হালকা হাস্যরসের সঙ্গে পরিমিত তিক্তরস মিশিয়ে, রচনাটি মালার মতো গেঁথে তোলার কাজটি পারঙ্গমস্রষ্টা ছাড়া অসাধ্য। বাংলা সাহিত্যে সার্থক রম্যরচনার রচয়িতা হাতে গোনা কয়েকজন। যদিও তাঁরা রসপিপাসুদের কাছে নিত্যস্মরণীয়।
তারাপদ রায় তাঁদেরই সার্থক উত্তরসূরি। কবির কলম পাশে রেখে যখন থেকে তিনি রসরচনা লেখা শুরু করলেন, তখন থেকেই তিনি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। কেবল জনপ্রিয়তার নিরিখে নয়, বিপুল, বিচিত্র বিষয়বস্তু নির্বাচন করে চল্লিশ বছর ধরে তিনি যে প্রায় দু' হাজার রম্যরচনার জন্ম দিয়েছেন, তারা রসিক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম। মনের কোণে জমে থাকা গোপন অন্ধকার, এক লহমায় রঙ্গের ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে এদের জুড়ি নেই। তাঁর সব রম্যরচনাই বিশুদ্ধ ও মৌলিক, এমন দাবি লেখক নিজেও করেন না। কিন্তু এগুলি লোকশ্রুতির পরম্পরার মতো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান। এই বইয়ে বাছাই করা তিনশো পঁয়ষট্টিটি রম্যরচনা সংকলিত হয়েছে। লেখকের বিভিন্ন স্বাদের রম্যরচনা গ্রন্থ থেকে খুঁজে-বেছে নেওয়া হয়েছে এই রচনাগুলি। লেখক রহস্য করে বলেছেন: 'বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে পাঠকের জন্য একটি করে রম্যরচনা।'
অর্থাৎ সমগ্র বছর জুড়ে পাঠক প্রাণ খুলে প্রতিদিন অন্তত একবার হাসবেন। মানুষের জীবন থেকে যারা হাসি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের চেষ্টা এবার বিফল হবে।

ISBN 81-7756-446-3

রম্যরচনা

৩৬৫

তারাপদ রায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০
তৃতীয় মুদ্রণ মে ২০০৮ মুদ্রণ সংখ্যা ১৫০০

অলংকরণ দেবাশীষ দেব
© মিনতি রায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 81-7756-446-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৩৫০.০০

পরমগুরু পরশুরাম এবং/অথবা

রাজশেখর বসু

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

অনেকদিন আগে আমার এক রম্যরচনার বইয়ের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম, "এক নদীর জলে দুবার ডুব দেওয়া যায় না। এক ঠোঁটে দুবার চুমু দেওয়া যায় না। এক রসিকতা দুবার করা যায় না।"

আমার রসরচনায় একই কথিকা বা পরম্পরা বারবার ঘুরেফিরে আসে, এই অভিযোগের এটা ছিল একটা উত্তর।

উত্তরটা পাঠকদের মনে ধরেনি। তা না হলে এখনও লোকে বলে, এই লেখাটা আগেও পড়েছি। বলতে ইচ্ছা হয়, আগেও পড়েছেন তো বেশ করেছেন। এখানে পড়ে, ওখানে শুনে, কখনও টুকে, কখনও অনুবাদ করে চল্লিশ বছর ধরে এই জোচ্চুরি করে আসছি। বলা উচিত, বাধ্য হয়ে করছি।

আমার অনুরাগিণী, ইংরেজি সাহিত্যের এক অধ্যাপিকা, সেদিন আমার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন, 'আপনার কয়েকটা বাছাই লেখা আমি ইংরাজিতে তর্জমা করব।' শুনে আমি আঁতকিয়ে উঠেছিলাম। আরে সর্বনাশ। আমি তো ইংরাজি থেকে তর্জমা করেই বাংলায় লিখেছি। এবার উলটোটা করলে ধরা পড়ে যাব। ধনেপ্রাণে মারা পড়ব।

সে যাই হোক, একটু সাবধানে বেছে নিয়ে বিশেষ করে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ এবং মৌলিক কয়েকশো রম্যরচনা একত্র করে একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজন করলাম।

'রম্যরচনা সমগ্র'-র কথা অনেকেই আমাকে বলেছেন। 'কবিতা সমগ্র' আছে। 'গল্প সমগ্র' আছে। এমনকী উপন্যাস সমগ্রও দেখা যাচ্ছে। তবে 'রম্যরচনা সমগ্র' নয় কেন, আপত্তি কী?

আপত্তি আছে। কারণ আমার ক্ষেত্রে সেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আমার রম্যরচনার সংখ্যা অন্তত দু' হাজারের কাছাকাছি। ঠাসাঠাসি করে টানা ছাপলেও চার-পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। রম্যরচনা বইকে মহাভারত কিংবা অভিধানের মতো ভারী দেখাবে।

শুধু তাই নয়। আমার অনেক রচনাই তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় সেই একই ব্যাপার। পৌনঃপুনিকতার দায় এড়াতে তিনশো পঁয়ষট্টিটি রম্যরচনার মধ্যে এই বই সীমাবদ্ধ রইল।

এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে পাঠকের জন্য একটি করে রম্যরচনা।

একুশটি বই থেকে এই সংকলন বাছাই করা হয়েছে। কাণ্ডজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি, বুদ্ধিশুদ্ধি, শোধবোধ, জলভাত, এবং গঙ্গারাম, পটললাল, সর্বাণী এবং..., বলাবাহুল্য, বালিশ, কী খবর, ক খ গ ঘ, ধারদেনা, ঘুষ, রস ও রমণী, শেষমেষ, সরসী, জলাঞ্জলি, সন্দেহজনক, বাঁচামরা, স্ত্রীরত্ন। এ ছাড়া 'মেলামেশা', 'মারাত্মক' 'ভদ্রলোক', 'বানরেরা মানুষ হচ্ছে' ইত্যাদি আরও সাত-আটটি বই এই সংকলনের বাইরে রইল, কারণ প্রধানত পৌনঃপুনিকতার আশঙ্কা।

এই সংকলন প্রকাশে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী মিনতি রায়, শ্রীমতী মণিদীপা চৌধুরী, শ্রীমতী রীনা আখতার এবং শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী। এদের শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়ে লাভ নেই, বরং বই বেরলে এই মূল্যবান গ্রন্থ তাঁদের এক কপি করে দেব।

শুভ মহালয়া
১৪১১
এইচ-এ ৫৫, সল্ট লেক
কলকাতা ৯৭

তারাপদ রায়

সূচিপত্র

চুরিবিদ্যা ১
নৈশকাহিনী ৩
কালীঘাটের পাখা ৬
ডাকাতের হাতে ৮
পদ্মাসন ১০
শিশুশিক্ষা (১) ১২
ঘুম (১) ১৪
পাগলের কাণ্ডজ্ঞান ১৬
পদবি ও নাম ১৮
ছারপোকার এপিটাফ ২০
ভাগ্যফল ২৩
বিশেষজ্ঞ ২৫
ছাতা ২৮
র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস ৩০
ঘড়ি ৩৩
দরজি ৩৫
সংখ্যাতত্ত্ব ৩৭
মাতালের কাণ্ডজ্ঞান ৩৯
ভূতের কাণ্ডজ্ঞান ৪২
বানরের কাণ্ডজ্ঞান ৪৪
কিঙ্কর-কিঙ্করী ৪৭
ডাক্তার-ডাক্তার ৪৯
দাঁত ৫২
টেলিফোন ৫৪
আমি কীরকম ভাবে ৫৬
মন মোর মেঘের সঙ্গী ৫৯
ভ্রমণকাহিনী (১) ৬১
প্রসূতি সদন ৬৪
নিজের ওজন নিজে বুঝুন ৬৬
জীবজন্তুর কথা ৬৮
গোরু (১) ৭১
প্রিয়তমাসু ৭৩
অভিনয় নয় ৭৬
ইঁদুর ও মদিরা ৭৮
টর্চলাইট ৮০
রং ৮৩
লিফট ৮৫
মদমত্ত ৮৮
সুচিকিৎসা ৯০
অচলার প্রেম ৯৩
শেষ পরকীয়া ৯৫
তালা ৯৮
কুকুর-কুকুর ১০০
গোপাল ভাঁড় ১০৩
জগৎপারাবারের তীরে ১০৫
হিন্দি ১০৭
রেফ্রিজারেটর ১১০
কৃষ্ণকান্ত এবং... ১১২
মাতাল রহস্য ১১৫
আবার মনে মনে ১১৭
শেষের সেদিন ১১৯
ভবসিন্ধু ১২২
রবীন্দ্রনাথ ১২৪
...বাচ্চা ১২৭
কুকুর কুণ্ডলী ১২৯
হে মাতাল, অমোঘ মাতাল ১৩১
শিশুপাল ১৩৩
ভোজনালয় ১৩৫
বাড়ি ভাড়া ১৩৭
হায় ছবি ১৩৯
জীবনবিমা ১৪১
কোন বাণিজ্যে ১৪৩
ডাক্তারের হাতে ১৪৫
অঘটন আজও ঘটে ১৪৭
সুপরামর্শ ১৪৮
পুলিশ ১৫০
ফাঁদ পাতা ভুবনে ১৫২
ধরা পড়েছে দু'জনে ১৫৪
রুপোলি পর্দার অন্তরালে ১৫৫
পিয়ো হে পিয়ো ১৫৭
ও চাঁদা চোখের জলে ১৬০
দামদর ১৬২
মিথ্যা কথা ১৬৪
কে কোথা ধরা পড়ে ১৬৬
সময় ১৬৮
হায় কবি, তুমি শুধু কবি ১৭০
রোগীর বন্ধু ১৭২
রসুন ১৭৪
রসিকতা ১৭৬
স্বর্গ ১৭৯
দুর্ঘটনার আগে ও পরে ১৮১
পণ্ডিত ১৮৩
সমস্যা ১৮৫
স্বেচ্ছাসেবক ১৮৮
বক্তা ও বক্তৃতা ১৯১
আবার বক্তৃতা ১৯৩
কলিংবেল ১৯৫
ঈশ্বর সমীপে ১৯৭
জীব-জগতের আজব কথা ১৯৯
তামাক ২০১
আবার তামাক ২০৩

রোগী কাহিনী ২০৬
নরখাদকের কাহিনী ২০৮
আয় শীত, যায় শীত ২১১
ঘটি-বাঙাল ২১৩
চিড়িয়াখানায় ২১৫
সমান-সমান ২১৭
স্মৃতির খেয়া ২১৯
অচলপত্র ২২২
সচিত্র ভারত ২২৪
রাম ও রামকৃষ্ণ ২২৬
কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ২২৯
স্বপ্ন ও রমণী ২৩১
অবাঞ্ছিত আতিশয্য ২৩৪
যা দেবী সর্বভূতেষু ২৩৭
মরণ রে ২৪০
ধৈর্যের পরীক্ষা ২৪২
ভুল (১) ২৪৭
গল্পের গোরু ২৪৯
কাজের মেয়ে ২৫৪
বইমেলা ২৫৫
স্ত্রী ২৫৭
প্রথম কোকিল ২৫৯
দ্বিতীয় কোকিল ২৬১
তৃতীয় কোকিল ২৬৩
অমল ধবল পালে ২৬৫
স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি ২৭১
চিকিৎসা ২৭৩
ভূত ও রিপোর্টার ২৭৭
হাঁচির গল্প ২৮০
ভাষা-ভাষা ২৮২
বালুকা ডাকিনী ২৮৪
ফুটবল ২৮৫
প্রশ্নোত্তর ২৮৭
অসম্ভব ২৮৯
রসিকতার উৎস সন্ধানে ২৯১
ডাক্তারবাবু নমস্কার ২৯৯
আত্মনেপদী ৩০১
ভাগলপুরের পাঞ্জাবি ৩০৩
পুজোর বাজার ৩০৫
অপমান ৩০৮
জীবজন্তু (১) ৩১০
পুজোর ছুটি ৩১২
ক্রিমিনাল ৩১৫
রবিবারের মহাভারত ৩১৯
আইনের আঙিনায় ৩২১
বুদ্ধি ৩২৩
শাশুড়ি ৩২৫
দেয়া-নেয়া ৩২৭
হে হিসাব ৩২৯
মাছ (১) ৩৩১
কুসংস্কার ৩৩৩
জুয়া (১) ৩৩৫
এসো বসি আহারে ৩৩৭
শুভ নববর্ষ ৩৩৯
রমণী সমাজে ৩৪২
স্বপ্ন ৩৪৪
কলকাতা তিনহাজার তিনশো ৩৪৭
আবার বইমেলা ৩৫১
এক সর্দারের গল্প (১) ৩৫৪
এক সর্দারের গল্প (২) ৩৫৬
এক সর্দারের গল্প (৩) ৩৫৮
জল ৩৬০
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ৩৬২
গাধা ৩৬৪
হাওয়াই ৩৬৬
সুনন্দর জার্নাল ৩৬৭
সরস কলকাতা ৩৬৯
সরস কবিতা ৩৭১
স্টুপিডেস্ট ৩৭৩
অবনী, বাড়ি আছো? ৩৭৪
জুয়া (২) ৩৭৫
সময়ের হিসেব ৩৭৮
কেনাকাটা: জুতো ৩৭৯
ভেজা চপ্পল ৩৮১
জয়বাবা শান্তিনাথ ৩৮২
টেলিফোন ৩৮৪
পরিশেষে ৩৮৫
জনগণের জোক! ৩৮৭
মকারান্ত ৩৮৮
কয়েকটি প্রশ্ন ৩৯৩
খাওয়া-দাওয়া ৩৯৪
বলাবাহুল্য ৩৯৭
শরৎচন্দ্র এবং রসিকতা ৩৯৯
পৃথিবী ৪০০
সুখের লাগিয়া ৪০২
অন্দর মহলে ৪০৩
জোক বুক ৪০৫
সান্টা, বান্টা ৪০৬
সরল শৈশব ৪০৭
কথা বলার বিপদ ৪০৯
সিগারেট ৪১০
পাটিগণিত ৪১১
গ্রন্থবার্তা ৪১৩
প্রেমিক-প্রেমিকা ৪১৫

ডাক্তারবাবু ৪১৬
বধূমাতা ৪১৮
কেনাবেচা ৪২০
বালিশ ৪২১
আপ রুচি খানা ৪২৩
কাণ্ডজ্ঞান ৪২৫
দুর্ঘটনা ৪২৬
বিজনের রক্তমাংস ৪২৭
বিলিতি বিয়ার-পাব ৪২৯
রাজনীতি ৪৩০
চপলতা ৪৩২
ব্যাধিধি ৪৩৩
মশা ও লবণহ্রদ ৪৩৫
যদ্দৃষ্টং ৪৩৬
বয়স বাড়ছে ৪৩৮
ধানাই-পানাই ৪৩৯
আমপাতা জোড়া-জোড়া ৪৪১
ভ্রমণ-কাহিনী (২) ৪৪২
হাস্যকবি সম্মেলন ৪৪৪
মুড়ি-মিছরি ৪৪৫
গণ্ডারের দুধ ৪৪৭
তৈজসপত্র ৪৪৮
পুলিশ ৪৫০
গোরু ৪৫২
অণুনাটিকা ৪৫৩
যদিদং হৃদয়ং ৪৫৬
এমন বাদল দিনে ৪৫৭
ফাঁসি ৪৫৯
লেপ ৪৬১
ব্যাটবল ৪৬৩
স্বপ্ন ৪৬৫
বড়দিন ৪৬৬
ধনীরাম ৪৬৮
ব্যাঙ্ক ৪৬৯
জাহান্নাম ৪৭১
ইতিহাস ৪৭৩
লুঙ্গি ৪৭৫
সেই বই ৪৭৬
ধ্বংসের মুখোমুখি ৪৭৭
ফুরসতনামা ৪৭৮
পোড়া বই ৪৮০
বার্তাকু ভক্ষণ বিল ৪৮২
অ্যালেন গিনসবার্গ ৪৮৪
প্যাঁচ ৪৮৬
শিশুশিক্ষা (২) ৪৮৮
লেখাপড়া ৪৮৯
ডেটলাইন শান্তিনিকেতন ৪৯১
যেভাবে গল্প তৈরি হয় ৪৯৩
হায় ভীরু প্রেম ৪৯৫
মাতালের গল্প ৪৯৯
মনের কথা ৫০১
চিনা-অচিনা ৫০৩
কয়েকটি অবিশ্বাস্য রসিকতা ৫০৫
মনের চিকিৎসা ৫০৭
কান্তকবি ৫০৮
জ্যোতিষী ৫১০
আবার জ্যোতিষী ৫১২
পথের ভিখিরি ৫১৪
গুরু-শিষ্য সংবাদ ৫১৫
ভুলোমন স্বামী ৫১৯
বই চুরি ৫২১
ফিলমি-ফিলমি ৫২২
চার্চিল ৫২৪
পঞ্জিকা ৫২৫
নিমন্ত্রণ ৫২৭
মাছ (২) ৫২৯
জানোয়ার ৫৩১
তুমি যে আমার ৫৩৩
সৈয়দ মুজতবা আলি ৫৩৪
ধারদেনা ৫৩৬
শিবরাম চক্রবর্তী ৫৩৭
যাচ্ছেতাই লেখা লিখছি ৫৩৯
দুর্বৃত্তের শাসানি ৫৪০
নিজের কোট খুলতে পারে না ৫৪১
ভোজসভা শেষে বক্তৃতা ৫৪২
শুধু পাঠিকারা চিঠি লেখে ৫৪৪
পাসপোর্ট ফটোর মতো ৫৪৫
আগে পাঁচ ডলারে, এখন? ৫৪৭
এত বুড়ো হব নাকো ৫৪৮
অপ্রত্যাশিত ৫৫০
গরমের পাখা মাঘ মাসে ৫৫১
বাংলায় কেন হয় না ৫৫২
মধ্যযুগ ৫৫৩
শিলিগুড়ি ৫৫৫
সেদিন বেঙ্গল ক্লাবে ৫৫৬
বেয়ারা ৫৫৮
এত কঠিন অঙ্ক ৫৫৯
বাড়িওয়ালা ৫৬১

সুনীলের সঙ্গে ৫৬২
পুলিশ এবং রবীন্দ্রসংগীত ৫৬৩
দিশি-বিলিতি পুলিশের বৃত্তান্ত ৫৬৫
রসলক্ষ্মীর সাধনা ৫৬৬
জানলা পড়ল মাথায় ৫৬৭
সেদিনের চুম্বনের পরে ৫৬৮
হাসির উপন্যাস ৫৭০
ভুল (২) ৫৭২
মহিলা কবিরা ৫৭৪
পুরনো কলকাতা ৫৭৫
প্রথমেই পঞ্চম সংস্করণ ৫৭৭
ঘুষ ৫৭৯
আইনমাফিক ৫৮৪
বাঁকা কথা ৫৮৯
শিশু বিষয়ে ৫৯২
শব্দকল্পদ্রুম ৫৯৫
জামাইষষ্ঠী ৫৯৮
আইরিশ রসিকতা ৬০০
পূজা ও রমণী ৬০৪
প্রতিযোগিতা ৬০৬
টকটক গন্ধ ৬১০
যানবাহন ৬১৩
রস ও রমণী ৬২০
অনুভব অথবা ভাল লাগা ৬২৩
রেডিয়ো ৬২৫
রিকশা ৬২৭
পরিবার পরিকল্পনা ৬২৯
মহিলা মহল ৬৩১
লালিমা পাল স্মরণে ৬৩৩
বোকার মা ৬৩৫
স্থূল ও অস্থূল ৬৩৭
দম্পতি, দম্পতী ৬৩৯
সাদা রাস্তা কালো বাড়ি ৬৪৩
লক্ষপতি ৬৪৫
গল্পের গতি ৬৪৭
পাকিস্তান ৬৪৯
ইঁদুর ৬৫১
এ হর্স ফর মাই কিংডম ৬৫৩
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ৬৫৬
প্রজাপতয়ে ৬৫৮
একটি উড়ো কাহিনী ৬৬০
সময়জ্ঞান ৬৬২
আমাদের কলের গান ৬৬৪
থানা পুলিশ ৬৬৬
ভ্রমণকাহিনী (৩) ৬৬৭
বয়স বাড়ছে ৬৬৯
ভুল, ভুল ৬৭১
জীবজন্তু ৬৭৪
ব্যবসা-বাণিজ্য ৬৭৬
বিজ্ঞাপন ৬৭৯
কবিতার ভাল-খারাপ ৬৮১
জোচ্চোর ৬৮৩
বলাই বাহুল্য ৬৮৫
গোলমাল ৬৮৬
বিপদ ৬৮৯
সিনেমা হল ৬৯০
বাসাবাড়ি ৬৯২
তবুও মাতাল ৬৯৫
ঢাকঢাক-গুড়গুড় ৬৯৮
জলাঞ্জলি ৭০০
টাকাপয়সা ৭০১
ঘুম (২) ৭০৩
ওগো বধূ সুন্দরী ৭০৫
প্রবাসে দৈবের বশে ৭০৬
তিন পুলিশের গল্প ৭০৮
দুই শ্রাদ্ধের গল্প ৭১১
দুই বাঘের গল্প ৭১৩
ঢাকাই রসিকতা ৭১৬
ওয়ার্ক কালচার ৭১৮
আমি কবি হয়েছিলাম গায়ের জোরে ৭২৩
যাহা পাই, তাহা চাই না ৭২৬
পথে পথে কবিতা ৭২৯
হাং সাং টাঙ্গাইল ৭৩১
পত্রের উত্তর ৭৩৫
আবার উত্তর ৭৩৬
বিদূষক ৭৩৮
মশা ৭৪৩
খাদ্য সমস্যা ৭৪৪
বউ কথা কও ৭৪৭
শেফালি ৭৪৮
ভালবাসার সন্ধানে ৭৫০
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ৭৫১
তারি লাগি যত ৭৫৩
জাহাজ ৭৫৪
স্ত্রীরত্ন ৭৫৬
আদ্যনারায়ণ ৭৫৭
আমার ভাগ্য ৭৫৯
পরোপকার ৭৬১
অফিস ৭৬২
ভদ্রলোক ৭৬৪
কাকের মাংস ৭৬৮
স্বর্গনরক ৭৬৯

চুরিবিদ্যা

নাবালক বয়সে এ বিষয়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। সম্ভবত সেটাই ছিল আমার প্রথম রম্যরচনা। এত বিষয় থাকতে ওই নিষ্পাপ বয়সে আমি কেন চুরিবিদ্যার উপরে আমার প্রথম গদ্যটি লিখেছিলাম সেটা যাঁর যেমন ইচ্ছে অনুমান করতে পারেন।

কিন্তু আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ওই লেখাটি লিখতে গিয়ে আমি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলাম। লিখতে লিখতে টের পেয়েছিলাম তস্করবৃত্তির প্রতি আমার একটা সহজাত টান রয়েছে। আজ এতদিন পরে ওই একই বিষয়ে আবার লিখতে বসে বুঝতে পারছি, টান যতটাই থাকুক, তখন আমি এ বিষয়ে প্রায় কিছুই জানতাম না। ইতিমধ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে সঙ্গদোষে এবং কালদোষে বহু বিখ্যাত তস্করের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে; অপর দিকে তস্করেরা এবং তস্করবান্ধব বহু কোতোয়াল সাহেবও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ।

আমি আমার এই চুরিবিদ্যায় আপাতত শুধু খাঁটি চোরেদের কথা বলব, আসল ও আদি চোরের দুঃখের কথা। এর মধ্যে ঠগ-জোচ্চোর-প্রতারকদের টেনে আনব না, তার জন্য পরে কখনও সময় পেলে চেষ্টা করব।

চোর দুই রকম। একপুরুষের নতুন চোর অথবা বংশানুক্রমে বনেদি চোর-বংশের সন্তান।

এই একপুরুষের নতুন চোরদেরই কষ্ট বেশি। আজকাল সিঁদকাঠি দুর্লভ, যা দু'-একটা গভীর রাতের অন্ধকারে কামারশালার পিছনের ঝোপে লুকিয়ে থেকে মশার কামড় খেয়ে কিনতে হয় তারও দাম সাংঘাতিক। কিন্তু যাঁদের বাপ-ঠাকুরদা চোর ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় উত্তরাধিকারসূত্রে জার্মান স্টিলের সিঁদকাঠি পেয়েছেন, সে রকম আজকাল আর কোথায় পাওয়া যাবে? আর তা ছাড়া, এখনকার কাঁচালোহার সিঁদকাঠির উপর ঠিক নির্ভর করা যায় না। তিন ইটের গাঁথুনি দেয়ালের দুটো ইট মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খুলে ফেলেছেন এমন সময় সিঁদকাঠিটি গেল ভেঙে, তখন সব পরিশ্রমই মাটি। তবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে আজ কিছুদিন হল এক দক্ষিণী চোর এসেছেন, তাঁর কাছে জানা গেছে মাদ্রাজ-মুম্বাইতে নাকি এখন স্টেনলেস স্টিলের সিঁদকাঠি পাওয়া যায়, সে যেমন সুন্দর দেখতে তেমনই মজবুত, দাম সামান্য বেশি। নতুন চোরেদের হয়তো এরপর থেকে সিঁদকাঠির সমস্যা থাকবে না।

কিন্তু অন্যান্য সমস্যা?

কালো হাফ প্যান্ট আর কালো স্যান্ডো গেঞ্জি পরে চুরি করতে যাওয়াই বহু পুরনো বিধি। কিন্তু কালো রংয়ের স্যান্ডো গেঞ্জি আজকাল একেবারেই পাওয়া যায় না, কেন যে গেঞ্জির কলগুলি এরকম গেঞ্জি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পুলিশের কোনও যোগসাজস আছে কি না, বলা যায় না। অনেকে বাধ্য হয়ে সাদা গেঞ্জি কিনে দ্বিগুণ খরচ করে শালকরের কাছ থেকে কালো রং করিয়ে নিচ্ছেন। এতে শুধু পয়সা বেশি লাগছে তাই নয়, যে শালকরের কাছেই সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি কালো রং করতে দেওয়া হোক সে এমন মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যে, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে সে সবই অনুমান করতে পারছে।

তবে কালো হাফপ্যান্টের ব্যাপারটা একটু কম জটিল। কালো হাফপ্যান্ট চেষ্টা করলে বাজারে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে সাদা হাফশার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট ইউনিফর্ম

রয়েছে। আর নতুন যুগের অতিরিক্ত ভিটামিন ও প্রোটিনে এবং সচ্ছল জনকজননীর ব্যাপক স্নেহে আজকাল বহু বালকই অতি নাদুসনুদুস, তাদের ইউনিফর্মের প্যান্ট যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক তস্করকেই চমৎকার ফিট করে। একটা ছোট অসুবিধা রয়েছে যে প্যান্টের সঙ্গে ওই ইউনিফর্মের দোকান থেকে একটা সাদা হাফশার্ট এবং একজোড়া সাদা মোজাও কিনতে হয়।

এত খরচ না বাড়িয়ে হরিষা মার্কেটে অথবা কোনও মঙ্গলবার সময় করে হাওড়া হাটে গেলে শুধু কালো হাফপ্যান্টই সংগ্রহ করা যেতে পারে। একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়, অনেক সময় এসব প্যান্টের রং খুব কাঁচা থাকে। একবার ধুতে গেলে আর কালোত্ব থাকে না, কালো খড়ির গুঁড়োর মতো রং বেরয়, এমনিতে কাঁচা কিন্তু অন্য কোনও কাপড়-চোপড়ে লেগে গেলে সেখানে খুব পাকা, আর কিছুতেই উঠবে না।

চুরি করার তো সময়-অসময় নেই, স্থান-অস্থান নেই। একবার নতুন কালো হাফপ্যান্ট পরে একটা বাড়ির পিছনের রেনপাইপ ধরে ঝুলতে ঝুলতে একজন চোর গৃহস্থদের ঘুমানোর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি এল, বৃষ্টিতে ভিজে তার নতুন প্যান্ট থেকে কালো পিচ্ছিল এক তরল পদার্থ বেরতে লাগল। পিছল হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর হাঁটু স্লিপ করতে লাগল, তিনি আর রেনপাইপ আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলেন না, হড়কে নীচে পড়ে গেলেন।

আরেকবার আরেকজন ওইরকম একটা নতুন প্যান্ট একবার পরার পর কাচতে গিয়ে একপুকুর জল কালো করে ফেলেছিলেন। পাড়ার লোকেরা যেই বুঝতে পারল এটা তাঁরই কীর্তি, এই মারে কী সেই মারে!

আসলে এ ভাবে চলে না, চলতে পারে না। এই বৃত্তি থেকে ক্রমশ লোক সরে যাচ্ছে, নানা বাধা ও অসুবিধার জন্য এই প্রাচীন বিদ্যা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়া, মার খাওয়া অথবা জেলখাটা এগুলো সনাতন সমস্যা, যাকে ইংরেজিতে বলে নর্মাল প্রফেশনাল হ্যাজার্ড— এ তো থাকবেই, এ নিয়ে কোনও প্রকৃত চোর মাথা ঘামায় না।

কিন্তু চুরি করার পোশাক, সিঁদকাঠি— এগুলি হল আসল সমস্যা। তা ছাড়া, যেটা এখনও বলা হয়নি, গায়ে মাখা তেলের ব্যাপারটা আছে।

চুরি করতে গেলে গায়ে তেল মাখতেই হবে। এটা বহু পরীক্ষিত এবং সর্বসম্মত অতি পুরনো রীতি। দেহ তৈলাক্ত থাকার জন্য কত চোর যে আজ পর্যন্ত শেষমুহূর্তে রক্ষা পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

তেল যে খুব বেশি লাগে তা নয়। সারা শরীরে তেল মাখতে নেই, সেটা অনেক সময় ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তেল মাখতে হয় ঊর্ধ্বাঙ্গে, দুই হাতে কবজি পর্যন্ত, বিশেষ করে ঘাড়ে, গলায় ও পিঠে। আর আজকালকার নতুন যুগের চোরেরা যাঁরা পুরনোদের মতো কদমছাঁট দেন না, মাথায় মজা করে বড় চুল রেখেছেন, তাঁদের মাথার চুলেও তেল মাখাতে হবে।

আগেকার দিনে পাওয়া যেত ক্রিম রঙের বিলিতি গ্রিজ। কী ভাল জিনিস ছিল সেটা, আর কী চমৎকার মৌচাক-মৌচাক গন্ধ বেরত গ্রিজটা দিয়ে। আর দামও ছিল বেশ ন্যায্য। যাঁরা পুরনো চোর তাঁদের মনে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নিউমার্কেটে ম্যাকফারলন সাহেবের দোকানে ক্রিমরঙা গ্রিজের এক পাইন্ডের কৌটো পাওয়া যেত ঠিক দেড় টাকায়। প্যাঁচপ্যাঁচে ছিল না, গা কুটকুট করত না। খুব সুবিধা ছিল এই গ্রিজটায়।

আর আজকাল ওইরকম গ্রিজ কোথায় পাওয়া যাবে! একালের চোরেরা ওসব জিনিস জন্মেও চোখে দেখেননি। তাঁরা গায়ে মাখেন পোড়া মবিল-অয়েল, তারও দাম এক বাটি তিন টাকা। সাংঘাতিক কুটকুটে এবং বিষাক্ত দ্রব্য এটি। এই পোড়া মবিলের কল্যাণে শত সহস্র নিরপরাধ তস্করের টাকায় চর্মরোগের ডাক্তারদের বিশাল রমরমাও চলছে। প্রায় সব চোরের গায়ে ঘা-পাঁচড়া, কিছুতেই সারতে চায় না। আর চুরির পরে ওই তেল শরীর থেকে তোলা কম কঠিন নাকি!

এর মধ্যে যাঁরা শৌখিন কিংবা বড়লোক চোর আছেন, তাঁরা কেউ কেউ গায়ে হোয়াইট ভেসলিন

মাখতে শুরু করেছেন, কিন্তু তারও দাম চড়তে চড়তে এক ছোট কৌটো চার টাকা-সাড়ে চার টাকায় পৌঁছেছে।

অবস্থা ক্রমশ এমন জায়গায় পৌছাচ্ছে যে চৌর্যবৃত্তির দিকে এখন নতুন লোককে আকর্ষণ করানো রীতিমতো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে আর পুরনো যাঁরা আছেন, জেলের বাইরে আছেন, তাঁরাও ক্রমশ এই রোমাঞ্চকর কাজে তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। যে উদ্দীপনা নিয়ে একদিন তাঁরা একটি সফল চুরির জন্য রাতের পর রাত অধীর প্রতীক্ষা করতেন এই দুর্দিনের বাজারে সেই উত্তেজনা আজ কোথায়!

নৈশকাহিনী

আমার এই নৈশকাহিনী রাত্রির কোনও ঘটনা নিয়ে নয়। আমার এই কাহিনীর বিষয়বস্তু হল নেশা।

আমার বিষয় অবশ্য ঠিক নেশা নয়, নেশার পরিমাপ নিয়ে এই আলোচনা। এক টিপ নস্যি, আড়াই প্যাকেট সিগারেট, তিন হেঁচকির জর্দা, সাত ছিলিম গাঁজা কিংবা চার পেগ হুইস্কি— একেক রকম নেশার সামগ্রীর মাপ হয় একেকভাবে— অন্তত এতকাল এই ছিল আমার সাবেকি ধারণা।

আমার সেই ধারণা গত রবিবার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যথারীতি রবিবার দিন বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিশে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। জায়গাটা জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি, চারদিকে পাতাল রেলের গর্ত, কাদা-জল, লোহা-ইট। দৌড়নো দূরের কথা, এর মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটাও বিপজ্জনক। একটু দূরেই ডি এন মিত্র স্কোয়ার, যা লোকমুখে বহুদিন হল গাঁজা পার্ক বলে পরিচিত। স্কোয়ারটি কয়েক বছর হল পাতাল রেলের দখলে, কিন্তু তার নাম বা নামকরণের কারণ এখনও বদলায়নি।

কোনও উপায় ছিল না। জলে ভিজে একেবারে চোপসানো অবস্থায় স্কোয়ারের সামনের ছাদ-ঢাকা, বাঁশের বেড়া দেওয়া পুরনো ঘরটার চাতালে যথাসাধ্য ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টি ও বাতাসের হাত থেকে সামান্য রক্ষা পাওয়া গেল।

চাতালের এদিক-ওদিকে কয়েকটি চক্র বসেছে। আট-দশ জন করে একেকটি চক্র। নানা বয়সের, নানা চেহারার অনেক রকম লোক, সকলেই ঘাস খাচ্ছেন। ঘাস মানে ইংরেজি গ্রাস, গ্রাস মানে গাঁজা। মদের আড্ডার সঙ্গে গাঁজার আড্ডার পার্থক্য হল যে এখানে সকলেই নিঃশব্দ। নিঃশব্দে একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে কলকে চলে যাচ্ছে, তিনি চার-পাঁচ টান দিয়ে পরের জনের হাতে তুলে দিচ্ছেন। রাস্তার মুচি, অফিসের বাবু, বাসের পকেটমার সকলে পাশাপাশি গোল হয়ে বসে। রসদ ফুরিয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই পয়সা দিয়ে আবার পুরিয়া এনে কলকে ভরে নিচ্ছে। সকলেই শিবনেত্র, কেউ কেউ সম্পূর্ণ চোখ বুজে আত্মস্থ, শুধু সময়মতো হাত উঠে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তীর কাছ থেকে কলকে গ্রহণের জন্য। বৃষ্টিভেজা বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছে গঞ্জিকাধুম্রের ঘন গন্ধে।

এখানে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে একা একাই নেশা হয়ে যাবে। অথচ বৃষ্টি আরও জোরে

এসেছে এবং বাতাস অন্তত একশো কিলোমিটার বেগে বইছে। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে এবং গঞ্জিকাচক্রের ধোঁয়া থেকে নাক বাঁচিয়ে একটা পাশে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

একটু আগেই ভদ্রলোককে দেখেছি নিমীলিত নয়নে খুব আয়েসের সঙ্গে দু'জন পাতাল রেলের মিস্ত্রির মাঝখানে বসে ধূমপান উপভোগ করছিলেন। তাঁর বোধহয় নেশা করা শেষ হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরবেন বলে উঠে এসেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে যা হয়, একটু পরেই আমাদের মধ্যে আলাপ শুরু হল। ভদ্রলোক নিজেই উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

ভদ্রলোকের উপাধি ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ছে নাম বলেছিলেন ভূপতি। ভূপতিবাবু মধ্যবয়সি, রোগা পাকাটে চেহারা। সামান্য ময়লা তাঁদের ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে। দেখলেই বোঝা যায় উৎসব অনুষ্ঠানে এঁর পাঞ্জাবিতে গিলে করা থাকে এবং গলায় পাকানো চাদর থাকে। মোটামুটিভাবে কলকাতার আধা বনেদি পুরনো লোক। কথাবার্তায় প্রকাশ পেল শ'দেড়েক হাতে-টানা রিকশা ছিল ভূপতিবাবুর এই দু'-চার মাস আগেও। তার মধ্যে একটির মাত্র লাইসেন্স ছিল। সেই একটি লাইসেন্সেই দেড়শোটি গাড়ি চলত। এখন পুলিশের অত্যাচারে সত্তরটা রিকশা নিজেদের পুরনো বাড়ির উঠোনে লুকিয়ে ফেলেছেন। গোটা তিরিশেক রিকশা ভবানীপুর আর বালিগঞ্জ থানায় ধরে নিয়ে গেছে। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না, তাই সময় পেলেই দুঃখ-চিন্তা ভুলতে এখানে এসে এক ছিলিম গাঁজা টেনে যান।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে, বৃষ্টি তখন একটু ধরে এসেছে, হাওয়ার বেগও বেশ কম, ভূপতিবাবু রাস্তায় নামলেন, আমিও নামলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রতার খাতিরে এমনি একটা প্রশ্ন, 'বাড়ি যাচ্ছেন?' ভূপতিবাবু একটু থেমে উত্তর দিলেন, 'এই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যাব কি মশায়? ওই গলির মধ্যে ময়রার দোকানে একটু দুধ খেতে যাচ্ছি। গাঁজার সঙ্গে দুধটা দরকার।' হঠাৎ ভূপতিবাবু কথা পালটিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন ভদ্রলোক গাঁজা খায় কী করে?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, সে কী কথা!' ভূপতিবাবু কিন্তু আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'দেখুন মশায়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। সব রকম নেশা-ভাং করে দেখেছি, অনেক মদ খেয়েছি, নামকরা মাতাল ছিলাম আমি, ভবানীপুরের সব ডাকসাইটে মাতালেরা আমাকে দেখে লুকিয়ে পড়ত। কিন্তু গাঁজা, গাঁজার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।'

ভর সন্ধ্যায়, বৃষ্টির মধ্যে গেঁজেলের পাল্লা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভদ্রতাসূচক কী একটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে আমি কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভূপতিবাবু ছাড়ার পাত্র নন। তিনি আমাকে চেপে ধরলেন, সত্যি সত্যি আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, 'কোন নেশা বড়, কোনটা ছোট— এ নিয়ে যার যা ইচ্ছে বলে কিন্তু এ বিষয়ে আমি বিস্তর চিন্তা করেছি, মনে মনে অনেক গবেষণা করেছি, অবশেষে একটা বৈজ্ঞানিক হিসেব বের করেছি আর সেই হিসেবে গাঁজাই সর্বোত্তম।'

'আপনার এই বৈজ্ঞানিক হিসেবটা কী রকম?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ভূপতিবাবু বললেন, 'আরে মশায়, নেশা মাপতে হবে আঙুল দিয়ে।'

'আঙুল দিয়ে!' আমি একটু বিস্মিত হলাম, তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, মদ কিংবা সিদ্ধির শরবত আঙুল দিয়ে মাপা যেতে পারে। মদের বেলায় দু' আঙুলে এক পেগ, তিন আঙুলে দেড় পেগ, এ রকম হিসেব হতে পারে।'

আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ভূপতিবাবু, উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'থামুন তো, খালি মদ আর মদ। আপনারা ফরসা জামা-কাপড়ওলা লোকেরা খালি মদের কথা বলেন। মদ তো পাঁচ-আঙুলে নেশা।'

আমি আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'পাঁচ-আঙুলে নেশা আবার কী?'

'অশত্থতলার নেশা বুঝতে পারছেন না,' ভূপতিবাবু এবার নিজের বিষয় পেয়ে গিয়ে আমাকে প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে লাগলেন, 'যত বেশি আঙুল তত বেশি উচ্চমানের নেশা। সবচেয়ে খারাপ নেশা হল এক আঙুলের। দেখবেন ওড়িয়া পানের দোকানে পাওয়া যায়, কালো মতন খবরের কাগজে জড়িয়ে বেচে, গুড়াখু, আঙুলে লাগিয়ে দাঁত মাজতে হয়, এটা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেশা।' একটু থেমে ভূপতিবাবু বললেন, 'এর চেয়ে খারাপ অবশ্য চা। মাত্র আধ আঙুলের ব্যাপার। একটা আঙুল অর্ধেক করে পেয়ালার হাতলে ঢুকিয়ে দিলেই হল। তবে চা ঠিক নেশা নয়।' বলে ভূপতিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসলেন, বোধহয় ওঁর সন্দেহ হচ্ছিল আমি খুব চা-খোর, ওঁর বিশ্লেষণে দুঃখিত হতে পারি। কিন্তু তিনি আর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন, 'এর পরেই আসে নস্যি, দু' আঙুলের নেশা। দু' আঙুল দিয়ে এক টিপ নাকে ঢোকানো, অতি বিশ্রী, নিচু নেশা মশায়। এর চেয়ে সিগারেট একটু ভাল। বিড়িও ওই একই। দু' আঙুলে ধরে বুড়ো আঙুল অর্ধেক কাত করে মুখে দিয়ে টান, ওই আড়াই আঙুলের নেশা খুব উঁচু জাতের নয়, তবে ফেলনাও নয়।'

ভূপতিবাবুর এই বিশ্লেষণ কখন শেষ হবে কে জানে, এদিকে আবার বৃষ্টি এসে গেল মনে হচ্ছে অথচ শুনতেও খারাপ লাগছে না, এ রকম আগে আর কখনও শুনিনি তো। ভূপতিবাবু সামান্য বিরতি দিয়ে আবার শুরু করে দিয়েছেন, 'এর মধ্যে আরও অনেক রকম নেশা আছে সেসব বাদ দিচ্ছি। আপনি মদের কথা বলছিলেন, মদ হল পাঁচ-আঙুলে নেশা। পাঁচ আঙুলে গেলাস ধরে মুখে তুলতে হবে। সোজা বোতল থেকে গলায় ঢেলে খেলেও ওই পাঁচ আঙুল। সিদ্ধির শরবতও অবশ্য তাই। দুটোই ভাল জাতের নেশা। তবে গাঁজার কাছে কিছু নয়।' এই বলে দুটো হাত জোড় করে একটি কাল্পনিক কলকে মুখের কাছে ধরে দু'বার জোরে জোরে টান দিয়ে বললেন, 'একেবারে পুরো দশ আঙুলের নেশা। দু' হাতের দশ আঙুলে কলকে ধরতে হবে। এর চেয়ে বড় নেশা হয় না।'

বৃষ্টি প্রায় এসে গেল আবার, চলে আসছিলাম, ভূপতিবাবু হাতের মুঠোটা দিয়ে আমার কবজিটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'শেষ কথাটা শুনে যান, কুড়ি আঙুলের নেশা, সেও ওই গাঁজাই। কাটিহারের মেলায় গেলে দেখবেন, অশত্থতলায় দারুণ ভিড়, ছিলিম মহারাজ গাঁজা খাচ্ছেন। দুই হাতে এক কলকে, দুই পায়ে এক কলকে। দুই হাত, দুই পা, দুই কলকে এসে গেছে মুখে, বৃশ্চিকাসনে গঞ্জিকা সেবন করছেন ছিলিম মহারাজ, দুই কলকে দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরচ্ছে।'

এতক্ষণে প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে গেছে। ভূপতিবাবুর হাত এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে এগোলাম।

কালীঘাটের পাখা

'এসি পাখা ডিসি পাখা আকাশের কানে কানে
শিশি বোতল রেগুলেটার সরু সরু গানে গানে'

কোনও পণ্ডিত পাঠক যাতে মনে না করেন যে এই অসামান্য পঙ্‌ক্তি দুটি এই ব্যর্থ কবির রচনা, সেই জন্যে প্রথমেই তাঁর ভ্রম নিরসন করা দরকার। এই শ্লোকটি মূলত সুকুমার রায়ের এবং প্রয়োজনবোধে এর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমার স্বর্গীয় অগ্রজ। আমার দাদা সাত বছর পরলোকে গিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে রসিকতা করব না, কিন্তু ঘটনাটা একটু বলি।

অনেকদিন কবিতা লেখা হয়নি। একটি কবিতা লেখার খুব চেষ্টা করছিলাম, কলম দিয়ে ঝলমল করে বেরিয়ে এল।

'এসি পাখা ডিসি পাখা আকাশের কানে কানে...'

একটু পরে হৃদয়ঙ্গম হল লিখনদেবী চান না যে আমি কবিতা লিখি, সুতরাং আবার কাণ্ডজ্ঞান।

এসি পাখা আজকাল সব বাড়িতেই আছে, কিন্তু এই শ্লোকের ডিসি পাখাটি ছিল আমাদের কালীঘাট বাড়িতে। এই পাখাটিকে অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে, এই কলকাতা শহরের বহু নামকরা লোক আছেন যাঁরা এই পাখাটির হাওয়া খেয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনও চোখ বুজে একটু চেষ্টা করলেই পাখাটিকে স্পষ্ট দেখতে পান বনবন করে ঘুরছে।

কোনও সাধারণ জিনিস ছিল না আমাদের এই পাখাটি। অন্য পাখায় যেখানে তিনটি ব্লেড থাকে, এর ছিল চারটি। প্রত্যেকটি এক সমকোণে নব্বুই ডিগ্রিতে পাশেরটির লম্ব। তিনটি ব্লেড ছিল টিন বা ওই জাতীয় কোনও ধাতুজ দ্রব্যের। কয়েক বছর পর পর একেকবার একেক রকম রং করতে করতে পাখাটি শেষ পর্যন্ত একটা ঝাপসা কালো রঙের চেহারা ধারণ করেছিল। সম্পূর্ণ কালো নয়, যখন অন্ধকারে চলত তখনও ঝাপসা ভাবটা দেখা যেত।

এর অবশ্য অন্য একটি কারণ ছিল। ওই পাখাটির চতুর্থ ব্লেডটি ছিল কাঠের এবং সেটা কী কাঠ ছিল, ভগবান জানেন, তাতে বিশেষ কোনও রং ধরত না। তা ছাড়া একবার সামান্য হালকা রং করার পরই কাঠের ব্লেডটি একটু বেঁকে যায়, তারপর থেকে রং করার সময় ওটাকে বাদ দিয়েই রং করা হত।

পাখাটির গায়ে অর্ধস্পষ্ট ইংরেজি হরফে লেখা ছিল, Government of Bengal, Excise Department, তার নীচে (98), ব্র্যাকেটেই।

আমাদের কোনও কোনও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ধারণা ছিল পাখাটি আমরা গভর্মেন্টের কোথাও থেকে চুরি করেছি। এক নীতিবাগীশ মাস্টারমশাই আমার ছোটভাই বিজনকে পড়াতেন, ওই পাখাটাই ছিল পড়ার জায়গায়, তিনি ওটার হাওয়া কিছুতেই খেতে চাইতেন না, এদিকে বিজনের গরমে লেখাপড়া হত না, শেষ পর্যন্ত বিজনের লেখাপড়াটাই বরবাদ হয়ে গেল।

অন্য কারও কারও বিশ্বাস ছিল যে আমার পূর্বপুরুষেরা প্রচুর মদ-গাঁজা খেতেন, এই বাবদ সরকারের আবগারি বিভাগের প্রচুর আয় হত এবং এই সব বিবেচনা করে এই ইলেকট্রিক পাখাটি সদাশয় সরকার বাহাদুর আমাদের পরিবারকে উপহার দিয়েছিলেন।

এসব কোনও কথাই সত্য নয়। আমার আগের চৌদ্দ পুরুষে কারও সরকারের সঙ্গে কোনও

সম্বন্ধই ছিল না। সরকারের ঘর থেকে পাখা চুরি করে আনা কিংবা সরকারের কাছ থেকে পাখা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের বংশের ছিল না।

রহস্যটা এই যে, সরকারি ডিসপোজাল থেকে আমার দাদাবাবু এই পাখাটি এগারো টাকা আট আনা দিয়ে নিলামে কিনেছিলেন, সেও অনন্তকাল আগে।

রঙটা কখনও রং করা হয়নি, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সরকারি হরফগুলি পাঠ করা যেত। এমনিতে কৌতূহলী লোকদের বোঝালে বুঝত, কিন্তু মুশকিল ছিল ওই নাইনটি-এইট সংখ্যাটি নিয়ে।

পাখাটি কি আটানব্বুই সালের, তার মানে আঠারোশো আটানব্বুই! তার মাত্র কয়েক বছর আগে ইডেন গার্ডেনে কলকাতার প্রথম ইলেকট্রিক আলো এসেছে, কলকাতার লোকে দল বেঁধে সন্ধ্যাবেলা সেই আলো দেখতে যেত। সেই অর্থে পাখাটি যথেষ্ট প্রাচীন। তা হতেও পারে। আবার এমনও হতে পারে যে পাখাটি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের আটানব্বুই নম্বর পাখা ছিল। সে আমলে আবগারি বিভাগ কত বড় ছিল, তাদের এই আটানব্বুইটা কিংবা ততোধিক পাখা কীভাবে ব্যবহৃত হত, তাদের শরীর বা মাথা এত গরম হত কেন, এসব প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে এসে যায়।

এসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন না তুলে পাখাটির আগাগোড়া, যতটুকু এখনও মনে আছে, বর্ণনা করছি।

আমাদের ওই পাখাটির সবচেয়ে বিচিত্র অংশটি ছিল এর রেগুলেটার এবং সেই জন্যই বোধহয় আমার দাদা এসি পাখা ভিসি পাখার গানে রেগুলেটার শব্দটি ঢুকিয়েছিলেন।

অটাত্তর আর পি এম-এর গ্রামোফোন রেকর্ডের বাক্সের মতো আকারের কালো চৌকো রেগুলেটার, তার উপরের দিকে একটি সিংহের ছবি আঁকা, যার থাবার নীচে একটি মরা মোষ কিংবা গোরু পড়ে রয়েছে।

রেগুলেটারটির আটটি ঘর, কিন্তু এক থেকে আট সব ঘরেই সমান গতিতে চলত এবং সে সাংঘাতিক গতি। দু' মিনিট-আড়াই মিনিট পর পর রেগুলেটারটি একটু কেঁপে উঠত, তখন পাখাটা একটু কমে যেত।

আধঘণ্টা পাখা চললে রেগুলেটার গনগনে গরম হয়ে যেত। এ সময় অনেক লোক না বুঝে হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে, রেগুলেটারের ছোঁয়ায় হাতে ফোসকা পড়ে গেছে।

আমাদের কিন্তু খুবই সুবিধে হয়েছিল। আমরা ওই রেগুলেটারের গায়ে ধরে পাঁউরুটি টোস্ট করে নিতাম। রেগুলেটারের উপর দিকে টিনের কৌটোয় বসিয়ে আমার দিদিমা তাঁর দোক্তার খনে মৌরি ভেজে নিতেন।

খুবই কাজের ছিল ওই রেগুলেটার কিন্তু শেষের দিকে পাখাটা বিরুদ্ধাচরণ শুরু করল। পাখাটা খুললেই গোঁ গোঁ করে বুনো ষাঁড়ের মতো করতে থাকত। পুরো পাড়া থরথর করে কাঁপতে থাকত। অনেক বাড়ির কম পাওয়ারের বালব পুট করে ফেটে চৌচির হয়ে যেত। অনেকের রেডিয়োতে এক সঙ্গে তিন-চারটে সেন্টার চলে আসত।

আমাদের কোনও অসুবিধা হত না। অন্তিম পর্বে পাখাটা চালানোর একটু আগেই দেখে নিতাম আমাদের নিজেদের জিনিসপত্র, আলো-পাখা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সব বন্ধ আছে কি না। বন্ধ না থাকলে সব বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর পাখাটা চালু করতাম।

সবচেয়ে সুবিধে ছিল রাতের বেলায়। পাখাটা চালালে আর অন্ধকার ঘরে আলোর দরকার হত না। পাখাটার ভিতর থেকে আলো ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসত, শুধু আমাদের ঘরে নয়, জানলা দরজা খোলা থাকলে আশপাশের ঘরবাড়ি আলোয় আলোময় হয়ে যেত।

পাড়ার লোকেরা অনেক চেষ্টা করেছিল, থানা-পুলিশ, আইন আদালত। কিন্তু কেউ তাদের পাত্তা দেয়নি। এই বিচিত্র পাখার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। অবশ্য আমরা খুব নির্দয় ছিলাম না। একবার এক প্রতিবেশী নবদম্পতির অনুরোধে তাদের ফুলশয্যার সময় দুই সপ্তাহ আমরা পাখাটি বন্ধ রেখেছিলাম।

আরেকবার পাশের বাড়ির ছাদে পাড়ার ছেলেরা রবীন্দ্রজয়ন্তী করেছিল, ছাদে ইলেকট্রিক ছিল না, তাদের আলো পাওয়ার জন্য আমরা পাখাটি আমাদের বিনা প্রয়োজনেই চালিয়ে ছিলাম।

অবশেষে আমাদের প্রকৃত ক্ষতি হয় চিন-যুদ্ধের সময় বাষট্টি সালে। ব্ল্যাকআউট আইন ভঙ্গ করার অপরাধে একদিন সরেজমিন তদন্ত করে সিভিল ডিফেন্স দফতর আমাদের পাখাটি বাজেয়াপ্ত করে।

তারপর আর পাখাটির কোনও খোঁজ পাইনি। আজ যখন চারদিকে অন্ধকার, অঘোষিত ব্ল্যাকআউট, সেই পাখাটির কথা কখনও কখনও মনে পড়ে।

ডাকাতের হাতে

এতক্ষণ ভদ্রলোককে কেউ লক্ষ করেনি। ভদ্রলোক মেঝের এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন।

ঘরময় দুরন্ত উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা। পুলিশের লোক, খবরের কাগজের লোক— কে কাকে লক্ষ করে! একটু আগে বাজারের পিছনে ব্যাঙ্কের এই একতলার ঘরে ডাকাতি হয়ে গেছে।

পুলিশের কর্তারা ব্যাঙ্কের এজেন্ট ও ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ডাকাতির বিবরণ ও অপহৃত অর্থের পরিমাণ জেনে নিচ্ছিলেন। স্থানীয় থানার ছোট দারোগাবাবু তাঁর কালো নোটবুকে টুকে নিচ্ছিলেন, 'তা হলে একশো টাকার নোটের বান্ডিল সাতাশটা, পঞ্চাশ টাকার নোটের বান্ডিল সতেরোটা, কুড়ি টাকার নোটের...' এমন সময়ে ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে উঠে এসে দারোগাবাবুর সামনে কীরকম যেন হাঁটু মুড়ে আধা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি হ্যান্ডলুমের ঘন গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবিটির ঝুল বেশ লম্বা এবং তাই রক্ষা, কারণ তাঁর নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ শূন্য, কোনও কাপড়-চোপড় নেই। পাঞ্জাবির কাপড় বেশ মোটা বলে পাঞ্জাবির তলায় কোমরের নীচে কিছু আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোককে লক্ষ করা মাত্র তাড়াতাড়ি পুলিশকে দেখিয়ে ব্যাঙ্কের এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো যার কথা বলছিলাম, এই যে...।' ভদ্রলোকের আশ্চর্য পোশাক এবং বিহ্বল চেহারা আর তার সঙ্গে এজেন্ট সাহেবের উত্তেজনা দেখে, পুলিশের এক কর্তা যিনি কাউন্টারে হেলান দিয়ে এতক্ষণ কাউন্টার টিপে টিপে কতটা শক্ত পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তিনি মুহূর্তে বুঝে ফেললেন, এই ব্যক্তি অবশ্যই ডাকাতদের একজন। তিনি চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন, 'অ্যারেস্ট হিম'। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন সেপাই দু'দিক থেকে ছুটে গেল।

কিন্তু এরই মধ্যে এজেন্ট, ক্যাশিয়ার সবাই হা হা করে উঠলেন, 'আরে করেন কী? করেন কী? উনি ডাকাত নন।'

'উনি ডাকাত নন, তা হলে উনি কী?' পুলিশের ছোটসাহেব গর্জে উঠলেন।

'উনি মিস্টার ছকু চৌধুরী। বাঁশের ব্যবসায়ী। আমাদের ক্লায়েন্ট।' ব্যাঙ্কের তরফে এই উত্তরে চমকিত হয়ে পুলিশেরা একটু নিরস্ত হলেন, শুধু ছোটসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের ব্যাঙ্কের

ক্লায়েন্টরা আজকাল এই রকম পোশাক পরে আসেন নাকি?'

ছকু চৌধুরী এতক্ষণে হাত জোড় করে পুলিশ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক দাঁড়িয়েছেন বলা যায় না, পা দুটো হাঁটুর কাছে ত্রিভুজের মতো ভাঁজ করে পাঞ্জাবির ঝুল দ্বারা যতটা লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

পিছনে থানার জমাদারসাহেব রুল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর উপরওলাদের সম্মুখে এই অর্বাচীন ব্যক্তিটির দাঁড়ানোর ভঙ্গির এই বেয়াদবি তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। জমাদার রুল উঁচিয়ে বললেন, 'এই, সিধা হো যাও, সোজা দাঁড়াও।'

জমাদারের আদেশ পেয়ে ছকু চৌধুরী কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, 'না স্যার, আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলবেন না। সে আমি পারব না।'

অবশ্য এত কাকুতি-মিনতি করার প্রয়োজন ছিল না। প্রায় সবাই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন ছকু চৌধুরী এতক্ষণ যে কারণে মেঝেতে বসে ছিলেন এখন সেই কারণেই বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লজ্জা নিবারণ ছাড়া তাঁর আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

সদ্য ডাকাতি হওয়া ঘরের আবহাওয়া আগেই থমথমে ছিল, এর পরে আরও থমথমে হয়ে উঠল। সবাই চুপচাপ। অবশেষে পুলিশের ছোটসাহেব নীরবতা ভাঙলেন, 'আপনি ডাকাত নন, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি শুধু পাঞ্জাবি পরে ব্যাঙ্কে এসেছেন কেন? ভদ্রসমাজে যাতায়াত নেই আপনার?'

ছকু চৌধুরী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'না স্যার, আমার লুঙ্গি...'; সঙ্গে সঙ্গে ছকুবাবুর অর্ধসমাপ্ত বাক্যটি ব্যাঙ্কের এজেন্টসাহেব অনুমোদন করলেন, 'হ্যাঁ, ছকুবাবুর লুঙ্গি...।'

ডাকাতির তদন্তের মধ্যে এইরকম একটি সামান্য লুঙ্গির প্রসঙ্গ আসায় পুলিশের লোকেরা খুব চটে উঠলেন, ছোটসাহেব আবার ধমকে উঠলেন, 'কীসের লুঙ্গি? এসব কী ইয়ারকি হচ্ছে?'

এবার ছকুবাবু একেবারে মুষড়িয়ে পড়লেন, 'স্যার, আমার লুঙ্গিটা ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেছে।' পুলিশ সাহেবদের অবাক হবার পালা, 'লুঙ্গি ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেল? সোনার সুতো দিয়ে বোনা, নাকি বেনারসি লুঙ্গি? ডাকাতদেরও কি আজকাল কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে?'

ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন, 'না ঠিক তা নয়; ডাকাতদের টাকা বেশি হয়ে গিয়েছিল। তারা বোধহয় আশা করেনি যে এত টাকা পাবে। দুটো মাত্র বড় বড় বাজারের থলে এনেছিল, সে দুটো পুরোপুরি ভরে গেলে তখন কী আর করবে, সামনের কাউন্টারে ছকুবাবু টাকা জমা দিতে এসেছিলেন, ওঁকে দু'জনে মিলে জাপটিয়ে ধরে ওঁর লুঙ্গিটা খুলে নিয়ে বাকি টাকা বস্তার মতো করে বেঁধে ফেলল।'

পুলিশ সাহেব হতবাক, 'বলেন কী মশায়? লুঙ্গিটা খুলে নিয়ে নিল?'

ছকুবাবুর পক্ষ সমর্থন করে ক্যাশিয়ারবাবু বললেন, 'ছকুবাবু খুব ভাল লোক, স্যার। আমাদের পুরনো কাস্টমার। প্রথমে উনি কেন, আমরা কেউই ধরতে পারিনি, ডাকাতেরা কেন ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা ভাবলাম ডাকাতের দল ভেবেছে ওঁর কাছে অনেক টাকা আছে, কিন্তু ওঁর ওই সামান্য দু' হাজার আড়াই হাজার টাকা ডাকাতেরা ছুঁল না। শুধু ওঁকে ধরে ওঁর লুঙ্গিটা খুলে নিল। ছকুবাবু যখন বুঝতে পারলেন যে লুঙ্গিটা খুলে নিচ্ছে, তিনি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন স্যার, কেন দেবেন না, বলুন। আমরাও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, না হলে স্যার, ব্যাঙ্ক ডাকাতি তো সব জায়গাতেই হচ্ছে, আমাদের সব টাকাই তো ইন্সিওর করা, আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে পুরনো খদ্দেরের লুঙ্গি নেবে, এ কী রকম অত্যাচার!'

ক্যাশিয়ারবাবুর ভরসা পেয়ে পুলিশদের হতবাক অবস্থা দেখে ছকুবাবু এতক্ষণে একটু সাহস অর্জন করেছেন, পুলিশ সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, আমার কী হবে?' পুলিশসাহেব এবার একটু ঠান্ডাভাবেই বললেন, 'কী হবে আপনার, যা শুনলাম, আপনার টাকাপয়সা

তো কিছু যায়নি! এখন কিছুক্ষণ ওই সিঁড়ির নীচে চুপচাপ বসে থাকুন। তারপর সন্ধ্যার সময় যেই লোডশেডিং হবে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।'

'কিন্তু আমি স্যার, আর বাড়ি ফিরতে পারব না স্যার। লুঙ্গিটা আমার নয় স্যার।' ছকু চৌধুরীর এই কথা শুনে পুলিশ সাহেব আরও বিচলিত হলেন, 'লুঙ্গিটা আপনার নয়?'

ছকু চৌধুরী আবার হাতজোড় করলেন, 'স্যার, সত্যি বলছি স্যার, লুঙ্গিটা আমার শালার। দু'দিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে, দুপুরে চৌরঙ্গিতে পাতাল রেলের গর্ত দেখতে বেরিয়েছে। ভাবলাম পাঁচ মিনিটের জন্য যাই ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে আসি। টাকাপয়সা সব ঠিক রইল, শুধু গেল আমার শালার লুঙ্গিটা!' ছকু চৌধুরী হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'আমার শালা যখন জানতে পারবে আমি তার লুঙ্গি পরে বেরিয়ে ছিলাম, আমি কী করে তাকে মুখ দেখাব, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে আমি কী করে মুখ দেখাব? ডাকাতেরা আমার এ কী সর্বনাশ করে গেল, স্যার!'

ব্যাঙ্ক আর পুলিশের লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছকু চৌধুরীর কান্না দেখতে লাগলেন। খবরের কাগজের লোকেরা ঝপাঝপ ছবি তুলতে লাগলেন।

পুনশ্চ: কোনও পাঠক বা পাঠিকার যদি এরকম সন্দেহ হয় যে এই কাহিনীর সঙ্গে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও ডাকাতির খবরের কোনও সম্পর্ক আছে, তাঁর ভুল নিরসন করার জন্যে জানাই, এই কাহিনীর সঙ্গে কোনও বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের কোনও যোগাযোগ নেই।

পদ্মাসন

সকালবেলা বাজার করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে অফিস যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এমন সময় জরুরি খবর এল আমার এক মামাশ্বশুর সকালবেলা পদ্মাসন করতে গিয়ে আটকিয়ে গিয়েছেন।

ভদ্রলোক কাছেই থাকেন, সুতরাং এই বিপদে সর্বপ্রথমে আমাকেই খবর দিয়েছেন। বিপদটা সত্যি যে কী, তা আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। যদি পদ্মাসন করতে না পারেন, আটকিয়ে যান, করবেন না; আর তা ছাড়া আমি তো আর যোগব্যায়ামের শিক্ষক নই, সত্যি কথা বলতে গেলে যোগব্যায়ামের য-ও আমি জানি না, এ ব্যাপারে আমার কী করার আছে?

আমার এই মামাশ্বশুর, গজেনবাবু, আজ কিছুদিন হল যোগব্যায়ামে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নানা জনের কাছে এ সম্পর্কে নানা কথা শুনে তিনি যোগব্যায়ামের চার্ট কিনে নিজেই ছবি দেখে দেখে আসন শুরু করেন।

যোগব্যায়ামের বহুল প্রচলিত আসনগুলির মধ্যে একটি হল ওই পদ্মাসন। আপাতভাবে ছবি দেখে আসনটি যত সহজ মনে হয় তা নয়, আবার খুব জটিল তাও নয়। আসলে একেক রকম আসন একেক জনকে পুষিয়ে যায়। যে পারে সে সহজেই পারে, যে পারে না সে হাজার চেষ্টা করেও পারে না, অনেকটা কবিতা লেখা বা গান গাওয়ার মতোই।

আগে আমরা কাঠের পিঁড়িতে জোড়াসন হয়ে বসে ভাত খেতুম। পদ্মাসন এই জোড়াসনেরই ঠিক পরের ধাপ। জোড়াসনে পায়ের পাতা দুটো উরুর নীচে থাকে, আর পদ্মাসনে সেটা উরুর উপরে চেপে বসিয়ে দিতে হয়; হাঁটু, পায়ের গোড়ালি এবং উরু খাপে খাপে আটকিয়ে যায়; এই আসনের সঙ্গে ঠিক মতো নিশ্বাসের ব্যায়াম করলে নাকি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকা যায়, সাধু-সন্ন্যাসীরা তাই করে বাতাসে ওড়েন।

এত কথা আমার জানা ছিল না। মাত্র তিনদিন আগে, গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা আমার মামাশ্বশুর মশায় একঘণ্টা ধরে সমস্ত আমাকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন। তারপর আজকেই এই অবস্থা।

মামাশ্বশুর মশায়ের গৃহভৃত্য আমাকে ডাকতে এসেছিল। এই লোকটির কোনও নাম নেই, আসলে ওর নাম ছিল বোধহয় নিখিল, মামাশ্বশুর মশায়ের বাবার নামও তাই। তখন তিনি ওর নতুন নামকরণ করেন মন্টু। কিন্তু সে এই নাম গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, এই নামে ডাকলে সাড়া দেয় না। আমি মামাশ্বশুর মশায়কে বলেছিলাম সাহেবদের কায়দায় ওকে ‘বয়’ অথবা ‘বেয়ারা’ বলে ডাকতে, কিন্তু তিনি সাত্ত্বিক মানুষ, এই বিজাতীয় পরামর্শে তিনি মোটেই রাজি হননি। ফল, লোকটিকে এই, ওই, হ্যাঁরে সম্বোধন করেই চালাতে হচ্ছে।

আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হ্যাঁরে কী হয়েছে ঠিক করে বল তো?’ সে ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারল না, কিন্তু তার উত্তেজনা এবং ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ঘটনাটা সত্যিই গুরুতর।

মামাশ্বশুর মশায়ের বাড়ি গিয়ে দেখলাম রীতিমতো জটিল অবস্থা। বাইরের ঘরে ভিড়, ভিতরে শোবার ঘরের মেঝেতে কম্বল পেতে তিনি যোগাসন করছিলেন, সেখানে এবং বারান্দায়ও অনেক লোক। ‘কী হল’ জিজ্ঞাসা করাতে সকলের কাছ থেকে একই জবাব পেলাম, ‘আসন করতে গিয়ে আটকিয়ে গেছেন।’ ভিড় ঠেলে শোবার ঘরে গিয়ে দেখি মামাশ্বশুর মশায় নতুন কেনা লাল কম্বলের উপরে তাঁর সাধের পদ্মাসনে বসে রয়েছেন। তবে তাঁর মুখে স্বর্গীয় প্রশান্তির পরিবর্তে প্রচণ্ড উদ্বেগ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারলাম। সত্যিই উনি পদ্মাসনে আটকিয়ে গেছেন। আজই প্রথম বহু চেষ্টার পরে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পদ্মাসনে বসেছেন কিন্তু তার পরেই আটকে গিয়েছেন, এখন আর বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তাঁর দুই পায়ের পাতা উরুর উপরে চেপে বসে গেছে, গিঁটে গিঁটে ফিট করে গেছে দুই গোড়ালি, এখন আর এই প্যাঁচ খুলতে পারছেন না।

প্রায় দু’ ঘণ্টা এই অবস্থায় আছেন। এটাই সর্বকালের দীর্ঘতম সময়ের পদ্মাসনের রেকর্ড, ঠিকমতো ভাবে পেশ করলে বুক অফ রেকর্ডেও স্থান পেতে পারে। তবে এতক্ষণ পদ্মাসনে থাকলে শূন্যে উঠে যাওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে তা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। মামাশ্বশুর মশায় বোধহয় মুখ বিকৃত করে সেই উড্ডয়ন-প্রবণতাকেই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন। জানলা দিয়ে বেরনো এত বড় শরীরের পক্ষে সম্ভব নয়, মামিশাশুড়ি মহাশয়া বুদ্ধি করে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছেন যাতে তাঁর পতিদেবতা মহোদয় ফুরুত করে উড়ে না যান।

অবশ্য দেখেশুনে মনে হচ্ছে সে সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু উড়তে পারুন বা না পারুন, অন্তত এই পদ্মাসনের বেড়াজাল ছিঁড়ে তাঁকে অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো হাঁটাচলা, ওঠা-বসা তো করতে হবে; সংসার আছে, অফিস আছে, আহার-নিদ্রা, শয়ন-ভোজন আছে, এই ভাবে পদ্মাসনে আটকে থাকলে চলবে না।

মুখ-চোখের বিকৃতি এবং উন্মুক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশি সঞ্চালন দেখে বুঝতে পারলাম তিনিও প্রাণপণ চেষ্টা করছেন পদ্মাসন খুলে বেরিয়ে আসতে। দরদর করে সারা শরীর দিয়ে ঘাম পড়ছে তাঁর।

পাড়ার ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি পুরনো আমলের বুড়ো চিকিৎসক, কিন্তু জন্মে কোনও রোগীকে এ অবস্থায় দেখেননি। মামাশ্বশুর মশায়ের চারপাশে তিন-চার পাক দিয়ে তিনি বললেন, ‘গজেনবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যান।’

হাসপাতালে নেওয়া কি সোজা কথা! অফিস পড়ে রইল। পাড়ার কয়েকটি ছেলের সাহায্যে একটি টেম্পো ভাড়া করে তারপর পাশের বাড়ির থেকে একটি বেশ বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি ধার করে সেই পিঁড়ির উপরে তাঁকে বসিয়ে বিয়ের কনেকে যেভাবে পিঁড়িতে তুলে সাতপাক দেওয়া হয় সেইভাবে শূন্যে তুলে টেম্পোতে বসিয়ে দেওয়া হল।

এখন হাসপাতালে কী হবে কে জানে? মামাশ্বশুর মশায় কতদিন এইরকম আটকিয়ে থাকবেন তা-ই বা কে বলতে পারে?

তবে বেডের জন্য অসুবিধে হবে না নিশ্চয়। কারণ মামাশ্বশুর মশায়ের কোনও বেড দরকার নেই, তিনি তো বসেই আছেন, বেডে শোয়ার অবস্থায় পৌঁছালেই তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন, তখন আর হাসপাতালের দরকার নেই।

শিশুশিক্ষা (১)

এক বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলাম গৃহস্বামীর জন্য। কিছুই খেয়াল করিনি, হঠাৎ পায়ের গোড়ালিতে একটা দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করলাম। পা দুটো ছিল একটা নিচু বেতের টেবিলের তলায়। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে দেখি একটি দশ-বারো মাস বয়সের শিশু কখন নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে জুতোর ওপরে আমার গোড়ালির মাংস তীক্ষ্ণ দুধদাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। যখন ঘুরে ঢুকেছিলাম ঘর খালিই ছিল কিংবা হয়তো শিশুটি সোফা-টোফার পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরছিল; এমনও হতে পারে ভিতরের ঘর থেকে পর্দার নীচ দিয়ে চলে এসেছে, অন্যমনস্ক থাকায় আমি টের পাইনি। অবশ্য একটু পরেই বাড়ির ভিতরে শোরগোল শোনা গেল, 'ডাকু কোথায় গেল, ডাকু?' বুঝলাম এই অবোধ শিশুটিই নিজ যোগ্যতায় এই সামান্য বয়সে এই নাম অর্জন করেছে।

খুঁজে খুঁজে বাইরের ঘরে এসে এক পরিচারিকা ডাকুকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে তার ধারালো দংশন থেকে আমি আমার পা ছাড়িয়ে নিয়েছি, চারটে দাঁত গর্ত হয়ে বসে গেছে, সেখানে লাল মুক্তোর মতো রক্তের বিন্দু।

মনে পড়ল কয়েক বছর আগে যোধপুর পার্কে এক বাড়িতে সদর গেটে নোটিশ দেখেছিলাম,

Beware of Children— শিশু হইতে সাবধান।

সেদিন ওই নোটিশটি দেখে কৌতুক অনুভব করেছিলাম, গৃহস্বামীর সস্নেহ বিপদসংকেত যথেষ্টই আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু আজ এতদিন পরে ওই রকম একটি বিজ্ঞপ্তির প্রকৃত অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হল।

অবশ্য এ রকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। একবার এক বিবাহবাসরে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিশাল হলঘরে একা একা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু বিপদ বাধাল একপাল শিশু। তারা অবশ্য দশ-বারো মাস বয়সের নয়, তার চেয়ে বেশ বড়, সাত-আট বছরের দল একটা। তারা চোর চোর খেলা আরম্ভ করল। প্রথমে বুঝতে পারিনি, খেলা

আরম্ভ হওয়ার পরে ধরতে পারলাম আমাকেই তারা বুড়ি বানিয়েছে। একজন চোর আর বাকিরা চোরের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বুড়ি ছুঁয়ে অর্থাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিত্রাণ পেতে লাগল। ফলে অনতিবিলম্বে আমাকে উঠে পড়তে হল, কিন্তু তাতে রক্ষা নেই, প্রথমে শিশুরা তাদের বুড়িকে চেপে ধরে আটকে রাখার চেষ্টা করল এবং তারপরেও যখন আমি গায়ের জোরে তাদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম, এক দঙ্গল ক্ষুদে শয়তান আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে 'বুড়ি পালাল', 'বুড়ি পালাল' বলে নাচতে লাগল। তখন বিয়েবাড়িতে লোকসমাগম শুরু হয়েছে; সুন্দরী রমণীরা এবং সুবেশ ভদ্রলোকেরা আমার এই কৌতুককর অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট মজা পেলেন। সেদিন সেই বিবাহবাসর থেকে কিছু না খেয়েই বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, কারণ বেশিক্ষণ এ ভাবে থাকা সম্ভব ছিল না।

এসব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তবে আমি এর চেয়েও অনেক হিংস্র এবং নিষ্ঠুর শিশুর কথা শুনেছি যারা বাড়িতে বাইরের লোক পেলে তাকে ছাতা দিয়ে খোঁচায় কিংবা রবারের বল ছুড়ে মারে। আমার স্ত্রী একদিন এক বাড়ি থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এসেছিলেন, তাঁর প্রিয় বান্ধবীর পুত্র তার খেলার ছোট ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে তাঁর হাঁটুতে বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। শিশুটির জনকজননী তখন সামনের সোফায় হাসিমুখে বসেছিলেন, শুধু আমার স্ত্রী যখন আর্তনাদ করে ওঠেন, বলেছিলেন, 'ছিঃ, বাবলু, অত জোরে মারতে নেই।'

অনেক সরল চেহারার শিশুকে দেখে বোঝার উপায় নেই তাদের কী প্রকৃতি। তাদের ভাসা ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট, এলোমেলো চুল দেখে অমলতার প্রতীক বলে মনে হয়। কিছুতেই বোঝার উপায় নেই এই শিশুটিই দশ মিনিট আগে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সিঁড়ির উপরে একজন অচেনা ভদ্রলোককে ল্যাং দিয়ে ফেলে দিয়েছে কিংবা এই মুহূর্তেই সে পারে আলমারির মাথার উপরে উঠে গগনভেদী হুঁউউ চিৎকার করে যে কোনও অপ্রস্তুত ব্যক্তির উপরে আচম্বিতে লাফিয়ে পড়ত।

এসব দৈহিক নির্যাতন ছাড়াও মৌখিক ব্যাপারেও শিশুদের দৌড় কিছু কম নয়। আমার এক প্রতিবেশীর কন্যা 'বাবা', 'মা' ইত্যাদি প্রথম যে তিন-চারটি শব্দ শেখে তার মধ্যে একটি ছিল 'শালা'। বাড়িতে কেউ এলেই তাকে 'শালা-শালা' করে গালাগাল করতে থাকত। সুখের বিষয় সে তখনও 'শ' উচ্চারণ করতে পারত না। ফলে সে বলত 'শালা-শালা'— কিন্তু শোনাত থালা-থালা। তার মা বাইরের লোকদের বলতেন, 'ও খুব ঘটি-বাটি-থালা নিয়ে খেলতে ভালবাসে, তাই খালি থালা-থালা বলে।'

এর চেয়ে একটু বড় যারা তারা অনেক রকম দুষ্টু বুদ্ধি ও ইয়ারকি ইস্কুল থেকে, কখনও বড়দের কাছ থেকে শিখে ফেলে। কিছুদিন আগেও যে কোনও বিবাহযোগ্য অথচ অবিবাহিত ছেলে বা মেয়েকে এই রকম শিশুদের অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। প্রশ্নটি অতি সরল, বাটা বানান কী? সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ বলবে, কেন বি এ টি এ। আর তখনই প্রশ্ন, 'কী হল, তুমি বিয়ে-টিয়ে করবে না?'

অবশ্য তরলমতি প্রাপ্তবয়স্করা অনেক সময় শিশুদের প্ররোচিত করেন। সেদিন এক বাড়িতে একটি বছর তিনেকের শিশু তার দুধ খাওয়ার স্টেনলেস স্টিলের বাটিটা হাতে করে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বলো তো, এটা কী?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন, এটা একটা বাটি।' ছেলেটা আমাকে মুহূর্তের অবকাশ না দিয়ে বলল, 'তোর বউয়ের সঙ্গে সাঁতার কাটি।' তার এই সাহসে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমি যথেষ্ট পুলকিত হলাম। আমি রেগে না যাওয়ায় সে যথেষ্ট দুঃখিত হল।

পরে জানতে পেরেছি এক তরুণ সাংবাদিক তার ভাগিনেয়কে এই চমৎকার বাক্যালাপটি প্রথম শিক্ষা দেয় এবং এখন সংক্রামকভাবে এটি শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

শিশুদের বিরুদ্ধে সব খারাপ কথা লেখার পরে একটি চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করি। সেদিন পার্কে দেখলাম একটি সদ্য দাঁড়াতে শেখা শিশু থপ থপ করে হাঁটতে চেষ্টা করছে, দু' কদম গিয়েই

পড়ে যাচ্ছে। দেখি তার গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো আছে একটা টিনের চাকতি, তাতে লাল অক্ষরে লেখা ইংরেজি 'এল'। অর্থাৎ লার্নার, মোটরগাড়ি চালানো শেখার সময় গাড়িতে যেমন লাগানো থাকে, শিশুটির মা সদ্য হাঁটিয়ের গলায় সে-রকম ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সে যদি আপনার গায়ে পড়ে তার কোনও দায়িত্ব নেই।

ঘুম (১)

ঘুমের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই সেই বিখ্যাত বালিকাটির কথা বলে নেওয়া ভাল।

ছাত্রজীবনে এবং তারপরেও কিছুদিন গৃহশিক্ষকতা করেননি এমন বাঙালি বিরল। আমার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই টিউশনি করেছেন, কিন্ডারগার্টেন থেকে এম এ পরীক্ষার ছাত্রছাত্রী পর্যন্ত যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী পড়ানোর চেষ্টা করেছেন। আমার এই বন্ধুরা প্রায় সকলেই দাবি করেন উপরিউক্ত বালিকাটি তাঁরই ছাত্রী ছিল।

বালিকাটির ছিল ঘুমের দোষ। ঘুমের জন্য পড়াশুনা তার মাথায় উঠেছিল। আমি নিজেও তাকে কিছুদিন পড়িয়েছি। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। প্রথম সপ্তাহে কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহেও যখন দেখলাম যা পড়া দিয়েছি কিছুই করে রাখছে না, তার উপরে পড়তে বসে কেবলই হাই তোলে; হাই শুধু হাই, হাইয়ের পর হাই; আমি ছাত্রীটিকে এক চোট খুব ধমকালাম। বেশ ধমকানোর পরে মেয়েটির কাছে সোজাসুজি জানতে চাইলাম, 'পড়া করে রাখোনি কেন?' মেয়েটি নির্বিকার কণ্ঠে একটা ছোট হাই দমন করতে করতে উলটো প্রশ্ন করল, 'কখন পড়ব, স্যার?'

আমি বললাম, 'কেন, সন্ধ্যাবেলা।'

'সন্ধ্যাবেলা বড় ঘুম পায়, স্যার।' মেয়েটি এবার আর তার হাই-তোলা আটকাতে পারল না।

কিন্তু আমি ছাড়লাম না, 'ঠিক আছে, সন্ধ্যাবেলাই ঘুমোবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়া করবে।'

মেয়েটি ইতিমধ্যেই বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে ছোট একটা তুড়ি তুলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো একটা বিপুল হাই ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। ওই অবস্থাতেই আলতো করে উত্তর দিল, 'সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বড় খিদে পায়, স্যার।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তোমাকে না খেয়ে পড়তে বসতে হবে না, তুমি আগে খেয়ে নেবে।'

মেয়েটি এবার আমতা আমতা করে বলল, 'না স্যার, খেলে আমি পড়তে পারব না।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম, 'কেন?'

মেয়েটি অম্লানবদনে বলল, 'খেলেই আমার ভীষণ ঘুম পায়।'

সেই মুহূর্তে আমি মেয়েটিকে চিনতে পারলাম। এই সেই বিখ্যাত বালিকা যার কথা অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি। যার ঘুম থেকে উঠলেই খিদে পায়, আর খেলেই ঘুম পায়।

খাওয়া-ঘুম-খাওয়া-ঘুম-খাওয়া— এইরকম চক্রাকারে চলেছে এর জীবনযাত্রা, এর মধ্যে আর কিছুর জন্য কোনও ফুরসত নেই। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে কুটিল চক্র বা ভিসাস সার্কল, যার

উদাহরণ হল ভারী শিল্প নেই বলে আমরা গরিব এবং আমরা গরিব বলেই আমাদের ভারী শিল্প নেই। এই মেয়েটিও একই রকম কুটিল বৃত্তে আবদ্ধ, ঘুমোলেই খিদে আর খেলেই ঘুম।

কিন্তু অন্যের ঘুম নিয়ে রসিকতা করার অধিকার আমার নেই। আমি ঘুমোইনি এমন কোনও জায়গা নেই। যে কোনও জায়গায় সামান্য এলিয়ে পড়তে পারলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। বাসের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে, ট্রেনের পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে বিভিন্ন বিপজ্জনক অবস্থায় আমি ঘুমিয়েছি। একবার চিৎ সাঁতার দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আড়াই ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখি— নদীর ঘাটে ছিলাম, মধ্য নদীতে চলে এসেছি; গায়ের চামড়া সাদা হয়ে কুঁচকে গেছে।

ক্লাবে বা বৈঠকখানায় আড্ডা দিতে দিতে, অফিসের টেবিলে ফাইল করতে করতে, এমনকী প্রমত্ত যৌবনে নিজের ফুলশয্যার রাতে আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি।

আমি যখন প্রথম অফিসে ঢুকেছি, কালীঘাটের বাড়িতে তখন একা একা, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে অনেকদিন দেরি হয়ে যেত, আগের দিন হয়তো খুব রাত জাগা হয়েছে। এই রকম এক দেরির দিন, বেলায় উঠে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। দ্বিতীয় দফায় ঘুম থেকে উঠে স্নান-খাওয়া করে অফিস যেতে সাড়ে বারোটা হয়ে গেল। ওপরওলা আমাকে ধরলেন, দেরির ব্যাখ্যা চাইলেন। তখন আমার সত্যভাষণের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল, মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, 'স্যার, ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল আমার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, চোখ থেকে চশমা খুলে অবাক দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর আবার চশমাটা চোখে দিয়ে ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'সে কী মশাই! আপনি বাড়িতেও ঘুমোন নাকি?'

আমার সেই ওপরওলা বেশ কিছুদিন হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। মধ্যে একদিন রাস্তায় দেখা দিয়েছিল, আমাকে দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম, আপনি আমার দুঃখটা বুঝবেন।'

আমি বললাম, 'কীসের দুঃখ আপনার? আপনার চেহারা দেখে তো শরীর ভালই মনে হচ্ছে।' ভদ্রলোক ম্লান হেসে বললেন, 'শরীর যে খারাপ ঠিক তা নয়। কিন্তু ঘুমের একটু কষ্ট পাচ্ছি। আপনি কষ্টটা একটু বুঝতে পারবেন, তাই বারবার আপনার কথাই মনে হচ্ছিল।'

আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার রাতে ঘুম হচ্ছে না?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না, সেকথা বলা ঠিক হবে না। রাতে ঘুম মোটামুটি হচ্ছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তবে?'

উনি বললেন, 'তবে আর কী? সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে, হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে, খবরের কাগজ পড়ে আরেকটু ঘুমিয়ে নিই। আর তো কাজ নেই, কী আর করব বলুন?'

আমার সমাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রাক্তন ওপরওলা নিজেই বলে চললেন, 'না, সত্যি কথা বলছি। সকালবেলা ঘুমোতে খুব কষ্ট হয় না। তারপর ঘুম থেকে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে মধ্যাহ্ন নিদ্রা। দুপুরে আর এই বুড়ো বয়সে কী-ই বা করার আছে; কষ্টেসৃষ্টে একটু ঘুমিয়ে নিই। কিন্তু আসল অসুবিধা হয় ওই বিকেলের দিকে। বিকেলের চা খেয়ে কত চেষ্টা করি কিছুতেই আর ঘুম আসতে চায় না । সে যে কী কষ্ট, রাত ন'টার আগে আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।'

ভদ্রলোক সত্যি কথা বলছেন, নাকি আমার নিদ্রালু স্বভাবকে ঠাট্টা করছেন, কিছু বুঝতে না পেরে একটি ক্ষীণ নমস্কার করে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এলাম।

পুনশ্চ: একজন পাঠিকা অভিযোগ করেছেন 'কাণ্ডজ্ঞান'-এ বড় কুকুরের উৎপাত। সুতরাং ঘুমের প্রসঙ্গে কুকুরের কথা বলব না, তবে একটা বেড়ালের কথা বলি।

এই পত্রিকারই এক বিখ্যাত লেখিকার বাড়িতে অগুন্তি বেড়াল। তারই একটা, আমার চোখের সামনে, ইঁদুর তাড়া করে লাফ দিয়ে উঠল আলমারির মাথায়। আলমারির পিছনে ইঁদুর।

ওত পেতে স্থির হয়ে বসে রইল বেড়ালটি, ওত পেতেই ঘুমিয়ে পড়ল। বেড়ালের যে নাক ডাকে সেই প্রথম জানলাম। সেই গুরু গুরু নাক ডাকতে ডাকতেই বেড়ালটি আলমারির মাথা থেকে নীচে পড়ে গেল। এরপর এক সেকেন্ড নীরবতা, তারপর ওই পতিত অবস্থাতেই আবার সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

পাগলের কাণ্ডজ্ঞান

এবারের কাণ্ডজ্ঞান পাগলের কাণ্ডজ্ঞান। এ বিষয়ে কারও মনে যদি কোনও সংশয় থাকে অনুগ্রহ করে এ-সপ্তাহে কাণ্ডজ্ঞান পড়বেন না।

এক পাগল ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির রাস্তার দিকের বারান্দায় বসে একটি জলভরা গামলায় ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। পথ দিয়ে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে কৌতূহলী একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, ক'টা ধরা পড়ল?' এর উত্তরে ওই পাগল ভদ্রলোক কী বলেছিলেন তা নিয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। একটি বিখ্যাত শিশুকাহিনীতে আছে, ওই পাগল ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনাকে নিয়ে তিনটে। এর আগে আর দুটো বোকা ধরেছি।'

অন্য একটি ততোধিক বিখ্যাত গল্প অনুসারে প্রশ্ন শুনে পাগল ভদ্রলোক লজ্জায় জিব কেটে বলেছিলেন, 'কী বলছেন দাদা, বারান্দায় গামলার মধ্যে মাছ আসবে কী করে? পাগল নাকি?'

গল্প দুটি দু'রকম। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই বারান্দায় মৎস্যশিকারী পাগল ভদ্রলোককে আপাতদৃষ্টিতে যতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন মনে হয়েছিল, তিনি আসলে তা নন।

এ অবশ্য গল্পের পাগলের কথা কিন্তু বাস্তবজীবনেও সত্যিকারের পাগলের কাণ্ডজ্ঞান কিছু কম নয়।

পাগল দু'রকম। রাস্তার পাগল ও ঘরের পাগল। প্রথমে রাস্তার পাগলের কথা বলি। রাস্তার পাগল মানে ঘরের বাইরের মুক্ত পাগল। প্রত্যেক রাস্তায়, মোড়ে, চৌমাথায়, বাজারে অন্তত একজন করে পাগল আছে। একজন থাকলে অবশ্য বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না, বরং এলাকাটি মোটামুটি বেশ জমজমাট থাকে। কিন্তু পাগলের সংখ্যা একের বেশি হয়ে গেলে অনেক সময় গোলমাল বেধে যায়। একজন পাগল আরেকজন পাগলকে কদাচিৎ সহ্য করতে পারে। নিরীহ, নির্বিরোধী পাগল ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে অনর্গল বিড়বিড় করছে, কারওর ক্ষতি করছে না, তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তার পাগলামির বহিঃপ্রকাশ অতি সামান্যই। পাঁচ-সাত মিনিট পর পর রাস্তার যে কোনও মহিলাকে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যালো, জাপান যাচ্ছেন কবে?'

সংগত কারণেই পাড়ার লোকেরা এই লোকটির নাম দিয়েছিল জাপানি পাগল। লোকটি এ-পাড়ার লোক নয়, তার পূর্বজীবনের কথা বিশেষ কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে স্পাই, কারও ধারণা খবরের কাগজের রিপোর্টার। ভালই ছিল লোকটা। হঠাৎ কোথা থেকে এই পাড়াতেই এক চঞ্চল উন্মাদ এসে উপস্থিত হয়েছে। সে অতিদ্রুত গলির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করছে, আর প্রায় প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছে, 'টাইম কত?' কেউ যদি সময় কত বলল, সে গম্ভীর হয়ে

তাকে বলছে, 'তা হলে তো খুব দেরি হয়ে গেল?' অনেক সময়ই অচেনা ব্যক্তিরা এই রকম বাক্যালাপে একটু ঘাবড়ে যান।

তবুও মোটামুটি চলছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল সেদিন, যখন দু'জনেরই খদ্দের এক হয়ে গেল। প্রথমজন যখন এক মহিলাকে কবে জাপানে যাবেন বলে প্রশ্ন করছে, দ্বিতীয়জন তার কাছেই টাইম জানতে এল। মহিলাটি অন্য পাড়ার, তিনি দ্রুত পদক্ষেপে গলি ত্যাগ করলেন। কিন্তু দুই পাগল পরস্পরের দিকে রোষকষায়িত লোচনে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর প্রথম পাগল বেশ শান্ত হয়ে হাতজোড় করে বলল, 'দাদা, এইটুকু ছোট গলি, এখানে দু'জন পাগলের স্থান হবে না।' দ্বিতীয় পাগল কী বুঝল কে জানে, সেই যে পাড়া ছেড়ে চলে গেল আর এল না। প্রথম পাগল এখনও রোদবৃষ্টিতে সেই একই ল্যাম্পপোস্টে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর পর সম্ভাব্য জাপানযাত্রীদের কাছে তাদের যাত্রার তারিখ জানতে চেয়ে মিষ্টি হাসে।

দ্বিতীয় পাগলটি অবশ্য এর মধ্যে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে এবং পাগলামির কলাকৌশল বদল করেছে। এখন সে ট্রাফিক কন্ট্রোল করে। কর্তব্যরত হোমগার্ড বা ট্রাফিক পুলিশকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

কে যেন বলেছিলেন, সমস্ত পাগলেরই মনের বাসনা হল ট্রাফিক কন্ট্রোল করা, এইটাই হল উন্মাদনার সিদ্ধিলাভের শেষ সোপান। কোথা থেকে একটা ছোট লাঠি কুড়িয়ে নেয় এরা, কখনও এক টুকরো কাপড় বা চট জোগাড় করে। কখনও পতাকা উড়িয়ে রেললাইনের পয়েন্টসম্যানের মতো, কখনও ছড়ি নাচিয়ে ড্রিলমাস্টারের মতো এরা ট্রাফিক দমন করে। এইরকম একজন পাগল একজন ঘুমন্ত ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় গত শনিবার সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিটের মোড়ে এমন জটলা পাকিয়ে দিয়েছিল, সেই ট্রাফিকের জট হ্যারিসন রোড পর্যন্ত আটকিয়ে দেয়।

কিন্তু এই দ্বিতীয় পাগলও কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। তার আছে পরিমিতি বোধ, তার আছে এলাকা বোধ। ট্রাফিকের জট পুরো পাকিয়ে গেলে, শিশুর হাতের গুলিসুতোর মতো যখন গাড়িগুলো একেবারে জড়িয়ে যায়, যখন মিনিবাস আর ট্যাক্সিগুলো মর্মভেদী আর্তনাদ করতে থাকে, সে তখন রাস্তা থেকে উঠে আসে, ফুটপাথের উপরে পানের দোকানের আয়নায় নিজেকে লজ্জিতভাবে দেখতে থাকে।

ট্রাফিকবিলাসী পাগলদের এলাকা বোধের কোনও তুলনা নেই। আমাদের পূর্ববর্ণিত পাগল লোকটি বাঙালি যুবক, পার্কস্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত সে যাবে, তার ওপারে কখনও সে যাবে না। রিপন স্ট্রিটে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ট্রাফিকের দায়িত্ব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাগলের, সে আবার তার পাড়া ছেড়ে কোনও বাঙালি পাড়ায় যাবে না। মল্লিকবাজারে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে একজন বিহারি মুসলমান পাগল, বেন্টিক স্ট্রিটে ছেঁড়া জুতো হাতে চিনেম্যান পাগলকে গাড়ি দমন করতে দেখেছি। আর হিন্দুস্থানি হলে তো কথাই নেই, হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা নেমে বড়বাজারে; তার আবার ঠেলাগাড়ি, রিকশা এইসবের কন্ট্রোল করার দিকেই ঝোঁক। প্রচণ্ড অধ্যবসায় সহকারে আশিটা স্থাণু ঠেলাগাড়িকে দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে ঠেলে ফাঁক করে, একদিন খুব ভোরবেলা দেখেছি, হিন্দুস্থানি এক পাগল দুটো গলির মুখ সম্পূর্ণ আটকিয়ে বন্ধ করে দিল। তারপর সেই আশিটা ঠেলাগাড়ির ফাঁক বুজিয়ে গলির মুখ খোলা, সে এক অসম্ভব অবস্থা।

তবু রাস্তার পাগল ভাল। রাস্তার পাগল দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তাকে রাতদিন পাবলিকের সঙ্গে মেলামেশা করে চলতে হয়, অনেক ঘা খেয়েছে সে, তাকে না ঘাঁটালে সে কখনওই খুব বিপজ্জনক হবে না।

কিন্তু ঘরের পাগল সাংঘাতিক হতে পারে। বন্ধুর বাড়ির দরজার কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় পাশের বাড়ির পাগল পা টিপে টিপে পিছনে এসে আচমকা আপনার গলা টিপে ধরল, এ রকম অনায়াসেই হতে পারে।

ঘরের পাগল শুধু বাড়িতে নয়, অফিসেও আছে। একটা অফিসের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নির্ভর

করে সেই অফিসে কতজন নির্ভরযোগ্য পাগল আছে তার উপরে। অনেকে হয়তো জানেন না বহু পুলিশের দারোগা পাগল। দু'জন উন্মাদ বড়বাবু আর একজন পোস্টমাস্টারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। বহুতল বাড়িগুলির লিফটম্যানদের মধ্যে অন্তত শতকরা পঁচিশজন পাগল, কেবল টেনে টেনে ভুরুর লোম (নিজের) ছিঁড়ছে আর বিড়বিড় করছে অথবা মিটমিট করে হাসছে, সাততলা বললে তেরোতলায় নামিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু তবুও লিফট ওঠানামা করছে, থানা-পুলিশ অফিস-কাছারি যা হোক করে চলছে, ডাক বিলি হচ্ছে। পাগলের কাণ্ডজ্ঞান আছে বলেই না এসব সম্ভব হচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে বা হরিণঘাটা দুধের ডেয়ারিতে কোনও পাগল নেই, তাই তাদের আজ এত বেহাল, এত দুরবস্থা।

পদবি ও নাম

দৈনিক পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যেখানে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত হয়, সেখানে নাম-পদবি পরিবর্তন নামে একটি কলম আছে। কর্মখালি কিংবা পাত্রপাত্রীর কলমের মতো না হলেও নাম-পদবি পরিবর্তন কলমটির চাহিদাও কিছু কম নয়।

প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজের ওই দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতে চোখে পড়বে 'আমি খাঁদু পাল আলিপুর আদালতে এফিডেবিট করিয়া গত ২৫ অক্টোবর হইতে শ্যামল রায় হইলাম।' অধিকাংশ এফিডেবিট ও বিজ্ঞপ্তিই পদবি পরিবর্তনের। কোনো কারণে পুরনো পৈতৃক পদবিটি আধুনিক যুবকের পছন্দ হচ্ছে না, নগা মাইতি আদালতে এফিডেবিট করে নিজেকে নগেন্দ্র মৈত্র বলে ঘোষণা করছেন। অনেকে পদবি পালটানোর সময় একই খরচে হচ্ছে বলে নামও পালটে ফেলছেন। অনেকে আগের নাম ও পদবির ধারে-কাছে থাকছেন, যেমন ওই নগা মাইতি থেকে নগেন্দ্র মৈত্র কিংবা ভ্যাবল সর্দার থেকে ভবলাল সরকার।

একটি দ্বিতীয় দল আছেন যাঁরা খোল নলচে সহ তাঁদের পূর্বপরিচয় পালটে ফেলেছেন। এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বিখ্যাত লোকের নাম গ্রহণ করছেন। একটা বিজ্ঞাপন অনেকদিন আগে দেখেছিলাম, আমি নকুড়চন্দ্র হুই হাওড়া আদালতে এফিডেবিট পূর্বক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হইয়াছি।'

এই সব বিজ্ঞাপনদাতাদের মতিগতি, মানসিকতা তবু বোঝা যায়, কিন্তু একটা বিজ্ঞাপন অল্পদিন আগে দেখেছিলাম যেখানে জয়ন্ত দাস বলে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তিনি জয়ন্তানুজ রায়চৌধুরী হলেন। সম্ভবত তিনি নিজের নামটিকে ভারী ও জবরদস্ত করতে চাইছেন। এরই বিপরীত আরেকজন, তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, 'গত মহালয়া হইতে আমি জাতিভেদমূলক চক্রবর্তী উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'ভাই' উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর নারায়ণ চক্রবর্তীর স্থলে নারায়ণ ভাই নামে পরিচিত হইব।'

পদবি নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা অবশ্য আমার সাজে না। আমার যে রায় পদবি এ নিতান্তই

জোলো উপাধি, এর জাত গোত্র বলে কিছু নেই। বহু লোক আমাকে বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন আমরা কী রকম রায়। আমি বলেছি, আমরা ভাল রকম রায়, আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠা, আমার বাবার বাবা-কাকা-জ্যাঠা, আমার ছেলের বাবা-কাকা-জ্যাঠা সবাই রায়।

কিন্তু এতে আমার কোনও সুবিধে হয়নি। আমার নাম এবং পদবি দুই-ই নিয়ে আমি বহুবার নানা বিপদে পড়েছি। প্রথম প্রথম যখন পদ্য লেখার চেষ্টা করি, এক সম্পাদক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তারাপদ রায় কোনো কবিতা লেখকের নাম হতে পারে না. তিনি বলেছিলেন, 'এটা নিশ্চয় তোমার ছদ্মনাম।'

আমার যে জীবনে কখনও উপন্যাস লেখা হল না সেও আমার এই নিজের নামের জন্যে। প্রথম যে উপন্যাসটিতে হাত দিয়েছিলাম, তার প্রথম অধ্যায়ে ছিল মাত্র তিনটি চরিত্র। নায়ক, নায়িকা ও নায়কের গৃহভৃত্য। দশপাতা লেখার পর খেয়াল হল কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই চাকরের নাম দিয়েছি তারাপদ। নায়িকা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছেন, 'এই তারাপদ, এক গেলাস জল নিয়ে আয়।' আমার অবশ্য কোনও দোষ নেই, চারদিকে তারাপদ নামে চাকরের সংখ্যা এত বেশি যে ওই নামটাই আমার কলম ফসকে কাল্পনিক চাকরের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। ফলে আমার আর উপন্যাস লেখা হয়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে আগেও বলেছি, এখনও বলি, স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক যেমন হয়, তেমনই ভৃত্য-ভূমিকা বর্জিত উপন্যাসের কথা কখনও যদি ভাবতে পারি, দেখা যাবে। না হলে, নিজেকে চাকর বানিয়ে তো আর উপন্যাস লিখতে পারি না। তাতে অবশ্য আমার এই হাস্যকর এবং গ্লানিময় জীবনের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে তা নয়, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

একবার এক সাহিত্যসভায় পদবি সংক্রান্ত একটা ছোট ব্যাপারে এক গোলমেলে লোকের পাল্লায় পড়ে বেশ বেকায়দা হয়েছিলাম। কী কারণে ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছিল যে আমি আগে তারাপদ রায়চৌধুরী নামে লিখতাম, বিশেষ কোনও কারণে এখন আর চৌধুরীটুকু লিখি না। যত তাঁকে বোঝাই, 'না মশাই, আমি রায়চৌধুরী নই, রায়চৌধুরী নামে লিখিনি, আমার সাতপুরুষে কেউ রায়চৌধুরী নয়,' তিনি তত বলেন, 'রায় আর রায়চৌধুরী একই হল মশায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায় কে না জানে? আমরা ভুলিনি তারাপদবাবু, আপনার সেই কৃষিবিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি, "নিজের ছাদে নিজের পাট চাষ করুন", "ড্রইংরুমে কাঁচালঙ্কার ফুল", আর সেই যে লিখেছিলেন, "কাটোয়ার ডাঁটা, কোথায় লাগে পাঁঠা?"

আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম যে সত্যিই আমি আগে রায়চৌধুরী ছিলাম, রায়চৌধুরী নামে লিখতাম কিন্তু এখন শুধু রায় লিখি। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, তবুও জোর করতে লাগলেন, কেন আমি রায়চৌধুরী টাইটেল ব্যবহার করছি না সেটা জানার জন্যে। তখন তাঁকে খুব নরম গলায় বললাম, 'কী করব বলুন? বিয়ের পর টাইটেল পালটে গেল যে।' তিনি আমার জবাব শুনে রীতিমতো বিচলিত হলেন কিন্তু আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন।

এবার পদবি সংক্রান্ত একটি আধুনিক সমস্যার কথা ভয়ে ভয়ে আমি উত্থাপন করব। ভয়ে ভয়ে এই কারণে যে আমার নিজের লোকেরা অনেকে এর মধ্যে রয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও যশস্বী। সমস্যাটা অবশ্য মধ্যে যতটা প্রকট হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছিল, এখন আর ততটা নেই।

সমস্যা হল পদবি যুক্তকরণ নিয়ে। এর সঙ্গে নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নটি রয়েছে। বিয়ের পরে মেয়েদের পদবি কেন পালটে যাবে! বিবাহপূর্ব খ্যাতনাম্নী মহিলা বিয়ের পরেও তাঁর নিজ পদবি রেখে দিয়েছেন এমন নজির বাংলা সাহিত্যে আছে। আবার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয়ের কোনো পদবিই ব্যবহার না করে দেবী ব্যবহার করছেন, অন্য দিকে দুই দিকের পদবি একসঙ্গে রয়েছে— এই দু'রকম বিখ্যাত দৃষ্টান্তও চোখের সামনেই রয়েছে।

সমস্যাটা এই পদবির যুগ্মকরণ নিয়ে। ধরা যাক, জয়ন্ত ঘোষের সঙ্গে জয়ন্তী রায়ের বিয়ে হল, তাঁরা দু'জনেই ঘোষরায় হলেন, তাঁদের ছেলের নাম হল বৈজয়ন্ত ঘোষরায়।

মনে করুন, আরেকটি দম্পতি তাঁরাও নারীর সমমর্যাদায় বিশ্বাসী। তাঁদের নাম মাধব চক্রবর্তী এবং মাধবী চ্যাটার্জি। বিয়ের পরে তাঁরা হলেন শ্রী এবং শ্রীমতী চক্রবর্তীচ্যাটার্জি, তাঁদের নয়নের মণি একমাত্র মেয়ের নাম হল সুমাধবী চক্রবর্তীচ্যাটার্জি।

এই বার আসল সমস্যা। কালক্রমে বৈজয়ন্ত এবং সুমাধবী বড় হল এবং তাদের বিয়ে হল। বিয়ের পরে সুমাধবীর সম্পূর্ণ নাম হল শ্রীমতী সুমাধবী ঘোষরায় চক্রবর্তীচ্যাটার্জি।

এখানেই কিন্তু সমস্যার শেষ নয়। আরও এবং আরও সমস্যা গোকুলে বাড়ছে। সেখানে দুটি ছেলে-মেয়ে প্রেমে পড়েছে, তাদের একজনের নাম স্বপন মিত্রটেলার, আরেকজনের নাম আয়েষা রহমানসান্যাল। দু'জনেই চমৎকার ছেলেমেয়ে, তাদেরও বিয়ে হল।

এর পর আবার পঁচিশ বছর। কলকাতার মেট্রোরেলের কামরায় প্রতিদিনের যাতায়াতে দুটি যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেম হয়েছে, তাদের একজন হল শ্রীযুক্ত অনির্বাণ ঘোষরায় চক্রবর্তীচ্যাটার্জি, অপরজন হল শ্রীমতী ঝিমকি মিত্রটেলার রহমানসান্যাল।

এর পর কী হবে? বিয়ের পর এদের কী পদবি হবে! এদের ছেলেমেয়ের কী পদবি হবে!

এর পরে আরও বাড়বে। এ হল জিওমেট্রিক প্রগ্রেশন, প্রত্যেক পুরুষ ডবল হয়ে যাবে। কারও নাম হবে বত্রিশ পদবিযুক্ত, কারও চৌষট্টি, কারও একশো আটাশ। সে এক ভয়াবহ দুর্দিন। একেকজনের নিজের নাম লিখতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাবে। আর মনে রাখাও তো অসম্ভব।

তখন কী হবে, কে জানে!

ছারপোকার এপিটাফ

আমি যখন চাকরিতে ঢুকেছি, একটা জিনিস দেখে আমার খুবই অবাক লেগেছিল প্রথম প্রথম; সেটা হল আমার সহকর্মীরা দিনের কাজ শুরু করার আগে অফিসে ঢুকে নিজ নিজ চেয়ার শূন্যে তুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিতেন। কাজের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণা অথবা অফিসের উপর নিদারুণ রাগ, ঠিক কী কারণে এতগুলি শান্ত ভদ্র কর্মচারী প্রতিদিন কাজের প্রারম্ভে এই বিচিত্র আচরণ করতেন এটা আমি গোড়ায় দু'-একদিন বুঝতে পারিনি। কিন্তু তার পরেই আমি মজ্জায় মজ্জায় টের পেলাম। প্রত্যেকটি চেয়ারে অসংখ্য ছারপোকা, তাদের দংশন যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই বিষাক্ত। প্রথম দিন বিকেলের দিকে গায়ে চাকা চাকা দাগ বেরল, ভাবলাম, অ্যালার্জি, অফিসের পরিবেশ সহ্য হচ্ছে না।

কিন্তু গরিবের ছেলে, চাকরি ছাড়ার উপায় নেই, অফিসের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে, এ রকম মনের জোর করে দ্বিতীয় দিনেও অফিসে গেলাম। দুপুরবেলায় যখন চেয়ারে বসে পাগলের মতো ছটফট করছি, দরদি সহকর্মী ফাইল থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'কী হল আপনার, সকালবেলা চেয়ার ছোড়েননি?' আমি যখন জবাব দিলাম, 'না,' তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'করেছেন কী মশায়? ছারপোকার কামড়ে মারা পড়বেন যে, যান, যান ওই প্যাসেজে গিয়ে চেয়ারটাকে ভাল করে আছড়িয়ে নিয়ে আসুন।'

একটু আছড়াতেই ছোট বড় অসংখ্য ছারপোকা বেতের চেয়ারের অন্ধিসন্ধি থেকে বৃষ্টির মতো ঝরতে লাগল। এর পর থেকে আমিও অফিসে গিয়েই প্রথমেই চেয়ার আছড়াতাম।

আমাদের অফিসে কেন, প্রায় প্রত্যেক অফিসেই সেই সময় চেয়ার আছড়ানোর ওই রীতি চালু ছিল। চেয়ার সারানো ছিল প্রায় নিয়মিত ঘটনা, অনেক অফিসেই বাঁধা কাঠ-মিস্ত্রি ছিল। নতুন চেয়ারও কিনতে হত হামেশা।

এই চেয়ার আছড়ানো ব্যাপারটা কিন্তু ছারপোকারা শেষের দিকে চমৎকার বুঝে গিয়েছিল। তখন আর চেয়ার আছড়িয়ে ছারপোকা বিশেষ বেরত না। ছারপোকার সংখ্যা যে কমে গিয়েছিল তা নয়, সকালের দিকে ছারপোকার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন দল বেঁধে যে যার চেয়ারের চেয়ার ছেড়ে নিকটবর্তী টেবিলের আনাচে-কানাচে আশ্রয় নিত। তারপর চেয়ারের অধিবাসী অফিসে এসে বসলে তারাও একে একে ধীরে সুস্থে রক্ত পান করতে চেয়ারে ফিরে আসত।

এই ফিরে আসার ব্যাপারটা আমি নিজেই আবিষ্কার করি। একদিন অফিসে গিয়ে টেবিলের নীচে তাকিয়ে কী একটা জটিল বিষয় নিয়ে একমনে ভাবছি, দেখলাম বহু ছারপোকা টেবিল ছেড়ে চেয়ারের দিকে এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে দু'-একটি উৎসাহী ও তরুণ ছারপোকার চেয়ারের পায়া পর্যন্ত এগিয়ে আসার তর সইছে না, মেজে থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে আমার চটি খোলা ডান পা ঝুলছিল, রক্তপিপাসু কয়েকটি ছারপোকা সেখানে এসে লাফাতে লাগল পায়ের উপর উঠবে বলে। একটি ছারপোকার উচ্চতা দশমিক শূন্য এক (.০১) ইঞ্চির বেশি নয়, (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইনসেক্টস ১৯৪৮ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); তার পক্ষে এক ইঞ্চি লাফানো মানে নিজের দৈর্ঘ্যের একশো গুণ উঁচুতে হাইজাম্প দেওয়া, চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না, পর পর কয়েকটা ছারপোকা অবলীলাক্রমে দু'-একবার চেষ্টা করেই আমার পায়ের উপর উঠে পড়ল।

তখন আমার বয়েস কম, কোনও বিষয়ে উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। ছারপোকার এই উচ্চলম্ফ-পরায়ণতা নিয়ে আমি অনেকের সঙ্গে, বিশেষ করে দু'-একজন জীববিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আমাকে বিশেষ পাত্তা দেননি। শেষে আমি ছারপোকার উচ্চলম্ফের বিষয়ে চিঠি লিখে বিখ্যাত গুইনেস বুক অফ রেকর্ডসের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন এবং আমাকে অনুরোধ করেন মেজে থেকে পায়ের মধ্যে শূন্যে লাফরত অবস্থায় একটি ছারপোকার ছবি তুলে পাঠাতে। অফিসের মধ্যে অন্ধকারে টেবিলের নীচে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের লাফের ছবি নেওয়া, আমাদের দেশে এ রকম সম্ভব হবে না বলে বুক অফ রেকর্ডসকে জানালাম।

কিন্তু তাঁরা নাকি যাচাই না করে কোনও তথ্য তাঁদের রেকর্ড বুকে ছাপেন না। তবে তাঁদের একজন প্রতিনিধি কিছুদিনের মধ্যে উত্তর প্রদেশের এক গুম্ফবিলাসীর গোঁফের দৈর্ঘ্য এবং কলকাতার শহরতলির এক যুবকের হাতের নখের পরিমাপ করতে থাকবে, রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ সে কথা জানিয়ে আমাকে তাঁদের সেই প্রতিনিধির সঙ্গে যথাস্থানে যথা সময়ে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। আমার অবশ্য সেটা করা আর হয়ে ওঠেনি।

ফলে আমারই গাফিলতিতে কলকাতার ছারপোকারা বুক অফ রেকর্ডসে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্থান পেল না। অবশ্য এখন আর সে সুযোগ নেই। কারণ সেসব ছারপোকা বহুদিন হল বিদায় নিয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের শেষ, ষাটের দশকের আরম্ভ। সে ছিল কলকাতার ছারপোকাদের স্বর্ণযুগ। সেই উত্তপ্ত তাম্রবর্ণ, দ্রুত বিচরণশীল, ক্ষিপ্র ছন্দোময় জিঘাংসু ছারপোকাদের আজকাল আর দেখতেই পাওয়া যায় না। তখন অধিকাংশ লোক হাতে একটা পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে ঘুরতেন, যেখানে গিয়ে বসতেন হাতের পুরনো কাগজটি ভাল করে পেতে তার উপরে বসতেন, এতে ছারপোকাদের দ্রুত ও আকস্মিক আক্রমণ কিছুটা প্রতিরোধ হত।

টেবিল-চেয়ার, তোশক-বালিশ শুধু নয়, তখন সর্বত্র ছারপোকা। জামা-কাপড়ে, জুতোর মোজার মধ্যে, ট্রামে-বাসে, সিনেমা হলে, সম্ভব-অসম্ভব এমন কোনও জায়গা ছিল না—যেখানে ছারপোকা ছিল না। আমার মনে আছে আমি দাড়ি কামানোর ভেজা বুরুশের মধ্যে, ঘুরন্ত টেবিল ফ্যানের ব্লেডে ছারপোকা দেখেছি। এমনকী ড্রেসিং সার্কেলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে থিয়েটার দেখতে দেখতে পরমাসুন্দরী নায়িকার কানের লতির নীচে, হাজার ওয়াটের জোরালো আলোয় স্পষ্ট দেখেছি, দুটি টুকটুকে ছারপোকা ঘুরছে। শেষ বয়েসে একবার ধনরাজ অসামান্য একটি গোল দিয়েছিলেন। খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গলের তাঁবুতে ধনরাজের পদপ্রান্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিলাম, ধনরাজ হাঁটুর উপর থেকে নিকাপ খুললেন, সেই প্রবল খেলার শেষে তখনও নিকাপের নীচে একটি চমৎকার ছারপোকা।

এই সুযোগে একজন অমর রসিকের কথাও বলি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে শিবরাম চক্রবর্তীর মেসে দেখেছি, ওঁর সেই বিখ্যাত তক্তপোশের ফাঁকে, উনি বলতেন মুক্তারামের তক্তারাম, দেখেছি নতুন চাদরের উপর নতুন চাদর, তার উপরে নতুন চাদর। কোনও চাদর তুলতেন না ছারপোকা বেরিয়ে আসবে বলে, শুধু কখনও ছারপোকার অত্যাচার বেশি হলে আবার একটি চাদর ফেলে দিতেন সবচেয়ে উপরে, অবশ্য প্রত্যেকটি নতুন চাদর পাতবার আগে চারদিকে ফিনাইল দিয়ে চাদরের চার প্রান্ত ভাল করে চুবিয়ে নিতেন যাতে ছারপোকারা ফিনাইলের দেয়াল লঙ্ঘন করে চাদরের উপরে না উঠে আসতে পারে। এই প্রতিষেধক ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী ছিল, ঈশ্বর জানেন, তিনি সত্যিই এটা করতেন কিনা সেটাও বলা কঠিন কিন্তু তিনি আমাকে এই রকমই বুঝিয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এই সব ছারপোকা, যাদের অত্যাচারে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর আগেই লোকেরা ট্রাম থেকে নেমে যেত, সিনেমার ইন্টারভ্যালের সময় হল থেকে পালিয়ে যেত, অর্ধেক মোগলাই পরোটা খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে দৌড়ে উঠে যেত, আজকাল প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে।

কিন্তু কেন?

এইবার আমি একটি ঐতিহাসিক তথ্য নিবেদন করব। স্থিতধী পাঠক, একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকান, মনে করে দেখুন একদা শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত আসল কলকাতায় কোনও মশা ছিল না। তার পর একদিন দলে দলে, লাখে লাখে মশার অনুপ্রবেশ ঘটল। তারা প্রথমে মানুষকে, তারপর কুকুর বিড়াল, গোরু-বাছুরকে কামড়াতে লাগল। তারপর ফলমূল, তরিতরকারি, টিকটিকি-ইঁদুর, অবশেষে ছারপোকাকে আক্রমণ করল। ছারপোকাকে আক্রমণ করার কারণটা সহজ, তার গায়ে মানুষের তৈরি রক্ত পাচ্ছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশারির আনাচে-কানাচে, বালিশ-তোশকের নীচে মশা ছারপোকা ধরে শুষে খাচ্ছে। এবং শেষে এই মশার অত্যাচারেই কলকাতার ছারপোকা এখন প্রায় নির্বংশ হতে চলেছে। এর পর হয়তো একটি ছারপোকাও আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না।

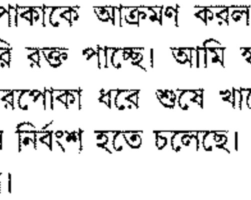

ভাগ্যফল

এ গল্প অনেকদিন আগেকার। রবিবারের সকালবেলা উকিলবাবু তাঁর বাইরের ঘরে বসে মক্কেলদের কাজ সারছিলেন। এমন সময়ে এক জ্যোতিষীঠাকুর এলেন। সে আমলের জ্যোতিষীরা আজকের জ্যোতিষীদের মতো প্যান্ট-শার্ট বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন না। মাথায় টিকি, কপালে ফোঁটা, পরিধানে গেরুয়া বা রক্তাম্বর, হয়তো বা পায়ে কাঠের খড়ম, হাতে সিঁদুরমাখা তুলোট কাগজ। তাঁদের দেখলেই চেনা যেত। তাঁরা কালেভদ্রে সংসারী মানুষদের দর্শন দিতেন। তাঁদের দেখা পেতে হলে নির্জন বটতলায় অথবা পোড়োমন্দিরে অমাবস্যার সন্ধ্যাবেলায় অথবা গলির গলি তস্য গলিতে বেনারস শহরের গোলক-ধাঁধায় খোঁজ করতে হত। আজকালকার মতো যে কোনও গয়নার দোকানের দেড়তলার চেম্বারে ঢুকে গেলেই তাঁদের দর্শন পাওয়া যেত না।

সে কথা পরে বলছি, আগে এই গল্পটা বলি। উকিলবাবু জ্যোতিষীঠাকুরকে দেখে যথাসাধ্য সম্ভ্রম প্রদর্শন করতে ইতস্তত করলেন না। এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা, কুশল বিনিময়ের পরে নিজের ডানহাতটি জ্যোতিষীর হাতে সমর্পণ করলেন। জ্যোতিষী তাঁর নামাবলির ঝোলা থেকে একটি আতস কাচ বার করে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ দেখার পর জ্যোতিষীটি খুব নিম্ন কণ্ঠে যেন খুব গোপন কথা শোনাচ্ছেন এইভাবে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনার মাতাঠাকুরাণী গত শীতে মারা গেছেন।' উকিলবাবু কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। কিন্তু ততক্ষণে গণকঠাকুর উকিলবাবুর হাত দেখে তাঁর আদি-অন্ত, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জেনে গেছেন, প্রায় স্বগতোক্তির মতো গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। 'বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমে, শিগগিরই বাচ্চা হবে অথচ সপ্তাহ দুয়েক চিঠি পাননি, খুব চিন্তিত আছেন। আপনার গৃহিণীর শরীরটা আজ কিছুদিন হল ভাল যাচ্ছে না। আপনি নিজেও কয়েকদিন আগে আদালতের সিঁড়ির ওপরে হোঁচট খেয়ে বেশ কাহিল হয়েছিলেন, এখনও গোড়ালিতে ব্যথা আছে।'

উকিলবাবু একথার পর নিজের দু'পায়ের গোড়ালির দিকে তাকাতে লাগলেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন গণকঠাকুরের অনিবার্য মন্তব্যের জন্যে। অবশেষে যখন গণকঠাকুর আসল কথায় এসে বললেন, 'আপনার এখন সময় খারাপ যাচ্ছে। আপনার শনি আর রাহু...', তখন উকিলবাবু একবার খুব জোরে কেশে উঠলেন। উকিলবাবু কাশি শুনে জ্যোতিষীঠাকুর বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু ভুল বললাম?' উকিলবাবুর কাশি থামিয়ে রীতিমতো বিস্মিত দৃষ্টিতে জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না ঠিক ভুল নয়, তবে...!' জ্যোতিষী বললেন, 'তবে?' অবশেষে উকিলবাবু পরিষ্কার করে বললেন, 'দেখুন, কী আশ্চর্য! সবই ঠিকঠাক, খুবই মিলে গেছে। কিন্তু এগুলো একটাও আমার নয়।' সন্ত্রস্ত জ্যোতিষীবাবু বললেন, 'আপনার নয়, মানে?' উকিলবাবু বললেন, 'আপনার সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে কিন্তু সেটা হল এই গলিরই ওই মাথায় সাতান্ন নম্বর বাড়ির মহেশ উকিলের সম্পর্কে, আর আমার বাড়ির নম্বর সাতাশ এবং আমি হলাম মহিম উকিল।'

সব জ্যোতিষীই যে এ রকম আগেভাগে খোঁজখবর করে জেনে নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন তা কিন্তু নয়। এঁরা অনেকেই তীক্ষ্ণ অনুমানের ওপরে নির্ভর করেন। একবার ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে চোট খেয়েছিলাম, এক শৌখিন জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন, 'বাঁ দিকের দরজা দিয়ে নামতে

গিয়ে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই।' ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমার দু' হাত উলটে-পালটে দেখে চলন্ত যানের বাঁদিকের দরজা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর মুহূর্তে আমার খেয়াল হল, ট্রাম গাড়ির ডানদিকে কোনও দরজা নেই, কোনও কালে ছিল না। সব দরজাই বাঁদিকে এবং এর জন্যে কোনও জ্যোতিষ বিচার দরকার পড়ে না।

অসংখ্য বাঙালির নাম ইংরেজি 'এস' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। সুতরাং কোনও জ্যোতিষী যদি আপনার ললাট কিংবা কররেখা নিদেনপক্ষে রাশি-নক্ষত্র গভীরভাবে বিবেচনা করে বলেন, আপনার জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম 'এস' দিয়ে আরম্ভ কিংবা 'এস' আদ্যক্ষর দিয়ে নাম-বিশিষ্ট আপনার একজন শত্রু আছে, তা হলে চমকিত বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

তেমনই আপনার বয়েস যদি চল্লিশ পঞ্চাশ, জন্ম হয়ে থাকে বাংলাদেশের মফস্বলে, তা হলে আপনার সম্পর্কে অনায়াসে দুটি অতীতবাণী করা সম্ভব। এক, আপনি অল্প বয়েসে ভীষণ জ্বরে ভুগেছেন, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড কিংবা সান্নিপাতিক। দুই হল, একবার আপনি জলে ডুবে প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন।

আর মধ্যবয়সিনী পাঠিকা, আপনি যে বিয়ের আগে একবার প্রথম যৌবনে প্রেমে পড়েছিলেন, সেই প্রেমিক যে আপনার পাশের বাড়িতেই থাকতেন, চিকন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছিল তার; আপনার উষ্ণ করতল হাতে ধরার আগেই একথা রয়ে-সয়ে বলে দেওয়া যায়, দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রে মিলবেই।

জ্যোতিষীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে ইদানীং। প্রত্যেক আড্ডায়, প্রত্যেক অফিসে এক বা একাধিক ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। এ ছাড়া প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি গলিতে আছেন একজন করে লোক্যাল জ্যোতিষী। অনেক সময়েই দেখা যায় দু'জন জ্যোতিষী মুখোমুখি বসে পরস্পর পরস্পরের ঠিকুজি বিচার করছেন। এই বিচারের ফলাফল উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় একই রকম অর্থাৎ এখন সময়টা খুব ভাল যাচ্ছে না, তবে সামনে বছরখানেক বছর দেড়েকের মাথায় ভাল সময় আসছে আর সব যদি ঠিকঠাক যায় তিন বছরের মধ্যে ভাগ্য তুঙ্গে।

অধিকাংশ লোকেরই, বিশেষ করে যখন একজন ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায়, ধারণা যে তার বর্তমান সময়টা ভাল যাচ্ছে না এবং সে অদূর ভবিষ্যতের গোলাপি সুদিনের স্বপ্ন দেখে। তিরিশ বছরের কোনও কেরানিকে যদি বলেন যে সে ষাট বছরে রাজা হবে, সে যতটা খুশি হবে তার চেয়ে যদি বলা হয় যে সে চৌত্রিশ বছর বয়েসে বড়বাবু হবে তা হলে সে অনেক বেশি খুশি হবে। হাত দেখেই হোক বা ঠিকুজি দেখেই হোক সমস্ত গণৎকারই শেষ পর্যন্ত যা বলেন তার সারমর্ম হল বাল্যকালে মৃত্যুযোগের থেকে রক্ষা, প্রথম যৌবনে ব্যর্থ প্রেম, এখন সময়টা তেমন ভাল নয়, সামনে কয়েকটা ফাঁড়া, দুটো বাধা, তিনজন শত্রু, তবে ভাল দিন এল বলে।

অনেক সময় শোনা যায় হাত দেখে বা মুখ দেখে কোনও জ্যোতিষী নাকি জন্মসময় ও তারিখ বলে দিতে পারেন, এ ব্যাপারটি আমি কখনও যাচাই করে দেখিনি। তবে এই সূত্রে এক দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যাপকের কথা মনে পড়ছে। এই চিরকুমার, তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানের অধ্যাপক তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দান করবেন সেই জ্যোতিষীকে যিনি দশটি অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির ঠিকুজি দেখে বলে দিতে পারবেন কোনটি স্ত্রীলোকের ঠিকুজি আর কোনটি পুরুষের ঠিকুজি এবং এর মধ্যে কে কে মৃত। যতদূর জানি, এখনও কোনও দাবিদার মেলেনি।

জ্যোতিষের প্রতি দুর্বলতা লোকের মধ্যে কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পুলিশের গোয়েন্দা, আধুনিক লেখক, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, এমনকী রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী উগ্রপন্থীর হাতের আঙুলে পাথর বসানো আংটি দেখা যাচ্ছে। বিলেতে মনস্তত্ত্ববিদরা যে ভূমিকা পালন করেন এদেশে জ্যোতিষীরাও সম্ভবত তাই করছেন। দুর্বল মানুষ তাঁর ভয়, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার জীবনে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতার প্রয়োজন বোধ করেন, আমাদের দেশে জ্যোতিষীরা সেই প্রয়োজন মেটাচ্ছেন।

তা মেটান, আমি একটি প্রাচীন ও নিষ্ঠুর গল্প দিয়ে ভাগ্যফল শেষ করি। জ্যোতিষী রাজার হাত দেখে বললেন, 'আয়ু আর বেশি নেই।' রাজা আতঙ্কিত। পাশেই সেনাপতি ছিলেন, বললেন, 'তাই নাকি? তা গণকঠাকুর, আপনার আয়ু কত?' গণকঠাকুর বললেন, 'তা আরো তিরিশ বছর।' সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষীর গলা তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন, তারপর রাজাকে বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি, দেখলেন তো তিরিশ বছর আয়ুর ব্যাপারটা, খামোকা এসব কথা বিশ্বাস করবেন না।'

বিশেষজ্ঞ

স্থান, দিঘার বিখ্যাত সমুদ্রতটের কাছাকাছি কাঁথি মহকুমার একটি গণ্ডগ্রাম। এই এলাকায় প্রচুর কাজুবাদামের চাষ হয়। কাজু মূল্যবান ফসল, বিদেশের বাজারে এর খুবই চাহিদা। কাজুবাদাম এখন দেশের মধ্যেও খুব জনপ্রিয়, যদিও দাম আকাশ-ছোঁয়া। কাঁথি অঞ্চলে কাজুর সন্দেশ তৈরি হয়, সেও বিশেষ উপাদেয়।

এই সব নানা কারণে এখন কাজুর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়েছে। দিল্লি থেকে বিশেষজ্ঞ এসেছেন সুদূর দিঘাতে কাজু চাষ পর্যবেক্ষণ করতে। সুখের বিষয়, বিশেষজ্ঞ মহোদয় বাঙালি, ইনি সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে ছয় মাসের কাজু চাষের ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আমেরিকায় কাজুর চাষ হয় কি না, সেখানে এর ট্রেনিং কী হবে—এসব প্রশ্ন আশা করি কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন পাঠকেরা দয়া করে তুলে আমার অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না।

সে যা হোক, বিশেষজ্ঞ মহোদয় সপারিষদ এক শীতের দুপুরে সমুদ্রের কাছের সেই গ্রামটিতে পৌঁছেছেন। এই ঠান্ডার দিনেও খালি গায়ে রোদ্দুরে বসে গ্রামের একজন কৃষক তামাকু সেবন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে সম্ভ্রান্ত লোকজন দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বেশ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এলেন, এসে যে গাছটায় এতক্ষণ কৃষক হেলান দিয়ে বসে ছিলেন সেটার গায়ে নিজের মুখের পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ গাছটার গোড়া অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে নিড়িয়ে, খুঁড়ে দিয়েছিলেন?'

এই প্রশ্ন শুনে কৃষক কেমন থমকে গেলেন। কিছু বলার আগেই বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের একজন পারিষদ বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন, 'অক্টোবর, মানে ওই আশ্বিন মাসে গাছটার গোড়া-টোড়াগুলো বেশ সাফ করে দিয়েছিলেন?'

কৃষক এবার বললেন, 'না।'

শূন্য পাইপটা দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বললেন, 'তাই বলি', তারপর একটু থেমে আবার কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাছটার ওপরের ডালগুলো এর মধ্যে কোনও দিন ভাল করে পোকা মারার ওষুধ দিয়ে স্প্রে করে দিয়েছেন?'

কৃষকের মুখ দেখে বোঝা গেল তিনি সাত জন্মে এ রকম কিছু শোনেননি, জেরার জবাবে থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, না তো।'

'তখনই বলেছিলাম,' বিশেষজ্ঞ মহোদয় কাতর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সাধে এই অবস্থা,' তারপর অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে কৃষকের সামনে দু' পা এগিয়ে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'আর কিছু না করুন, এই শীতের মধ্যে, বৃষ্টির আগে গাছের উপরের পাতাগুলো একবার ছেঁটে দেবেন তো?'

একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির এ রকম মারমুখো ভাব দেখে ইতিমধ্যে কৃষক রীতিমতো ঘাবড়িয়ে গেছেন এবং চার পা পিছিয়ে গেছেন। নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি কোনও রকমে জবাব দিতে পারলেন, 'আজ্ঞে না তো।'

মাথায় হাত দিয়ে বিশেষজ্ঞ মহোদয় মাটিতে বসে পড়লেন, 'এই ভাবে নিজের সর্বনাশ করে! আমি অবাক হয়ে যাব যদি আপনি এই গাছে এক কেজির বেশি কাজুবাদাম পান।'

একটু দম নিয়ে কৃষক তাঁর হাতের হুঁকোতে দু'-তিনবার জোরে জোরে টান দিলেন কিন্তু আগুন নিবে গেছে, ধোঁয়া বেরল না, নিরাশ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমিও খুব অবাক হব।'

এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের মুখে আর বাক্য জোগাল না, একজন পারিষদ তাঁকে সাহায্য করলেন, কৃষককে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও অবাক হবেন?'

এইবার কৃষক বেশ ধাতস্থ হয়েছেন, কোমর থেকে দেশলাই বের করে হুঁকোটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অবাক হব না? এটা হল শ্যাওড়া গাছ, এই শ্যাওড়ায় এক কেজি কেন, যদি একটা কাজুবাদামও হয় নিশ্চয়ই অবাক হব, খুবই অবাক হব।'

উপরের গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো। এর সঙ্গে কোনও জীবিত ব্যক্তি বা প্রকৃত ঘটনার কোনও সংযোগ নেই। যদি কোনও কারণে কোথাও কোনও মিল ঘটে যায় সে নিতান্তই আকস্মিক।

বরং বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে সেই সাঁতারের শিক্ষকের গল্পটি একবার স্মরণ করি। গল্পটি বাংলা ভাষায় অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী, মূল ইংরেজিটা বোধহয় পি. জি. ওডহাউসের, নাকি স্টেফান লিককের।

গল্পটা রীতিমতো চওড়া, অন্তত শিবরাম চক্রবর্তীর কলমে। বিস্তারিত বর্ণনা থাক, আসল ঘটনা এই রকম। সাঁতারের বিখ্যাত ইস্কুলের সাঁতার শিক্ষকেরও খুব খ্যাতি। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা রকম নির্দেশ দেন, তাঁরই নির্দেশে কতজন যে দক্ষ সাঁতারুতে পরিণত হয়েছে, অতি আনাড়ি অবস্থা থেকে, তার হিসাব নেই। একদিন হঠাৎ জলে পড়ে গেলেন শিক্ষক মশায়। তিনি তীর থেকে নির্দেশ দিতেন কিন্তু সেদিন কী করে পাড় থেকে জলে পড়ে গেলেন। তারপর নাকানি-চুবানি খেয়ে ডুবে মরেন আর কী! সেদিনই প্রকাশ পেল তিনি সাঁতার একদম জানেন না, জীবনে কখনও জলে নেমেছেন কিনা তাই সন্দেহ।

অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাঁতার শেখাতে গেলে সাঁতার জানতেই হবে এমন কোনও কথা নেই।

আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। আমি গানের গ জানি না। গান সম্পর্কে আমার সুরজ্ঞান এবং কণ্ঠস্বর দুইই ভয়াবহ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গো-মাংস যে রকম, আমার কাছে সারেগামাও তাই। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। একবার এক অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, বাজনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা'—দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সংগীতটি বাজানো হচ্ছে, আমি জাতীয় সংগীতের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

আমি ছিলাম সেই সভায় প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি বা ওই রকম কিছু। পাশেই সভাপতি মহোদয় বসে ছিলেন। তিনি আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন, 'উঠছেন কেন?' আমি বললাম, 'আপনিও দয়া করে উঠুন। দেখছেন না জাতীয় সংগীত বাজছে।' সভাপতি মহোদয়ের দুই চোখ কপালে উঠল। বেশ চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাম সেপ্টেম্বর আবার কবে থেকে জাতীয় সংগীত হল?' আমি আর কিছু বললাম না, ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সভাটি ছিল একটি সংগীত বিদ্যায়তনের বার্ষিক উৎসব এবং আমাকে বড় সমঝদার ভেবে কর্তৃপক্ষ অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষের তেমন দোষ দেওয়া চলে না। এ রকম ভুল সর্বত্রই হয়। যাঁকে আমরা কোনও বিষয়ে অথরিটি বলে ধরে নিয়েছি তিনি হয়তো সেই বিষয়ে একজন প্রকৃত হস্তিমূর্খ। দশচক্রে যে রকম ভগবান ভূত হয় তেমনি মূর্খও পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়। তবে ওই দশচক্রের মূল চক্রটি উচ্চাভিলাষী মূর্খ নিজেই আবর্তন করান।

অজ্ঞদের গালাগাল করা রুচিসম্মত নয়, বিশেষজ্ঞের কথা হচ্ছিল সেই কথাই বলি। ইংরেজিতে বলা হয় কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের আরও-আরও-আরও জানতে জানতে অবশেষে এভরিথিং অ্যাবাউট নাথিং জানাই হল বিশেষজ্ঞের বা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের স্বপ্ন। এই নাথিং কিন্তু ঠিক নাথিং নয়, দু'-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজনের বিষয় হল মৌর্য যুগের স্বর্ণমুদ্রার সিংহের ডান পায়ের (সামনের) মধ্যমার দৈর্ঘ্য। ইনি কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন। ইনি ইতিহাসের লোক। এঁরই বন্ধু সাহিত্যের, তাঁর বিষয় হল শিলাইদহের কুঠিবাড়ির মধ্যের ঘরের বড় শালকাঠের জলচৌকিটির পায়ার কাছে যে কালির দাগ লেগে ছিল সেই মসিচিহ্ন কি শিলাইদহ বোটে জলচৌকিটি নিয়ে সোনার তরী কবিতাটি লেখার সময়, (যদি নেওয়া হয়ে থাকে), দোয়াত উলটে লেগে গিয়েছিল? এই বক্তব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে তিনি একশো রকম তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন।

আজ কিছুদিন হল শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, ডাক্তার সাহেবদের হাতে আছি। বিশেষজ্ঞ নিয়ে লেখা শেষ করার আগে তাঁদের সম্পর্কে কিছু না লেখা অনুচিত হবে।

আমাদের ছোটবেলায় পারিবারিক ডাক্তার পায়ের গোড়ালি থেকে মস্তকের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গের চিকিৎসা করতেন। তিনিই বহু পরে একবার কানে ব্যথা হওয়ায় বললেন ই-এন-টি স্পেশালিস্টের কাছে অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণ-কণ্ঠ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে। এর অনেকদিন পরে একবার মিনিবাসে একটা লোক আমার নাকটা গুঁতিয়ে দিল, রীতিমতো ফুলে গেল। সেই ই-এন-টির কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আমি এখন শুধু কান করছি। আপনি ড. নাগের কাছে যান। তিনি এখন নাক করেন।' ড. নাগকে গিয়ে দেখালাম। তারপর এই গত সপ্তাহে ঠান্ডা লেগে ভীষণ মাথা ভার, একটা নাক, ডান নাকটা সম্পূর্ণ বন্ধ। আবার গেলাম ড. নাগের কাছে। তিনি সব দেখে বললেন, 'ডান নাকে আমার দ্বারা হবে না, আমি এখন শুধু বাঁ নাক দেখছি।'

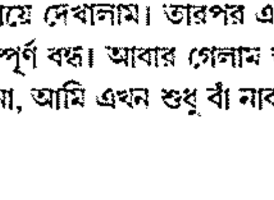

ছাতা

প্রিয় মেঘনাদবাবু,

গত শনিবার রাতে খুব বৃষ্টির সময় আমাদের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাদের চাকর পাশের বাড়ি থেকে যে ছাতাটি আপনাকে চেয়ে এনে দিয়েছিল সেই ছাতাটি পাশের বাড়ির ভদ্রলোক আজ চাইতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বললেন, ছাতাটি তিনি তাঁর অফিসের বড়বাবুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, বড়বাবুকে বড়বাবুর ভায়রাভাই খুব চাপ দিচ্ছেন ছাতাটির জন্যে, কারণ বড়বাবুর ভায়রাভাই যে বন্ধুর কাছ থেকে ছাতাটি আনেন সেই বন্ধুর মামা তাঁর ছাতাটি ফেরত চাইছেন।

দয়া করে মনে কিছু করবেন না। আমাদের নিজের ছাতা না থাকায় পাশের বাড়ি থেকে ছাতাটা ধার করে নিয়ে এসেছিলাম। তাই এই জটিলতার জন্যে আমরা নিজেরাও খুব সংকোচ বোধ করছি। এই সামান্য ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়ই তাগাদা দিতাম না।

ছাতাটি পত্রবাহকের হাতে ফেরত দিয়ে বাধিত করবেন। আবারো বলছি, মনে কিছু করবেন না। এইমাত্র পাশের বাড়ির ভদ্রলোক আবার তাঁর চাকর পাঠিয়ে তাগাদা দিলেন।

ইতি
আপনাদের ঘনশ্যাম

বলা বাহুল্য, মেঘনাদবাবুর পক্ষে ছাতাটি ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ওই ছাতা নিয়ে পরের দিন সকালে মেঘনাদবাবুর ছেলে বাজারে যায় এবং ফেরার পথে যখন বৃষ্টি থেমে গেছে, বাজারের পাশের চায়ের স্টলে এক কাপ চা খেতে গিয়ে সেখানে ফেলে আসে। পরে অবশ্য চায়ের দোকানদার ছাতার কথা অস্বীকার করেননি কিন্তু সেদিনই দুপুরে আবার যখন বৃষ্টি আসে তখন দোকানদার মশায় সেটা মাথায় দিয়ে বাড়ি যান ভাত খেতে। বিকেলে সেই ছাতা নিয়ে দোকানদার মশায়ের ভাই খেলার মাঠে যান। খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে ভাইটি তাঁর বান্ধবীর বাড়ি যান। সেখানে ছাতাটি রেখে আসেন কিন্তু এখন সেই বান্ধবীর বাড়িতে ছাতাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমাদের এবারের গল্প ছাতার গল্প। যে তরুণী পাঠিকার সকৌতুক মুখচ্ছবির কথা ভেবে এই সব ছাইপাঁশ, উলটো-পালটা লিখি সেই পাঠিকা-সুন্দরী নিশ্চয়ই এবার এই শুরুতেই খুব ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন।

তার চেয়ে বরং আমার নিজের ছাতার কথা বলি। প্রথমেই নিজেকে সংশোধন করে নিই, আমার নিজের কোনও ছাতা নেই, কখনওই ছিল না। রোদ-বৃষ্টিতে চিরকাল খালি মাথায় ঘুরে বেরিয়েছি, কোনওদিন ছাতা বা মাথার উপর কোনও আচ্ছাদন দরকার পড়েনি। তা ছাড়া আমাদের পাগলের বংশ, ছোটবেলা থেকে ঠাকুমা-পিসিমারা বলে এসেছেন, 'সব সময়ে মাথা খোলা রাখবি, যত পারবি মাথায় হাওয়া লাগাবি, কখনও কোনও রকম ঢাকাঢুকি দিবি না।' আমরাও সেই আদেশ মেনে চলি, শুধু ছাতা কেন, টুপি, মাফলার এমনকী লম্বা চুল রাখা পর্যন্ত আমাদের বারণ।

তবু একটা কথা এখানে স্বীকার করে না নিলে গৃহে গঞ্জনা পেতে হবে। আমার বিয়েতে একটা ছাতা পেয়েছিলাম। আমার বিয়ের বরকর্তা ছিলেন আমার এক সরল প্রকৃতির স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবী মামা। আমার বাবা কেন যে তাঁকে বরকর্তার উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বিয়ের সামাজিক রীতিনীতি, কলা-কৌশল কিছুই তাঁর জানা ছিল না, কারণ আমার সেই মামার আসল দিনগুলি কেটেছিল কারাগৃহের অন্তরালে। আমাদের সঙ্গে বরপক্ষে যে নাপিত গিয়েছিল সে তাঁকে বুঝিয়েছিল যে বিয়েতে বরের ছাতা নাপিত পায় এবং বরকর্তা মহোদয় সরল বিশ্বাসে ছাতাটি তাকে দিয়ে দেন। ফলে আমার জীবনের সেই এক ও অদ্বিতীয় আপন ছাতাটি আমি চোখেই দেখতে পাইনি।

আমার নিজের কাছে অবশ্য এখন একটি ছাতা আছে কিন্তু সেই ছাতা আমি কিনিনি, কেউ আমাকে দানও করেনি, সেটি আমি অর্জন করেছিলাম।

মেঘলা দিন, রাস্তার মোড়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বিলিতি পোশাকে সজ্জিত ভদ্রলোক, সদ্য বিদেশাগত বহুদিন প্রবাসী সফল বাঙালি ভদ্রলোকের যেমন পরিতৃপ্ত চেহারা ও জামাকাপড় হয় ওঁরও তাই। ভদ্রলোকের হাতে ছিল ছয় ইঞ্চি সাইজের গোল চামড়ায় জড়ানো কী একটা পদার্থ।

হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামতে ভদ্রলোক ওই চামড়ার মোড়ক খুলে একটা জিনিস বার করলেন, সেটা একটা কনডেন্সড ছাতা, নীচের দিকে একটা বোতামের মতো, সেটা টিপলেই ছাতাটি হুস করে খুলে যাবে। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকও বুঝতে পারেনি, আমার তো পারার কথাই নয়, এই কর্কটক্রান্তির দেশে ওই বিলিতি শীতলতার বোতামটি কোনও কারণে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে ছিল। ভদ্রলোক বোতামটি টেপা মাত্র ভেতরের লুকানো স্টিলের বাঁটটি ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে বেরিয়ে এসে, আমি কিংবা সেই ভদ্রলোক কিছু টের পাবার আগে, সজোরে আমার কানের নীচের রগে আঘাত করল। জীবনে এমন প্রচণ্ড চোট আর কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না, 'কোঁ কোঁ' করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলাম। কয়েকজন পথচারী ছুটে এলেন, একজন কাছের টিউবওয়েল থেকে আঁজলা করে জল এনে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন।

আমি অবশ্য জ্ঞান হারাইনি, তবে কানের নীচে কেটে রক্ত পড়ছিল। উঠে বসে ছাতার মালিক সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পেলাম না। তবে ছাতাটি আমার সামনেই খোলা অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল। এক ভদ্রলোক ছাতাটি তুলে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'এই সব সাংঘাতিক ছাতা ব্যবহার করে নাকি মশায়, এখনই তো মারা পড়তে বসেছিলেন।' পাশেই একজন বিজ্ঞদর্শন লোক ছিলেন, তিনি বললেন, 'এই সব ছাতাই তো বুকে ঠেকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে জাপানিরা আত্মহত্যা করে। আজকাল তো হারাকিরিতে ছোরা ব্যবহার উঠেই গেছে, সবাই ছাতা ব্যবহার করছে।'

যে ভদ্রলোক ছাতাটি আমার হাতে তুলে দিচ্ছিলেন হঠাৎ হাতলের সেই বোতামের জায়গায় তাঁর হাতের চাপ পড়াতেই বোধহয় ছাতাটি হঠাৎ ফরফর করে উঠল, আসলে ছাতাটি তখনও পূর্ণ বিকশিত হয়নি। সদ্য বিকচোন্মুখ অবস্থায় তাকে ফেলে মালিক পালিয়েছেন, এইবার দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কল্যাণে ছাতাটি সহসা পরিপূর্ণ আকার ধারণ করল।

ফরফর শব্দ করে ছাতাটি পুরো খুলে আসতেই যে ভদ্রলোকের হাতে ওটা ধরা ছিল তিনি লাফিয়ে উঠে ছাতাটি ছেড়ে দিলেন, ছাতাটির বিকাশ এবং ছত্রধারীর উল্লম্ফন দেখে বাকি যারা আমার সাহায্যে এসেছিলেন তাঁরা কী এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আর্তনাদ করে সবাই দশ-বারো হাত পিছিয়ে গেলেন। মুক্ত বিহঙ্গের মতো খোলা ছাতাটি বাদুলে হাওয়ায় প্রায় উড়তে যাচ্ছিল, আমি খপ করে সেটার হ্যান্ডেল চেপে ধরলাম। এবার আর ছাতাটি কোনও বিরুদ্ধাচরণ করল না। হিসহিস ও মৃদু গুঞ্জন উঠল অদূরবর্তী ভিড়ের মধ্যে, সেখান থেকেই কে একজন বলল, 'দাদার সাহস আছে বটে!'

যেখানে যাচ্ছিলাম, যাওয়া হল না। বৃষ্টিও নেমেছে, জীবনে প্রথমবার ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে কানের নীচে ডেটল লাগালাম।

তবে ছাতাটি বন্ধ করার চেষ্টা করিনি। ওই মুক্ত অবস্থাতেই বাইরের ঘরে আছে। আমার ছেলে বলেছে তাঁর এক সহপাঠিনীর জামাইবাবু নাকি টোকিয়োতে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা আসছেন। সেই জামাইবাবু ভদ্রলোককে একদিন নিমন্ত্রণ করে বাসায় এনে তাঁকে দিয়ে ছাতাটা বন্ধ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস

কেউ হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমার এই সামান্য সাহিত্য-জীবনে গদ্য লেখা আমি আরম্ভ করেছিলাম 'রন্ধন প্রণালী' দিয়ে।

সে বড় দুঃখের কাহিনী। আমি তখন (এমনকী এখনও) রান্নার 'র' পর্যন্ত জানি না। আমি নিতান্ত অর্থলোভে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তখন দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয়তে নিয়মিত 'রন্ধন প্রণালী', যেমন মানকচুর কাটলেট কিংবা সজনের চাটনি এই জাতীয় বিচিত্র খাদ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া, প্রকাশিত হত। আমি কী করে কোথায় যেন শুনেছিলাম যে প্রতিটি রন্ধনপ্রণালীর জন্যে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হয়।

তখন পাঁচ টাকার অনেক দাম। চার্মিনার সিগারেট প্রতি প্যাকেট পুরনো সাত পয়সা, বড় দোকানে পাঁচ প্যাকেট একসঙ্গে পাইকিরি দাম আট আনা। তার মানে পাঁচ টাকা ছিল পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেটের সমান। সুতরাং পাঁচ টাকার জন্য লোভ করা নিশ্চয় খুব অন্যায় ছিল না। তখন কী যে টাকার টানাটানি ছিল, সে শুধু ঈশ্বর জানেন আর জানেন কয়েকজন সুহৃদ যাঁদের সেই সময়ের ঋণ এখনও পর্যন্ত শোধ করা হয়নি। আর এখন শোধ দেবই বা কী করে, পঁচিশ বছর পরে তো দশ আনা পয়সা কিংবা উনিশশো ষাট সালের একটা ডাবল ডিমের ওমলেটের দাম শোধ দিতে গেলে তারা চমকে উঠবে, ভাববে নতুন কোনও উদ্দেশ্য আছে। আর তাঁদের সবাইকে খুঁজে বার করতে গেলে দিশেহারা হয়ে যাব, শুধু মর পৃথিবীতে নয়, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক তোলপাড় করতে হবে।

সে যা হোক, মোদ্দা কথা হল কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই শুধুমাত্র টাকার জন্যে রন্ধনপ্রণালী রচনার অসাধু কর্মটি আমি করেছিলাম। তবে কাজটা ছিল খুব সোজা।

বটতলার প্রকাশিত 'সচিত্র রন্ধন প্রণালী' নামে একটি চমৎকার বই, মাত্র এক টাকা কি দেড় টাকা মূল্য, কালীঘাট মন্দিরের সামনে যেখানে শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর ব্রতকথা ইত্যাদি বিক্রি হয়, সেখান থেকে কিনেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় বইটি কোনও মহিলা লেখেননি, কোনও পাচক ঠাকুরও নন। বইটি লিখেছিলেন দামোদর ধর কিংবা ওই রকম নামের এক ভদ্রলোক। বইটির রঙিন মলাটে অবশ্য জনৈকা রন্ধনরতা মহিলার ছবি ছিল যিনি একটি বিশাল কড়াইতে আস্ত একটি রুইমাছ (আঁশ সমেত) ভাজছেন কিংবা সাঁতলাচ্ছেন।

ডাল, ভাত, ভাজা ইত্যাদি বিষয় থেকে শুরু করে এঁচড়ের মুড়িঘণ্ট, পেঁপের হালুয়া পর্যন্ত একশো আটটি রান্নার পদের বর্ণনা ছিল এই শ' দেড়েক পাতার গ্রন্থে।

আমার কাজ ছিল একেবারে পরিষ্কার। বইটি থেকে যে কোনও একটি পদ বেছে নিয়ে শুধু ব্যবহৃত বস্তুগুলোর নাম বদলিয়ে দিতাম। সঙ্গে থাকত সুললিত ভাষ্য, যেটা আমার নিজের সংযোজন। যেমন ধরা যাক, পটলের কোর্মা বানানোর পদ্ধতি ছিল বইটিতে। আমি লিখলাম কুমড়োর কোর্মা। লেখা ছিল আধসের পটল, আধ পোয়া তেল। আমি করে দিলাম তিন পোয়া কুমড়ো, আর খাদ্যটি সুস্বাদু করার জন্যে তেলের বদলে তিন ছটাক ঘি।

দু'-চারটি লেখার পরে শেষের দিকে সাহস বেড়ে গেল, তখন ওই দামোদরবাবুর বইটির সাহায্য ছাড়াই নিজের বুদ্ধিমতো নিত্য নতুন খাদ্য কল্পনা করতাম। সব সময় সব লেখা ছাপা হত না। তবে এখনও আমার কাছে দু'-একটা পেপার কাটিং রয়েছে, তাতে দেখছি ট্যাড়সের মালাইকারি ও বেগুনের বোঁটার চাটনি রয়েছে।

বেগুনের বোঁটার চাটনি বলতে গিয়ে মনে পড়ল তখন আমি এতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলাম না, গরিবদের কথা ভাবতাম। ফেলে দেওয়া বেগুনের বোঁটা, দুটো কাঁচলঙ্কা, একটু নুন আর একটা তেঁতুল দিয়ে আমি যে চাটনির নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা খেয়ে কতজন গরিব গৃহস্থ তৃপ্ত বা আহ্লাদিত হয়েছিলেন তা বলতে পারব না কিন্তু শেষাশেষি আমি খুব বিপদে পড়েছিলাম।

আমি রন্ধন প্রণালীর লেখাগুলো পাঠাতাম আমার নামের মধ্যপদ লোপ করে তারা রায় নামে। ছোটবেলায় মেয়েদের ইস্কুলে হাতেখড়ি, আমার হাতের লেখাও একটু মেয়েলি ধরনের হেলানো, ফলে সম্পাদক মহোদয় খুব সম্ভব আমাকে কোনও প্রবীণা, রন্ধন পটিয়সী সুগৃহিণী ভেবে নিয়েছিলেন। ভালই ছাপা হচ্ছিল দু'-চারটে লেখা কিন্তু কাঁচা টোপাকুলের পায়েস পাঠানোর পর একটি ছোট পোস্টকার্ড পাঠিয়ে রবিবাসরীয় সম্পাদক মহোদয় ডেকে পাঠান। আমাকে দেখে, আমার কথা শুনে সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা লেখা আমার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। সোজা কথা, রন্ধন প্রণালী রচনার সেখানেই ইতি।

রন্ধন প্রণালী রচনার সময়ে দু'-একবার সততার স্বার্থে যে জিনিস লোককে খেতে বলেছি তা নিজে বানিয়ে খাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে এক অসম্ভব চেষ্টা। উনুন ছাড়া তো রান্না করা যাবে না। আমি তখন একা থাকি, বাইরে খাই। তবু একটা মাটির উনুন কিনে নিয়ে এলাম এবং বহু দুঃখের মধ্যে আবিষ্কার করলাম কয়লার উনুন ধরানো পৃথিবীর কঠিনতম কাজ। আমার দুঃখের কথা শুনে একজন জনতা স্টোভ কেনার কথা বললেন। তখন সদ্য জনতা স্টোভ বেরিয়েছে, কিনে দেখলাম জনতা স্টোভ জ্বালানো তেমন কঠিন নয়, কিন্তু নেবানো অসম্ভব। কয়লার উনুন ধরানোর চেয়ে জনতা স্টোভ নেবানো শতগুণ কঠিন। অবশ্য ইলেকট্রিক হিটার বা গ্যাস চেষ্টা করে দেখতে পারতাম কিন্তু সে সংগতি ছিল না। তা ছাড়া পাঁচ টাকার জন্যে কেউ এত খরচা করে না।

আমি আর কখনওই রান্না করার চেষ্টা করে দেখিনি। পারতপক্ষে রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করি না। সে খুবই বিপজ্জনক জায়গা। যত দূর মনে পড়ে বছর কুড়ি আগে শেষবার ওই নিষিদ্ধ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলাম।

কারণটা খুব সামান্য ছিল না।

তখন শনিবার দেড়টার সময় আমাদের অফিস ছুটি হত। এই রকম এক শনিবারে ছুটির আধঘণ্টা খানেক আগে আমার এক বন্ধু তিনটি সাহেব যুবক এবং এক মেম যুবতীকে আমার অফিসে নিয়ে এলেন। এঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুটির সদ্য আলাপ হয়েছে। ছেলেমেয়ে চারজনই নিউ ইয়র্কের, অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে কলকাতা এসে পৌঁছেছে। কালীঘাট দেখবে। আমার কালীঘাটে বাড়ি, বন্ধু ভদ্রলোক সেই জন্যে আমার কাছে ওদের নিয়ে এসেছে, যদি আজ বিকেলে ওদের কালীঘাট ঘুরিয়ে দেখাই খুবই ভাল হয়। এই সব বলে বন্ধুটি এই চারজনকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

দেড়টার সময় রাস্তায় নামলাম। দেখি ওরা নিজেদের মধ্যে কী সব চাপা ফিসফাস আলোচনা করছে। একে ইংরেজি, তার উপরে মার্কিনি উচ্চারণ, তার উপরে ফিসফাস কিছুই বুঝতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে আমার বাঙাল ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার?' কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বুঝতে পারলাম, ওরা হাংরি, ক্ষুধার্ত। কোথাও খেয়ে নিয়ে তারপর কালীঘাট যেতে চায়। আমি বোঝালাম, কালীঘাটেই আমার বাড়ি, আমাদের বাড়িতেই কিছু না কিছু খাবার আছে, চলো গিয়ে দেখা যাক।

এইখানেই আমার ভুল হয়েছিল। সেই দিন সকালেই আমার কিঞ্চিৎ নবোঢ়া পত্নীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের এবং আমার বান্ধবীদের একটি দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, বাড়ি ফিরে টের পেলাম; আমাদের কালীঘাট বাড়ির আট বাই নয় ছোট ঘরেও চারটি সাহেব-মেম দেখে তিনি একবারও লেপের নীচ থেকে বেরিয়ে এলেন না।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা উচিত, সেটা ছিল শীতকাল। কলকাতার সেই অসামান্য সময়। দু'-তিনবার বৃথা চেঁচামেচির পর আমি বুঝলাম আজ যদি এই সাদা অতিথিদের খাওয়াতে হয় তার বন্দোবস্ত আমাকেই করতে হবে। অনেক রকম ভাবনা-চিন্তার পরে সাহেব-মেমদের বারান্দায় বসিয়ে, আমি রান্নাঘরের রহস্যময় পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম।

রান্নাঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজার পাশে দেখলাম একটা বিরাট গোল হাঁড়ি। মনে পড়ল, আমার দিদিমা মাস দুয়েক আগে এই গুড়ের হাঁড়িটা পাঠিয়েছিলেন। হাঁড়িটার অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখলাম এখনও হাঁড়িটার গায়ে কিছু গুড় লেগে আছে। এর পরে তরকারির ঝুড়িতে উঁকি দিলাম, সেটা ওই গুড়ের হাঁড়ির পাশেই। দেখলাম প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে এক আনা জোড়া যত মুলো কিনে এনেছি সব সেই ঝুড়িতে। বুঝতে পারলাম আমার স্ত্রী মুলো পছন্দ করেন না, তাই এই অবস্থা।

এরপরে আমার একটু পরিশ্রম। মুলোগুলো কুচি কুচি করে কাটলাম। সাত দুগুনে চোদ্দোটা মুলো, অনেক হল। এর পরে সেই কুচি মুলো গুড়ের হাঁড়িতে ঢেলে খুব মাখামাখি করলাম। তারপর বিয়েতে উপহার পাওয়া ডিনার সেট থেকে চারটে প্লেট বার করে সমান ভাগ করে সেই মুলোগুড় সাহেব-মেমদের দিয়ে দিলাম, বললাম, 'র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস, এ বেঙ্গলি ডেলিকেসি।' সেই নিউ ইয়র্কীয় যুবক-যুবতীরা এত আনন্দ করে এই আশ্চর্য খাবার খেল তা বলার নয়। তারা আজও আমাকে ভোলেনি। প্রত্যেক বছর বড়দিনে এখনও আমাকে শুভেচ্ছা পাঠায়। সেই চারজনের মধ্যে একজন, ওই মেম-ললনাটি নিউ ইয়র্কের এক গলিতে একটি রেস্তোরাঁ করেছে। সেই রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকায় ইন্ডিয়ান একসোটিক ফুডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলছে মুলো-গুড়, 'র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস।'

ঘড়ি

ঘড়ি হারায়নি বা ঘড়ি চুরি যায়নি, জীবনে ঘড়ি খোয়ানোর একটি ঘটনাও ঘটেনি এমন খুঁজে পাওয়া খুব সোজা নয়। ঘড়ি যেমন ভেতরে ভেতরে চলে এবং সময় দেয়, সেই রকম বাইরে বাইরেও চলে এবং একজনের কাছ থেকে অবলীলাক্রমে আরেকজনের কাছে চলে যায়।

আমি জীবনে এখনও পর্যন্ত অন্তত পাঁচ-সাতটি ঘড়ি হারিয়েছি এবং প্রায় প্রত্যেকটিই চুরির ঘটনা। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঘড়ির ডায়ালে যেখানে সুইস মেড, শক প্রুফ ইত্যাদি লেখা থাকে, সেখানে পয়সা খরচ করে 'স্টোলেন ফ্রম তারাপদ রায়' (Stolen from Tarapada Roy) লিখে নিয়েছি। এতে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা কিছু কমেছে এমন নিশ্চয় নয়, কিন্তু যে চুরি করবে সে বেচতে গিয়ে বেকায়দায় পড়বে এই আনন্দে আছি।

ঘড়ির কথা আরম্ভ করে প্রথমেই ঘড়ি চুরির ব্যাপার বলে ফেললাম বোধ হয় মনের মধ্যে এ বিষয়ে বেদনা বহমান বলে। তবে আমার সব ঘড়িই যে চুরি হয়েছিল তা নয়। আমার একটা ঘড়ি হনুমানে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন আমি থাকতাম এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের একটা গলিতে, ভীষণ হনুমানের উৎপাত ছিল এই অঞ্চলে সেই সময়, সেই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন সালে। এখন আর ওসব এলাকায় হনুমান দেখা যায় না। সব বিদেশে চালান হয়ে গেছে।

হনুমানের উৎপাতে আমরা অধিকাংশ জিনিসপত্র টেবিলের ড্রয়ারের ভিতরে কিংবা আলমারির মধ্যে রাখতাম। সেদিন কী একটা তাড়াতাড়িতে টেবিলের উপরে আমার প্রায় আনকোরা ঘড়িটা রেখে ঘরের বাইরে গেছি, হঠাৎ হনুমানটা জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঢুকে আমার সেই ঘড়িটা আর একটা ডায়েরি মতন খাতা নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। ওই ডায়েরি মতন বস্তুটি ছিল আমার প্রথম কবিতার খাতা। হনুমানটি বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করার চেষ্টা করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে আমি দমে যাইনি। এক সপ্তাহের মধ্যে শুধু হনুমানের উপরেই 'ওগো শাখামৃগ' নামে এক খাতা কবিতা লিখেছিলাম।

ঘড়িটা উদ্ধার করার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার ছোট মেসোমশাই দুঁদে পুলিশকর্তা। তখনও লালবাজারে স্ন্যাচিং স্কোয়াড হয়নি। তিনি অ্যান্টি-রাউডি এবং অ্যান্টি-রবার শাখার দুই দুই চারজন সেপাইকে ভার দিয়েছিলেন ঘড়িটি উদ্ধার করার জন্যে। হনুমানটি কিন্তু ঘড়ি হাতছাড়া করেনি। মাঝে মাঝেই দেখা যেত এ-বাড়ির ছাদে, ও-বাড়ির দেয়ালে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ঘড়িটি কানের কাছে ধরে টিকটিক শব্দ শুনছে। চব্বিশ ঘণ্টার পরে চাবি না দেওয়ায় ঘড়িটির দম নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখনও দেখতে পেতাম হনুমানটি শক্ত মুঠিতে ঘড়িটি ধরে কানের কাছে নিয়ে খুব ঝাঁকি দিচ্ছে।

ওই বন্ধ ঘড়িটা কিন্তু হনুমানের খুব উপকারে লেগেছিল। আমি নিজে দেখেছি লোকে ওকে কলাটা-মুলোটা খাওয়াত ওই ঘড়িটা হাতাবার জন্যে। কিন্তু সে সুবিধে কারও হয়নি। হনুমান একটি শতাব্দী-প্রাচীন সহকার তরুর উচ্চতম কাণ্ডশীর্ষে ঘড়িটি রেখে তবে নীচে কলা খেতে আসত।

একবার সেপাইরা ওই রকম এক সময়ে ওই গাছের উপরে উঠে ঘড়িটি খুঁজে আনতে গিয়েছিল। ব্যাপারটা টের পাওয়া মাত্র দুই লাফে হনুমানটি গাছে ফিরে যায় এবং সবচেয়ে আগে যে সেপাইটি

উঠছিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য যে, সে সেই সেপাইটির হাতে যে হাতঘড়িটা ছিল সেটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন সেপাইরা আমার ঘড়ি আর উদ্ধার করবে কী, নিজেদের ঘড়ি রক্ষা করতেই ব্যস্ত।

এরই পরে হনুমানটির নামকরণ হয়। ঘড়িয়াল হনুমান নামে ওই জন্তুটি আমাদের এলাকায় রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। অনেকের ধারণা হয়েছিল, হনুমানটির দৈবশক্তি আছে, সে সময় বলতে পারে। লোকে তাকে একটা কলা খাইয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করত, 'কেয়া হনুমানজি, সাড়ে পাঁচ বাজ গিয়া?' কেন যে বাঙালিরা পর্যন্ত হনুমানের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলত তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু কলা দিয়ে এ রকম প্রশ্ন করলেই হনুমানটি যে কোনও একদিকে ঘাড় নাড়াত, লোকে বলত, 'দেখো, হনুমানজি বোলতা হ্যায় সাড়ে পাঁচ বাজ গিয়া।'

ঘড়ির কথা বলতে গিয়ে হনুমানের গল্প করে বসলাম। আসল গল্পটাই বলা হয়নি। গল্পটা পুরনো, পড়বার পরে যাঁদের মনে হবে গল্পটা তিনিও জানতেন, দয়া করে মনে মনে হাত তুলবেন, আমিও তাঁদের মনে মনেই রসিক চূড়ামণি উপাধি দেব।

আমার এক বন্ধুর একটা পুরনো দেয়ালঘড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কালো মেহগনি কাঠের ফ্রেমে বিরাট গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। সেটা সে সারাতে নিয়ে যাচ্ছিল ঘড়ির দোকানে। আমরা দু'জনে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তা ছাড়া সন্ধ্যার সময়, হাজরার মোড়, লোকজন গিজগিজ করছে। এক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা উলটোদিক থেকে আসছিলেন। তিনিও নিশ্চয় খেয়াল করেননি, হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঠুকে গেল আমার বন্ধুর হাতে উঁচু করে ধরা দেয়ালঘড়িটার কাঠের ফ্রেমে।

আচমকা আহত হয়ে মাথা তুলে তাকিয়েই মহিলা দেখেন ওই অত বড় একটা ঘড়ি। তিনি হয়তো কোথাও শিক্ষয়িত্রী-টিক্ষয়িত্রী হবেন, সে কী রাগারাগি শুরু করলেন আমাদের উপরে, 'হাতঘড়ি ব্যবহার করতে পারেন না? এত বড় একটা ঘড়ি হাতে করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন!' যত বোঝাতে যাই, ঘড়ি সারাতে নিয়ে যাচ্ছি, কে শোনে কার কথা।

ঘড়ির সম্পর্কে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপারটি ছিল গোপাল ভাঁড়ের বইয়ের মলাটে। গোপাল ভাঁড়ের আমলে অবশ্যই ঘড়ি ছিল না, ঘড়ি নিয়ে তাঁর কোনও রসিকতাও মনে পড়ছে না। কিন্তু 'সচিত্র গোপাল ভাঁড়' বইয়ের পুরনো চিৎপুর সংস্করণের কভারে ছবি ছিল ঘড়ি নিয়ে। একজন লোক ঘড়ি হাতে যাচ্ছে, তাকে আরেকজন জিজ্ঞাসা করছে, 'দাদা, ক'টা বাজে?' ঘড়িধারী দাঁত বার করে পালটা জিজ্ঞাসা করছেন, 'দাদা, ক'টা চাই?' অনেক মহৎ সমস্যার মতোই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের আদি-অন্ত আমি আজও খুঁজে পাইনি।

আজকাল ডিজিট্যাল ঘড়ি চলছে। আলো জ্বলে-নেবে, মুহূর্তে মুহূর্তে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। আমার এক তরুণ ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আছেন। তিনি বলেছেন, ডিজিট্যাল ঘড়ি চলবে না, আবার ডায়াল ঘড়িতেই পশ্চিমিরা ফিরে যাচ্ছে। কারণ হল, ডিজিট্যাল ঘড়িতে মাত্র একটাই সময় দেখায়, যেমন বারোটা সাতান্ন কিংবা সাতটা তেত্রিশ। ব্যাপারটা খুবই ক্ষণিক। সিনেমার শো সাড়ে পাঁচটায়, সিনেমা হল বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে, ডিজিট্যাল ঘড়িতে পাঁচটা তেরো, তাড়াতাড়ি করা দরকার কিন্তু সময়টা আমার মনে রেখাপাত করল না, কারণ শুধু একটা সময়ই দেখতে পেলাম। কিন্তু ডায়াল ঘড়িতে শুধু পাঁচটা তেরোই দেখতাম না, দেখতে পেতাম নির্দিষ্ট সময় থেকে মাত্র সতেরো ঘর দূরে আছি, মনের মধ্যে একটা তাড়া আসত। সময় তো শুধু সময় নয়, সে বহমান ও আপেক্ষিক, তাকে মুহূর্তের বিন্দুতে আবদ্ধ করলে চলবে না। সময় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ভাবটাই উবে যাবে।

অনেক সময় অনেকজনের কথা বলেছি। সময় সচেতনতা সম্পর্কে আমার ছোট ভাই বিজনের কথা বলি। আমার জানাশোনার মধ্যে সময়-জ্ঞানহীনতায় সেই ফার্স্ট যাচ্ছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে গেলে মহাভারত হবে। কিন্তু তার এই সময়জ্ঞানের অভাবের একটা প্রকৃত কারণ আছে।

ওর দশ-বারো বছর বয়সে মামার বাড়িতে একটা দেয়াল-ঘড়ি দেয়াল থেকে খুলে ওর মাথায় পড়ে, ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমার নিজের ধারণা, সেই থেকেই সময়বোধ ওর হারিয়ে গেছে। কিন্তু বিজন যেদিন বলল, 'না দাদা, কারণ তা নয়।' বলে ওর ডিজিট্যাল ঘড়িটা দেখিয়ে বলল, 'এটাই কারণ।' কারণটা দেখলাম ওর ডিজিট্যাল ঘড়িতে তেরোটা নিরানব্বুই বেজেছে। বিজন একটু মৃদু হেসে বলল, 'তেমন মারাত্মক কিছু নয়, অত ভয় পেয়ো না। ব্যাটারি ডাউন, পালটালেই আবার একটা থেকে বারোটার মধ্যে থাকবে।'

দরজি

দরজি অর্থাৎ যাঁরা জামাকাপড় বানান। এই সীবন-শিল্পীদের কোথাও কোথাও কেউ কেউ খলিফা বলে থাকেন। বহুক্ষেত্রেই দরজি যদি মুসলমান হন, বলা হয় খলিফা সাহেব। এই খলিফা আরব্য রজনীর হারুন রশীদ বা কোনও সম্রাট বা শাহ নন, এই খলিফা মানে ওস্তাদ।

ওস্তাদ অর্থাৎ দক্ষ কারিগর। দরজিদের ক্ষেত্রে এই কারিগরি দক্ষতার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল লোক ঘোরানো। এত মোলায়েম হেসে গ্রাহককে দিনের পর দিন ঘুরিয়ে যাওয়া আর কোনও পেশায় দেখা যায় না।

দিল্লি বেড়াতে যাবে বলে যে নবীনা কিশোরীটি লাল ফুলফুল শালোয়ার কামিজটি বানাতে দিয়েছে, দিল্লি থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেও সে যদি তা উদ্ধার করতে পারে তা হলে সে ধন্য। আমার এক বন্ধুর মামা এই অঘ্রান মাসে একটা সার্জের ফুলশার্ট দরজির দোকানে বানাতে দিয়ে পাঁচ দশ হাঁটাহাঁটি করে চৈত্রের শেষাশেষি শার্টটি হাতে পেলেন। প্রখর মধ্যাহ্নকাল, গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হয়ে গেছে, এদিকে দরজিমশায়ের কাচঢাকা ছোট ঘরে যথারীতি লোডশেডিং। সেই মাতুল ভদ্রলোক নতুন পাওয়া গরম জামাটি ট্রায়াল দিতে দোকানের দমবন্ধ দু'ফুট বাই আড়াইফুট ট্রায়ালরুমে ঢোকেন। বেরতে দেরি হচ্ছে দেখে দোকানের এক কর্মচারী দরজা ফাঁক করে দেখেন মাতুল মহোদয় ওই গরমে, বদ্ধ ক্ষুদ্র কক্ষে বিলিতি সার্জের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সেদিন আবার টালা ট্যাঙ্কের পাম্প চুরি আর পলতায় জলবিরতি। কোথাও এক বিন্দু জল নেই, শেষে পাশের পানের দোকান থেকে কুড়ি বোতল লেমনেড এনে মাথায় ঢেলে তারপর ভদ্রলোকের জ্ঞান ফেরে। সেই লেমনেডের দাম কে দেবে, দরজি না খদ্দের তা এখনও স্থির হয়নি, কিন্তু লেমনেডের জলের রঙে দুগ্ধশুভ্র সার্জের পাঞ্জাবিতে যে অপরিচিত মহাদেশের মানচিত্র আঁকা হয়েছে তা তুলে ফেলা সহজ হবে না।

কিন্তু এসব তো সামান্য কথা। নির্মলবাবু বলে এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ভদ্রলোক অতিশয় সজ্জন, শিক্ষিত ব্যক্তি, তা ছাড়া সদালাপী। কিন্তু ভদ্রলোকের একটা দোষ ছিল, ভদ্রলোকের একটু হাতটান ছিল। অবশ্য লোকজনের জিনিসপত্র সরাতেন না, একটা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, সেখান থেকেই মাঝে-মধ্যে প্রয়োজন ও সুবিধেমতো অল্পবিস্তর টাকা-পয়সা সরাতেন। যেমন হয়, অবশেষে ধরা পড়ে যান। বিচারে তহবিল তছরুপের গুরুতর দায়ে তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়।

জেলে যাওয়ার সময় নির্মলবাবু পকেটের কাগজপত্র, টাকা-পয়সা সব জেলের অফিসে জমা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন, সেটাই নিয়ম। পাঁচ বছর পরে জেল থেকে বেরনোর সময় যখন সব ফেরত পেলেন, দেখলেন পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে একটা দরজির দোকানের রসিদ রয়েছে। নির্মলবাবুর মনে পড়ল, মামলায় খালাস পেয়ে যাবেন আর খালাস পেলেই চুটিয়ে ফুর্তি করবেন এই আশায় একটা গরদের পাঞ্জাবি বানাতে দিয়েছিলেন। সে সাধ তাঁর পূরণ হয়নি, কিন্তু পাঁচ বছর পরে রসিদটি নিয়ে তিনি সেই দরজির দোকানে এবার গেলেন। দরজির দোকানটি একই রকম আছে, খুব রমরমা, বহু লোকজন জামাকাপড়ের মাপ দিচ্ছে। পাঁচ বছরের পুরনো রসিদটা নির্মলবাবু সন্তর্পণে কাউন্টারে দেখালেন। এতদিন হয়ে গেছে কিন্তু কেউ কিছু মাথাই ঘামাল না, রসিদটি হাতে হাতে ঘরের পিছনে কারিগরি সেকশনে চলে গেল, সেখান থেকে এক ভদ্রলোক রসিদটি হাতে কাউন্টারে এসে নির্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গরদের কাপড় তো?' নির্মলবাবু যখন বললেন, 'হ্যাঁ,' ভদ্রলোক বিনীতভাবে মোলায়েম হেসে বললেন, 'দাদা, কিছু মনে করবেন না, একটু দেরি হয়ে গেল, একবার কষ্ট করে সামনের সপ্তাহের শেষের দিকে আসুন।'

এ গল্প নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত, কিন্তু খুব অতিরঞ্জিত নয়। দরজিরা বহু সময়েই খুব অসুবিধা সৃষ্টি করেন। কত বিয়ের পাঞ্জাবি, ইন্টারভিউয়ের শার্ট, ছোট ছেলের পুজোর পোশাক দরজির দোকান থেকে শেষ মুহূর্তেও উদ্ধার করা যায় না। লোকে জামাইবাবুর পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করতে যায়, পুরনো কলার ফাটা শার্ট পরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায়, ছোট মেয়ে ময়লা ফ্রক পরে পুজো মণ্ডপের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্যদিকে দরজিদের জন্যে তাঁদের খদ্দেররাও কম অসুবিধার সৃষ্টি করেন না। আমি একবার দেখেছিলাম একজন শৌখিন লোক এক দরজির দোকানে রাগারাগি করছেন, 'বাঁ হাতের সামনের দিকটা হবে লাল এবং পেছনের দিকটা নীল, ডান হাতের সামনে নীল পেছনে লাল, আর তুমি করে দিলে বাঁয়ে নীল-লাল আর ডাইনে লাল-নীল। রইল তোমার জামা, এ জামা আমি নেব না।' বিব্রত দরজি হাতজোড় করে বলছেন, 'জামাটা নিয়ে যান দাদা, এ জামা আপনি ছাড়া আর গায়ে দেবার লোক আমি জোগাড় করতে পারব না।'

আরেক ধরনের লোক রয়েছে, তাদের ধারণা দরজি বুঝি কাপড় বেশি নিচ্ছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত গল্প আছে। এক গৃহস্থকে তাঁর ছেলে পাঞ্জাবির জন্যে সাদা কাপড় পাঠিয়েছে। তিনি টেলারিং শপে গেছেন। দরজি মাপ নিয়ে যখন কাপড়টা তুলছে, তখন তাঁর কী মনে হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাপড় একটু বেশি হবে?' দরজি বললেন, 'তা একটু হতে পারে।' তখন গৃহস্থ বললেন, 'ঠিক আছে, বেশি কাপড় দিয়ে দু'-একটা রুমাল বানিয়ে দেবেন।' দরজি বললেন, 'তথাস্তু।'

রাস্তায় নেমে ভদ্রলোকের মনে হল অতিরিক্ত দুটো রুমালে যখন দরজির আপত্তি হল না, হয়তো একটা পাজামাও হয়ে যাবে। ভদ্রলোক ফিরে গেলেন দরজির দোকানে, দরজিকে তাঁর আবদার জানালেন। দরজি বললেন, 'সে সম্ভব নয়।' ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন না চেষ্টা করে।' দরজি দেখলেন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চুপ করে রইলেন। দরজিকে মৌন দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আর ওই রুমাল দুটোও কাপড় বেঁচে গেলে করে রাখবেন।'

কিছুক্ষণ পরে আবার ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন, সামনে শীত আসছে, কাপড় যদি একটু বেশিই থাকে তবে কাটছাঁট যা বাঁচবে তা দিয়ে একটা টুপিও বানিয়ে নিলে মন্দ হয় না। দরজি ততক্ষণে বাকরহিত হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক এর পরে আরও দু'বার ফিরলেন, শেষ পর্যন্ত তিন মিটার কাপড়ে মোটামুটি ফরমাশ দাঁড়াল একটা ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, একটা ঢোলা পাজামা, দুটো আন্ডারওয়ার, দুটো ফতুয়া, দুটো রুমাল এবং একটা টুপি।

নির্দিষ্ট দিনে সেই ভদ্রলোক দরজির দোকান থেকে সবই পেলেন; পাঞ্জাবি, পাজামা, ফতুয়া, টুপি, রুমাল, যা যা যত সংখ্যক চেয়েছিলেন। কিন্তু এ কী? সবই অতি ছোট ছোট, পুতুলের জামাকাপড়। কোনও শিশুও সেগুলো পরিধান করতে পারবে না। শুধু বাচ্চা মেয়েদের পুতুল

খেলায় কাজে লাগাতে পারে। ভদ্রলোকের রাগারাগিতে রাস্তায় লোক জমে গেল, কিন্তু দরজিমশায় নির্বিকার, তিনি বলছেন, 'তিন মিটার কাপড়ে এতগুলো জিনিস এর চেয়ে বড় করা যাবে না, কেউ পারবে না।'

এর বিপরীত গল্পটি আরও জটিল। দামি গরম কাপড় বিলেত থেকে এনে দরজির দোকানে এক ভদ্রলোক কোট বানাতে গেছেন। দরজি মেপে বললেন, 'এতে হবে না।' ফেরত নিয়ে পাশের দোকানে যেতে সেখানকার মালিক হাসিমুখেই অর্ডার গ্রহণ করল। ভদ্রলোক যেদিন কোট আনতে গেছেন, দেখেন সেই দরজির দোকানে একটি ছোট ছেলে তারই কোটের কাপড়ে তৈরি একটা কোট গায়ে দিয়ে খেলছে। ওদিকে তাকাতে দোকানদার একটু মোলায়েম হেসে বললেন, 'আপনার কাপড়টা থেকে অনেকটা কাটিং বেরিয়েছিল, তাই দিয়ে বানিয়ে দিলাম।' ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি, আর তাঁর নিজের কোটটাও ভাল ফিট করেছে। তিনি নিজের কোটটা নিয়ে, সেই প্রথম দোকানে যে কাপড় কম হবে বলেছিল তাকে গিয়ে ধরলেন, 'আপনি কী রকম দরজি, আমার কোট হয়েও ওই দরজির ছেলের একটা কোট হয়ে গেল; আর আপনি বলেছিলেন যে কাপড় কম হবে!'

একটি গলাবন্ধ কোটের গলা কাটতে কাটতে দরজি মশায় জবাব দিলেন, 'আরে, ওর ছেলের বয়েস সাত আর আমার ছেলের বয়েস উনিশ, আমার ছেলের কোট কি ওতে হত, কাপড় কম পড়ত না?'

সংখ্যাতত্ত্ব

যাঁরা আমাকে হরপ্পার যুগ থেকে চেনেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা জানেন কিংবা যাঁদের মনে আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় শেষ পত্রে সংখ্যাতত্ত্বের বিশেষ বিষয়ে আমি শূন্য পেয়েছিলাম, তাঁদের কারও পক্ষে একথা ভাবা হয়তো অসম্ভব নয় যে, আমার এই কাণ্ডজ্ঞানটি নিতান্তই বিদ্বেষপ্রসূত এবং প্রতিহিংসাবশত।

তবে সত্যি কথা, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, এই পঁচিশ বছর পরে এখন আমার আর এ বিষয়ে রাগ বা হিংসে বলে মনের মধ্যে কিছু নেই। আর তা ছাড়া অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সম্প্রতি কিছুদিন আমাকে জীবিকার জন্যে যে কাজটি দেখতে হচ্ছে সে ওই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়েই।

আর তা ছাড়া ওই শূন্যের ব্যাপারটার আমার কাছে আর কোনও গুরুত্ব নেই। শুধু ওই পরীক্ষায় নয়, তার আগে ও পরে জীবনের বহু পরীক্ষায় আমি অবলীলাক্রমে শূন্য পেয়েছি।

খুব অল্প বয়েসে ইস্কুলের নিচু ক্লাসে অঙ্কের পরীক্ষায় প্রথম যেবার শূন্য পাই, বাবা আমাকে মারতে এসেছিলেন। পরম স্নেহশীলা আমার রাঙা পিসিমা সেখানে ছিলেন, তিনি বাবাকে বাধা দেন এবং নাম ধরে ধমকিয়ে দিয়ে বলেন, 'জটু, খোকাকে মারতে যাচ্ছ, কেন, খুব খারাপ কী করেছে? একেবারে কিছুই যে পায়নি তা তো নয়, শূন্য তো পেয়েছে।'

শূন্য পাওয়া একেবারে কিছুই না পাওয়া নয়, সেটা তখন থেকেই আমি জেনে গিয়েছি। কিন্তু

শূন্যের সমস্যা বড় বেশি জটিল, তা নিয়ে অন্য কোনও দিন হাসাহাসি করা যাবে। আজ সংখ্যাতত্ত্ব।

কোনও এক মেডিক্যাল কলেজে সে বছর স্নাতকের সংখ্যা ছিল একশো, আর স্নাতকীর সংখ্যা ছিল দশ। এর মধ্যে পাঁচটি ডাক্তার ছেলে ভালবেসে তাদের পাঁচজন সহপাঠিনীকে বিয়ে করেছিল পাস করে বেরনোর পরেই। সে বছর সেই ডাক্তারি কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের সুভেনিরে সম্পাদক রিপোর্ট করেছিলেন, 'আমাদের মেডিক্যাল কলেজের শতকরা পাঁচজন ডাক্তারবাবু শতকরা পঞ্চাশজন ডাক্তার দিদিমণিকে আলোচ্য বছরে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করেছেন।'

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে নিশ্চয়ই এই ডাক্তারি রিপোর্টে কোনও ভুল নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক গোলমেলে! সাধে কী আর সেই বিখ্যাত সাহেব বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন, 'মিথ্যে তিন রকম—'মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে এবং সংখ্যাতত্ত্ব।' সেই সাহেব আমার মতো শূন্য পাওয়ার রাগে ওই কথা বলেননি, সম্ভবত তাঁর রাগের কারণ ছিল অন্য।

'এ সভায় প্রায় আধাআধি লোকই বোকা' এবং 'এ সভায় প্রায় অধিকাংশ লোকই বুদ্ধিমান,' এ দুটি বাক্যের যে একই মানে, সে বুঝি শুধু সাংখ্য বিজ্ঞানেই সম্ভব।

তবুও সংখ্যাতত্ত্বের উপরে কিছু লোকের বড় বেশি ঝোঁক। আমার পরম গুরুদেব স্বর্গত স্টেফান লিকক সাহেব এ নিয়ে চরম রসিকতা করে গেছেন। লিকক সংখ্যাতত্ত্বে প্রচণ্ড উৎসাহী দুই ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা নিয়ে লিখেছিলেন।

ধরা যাক, এই দুই ব্যক্তি আলোচনা করছিলেন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে কিংবা সৌরমণ্ডল নিয়ে। দু'জনেই জানেন এর মধ্যে বড় বড় অঙ্কের ব্যাপার রয়েছে এবং দু'জনেই সব ঘুলিয়ে ফেলেছেন। একজন বলছেন, 'হিসেবটা দেখেছ একবার? আমেরিকায় কত সাইকেল বিক্রি করি আমরা প্রত্যেক বছর? দাঁড়াও বলছি, এই তো কালকেই কাগজে দেখলাম, বহু হাজার, না না হাজার নয়। বেশ কয়েক লক্ষ সাইকেল চালান যায়, সংখ্যাটা ঠিক মনে পড়ছে না তবে বোধ হয় লক্ষ নয়, বেশ কয়েক কোটিই হবে। নাকি কয়েক হাজারই হবে। হাজার হাজার সাইকেল যাচ্ছে আমেরিকায়।'

কিংবা সৌরমণ্ডল, 'দ্যাখো, কালকে একটা চমৎকার হিসেব পড়লাম। একজন মানুষকে যদি কামানের মধ্যে পুরে ছুড়ে দেওয়া যায়, আচ্ছা মানুষ নয়, ধরো একটা বল যদি মনে করো ঘণ্টায় দশ মাইল, না না দশ মাইল নয়, সম্ভবত সেকেন্ডে বারো হাজার তেত্রিশ কিংবা ওই রকম কী একটা কিলোমিটার গতিতে চাঁদের দিকে, সম্ভবত সূর্যের দিকে অথবা মঙ্গলগ্রহের দিকে, মনে হচ্ছে মঙ্গলগ্রহই হবে তাই পড়েছিলাম, চমৎকার বুঝিয়ে লিখেছে, যদি সেই বলটা যেতে থাকে তা হলে এক মাস সতেরো দিন, না সতেরো বছর এক মাস পরে সেই বলটা, হ্যাঁ এইবার যেন মনে পড়ছে, মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পড়তে পারে।'

লিকক সাহেবকে কাণ্ডজ্ঞানে কায়দা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে খুব জট পাকিয়ে ফেললাম। তার চেয়ে সংখ্যাতত্ত্বের সহজ সরল পুরনো গল্পটি যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে আরেক বার বলি।

দিল্লি থেকে ভারত সরকার কোনও কারণে জানতে চেয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা কী রকম। প্রশ্নটির উত্তরের জন্যে টেলিগ্রাম গিয়েছে রাজ্যস্তর থেকে জেলাস্তরে, সেখান থেকে মহকুমায়, সেখান থেকে ব্লকে, সেখান থেকে গ্রামে।

সাধারণত গ্রামের চৌকিদার মশায় এ রকম সংখ্যাতত্ত্ব সরবরাহ করেন। তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোনও এক গ্রামের খবর সংগ্রহ করলেন। ত্রিশটি গোরু, বারোটি মোষ, একুশটি শুয়োর, চল্লিশটি ছাগল, আড়াইশো পাতিহাঁস, চারটি রাজহাঁস, হাজার খানেক মুরগি ইত্যাদি। চৌকিদার মশায়ের ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, তাকে তিনি বললেন, 'এগুলো সব ইংরেজি করে দে।' সে বেচারি অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠভাবে কাউ, বাফালো, সব সেরে শেষে অভিধান মিলিয়ে চারটি রাজহাঁসকে করল ফোর গ্যান্ডারস (Four Ganders)। সে অবশ্য ঠিকই করল। কিন্তু ব্লক অফিসে একজন এই রিপোর্ট দেখে জীবজন্তুর নাম ইংরেজিতে পড়ে ভাবলেন, চৌকিদারটা কী মূর্খ, গণ্ডার ইংরেজি জানে না,

দ্যাখো কী লিখেছে! তিনি ইংরেজি অভিধানে বানান দেখে শুদ্ধ করে লিখে দিলেন, 'ফোর রাইনোসেরাস।'

চল্লিশটি গ্রাম থেকে রাজ্যস্তরে রিপোর্ট এসেছে, তার মধ্যে একটি ওই চারটি গণ্ডার। রাজ্যে চল্লিশ হাজার গ্রাম, পরিসংখ্যান রিপোর্ট গেল সারা রাজ্যে চার হাজার গৃহপালিত গণ্ডার আছে।

অবশ্যই এই রিপোর্টের পর শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। অনেক পর্যটক এলেন এইসব গৃহপালিত গণ্ডারদের দেখতে। তারপর কী হল আমরা জানি না। কারণ এটা নিতান্তই গল্প, এ গল্পের মর্মার্থ হল, বড় হিসেবে ছোট গোলমাল অনেক বর্ধিত আকারে দেখা দিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে দিতে পারে। আবার সব সময় সব জিনিস বোঝানোও যায় না।

যেমন এই উদাহরণটি। কোনও এক বিলিতি শহরে পুলিশকর্তা হিসেব করে দেখালেন, শতকরা দশটি দুর্ঘটনার জন্যে মাতাল ড্রাইভারেরা দায়ি। এই কথা শুনে এক মদ্যপ পুলিশকে জানালেন, 'শতকরা নব্বুইটি দুর্ঘটনা যখন হচ্ছে মদ না-খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্যে, তা হলে মদ না-খেয়ে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিচ্ছ না কেন?'

মাতালের কাণ্ডজ্ঞান

এবার গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা। বহু জায়গা থেকে বহু গল্প চুরি করে সঙ্গে কিছু গোঁজামিল দিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে কাণ্ডজ্ঞান চালাতে হয়। অনেকেই সেটা দেখেও দেখেন না, খেমাঘেন্না করে ছেড়ে দেন।

এইভাবে আমার সাহস বেড়ে গেছে। এইবার দেশ পত্রিকার খোদ সম্পাদক মহোদয়ের গল্প দিয়েই শুরু করব। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের বলা এই গল্পটি অনেকেই অনেক জায়গায় বিভিন্ন ভাষ্যে শুনেছেন, 'সম্পাদকের বৈঠকে' বইতে গল্পটি তিনি চমৎকার রসালো ভাবে লিখেও রেখেছেন। তবুও কাণ্ডজ্ঞানের জন্যে গল্পটি আমি সংক্ষিপ্ত করে আবার এখানে লিখছি।

দু'জন মাতাল অনেক রাতে মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে ঠিক মধ্যিখানটায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিশ এসে তাঁদের অনুরোধ করছে যাতে এ ভাবে দু'জনে ধরাধরি করে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে যে যার বাড়িতে চলে যান। কিন্তু পরস্পরকে ছেড়ে তাঁরা যেতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন, 'United we stand, divided we fall.' অর্থাৎ দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে এই অবস্থায় আছেন বলেই দাঁড়িয়ে আছেন, যে মুহূর্তে দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাবেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবেন।

এ গল্প মাতালের বাড়ি না-ফেরা নিয়ে। মাতালের বাড়ি ফেরা নিয়ে চমৎকার গল্প আছে সৈয়দ মুজতবা আলির। একজন মাতাল গভীর রাতে বাড়ি ফিরে বাবাকে ডাকছে বাবা বাবা বলে নয়; বাবার নাম হরিপদ, ডাকছে, 'হরিপদবাবু, ও হরিপদবাবু, দরজা খুলুন।' বাবা তো রেগে আগুন, 'কী, আমার নাম ধরে ডাকা? মাতলামির জায়গা পাওনি!' মাতাল ছেলে তখন বাবাকে বোঝায়, 'আমি যদি নেশা করে এসে আপনাকে বাবা বাবা বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকি, পাড়ার লোকেরা জানবে আপনার ছেলে মাতাল। তাতে কি আপনার সম্মান থাকবে! তার চেয়ে আমি যদি আপনাকে

হরিপদবাবু বলে ডাকি, লোকে ভাববে আপনার কোনও ইয়ার-বন্ধু নেশা করে এসে আপনাকে ডাকছে। কত লোকেরই তো ইয়ার-বন্ধু মাতাল থাকে, তাতে আপনার কোনও মানহানি হবে না।' অকাট্য যুক্তি, অতঃপর পিতৃদেব কী করেছিলেন আমাদের জানা নেই।

(শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের এবং সৈয়দ মুজতবা আলির গল্প দুটি মনে আছে, কিন্তু হাতের কাছে বই দুটি নেই। গল্প দুটি বোধহয় আরও মজার। স্মৃতি আমাকে কিঞ্চিৎ প্রতারণা করল বলে মনে হচ্ছে, ত্রুটি মার্জনীয়।)

মদ্যপ সম্পর্কে একমাত্র বিয়োগান্ত গল্পটি শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর। মাতাল ও মদ খাওয়া নিয়ে সব গল্পই ওই উত্তেজক পানীয়টির মতোই তরল। কিন্তু হিমানীশবাবুর গল্পটি বড়ই করুণ।

গল্পটি অযোধ্যা সিং নামে এক মদ্যপ যুবককে নিয়ে। সে অত্যন্ত বেশি মদ খেত। একদিন পর পর কয়েক বোতল রাম দুয়েক ঘণ্টার মধ্যে গলাধঃকরণ করল অযোধ্যা সিং। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তখন অযোধ্যা সিং-এর আত্মীয়বন্ধুরা অযোধ্যার শেষকৃত্যের সময় সে যে রামের বোতলগুলি খেয়েছিল এবং যেগুলিতে তখনও রাম ছিল সেগুলো অযোধ্যা সিং-এর চিতায় রাগ করে তুলে দেয়।

হিমানীশের এই গল্প শুনে অনেকে বিশেষ রকম আপত্তি করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, 'মদ অতিরিক্ত খেলে শরীর খারাপ হতে পারে, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, অনেক দিন ধরে খেলে গুরুতর অসুখে ভুগে মরে যেতে পারে, কিন্তু বেশি মদ পান করে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, এ অতি অসম্ভব কথা।' এবার হিমানীশ করুণ মুখে বলেছিলেন, 'দেখুন, সব শুনলেন তো, ওই অযোধ্যা সিং-এর সঙ্গে রামের বোতলগুলোও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন যদি কিছু আমাকে প্রমাণ করতে বলেন, সে আমি পারব না। পারলে বিশ্বাস করুন, না পারলে বিশ্বাস করবেন না।'

মাতাল সম্পর্কে সবই শোনা গল্প বলছি। আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লেখা অতি বিপজ্জনক। আমার এই লেখা পড়ে তাঁরা যদি কেউ বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তারপর বেশি নেশা করেন, তারপর আমার খোঁজ করেন, সেই সমাগম খুব মধুর না হতেও পারে।

তার চেয়ে অমল কৈশোরের কথা বলি। কলকাতার থেকে অনেক দূরে যে ছোট শহরে আমরা বড় হয়েছি, সেখানে মদ খাওয়া খুব চালু বা জনপ্রিয় ছিল না। মাত্র একটি কি দুটি স্থানীয় মাতাল ছিলেন, শহরসুদ্ধ লোক তাঁদের চিনত, তাঁদের খ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে এমনকী সাত-সকালে যখন তাঁরা হয়তো বিশুদ্ধ, নির্মদ চিত্তে বাজারের থলে হাতে যাচ্ছেন, তখনও আমাদের মতো অল্পবয়স্করা তাঁদের হঠাৎ দেখলে, 'মাতাল-মাতাল' চিৎকার করে ভয়ে দৌড়ে পালাতাম। তাঁরা যে খুব ক্ষতিকর ছিলেন, বিপজ্জনক বা মারকুটে ছিলেন—তা কিছু মনে হয় না। শহরের সাধারণ লোকে একদিকে তাঁদের মাতাল বলে সমীহ করতেন, অন্যদিকে একটু রোমান্টিকভাবেও দেখতেন। আসলে সেটা ছিল দেবদাস-পার্বতীর যুগ, নবীন বাংলার প্রমথেশ-পর্ব। তাই যে কোনও ভদ্রলোক মাতালকেই অহেতুক গৌরবান্বিত করে বলা হত, 'ম্যাট্রিকে গোল্ড মেডাল পেয়েছিল, বাবা-মা লাভ ম্যারেজ করতে দিল না, এখন মদ খেয়ে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে,' অথবা 'মদ খাওয়া আরম্ভ করার আগে কী চেহারা ছিল নিখিলের, একেবারে রাজপুত্রের মতো। আর সব সময় ফটফট করে সাহেবদের মতো ইংরেজির খই ফুটত মুখে।'

সেই সব সুপুরুষ, সুপণ্ডিত, ভগ্নহৃদয়, ব্যর্থ-প্রেমিক মাতালদের আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। আজকালকার অধিকাংশ মদ্যপ পেঁচি, ধান্দাবাজ এবং অত্যন্ত গোলমেলে। অবশ্য দু'-একজন ফুর্তিবাজ মাতালও আছেন।

হাওড়া স্টেশনে একটা ওজনের যন্ত্র আছে, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বন্ধুর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ভাবলাম ওজনটা নিয়ে নিই। ওজনের যন্ত্রটায় হেলান দিয়ে গিলেকরা পাঞ্জাবি ও তাঁতের ধুতি পরা এক ঈষৎ মত্ত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। আমি পকেট

থেকে দুটো দশ পয়সা বের করে যন্ত্রটির দিকে এগুতেই ভদ্রলোক একটু আলগা হয়ে সরে দাঁড়ালেন। যন্ত্রটা নিশ্চয় খারাপ ছিল, আমার কুড়ি পয়সা গলাধঃকরণ করে খটখট শব্দসহ যে কার্ডটি বেরিয়ে এল তাতে আমার ওজন উঠেছে মাত্র পনেরো কেজি। আমার বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী মত্ত ভদ্রলোক কার্ডটির দিকে ভাল করে দেখে হঠাৎ আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'দাদা একদম ফাঁপা।'

এ তো তবু রেল স্টেশনের কথা। একবার এক পার্টিতে দেখেছিলাম এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড হইহুল্লোড়, নাচ-গান করছেন, তাঁর স্ত্রী একটু রক্ষণশীলা, তিনিও উপস্থিত, তবে স্বামীর আচরণে রীতিমতো বিব্রতা। তিনি একা একা বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী বেচারির হুঁশ হয়েছে, পার্টিও ভেঙে এসেছে, স্বামী টলতে টলতে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের পক্ষে যতটা অনুতপ্ত হওয়া যায় সেই রকম গলায় স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, 'চলো, বাড়ি যাই।' পত্নীদেবী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'না।' মাতাল তখন হাতজোড় করে বললেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি অনেকটা আমার স্ত্রীর মতো দেখতে, তাই ভুল করেছিলাম, ক্ষমা করবেন।' স্ত্রী এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন, 'বদমাইস, মাতাল, সব জায়গায় আমার মুখে কালি দিচ্ছ। তোমার মুখ শিল-নোড়া দিয়ে থেতলে দিলে আমার মনে শান্তি হবে।' হতভাগ্য মদ্যপ আরও সংকুচিত হয়ে গেলেন, করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, আমার দোষ নেবেন না। আপনি যে শুধু আমার স্ত্রীর মতো দেখতে তাই নয়, আপনার কথাবার্তাও হুবহু আমার স্ত্রীর মতো।'

মাতালের গল্পের শেষ নেই। বত্রিশ পুতুল, চল্লিশ চোর কিংবা সহস্র এক আরব্য রজনীর চেয়েও দীর্ঘ সেই কথামালা। এই ধূলিমলিন, পাই পয়সা, শাকচচ্চড়ির গোমড়ামুখ পৃথিবীতে এখনও দু'-একটি মজার গল্প মাতালেরাই রচনা করেন। তাঁরা আমাদের নমস্য, তবে দূর থেকে।

নমস্কার করার আগে শেষ গল্পটা আমি বলি। এ গল্পটা আমি দু'ভাবে শুনেছি। এক, মদের দোকানে দু'জন অনেকক্ষণ ধরে মদ খাচ্ছে, শেষে একজন আরেকজনকে বলল, 'এই তুই আর মদ খাসনে, তোকে কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।' দুই নম্বর গল্প, পার্টিতে এক মহিলার পদপ্রান্তে এসে বসলেন এক মাতাল, তারপর মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, মদ খেলে আপনাকে বড় সুন্দরী দেখায়।' ভদ্রমহিলা লেমনেড খাচ্ছিলেন, বললেন, 'কিন্তু আমি তো মদ খাচ্ছি না।' ভদ্রলোক সংশোধন করে বললেন, 'না না, আপনার কথা নয়, আমি তো মদ খাচ্ছি!'

ভূতের কাণ্ডজ্ঞান

ভাগ্য এবং জীবিকাসূত্রে আজ বছরখানেক হল আমি একটি রহস্যময় বাড়িতে বসবাস করছি, বাড়ি না বলে বলা উচিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। গভীর নিশীথে এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে নূপুরের নিক্বণ, রূপসীর ক্রন্দনধ্বনি, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। কখনও বালুবেলায় উদ্দাম ঢেউয়ের মতো দূরে কোথাও থেকে উন্মাদের অট্টহাসি এ-বাড়ির দেয়ালে আছড়িয়ে পড়ে।

আমার একতলায় থাকেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রকৃতই ডাক্তার, চিকিৎসা বিদ্যার ডাক্তার, অ্যানেসথেসিয়া অর্থাৎ অবেদনের অধ্যাপক, রীতিমতো বিজ্ঞানবাদী। তিনি হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন, 'মশায়, একটা খোঁজ নেবেন তো এ-বাড়িতে কখনও কেউ খুন-টুন হয়েছিল কি না, কেউ আত্মহত্যা করেছিল কি না?'

একটু আগে লোডশেডিং হয়েছিল, তাই দু'জনেই বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠটায় বসেছিলাম। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে জরাজীর্ণ, অন্ধকার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন ছমছম করে উঠল। এ রকম দু'-একটা বাড়ি শহরতলির বা পুরনো গ্রামগঞ্জের একান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু একেবারে মহানগরের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে, কী রকম যেন অস্বাভাবিক, কী রকম যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। অনেক সময় কাঠের সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাই, আলগা কথাবার্তা। দরজা খুললে কিন্তু কাউকে নামতে অথবা উঠতে দেখি না। ভয় হয়, গরিব মানুষ, বড় বাড়িতে থাকার লোভে শেষে সবংশে নিধন না হই।

প্রথম প্রথম ভূতের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করেছিলাম। বাথরুমের একটা সাবানে ভূত প্রতিদিন রাতে, সে যে এসেছিল সেটা জানাত, নখের আঁচড় রেখে যেত। একদিন ধরে ফেললাম ভূত মহোদয়কে, ছুঁচোর ছদ্মবেশে এসে দৈনিক রাতে সাবানটাকে দাঁত দিয়ে কাটে। বাথরুমের দরজা খুলে কুকুরটাকে দু'দিন বাথরুমের সামনে রাখলুম। ভূত এল না। ছাদের ওপরের ট্যাঙ্ক চুঁইয়ে জল দোতলার জানলায় একটা ভাঙা কাচের শার্সির ওপরে পড়ে, পাশের ঘর থেকে অন্ধকার রাতে মনে হয় নূপুর বাজছে, সেটাও আবিষ্কার করলাম।

এই রকম দু'-চারটে ধরে ফেললাম। কিন্তু ভয় এখনও কাটেনি। আমার সাহস এখন খুব কম। ভূত বিশ্বাস করি না কিন্তু ভয় পাই। ভূতের ব্যাপারে সাহসের ব্যাপারে আমার বন্ধু চৌধুরী সাহেবের গল্পটা বলি।

চৌধুরী সাহেব গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে, উঠেছিলেন মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে সারকিট হাউসে। এটা সেই পুরনো সারকিট হাউস। এর সংলগ্ন পেছনের জমিতে আজকাল নতুন সারকিট হাউস হয়েছে, সেটা আলাদা। কিন্তু এই বহু পুরনো সারকিট হাউসটি, এর আশেপাশের সরকারি আবাসগুলি, এমনকী জেলাশাসকের বাড়িটি পর্যন্ত ভৌতিক সম্পদের জন্য বিখ্যাত।

এখানকার প্রধান বিশেষত্ব হল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম এবং রাইটার্স বিলডিংস আর দার্জিলিং-এ একটা পোড়ো বাড়ি বাদ দিলে সারা পশ্চিমবঙ্গে শুধু এখানেই এখনও সাহেব ভূত আছে।

এইখানে ভূতেদের বিষয়ে দু'-একটা কথা লিখে রাখি। সম্প্রতি প্রাণের দায়ে বিষয়টি আমি অধ্যয়ন করেছি। নানা রকম, নানা জাতের ভূত আছে। সাধারণ হিন্দু ভূত-পেত্নী ছাড়াও, অপঘাতে

মৃত ব্রাহ্মণ ভূত রয়েছে। তারা হল ভূত সমাজের শিরোমণি, তাদের বলা হয় ব্রহ্মদৈত্য, হিন্দিতে বলে বরমপিশাচ। মুসলমান ভূত হল মামদো, শব্দটা মহামেডানের অপভ্রংশ। সাহেব ভূত হল স্পুক, মেমসাহেব পেত্নী হল পিক্সি।

আজকাল ভূত-পেত্নী এমনিই খুব কমে গেছে। স্পুক বা পিক্সি তো দেখাই যায় না। যা হোক, এই রকম একটি স্পুক এখনও বহরমপুরের পুরনো সারকিট হাউসে আছে। কেউ বলে ইনি স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব, কেউ বলে ওয়ারেন হেস্টিংস। আবার কারও ধারণা, ইনি ফাদার জিন নামে এক প্রাচীন পাদরি, অন্যদের ধারণা এক নীলকর সাহেব, যে দেড়শো বছর আগে এ-বাড়িতে খুন হয়েছিল।

সে যা হোক, সাহেব ভূতরা খুব খারাপ হয় না। তারা কোটপ্যান্ট পরে নিরিবিলিতে থাকতেই ভালবাসে, তাদের দেখলে, শুধু 'হ্যালো, মিস্টার স্পুক' বললেই তারা খুশি।

বহরমপুরের পুরনো সারকিট হাউসের একটি ঘরে চৌধুরী সাহেবের ঘুম ভাঙল এক রাতে। আলোর সুইচটা বিছানা থেকে অনেক দূরে, চৌধুরী সাহেব বাথরুমে যাওয়ার জন্যে উঠলেন। ঘরটা ভাল চেনা নয়, আজকেই এসেছেন। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম রয়েছে কিন্তু তিনি অন্ধকারের মধ্যে বাথরুমের দরজা ভুল করে ভিতরে হলঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। উপরে স্কাইলাইট থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চৌধুরী সাহেব দেখতে পেলেন, হলঘরে সোফার মধ্যে অন্ধকারে বিলিতি পোশাক পরা কে একজন বসে রয়েছে। চৌধুরী সাহেবের বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হল না, সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'হ্যালো, মিস্টার স্পুক।' ছায়ামূর্তিটা ঘাড় দোলাল, চৌধুরী সাহেব বিনীতভাবে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার স্পুক, আপনি তো পুরনো বাসিন্দা, দু'-একশো বছর এ-বাড়িতে হয়ে গেল। আমাকে একটু দয়া করে বলে দেবেন বাথরুমটা কোন দিকে!' মিস্টার স্পুক কিন্তু সহজ বাংলায় বললেন, 'ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে।'

চৌধুরী সাহেবের এই বৃত্তান্ত শুনে আমি বলেছিলাম, 'বস্তুটি সাহেব ভূত না হয়ে জ্যান্ত বাঙালিও তো হতে পারে? হয়তো ঘর খালি পায়নি, তাই হলঘরে রাত কাটাচ্ছিল।' চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, 'পাগল নাকি মশায়! একে বহরমপুর সারকিট হাউস, অন্ধকার মধ্য রাত, কোটপ্যান্ট পরে চুপচাপ বসে আছে, সাহেব ভূত না হয়ে যায়?'

এতটা লিখে, এখন এই রাত বারোটায় কেমন যেন মনে হচ্ছে, ভূতের ব্যাপারটা কাণ্ডজ্ঞানে টেনে আনা সংগত হয়নি। আমার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া, বাঙালি পাঠক ভূতের বিষয়ে মজার কথা অনেকদিন ধরেই শুনছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূত চিপে তেল বের করেছিলেন। পরশুরামের 'ভূশণ্ডির মাঠে' কিংবা 'মহেশের মহাযাত্রা' অন্তত দশবার করে পড়েনি এমন পাঠক আছে কি? আর সেই জটাধর বক্সী, দিল্লির গোল মার্কেটের ক্যালকাটা টি ক্যাবিনে সেই বহিরাগত, সে কি জোচ্চোর না ভূত?

শিবরাম চক্রবর্তীরও কোনও তুলনা নেই। দার্জিলিং-এ জলাপাহাড়ে বড় ভূতের উপদ্রব, আগের বারে মনুষ্যবেশী ভূত যে ব্যক্তিটিকে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরেছিল, সে সেই জায়গাতেই এবারেও বসে আছে, তবে এখন সে নিজেও ভূত। কিন্তু পুরনো ভূত তা বুঝতে পারেনি, তাকে এবারও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে নতুন ভূতের অশরীরী দেহের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে পুরনো ভূত নিজেই খাদে পড়ে গেল।

আর শেষতম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সরল, অমায়িক, শিশুকে ভূতেরা শীর্ষেন্দুর পোষমানা। শীর্ষেন্দু সামান্য স্মরণ করলেই তারা তাদের সূক্ষ্মদেহ শীর্ষেন্দুর কলমের নিবের ফাঁকে গলিয়ে দেয়।

সুতরাং ভূতের কাণ্ডজ্ঞানে প্রয়োজন নেই। তবে শেষ করার আগে ভূত সম্পর্কে আমার নিজের একটা সাহসের গল্প বলি।

গল্পটা পনেরো বছর আগেকার। তখন আমি এত কাপুরুষ ছিলাম না। তখন আমাদের পুরনো পণ্ডিতিয়া পাড়ার সন্ধ্যা সঙ্ঘ ক্লাবের গৃহনির্মাণ তহবিলে টাকা তোলা হচ্ছে। যদিও এ কাজে আমি

খুব পটু নই, আমার উপরে পড়েছিল একশো টাকা চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব। টাকা-পয়সা কিছু আদায় করতে পারিনি কিন্তু চাঁদার বইটা আমি সব সময় পকেটে রাখতাম।

ওই সময় একটা কাজে একটু পাটনা গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম একটা ধর্মশালায়। এক বন্ধুর বোনের পাটনায় বিয়ে হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, ধর্মশালার নাম শুনে সে বলল, 'ও তারাপদদা, ওখানে থাকবেন না, ওখানে ভীষণ ভূতের উৎপাত।'

সত্যি রাতে ভূত এল। বিছানায় ঘুমিয়ে আছি ধর্মশালায়, হঠাৎ কীসের শব্দে ঘুম ভাঙতে দেখি মশারির বাইরে ছায়া-ছায়া কী যেন হাত বাড়িয়ে আমার বালিশের নীচে কী খুঁজছে। বাধ্য হয়ে জানতে ইচ্ছে হল, 'ভূত নাকি?' বালিশের নীচে হাতটি শক্ত হল, মুখ দিয়ে চন্দ্রবিন্দু লাঞ্ছিত দুটি শব্দ বেরল, 'হাঁ ভূত।' বালিশের নীচ থেকে ম্যানিব্যাগ, টর্চ ও হাতঘড়িটা বার করে নিলাম। এক পাশে ছিল সন্ধ্যা সঙ্ঘের চাঁদার খাতাটা, সেটা ভূতের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'ভূতজি, এ-ঘরে আরও অনেক লোক শুয়ে আছে। আপনি নিশ্চয় তাদের কাছেও যাবেন। দেখবেন তো আমাদের ক্লাবের গৃহনির্মাণ ফান্ডে কিছু আদায় করা যায় কি না। বড় ফ্যাসাদে আছি, একশোটা টাকা তুলতেই হবে।' তারপর মানিব্যাগ, ঘড়ি ইত্যাদি বালিশের খোলের মধ্যে ভরে সেটাকে শক্ত করে জাপটে আবার ঘুম দিলাম।

ভূতজি আমার বাংলা বুঝতে পেরেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন তার প্রমাণ, পরদিন ভোরে ধর্মশালার উঠোনে দেখলাম চাঁদার খাতাটি তিনি রেগে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রেখেছেন।

বানরের কাণ্ডজ্ঞান

এক সার্কাসের দলে একটা বানরের বাচ্চা চমৎকার সব খেলা দেখাচ্ছিল, এই একটা বিরাট কুকুরের পিঠে চড়ে মুখে লাগাম টেনে কুকুরটাকে ঘোড়ার মতো চালাচ্ছে, আবার আগুনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ট্রাপিজের লোহার রিংয়ের মধ্য দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বানর বালকের ক্রীড়াকৌশল দেখছিল। এমন সময় কোথা থেকে একটা বেরসিক গোদা বানর অতর্কিতে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে এসে বাচ্চা বানরটাকে কানে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। দর্শকবৃন্দ এই অভাবিত দৃশ্য দেখে মহা হইচই বাধিয়ে দিলেন। তখন সার্কাসের ম্যানেজার সাহেব হাত জোড় করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখুন মশাইরা, এ ব্যাপারে আমার কিংবা আমার কোম্পানির কোনও দোষ নেই। ওই যে ছোট বানরটা খেলা দেখাচ্ছিল, বড় বানরটা হল তার বাবা। বাবার ইচ্ছে নয় যে ছেলে সার্কাসে খেলা দেখায়, এতে নাকি তার সম্মানহানি হয়। তাই ছেলেকে কানে ধরে নিয়ে চলে গেল। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। বাপ না চাইলে কি আমরা নাবালক ছেলেকে দিয়ে খেলা দেখাতে পারি? বলুন, আপনারাই বলুন।'

বানর নিয়ে ভালই আরম্ভ করেছিলাম আজকের কাণ্ডজ্ঞান। সহসা আমার বাঙাল কর্ণকুহরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু করেছে, বানর না বাঁদর?

যতদূর মনে পড়ছে ছোটবেলায় রামায়ণে পড়েছিলাম,

> ছোট ছোট বানরের
>   বড় বড় পেট।
> পার হইতে লঙ্কা
>   মাথা হইল হেঁট ॥

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ আঁতিপাঁতি করে খুঁজে 'বানর' শব্দটি কয়েক সহস্রবার পেয়ে গেলাম, এই পঙ্‌ক্তি দুটি কোথাও পেলাম না। পঙ্‌ক্তি দুটি কোথায় গেল? হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? নাকি অন্য কোথাও আছে?

বরং কবি মনীশ ঘটকের সেই খ্যাতনাম্নী কুড়ানি বাঙালিনীকে অনেক সহজে হাতের কাছে পেয়ে গেলুম—

> গলিতাশ্রু, হাস্যমুখী, কহে হাত ধরি,
> 'তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী।'

দুটি বিখ্যাত বাংলা অভিধান খুলে দেখলাম, বানর মানে বাঁদর, এবং বাঁদর মানে বানর। সংস্কৃত বানর শব্দটি বাংলায় বাঁদর হয়ে গেছে, ব্যাকরণের ভাষায় তৎসম থেকে তদ্ভব। তারপর বাঁদর থেকে বাঁদুরে, বাঁদরামি। এইখানে প্রসঙ্গ সূত্রে একটা ছোট জিনিস লিখে রাখা ভাল। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় বাঁদর নেই, আছে বানর, বান্দর, বান্দরামি।

এ অবশ্য আমার বিষয় নয়। তবু সপ্তাহান্তে সাতশো শব্দ লিখতে গিয়ে এমন সমস্ত শব্দের মুখোমুখি হই, যার ব্যবহার জানি কিন্তু ব্যবহার করা উচিত কি-না জানি না। আশা করি শিক্ষিত ভদ্রজন দোষ নেবেন না, কখনও কদাচিৎ আমার এই বিপথগামিতায়।

ভো সাধারণ পাঠক, হে তরলমতি পাঠিকা, আসুন আমরা হাস্যকর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। প্রসঙ্গটি সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের কাহিনীর কাছাকাছি।

সুন্দরবনের একটি তরুণ বাঘ খাদ্যের অভাবে এবং যৌবনের উত্তেজনায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলে শিকার করে খাওয়া তার পোষাচ্ছে না। তা ছাড়া তার হইহল্লা, লোকজন, মেলা-সভার এই সব খুব পছন্দ। আর একটা চাকরিও তার দরকার, কতকাল আর বিদ্যাধরীর খালে কাঁকড়াই খেয়ে কাটাবে। মা-বাবাও বুড়ো হয়েছে, তাদের সামর্থ্য নেই বড় বড় জন্তু মেরে এনে খাওয়াবে. সুন্দরবনে বড় জন্তুই বা কোথায়? গৃহস্থ বা গৃহস্থের গোরু-ছাগল ধরে খাওয়া যায়, কিন্তু সে বড় বিপজ্জনক পেশা।

সুতরাং আমাদের এই তরুণ বাঘটি অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থির করল যে একটা চাকরি তার জোগাড় করতে হবে। নামখানায় এক বড় সার্কাসের দল এসেছে, সে দলে অনেক বাঘ-সিংহ, হাতি-ঘোড়া, কুকুর-বানর। একদিন রাতে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তরুণ বাঘটি হঠাৎ বহু দূর থেকে সার্কাসের আলো দেখে কৌতূহলবশত এগিয়ে এসে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। ম্যানেজার সাহেব তখন ঘরে বসে কাজ করছিলেন, বাঘটি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। সার্কাসের ম্যানেজার, সারা জীবন হিংস্র জীবজন্তু নিয়ে তাঁর কারবার। নতুন বাঘ দেখে তিনি খুব খুশি এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই?' বাঘটি নিবেদন করল, সে সার্কাসে একটি কাজ চায়। অনেক রকম লাফ-ঝাঁপ, ডিগবাজি-গর্জন করে সে তার যোগ্যতা প্রমাণ করার অশেষ চেষ্টা করে।

কিন্তু ম্যানেজারবাবু তাকে কাজ দিলেন না। বললেন, 'আমার এখানে কোনও বাঘের কাজ খালি

নেই। এ সার্কাসে চারটে পুরনো বাঘ আছে। তোমাকে নিলে তাদের একজনকে ছাড়াতে হবে। তারা অনেক দিন আছে, এই বুড়ো বয়েসে যাবে কোথায়?'

ম্যানেজারবাবু অবশ্য নির্দয় নন। তরুণ বাঘটিকে পরামর্শ দিলেন, নদী পার হয়ে সামনের বাসরাস্তা বরাবর সোজা উত্তরে গেলে এক রাতে কলকাতা চিড়িয়াখানায় পৌঁছে যাবে। সেখানে এলাহি ব্যাপার, বহু জন্তু, বহু খাঁচা, বহু বাঘ। গিয়ে একটু কাঁদাকাটি করো, তোমার যা হোক একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

উপদেশ মতো বাঘটি একদিন সাতসকালে কলকাতা চিড়িয়াখানায় এসে পৌঁছাল। কিন্তু, দুঃখের কথা, সেখানেও কোনও কাজ খালি নেই। শার্দুল যুবকটি অনেক রকম অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করল কিন্তু বাঘের সমস্ত খাঁচাই ভর্তি। এমনকী একেকটা খাঁচায় একাধিক বাঘ রাখতে হয়েছে, কোনও জায়গাই খালি নেই। শেষে বাঘটি যখন বলল, 'ঠিক আছে, সৎভাবে যখন হল না, এখন থেকে আমি মানুষ মেরে খাব,' তখন কর্তৃপক্ষ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন, বললেন, 'আচ্ছা ওই এক পাশে একটা ছোট খাঁচা আপাতত খালি আছে, তুমি ওর মধ্যে থাকো।'

বাঘ খাঁচার মধ্যে ঢুকল। দর্শকেরা নতুন বাঘ দেখে খুব খুশি। বাঘ বেচারিও নতুন কাজের আনন্দে হম্বিতম্বি, তর্জন গর্জন করে দর্শকদের অতিশয় মনোরঞ্জন করল। সন্ধ্যাবেলা কিন্তু যখন অন্যান্য পুরনো বাঘদের দেওয়া হল বড় বড় মাংসের খণ্ড, এই নতুন বাঘটিকে দেওয়া হল দুটো কলা আর এক মুঠো ছোলা। এই বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাল বাঘটি, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম এবং জনতার সুপ্রশংসার পরে এই খোরাকি! সে গর্জে উঠল। কর্তৃপক্ষ বললেন, 'রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, বাঘের খাঁচা খালি নেই। তোমাকে বানরের খাঁচায় রাখা হয়েছে, বানরের খাবারই তোমার ন্যায্য বরাদ্দ।'

সেই বাঘটি এর পরে কী করেছিল তার কোনও খবর নেই। কিন্তু বানরেরা শুনেছি একটা বাঘকে তাদের খাঁচায় রাখার প্রতিবাদে একদিন হরতাল করেছিল।

বানরদের মনের জোর সত্যিই খুব বেশি। সেই বিখ্যাত তিন বানরের ছবি বা মূর্তি সবাই দেখেছে। তাদের মধ্যে একজন হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে—সে কোনও খারাপ দৃশ্য দেখবে না; একজন দু'হাত দিয়ে দু'কান চাপা দিয়েছে—কোনও কুবাক্য শুনবে না; আর তৃতীয় বানরটি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে—সে কিছুতেই কোনও খারাপ কথা বলবে না।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু, ধীমান পাঠক, যদি আপনার হাতের কাছে ওই ছবি বা মূর্তি একটি থাকে দয়া করে আরেকবার ভাল করে তাকিয়ে দেখুন।

ওই যে প্রথমটি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে, তার কিন্তু হাতের আঙুলের মধ্যে মধ্যে একটু ফাঁক আছে। সেই ফাঁক দিয়ে সে কিছু দেখছে না এমন কথা হলফ করে আপনি বলতে পারবেন না।

আর দ্বিতীয়টি, সে হাত দিয়ে কান ঢাকা দিয়েছে কিন্তু হাতের তালুর ফাঁক দিয়ে মনে হচ্ছে সে সব কিছুই শুনছে। শুনতে পাচ্ছে না এটা তার ভান মাত্র।

সর্বশেষ, পিছনের ওই হাত দিয়ে মুখ চাপা দেওয়া বানরটি, হ্যাঁ, একথা ঠিক সে কিছুই বলছে না। কিন্তু একবার তার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, সে কিন্তু অনেক কিছুই ভাবছে, আর কখনও কখনও কোনও কথা বলার চেয়ে কোনও কিছু ভাবাও কম খারাপ নয়, আপনারাই ভেবে বলুন।

কিঙ্কর-কিঙ্করী

নতুন কাজের মেয়েটি একটু দায়সারা ভাবে ঘর মুছছিল। তাই দেখে গৃহিণী তাকে বললেন, একটু ভাল করে, যত্ন নিয়ে ঘরের মেঝেটা মুছতে। নবনিযুক্তা পরিচারিকাটি এই কথা শুনে গালে হাত দিয়ে চোখ গোলগোল করে বলল, 'অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না গো, বউদি!'

পরিচারিকার এই জবাবে গৃহিণী রীতিমতো বিব্রত বোধ করলেন। ঘর মোছার মধ্যে সুলক্ষণ-অলক্ষণ কী আছে?

বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। মেঝে মোছা থামিয়ে পরিচারিকাটি নিজেই ব্যাখ্যা দিল, 'আগের বাড়ির বউদি ঠিক এই রকম বলত, তাদের মেজে মুছে মুছে এমন পিছলে হয়ে গিয়েছিল যে দাদাবাবু পা হড়কে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে আজ চার মাস হাসপাতালে।'

স্বীকার করা উচিত যে, এই পরিচারিকাটি ভালভাবে ঘর না মোছার যে অব্যর্থ অজুহাত দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। হয় সে খুব বুদ্ধিমতী, না হয় খুবই সরল।

পরিচালিকাদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা একটু অন্যরকম ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই বা কেন, সেই রামায়ণের মন্থরা থেকে সাহিত্যে কিঙ্করী-কীর্তন শুরু হয়েছে। দেশি-বিদেশি মহাকাব্য-নাটকে, গল্প-উপন্যাসে কিঙ্কর-কিঙ্করীর ভূমিকা কিছু কম নয়। বড়লোক দেশগুলিতে আজকাল অবশ্য উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিও ঝি বা চাকর রাখতে পারে না। আমাদের মতো দেশে ভৃত্যতন্ত্র এখনও চমৎকার চলছে, এবং আমাদের জীবনে তার ভূমিকা কিছু কম নয়। সকালে উঠে কাজের লোক ঠিকমতো না এলে, চিৎকার-চেঁচামেচি-হইচই, একটা সাধারণ পরিবারের চেহারা বদলিয়ে দেয়।

ঠিকে কাজের মেয়েটি এসে গেলেও খুব সুখকর নয়। অনেক সময়ই সে খুব মুখরা ও কলহপরায়ণা। তার চেয়েও বিপদ, সে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছিলাম, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন:

'সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরানি নাই তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরানি নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্তা। বিশেষ, যাহার অনেকগুলি চাকরানি, তাহার বাড়িতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, নিত্য রাবণবধ।'

বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি নিজেও দু'-একটি মারাত্মক নমুনা দেখেছি।

একদিন সকালবেলায় দেখেছিলাম মনোহরপুকুর রোডে। গৃহস্থ বাজার করে ফিরছেন, প্রাক্তন (সম্প্রতি সদ্য ত্যক্ত) পরিচারিকা পথের ওপরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। দৃষ্টিপথে আসামাত্র, ভয়ংকরী ভীমরূপা মহিলাটি চিল যেভাবে ইঁদুরছানা ধরে সেইভাবে কিংবা তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ক্ষীণপ্রাণ, শীর্ণতনু তার পুরনো মনিবের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনিব ভদ্রলোক একবারমাত্র কোঁক করার সুযোগ পেলেন, তাঁর শার্টের কলার ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পরিচারিকাটি কোনও অনির্দিষ্ট লক্ষে তাঁকে নিয়ে চলল। ভদ্রলোকের হাত থেকে তাঁর বাজারের থলে মাটিতে পড়ে গেল। ভদ্রলোক সেদিন কয়েকটা তাজা ছোট ছোট কই মাছ কিনেছিলেন, খোলা থলে থেকে সেই চঞ্চল মাছগুলি বেরিয়ে ফুটপাথের উপর লাফাতে লাগল।

আমার স্মৃতিতে এই দৃশ্যটি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমি হরিণঘাটার দুধ নিয়ে বাড়িতে

ফিরছিলাম, হাতের বোতলের দুধ জমে দই হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু এ রকম তো আমারও হতে পারত। ভাবলে রীতিমতো হৃৎকম্প হয়।

অবশ্য আমাকে এখনও ব্যক্তিগতভাবে আমার গৃহভৃত্য বা পরিচারিকার হাতে নিগৃহীত হতে হয়নি। তবে বছর দুয়েক আগে আমার দূর সম্পর্কের এক শালার বউয়ের মাথায় রান্নার ঠাকুর আঘাত করায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পাচকটির কোনও চুরি বা ডাকাতি করার উদ্দেশ্য ছিল না। গৃহিণী সকাল থেকে খিচখিচ করছিলেন, পাচক নিঃশব্দে রান্না করে যাচ্ছিল, হঠাৎ শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ভাতের হাতা দিয়ে মনিবানীর মাথায় একটি আঘাত করে উধাও হয়ে যায়। বাসায় তখন আর কেউ ছিল না। ঠাকুরটি সদর দরজা ভেজিয়ে রেখে মোড়ের মাথায় ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে যায়, 'বারো নম্বর বাড়ির বউদির শরীরটা ভাল নেই। আপনাকে এখনই একবার ডেকেছে।' সেদিন ডাক্তার এসে শূন্য গৃহে ওই শালাজকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখেন, অবশেষে পাড়াপ্রতিবেশী ডেকে, সেবা-শুশ্রূষা করে, ওষুধ দিয়ে মহিলার জ্ঞান ফেরানো হয়। পাচকটি কিন্তু আর আসেনি, তার আর খোঁজ পাওয়াই যায়নি।

আমার সেই মিষ্টভাষিণী, সদাহাস্যময়ী, সুন্দরী শালাজ সাতসকালে পাচকটিকে এমন কী কটুবাক্যে জর্জরিত করেছিলেন যাতে সে প্রভুপত্নীকে এমন নির্দয়ভাবে আঘাত করে, সে তথ্য কিন্তু জানা যায়নি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, চমৎকার সব মহিলারা কাজের লোকদের সঙ্গে অনেক সময় এমন আচরণ করেন যে, তাঁরা যে খুন-জখম হন না সেটাই আশ্চর্য।

তবে অনেক সময় গর্হিত কারণ থাকে। এক বনেদি বাড়ির চাকরটি সকালবেলা ঘর ঝাড়তে গিয়ে একটি অমূল্য ও সুপ্রাচীন কাটগ্লাসের ফুলদানি ভেঙে ফেলে। গৃহিণী খুব ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়ে বললেন, 'এত পুরনো জিনিসটা এতদিন পরে ভেঙে ফেললে। কবে আমার দাদাশ্বশুরের বাবা বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন জিনিসটা।' ভৃত্যটা দাঁত বার করে বলল, 'তাই বলুন, পুরনো মাল, আমি ভয় পেলাম নতুন জিনিস ভাঙলাম বুঝি।' অতঃপর ভদ্রমহিলা এক গ্লাস জল ভৃত্যটির গায়ে ছুড়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িতে কিন্তু কখনও কোনও কাজের লোককে এ রকম করি না। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয় না যে তা নয়; যখন দেখি রান্নাঘর থেকে চায়ের পেয়ালা টেস্ট করতে করতে নিয়ে আসছে। কারণ আর কিছু নয়, একটা চিনি ছাড়া, তিনটে চিনিওলা এবং কোনটা কী গুলিয়ে ফেলেছে, তখন মনে হয় ১৯৯১ সালে প্রকাশিতব্য অখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলি দিয়ে লোকটার মাথায় মারি।

তা যে করি না তার কারণ এই নয় যে, ওই ভারী বইটি এখনও প্রকাশিত হতে আট বছর বাকি। হাতের কাছে ভারী বইয়ের অভাব নেই, ইচ্ছে করলে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' কিংবা যে বইয়ের উপর আমার স্পষ্ট অধিকার রয়েছে, আমাকে ও মিনতিকে উৎসর্গীকৃত 'নীললোহিত সমগ্র' দিয়েও মারতে পারি।

এই তো গত মাসের শেষ শনিবার। বাসায় আমি আর আমাদের একমাত্র কাজের লোক গোবিন্দ। শেষ শনিবার বা চতুর্থ শনিবার আমার অফিস বন্ধ। ভাইয়ের অফিস খোলা, ছেলের কলেজ খোলা। দু'জনেই বেরিয়েছে। স্ত্রীও কোথায় কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন।

বাড়িতে লোক বলতে আমি আর গোবিন্দ। টেবিলের ওপরে একটা দশ টাকার নোট পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে বাথরুমে স্নান করতে গেছি, স্নান সেরে এসে দুটো রুমাল কিনতে যাব এই উদ্দেশ্যে।

দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে জামাকাপড় পরে বেরতে যাব, ওমা, দেখি যে টেবিলে টাকাটা নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে ধরলাম, 'গোবিন্দ, এই টেবিলে পেপারওয়েটের নীচে দশটা টাকা রেখেছিলাম, সেটা কী হল?'

গোবিন্দ সরলভাবে বলল, 'পেপারেট কী বাবু?' আমি আরও রেগে গেলাম, কাচের কাগজচাপাটা তুলে দেখিয়ে বললাম, 'এইটা, এর নীচে দশটা টাকা এইমাত্র ছিল, সেটা কী হল?'

গোবিন্দ সরলতরভাবে জানাল যে, এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও সে কিছু জানে না। কোনও দশ টাকার নোট সে দেখেনি।

আমি বললাম, 'দ্যাখো গোবিন্দ, বাড়িতে আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নেই। বেশি চালাকি করবে না। টাকা দিয়ে দাও।' গোবিন্দ বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথা বুঝেছি বাবু, বেশি কথা বাড়াবেন না। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ, ফিফটি ফিফটি হয়ে যাক। আপনারও পাঁচ টাকা যাক, আমারও পাঁচ টাকা যাক।' বলে গোবিন্দ অম্লানবদনে একটি পাঁচ টাকার নোট আমাকে এগিয়ে দিল।

তবুও গোবিন্দকে কিছু বলিনি। গোবিন্দ, গোবিন্দের মা বা গোবিন্দের বউ, যখন যেই থাক কিঙ্কর-কিঙ্করী, কাউকে কিছু বলি না। মনোহরপুকুরের ভদ্রলোক আর শালার বউয়ের পরিণতির কথা মনে করে আত্মসংবরণ করি।

ডাক্তার-ডাক্তার

আমার মতো দুঃসাহসী লেখক আজকাল সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ কিছুদিন হল ভয়ংকর হৃদয়ের ব্যামোয় আমার জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে, বস্তুত আমি বেঁচে আছি কয়েকজন দয়ালু ও মহানুভব ডাক্তার মহোদয়ের অসীম কৃপায় ও ভালবাসায়। অথচ সেই আমি, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, কাণ্ডজ্ঞানহীন 'কাণ্ডজ্ঞান' লেখক, এর মধ্যেই শ্রদ্ধেয় চিকিৎসকদের নিয়ে রসিকতায় মত্ত হলাম।

অনেকদিন আগে আমাদের কালীঘাটের পুরনো পাড়ায় আমাদের স্থানীয় ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বসে আছি। ডাক্তারবাবু প্রৌঢ়, আমার সঙ্গে বয়সের ঢের তফাত কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রোগী ও চিকিৎসকের মামুলি কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শেষ হলে তাঁর সঙ্গে আমি সিনেমা, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করতাম।

একদিন তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। শেষ রোগী বিদায় নিয়েছে, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাকের কামড়ে বিষ আছে কি না, থাকলে জলাতঙ্ক হতে পারে কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। দু'দিন আগে সকালবেলায় কী এক অজ্ঞাত কারণে হাজরা পার্কে, (তখন পার্কটির এমন শোচনীয় অবস্থা হয়নি), একটা কাক সহসা উত্তেজিত হয়ে পর পর চার-পাঁচজন নিরীহ বায়ুসেবীকে কামড়িয়ে দেয়; এই অস্বাভাবিক ঘটনাই সেদিন আমাদের এই অদ্ভুত আলোচনার কারণ। সে যা হোক, আমাদের আলোচনার মধ্যেই এক সুবেশ যুবা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে ঝকঝকে দামি পোশাক, পায়ে মসৃণ অ্যামবাসাডর জুতো, হাতে দামি বিলিতি হাতঘড়ি, আঙুলে হিরের আংটি।

যুবকটি আমাদের ওই কাকের আলোচনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে বললেন যে, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আপনার চিকিৎসার জন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ।' ডাক্তারবাবুর কাছে অনেক রোগী আসে, ডাক্তারবাবুর স্মৃতিশক্তিও খারাপ নয়, কিন্তু তিনি এই যুবক ব্যক্তিটিকে চিনে উঠতে পারলেন না। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো, আপনার কখনও চিকিৎসা করেছি কি আমি?'

যুবকটি মৃদু হেসে বলল, 'না, আমার চিকিৎসা নয়, আপনি আমার মামার চিকিৎসা করেছিলেন, তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।'

ডাক্তারবাবু আরেকটু বিচলিত হলেন, 'আপনার মামা?'

যুবকটি বলল, 'আমার মামা হলেন রায়বাহাদুর স্বর্গীয় শশধর পাল। তিনি তো আপনার হাতেই মারা গেলেন। মামার তো কেউ নেই, আমি একমাত্র ভাগ্নে, আমিই সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছি। আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।'

অবশ্য সমস্ত ডাক্তারবাবুর ভাগ্যে এমন কৃতজ্ঞ রোগী জোটে না। একজন রোগীকে ডাক্তার ফোন করেছিলেন, 'খগেনবাবু, আপনার যে বাতের চিকিৎসা করেছিলাম তার জন্যে আপনি আমাকে চেক দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, সেই চেকটি ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে।' টেলিফোনের ওপার থেকে নির্বিকার খগেনবাবু জবাব দিলেন, 'কী আর করা যাবে বলুন। আপনি যে বাতের ব্যথার চিকিৎসা করেছিলেন, সে ব্যথাটাও ফেরত এসেছে।'

অধিকাংশ চিকিৎসকই অধিকাংশ সময়ে সুজন ও সুরসিক। বহু মৃত্যু, বিপর্যয় ও মহামারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁরা ঠান্ডা মাথায়, অকম্পিত হাতে কাজ করেন। তবে এর মধ্যে দু'-একজন মারকুটে ডাক্তারও আছেন। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা, রোগীরা মারকুটে ডাক্তারদের বেশি পছন্দ করেন। নরম ডাক্তারদের চেয়ে মারকুটে ডাক্তারদের পসার অনেক তাড়াতাড়ি হয়। ভবানীপুরে একজন মারাত্মক গোলমেলে ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নির্দেশ, পথ্যাদি ঠিকমতো না মানায় প্রত্যহ একাধিক রোগী তাঁর হাতে চড়চাপড় খেত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর এক গলাব্যথার রোগী পাঞ্জাবি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বরফ দেওয়া লস্যি খাচ্ছিল, তিনি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওই দৃশ্য দেখে রোগীর হাত থেকে কাচের গেলাস কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ভেঙে ফেলেন।

এই চিকিৎসককে তাঁর এক রোগী একবার বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার যে জ্বরটা ছাড়ছে না। আপনি বললেন, আমার টাইফয়েড। কিন্তু টাইফয়েডের চিকিৎসায় তো কিছু হল না। আমার নিমুনিয়া হয়নি তো?' ডাক্তারবাবু গর্জে উঠলেন, 'নিমুনিয়া? নিমুনিয়া কেন?' মুমূর্ষু রোগী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের অফিসের রামবাবুর ডাক্তারেরা টাইফয়েড বলে চিকিৎসা করল। কিছু ধরতেই পারেনি, শেষে রামবাবু মারা গেলে জানা গেল নিমুনিয়া হয়েছিল।' ডাক্তারবাবু আরও গর্জে উঠলেন, 'ও রামবাবু-ফামবাবু ছাড়ুন। আমি যদি কারও টাইফয়েডের চিকিৎসা করি সে টাইফয়েডেই মারা যাবে; নিমুনিয়ায় নয়।'

এসব অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কথা বেশি বলে লাভ নেই। বরং দু'-একজন তরুণ চিকিৎসকের কথা বলি। বছর দশেক আগে একদিন কলেজ স্ট্রিটের ট্রামে ধর্মতলায় আসছি, হঠাৎ গোলদীঘির সামনে কয়েকটি তরুণ যুবক দৌড়ে এসে ট্রামে উঠলেন, তারপর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন, 'আমাদের ডাক্তার ডাকুন, ডাক্তার ডাকুন।' যাত্রীরা হতভম্ব, এক প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তোমাদের কী হয়েছে? ডাক্তার ডাকতে বলছ কেন?' একটি উৎফুল্ল যুবক আরেকবার বুক চাপড়িয়ে উত্তর দিলেন, 'আমাদের ডাক্তার বলে ডাকুন। আজ এম বি বি এস-এর রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমরা পাশ করেছি, ডাক্তার হয়েছি।'

জানি না, সেই সদ্য স্নাতক নবীন চিকিৎসকেরা লাল ফিতে আর ঘোরানো সিঁড়ি, হাসপাতালের নোংরা বারান্দা আর প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারের নিরুপায় সীমাবদ্ধতার মধ্যে দমবন্ধ দাঁড়িয়ে এখনও বুক চাপড়িয়ে বলেন কি না, 'আমাদের ডাক্তার ডাকুন, আমাদের ডাক্তার ডাকুন।'

দুঃখের কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চিকিৎসকদের নিয়ে দু'-একটি বিলিতি মজার গল্প আরেকবার বলা যাক।

ডক্টর হোয়াইট ডক্টর গ্রিন সাহেবকে মোটেই পছন্দ করেন না, গ্রিন ডাক্তারের নাম শুনলে হোয়াইট সাহেবের আপাদমস্তক জ্বলে যায়। একদিন হোয়াইট ডাক্তারের কাছে একজন চিকিৎসার জন্যে এসেছেন, হোয়াইট সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এর আগে আর কাউকে দেখিয়েছেন কি না।

রোগীটি জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, গ্রিন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।' গ্রিনের নাম শোনামাত্র ডক্টর হোয়াইট উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'সেই মূর্খ, স্টুপিড গ্রিন হাতুড়ে আপনাকে কী কুপরামর্শ দিল?' হতবাক রোগী একটু থেমে থেকে তারপর নিচু গলায় বললেন, 'স্যার, ডক্টর গ্রিন আমাকে পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে এসে দেখাতে।'

পরের গল্পটি বড় বিপজ্জনক। এক রোগী সার্জনের কাছে অপারেশন করাতে এসেছে। অপারেশন টেবিলে শুয়ে রোগী ডাক্তারবাবুকে বলছে, 'ডাক্তারবাবু, আমার এই প্রথম অপারেশন। আমার কেমন ভয় ভয় করছে।' সার্জন সাহেব বললেন, 'আপনি ঠিক আমার মনের কথা বলেছেন। আমারও এটা প্রথম অপারেশন। আমারও কেমন ভয় ভয় করছে।'

আরেকটি অপারেশনের গল্প আরও মর্মান্তিক। একটি সার্জন রোগীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'আপনার এই অপারেশনটা খুব জটিল। দশজনের মধ্যে ন'জনই মারা পড়ে। তবে আমার হাতে এখন পর্যন্ত ন'জন সবসুদ্ধ মারা গেছে। তাই মনে হয় আপনার বাঁচবার সম্ভাবনা সেন্ট পারসেন্ট, শতকরা একশো।'

এই গল্পটি অনেকে এই পর্যন্ত জানেন। কিন্তু এক বিখ্যাত শল্যবিদের কাছে এর পরের অংশটুকু শুনেছি। অপারেশন টেবিলে রোগী তাঁর অপারেশনের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য পরিণতি হৃদয়ঙ্গম করে সার্জন সাহেবের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সার্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কিছু বলার আছে?' রোগীটি ক্ষীণ কণ্ঠে মিনমিন করে বললেন, 'আমার প্যান্ট আর জুতো জোড়া দয়া করে ফেরত দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাই।'

তবে তেজস্বী রোগীরও অভাব নেই। ডাক্তারকে আক্রমণ করছে, হাসপাতাল ভাঙচুর করছে— এ রকম খবর এখন প্রতিদিনের কাগজে। সেই অসভ্যতা রসিকতারও অযোগ্য। কিন্তু সেই যে রোগীটি সার্জনকে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, দেখবেন আমার পেটের কাটার দাগটা যেন অন্তত আট ইঞ্চি হয়।' সার্জন বলেছিলেন, 'অপারেশনের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু কাটতে হবে, শুধু শুধু আট ইঞ্চি কাটতে যাব কেন?' সাহসী রোগীটি বললেন, 'ডাক্তারবাবু অন্তত আট ইঞ্চি চাই। এর জন্যে যা লাগে আমি দেব।' কৌতূহলী সার্জন সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?' রোগীটি অপারেশন টেবিলে উঠে বসে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'দেখুন, সারা জীবন ধরে শুনে যাচ্ছি আমার শালির ছয় ইঞ্চি লম্বা অপারেশনের দাগ আর আমার শাশুড়ির সাড়ে সাত ইঞ্চি, আমার কাটা দাগটা অন্তত আট ইঞ্চি করবেন, স্যার।'

দাঁত

দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাট অঞ্চলে, (জানি না এখনও আছে কিনা, পাতাল রেলের কল্যাণে সে রাস্তা দিয়ে আজ কয়েক বছর যাতায়াত নেই) একটা বাড়ির সামনে বহুকাল ধরে একটা সাইনবোর্ড ছিল, তাতে লেখা ছিল, 'দান্তের হাসপাতাল'।

বলা বাহুল্য, এটি একটি নিতান্তই বানান-বিভ্রাট, মহাকবি দান্তের সঙ্গে এই হাসপাতালটির সামান্যতম যোগাযোগ থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আসলে দাঁতের চন্দ্রবিন্দু কোনও বিচিত্র ভ্রমে পিছিয়ে গিয়ে 'ন' হয়ে গেছে, ফলে দাঁতের হাসপাতাল দান্তের হাসপাতালে পরিণত হয়েছে।

শুধু বানানে নয়, বাস্তবে চিকিৎসায় এ রকম দাঁত বিভ্রাট অনবরতই শোনা যায়। হাসপাতালে দেখা গেছে বারো নম্বর রোগীর মাড়ির দাঁতে ব্যথা, কাগজ দেখে ভুল করে তেরো নম্বর রোগীর মাড়ির দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে, যার আসলে সামনের দাঁতে ব্যথা। একবার এক রোগীকে দেখেছিলাম দাঁতের চেয়ারে যন্ত্রণাকাতর বিকৃত মুখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ককাচ্ছেন, ডাক্তার বলছেন, 'কী হল? এখনও তো আমি আপনার দাঁতে হাত দিইনি।' রোগী বলছেন, 'দাঁত নয়, আপনি পায়ের বুটজুতো দিয়ে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল মাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

কিন্তু এ সমস্ত গল্পই খুবই তুচ্ছ এবং হাস্যকর মনে হবে, আজ আমি আপনাদের যে মর্মান্তিক কাহিনী শোনাতে বসেছি তার তুলনায়। কাণ্ডজ্ঞানের মতো তরল পৃষ্ঠার পক্ষে কাহিনীটি মোটেই উপযুক্ত নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতে কোনও ভাল বিষয় না থাকার জন্যে নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই গর্হিত কাজটি করছি।

এই গল্পটির কোনও ইতিহাস বা ভূগোল নেই। কবে কোথায় ঘটেছিল তা বলা যাবে না, বলা উচিতও হবে না। বর্ণনার সুবিধের জন্যে আমি গল্পটি উত্তমপুরুষে বলছি, কিন্তু গল্পটি আমার নয়, আমি শুনেছিলাম যাঁর কাছে তিনি কার কাছে শুনেছিলেন বা কোথাও পড়েছিলেন কি না, তা বলতে পারব না।

গল্পটির কেন্দ্রস্থল এক মফস্বল শহর, কলকাতার কাছেই। সেখানে এই গরমে এক প্রীতিসম্মেলন সহ মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছিলাম। আজকাল সন্ধ্যায় বিদ্যুতের অভাব এবং চুরি-ছিনতাইয়ের প্রাচুর্যের জন্যে কলকাতা এবং মফস্বলে বহু গৃহস্থই প্রীতিভোজের আয়োজন দুপুরবেলা করছেন।

যেমন হয়, সেই প্রীতিভোজের আসরে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে বেশ অনেকদিন পরে দেখা হল। এখানেই অনেকদিন পরে চিন্তাহরণ বসুর সঙ্গে দেখা। একসময় ওঁর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল, এক পাড়ায় থাকতাম, প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। এখন দু'জনে দু'জায়গায় দু'রকম ব্যস্ত জীবন যাপন করি, কদাচিৎ দেখা হয় তাঁর সঙ্গে, আজ এখানে দেখা হল দেড় বছর বাদে।

চিন্তাহরণবাবুকে দেখে বিশেষ ভাল লাগল না। মুখ কালো করে, গালে হাত দিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে স্থির হয়ে বসে আছেন, পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, দাঁত ব্যথা, সকাল থেকেই অল্প অল্প ছিল। ব্যথাসুদ্ধই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কিন্তু তখনও কোনওরকম ছিল, কিন্তু এখন অসহ্য, শুধু দাঁত নয় সমস্ত শরীর যেন টনটন করছে। জিজ্ঞাসা করে আরও জানতে পারলাম, এখানে আসবার পথে মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে এক শিশি 'টুথেক কিওর' কিনে লাগিয়েছেন, পায়ের

[illegible] লাল ওষুধের ফাঁকা শিশিটা পড়ে রয়েছে। তারপর সামনের পানের দোকান থেকে চারটে অ্যান্টিপাইরিন কিনে সোডা ওয়াটার দিয়ে খেয়েছেন। তারপর সহনিমন্ত্রিতদের পরামর্শে ভোজবাড়ির ব্যস্ত রান্নাঘর থেকে এক ঘটি গরমজল এনে নুন দিয়ে কুলকুচি করেছেন, এমনকী যারা পান সাজছে তাদের কাছ থেকে গুটিকয় লবঙ্গ চেয়ে নিয়ে দাঁতের গোড়ায় চেপে রেখেছেন।

কিছুতেই কিছু হয়নি। সর্বশেষে স্থানীয় এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে পাশের পাড়ায় এক হঠ-সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যান। মাত্র পাঁচ সিকে পয়সার বিনিময়ে সেই সন্ন্যাসীটি চিন্তাহরণবাবুকে [illegible] ব্যথাহরণ একটি মন্ত্র দিয়েছেন, মন্ত্রটি মনে মনে আটশো আটবার জপ করা মাত্র ব্যথা দূর হয়ে যাবে; জপটি খুবই গোপন এবং অব্যর্থ। কিন্তু এই দুঃসহ ব্যথায় আটশো আটবার কোনও মন্ত্র জপ করার মতো মনের জোর তাঁর নেই। আর মন্ত্রটিও অতি খটমটে, আমি জিজ্ঞাসা করায় গোপনীয়তা ভঙ্গ করে চিন্তাহরণবাবু জানালেন মন্ত্রটি হল—

'পরম ব্রহ্ম প্রজাপতি ঋষি
শূল শান্তি অহর্নিশি
সুখ শান্তি দিশি দিশি
পরম শান্তি প্রজাপতি ঋষি।'

বলা বাহুল্য, এই মন্ত্র আটশো আটবার জপ করে যন্ত্রণা দূর করা বোধহয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয় এবং সময় লাগে অন্তত বারো-চৌদ্দ ঘন্টা।

এখন চিন্তাহরণবাবু একা একা গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন এমনিতে যদি ব্যথাটা একটু কমে যায়। নিমন্ত্রণ খাওয়া মাথায় উঠেছে, ব্যথাটা সামান্য কমলেই সোজা একটা রিকশা করে স্টেশনে, স্টেশন থেকে কলকাতা ফিরবেন। আমি প্রস্তাব করলাম, 'তার চেয়ে চলুন একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাই।' চিন্তাহরণবাবু বললেন, 'সে কথা কি আমি ভাবিনি? কিন্তু এই গ্রীষ্মের ভরদুপুরে ছুটির দিনে এই মফস্বল শহরে দাঁতের ডাক্তার কোথায় পাব?'

প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক আমার আর চিন্তাহরণবাবুর কথাটা শুনছিলেন, তিনি বললেন, কাছেই রেল স্টেশনের ওপারে 'সিওর কিওর' নামে একটা নার্সিংহোম আছে, সেখানে মিলিটারির প্রাক্তন ডাক্তার মেজর সিং, দাঁত-চোখ-কান-বুক যাবতীয় চিকিৎসা করেন এবং তাঁকে দিবারাত্র পাওয়া যায়।

রিকশা করে চিন্তাহরণবাবুকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার সিংকে দেখে শ্রদ্ধা হল। আমরা যখন গেলাম তখন তিনি স্থূলদেহ এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাতিবৃহৎ তলপেট হাঁটু দিয়ে চেপে সেই ব্যক্তির লিভারের ক্ষমতা পরীক্ষা করছিলেন। শুধু লিভার নয়, দাঁত ব্যথা, চক্ষু পরীক্ষা, কানের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি নানাবিধ ডাক্তারি ও শল্যচিকিৎসা মেজর সিং একা নিজ হাতে করেন।

আমাদের নতুন লোক দেখে এবং প্রয়োজন শুনে মেজর সিং যকৃৎ রোগীকে কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি দিয়ে আমাদের কাছে এলেন। একটা পুরনো লোহার চেয়ারে চিন্তাহরণবাবু বসলেন, চেয়ারের পিছনে চুলকাটার সেলুনের মতো একটা স্কন্ধাসন, তাতে মাথা হেলিয়ে দিলেন। মেজর সিং একটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ছুরি, কাঁচি, ফরসেপস ইত্যাদি বার করে নিয়ে এলেন; যন্ত্রপাতি পুরনো কিন্তু বেশ মজবুত, বোধহয় মিলিটারি থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছেন। চিন্তাহরণবাবু এত যন্ত্রণার মধ্যেও আশঙ্কান্বিতভাবে মেজর সাহেবের ও তাঁর অস্ত্রাদির দিকে তাকাতে লাগলেন। আমি চিন্তাহরণবাবুর মাথার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মেজর সিং চিন্তাহরণবাবুর ডানদিকে এসে তাঁকে হাঁ করতে বললেন। চিন্তাহরণবাবু হাঁ করা মাত্র মুহূর্তের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। কোনও প্রশ্ন না করে, কিছু না জেনে, কোনও বিবেচনা না করে মেজর সাহেব বিদ্যুৎগতিতে চিন্তাহরণবাবুর ওপরের পাটির সামনের তিনটা দাঁত ফটাফট

তুলে মেজেতে ফেলে দিলেন। আমি দেখলাম একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হতে চলেছে, কিন্তু চিন্তাহরণবাবুর এক ফোঁটা রক্ত বেরোল না, মেজর সাহেবও বললেন, 'সাংঘাতিক অ্যানিমিয়া দেখছি, একবিন্দু রক্ত নেই।'

চিন্তাহরণবাবু ইতিমধ্যে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছেন। সদ্য তোলা দাঁত তিনটে মেজে থেকে তুলে পাশের বেসিন থেকে ধুয়ে নিলেন, তারপর সযত্নে ওপরের পাটিতে দাঁত তিনটি লাগালেন। তারপর মেজরকে বললেন, 'খুব রক্ত দেখার সাধ হয়েছে বুঝি? কথা নেই বার্তা নেই, তিনটে দাঁত তুলে ফেললেন? পাগল নাকি? ভাগ্যিস বাঁধানো দাঁত তাই রক্ষা পেয়ে গেলাম।'

চিন্তাহরণবাবু আমাকে বললেন, 'চলুন এই পাগলের আস্তানা থেকে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচাই। তবে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে উত্তেজনায় দাঁতের ব্যথাটা মরে গেছে।'

দু'জনে বেরিয়ে এলাম। তখনও মেজর সাহেব আমাদের পিছু ছাড়েননি। পিছন ফিরে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'আমার ভিজিটটা!'

টেলিফোন

স্বর্গত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অসামান্য কৌতুকনকশা ছিল, যেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তি জীবনে প্রথমবার টেলিফোন ধরেছে। সে অবশ্য প্রথমে ধরতে চায়নি, কিন্তু টেলিফোনটির কাছাকাছি কোনও লোক ছিল না এবং রিসিভারটি ক্রমাগত বেজেই চলেছে, ফলে বাধ্য হয়েই সে রিসিভারটি তোলে। তখন অপর প্রান্ত থেকে যিনি ফোন করছেন, তিনি যথারীতি বলেছেন, 'হ্যালো।' এই গ্রাম্য ব্যক্তিটি, যে এ প্রান্তে ফোন ধরেছে, সে ভেবেছে তাকে হেলতে বলা হয়েছে। সুতরাং সে একটু কাত হয়েছে। আবার ও প্রান্ত থেকে 'হ্যালো' বলেছে আর এই ব্যক্তিটি আরও একটু কাত হয়েছে। যত 'হ্যালো' শুনছে, তত কাত হয়ে যাচ্ছে, মুখে কিছু বলছে না, ফলে ও-প্রান্ত থেকে ক্রমাগত 'হ্যালো, হ্যালো...' হয়ে যাচ্ছে, এ লোকটিও কাত হতে হতে একদম মেজেতে শুয়ে পড়েছে এবং তখন বলছে, 'আর হেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হেলতে হেলতে আমি চিত হয়ে গেছি।'

আমার বর্ণনার ত্রুটির জন্যে হয়তো এই নকশাটিকে কারও কারও একটু মোটা দাগের মনে হতে পারে, কিন্তু ভানুবাবুর অননুকরণীয় প্রসাদগুণে অসম্ভব কৌতুকের সৃষ্টি হত এই উপস্থাপনায়।

টেলিফোন প্রসঙ্গে আমার অবস্থা ওই কৌতুকনকশার গ্রাম্য ব্যক্তিটির চেয়েও খারাপ। আমি টেলিফোনে কোনও কথা বুঝতে পারি না, বলতেও পারি না। বলতে পারি না তার কারণ আমার অস্বাভাবিক ভারী গলা, যা টেলিফোন যন্ত্রের মাধ্যমে আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আমার সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল যে, আমি কিছুতেই আস্তে কথা বলতে পারি না। এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, তারপর চেঁচিয়ে, তারপর ফোনে, ওদিকে যিনি থাকেন তাঁর অবস্থা অকল্পনীয়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলছিলাম। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ডালহৌসি স্কয়ার থেকে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, নীরেন্দ্রনাথ আমার চেঁচানি শুনে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'শুধু শুধু টেলিফোন কোম্পানিকে পয়সা দিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ফোনটা নামিয়ে রেখে কথা বলো, আমি বেশ শুনতে পাব।'

বাড়িতে বা অফিসে আমি কখনওই পারতপক্ষে ফোন ধরি না, বিশেষ নিরুপায় না হলে ওই [illegible] ব্যক্তিটির মতো ফোনের ক্রিং ক্রিং এড়িয়ে চলি। অবশ্য আমাদের বাড়িতে ফোন ধরার সুযোগও খুব কম। যেদিন প্রথম আমাদের সংসারে ওই যন্ত্রটি এল সেদিন থেকে ফোন বাজা মাত্র আমার ছোট ভাই এবং ছেলে দু'জনে পাগলের মতো ছুটে যায় ফোন ধরতে। ফোন বেজে চলে, এদিকে দু'জনের মধ্যে যাকে বলে ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি। ইতিমধ্যে আমাদের কাজের লোকটিও এই ফোন ধরার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। এদের মারামারি ও গোলমালে কত দরকারি কোথায় যে চাপা পড়েছে, ধরাই হয়নি। আবার হয়তো ধরা হল, কিন্তু যিনি ফোন করেছেন, তিনি আমাদের দিক থেকে গোলমাল, চেঁচামেচির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে নিঃশব্দে ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রথমে ভেবেছিলাম এটা সাময়িক উত্তেজনা। কালক্রমে ধীরেসুস্থে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হতে চলেছে টেলিফোন লড়াই এখনও পূর্ণগতিতে চলেছে। আমি একবার জানতে চেয়েছিলাম, ওরা এ রকম কেন করে? আমার ভাই বলেছে, রং নাম্বার হলে মনের সুখে গালাগাল দেবে সেই জন্য। আমার ছেলে বলেছে, বিশেষ কোনও কারণে নয়, তবে কেন যেন টেলিফোন বেজে উঠলেই তার মাথায় রক্ত উঠে যায়, সে দিশেহারা বোধ করে। আর পরিচারকটি বলেছে, দাদাবাবু আর কাকাবাবু ও রকম করে বলে সেও ও রকম করে।

নিজের বাড়ির ফোনের কথা থাক। এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছি বন্ধুপত্নী প্রায় ঘণ্টাখানেক ফোনে কথাবার্তা বলার পর অবশেষে ক্লান্ত হলেন। অপর পক্ষকে জানালেন, 'ভাই একটু ধরো। কানটা বদলিয়ে নিই।' বলে ফোনটি ডান কান থেকে বাঁ কানে ঘুরিয়ে নিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আলাপ শেষ হল। ভদ্রমহিলা টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সবে উঠেছেন, ইতিমধ্যে আরেকটি ফোন এল। তিনি আবার গিয়ে ফোন ধরলেন। ঘরের অপর প্রান্তে আমরা বসে গল্প করছিলাম, ভদ্রমহিলার স্বামী মানে আমার বন্ধুটি, চাপা গলায় বললেন, 'আবার এক ঘণ্টা।' কিন্তু পতিদেবতার ভবিষ্যৎ-বাণী নস্যাৎ করে দিয়ে এবারের আলাপ মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গ করলেন। বন্ধুপত্নী ফোন রেখে উঠে আসতে আমি রঙ্গ করে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি কথা ফুরল?' ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী আর কথা বলব? এটা যে রং নম্বর ছিল।'

রং নম্বর কোনও এক যুগে বেশ রোমান্টিক ব্যাপার ছিল। তখন রং নম্বরের সুযোগ কম ছিল, টেলিফোন তখনও স্বয়ংক্রিয় হয়নি, নম্বরের জন্য এক্সচেঞ্জে টেলিফোন সহায়িকার উপর নির্ভর করতে হত। তিরিশের, চল্লিশের দশকে বাঙালি টেলিফোন-মহিলা আধুনিতার প্রতীক। তাঁদের নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস, সিনেমা। পাড়ায় একজন মহিলা টেলিফোন অপারেটর থাকলে সমস্ত লোক অবাক হয়ে তাঁর যাতায়াত, কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করত। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' এখনও অনেকেরই হয়তো মনে আছে।

অটোমেটিক হওয়ার পর থেকে টেলিফোনের সেই রোমান্টিক যুগ শেষ হয়েছে। এখন দূরভাষণ একটি প্রয়োজনীয় বিরক্তি। রং নম্বরে রং নম্বরে গ্রাহক সদা অতিষ্ঠ। অবশ্য যদি যন্ত্রটি চালু থাকে। যন্ত্রটি চালু না থাকলে, যা প্রায়শই হয়, অবশ্য রং নম্বরের ভয় নেই। আর এই ভুল নম্বর যখন হতে থাকে ক্রমাগতই হতে থাকে। একই লোক একই ভুল নম্বর বারবার পেতে থাকে। একবার এইরকম একটি লোক ক্লান্ত হয়ে আমাকে আমার ফোন নম্বর জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'দাদা, এটা কি রং নম্বর?' আমি কিছু না বুঝতে পেরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ফোন নামিয়ে রাখল। একটু পরে আবার ক্রিং, ক্রিং, আবার সেই প্রশ্ন, 'দাদা, এটা কি রং নম্বর?' ক্রমাগত চলতে লাগল। আমি মরিয়া হয়ে গেলাম, ওদিকের লোকটিও তাই। কিন্তু শেষে সে আর পারল না, ঊনত্রিশ বারের মাথায় যখন আমি আবার জানালাম, 'হ্যাঁ, এটা রং নম্বর', তখন ও প্রান্তে স্পষ্ট একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই হাত থেকে রিসিভার মাটিতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। বোধহয় লোকটা এত চেষ্টা করেও সঠিক নম্বর না পাওয়ায় হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করল।

নবনীতা দেবসেনের বাড়িতে একবার গভীর রাতে একটা খুব গোলমেলে রং নম্বর এসেছিল। গলার স্বর এবং ইংরেজি উচ্চারণ শুনে নবনীতা বুঝতে পারে এটা একটা মাদ্রাজি মাতাল। আমরা জানতে চাই, 'মাতাল বোঝা গেল কী করে? আর মাদ্রাজিই বা কেন?' নবনীতা বলল, 'ব্যাপারটা খুব সোজা। লোকটা পাঁচ সংখ্যার নম্বর চাইছিল; কলকাতা, বোম্বে, দিল্লি সব ছয় সংখ্যার নম্বর। আর তা ছাড়া মাতাল ছাড়া আর কে মধ্যরাতে অন্য শহরের রং নম্বর চাইবে?'

ফোনের গল্প অনেক। ব্যাপারটা সেই জন্য সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি। কয়েকদিন আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখেছি ফোনে ক্রিং ক্রিং বাজা মাত্র বাড়িসুদ্ধ সবাই, এমনকী শক্তির মতো দুঃসাহসী লোক পর্যন্ত চমকে চমকে উঠছে। কী ব্যাপার, এত ভয় কীসের? কোনও দুঃসংবাদ আসার আশঙ্কা করছে নাকি অথবা কোনও দুর্দান্ত লোকের শাসানি? শুনলাম তা নয়, টেলিফোনটা ধরতে গেলেই সাংঘাতিক শক দিচ্ছে, বৈদ্যুতিক শকের চেয়েও তীব্র। ফোন বাজলে ধরতে হবে, ধরলেই শক। এই ভয়ে সবাই অতিষ্ঠ। এর আগে কিংবা পরে, আর কোথাও এমন শকিং ফোনের কথা শুনিনি, শিবরাম চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন শক থেকেই শক্তি।

এই শক তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু একধরনের টেলিফোন কিন্তু প্রচণ্ড বিরক্তিকর। কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করবে না, নাম বলবে না। ভাঙা ন্যাকা গলায়, 'বলো তো, আমি কে বলছি? চিনতে পারছ না তো? কী করে চিনবে বলো? কতদিন পরে, কত রোগা হয়ে গেছি, মাথায় এতবড় টাক পড়েছে, সত্যি চিনতে পারছ না?' এসব লোকের টেলিফোন নামিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

পুনশ্চ: টেলিফোনে ক্রস-কানেকশন থেকে দ্রুত অব্যাহতি পাওয়ার আমার একটি ফর্মুলা আছে। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, শতকরা নব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যাবে। ফোন তুলে ডায়াল টোন পেয়েই শুনলেন লাইনে কারা কথা বলছে কিংবা আপনি কথা বলতে বলতে লাইনে কাদের বাক্যালাপ চলে এল। এদের লাইন ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে কোনও লাভ নেই। বরং সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলুন, 'ট্রাঙ্ক কল, দিল্লি, ট্রাঙ্ক।' দেখবেন অপর পক্ষদ্বয় ফোন নামিয়ে দিয়েছে, তারা ভাবছে তাদের বুঝি দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছে। সেটা ধরার জন্য তারা ফোন নামাতেই আপনার জট আপাতত খুলে যাবে।

আমি কীরকমভাবে

কাণ্ডজ্ঞানের এই এক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমার নিজের চেহারা, কণ্ঠস্বর, বিদ্যা-বুদ্ধি, আত্মীয়স্বজন নিয়ে এত কথা লিখেছি যে অতি বড় নির্লজ্জ ছাড়া বোধহয় আর কারও পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কোনও পাঠক বা পাঠিকা আমাকে যদি ইগো-ম্যানিয়াক ভাবেন তা হলেও আমার কিছু করার নেই।

আমি অনুপায়। নিজেকে নিয়ে এমন সমস্ত দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে অনবরতই যেতে হয় যে তা হয়তো অনেক সময় অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। আমার তবু উপায় নেই, লিপিবদ্ধ করে আমার বেদনাভার যতটুকু লাঘব করা যায় তাই আমার চেষ্টা।

কেন যে লোকেরা আমাকে বারবার ভুল বোঝে সেটা আমি আজ অবধি কিছুতেই ধরে উঠতে পারিনি। এই তো গত রবিবার সন্ধ্যাবেলা রীতিমতো ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে সস্ত্রীক একটি বিখ্যাত হলে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় মঞ্চের উপর স্বরপ্রক্ষেপণ যন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ করছিল না। কখনও অতিশয় উচ্চগ্রাম, আবার কখনও অতি স্তিমিত; নাটকটির স্বরসাম্য বারবার বিঘ্নিত হচ্ছিল। অন্যান্য শ্রোতাদের মতো আমিও কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করছিলাম। এমন সময় একজন কর্মকর্তা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বেড়ালের মতো চোখে খুঁজে খুঁজে আমার সিটের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর পিঠে মৃদু টোকা দিয়ে আমাকে উঠে আসতে বললেন, আমি কিছু অনুমান না করতে পেরে ভদ্রলোকের সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে মঞ্চে উঠে গেলাম। একটু পরেই বুঝলাম ভদ্রলোক ভুল করেছেন; তিনি ভাবছেন যে আমি এই হলের ইলেকট্রিক মেকানিক এবং যদিও ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থিয়েটার দেখছি, এই যন্ত্রপাতি আমাকে ঠিক করে দিতে হবে এখনই। না হলে আমার চাকরি উনি খেয়ে নেবেন।

আমার চাকরি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওই ভদ্রলোক খাননি কিন্তু কী অন্যায় নাজেহাল হলাম! বিনা প্রতিবাদে রীতিমতো অপমানিত হলাম। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কারণ আমি জানি যে চিরকাল যেখানে যে গাফিলতি হয়েছে, আমাকেই সেখানকার লোকেরা গাফিলতকারী হিসাবে শনাক্ত করেছে। আমার এক বান্ধবী তাঁর বাড়িতে তাঁর অসাক্ষাতে যখনই কোনও কাচের গেলাস বা পেয়ালা ভাঙে, তিনি বাড়ি এসে খোঁজ করেন, 'নিশ্চয়ই তারাপদ এসেছিল?' আমি স্বকর্ণে শুনেছি, মহিলা ভিতরের দিকে রান্নাঘরে কী করছেন, এদিকে বাইরের ঘরে আমাদের চায়ের আসরে কী করে একটা চিনেমাটির প্লেট কার হাত থেকে পড়ে ঝনাৎ করে ভেঙে গেল। মহিলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই যাঃ, তারাপদ আবার যেন কী ভাঙল!' কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে ওই বাড়িতে কিংবা নিজের বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও আমি কদাচিৎ কোনও জিনিস ভেঙেছি।

কিন্তু শুধু চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নয়, রাস্তাঘাটে অচেনা জায়গায় অপরিচিত লোক পর্যন্ত আমাকে সামান্য দেখেই কী একটা ভুল ধারণা তৈরি করে ফেলে।

কেউ বিশ্বাস করবেন না জানি। তবু ব্যাপারটা বলে রাখা ভাল। তখন আমি খুব একটা নাবালক নই: রীতিমতো অফিসে চাকরি করছি, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস ছুটির পর কলেজ স্ট্রিটে যাই আড্ডা দিতে। ডালহৌসি স্কয়ার থেকে গোলদীঘি সামান্যই রাস্তা, হেঁটেই যেতাম। লালবাজারের পর বউবাজার-বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে ডানদিকে কয়েকটা চামড়ার জিনিসের দোকান পাশাপাশি। এই দোকানগুলোতে বাস কন্ডাক্টরের খুচরোর ব্যাগ, চাপরাশির কোমরবন্ধ, ঘোড়ার তকমা, ছাগলের বা গোরুর গলার ঘুঙুরের মালা ইত্যাদি আশ্চর্য সব দ্রব্যাদি বিক্রি হয়। এসব জিনিসের কিন্তু কোনও ক্রেতার অভাব নেই, সবগুলি দোকানই বেশ জমজমাট।

একদিন সন্ধ্যার দিকে ওই দোকানগুলির সামনের ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে কলেজ স্ট্রিটের দিকে এগোচ্ছি। সেদিন কী কারণে যেন অফিস থেকে বেরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা চামড়ার দোকানের সামনে বাধা পড়ল, দুই গ্রাম্য ভদ্রলোক চামড়ার সরঞ্জাম কিনছিলেন, তাদেরই একজন আমাকে আটকালেন, 'দাদা, এক মিনিট দাঁড়িয়ে।' তারপর দু'জনে মিলে আমার ঘাড় এবং গলার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে কী আলোচনা করতে লাগলেন। একটু পরেই বুঝতে পারলাম ইঙ্গিতটি আমার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। এঁদের গ্রামের বাড়িতে সদ্যোজাত গোবৎসটি কিঞ্চিৎ চঞ্চল, তার অবস্থান ও গতিবিধি নির্ণয়ের জন্যে তার গলার জন্যে একটি ঘুঙুর বসানো চামড়ার নেকলেস চাই। কিন্তু বাছুরটির গলার মাপ তাঁরা নিয়ে আসেননি। তবে আমাকে দিয়ে [illegible] আমার গলার চেহারা নাকি একেবারে তাদের বাছুরের গলার মতো। আমার যদি কোনও [illegible] না হয় তা হলে আমি যদি একটু দাঁড়াই তা হলে আমার গলার মাপে বাছুরের ঘুঙুরটা তাঁরা [illegible] পারেন।

এ অবস্থায় আমি কী করেছিলাম? কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমার? একটি গোবৎসকে গলায়

ঘুঙুর বাঁধার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে মিথ্যা আত্মসম্মানে অন্ধ হয়ে হনহন করে হেঁটে গিয়েছিলাম, নাকি গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম মাপ দেবার জন্যে?

যাই করে থাকি, আমি কিন্তু এই গ্রাম্য ব্যক্তিদের সরলতাকে মনে মনে অনেকদিন আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু আমার সহপাঠী বন্ধু সিদ্ধিনাথকে কোনও কালে ক্ষমা করতে পারব না।

অনন্তকাল আগে আমি আর সিদ্ধিনাথ এক কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। আজকাল তার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। কী কারণে যেন সিদ্ধিনাথ চিরকালই আমাকে খুব তালেবর, শাহেনশা ব্যক্তি বলে মনে করে। হঠাৎ হঠাৎ এসে উলটোপালটা পরামর্শ বা সাহায্য চায়। নানারকম ফিকির সিদ্ধিনাথের। শহরতলিতে এক আত্মীয়ের সঙ্গে একটা কাঠ-চেরাইয়ের ব্যবসা করেছিল সিদ্ধিনাথ। ভালই চালাচ্ছিল, হঠাৎ একদিন এসে বলে আত্মীয়-অংশীদারের সঙ্গে কী গোলমাল হয়েছে, ও ব্যাটাকে ভাগাতে হবে। আমি তাকে বললাম কোনও উকিলের কাছে গিয়ে দেওয়ানি মামলা করতে। বলল, 'তা নয়। ওকে আমি পুড়িয়ে মারতে চাই। তুমি আমার এই উপকারটুকু করো।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মানে?' সিদ্ধিনাথ যা বলল তাতে বুঝলাম ব্যাপারটা তেমন কিছু না, আজ রাত দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে সে তার শত্রুর বাড়ির পিছনের রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দেবে। উদ্যোগ আয়োজন, সবরকম বন্দোবস্তই সে করেছে, যথা পেট্রলের টিন, তুলোর বল, মশাল। আমাকে শুধু নির্দিষ্ট বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করে রাতের অন্ধকারের আড়ালে দৌড়ে তার জিপে এসে উঠতে হবে। পুরনো বন্ধু হিসেবে অন্তত এটুকু কি আমি তার জন্যে করব না?

সিদ্ধিনাথকে আমি জন্মজন্মান্তরেও ক্ষমা করব না, কিন্তু আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, সে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে জানো। আমি এখন নিজেকে জানতে চাই। আমি কে? আমি কেমন? আমি কি অগ্নিসংযোগের নায়কের মতো, আমি কি গোরু বাছুরের বিকল্প, নাকি নিতান্তই সাদামাঠা কাচ কিংবা চিনেমাটির বাসন ভাঙার কারিগর?

আমার এই চিরায়ত প্রশ্নের চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন আমার পূজনীয়া স্ত্রী। বিদেশ যাওয়ার জন্যে পাসপোর্টের ফটো তুলেছিলাম। যেমন হয়—অনেকটা আমার মতো, অনেকটা অস্পষ্ট, যেন আমি নই, তবে আমার ডবল, দু' নম্বর তারাপদর দু' নম্বরি ছবি।

পাঁচ সপ্তাহ বিদেশ ঘুরে ফিরে এলাম। ঘাটা-আঘাটায়, পথে-বিপথে। মাথায় একমাসের আতেলা চুল, চোখের নীচে কালি, ওজন সাত কেজি কম। দমদম বিমানবন্দরের লাউঞ্জে প্রাণাধিকা বললেন, 'জানো, তোমাকে ঠিক তোমার পাসপোর্ট ফটোর মতো দেখাচ্ছে।'

মন মোর মেঘের সঙ্গী

যদি কোনও পাঠক 'ভুলোমন মাস্টারমশায়' এবং 'পাগলের কাণ্ডজ্ঞান' পড়ে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে আজকের এই রচনা পড়ে হাসা হয়তো একটু কঠিন হবে।

ভুলোমন মাস্টারমশায় এবং উদ্দাম পাগলের মধ্যে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা খাচ্ছে-দাচ্ছে, অফিস যাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে কিন্তু কোথায় যেন মনের মধ্যে কী একটা ব্যাপারে কীরকম যেন গোলমাল রয়েছে, কীসের খটকা, অস্পষ্টতা।

আমাদের এক বিখ্যাত বন্ধু নানারকম ছক এঁকে স্থাপত্য বিজ্ঞানের নকশা বানিয়ে এবং উচ্চগণিতের অতি দুরূহ সমস্ত সমীকরণ করে বার করেছিল যে উনিশশো চুয়াত্তর সালের সাতই জুলাই, রাত এগারোটা বেজে সাতাশ মিনিট সাড়ে বত্রিশ সেকেন্ডে কলকাতা ময়দানের অক্টরলোনি মনুমেন্ট মানে শহিদ মিনার ভেঙে পড়ে যাবে, একেবারে মুখ থুবড়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাবে। কুতুব মিনার, তাজমহল, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি ওইগুলি কবে ভেঙে পড়বে সে বিষয়েও তার বেশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব ছিল। তার বাধ্যবাধকতায় এবং বন্ধুর প্রতিভার প্রতি চক্ষুলজ্জার খাতিরে দশ বছর আগের আষাঢ় শেষের এক প্রবল বৃষ্টির রাতে আমরা সাত-আটজন বন্ধু ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে এগারোটা সাতাশ মিনিট বেজে যাওয়ার পরেও আরও ঘণ্টাখানেক এক হাঁটু কাদাজলের মধ্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। সেদিন রাতে কেন, মনুমেন্ট আজও ভাঙেনি, অদ্যাবধি তাজমহল ইত্যাদিও অটুট আছে। আমার সেই বন্ধুটি এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করেননি।

এ রকম মানসিক সমস্যা অনেকের সাময়িকভাবে দেখা দেয়। তারপর কিছু সময় অথবা কোনও এক বিশেষ ঘটনার পরে সেটা মন থেকে উবেও যায়।

কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানসিক রোগীর মনে কোনও কোনও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। খিদিরপুরের দিকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে জানি। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল জাপানি যুদ্ধের আমলে ওই খিদিরপুরের পাড়ায়। কেন যেন তাঁর ধারণা রয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। জাপানি যুদ্ধবিমান যে কোনও মুহূর্তে হানা চালাতে পারে। এখনও মাঝরাতে তিনি কখনও কখনও ছাদে উঠে যান, চিলেকোঠার জানলার নীচে হামাগুড়ি দিয়ে বসে সন্তর্পণে সারা আকাশ তন্নতন্ন করে দেখেন, কোথাও বোমারু বিমানের ছায়া চোখে পড়ে কি না।

এক সাহেবের কথা পড়েছি হাসির গল্পের বইতে। তার ধারণা সে গোরু। মাঝেমধ্যে মাঠে নেমে চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কচি ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করে। কখনও কখনও হাম্বা-হাম্বা করে ডাকে।

অফিস-কাছারি সবই ঠিকঠাক চালিয়ে যাচ্ছিল সেই সাহেব। শুধু ফাঁকে ফাঁকে, ছুটিতে-অবসরে একটু-আধটু গোরুগিরি করত। রবিবারের সকালে মাঠে নেমে ঘাস খাওয়া, হঠাৎ মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে হাম্বা-হাম্বা রব তোলা—সাহেবের মিসেস সাহেব, মানে এককথায় মেমসাহেব, কোনওরকমে মানিয়ে-শুনিয়ে প্রায় চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিপদ হল, একদিন ওই সাহেব কী এক উত্তেজনার আতিশয্যে নিজেকে ওভার-এস্টিমেট করে ফেললেন. একটি প্রকৃত চার পেয়ে, লেজঝোলা, দুগ্ধ-দায়িনী গোরুর সঙ্গে হঠাৎ গুঁতোগুঁতি বাধিয়ে ফেললেন। তবু ষাঁড় নয়, বলদ নয়, নিতান্ত গোরু সেটা। অস্থিচর্মসার, বেঁটে নিতান্তই আটপৌরে দিশি গোরু না হলেও বিলিতি গোরু। ষাঁড় কিংবা বলদের তুলনায় কম শক্তিশালী। তাই সাহেব

প্রাণে বেঁচে গেল। এক রবিবার বিকেলে গ্রামের মাঠে নেমে নিরীহ একটি গোরুর সিংয়ের সঙ্গে নিজের কপাল ঠেকিয়ে হাম্বা রব তুলে লড়ে গিয়েছিলেন। হতভম্ব গোরুটি এক গুঁতোয় তাঁকে মাটিতে ফেলে, পিছনের দুই খুর দিয়ে লাথি মেরে ছুটে পালিয়ে গেল।

এই অঘটনের পর মেমসাহেব প্রায় জোর করে তাঁকে নিয়ে গেলেন মনোবিকারের ডাক্তারের কাছে।

নানা রকমের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করে ডাক্তার সাহেব তাঁর রোগীর কোনও বিকার আবিষ্কার করতে পারলেন না। সব বিষয়ে সব প্রশ্নের ঠিকঠাক, যে কোনও বুদ্ধিমান, সাব্যস্ত ব্যক্তির মতো উত্তর দিচ্ছেন তথাকথিত রোগীটি কিন্তু যে মুহূর্তে গোরুর প্রশ্ন তুলছেন, গোরুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছেন, সাহেব হাম্বা করে উঠছেন, বিকট সেই হাম্বা চিৎকার অনেকক্ষণ ধরে। ডাক্তার সাহেব যতই বোঝান ততই সাহেবটি বলেন যে, তাঁকে বুঝিয়ে কোনও লাভ হবে না, কারণ বোঝার কিছু নেই, তিনি নিজের মনে মনে অনেক বুঝে দেখেছেন এবং তিনি ভাল করেই জানেন তিনি সত্যিই গোরু, একটি আসল গোরু, মানুষ নন, কিছুতেই মানুষ নন।

এমন রোগী এমনকী ওই মনোবিজ্ঞানের স্বর্গভূমি বিলাত দেশেও খুব বেশি পাওয়া যায় না। ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং স্বভাবতই জানতে চাইলেন, 'কবে থেকে আপনি বুঝতে পারলেন যে, আপনি মানুষ নন, আপনি গোরু?' সাহেবটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'সে অনেক কাল থেকে।' ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তবু বলুন কতদিন আগে থেকে।' রোগীটি এবার একটু মৃদু হাসলেন, তারপর এক লাফ দিয়ে চেম্বারের কোচের উপর চতুষ্পদ জন্তুর মতো চার পায়ে দাঁড়িয়ে, মৃদু হাম্বা-হাম্বা ধ্বনি তুলতে তুলতে বললেন, 'সেই যবে বাছুর ছিলেম তবে থেকে।' ডাক্তার সাহেব এবার বুঝতে পারলেন, ইনি শুধু বর্তমানের গোরু নন, ইনি একদা বাছুরও ছিলেন। এরপর ডাক্তারের আর কিছু করার রইল না, হাল ছেড়ে দিলেন। তবে মেমসাহেবকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনার স্বামীর জন্য আর কিছু করার নেই। তবে ঘাস-বিচালি খেয়ে পুষ্টির অভাবে যাতে মারা না পড়ে সেইজন্য ঘাসের সঙ্গে একটু করে ভিটামিন কমপ্লেক্স মিশিয়ে দেবেন।'

অবশ্য এ কাহিনী একেবারে প্রত্যন্ত সীমার। কাছাকাছির মধ্যে একজন নামকরা কবিকে জানি, যাঁর বয়েস এখন অন্তত ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। তাঁর ধারণা তিনি এখনও লম্বা হচ্ছেন। তাঁর বাড়ির দেয়ালে স্কেলকাঠি দিয়ে ছকে রেখেছেন। মাঝেমধ্যেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে নিজেকে মাপেন, কখনও মনে হয় একটু বেড়েছেন, কখনও তত বাড়ছেন না বলে আপসোস করেন। চোদ্দো-পনেরো বছরের যে কোনও উচ্চতাকাঙ্ক্ষী, লম্বাপরায়ণ কিশোরের মতো তাঁর উৎসাহ এ বিষয়ে। তিনি নিয়মিত রিং করছেন এবং যোগব্যায়াম। কে তাঁকে বোঝাবে এ জন্মে তাঁর আর লম্বা না হলেও চলবে এবং হাজার চেষ্টাতেও তিনি লম্বা হবেন না, হতে পারেন না।

আমার ভাইয়ের এক সহকর্মী ট্রামের ব্যবহৃত টিকিট সংগ্রহ করতেন। কত লোকের কতরকম বাতিক থাকে, দেশলাইয়ের খোলা থেকে বাঘের চামড়া কত মানুষ কত কী জমায়—সুতরাং টিকিট সংগ্রহকারীর বন্ধুবান্ধব, অফিসের লোকেরা তাঁর ওই বাতিক নিয়ে কিছু মাথা ঘামায়নি।

একবার ভদ্রলোক মাসখানেক অফিসে আসেননি। তাঁর স্ত্রীর চিঠি পেয়ে আমার ভাই তাঁর বাড়িতে যায়, গিয়ে দেখে তিনি শয্যাশায়ী। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন অতিরিক্ত ট্রামের টিকিট খেয়ে নাকি তাঁর ওই অবস্থা। আমার ভাই বিছানার পাশে টেবিলের উপরে তাকিয়ে দেখল নানা রংয়ের, নানা দামের রাশি রাশি ট্রামের টিকিট আলাদা আলাদা করে তাড়া বেঁধে রাখা আছে। সামনে একটা প্লেট, প্লেটের পাশে কাসুন্দি, টম্যাটো সস, চিলি সসের শিশি, নুনদান, মরিচদান। আমার ভাই অবাক হয়ে ওইদিকে তাকিয়ে থাকায় শয্যাশায়ী বন্ধু আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, অল্প কাসুন্দি ও চিলি সস দিয়ে কয়েকটা ধর্মতলা টু হাওড়ার সেকেন্ড ক্লাসের সবুজ রংয়ের তাজা টিকিট টেস্ট করে দেখবে কিনা, কিংবা টম্যাটো সসে চুবিয়ে কয়েকটা ধবধবে সাদা বালিগঞ্জ-পার্ক সার্কাস লাইনের টিকিট? ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'এতদিন তো তবু ভালই ছিল; চিৎপুর, বাগবাজার, বেলগাছিয়ার

টিকিট তবু মোটামুটি হজম হচ্ছিল, কিন্তু এই হাওড়ার আর বালিগঞ্জের টিকিট কিছুতেই ওঁর সহ্য হচ্ছে না। ডাক্তারও দেখাবে না, অথচ হাওড়ার টিকিটের জন্য কী লোভ কী বলব?'

সেই ট্রাম-টিকিটলোভী ভদ্রলোকের কী হয়েছিল, ঈশ্বর জানেন। তিনি আর অফিসে আসেননি। আমার ভাইও ভয়ে ভয়ে যায়নি।

কিন্তু শুধু কাগজ খাওয়া বা গোরু মনে হওয়া নয়, অনেক ছোটখাটো মানসিক অস্বাভাবিকতায় আমরা ভুগি। কেউ হয়তো বিনা কারণে ভয় পাই, কারও হয়তো বারান্দার রেলিংয়ের কাছে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, বন্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে। আবার কেউ হয়তো একা একা কথা বলে।

এইরকম এক একা একা কথা বলার রোগী এক মনঃসমীক্ষকের কাছে গিয়েছিলেন। মনের ডাক্তার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না, বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? অনেকেই একা একা কথা বলে, আমি নিজেই বলি।' রোগী করুণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু, জানেন না তো ডাক্তারবাবু, আমি যে কী সাংঘাতিক বোর! নিজে নিজে কথা বলে আমি একদম টায়ার্ড হয়ে যাই।'

ভ্রমণকাহিনী (১)

বিশাল বিমানের একপ্রান্তে জানলার পাশে কম্পিত হৃদয়ে বসেছিলাম। সেই আমার সামান্য জীবনের আদি এবং অকৃত্রিম বিদেশ ভ্রমণ। একটু আগে বিমানের সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভেতরে ঢোকার দরজা বন্ধ করা হয়েছে, কোমর-বন্ধনী শক্ত করে আটকানোর জন্যে আলোক-সংকেত জ্বলে উঠেছে। জানলার কাচের সোজাসুজি দেখলাম বিমানের সামনের পাখা তীব্রবেগে ঘুরছে, এই পাখাকেই বোধহয় প্রপেলার বলে। সে যাই হোক, মুহূর্তের মধ্যে বিমান গতি পেল এবং সেই মুহূর্তে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি নীচের মানুষগুলোকে ছোট ছোট কালো পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। সত্যি কী আশ্চর্য, কী তাড়াতাড়ি উড়োজাহাজ কত উঁচুতে উঠে গেছে! বিজ্ঞানের কী আশ্চর্য লীলা!

আমার পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি আমার মতোই এই প্রথম বিদেশ যাচ্ছেন। কিছুকাল আগে তাঁর স্বামী নিউইয়র্কে গেছেন, এবার তিনি স্বামীর সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে একই বিমানে আজ সকালে কলকাতা থেকে দিল্লি এসেছেন, এখন আবার একই বিমানে আমরা বিদেশমুখী। সামান্য আলাপ হয়েছে মহিলার সঙ্গে। ক্ষণিকের মধ্যে বিমানের ঊর্ধ্বারোহণে মানুষগুলি পিঁপড়ের মতো দেখতে হয়ে যাওয়ায় আমি আমার উত্তেজনা দমন করতে পারিনি, আমি মহিলাকে জানলার কাচের বাইরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম, 'দেখুন, দেখুন, এক মিনিটের মধ্যে প্লেনটা কত উঁচুতে উঠে গেছে, মানুষজন সব পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে।' কৌতূহলী হয়ে ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে জানলার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে খিলখিল করে হেসে বললেন, 'প্লেন এখনও ছাড়েইনি, উপরে উঠবে কী করে? আপনি যেগুলোকে মানুষ ভাবছেন, ছোট হয়ে পিঁপড়ের মতো হয়ে গেছে ভাবছেন, সেগুলো সত্যিই পিঁপড়ে, সত্যিকারের আসল খাঁটি পিঁপড়ে। প্লেনের জানলায় ঘুরছে, এগুলো মানুষ নয়।'

তদবধি আমার ভ্রমণ-ভ্রমের শুরু, তদবধি আমার ভ্রমাবলি আমার মসৃণ যাত্রাকে ক্রমাগত কণ্টকিত করেছে।

অবশ্যই সমস্তই ভ্রম বলে চালানো যাবে তা বোধহয় নয়। অনেকখানিই আমার মূর্খতা ও অজ্ঞানতা।

কিন্তু আমিই বা জানব কী করে?

আমি যে সময়টা মার্কিন দেশে ছিলাম, সেটা সাংঘাতিক শীত ঋতু। বাংলা কাগজে যেমন গরম বা বর্ষা বা বন্যা বা খরা নিয়ে সদাসর্বদাই বলে যে নিদারুণ ব্যাপার, এ রকম আর ইতিপূর্বে কখনওই হয়নি, তেমনিই সে বছর সমস্ত মার্কিনি দৈনিকগুলো বলে যাচ্ছিল, এটাই হচ্ছে শতাব্দীর শীতলতম শীত ঋতু।

সে যাই হোক, আমি আয়োজনের ত্রুটি করিনি। দক্ষিণ কলকাতায় আমার পরিচিত সমস্ত বাড়ি থেকে আমার গায়ের কাছাকাছি মাপের যত সোয়েটার, কোট, ওভারকোট, গরম টুপি, পশমের মোজা সব সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। গলা-উঁচু ফুলহাতা তুলোর গেঞ্জি, তার উপরে সার্জের ফুলশার্ট, তার উপরে হাতকাটা সোয়েটার, হাতকাটার উপরে ফুলহাতা সোয়েটার, তারপর গলাবন্ধ কোট, তারপর গলায় মাফলার, মাথায় টুপি, সর্বোপরি আমার থেকে তিন সাইজ বড় একটি ওভারকোট—এই ছিল আমার উত্তমাঙ্গের পোশাক; নিম্নাঙ্গের সাজসরঞ্জামও কম ছিল না। এ ছাড়া ছিল হাতে গরম দস্তানা, পায়ে গরম ফুল মোজা। জামাকাপড় পরে ওজনের যন্ত্রে ওজন নিয়ে দেখেছিলাম, আমার স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ওজন তিরিশ কেজি বেড়ে যাচ্ছে। ওয়াশিংটন-নিউইয়র্কে মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে টের পেয়েছি সাহেবরা আমাকে গোপনে টিপে টিপে দেখছে, বুঝতে চাইছে আমি প্রকৃতই কীরকম, আমার সারমর্ম কী!

দুঃখের বিষয়, এত সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও আমার সঙ্গে মাফলার ছিল মাত্র একটি। একদিন বিকেলে হোটেলে ফেরার পথে ঝোড়ো হাওয়া, ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর উড়ন্ত শিমুল তুলোর মতো বরফের আঁশে আমার মাফলারটি জবজবে ভিজে গেল। পশমের জিনিস একবার ভিজে গেলে সহজে শুকোতে চায় না; পরদিন সকালে বেরনোর সময় দেখলাম আমার মাফলার তখনও রীতিমতো ভেজা রয়েছে, গলায় জড়িয়ে বেরলে নির্ঘাত নিমুনিয়া হবে। যে রাস্তায় ছিলাম সেই গলির মোড়েই একটা বড়সড় জামাকাপড় এবং আরও নানা জিনিসের দোকান। কাচের শো-কেসে দেখলাম, বহু দ্রব্যের মধ্যে দু'-চারটি চমৎকার মাফলারও রয়েছে। দোকানে ঢুকে একটা মাফলার চাইলাম।

সুন্দরী বিক্রয়-বালিকা দু'বার স্মিত হেসে আমার ক্ষমা ভিক্ষা করে জানতে চাইল আমি কী চাইছি, আমি আবার বললাম, 'মাফলার।' স্বাভাবিক সৌজন্যবশতই হোক আর বিদেশি বলেই হোক, মেমসাহেব দোকানের বাইরে সিঁড়িতে বেরিয়ে এসে দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে দেখিয়ে বলে দিলেন, এই ব্লকের অন্যপ্রান্তের দোকানে মাফলার পাওয়া যাবে।

এই দোকানেই মাফলার রয়েছে অথচ আমাকে অন্য দোকানে পাঠাচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। এমন হতে পারে এদের জিনিসটা তেমন ভাল নয়, একজন বিদেশিকে ঠকাতে চায় না তাই ওখানে পাঠাচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে দুটো একই দোকান, জামাকাপড় ইত্যাদি ওখান থেকে বিক্রি হয়, আর সব এখানে।

কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ও-প্রান্তের দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম। ও মা! এ তো একটা মোটর পার্টসের দোকান, কাচের শো-কেসে গাড়ির যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে। মাফলার এখানে কী করে পাব?

তারপর ভাবলাম, এদেশে ড্রাগ স্টোরে রেস্টুরেন্ট চলে, রেস্টুরেন্টে ডাকটিকিট বিক্রি করে, হয়তো গাড়ির যন্ত্রপাতির দোকানে গলার মাফলার পাওয়া যাবে। বিরাট মোটামতো লম্বা চওড়া এক

দশাসই সাহেব দেড় ফুট একটা লোহার রেঞ্জ হাতে, আমি ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই, তার বিরাট থাবা আমার কাঁধে চেপে দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি সহকারে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাল্লো।' কারও কণ্ঠস্বর যে অন্তর থেকে কর্কশ হতে পারে এই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম হল।

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চিরদিনের নামকরা কাপুরুষ আমি। সবরকম বিপজ্জনক স্থান ও অবস্থা থেকে সবসময় যথাসাধ্য দূরে থাকি। কোনওরকমে কাঁধটাকে সংকুচিত করে সাহেবের সচল থাবার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতেই থাবাটা আরও চেপে বসে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার অমায়িক গর্জন, 'হ্যাল্লো।' থাবার ঝাঁকির ধাক্কাটা কিঞ্চিৎ ধাতস্থ করে নিয়ে আমি অবশেষে আমার পক্ষে যতটা মিনমিন করে বলা সম্ভব সেইভাবে করুণ কণ্ঠে ঐতিহ্যময় টাঙ্গাইল ইংরিজিতে নিবেদন করলাম, আমি একটা মাফলার কিনতে এসেছি। তারপর ভয় এবং মনের দুঃখে বুদ্ধির খেই হারিয়ে ফেললাম, আমার অসুবিধের কথা বলতে লাগলাম। বললাম, ওয়াশিংটনের এই মারাত্মক বৃষ্টি-বরফে আমার মাফলার ভিজে গেছে এবং এই ঠান্ডায় ভিজে মাফলারে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

একটা সামান্য মাফলার, তাও নিজের পয়সা দিয়ে নগদ কিনব, তার জন্যে কেন যে আমি এত কাকুতি-মিনতি করতে গেলাম, কেন যে আমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হল বলা কঠিন।

কিন্তু আমার ভাষার প্রসাদগুণেই হোক কিংবা করুণ কাহিনীর জন্যেই হোক, সাহেব যত শোনে তত ভ্রূকুঞ্চন করে, চোখ গোল গোল করে আর অবাক হতে থাকে। সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যেই প্রশ্ন করতে থাকে, 'মাফলার? ইউ মিন মাফলার? ওয়েট মাফলার?' আমিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই, 'ইয়েস স্যার, মাফলার স্যার, মাই মাফলার ওয়েট স্যার।'

এইরকম আশ্চর্য কথোপকথন কিছুক্ষণ চলার পরে ওই দুর্দান্ত সাহেবের বোধহয় একটু মায়া হল, তার বজ্র থাবা কিঞ্চিৎ শিথিল হল। তারপর হঠাৎ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়ি কোথায়?'

কেন যে সাহেব এই প্রশ্ন করল আমি বুঝতে পারলাম না। আমি আরও বিনীতভাবে জানালাম, 'আমার কোনও গাড়ি নেই। সাহেব, আমি গরিব বিদেশি, এখানে কেন, দেশেও আমার কোনও গাড়ি নেই।'

আমার কথা শুনে সাহেব ভীষণরকম ঘাবড়িয়ে গেল, 'ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ কার? তোমার গাড়ি নেই? অথচ মাফলার চাইছ? মাফলার দিয়ে কী করবে?'

এখনও কিছু বুঝতে না পেরে আমি বললাম, 'সাহেব, মাফলার আমার গলার জন্য চাইছি। আমার একটাই মাফলার, সেটা ভিজে গেছে।'

সাহেব এবারে সশব্দে হো হো করে হেসে উঠল, তারপর দোকানের ভিতরে যত লোক ছিল সবাইকে আমার চারপাশে ডেকে আনল, 'হিয়ার ইজ এ ফানি গাই, এ লোকটার গাড়ি নেই কিন্তু মাফলার চাই।' বলে পরমানন্দে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

এই ঘটনার কার্যকারণ সেদিন বুঝতে পারিনি। পরে জেনেছি, আমেরিকানরা মাফলার অর্থে বোঝে গাড়ির সাইলেন্সার। আমার গাড়ি নেই অথচ সাইলেন্সার চাইছি, এ রকম অসম্ভব কথা তারা কখনও শোনেনি। সাহেবদের অট্টহাসি পিছনে রেখে আমি বেকুবের মতো সেই মোটরপার্টসের দোকান থেকে সেদিন বেরিয়ে এলাম।

প্রসূতি সদন

শ্রীমান কখগ আজ সকালেই পিতৃত্বের গৌরবান্বিত পদে উন্নীত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অআ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে একটি সুস্থ সাড়ে আট পাউন্ড বলবান পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। প্রসূতি ও নবজাতক দু'জনেই চমৎকার। কোনও গোলমাল নেই। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবী বিকেল থেকে ভিড় করে শ্রীমতী অআকে এবং সদ্যোজাত শিশুপুত্রটিকে দেখতে এসেছে। রীতিমতো আনন্দ-উৎসব। একটু আগে সাতটা বাজতে নার্সিংহোমের বিদায় ঘন্টা বেজেছে। কিছুটা বিলম্বিত লয়ে হলেও সবাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেছে। প্রত্যেককে শ্রীমান কখগ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন। শেষ দলটিকে ট্রামে তুলে দিয়ে সন্তর্পণে শ্রীমান কখগ নার্সিংহোমে ফিরে এসেছেন। তারপর সদর দরজায় দারোয়ানকে দুটি টাকা বকশিস দিয়ে দোতলায় শ্রীমতী অআ-র কেবিনে চলে এসেছেন। তারপর আবার দু'টাকা খরচ। রাতের আয়াকে বকশিস দিয়ে অনুরোধ করলেন বাচ্চাকে একটু নিয়ে আসতে।

বাচ্চাটি এল। শ্রীমতী অআ একটু কষ্ট করে খাটে হেলান দিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বসলেন। শার্টের পকেট থেকে বাজারের ফর্দের মতো একটা লম্বা তালিকা বার করলেন শ্রীমান কখগ। এরপরে আরম্ভ হল তালিকা মেলানো। একটি মনুষ্য-শিশুর শরীরের সমস্ত বিবরণ রয়েছে সেই তালিকায়। শ্রীমান একটি করে আইটেম বলেন আর শ্রীমতী সেটা মেলান, সঙ্গে সঙ্গে টিক পড়ে ফর্দে। মাথা এক, কান দুই, নাক এক, নাকের ফুটো দুই, চোখ দুই, মুখ এক, জিব এক। এইভাবে নামতে নামতে বাঁ হাত এক, বাঁ হাতে আঙুল পাঁচ, ডান হাতে এক, ডান হাতে আঙুল পাঁচ। সর্বশেষে গোড়ালি দুই, চৌষট্টি দফায় এই ফর্দে আগাগোড়া যখন টিক পড়ল, শ্রীমান কখগ-শ্রীমতী অআ নিশ্চিন্ত হলেন, 'না, সবই ঠিকঠাক মিলেছে। তাঁদের সন্তান পুরোপুরিই জন্মেছে। কোনও খুঁত-টুঁত নেই।' একটা পাষাণভার নেমে গেল দু'জনারই বুক থেকে।

এই দুশ্চিন্তা কিন্তু কখগ-অআ দম্পতির নিজস্ব নয়। প্রতিটি দম্পতিরই অন্তত প্রথম সন্তানের বেলায় ভাবনা থাকে কেমন হবে, সব ঠিকঠাক হবে কিনা। তবে এ ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন বাবা নতুন মায়ের চেয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামান। এবং সেই মাথা ঘামানো শুধু সন্তানকে নিয়ে নয়, সন্তানের মাকে নিয়েও।

ডাক্তার এবং হাসপাতালের কাছে সন্তানসম্ভবা মাতার চেয়ে সন্তানসম্ভব পিতা অনেক বেশি বিপজ্জনক। আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগে আমার ছেলে জন্মানোর সময় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাকে তাঁর চেম্বারে তালা দিয়ে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সদ্যোজাত অথবা সদ্যসম্ভব সন্তানের বাবা অত্যন্ত বিরক্তকারী প্রাণী। বহু সময়ে দেখা যায় যে-মহিলাটি সন্তান ধারণ করেছেন, তিনি মোটামুটি নির্বিকার; দাঁত চিপে, মুখ বন্ধ করে প্রাচীন যন্ত্রণা সহ্য করছেন। কিন্তু ভাবী পিতা অস্থির হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন। একবার ডাক্তারকে, একবার নার্সকে, এমনকী অচেনা লোককে অস্থির করে দিচ্ছেন তাঁর কাল্পনিক এবং উদ্ভট সমস্ত জিজ্ঞাসা ও দুর্ভাবনা নিয়ে। ধাত্রীবিদ্যার এক বিখ্যাত মহিলা ডাক্তার আমাকে পরোক্ষে একদা বলেছিলেন যে প্রত্যেক প্রসূতি সদনের একতলায় একটি হাজত-ঘর করা উচিত, যেখানে ভাবী বাবাদের তাঁদের সন্তান না জন্মানো পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

তিনি অনুযোগ করেছিলেন, 'বউয়ের স্টেচারের বা ট্রলির পিছু পিছু এরা লেবার রুমে পর্যন্ত ঢুকে যায়।'

এসব সমস্যা সন্তান জন্মানোর সময়কার। তার আগের সমস্যাগুলিও কিছু কম নয়। ওষুধ-পথ্য, আচার-কাসুন্দি, ভাল ডাক্তার, নির্ভরযোগ্য নার্সিংহোম—এসব সমস্যা তো আছেই; তার পরেও আছে সেই পুরনো প্রশ্ন, ছেলে না মেয়ে?

মাঝে-মধ্যেই ফ্রান্স কিংবা কানাডা থেকে ডাক্তারি সংবাদ আসে পেটের বাচ্চা ছেলে না মেয়ে জানার খুব সহজ পন্থা আবিষ্কার হয়ে গেছে। রয়টারের পাঠানো তিন সেন্টিমিটার খবর। কিন্তু খবরটা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ খবরটা পুরনো অথবা বলা চলে পৌনঃপুনিক—'আর চিন্তা নাই' গোছের। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার মতো, একটা নিয়মিত ব্যবধানে ও রকম সংবাদ পাঠানো একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার চেয়ে খনার বচন ভাল। ফুলের নাম, মায়ের নাম, বাবার নাম সব গুণ কিংবা যোগ কিংবা বিয়োগ করে সোজাসুজি তিন দিয়ে ভাগ। ভাগফল দুই হলে ছেলে, এক হলে মেয়ে, আর শূন্য হলে সর্বনাশ।

এই সর্বনাশের কথায় মনে পড়ে যাচ্ছে সেই গোলমেলে গল্পটি। কফি হাউসে বসে কয়েকজন ভদ্রলোক গল্প করছিলেন। গল্পের বিষয়বস্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর, পণ্ডিতি ভাষায় বলা যায়, 'ভাবী জাতকের উপরে মাতার মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব।'

একজন একটা আশ্চর্য ঘটনা বললেন। তাঁর শ্যালি পেটে বাচ্চা আসার পর "শ্যামদেশের যমজ" নামে একটা বই পড়ে খুব চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং কী আশ্চর্য, পরশুদিন তার নিজেরই যমজ ছেলে হয়েছে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রায় একইরকম কিন্তু অধিকতর বিস্ময়জনক কাহিনী শোনালেন। তাঁর এক প্রতিবেশিনী গর্ভবতী জীবনে "The Strange Stories of Triplets" অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটি বাচ্চা জন্মানোর বিচিত্র গল্পমালা নামে একটি ইংরেজি বই পাঠ করেছিলেন, পরিণামে অবশেষে তাঁর তিনটি বাচ্চা জন্মেছে।

টেবিলের অপর প্রান্তে এক নিরীহ ভদ্রলোক এতক্ষণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে এইসব কাহিনী শুনছিলেন। এই গল্পটি শোনার পরে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুরা বললেন, 'কী হল, এত তাড়াতাড়ি উঠলে কেন? রাত তো তেমন কিছু হয়নি। একটু বসে যাও।' ভদ্রলোক বললেন, 'না ভাই, আমার সর্বনাশ হয়েছে!' সবাই জানতে চাইলেন, 'কেন, কী সর্বনাশ হল?'

ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই, আমার বউয়ের তো বাচ্চা হবে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় দেখলাম সে বসে বসে "আলিবাবা ও চল্লিশ চোর" পড়ছে। দুই-তিন তবু ভাবা যায়, কিন্তু চল্লিশ চোর? আমার কী হবে?' এই বলে সে নিরীহ বেচারি পাগলের মতো বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন। হতভম্ব বন্ধুরা স্তব্ধ হয়ে তাঁর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সাহেবরা সন্তান জন্মানোর পরে চুরুট বিলি করেন। চুরুটের মোড়কে লেখা থাকে—ইটস্ এ বয়, ইটস এ গার্ল। আমাদের বাল্যকালে মফস্বল শহরে দেখেছি শাঁখ বাজাতে। আমরা কতবার শাঁখ বাজানো হল গুণতাম। বোধহয় জোড় সংখ্যা বাজলে ছেলে আর বিজোড় সংখ্যায় মেয়ে, উলটোটাও হতে পারে। কোনদিক থেকে কোন বাড়ির শাঁখের আওয়াজ আসছে শুনে প্রবীণা গৃহিণীরা বুঝে ফেলতেন, 'আহা, বিপিনের আবার মেয়ে হল।'

অতঃপর, অশৌচ, আটকড়াই, ছয় ষষ্ঠী ইত্যাদি নানা সংস্কার। ধোপা-নাপিতের কিঞ্চিৎ আয়। সম্ভবমতো প্রতিবেশীদের মিষ্টান্ন লাভ।

এসব পুরনো দিনের কথা। আজকাল শহুরে নার্সিংহোমে দারোয়ান, বেয়ারা, আয়াকে কিছু বকশিস দিয়েই মিটে যায়। এক সরকারি হাসপাতালে দেখেছিলাম, এক ভদ্রলোক প্রসূতি ও প্রসূতকে নিয়ে বেরতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছেন। সবাই বকশিস চাইছে। অবশেষে ভদ্রলোক

হাত জোড় করে সবাইকে বললেন, 'ভাইসব, এবার আর নয়। বউদিকে দেখে রাখুন। উনি এখানে বছর বছর আসবেন, আমিও আপনাদের বছর বছর বকশিস দেব।'

পুনশ্চ: একটু অপ্রাসঙ্গিক, তবু একটা উড়ো ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার এক প্রসূতি সদনের ডাক্তারবাবুকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ডাক্তারি বিদ্যার এত শাখা থাকতে আপনি কেন এই সন্তান জন্মানোর নারী-ঘটিত ব্যাপারে এলেন, টাকার জন্যে?' ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'না, ঠিক তা নয়। দেখুন, ক্যানসারের রোগী দেখলে ভয় হত আমারও বুঝি ওরকম হয়েছে, টিবির রোগী কাশত, আমিও কাশতাম। যেখানে যে রোগীর যে রোগ দেখতাম মনে হত আমারও সে রোগ আছে। সব লক্ষণ মিলে যেত। অবশেষে এই মাতৃসদনে এসে নিশ্চিত হয়েছি—এই রোগ অন্তত আমার হবে না।'

নিজের ওজন নিজে বুঝুন

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। সন্ধ্যার দিকে চৌরঙ্গি রোড ধরে হেঁটে ফিরছি, হঠাৎ সামনে এক ব্যক্তি এসে উদয় হলেন। দেখে একটু চমকে উঠেছিলাম, আগে-ভদ্রলোক-ছিলাম গোছের চেহারা। শীর্ণ, ময়লা জামা, ছেঁড়া চটি, চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত ভাব। অবশ্য একটু পরেই বুঝলাম আমার চমকানোটা অমূলক, লোকটি একজন সামান্য ভিখিরি; গুণ্ডা বা ছিনতাইকারী নয়।

ব্যক্তিটি আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা, দশটা পয়সা দেবেন, দু'-দিন কিছুই খাইনি।' বুঝতে পারলাম লোকটি শুধু ভিখিরি নয়, নির্বোধও বটে, দু'-দিন যদি না খেয়ে থাকে, তবে দশ পয়সায়, মাত্র দশ পয়সায় আজকের দিনে কী খেতে পাবে! আমি বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'দু'-দিন যদি না খেয়ে থাকেন, তা হলে দশ পয়সা দিয়ে কী হবে?' উত্তরে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি বললেন, 'একটু ওজন নিয়ে দেখতাম, আমার ওজন কতটা কমেছে।'

একজন পথের ভিক্ষুকের এইরকম বৈজ্ঞানিক মনোভাব দেখে আমি এরপর কতটা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেটা বুঝিয়ে বলার নিশ্চয় দরকার নেই। তবে সেই মুহূর্তে আমারও মনে পড়ল বেশ কিছুদিন আমি নিজেও ওজন নিইনি, বহু কষ্টে শরীরের স্থূলতা মাস কয়েক আগে অনেকটা কমিয়েছিলাম, এখন সন্দেহ হচ্ছে আবার বুঝি মোটা হয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, আমার এই ওজন কমানোর ব্যাপারটা আমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-পরিজন অনেকেই বিশেষ সহজভাবে নেননি, অনেকেই আমার মধ্যদেশের দিকে ভ্রূকুঞ্চন করে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 'সত্যি রোগা হয়েছ, বলছ?' এমনকী আমার সহধর্মিণী পর্যন্ত এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। একবার তাঁর সামনে ওজন নিয়ে ওজন-যন্ত্রের কার্ডে দেখলাম আগের বারের চেয়ে দেড় কেজি ওজন কম। ভদ্রমহিলা ওজনের অঙ্কের দিকে না তাকিয়ে কার্ডের নিম্নাংশের আপ্ত বাক্যটি পড়তে লাগলেন, ইংরেজিতে লেখা সেই সদুক্তি, যার বঙ্গানুবাদ হবে, 'আপনি সৎ চরিত্রের, উদার দিলখোলা লোক। সকলেই আপনাকে ভালবাসেন।'

ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে বললেন, 'এই কথাগুলো তোমার সম্পর্কে যেমন মিথ্যে, তেমনি মিথ্যে তোমার ওজনের হিসেব।'

এই সূত্রে এক স্থূলাঙ্গিনী মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর স্বামী তাঁর উপরে খুব অত্যাচার করেন, তিনি ক্রমশ কাহিল হয়ে যাচ্ছেন, ক্রমশ কিঞ্চিৎ রোগাও হয়ে যাচ্ছেন। এইরকম সময়ে এক বান্ধবীর সঙ্গে সেই মেমের দেখা। বান্ধবী তাঁকে অনেকদিন পরে দেখে বললেন, 'এ কী, লরা, তোমার একী চেহারা হয়েছে!' লরা মেম তখন তাকে বললেন যে তাঁর স্বামীর অত্যাচারে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে। এই বলে নিরালায় বসে চোখের জলে ভিজিয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণ পতি-নিন্দা করলেন, অত্যাচারের বিবিধ বর্ণনা দিলেন এবং সর্বশেষে বললেন যে, স্বামীর অমানুষিক ব্যবহারে গত কয়েক মাসে তাঁর পনেরো পাউন্ড ওজন কমে গেছে। দরদি বান্ধবী তখন সুপরামর্শ দিলেন, তা হলে তুমি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স করছ না কেন? তুমি যা যা বললে আদালতে জানালে সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স পেয়ে যাবে।' তখন লরা মেম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ডিভোর্স করব, নিশ্চয়ই করব। তবে আরও কিছুদিন পরে।' বিস্মিতা বান্ধবী বললেন, 'বিবাহবিচ্ছেদ যদি করতেই হয় তবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করা কেন?' স্থূলাঙ্গিনী লরা বললেন, 'আমার ওজনটা আর পনেরো-বিশ পাউন্ড কমলেই আমি ওঁর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনব।'

নোবেল প্রাইজের সঙ্গে ধ্বনি সমন্বয় করে ইংরেজিতে একটা বাজে পান (Pun) আছে, নো বেলি প্রাইজ (No Belly Prize)। যে কেউ রোগা হচ্ছেন, খাদ্য কমিয়ে বা পরিশ্রম বাড়িয়ে ওজন ওরফে ভুঁড়ি কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কী হে, তুমি কি নো বেলি প্রাইজের চেষ্টা করছ নাকি?'

আরেকটা মোটা দাগের বিলিতি গল্প আর এক মোটা মেমসাহেবকে নিয়ে। সেই গজেন্দ্রগামিনী তাঁর ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আজ আমার জন্মদিন।' ও-প্রান্তে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে।' মোটা মেম বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার সাহেব, আমি বড় বেকায়দায় পড়েছি, আমাকে শিগগির একটা রোগা হওয়ার জোরালো ওষুধ পাঠিয়ে দিন।' ডাক্তার সাহেব শুধোলেন, 'ম্যাডাম, জন্মদিনে রোগা হওয়ার ওষুধ দিয়ে কী হবে?' 'কী বলব ডাক্তার সাহেব, আমার বর আমাকে একটা উপহার দিয়েছে। কিন্তু সেটা এতই ছোটো যে আমি তার মধ্যে গলতে পারছি না।' মহিলার করুণ কণ্ঠে এই সংবাদ পেয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি পোশাকটা সঙ্গে করে চলে আসুন, দেখি কতটা কী করা যায়?' মোটা মেম আর্তনাদ করে উঠলেন, 'পোশাক? পোশাক কী বলছেন? আমার স্বামী আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে, আমি সেই গাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারছি না।'

একদা বড় ওজনের মানুষ বলতে বোঝাত ক্ষমতাবান, কৃতী মানুষদের। তখন মানুষদের সাফল্যের মাপকাঠিই ছিল তার ওজন। এখন একমাত্র যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর কোথাও ওজনের কোনও গুরুত্ব নেই।

চালু কথাই ছিল, নিজের ওজন বুঝে চলবে, নিজের ওজন বুঝে কথা বলবে। তখন ওজন মানেই ছিল গুরুত্ব। কিন্তু এখন সবচেয়ে সফল লোকেরা চাইছেন তাঁদের ওজন কমাতে, ছিমছাম, ফিটফাট হতে। অতিরিক্ত দেহ-ভার নাকি কর্মশক্তি, জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়।

কিন্তু একথা বুঝি পুরোপুরি সত্য নয়। এখনও মাঠে-ময়দানে দেখি শেষরাতের অন্ধকারে আর বিকেলের ছায়ায় হাজার হাজার মোটা লোক যেমন হনহনিয়ে ছুটছে রোগা হওয়ার জন্যে, তেমনিই হাজার হাজার রোগা লোক ছুটছে মোটা হওয়ার জন্যে।

মোটা-রোগার কথায় মনে পড়ে, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের মোটা নায়ক (তাঁর স্ত্রীও মোটা) বলেছিলেন, আমরা বাড়িতে মোটামুটি দু'জন। এরই প্রতিধ্বনি তুলে একদা আমার এক অসুস্থ বন্ধুর রুগ্ন সহধর্মিণী বলেছিলেন, 'আমরা রোগারুগী দু'জন।'

তবে মোটা-রোগা নিয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প দুই খ্যাতিমান সাহেবকে নিয়ে। এঁদের দু'জনের

নাম আমার বারবার গুলিয়ে যায়, তাই জব্দ হওয়ার ভয়ে লিখছি না (বার্নার্ড শ এবং চেস্টারটন নয় তো? হে সুশিক্ষিতা পাঠিকা, ভুল হয়ে থাকলে, দয়া করে চিঠি দিয়ে বা ফোন করে অপমান করবেন না। আমার বিদ্যের দৌড় তো আপনি এতদিনে বুঝে গেছেন। আর কাণ্ডজ্ঞানের দৌড়ও প্রায় শেষ।)

সে যা হোক, বার্নার্ড শ যেমন রোগা ছিলেন, চেস্টারটন ছিলেন তেমন মোটা। একদিন কী একটা কথার মধ্যে চেস্টারটন বার্নার্ড শ'র দিকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'তোমাকে দেখলেই মনে হয় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে।' ক্ষুর-জিহ্ব বার্নার্ড শ সঙ্গে সঙ্গে স্থূল চেস্টারটনকে বলেছিলেন, 'অবশ্য তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় দুর্ভিক্ষের কারণটা কী!'

এত সব কথা বলতে গিয়ে ওজনের গল্পগুলো কিন্তু ঠিকমতো বলা হল না। অন্তত দুটো বলা যাক।

একবার এক প্রগলভা সুন্দরীকে কে যেন না বুঝে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি একটু মোটা হয়ে গেছেন নাকি?' প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা চোখ নাচিয়ে বললেন, 'বাজে কথা। এই জংলি শাড়িটার জন্যে এমন দেখাচ্ছে। জামাকাপড় খুলে আগেও আমার ওজন ছিল একশো চার পাউন্ড, এখনও সেই একশো চার পাউন্ড।' এ ধরনের জবাবে ভদ্রলোক চমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'তাই নাকি?' মহিলা মোহিনী কণ্ঠে বললেন, 'কেন? সন্দেহ হচ্ছে? দেখবেন?'

এ গল্পটা সুরুচির উপকূল ছুঁয়ে গেল। এরই পাশের গল্পটা অনেক ছিমছাম। একটি অত্যন্ত রোগা, চোখে হাই পাওয়ার চশমা, সত্যবাদী যুবক ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'চশমাসুদ্ধু আমার ওজন একাশি পাউন্ড।' ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান জানতে চেয়েছিলেন, 'চশমাসুদ্ধু ওজনের দরকার কী?' ছেলেটি নিজের মোটা কাচের দিকে নির্দেশ করে বলেছিল, 'চশমা খুলে ফেললে যে আমি ওজনের স্কেলটা পড়তে পারি না।'

সবশেষে আমার নিজের ওজনে ফিরে আসি। ওজন কমানোর চেষ্টায় এখন আমার দমবন্ধ দিন কাটছে। কিন্তু আরম্ভটা হয়েছিল হালকাভাবে। অন্য একটা অসুখের সূত্রে ডাক্তারবাবু বললেন, অতিরিক্ত মেদ আমার অসুখের কারণ। তিনি নিজেও আমার থেকে কম মোটা নন। কিন্তু আমাকে বললেন, 'আমাদের দশ কেজি ওজন কমাতে হবে।' প্রস্তাব শুনে আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আজ্ঞে নিশ্চয়, আপনি পাঁচ কেজি, আমি পাঁচ কেজি।' ডাক্তারবাবু খুশি হননি।

জীবজন্তুর কথা

লিখেছিলাম নাকি কাণ্ডজ্ঞানে জীবজন্তুর বিষয়ে এর আগে? মাত্র পনেরো মাসেই কীরকম যেন স্মৃতিবিভ্রম হচ্ছে আমার। তা ছাড়া একই লোকের কাছে একই রসিকতা দু'বার করার চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক এই রসিকতা একই পৃষ্ঠায় একাধিকবার করতে যাওয়া। খেয়াল করতে পারছি, বানর নিয়ে, গোরু নিয়ে লিখেছি; কিন্তু পুরোপুরি জীবজন্তু নিয়ে বোধহয় নয়।

সে যা হোক, এখন যে-গল্পটা উল্লেখ করছি সেটা নিশ্চয়ই আগে লিখিনি, তার কারণ একটা বিলিতি কার্টুনে আমি নিজেই মাত্র গতকাল এটি দেখেছি ও পড়েছি। এটা ক্যাঙারুদের গল্প। খুব

ভিড়; সেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বাপ-ক্যাঙারু আর মা-ক্যাঙারু একটু ফাঁকায় এসে দাঁড়াতেই বাপ-ক্যাঙারু জিজ্ঞাসা করছে, 'খোকা, খোকা কই?' মা-ক্যাঙারু তার শরীরের মধ্যে শূন্য পকেটের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'সর্বনাশ, খোকা তো এই ভিড়ের মধ্যে পকেটমার হয়ে গেল।'

জীবজন্তুর খোকাদের নিয়ে এ রকম আরেকটি অনেকদিন আগে দেখা ব্যঙ্গচিত্র মনে পড়ছে; সেটি অক্টোপাসদের নিয়ে। একটি বড় অক্টোপাস, তার চারপাশে কিলবিল করছে ছোট ছোট অক্টোপাস। সেই ছোট অক্টোপাসগুলি বড়টির বাচ্চা, তারা তাদের মাকে জোর করছে, 'মা, তুমি আমাদের বলে দাও, কোনগুলি আমাদের পা আর কোনগুলি আমাদের হাত।'

কিন্তু মা অক্টোপাস এই সাংঘাতিক প্রশ্নের কী উত্তর দেবে! মা অক্টোপাস নিজেই কি জানে কোনগুলো তার হাত, আর কোনগুলো তার পা? আর, সবচেয়ে বড় কথা তা জানারই বা দরকার কী?

অক্টোপাসের ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা তার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। বরং একটা কাণ্ডজ্ঞান এবং বাক্‌শক্তি সম্পন্ন বেড়ালের কথা বলি।

এই বেড়ালটি একটি প্রাচীন, মাথামোটা, সাদা-কালো হুলো বেড়াল। আমি নিজে স্বচক্ষে এই বেড়ালটিকে দেখিনি কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এক ভদ্রলোকের মুখে এর বৃত্তান্ত শুনেছি।

গরমের দিনের এক ভরদুপুর বেলায় সেই ভদ্রলোক চেতলার এক গলি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। সুনসান মধ্য নিশীথের মতো ফাঁকা চারদিক, হঠাৎ গলির মুখের একটু আগেই ভদ্রলোকের গাড়িটা কী করে খারাপ হয়ে, একবার হ্যা-হ্যা-হ্যা করেই বন্ধ হয়ে গেল। প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় পিচ গলছে, চারদিকে রোদ্দুরের ঝাঁজ, আশেপাশে জনমানব চোখে পড়ছে না। অন্তত গাড়ি ঠেলবার লোক সব রাস্তাতেই পাওয়া যায় কিন্তু এই সময়ে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক নিজে গাড়ির যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ভাল জানেন না, তবু নিরুপায় হয়ে গাড়ি থেকে নামলেন, নেমে সামনেটা খুলে ইঞ্জিনের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কোনও গোলমাল ধরা যায় কিনা। ঘামতে ঘামতে ইঞ্জিন পর্যবেক্ষণ করছেন এমন সময় তাঁর কানে এল কে যেন মোটা গলায় বলছে, 'কারবুরেটরে গোলমাল মনে হচ্ছে।' একজন সাহায্যকারী পাওয়া গেল এই আশায় ভদ্রলোক মাথা তুলে দেখলেন মানুষজন কিছু নয়, একটা বেড়াল। ছোটবেলায় সুকুমার রায়ের হযবরল পড়ে আর দশটি শিশুর মতোই মজা লেগেছিল তাঁর; সেই মজা, সেই কল্পকাহিনী কোনওদিন যে সত্যি হতে পারে এ তিনি ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবেননি।

সামনের একটা শতাব্দী-প্রাচীন তিনতলা বাড়ির অর্ধভগ্ন দেয়ালের উপরে একটি প্রলম্বিত এবং তুলনামূলকভাবে বৃহৎ গন্ধরাজ ফুলগাছের ছায়ায় পূর্ব-বর্ণিত সাদা-কালো অভিজ্ঞদর্শন বেড়ালটি বসে রয়েছে এবং সে-ই কথা বলছে। ভদ্রলোক মাথা তুলতে বেড়ালটি আবার গমগমে গলায় মানুষের মতো অবিকল বলল, 'কারবুরেটরটা সারাতে হবে।'

ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে প্রাচীরস্থ বেড়ালটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, এমন সময় ওই তিনতলা বাড়ি থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন, 'কালাচাঁদ, এই কালাচাঁদ', এইরকম হাঁকতে হাঁকতে। বেড়ালটিও দেয়াল থেকে এক লাফে ভিতরের দিকে নেমে চলে গেল। বুড়ো সদর দরজায় এসে গাড়ির সামনে বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, গাড়ির কিছু খারাপ হয়েছে?'

বেড়ালকে কথা বলতে দেখার ধাঁধা ভদ্রলোকের তখনও কাটেনি, তিনি বললেন, 'একটা বেড়াল আমাকে বললে...', অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ভদ্রলোককে বাক্য সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বুড়ো বললেন, 'বেড়াল? কালাচাঁদ? ওই সাদা-কালো যেটা এই দেয়ালের উপরে বসেছিল?' ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই সাদা-কালো বেড়ালটা।' বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলেছে কালাচাঁদ?' ভদ্রলোক রীতিমতো বিচলিত হয়ে বললেন, 'বেড়ালটা বলল আমার গাড়ির কারবুরেটরটা নাকি খারাপ হয়েছে।' বুড়ো হো হো করে হেসে বললেন, 'কালাচাঁদ বুঝি তাই বলেছে! কালাচাঁদের যত মাতব্বরি। ও গাড়ির কী বোঝে? আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।'

এই কাহিনীর বাকি অংশ আমাদের এই জীবজন্তুর কাণ্ডজ্ঞানে প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করার মতো গল্প নয় এটা, শুধু যিনি বলেছিলেন তাঁর উপর আস্থা আছে বলে এই গল্পটা লেখার সাহস হল।

তবে কিছুদিন আগে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বাতির নামে যে কথা-বলা হাতির বাচ্চার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেটা পড়ার পর বুঝতে পেরেছি শুধু চেতলার বেড়াল নয়, রাশিয়ার হাতিও মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। আর বাতিরের কথাবার্তা অতি চমৎকার। সে মোটেই কালাচাঁদের মতো শয়তান নয়। তার একটাই দোষ, কাণ্ডজ্ঞান লেখক তারাপদ রায়ের মতো সে অনবরতই নিজের কথা বলে। 'বাতির খুব ভাল, বাতিরকে স্নান করার জল দাও, কই বাতিরের খাবার কোথায়?' ইত্যাদি নিতান্ত আত্মগত ভাষণ বাতিরের, যা টেপরেকর্ডেও ধরা পড়েছে।

অবশ্য ক্যাঙারু, অক্টোপাস, বেড়াল বা হাতির বাচ্চা নয়, কথা বলার গল্প ঘোড়াকে নিয়েই বেশি।

অনেক গল্পের মধ্য থেকে দু'রকম দুটো ঘোড়ার কথা বেছে নিচ্ছি। প্রথমটি, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ধরা যাক, ঘোড়াটির নাম যেমন হয় 'হ্যাপি বয়'। হ্যাপি বয়ের জীবন কিন্তু খুব হ্যাপি নয়। সে রেসে দৌড়ায় বটে, কিন্তু তার স্থান খুব উঁচুতে নয়, সে মোটেই বাজি জিততে পারে না। জুয়াড়িরাও সেইজন্যে তার উপরে বিশেষ বাজি ধরে না।

সেদিন একটা রেসে অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে হ্যাপি বয়ও রয়েছে এবং যথারীতি তার উপরে বিশেষ কেউই বাজি ধরেনি। রেস আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে রেস কোর্সের বুকিং কাউন্টারে কর্মরত ভদ্রলোক হঠাৎ শুনলেন ফ্যাসফ্যাসে গলায় কে একজন বলছে, 'দাদা, হ্যাপি বয়ের উপরে দশ হাজার টাকা ধরছি', বলে এক তাড়া নোট কাউন্টারের সামনে এগিয়ে দিয়েছে। কাউন্টারের ভদ্রলোক কী একটা হিসেব মেলাচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ মাথা তুলে দেখেন একটা ঘোড়া দশ হাজার টাকার নোটের বান্ডিল কাউন্টারের উপর রেখেছে। সুখের বিষয়, তিনি আঁতকে ওঠেননি, রেসকোর্সে কাজ করে করে ঘোড়া ও মানুষের প্রভেদ করতে তাঁর একটু সময় লাগে। কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া হল 'হ্যাপি বয়' শুনে, তিনি চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাপি বয়ের ওপরে দশ হাজার টাকা কেন?' কাউন্টারের ওপার থেকে সেই ঘোড়াটি বলল, 'কারণ আমিই হ্যাপি বয়।'

দ্বিতীয় গল্পের ঘোড়াটি অবশ্য সাধারণ চড়বার ঘোড়া। এক ঘোড়সওয়ার তাঁর ঘোড়া থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে আহত হয়েছিলেন। সেই ঘোড়াটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে এক পশুচিকিৎসককে ডেকে নিয়ে প্রভুর কাছে অকুস্থলে ফিরে আসে। পরে ওই ঘোড়ার মালিককে তাঁর ঘোড়ার এই বুদ্ধির প্রশংসা করলেই তিনি আপত্তি জানাতেন, 'একেই বলে ঘোড়ার বুদ্ধি। আমি কি ওর মতো ঘোড়া নাকি যে আমার জন্য ঘোড়ার ডাক্তার ডেকে এনেছে?'

এত সব অলীক কাহিনীর শেষে একটি সত্যিকারের ঘটনা বলি। সেটা অবশ্য ঘোড়ার কথা বলার গল্প নয়। মানুষের কথা না বলার গল্প।

ছোটবেলায় আমাদের এক প্রতিবেশীর একটি ঘোড়া ছিল। সেটি তাঁর বাড়িতেই থাকত, কালেভদ্রে কখনও চড়তেন। সকালবেলা তিনি ঘুম থেকে উঠে ঘোড়াটিকে নিঃশব্দে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে আস্তাবল থেকে বার করে দিতেন। ঘোড়ার খাওয়ার পাত্রে ভুষি-ছোলা ইত্যাদি দিয়ে সেই টিনের পাত্রটি একটি লাঠি দিয়ে বাজিয়ে ঘোড়াটি অন্যমনস্ক থাকলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন খাদ্যের প্রতি। এমনকী ওই ঘোড়ায় চড়ে কখনও কোনও মোড়ের কাছে এলে, 'ডাইনে' বা 'বাঁয়ে' ইত্যাদি না বলে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম টেনে নির্দিষ্টমুখী হয়ে আবার ঘোড়ায় চড়তেন। তাঁর এই ব্যবহারে অবাক হয়ে একদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম, অন্যরা যেমন বাঁয়ে-ডাইনে বলে, খাবার দিয়ে ডাকে, আপনি তা করেন না কেন? ঘোড়া তো এসব কথা বেশ বুঝতে পারে। তিনি গম্ভীর মুখে আমাকে বলেছিলেন, 'এ ব্যাটা আমাকে তিন বছর আগে একবার অন্যায়ভাবে চাঁটি মেরে ফেলে দিয়েছিল, তারপর থেকে আমি ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি।'

গোরু (১)

গোরুর ইংরিজি কাউ। কিন্তু কোনও গোরুর নামও যে কাউ হতে পারে সেটা জানা গেল ইম্ফলের এক খবরে।

কাউ নামে ইম্ফল শহরের এই বলদটি সংবাদ সৃষ্টি করেছে। সে অন্যান্য ধর্মের ষাঁড়ের মতোই পথচারী এবং বলশালী, সংস্কৃত শ্লোকের ভাষায় বলা যেতে পারে তার ভোজন যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে। তাকে অনেকে খাবার দেয়, অনেকে দেয় না। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনও বাড়াবাড়ি, জোরাজুরি নেই। তরকারির দোকানে গিয়ে সে মুখ বাড়ায়, তরকারিওলা তাকে সামান্য কিছু দিল কি দিল না, তারপর পরের দোকানে চলে গেল। গৃহস্থবাড়ির দরজাতে গিয়েও তাই। কিছু মিলল তো কাউ খুশি মনে জাবর কাটতে কাটতে পরের দরজায় গেল। না মিললেও তার কোনও ক্ষোভ, ক্রোধ বা উষ্মা নেই, সরল মনে সে চলে যায়।

কাউয়ের মতো পথের গোরু সব জায়গাতেই দেখা যায় বলবান অথচ বিনীত, নিরভিমান, পরমুখাপেক্ষী। কাউ সংবাদ হয়েছে অন্য কারণে। কারণটি রীতিমতো রাজনৈতিক। সে গোরুমুক্তি আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এমনিতে অন্য কোনও গোরু বা মানুষের উপরে তার কোনও রাগ দেখা যায় না। কিন্তু কাউ যদি দেখে কোনও গোরুকে মানুষ খাটাচ্ছে, যেমন গাড়ি টানাচ্ছে বা লাঙল চালাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে যায়। কাউয়ের সামনে দিয়ে কোনও গোরুর গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চোখে পড়লেই শিং তুলে দৌড়ে আক্রমণ করবে, গাড়িতে যুক্ত বলদ বা ষাঁড় দুটিকে মুক্ত না করা পর্যন্ত গাড়োয়ানের পরিত্রাণ নেই। পারতপক্ষে কাউ যখন যে রাস্তায় থাকে, সে পথ দিয়ে কোনও দুঃসাহসী গাড়োয়ানও গাড়ি নিয়ে যায় না। কৃষকদেরও যথেষ্ট বিপদ, শহরতলির রাস্তা ধরে জোয়ালে বাঁধা গোরু নিয়ে মাঠে চাষ করতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে, এই দৃশ্য চোখে পড়লেই কাউ ছুটে আসবে। কৃষকেরা প্রাণের ভয়ে চাষের গোরু আলাদা করে মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যায়, তার আগে বা পরে লাঙল নিয়ে যায়, যাতে কাউ জোয়ালে বদ্ধ অবস্থায় চাষের গোরু দেখতে না পায়।

দিগদিগন্তে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে ইম্ফলের প্রবল পরাক্রান্ত কাউয়ের এই গোরুমুক্তি আন্দোলন যদি প্রসারিত হয় তা হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই সুপ্রাচীন দেশের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতীক গো-শকট লুপ্ত হয়ে যাবে এবং ক্ষেতে চাষ ঘোড়া দিয়ে কিংবা ট্রাক্টর দিয়ে করতে হবে।

কাউ কেন এ রকম করে? গোরুর মনস্তত্ত্ববিদ থাকলে হয়তো জার্মান ও লাটিন শব্দ কণ্টকিত একটা সাড়ে সাত পাতা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে গোরুর যে বুদ্ধির অভাব নেই সে বিষয়ে আমি নিজেই সাড়ে সাত পাতা লিখতে পারি।

বছর পঁচিশ আগে কালীঘাটে একটা বিখ্যাত ষাঁড় ছিল। যে কোনও ফৌজদারি মামলার আসামির মতো তার একাধিক নাম ছিল (বলহরি ওরফে শিবু।) কেওড়াতালার দিকে দেখেছি স্থানীয় লোকেরা তাকে বলহরি বলে ডাকে, এদিকে হাজরার মোড়ের দিকে তার নাম ছিল শিবু। বহুরকম গোলমেলে কার্যকলাপ ছিল এই বলহরি ওরফে শিবুর। একাধিকবার সে বসুশ্রী কফিহাউসের দোতলায় উঠবার চেষ্টা করেছে। বোধ হয় কারও খোঁজে যেত। চারু মার্কেট থেকে জগুবাবুর বাজার— দক্ষিণ কলকাতার এই বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল তার সাম্রাজ্য। আমাদের পুরনো

বাড়ির ভাঙা সংকীর্ণ প্যাসেজে একেকদিন রাতে সে পথ আটকে শুয়ে থাকত, তাকে টপকিয়ে বাড়ি ঢুকতে হত। গভীর রাতে ক্লান্ত দেহে একটি পর্বতপ্রমাণ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বলীবর্দকে অতিক্রম করে গৃহপ্রবেশ খুব মধুর ছিল না, তার অত্যাচারে বেশ কিছুদিন আমাকে নৈশভ্রমণ বন্ধ রাখতে হয়।

চুরি করে বা জোর করে খাওয়া, নিরীহ পথিককে তাড়া করে যাওয়া, শিশু ও মহিলাদের ভয় দেখিয়ে তাদের হাত থেকে মিষ্টি বা শিঙাড়ার চুপড়ি ছিনিয়ে নিয়ে অতি দ্রুত গলাধঃকরণ করা ইত্যাদি ষণ্ডজনিত বহুরকম অন্যায় সে করত। একবার কী কারণে উত্তেজিত হয়ে কালিকা সিনেমার দশ আনার লাইনের নিরীহ দর্শকদের সে গুঁতিয়ে দেয়। কয়েকবার নির্বিকার চিত্তে ট্রামলাইনে শুয়ে থেকে সে দক্ষিণ কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল করে দেয়; এদিক দিয়ে সে পাতাল রেলের পূর্বসুরী।

এই রকম সব নানাবিধ কুকর্ম করার জন্যেই সে দাগী আসামিদের মতো দুটি নামের সুবিধে গ্রহণ করে। রাসবিহারী পাড়ার লোকের নালিশ শুনে কালীঘাট ফাঁড়ির পুলিশ যখন বলহরিকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন সে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিশ মুখার্জি রোডে— সেখানে সে শিবু নামে পরিচিত।

বলহরি যে সব সময় বেআইনি কাজ করত তা কিন্তু নয়। হাজরার দক্ষিণ-পশ্চিম মোড়ে জুতো পালিশওলাদের বেআইনি অবস্থান সে একাধিকবার গুঁতিয়ে তছনছ করে দেয়। একটি অশ্লীল পত্র-পত্রিকার দোকানের সব বইপত্র কিছু খেয়ে ফেলে, কিছু ছিঁড়ে পদদলিত করে সে পর্নো-বিপণিটি তুলে দেয়।

আমরা তাকে তার মধ্য-যৌবনে দেখেছি। তখন তার রাশভারী, অভিজাত ভাব। উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ না হলে ছুটোছুটি, গুঁতোগুঁতি করত না। তবে তার বুদ্ধি তখন তুঙ্গে। বলহরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিশ্বকর্মা পুজোর সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি কাটাকাটি দেখত। ঘুড়ি কেটে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে হেলতে-দুলতে সমবেত দৌড়বাজ বালকদের উপেক্ষা করে, কখনও শিং দিয়ে সরিয়ে, সে একটু মাথাটা তুলে উড়ন্ত ঘুড়িটা মুখে ধরে খেয়ে নিত। ঘুড়ির প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি ছিল তার। কালীঘাটে রথের মেলায় যে বেশ কয়েক বছর ঘুড়ির দোকান বসেনি তার প্রধান কারণ বলহরির অত্যাচার। হাজরার মোড়ে যখন প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাফিক আলো এল সে সময় লাল-সবুজ-হলুদের পার্থক্য সে আমাদের অনেক আগে বুঝতে পেরেছিল। প্রৌঢ় বলহরিকে দেখেছি ট্রাফিক লাইটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবুজ আলোর প্রতীক্ষায়।

তবে শেষের দিকে বলহরি বড় অলস হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই নড়াচড়া করত না, খাদ্যসংগ্রহে যেতে চাইত না। তখন শুধু রুমাল খেত বলহরি। নিঃশব্দে পথচারীর পকেট থেকে সে রুমাল তুলে নিত। নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মতো ছিল তার উত্তোলন ক্ষমতা। নিরীহ, অসহায় পথিক ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেত না। শেষে তার এই কর্মপদ্ধতি এত সাবলীল হয়ে ওঠে যে, কোনও কুমারী মেয়ের কোমরে শাড়িতে গোঁজা রুমালও যদি বলহরি জিভ দিয়ে তুলে নিত মেয়েটি বুঝতেই পারত না।

অনেকদিন বলহরিকে দেখিনি। মাসখানেক আগে কালীঘাটের পুরনো পাড়ায় গিয়ে তার খোঁজ করেছিলাম। একালে তাকে বিশেষ কেউ চেনে না। এক প্রাচীন ভদ্রলোক বললেন যে কলিযুগের প্রারম্ভে যখন কালীঘাট পার্কের পাশে প্রথম মেট্রোরেলের টিনের চালা উঠল তখন একদিন রাতে বৃদ্ধ বলহরি উন্মত্তের ন্যায় নিষ্ফল আক্রোশে প্রচণ্ড গুঁতিয়ে কয়েকটি টিনের চালা ধরাশায়ী করে উত্তরের দিকে চলে যায়; সে কাশী কিংবা বৃন্দাবন চলে গেছে।

আমি বুঝতে পারছি যে এই ইস্কুলের কাউ কিংবা কালীঘাটের বলহরিকে নাকি পাঠক-পাঠিকারা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করছেন না।

তার থেকে দুটো নির্ভরশীল বিলিতি গোরুর গল্প বলি। লস এঞ্জেলসের কাছে একটা খামারে দেখেছিলাম এক বৃদ্ধ কৃষক তাঁর বাছুরের সঙ্গে দাবা খেলছেন। আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম,

'আপনার বাছুর তো খুব চালাক, দাবা খেলতে পারছে!' বুড়ো হেসে বলেছিলেন, 'তেমন চালাক কিছু নয়, তেমন খেলতে পারছে না, এই তো পাঁচবারের মধ্যে তিনবারই হেরেছে।'

আরেকবার বার্সেলোনাতে এক মেমসাহেব আমাকে এক স্পেনীয় গোরুর গল্প শুনিয়েছেন। গল্পের গোরু আমাদের দেশে দুয়েকবার গাছে ওঠে, কিন্তু সেই নীলনয়নার বুলফাইটের দেশের গোরু রেস্তোরাঁয় বিয়ার খেতে ঢুকেছিল। গোরুটি মানুষের মতো চেয়ারে ভব্য হয়ে বসে এবং বেয়ারাকে ডেকে বিয়ারের অর্ডার দেয়। যথা সময়ে পান শেষ করে বিল মিটিয়ে দেয়। যখন সে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সাহেব তাকে সাহস করে বলেন, 'দেখুন, আজ চল্লিশ বছর এই জায়গায় কাজ করছি কিন্তু কোনও গোরুকে বিয়ার খেতে আসতে দেখিনি।' গোরুটি তিক্ত হেসে বলেছিল, 'আগে যেমন দেখেননি, পরেও আর দেখবেন না। গোরুদের সাধ্য কি বিয়ার খায়, বিয়ারের যা দাম!'

প্রিয়তমাসু

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে আমার দুই পুরনো বন্ধুর তথা বিখ্যাত কবির জায়াদ্বয় তাঁদের নিজ নিজ পতিদেবতা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা সরলভাবে বলেছেন। এই সাক্ষাৎকারের কথা আগেই কানে এসেছিল এবং কিঞ্চিৎ চিন্তিত ছিলাম মহীয়সী মহিলাদ্বয় কী বলবেন বা বলতে পারেন এই ভেবে। সুখের বিষয় সাক্ষাৎকার দুটি প্রকাশিত হবার পর আমাদের বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। না, ভদ্রমহিলারা কবি স্বামীদের মুখরক্ষা করেছেন, মারাত্মক কিছু বলেননি। বরং স্বীকার করা ভাল, পড়ে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে স্বামী ও সংসার নিয়ে তাঁদের বিশেষ কোনও গর্হিত অভিযোগ নেই, তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্ট।

কিন্তু যদি বিপরীত হয়! যদি কোনও দুঃসাহসী সম্পাদক বা সম্পাদিকা বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুরোধ করেন তাঁদের স্ত্রী-সংসার ইত্যাদি বিষয়ে অকপটে বলতে, তা হলে কী হত? খ্যাতনামা ভদ্রলোকেরা কি দু'-চারটি রোমহর্ষক কিংবা বিপজ্জনক উক্তি তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতেন না?

হয়তো বলতেন, হয়তো বলতেন না। কিন্তু এই ভূমিকা বা অবতরণিকার সুযোগে কাণ্ডজ্ঞানের অনতিবিখ্যাত, হতভাগ্য লেখক তাঁর স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে আপামর পাঠক-পাঠিকাকে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা জানাতে চান।

(এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরদিন যদি কোনও কারণে আমার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, বাঁ হাতে প্লাস্টার করা দেখেন, দয়া করে জানবেন বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে আমার ওই অবস্থা হয়েছে। তিনি মোটেই দায়ি নন।)

* * *

গত পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সামান্য বিশ্রাম করে ডাক্তারি নির্দেশানুযায়ী যথারীতি সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি। হেঁটে যখন বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালের অপর প্রান্তে পৌঁছেছি, তেড়ে বৃষ্টি এল, সঙ্গে জোর বাতাস। কাছাকাছি কোথাও মাথা বাঁচানোর সামান্য আশ্রয় নেই। বেশ জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে বাড়ি আসার পথে একটি বিদ্যুৎ অথবা টেলিফোন অথবা জল সরবরাহ অথবা পাতাল রেল অথবা ওরিয়েন্টাল গ্যাস অথবা সড়ক বিভাগের প্রাচীন গর্তে পড়ে যাই এবং কোনওরকমে আত্মরক্ষা করে সারা গায়ে জলকাদা মেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরি।

আমার স্ত্রীর অবশ্যই উচিত ছিল আমাকে দেখে 'আহা, উহু' করা, আমার কাছে জানতে চাওয়া কী করে কোথায় আমার এই পরিণতি হল, তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে আমার মাথা মুছে দেওয়া, শুকনো লুঙ্গি-গেঞ্জি এগিয়ে দেওয়া এবং নিতান্ত এককাপ ধূমায়িত আদা-চা-আমার জন্যে তৈরি করে আনা।

হা কপাল! তার বদলে ভদ্রমহিলা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খেপে গেলেন, 'তুমি এই জল-কাদা নিয়ে ঘরের মধ্যে এলে? তুমি ও রকম এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এ-ঘরের জলকাদা কে মুছবে?' তারপর আমার হতভম্ব পরাস্ত চেহারা, নিরুত্তর মুখ দেখে কেমন একটু নরম হয়ে গেলেন, বললেন, 'তুমি কি কোনওকালে মানুষ হবে না, এ রকম চিরটাকাল ধরে করে যাবে? সব সময় জলকাদা নিয়ে ঘরে ঢুকবে?'

চিরকাল মানে কতকাল? সবসময় মানে কত সময়? আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে শেষবার বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসেছিলাম সাত বছর আগে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে। সেটাও গিয়েছিলাম কলেজ স্ট্রিটে জুতোর দোকানে। আগের দিন স্ত্রী একজোড়া চটি কিনেছিলেন সেখান থেকে, অনেক দেখেশুনেই কিনেছিলেন কিন্তু বাড়ি এসে দেখা যায় এক সাইজ ছোট হয়েছে। সেটা সকালবেলায় পালটিয়ে এক সাইজ বড় নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রী বললেন, 'আগের সাইজটাই বোধ হয় ঠিক ছিল, এটা কেমন বড় বড় ঠেকছে।' সেই দ্বিতীয় জোড়াটা পালটিয়ে প্রথম জোড়াটা পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। পুনঃ পুনঃ জুতো পালটানোর প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই সম্মানজনক নয়। তদুপরি সেদিনও রাস্তার জলকাদা ঘরে বয়ে নিয়ে আসার জন্যে আজকের মতোই অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম।

কিন্তু এসব নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। আমার স্ত্রী তো আমাকে মারতেও পারতেন। ভেজা নতুন জুতো জোড়া তাঁর হাতেই ছিল কিংবা ইচ্ছে হলে পুরনো কিছু দিয়েও প্রহার করতে পারতেন। তা তিনি করেননি বরং ফেরত আনা আগের জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে দেখলেন, ছোট হল, বড় হল, না ঠিক হল!

আতলান্তিক তীরের এক শহরে শুধুমাত্র পুরুষ মদ্যপায়ীদের একটা দশাসই পাবের দেয়ালে অনেককাল আগে একটা আবেদন দেখেছিলাম। সুরা-রসিকদের প্রতি পাব-মালিকের অনুরোধ, ইংরেজিতে একটি ছড়া, কাঁচা বাংলায় যার অনুবাদ এ রকম হতে পারে—

'বাড়ি ফিরেই সেই তো আজও
বৌয়ের হাতে খাবেন মার,
বরং সখা, থাকুন না কেন,
থাকুন কিছুক্ষণটা আর।'

বলা বাহুল্য, এই নোটিশের গুণেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক, সেই পাবে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ত, ভিড় কিছুতেই ভাঙতে চাইত না।

সে যাই হোক, বিলেতে কিন্তু আজকাল মেমসাহেবরা খুব বেশি মারধোর, খারাপ ব্যবহার করেন না স্বামী দেবতাদের সঙ্গে। কারণ আর কিছুই নয়, অধিকাংশ স্বামীই পালানোর জন্যে প্রস্তুত। এখন আর নতুন সাহেব বর জোগাড় করা খুব সহজ নয়। আগে বউরাই পালাত, আজকাল নাকি সাহেব স্বামীদেরই পালানোর দিকে বেশি ঝোঁক।

তবে আমাদের দেশে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। স্বামীরা পালাবে কোথায়, পালিয়ে কোথায় যাবে! ভাল করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে এক হাজার বউ পালানোর ঘটনার বিনিময়ে একটি মাত্র বর পালানোর নজির হয়তো পাওয়া যাবে।

তবে একটা গল্প শুনেছিলাম, কে একজন মধ্যবয়স্কা অনূঢ়া মহিলা সহসা বিয়ে করার জন্যে উৎসাহী হয়ে খবরের কাগজে 'স্বামী চাই' বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কয়েক হাজার চিঠি পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু একটিও কোনও পুরুষমানুষের কাছ থেকে নয়। হাজার হাজার বিবাহিতা মহিলা তাঁদের স্বামীর ফটো পাঠিয়ে, গুণগান করে পত্র দিয়েছিলেন, একটিই অনুরোধ 'তুমি আমার স্বামীকে নাও।'

এরই বিপরীত দিকে আমার এক বান্ধবী একবার তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, 'বিবাহযোগ্যা স্ত্রী আছে', এই বলে।

কে এক নাক উঁচু চিরকুমার কোনও অভিজ্ঞতা বিনাই একদা বলেছিলেন, 'বিবাহ একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী যার প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয় নায়কের মৃত্যু দিয়ে।' আমার অবশ্য কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা কিন্তু এত বড় কথা বলার সাহস আমার নেই। তবে আমি নিপীড়িত, নির্যাতিত স্বামীদের একটি স্তোকবাক্য উপহার দিতে পারি রাশিয়ান কাহিনী থেকে ধার নিয়ে, 'হে ভদ্রলোক, আপনার ছেলেটি আপনাকে যত বড় হিরো ভাবছে, আপনি হয়তো সত্যিই তা নন, কিন্তু আপনার স্ত্রীরত্নটি আপনাকে যত বড় বোকা ভাবছেন আপনি তাও নন।'

আর তা ছাড়া সদাসর্বদা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করলে ক্ষতিই হবে এমন কোনও কথা নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিধানকারকে তাঁর অভিধান রচনার জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই আশ্চর্য অভিধান, এত বিচিত্র সব শব্দ আপনি কী করে সংগ্রহ করেছেন?' অভিধানকার মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।' এই উত্তরে প্রশ্নকারীর বিমূঢ় মুখশ্রী দেখে অভিধান রচয়িতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'সারা দিনরাত পঁচিশ বছর ধরে ঝগড়া করে, কথার পিঠে কথার পর কথা সাজিয়ে সাজিয়ে এত শব্দ আমার আয়ত্তে আসে।'

তবু ঝগড়াঝাঁটি হোক কিংবা যাই হোক, বেশি দিন বিয়ে হয়ে গেলেই যে পত্নীর প্রতি ভালবাসা থাকে না তা নয়। আমার এক প্রৌঢ় সহকর্মী প্রায় প্রতিদিনই সকালবেলায় বাড়িতে ঝগড়া করে এসে অফিসে আমার কাছে খিটমিট করে স্ত্রীর বিষয়ে রাগারাগি করতেন। সেই ভদ্রমহিলা একবার দিন কয়েকের জন্যে স্বামীকে রেখে কী একটা বিয়ে-টিয়ে উপলক্ষে কলকাতার বাইরে গেছেন। দিনটা বোধ হয় ছিল শুক্রবার। শনি-রবিবার ছুটির পরে ভদ্রলোক সোমবার অফিসে এলেন। প্রৌঢ় বয়সের বিরহ, ভদ্রলোক কেমন যেন চুপসে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কী হল মিস্টার ধরচৌধুরী?' দেখলাম মিস্টার ধরচৌধুরী শুধু চুপসেই যাননি, তাঁর মুখ দিয়ে স্বর বেরচ্ছে না ভাল করে, জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'আর বলবেন না, আজ আড়াই দিন খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেকী, মিসেস ধরচৌধুরী সামান্য চোখের আড়াল হতে আপনি খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন!' মিস্টার ধরচৌধুরী বললেন, 'উপায় নেই। মিসেস যাওয়ার সময় ভুল করে তাঁর নিজের জিনিসপত্রের ভিতরে আমার বাঁধানো দাঁতজোড়া নিয়ে চলে গেছেন', বলে দন্তহীন মাড়ি কিড়মিড় করার চেষ্টা করলেন।

অভিনয় নয়

কলকাতা নামক এই ধূসর মরুভূমিতে একটি মধ্যসাপ্তাহিক মরূদ্যান আছে; যেখানে সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় বিদগ্ধ পুরুষ এবং সুন্দরী রমণীরা সমবেত হন। সেখানে সোনালি পানীয় এবং মেজাজি আড্ডা এবং কখনও কখনও চূড়ান্ত সুখাদ্য আমার এবং অনেকের জন্যে অপেক্ষা করে। সরাসরি বলা উচিত ওই সান্ধ্য আসরে আমার অবারিত দ্বার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই সুস্থলে আমি কদাচিৎ যাই। গেলে খুবই ভাল লাগে, কিন্তু যাওয়া হয় না। তার একটাই কারণ, অভিনয়। অভিনয়ের ব্যাপারে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয়, গায়ে জ্বর আসে।

হয়তো আমার মঞ্চ-কাঁপানো কণ্ঠস্বর অথবা ভাঁড়োপম স্থূল অবয়ব আমার অবচেতন মনে অভিনয় সম্পর্কে একটা অতিশীতল অনীহা রচনা করেছে। অথচ সেখানে গেলেই দেখতে পাই আমার বিখ্যাত বন্ধুরা দিনের সমস্ত ক্লান্তি হাতে ঠেলে দিয়ে সায়াহ্নের পর সায়াহ্ন কেমন সাবলীলভাবে মহড়া দিয়ে চলেছেন। বিখ্যাত লেখক যাঁর কলম ছুরির মতো ধারালো, মৃত্যুঞ্জয়ী সার্জন যাঁর ছুরি মাখনের মতো মসৃণ, রূপসী বন্ধুপত্নী যাঁর হাসি জন্মজন্মান্তের অনুরাগ-বিধুর, প্রবীণ সম্পাদক যাঁর প্রতিষ্ঠা প্রবাদপ্রতিম তাঁরা কত অনায়াসে, কত আয়াসে নাটকের মুখস্থ পার্টে গলা জোগাচ্ছেন।

যে গান ভালবাসে না সে খুন করতে পারে। যে অভিনয় ভালবাসে না সেও খুন করতে পারে। কিন্তু আমি অভিনয় ভালবাসি না, তা তো নয়। আসলে আমি এখনও একটু চঞ্চল, একটু পরিহাস-প্রিয়, বাক্‌বিলাসী; আমার পক্ষে অসম্ভব স্থির হয়ে বসে অন্যদের কথাবার্তা শোনা, বিশেষ করে সে যদি হয় মুখস্থ পার্ট এবং আগেও একবার শোনা হয়ে গিয়ে থাকে।

স্বীকার করি অভিনয় সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। উলটোদিক দিয়ে ব্যাপারটায় ঘুরে আসছি।

এ গল্পটা অবশ্য আগেও একাধিকবার অন্য সূত্রে বলেছি, তবে আমার অভিনয় অভিজ্ঞতার উদাহরণ হিসেবে এত ভাল যে না বলা ঠিক হবে না।

জীবনে মাত্র একবার আমি একটা থিয়েটারে পার্ট পেয়েছিলাম। ঠিক পার্ট বলা উচিত হবে না, কারণ আমার ভুবনবিখ্যাত কণ্ঠ ব্যবহার কররার কোনও সুযোগ ছিল না। নাটকের একেবারে প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠতেই, বিছানায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী নায়কের বৃদ্ধ পিতার ভূমিকা ছিল আমার, একবার আর্তকণ্ঠে 'ওঃ, ওঃ' বলে আমার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া এবং সেখানেই নাটকের শুরু।

কিন্তু এই সামান্য পার্টেও পরিচালক আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। মহড়ার সময় যতবার 'ওঃ ওঃ' করে মারা যাই, পরিচালক বলেন মরার পরে ওরকম শক্ত হয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবেন না, মৃত্যুর দৃশ্য হলে কী হবে, নাটকে সবকিছুর মধ্যেই লাইফ আনতে হয়, একটু লাইফ আনুন। বলা বাহুল্য মৃত্যুর মধ্যে কী করে জীবনসঞ্চার করতে হয় অদ্যাবধি সে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধগম্য হয়নি।

মিথ্যাভাষণের অপবাদ এড়ানোর জন্যে এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি। এই মৃত পিতার ভূমিকার পূর্বেও আমার কৈশোরে একবার আমার মঞ্চে উঠবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার অবশ্য

আমার কিছুই করতে হয়নি। একলব্য নাটক, আমাকে দেওয়া হয়েছিল গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তির ভূমিকা, রক্ত-মাংসের দ্রোণাচার্যের পার্ট করেছিল অন্য একজন। আমাকে মূর্তি হয়ে নিশ্চুপ, নিশ্চল বসে থাকতে হল, আমাকে সামনে রেখে একলব্য অস্ত্রশিক্ষা করল। মফস্বল শহরের আমবাগানে মশকবহুল সন্ধ্যায় প্রায় পনেরো মিনিটের সেই দৃশ্যে নট নড়নচড়ন স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকা, সে স্মৃতিও আমার খুব মধুর নয়। সে বড় সুখের সময় নয়।

আমি জানি, আমার এই দুঃখময় অভিনয় জীবনের কথা পাঠ করে কোমলতমা পাঠিকার নয়নকোলেও একবিন্দু অশ্রু সঞ্চারিত হবে না। আমি এও জানি, বরং তিনি এখন ঠোঁট টিপে হাসছেন, এবং সেটাই আমার নিয়তি। সুতরাং হাসির কথাই বলি।

এক বেদনাঘন, বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা এক সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি করুণ, হৃদয়স্পর্শী অভিনয় করছিলেন। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই করুণ রসের শুরু, আর সেই দৃশ্যে যাকে দর্শকের ভাষায় ফাটিয়ে দেওয়া বলে, তাই করলেন নায়িকা। সিন পড়ে যাওয়ার পর উইংসের অভ্যন্তরে নায়িকাকে অভিনন্দন জানালেন পরিচালক, 'এমন জীবন্ত, এমন প্যাথেটিক পার্ট এমন সুন্দর করছেন আজকে, ভাবাই যায় না। দর্শকরা কোনওদিন এই দৃশ্যে এত হাততালি দেয়নি।'

নায়িকা শুকনো গলায় ডান পায়ের থেকে চপ্পল খুলতে খুলতে বললেন, 'এই চটিটার একটা পেরেক উঠে রয়েছে, সেটাই পায়ে ফুটে আমার চোখ দিয়ে জল বার করে দিচ্ছে। সাধে কি আর পার্ট এত সুন্দর হচ্ছে!'

এই কথা শুনে পরিচালক যেন হাতে চাঁদ পেলেন, তাড়াতাড়ি নায়িকাকে বললেন, 'ম্যাডাম, এখন চপ্পলটা খুলবেন না। দয়া করে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত পায়ে দিয়ে থাকুন। আর এর পর থেকে প্রত্যেক শোতেই পেরেক ওঠা অবস্থায় পায়ে দিয়ে আসবেন। এই পেরেক আপনার জীবনে আর বাংলার অভিনয়ের ইতিহাসে যুগান্তর এনে দেবে।'

আরেকটা মজার কাহিনী মনে আসছে। এক পেশাদারি নাটকের মঞ্চসফল নায়ক প্রযোজক মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলেন, 'স্যার, ওই নাচের সিনে যদি আপনি গেলাসে লাল রঙের শরবত না দিয়ে সত্যিই মদ খেতে দেন তা হলে অভিনয়টা আরও প্রাণবন্ত, আরও জমজমাট করতে পারি।'

প্রযোজক মহোদয় ব্যান্ডেল লোকালে চানাচুর বিক্রি করে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। তারপর বহু ঘাটা-আঘাটা, নালা, খাল, বিল পার হয়ে হাতিবাগানের ঘাটে নৌকো এনে ভিড়িয়েছেন। এ ধরনের বাজে অনুরোধকে ঠান্ডা করতে তাঁর নিঃশব্দ পাথরপ্রতিম চাহনি, ইনডাস্ট্রির আপামরের ভাষায় সাপের চাউনি, যথেষ্টের চেয়ে বেশি কিন্তু নায়ক তো ফেলনা নয়। শিশির ভাদুড়ী কিংবা নির্মলেন্দু লাহিড়ী না হতে পারে কিন্তু ভদ্রলোকের বক্স অফিস খুব খারাপ নয়; প্রযোজক মহোদয় কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, শেষ দৃশ্যে বিষপানের দৃশ্য আছে, আপনি যেখানে আত্মহত্যা করছেন। সেই দৃশ্যে আপনার গেলাসে খাঁটি বিষ দেবো তো?'

এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। উত্তর নেই এইরকম আরও অনন্ত প্রশ্নের। কিছুদিন আগে দূরদর্শনে কয়েক রবিবার সকালে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র প্রাঞ্জল এবং সরসভাবে অভিনয়ের ব্যাপারটা নতুন যুগের নাট্যোৎসাহীদের ব্যাখ্যা করলেন। সেখানে তিনি প্রথমেই বললেন, সব মানুষই অভিনয় করে, অভিনয় করতেই হয় মানুষকে। বাড়িতে হয়তো কেউ এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না, বিরক্ত হচ্ছি, কিন্তু তবু তাঁকে বলছি, 'এখনই চলে যাচ্ছেন? আরেকটু বসুন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।'

শেক্সপিয়রের মতে, জীবনে এ রকম অভিনয় আমাদের সব সময়ই করে যেতে হচ্ছে।

শেক্সপিয়র সাহেব আরও বহু কথা—জন্মমৃত্যু, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ মানুষের সব কিছু নিয়ে সবরকম কথা বলে গিয়েছেন। এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখলে?'

ছেলে গম্ভীর মুখ করে বলল, 'ভালই, তবে বইটা একেবারে কোটেশনে ভর্তি।' আরেকটি ছেলেকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'শেক্সপিয়ার কে?' সে অম্লানবদনে বলেছিল, 'ওই যে আমাদের স্কুলের বার্ষিক উৎসবের নাটক লেখে।'

অভিনয় সংক্রান্ত এই এলেবেলে নিবন্ধ মহাকবি শেক্সপিয়রকে দিয়ে সমাপ্ত করতে পারলেই বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হত। কিন্তু আমার স্বভাব মন্দ; একটা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বাজে ঘটনা মনে পড়ছে। এক মূকাভিনেতার বাড়ির সামনে দিয়ে বছর কয়েক আগে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে যেতাম। মাঝেমধ্যেই তাঁর বাড়ির দরজায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত। সেই মূকাভিনেতার বন্ধু ছিলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। মূকাভিনেতার সঙ্গে দেখা হতেই আমি প্রশ্ন করতাম, 'আচ্ছা অমুকে আপনার এত বন্ধু, আর আকাশবাণীতে আপনাকে একটা চান্স দেয় না।' মূকাভিনেতা ভদ্রলোক করজোড়ে বলতেন, 'দেখুন, আমি করি মূকাভিনয়, রেডিওতে আমার কী প্রোগ্রাম দেবে?' আমিও নাছোড়বান্দা, দেখা হলেই ওই একই প্রশ্ন করতাম। মূকাভিনেতা ভদ্রলোক শেষে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমাকে দেখলেই মূকাভিনয় করতেন।

ইঁদুর ও মদিরা

চঞ্চলা পাঠিকা, এই বিদ্যাবুদ্ধির এ রকম অপ্রাকৃত এবং খটমটে শিরোনাম দেখে চট করে পাতা উলটিয়ে দিয়ো না। আসলে এই রচনার নাম অনায়াসেই দেওয়া যেত সুরা ও রমণী অথবা নারী ও মদিরা। কিন্তু অনিবার্য কারণে এবং একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ইঁদুর বাদ দিয়ে নামকরণ করা গেল না।

তবু ইঁদুরের রহস্যে প্রবেশ করার আগে ভদ্রতাবশত দু'-একটা মদিরার গল্প বলে নিই।

প্রথম গল্পটি শুনেছিলাম শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর কাছে, পরে অবশ্য সেটা আমি অন্যত্র পাঠ করেছি। নার্সিংহোমে হাত পা ভেঙে এক ভদ্রলোক শয্যায় শায়িত। আগের দিন রাতে কী এক অজ্ঞাত কারণে ভদ্রলোক দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন এবং তারই ফলে এই অবস্থা। বিকালের দিকে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেখা করতে এলেন আহত ব্যক্তির সঙ্গে। 'কাল আমার কী হয়েছিল বল তো?' আহত ব্যক্তি বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন। বন্ধুটি বললেন, 'আর বলিস না, সাংঘাতিক ব্যাপার। সেই যে আমরা তোর জন্মদিন উপলক্ষে তোদের গাড়িবারান্দার ছাদে বসে সন্ধ্যারাত থেকে কয়েকজন মিলে কয়েক বোতল মদ খেলাম।' আহত ব্যক্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আরে, সে পর্যন্ত আমার মনে আছে। কিন্তু তারপর পড়লাম কী করে? কোথায় পড়লাম?'

বন্ধুটি বললেন, 'তুই তো নিজে থেকে নিজের দোষে পড়লি। রাত বারোটার সময় তুই বললি যে আমি এবার পাখির মতো উড়তে পারব। এই জন্মদিন থেকে ভগবান আমাকে একটা নতুন ক্ষমতা দিয়েছেন, আজ থেকে আমি ইচ্ছে করলেই পাখির মতো উড়তে পারব।' আহত ব্যক্তির কিছুই মনে নেই, সে চোখ গোল গোল করে বলল, 'সর্বনাশ! তারপর?'

'তারপর আর কী?' বন্ধুটি বললেন, 'তুই উড়তে পারবি শোনামাত্র মানিক আর বলাই বাজি

রাখল যে, তুই কিছুতেই উড়তে পারবি না, কোনও মানুষ কখনও উড়তে পারে না। এই শুনে তুই ক্ষেপে গেলি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িবারান্দার কার্নিশে উঠে দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে পাখির মতো উড়তে গিয়ে নীচে ধপাস করে পড়ে গেলি।'

আহত ব্যক্তি অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু তুই তো ছিলি সেখানে। তুই তো আমাকে বাধা দিতে পারতিস?' বন্ধুটি অধোবদনে স্বীকারোক্তি করলেন, 'কী আর বলব, আমি তো নিজেও ভেবেছিলাম যে তুই নিশ্চয় উড়তে পারবি। তোর ওড়ার উপরে আমিও তো পঞ্চাশ টাকা বাজি রেখেছিলাম।'

দ্বিতীয় গল্পটি আমাকে বলেছিলেন এক পুলিশের দারোগা। দারোগা সাহেব একদিন রাত বারোটার সময় থানায় ফোন পেলেন, এক খ্যাতনামা অভিনেতা (নাম বলা উচিত হবে না) তাঁকে ফোন করছেন, 'আমার গাড়ি রাস্তায় রেখে আমি একটি অমুক হোটেলে গিয়েছিলাম। এখন সেই হোটেলের থেকেই ফোন করছি। ভীষণ ব্যাপার হয়েছে।'

দারোগা সাহেব ভাবলেন, গাড়ি নিশ্চয় চুরি হয়েছে। হামেশাই হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার গাড়িটা রাস্তায় নেই?' অভিনেতা বললেন, 'আরে গাড়ি না থাকলে তবু অন্য কথা ছিল। গাড়িটা আছে কিন্তু স্টিয়ারিং-হুইল, ড্যাশবোর্ড, ব্রেক পেডাল এমনকী সামনের কাচটা পর্যন্ত নেই।'

দারোগা সাহেব তাঁর চাকুরি-জীবনে অনেক রকম চুরির কথা শুনেছেন, এটা একটু বেশি অভিনব বলে মনে হল তাঁর, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি ওখানে থাকুন আমি আসছি।' কিন্তু দারোগা সাহেবকে যেতে হল না, তিনি বেরতে যাচ্ছেন এমন সময় বিখ্যাত অভিনেতা টলতে টলতে থানার মধ্যে ঢুকলেন, 'দারোগাবাবু কিছু মনে করবেন না। আপনাকে অযথা বিরক্ত করেছি। আমার গাড়ির সবকিছু ঠিকঠাক আছে, কিছুই চুরি যায়নি। ভুল করে পিছনের সিটে গিয়ে বসেছিলাম, তাই ও রকম মনে হয়েছিল। ফোন করে ফিরে এসে সামনের সিটে বসতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।'

মদের এই প্রভাব এ কি শুধু মানুষদের ওপর? অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মদের কী সম্পর্ক? ঘোড়াকে রাম খাওয়ালে বেশি ছোটে এ তো পুরনো কথা। মদ খেলে কুকুরও মাতাল হয় এ আমার স্বচক্ষে দেখা। একবার আমার একটা কুকুর রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, বিশেষ চোট লাগেনি কিন্তু মৃত্যুভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। সামনের বাড়ির এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাকে নিজের বরাদ্দ থেকে দু' আউন্স হুইস্কি চামচে করে খাইয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুকুরটি চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং রাস্তায় ছুটে গিয়ে সমস্ত গাড়িকে তাড়া করতে লাগল। সেদিন বহু কষ্টে তাকে দ্বিতীয়বার চাপা পড়ার হাত থেকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

কুকুর বা ঘোড়া নয়, সামান্য ইঁদুরের ওপর মদ নিয়ে গবেষণা করেছেন এক মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ, প্রোফেসর গেলর্ড এলিসন। এলিসন সাহেবের গবেষণা কোনও ভুয়ো বা ফাঁকা ব্যাপার নয়। এই গবেষণার ফলশ্রুতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো সংবাদপত্রে বিশদভাবে বেরিয়েছে।

এলিসন সায়েব দেখতে পেয়েছেন যে যদি মদ ঠিকমতো সরবরাহ করা হয় তবুও ইঁদুরের মধ্যে কিছু সংখ্যক কখনওই মদ খাবে না। বাকি কিছু সংখ্যক অল্পস্বল্প মদ খাবে। আর অল্প কিছু ইঁদুর যাকে বলে অ্যালকোহলিক অর্থাৎ পুরোপুরি মদ্যপ তৈরি হবে। এর একটা হিসেবও দিয়েছেন অধ্যাপক এলিসন, শতকরা দশ ভাগ মদ্যপ, শতকরা পঁচিশ ভাগ মদ স্পর্শ করে না, বাকিরা সময়-সুবিধামতো পরিমিত পান করে। সবচেয়ে মজার কথা, মানুষের সমাজেও মদ্যাসক্তির ভাগাভাগিটা প্রায় একই রকম।

পরিমিত মদ্যপায়ী ইঁদুরেরা সাধারণত পান আরম্ভ করে নৈশাহারের দু' ঘণ্টা আগে। নৈশাহারের পরে তারা জল ছাড়া কোনও পানীয় খায় না। অবশ্য ঠিক ঘুমুতে যাওয়ার আগে আর কেউ কেউ আরেকটু মদ খায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মদ্যপ ইঁদুরদের নিয়ে। তাদের স্বভাব চরিত্র আচার আচরণ ঠিক মদ্যপ

মানুষদের মতোই। এই অ্যালকোহলিক ইঁদুরেরা সকাল থেকেই মদ্যপান শুরু করে, যত দিন গড়াতে থাকে, তারাও মদ খেয়ে যায়। এরা অধিকাংশই খুব আলসে, এদের ঘুম ভাল হয় না। তার চেয়ে বড় কথা অন্য ইঁদুরেরা এদের মোটেই সম্মান বা গ্রাহ্য করে না। যেসব ইঁদুর মদ খায় না বা পরিমিত মদ্যপান করে ইঁদুর সমাজে তাদের বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা হয়।

ইঁদুরের কথা আর নয়, মানুষের কথায় আসি। আরম্ভে সুরা ও রমণীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেখানেই আসছি।

ওমর খৈয়াম এক স্বপ্নসম্ভব পুষ্পকুঞ্জের কথা বলেছিলেন সেখানে খাদ্য ও কাজ, সাকী ও সুরা সবই ছিল। দুঃখের বিষয় এ নিতান্তই পদ্যের পৃথিবী, মানুষের জীবনে এসব একসঙ্গে জোটে না।

এক বিদেশি পানশালার কথা মনে পড়ছে। সেখানে এক বেআক্কেলে মদ্যপের সঙ্গে আমার ক্ষীণ পরিচয় হয়েছিল। একদিন দেখি সে শুকনো মুখে বসে আছে। আমি সহানুভূতি দেখাতে তার পাশে গিয়ে বসলাম, 'কী হল, কী হয়েছে' জানতে চাইলাম। সে যা বলল সাংঘাতিক, আগের রাতে একজনের কাছে এক বোতল হুইস্কির জন্য তার বউকে বেচে দিয়েছে। আমি তখন বললাম, 'তা হলে এখন বউয়ের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে।' সে বলল, 'তা হচ্ছে। বউ না থাকায় আজ খুব কষ্ট হবে, আজ মদ খাব কী বেচে?'

দ্বিতীয় গল্পের নায়কের দেখা পেয়েছিলাম এই শহরেরই এক ক্লাবে। সেও শুকনো মুখে বসে ছিল। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, বউয়ের সঙ্গে গোলমাল চলছে। আমি বললাম, 'তা, ব্যাপারটা কী?' সে বলল, 'বউ বলেছে তিরিশ দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।' আমি বললাম, 'তা হলে তোমার ভালই তো হল।' 'ভালই তো হয়েছিল', সে গেলাসে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে দীর্ঘতর নিশ্বাস ছাড়ল, 'আজকেই মাস শেষ হয়ে গেল, আজকেই তিরিশ দিনের শেষ দিন।'

মদিরা কথামালার আপাতত শেষ গল্পটি অবশ্যই ইঁদুরকে নিয়ে। একটি ইঁদুর একটি বিড়ালকে নিয়ে একটি হোটেলে গেছে। সেখানে ইঁদুরটি পরিমিত এবং বিড়ালটি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে। যখন নেশাগ্রস্ত বিড়ালটি এলিয়ে পড়েছে, তখন ইঁদুরটি বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য এক প্লেট কড়াইশুঁটির অর্ডার দিল। বেয়ারাটি ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বন্ধু মিস্টার ক্যাট কিছু খাবেন না, ওঁর খিদে পায়নি?' ইঁদুরটি বেয়ারাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওঁকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, মিস্টার ক্যাটের খিদে পেলে আমি কি আর এখানে থাকব?'

টর্চলাইট

একদা নিশীথকালে দু'জন বিখ্যাত গুলিখোর একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঘনঘোর অন্ধকারে একজন গুলিখোরের হাতে একটি টর্চলাইট ছিল। সেই টর্চলাইটে আলো জ্বালিয়ে পথ দেখতে দেখতে দু'জনে হাঁটছিল। যেমন হয়ে থাকে দু'জন গুলিখোর পাশাপাশি হাঁটলে যা হওয়া উচিত, দু'জনে মিলে উলটোপালটা আজগুবি সব গল্প করছিল। তাদের গন্তব্য স্থান বেশ দূরে ছিল, হয়তো নেশার ঘোরে তারা ঘুরপথেই যাচ্ছিল। অনেক অনেক হাঁটার পর এক গুলিখোর বলল, 'এ যে কিছুতেই পৌঁছাচ্ছি না, এর থেকে স্বর্গে যাওয়া তো সোজা। আর কত হাঁটব রে বাবা?' দ্বিতীয় গুলিখোর যার

হাতে টর্চলাইট ছিল সে আকাশের দিকে লম্বালম্বি টর্চলাইটটার আলো ফেলে বলল, 'ওই তো স্বর্গ, সোজা পথ। আমাদের বাড়ির পথের মতো অত ঘোরা রাস্তা নয়। যাবি?' প্রথম ব্যক্তি এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল, সে বলল, 'এ আর বেশি কথা কী? সোজা এই আলো বেয়ে উঠে যাব।' সুড়ঙ্গের মতো টর্চলাইটের আলোটা সরাসরি অন্ধকার আকাশ ভেদ করে উঠে গেছে, সেই ঊর্ধ্বপানে সে তাকিয়ে নিয়ে মালকোছা দিল তার ধুতিতে আলো বেয়ে স্বর্গে উঠে যাওয়ার জন্যে। তার পরেই কী যেন চিন্তা করে সে থমকে দাঁড়াল। টর্চলাইটধারী তাগাদা দিল, 'কী রে, কী হল দেরি করছিস কেন? লাইট টিপে টিপে আমার আঙুল ব্যথা হয়ে গেল।' দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন বলল, 'না ভাই তোকে বিশ্বাস নেই। আমি উঠব না।' প্রথম গুলিখোর বন্ধুর অবিশ্বাসে আহত হয়ে বলল, 'আমাকে ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কী করব?' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি ওঠার সময় তুই যদি মাঝপথে আলো নিবিয়ে দিস, তা হলে তো আমি ঝপাং করে পড়ে মরে যাব।'

টর্চলাইটের এই পৌরাণিক মোটাদাগের হাসির গল্পটি যাঁরা জানেন তাঁদের জন্য আমি অন্য এক টর্চলাইটের করুণ কাহিনী শোনাতে চাই, সে কাহিনী এ রকম কাল্পনিক, গুলিখোর বা হাস্যকর নয়।

আমার টর্চলাইটটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের বাড়িতে কোনও জিনিস হারিয়ে গেলে সবসুদ্ধ একশো আট জায়গায় খুঁজতে হয়। জায়গাগুলো এইরকম, আলমারির নীচে, আলনার পিছনে, তরকারির ঝুড়ির আড়ালে, আমাদের কুকুর গণেশের বিছানায়, ছোট জিনিস হলে আমার পাঞ্জাবির পকেটে, বড় জিনিস হলে মিনতির হাতব্যাগে অথবা আমাদের ডাকবাক্সে।

আমাদের হারিয়ে যাওয়া জিনিস ডাকবাক্সে কী করে প্রবেশ করে সে প্রশ্নে অন্য একদিন যাব।

আমাদের টর্চলাইটটা ঠিক আমাদের নয়। বহুকাল আগে, সে প্রায় পঁচিশ বছর হল এই লাইটটা আমাদের কালীঘাট বাড়িতে একটা চোর ভুল করে ফেলে যায়। চোর যখন দোতলার পাইপ বেয়ে আমাদের বাড়িতে চুরি করার যোগ্য কোনও জিনিস না পেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন ভুল করে ছাদের কার্নিশের ধারে সে তার টর্চলাইটটা ফেলে যায়। আমার অগ্রজ বহুক্ষণ আগেই গৃহে চোরের প্রবেশ টের পেয়েছিলেন এবং তিনি নীরবে চোরটিকে লক্ষ রাখছিলেন শুধু এই কৌতূহলবশত যে আমাদের বাড়িতে এমন কী জিনিস আছে যা চোর নিতে পারে!

শেষ পর্যন্ত দাদা দেখলেন যে হতভাগ্য চোরের সম্পূর্ণ পরিশ্রম শুধু বৃথা হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু সে তার নিজের সম্পত্তি কার্নিশের একধারে ফেলে যাচ্ছে। কার্নিশেরই অন্য প্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে গুটি মেরে বসে দাদা এতক্ষণ পর্যন্ত চোরের কার্যকলাপ নজর রাখছিলেন, এবার তাঁর মায়া হল।

পাইপ বেয়ে চোর তখন প্রায় আধাআধি নেমে গেছে। দাদা কার্নিশের উপর থেকে মাথা বাড়িয়ে ডাকলেন, 'এই যে ভাই, আপনার চর্টটা।' সঙ্গে সঙ্গে চোর বেচারি একটা মোক্ষম লাফ দিয়ে নীচে নেমে ছুট দিল। দাদাও টর্চলাইট হাতে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে চোরের পিছনে দুর্ভাগার আলোটা ফেরত দেওয়ার জন্য দৌড়তে লাগলেন।

সে দৌড় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আমাদের মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে কালীঘাটের বাজার ধরে আদিগঙ্গার খাল পেরিয়ে চেতলার মধ্য দিয়ে একেবারে নিউ আলিপুরের সীমানায় দুর্গাপুর ব্রিজের নীচ পর্যন্ত। পুলের নীচের গোলকধাঁধায় লোকটা হারিয়ে যায়, দাদাও রণে ভঙ্গ দিয়ে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসেন।

এরপর থেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ওই চোরের টর্চটি আমাদের সম্পত্তি হয়। আমার সেই স্মরণীয় অগ্রজ বহুদিন বিগত হয়েছেন। বাউন্ডুলে, অস্থির চিত্ত, খ্যাপা দাদা তাঁর স্নেহাস্পদ ভাই, এই আমার জন্যে, ইহপৃথিবীতে স্মৃতি এবং ওই চোরের টর্চলাইটটি ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। ওই টর্চলাইট আমার অতিপবিত্র উত্তরাধিকার সুতরাং এরপর থেকে ওই আলোটিকে চোরের টর্চলাইট না বলে শুধু টর্চলাইট বলব।

টর্চলাইটটি পাওয়া যাচ্ছে না। এ রকম মাঝেমধ্যে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই বেরিয়ে পড়ে।

দ্রব্যটি এত বেশি হারায় যে ওটি খুঁজে বার করার জন্যে আমার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে একটি সরল পন্থা বার করেছি।

লাইটটি হারিয়ে গেলে আর যত্রতত্র, একশো আট জায়গায় খুঁজি না। বাড়ির সবাই মিলে একত্র হয়ে একটা টেবিলের চারপাশে বসি। তারপর আলোচনা শুরু হয় লোডশেডিং নিয়ে। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে গুপ্তধনের চাবিকাঠি। লোডশেডিংয়ের সময় ছাড়া টর্চলাইট কাজে লাগে না। সুতরাং আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, শেষ কখন বা কবে লোডশেডিং হয়েছিল। যখন ঘনঘন লোডশেডিং হয় তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব মতভেদ হয় না।

তারপরে প্রশ্ন, গত লোডশেডিংয়ের সময়ে কে টর্চ ব্যবহার করেছিল এবং সর্বশেষ মোক্ষম জিজ্ঞাসা, লোডশেডিংয়ের পরে যখন আলো ফিরে এল সেই মুহূর্তে যার কাছে টর্চলাইট ছিল, সে কোথায় দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে ছিল? বলা বাহুল্য, এই শেষ প্রশ্নটি নিয়ে বহু বাদবিসম্বাদ হয় এবং যেভাবেই হোক টর্চলাইটের হদিশ মিলে যায়।

যাঁরা এ পর্যন্ত পড়ে ভাবছেন টর্চলাইটটি খুবই দামি মডেলের, সোনা, রুপো অন্তত তামার, কিংবা অন্য কোনও রহস্য আছে এর মধ্যে, তাঁরা কিন্তু ভুল ভাবছেন।

এবার টর্চটির রহস্য প্রসঙ্গে আসছি। প্রসঙ্গত ওই টর্চটি আমরা বাড়ির কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জ্বালাতে পারে না, সুতরাং কারও ওটা চুরি করে লাভ হবে না। টর্চটি জ্বালানোর আগে সেটার পিছনে এক সেকেন্ড ব্যবধানে পরপর তিনবার আলতো করে এবং তারপরে অতর্কিতে একবার একটু জোরে চড় দিতে হবে। এই শেষ চড়টা খুব জোরে হলে চলবে না, আবার খুব আস্তে হলেও চলবে না। চড় মারার সময় খুব সূক্ষ্মভাবে কান পেতে থাকতে হয়, টেলিফোনের লাইন কেটে যাওয়ার মতো একটা মৃদু কট করে শব্দ হওয়া মাত্র টর্চটাকে হাতের মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে হবে এবং ভাগ্যপ্রসন্ন থাকলে ওই ঘুরতে ঘুরতে আলো জ্বলে উঠবে।

আলো জ্বলে উঠলেই সে সমস্যার সমাধান হল তা নয়। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে টর্চের মুখটা নীচের দিকে করলেই আলো নিবে যায়, ফলে গুলিখোরের টর্চলাইটের মতো এটাকে স্বর্গপানে ধরে রাখতে হয়। অন্ধকারের মধ্যে চলাফেরার জন্যে পনেরো থেকে বিশ ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁয়ে বা ডাইনে কাত করা যেতে পারে, কিন্তু খুব সাবধানে, কারণ নিবেও যেতে পারে।

তবে নিবে গেলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ অনেক সময় একা একাই স্বেচ্ছায় জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়, বহু সময়েই সে কমে-বাড়ে নিজের খুশিমতো; এই নিবু নিবু হয়ে এসেছে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল, আবার ধীরে ধীরে কমতে লাগল, এ রকম হামেশাই হয়।

টর্চটা সম্বন্ধে আরেকটা তথ্যও জানানো দরকার। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে টেবিল বা তাকের পাশে টর্চটি পড়ে থাকতে দেখে কেউ দয়া করে ধরতে যাবেন না। পিছনে স্প্রিংটা আজ কিছুদিন হল বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী হয়ে পড়েছে। হঠাৎ হঠাৎ পিছন দিক দিয়ে স্প্রিংটা ছিটকে বেরিয়ে আসে, তার পিছে পিছে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসে দুটি বড় ব্যাটারি, বুকে লাগলে দিশি পাইপগানের গুলির চেয়ে সে কম মারাত্মক নয়।

আজ কিন্তু এই অপূর্ব টর্চটিকে হাজার চেষ্টা করে উদ্ধার করা গেল না। মন খারাপ করে অবশেষে তার এই অবিচুয়ারি লিখতে বসেছি। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং। আলো নিবতেই কী আশ্চর্য, টর্চলাইটটা নিজেই ফিরে এল। দেখি বইয়ের তাকের পিছনে অন্ধকারে সে একা একাই জ্বলে উঠেছে। বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল। দাদা মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন, 'গরিব মানুষের ফেলে যাওয়া জিনিস, হারাবি না, যত্ন করে রাখবি, লোকটাকে পেলে ফেরত দিবি।'

রং

শিবরাম চক্রবর্তী একবার তাঁর এক গল্পে রং ফলানোর বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন। শিব্রামীয় পানরীতির অমোঘ ব্যবহারে রং শব্দটি বাংলা ইংরেজি দুই দিক থেকে এসেছিল। বাংলা রং, মানে বর্ণ, রং ফলানো মানে সোজা কথায় বাড়িয়ে বলা আর ইংরেজি রং অর্থাৎ Wrong মানে ভুল।

ইংরেজি ব্যাপারে এবার যাচ্ছি না, শুধু হাতের কাছে এসে গেছে যখন ব্যাপারটা একটু ছুঁয়ে থাকি।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, অরভিল এবং উইলবার রাইট, প্রথম এরোপ্লেন চালিয়েছিলেন। এরোপ্লেন বিষয়ক এক খণ্ডকাব্যে বিখ্যাত রসিক কবি অগডেন ন্যাস লিখেছিলেন, 'টু রাইটস মেক এ রং', (Two rights make a wrong); ন্যাস সাহেব উচ্চারণের মিলের জন্যে একটুও বানানের তফাত মানেননি। রাইট নামের বানানের প্রথমে যে ডবলিউ আছে সেটাকে উপেক্ষা করেছেন। সে যাহোক, দুই রাইট মিলে একটা রং বানিয়েছে, বিমান সম্পর্কে কবির এই তির্যক উক্তিটি চমৎকার।

বাংলা রঙের ব্যাপারে রসায়ন বিজ্ঞানী পরশুরাম ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বোদ্ধা। তাঁর অসংখ্য গল্পে রঙের, বিশেষ করে গাত্রবর্ণের, তিনি অতুলনীয় বিশ্লেষণ করেছেন। ধুস্তরীমায়া অর্থাৎ দুই বুড়োর রূপকথা গল্পের নায়ক উদ্ধব পাল নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে রাজকুমারী স্পন্দচ্ছন্দাকে জিজ্ঞাসা করেছন, 'অত ফরসা কী করে হলেন?'

রাজকুমারী যখন বললেন যে তাঁর গায়ের রং-ই ওই রকম, উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন, 'ওগো চণ্ডপণ্ডা পদ্মীরানী, রঙের ব্যাপারে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ওই হল আমার ব্যবসা। তুমি এক কোট আস্তরের উপরে তিন কোট পেন্ট চড়িয়েছ—হবক্স জিঙ্ক, একটু পিউরি আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু জমির আদত রংটি কেমন?'

তাঁর অন্য এক গল্পে পরশুরাম এক আত্মাভিমানী বাঙালি কালো মেয়ের কথা লিখেছেন, যার আগে নাম ছিল শ্যামা। ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে, কারণ তার কালো রং সে শ্যামবর্ণ বলে চালাতে চায় না।

এই সূত্রে আমার নিজের কথাও একটু বলি। আমার মা বলেন আমার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু আসলে তা নয়। আমার কৃষ্ণ ত্বক মাতৃস্নেহের তারল্যে কিছুটা ঝকঝকে মনে হত স্বর্গতা জননীর দৃষ্টিতে। গায়ের রং নিয়ে এ বয়েসে আমার দুঃখ নেই। বাঙালি পুরুষের গায়ের রং শুধু বিয়ের রাতে কন্যাপক্ষের মহিলামহলে সামান্য আলোচ্য-বিষয়। তবে দু'-একটা অসুবিধে আজও আছে। কলকাতায় নবাগত অনেক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক রাস্তাঘাটে আমাকে পেলে তামিল ভাষায় কথা বলে কিছু জানতে চান। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার বেশ দু'-চারবার হয়েছে।

আরেকটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিদেশ যেতে গিয়ে। আমাদের গরিব দেশের পাসপোর্টে চোখের বর্ণ চুলের বর্ণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয় কিন্তু সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ কোনও কোনও দেশে যেতে গেলে ভিসার দরখাস্তে গায়ের রং কীরকম তাও জানাতে হয়। আমার গায়ের রং কালো, অবশ্যই কালো কিন্তু আমি কৃষ্ণাঙ্গ নই, ব্ল্যাক বলতে যা বোঝায় আমি সে জাতের নই। আমি সাদা বা কালো নই, আমি ভারতীয় কিংবা বড়জোর বাঙালি। কিন্তু গায়ের রং তো ইন্ডিয়ান বা বেঙ্গলি লেখা যাবে না।

উদ্ধার করেছিলেন ভিসা অফিসার নিজেই, ফর্মের ওই জায়গাটা ফাঁকা রেখেছিলাম, তিনি নির্দ্বিধায় লিখে দিলেন, 'হুইটিস', মানে গমের মতো। সেই থেকে নিজের গায়ের রং সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেছে, যখনই কোথাও লালচে গমের দানা চোখে পড়ে নিজের গায়ের চামড়ার দিকে তাকাই, সেই সাহেব ভিসা অফিসারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে।

গায়ের রং মোটামুটি পাকা ব্যাপার। সাহেব-মেমরা অনেক সময় সমুদ্রতীরে যান গায়ের চামড়া রোদে পুড়িয়ে ট্যান করার জন্যে কিন্তু জনপদে ফিরে এসে তাঁরা আবার তাঁদের দুঃখের শ্বেতবর্ণ ফিরে পান। আমাদের কালো রং অনেক সময় অসুখ-বিসুখে, রোদ্দুরে ঘুরে, রাত জেগে বা অন্য কোনও কারণে আরও কালো হয়ে যায়, চেনাশোনা লোক পথে-ঘাটে দেখা হলে বলে, 'কী হল এত কালো হলে কী করে?' পার্থক্যটা অবশ্য ভূত-চতুর্দশীর অন্ধকার আর শ্যামাপুজোর অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও কম, তবু পরিচিত চোখে ধরা পড়ে। এদিকে গ্রামের লোক কলকাতায় এলে কলকাতার কলের জলে তাদের গায়ের রং চিকেশাভাব ধারণ করে, মাজা রঙের মেয়ে গৌরাঙ্গী হয়ে ওঠে। আবার গ্রামে ফিরে গেলে কয়েকদিনের মধ্যে যে-কে সেই।

হকার্স কর্নারে দেখেছি রং উঠে যাওয়া সদ্য কাচা নতুন শাড়ি হাতে স্থূলাঙ্গিনী মহিলা চেঁচাচ্ছেন, 'আপনি বলেছিলেন না পাকা রং, এই আপনার পাকা রং?' প্রিন্টেড শাড়ির লাল ফুল, নীল পাতা, সবুজ পাখি—রং মেখে প্রায় একাকার হয়ে গেছে, সেই শাড়িটা দোকানদারের মুখের সামনে মেলে ধরেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু দোকানদার নির্বিকার। শুধু নির্বিকার না, পাশের তাক থেকে আবার প্রিন্টেড শাড়ি নামাচ্ছেন আর বলছেন, 'মাসিমা, যা হবার হয়েছে, এবার এই রামপুরের প্রিন্ট নিয়ে যান, এবার সত্যিই পাকা জিনিস দিচ্ছি।'

এর চেয়েও মারাত্মক গল্পের সেই দোকানদার। অনুরূপ পরিস্থিতিতে সে নাকি উলটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রংটা উঠে কী হল?' কেনা-দিদি জবাব দিয়েছিলেন, 'উঠে গিয়ে লাগল অন্য কাপড়ে।' দোকানদার এবার আশ্বস্ত হলেন, 'ও তা হলে এক সঙ্গে কেচেছিলেন। বাকি কাপড়গুলো কী ছিল?' কেনা-দিদি এই প্রশ্নে খেপে গেলেন, 'আপনার চাদরের নীল রং লেগে গেছে সাদা তোয়ালেতে, বিছানার চাদরে, কর্তার গেঞ্জিতে, ছেলের পাজামায়।' এবার দোকানদার স্মিত হেসে বললেন, 'কেনা-দিদি, এবার দেখবেন রংটা কত পাকা। ওই তোয়ালে, চাদর, পায়জামা থেকে জন্মেও ওই নীল রং উঠবে না। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সেদ্ধ করলেও না।'

এ গল্প বানানো গল্প, কিন্তু যেকোনও মহৎ সাহিত্যের মতো এর বিষয়বস্তু সত্যি; পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যাঁর সাদা কাপড়ে কখনও পাকা দাগ পড়েনি অন্য কোনও কাপড়ের কাঁচা রঙের? এবং সে রং আর ওঠেনি।

কাঁচা রঙের ব্যাপারটা আরও একটু পরিচ্ছন্ন করা যেতে পারে আমার নিজেরই একটি ঘটনায়। আমার পরমারাধ্যা পত্নীঠাকুরানি একবার আমাকে একটি কলকাপেড়ে সাদা শাড়ি কিনে আনতে বলেছিলেন। এসব কঠিন কাজ সাধারণত তিনি নিজেই করেন, কিন্তু বোধহয় এই অসামান্য জিনিসটা বাজারে পাননি। আমিও পেলাম না, কিন্তু শততম একাদশ বিপণিতে এক বিক্রেতা একটি আশ্চর্য কথা বললেন, 'ফিকে নীল অথবা ফিকে হলদে রঙের কলকাপাড়ের শাড়ি নিয়ে যান স্যার। এক ধোপেই সাদা হয়ে যাবে।'

রঙের গল্প শেষ করার আগে আরও একটা ক্ষমা চাওয়ার মতো ব্যাপার আছে।

কিছুদিন আগে এক ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের পোষা মেনি বিড়াল গান্ধারী তিনটে বাচ্চা দিয়েছিল। গান্ধারী নিজে আগাগোড়া সাদা আর বাচ্চা তিনটে হয়েছে চমৎকার সাদাকালো। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক পুরো এক রিল ছবি তুললেন আমাদের বাড়িতে। ফোটোগুলো ডেভেলপ করে আর প্রিন্ট করে এক ছুটির দিন নিয়ে এলেন। চমৎকার ঝকঝকে সব ছবি উঠেছে বিড়ালছানা ও তাদের মা সমেত বাড়ির সকলের। তবে অর্ধেকের বেশি ছবিই বেড়াল ছানাদের।

ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক রঙিন ছবি তুলেছিলেন এবং রঙিন ছবির খরচটাই আমার কাছে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে অর্ধেক টাকা দিয়েছিলাম। সাদা-কালো বেড়াল ছানার রঙিন ফটো দিয়ে কী হবে, যদি তিনি তুলে থাকেন সেটা তাঁর বোকামি, তার মাশুল আমি দেব কেন? সেই ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক আর আমাদের বাড়ি আসেন না। এখন মনে হচ্ছে পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেই হত।

রং সম্পর্কে শেষ কথা বলেছিলেন এক অনিদ্রা রোগী। নানা রকম ঘুমের ট্যাবলেট তাঁর মাথার কাছে সাজানো. একটা, দুটো বড়িতে তাঁর ঘুম আসে না, অন্তত তিন-চারটে লাগে। বিভিন্ন ট্যাবলেট বিভিন্ন আকারের সাদা-কালো-হলদে ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের।

একই হোটেলে আমার পাশের বেডে ছিলেন ভদ্রলোক। দেখলাম একেক রঙের একটা করে ট্যাবলেট নিয়ে তিন-চার রকম ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়ে খেয়ে ফেললেন। আমি বললাম, 'এটা কী করলেন?' অনিদ্রা রোগী মৃদু হেসে বললেন, 'নানা রঙের ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে খাই রঙিন স্বপ্ন দেখব বলে।'

লিফট

স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি, এই পঙ্‌ক্তি দুটি হয়তো একটু এদিক-ওদিক হতে পারে তবে কবিতাটি নিশ্চয় কবি গোলাম মোস্তাফার,

দেখে শুনে বুঝিলাম করি তালিকা,
সবচেয়ে ভাল মোর ছোট শ্যালিকা।

আমার নিজের বিয়ে হয়েছে দুই দশকেরও আগে, প্রায় দুই যুগই বলা যায়। এতদিন পরে তালিকা প্রণয়ন করে ছোট্ট শ্যালিকাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করার আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

তবু লিফটের সূত্রে আমার ছোট শ্যালিকা সম্পর্কে দু'-একটা কথা লিখে রাখা চলে। তার প্রথমটি অপ্রাসঙ্গিক। আমার বিয়ের সময় আমার মাননীয়া স্ত্রী এবং তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আকারে-প্রকারে, আচার-আচরণে অনেকটা একরকম ছিলেন। যেমন হয়, মায়ের পেটের পিঠোপিঠি বোন বা ভাই হলে। আমার বিয়ের অব্যবহিত পরেই একদিন আমাদের বাড়িতে আমার শ্যালিকাকে দেখে আমার এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কে তোমার স্ত্রী আর কে তোমার শ্যালিকা বুঝতে তোমার অসুবিধে হয় না?' আমি সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিলাম, 'বোঝার খুব চেষ্টা করি না।'

এসব অনেককাল আগের কথা। সেদিনের সেই নবীনা শ্যালিকা, আজ ষড়ৈশ্বর্যময়ী রাশভারি সংসারিণী। কে তাকে দেখবে বলবে একদা তাকে নিয়েই আমি কবিতা লিখেছিলাম, 'রোদে হাওয়ায় একটি গোলাপ, একটিই শেষ গোলাপ সখি।' 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই।

এসব ব্যক্তিগত কথা আপাতত থাক। বরং সরাসরি এবারের মূল বিষয় লিফট প্রসঙ্গে চলে

আসি। বলা বাহুল্য, ওই লিফট সূত্রেই শ্যালিকার কথা এসেছে। এইখানে অতি গোপনে ব্রাকেটে একটা কথা বলে রাখি, (এই বিশ্বে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হলেন আমার স্ত্রী, তবে তাঁর চেয়েও সুন্দরী তাঁর ছোট বোন।)

কলকাতার এক সরকারি অতিথিশালায় আমরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি শ্যালিকাকে নিয়ে মিঠে পান কিনতে বেরলাম। আমার স্ত্রী-পুত্র এবং শ্যালিকার স্বামী পুত্রাদি অতিথিশালার উচ্চতম তলে চলে গেলেন শীতের রোদ পোহানোর জন্যে। পান কিনে ফেরার পথে ঘটল সেই অঘটন। লোডশেডিং, চারতলা এবং পাঁচতলার মধ্যে ঘচঘচাং করে লিফটটা আটকে গেল। এইরকম একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্যালিকার উষ্ণ সান্নিধ্য, কিন্তু আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। অন্যদিকে আমার শ্যালিকা প্রাণপণ চেঁচাতে লাগলেন, 'বাঁচাও, বাঁচাও'। ওই অবস্থাতেও আমার মাথা ঠান্ডা ছিল। আমি যত তাকে বলি, 'লোকে ভাববে আমি কোনও অশালীন আচরণ করছি, তুমি একটু কম চেঁচাও', কে কার কথা শোনে।

বহু চেঁচামেচি, কাঁদাকাটি অনুনয় বিনয়ের পর সেদিন লোকেরা আমাদের উদ্ধার করেছিল প্রায় আধঘণ্টা পরে।

লিফটের প্রাচীন গল্পটা এক গ্রামবৃদ্ধকে নিয়ে। সে বেচারি কলকাতায় এসে জীবনে প্রথম লিফট দেখে। দেখে যে এক বৃদ্ধা মহিলা লিফটের ভিতরে ঢুকে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। দু' মিনিট পরে লিফটটা উপর থেকে নেমে এল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক পরমাসুন্দরী যুবতী।

এই দৃশ্যটি দেখার পরে ওই পাড়াগেঁয়ে বুড়োটি নাকি কপালে চড় দিয়ে আক্ষেপ করেছিল, 'হায়, আমার বুড়িকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে এলাম না। সে তো আসতেই চেয়েছিল। আমিই রেখে এলাম। আমারই কপালের দোষ। আজ কলকাতা থেকে তাকে কেমন অল্পবয়সি ডাগরডোগর বানিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম।'

লিফটের ব্যাপারে অনেকদিন আগে কলকাতা শহরের পুরনো একটা হোটেলের একটা মজার ঘটনা বলার রয়েছে। তখন এই শহরে অনেক ইংরেজ ছিল। সাহেব-মেমদের জন্যে খাস বিলেত থেকে খাঁটি সাহেব জ্যোতিষীরা আসত। তারা কবে বিয়ে হবে, শাশুড়ি মারা যেতে পারে কি না, অদূর ভবিষ্যতে হোমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, বিপ্লবীদের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা, এমনকী জন সাহেবের মেমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ার ব্যাপারটা জন সাহেব আঁচ করছেন কি না ইত্যাদি হাজারো ব্যাপারে হাত গুনে বা ক্রিস্টাল বল দেখে জানিয়ে দিতেন।

সাধারণত এই সব সাহেব (মেমসাহেব জ্যোতিষীও ছিল) যেদিন কলকাতায় আসতেন সেদিন কিছুটা প্রচারের আর কিছুটা গোছগাছের জন্যে সামান্য দু'-চারজনের হাত দেখতেন পয়সা না নিয়ে।

সেবার এসেছেন ক্যাপটেন বিলি ইনার আই। সাহেব মেমদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এঁর নখদর্পণে। লন্ডনে, নিউইয়র্কে হইচই ফেলে কলকাতায় এসেছেন। জাহাজ থেকে নেমেছেন বোম্বাইতে, সেখানে কয়েক সপ্তাহ ভবিষ্যতের ঝড় তুলে কলকাতায়। প্রথম দিন হোটেলের ঘরে বিশ্রাম, সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ভাগ্যগণনা। হোটেলের স্থানীয় কর্মচারীরা কেউ কেউ আলাদা আলাদা বা দল বেঁধে এসে তাঁকে মুফতে হাত দেখিয়ে যাচ্ছে। তিনিও অল্পবিস্তর বলে যাচ্ছেন।

মাথায় কদমছাট চুল তার মধ্যে দীর্ঘ টিকি, পরনে খাকির পোশাক একটি লোক, হোটেলের কোনও কর্মচারী, সে হাত দেখাতে এসেছে। দু'-একজনের পরে ক্যাপ্টেন বিলি এরও হাত দেখলেন। একটা বড় আতসকাচ দিয়ে একবার ডান হাতের কররেখা আর একবার বাঁ হাতের কররেখা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, তারপর লোকটিকে বললেন, 'তোমার জীবনে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস (ups anf down) অর্থাৎ ওঠানামা আছে।' তিনি অবশ্য ইংরেজিতেই বললেন তবে পাশেই তাঁর দোভাষী বসে ছিল, সে কিছুটা সাদা বাংলায় কিছুটা ভাঙা হিন্দিতে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসু উক্ত টিকিধারীকে তার জীবনের ওঠানামার কথা জানালেন।

ফল যা ফললো সেটা মারাত্মক। লোকটি এই কথা শুনে প্রচণ্ড আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,

অবশ্য এর চেয়ে খাঁটি, এর চেয়ে সত্যি তার সম্পর্কে আর কিছুই হতে পারে না। কারণ সে হল লিফটম্যান—তার শুধুই ups and downs—সারাদিন কেবলই ওঠা আর নামা।

চাকরিতে সে নতুন ঢুকেছে, কাজটা পাকাপাকি থাকবে কি না সে বিষয়ে তার মনে সংশয় ছিল। এটুকু যখন সাহেব বলতে পেরেছে, বাকিটুকুও নিশ্চয়ই পারবে। তাই সে আবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল তার এই উত্থান-পতন, পুনরাবৃত্ত আপস অ্যান্ড ডাউনস কতদিন চলবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপটেন বিলি যথারীতি চিরাচরিত জ্যোতিষীসুলভ উত্তর দিয়ে আশ্বস্ত করলেন, না না, এই সামান্য মাস কয়েকের ব্যাপার। এই ইস্টারের পরেই আর আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে না।

সাধারণত এ ধরনের স্তোকবাক্যে সব ভাগ্য জিজ্ঞাসুরাই খুশি হয়। কিন্তু উত্থান-পতন, আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে না জেনে এই টিকিধারী কেন এত মুষড়ে পড়লেন, গণৎকার সাহেবের সেটা কিছুতেই বোধগম্য হল না।

লিফট সংক্রান্ত শেষ গল্পটি আমার নয়, আমি শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর কাছ থেকে চুরি করেছিলাম এবং তিনি এটা সদ্ব্যবহার করার আগেই আমার ডোডোতাতাই গল্পমালায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। দুটি শিশু অধীর প্রতীক্ষা করছে, সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে। তাদের বাবা মস্ত একটা লিফট নিয়ে আসবে। বাড়িতে কোথায় লিফট বসানো হবে, সে জায়গাটাও তারা ঠিক করে ফেলেছে।

কারণ আর কিছু নয়। আজ সকালে অফিস যাওয়ার সময় তাদের বাবা তাদের মাকে বলেছে, 'আজ হয়তো একটু তাড়াতাড়ি আসব, বড়সাহেব বলেছেন আজকে আমাকে একটা লিফট দেবেন।'

বলা বাহুল্য, তাদের বাবা যখন দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় বড়সাহেবের গাড়ি থেকে শূন্য হস্তে নামল শিশু দুটি ছুটে গেল তাদের বাবার কাছে, 'বাবা বড়সাহেব তোমাকে লিফট দেয়নি?'

বাবা সরলচিত্তে জবাব দিলেন, 'কেন দেবে না? বড়সাহেবই তো নামিয়ে দিয়ে গেলেন।' ছেলে দুটি বলল, 'গাড়ি থেকে তুমি তো একা নামলে। বড়সাহেব তো লিফটটা নামিয়ে দেয়নি।'

হিমানীশের গল্পটা অবশ্য একটু অন্যরকম ছিল। একদিন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর গাড়িতে নামিয়ে দেবেন বলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আনন্দবাজার অফিসের সিঁড়ির পাশে লিফটের সামনে। হিমানীশ লিফটে করে উপরে উঠতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে আমি বললাম, 'নীরেনদা লিফট দেবেন তাই দাঁড়িয়ে আছি।' হিমানীশ দ্রুত লিফট থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ঠিক আছে। তা হলে নিয়ে যান।'

মদমত্ত

কয়েক বছর আগে মাতালের কাণ্ডজ্ঞান পাঠ করে এক সরল প্রকৃতির মদমত্ত পাঠক আমাকে প্রকৃত সুরাবিলাসী ধরে নিয়ে বিশেষ বিপাকে ফেলেছিলেন। সে কাহিনী অন্যত্র লিখেছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠায় আবার 'ইঁদুর ও মদিরা' লিখে একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি। মদ যে খায় এবং মদ যে খায় না উভয়েরই মদের গল্পের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল এবং সকলেরই জানা আছে অন্তত একটি না একটি কাহিনী, যেটা তাদের ধারণা মাতাল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প।

একটা খুব ভাল কাহিনী শুনিয়েছেন এক প্রবীণ, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। তাঁর আদালতে অনেকদিন আগে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে তিনি পেয়েছিলেন। আগের দিন রাতে রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করার দোষে পেটি কেসে পুলিশ পরদিন সকালে আদালতে চালান দিয়েছে।

ধুতিতে, পাঞ্জাবিতে ধুলো-কাদা মাখা, চোখের চশমার কাচ ভাঙা, কপালের কাছে কিছুটা ছড়ে গেছে কিন্তু আসামি অত্যন্ত নিরীহ ও ভদ্রপ্রকৃতির। হাতজোড় করে দোষ কবুল করলেন আসামি। আরও অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরও পঁচিশ টাকা জরিমানা হল।

আদালতের নির্দেশ শুনে আসামি বিনীতভাবে প্রশ্ন করল, 'হুজুর, এই যে পঁচিশ টাকা দেব, এর একটা রসিদ পাব তো?'

বিচারক একটু বিস্মিত হয়েছিলেন এই প্রশ্নে। তিনি বললেন, 'তা পাবেন না কেন? নিশ্চয়ই পাবেন।' তারপর একটু থেমে জানতে চেয়েছিলেন, 'কিন্তু আপনি এই রসিদটা দিয়ে কী করবেন? কী কাজে লাগবে আপনার রসিদটা?'

আসামি ভদ্রলোক অধিকতর বিনীত হয়ে বললেন, 'বাড়িতে নিয়ে বউকে দেখাব।' বিচারক আরও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্ত্রীকে আদালতের রসিদ দেখিয়ে কী করবেন?' আসামি এবার পরিষ্কার করে বললেন, 'বউকে রসিদটা দেখালে সে বুঝতে পারবে যে সব টাকাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিইনি। কিছু টাকা অন্য কাজেও ব্যয় হয়েছে।'

সুরাপায়ীর জগৎ অত্যন্ত লম্বা এবং চওড়া। প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির, রাস্তাঘাট, বাজারহাট সর্বত্র তার অবস্থিতি। দিন ও রাতের যে কোনও সময়ে তাকে যে কোনও স্থানে আশা করা যেতে পারে। হয়তো সে সাতসকালেই মদ খায়নি কিন্তু গত রজনীর খোঁয়ারি সকালেও চলছে এবং বেলা বাড়তে বাড়তে সুরাবিলাসীর সংখ্যা রাত দুপুর নাগাদ তুঙ্গে পৌঁছাচ্ছে।

আদালতের কাঠগড়ায় প্রকাশ্য দিবালোক থেকে আমরা এবার একবার হাসপাতালের ওয়ার্ডে গভীর রজনীতে ঘুরে আসি। এক গুরুতর অসুস্থ রোগী বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছেন। তিনি আজকেই একটু আগে এই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। দু'দিক থেকে দু'জন ডাক্তার তাঁকে দেখতে ঢুকেছেন। দু'জনারই নৈশ ডিউটি, কিঞ্চিৎ টলছেন। টলতে টলতে রোগীর বিছানার দু'পাশে এসে দু'জনে দাঁড়িয়েছেন। তারপর দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে রোগীর চাদরের নীচে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নাড়ি দেখার জন্যে। রোগীর হাত চাপা পড়ে রয়েছে তার কাত হয়ে থাকা শরীরের নীচে। যা হোক একটু এদিক ওদিক করে দুই ডাক্তার চাদরের নীচে পরস্পরের কবজির সন্ধান পেলেন এবং একজন অন্যজনের নাড়ি ধরে বসলেন নিজেদেরই অজান্তে।

তারপর দু'জন ডাক্তার চাদরের নীচে পরস্পরের নাড়ি ধরে এ রকম কথোপকথন করলেন—
'দারুণ মাতাল দেখছি।'
'খুব মদ খেয়েছে আজ।'
'সাত আট পেগ মদ খেয়েছে অন্তত।'
'তার চেয়েও বেশি হতে পারে।'
'যত সব মাতালের কাণ্ড।'
'যত সব মাতালের কাণ্ড।'

এর পরের উপাখ্যানটি নির্জলা প্রভাত কালের, এক সরল মদ্যপের। ভদ্রলোকের সেদিন অফিস যাওয়া হয়নি। অবশ্য দোষ তাঁর নয়। একটা ছোট গোলমালের জন্য তিনি কাজে যেতে পারেননি।

আগের রাতে খুব মদ খেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সকালবেলায়ও বেশ নেশা ছিল কিন্তু তবুও ঘুম চোখে অভ্যাসবশত অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। প্রথমেই দাড়ি কামানো। দাড়ি কামাতে গিয়ে গোল আয়নাটা তুলে নিয়ে তিনি দেখলেন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না, নিজের কোনও ছায়া পড়ছে না। তখন তাঁর ধারণা হল নিশ্চয়ই তিনি অফিসে চলে গিয়েছেন। বেলাও বেশ বেড়ে গেছে, এতক্ষণ তো অফিসে চলে যাওয়ারই কথা, আর সে জন্যেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে অধিক বেলায় তাঁর এই ভ্রম সংশোধন হয়েছিল, যখন তাঁর মনে পড়ল যে দাড়ি কামানোর আয়নার কাচটা আগের দিনই ফ্রেম থেকে খুলে পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

অন্য এক সম্ভ্রান্ত মদ্যপকে জানি, যাঁর ভীষণ আত্মসম্মান বোধ। নতুন একটা পাড়ায় বাড়ি করে উঠে এসেছেন। আগের পাড়ায় মাতাল বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতেন। পাড়ার লোক টিটকিরি দিত।

নতুন পাড়ায় এসে ভদ্রলোক ঠিক করলেন আর টিটকিরি নয়, আর ধরা দেবেন না। এখনও তিনি সন্ধ্যার অনেক পরে, অনেকদিনই মধ্যযামে নেশাতুর অবস্থায় বাড়ি ফেরেন কিন্তু এ-পাড়ার লোকে আর তাঁকে মাতাল বলে টিটকিরি দেয় না। ভদ্রলোক একটা চমৎকার বুদ্ধি বার করেছেন লোকে যাতে টলটলায়মান পায়ের ভিতরে পা অবস্থাটা ধরতে না পারে। নিজের গলির মুখে এসেই তিনি উলটোমুখ হয়ে যান। এবার পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে সন্তর্পণে বাড়ি ফেরেন। তাঁর এই পিছুহাঁটার ব্যাপারটা নতুন পাড়ার লোকেরা কয়েকদিনের মধ্যেই ধরে ফেলে। কিন্তু তারা তাঁকে মাতাল বলে টিটকিরি দেয় না, পাগল কিংবা উচ্চাঙ্গের রসিক ভেবে হাসাহাসি করে। নতুন পাড়ার অল্পবয়েসিরা ভদ্রলোককে আজকাল রসিকদা বলে ডাকে। তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে নতুন নামকরণ মেনে নিয়েছেন।

এই রসিকদা সম্পর্কে আরও একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। রসিকদার বিয়ের কিছুদিন পরেই রসিকদার স্ত্রী তাঁর স্বামীর গভীর মদ্যাসক্তির ব্যাপারটা অনুধাবন করেন। তারপরে যথারীতি, 'তুমি আর মদ খাবে না,' 'তুমি আবার মদ খেয়ে বাড়ি এলে আমার মরামুখ দেখবে,' ইত্যাদি নানা দেয়াল রসিদাকে টপকাতে হল। সহস্র অনুনয় বিনয়, রাগ-গোঁসা-ক্রোধ ইত্যাদি উপেক্ষা করে রসিকদা নিয়মিত গভীর রাতে টলটলে অবস্থায় বাড়ি ফিরতে লাগলেন।

তখন রূপালি পর্দায় সাহেব-বিবি-গোলাম সিনেমার খুব রমরমা চলছে। রসিকদার স্ত্রী অর্থাৎ রসিকবউদি পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে সিনেমাটি কয়েকবার দেখেছেন। এবং এই সিনেমা থেকেই তাঁর মাথায় একটু চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। সাহেব-বিবি-গোলামের নায়িকার মতো তিনিও মদ খাওয়া ধরবেন, স্বামীকে বাড়িতে আটকিয়ে রাখা যাবে। মদ খাওয়ার জন্যে আবার শিক্ষাও দেওয়া হবে। ঘরের বউ মাতাল হলে যদি লোকটার হুঁশ ফেরে, মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, তা হলে তো ভালই।

রসিকদা এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। সেই দিনই অফিস থেকে ফেরার পথে এক বোতল দু' নম্বর ধেনো মদ কিনে আনলেন। সন্ধ্যাবেলা ঘরের মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে রসিকদা রসিকবউদিকে মদ্যপানে হাতে খড়ি দিতে প্রস্তুত হলেন। মোড়ের পানের দোকান থেকে এক কেজি বরফ, দু' বোতল সোডা ওয়াটার এনে স্বামী-স্ত্রী বেশ জমিয়ে বসলেন। রসিকদা খেয়াল করে রসিকবউদিকে দিয়ে কয়েকটি বেগুনি ভাজিয়েছেন।

কিন্তু এক চুমুক মুখে দিয়েই রসিকবউদি প্রচণ্ড একটা হেঁচকি তুললেন, তারপরে ক্রমাগত হিক্কা, হিক্কা আর হিক্কা। রসিকবউদি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ, এই সাংঘাতিক জিনিস কী করে খাও তুমি? আমার বুক জ্বলছে, মাথা ঘুরছে, বমি আসছে। তুমি কী আনন্দে এটা খাও। এই ছাঁইপাঁশ গেল।' রসিকদা তখন মুখ খুললেন, 'তা হলে ভেবে দেখো। তুমি ভাবো আমি মদ খেয়ে খুব আনন্দে থাকি। তোমার এক চুমুক খেয়েই এই অবস্থা আর আমাকে দিনের পর দিন কত কষ্ট করে গেলাসের পর গেলাস এই জিনিস খেয়ে যেতে হচ্ছে।'

সুচিকিৎসা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ডমরু চরিতে এক আশ্চর্য চিকিৎসার কথা লিখেছিলেন। সে কাহিনী যথেষ্ট বিস্তৃত, আমরা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে এখানে একটু বলে নিচ্ছি।

ডমরুর জ্বর হয়েছে, কম্প জ্বর। বেচু কবিরাজকে খবর দেওয়া হল। বেচু জাতে কৈবর্ত, আগে চাষ করত। এখন কবিরাজ হয়ে বিলক্ষণ পসার হয়েছে। বেচু এসে ডমরুর নাড়ি ধরে শ্লোক পড়তে লাগল,

"কম্প দিয়া জ্বর আসে
কম্প দেয় নাড়ি।
ধড়ফড় করে রোগী
যায় যমবাড়ি ॥"

নাড়ি পরীক্ষা করার পর বেচু ডমরুকে বিষবড়ি দিল। সামান্য বিষবড়ি নয়, একেবারে নতুন ওষুধ, সম্প্রতি সে নিজে মনগড়া করে প্রস্তুত করেছে।

ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে ডমরুর স্ত্রীর মনে যাতে কোনও সন্দেহ না থাকে সেই জন্যে বেচু নিজেও দুটো বড়ি খেয়ে নিল।

বড়ি খাওয়ার তিন ঘণ্টা পরে ওষুধের গুণ প্রকাশিত হল। ডমরুর চোখ লাল হয়ে উঠল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। প্রাণ যায় আর কী!

ডমরুর অবস্থা দেখে তাঁর বন্ধু আধকড়ি বেচুর খোঁজ করতে গেলেন। বেচু ঘরে ছিল না। অনেক খুঁজে দেখা গেল যে সে এক পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। তারও চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। পানাপুকুরের পচা পাঁক তুলে সে মাথায় দিচ্ছে।

অম্বিকাকড়ি বেচুকে বললেন, 'বেচু, তুমি ডমরুকে কী ওষুধ দিয়েছ? তোমার ওষুধ খেয়ে ডমরু মরে পড়তে বসেছে।' মাথায় কাদা দিতে দিতে বাজখাঁই স্বরে বেচু বলল, 'বড়ি খেয়ে আমিই বা কেমন ভাল আছি।'

চিকিৎসা-অচিকিৎসা-সুচিকিৎসার ছোট-বড় অনেক কাহিনী আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের এ গল্পটির কোনও তুলনা নেই।

অন্য ধরনের একটা আধুনিক গল্প এ মুহূর্তে মনে পড়ছে।

এক রোগী গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে, বিখ্যাত দিকপাল ডাক্তার। রোগী ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, সন্ধ্যাবেলা বড় ক্লান্ত, অবসন্ন লাগে অথচ ঘুমও ভাল করে আসতে চায় না।' ডাক্তারবাবু নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, 'আপনার কিছু হয়নি। রাতে শোয়ার আগে একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে শোবেন। ভাল হয়ে যাবেন।'

ছয় মাস পরে ওই রোগী আবার একবার ওই ডাক্তারবাবুকে দেখাতে এলেন। আবার ডাক্তারবাবু ভাল করে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আপনার কিছু হয়নি। রাতে শোয়ার আগে বড় এক গেলাস জল খেয়ে শোবেন। ভাল হয়ে যাবেন।'

বিমূঢ় রোগী বললেন, 'কিন্তু মাত্র ছয় মাস আগে আপনি আমাকে শোয়ার আগে ব্র্যান্ডি খেতে বলেছিলেন, এখন বলছেন জল!' ডাক্তারবাবু মৃদু হাসলেন, তারপর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে রোগীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিকিৎসাশাস্ত্রের কী দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে আজকাল, জানেনই তো, ছয় মাস কেন , দু'-তিন মাসের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়মিত বদলে যাচ্ছে।'

তা বদলাক, অনবরত বদলাক। মূল অসুবিধা হল এই চিকিৎসার বদলের খবর ডাক্তারদের মতো বহু রোগীই রাখে। আজকাল বহু রোগীই এত ওয়াকিবহাল যে তারা শুধু ডাক্তারদের পক্ষেই বিপজ্জনক তা নয়, নিজেদের পক্ষেও বিপজ্জনক। অনেক রোগীই ডাক্তারের কাছে যায় নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী সে নিজের যে চিকিৎসা চালাচ্ছে তার প্রতি চিকিৎসকের অনুমোদন আদায় করতে। পেটেন্ট ওষুধের এই স্বর্ণযুগে যে কোনও ওষুধের দোকানে খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে ওদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ অর্থাৎ চার ভাগের তিন ভাগ ওষুধ বিক্রি হয় প্রেসক্রিপশনের বাইরে, অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি নিজের খেয়াল ও মর্জিমতো ওষুধ কেনে যতক্ষণ পর্যন্ত রীতিমতো মরণাপন্ন না হচ্ছে।

ডাক্তারি বিদ্যার সবচেয়ে ভাল সময় ছিল গত শতাব্দীর শেষ আর এই শতাব্দীর শুরুতে। সেই সময় চিকিৎসকেরা আর অনুমানে চিকিৎসার মধ্যে যাচ্ছেন না। চিকিৎসাশাস্ত্র শারীরবিদ্যা মোটামুটিভাবে চিকিৎসক সমাজের আয়ত্তে এসে গেছে কিন্তু রোগীরা তখনও কিছু জানতে পারেনি। তারা চিকিৎসকের ব্যবস্থার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এরপর ধীরে ধীরে সবাই সব কিছু জানতে লাগল, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, অ্যান্টিবায়োটিক সকলের হাতের আমলকী হয়ে গেল। রক্তে চিনি বা ইউরিয়ার অনুপাত নিয়ে বহুলোক এমন ভাষায় কথা বলে যা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিষয়বস্তু ছিল।

বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে একটু গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ত্রৈলোক্যনাথ দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, হালকা কথাতেই ফিরে যাই।

প্রথমে আমার নিজের ডাক্তার সাহেবের কথা বলে নিই। তিনি এই শহরের একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক, গভীর রাত পর্যন্ত ধনকুবের, ডাকসাইটে আমলা, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে আর অভিজাত গৃহিণীকুলে তাঁর চেম্বার গমগম করে। বিশেষ প্রয়োজনে ছয় মাস বছরে তাঁর কাছে একবার যাই. এই বিশেষ প্রয়োজনটা হল দু'রকম। প্রথম হল, চিকিৎসার প্রয়োজন, দ্বিতীয় বিশ্রাম।

অফিসে-বাড়িতে চাকরি করে, সাহিত্য করে, আড্ডা দিয়ে, সামাজিকতা করে, বাজার করে, নিজের ছেলে পড়িয়ে আমার কোনও বিশ্রাম জোটে না। শুধু কালেভদ্রে চার ঘণ্টা, আমার ডাক্তারের চেম্বারে আমার বিশ্রাম জোটে। যত অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই যাই ডাক্তার সঞ্জয় সেনের ওখানে আমাকে চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয় এবং বহুদিন পর ওই চার ঘণ্টা নিথর বিশ্রামে আমি ভাল হয়ে যাই, ডাক্তার সেন যখন দেখেন তখন আমার ক্লান্তি নেই, উত্তেজনা নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি আমাকে 'ভেরি গুড' সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দেন।

এবার চিকিৎসা বিষয়ে একটা অতি পুরনো গল্প বলি। গল্পটা যদিও অনেকেরই জানা কিন্তু এত ভাল যে আরেকবার বলা যায়।

এক ব্যক্তির গোরু হারিয়েছে। সারাদিন ধরে সে বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে, ঝোপ-জঙ্গলে গোরু খুঁজেছে। তার হাঁটু ছড়ে গেছে, গোড়ালি কেটে গেছে, সারা শরীর বুনো কাঁটায় রক্তাক্ত। সে এল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু তাকে দেখলেন, দেখে দুটো ট্যাবলেট দিলেন, বললেন রাতে খেয়ে উঠে খেয়ে নিতে।

পরদিন সাতসকালে সেই রোগী এসে আবার হাজির, সে রীতিমতো উত্তেজিত, 'ডাক্তারবাবু, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আপনার ওষুধের কী গুণ।' এ রকম প্রশংসা শুনে ডাক্তারবাবু যথেষ্টই বিচলিত হলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কী, ব্যথাবেদনা সব সেরে গেছে!' রোগী যা বলল সে এক তাজ্জব বৃত্তান্ত, 'কাল রাতে শোয়ার আগে যেই ট্যাবলেট দুটো খেয়েছি, অমনি শুনি ঘরের পিছনে উঠোনে হাম্বা-হাম্বা ডাক। ছুটে গিয়ে দেখি, ঠিক তাই, ওষুধটা খাওয়ামাত্রই গোরুটা ফিরে এসেছে। আর এরপর কি গায়ে ব্যথা থাকে। ব্যথাও সেরে গেছে।'

তাঁর ওষুধের এই অত্যাশ্চর্য গুণ দেখে সেই ডাক্তারবাবু কতটা খুশি হয়েছিলেন সেটা অবশ্য বলা কঠিন।

চিকিৎসা সম্পর্কে অন্য একটা গল্প বলি, মার্কিনি গল্প। যথারীতি একটু সোভিয়েত বিরোধী। এক আমেরিকান শল্য-চিকিৎসক গেছেন মস্কোয় এক হাসপাতালে। সেখানে তিনি নানারকম অপারেশন দেখছেন, সমস্তই ঝকঝকে, তকতকে, সুচিকিৎসার অতি ভাল বন্দোবস্ত।

আমেরিকান ডাক্তার এক অপারেশন থিয়েটারে দেখলেন এক রোগীর কানের নীচে বিরাট অংশ কেটে নিয়ে ডাক্তাররা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে একটা বিরাট অপারেশন করছেন। তিনি রাশিয়ান ডাক্তারদেরর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কীসের অপারেশন হচ্ছে? রোগীর কানে কী হয়েছে?'

স্বল্পভাষী রাশিয়ান ডাক্তার জবাব দিলেন, 'এর কানে কিছু হয়নি।' মার্কিনি চিকিৎসক বললেন, 'তা হলে?' এবার রাশিয়ান ডাক্তার জানালেন, 'রোগীর গলার টনসিল অপারেশন হচ্ছে।' আমেরিকান ডাক্তার বেশ অবাক হলেন, 'তা গলার টনসিল, এঁর কান কাটছেন কেন?'

রাশিয়ান ডাক্তার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তারপর নিচু গলায় বললেন, 'জানেন না, আমাদের এখানে মুখ খোলা বারণ। কাউকেই কোনও কারণেই মুখ খুলতে দেওয়া হয় না। তাই আমরা কানের পিছন দিক দিয়ে টনসিল অপারেশন করি।'

অচলার প্রেম

এবারের নিবন্ধের নাম হওয়া উচিত ছিল 'আবার পরকীয়া' কিংবা 'পরকীয়ার পরে' অথবা অনুরূপ কিছু। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু পরকীয়া প্রেম বা ব্যভিচার। জটিল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে, তাই নামটাও জটিল হল।

আগে একটা কথা পরিষ্কার করে নিই। সব পরকীয়া ভালবাসাই কিন্তু ব্যভিচার নয়। পরকীয়া প্রেম অনেক সময়েই দূর থেকে, সে অধরা, অছোঁয়া নিতান্তই নিরামিষ। সত্যজিৎ রায়ের পিকুর মা অথবা লেডি চ্যাটারলির মতো নয়। নিরামিষ পরকীয়া প্রেম, যা কামগন্ধহীন, যার তুলনা শুধু নিকষিত হেম; সেই স্বপ্নময় ভালবাসা পৃথিবীর সমস্ত রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস, মধুর কবিতা এবং সোনালি গানের মূল বিষয়বস্তু।

আমরা মোটা আলোচনায় যাচ্ছি না। বিষয়টি জটিল, আগে সরল বিলিতি গল্প বলে নিই।

প্যারিস শহরের এক রেস্তোরাঁয় বসে সকালে দুই বন্ধু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছে। হঠাৎ এক বন্ধুর চোখ খবরের কাগজের এক জায়গায় পড়তে সে আঁতকিয়ে উঠল, সে অন্য বন্ধুকে দেখাল তারপর পড়ে শোনাল। ঘটনাটি সামান্য নয়, মাদাম দুভালের স্বামী মঁশিয়ে দুভাল গতকাল রাতে অতর্কিতে বাড়ি ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখতে পান। মঁশিয়ে দুভাল কয়েকদিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ফেরার কথা ছিল তাই হয়তো দুভাল-পত্নীর এই অসতর্কতা।

সে যা হোক, দুভালসাহেব বাড়ি ফিরে সেই হতভাগ্য প্রেমিককে দড়ি দিয়ে জানলার গরাদের সঙ্গে বাঁধেন। তারপর নির্মমভাবে একঘণ্টা চাবুক মারেন এবং অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে প্যারিস শহরের শীতের বরফজমা, কনকনে ঠান্ডায় রাস্তায় লাথি মেরে বাড়ির মধ্য থেকে বের করে দেন। পুলিশের গাড়ি দুর্ভাগ্যকে উদ্ধার করে রাস্তা থেকে তুলে অ্যামবুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যে বন্ধুটি খবরের কাগজটি অন্য বন্ধুকে পড়ে শোনাচ্ছিল, সে বলল, 'কী সাংঘাতিক। সামান্য অবৈধ প্রেমের জন্য এত লাঞ্ছনা! কী সাংঘাতিক ব্যাপার।' যে শুনছিল সেই দ্বিতীয় বন্ধুটি খবরটা শুনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, 'এর চেয়ে আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

প্রথম বন্ধু বিস্মিত, 'এর থেকে আর কী সাংঘাতিক হবে।' দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল, 'কাল না হয়ে পরশুদিন হলেই আরও সাংঘাতিক হত। পরশুদিন রাতে যে আমি ছিলাম দুভালমেমের বাড়িতে, সেদিন যদি দুভাল ফিরত!'

দ্বিতীয় কথিকাটি বিপরীতমুখী। আগের গল্পের স্বামী মারমুখী। আর এ গল্পে ভীরু, ভালমানুষ স্বামী তাদের একজন যারা বউকে দখলে রাখতে পারে না, সাহেবরা যাদের শিং গজিয়েছে বলে উপহাস করে।

এক ব্যক্তির অফিসে খুব ক্লান্ত লাগছে। অথচ অফিস ছুটি হতে এখনও তিন-চার ঘণ্টা বাকি। এখন ভরদুপুর। তার সাহসের অভাব, অফিস থেকে পালাতে ভরসা করছে না। তার সহকর্মী তাকে বলল, 'আরে, ভয়ের কী আছে? আজ তো বড়সাহেব অফিসে নেই। খুব সাজগোজ করে, ভুরভুরে আতর মেখে বেরিয়েছে। কোথাও ফুর্তি করতে গেছে, সহজে ফিরবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, কেউ তোমাকে ধরবে না।'

ক্লান্ত কর্মচারীটি সংশয়াকুল চিত্তে গৃহপানে রওনা হল। তার বাড়ি কাছেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা গেল সে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে অফিসে ফিরে আসছে। সে ফিরে এসে হাঁপাতে লাগল। একটু বিশ্রাম নেয়ার পরে তার পূর্ব পরামর্শদাতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এমন ভয় পেয়ে ফিরে এলে কেন?'

কর্মচারীটি বলল, 'তোমার পরামর্শ শুনে আজ আমি ঘোর বিপদে পড়েছিলাম।'

'কী বিপদ?' কিছুই বুঝতে পারছে না পূর্ব পরামর্শদাতা।

'কী বিপদ?' অফিস কেটে চলে যাওয়া বন্ধুটি ব্যাখ্যা করে বলল, 'চাকরি যেতে বসেছিল। আজ চাকরি খোয়াতাম। বড় সাহেবের কাছে অল্পের জন্য ধরা পড়িনি যে অফিস পালিয়েছিলাম।'

পরামর্শদাতা পুনরায় প্রশ্ন করল, 'তার মানে?'

বন্ধুটি বললে, 'তার মানে? বাড়ি ফিরে শোয়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ শুনি বউ কার সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলছে। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি বড়সাহেব আমার বিছানায় শুয়ে। ভাগ্যিস হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাইনি। তা হলেই ধরা পড়ে যেতাম। অফিস পালানো ধরতে পারলে সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে বরখাস্ত করত। সেই ভয়েই তো এক ছুটে ফিরে এলাম অফিসে।'

'মানুষেরা যাকে বীরত্ব বলে, ঈশ্বর যাকে ব্যভিচার বলেন,' লর্ড বায়রন ডন জুয়ানে লিখেছিলেন, 'সেটা খুব বেশি সেই সব অঞ্চলে যেখানে আবহাওয়া উষ্ণ।'

উষ্ণ আবহাওয়ার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ভাল করেননি বায়রন, বরং আমাদের প্রাচ্যদেশীয়দের মনে হয় বায়রন সাহেবের শীতল শ্বেতাঙ্গ দেশগুলিতেই চিরদিন ব্যভিচার প্রবল ছিল এবং এখনও আছে।

বায়রন সাহেবের বেশ কিছুকাল আগে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নামে এক নাট্যকার অত্যন্ত অনাসক্তভাবে পরকীয়া সম্পর্কে দু'-চার হাজার কথা লিখেছিলেন। শেক্সপিয়ারের মতো হৃদয়সন্ধানী মানুষকে অনাসক্ত বলছি এ কারণে যে তিনি নিজের সঙ্গে নিজেরই বিরোধ ঘটিয়েছেন।

'বিনা কারণে বাড়াবাড়ি' অর্থাৎ 'মাচ এডু (কিংবা এ্যাডু অথবা আডু বা অ্যাডু) অ্যাবাউট নাথিং' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার মহিলাদের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে মানা করেছেন, 'কারণ পুরুষেরা চিরদিনের প্রতারক, তাদের এক পা সাগরে আরেক পা তটভূমিতে, পুরুষেরা কোনওদিন কোনও একটা কিছুতে স্থির নয়।'

চমৎকার! চার শতাব্দী পরের এক অস্থিরচিত্ত পুরুষমানুষ হিসেবে এ না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মহাকবির আটাশিতম সনেটের হিরের মতো উজ্জ্বল দুটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে। 'আমার প্রেমিকা শপথ করেছে সবটাই তাঁর খাঁটি, বিশ্বাস করি; যদি জেনেছি মিথ্যাও বলে সে।'

ব্যর্থ অনুবাদে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এতবড় সর্বনাশ এর আগে কেউ করেনি। অধিক মূর্খতা প্রকাশ করে লাভ নেই। বরং সরাসরি মাতৃভাষায় যাই।

মাতৃভাষা এবং শরৎচন্দ্র এবং এই নিবন্ধের শিরোনামায় চলে আসি। 'অচলার প্রেম' নামক একটি সত্য ঘটনামূলক কাহিনী দিয়ে পরকীয়ার আলোচনা পরবর্তী সংখ্যার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

এই গল্প এক প্রৌঢ় বাংলার অধ্যাপককে নিয়ে। তিনি একান্ত সরল এবং নীতিপরায়ণ। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিজের সন্তানের মতো দেখেন, তাদের নিত্যশুভার্থী।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের সিলেবাসে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' পাঠ্য ছিল। আমার নিজের পাঠ্যবিষয় অন্য থাকলেও গল্পটা আমি শুনেছিলাম বাংলার ছাত্রদের, বিশেষ করে কবি দেবতোষ বসুর কাছ থেকে।

ওই প্রৌঢ় অধ্যাপকই ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান। তিনি নিজেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন 'গৃহদাহ' পড়ানোর।

প্রধান অধ্যাপক মহোদয় একবারও চিন্তা করে দেখেননি তাঁর নিরীহ এবং গোবেচারা দর্শন ছাত্রছাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই এমন সব বিষয় জানে, এমন সব বিষয় পড়েছে যার কাছে সনাতনপন্থী শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' নিতান্তই শিশুশিক্ষা কিংবা বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ।

অধ্যাপক মহোদয় 'গৃহদাহ' নিজের হাতে রাখলেন, কিন্তু কিছুতেই পড়াচ্ছেন না। তখন অনার্স দু' বছরের। তাঁর চিন্তা যে দু' বছরে ছেলেমেয়েগুলোর একটু বয়স বাড়বে, তারা একটু পরিণত হবে, তখন গৃহদাহের গূঢ় তত্ত্ব তাদের বোঝানো যাবে।

ফলে অনার্সের টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত 'গৃহদাহ' পড়ানো হল না। তখনও প্রধান অধ্যাপকের যথেষ্ট মনোবল তৈরি হয়নি বইটি পড়ানোর মতো। তিনি মাঝেমধ্যে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকান আর মনে মনে অঙ্ক কষেন ছেলেমেয়েরা 'গৃহদাহ' পাঠের যোগ্য হল কি না। অবশেষে ছাত্রছাত্রীরাই তাঁকে চেপে ধরল, 'স্যার, আমাদের আর কবে গৃহদাহ পড়ানো হবে?' তখন অধ্যাপক টেস্ট পরীক্ষার পরে একদিন স্পেশ্যাল ক্লাসের বন্দোবস্ত করলেন শুধু শরৎচন্দ্রের ওই উপন্যাসটি পড়ানোর জন্য।

স্পেশাল ক্লাসের আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল বেলা এগারোটায়। অধ্যাপক খুবই সময় সচেতন কিন্তু সেদিন প্রায় পৌনে বারোটা পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। ছাত্রছাত্রীরা যখন অধীর হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল গেট দিয়ে তিনি ঢুকছেন। কিন্তু এ কোন তিনি? যেন তাঁর গুরুদশা হয়েছে। একগাল না-কামানো দাড়ি, লাল চোখ, এলোমেলো চুল, ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, তাঁকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তিনি গুম হয়ে ক্লাসে এসে ঢুকলেন, কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। মিনিট পাঁচেক থম মেরে বসে থেকে তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, 'না আমি পারলাম না। আমার পক্ষে সম্ভব নয় এ কাহিনী তোমাদের পড়ানোর', বলতে বলতে তিনি দ্রুত পদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, শেষ মুহূর্তে দরজায় দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন, 'কিছুই বলতে পারলাম না, শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি তোমাদের। মনে রেখো অচলার প্রেম পবিত্র ছিল না, পবিত্র ছিল না।'

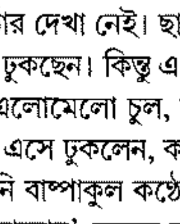

শেষ পরকীয়া

পাড়াগাঁয়ের পুকুরপাড়ে ছাইয়ের গাদার আড়ালে মানকচু কিংবা ধুতরো ফুলের ঝোপের পিছনে বসে যেসব গ্রামবৃদ্ধ স্নানরতা রমণীদের ঘাটের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকেন, গ্রাম্যগঞ্জনা এবং কখনও কখনও মৃদু বা তত-মৃদু-নয় প্রহার ও গলাধাক্কা তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারে না এই দার্শনিক অভ্যাস থেকে।

বিদ্যাবুদ্ধি লেখক হয়তো এখনও ততটা বুড়ো এবং অথবা নির্লজ্জ হননি কিন্তু তাঁরও হয়েছে ওই একই দশা, ছাইয়ের গাদার পিছনে বসে দর্শনসুখ না ভোগ করলেও পরকীয়া লিখে তাঁর ফুর্তি হয়েছে প্রচুর, জীবনে এই প্রথম এমন নিষিদ্ধ কাজের আনন্দ পেলেন তিনি।

যাঁরা জানতেন না যে, এই রকম জটিল ও নিষিদ্ধ বিষয়ে আমার এত অগাধ জ্ঞান এবং যাঁরা পরকীয়ামালা পাঠ করে বিচলিত বোধ করছেন তাঁদের জন্য এবার প্রথমেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর কথিত কাহিনী দিয়ে শুরু করি। বিদ্যাসাগর মহোদয়ের যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪, ২য় সংস্করণ), যা কিনা কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত; সেখান থেকে সংক্ষিপ্তাকারে আমি উপস্থাপন করছি।

এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী এক সুপণ্ডিত কথকের কথায় মোহিত হয়ে তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ হন এবং অবশেষে সেবাদাসী হয়ে পড়েন। একদিন পণ্ডিত কথকতার সময় ব্যভিচার বিষয়ে বললেন। যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয় নরকে তাকে অনন্তকাল কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। কণ্টকাকীর্ণ লোহার শিমুল গাছকে উপপতিরূপে তাকে গ্রহণ করতে হয়। যমদূতেরা তাকে সেই গাছ আলিঙ্গন করতে বাধ্য করে সেই ব্যভিচারিণীর সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, রক্ত পড়তে থাকে; সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করতে থাকে। তবু তার রক্ষা নেই। পণ্ডিতমশায় তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন স্ত্রীজাতিকে সাবধান করে দিয়ে যে, 'ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে।'

এই ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শুনে সেই সেবাদাসী তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে গেল। সে আর সেদিন সন্ধ্যায় কথকঠাকুরের শয়নগৃহে প্রবেশ করল না।

পণ্ডিতমশায় যখন তাকে ডেকে পাঠালেন এবং জানতে চাইলেন, 'আজ কী হল?' সেবাদাসী শোকাকুল বচনে শিমুল গাছের উপাখ্যান শুনে তার ভয় হয়েছে এবং তার পক্ষে আর শয়নগৃহে গুরুদেবকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয়, সেটা জানিয়ে দিলেন।

তখন পণ্ডিত সহাস্যে বললেন, 'আরে পাগলি, তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় আসছ না! আমরা পূর্বাপর যেমন বলে এসেছি, আজও তাই বলেছি। শিমুলগাছ আগে ওরকম ভয়ংকর ছিল বটে; কিন্তু শরীরের ঘষায় ঘষায় লোহার কাঁটাগুলো ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমুল গাছ তেল হয়ে গিয়েছে। এখন আলিঙ্গন করলে সারা শরীর শীতল ও পুলকিত হয়।'

বিধবার সঙ্গে প্রণয় বা ঘনিষ্ঠতা বোধহয় সে অর্থে পরকীয়া পর্যায়ে পড়ে না। তবে খানদানি বিধবা সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলি এক আশ্চর্য কাহিনী লিখেছিলেন তাঁর চাচাকাহিনীতে। সে বিধবা কিন্তু কোনও মানুষের বিধবা নয়, সে সিংহের বিধবা।

বরোদার মহারাজ সয়াজি রাওকে ইথিওপিয়ার রাজা একজোড়া সিংহ উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরুষ সিংহটি মারা যায়। তখন সেই বিধবা সিংহীর ঘরে একটি গুজরাটি সিংহ বর হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। খাঁচার দরজা দিয়ে বর ঢুকলেন আস্তে আস্তে। হঠাৎ সিংহী এক লাফ দিয়ে এসে পড়ে সিংহের ঘাড়ে। মুহূর্তের মধ্যে নতুন বর নিহত হল। মুজতবা লিখেছেন, বরোদার মহারাজা সিংহের সিংহীর দ্বারা নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'এদেশের খানদানি বিধবা— তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক— নতুন বিয়ে করতে চায় না। হাবশি সিংগিনী এদেরও হার মানালে যে?'

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বৈধতা-অবৈধতা সংক্রান্ত এ যাবৎ সবচেয়ে মারাত্মক গল্পটি অবশ্য পরশুরাম বিরচিত, সেই অসামান্য 'ভূশণ্ডীর মাঠে'। সে গল্প লিখতে গিয়ে পরশুরামের পর্যন্ত কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছিল। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী। এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল।

সিংহ বা ভূতের পরকীয়ার সমস্যা ছেড়ে এবার আমরা একটু মানুষের পরকীয়ায় মনোযোগ দেব।

প্রথমেই সেই বিখ্যাত কমার্শিয়াল আর্টিস্টের গল্পটি বলে নিই। এই শিল্পী ভদ্রলোক এক বিজ্ঞাপন কোম্পানির ধরাবাঁধা কাজ করেন। তাঁর নিজস্ব স্টুডিয়োতে সেদিন তিনি খুব ক্লান্ত অবস্থায় বসে আছেন। কিছু কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। অথচ এক আলুলায়িত বসনা, টানটান সুন্দরী সামনেই সোফার উপরে শুয়ে একটা গোলাপ ফুলে চুম্বন করছে। একটা লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনের জন্য ছবিটা

তৈরি করতে হবে, তাড়াতাড়িই করতে হবে। কিন্তু আজ নানা হাঙ্গামা ছিল সারাদিন। শিল্পীর কাজ করতে ভাল লাগছে না।

মডেল সুন্দরীর দিকে কিছুক্ষণ নিথর তাকিয়ে থেকে তুলি হাত থেকে নামিয়ে শিল্পী বললেন, 'মিসেস দাস, আজ থাক। বড় মাথাটা ধরেছে। আপনি বরং এই সামনের চেয়ারটায় এসে বসুন, একটু চা খাই।' শিল্পী পাশের টেবিল থেকে দুটো পেয়ালা নিয়ে বাড়ি থেকে আনা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। মডেল সুন্দরী কাপড়-চোপড় গোছগাছ করে সামনের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে শিল্পীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন, কোনও প্রণয় ভালবাসার ব্যাপার নয়, টুকটাক সাধারণ কথাবার্তা।

এমন সময়, যেমন হয়, সিঁড়িতে চপল চটির শব্দ। শিল্পীর স্ত্রী হঠাৎ হঠাৎ স্টুডিয়োতে এসে পড়েন, আজও তাই হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বোঝা মাত্র শিল্পী আঁতকে উঠলেন, তাঁর স্ত্রী যদি তাঁকে এখন চা খেতে খেতে সুন্দরী মডেলের সঙ্গে গল্প করতে দেখে, তা হলে সমূহ সর্বনাশ।

শিল্পী মডেলকে বললেন, 'সর্বনাশ, আমার স্ত্রী আসছেন। আপনি তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় এলোমেলো করে সোফার উপর শুয়ে পড়ুন। আমার স্ত্রী যদি আপনাকে আমার সঙ্গে চা খেতে দেখতে পান, ঘোর বিপদ হবে।'

এক ধর্মযাজক একদা এক বক্তৃতাকালে বলেছিলেন, 'দশজন কুমারীর সঙ্গে আমি থাকব তবু একজন বিবাহিতার সঙ্গে নয়।' পরকীয়াবিদ্বেষী সেই ধর্মযাজকের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, সেই সভার সব পুরুষ শ্রোতাই একমত হয়ে হর্ষধ্বনি দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরাও তাই চাই।'

পরকীয়ার প্রধান অসুবিধা হল, মহিলাটির স্বামী-দেবতাকে নিয়ে। যে ভদ্রলোক জীবনে কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্য স্ত্রীর প্রতি কোনও রকম মনোযোগ দেননি, তিনিই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন, সেই মহিলার প্রতি অন্য কোনও পুরুষমানুষ সামান্য মনোযোগ দিলে।

তবে সেই সব পুরুষমানুষ, যাঁরা বিশ্বপ্রেমিক, যাঁরা মহিলা দেখলেই গদগদ হয়ে প্রেমে পড়েন, যাঁরা ভাবেন মহিলামাত্রেই সুরসিকা, তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে মাঝেমধ্যে দু'-একটা রসিকতা করার চেষ্টা করে দেখবেন, তাতে হয়তো ভুল ভাঙতে পারে।

পরকীয়া, যাকে সাধুভাষায় বিবাহোত্তর প্রণয় বলা চলে, ব্যাপারটা কিন্তু মোটের উপর যতই ভাল হোক উত্তরোত্তর খরচের ব্যাপার। এই তো গত শীতে একজন দুঃসাহসী সাহিত্যিককে দুটি কাশ্মীরি শাল কিনতে হয়েছিল, এই তাঁর নবীনা বান্ধবীকে উষ্ণ রাখার জন্য, অপরটি তাঁর প্রবীণা স্ত্রীকে ঠান্ডা রাখার জন্য।

দুটি ক্ষুদ্র কাহিনী দিয়ে এই পরকীয়া কথামালা শেষ করছি। এক ভদ্রলোক একদিন তাঁর স্ত্রীর প্রণয়ীকে হাতেনাতে ধরে ফেললেন। প্রণয়ীটি মোটেই ভীত বা বিব্রত না হয়ে বললেন, 'দেখুন হাতাহাতি বা মারামারি করে লাভ নেই। তার চেয়ে আসুন তাসের জুয়া খেলি, আপনার স্ত্রী আমার হবে না আপনারই থাকবে জুয়া খেলে সেটা ঠিক করে ফেলি।' স্বামী ভদ্রলোক উদাসীনভাবে বললেন, 'দেখুন, জুয়াটাকে সামান্য একটু ইন্টারেস্টিং করার জন্য যদি একটা টাকা বাজি সঙ্গে থাকে তাতে কি আপনার আপত্তি হবে?' মোদ্দা কথা, ভদ্রলোকের কাছে তাঁর স্ত্রীর মূল্য এক টাকাও নয়।

তবে অন্য গল্পটি একটু আলাদা। মৃত্যুকালে স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে বলেছেন, 'ওগো, আমার মৃত্যুর পরে তুমি কাউকে প্রাণ ভরে ভালবেসো।' স্বামী আবেগবিধুর কণ্ঠে বললেন, 'অসম্ভব, এ জীবনে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' স্ত্রী বললেন, 'আমার গয়নাগাঁটি সব তার জন্য রেখে যাচ্ছি, তুমি তাকে দিয়ো।' এতক্ষণে স্বামী মৃত্যুপথযাত্রিণী রুগ্‌ণা পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হার, দুলগুলো হবে কিন্তু চুড়ি আর বালাগুলো হবে না, তার হাত-টাতগুলো যে তোমার থেকে অনেক গোলগাল।'

তালা

সেই যে টর্চলাইটের গল্পে আমাদের পুরনো কালীঘাট বাড়িতে চোরের কথা লিখেছিলাম, সেই চোর সে-রাতে টর্চলাইট ফেলে পালিয়েছিল। তারপর কিন্তু সে দু'-এক সপ্তাহের মধ্যে ওই ফেলে যাওয়া টর্চলাইটের শোকেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমাদের বাড়িতে আবার ফিরে আসে।

অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সেই একই চোর আসেনি পরের রাতে, অন্য কোনও নতুন চোর এসেছিল। তবে সাধারণত এ রকম হয় না, এক চোর যে বাড়িতে বা যে এলাকায় চুরি করে অন্য চোর সেখানে যায় না। তবু আমাদের বাড়ির ঢিলেঢালা ভাব অন্য কোনও নতুন চোরকেও প্রলুব্ধ করেছিল এমন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

সে যা-হোক আমাদের এ দফার প্রসঙ্গ চোর বা টর্চলাইট নয়, এবারের প্রসঙ্গ তালা।

অনেকে হয়তো আমাকে দুঃসাহসী ভাবছেন, কারণ অল্প কিছুদিন আগেই শ্রীযুক্ত সুভো ঠাকুর অতিশয় রোমাঞ্চকর একটি নিবন্ধ লিখেছেন, বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯১, 'তালার তল্লাশে'। সেখানে সুভো ঠাকুর ব্যাঘ্রোপম, নর্তকীসদৃশ এমনকী সংগীতপরায়ণ বিচিত্র সব তালার কথা বলেছেন।

আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে এসবের মধ্যে যাব না। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের তালার কথা বলব।

তখন কালীঘাটের ভগ্নগৃহে শুধু আমি আর আমার দাদা থাকি। দু'বেলা হোটেলে খাই, সকালে একটি কাজের মেয়ে এসে ঘর ঝেড়ে, জল তুলে দিয়ে যায়। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি সঙ্গীন; জিনিসপত্র, দ্রব্যসামগ্রী বলতে প্রায় কিছুই নেই। তালার দরকার খুব ছিল না কিন্তু আমাদের তালাটি আমরা দু'ভাই পেয়েছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে। দেশবিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে আমার মাতামহের পাটের ব্যবসা ছিল। সেই পাটের গুদামের তালা। অতিকায় আকার এবং ভারী ওজন। তালাটির গায়ে লেখা ছিল, হবস অ্যান্ড ব্রাদার্স, লক অ্যান্ড কি ম্যানুফাকচারার্স, লন্ডন ১৮৭২। নীচের দিকে লেখা সেভেন লিভারস এবং পিছনে একটি নম্বর XY218 (এক্সওয়াই ২১৮)।

আমার স্বর্গত মাতামহ দেশবিভাগের পর প্রায় কিছুই আনতে পারেননি গ্রাম থেকে, শুধু এক বাক্স তালা এনেছিলেন। ওইরকম ভারী ভারী তালা প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি। তিনি যে বাক্সে ওই তালাগুলি (সঙ্গে আর অল্প কিছু জিনিস) এনেছিলেন সেই বাক্সটি স্টিমারঘাটে বা রেলস্টেশনে কোনও একজন কুলির পক্ষে উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।

মাতামহ কলকাতা আসার পর আত্মীয়-পরিচিতদের মধ্যে তালাগুলি বিলিয়ে দেন। ভাগে আমি আর দাদাও একটি তালা পাই। এই মহামূল্যবান তালাটি লাভ করে অগ্রজ মহোদয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু কিছু পরে খেয়াল হল, তালা আনা হয়েছে কিন্তু চাবি কই!

সেই দিন তৎক্ষণাৎ দাদা আবার ছুটে গেল মাতামহের কাছে চাবি আনতে। মাতামহ খুব ধমকে দিলেন, 'তোমাদের লোভ বড় বেশি। আমরা অল্প বয়সে এমন ছিলাম না। তালা পেয়েছ তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। আবার চাবি চাইছ?'

দাদা বলল, 'চাবি ছাড়া তালা দিয়ে কী হবে' মাতামহ এ কথায় খুবই বিস্মিত হলেন, 'তোমরা কি তালাটা ব্যবহার করবে ভেবেছ নাকি?' দাদা গুম মেরে গিয়ে বলল, 'তবে?' 'তোমাদের পূর্ববঙ্গের মাতুলালয়ের পবিত্র স্মৃতি। সারাজীবন ওই তালাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, পুজো করবে।'

বিট্ঠল দাদা ফিরে এল। পরের দিন চতুরতর আমি গেলাম। আমাকেও পূজনীয় মাতামহ প্রায় একই রকম কথা বললেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা গোলমেলে। মাতামহ তড়িঘড়িতে বাড়ি ছেড়ে আসতে গিয়ে তালাগুলো নিয়ে এসেছেন। কিন্তু চাবিগুলো, কোথায় আলাদা করে রাখা ছিল, সেগুলো ফেলে এসেছেন। যদি তিনি আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারেন এবং চাবিগুলো পান, তা হলে তালাগুলো ব্যবহারযোগ্য হবে, না হলে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই ব্যবহৃত হবে।

আমরা বুঝে ফেলেছিলাম মাতামহের আর দেশে ফেরা হবে না, সুতরাং দাদা সিদ্ধান্ত নিল এ তালা রেখে কোনও লাভ নেই, তার চেয়ে আদিগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসা ভাল।

সেই সময় আমাদের মহিম হালদার স্ট্রিটের পাড়ার শেষপ্রান্তে একজন বিলেত ফেরত পাগল থাকতেন, তিনি কোনও কোনও ঠান্ডার রাত্রিতে বাড়ির সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে উদাত্ত গলায় গাইতেন,

লন্ডন টন্ডন গ্ল্যাসগো,
গো ওয়েন্ট গন গো।'

দাদা যখন গঙ্গায় তালা ফেলতে যাচ্ছে তাঁর দেখা, কিঞ্চিৎ শুনে তিনি বললেন, 'হবস কোম্পানির তালা গঙ্গায় ফেলতে যাচ্ছ! এ তো টেমসে ফেলতে হবে। না হলে মহাপাপ হবে।'

আমার দাদা, চিরকাল খুব সাহেব ভক্তি ছিল তার, দাদা তালা নিয়ে ফিরে এল। হবস কোম্পানির বিলিতি তালা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া মহাপাপ না হোক, অন্যায় হবে সেটা দাদা বুঝতে পেরেছিল।

শেষে আমরা দু'ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম এত বড় তালা ফেলে রেখে লাভ নেই। আর এই ভাঙা বাড়ির সদর দরজায় যদি তালাটা ঝোলানো যায় তা হলে বাড়ির চেহারা খুব খোলতাই হবে। আমাদের একটা মরচে ধরা বারো আনা দামের টিনের তালা ছিল। আমরা ঠিক করলাম পৈতৃক আমলের তালাটায় চাবি বানিয়ে নিয়ে অই পুরনো তালাটাকে ফেলে দেব।

এত বড় তালার চাবি সাধারণ তালা মেরামতওলারা কেউ বানাতে চাইল না। সেই বিলেত ফেরত পাগল বললেন, যদি তালাটা রেজিস্ট্রি পার্সেল করে লন্ডনে হবস কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তা হলে তারা বছর দুয়েকের মধ্যে চাবিসুদ্ধ পাঠিয়ে দেবে।

ডাকঘরে, জিপিওতে, কাস্টমস অফিসে অনেক ঘুরলাম বিলেতে তালা পাঠানোর কী নিয়ম, চাবিসুদ্ধ তালা ফেরত আসারই বা কী নিয়ম, কত শুল্ক, কত মাশুল, কত টিকিট— কেউ কিছু বলতে পারল না।

তখন আমরা একটা বুদ্ধি বার করলাম। আমরা মানে দাদারই বুদ্ধি, আমি শুধু সায় দিলাম। বাইরের দরজায় টিনের তালাটার নীচে একটা পেরেক লাগিয়ে এই বড় তালাটাও ঝুলিয়ে দেব। বাইরে থেকে মনে হবে দুটো তালা লাগানো রয়েছে।

অবশ্য আমাদের এই চাতুর্য খুব কাজে লাগেনি। দরজায় ডবল তালা দিয়ে দু'-চারদিন পরে একদিন রাতে আমি আর দাদা চেতলাহাটে রামযাত্রা শুনতে গেছি। ফিরে এসে দেখি বাড়িতে সত্যি চোর এসেছিল। সমস্ত উলোট-পালোট, তবে কিছুই পায়নি, নিতে পারেনি। শুধু যাওয়ার সময় সদরের হবসের অচল তালাটা নিয়ে গেছে, টিনের ঠুনকো তালাটি ফেলে গেছে ফুটপাতে।

দাদা খুব দুঃখিত হল। এত বড় পারিবারিক মর্যাদার জিনিস চোর নিয়ে গেল— যেন কোহিনুর বা ময়ূর সিংহাসন হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু দাদাই আবার তালাটা উদ্ধার করল। সতর্ক দৃষ্টি ছিল দাদার, একদিন কালীঘাট বাজারে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর চোখে পড়ল এক বন্ধ মুদির দোকানের দরজায় সেই তালাটি লাগানো। সেই হবস অ্যান্ড ব্রাদার্স, লন্ডন ১৮৭২ থেকে দুশো আঠারো নম্বর পর্যন্ত দাদা তালা উলটিয়ে মিলিয়ে দেখল। তারপর পাশের দোকান থেকে খোঁজ নিয়ে একেবারে মুদিওলার বাড়িতে। মুদির ছেলের বিয়ে তাই দু'দিন দোকান বন্ধ রেখেছে।

দাদা যখন বিয়েবাড়িতে পৌঁছাল তখন সদ্য বধূবরণ হচ্ছে। মুদিপুত্র বাসি বিয়ে সাঙ্গ করে নববধূ নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। দাদা এরই মধ্যে একটু আড়ালে মুদি ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে সরাসরি বলল, 'আমাদের হবসের তালাটা আপনার দোকানে কেন লাগানো রয়েছে!' কথাটা শুনে দোকানদারের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'তখন রামুকে মানা করেছিলাম', বলে তিনি, 'রামু রামু' বলে চেঁচাতে লাগলেন।

রামুই বর, সে এইমাত্র বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থাকে এসেছে। সে উঠোনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আড়চোখে নববধূর সৌন্দর্য পান করছিল। তার কপালে এখনও চন্দনের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে, একটু আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে সাজিয়ে দিয়েছে। তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার আংটি, বরের সাজসজ্জা ছাড়ার এখনও সে ফুরসত পায়নি।

পিতৃদেবের কর্কশ আহ্বান শুনে রামু এগিয়ে এল। বাবার সামনে দাঁড়াতেই নববিবাহিত পুত্রকে বাবা তেড়ে এলেন, 'যাও এবার জেল খাটো। এক শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে, আরেক শ্বশুরবাড়িতে যাও।' রামু কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তখন দাদা বলল, 'আমাদের তালাটা।' তালার কথা বলতেই রামুর মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রামুর বাবা এবার কোমর থেকে দুটো চাবি বার করে রামুকে দিয়ে বললেন, 'শোবার ঘরের তালাটা নিয়ে দোকানে লাগিয়ে দাও। আর এই ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তালাটা ফেরত দিয়ে দাও। পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।'

সদ্যবিবাহিত রামুকে দাদা পায়ে ধরার অমর্যাদা থেকে রেহাই দিল। রামুর বাবা দাদাকে দই-মিষ্টি খাওয়ালেন, ইত্যবসরে রামু দোকান থেকে তালাটা নিয়ে এসেছে।

শুধু তালা নয়, সঙ্গে একটা চাবি। দোকানদারই বোধহয় কোনওভাবে বানিয়ে নিয়েছিল।

দাদা বলেছিল, 'যতদিন রামুর স্বভাবচরিত্র না পালটায় এ তালা ব্যবহার করবি না। ওর কাছে আরেকটা চাবি থাকতে পারে।' রামুর স্বভাবচরিত্র পালটানোর আগেই আমরা পাড়া পালটেছি। দাদাও বহুদিন নেই। কিন্তু হবসের তালাচাবি আছে, এখনও আমরা নিরাপদে ব্যবহার করি।

কুকুর-কুকুর

কুকুর হইতে সাবধান (Beware of dogs)। অনেক বাড়ির দরজায় শুধু এটুকু নোটিশ লাগিয়ে গৃহকর্তার মনে শান্তি হয় না, তাঁরা বিজ্ঞপ্তির পাশে একটি হিংস্র সারমেয়ের দাঁত ও জিব বের করা ছবিও এঁকে রাখেন। অনেক সময়েই দেখা যায়, ছবির হিংস্র কুকুরটির সঙ্গে গৃহস্থ কুকুরটির কোনও মিলই নেই, সে নিতান্ত ভিতু, নিরীহ এবং সর্বোপরি নেড়ি। সে যা হোক, কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা যে কোনও রকম কুকুর দেখলেই ভয়ে হিম হয়ে যান আবার অনেকে কোনও কুকুরকেই তেমন পরোয়া করেন না।

তবে ওই 'কুকুর হইতে সাবধান' কথাটায় আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। কথাটা কেমন যেন খটমটে এবং অবাংলা। বরং 'কুকুর আছে, সাবধান' কিংবা 'সাবধান, কুকুর আছে।' কিছুটা ভাল।

এবার কুকুরের গল্পে আসি। যাঁরা কুকুর নিয়ে রঙ্গরসিকতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বা বিরক্ত বোধ

হয়েছেন কিংবা সেইসব কুকুর-অন্ত প্রাণ সারমেয় প্রেমিকেরা যাঁরা কুকুর নিয়ে ঠাট্টা করায় আহত হয়েছেন, তাঁদের জন্য এবার প্রথমেই দুটি দু'রকম উপহার আছে।

প্রথম কাহিনীটা রীতিমতো রহস্যময় এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক।

রহস্যময় কাহিনীটি আমি অন্যের কাছে শুনেছি। কিন্তু বক্তব্যের সুবিধার জন্য নিজের জবানিতে লিখছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন সকালে শহরতলিতে আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের বাড়িতে গেছি। ভদ্রলোক একটু বিচিত্র চরিত্রের লোক, বহুরকম অভিজ্ঞতা তাঁর। তাঁর সঙ্গে নানারকম বিষয়ে কথা হচ্ছে, এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে একটি সাধারণ দিশি কুকুর আমরা যে বসার ঘরে বসে আছি সেখানে এসে ঢুকল এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল, 'আজ সকালের খবরের কাগজটা কোথায় গেল।' পাশেই টেবিলের উপরে খবরের কাগজটা ছিল, ভদ্রলোক এগিয়ে দিতেই কুকুরটা সেটা নিয়ে আবার পাশের ঘরে চলে গেল।'

আমার তো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা, কুকুর কথা বলছে, কাগজ পড়ছে; জীবনে কোনওদিন কল্পনা করতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনার কুকুর খবরের কাগজ পড়তে নিয়ে গেল?' বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার ধারণা হয়েছে ও ওই কাগজটা পড়বে?' আমি তখনও হতভম্ব হয়ে আছি, বললাম, 'তবে?' ভদ্রলোক বললেন, 'খবরের কাগজ পড়ার বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই। শুধু প্রত্যেকদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে ওই অরণ্যদেব আর গোয়েন্দা কমিকটি মন দিয়ে দেখে।'

এ গল্পটি অবশ্যই অবিশ্বাস্য। তবে এর পরের রাজনৈতিক কাহিনীটি হয়তো তত অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে।

ঘটনাটি ঘটেছিল পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এক ভারতীয় গ্রামে। পাকিস্তান অঞ্চল থেকে একটা কুকুর একদিন সেই গ্রামে প্রবেশ করেছে। কুকুরটি রীতিমতো গায়ে-গতরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দেখলেই বোঝা যায় আরামে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সে বড় হয়েছে।

এদিকে ভারতীয় গ্রামের কুকুরগুলির অস্থিচর্মসার, মড়াখেকো চেহারা। তারা কোনওদিন ভাল করে পেট পুরে খেতে পায় না। তারা এই কুকুরটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, তার সঙ্গে গল্পগুজব করতে লাগল। কথায় কথায় যখন জানল যে এই পাকিস্তানি কুকুরটি প্রতিদিন সকালে দু' লিটার দুধ খায়, দুপুরে রাতে এক কেজি করে সুস্বাদু মাংস খায়; ভারতীয় কুকুরেরা অবাক হয়ে গেল, তাদের সকলের তখন একটাই জিজ্ঞাসা, তা হলে তুমি অত আরাম, বিলাসবৈভব ছেড়ে আমাদের এ কষ্টের এলাকায় এলে কেন? এখানে তো কিছুই খেতে-টেতে পাবে না। পাকিস্তানি কুকুরটি বিরসবদনে বলল, 'আমি কি আর সাধে এসেছি, ওরা যে ওপারে একদম ভৌ ভৌ করতে দেয় না। আমি যে আবার একটু ভৌ ভৌ না করে থাকতে পারি না।'

দেশে দেশে, কালে কালে কুকুর নিয়ে সহস্র গল্প। সেই কবে বেদব্যাস মহাপ্রস্থানের পথে তাকে যুধিষ্ঠিরের শেষ সঙ্গী করেছিলেন, তারও আগে কিংবা পরে সে প্রবেশ করেছিল পিরামিডের অভ্যন্তরে, হিতোপদেশ আর ঈশপের কথামালার যুগ থেকে, তারও আগে থেকে সে মানুষের নিত্যসঙ্গী।

কুকুরপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন লর্ড বায়রন। তাঁর প্রিয় কুকুরের মৃত্যুতে তার সমাধিফলকের জন্য রচিত বিখ্যাত কবিতাটি অনেকেই হয়তো পড়েছেন। যেখানে বলা আছে, 'আমি জীবনে আর কোনও বন্ধুকে জানি না, শুধু একজনই ছিল, সে এখানে শায়িত।' সেই দীর্ঘ কবিতার শেষে আরও একটি এপিটাফ আছে, সেখানে বলা আছে, 'বেটসোয়াইন, একটি কুকুর, মানুষের সব গুণই তার ছিল, মানুষের কোনও দোষই তার ছিল না।'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আজ যদি কেউ বায়রনের সমাধি খুঁজতে যান তাঁকে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হবে। ইংল্যান্ডের হাকনাল গ্রামে লর্ড বায়রনের পারিবারিক কবরখানায় অনেক

প্রস্তরলিপির মধ্যে একটি গৌণ ফলকে তাঁর নাম ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা। অথচ অদূরে নিউস্টেড অ্যাবেতে রয়েছে তাঁর প্রিয় কুকুর বেটসোয়াইনের সুরম্য সমাধিমন্দির, কারও দৃষ্টিই সেটা এড়াবে না।

আমিও একজন কুকুরভক্ত সামান্য লেখক। তবে নিজে লেখার চেয়ে টুকে লেখাতেই আমার বেশি ফুর্তি। এমনকী আমার নিজের কুকুরের ক্ষেত্রেও তাই করেছিলাম, আলেকজান্ডার পোপের বিখ্যাত শ্লোক থেকে চুরি করে একদা আমি আমার কুকুরের গলার বকলসে ব্যাজ লাগিয়ে লিখে দিয়েছিলাম,

'আমি হুজুর, পণ্ডিতিয়ার
তারাবাবুর কুকুর।
আপনি হুজুর কোথাকার
কোন বাবুর কুকুর?'

এই ছোটলোকি পদ্য পড়ে কত বড়লোকের যে মাথা হেঁট হয়েছে তার শেষ নেই। আর এ ছাড়া আমি কিইবা করতে পারি। আমি আজ পর্যন্ত যত কুকুর পুষেছি বায়রন সাহেবের মতো তাদের সমাধিমন্দির করতে গেলে পুরো কলকাতা ময়দান লেগে যেত।

আধুনিক হাসির রচনার সঙ্গে কুকুর মিলেমিশে রয়েছে প্রথম থেকেই। অদ্যাবধি রচিত শ্রেষ্ঠ হাসির উপন্যাসটির নামই হল, 'একটি নৌকায় তিনজন মানুষ, কুকুরটির কথা না বলাই ভাল,' উপন্যাসকার জেরোম কে জেরোম। এ বই যিনি পড়েননি, তিনি হাসির রচনার কিছুই পড়েননি।

তবে কুকুর সম্বন্ধে মোক্ষম কথা বলে গেছেন থার্বার। জেমস থার্বার, নিউ ইয়র্কার কাগজের বিখ্যাত সরস লেখক এবং গ্রন্থকার, এই শতকে সবচেয়ে বেশি লিখেছেন কুকুর নিয়ে। কুকুর নিয়ে অসামান্য সব কার্টুনও এঁকেছেন। থার্বার বলেছিলেন, 'কুকুররা মানুষকে নিয়ে যত মজা পায়, মানুষরা কুকুর নিয়ে ঠিক তত মজা পায় না কারণ এই দু'রকম জন্তুর মধ্যে মানুষই বেশি হাস্যকর।'

কোটেশন কণ্টকিত এই কুকুরকাহিনী শেষ করার আগে দু'-একটা সত্যিকারের মজার কথা বলি।

প্রথম গল্পটি অভিনেতা রবি ঘোষ মশায় বোধহয় বলেছিলেন কিংবা স্বর্গীয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সে যাঁর গল্পই হোক, তাঁর একটা কুকুর ছিল। সেই কুকুরের জন্যে বাড়িতে চোর বা কোনও বাইরের লোক এলেই তিনি বুঝতে পারতেন। না, কুকুরটা গর্জন, ঘেউ ঘেউ, তেড়ে যাওয়া, কামড়ে দেওয়া এসব কিছুই করত না। সে ছিল একটা অত্যন্ত ভীরু কুকুর। বাড়িতে কোনও অচেনা ব্যক্তির আবির্ভাবের গন্ধ পেলেই সে পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে প্রভুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একবার একটা চোর ঢুকেছে বাড়িতে, গভীর রাত, প্রভু নিদ্রামগ্ন, কুকুরটা মশারি ছিঁড়ে বিছানার মধ্যে ঢুকে প্রভুর কোলে গিয়ে লুকোতে প্রভু টের পেলেন বাসায় চোর এসেছে।

আর একবার হাতিবাগান বাজারের সামনে এক রবিবার সকালে আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্যে একটা কুকুরছানা কিনতে গিয়েছিলাম, একটা বাচ্চা পছন্দ হওয়ার পর কুকুরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা বেশ বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত হবে তো?' গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'বিশ্বস্ত? জানেন এই কুকুরটা এখন পর্যন্ত চারবার বেচেছি, চারবারই খদ্দেরের বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে।'

গোপাল ভাঁড়

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রসরাজও ছিলেন, গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন, কিন্তু ভাঁড়ে থাকিতে থাকিতে খেজুর রস, তালের রসও যেমন তাড়ি হইয়া পড়ে, কথার রসেরও সেই দশা দাঁড়াইল।

এখন কেহ রসিকতা করিলে গম্ভীর লোকে তাহা ছ্যাবলামো বা ভাঁড়ামো বলিয়া নিন্দা করেন।'

আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে অন্য যুগের অন্য এক রসরাজ, নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এ কথা লিখেছিলেন।

গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা শোনেননি, বলেননি বা পড়েননি এমন বঙ্গভাষীর সংখ্যা বিরল। 'গোপাল ভাঁড়' নামক রসিকতার বই গত এক শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যের বেস্টসেলার, পঞ্জিকা বা রামায়ণ কিংবা লক্ষ্মীর বা শনির পাঁচালির প্রতিদ্বন্দ্বী, শংকর বা বুদ্ধদেব গুহের বেস্টসেলার এর পাশে অর্বাচীন।

এখনও রেলের কামরায়, হাট-বাজারে গোপাল ভাঁড়ের শস্তা সংস্করণ নিয়মিত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। নতুন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ধারাপাত, বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষাকে কিছু কোণঠাসা করেছে কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের আজও সমানই রমরমা।

কিছুদিন আগে কাছাড়ে গিয়েছিলাম, সেখানে প্রত্যন্ত শহরের ছোট বইয়ের দোকানে দেখেছি গোপাল ভাঁড় কাচের শোকেসে সাজানো। তারও আগে বাংলাদেশে, ঢাকা টাঙ্গাইলের বইয়ের দোকানে গোপাল ভাঁড় পেয়েছি। সব সংস্করণ এক রকম নয়, গল্পগুলোও সব মেলে না, কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি, টাকমাথা গোপাল ভাঁড়ের ছবি আঁকা প্রচ্ছদ নিয়ে গোপাল ভাঁড় কথামালা চমৎকার চলছে।

সরস গোপাল ভাঁড় নিয়ে নীরস আলোচনা করার আগে গোপাল ভাঁড় এতকাল ধরে কেন এত জনপ্রিয় সেটা বোঝার চেষ্টা করি।

এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলেদের নাম রেখেছেন, পটল, আদা, সিম, বেগুন ইত্যাদি। গোপাল ভাঁড় শুনে বলছে, 'সবাইকে আলাদা আলাদা করে না ডেকে একবারে এদের শুকতো বা লাবড়া বলে ডাকতে পারেন।' এ নিতান্ত বাঙালির নিজস্ব রসিকতা। কিংবা সেই কাণ্ডজ্ঞানে ঘড়ির উপাখ্যানে গোপাল ভাঁড়ের একটা প্রশ্নোত্তর লিখেছিলাম। গোপাল ভাঁড়ের কাছে একটা ঘড়ি রয়েছে, একজন তার কাছে সময় জানতে চাইছে, 'দাদা, ক'টা বাজে?' হাস্যমুখ গোপাল জিজ্ঞাসা করছে, 'দাদা, ক'টা চাই?' এই রহস্যময় জবাবি প্রশ্নটির কিন্তু কোনও জবাব নেই।

তবু গোপাল ভাঁড়ের অধিকাংশ রসিকতা বড় মোটা দাগের, স্থূল ও অশ্লীল। মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ, শারীরিক পঙ্গুতা, এমনকী পুত্রবধূ নিয়ে রসিকতা গোপাল ভাঁড়ের পাতায় পাতায়।

তবু গোপাল ভাঁড় এত জনপ্রিয়। বোধহয় স্থূলতা, রুচিহীনতা যা কিছু বৈঠকী বা রকের রসিকতার একটা বড় অঙ্গ সেই সঙ্গে উচিত জবাব এবং অল্পকষায় মন্তব্য গোপাল ভাঁড়কে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছে। গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে একাধিক বাংলা চলচ্চিত্র হয়েছে, যাত্রাও হয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জড়িত যে কোনও ঐতিহাসিক পালায় গোপাল ভাঁড় জনপ্রিয় চরিত্র। আসলে গোপালের গুণ হল সে যতই স্থূল হোক, সহজবোধ্য।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের একটা বিখ্যাত মঞ্চকাহিনী বলি। মিনার্ভা থিয়েটারে আবু হোসেন অভিনীত হচ্ছে। আবু হোসেনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বয়ং অর্ধেন্দু মুস্তফি।

নাটকের একটি দৃশ্যে আছে, আবু হোসেনকে রক্ষিবৃন্দ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে পাগলাগারদে দেওয়ার জন্য। আবু হোসেনের মা ডুকরে কাঁদছেন, 'ও বাপরে— আমার কী হল রে!' ইত্যাদি করুণ উক্তি করে।

সেকালে চপল এবং লঘুমতি নাট্যামোদীর অভাব ছিল না। তাদের কেউ কেউ আবু হোসেনের ক্রন্দনরতা মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হলের মধ্যে থেকে কাঁদতে লাগল। আবু হোসেনবেশী মুস্তফিসাহেব স্টেজ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দর্শকদের এই ক্রন্দনধ্বনি শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে মাকে বললেন, 'মা, আর কাঁদিসনে। তোর কান্না শুনে শেয়াল-কুকুরে কাঁদছে।' সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল-কুকুরের দশায় পরিণত হওয়া দর্শকেরা থেমে গিয়েছিল।

অর্ধেন্দু মুস্তফির এই শেষের ডায়লগটি মূল নাটকে ছিল না। থাকার কথাও না। এটা গোপাল ভাঁড়ের একটা পুরনো গল্প, অর্ধেন্দুবাবু সুযোগ পেয়ে এবং বুদ্ধি করে এখানে চালিয়ে দিলেন।

গোপাল সংক্রান্ত এ রকম বহু গল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুযোগ ও সুবিধামতো সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

গোপালের হাতের লেখা ভাল নয়। এক বৃদ্ধা এসেছেন তাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাতে। গোপাল বলল সে চিঠি লিখতে পারবে না, তার পায়ে ব্যথা। বৃদ্ধা অবাক, হাত দিয়ে চিঠি লিখতে পায়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক? গোপাল ব্যাখ্যা দিল, 'লিখব তো হাত দিয়েই। কিন্তু আমার হাতের লেখা পড়বে কে? সে তো পড়তে হবে আমাকেই গিয়ে। কিন্তু আমার পায়ে যে ব্যথা, পড়তে যেতে পারব না।'

অন্য এক কাহিনীতে গোপাল মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে তার স্ত্রীকে বলছে, 'যাও তো দেখে এসো ভোর হচ্ছে কি না? পূর্বের আকাশ লাল হয়ে এসেছে কী না?' বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বউ ফিরে এসে বলল, 'ভারী আঁধার। কিছু ঠাহর করতে পারছি না।' গোপালের আদেশ হল, 'এমনিতে দেখতে না পাও, আলো জ্বেলে দেখ সূর্য উঠছে কি না?'

আরেকবার এক আলুর গুদামে আগুন লেগেছিল। গোপাল সেই গুদামের পোড়া আলু নুন মাখিয়ে আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছে, এমন সময়ে গুদামের মালিকের সঙ্গে দেখা। তিনি হাহাকার করে উঠলেন, 'আমার দুটো আলুর গুদামের একটা পুড়ে গেল। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।' গোপাল তৃপ্ত মুখে আলুপোড়া খেতে খেতে বলল, 'জানেন, আমার আলুপোড়া খেতে খুব ভাল লাগে। আপনার পরের গুদামটায় যখন আগুন লাগবে, খবর দেবেন।'

গোপাল ভাঁড়কে বলা হয় অষ্টাদশ শতকের লোক। কিন্তু এই আলু কিংবা ঘড়ি ব্যাপারটা ওই শতকের সঙ্গে মিলছে না। ঘড়ি কিংবা আলু আমাদের সমাজে অনেক পরের ব্যাপার।

কথিত আছে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড় সভাসদ ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় এবং মৃত্যু ওই শতকের শেষাশেষি। তিনি বাংলার নবাব আলিবর্দি, সিরাজদৌল্লা এঁদের সমসাময়িক ছিলেন। গোপাল তাঁরই বিদূষক: আকবরের যেমন বীরবল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তেমনি গোপাল ভাঁড়।

গোপাল ভাঁড়ের এই ঐতিহাসিকতা কিন্তু সকলে স্বীকার করেন না। স্বয়ং সুকুমার সেন বলেছেন, কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিলেন না। শঙ্করতরঙ্গ নামে একজন ছিলেন রাজার পার্শ্বচর, দেহরক্ষী; তিনি বাক্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ভাঁড় ছিলেন না।

গোপাল ভাঁড় কে ছিলেন কে জানে? রসরহস্যমালার এই প্রাচীন নায়ক, তাকে ঘিরে থাকুক কিছু কিংবদন্তি, কিছু অস্পষ্টতা। বটতলার গ্রন্থমালা তাকে পৌঁছে দিক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শতক থেকে শতকান্তরে। তার উপাখ্যানে নতুন যুগের নতুন বিদূষক যোগ করে দিক আর কয়েকটি রসিকতা, খারাপ-ভাল কয়েকটি বহুজনবোধ্য গল্প।

ততক্ষণে আমরা এই কালজয়ী ভাঁড়কে আরও একটু অবলোকন করি। গোপাল ভাঁড়ের যেসব বিখ্যাত গল্প, সেই বিধবা পিসির লাউঘন্টে ভাজা চিংড়ি মাছ মিশিয়ে পিসিকে ব্ল্যাকমেল করা কিংবা

কবি ভারতচন্দ্রকে গোপালের অনুরোধ, 'আপনার বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপিটি কাত করবেন না, এর রসে টইটম্বুর, রস গড়িয়ে পড়বে,' এসব প্রায় সকলেরই বহুবার শোনা।

ওইসব দাগের এবং বহুশ্রুত গল্পগুলি এড়িয়ে দু'-একটি অন্য গল্প বলা যাক। এক মজুর গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, গর্ত তো কাটলুম, গর্তের মাটি রাখব কোথায়?' গোপাল জবাব দিল, 'গর্তটি একটু বড় করে খুঁড়লেই তার মধ্যে মাটিটা রাখতে পারবে।' গোপাল কিন্তু মাঝেমধ্যে জব্দও হয়েছে। সে তার স্ত্রীকে বলেছিল তিলের নাড়ু বানাতে। তার স্ত্রী বানাল তালের বড়া, গোপাল বিস্ময় প্রকাশ করাতে গোপালের স্ত্রী জানালে, 'তিল থেকেই তো তাল হয় গো।' আরেকবার গোপালের ছেলে হাটের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বাবাকে, 'গোপাল, গোপাল', নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছিল, গোপাল এতে রাগ করায় ছেলে বলেছিল, 'হাটের মধ্যে বাবা-বাবা করলে কে না কে সাড়া দেবে। তার থেকে নাম ধরে ডাকাই নিরাপদ।'

গোপাল ভাঁড়ের শেষ গল্পটি সাদামাটা। মজার কথা এই যে, এ গল্পটি মোল্লা নাসিরুদ্দিনেরও আছে! গোপাল নাকি কবে যুদ্ধে গিয়েছিল, সেখানে বিপক্ষের বহু সৈন্যের সে পা কেটে ফেলে। 'মাথা না কেটে পা কাটলে কেন?' এই প্রশ্নে গোপাল জানাল, 'মাথাগুলো যে আগেই কাটা ছিল।'

জগৎপারাবারের তীরে

আমাদের সাবেকি কালীঘাট পাড়ার চুলকাটার সেলুনের বাইরের দরজায় লেখা ছিল,

চুল— ১৲ (এক টাকা)

শিশু— ৷৷৹ (আট আনা)

তখন আমাদের বাড়িতে কোনও শিশু ছিল না। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা চুলকাটার দোকানের ওই বিজ্ঞপ্তি দেখে এবং শস্তায় পাওয়া যাচ্ছে দেখে ওই সেলুন থেকে একটাকা দিয়ে দুটো শিশু কেনার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ক্ষৌরকার মহোদয় শিশু সরবরাহ করতে পারেননি, পারার কথাও নয়। কিন্তু তিনি আমার দাদাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে ওই শিশু মানে হল শিশুদের চুলকাটা। ফলে পথে-ঘাটে, সময়-অসময়ে যখনই ওই সেলুনওলার সঙ্গে দাদার দেখা হত, দাদা তাঁকে তাগিদ দিতেন, 'ও মশায় শিশু এল। আমাদের যে দুটো শিশু বড় দরকার।'

কবি বলেছেন, 'জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' শিশুরা যদি শুধু জগৎপারাবারের তীরেই খেলত তা হলে হয়তো তেমন আপত্তির কিছু ছিল না কিন্তু তারা যে কোথায় খেলে আর আর কোথায় খেলে না, কেউই বলতে পারবে না, তারা নিজেরাও নয়। গাছের ডালে, পুকুরের জলে, বাবার লেখার টেবিলে, মায়ের রান্নাঘরে, ঠাকুমার পুজোর জায়গায়, ইস্কুলের ক্লাসে, সিঁড়িতে, বারান্দায়, গাড়িতে এবং আরও এক হাজার এক জায়গায় তারা খেলে। খেতে খেতে খেলে, ঘুমোতে ঘুমোতে খেলে, কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে, পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে এমনকী খেলতে খেলতে খেলে।

তা খেলুক, যত খুশি খেলুক, সরল শিশুদের সরল খেলাধুলোয় বাদ সেধে লাভ নেই। তা ছাড়া

আমরা সবাই তো বিলিতি ছড়ায় সেই সাহেব খোকা জিলের কথা পড়েছি; খেলা না করে শুধু কাজ করে যার খুব ক্ষতি হয়েছিল।

জিলের ছড়া যে-দেশের, সে-দেশের উইলিয়াম ওয়র্ডসওয়ার্থ নামক এক প্রবীণ কবির ভাল ভাল উক্তির দিকে খুব ঝোঁক ছিল, তিনিই বলেছিলেন শিশুরাই হল মানুষের বাবা। এর চেয়ে সুন্দর হল একটি ফরাসি প্রবাদ, শিশুরা হল দেবদূত, তারা যত বড় হতে থাকে তাদের পাখা তত ছোট হতে থাকে।

দেবদূত, কবিতা এবং প্রবাদ-বাক্য থেকে মর্ত্য-পৃথিবীর শিশুদের কাছে ফিরে আসা যাক। এক বড় রেস্তোরাঁয় একদা দেখেছিলাম এক দম্পতি তাঁদের শিশুকন্যাটিকে নিয়ে নৈশাহার করছেন। তাঁরা একটা আস্ত সেদ্ধ মাছ নিয়েছেন যার অর্ধেকও তাঁরা তিনজনে খেয়ে উঠতে পারেননি। বিল মেটানোর আগে কর্তা বেয়ারাকে বললেন, 'মাছ যেটুকু আছে, একটা প্যাকেট করে দাও তো আমাদের বেড়ালটার জন্য।' শিশুকন্যাটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় করে বলে ফেলল, 'বাবা, তা হলে আমরা আজ থেকে একটা বেড়াল পুষব। কী ভাল, কী ভাল।' পিতৃদেবের কর্ণমূল আরক্ত করে মেয়েটি হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

অন্য একটি বাচ্চা মেয়ের কথা বলি। কয়েকদিন আগে তার একটি ভাই হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুকু, ভাই কেমন হয়েছে?' সে ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'মন্দ না।' আমি তার মুখভাব দেখে অবাক হলাম, বললাম, 'সেকী, ভাই পেয়ে তুমি খুশি হওনি।' খুকু জানাল, 'ভাই না হয়ে বোন হলে অনেক ভাল হত। আমি অনেক খুশি হতাম। বড় হলে তার সঙ্গে পুতুল খেলতে পারতাম।' আমি রহস্য করে বললাম, 'যাও না, যে হাসপাতাল থেকে মা ভাইকে নিয়ে এসেছে সেখানে গিয়ে ভাইকে বদলিয়ে মনের মতো একটা বোন নিয়ে এসো।' খুকু বিজ্ঞের মতো গম্ভীর মুখে বলল, 'সে তো প্রথমে হলে হত। এখন সাত দিন ব্যবহার করা হয়ে গেছে এখন কি আর ফেরত নেবে।'

শিশুনারী বড় পাকা হয়, শিশুনর সে তুলনায় সরল কিন্তু গোঁয়ার ও ডানপিটে। দু'ভাই মারামারি করছে। মা রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বড়টিকে নিয়ে পড়লেন, 'তুমি ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করলে ফের, তোমাকে বারণ করিনি?' বড়ছেলে বলল, 'ভাই আমাকে আগে মেরেছে।' মা সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলিনি কখনও ভাইয়ের উপর রাগ হলে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত গুনবে। দেখবে গুনতে গুনতে রাগ পড়ে যাবে।' এবার বড়ছেলে উত্তেজিত হয়ে গেল, সে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি তো আমাকে পনেরো পর্যন্ত গুনতে বলেছ আর ওকে বলেছ রাগ হলে দশ পর্যন্ত গুনতে। আমি যখন এগারো-বারো গুনছি, তখনই তো দশ গোনা শেষ করে ও আমার পেটে ঘুষি মারল।'

আরেকবার এক দাঁতের ডাক্তারের ওখানে দেখেছিলাম শিশুপুত্র সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ডেন্টিস্টের সঙ্গে বাদানুবাদ করছেন, 'আপনি বলেছিলেন খোকার পোকাখাওয়া দাঁতটা তুলে ফেলতে দশ টাকা নেবেন আর এখন বলছেন চল্লিশ টাকা।' ডেন্টিস্ট বললেন, 'দেখুন দশ টাকাই নিই, সেটাই নেওয়ার কথা। কিন্তু আপনার ছেলে দাঁত তুলতে গিয়ে এমন মারাত্মক চেঁচাল যে আমার বাকি তিনজন রোগী যারা চেম্বারে বসেছিল ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। সেই জন্য ওই তিনজনের ত্রিশ আর আপনার ছেলের দশ, সব মিলিয়ে মোট চল্লিশ চাইছি।'

শুধু দাঁত তোলা নয়, এমন শিশুকে জানি যার চুল কাটাও প্রাণান্তকর ব্যাপার। এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম সেলুনের দরজায় দরজায় ছেলের হাত ধরে ঘুরছেন। সমস্ত ক্ষৌরকার সেই শিশুটিকে চেনেন। তাঁরা তাকে দেখেই আঁতকিয়ে উঠছেন, 'সর্বনাশ! না ওর চুল আমি কাটতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন দাদা।'

শিশুদের নিয়ে আমার সুদুর অতীতের শিক্ষক-জীবনের দু'-একটা তুচ্ছ ঘটনা আজও মনে আছে। একটি বাচ্চা ছেলে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্যার, কারওকে কি সে যা করেনি

ত্র জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত।' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই না।' সে এবার খাপ খুলল, 'তা হলে স্যার, অঙ্কের দিদিমণি আমি অঙ্ক করিনি বলে সাজা দিলেন কেন?'

আরেকবার আরেকটি ছাত্রকে বলেছিলাম, 'রেফের নীচে দ্বিত্ব দেয়ার দরকার নেই, পূর্ব বানানে রেফের নীচে একটা ব কেটে দাও।' ছেলেটি অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, কোন ব কেটে দেব? উপরের ব না নীচের ব?'

সবচেয়ে জব্দ হয়েছি এই সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে তার ক্ষুদ্র পৌত্রীটিকে মুখে মুখে যোগ অঙ্ক শেখাতে গিয়ে। আমি তাকে বললাম, 'আমি যদি আজ তোমাকে তিনটে বল দিই, কাল তোমাকে দুটো বল দিই আর পরশুদিন একটা বল দিই তা হলে তোমার সবসুদ্ধ ক'টা বল হবে?'

মেয়েটি একটু মনে মনে চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আটটা।' আমি বললাম, 'সে কী, আটটা কেন?' সে বলল, 'আমি আপনার কাছ থেকে পেলাম তিনদিনে সবসুদ্ধ ছ'টা। আর আমার তো নিজেরও দুটো আছে, তাই আটটা।'

পুনশ্চ: শিশুকাহিনীতে এ গল্পটা না লেখাই ভাল। তাই মূল অংশে গল্পটা এড়িয়ে গেছি। তবু মনে যখন এসেছে, পুনশ্চের পর্দার আড়ালে বলেই ফেলি।

বাড়ির ছোট শিশুটির জন্য কয়েকদিন হল একজন নতুন দিদিমণি নিযুক্ত হয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় যখন দিদিমণি পড়িয়ে ফিরছেন শিশুটির মা পড়ার ঘরে এলেন, এসে শিশুটিকে বললেন, 'সানি, দিদিমণি যাওয়ার আগে দিদিমণিকে একটু আদর করে দাও।' সানি নামক শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'না, দিদিমণিকে আদর করব না।' মা বললেন, 'কেন?' 'আদর করলে দিদিমণি আমাকে চড় মারবে।' সরল শিশুটি জানাল। মা অবাক হলেন, 'সে কী, তা কেন?' সানি বললে, 'কাল দিদিমণিকে বাবা আদর করতে গিয়েছিল, বাবাকে দিদিমণি চড় মেরেছে।'

হিন্দি

সেই কবে কিশোর বয়সে লিখেছিলাম যে দশরথের চার ছেলের হিন্দি অনুবাদ হল দশরথকা চৌবাচ্চা, এরপর আর বিশেষ ভাল করে হিন্দি শেখা হয়নি।

আজ কিছুকাল হল আবার নতুন করে হিন্দি শেখা আরম্ভ করেছি। দূরদর্শনের পর্দায় সপ্তাহান্তিক হিন্দি সিনেমার প্রতি আমার একটা আসক্তি জন্মেছে। প্রথম দিকে খুব ভাল বুঝতে পারতাম না কিন্তু ভাব-ভাষা ঠিক বুঝি-না-বুঝি আসল ব্যাপারটা এখন বেশ ধরতে পারছি। আমি এখন বুঝে গেছি শেষ দৃশ্যে জীবনপণ লড়াইয়ের পরে যে জীবিত থাকে সেই হল কাহিনীর নায়ক, আর শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে যে মারা পড়ে সে হল খলনায়ক।

এসব বোঝা ছাড়াও হিন্দি সিনেমা দেখে ক্রমশ আমার শব্দের স্টক বাড়ছে। এখন পর্যন্ত যে কয়টি নতুন শব্দ আমি আয়ত্ত করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল, খামোশ।

খামোশ শব্দটির শেষ অংশটি 'শ' না 'স' নাকি 'ষ', সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শব্দটির

মানেটাও যে ভাল বুঝতে পেরেছি তা নয়। কিন্তু 'খামোশ' একটি চমৎকার ধমক, বাংলাতেও এর ব্যবহারে চমৎকার কাজ হয়।

ময়দানে আমার কুকুর নিয়ে বেড়াতে গিয়ে স্বভাব-বদমাইশ কুকুরটি সামান্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেই আমি তাকে ধমক দিই, 'খামোশ', সে সঙ্গে সঙ্গে লেজ গুটিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

আজকাল রাস্তায় ট্যাক্সি ধরতে হলে আর কাতর স্বরে 'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' করে মরীচিকার পিছনে ছুটে ক্লান্ত হই না। আমার কম্বু-বিনিন্দিত কণ্ঠে একবার জোর খাঁকারি দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠি, 'খামোশ', ট্যাক্সিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়, 'স্যার' বলে পিছনের সিট খুলে যত্নে তুলে নেয়।

'খামোশ' কিংবা অন্য যে কোনও শব্দের মানে না জেনে এই লাভজনক ব্যবহার, এটা যে কখনও যথেষ্ট পরিমাণ বিপজ্জনক হতে পারে, সে বিষয়ে আমি সচেতন।

শিবরাম চক্রবর্তীর অসামান্য একটি গল্পে শব্দের ভুল ব্যবহারের পরিণতি দেখানো আছে। গভীর রাতে শিশু কাঁদছে, শিশুকে ঘুম পাড়াতে হবে। নব নিযুক্তা হিন্দুস্থানি আয়াকে নির্দেশ দেওয়া হল, 'যাও, ইসকো ঘুমাকে লে আও।' নির্দেশক বলতে চাচ্ছেন যে শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে এসো। কিন্তু হিন্দিতে ঘুমাকে মানে ঘুরিয়ে বা বেড়িয়ে নিয়ে এস। ফলে নির্দেশ পাওয়া মাত্র আয়াটি বাচ্চাটিকে নিয়ে গভীর রাতের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

অবশ্য স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে কাজের লোকের ভুল বোঝা এই প্রথম বা নতুন নয়। ঘটনাটি হিন্দি-জড়িত নয় কিন্তু স্মরণীয়। কাজের লোককে বলা হয়েছে দরজা ভেজাতে অর্থাৎ দরজাটা কুলুপ না দিয়ে টেনে দিতে কিন্তু সে ধরতে পারেনি। এক বালতি জল তুলে এনে দরজা জল দিয়ে ভেজাতে লেগে গেল কাজের লোকটি।

কাজের লোকটি নিয়ে অন্য একটা বিদ্যাবুদ্ধি হয়ে যাবে। আপাতত শিবরাম চক্রবর্তীর হিন্দি ব্যাপারটুকু সেরে নিয়ে আমার নিজের হিন্দিপ্রমাদে প্রবেশ করব।

শিবরামের সেই গল্পটা বোধহয় নকুড় কাকাকে নিয়ে। সেই নকুড়কাকা যার সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তীর অহংকার ছিল। একশো একার জমি আমার নকুড়কাকার একার। নকুড়কাকা যেমন বড়লোক, তেমনি কৃপণ; যাকে বলে কৃপণ-কুলচূড়ামণি। সেই নকুড়কাকা পোস্টাফিসে টাকা জমান হিন্দিতে সই করে। কারণ খুব স্পষ্ট। একে পোস্টাফিসে কখনওই সই মেলে না এবং সেই জন্য টাকা তোলা যায় না, তার উপরে অধিকতর নিরাপত্তার জন্য নকুড়কাকা হিন্দিতে নাম সই করেন। এমনিতেই সই মেলে না, তার উপরে হিন্দি সই, ফলে ইচ্ছে বা প্রয়োজন থাকলেও কখনওই নকুড়কাকার পক্ষে পোস্টাফিসে একবার রাখা টাকা আর তোলা সম্ভব হয় না। সুতরাং জমা টাকা আর খরচ হয় না। একেবারে অকাট্য যুক্তি। পোস্টাফিসে নকুড়কাকার টাকা জমার উপরে জমা পড়তে থাকে, কখনওই সেটা তোলা যায় না।

শিবরাম চক্রবর্তীর ঠিক পরেই আমার নিজের কথায় চলে আসা খুবই গর্হিত আচরণ হবে, একটু ঔদ্ধত্যও হয়তো হবে তাই আমি সরাসরি না এসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারফত আসছি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার নামে এই গল্পটা লিখেছিলেন তাঁর 'মায়াকাননের ফুল' নামক স্মৃতিময় উপন্যাসে। সেটা হয়তো সবাই পড়েছেন। আমি সেই জন্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ও আলাদা করে নিবেদন করছি।

কাল্পনিক ঘটনাটি ঘটেছিল হাজারিবাগের একটা গ্রামে। তখন তাতাইয়ের বয়স পাঁচ-ছয়ের বেশি হবে না। আমরা সেবার পুজোর ছুটিতে হাজারিবাগের ওই গ্রামে মাসখানেক ছিলাম। এরই মধ্যে একদিন তাতাইকে একটি বোলতা কামড়ায়। কপালের পাশে কামড়েছিল, কিছুক্ষণ পরে চোখমুখ ফুলে উঠল। মিনতি প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিল, আমি যত বলি, 'আমাকে ছেলেবেলায় বহুবার বোলতা কামড়িয়েছে, হঠাৎ একটা বোলতার কামড়ে কিছু হয় না। আধখানা অ্যাসপিরিন দিয়ে দাও;' মিনতি তত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে তাতাইয়ের আকুল ক্রন্দন।

রাস্তার মোড়েই বসেন এক দেহাতি ডাক্তার। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোক ভাল বাংলা বোঝেন না। ওঁর কাছে তাতাইকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী গেলাম বটে কিন্তু আমার সামান্য হিন্দিজ্ঞানে তাঁকে বোঝাতে পারলাম না কী হয়েছে। বোলতার হিন্দি কী ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। মধুমক্ষি, মৈমস্থি, মৌমক্ষি কত কী বললাম কিন্তু ডাক্তারবাবু আর বোঝেন না।

পাশেই এক হিন্দুস্থানি ভদ্রলোক বসেছিলেন। দু'দিন আগে রাস্তায় পরিচয়, হাজারিবাগ সদর শহরে এই ভদ্রলোক এক সময় কিছুদিন ছিলেন, কিছুটা বাংলা জ্ঞান আছে। অগত্যা তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'ভাইয়া, হামলোক তো বোলতাকে বোলতা বোলতা হ্যায়, আপ লোক বোলতাকো ক্যায়া বোলতা হ্যায়।'

অনুগ্রহ করে কোনও পাঠক-পাঠিকা আমার এ প্রশ্নের কী উত্তর পেয়েছিলাম এবং অতঃপর কী হয়েছিল অনুমান করে নেবেন। ততক্ষণে আমি আমার এক সরকারি বন্ধুর হিন্দি সংকটের কথা বলি।

বন্ধুটিকে চাকরি পাকা হওয়ার আগে যথারীতি কয়েকটি বিভাগীয় পরীক্ষা পাশ করতে হয়েছিল, তার মধ্যে একটি হল হিন্দি। লিখিত এবং মৌখিক দু'রকম পরীক্ষাই পাশ করতে হবে।

লিখিত পরীক্ষা বন্ধুবর কোনওভাবে পাশ হলেন। এবার মৌখিক পরীক্ষা। খুব সোজা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দির পরীক্ষক, 'কলকাতার বাইরে থেকে একজন বেড়াতে এসেছেন, তাঁকে আপনি কোথায় কোথায় নিয়ে যাবেন, কী কী দেখাবেন হিন্দিতে বলুন।'

সোজা প্রশ্ন পেয়ে বন্ধুটি গড়গড় করে বলে চললেন, রাজভবনমে লে যায়গা, চৌরঙ্গিমে লে যায়গা, জাদুঘরমে লে যায়গা, চিড়িয়াখানামে লে যায়গা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালমে লে যায়গা...'। হিন্দি পরীক্ষক তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইংরেজি হয়ে গেল, ওটা হিন্দি করে বলুন।'

বন্ধুবর অনেক ভাবলেন, কিন্তু কিছুতেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হিন্দি প্রতিশব্দ মনে এল না। তখন দু'বার ঘাড় চুলকে বললেন, 'হাম উসকো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালমে নেহি লে যায়গা, উসকো পরেশনাথকা মন্দিরমে লে যায়গা।'

বন্ধুর আর সেবার পাশ হওয়া হল না। ছয় মাস পরে আবার বিভাগীয় পরীক্ষা। সেই একই পরীক্ষক, একই ছাত্র। এবার প্রশ্ন আরও সোজা, 'ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হিন্দিতে বলুন।' বন্ধুটি কিঞ্চিৎ চিন্তা করে নিয়ে, সংখ্যাগুলিকে হিন্দিত্ব দেওয়ার জন্য 'ষ' এবং 'স' এই দুটি বর্ণকে 'ছ' করে অর্থাৎ ষাট, একষট্টি, বাষট্টির জায়গায় ছাট, একছট্টি, বাছট্টি করে বলে গেলেন।

নিরুত্তাপ পরীক্ষক ছত্তুর পৌঁছানোর পরে থামালেন, তারপর বললেন, 'এবার বাংলায় বলুন।' 'ষ' বা 'স' বদল করে দিলে বাংলায় যে ব্যাপারটি একই এবং সেটা হিন্দি নয় সেটা বুঝতে বন্ধুবরের এক সেকেন্ড লাগল। তিনি 'বহুৎ শুকরিয়া' বলে বিদায় দিলেন।

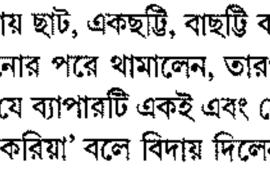

রেফ্রিজারেটর

আগে গালভরা পোশাকি নাম ছিল রেফ্রিজারেটর। অনেকদিন হল বস্তুটি আটপৌরে হয়ে গেছে, শহরে নগরে প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, এখন তাকে ছোট করে ফ্রিজ বলা হয়। যেমন কিছুদিন হল টেলিভিশন হয়েছে টি ভি।

টেলিভিশন নিয়ে এ যাত্রা কিছু লিখতে চাই না। বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে সে বড় গুরুপাক হবে। সে বিষয়ে যথা সময় যথাস্থানে লেখা যাবে।

ফ্রিজের কথার আরম্ভে একটা পুরনো প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করে নিচ্ছি। সেই যে কোন বাড়ির বাচ্চা কাজের ছেলেটি বা মেয়েটি গরমের দিনে ঠান্ডার লোভে একটা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে শুতে যায় এবং তারপরে তার মধ্যে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ে, সে গল্পটার কিন্তু কোনও ভিত্তি নেই। যতদূর জানা গেছে এ রকম গল্প সম্পূর্ণ মনগড়া। তা ছাড়া একটি আটদশ বছরের শিশু দরজা খুলে শুতে পারে ফ্রিজের মধ্যে এমন জায়গাই বা কোথায়? আসলে রেফ্রিজারেটর যুগ শুরু হওয়ার মুখে এই নতুন যন্ত্রটি সম্পর্কে অনীহা, উদ্বেগ ও কৌতূহল, সেই সঙ্গে গৃহস্থের নাগালের বাইরে এর উচ্চমূল্য সব মিলিয়ে এই ভয়াবহ গল্পটির জন্ম দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনেকসময় অনেক কড়া ডিসিপ্লিনের ইস্কুল সম্পর্কেও গুজব রটে। অমুক স্কুলে একজন ছেলে বা মেয়েকে স্কুল ছুটির আগের দিন ঘরে আটকিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। তারপর দিদিমণি বা মাস্টারমশায় ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে গিয়ে বাড়ি চলে যান। পরে কয়েকদিন বাদে স্কুল খুললে দেখা যায় সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি ক্লাসঘরে মরে পড়ে আছে।

এ রকম গল্প বহু ক্ষেত্রেই গুজব মাত্র। ভাল করে খোঁজ নিলে শোনা যায়, এ ইস্কুল নয় সে ইস্কুল, বড়দিনের ছুটির আগে নয়, পুজোর ছুটির আগের ঘটনা।

ফ্রিজের গল্প বহুদিন বন্ধ হয়েছে কিন্তু স্কুলের গল্প আজও মাঝেমধ্যে শোনা যায়।

সে যা হোক আমরা ফ্রিজের আদি যুগের আসল ব্যাপারে যাচ্ছি।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন আমি বঙ্গপ্রদেশের বৃহত্তম জেলার একটি মফস্বলি স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি জীবনে প্রথম ফ্রিজ দেখতে পাই। আমাদের সেই আটকোটি লোকের বিশাল জেলায় তখন সবসুদ্ধ পাঁচ-দশটি ফ্রিজ ছিল কিনা সন্দেহ এবং তার অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে, রাজা-জমিদারের বাড়িতে। গ্রামে এমনকী শহরেও বিদ্যুৎ সহজলভ্য ছিল না। এগুলো ছিল কেরোসিনের ফ্রিজ।

আমি প্রথম ফ্রিজ দেখি টাঙ্গাইল শহরের উপান্তে এক জমিদারের কাছারি বাড়িতে। আজ যখন দেখি একটি সামান্য শিশু পর্যন্ত এক মুহূর্তের মধ্যে সুইচ অন করে একটা রেফ্রিজারেটর চালিয়ে দিচ্ছে তখন আমার মনে পড়ে শান্তিকুঞ্জের সেই অতিকায় ফ্রিজটির কথা। সেই ফ্রিজটি কেরোসিনে চলত। তখনকার মফস্বলে তরিতরকারি মাছ মাংস ফ্রিজে রাখার কোনও প্রশ্ন ছিল না, টাটকা এবং প্রচুর পাওয়া যেত এসব জিনিস, অবশ্য টাকা থাকলে।

ওই ফ্রিজটি ব্যবহার করা হত কালেভদ্রে। গ্রীষ্মকালে কোনও কোনও দিন নিমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা বা পার্টি থাকলে বরফ এবং ঠান্ডা জলের জন্য এবং ঠান্ডা দই, পুডিং বা কোনও শীতল পানীয়ের জন্য ফ্রিজটি চালু করা হত ওই নির্দিষ্ট দিনটিতে।

ফ্রিজটি আয়তনে ছিল বিশাল। প্রায় ছোটখাটো একটা সিঁড়িকোঠা ঘরের মতো। বিরাট দরজা, খুলে নিয়ে যে কোনও বাড়ির গেটে লাগিয়ে দেওয়া যায়, সিংহদরোজা বানানোর মতো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার ছিল ফ্রিজটা চালু করা। অনেক কাল আগের কথা স্পষ্ট মনে নেই তবে এখনও আবছা আবছা ভাবে আমি স্মরণ করতে পারি যন্ত্রটিকে কার্যকরী করার একটা দৃশ্য। আমার আট-দশ বছর বয়স হবে, টাঙ্গাইলের সেই জমিদার বাড়ির একটা দেওয়াল ঘেঁষা বড় বকুল গাছ থেকে প্রায় শিউলি ফুলের মতো বড় বড় বকুল ঝরে পড়ত বাইরের রাস্তায়; গ্রীষ্মের কোনও কোনও ঘুমভাঙা ভোরবেলায় সেই ফুল কুড়োতে যেতাম।

একদিন সেই প্রায়ান্ধকার প্রভাতে দেখি জমিদার বাড়ির মধ্যে ভীষণ হাঁকডাক হইচই চলছে। কৌতূহলবশত পাঁচিলের উপর উঠে বসে দেখলাম সামনের একটা বড় ঘরে বিশাল কালো একটা দৈত্যের সিন্দুকের মতো জিনিসের সামনে জটলা। দুটি কেরোসিনের টিন হাতে নিয়ে চারজন লোক এসে একটা বড় পাইপের মধ্যে চোঙা দিয়ে সেই তেল ঢালছে, আর সমবেত নির্দেশ আসছে, 'আরও আরও, আর না, আর না, আরেকটু, আরেকটু।' কিছুক্ষণ পরে তৈলবাহী পাইপ উপচিয়ে তেল পড়ে ঘর ভেসে গেল।

বাড়ির মধ্য থেকে ডেকে আনা হল জনা কয়েক দাসীকে। তারা বড় বড় ন্যাতা দিয়ে মুছতে লাগল পাথরের মেজে থেকে সেই উপচে পড়া কেরোসিন তেল।

সেদিন সন্ধ্যাতেই কীসের যেন ভোজ। এই পরিচারিকারা বাড়ির মধ্যে মাছ, তরকারি কুটছিল। তারা খুব গজগজ করতে লাগল তাদের স্বাভাবিক কাজে বাধা পড়ায় এবং পুরুষদের অকমর্ণ্যতায়। জনৈকার কথাবার্তার মধ্যে বিষাক্তভাব সম্ভবত বেশি ছিল, হঠাৎ দেখলাম যে দু'জন কেরোসিন ঢেলেছিল তাদের একজন শূন্য কেরোসিনের টিন তুলে সেই প্রগলভা পরিচারিকাকে মারতে উঠল। হয়তো ভয় দেখাতে চেয়েছিল।

কিন্তু এর পরেই ঘটল অঘটন। পিচ্ছিল কেরোসিনসিক্ত পাথরের মেজেতে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি করতে গিয়ে ক্রুদ্ধ ভৃত্যটি তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। সে সহসা পা পিছলে চিত হয়ে পড়ে গেল অন্য এক পরিচারিকার ঘাড়ে এবং সেই সঙ্গে তার হাত থেকে কেরোসিনের ফাঁকা টিনটা ছিটকে গেল। একটু দূরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রেফ্রিজারেটার চালানোর নির্দেশ দিচ্ছিলেন প্রৌঢ় ম্যানেজার মহোদয়। তিনি উড়ন্ত কেরোসিনের টিনের আঘাতে ধরাশায়ী হলেন। বোধহয় টিনের কাটা অংশ তাঁর কপালে লেগে গিয়েছিল, সেখানে কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল।

সে এক প্রমাণ সাইজের লঙ্কাকাণ্ড। হইচই হুলস্থুল, তারপরে রাগারাগি কাঁদাকাটি— বাড়ির মধ্য থেকে বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী দৌড়ে ছুটে এলেন, প্রথমে তিনি কিছুতেই কী হয়েছে বুঝতে পারেন না। অবশেষে কিছুটা বুঝে, কিছুটা অনুমান করে তিনি সবাইকে থামালেন, মুখে বলতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমরা কেউ কোনও কর্মের নও। ভোজের বাড়ি, আজ সন্ধ্যাবেলা দুশো-আড়াইশো গণ্যমান্য লোক খাবে। এখনও পর্যন্ত মেশিনটা চালাতে পারলে না। তার উপরে দেখছি নিজেদের মধ্যে গোলমাল বাধিয়েছ।'

কথা বলতে বলতে তিনি ফ্রিজের ঘরের দরজার কাছে এগোতেই একজন পরিচারিকা, যে পড়ে যায়নি, সে তাঁকে দেখে খুব তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই গড়িয়ে পড়ল মেজেতে।

অবস্থার গতিক দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দূরে সরে গেলেন। একটু পরে ঘর-টর মোছা শেষ হল। এবার কাজের লোকেরা বড় বড় দইয়ের হাঁড়ি, আরও নানারকম পাত্র নিয়ে এল। তার মধ্যে কয়েকটা চিনেমাটির বয়াম, কাচের কুঁজো এমনকী পিতলের কলসি পর্যন্ত ছিল। সম্ভবত এগুলোর মধ্যে জল ভরা ছিল, বোতলে জলভরার কোনও ব্যাপারই নেই। সমস্তই এলাহি ব্যাপার।

এরপর এল আসল মুহূর্ত। মেশিনটি চালু করার পালা। এ কাজ ম্যানেজার বা কর্মচারীদের দিয়ে হবে না, ডাক পড়ল বিলেত ফেরত ছোট সাহেবের। তিনিই পরবর্তী জমিদার। তিনি এসে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন, 'দরজা আরেকটু চেপে বন্ধ করো, একটুও যেন ফাঁক না থাকে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে, সব মারা পড়বে।' ফাটা এবং মারা পড়ার ভয়ে সবাই যতদূর সম্ভব পিছিয়ে গেল, কেউ আর যন্ত্রের সুইচ চালু করতে সাহস পায় না।

শেষে ছোট সাহেব স্বয়ং দূর থেকে একটা কাঠের লাঠি দিয়ে সুইচটা নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ফাঁকা, যে যার মতো প্রাণভয়ে দৌড় দিল।

আমিও পাঁচিলের উপর থেকে এক লাফে নেমে বাড়ির দিকে ছুটলাম। নামার মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিলাম ফ্রিজের ঘর থেকে ঘন ধোঁয়া বেরুচ্ছে এবং একটা গোরুর হাম্বা হাম্বা ডাকের মতো শব্দ বেরচ্ছে ফ্রিজের থেকে।

ওইদিন সন্ধ্যায় আমার বাবারও নিমন্ত্রণ ছিল, ওই ভোজসভায়। 'কিছু খাওয়া গেল না। জল, শরবত, দই, এমনকী মাছ, তরকারির মধ্যে পর্যন্ত কেরোসিনের গন্ধ। চারটি মুড়ি দাও চিবিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ি', বাবা শুকনো মুখে অনেক রাতে ফিরে এসে মাকে বললেন।

কৃষ্ণকান্ত এবং...

আমাদের বেড়াল কৃষ্ণকান্তের বয়েস তখন বোধহয় দেড় মাসের বেশি হবে না। একদিন বাসায় এক কেজি মাংসের কিমা আনা হয়েছে, রান্নার টেবিলের নীচে শালপাতার ঠোঙাটা, যাতে কিমা ভরা ছিল, সেটা রাখা হয়েছিল। হঠাৎ একসময় দেখা গেল কিমার ঠোঙাটা উধাও। নেই, কোথাও নেই।

একটু পরে খুঁজে পাওয়া গেল বারান্দায়, শূন্য ঠোঙার শুকনো শালপাতাগুলি হাওয়ায় গড়াগড়ি যাচ্ছে,কিমার কোনও চিহ্ন নেই। এমনকী কোনও শালপাতার গায়ে এক ফোঁটা কিমার টুকরোও লেগে নেই। একেবারে ধোয়ামোছা, পরিষ্কার।

কিছু পরে কৃষ্ণকান্তকে খুঁজে পাওয়া গেল। তার মুখে কেমন একটা চোর চোর ভাব, সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে রয়েছে। ধরে আনতে দেখা গেল, পেটটা অসম্ভব মোটা আর ভারী রীতিমতো পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো গোল, টনটনে।

কিন্তু সব সত্ত্বেও কেমন খটকা লাগল, ওইটুকু দেড়মাসি, আধফুটি বেড়াল সে পুরো এক কিলো কিমা চেটেপুটে সাফ করে খেয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান করে ফেললাম। (আমাদের পরিবারের একটা বড় গুণ, পারিবারিক ঐতিহ্য হল, ভালভাবে হোক, খারাপভাবে হোক যে কোনও সমস্যা দ্রুত সমাধান করা।) রাস্তা দিয়ে একটা পুরনো খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছিল। তাকে ডেকে আনা হল। তারপর তাকে এক টাকা বকশিস দেওয়া হবে কথা দিয়ে তার দাঁড়িপাল্লা এবং ওজনের পাথর পাঁচ মিনিটের জন্য ধার নেওয়া হল। অবশ্য তাকে কারণটা বলা হল না। যদি সে জানতে পারত যে তার তুলাদণ্ডে

একটি মার্জার শিশুকে ওজন করা হবে সে হয়তো এক টাকার লোভেও দাঁড়িপাল্লা দিতে রাজি না হতে পারত।

এর পরের অধ্যায় আরও কঠিন। বুদ্ধিমতী প্রাণাধিকা পাঠিকা কখনও বেড়াল ওজন করার চেষ্টা করে দেখেছ? সে এক অসাধ্য ব্যাপার। অনেক আঁচড় কামড়, কলাকৌশল ইত্যাদির পরে কৃষ্ণকান্তকে দাঁড়ির এক পাল্লায় তুলে অন্য পাল্লায় পাথর দিয়ে বহু কষ্টে ওজন করা সম্ভব হয়েছিল। সেই পাঁচ মিনিটের নির্দিষ্ট সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, ফলে পুরনো কাগজওয়ালা পয়সার ক্ষতি হচ্ছে বলে রাস্তায় ইতিমধ্যে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

সে অন্য গল্প। আসল ঘটনা আরও মারাত্মক। কৃষ্ণকান্তকে ওজন করে দেখা গেল, তার ওজন হয়েছে ঠিক এক কিলোগ্রাম।

এক কিলোগ্রাম মাংস খাওয়ার পরে যদি বেড়ালের ওজন ঠিক এক কিলোগ্রামই হয় তা হলে মাংস খাওয়ার আগে ওই বেড়ালের ওজন কত ছিল? স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ও কস্মিনকালে তাঁর বিখ্যাত পাটিগণিত গ্রন্থে এমন কোনও জটিল প্রশ্নের সন্ধান দেননি। সেখানে বাঁদরের বাঁশ বেয়ে ওঠা থেকে দুধে জল মেশানো পর্যন্ত হাজার রকম পাটিগাণিতীয় (নাকি পাটিগাণিতিক) উদাহরণ ছিল, কিন্তু তার কোনওটাই এতটা রহস্যময় নয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের কৃষ্ণকান্ত নামক মার্জার শিশুটির ওজন শূন্য, অর্থাৎ সে অশরীরী, অর্থাৎ, সে একটি ভূত। কিন্তু ঘটনা হয়তো তা নয়, তার সম্ভবত তখন ওজন ছিল পাঁচশো গ্রাম, আড়াইশো গ্রাম ওজনে মাংসওয়ালা কম দিয়েছিল আর আড়াইশো গ্রাম ওজন কমে গিয়েছিল পুরনো কাগজওয়ালার চোরাই দাঁড়িপাল্লার ভুলপ্রান্তে উপস্থাপনের জন্য।

কৃষ্ণকান্ত কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও এমন করেনি। শুধু কৃষ্ণকান্ত কেন, আজকাল আমাদের বাড়ির সব কুকুর-বেড়ালই সব সময়ে রীতিমতো আইনশৃঙ্খলা মেনে চলে। তাদের আচার-সহবৎ সকলের প্রশংসা পায়।

মনীষী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, যিনি কখনও কখনও চমকপ্রদ গল্প-উপন্যাস লেখেন, কখনও কখনও আমাদের বাড়িতেও আসেন। তিনি একদিন আমাদের বাড়িতে বিস্ময় প্রকাশ করেন আশ্চর্য সব কাণ্ড দেখে যে টেবিলের উপর খোলা বাটিতে দুধ রয়েছে বেড়াল খেয়ে নিচ্ছে না, কুকুর বিছানা বা সোফায় উঠে শুচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি— তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এ ধরনের অরাজকতা দেখে।

সন্দীপনবাবু হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে যদি কখনও কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ভাল আছেন?' তিনি কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে ঘাড় চুলকিয়ে বলেন, 'দাঁড়ান, ভেবে বলতে হবে।' সেই সন্দীপনবাবু পর্যন্ত কুকুর-বিড়ালের এতাদৃশ বাধ্যবাধকতা দেখে তাঁর স্বভাব-সুলভ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁকে আমরা সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাই।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, 'দ্যাখ-মার সিসটেম।' কৃষ্ণকান্তের ওই ঘটনার পরে আমার বিনম্রা স্ত্রী মিনতি দেবী এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। সম্প্রতি ওই পদ্ধতিটিকে 'দ্যাখ-মার সিসটেম' (Dhakh-Maar System) এই ট্রেড নামে আমরা পেটেন্ট নেওয়ার কথা চিন্তা করছি।

এই সিসটেম বা পদ্ধতিটি আর কিছুই নয়, কোনওরকম বেয়াদপি বা বেচাল দেখলে, দ্যাখা মাত্র মার। কুকুর, বিড়াল এবং সেই সঙ্গে আমরা সকলে ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। মিনতি দেবীকে এই স্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্তা বলা উচিত। তিনি প্রতিবার রথের মেলায় একাধিক কুড়িটি বেলবার এক্সট্রা বেলুন খরিদ করেন। আজকাল বেশি ব্যবহার করতে হয় না, একবার বেলুন তুলে দেখালেই অবলা জীবেরা সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

অনাবশ্যক এবং বিপজ্জনক বিষয়ে কথাচ্ছলে চলে গেছি, দ্রুত বিড়ালে প্রত্যাবর্তন করছি।

কুকুরের কথা বলার বিষয়ে একবার লিখেছিলাম। এবার বেড়ালের কথা বলার বিষয়ে কিছু লেখা যায়। একবার একটি চপলা তরুণী আমাকে জব্দ করেছিল, সে বলেছিল, তাদের বেড়াল নাকি

নিজের নাম বলতে পারে। তাদের বাড়িতে আমি নিজের কানে বেড়ালের নাম বলা শুনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনি বেড়াল নাম বলতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার নাম হল 'মিঁয়াও'। নাম জিজ্ঞাসা করলেই সে 'মিঁয়াও' 'মিঁয়াও' বলে।

বেড়াল যে সব সময় 'মিঁয়াও' 'মিঁয়াও' বলে ঠিক তা নয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসে একটি বেড়াল পড়ন্ত দুপুরে এসে এক হতভাগিনী রাঁধুনী মহিলার কাছে স্পষ্ট 'মা' 'মা' করে ডেকে খাবার চাইত। শীর্ষেন্দুর অমল বর্ণনায় বেড়ালের 'মা'-'মা' ডাকে ভরা সেই মধ্য দুপুর বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে গেছে।

এক মার্জার-অনুরক্ত বিদেশি লেখক কিন্তু বেড়ালের কথা বলার ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। তিনি এ বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য, 'বেড়ালদের আমি খুব ভালভাবে জানি। তারা খুব চতুর এবং মিথ্যাবাদী। যদি কোনওদিন কোনও বেড়াল আপনাকে বলে এবং দাবি করে যে সে কথা বলতে পারে, তার কথা মোটেই বিশ্বাস করবেন না।'

আরেকটা গল্প জানি, একটা বুড়ো হুলো বেড়াল কালীঘাটে নিত্যানন্দ ভোজনালয়ে গিয়ে একদিন মাছ ভাতের অর্ডার দিয়েছিল। যে রাঁধুনিবামুন পরিবেশন করছিল তাকে সে বলে, 'আমার মাছের টুকরোটা যেন একটু কাঁচা থাকে, খুব বেশি সেদ্ধ বা ভাজা না হয়।' ভাত-মাছ খেয়ে দাম দিতে দিতে কৌতূহলী বেড়ালটি পরিবেশনকারীকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই যে আমি এ রকম খেলাম, আপনার খুব অবাক লাগছে না!' বামুনঠাকুর বললেন, 'না, না তাতে কী? কত রকম খদ্দের আসে। অনেকেই বেশি ভাজা মাছ খেতে চায় না। আমি নিজেও খুব পছন্দ করি না।'

কথা বলতে পারুক আর না পারুক, বেড়ালের বুদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু আমাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। নিঃশব্দে রান্নাঘরে প্রবেশ করা, জালের আলমারির ছিটকিনি পা দিয়ে খুলে ফেলা, বিপদে দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যাওয়া পরে ফিরে এসে পায়ে মাথা ঘষে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, এগুলো বেড়ালের চরিত্রের অঙ্গ। আমি এমন একজনকে জানি, যিনি বেড়াল খুব পছন্দ করেন না, তিনি প্রতিদিন রাতে ঘুমোনোর পরে তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে একটি বেড়াল নিঃশব্দে এসে শয্যাগ্রহণ করত এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার আগে উঠে চলে যেত। ভদ্রলোক টের পাননি, কোনওদিন জানতে পারেননি একটি রূপসী পূর্ণ যৌবনা মেনি বেড়াল রাত্রে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী।

বেড়ালের অভিজ্ঞতা বোধও যথেষ্ট বেশি। সে অনেক ব্যাপারেই নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। কথায় আছে, যদি কোনও বেড়ালের গরম দুধ খেয়ে কখনও জিব পুড়ে যায় তা হলে পরে সে ঠান্ডা দই খাওয়ার সময়েও ফুঁ দিয়ে খাবে। মার্ক টোয়েন সাহেবও অনুরূপ কথা লিখেছেন, 'একটি বেড়াল যে গরম স্টোভের ঢাকনায় একবার বসেছে, সে আর জন্মে কোনওদিন ওই উত্তপ্ত স্থানে বসতে যাবে না। সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার এই যে, সে কোনওদিন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া স্টোভের ঢাকনার উপরেও বসতে যাবে না।'

মাতাল রহস্য

মদের মতোই মদের গল্পও অতি উত্তেজক। কাণ্ডজ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠায় কত উলটোপালটা বিষয়ে বলা হল। কুকুর-বেড়াল, চোর-ডাকাত, ছাতা-মাথা কত না খুচরো গল্প শুনে, বানিয়ে বা অন্য বই থেকে টুকে লিখলাম, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে ইতিমধ্যে টের পেয়েছি মাতাল কথামালা হত জমজমাট হয়, কিছুই আর তেমন জমে না। মদ ও মাতালের আকর্ষণের কোনও তুলনা হয় না।

সম্প্রতি বেড়াল নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়ে গেছে বোধহয়। ফলে বিদ্যাবুদ্ধির শোচনীয় ঝুল অবস্থা দেখে আমার পরম বন্ধু রসরঞ্জন শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তিনটি সুরাসিক্ত রসিকতা প্রেরণ করেছেন, সেগুলি নিবেদন করছি। সুরা রসপিপাসু পাঠকপাঠিকাবৃন্দ সেসব মন দিয়ে পাঠ করুন যদি কিঞ্চিৎ গোলাপি আবেশ তাঁদের স্পর্শ করে, সমস্ত কৃতিত্ব হিমানীশবাবুর, আমার নয়।

স্কচ হুইস্কি দিয়ে আরম্ভ করা যাক। এটাই নাকি জগৎ-সংসারের সেরা মদ। এক বিখ্যাত ফৌজদারি উকিলের বাড়িতে এক মক্কেলের আবির্ভাব। উকিলবাবুর টেবিলের ঠিক সামনের চেয়ারে বসে মক্কেল মহোদয় বললেন, 'স্যার, এক কেস স্কচ হুইস্কি চুরি করার দায়ে ধরা পড়েছি। এই কেস কি আপনি নেবেন?' উকিলবাবু তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে মক্কেলের কানের খুব কাছে মুখটা নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'নেব। নিশ্চয়ই নেব। কেসটা কোথায়?'

দ্বিতীয় গল্পটি প্রথম গল্পটির মতো তত সরল নয়। রেললাইনের পাশে এক উচ্চতল বাড়ি। সে বাড়ির উপরের এক ফ্ল্যাটে পার্টি হচ্ছে, পার্টি ভাঙল গভীর রাতে, তখন লোডশেডিং, ঘুটঘুটে অন্ধকার, লিফটও বন্ধ। কয়েকজন মাতাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে অবশেষে রেললাইনের উপর এসে পৌঁছল। সকলের অবস্থাই এমন যে চলতে পারছে না আর, রেললাইনের ওপরে হামাগুড়ি দিতে লাগল। এইভাবে মিনিট কুড়ি যাওয়ার পরে একজন বলল, 'আজব বাড়িতে পার্টিতে এসেছিলাম বটে। অর্ধেক সিঁড়ি সিমেন্টের আর বাকি সিঁড়ি কাঠের।' এই শুনে দ্বিতীয় এক মাতাল বলল, 'কী উঁচু সিঁড়িরে বাবা, নামছি তো নামছিই, এ যে আর শেষ হয় না।' এইবার তৃতীয় হামাগুড়িদাতা মাতাল বলল, 'তা, সিঁড়ি বেয়ে নামতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। তবে রেলিং দুটো এত নিচু করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে না গেলে ধরতেই পারতুম না।'

তৃতীয় গল্পটিও হিমানীশ প্রেরিত। কিন্তু স্বীকার করা ভাল, গল্পটি হিমানীশের নয়, এর প্রবক্তা সাংবাদিক সন্তোষ বাগচী। শ্রীযুক্ত বাগচী কিছুকাল আগে অবসর নিয়েছেন, তাঁর রসবোধ অতি সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত।

সন্তোষবাবুর গল্পটিও অবশ্য মাতাল-সংক্রান্ত। এ কিন্তু ভাল জাতের মাতাল। বছরের শেষ দিনে নিউ ইয়ারস ইভে ভদ্রলোক প্রচুর মদ্যপানের পর প্রতিজ্ঞা করলেন নিজের মনে, 'না আর নয়, আজ থেকে মদ খাওয়া শেষ। এই বাজে নেশা ছেড়ে দিলাম।' সোজা বাড়ি গিয়ে যথারীতি বিছানায় শয়ান হলেন তিনি। পরের দিন দুপুরবেলা ঘুম ভাঙল, তখন তাঁর আগের রাতের প্রতিজ্ঞা মনে পড়ল। খুশি হলেন নিজের ওপরে, নববর্ষে চমৎকার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে; না, সত্যি সত্যি আর কখনও মদ্যপান নয়।

বিকেলের দিকে রাস্তায় বেরলেন তিনি। তখন তিনি নিজের মনের জোর পরীক্ষা করার জন্য

পানশালার সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলেন। নববর্ষের অপরাহ্ন, পানশালার ভিতরে তখন মদিরার মোহজাল; উচ্ছল, আনন্দিত জনতা। রাস্তা থেকে মৃদু সংগীতের ইশারা পাওয়া যাচ্ছে। সব কিছু অবহেলা করে, সুরার হাতছানি উপেক্ষা করে ভদ্রলোক নিতান্ত মনের জোরে এগিয়ে গেলেন পানশালা অতিক্রান্ত হয়ে।

কিছু দূরেই আরও একটা পানশালা। সেখানেও অনুরূপ প্রলোভন, প্রচুর নরনারী মদ্যপান করছে। কিন্তু তিনি বেপরোয়া, একে একে বহু পানশালা পার হয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরতি পথে, ওই একই পানশালাগুলির সামনে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে, দীপ্ত চিত্তে চলে গেলেন।

এইভাবে বার দশেক পারাপার করার পরে ভদ্রলোক নিজের মনকে বললেন, 'ওরে মন, তোর তো খুব জোর। এই দোকান, এই মদ, এই সব মানুষজনেরা পান করছে, এততেও তোর কোনও বৈকল্য নেই, দুর্বলতা নেই, লোভ নেই। সাবাস! ওরে মন, সাবাস, সাবাস।'

ততক্ষণে নববর্ষের মধুর সন্ধ্যা নীল কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে সরাবসরণীতে উচ্ছলতায় অংশ নিতে এসেছে। রাজপথে খুশি জনতার ভিড়, সুমধুর সুরলহরী ভেসে আসে পাশের পানশালাগুলি থেকে। সেই সঙ্গে হাসি, গান।

এবার ভদ্রলোক নিজের মনকে বললেন, 'ওরে মন, ওরে আমার মন, তুই যখন এতই সাহসের পরিচয় দিলি, আজ এই নতুন বছরের শুভ দিনে আয় তোকে একটু খুশি করি,' এই স্বগতোক্তি করে ভদ্রলোক তাঁর মনকে খুশি করার জন্য সামনের পানশালার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত বাগচী, দুই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি করা হয়ে গেল, আমি নিজেও মানবজাতির ওই বিপজ্জনক প্রশাখার (সৈয়দ মুজতবা আলি দ্রষ্টব্য)। ব্যাপারটা নাকি সুবিধার নয়, ত্র্যহস্পর্শের দোষ কাটানোর জন্য এইখানে এক কুলীন কায়স্থকে ছুঁয়ে যাচ্ছি।

প্রবীণ, রাশভারী, বিদগ্ধ পরশুরাম বা রাজশেখর বসুকে মদের গল্পে কখনওই স্মরণ করতে সাহস হয়নি। এবার শুধু ফাঁড়া কাটাবার জন্য করছি।

পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী গল্পে পরশুরাম মদের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়েছেন। দ্রৌপদীকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছেন, 'দশ-বিশ কলসে উত্তম আসব পাঠিয়ে দেব? পৈষ্ঠী মাধ্বী আর গৌড়ী মদিরা, মৈরেয় আর দ্রাক্ষেয় মদ্য, সবই দ্বারকায় প্রচুর পাওয়া যায়।...'

শুধু ঈশ্বর বা অবতার নন, যন্ত্র সম্পর্কেও মদের কথা বলেছেন পরশুরাম। একগুঁয়ে বার্থা গল্পে আছে, মোটর গাড়ির মালিক নিজের জন্য এক বোতল ব্র্যান্ডি কিনলেন আর তিন বোতল সাজাহানপুর রম (Rum) কিনলেন তাঁর গাড়ির জন্য, কারণ গাড়ি কেনার পরই তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, গাড়িকে রম খাওয়ালে (অর্থাৎ পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢাললে) তার বেশ ফুর্তি হয়। হর্সপাওয়ার বেড়ে যায়।

মাতাল প্রসঙ্গে আরেকজন সিদ্ধপুরুষকে স্মরণ করি, তিনি অতুলনীয় ত্রৈলোক্যনাথ। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে এক গুলিখোর মাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, 'আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা জোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয়তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল, তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুরফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।'

মহাজ্ঞানী, মহাজন যে পথে গমন করেছেন, সে পথে আরেকটু যাই, আর একটা ল্যাম্পপোস্ট ছুঁই।

কাহিনীটি পুরনো। জনৈক সুরাপায়ী বারে এসে মদের অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে একটা পোষা

গিনিপিগ বার করে টেবিলের ওপর রাখতেন। তারপর কয়েক পাত্র পান করার পরে গিনিপিগকে তুলে ভাল করে দেখে আবার পকেটে পুরে চলে যেতেন। একদিন বেয়ারা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'দাদা, গিনিপিগটাকে নিয়ে আসেন কেন?' দাদা বললেন, 'দ্যাখো,-আমি তো একটা গিনিপিগ আনি। যখন খেতে খেতে দেখি দুটো গিনিপিগ হয়েছে, তখন দুটোকে দু' পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে যাই।'

কিছুদিন পরে গিনিপিগটা মারা গেছে। গিনিপিগ ছাড়া ভদ্রলোক এসেছেন। বেয়ারা বলল, 'দাদা, এবার কী করবেন?' দাদা বললেন, 'সামনের টেবিলের লোকটা যেই ডবল হয়ে যাবে, আমি উঠে পড়ব।' এইভাবে ভালই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দাদা এক পেগ খেয়েই উঠে পড়লেন। বেয়ারাটি ছুটে এল, 'দাদা, আজ এত তাড়াতাড়ি?' দাদা বললেন, 'তাই তো, আজ বড় তাড়াতাড়ি নেশা হয়ে গেল। সামনের টেবিলের লোকটা এক পেগ খেতেই দেখি ডবল হয়ে গেছে।' বেয়ারা হেসে বলল, 'দাদা, ও দেখে ভয় পাবেন না। ও টেবিলে একজন নয়, দু'জনই আছে। ওরা যমজ ভাই। তাই ডবল মনে হচ্ছে।'

দাদা এবার শান্ত হয়ে টেবিলে বসলেন এবং ডবল রিডবল না হওয়া পর্যন্ত, দু'জন চারজন না হওয়া পর্যন্ত মনের সুখে সুরাপান করতে লাগলেন।

আবার মনে মনে

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক কবি ইউরিপিডেস বলেছিলেন, ঈশ্বর যখন ধ্বংস করেন, তখন প্রথম পাগল করে দেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক উপন্যাসে লিখেছিলেন, মানুষ মহাপাপে পাগল হয়। শেক্সপিয়ার সাহেব তাঁর হ্যামলেট নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পাগলামির সঙ্গে সেই অমোঘ উক্তিটি করেছেন, এই যদি পাগলামি হয়, তবে এর ভিতরে পদ্ধতি রয়েছে, (Yet there is madness in it.)।

পাগল ও পাগলামি সংক্রান্ত মহাজনভাবণে আবদ্ধ না থেকে একটু সামনের দিকে যাচ্ছি।

প্রথমে নিজের কথা বলি। আমার লেখা পড়ে যদি কারও ধারণা হয়ে থাকে যে আমার মধ্যে পাগলামি রয়েছে তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। আমাদের বংশে এখন আর তেমন নামকরা পাগল কেউ নেই, কিন্তু বহুকাল পাগলামির ধারা ছিল। সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণে যাব না, শুধু একটা ছোট ঘটনা বলি। একবার আমার স্বর্গত অগ্রজকে, যিনি পাগলামির জন্য নিজ গণ্ডির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এক মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু দাদাকে পরীক্ষা করতে করতে নানা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের বংশে কেউ কখনও পাগলামিতে ভুগেছে?' দাদা মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, ভোগেনি তবে অনেকেই পাগলামি উপভোগ করেছে, রীতিমতো এনজয় করেছে।'

পাগলামি উপভোগ করার একটা পুরনো গল্প আগে বলে নিই।

এই ভদ্রলোক বিমানবন্দরের কাছে থাকেন। প্রতিদিন বিকালে বিমানবন্দরের পাশের রাস্তায়

পায়চারি করে বাড়ি ফিরে আসছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকছেন, 'ও দাদা। ও দাদা। এই যে এদিকে।'

ভদ্রলোক দেখলেন হাস্যমুখ এক ব্যক্তি বিমানবন্দরের এই প্রান্তে একটা ছোট বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাত তুলে ডাকছেন। বিমানবন্দরের এদিকটায়, তারকাঁটার বেড়াটা একটু ঢিলে, তার মধ্যে দিয়ে চিকন পায়ে চলার পথ আছে।

আহ্বান শুনে পথচারী ভদ্রলোক কোনও একটা দরকারে ডাকছে এই ভেবে অগত্যা এগিয়ে গেলেন।

সেই হাস্যমুখ ব্যক্তিটি এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'দাদা, যাবেন নাকি, আমার এই প্লেনে মিনিট পনেরো আকাশে বেড়িয়ে আসতেন।'

যাঁকে অনুরোধ করা হল তিনি কখনও বিমানে চড়েননি। ভাবলেন, এ নিশ্চয় কোনও শৌখিন পাইলট। যাই মিনিট পনেরো আকাশ ভ্রমণ করে আসি। এমন মওকা সহজে জুটবে না।

ছোট প্লেন মাত্র কয়েকটা সিট। ভদ্রলোক উঠে দেখলেন, তিনি ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই। একটু পরেই পাইলট প্লেন ছেড়ে দিলেন, শূন্যে উঠল উড়োজাহাজ।

হঠাৎ যাত্রী ভদ্রলোক দেখলেন পাইলট অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছেন। একটু বোকার মতো যাত্রী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, এত হাসির কী হল? এত হাসছেন কেন?'

উদ্দামভাবে হাসতে হাসতে ছোট প্লেনটাকে একটা নাক-উঁচু ডাইভ দিয়ে পাইলট বললেন, 'আমি যে পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছি, সেই পাগলাগারদের লোকেরা যখন টের পাবে যে আমি পালিয়েছি, তখন যে কী মজাই না হবে। কী মজা, কী মজা! একবার ভাবুন তো দাদা!'

এত মজায় দাদার তখন বুকের রক্ত হিম।

আগের গল্পটি অবশ্য দারুণ গোলমেলে তদুপরি বিপজ্জনক। কিন্তু বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সামান্য কারণেও উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

একবার এক বায়ুরোগগ্রস্ত ভদ্রলোক প্রাণপণ ছুটে মানসিক ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে যান, সঙ্গে আর্তনাদ, 'ডাক্তারবাবু, বাঁচান, বাঁচান। আমি আর পারছি না। আমার চারদিক ঘিরে ধরেছে, চারপাশ থেকে আমাকে আটকে রেখেছে।'

হতভম্ব ডাক্তারবাবু রোগীকে যথাসাধ্য শান্ত করে জানতে চাইলেন, 'জিনিসটা কী? কী আপনাকে চারপাশে ঘিরে আটকে রেখেছে?' রোগী তাঁর হাওয়াই শার্ট উঁচু করে নীচে প্যান্টের কোমরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফিস ফিস করে বললেন, 'আমার এই কোমরের বেল্ট। এই বেল্টটা আমাকে আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে রেখেছে।'

আরেক বাতিকগ্রস্তের কথা জানি, সেই ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছিল তার এক ধরনের মারাত্মক লিভারের অসুখ হয়েছে। ডাক্তারকে বলতে ডাক্তার ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'এ অসুখ হলে আপনি জানতেই পারবেন না। এ আপনার সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাজে চিন্তা।'

রোগী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন জানতে পারব না?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'কারণ এ অসুখ টের পাওয়া যায় না। কোনও ব্যথা, বেদনা বা অসুবিধে, এ অসুখের কোনও লক্ষণই নেই।'

এইবার রোগী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, সেইজন্যেই তো। কোনও লক্ষণ না থাকার জন্যই তো আমি বুঝতে পারছি যে ওই অসুখটা আমার হয়েছে।'

কোনও ডাক্তারের কাছে সুরাহা করতে না পেরে এই রোগী একদিন আমাকে তার মনের দুঃখের কথা বলেছিল। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা যেটা বলেছিল, তা হল রোগের চিন্তায় আজকাল সারারাত তার ঘুম আসে না। বিনিদ্র রজনীতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে।

আমি অগত্যা তাকে একটা সুপরামর্শ দিয়েছিলাম, 'রাতে এক ঘণ্টা পর পর এক পেগ করে হুইস্কি খাবে।' সে অবাক হয়ে বলেছিল, 'তাতে কি আমার ঘুম আসবে?'

আমি বলেছিলাম, 'ঘুম আসুক ছাই না আসুক, ঘুম না আসার কষ্টে ভুগবে না। পরম আনন্দে

জেগে থাকবে।' ওই রোগী আমার এই সুপরামর্শ গ্রহণ করেছিল কি না, আশা করি সে প্রশ্ন আমাকে কেউ করবেন না।

আরেকটা ছিটগ্রস্ত লোকের গল্প করি। এ ভদ্রলোক একদা আমার প্রতিবেশী ছিলেন। একবার সাঁওতাল পরগনা থেকে শীতের সময় বেড়াতে গিয়ে একটা ভালুকছানা নিয়ে এসেছিলেন।

ক্রমশ ভালুকছানাটা পাড়ার মধ্যে বড় হতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা হিংস্র জন্তু বড় হচ্ছে, নিতান্ত ভয়ে ভয়ে একদিন প্রতিবেশীকে বললাম, 'আপনার ভালুকছানা তো বেশ বড় হল। এবার ওটাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যান।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, 'সামনের রোববার অবশ্যই ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব।' পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি দেখি, ভালুকছানাটা, (এখন আর ছানা নয়, রীতিমতো বড়সড়) প্রতিবেশীর বাইরের ঘরের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল? গত রোববার ভালুকের বাচ্চাটাকে চিড়িয়াখানায় নিতে বলেছিলাম যে। নিয়ে যাননি?'

ভদ্রলোক মধুর হেসে বললেন, 'তা নিয়ে গিয়েছিলাম বইকী। মধুলাল মানে আমার ওই ভালুকছানাটার চিড়িয়াখানা খুব ভাল লেগেছে। ভাবছি এই রোববারে মধুলালকে মিউজিয়ামে নিয়ে যাব। দেখি মধুলালের মিউজিয়াম চিড়িয়ানার মতোই ভাল লাগে কি না?'

এত সব আজেবাজে গল্প লেখার পরে সবশেষে একটা প্রকৃত কাহিনী লিখছি; প্রকৃতই সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

এক মনস্তত্ত্ববিদের চেম্বারে এক ভদ্রমহিলা এলেন। তাঁর সঙ্গে শিকলে বাঁধা একটি বেশ বড় মুখপোড়া হনুমান। ডাক্তার ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি আমার জন্য আপনার কাছে আসিনি। আমি এসেছি আমার স্বামীর জন্য।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, আপনার স্বামীর কী হয়েছে?' মুখপোড়া হনুমানটির মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলা দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, আমার স্বামীর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি একটা হনুমান।'

শেষের সেদিন

কোথায়, কোন দেশে নাকি তাঁর ল্যাবরেটরিতে এক খামখেয়ালি জীববিজ্ঞানী একটি হাস্যবান হায়েনার সঙ্গে এক সদাবাক্ময়ী কাকাতুয়ার পরিণয় দিয়েছিলেন।

জীববিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, এই পরিণয়জাত সংকর সন্তানটি পশু না পাখি বোঝা যায়নি, কিন্তু সে বাবার কাছ থেকে হা হা হাসি এবং মায়ের কাছ থেকে চমকপ্রদ কথা বলা এই দুটি জন্মসূত্রে অর্জন করে।

ফলে এই বিচিত্র জীবটি শুধু হা হা করে হেসেই ক্ষান্ত হত না, সঙ্গে সঙ্গে কাজের মাধ্যমে হাসির কারণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করত।

এ অবশ্য নিতান্তই গল্প, মানে কল্পকথা। আজ এই শেষ বিদ্যাবুদ্ধিতে এ গল্পের খেই ধরতে যাব না। বিদ্যাবুদ্ধিতে বোকা হাসি এবং মোটা গল্প অনেক হয়েছে, এবার এই শেষ কিস্তিতে আমার জবাবদিহির পালা।

উত্তর কলকাতার প্রাচীন পাঠক থেকে আলিপুর আদালতের মাননীয় ব্যবহারজীবী পর্যন্ত কেউ কেউ কখনও কখনও বিদ্যাবুদ্ধির কোনও না কোনও স্খলন উল্লেখ করে পত্রাঘাত করেছেন। তাঁদের কাছে আমি যথার্থই কৃতজ্ঞ, তাঁদের চিঠি না পেলে জীবনে জানতে পারতাম না যে এমন প্রাজ্ঞ লোকেরা কষ্ট করে বিদ্যাবুদ্ধির মতো জোচ্চুরি করে লেখা পাঠ করেছেন, পাঠ করে বিরক্ত বোধ করেছেন। পয়সা খরচ করে চিঠি দিতেও তাঁদের কষ্ট কম হয়নি। তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যাঁরা লিখেছেন বিদ্যাবুদ্ধির কিছু কিছু রসিকতা বিলিতি জোকবুকে তাঁরা খুজে পেয়েছেন, তাঁরা স্বভাবদোষে বিনয় প্রকাশ করেছেন, একটি রসিকতাও আমার নিজের নয়, সবই কোনও না-কোনও বই থেকে টোকা। আমার অক্ষম ভঙ্গিতে এবং নির্বোধ ভাষায় আমি শুধু সে গল্পগুলোকে সাজিয়েছি।

বিনীতভাবে জানাই, মহামহিম মার্ক টোয়েনসাহেব কিংবা চিরকিশোর শিবরাম চক্রবর্তী এবং গোপালভাঁড়, নাসিরুদ্দিন কিংবা প্রাতঃস্মরণীয় পরশুরাম অথবা সৈয়দ মুজতবা আলি, আমার এ মহাবিদ্যা তাঁদের কাছেই অধীত। রসিকতার ধারাই তাই।

মধ্যযুগে আরবদেশে একটা গল্প ছিল। যমজ ভাই দু'জন, আগাগোড়া একরকম দেখতে, তাঁদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। এক বিদেশি বণিক এসে দ্বিতীয় জীবিত ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'গতবার আপনার কিংবা আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শুনলাম আপনি মারা গেছেন, নাকি আপনার ভাই? আমি কি আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি নাকি আপনার সঙ্গে কথা বলছি? আপনারা দু'জনে এত একরকম দেখতে, কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

এ প্রশ্নের জবাব নেই। মার্ক টোয়েনসাহেব নিজের মতো করে চমৎকার লিখেছিলেন এই গল্প, পরে শিবরাম আরও চমৎকার। আর এই অধম? সে এ গল্প লেখেনি, লেখার সাহস হয়নি তার, সে শুধু মুখে বলেছিল। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো, একবার সে গিয়েছিল মার্কিন দেশে। সে দেশে সবই রহস্যময়। সেই রহস্যময়তা শুরু হয়েছে জন্মবৃত্তান্ত থেকে।

সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করত, আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি উপনিষদীয় জটিল প্রশ্ন। সব প্রশ্নের জবাবে আমার ছিল একটিমাত্র উত্তর, একটিমাত্র গল্প, সে ওই যমজের গল্প।

গল্পটা বলি। গল্পটা আমার জন্মরহস্য নিয়ে।

আমার ঠাকুমা ছিলেন যমজ বোনের একজন। এক খরস্রোতা নদীর তীরে ছিল আমার বাবার মাতুলালয়। মানে আমার পূজনীয়া পিতামহীর পিত্রালয়। যখন আমার ঠাকুমা এবং তাঁর বোনের নয়-দশ বছর বয়স, একবার বাড়ির নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে, তাঁদের দু'জনের একজন জলে ভেসে যান, কে যে সঠিক ভেসে গিয়েছিলেন, আমার পিতামহী নাকি পিতামহীর বোন, তাঁর দেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দু'জনেই ছিলেন হুবহু একরকম দেখতে, নাক চোখ একরকম, গায়ের রং, উচ্চতা সবই একরকম, কে যে কে বোঝা অসম্ভব। ফলে হল কী, যিনি জলে ভেসে গেলেন, তিনিই আমার পিতামহী নাকি তিনি ছিলেন পিতামহীর বোন তা কোনওদিন জানা যায়নি। আজ পর্যন্ত আমি জানি না, আমি আমার পিতামহীর পৌত্র নাকি আমার পিতামহীর বোনের পৌত্র। এই অসম্ভব জটিলতা, রহস্যময়তা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে আছে।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, বিদেশিরা তাজ্জব বনে যেত এই গল্প শুনে।

এবার একটি তথ্যের মধ্যে যাচ্ছি। গত ১৪ সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সামন্ত লিখেছেন কবিকঙ্কণে আলুর উল্লেখ আছে, সুতরাং আমি যে 'গোপাল ভাঁড়' নিবন্ধে লিখেছিলাম আলু অষ্টাদশ শতকের পরের ব্যাপার, সেটা ভুল।

সত্যিই কি ভুল? আলু হল একপ্রকার মূল বা কন্দ। শব্দটি সংস্কৃত না ফরাসি সে বিষয়ে

পণ্ডিতদের সন্দেহ আছে। সম্ভবত, আমার মনে হয় আলের মধ্যে যা জন্মায় তাই আলু এবং গোল আলু আমাদের দেশে খুব বেশিদিন আসেনি। এই সেদিন পর্যন্ত পুজোপার্বণে আলুর ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, এখনও সে জলচল হয়নি।

এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯০২ সালে নব্যভারত পত্রিকায় প্রাচীন আচার ব্যবহার নিবন্ধে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহোদয় লিখেছিলেন, 'এখন গোল আলু লোকের প্রধান তরকারি হইয়াছে। পিতামহেরা উহার নামগন্ধ জানিতেন না। এমনকী, ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্টাভোরিনাস নামক ভ্রমণকারী কলিকাতার বাজারের যে সকল তরকারির তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বাঁধাকপি ও কড়াইশুঁটির উল্লেখ আছে, কিন্তু আলুর নাম নেই।' (দ্রষ্টব্য, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত কলিকাতার ইতিবৃত্ত, ১৯৮১ সংস্করণ, পৃ. ১০৭।)

অকারণে শেষমেষ কচকচির মধ্যে চলে যাচ্ছি। বরং তরল বিষয়ে চলে আসি।

সন্ন্যাসীরা যেমন স্বপ্নে মাদুলি পান তেমনি আমি ডাকে দু'-একটা চমৎকার গল্প পেয়েছি। সেগুলির সদ্ব্যবহার করি।

কাঁকুলিয়া রোড থেকে শ্রীমতী সুদেষ্ণা সরকার একাধিক ভাল গল্প পাঠিয়েছেন। একটা গল্প বিশুদ্ধ জলপান নিয়ে।

যখন আন্ত্রিক রোগের হিড়িক দেখা দিয়েছিল, তখন মিলিটারি সব ব্যারাকে যে কতরকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা আর কহতব্য নয়।

ব্যারাক অধিকর্তা ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পানীয় জল জীবাণুমুক্ত রাখতে তোমরা কী কী ব্যবস্থা নিয়েছ?'

'আজ্ঞে, আমরা জলটা ভাল করে ফুটিয়ে নিই।'

'বাঃ, বাঃ, এই তো চাই।'

'তারপর আমরা জলের মধ্যে জীবাণুনাশক ওষুধ দিই।'

'চমৎকার।'

'এরপর আমরা সেই জল ফিলটার করি।'

'চমৎকার। অতি চমৎকার।'

'এবং তারপর আমরা নিরাপত্তার খাতিরে শুধু বিয়ার খাই। আজ তিন সপ্তাহ আমরা কেউ জল খাচ্ছি না।'

মদের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে যখন এসেই পড়ল তা হলে বহরমপুরের লোকেন রায়কেও স্মরণ করতে হয়। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, সেখানে এক ভাঁটিখানায় প্রতি সন্ধ্যায় কবির লড়াই হয়, সেখানে তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন, খালি বোতল বাজিয়ে গান হচ্ছে,

হুইস্কি ব্র্যান্ডি যাই বল না
বাংলা মদের নেই তুলনা।

মদমত্ত পাঠ করে উত্তেজিত হয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস রোড থেকে আবদুস সালাম বিশ্বাস লিখেছিলেন, 'মদ্যপায়ীদের নিয়ে অহেতুক যথেচ্ছাচার বিবেকবুদ্ধিকে প্রশংসিত না করে ধিকৃতই করে।' ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি তবে অনুমান করি বিশ্বাস সাহেব খুব ক্ষুব্ধ।

প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু রোডের বুদ্ধদেব কর। একটি কালো পতাকা পাঠিয়ে করমশায় আমাকে জানিয়েছেন, 'কলকাতার বিভিন্ন সরাবখানায় আপনাকে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি। ব্যক্তিগত প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটি ক্ষুদ্র কালো পতাকা আপনাকে প্রদর্শন করলাম।'

শেষ করবার আগে একটি সুখবর দিই। দুর্গাপুর থেকে শ্রীআশীষ মজুমদার আমাকে একটি লটারির টিকিট উপহার পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রথম পুরস্কার একটি বড় খাসি, দ্বিতীয় পুরস্কার তিনটি বড় মুরগি।

প্রতিযোগিতার ফলাফল এখনও জানি না। আমার যা ভাগ্য একটা পুরস্কার হয়তো পেয়েও যেতে পারি।

ইতি ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন মাস।

হাস্যোপাখ্যান বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ড সমাপ্ত।

পুনশ্চ: একটু দাঁড়ান। এবার যে যমজকাহিনী লিখেছি তাতে একটু বাদ আছে। সেদিন এক যমজ ভাইবোনকে দেখলাম। তারাও দু'জনে আগাগোড়া একরকম, শুধু বয়সের ব্যাপারটা ছাড়া। ভাইয়ের বয়স একচল্লিশ আর বোনের এখনও চৌত্রিশ।

ভবসিন্ধু

এবারে আর কোনও প্রাগৈতিহাসিক রেফ্রিজারেটরের লোমহর্ষক এবং অবিশ্বাস্য কাহিনী লিখে সরলমতি পাঠকপাঠিকাদের বিচলিত করব না। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় আমাদের বাড়ির অত্যাশ্চর্য এবং অব্যবহৃত একটি ফ্রিজ।

মহামতি সুকুমার রায়ের অনুসরণে আমাদের বাড়িতে কোনও কোনও প্রধান জিনিসের নামকরণ করা আছে। বেশি উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই; আমাদের দেওয়াল ঘড়িটিকে আমরা বলি চলন্তিকা, টেলিফোনকে হিংটিং এবং এবারের আলোচ্য ফ্রিজটিকে ভবসিন্ধু নাম দেওয়া আছে।

ফ্রিজটির যখন একটা নাম আছে এবং তার যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে তাই আমরা তাকে বারবার ফ্রিজ না বলে ওই ভবসিন্ধু নামেই অভিহিত করব।

ভবসিন্ধুকে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড সংগ্রহ করি সত্তর দশকের গোড়ার দিকে। কলকাতার একটি বিদেশি দূতাবাসের এক মৃত কর্মচারীর পুরনো জিনিসপত্র নিলামে বিক্রি করা হচ্ছিল, এই বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে দেখে আমরা ফ্রিজটা কিনতে যাই। খুব বেশি দাম দিতে হয়নি, মোটামুটি শোভন দেখতে, নগদ টাকা দিয়ে তখনই ওটা আমরা একটা টেম্পোতে তুলে বাড়ি নিয়ে আসি।

অবশ্য এর মধ্যে একটা ব্যাপার আমরা জানতাম না এবং আগে জানলে আমরা হয়তো ওই নিলামে যেতামই না। ব্যাপারটা এই যে, আমরা যে বিদেশি ভদ্রলোকের জিনিসটি কিনেছিলাম, সেই ভদ্রলোকের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, বছর খানেক আগে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

সেই সময়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে কাগজপত্রে অনেক হইচই চেঁচামেচি হয়েছিল। ভদ্রলোক জাপানিদের মতো নিজেকে ছোরা মেরে বন্ধ ঘরে আত্মহত্যা করেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে এটা খুনের ব্যাপার বলে পুলিশ মনে করে।

আমরা ভবসিন্ধুকে কেনবার পরে কে যেন প্রথম আমাদের খেয়াল করিয়ে দেয় এই যন্ত্রটির মালিক ওই আত্মহত্যাকারী দূতাবাস কর্মচারী। কেনবার পর থেকে আমাদের মনে একটা সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল, ভবসিন্ধুর নানাবিধ আচরণে; পরে এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করে আমরা বাড়ির সবাই রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

মিনতি বলল, 'ফ্রিজটা যখন নিয়ে আসা হয় তখন আমার মনে আছে এটার গায়ে ছিটেছিটে গাঢ়

কালো রঙের কী যেন লেগে ছিল।' আমাদের বুক ধড়াস করে উঠল, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, কেউ কিছু বললাম না, সবাই মনের গভীরে বুঝতে পারলাম, ওই কালো ছিটগুলো ছিল শুকনো রক্তের ফোঁটা।

তাতাই তখন অতি ছোট, তবে ভূতের ভয় পাবার বয়েস তার হয়েছে। সে বলল, সে দু'দিন আগে এক দুপুরে ফ্রিজটাকে একা একা খুলে যেতে দেখেছে। দরজাটা নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে। এ দৃশ্য আমিও একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখেছি। বিজন বলল, ফ্রিজটা যখন টেম্পোতে করে আনা হয়, তখন ওটার একটা কোনা লেগে ওর হাঁটুটা ছড়ে যায়, সেই ঘা এখনও শুকোচ্ছে না।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে যে কুকুর ছিল, সে এখনকারটির শ্রদ্ধেয় জননী। তার নাম ছিল চিলি. বিখ্যাত লেখক থেকে নগণ্য পথচারী, ডাক্তার, মেসোশ্বশুর, তাতাইয়ের সহপাঠী—জানাশোনার মধ্যে অসংখ্য লোককে সে বিনা কারণে কামড়েছে। সে হঠাৎ উঠে গিয়ে শান্ত চিত্তে একটা জোর কামড় দিয়ে যেন কিছু নয় ব্যাপারটা এই রকম মুখ করে আবার ফিরে এসে নিজের চেয়ারে শুয়ে ঘুমাত।

সেই দুর্দান্ত চিলি ভবসিন্ধুকে নিয়ে আসার পর প্রচণ্ড খুশি হয়। ভবসিন্ধুকে যেখানে রাখা হয় তার চারপাশে লেজ নেড়ে নেড়ে ঘোরে, মাঝে মাঝে ভবসিন্ধুর দরজা, দেয়াল এগুলো শুঁকে শুঁকে আলতো করে জিব দিয়ে চাটে। এ লক্ষণটাও আমাদের খুব সুবিধে মনে হল না।

অনেক রকম আলাপ-আলোচনা করে এবং বহুলোকের পরামর্শ নিয়েও আমরা ভবসিন্ধু সম্পর্কে কোনও রকম মনস্থির করতে পারলাম না। জন্মের মধ্যে কর্ম, একটা ফ্রিজ কেনা হয়েছে অথচ সেটাকে বাসায় রাখতে কেমন যেন একটা খটকা, একটা আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে মনে।

দু'-একজন যুক্তিবাদী বন্ধু আমাদের বললেন, 'এ সবই আজব চিন্তা, তোমরা যদি না জানতে যে এর মালিক আত্মহত্যা করে মারা গেছে তা হলে তো কোনও চিন্তাই করতে না, এত গোলমাল হত না।'

আমরা ব্যাপারটা মেনে নিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এর মধ্যে একদিন গভীর রাতে একটা অনৈসর্গিক কারণে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই জেগে উঠলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে লোডশেডিং ছিল, আলোর সুইচ অফ না করেই ঘুমিয়ে ছিলাম। ফ্রিজটা থাকত আমাদের শোয়ার ঘরে, কখন বিদ্যুৎ এসেছে, ঘরের আলোটা জ্বলেছে এবং ফ্রিজটার ভেতর থেকে কেমন একটা করুণ সানাইয়ের মতো শব্দ বেরচ্ছে। এই বাজনা ক্রমশ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। মিনতি বিস্ফারিত চোখে বিছানার উপর উঠে বসল, সানাই বাদন শুনে বিজন এবং তাতাই, সেই সঙ্গে চিলিও পাশের ঘর থেকে আমাদের ঘরে এল।

আমরা কেউ কাউকে কিছু বলছি না, শুধু বিহ্বল আর হতভম্ব হয়ে ওই বাজনা শুনতে লাগলাম। একটু পরে শুধু বাজনা নয়, নাচ শুরু হল। ভবসিন্ধু রীতিমতো দুলেদুলে নাচতে লাগল, ভবসিন্ধুর উপরে দুটো লেবু আর একটা খালি জলের বোতল রাখা ছিল। জলের বোতল সশব্দে মেজেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, লেবু দুটো গড়িয়ে পড়ে খাটের নীচে চলে গেল। লেবু দুটোকে অনুসরণ করে চিলিও খাটের নীচে প্রবেশ করল। এই দৃশ্যের যবনিকা পতন হল, মিনতির একটি হিমশীতল আর্তনাদে এবং সেই সঙ্গে তাতাইয়ের চিৎকারে।

অত রাতেও আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এল। পাশের বাড়িতে এক অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর মেজর ছিলেন। দুঃসাহসী বলে তাঁর নাম আছে, তিনি হাত দিয়ে ভবসিন্ধুকে নিবৃত্ত করতে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ধাক্কায় চিৎপাত হলেন।

চতুর্দিকে আশঙ্কা, উত্তেজনা ও হাহাকার। এরই মধ্যে একটি ঢ্যাঙা মতন ছেলে ভিড় ঠেলে এসে ফ্রিজের সুইচটা অফ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভবসিন্ধুর নৃত্যগীত সমাপ্ত হল। ছেলেটি কী একটা বোঝাতে চাইল, এটা অন্য ভোলটেজের মেশিন, তাই ভেতরের মোটরটা একদম ভড়কে গেছে।

আমাদের কিন্তু এসব বৈজ্ঞানিক বা বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা মনে ধরল না। আস্তে আস্তে লোকজন চলে গেল। আমরা গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে শুতে গেলাম।

পরদিন সকালবেলা অফিসে গিয়ে প্রথম কাজ হল গয়ায় আমাদের পরিচিত এক পাণ্ডাকে ওই সাহেবের নাম জানিয়ে একান্ন টাকা মানি অর্ডার করে পাঠানো, লোকটার নামে একটা পিণ্ড দেওয়ার জন্য। সাতদিন পরে পাণ্ডাঠাকুর জানালেন, এখন আর এত কম টাকায় পিণ্ডিদান হয় না, তা ছাড়া বিধর্মীর পিণ্ডদানে খরচা বেশি, আরও দেড়শো টাকা পাঠাতে হবে।

তাই পাঠালাম। এর মধ্যে আমি আর বিজন একদিন ট্যাক্সি করে গিয়ে বাবুঘাট থেকে দু' কলসি গঙ্গাজল নিয়ে এলাম। ভবসিন্ধুকে বাথরুমে শাওয়ারের নীচে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে স্নান করালাম, তারপরে দু' বালতি গঙ্গাজল দিয়ে ভাল করে মুছলাম।

আধিভৌতিক এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মিস্ত্রি ডেকে ভবসিন্ধুর চিকিৎসা করালাম। আগাগোড়া নতুন রং করালাম।

কিন্তু ভবসিন্ধু আর চালু হল না। গয়ায় পিণ্ডিদানের জন্যেই হোক অথবা মেরামতির গলতির জন্যেই হোক সে একদম থেমে গেল। নাচগান তো দূরের কথা, মেশিনটা আর চলে না। তবে সারানোর পরেপরেই একবার হয়েছিল, হঠাৎ চলতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার কাজ ছিল বিপরীত। সে খাবারপত্র ঠান্ডা না করে গরম করতে লাগল। ব্যাপারটা ধরার পর মিনতি সেবার শীতে আমাদের মাছ, তরকারি, ভাত ভবসিন্ধুর মধ্যেই রাখত, বেশ গরম থাকত খাবার-দাবার। অবশ্য এই তাপদান খুব বেশিদিন চলেনি। এরপর থেকে ভবসিন্ধু একদম থেমে গুম হয়ে আছে।

ভবসিন্ধুকে আমরা বিদায় করিনি। সে এখনও বাসায় আছে। তাতে শীতের লেপ-কম্বল তুলে রাখা হয়। আর প্রত্যেকবার বসন্তকালে ভবসিন্ধুর দরজাটা খুলে রাখি। পাশের বাড়িতে রূপসী নামে মেনিবেড়াল আছে, সে বছরে দিন পনেরোর জন্যে ব্যবহার করে প্রসূতিসদন হিসেবে ভবসিন্ধুর একটা তাক।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথই তো লিখেছিলেন,

> কোনোদিনও এত বুড়ো
> হবো নাকো আমি,
> হাসি তামাসারে যবে
> কবো ছ্যাবলামি

ভয়ে ভয়ে এই উদ্ধৃতিটা দিলাম। উদ্ধৃতি দিতে গেলে মূল বই খুঁজে শুধু বানান বা শব্দ নয়, কমা-সেমিকোলন পর্যন্ত মিলিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু জ্ঞানগম্যির মতো এই তরল দ্রুত লেখায় তার অবসর কোথায়। মাথায় কিংবা কলমে যা আসে, যা মনে পড়ে প্রাণের আনন্দে তরতর করে লিখে যাই। মেলানো বা সংশোধনের অবকাশ মেলে না। সুধী সাবধান! এই তুচ্ছ রচনার ত্রুটি ধরবেন না।

ঝলমল করে একশো পঁচিশটা বছর পার হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। একশো পঁচিশ বছর সোজা কথা নয়। আজ যদি কেউ কোনও ভাল বা বড় কোম্পানির একশো টাকার ডিবেঞ্চার কেনে পাঁচ বছরে সেটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এইভাবে বেড়ে গেলে একশো টাকা একশো পঁচিশ বছরে বহু কোটি টাকার অবিশ্বাস্য একটি অঙ্কে পরিণত হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অঙ্কের হিসেবে যাওয়া ঠিক হবে না, বরং হালকা আলোচনায় থাকাই নিরাপদ।

বলা বাহুল্য, শতবার্ষিকীর বছরে যে রকম উত্তেজনা, উন্মাদনা, সভাসমিতির ধুম পড়েছিল একশো পঁচিশ বছরে ঠিক তেমন দেখা গেল না। এর মানে অবশ্য এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেছে, তা মোটেই নয়। কিন্তু সেই শতবার্ষিকীর বছরে সিনেমা-নাটক, গান-কবিতা, উৎসব-অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে যে বৃহৎ কাণ্ড হয়েছিল এবার তা হল না।

মনে আছে, সে বছর উত্তর কলকাতায় এক ক্ষৌরকারের চুল কাটার সেলুনে সাইন বোর্ডের নীচে বিশাল ফেস্টুন টাঙানো হয়েছিল, 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার এই বহুমুখস্থ বাক্যটির এখানে চমৎকার অন্য অর্থ। অর্থটি অবশ্যই স্পষ্ট, ক্ষৌরকার মহোদয়ের কাঁচির নীচে সবাইকেই মাথা নিচু করে বসতে হবে চুল কাটার জন্যে, কারোর রক্ষা নেই।

শতবার্ষিকীর সময়কার একাধিক কৌতুককর গল্প শুনেছিলাম স্বর্গীয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে। অতুলনীয় বাচনভঙ্গি ছিল অচিন্ত্যকুমারের, আমার এই অক্ষম কথিকায় তার ছিটেফোঁটাও প্রকাশ পাবে না, তবু বলা যাক।

অচিন্ত্যকুমার আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন এক সরকারি অফিসের রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে, সভাপতিত্ব করতে। বর্ণনা শুনে মনে হয়েছিল অফিসটা সম্ভবত নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের সাততলায় কিংবা আটতলায়। গঙ্গার ধার ঘেঁষে পশ্চিম কিংবা উত্তরমুখী একটা ঘরে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে।

অফিসেরই এক ভদ্রলোকের রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। ভদ্রলোক হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বেশ দরাজ গলায় গান ধরেছেন, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। গান শুরু হতে দেখা গেল ভদ্রলোক শুধু একা নন তাঁর সঙ্গে কোরাসে গান ধরেছেন তাঁরই পিছনে বসা ওই অফিসারটি এবং আরও আট-দশ জন পুরুষ ও মহিলা।

ভালই গান জমেছে, একটা অফিসের অনুষ্ঠানের পক্ষে বেশ ভাল। সভাপতির আসনে বসে অচিন্ত্যকুমার মনোযোগ দিয়ে চোখ বুজে শুনছেন, কোরাস 'বাজাই আমি বাঁশি' পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, হঠাৎ সমবেত আর্ত চিৎকার, 'গেলো, গেলো, ধর, ধর,' চমকে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন অচিন্ত্যকুমার। কী হল, কী হয়েছে কিছুই অনুমান করতে পারছেন না। সবিস্ময়ে দেখলেন ঘরের প্রত্যেকটি লোক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, 'ওই, ওই, ওই যে, ওই যাচ্ছে,' সবাই চেঁচাচ্ছে; আর এরই মধ্যে কয়েকজন দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বাইরে সিঁড়ির দিকে যেখানে লিফট ওঠানামা করছে। লিফট দেরি হচ্ছে দেখে কয়েকজন সিঁড়ি দিয়েই পাগলের মতো ছুটে নেমে গেল।

কীসের কী ব্যাপার অচিন্ত্যকুমার কিছুই বুঝতে পারছেন না, তাঁর জিজ্ঞাসু মুখভঙ্গি দেখে তাঁরই পরিচিত এই অফিসেরই জনৈক টাইপিস্ট যে তাঁকে আজ নিয়ে এসেছে সে এসে অচিন্ত্যকুমারকে বলল, 'গানটা উড়ে গেল।' অচিন্ত্যকুমার যশস্বী লেখক হলেও পেশায় ছিলেন দক্ষ বিচারক। কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বুঝতে পারলেন, হারমোনিয়ামের উপরে একটি পেপার ওয়েট চাপা ছিল টুকরো কাগজে লেখা গানটি, হঠাৎ পাতা ওলটাতে গিয়ে কাগজটা ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, গানটা কারো মুখস্থ নেই, তাই এত হইচই।

ইতিমধ্যে লিফট এবং সিঁড়িবাহিত সংগীতলিপি সন্ধানীরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের কাছে জানা গেছে, 'একদম উড়তে উড়তে মাঝগঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।'

এর পরে সে গান আর হল না। সভাই আর তেমন জমল না। অচিন্ত্যকুমার সেখান থেকে একটু পরে বেরিয়ে এলেন, কাছেই আরেকটা অফিসে যেতে হবে, সেখানকার উদ্যোক্তারা অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় অপেক্ষা করছে।

পরের সভায় কিন্তু এ জাতীয় অঘটন কিছু ঘটল না। প্রথমে একটি মেয়ে গাইল 'হারে রে রে রে।' এর পরে আরেকটি মেয়ে, সেও ওই 'হা রে রে রে রে...', তারপরে আরেকজন, তারপরে, তারোপরে একে একে ক্রমাগত মহিলারা গাইতে লাগলেন, 'হারে রে রে রে রে।'

দ্বাদশ গানের মাথায় দম নিতে অচিন্ত্যকুমার সামনের বারান্দায় গেলেন পায়চারি করতে, একজন উদ্যোক্তা উঠে এসে বললেন, 'স্যার, গান ভাল হচ্ছে না?' অচিন্ত্যকুমার স্পষ্টই প্রশ্ন করলেন, 'সবাই হারে রেরে গাইছে, আপনারা বলেননি তো সংগীত প্রতিযোগিতা।' উদ্যোক্তা ভদ্রলোক তখন বুঝিয়ে বললেন, 'না স্যার, প্রতিযোগিতা নয়। আমাদের অফিসে একটা নতুন মেয়ে এসেছে আজ তিন মাস, ওই যে মেয়েটা প্রথম গাইল, ওর মামার গানের ইস্কুল আছে, ও আসার পরে অফিসের অন্য মেয়েরা ওর কথা শুনে সেই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত সবাই ওই একটাই গান শিখেছে, ওই হারে রে রে রে রে।'

অচিন্ত্যকুমারের পর মহাত্মা শিবরাম চক্রবর্তী। শিবরাম চক্রবর্তীর হাতে আমরা মানুষ হয়েছি, আনন্দবাজারের পাতায় 'অল্প বিস্তর'-এর কলমে আমাদের রসিকতার হাতেখড়ি।

শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে এক অনুষ্ঠানের জন্যে শিবরাম চক্রবর্তীকে নিমন্ত্রণ করতে গেছি, আমার সঙ্গে সেদিন তেমন বেশি ঘনিষ্ঠ নয় এক বান্ধবী। দু'-চার কথার পর হঠাৎ শিবরাম আমাকে বললেন, 'এ মেয়েটি তো চমৎকার। তুমি একে বিয়ে করছ না কেন।' আমি এই প্রশ্নে দিশেহারা, কিন্তু আমার বান্ধবীটি প্রগলভা, তিনি শিবরামকে বললেন, 'ওকে আমার পছন্দ নয়, আপনাকে বেশ লাগছে, আপনিই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিন।' চিরকুমার, চির সপ্রতিভ শিবরাম স্মিত হেসে বললেন, 'কিন্তু ভাই, সে তো হবার নয়, আমি যাকে বিয়ে করব সে তো ঝরিয়ায় চলে গেছে।' বান্ধবীটি অবাক হয়ে বললেন, 'ঝরিয়া?' শিবরাম বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না, "ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া"।'

অতঃপর শেষ কাহিনী। শেষ কাহিনীটি বোম্বাই মার্কা। কয়েক মাস আগে বোম্বাইয়ের একটি ফিল্ম স্টুডিয়োর ম্যানেজারের ঘরে দেখি রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের নানা ফটো। ভাটিয়া ভদ্রলোক এত রবীন্দ্রপ্রেমী দেখে খুব ভাল লাগল কিন্তু তিনি যা বললেন তা একটু অন্যরকম। সিনেমায় একেকরকম চরিত্রে একেকরকম দাড়ির জন্যে মেকআপ-ম্যানকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারেন সেই জন্যেই কবিগুরুর এই নানা বয়সের ছবিগুলি টাঙানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত কাজে লাগবেন তিনি নিজেই কি জানতেন?

...বাচ্চা

বোধহয় পৃথিবীর সব ভাষাতেই গালাগালের একটা অঙ্গ হল প্রতিপক্ষকে কোনও জন্তুর সন্তান বলে সম্বোধন বা অভিহিত করা। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় শুয়োরের বাচ্চা কথাটি একটি অত্যন্ত চালু অশালীন গাল। কুত্তার বাচ্চাও চলে।

অবশ্য পিগ অথবা সন অফ এ বিচ (কুত্তির বাচ্চা) রূপে এ দুটি গালাগালে ইংরেজ এবং মার্কিনিরাও বেশ রপ্ত।

এই কুত্তির বাচ্চা বা সন অফ এ বিচ গালটি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মহামতি রোনালড রিগান সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বিপাকে পড়েছেন।

সেই বিপাকের প্রশ্নে যাওয়ার আগে এই বাচ্চাজড়িত গালের ব্যাপারটা একটু ছুঁয়ে যাই। কাউকে যদি বাঘের বাচ্চা বা সিংহের বাচ্চা বলা হয় সেটা হবে প্রশংসাব্যঞ্জক। যাকে বা যার উদ্দেশে বলা হবে সে হয়তো খুশিই হবে।

অন্যদিকে কুকুর মানুষের এত উপকারী এবং প্রিয় জন্তু অথচ কোনও কুকুর প্রেমিককেও যদি কুকুরের বাচ্চা বলে অভিহিত করা যায়, সে হয় মারবে না হলে মানহানির মামলা করবে। এদিকে কেউ যদি কাউকে বেড়ালের বাচ্চা বলে সে তাতে খুশি হবে না হয়তো কিন্তু রাগও হয়তো করবে না।

রিগান সাহেবের ব্যাপারে আসি।

পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রের কর্ণধারের মতোই মার্কিন প্রেসিডেন্ট খবরের কাগজের লোকদের বিশেষ পছন্দ করেন না। খবরের কাগজের লোকেরা উলটোপালটা প্রশ্ন করে, যা নয় তাই জানতে চায়, বড় বেশি কৌতূহল তাদের। একজন ক্ষমতাবানের পক্ষে এসব সহ্য করা কঠিন।

ফিলিপাইন সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ রিগান সাহেব দাঁত চেপে কোনও একজন সাংবাদিকের উদ্দেশে উচ্চারণ করেন, 'সন অফ এ বিচ।'

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি, যথা রয়টার, এ পি, ইউ পি আই ইত্যাদি তাদের বাঘা বাঘা ব্যক্তিদের পাঠিয়েছিল এইদিন প্রেসিডেন্টের কাছে হোয়াইট হাউসে। সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রে রিগানের এই উক্তি ধরা পড়েছে।

বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বড় অসুখে ভুগে উঠেছেন তদুপরি তিক্ত প্রশ্ন, তাঁর পক্ষে 'কুত্তির বাচ্চা' উক্তি করা খুব অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রবক্তা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে রিগান সাহেব আদৌ ও রকম কিছু বলেননি, তিনি যা বলেছেন তা হল, 'He's sunny and you are rich,' ওই কথাটা ধ্বনি সমতার জন্য 'সন অফ এ বিচ' শুনিয়েছে।

বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যাটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই সূত্রে অনেকদিন আগের একটা গল্প মনে পড়ছে। আমার এক বন্ধু আমাকে গল্পটি বলেছিলেন।

বন্ধুটি তাঁর ছোট কন্যাকে মাত্র কয়েকদিন আগে একটি ইংরেজি মাধ্যম নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। 'এক ছুটির দিনে' সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বন্ধুটি দেখেন তাঁর মেয়ে ইস্কুলের খাতা খুলে ক্লাসের পড়া করছে একমনে। হঠাৎ তাঁর কানে গেল 'সন অফ এ বিচ' শব্দটি। বারবার ওই কুৎসিত শব্দটি উচ্চারণ করছে তাঁর নিষ্পাপ বালিকা কন্যাটি।

ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে কান পাতলেন মেয়ের পড়ায়। দেখলেন অঙ্কের খাতা খুলে মেয়েটি মুখস্থ করছে, সামান্য সাধারণ যোগ অঙ্ক। 'ওয়ান প্লাস টু সন অফ এ বিচ থ্রি', 'টু প্লাস টু সন অফ এ বিচ ফোর'।...ইত্যাদি ইংরাজি বাক্যের প্রত্যেকটিতে ওই অশালীন শব্দমালা। ভদ্রলোক পরের দিনই মেয়ের স্কুলে গেলেন। 'এ কী রকম বিলিতি নামতা, এ সব কী শেখাচ্ছেন আপনারা?'

ভদ্রলোকের মুখে সব শুনে স্কুলের দিদিমণিরাও অবাক। কই এ রকম কিছু শেখানো তো হয় না। বলা উচিত শেখানোর প্রশ্নই আসে না। অনেক তত্ত্বতালাশের পর আবিষ্কার হল, গোলমালটা কোথায়। ক্লাসে শেখানো হয়েছে 'ওয়ান প্লাস টু সাম অফ হুইচ থ্রি' সেটা ছাত্রীর কানে গেছে 'সান অফ এ বিচ।' ইংরেজি 'Sum of which' যদি 'Son of a bitch' হয়ে যায় স্কুলের দোষ কোথায়?

দোষের কথা থাক, বাচ্চা বিষয়ক শেষ গল্পটি বলে ফেলি। গল্পটি গোলমেলে কিন্তু চমৎকার।

প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা বোধ হয়। কলকাতায় তখনও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের যুগ আসেনি। সেটা ছিল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আমল। ডালহৌসি স্কোয়ারে জিপিওর পিছনে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তখন একজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, ভদ্রলোকের উপাধি চৌধুরী, মৈথিলি ব্রাহ্মণ।

একবার সেই ভদ্রলোকের আদালতে এক ব্যক্তিকে বউবাজার থানার পুলিশ চালান দিয়েছে, বউবাজারের একটি মেসে এই ব্যক্তিটি ঘুষি মেরে তার রুমমেটের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে।

আসামিটি আপাত নিরীহ দর্শন, ধুতি পাঞ্জাবি পরা রীতিমতো ভদ্রলোকের চেহারা। হঠাৎ এমন কী উত্তেজনার কারণ ঘটল যে, ইনি একজনের নাক ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দিলেন? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কৌতূহল হল, ব্যাপারটা কী, কী এমন ব্যক্তিগত বিবাদ লোকটিকে আদালতের কাঠগড়ায় আসামি করে ঠেলে দিয়েছে।

আসামিকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসামিটি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'হুজুর, ও আমাকে বাঙালের বাচ্চা বলেছিল।'

অভিযোগটা অকল্পনীয় নয়। উদ্বাস্তুসংকুল কলকাতায় তখন বাঙাল-ঘটির কলহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ব্যাপারটা বুঝলেন, তবু আদালতের খাতিরে আসামিকে নরম করে প্রশ্ন করলেন, 'একজন লোক আপনাকে বাঙালের বাচ্চা বলেছে তাই বলে আপনি তার নাক ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দেবেন?'

আগুনে ঘৃতাহুতির মতো এই প্রশ্নে আসামি একেবারে জ্বলে উঠল, 'হুজুর আপনাকে যদি কেউ ঘটির বাচ্চা বলত আপনি রাগ সামলাতে পারতেন?'

হাকিম মৃদু হেসে বললেন, 'ঘটির বাচ্চা বললে আমি রাগ করতে যাব কোন দুঃখে, আমি তো আর ঘটি নই।'

হাকিমের এই কথা শুনে আসামি উৎফুল্ল হয়ে উঠল, 'তা হলে হুজুর আপনিই বলুন, আপনাকে কেউ বাঙালের বাচ্চা বললে আপনার মাথায় রক্ত উঠে যেত না?'

মৈথিলী ব্রাহ্মণ আবার মৃদু হাসলেন, 'আমি তো বাঙাল নই যে বাঙালের বাচ্চা বললে রাগ করব।'

আসামি এবার একটু বিব্রত এবং চিন্তিত হল। কিন্তু সে হাল ছাড়বার পাত্র নয়, সে গম্ভীর হয়ে হাকিমকে বলল, 'তা হলে হুজুর আপনি যে ধরনের বাচ্চা কেউ যদি আপনাকে ঠিক সেই ধরনের বাচ্চা বলে গালাগাল দেয় তবে আপনি কী করবেন? আপনি ঘুষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে রক্ত বের করে দেবেন না?'

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হাকিম সাহেব উত্তেজিত আসামির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

অতঃপর একটি সরল বাচ্চা কাহিনী দিয়ে এই আপাত অমার্জিত রচনাটি শেষ করি।

ঠিক কাহিনী নয়, একটি কথোপকথন, একটি বাবার সঙ্গে তার বাচ্চার কথোপকথন :

বাচ্চা : বাবা হাতির দুধ কি খুব ভাল?

বন্ধু : তা হবে।

বক্তা : শুনেছ, একটা বাচ্চার হাতির দুধ খেয়ে এক মাসে পাঁচ কেজি ওজন বেড়েছে।

বন্ধু : এক মাসে পাঁচ কেজি? এ তো অসম্ভব!

বক্তা : অসম্ভব হবে কেন? হাতির দুধ খেয়ে পাঁচ কেজি ওজন যে বাচ্চার বেড়েছে, সেটা একটা হাতির বাচ্চা।

পুনশ্চ : বাচ্চা সংক্রান্ত সেই বাজে গল্পটা মনে আছে তো? সেই যে বাস থেকে নেমে ক্যাঙারু মা পকেটে হাত দিয়ে পকেট খালি দেখে হাউমাউ করে উঠেছিল, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার বাচ্চাটা পকেটমার হয়ে গেছে।'

কুকুর কুণ্ডলী

খুব ছেলেবেলায়, কবিরা যাকে বলেন অস্ফুট শৈশবে, একটা কুকুরছানা কোলে নিয়ে আমার একটা ফোটো তোলা হয়েছিল। সব কিছু যে রকম যায়, ঠিক সেই ভাবে সারমেয়-বাহন মফস্বলি নবালকের সেই সাদা-কালো আলোকচিত্রটি কবে কোথায় হারিয়ে গেছে। এমনকী সেই কুকুরছানাটি কী রকম, কী রঙের দেখতে ছিল, কী নাম ছিল কিংবা তার একেবারেই কোনও নাম ছিল কিনা এর কিছুই এতদিন পরে আর মনে নেই।

জমানা বদল হো গয়া। শুধু জমানাই নয়, শুধু সময়ই নয়; স্থান-কাল-পাত্র, জীবন, পরিবেশ সব বদল হয়ে গেছে। কিন্তু ওই কুকুরছানাটি আজও আমার পিছু ছাড়েনি।

আমি যেখানেই যাই একটা না একটা কুকুর আমার জুটে যায়, সে আমার কাছে এসে লেজ নাড়ে, আমার হাত চাটে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র এ রকম হয়েছে। কুকুর বিষয়ে আমার এ রকম অহংকার আমার এক প্রাণের বান্ধবী একটি তির্যক মন্তব্যে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ভুরু কুঁচকিয়ে আমাকে বলেছেন, 'দ্যাখো তুমি যদি কাঁটা চামচে দিয়ে খাও, কিংবা খেয়ে উঠে আর সকলের মতো ভাল করে হাত ধোও, তা হলে কুকুর এসে আর তোমার হাত চাটবে না, হাত চেটে সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়বে না।'

মন্তব্যটি অবশ্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক নয়। আসলে কুকুর ব্যাপারটাই তেমন সম্মানীয় নয়।

এক সাহেব দোকানে কুকুর কিনতে গিয়েছিলেন। কুকুরের দোকানদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুকুর তো কিনছেন, কিন্তু এর যথেষ্ট যত্ন দরকার, আপনার মেমসাহেব কুকুরের যত্ন নিতে জানেন তো।' নিজের নধর-ডাগর ভুঁড়ির ওপর হাত বোলাতে বোলাতে সাহেব বললেন, 'আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন না?'

দোকানের কথাই যখন এল, আরেকটা বিলিতি কুকুরের দোকানের গল্প লিখি। এক ভদ্রমহিলা কুকুরের দোকানে গিয়ে এক জাতের বেঁটে কুকুর দেখে দোকানদারকে বলেন, 'এ কুকুরগুলোর পা-গুলো বড় ছোট ছোট।' দোকানদার বললেন, 'ছোট কী বলছেন? মেজে তো ছুঁয়েছে। পেট থেকে মেজে পর্যন্ত যতখানি লম্বা হওয়া দরকার এর চারটে পা-ই ঠিক ততখানিই লম্বা আছে।'

প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছানোর আগে কুকুর সম্পর্কিত অপমানের আরেকটা কাহিনী বলি; তবে এটা কুকুরের পক্ষে অপমানের না মানুষের পক্ষে অপমানের সেটা বলা অবশ্য কঠিন।

গল্পটা কুকুরের ট্রেনিং নিয়ে। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা তুমি কী করে তোমার কুকুরকে এত ভাল ট্রেনিং দিলে। আমি তো আমার কুকুরটাকে হাজার চেষ্টা করেও কিছুই শেখাতে পারছি না?' এর জবাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরের মালিক বলেছিল, 'দ্যাখো, কুকুরকে কিছু শেখাতে গেলে সর্ব প্রথমে যেটা দরকার সেটা হল যে শেখাবে তাকে অবশ্যই কুকুরের থেকে কিছু বেশি জানতে হবে। তা না হলে তার কাছে কুকুর কী শিখবে?'

অপমান থেকে দংশনে যাই। কুকুরের কামড় নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই।

এক ভদ্রলোক একদা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার কুকুর আজ পর্যন্ত কাকে কামড়াতে বাদ রেখেছে বলুন, আমার শালাকে কামড়িয়েছে। আমার ভগিনীপতিকে কামড়িয়েছে; আমার মেসোমশায়, আমার পিসশ্বশুর, আমার বন্ধু, আমার স্ত্রীর বান্ধবী, ডাক পিয়ন, ডাক্তার, খবরের কাগজওলা, আত্মীয় প্রতিবেশী প্রায় প্রত্যেককে সে কামড়িয়েছে, এমনকী আমাকে, আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত।

যাঁর কাছে ভদ্রলোক দুঃখ করছিলেন, তিনি তখন বললেন, 'তা হলে বলুন সবাইকে আপনার কুকুর কামড়িয়েছে।' কুকুরের মালিক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না মিথ্যা কথা বলব না অবোলা জন্তুর বিষয়ে। অনেককে ও কামড়ায়নি, যেমন সেবার যখন আমার বাড়িওলা চারজন গুণ্ডা পাঠিয়েছিলেন আমাদের ফ্ল্যাট থেকে জোর করে তাড়ানোর জন্যে সেবার আমার কুকুর তাদের দেখে লেজ নেড়েছিল, তাদের হাত চেটে দিয়েছিল। আরেকবার ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা ভুল করে আমাদের বাড়িতে সার্চ করতে এসেছিল, তাদের দেখে আমার কুকুরের কী আনন্দ, তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কী গড়াগড়ি। তারপর সেদিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি চিলেকোঠার জানলার শিক ভেঙে একটা সিঁদেল চোর বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। আর কুকুরটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুব লেজ নাড়ছে চোরটার দিকে আহ্লাদী চোখে তাকিয়ে।'

এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই মনের দুঃখে অতিরঞ্জিত করে তাঁর কুকুরের নিন্দা করেছেন। তবে কুকুরের কামড়ানো নিয়ে একটা গ্রাম্য বাদানুবাদ বহুদিন আগে শুনেছিলাম সেটা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এক ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতির এজলাসে। রামচন্দ্র এসে অভিযোগ করেছে, 'হুজুর শ্যামচন্দ্রের কুকুর আমার পায়ে কামড়িয়েছে।' শ্যামচন্দ্রকে তলব করে আনা হল, 'বলো, তোমার কী বক্তব্য?'

শ্যামচন্দ্র জানাল, 'হুজুর আমার কুকুর রামকে কামড়িয়েছে, ঠিকই, কিন্তু সে জন্যে আমি ওকে দশ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি।'

এবার রামচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে গেলেন, পকেট থেকে দশ টাকার নোটটা বের করে বলল, 'হুজুর আপনিই দেখুন শ্যামের বদমায়েসিটা। শ্যাম একটা অচল নোট দিয়েছে আমাকে।'

এতক্ষণে শ্যামচন্দ্র খাপ খুলল, ক্রাচবাহিত রামচন্দ্রের পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'কিন্তু, হুজুর রামের যে পায়ে আমার কুকুর কামড়িয়েছে রামের সে পাটা তো আসল নয়, সেটা যে কাঠের পা। আপনিই বলুন, আমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছি কি না, কাঠের পায়ে কামড়ানোর জন্যে?'

কুকুরের কামড় নিয়ে আর মাত্র একটি গল্প।

গল্পটি অত্যন্ত পুরনো, যাঁরা আগে শোনেননি বা পড়েননি, শুধু তাঁদেরই জন্যে।

খুবই সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এক ডাক্তারকে তাঁর রোগী ফোন করেছেন রাত এগারোটায়। ডাক্তার অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিরক্ত, তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'জানেন না রাত দশটার পর আমি রোগী দেখি না।' রোগী বললেন, 'সে তো আমি ভালভাবেই জানি, ডাক্তারবাবু, কিন্তু যে কুকুরটা আমাকে একটু আগে কামড়াল সে বোধ হয় জানে না।'

হে মাতাল, অমোঘ মাতাল

ইংরেজি প্রবাদ আছে, পেয়ালা ও ঠোঁটের মধ্যে বহু কিছু ফসকিয়ে যায়। এক বিজ্ঞ মাতাল এই বিখ্যাত প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'তাই আমি আর পানীয় পেয়ালায় ঢালি না, সরাসরি বোতল থেকে মুখে ঢেলে খাই।'

বোতল বা পানীয়ের গল্প কত যে শুনলাম আর পড়লাম, আর তাই নিয়ে ছাই ভস্ম কত কী যে এ যাবৎ লিখলাম কিন্তু এর কোনও শেষ নেই। যাই লিখি না কেন এখন, এর কোনও গল্পই নতুন নয় আবার কোনও গল্পই পুরনো নয়।

প্রথমে সুরেশ আর পরেশের গল্পটাই ধরা যাক। সুরেশ এবং পরেশ দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কৃতবিদ্য মদ্যপ। বহু, বহু, গ্যালন মদ্যপানের পর অবশেষে দু'জনে একদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, আর নয়, আর মদ খাওয়া নয়। ছেড়ে দেওয়া ঠিক করে তারপরে নানা দিক বিবেচনা করে এক বোতল ব্র্যান্ডি সুরেশের কাছে রেখে দেওয়া হল, যদি দু'জনের মধ্যে কেউ কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে ব্র্যান্ডিটা তাঁর কাজে লাগবে।

একদিন কোনও রকমে কাটল, দু'দিনের মাথায় পরেশ আর সহ্য করতে পারলেন না, সুরেশের বাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়ে বললেন, 'ভাই সুরেশ, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। ব্র্যান্ডিটা একটু বার কর তো।' অনুরোধ শুনে সুরেশ করুণ মুখ করে বললেন, 'ভাই পরেশ ব্র্যান্ডি তো আর এক ফোঁটাও নেই। কালকেই আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম পুরো বোতলটা খেয়েও সুবিধে হয়নি, শরীরটা আজও কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে।'

সুরেশ-পরেশের এই কাহিনীটি অবশ্যই কল্পিত, কিন্তু স্বাস্থ্যের সঙ্গে মদের কিছু একটা যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের অজুহাতে মদ্যপান শুরু করে কত লোক যে প্রতিষ্ঠিত মদ্যপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিলিতি মদ্যপানের আরম্ভেই অন্যের স্বাস্থ্যপানের রীতি আছে। এবং সেই জন্যেই সাহেবি নিষেধাজ্ঞা আছে, 'দেখো অন্যের স্বাস্থ্যপান বেশি করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করো না।'

মদের গল্পে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে লাভ নেই। আমার নিজের একটা পুরনো অভিজ্ঞতার কথা বলি।

কয়েক বছর আগে দমদমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন বাগানবাড়িতে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিল। পান ভোজনের অতিরিক্ত অত্যাচার এড়ানোর জন্যে একটু দেরি করেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম গৃহকর্তা তখনই প্রায় বেসামাল। আমরা নিমন্ত্রণ সেরে চলে আসবার অনেক আগেই তিনি দোতলার বারান্দার একপাশে একটা খাটিয়ায় শয্যাগত হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

গৃহকর্তাকে বাদ দিয়েই বেশ অস্বস্তির মধ্যে আমরা আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারলাম। প্রচণ্ড মশা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মশার আক্রমণ বাড়তে লাগল। আমরা চলে আসার সময় দেখলাম ঘুমন্ত গৃহকর্তাকে মশায় ছেঁকে ধরেছে। ভদ্রলোকের খাস ভৃত্য কাছেই ছিল, তাকে বললাম, খাটিয়ার উপরে একটা মশারি টাঙিয়ে দিতে। ভৃত্যটি বলল যে, তার মনিব মশারির নীচে শোয়া পছন্দ করেন না। ভোরবেলা উঠে বিছানায় মশারি টাঙানো দেখলে খেপে যাবেন।

আমি তবু বললাম, কিন্তু মশায় কামড়ে তো শেষ করে দেবে। চতুর ভৃত্যটি এতক্ষণে আসল

কথাটি বলল, 'বাবুকর্তা যখন বাগানবাড়িতে আসেন এই খাটিয়াতেই এইভাবে মশারি ছাড়াই শোন। তাতে তেমন কিছু হেরফের হয় না।' আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে সে জানাল, প্রথম রাতে কর্তা এত বেহুঁশ থাকেন মশা কেন বাঘে কামড়ালেও টের পাবেন না। আর শেষ রাতের দিকে কর্তার মদমিশ্রিত রক্ত সন্ধ্যা থেকে পান করে মশাগুলো এত বেহুঁশ হয়ে যায় যে তারা আর কামড়ায় না।

এ রকম ক্ষেত্রে মদ বন্ধুরই কাজ করে, মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা কম কথা নয়। কিন্তু তবু মদ বন্ধু না শত্রু এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজও হয়নি।

এক পাদরি একবার তাঁর সাপ্তাহিক ভাষণে উপদেশ দিয়েছিলেন শত্রুকে ভালবাসতে। কয়েকদিন পরে শ্রোতাদের একজনের সঙ্গে তাঁর রাস্তায় দেখা, সে এক বোতল হুইস্কি হাতে বাড়ি ফিরছে। তিনি বোতলবাহককে বললেন, 'সর্বনাশ, মদ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছ, মদ তো মানুষের শত্রু।' লোকটি বোতলটাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে পাদরিকে বলল, 'কিন্তু পাদরিসাহেব, আপনিই না সেদিন বললেন, শত্রুকে ভালবাসতে, তাই তো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

বন্ধুত্বের অন্য রকম একটা কাহিনী আছে। এক ভদ্রলোক আগে ব্যারাকপুরে থাকতেন, কিছুদিন হল বাসাবদল করে কলকাতায় চলে এসেছেন। এক শনিবার সন্ধ্যাবেলা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ব্যারাকপুরে গেলেন। যথারীতি আড্ডা, গল্পগুজব, তারপর প্রথমে এক বোতল, পরে আরেক বোতল হুইস্কি আনা হল, ভদ্রলোক আর তাঁর পুরনো তিন-চারজন বন্ধু মনের আনন্দে পুনর্মিলন উৎসব উদযাপন করলেন।

রাত যখন প্রায় এগারোটা, যখন সকলেরই অবস্থা টলমল, লাস্ট ট্রেনের আর দেরি নেই। সবাই মিলে দুটো রিকশা ডেকে চললেন স্টেশনে। তাঁরা যখন স্টেশনে ঢুকেছেন তখন শেষ ট্রেন প্ল্যাটফর্মের থেকে ছাড়ছে। সবাই দৌড় দিলেন ট্রেনের দিকে।

এর পরের দৃশ্য, শূন্য প্ল্যাটফর্মে যাঁর কলকাতায় ফেরার কথা তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, দূরে দ্রুতগতিতে ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর সেই ট্রেনে চলে যাচ্ছেন ব্যারাকপুরের বন্ধুত্রয়, যাঁরা সি-অফ করতে অর্থাৎ বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

মদ্যপানের পর সুষ্ঠুভাবে বিদায় গ্রহণ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। কেউ টলতে টলতে বেরিয়ে যায়, কারও বেরনোর ক্ষমতা থাকে না, কার্পেটের এক প্রান্তে কিংবা সোফার ওপর পা ছড়িয়ে গড়ায়, কেউ অহেতুক ঝগড়া বাধিয়ে গালাগাল করতে করতে এবং ভবিষ্যতে আর কখনও আসবে না জানাতে জানাতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আরও এক ধরনের লোক আছে, তারা খুব আমুদে আর বিলাসী হয়ে পড়ে, এদের কেউ কেউ অন্যের ঘাড়ে বা পিঠে উঠে বেরনোর চেষ্টা করে। আবার এমন মাতালও পাওয়া যায়, অন্যকে ঘাড়ে বা পিঠে তোলাতেই তার আনন্দ। এরা অনেক সময় আনন্দের আতিশয্যে পার্টিস্থ কোনও মহিলাকে কাঁধে তুলতে চায়, তখনই বিপত্তি।

তবে এসব বিপত্তির ব্যাপারে অনেক মদ্যপই যথেষ্ট সচেতন। এক খ্যাতনামা মাতালকে দেখেছি, নাম বলা বারণ, তিনি পার্টিতে এসে দু'পেগ পান করার পরই সবার কাছে 'গুড বাই' 'গুড নাইট' বলে বিদায় প্রার্থনা করেন, খুবই বিনীতভাবে। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'সেকী আপনি এখনই, এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন নাকি?' তিনি মধুর হেসে জবাব দেন, 'না তা নয়, তবে যখন যাব তখন তো আর বিদায় গ্রহণ করার মতো অবস্থা থাকবে না তাই আগেই বিদায়ের ব্যাপারটা সেরে নিচ্ছি।'

শিশুপাল

মহাভারতবিদিত রাজা শিশুপালের শত অপরাধ শ্রীকৃষ্ণ মার্জনা করেছিলেন। অবশেষে অপরাধ সংখ্যা শতাধিক হয়ে যাওয়ায় পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের সময় শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে হত্যা করেন।

মহাভারতের পাঠক এ কাহিনী জানেন। মহাভারত থেকে জ্ঞানগম্যির দূরত্ব অতিশয় বিস্তর, শিশুপালের শতোত্তীর্ণ দোষের উপাখ্যান এখানে বেমানান। রাজা শিশুপাল নন, প্রকৃতই শিশুর পালন (ষষ্ঠী তৎপুরুষে শিশুপাল) নিয়ে এবার আলোচনা।

মুখবন্ধ বেশি না বাড়িয়ে আমার এই শিশুপাল কথামালা সরাসরি শিশুপালন দিয়ে আরম্ভ করছি।

নবীনা জননীরা অনেকেই তাঁদের শিশুটিকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেন। মাতৃদেবীর অননুমোদিত কোনও খাবারই শিশুদের স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। মায়েরা কেউ কেউ এত খুঁতখুঁতে হন যে তাঁদের নয়নের মণিটিকে সদাসর্বদা ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখার চেষ্টা করেন। কেউ শিশুটিকে কোনও খাবার দিতে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না—এমন কী কোলে নিতে গেলেও মায়ের আপত্তি।

এই রকম এক শিশুর মা, যিনি তাঁর সন্তানটিকে সব সময়ে সুরক্ষার কাচের বাক্সের মধ্যে মানুষ করছেন, একদিন তাঁর মনে হল বাচ্চাটির বোধহয় দাঁত উঠছে। বছরখানেক বয়েস হতে চলেছে বাচ্চার, দু'-একটা করে ধারালো দুধ দাঁত এখন তো উঠবেই।

মাতৃদেবী একদিন তাঁর বয়স্কা প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাসিমা, আমার ছেলের তো দাঁত ওঠার বয়েস হল, আমার মনে হচ্ছে, ওর দাঁত উঠেছে, কিন্তু কী করে জানা যায় বলুন তো?' মাসিমা সরলভাবে বললেন, 'দাঁত উঠেছে কিনা জানা আর তেমন কঠিন কী? তুমি ওর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে মাড়ির মধ্যে লাগিয়ে দ্যাখো, দাঁত উঠলে বেশ বুঝতে পারবে।'

এই পর্যন্ত উপদেশদানের পরে সাবেকি সরলমনা মাসিমার হঠাৎ ভ্রুকুঞ্চিতা, উদ্বিগ্না ছেলের মায়ের দিকে নজর পড়ল যে ভাবতেই পারে না যে, তার খোকার মুখে আঙুল দেওয়া সম্ভব।

মুহূর্তের মধ্যে মাসিমা নিজেকে সংশোধন করে নিলেন, বললেন, 'তবে তোমার খোকার মুখে ঢোকানোর আগে তুমি তোমার আঙুলটা গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ো। সাবধানের মার নেই। কখন কীসে যে কী হয় তাতো বলা যায় না।'

এ গল্প ঠিক শিশুকে নিয়ে নয়, শিশুর মাকে নিয়ে। আসল শিশু, যে এর চেয়ে বেশ বড় এবং জীবন্ত ও চলন্ত এবার তার কথা বলি।

অনেকদিন আগে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ব্যাপারটা দেখেছিলাম। রবিবারের এক সকালে বন্ধুর বাড়িতে গেছি আড্ডা দিতে, দেখি বন্ধু মাথা গুঁজে শুকনো মুখে চৌকো ঘর কাটা একটা খাতায় কী সব অঙ্ক করছেন, আর মধ্যে মধ্যে ঘাড় চুলকোচ্ছেন। বন্ধুর সামনের চেয়ারে বসে আছে তাঁর শিশুপুত্রটি। এগুলো তারই অঙ্ক, খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সংখ্যায় অনেক; তা ছাড়া নতুন যুগের নতুন রীতির অঙ্ক, আমাদের সনাতন কায়দায় সেগুলো কষা গ্রাহ্য নয়।

বন্ধুবর আমাকে দেখে একটু মাথা উঁচু করে ক্ষীণ হেসে বসতে বললেন। কিন্তু তাঁর পুত্রটি আমাকে দেখে মোটেই খুশি হয়নি মনে হল, বাবার হোমওয়ার্ক করতে বাধা হবে, সম্ভবত এই ভেবে সে বেশ গম্ভীর।

এরই মধ্যে আরেকটি সমবয়সি ছেলে জানলা দিয়ে উঁকি দিল। বন্ধুর বাড়িটা একতলায়, রাস্তা থেকে জানলা দিয়ে কথা বলা যায়। বাইরের ছেলেটি জানলা বেয়ে উঠে বন্ধু-পুত্রকে একটা রবারের বল দেখিয়ে বলল, 'কী রে আপেল, খেলতে যাবি না? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।'

আপেল অর্থাৎ বন্ধুর শিশুপুত্রটি রীতিমতো বয়স্ক চালে জবাব দিল, 'আমার দেরি হবে। বাবার হোমওয়ার্ক কষে দেয়া এখনও শেষ হয়নি। আমি একটু চোখের আড়াল হলেই বাবা সব ফেলে রাখবে। বাবা যা ফাঁকিবাজ। আর তখন ক্লাসে মার খেতে হবে আমাকে।'

এই শিশুটি যেন ঠিক শিশু নয়, শিশুর গল্পে একে মানায় না। প্রকৃত শিশুর কাহিনী কিন্তু আসলে তার বাবা-মাকে জড়িয়ে, সে উপাখ্যানে শিশুটির ভূমিকা গৌণ।

নিতান্ত প্যারাম্বুলেটরশায়ী দুটি অবোলা শিশুর দুটি ভিন্ন কাহিনী আছে। প্রথম গল্পটি যে ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন তাঁর এ ধরনের গল্প বলার অভ্যাস আছে তাই বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু তিনি হলফ করে বলেছেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং স্বকর্ণে শুনেছেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল লেকের এক প্রান্তে। একটি প্যারাম্বুলেটর এক ভদ্রলোক দ্রুত চালিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁর পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছেন তাঁর স্ত্রী। কিছুক্ষণ ছোটার পরে ভদ্রমহিলা স্বামীকে ধরে ফেললেন, হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'এ কী করছ। এ তো আমাদের বাচ্চা নয়। আমাদের বাচ্চা তো ওই গাছতলায় প্যারাম্বুলেটরে ঘুমোচ্ছে। এ তো অন্যদের বাচ্চা।'

ভদ্রলোক তখনও দ্রুতবেগে প্যারাম্বুলেটর ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতেই জবাব দিলেন, 'তা হোক। এ প্যারাম্বুলেটরটা আমাদেরটার চেয়ে অনেক ভাল।'

পরের গল্পটি কোথায় যেন পড়েছিলাম। স্বামী-স্ত্রী মধ্যাহ্ন ভোজনে গিয়েছিলেন। সেখানে পানাহার সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছেন।

বাড়ির খুব কাছে একটা পার্ক। সেখানে পার্কের গেটের পাশে অনেকগুলো প্যারাম্বুলেটর; গাড়িগুলো দাঁড় করিয়ে আয়ারা বাড়ি ফেরার মুখে নিজেদের মধ্যে জটলা করছে। গল্পগুজব করছে।

হঠাৎ স্ত্রী একটা প্যারাম্বুলেটরের পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীকে বললেন, 'এই তো এটা আমাদের বাচ্চা।' স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী অবাক হয়ে বললেন, 'কী করে বুঝলে?' নির্বিকারভাবে স্ত্রী জবাব দিলেন, 'আয়াটাকে দেখে চিনতে পারলাম।'

শৈশবের সঙ্গে সারল্যের নাকি একটা সম্পর্ক আছে। কথায় বলে, শিশুর মতো সরল। এ কথাটা কিন্তু সব সময় মানা যায় না।

যাঁরা শিশুদের খুব সরল মনে করেন, যাঁরা মনে করেন শিশুরা কিছু বোঝে না, তাঁরা সম্ভবত খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি নন, বরং বলা চলে এই ধরনের চিন্তাকারীরা নিজেরাই শিশু।

আসল শিশুর কথা বলি। তার দিদি জামাইবাবু এসেছে সাতদিনের ছুটিতে বেড়াতে। সে হাজার রকম উৎপাত-আবদার করে সেই দম্পতির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দিদির যথেষ্ট অভ্যাস আছে ভাইয়ের অত্যাচারের ব্যাপারটা, মাত্র অল্প কিছুকাল আগেই তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু জামাইবাবু বেচারি একদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। ক্ষুদ্র শ্যালকের কানটি একটু মলে দিলেন।

এর পরের ঘটনা অবিশ্বাস্য। ক্ষুদ্র শ্যালকটি আর কিছুই করল না। কিন্তু কয়েক দিন আগে বাড়িতে ম্যালেরিয়া হয়েছিল দু'-একজনের, কিছু কুইনিন রয়ে গেছে, সেই সাদা কুইনিনের বড়িগুলো গোপনে সযত্নে গুঁড়ো করে দিদির ফেস পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে দিল।

এ রকম তিক্তস্বাদ সেই নবীন জামাইবাবু তাঁর জীবনে আর কখনও পাবেন কি না, জীবনে আর কখনও তিনি কোনও শিশুকে কান মলতে বা অন্যভাবে শিক্ষা দিতে যাবেন কি না, তা বলা কঠিন।

ভোজনালয়

প্রথমেই অনেকদিন আগেকার একটা রদ্দি গল্প বলে নিচ্ছি। ঘটনাটা প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার, কিন্তু এখনও ভুলিনি, বোধহয় কখনওই ভুলব না।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় শেয়ালদার কাছে একটা মাঝারি রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা মাংসের কাটলেটের অর্ডার দিয়েছিলাম। কিন্তু বেয়ারা কাটলেটটি পরিবেশন করবার পর খাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি সেটা ভয়ংকর শক্ত। ছুরি-কাঁটা দিয়ে নানাভাবে নানা কায়দায় বিপুল প্রয়াস চালানোর পর ঘামতে ঘামতে বুঝতে পারলাম কাটলেটটি দুর্ভেদ্য; ঢাল বা বর্ম বানানোর জন্যে এ জিনিস চমৎকার কিন্তু গলাধঃকরণ করা অসম্ভব।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলাম, কাটলেটটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম, 'এ জিনিস খাওয়া যাবে না। এটা ফেরত নিয়ে যাও।'

বেয়ারাটি অনেকক্ষণ আমার কাটলেটটি ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করল। তারপর আপত্তি জানাল, 'না স্যার, এটা ফেরত নেয়া যাবে না।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ফেরত নেয়া যাবে না?' বেয়ারাটি অম্লানবদনে বলল, 'স্যার এটাকে আপনি একদম বেঁকিয়ে ফেলেছেন, এটা তো আর ফেরত হবে না।'

এই ঘটনার পর বহুকাল কোনও রেস্তোরাঁয় মাংসের কাটলেট অর্ডার দিতে সাহস করিনি। তবুও আরেকবার আরেকটা গণ্ডগোল হয়েছিল। ওই শেয়ালদা এলাকারই একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বলি, 'ফিশ ফ্রাই দাও।' বেয়ারা বলে, 'মাছ ভাল হবে না, তার চেয়ে মাংসের কাটলেট দিই।' আমি বললাম, 'না মাংসের কাটলেট নয়। ফিশ ফ্রাই দেবে।' লোকটি কিছুতেই রাজি হচ্ছে না দেখে, হেড বেয়ারাকে ডেকে বললাম, 'আমাকে একটা ফিশ ফ্রাই দিতে বলো।' হেড বেয়ারা বলল, 'তার চেয়ে মাংসের কাটলেট নিন।'

বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেও হেড বেয়ারাকে ফিশ ফ্রাই দিতে রাজি করাতে পারলাম না। তখন উঠে রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সাহেবের কাউন্টারে গিয়ে বললাম, 'দেখুন আমি বারবার ফিশ ফ্রাই চাচ্ছি আর আপনার বেয়ারারা আমাকে মাংসের কাটলেট দিতে চাচ্ছে। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

ম্যানেজার সাহেব চোখ থেকে চশমা নামিয়ে আমাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'মাংসের কাটলেট খারাপ কী? ফিশ ফ্রাই জোর করছেন কেন?' এরপরেও আমি আরেকবার কী ভরসায় ফিশ ফ্রাইয়ের আবেদন জানিয়েছিলাম তা বলতে পারব না, কিন্তু এর পরিণতি যা ঘটল তা রীতিমতো ভয়াবহ।

ম্যানেজার সাহেব, হেড ওয়েটার এবং প্রথম ওয়েটারটি পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিজেদের মধ্যে কী এক নিঃশব্দ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল, তারপর ম্যানেজার সাহেব আমাকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চালাকি করবেন না। আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনি কার কাছ থেকে এসেছেন আর আপনি কার লোক।'

ম্যানেজার সাহেবের কথার আমি মাথামুণ্ডু কিছুই অনুধাবন করতে পারলাম না। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। হেড ওয়েটার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ম্যানেজার সাহেবকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'স্যার

আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম গঙ্গাবাবু একে পাঠিয়েছে, এ নিশ্চয় গঙ্গাবাবুর লোক।'

কে গঙ্গাবাবু? কেন তিনি আমাকে এখানে পাঠাবেন? এসব প্রশ্ন আমার মনে উদয় হওয়ার আগেই রেস্তোরাঁর ওয়েটাররা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে রাস্তায় নামিয়ে দিল। পেছন থেকে ম্যানেজার সাহেব উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'খেতে এসেছ না গোলমাল পাকাতে এসেছ? গঙ্গারামকে বলে দিয়ো চালাকি করে বিশেষ সুবিধে হবে না।'

গঙ্গারামকে কোনওদিন এসব কথা আমার বলা হয়নি। কারণ, তার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি, তাকে আমি চিনিই না।

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক রেস্তোরাঁর বেয়ারাকে খুব ভাল বখশিস দেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি যে বেয়ারাকে এত বখশিস দেন, তাতে আপনার কী লাভ হয়? আপনার কাটলেটটা কি আমাদের চেয়ে কম শক্ত হয়?'

ভদ্রলোক অতিশয় বিজ্ঞ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তা নিশ্চয় হয় না। কিন্তু বেয়ারা কাটলেট কাটার জন্যে আমাকে যে ছুরিটা দেয় সেটাই রেস্তোরাঁর একমাত্র ধারালো ছুরি। বাকিগুলো সব ভোঁতা, তাই আপনারা কাটতে পারেন না।'

খারাপ খাবার নয়, রেস্তোরাঁর সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিস হল দেরি করা। বহু জায়গায় অর্ডার নিতেই ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। আর একবার অর্ডার দিলে খাবার না আসা পর্যন্ত বন্দি, উঠে চলে যাওয়ার উপায় নেই।

ধৈর্য না হারানোর একটা কাহিনী বলি। এক ভদ্রলোক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পরে এক বেয়ারা এক গেলাস জল এনে তাঁর সামনে রেখে উধাও হল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ভদ্রলোক তাকে ধরে একটা মেনু চাইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে তেল-হলুদ-মশলা মাখা একটা মেনু টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বেয়ারা আবার নিরুদ্দেশ। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে ভদ্রলোক তাকে কবজা করে একটা স্যুপের অর্ডার দিলেন। স্যুপের অর্ডার নিয়ে যখন বেয়ারাটি আবার দ্রুত বিদায় নিচ্ছে, ভদ্রলোক তাকে ডাকলেন, ডেকে পকেট থেকে দুটো পোস্টকার্ড বার করে বললেন, 'তোমার দিতে যদি খুব দেরি হয় চিঠি দিয়ে জানাবে, না হলে খুব চিন্তায় থাকব।'

ভদ্রলোক চিন্তায় থাকুন ইতিমধ্যে মেনুর প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলে নিই। এটি একটি দাম্পত্য আলাপ।

স্বামী বেচারি মেনু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন, হঠাৎ স্ত্রী বললেন, 'ওগো মেনুটা কি উর্দুতে ছাপা নাকি?' স্বামী বললেন, 'কেন?' স্ত্রী বললেন, 'তাহলে তুমি যে ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়ছ।' স্বামী বেচারার দোষ নেই, মহামূল্য সব খাবার, ডানদিকে তার দাম দেখে তারপর বাঁয়ে দেখছেন কী জিনিস।

অবশেষে একটা মধুর গল্প দিয়ে ভোজনালয় থেকে বেরোচ্ছি।

বহুদিন আগে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফি হাউসে একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তখন চিনির এবং দুধের পটে আলাদা করে চিনি এবং দুধ দিত, এখনও হয়তো দেয় তবে অনেককাল ওদিকে যাইনি তাই বলতে পারব না। সে যা হোক আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে এক অচেনা ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি চিনির পট থেকে কম-সে-কম দশ থেকে বারো চামচ চিনি নিয়ে নিজের কফির পেয়ালায় ঢাললেন। তারপর চামচে দিয়ে চিনিটুকু না গুলে কফিটা খেতে লাগলেন। আমি অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম এতক্ষণ, শেষে আর থাকতে না পেরে ভদ্রতার সাধারণ সীমা লঙ্ঘন করে ভদ্রমহোদয়কে বললাম, 'চিনিটা গুলে নিলেন না?' ভদ্রমহোদয় মুখটা বিকৃত করে বললেন, 'বেশি মিষ্টি একদম খেতে পারি না।'

বাড়ি ভাড়া

আজকাল আর কেউ হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না কিন্তু এই কলকাতা শহরেই একদা প্রায় বিনা আয়াসে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত। তখনকার শহরতলি ঢাকুরিয়া বা দমদমেই শুধু নয়। শ্যামবাজার এবং ভবানীপুরে, এমনকী নতুন গড়ে ওঠা বালিগঞ্জে বা নিউ আলিপুরে বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল না।

সুন্দর, খোলামেলা, দক্ষিণমুখী বাড়ির দোতলার রেলিংয়ে অথবা একতলার বারান্দায় নোটিশ বা সাইনবোর্ড লাগানো থাকত, 'টু লেট' (To let), অর্থাৎ 'ভাড়া দেওয়া হবে'। বাড়িওলা অধীর প্রতীক্ষা করতেন ভাড়াটের জন্যে। হবু ভাড়াটেকে কনে দেখানোর মতো যত্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ি, পাড়া ও প্রতিবেশীর গুণাবলি বর্ণনা করতেন বাড়ির মালিক।

সেই সব চমৎকার দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন এই শহরে একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়া অসম্ভব। বাড়ি, ফ্ল্যাট, এমনকী ছোট এক চিলতে ঘর, গ্যারেজের উপরে দমবন্ধ, অন্ধকার কুঠুরী—হাজার ছুটোছুটি, ধরাধরি করে মাথা গোঁজার সামান্য জায়গাও এখন আর পাওয়া যায় না।

সেই সব দিন নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। সেদিন আর ফিরে আসবে না।

শুধু ভাল বাড়ি বা বসবাসযোগ্য ফ্ল্যাটের যে এখন অভাব তাই নয়, ভাল ভাড়াটেও আজকাল আর পাওয়া যায় না। কলকাতার হাজার হাজার বাড়িতে এখন বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের অহর্নিশি সংগ্রাম চলেছে। সে সংগ্রাম কখনও থানা, কখনও আদালত পর্যন্ত গড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বাড়িওয়ালা নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, 'ভাড়াটে সমেত বাড়ি বিক্রয়'।

এই 'ভাড়াটে সমেত বাড়ি বিক্রয়' ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এই রকম একটা ভাড়াটে সুদ্ধ বাড়ি এক ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি ক্রয় করেছিলেন, সে বাড়িতে দু'-ঘর ভাড়াটে ছিল। ক্রেতা ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছিল তিনি ভাড়াটে সমেত বাড়ির দাম দিয়েছেন, সুতরাং বাড়ির ভাড়াটেদেরও তিনি ক্রয় করেছেন। সবচেয়ে বিপদ হয় যখন এক ঘর ভাড়াটে উঠে যাচ্ছে তখন তিনি তাতে খুশি না হয়ে সেই ভাড়াটেদের বাধা দিয়েছিলেন চলে যাওয়ায়, বলেছিলেন, 'তোমাদের সুদ্ধু এই বাড়ি আমি কিনেছি। এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

তবে সব বাড়িওয়ালা উপরের আখ্যানের ভদ্রলোকের মতো নন। তাঁদের অধিকাংশেরই বিচার-বিবেচনা প্রবল।

কথিত আছে, এক ভাড়াটে ভরা বর্ষার দিনে বাড়ির মালিকের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে ছাদ দিয়ে জল পড়ে। তাতে নাকি বাড়ির মালিক ভুরু কুঁচকিয়ে বলেছিলেন, 'ছাদ দিয়ে জল পড়বে না কি লেমনেড পড়বে?'

আসল ঘটনা কিন্তু মোটেই সে রকম নয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। এমন একটি বাড়িতে আমাকে কিছুকাল বসবাস করতে হয়েছিল, যে বাড়িতে ছাদ দিয়ে জল পড়ে, কল দিয়ে জল পড়ে না। একদিন গৃহস্বামীকে সেকথা জানালাম। তিনি কলের জলের কথায় কান দিলেন না, কিন্তু ছাদ দিয়ে জল পড়ার কথায় একটি চমৎকার স্তোকবাক্য দিলেন, মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? সব সময় তো আর জল পড়ছে না।

শুধু যখন বৃষ্টি হবে তখন ওই একটু আধটু পড়বে।'

উক্ত গৃহস্বামী অবশ্যই নমস্য ব্যক্তি। এবার একজন নমস্য ভাড়াটের কথাও বলি, এই ভদ্রলোকের কথা ইতিমধ্যে কোথায় যেন বলেছি, তবু তাঁকে বাদ দিয়ে এই প্রসঙ্গ লেখা যায় না।

এই ভাড়াটে ভদ্রলোককে আমি দীর্ঘকাল ধরে চিনি। কয়েকদিন আগে বাজারে দেখা। দেখি তাঁর হাতে আট-দশটা ইঁদুর ধরার বাক্স। বাজার থেকে তিনি বেরচ্ছেন, আমি প্রবেশ করছি, তিনি আমাকে দেখে একটু দাঁড়ালেন, প্রশ্ন করলেন, 'দাদা, আরশোলা কী করে ধরা যায়?'

আমি একটু অবাক হয়ে তাঁর হাতে ইঁদুর-ধরার বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

ভাড়াটে ভদ্রলোক বললেন, 'দাদা আমি সল্টলেকে বাড়ি করেছি, সেখানে চলে যাচ্ছি, এই শনিবার।'

আমি নির্বোধের মতো জানতে চাইলাম, 'সল্টলেকে আরশোলা দিয়ে কী করবেন?' ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'সল্টলেকের ব্যাপার নয়। আপনাদের পাড়ার ব্যাপার। যখন এসেছিলাম সেই সাড়ে সাত বছর আগে, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল আমার, ফ্ল্যাট যে অবস্থায় নিচ্ছি সেই অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। কোনো অদল-বদল, ব্যতিক্রম চলবে না।'

এর পরেও আমি সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে না পারায় ভাড়াটেমশায় বললেন, 'আমি ফ্ল্যাটে ঢুকে গোটা চল্লিশেক ইঁদুর আর শ দুয়েক আরশোলা পেয়েছিলাম। সেগুলো বহু কষ্ট করে তাড়িয়েছিলাম। কিন্তু এখন যাওয়ার সময়ে চুক্তি খেলাপ করতে পারি না। তাই ইঁদুর আর আরশোলা জোগাড় করছি, ফ্ল্যাটে রেখে যাওয়ার জন্যে।'

বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে ইঁদুর বা আরশোলা অবশ্য কোনও বিচিত্র ব্যাপার নয়। খোদ মার্কিন দেশে একটি রসিকতা আছে যে প্রথম প্রথম মহাকাশযানে যে ইঁদুর পাঠানো হত তার একমাত্র কারণ হল, যে মহাকাশ বিজ্ঞানী এই দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর ফ্ল্যাট ভর্তি ছিল ইঁদুর এবং তিনি কৌশলে এইভাবে ইঁদুরগুলিকে তাঁর বাড়ি থেকে মহাকাশে পাচার করার প্রয়াস করেছিলেন।

বাড়ি ভাড়ার শেষতম কাহিনীটি সত্যঘটনা অবলম্বনে এবং সেই জন্যে কিঞ্চিৎ দুঃখের।

তরুণ চিত্রকর গগনচন্দ্র পাল একটি ছোট ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। তাঁর নিজের ধারণা তিনি খুব প্রতিভাবান, কিন্তু বোধহয় সেই জন্যেই তাঁর আঁকা ছবি-টবি তেমন বিক্রি হয় না। অন্য কোনও আয়ও বিশেষ নেই। ফলে যা হয়, বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে।

বাড়িওয়ালা তাগাদা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। অবশেষে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললেন। একথায় গগনচন্দ্রের বড় রাগ হল, তিনি বললেন, 'জানেন, আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে লোকে আপনার বাড়ি দেখিয়ে বলবে যে এ বাড়িতে বিখ্যাত শিল্পী গগন পাল থাকতেন।'

বাড়িওয়ালা গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'পঁচিশ বছর লাগবে না। আপনি যদি এখনই ভাড়া মিটিয়ে না দেন তবে আজ বিকেল থেকেই লোকে বলবে যে এখানে গগন পাল থাকতেন।'

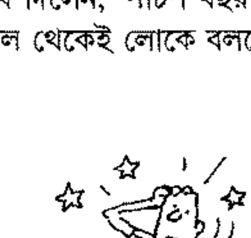

হায় ছবি

জন ওপি, আঠারো শতকের শেষের এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের অসামান্য ইংরেজ চিত্রকর, বিখ্যাত হয়েছিলেন ঐতিহাসিক চিত্রমালা এঁকে। তাঁর তুলির ছোঁয়ায় ইতিহাসের পৃষ্ঠার অক্ষম ঘটনাবলি উজ্জ্বল, জীবন্ত হয়ে উঠত। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার ছবি এত ঝলমল করে, এত জীবন্ত হয়ে ওঠে, আপনি ছবি আঁকার রঙের সঙ্গে কী মেশান?' অহংকারী জন ওপি হেসে বলেছিলেন, 'মাননীয় মহোদয়, আমি আমার ছবি আঁকার রঙের সঙ্গে আমার মাথার ঘিলু মেশাই।'

আমি নিজে বর্ণান্ধ বা রংকানা। হলুদ এবং সবুজের মধ্যে সবসময় পার্থক্য করতে পারি না। অবশ্য ডাক্তারি মতে এটা নাকি খুব অস্বাভাবিক নয়। বর্ণান্ধের সংখ্যা নাকি অনেক, বহু বর্ণান্ধই আছে, যারা জানে না যে রঙের হেরফের, নীল-সবুজের ব্যতিক্রম তাদের চোখে ধরা পড়ে না।

আসলে কিন্তু রঙের হেরফের ধরা খুবই কঠিন কাজ। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাইরের বসবার ঘর রং করাচ্ছিলেন। তিনি কারিগরকে একটি বড় ফুলদানি দেখিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'ঠিক এইরকম রং হবে দেয়ালে। এই ফুলদানিটার সঙ্গে ম্যাচ করে, একদম মিলিয়ে। একটুও যেন এমন-তেমন না হয়।'

ফুলদানিটার রং ছিল এক রকমের আবছায়া স্বচ্ছ নীল, প্রায় আকাশি বলা চলে। কারিগর ভদ্রলোক রং মেলাতে গিয়ে পড়লেন বিপাকে। কত রকম যে রং কতবার মেশালেন, সাদা-নীল, নীল-সাদা, একটু বেগুনি আবার একটু সবুজ সবরকম মিশিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু কিছুতেই ওই ফুলদানির গায়ের রঙের মতো রং তৈরি করতে পারলেন না।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে কারিগর একটি অসাধু কাজ করলেন। যে রংটা শেষ পর্যন্ত বানিয়েছেন সেটা দিয়ে প্রথমে ফুলদানিটা রং করলেন, তারপর ওই ড্রইংরুমের দেয়াল। ঘটনাটা ভদ্রমহিলার অনুপস্থিতিতে ঘটল। যখন মহিলা ফিরে এলেন, তিনি দেয়ালে এবং ফুলদানিতে ম্যাচিংয়ের বাহার দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, কারচুপিটা ধরতে পারলেন না।

রঙের কথা আপাতত থাক। এবার আসল ছবিতে যাই, ছবির প্রদর্শনীতে।

একদা এক চিত্রসমালোচক তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে একটি চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন। যে ভদ্রলোকের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছিল তিনি মনুষ্যমুখের কারিগর। খারাপ-ভাল কয়েক ডজন মানুষের পোর্ট্রেট তিনি ওই প্রদর্শনীতে দেখাচ্ছেন।

হলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে চিত্রসমালোচক তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে অবশেষে এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। বান্ধবী বেচারিনী ইতিপূর্বে ছবি-টবি বিশেষ কিছু দেখেননি। তা ছাড়া আজ একসঙ্গে এতগুলো বাঁদরমুখো, গোরুচোখো, কুকুরকপালী আধামানুষ চেহারার ছবি দেখে তিনি রীতিমতো আপসেট, বিপর্যস্ত। এবার প্রদর্শনীর প্রান্তে এসে দেখা শেষ হয়ে গেছে এই ভেবে ভদ্রমহিলা যেই সামনের দিকে হাঁফ ছেড়ে তাকিয়েছেন অমনিই চমকে উঠলেন, এতক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছিলেন, আর বরদাস্ত করতে পারলেন না, বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হরিবল! সহ্য করা অসম্ভব।' সমালোচক চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, কী হল?'

ভদ্রমহিলা, মানে উক্ত বান্ধবী, সামনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'একবার ভাল করে দ্যাখো। এসব ছবির কোনও মাথামুণ্ডু আছে? এমন ছুঁচোর মতো চেহারা কোনওদিন কোনও মেয়েছেলের হয়?'

বান্ধবী-নির্দেশিত ছবিটির দিকে এক পলক তাকিয়ে চিত্রসমালোচক খুব নরম গলায় বললেন, 'সখী, ভাল করে পর্যবেক্ষণ করো, ওটা কোনও হাতে আঁকা ছবি নয়, ওটা একটা দেয়াল-আয়না, ওতে একটা প্রতিচ্ছবি, তোমার।'

এরপর কী হয়েছিল সেকথা বলা কঠিন। কিন্তু উপরিউক্ত সমালোচক মহোদয় যদি পরিচ্ছন্ন লোক হতেন, তাহলে তাঁর বান্ধবীটিকে উপনিষদের ভাষায় বলতেন, 'আত্মানাং বিদ্ধি। অয়ি ছুঁচোমুখি, নিজেকে জানো, নিজের ছায়াকে চিনতে শেখো।'

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ (এবং কুখ্যাত) অলিভার ক্রমওয়েল তাঁর ব্যক্তিগত চিত্রকরকে, যিনি ক্রমওয়েলের ছবি আঁকতে এসেছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি যেমন, ঠিক তেমন আঁকো। তুমি যদি আমার ক্ষতচিহ্ন আর বলিরেখা বাদ দিয়ে আমাকে আঁকো, আমি তোমাকে এক পয়সাও দেব না।'

খারাপ হোক, ভাল হোক ক্রমওয়েল সাহেব বেশ বড় জাতের মানুষ ছিলেন। নিজের সম্পর্কে সকলের ধারণা এরকম পরিষ্কার থাকে না। নিজের মুখচ্ছবি সম্পর্কে অনেকেরই খুব উচ্চ ধারণা, আয়নার সামনে নানা কায়দায় মুখভঙ্গি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে, আমাদের চেনাজানার মধ্যেই এমন মানুষ-মানুষীর সংখ্যা অনেক।

তা ছাড়া আরেকটা গোলমাল হল এই যে, নিজের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে অনেকেরই উচ্চাশা অপরিসীম। সবাই ছবি-আঁকিয়ে দিয়ে নিজের ছবি আঁকাতে পারে না। অবশ্য আজকাল বইমেলায় বা প্রদর্শনীতে দেখা যায় সামান্য পাঁচ বা দশ টাকা নিয়ে আর্টিস্ট মুখের ছবি আঁকছেন সামনে মূর্তিমান বা মূর্তিমতীকে বসিয়ে।

সে যা হোক, হাতে আঁকা ছবি নয়, ফটোর ব্যাপারে গোলমাল হামেশাই হয়। কালীঘাট মন্দিরের পাশে ফটোর স্টুডিয়োতে যেখানে দু'-চার টাকা বেশি দিলেই ভাড়া করা চশমা দিয়ে বা চাদর কাঁধে ফেলে ফটো তোলা যায় সেখানে ঝগড়া হতে দেখেছি। যাঁর ফটো তিনি বলছেন, 'এ কী কুৎসিত ছবি উঠেছে আমার, এ আমি নেব না।' ফটোগ্রাফার গলা উচ্চগ্রামে তুলে বলছেন, 'ফটো আবার কুৎসিত কী? যেমন চেহারা তেমন ফটো উঠবে তো?'

গোপাল ভাঁড়ের বইয়ে এ বিষয়ে চমৎকার গল্প আছে। গল্পটি বহুবিদিত এবং যতদূর মনে পড়ছে, আমিও আগে লিখেছি।

চিত্রকর পুত্রের গর্বিত পিতা তাঁর বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন ছেলের আঁকা ছবি দেখাতে। একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, 'দেখছ আমার ছেলে কী সুন্দর বাঁদরের ছবি এঁকেছে। বাঁদরের মুখটা দেখছ কীরকম শয়তানিতে ভরা।' পিতৃদেবকে হতবাক এবং পিতৃবন্ধুকে স্তম্ভিত করে দিয়ে চিত্রকর শ্রীমান বললেন, 'না বাবা বাঁদর-টাঁদর নয়, এটা তোমার ছবি।'

অবশেষে ছবি সম্পর্কে আমার নিজের একটা চূড়ান্ত বোকামির ঘটনা বলি। অনেকদিন আগে আমার এক বন্ধুর চিত্রপ্রদর্শনীতে যাই। সেখানে একটি বর্ণাঢ্য ছবি দেখিয়ে বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখছ?' আমি বললাম, 'চমৎকার! দেখে জিবে জল আসছে।'

বন্ধুটি অবাক হলেন, বললেন, 'ছবি দেখে কারো জিবে জল আসে কখনও এমন শুনিনি।'

আমি বললাম, 'এমন সুন্দর ডিমের ওমলেটের ছবি দেখে জিবে জল আসবে না?' বন্ধুটি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'লোভী, এটা কোনও ওমলেটের ছবি নয়, এটা সূর্যাস্তের ছবি।'

জীবনবিমা

সারা জীবনে অন্তত একবারের জন্যেও একটি জীবনবিমা বা লাইফ ইন্সুরান্স করেননি এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবার বিমা করে তার কিস্তি খেলাপ করে সেটাকে পচিয়ে দিয়েছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাও সংসারে অগণ্য।

শখ করে বা সাধ করে কেউ অবশ্য জীবনবিমা করতে চান না। নতুন চাকরি পাওয়ার পরে কিংবা বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে বন্ধু, আত্মীয় বা হিতৈষীর ছদ্মবেশে জীবন বিমার দালাল (মার্জিত ভাষায় এজেন্ট) দেখা দেন। তাঁর উদ্দেশ্য কিন্তু মহৎ। তিনি অনিত্য মানব জীবনের বিপুল অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তাঁর গ্রাহককে দিনের পর দিন প্রাঞ্জলভাবে অবহিত করেন এবং মাসে যৎসামান্য শ দুয়েক টাকা গুণলেই যে দুম করে হঠাৎ মরে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার ন্যায্য অধিকার অর্জন করা সম্ভব, সেই সৌভাগ্যের দিকে গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন।

এবং বহু ক্ষেত্রেই নাছোড়বান্দা এজেন্ট মহোদয় সফল হন। প্রথম দু'-চার কিস্তি প্রিমিয়াম ঠিকই জমা পড়ে, এজেন্ট সাহেব নিজেই সংগ্রহ করে নিয়ে যান কিংবা তাগাদা দিয়ে পাঠিয়ে দেন। এজেন্ট সাহেব এমন ভরসাও দেন যে, চিরকাল তিনি একই ভাবে তাঁর গ্রাহককে সহায়তা করে যাবেন।

দুঃখের বিষয় কোনও এজেন্ট সাহেবই সেই অর্থে অমর নন। কোনও কোনও সময় এই মর পৃথিবী থেকে তাঁর গ্রাহকদের ঢের আগে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। কখনও কখনও তিনি অন্য পেশায় চলে যান, আবার কখনও পাড়া বা শহর বদল করে দূরের মানুষ হয়ে যান। পুরনো গ্রাহকদের তত্ত্ব-তালাশ তাঁর পক্ষে আর করা সম্ভব হয় না।

এদিকে, অভিভাবকহীন গ্রাহক বেচারা তাগিদের এবং আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কার অভাবে, তদুপরি আয়ের চেয়ে ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় কিস্তির খেলাপ করতে থাকেন।

তা হোক, বিমার কিস্তি যত খেলাপ হবে ততই গ্রাহকের ক্ষতি কিন্তু খেলাপ কিস্তির উপরেই নির্ভর করছে বিমার ব্যবসা। যত বেশি গ্রাহক কিস্তি খেলাপ করবে যত বেশি বিমার পলিসি পচে যাবে বা দায়বদ্ধ হয়ে যাবে ততই রমরমা, ততই জমজমাট হবে বিমার ব্যবসা।

এসব অনেক কাল আগের ব্যাপার। তারও আগে এক বিদেশি বলেছিলেন, 'জীবনবিমা করেছ বলে তোমার স্ত্রী হয়তো আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু তোমার বিধবা কিছুতেই আপত্তি করবেন না।'

জীবনবিমা নিয়ে হাজার রকম মজার ছড়া এবং গল্প প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই বিমার এজেন্টদের নিয়ে। সেসব পুরনো গল্প পাশ কাটিয়ে আমরা অনেকদিন পরে একটু তরতাজা গল্পের দিকে যাই।

এক পাড়ায় এক শতায়ু ভদ্রলোকের খুব ধুমধাম করে জন্মের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। সেখানে বহিরাগত এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কী?' তখন স্থানীয় এক ব্যক্তি গরদের ধুতি, রেশমের চাদর শোভিত এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন, 'নগেনবাবুর একশো বছর পূর্ণ হল, তাই আমরা একটু আনন্দ করছি।'

বাইরের লোকটি বললেন, 'আপনারা সবাই এত আনন্দ করছেন, কিন্তু ওই দিকে শুকনো মুখে

করুণ চোখে ওই যে ভদ্রলোক গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন, উনি কে?'

সেই ভদ্রলোক তখন জবাব দিলেন, 'আরে উনি হলেন নগেনবাবুর পঁচিশ বছরের ছোট ভাই খগেনবাবু। নগেনবাবুর যাট বছর বয়েসে একবার মর মর অসুখ হয়। তখন খগেনবাবু নগেনবাবুর নামে একটা জীবনবিমা করেন। সেই থেকে জীবনবিমা খগেনবাবু টেনে চলেছেন, এখন তাঁর নিজেরই পঁচাত্তর বছর বয়েস অথচ নগেনবাবু বহাল তবিয়তে, জীবনবিমার কোনও ফয়সালা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই খগেনবাবুর এ রকম কাহিল অবস্থা।

এ কাহিনীটি যাই হোক পরের কাহিনীটি কিন্তু প্রায় অবিশ্বাস্য।

এক গণ্ডগ্রামে ঘনশ্যাম নামে এক ব্যক্তি একটি জীবনবিমা করেছিলেন, পঁচিশ বছর মেয়াদি বিমা ছিল ঘনশ্যামবাবুর। দীর্ঘ একুশ বছর ধরে মাসে মাসে যথা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়েছেন, কোনওদিন কখনও সামান্য দেরি হয়নি।

যখন বিমার মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র চার বছর বাকি তখন কিস্তির খেলাপ হল। পর পর বেশ কয়েক মাস। সাধারণত জীবনবিমার শেষ পর্যায়ে এ ধরনের খেলাপ ঘটে না। বিমা কোম্পানি সদর থেকে এক চিঠি দিল ঘনশ্যামবাবুর নামে। কেন কিস্তির খেলাপ হল, কীসের অসুবিধে সেই সব প্রশ্ন ছিল সেই পত্রে।

কিছুকাল পরে ঘনশ্যামবাবুর বিধবা স্ত্রীর চিঠি এল, অত্যন্ত দুঃখের সেই চিঠি। চিঠিটিতে বিধবা জানিয়েছেন যে, আজ প্রায় বছর খানেক হল ঘনশ্যামবাবু মারা গেছেন। তিনিই ছিলেন তাঁর সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী। বিধবা প্রথম কয়েকমাস যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিস্তি দিয়ে যেতে, কিন্তু আর্থিক কষ্টের জন্যে এখন আর পারছেন না। কোম্পানি যদি দয়া করে মাপ করে দেন।

চিঠির বক্তব্য শুনে কোম্পানি অবশ্যই খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, বিধবা কোথায় বিমার টাকা দাবি করবে, তা নয় বিমার কিস্তি খেলাপ হয়েছে বলে মাপ চাইছে।

অন্য এক বিধবার গল্প বলি। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তারপর যখন দেখা গেল তাঁর স্বামী তাঁর জন্যে এক লক্ষ টাকার জীবনবিমা রেখে গেছেন, তিনি শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ' কিন্তু ওঁকে আমি এত ভালবাসতাম, উনি আমাকে এমন শূন্য, এমন ফাঁকা করে ফেলে চলে গেছেন, এই একলক্ষ টাকার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও যদি ওঁকে ফিরে পাওয়া যেত—আমি কত সুখী হতাম।'

উপসংহার: একটি দুর্ঘটনা বিমার বিজ্ঞাপন—

"হালিশহরের নরহরি চক্রবর্তী গতকাল সকালে একটি দুর্ঘটনা বিমা করেন এবং সন্ধ্যাবেলাতেই শেয়ালদা স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে উঠে বাড়ি ফিরতে গিয়ে পড়ে গিয়ে সামনের দিকের চারটি দাঁত ভাঙে এবং মাথা ফেটে যায়। এই দুর্ঘটনার জন্যে আজকেই আমাদের কোম্পানি তাঁকে চারশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

আপনিও অবিলম্বে দুর্ঘটনা বিমা করে ফেলুন। নরহরিবাবুর মতো সৌভাগ্য আপনারও তো হতে পারে, নিশ্চয়ই পারে।"

কোন বাণিজ্যে

প্রকৃত ব্যবসায়ী যিনি, তিনি সর্বদাই ব্যবসা করেন। শয়নে-স্বপনে, পথে-ঘাটে সর্বদা, সব সময়ে তাঁর ব্যবসার চিন্তা। এমনকী মৃত্যুর মুহূর্তেও সে চিন্তা তাঁর মাথা থেকে যায় না।

মৃত্যুপথযাত্রী ব্যবসায়ীকে নিয়ে গল্পের অন্ত নেই। একটি পুরনো গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। একজন বড় দোকানদার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁর শেষ নিশ্বাসের মুহূর্ত খুব দূরে নয়। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে সকলের খোঁজ নিতে লাগলেন।

প্রথমে বড় ছেলের খোঁজ পড়ল, 'অমল কোথায়?' অমল মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'এই যে বাবা, আমি এখানে।' অতঃপর বিমল, কমল ইত্যাদি অন্যান্য পুত্রের অনুসন্ধান করলেন, দেখা গেল সকলেই সমান পিতৃভক্ত, শেষ শয্যার পাশে সকলেই দণ্ডায়মান। ছেলেদের রোলকল শেষ হয়ে যাওয়ার পর নাতিদের অনুসন্ধান করলেন বৃদ্ধ। দেখা গেল তারাও সকলেই ওই ঘরের মধ্যে দাদুর কাছেই রয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী এবার ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, একজন মুমূর্ষুর পক্ষে যতটা কণ্ঠস্বর বাড়ানো সম্ভব তার থেকে বেশি বাড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে? তা হলে দোকানে কে রয়েছে? তোমরা সবাই দোকান খালি করে এখানে চলে এসেছ? আমার মরার পরে ব্যবসা তো লাটে উঠবে দেখছি।'

আরেক মৃত্যুপথযাত্রীর কাহিনী জানি, সেটি কিঞ্চিৎ বীভৎস রসের। এক ব্যবসায়ী তাঁর অংশীদারকে খুন করেছিলেন। আদালতের বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের দিন জেলখানার এক কর্মচারী কথায় কথায় তাঁকে বলে যে, কাল তাঁর ফাঁসি দিতে সরকারের প্রায় পাঁচশো টাকা খরচ হবে। শুনে সেই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যবসায়ী জানতে চাইলেন, 'এত কেন?' তখন সেই কারাকর্মী হিসেব দিয়ে বললেন, 'জল্লাদ আর তার সহকারীরা পাবে তিনশো টাকা, দড়ি ও অন্যান্য ফাঁসির সরঞ্জাম, ফাঁসিকাঠে তেল লাগানো ইত্যাদি বাবদ একশো টাকা, আপনার ফাঁসির পোশাক, মুখ ঢাকা কালো কাপড় এসব বাবদ আরও একশো।'

খরচের বর্ণনা শুনে ব্যবসায়ী রীতিমতো স্তম্ভিত। তিনি বহুক্ষণ ধরে গম্ভীরভাবে কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'জেল কর্তৃপক্ষ যদি একটা দড়ি আমাকে দু' টাকা দিয়ে কিনে দেয় আর আমাকে একশো টাকা দেয়, তাহলে আমি নিজেই গলায় দড়ি দিতে পারি, আমারও কিছু লাভ হয়, সরকারেরও কিছু সাশ্রয় হয়।'

ব্যবসার বিষয়ে বলতে আরম্ভ করে চলে গেলাম একেবারে জেলখানার ভিতরে ফাঁসির কাঠগড়ায়। এসব বীভৎস ব্যাপার পরিত্যাগ করে এবার আসল ব্যবসার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

ধর্মতলার মোড়ে দু'জন ফলওয়ালা পাশাপাশি বসে। যে সময়ের যে ফল, বর্ষায় পেয়ারা, গরমে আম, শীতে কমলালেবু দু'জনে একই রকম ফল বেচে। শুধু একই রকম ফল নয়; দু'জনের ফলের বর্ণ, গন্ধ, আকার, আয়তন সর্বদাই একরকম, দেখে মনে হয় যেন একই ঝুড়ির ফল দু'জনে ভাগ করে বেচছে। কিন্তু গোলমাল রয়েছে এক জায়গায়, দু'জনের দাম দু' রকম। একজন মোটা, কালো তার নাম মোটা মিঞা তার ফলের দাম সর্বদাই চড়া, এক কাঠি ওপরে। দ্বিতীয় জন রোগা, ফর্সা, তার নাম পাতলা খাঁ। তার দাম কম। একই রকম দেখতে একই সাইজের ল্যাংড়া আম মিঞাসাহেব দশ টাকার এক পয়সা কম দামে দেবেন না। ওপাশে খাঁ সাহেব সেই একই আম আট টাকা, সাড়ে

সাত টাকায় বেচছেন। সুতরাং খাঁ সাহেব যখন রমরমা ব্যবসা করছেন, তখন মিঞা সাহেবের ভাঁড়ে মা ভবানী অর্থাৎ বিক্রিবাটা শূন্য। দু'-এক ঘন্টার মধ্যে আম হোক, পেয়ারা হোক বা কমলালেবু হোক, খাঁ সাহেবের সমস্ত ফল উড়ে যাচ্ছে আর মিঞা সাহেব তখনও চড়াদাম হেঁকে খদ্দের তাড়াচ্ছেন।

মিঞা সাহেব কেন এমন করছেন, তাঁর এতে লাভ কী? আসলে মিঞা সাহেব বোকা লোক নন। তাঁর আর খাঁ সাহেবের একই ব্যবসা, দু'জনেই সমান অংশীদার। মিঞা সাহেবের দাম বেশি বলেই খদ্দেররা চটপট শস্তায় একই ফল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে কম দামে কিনে নেয়। খাঁ সাহেবের ফল ফুরিয়ে গেলে তখন মিঞা সাহেব তাঁর ঝুড়ি থেকে আবার অর্ধেক ফল তাঁকে দিয়ে দেন, ব্যবসা জোর জমে ওঠে, মিঞা সাহেব হাঁকতে থাকেন, 'দশ রূপেয়া, দশ রূপেয়া...' পাশেই খাঁ সাহেব আরও জোর গলায় হাঁকেন, 'আট রূপেয়া, আট রূপেয়া...।'

আবার এমন খদ্দেরও জুটে যায় যে দাম বেশি দিয়ে মিঞা সাহেবের ফলটাই কেনে, কারণ তার ধারণা, যা কিছুর দাম বেশি তাই ভাল। এ রকম খদ্দের জুটলে তো কারবারে একেবারে ষোলো আনা লাভ।

একই জিনিস বেশি দামে কেনার ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক গল্প নয়। এটা ক্রেতা মনস্তত্ত্বের একটা বড় দিক। মার্কিন দেশে কিছুদিন আগে একটা সমীক্ষা হয়েছিল। একটা পাঁচ ডলার দামের মাখনের প্যাকেট ঠিক সমান দু' ভাগে ভাগ করে এক ভাগের দাম রাখা হল তিন ডলার আর অন্য ভাগের দাম দু' ডলার। দোকানের তাকে দু' ভাগে অর্ধেক অর্ধেক করে দু' ডলার দাম লেখা এবং তিন ডলার দাম লেখা মাখনের প্যাকেটের অর্ধাংশগুলো সাজিয়ে রাখা হল। দেখা গেল ক্রেতারা অধিকাংশই ওই বর্ধিত মূল্যের তিন ডলারের টুকরোগুলো নিয়েছেন; দু' ডলার দামের ওই একই মাখন তাঁরা নিকৃষ্ট ভেবে এড়িয়ে গেছেন।

আসলে ব্যবসা বাণিজ্য খুব সোজা ব্যাপার নয়। যার হয়, তার এমনিতেই হয়, যার হয় না কিছুতেই হয় না। আবার যার আজ হয় তার হয়তো কাল হয় না। ব্যবসায় সফল হওয়ার যেমন অনেক অঙ্ক অনেক হিসেব আছে তেমনই আবার কখনও কোনও অঙ্ক কোনও হিসেবই মেলে না। উনিশশো পঁচাশির হিসেব উনিশশো ছিয়াশিতে মেলে না, রামবাবুর অঙ্ক আর শ্যামবাবুর অঙ্ক মিলতে চায় না। দুইয়ে আর দুইয়ে মাঝে মধ্যে চার অবশ্যই হয় আবার কখনও শূন্য হয়, অন্য দিকে কারও সৌভাগ্যে বাইশ পর্যন্ত হতে পারে।

কবি বলেছিলেন, 'যাবই আমি/...বাণিজ্যেতে যাবই, তোমায় যদি না পাই তো তবু আর কারে তো পাবই।' কবির পাওনা আর বণিকের পাওনা এক নয়। কবি হয়তো সব অবস্থাতেই কিছু না কিছু পেয়ে যান, কিন্তু বহু পরিশ্রম, বহু ক্লান্তির পরে বালু মরুর তীরে শূন্য হাতে ফিরে আসা মহাজনের সংখ্যা কম নয়।

এই রকম এক একদা-সচ্ছল, এখন সর্বস্বান্ত মহাজনকে এক সন্ধ্যাবেলা দু'জন ছিনতাইকারী রাস্তার মধ্যে ধরেছিল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সেই ব্যবসায়ী লড়ে গেলেন গুণ্ডা দু'জনের সঙ্গে। কিন্তু অবশেষে কাবু হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর শার্টের পকেট থেকে অনেক খুঁজে একটি মাত্র আধুলি পাওয়া গেল, তখন এক নম্বর ছিনতাইকারী দু' নম্বর ছিনতাইকারীকে বলল, 'সর্বনাশ! এর কাছে যদি পুরো একটা টাকাও থাকত, তাহলে আর আমাদের প্রাণে বাঁচতে হত না।'

ডাক্তারের হাতে

ডাক্তার-অন্ত প্রাণ আমার। আমার আত্মীয়েরা ডাক্তার, আমার সহৃদয় প্রতিবেশী ডাক্তার, আমার বন্ধুরা ডাক্তার। অথচ রসিকতা করতে নেমে আমার আপন-পর জ্ঞান মোটে থাকবে না। তা ছাড়া আমার মতো রোগবাতিক, অসুখকাতর ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসক মহোদয়দের মোটেই ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়।

উচিত অনুচিতের প্রশ্ন পরে। নামকরণেই মহা ভুল করে ফেললাম। 'ডাকাতের হাতে' নামে চমৎকার ছোটদের কাহিনীটি নিশ্চয়ই অনেকে ছোটবেলায় কিংবা পরে পড়েছেন। অন্য কিছু নয়। শুধু ধ্বনিমিলের খাতিরে এ-নিবন্ধের নাম দিয়ে ফেললাম। দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও অত্যুৎসাহী দুরভিসন্ধি খুঁজতে যাবেন না।

অবশ্য আমার চেয়েও বিপজ্জনক কাজ অনেকে করেছেন। হাতের সামনে রয়েছে একটি টাটকা কেনা মার্কিনি জোকবুক। (জোকবুক শুনে শুচিবায়ুগ্রস্তা পাঠিকাঠাকরুন দয়া করে নাক সিঁটকোবেন না; জোকবুক আমার সদা শিরোধার্য, জোকবুকই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে)।

ওই মার্কিন জোকবুকে ডাক্তারের একটি চমকপ্রদ সংজ্ঞা দিয়েছে। সংজ্ঞাটি হল,

'ডাক্তার হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আজ তোমাকে হত্যা করবেন যাতে তুমি কাল মারা না যাও।'

এ প্রসঙ্গে একটি পুরনো গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। গল্পটি কখনও স্যার নীলরতন সরকারের নামে চলেছে, আবার কখনও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নামে। গল্পটি চমৎকার কিন্তু যতদূর মনে হয় সত্যি নয়, কিংবা কী জানি হয়তো সত্যি হতেও পারে।

স্যার নীলরতন (অথবা বিধানচন্দ্র) গিয়েছেন এক দরিদ্র রোগীকে দেখতে। শহরতলির শেষ সীমানার একটি ভাঙা টিনের ঘরে রোগীর বাস। রোগীর ঘরের বাইরে টিনের পুরনো রং-জ্বলে-যাওয়া সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'ডাক্তার অমুক চন্দ্র অমুক, এইচ এম বি, প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।'

স্যার নীলরতনের সঙ্গে সহকারী রয়েছে জনৈক তরুণ ডাক্তার। দু'জনে মিলে রোগীর ঘরে ঢুকে রোগীর অবস্থা দেখলেন। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, ঘরের দৈন্যদশা ততোধিক। ভাঙা আয়না থেকে শতচ্ছিন্ন ময়লা বিছানা, সর্বত্র কঠোর দারিদ্র্যের অমোঘ ছাপ।

রোগী দেখা হয়ে যাওয়ার পর স্যার নীলরতন আর তাঁর সহকারী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামতেই রোগীর স্ত্রী তাঁর আঁচল থেকে খুলে ময়লা পুরনো এক টাকা-দু' টাকার নোটে বত্রিশটা টাকা, ডাক্তারবাবুর ভিজিট, স্যার নীলরতনের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু নীলরতন ভিজিট প্রত্যাখ্যান করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়িতে ওঠার পর তরুণ সহকারীটি নীলরতনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার আপনি এখানে ভিজিট নিলেন না কেন?' নীলরতন জবাব দিলেন, 'দেখলাম বড় গরিব, তা ছাড়া ডাক্তারমানুষ, আমাদেরই সম ব্যবসায়ী।' তরুণ চিকিৎসকটি একটু উত্তেজিত হল। সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'স্যার, এ কীসের ডাক্তার? এ তো কোয়াক, সাধারণ একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ, একে আপনি ডাক্তার বলতে পারেন না। আপনিও ডাক্তার, আর এও ডাক্তার?'

তরুণ সহকারীর উত্তেজনা দেখে স্যার নীলরতন মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, 'তফাত খুব বেশি কী?' সহকারী অবাক হয়ে বললেন, 'তফাত নেই।' নীলরতন সরকার বললেন, 'খুব সামান্য তফাত। আমরা রোগীকে হত্যা করি আর এঁরা রোগীকে মরতে সাহায্য করেন।'

এই সূত্রে হাতুড়ে ডাক্তারের বিখ্যাত কাহিনীটি মনে পড়ছে। গল্পটি সুপরিচিত, বাংলা সিনেমাতেও ঢুকে গিয়েছিল।

পাড়াগাঁয়ে এক ভদ্রমহিলার প্রসববেদনা উঠেছে। কাছে পিঠের মধ্যে রয়েছে এক হাতুড়ে, তাঁকেই ডাকা হল। তিনি আঁতুড়ঘর অর্থাৎ রোগিণীর প্রসবকক্ষে তাঁর ডাক্তারি বাক্স নিয়ে ঢুকে পড়লেন এবং ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ দরজার বাইরে তখন আত্মীয় প্রতিবেশীরা অধীর প্রতীক্ষা করছেন। প্রায় দশ মিনিট অস্থির অপেক্ষার পর ডাক্তারবাবু দুম করে দরজা খুলে মুখ বার করলেন, সবাই চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'কী হল ডাক্তারবাবু, ছেলে না মেয়ে?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'এখনও কিছু হয়নি, আগে একটা ছুরি দিন।'

একজন দৌড়ে গিয়ে একটা ছুরি এনে ডাক্তারবাবুকে দিল, ছুরিটি হাতে নিয়েই ডাক্তারবাবু সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সবাইয়ের তখন ভীষণ দুশ্চিন্তা, কী জানি অপারেশন করতে হচ্ছে কি না? এ ডাক্তার পারবে কি না?

কিন্তু সমস্ত দুশ্চিন্তা নিরসন করে আবার ডাক্তারবাবু দরজা খুলে মুখ বার করলেন, কী ব্যাপার, না ওই ছুরিতে হচ্ছে না, একটা বঁটি, দা কিংবা কাটারি হলে ভাল হত। সঙ্গে সঙ্গে একদিক থেকে একজন একটা কাটারি আর অন্যদিকে থেকে আরেকজন একটা বঁটি দ্রুত নিয়ে এসে ডাক্তারকে এগিয়ে দিলেন।

সকলের চিন্তা কিন্তু আরও বেড়ে গেল। এ কী ধরনের সন্তান প্রসব, যার জন্যে কাটারি, বঁটি, দা লাগে। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুর মুখ আবার দরজার পাল্লা গলিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাঁর কপালে ঘাম, মুখে উদ্বেগের স্পষ্ট ছাপ। তিনি কাতর স্বরে অনুরোধ করলেন। 'আপনারা কেউ একটা ভাল হাতুড়ি দিতে পারেন আমাকে?'

ছুরি কাটারি পর্যন্ত তবু সবাই সহ্য করেছিল, কিন্তু হাতুড়ি কী কাজে লাগবে শিশু জন্মের সময়ে, একথা ভেবে প্রায় সকলেই হতবাক হয়ে গেল। সত্যি কী ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে কেউই কিছু বুঝতে পারছিল না।

ঠিক এই সময়ে আঁতুড় ঘরের মধ্য থেকে নবজাতকের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল, সে দিকে দৃষ্টিপাত করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'যাক ভালয় ভালয় বাচ্চাটা জন্মাল। হাতুড়িটা আর দরকার নেই।' বলে ডাক্তারবাবু ঘর থেকে ডাক্তারির বাক্স বার করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তখন সবাই ছেঁকে ধরল 'আপনি হাতুড়ি চেয়েছিলেন কেন? আর এতক্ষণ ছুরি-কাটারি দিয়েই বা কী করলেন?' ডাক্তারবাবু তাঁর হাতের কালো বাক্সটা দেখিয়ে বললেন, 'ওষুধ বার করতে পারছিলাম না। বাক্সটার চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না, বোধ হয় বাসায় ফেলে এসেছি। ছুরি, কাটারি দিয়েও খোলা যায়নি। তাই হাতুড়ি চেয়েছিলাম। যাক ওষুধ দরকার পড়ল না, ভালয় ভালয় বাচ্চাটা হয়ে গেল।' ডাক্তার দ্রুত পদে বেরিয়ে গেলেন।

উপরের হাতুড়ি ও ডাক্তারের এই গল্পটি খুব পুরনো কিন্তু কতদিনের পুরনো, কে জানে। হাতুড়ে ডাক্তার কথাটা কি এই গল্প থেকেই জন্ম নিয়েছে?

অঘটন আজও ঘটে

দুর্ঘটনা ব্যাপারটা আকস্মিক। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা চিরদিনই ঘটে, ঘটে যায়। অসাবধানী ব্যক্তির জীবনে যেমন দুর্ঘটনা ঘটে, খুব সাবধানী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনার কোনও অঙ্ক নেই, তা কোনও হিসেবে আসে না। বাথরুমে পা পিছলে কোমর ভেঙে যেমন তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকা সম্ভব, তেমনই সম্ভব লঞ্চে পিকনিক করতে গিয়ে গঙ্গায় পড়ে যাওয়া কিংবা দ্রুতগামী ট্রেনের সামনের কোচে শায়িত অবস্থায় মধ্য রাতে অন্য লাইনের মালগাড়ির মোকাবিলা করা।

তবু এরই মধ্যে তফাত আছে। দুর্ঘটনার রকমভেদ আছে। কিছু দুর্ঘটনা আছে যা এড়ানো যেত, আবার কিছু আছে যা এড়ানো যায় না।

একটি সাবেকি দুর্ঘটনার কাহিনী এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। গল্পটি পুরনো, কাজির বিচারের আমলের।

রাস্তার ধারের একটা পুরনো বাড়ির ছাদের কার্নিশ সারাচ্ছিল এক রাজমিস্ত্রি। হঠাৎ সে পা ফসকিয়ে এক বৃদ্ধ পথচারীর ঘাড়ে পড়ে যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রাজমিস্ত্রিটির তেমন কিছু হল না, কিন্তু বৃদ্ধ পথিকটি মারা গেলেন।

এর পর বৃদ্ধের পুত্র কাজির আদালতে ওই রাজমিস্ত্রির বিরুদ্ধে নালিশ করল। কাজি সব কিছু শুনে বিচার বিবেচনা করে রাজমিস্ত্রিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পুত্র এতে সন্তুষ্ট হল না। সে জোরাজুরি করতে লাগল যে, 'ন্যায়বিচার হল না, এই রাজমিস্ত্রি ঘাড়ে পড়ায় আমার বাবা মারা গেল, কিন্তু রাজমিস্ত্রির কোনও সাজা হল না। এ কেমন বিচার হল?'

লোকটি যখন নানারকম ওজর-আপত্তি করতে লাগল কাজি তাঁর আদেশ পালটাতে বাধ্য হলেন। তিনি পুনরাদেশ দিলেন যে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি রাস্তার যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, রাজমিস্ত্রি ঠিক সেখান দিয়ে হেঁটে যাবে আর ছাদে যেখানে ওই রাজমিস্ত্রি মেরামত করছিল সেখান থেকে মৃত ব্যক্তির পুত্র অর্থাৎ অভিযোগকারী লাফ দিয়ে রাস্তায় রাজমিস্ত্রির ঘাড়ে পড়বে।

বলা বাহুল্য এর পরের ঘটনা জানা যায় না।

বেশ কিছু কাল আগের কথা—দূর মফস্বলের এক সাপ্তাহিক পত্রে এই রোমহর্ষক সংবাদটি ছাপা হয়েছিল,

'দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা—

গত শনিবার মধ্যরাত্রে স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র পোদ্দার একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হইতে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন। এ অঞ্চলে সমাজবিরোধীদের উৎপাত বাড়িয়া যাওয়ায় পোদ্দার মহাশয় রাত্রিতে শোয়ার সময় মাথার নীচে পিস্তল লইয়া শয়ন করেন।

"শনিবার মধ্যরাত্রে কীসের যেন শব্দে ঘুম ভাঙিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিতে পান জানালার পাশে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বালিশের নীচ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি চালান। গুলির শব্দে বাসাস্থ সকলে জাগিয়া ওঠে এবং আলো জ্বালাইয়া দেখা যায় পোদ্দার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। জানালার পাশে তাঁহার নিজের ছাড়া পাঞ্জাবি ঝোলানো ছিল, তিনি ঘুমঘোরে অন্ধকারে তাহাই কোনও লোক ভাবিয়া গুলি করেন। দেখা যায় পাঞ্জাবিটির বুকের দুই দিক গুলিতে ছিন্ন হইয়াছে।

'সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যদি গুলি চালনার সময় পোদ্দার মহাশয়ের গায়ে পাঞ্জাবিটি থাকিত তিনি অবশ্যই নিহত হইতেন। এই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা অতঃপর তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।'

এই বাজে সংবাদের পর একটি সত্য ঘটনায় যাই। লন্ডন শহরের মেট্রো রেলে যখন প্রথম এসকেলেটর চালু হয় যাত্রিসাধারণ কিছুতেই সেটা ব্যবহার করতে চাইতেন না। তাঁদের ভয় হয়েছিল তাঁরা যদি এসকেলেটরে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হন। অবশেষে যাত্রীদের মন থেকে ভয় দূর করার জন্যে মেট্রো কর্তৃপক্ষ এক খঞ্জ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন, যার কাজ হল ক্রাচে ভর দিয়ে সর্বজনসমক্ষে এসকেলেটরে ওঠানামা করা। এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হল। ক্রাচে ভর করে খঞ্জ ব্যক্তির ওঠানামা দেখে যাত্রীদের এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে ওই লোকটি তার পা হারিয়ে খোঁড়া হয়েছে ওই এসকেলেটরে চড়তে গিয়েই, সুতরাং তাঁরা এসকেলেটরকে আরও এড়িয়ে চললেন।

তবে সব দুর্ঘটনাই যে ঘটে তা নয়। কিছুদিন আগে এক সকালে থিয়েটার রোডের মোড়ে দেখা গিয়েছিল যে এক ভদ্রলোক, তাঁর জামার কলার ছেঁড়া, কপাল ফাটা এবং মাথায় ব্যান্ডেজ, রাস্তা থেকে একটা আধলা ইট কুড়িয়ে তাই দিয়ে নিজের গাড়ির হেডলাইট, কাচ এইসব ভাঙছেন, গাড়ির মাডগার্ড দুমড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারপাশে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেল। সকলের ধারণা, ভদ্রলোক উন্মাদ, না হলে নিজের গাড়ি কেউ এভাবে ভাঙে। ভাঙাচোরা শেষ করে কপালের ঘাম মুছে ভদ্রলোক বিস্মিত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'না দাদারা, আমার মাথা খারাপ হয়নি। কাল রাতে মদ খেয়ে একটু মারামারি করেছিলুম। বাড়িতে বউকে ফোন করে বলেছিলাম গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট করেছি, তাই গাড়িটাকে ভেঙে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। দুর্ঘটনাটা প্রমাণ করতে হবে তো!'

সুপরামর্শ

এই পৃথিবীতে পরামর্শ দেওয়ার লোকের কোনও অভাব নেই, কখনও ছিল না। আপনি যদি একটু কাশেন, বলেন, 'গলাটা কেমন ব্যথা-ব্যথা করছে', সাতজন লোক আপনাকে সতেরো রকম উপদেশ বা পরামর্শ দেবে। সেই পরামর্শের মধ্যে নাক দিয়ে উষ্ণ নুন জল টেনে গলা দিয়ে বার করা থেকে হলুদ পাতা পুড়িয়ে সেই পোড়াপাতার গন্ধ শোঁকা পর্যন্ত বিচিত্র ও অসম্ভব যত নির্দেশ নিহিত। কে কী করে কাকে বোঝাবে যে নাক দিয়ে গরম জল টেনে গলা দিয়ে বার করা সহজ কর্ম নয়, কিংবা হলুদ গাছের পাতা জীবনে চোখে দেখিনি, কোথায় পাওয়া যায় তাও জানি না।

সব সময় সব পরামর্শ অবশ্য সংগত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পাড়াগাঁয়ের এক কৃষকের বলদের পিঠে একটা ঘা হয়েছিল; বিশাল, দগদগে ঘা। বলদটা ক্রমশই কাহিল হয়ে পড়ছিল। এই সময়ে সেই কৃষকের দেখা হল পাশের গাঁয়ের এক কলুর সঙ্গে। কলু ওই কৃষকের জমির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কৃষক ভাবল কলুর বলদ সারাদিন ঘানি ঘোরায়, তারও পিঠে নিশ্চয় ঘা আছে। কৃষক কলুকে তার বলদটা দেখিয়ে বলল, 'ভাই তোমার বলদের পিঠেও কি

এই রকম ঘা আছে?' কলু বলদের পিঠের ঘা ভাল করে দেখে তারপর বলল, 'হ্যাঁ আমার বলদের পিঠেও এইরকম ঘা হয়েছিল।' তারপর একটু থেমে বলল, 'এখন আর নেই।' কৃষক উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘায়ে ওষুধ কিছু দিয়েছিলে? কলু বলল, 'টোটকা ওষুধ দিয়েছিলাম। কলকে ফুলের রসের সঙ্গে ধুতরো ফলের শুকনো বীজ গুঁড়ো করে মলম বানিয়ে লাগিয়েছিলাম।'

কলুর এই পরামর্শ শুনে কৃষকও তার বলদকে ওই টোটকা মলম লাগাল এবং ওই বিষাক্ত মলমে কয়েকদিনের মধ্যেই বলদটি মারা পড়ল। পরের হাটবারে কলুর সঙ্গে আবার কৃষকের দেখা। কলুকে কৃষক বলল, 'তোমার পরামর্শ মতো ওষুধ লাগিয়ে আমার বলদটা যে মারা গেল।' কলু করুণ হেসে বলল, 'ওই ওষুধ লাগিয়ে আমার বলদটাও মারা গিয়েছিল।'

এর পরের গল্পটি ঠিক এ রকম করুণ রসের নয় কিন্তু দৃষ্টান্তযোগ্য।

এক তস্কর কঠোর পরিশ্রম করে এবং গলদঘর্ম হয়ে গভীর নিশীথে এক গৃহে প্রবেশ করতে সমর্থ হল। গৃহস্থ বাড়িতে নেই, তার মূল্যবান দ্রব্যাদি রয়েছে একটি শক্ত লোহার আলমারিতে। তস্কর যখন লোহার আলমারিটা ভেঙে খুলতে যাচ্ছে, দেখল আলমারির গায়ে পরিষ্কার ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, 'অনুগ্রহ করে এই মূল্যবান আলমারি ভাঙবেন না। জোর করে খোলার দরকার নেই। এই পাশে একটা লাল রঙের সুইচ আছে, ওটা টিপলে আলমারি একা একাই খুলে যাবে।'

এই পরামর্শ পাঠ করে এবং কোনো রকম চিন্তা ভাবনা না করে তস্করটি লাল সুইচটা টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার বাড়ি আলোতে ভরে গেল, তীব্রস্বরে সাইরেন বাজতে লাগল, সিঁড়ি দিয়ে, বারান্দা দিয়ে দলে দলে সান্ত্রীরা ছুটে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং তস্করকে গ্রেফতার করল।

পরামর্শ দান ও গ্রহণের আবার অন্য একটি দিকও আছে। এক মনস্তত্ত্ববিদ রোগিণীকে বলেছিলেন, 'যদি কাউকে দেখে মনে বিরক্তি হয় তা হলে পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়ে চলবেন। মন ঠান্ডা থাকবে।'

মাস তিনেক পরে সেই রোগিণীর সঙ্গে রাস্তায় মনস্তত্ত্ববিদের দেখা। মনস্তত্ত্ববিদ বললেন, 'কী হল আপনি তো আর আসেন না।' রোগিণী বললেন, 'সেই যে আপনি বলেছিলেন কোথাও বিরক্ত হলে যাবেন না। আপনার ওখানে আমার এত বিরক্ত লাগে, তাই আর যাই না।'

পরামর্শ বা উপদেশ দেবার অধিকারও থাকা চাই। হজরত মোহাম্মদকে নিয়ে সেই বিখ্যাত গল্পটি এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।

হজরতের কাছে এক ব্যক্তি এসেছেন একটা পরামর্শ নিতে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, লোকটি গরিব, তার মিছরি কেনার পয়সা নেই। কিন্তু তার ছেলে খুব মিছরি খেতে চায়। সে কী করবে? কী করে ছেলের মিছরি খাওয়া বন্ধ করবে।

হজরত লোকটিকে বললেন, 'কয়েকদিন পরে এসো।' কয়েকদিন পরে লোকটি এল, হজরত মোহাম্মদ তাকে বাস্তব পরামর্শ দিলেন কীভাবে ছেলের মিছরি খাওয়া আস্তে আস্তে কমিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

মোহাম্মদ পরামর্শ দেওয়ার পর একজন সঙ্গী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো এই একই পরামর্শ কয়েকদিন আগেও দিতে পারতেন লোকটিকে, যখন ও প্রথমদিন আসে।'

হজরত মোহাম্মদ হেসে বললেন, 'তখন যে আমি নিজেই মিছরি খেতে খুব ভালবাসতাম, খুব মিছরি খেতাম। আমি কী করে অন্যকে মিছরি খাওয়া ছেড়ে দিতে উপদেশ দিতাম?'

অবশ্য আপামর সাধারণ উপদেশদানের ব্যাপারে মোটেই সতর্ক নয়।

একটি কাল্পনিক শোকসংবাদ পড়েছিলাম, বিলিতি হাসির ম্যাগাজিনে।

মিস্টার গুড ওয়াকার

'পথচারীদের জন্যে নির্দেশাবলি' এবং 'সাবধানে পথ চলুন' পুস্তিকাদ্বয়ের লেখক মিস্টার ওয়াকার গতকাল দুপুরে ফ্লিট স্ট্রিটে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছেন।

অন্যকে পরামর্শ দিতে গিয়ে ওয়াকার সাহেব নিজেই মারা পড়েছেন।

পুলিশ

না। যতদূর মনে করতে পারছি, এ পর্যন্ত এই মারাত্মক বিষয়ে আমি একবিন্দু কালিও ব্যয় করিনি।

ইঁদুর থেকে হাতি, মাতাল থেকে ভগবান। ইয়ারকি করার লোভে ভূভারতের যাবতীয় বিষয় ছুঁয়ে দেখেছি। কিন্তু বিনা কারণে, (নাকি অবচেতন মনে সত্যিই কোনও গূঢ় কারণ আছে), পুলিশকে চিরকাল এড়িয়ে গেছি।

সে যা হোক প্রথমেই সরাসরি পুলিশের ব্যাপারে যাচ্ছি না। এমন একটা গল্প দিয়ে শুরু করি যে গল্পে পুলিশ নেই এবং গল্পটা সেই জন্যেই।

ময়দানের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি ভাবে এক ভদ্রলোক শর্টকাট করছিলেন। সময়টা শেষ সন্ধ্যা, চারপাশে লোকজন নেই, নিঝুম শীতের রাতের শুরু। হঠাৎ মাঠের মাঝখানে এক ব্যক্তি ওই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, ওই দিকে কোনও পুলিশ-টুলিশ দেখলেন?' সরলচিত্ত দাদা বললেন, 'না তো, ওদিকে পুলিশ দেখলাম না তো, কেন কী হয়েছে?'

আগন্তুক ব্যক্তিটি এবার বলল, 'না কিছুই হয়নি, এবার হবে।' দাদা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হবে?' পকেট থেকে একটা ছোরা বার করে আগন্তুক এবার স্বমূর্তি ধারণ করে বলল, 'এবার ছিনতাই হবে। নিন, ভাল ছেলের মতো ঘড়ি, আংটি খুলে দিন, পকেট থেকে টাকাপয়সা সব তাড়াতাড়ি বার করুন। না হলে খুনও হবে।'

এ গল্পটা পুরনো, এর মধ্যে পুলিশ নেই বলে এটা দিয়েই আরম্ভ করতে বাধ্য হলাম। এর পরের গল্পটা সদ্য শুনেছি। এ এক পুলিশসাহেবের মুখে শোনা।

পুলিশসাহেবকে একদিন এক ডিউটিরত সান্ত্রী ফোন করলেন রাস্তার পাশের এক ব্যাঙ্ক থেকে, 'স্যার, এই একটু আগে এই ব্যাঙ্ক থেকে একজন টাকা তুলে রাস্তায় বেরনো মাত্র তার কাছ থেকে কয়েকটা লোক রিভলবার দেখিয়ে টাকাটা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে।'

উদ্বিগ্ন পুলিশসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাউকে ধরতে পেরেছ?' টেলিফোনে উত্তর এল, 'একজনকে ধরেছি স্যার। যার টাকা ডাকাতি হয়েছে, তাকে আটকে রেখেছি।'

পুলিশকে নিয়ে রসিকতা করা অবশ্য ঠিক নয়। পুলিশ ঠিক ঠাট্টার পাত্র নয়, বরং বিপরীত দিকে যথেষ্ট সম্ভ্রম এবং সমীহের বিষয়।

এই সেদিন পর্যন্ত কোনও এলাকায় যদি একজন নিরস্ত্র পুলিশ কনস্টেবলও যেত, চারপাশে সবাই শশব্যস্ত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। গ্রাম্য কবি তাঁর গানে পুলিশকে রাজা বানিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু রাজা নয় ভগবান আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পুলিশকে এক করে ফেলেছিলেন। চমৎকার সেই গান, নিশ্চয় অনেকেই শুনেছেন, 'লাল পাগড়ি দিয়ে মাথে, তুমি রাজা হলে মথুরাতে।'

এরও বহুদিন পরে বিখ্যাত পশ্চিমি নাটকের ছায়ানুসারী এক আধুনিক বাংলা নাটকে চমৎকার একটি গান ছিল, যার মধ্যে প্রায় এ রকম একটা লাইন ছিল, 'অর্ধেক দেবতা তুমি অর্ধেক পুলিশ।'

দেবতা প্রসঙ্গে একটা বিলিতি গল্প মনে পড়ছে। দুটি সাহেব শিশু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। প্রথমজন বলছে, 'রোববার উপাসনার দিন। ওদিন কোনও কাজ করতে নেই।' দ্বিতীয়জন বয়েসে কিছু ছোট, সে বলল, 'রোববার কাজ করলে কী হবে?' প্রথমজন তখন বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে জানাল, 'রোববারে যে কাজ করবে সে স্বর্গে যেতে পারবে না।' দ্বিতীয় ছেলেটির বাবা

পুলিশের কাজ করে, সে চিন্তায় পড়ে বলল, 'কিন্তু পুলিশের বেলায় কী হবে, পুলিশকে তো রোববার কাজ করতে হয়। আমার বাবা তো রোববার ডিউটি করে।' প্রথমজন অতি বুদ্ধিমান, সে সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান করে দিল, বলল, 'পুলিশ রোববার কাজ করে, স্বর্গে যাবে না। আর তারেই বা কেন, স্বর্গে তো আর পুলিশের কোনও দরকার নেই।'

পুলিশের ডিউটির একটা অন্যরকম কাহিনী আছে। বোধহয় কাহিনীটি মিথ্যে নয়। এক পুলিশ অফিসারের বাড়িতে মধ্যরাতে চোর ঢুকেছে। পুলিশ অফিসার বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী পাশের ঘরে লোকের পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডেকে তুললেন ঘুম থেকে 'ওগো, শিগগির ওঠো, আমাদের বাড়িতে চোর ঢুকেছে।' বিছানায় পাশ বদলিয়ে স্বামী ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমি কিছু জানি না। আমার এখন ডিউটি নেই।'

বাংলা গল্প-উপন্যাসে ততটা না হলেও বাংলা সিনেমায় পুলিশ নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টা হয়েছে। স্বর্গত জহর রায় কিংবা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত এ জাতীয় দু'-একটি চরিত্র এখনও মনে পড়লে হাসি পায়। মাঝেমধ্যে রাস্তাঘাটে জীবন্ত পুলিশ চরিত্রের মধ্যে সেসবের ছায়া দেখতে পাই।

এককালে বিলিতি হাসির সিনেমারও বিশেষ উপজীব্য ছিল পুলিশ, ভীরু ও গোবেচারা ধরনের চরিত্র ছিল সেটা। একটা দৃশ্য মনে পড়ছে। এক কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জন রাস্তা। রাত এগারোটা, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নায়িকা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময়ে পুলিশ কনস্টেবল মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার বাস যতক্ষণ না আসে আপনার পাশে আমি দাঁড়াচ্ছি। আপনার কোনও ভয় নেই।'

মেয়েটি রীতিমতো সাহসিকা এবং আধুনিকা, সে বলল, 'না, আমি কোনও ভয় পাচ্ছি না। আমার জন্যে আপনাকে দাঁড়াতে হবে না।' এবার পুলিশ বেচারা ভীত সন্ত্রস্তভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখে বলল, 'আসলে আমার কেমন ভয় করছে। আপনি যদি অনুমতি করেন আপনার পাশে আমি একটু দাঁড়াই।'

পুলিশ ও মাতাল নিয়ে মজার কাহিনী অনেক। মাতাল গল্পমালায় তার কিছু কিছু লিখেছি, একটা গল্প লেখা হয়নি। সেটা অবশ্য বোধহয় সবাই জানে। তবু ভুলে যাওয়ার আগে লিখে রাখছি।

এক মাতালকে ধরার জন্যে পুলিশ মাতালের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিল। চেতলা পুলের কাছে এসে মাতালটির দম ফুরিয়ে যায়, পুলিশ তাকে প্রায় ধরে ফেলে। তখন বেগতিক দেখে মাতালটি ডানদিকে ঘুরে কালীঘাট খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। নাছোড়বান্দা পুলিশও তখন খালে নেমে তাকে ধরতে যায়। কিন্তু মাতালটি অতি চতুর। আইনের কূট প্রশ্ন তুলে পুলিশকে সে আটকিয়ে দেয়। সে গলাজলে গিয়ে বলে যে, 'আমি এখন জলের মধ্যে আছি। এটা জলপুলিশের এলাকা। তুমি আমাকে ধরবার কে? আমাকে ধরবে না ছেড়ে দেবে সেটা জলপুলিশ বুঝবে, তুমি বিদায় হও।'

শেষ গল্পটি ট্র্যাফিক পুলিশের। এক ভদ্রলোক খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ ট্র্যাফিক পুলিশ তাঁকে রাস্তায় আটকাল, আটকিয়ে তাঁর লাইসেন্স দেখতে চাইল।

ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলেন, 'আমি তো কোনও আইনভঙ্গ করিনি। কোথাও গুঁতো লাগাইনি, কাউকে চাপা দিইনি। আমাকে খামোকা কেন হয়রানি, আমি এত সাবধানে, যত্ন করে গাড়ি চালাচ্ছি।'

ট্র্যাফিক পুলিশ মৃদু হেসে বললেন, 'সেই জন্যই গাড়িটা থামালাম। লাইসেন্স থাকলে কি কেউ এত সাবধানে গাড়ি চালায়?'

ফাঁদ পাতা ভুবনে

'মায়ার খেলা'র সেই আশ্চর্য গানটিকে হালকা আলোচনার সীমানায় টেনে আনার জন্যে আমি যারপর নাই লজ্জিত এবং দুঃখিত, কিন্তু প্রেমের মতো জটিল বিষয়ে আমার মতো আনাড়ি ব্যক্তির একটা অবলম্বন দরকার। তাই এই অসাধু প্রচেষ্টা, এর মধ্যে আর কোনও গূঢ় ব্যাপার নেই।

কবি হাইনেই বোধহয় বলেছিলেন, প্রথম প্রেম ঐশ্বরিক ব্যাপার, কিন্তু দ্বিতীয়বার যে প্রেমে পড়ে সে একটা গাধা।

প্রেমে পড়া ব্যাপারটাই অবশ্য অন্যের কাছে একটা চূড়ান্ত বোকামির ব্যাপার। এমন লোকের সংখ্যা কম, যাঁরা মনে করেন যে বোকা ছাড়া আর কেউ প্রেমে পড়ে না, নির্বোধ ছাড়া কেউ প্রেমে পড়তে পারে না।

কিন্তু এ জাতীয় ধারণা করার, কোনও মানে হয় না। প্রেমকলার মতো জটিল কলায় পারদর্শী হওয়া কোনও বোকা বা নির্বোধের পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়।

প্রথমেই দুটো প্রেমের গল্প ধরা যাক। একটি সরল প্রেমের, অন্যটা পরকীয়া প্রেমের।

সরল কাহিনীটির নায়ক একদিন তাঁর প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে প্রেমিকাকে বলল, 'আজ সন্ধ্যাটা খুব মজায় কাটানো যাবে, এই দ্যাখো সিনেমার টিকিট কেটে এনেছি।' মেয়েটি টিকিটগুলো হাতে নিয়ে বলল, 'এ কী তিনটে টিকিট কেন? বোধহয় হল থেকে ভুল করে দুটো টিকিট দিতে গিয়ে তিনটে দিয়ে দিয়েছে।'

প্রেমিক যুবকটি মৃদু হেসে বলল, 'আমি তিনটে টিকিটই কিনেছি।' একথা শুনে প্রেমিকা কিঞ্চিত বিস্মিত হল, 'সে কী কথা? আমাদের সঙ্গে আর কেউ যাবে নাকি?' প্রেমিক বলল, 'আরে না না, তা নয়। আমরা সিনেমায় যাচ্ছি না।' প্রেমিকাটি চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল, 'তবে?'

প্রেমিক এবার ব্যাখ্যা করল, 'সন্ধ্যাবেলা আমরা এখানেই থাকছি। সিনেমার টিকিট তিনটে তোমার মা, বাবা আর ভাইয়ের জন্যে।'

বলাবাহুল্য এই প্রেমিকপ্রবর নির্বোধ নয়। এর পরের পরকীয়া আখ্যানের প্রেমিকটি কিন্তু আরও বেশি চালাক।

গল্পটা উলটো দিক থেকে ঘুরিয়ে বলি। এক ডাক্তারের চেম্বারে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাই এক যুবক ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, 'আর কয়জন রোগী বাকি আছে?' ডাক্তারবাবুর ব্যস্ত পশার, কোনওদিন দেখা যায়, তখনও দশ বারোজন রোগী অপেক্ষারত, কোনওদিন চেম্বারের কম্পাউন্ডারবাবু বলেন, 'আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।' সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

এ রকম বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। যুবকটি কোনওদিনই ডাক্তারবাবুর জন্যে অপেক্ষা করে না, চেম্বারে উঁকি দিয়ে দেখেই ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারবাবুর ক্রমে কৌতূহল বাড়তে লাগল, ব্যাপারটা কী, এ কেমন রোগী?

বুড়ো বয়সে সব কিছু শেখার জানার জন্যে খুব ইচ্ছে হয়। অবশেষে একদিন কম্পাউন্ডারবাবু আর থাকতে না পেরে চেম্বার ফেলে রেখে সেই যুবকের পিছু নিলেন।

ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই কাজটি না করলেই নিশ্চয় ভাল করতেন। কারণ অনুসরণ করে তিনি যা দেখলেন, সে খুব মনোরম নয়। ওই যুবকটি সরাসরি গেল রাস্তার ওপাশেই খোদ ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।

এই বাজে গল্প আর ফেনিয়ে লাভ নেই। সবাই বুঝে ফেলেছেন, শুধু যে দু'একজন বোঝেননি তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই, এই যুবকটি ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর বশংবদ প্রেমিক। প্রতিদিন সে চেম্বারে এসে জেনে যায় ডাক্তারবাবুর আর কতক্ষণ লাগবে, এবং সেটা জেনে তাঁর স্ত্রীর কাছে যায়।

প্রেম নিয়ে এত খারাপ গল্প লিখে মনে কেমন ধিক্কার জাগছে। প্রেম হল ফুলের মতো নিষ্পাপ, সুন্দর বিষয়, তাকে নিয়ে এতটা ইয়ারকি করা উচিত হল না।

সুতরাং অতঃপর প্রেম ও ফুল।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা এক পরিচিত তরুণকে একদা প্রশ্ন করেছিলাম, 'তোমার এ দশা হল কী করে?' সে বলেছিল, 'আমার প্রেমিকা আমাকে ফুল ছুড়ে মেরেছে।' আমি বললাম, 'ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় শুনেছি, কিন্তু মাথা ফাটে এই প্রথম দেখলাম।' তখন সে জানাল, 'দাদা, ভুল বুঝবেন না। শুধু ফুল নয়, কাচের ফুলদানি সুদ্ধু ফুল ছুড়ে মেরেছিল।'

ফুলের পরের গল্পটি ম্যাটমেটে। এক প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে সপ্তাহান্তে একটি গার্লস হোস্টেলে যেত। একদিন তার হাতে কাগজের ফুল। প্রেমিকা জিজ্ঞেস করল, 'কাগজের ফুল আনলে কেন?' ছেলেটি করুণ কণ্ঠে জানাল, 'প্রতিদিন নীচের মেট্রনের ঘরে অপেক্ষা করতে করতে তাজা ফুলগুলো শুকিয়ে যায়, তাই কাগজের ফুল আনলাম।'

আহা!

আমরা এই অপেক্ষমান বিরহের মধ্যে যাব না। বিরহকে পূর্ণ করে তোলে প্রেমপত্র। প্রেমপত্র বিষয়ে একটি সদুপদেশ দেব, তার আগে একটা ছোট ঘটনা বলি।

ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকাকে বলল, 'তা হলে এবার আমার চিঠিগুলো ফেরত দাও।' প্রেমিকা বলল, 'কী দরকার? আমি কথা দিচ্ছি চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলব।' প্রেমিক বলল, 'না পুড়িয়ো না, ওগুলো লেখাতে আমার যথেষ্ট টাকা ব্যয় হয়েছে, আর তা ছাড়া অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে তো?'

অতঃপর একটি সদুপদেশ।

হে নবীন প্রেমিক। এ বছর বসন্ত বড় দ্রুত এসে গেছে। মলয় পবন। গাছে গাছে নতুন পাতা, গন্ধে ভরা সাদা ফুল। আমের মুকুলের ঘ্রাণে দিকদিগন্ত আমোদিত। এই তো প্রেমে পড়ার সময়।

কিন্তু একটা কথা, যতই প্রেমে পড়ো, যতই অনুরাগে বিহ্বল হও, সাবধান, প্রেমপত্র লিখতে যেয়ো না। সে বড় কঠিন কাজ। বানান-ব্যাকরণের সমস্যাই শুধু নয়, ওই প্রেমপত্র জিনিসটি একটি মারাত্মক এবং বিপজ্জনক দলিল। বহু বাঘা বাঘা লোক প্রেমপত্র লিখে ফেঁসে গেছে। সামনা সামনি যা ইচ্ছে বলো, সম্ভব হলে টেলিফোনেও বলো। যদি কাছাকাছি না যেতে পারো, তবে প্রেমিকার দৃষ্টিপথে থাকো, হাবে-ভাবে-ভঙ্গিতে প্রণয় নিবেদন করো অবশ্যই নিরাপদ দূরত্ব থেকে, যাতে প্রেমিকার বাবা-কাকা কিংবা গৃহভৃত্য দৌড় দিয়ে তাড়া করে হঠাৎ ধরে ফেলতে না পারে।

কিন্তু চিঠি লিখতে যেয়ো না।

আমার এই সদুপদেশের সপক্ষে একটি বিদেশি কাহিনী বলছি। এক প্রেমিক প্রবাস থেকে নিয়মিত তার প্রেমিকাকে চিঠি লিখত। নিয়মিত মানে খুবই বেশি নিয়মিত। প্রত্যেক সপ্তাহে তিনবার, একদিন অন্তর সোমবার-বুধবার শুক্রবার সে প্রেমিকাকে নীল কাগজে আতর মাখিয়ে দীর্ঘ চিঠিতে তার মনের আকুতি জানাত।

প্রেমিকটি এতই অনুরাগে বিহ্বল ছিল যে, খেয়ালই করত না তার প্রেমিকা চিঠির উত্তর দিচ্ছে কি না। সে মনের আবেগে চিঠি লিখে যেত।

অবশেষে একদিন কালিদাসের নির্বাসিত যক্ষের মতো এই প্রেমিকটিরও প্রবাসের মেয়াদ শেষ হল। সে দেশে ফিরে এল এবং পেল তার জীবনের চরম আঘাত। তার প্রেমিকা পাড়ার তরুণ ডাকপিয়নকে বিয়ে করেছে, যে ডাকপিয়ন প্রতি সপ্তাহে তিনবার প্রবাসীর সুরভিত নীল চিঠি নিয়ে প্রেমিকার কাছে পৌঁছে দিত, তারই গলায় মালা দিয়েছে প্রেমিকা।

ধরা পড়েছে দু'জনে

এই নিবন্ধের নামের সঙ্গে ভয়াবহভাবে খাপ খাবে এমন একটি গল্প দিয়ে শুরু করছি। তবে কাহিনীগত এবং ভাবগত কারণে স্বীকার করা উচিত যে এই গল্পটি এ জাতীয় মনোরম বিষয়ের পর্যায়ে পড়ে না।

এ গল্পে সত্যি সত্যি দু'জনের ধরা পড়ার ব্যাপার আছে। বলা বাহুল্য, গল্পটা ফরাসি। অনেক আগেই এটা লেখা উচিত ছিল পরকীয়া প্রেমের কোনও অবাস্তব তথা অবিশ্বাস্য কাহিনীমালায়। কবুল করছি, ভুল হয়ে গেছে। তাই শেষ পর্যন্ত ভুলে যাওয়ার আগেই গল্পটা এখানে লিখে রাখছি।

আগেই বলেছি, গল্পটা ফরাসি। অনেকদিন আগের কথা। এক ফরাসি কূটনীতিক এক মদ্যপানের আসরে আমার একান্ত ও পরমারাধ্যা বউদিকে এই গল্পটা বলেছিলেন।

সতীসাধ্বী খুব চটে গিয়েছিলেন গল্পটা শুনে, পরে একটু রেখেঢেকে আমাকে বলেছিলেন, 'এসব ঘটনার কোনও মানে হয়?'

ঘটনাটা কী?

এক ফরাসি সাহেব, এই সব গল্পে যেমন হয়, কিছুদিনের জন্যে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। সেই ফরাসি সাহেবের যিনি ফরাসিনী, সেই মেমসাহেবের যৎকিঞ্চিৎ চরিত্রদোষ ছিল। ফরাসি দেশে এটা খুব খারাপ ব্যাপার বলে গণ্য হয় না।

সে যা হোক, সাহেবের যেদিন বাড়ি ফেরার কথা কোনও কারণে তার দু'দিন আগে তিনি ফিরেছেন। বাড়ি ফিরে সদর দরজায় তিনি কলিংবেল বাজাতে স্ত্রী জানালা দিয়ে দেখেন, সর্বনাশ, স্বামী ফিরে এসেছেন। এদিকে বাড়ির মধ্যে তখন একজন নয়, দু'-দু'জন প্রেমিক। তাড়াতাড়িতে মেমসাহেব একজনকে চালান করলেন শোয়ার ঘরের ছাদে লাগানো বক্সরুমে এবং অপরজনকে লোহার আলমারির পিছনে। তারপর স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন।

স্বামীকে যথেষ্ট আদরযত্ন করার পর এই জাতীয় রমণীরা যেমন ছলাকলার আশ্রয় নেন এই মহিলাও তাই নিলেন। প্রেমে গদগদ কণ্ঠে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওগো, তুমি যে আমাকে একটা মুক্তোর মালা দেবে বলেছিলে, সেটা কবে দেবে?'

স্বামী বেচারা ছিলেন ধর্মপ্রাণা, তা ছাড়া সে সময় তাঁর একটু টাকার টানাটানি চলছে, তাই তিনি বললেন, 'আমি আর কী দিতে পারি তোমাকে, যিনি উপরে রয়েছেন তাঁকে বলো।'

ছাদের ওপরের বক্সরুমে যে প্রেমিকপ্রবর এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, একথা শুনে সে দেখল মহাবিপদ, ধরা যখন পড়েই গেছি আমি একা খেসারত দেব কেন? সে বক্সরুম থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'পুরো টাকাটা আমি দেব কেন? আমি আদ্ধেক দেব আর বাকি আদ্ধেক দেবে আলমারির পেছনে যে রয়েছে সে।'

এই গল্পটি আমাকে যিনি শুনিয়েছিলেন আমার সেই প্রাণের বউদি সিঁথেয় সিঁদুর আর অক্ষয় সাদা শাঁখা হাতে পূর্ণ যৌবনে বিদায় নিয়েছেন। রঙ্গরসিকতার গল্পে তাঁকে টেনে নিয়ে এসে মহাপাপ হল। তবে এও জানি, তিনি সব বুঝতেন, সব জানতেন, এবং সব ক্ষমা করবেন।

অতঃপর আরও একটি ধর্মীয় গল্প বলি। দুঃখের বিষয় এ গল্পটাও বিদেশি।

দুটি ছেলেমেয়ে প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি ক্যাথলিক, ছেলেটি ইহুদি।

বিয়ের প্রশ্ন উঠতেই গোলমাল বাধল। ছেলেটিও ধর্ম ছাড়বে না, আর মেয়ের মা-বাবা গোঁড়া ক্যাথলিক। তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে তাঁদের মেয়ে সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে করতে পারে। মেয়েটি কান্নাকাটি করায় মেয়ের মা-বাবা গেলেন চার্চের বিশপের কাছে পরামর্শ নিতে। বিশপ বললেন, 'ছেলেটিকে ভাল করে আমাদের ধর্মের কথা বোঝেন। মা মেরির কথা বলুন, পোপের কথা বলুন। ক্যাথলিক ধর্ম সম্পর্কে ছেলেটিকে আগ্রহী করে তুলুন।'

তাই করা হল, মেয়েটি আর তার বাবা-মা সবাই মিলে যখনই সুযোগ পায় ইহুদি যুবকটিকে গির্জা ও পোপের মাহাত্ম্য, মা মেরির উপাখ্যান এই সব বলে। তারপরে যা হল, সে হল ভয়াবহ। একদিন মেয়ের মা-বাবা দেখলেন তাঁদের কন্যা অঝোর নয়নে কাঁদছে। তাঁরা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?' মেয়েটি কান্না থামিয়ে চোখ মুছে বলল, 'ও জন্মের মতো সংসার ছেড়ে চলে গেল। সব শুনে ও আমাদের ধর্মের এত ভক্ত হয়েছে যে, ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হয়ে গেল।'

অতঃপর একটি দিশি উপাখ্যান।

রাম ও শ্যাম রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে রয়েছে, দু'জনেরই মুখ খুব গম্ভীর। রাম শ্যামকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা শ্যাম, তুমি কি এমন কোনও মেয়েকে পছন্দ করবে যার বয়েস বেয়াল্লিশ, যার গায়ের রং কালো, যে বেঢপ মোটা।'

বর্ণনা শুনে শ্যাম আঁতকিয়ে উঠল, 'এসব কী বলছ রাম? তুমি কি আমার টেস্ট জানো না?' তখন রাম বলল, 'তারপরে ধরো, মেয়েটির অর্ধেক চুল পেকে গেছে, দুটো দাঁত পড়েছে, বাকি দাঁতগুলোয় পানের ছোপ।'

অধিকতর আঁতকিয়ে উঠে শ্যাম বলল, 'এসব কী যা তা বলছ। তোমার কি মাথা খারাপ?' রাম শান্তভাবে বলল, 'আমার নয় তোমারই মাথা খারাপ।' শ্যাম ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলল, 'মানে?' রাম বলল, 'মানে বুঝতে পারছ না? মেয়েটার বর্ণনা শুনে কিছু বুঝতে পারলে না?'

শ্যাম মাথা চুলকোতে লাগল, তখন রাম বলল, 'আচ্ছা বলো তো, আমার মোটা, কালো, বুড়ি বউয়ের সঙ্গে কী করে তুমি প্রেম চালাচ্ছ? তোমার কি কোনও রুচি নেই?'

রুপোলি পর্দার অন্তরালে

এ গল্পটা পুরনো বিলিতি জোকবুকে আছে। প্রাতঃস্মরণীয় শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন ভ্রাতৃদ্বয়ের বিখ্যাত কাহিনীমালার এক আখ্যানে চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছিলেন এই গল্প।

গল্পের ঘটনাটা এ রকম।

একদা এক সরল প্রকৃতির মফস্বলি ভদ্রলোক শহরের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে এসেছেন। তিনি হলের বাইরের কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে হলের দরজায় গেলেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে সেই কাউন্টার থেকে আরেকখানা টিকিট কেটে হলের দরজার দিকে ছুটে গেলেন।

আবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত প্রত্যাবর্তন, আবার আরেকটি টিকিট ক্রয়, তারপর হলের দরজায় দৌড়। আবারও ভদ্রলোক ঘামতে ঘামতে ফিরে এলেন।

বার কয়েক এইরকম টিকিট ক্রয়, দৌড় এবং দ্রুত দৌড়ে প্রত্যাবর্তন লক্ষ করার পর কাউন্টারে যে ভদ্রলোক টিকিট বেচছিলেন তিনি একটু সচেতন হলেন। প্রথম দুয়েকবার তিনি ব্যাপারটাকে খেয়াল করেননি, তারপর তিনি ধরে নিয়েছেন হয়তো গেটে চেনাশোনা আপনজন কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে ভদ্রলোকের, তাই আবার টিকিট কিনতে এসেছেন।

কিন্তু বার বার, বেশ কয়েকবার একই নাটকের একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় দেখে কাউন্টার-ক্লার্ক ভদ্রলোকের কেমন খটকা লাগে, তিনি পঞ্চমবার টিকিট কেনার সময় দ্রুত ধাবমান ক্রেতাকে বললেন, 'দাদা, আপনার যে-ক'টা টিকিট দরকার একবারে কিনে নিন, বারবার ছুটে ছুটে আসছেন কেন?'

দাদা হাঁফাতে হাঁফাতে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে তারপর বললেন, 'আমার তো দরকার মাত্র একটা টিকিটের। আমি একাই সিনেমা দেখতে এসেছি।'

কাউন্টার-ক্লার্ক বললেন, 'তবে?'

দাদা বললেন, 'তবে আর কী? কোথা থেকে একটা খ্যাপা লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেই টিকিট নিয়ে হলে ঢুকতে যাচ্ছি সে লোকটা টিকিট ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলছে। আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ফেরত আসছি আরেকটা টিকিট কিনতে।'

এরপর পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দাদা বললেন, 'এত ঝামেলা জানলে আমি সিনেমা দেখতে আসতুম?'

সিনেমা সংক্রান্ত দ্বিতীয় গল্পটি পুরোপুরি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

একটি সিনেমা হলে নাইটশো ভেঙেছে, তা রাত প্রায় বারোটা হবে। সিনেমা ভেঙে দর্শকেরা বাইরে এসে দেখেন, ভীষণ দুর্যোগ, জল-ঝড় চলছে। রাস্তায় কোমর সমান জল জমে গেছে এর মধ্যেই। এদিকে বৃষ্টি থামার কিংবা ঝড় কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

দর্শকরা হল থেকে বেরতে পারছেন না আর সেই জন্যে হলের ম্যানেজারবাবুও হল বন্ধ করতে পারছেন না। কিন্তু ম্যানেজারবাবু ভদ্রলোক, যখন দেখলেন যে দর্শকদের হল ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই, তিনি সবাইকে অনুরোধ করলেন, 'আপনারা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বৃষ্টি সহজে ধরে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আপনারা বরং যে যার সিটে গিয়ে বসুন। আমি না হয় সিনেমাটা আরেকবার দেখাই।'

ম্যানেজার সাহেবের এই নির্দোষ এবং সরল প্রস্তাব মন্ত্রের মতো কাজ করল। সহসা দুর্যোগ তুচ্ছ করে সমস্ত দর্শক ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই সিনেমা দ্বিতীয়বার দেখা অসম্ভব, তার চেয়ে যদি ঝড়-বাদলে নিউমোনিয়া হয় কিংবা জলে ডোবা রাজপথে খানাখন্দে পড়েন সেও ঠিক আছে তবু এ সিনেমা আবার নয়, কিছুতেই নয়। উদভ্রান্ত হয়ে পাগলের মতো দর্শকেরা ম্যানেজারবাবুর প্রস্তাব শোনামাত্র হুড়োহুড়ি করে দুর্যোগের রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, মুহূর্তের মধ্যে হল শূন্য হয়ে গেল।

আমাদের ছোটবেলায় সিনেমা দেখেনি এমন লোকের সংখ্যা কম ছিল না, বিশেষ করে সেই সুদূর মফস্বলে যেখানে আমাদের শৈশব কেটেছিল। সিনেমা দেখতে ভয় পেত এমন লোকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। পর্দায় চলন্ত ট্রেনের দ্রুত এগিয়ে আসা কিংবা টারজানের গল্পে বন্যপশুর ক্রুদ্ধ গর্জন কত নিরীহ দর্শককে যে বিচলিত করেছে, তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তা আর কহতব্য নয়।

মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের বইয়ের শুরুতেই সেই গর্জনোদ্যত সিংহের মুখব্যাদান দেখে আসল ছবি ফেলে রেখে কত দর্শক যে চম্পট দিয়েছেন তারও ইয়ত্তা নেই।

তবু এতদিনে সিনেমা আমাদের ঘরের ভিতরের ঘরে, অন্তরের ভিতরের অন্তরে প্রবেশ করে গেছে। দেবতার অষ্টোত্তর শত নামের মতো এখন তারও অসংখ্য নাম। সেই আদি যুগের বায়োস্কোপ, টকি থেকে শুরু করে সিনেমা, চলচ্চিত্র, ছবি, বই, শো এবং সর্বশেষে যোগ হয়েছে ঘরোয়া ভিডিয়ো, সে একেবারে শোয়ার ঘরে বিছানার পাশে এসে গেছে।

সুতরাং সিনেমা নিয়ে সাবধানে রসিকতা করতে হবে। তাই এবার আমার নিজের নয়, একটি মার্কিনি রসিকতা করি।

হলে একটা মারমার কাটকাট ছবি চলছে। সমস্ত হলে তিল ধারণের জায়গা নেই, সব সিট ভর্তি। শুধু একটা রোতে দেখা গেল এক ভদ্রমহিলার পাশের একটা সিট খালি।

ভদ্রমহিলার আরেক পাশে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে এ মহিলার কোনও পরিচয় নেই। সে যা হোক ইন্টারভ্যালের সময় প্রায় উপযাচক হয়ে ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'দেখুন তো কী অপচয়, হাজার হাজার লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে, আর এ সিটটা খালি পড়ে রয়েছে। যে কিনেছে সে শুধু শুধু টিকিটটা নষ্ট করল।'

এই আলাপে ভদ্রমহিলা জানালেন, 'এই সিটটার টিকিট আমার স্বামীর জন্য কেনা হয়েছিল।' শুনে সেই কৌতূহলী ভদ্রলোক স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি বুঝি কোনও কাজে আটকে গেছেন, তাই আসতে পারলেন না?'

ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে বললেন, 'আজ্ঞে ঠিক তা নয়। আমার স্বামী মারা গেছেন।' প্রশ্নকারী ভদ্রলোক একটু 'আহা-আহা' করে তারপর বললেন, 'কিন্তু তাঁর কিংবা আপনার বন্ধু-টন্ধু কেউ আসতে পারতেন।'

ভদ্রমহিলা আবার নির্বিকারভাবে বললেন, 'তার উপায় নেই। তাঁরা সবাই আমার স্বামীকে কবর দিতে শোকযাত্রায় গেছেন। আমার স্বামী আজ দুপুরেই মারা গেলেন কিনা।'

এতক্ষণের এই যে গল্প কয়টি এসবই রুপোলি পর্দার সামনের গল্প। অবশেষে আমরা পর্দার অন্তরালের আখ্যানে যাচ্ছি।

প্রযোজক মহোদয় নায়ক নবীনকুমারকে বললেন, 'দ্যাখো তুমি দেখতে ভাল, তোমার অভিনয়ও খারাপ নয় কিন্তু তুমি বড় দুশ্চরিত্র। তুমি যদি স্বভাব না বদলাও আমি তোমাকে নেবো না।'

নবীনকুমার অনুনয় করে বললেন, 'স্যার আর কখনও খারাপ ব্যাপারে যাব না। আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না।'

কিন্তু কয়েকদিনের মাথায় এক মহিলার সঙ্গে নবীনকুমার এক হোটেলের লাউঞ্জে প্রযোজকের মুখোমুখি পড়ে গেলেন। নবীনকুমার সুঅভিনেতা, তিনি প্রযোজকের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনি ভুল বুঝবেন না। এ কোনও আজেবাজে মেয়েছেলে নয়, ইনি আমার স্ত্রী।'

রাগে ফেটে পড়লেন প্রযোজক, 'কী বললে, তোমার স্ত্রী? বদমায়েস, রাস্কেল, জানো ইনি আমার স্ত্রী।'

পিয়ো হে পিয়ো

মদের ব্যাপারে আমার দুর্বলতা অপরিসীম এবং সুবিদিত। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাই বলতে পারি যে মদের ব্যাপারে লেখা নিয়ে যতটা আমার দুর্বলতা, পান করার ব্যাপারে তা নয়।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এই প্রাচীন, ভুবনমনোমোহিনী পানীয়টির প্রতি আমার কিঞ্চিৎ পক্ষপাত রয়েছে, বিশেষ করে আমার লেখায়। এক বাক্যে বলা উচিত, আমি সুরার গুণগ্রাহী।

চার্লস ল্যাম্ব, সেই বহুখ্যাত ইংরেজ লেখক, স্বপ্ন দেখেছিলেন, যদি কখনও বিয়ে করেন তা হলে

জমিদারের মেয়ে বিয়ে করবেন এবং তখন তিনি সুখে পানশালায় বসে ঠান্ডা ব্রান্ডি জল দিয়ে পান করতে পারবেন।

ঠিক এই ধরনের স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যাস নেই। আবার মহাকবি ওমর খৈয়ামের মতো আমি পান করা সম্পর্কে এ রকম কথাও বলতে পারব না—

'পান করো। কারণ তুমি জানো না কোথা থেকে এসেছ,
পান করো। কারণ তুমি জানো না তুমি কোথায় যাবে।'

ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আরও দু'-একটা খাপছাড়া ঘটনা বলে নিচ্ছি।

মার্কিন দেশে এক ছোট শহরের এক শেরিফ ভয়ংকর মদ্যপান বিরোধী। তিনি বিশেষ করে অপছন্দ করেন মদ খেয়ে গাড়ি চালানো। যদি কখনও কোনও মাতাল ড্রাইভার তাঁর হাতে পড়ে তা হলে সেই মাতালের মোটেই অব্যাহতি নেই। তিনি সোজা সেই ড্রাইভারকে নিয়ে যান জেলখানায়, সেখানে জেলখানার বাঁধানো উঠানে নিজের হাতে টেনে দেন চক দিয়ে লম্বা লম্বা সাদা লাইন। তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন,—এই লাইনের উপর দিয়ে সরাসরি হেঁটে যাও, বাঁয়ে ডাইনে যে কোনও দিকে হেলে পড়লে সাজা হবে।

কিন্তু মজার কথাটা এই যে শেরিফ সাহেব কখনওই চক দিয়ে লাইনটা সোজা টানতে পারেননি। তার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি নিজেই সব সময়ে মদে চুর থাকেন, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না উবু হয়ে উঠোনে বসে সোজা লাইন টানা। সেই আঁকা বাঁকা লাইন দিয়ে টলতে টলতে মাতাল ড্রাইভারেরা চলে যায় অনায়াসে, শেরিফ সাহেব তাদের ধরতে পারেন না, পারেন না তাদের সাজা দিতে।

আরেকটি হাস্যকর ঘটনা, সেটিও মার্কিনি এবং সেটিও গাড়ি চালানো সংক্রান্ত। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে পুলিশ আদালতে চালান দেয়। সে তার জবানবন্দিতে বলে,—আমার মত্ত অবস্থায় গাড়ি না চালিয়ে উপায় নেই। কারণ আমার বউ আমাকে বাড়িতে মদ খেতে দেয় না। তাই পুরো বোতলটা গাড়িতে বসে আমাকে খেয়ে নিতে হয়।

এর পরের আরেকটি দিশি ঘটনা বোধ হয় তেমন হাস্যকর নয়, কিন্তু অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে গ্রেপ্তার হন এক ভদ্রলোক; পরে পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে যে ভদ্রলোক একজন মোটর ভিহিকল ইনস্পেক্টর, তাঁর বৃত্তি হল গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্সের টেস্ট নেয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিজে গাড়ি ঠিকমতো চালাতে জানেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজেরই কোনও রকম গাড়ি চালানোর লাইসেন্স নেই।

মত্ততা বিষয়ক আইন-আদালতীয় ঘটনা লিখে শেষ করা যাবে না। বরং আদালতের প্রাঙ্গণ ছেড়ে এবার আমরা সরাসরি পানশালায় প্রবেশ করি।

পানশালার এই গল্পটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব আমার প্রিয় বন্ধু সুরসিক শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর, আমি অনুলেখক মাত্র।

এক সুরাবিলাসী নিয়মিত পানশালায় যান। কিন্তু তাঁর স্বভাব কিঞ্চিৎ বিচিত্র, তিনি সব সময়ে একসঙ্গে দু'গেলাস পানীয়ের অর্ডার দেন। ফুরিয়ে গেলে তারপর আবার দু'গেলাস। আবার দু'গেলাস। সব সময়ে একসঙ্গে দু'গেলাস, কিছুতেই এক গেলাস নয়।

একদিন এক দুঃসাহসী, কৌতূহলী বেয়ারা ওই ভদ্রলোককে বিনীতভাবে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা স্যার, একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন।' ভদ্রলোক গেলাস থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে জানতে চাইলেন, 'কী কথা?' বেয়ারা মাথা চুলকিয়ে বলল, 'না স্যার, তেমন কিছু নয়, এই আপনি এক সঙ্গে একেক বারে দু'গেলাস করে নেন কেন?'

এই প্রশ্নে ম্লান হেসে ভদ্রলোক এক করুণ কাহিনী শোনালেন, 'আমার প্রাণের বন্ধু ছিল প্রাণেশ। প্রাণেশ আর আমি সব সময়ে এক সঙ্গে মদ খেতাম। প্রাণেশ খুব ভালবাসত মদ খেতে। সে আজ কিছুদিন হল মারা গেছে। কিন্তু আমার আর একা মদ খেতে ইচ্ছে করে না। তাই সব সময়ে

দু'গেলাস নিই। এক গেলাস প্রাণেশের জন্যে, আর অন্য গেলাস আমার।'

এর কিছুকাল পরে হঠাৎ দেখা গেল স্বর্গীয় প্রাণেশের প্রাণের বন্ধু সেই ভদ্রলোক পানশালায় এসে দু'গেলাসের বদলে এক গেলাসের অর্ডার দিয়েছেন। এই নিয়মভঙ্গ দেখে আগের দিনের সেই দুঃসাহসী বেয়ারা বলল, 'কী হল স্যার, আজকে আপনার বন্ধুর জন্যে আরেক গেলাস নিলেন না?' ভদ্রলোক একটু ম্লান হেসে গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'এটা তো আমার বন্ধুরই গেলাস। আমার গেলাস লাগবে না। আমি কাল থেকে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

অন্য এক অদ্বিতীয় মাতালের গল্প বলি। তিনি একদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল তিনটার সময় অফিস গেলেন। অফিসের ম্যানেজার তাঁকে ধরলেন, 'কী ব্যাপার রমেশবাবু? বেলা তিনটের সময় অফিসে হাজিরা দিতে এসেছেন, ছুটির সময়ই তো হয়ে গেল।'

নতমুখে রমেশবাবু বললেন, 'স্যার, ব্যাপারটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে কিন্তু দোষটা ঠিক আমার নয়।'

শুনে আরও রেগে গিয়ে স্যার মহোদয় প্রশ্ন করলেন, 'দোষ যদি আপনার না হয়, তা হলে আপনি দেরি করে আসার সব দোষ নিশ্চয় আমার।'

রমেশবাবু আরও নরম হয়ে গেলেন, 'না স্যার। কথাটা ঠিক তা নয়, ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আপনি তো জানেন স্যার কাল ছুটি ছিল। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে একটু নেশা করলাম। আমি আবার মাত্রা ঠিক রাখতে পারি না। রাত তিনটে পর্যন্ত মদ খেয়ে চুর হয়ে বাড়ি ফিরলাম।'

স্যার অস্থির হয়ে উঠলেন, 'কী বলবেন বুঝতে পেরেছি।'

ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন রমেশবাবু, 'না স্যার, বুঝতে পারেননি। আমি বেলা পর্যন্ত ঘুমোইনি, সকালবেলা হ্যাংওভার ছিল, কিন্তু ঠিক সময়েই ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার ঘুম থেকে উঠে দেখি দশটা বেজে গেছে। এদিকে তখন বেশ নেশা রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাড়ি কামাতে গেলাম। আয়নায় তাকিয়ে দেখি আমি নেই। কেমন খটকা লাগল। বুঝলাম, আমি অফিসে চলে গেছি।'

চোখ গোল গোল করে স্যার বললেন, 'তারপর।'

রমেশবাবু বললেন, 'আর তারপর। আবার ঘুমোলাম, দুটোয় ঘুম থেকে উঠে নেশা কাটতে ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। না, আমি অফিস যাইনি শুধু আয়নার কাচটা খুলে গেছে, তাই নিজেকে দেখতে পাইনি। ভুল বোঝা মাত্র এই ছুটে এলাম।'

আজগুবি গল্প ছেড়ে প্রত্যক্ষ ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি। আবার মাতাল ও আদালত।

কলকাতার ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক ব্যক্তিকে পুলিশ অভিযুক্ত করে মাতলামি এবং রাস্তায় হল্লা করার অভিযোগে। লোকটি জামিনে খালাস ছিল কিন্তু মামলার দিন আদালতে অনুপস্থিত হওয়ায় তার নামে ওয়ারেন্ট বেরোয়। পরের তারিখে পুলিশ তাকে আদালতে উপস্থিত করলে সে আগের তারিখে তার অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে এবং জানায় আগের তারিখে তার উপায় ছিল না আদালতে আসার, কারণ সে তখন ছিল হাওড়া জেলে। জেলে কেন ছিল একথা আদালত জানতে চাওয়ায় সে নির্বিকারভাবে বলে, 'একটা ছোট মামলায়। মাতলামি আর হল্লা করার জন্যে পুলিশ আমাকে চালান দিয়েছিল।'

পানীয় বিষয়ক এই তরল কথিকা একটি মহাজন বাক্য দিয়ে শেষ করি। মহামতি শেক্সপিয়ার আক্ষেপ করেছিলেন 'ওথেলো' নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) :

'—হায় ঈশ্বর। মানুষেরা কেন তাদের বুদ্ধিকে ঢাকা দেয়ার জন্যে শত্রুকে গ্রহণ করবে তাদের মুখের মধ্যে; কেন তারা আনন্দ, উত্তেজনা আর হইহল্লায় মেতে নিজেদের পশুতে রূপান্তরিত করবে?'

মহাকবির এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমার জানা নেই।

ও চাঁদা চোখের জলে

চাঁদা আদায়ের সবচেয়ে ধুম পড়ে যায় শারদীয়া পুজোর সময়। অবশ্য যারা চাঁদা তোলার তারা বছরের সব সময়েই চাঁদা তোলে। গৃহস্থের দরজায় দরজায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাজারে, দোকানে, ফুটপাথে এমন কী হাইওয়ের রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থামিয়ে অক্লান্ত প্রয়াস চলে সারা বছর ধরে চাঁদা আদায়ের।

কখনও চাঁদা সরস্বতী পুজোর জন্যে, কখনও মা শীতলা বা ওলাবিবির নামে, আবার কখনও কাল্পনিক বিদ্যালয় কিংবা অস্তিত্ববিহীন সাধারণ পাঠাগারের নামে তোলা হয় চাঁদা। তবে প্রকৃত চাঁদার মরশুম হল শরৎকাল।

চাঁদা আদায়ের ভাষা ও ভঙ্গি সর্বত্র কিন্তু একরকম নয়। কোথাও অনুনয়-বিনয়, 'বউদি, আর দুটো টাকা দিন, বাজারের অবস্থা বুঝছেন না' আবার কোথাও বা চোখ রাঙানি, 'দেবেন কি দেবেন না ফর্সা করে বলে দিন, তারপরে দেখা যাবে' আবার কখনও এর থেকেও কয়েক মাত্রা উপরে বাঁশ দিয়ে গাড়ি আটকিয়ে কিংবা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে চাঁদার টাকা সংগ্রহ।

এই চাঁদা, এ হল আবশ্যিক চাঁদা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে দিতেই হবে। তবে, অনেক চাঁদা আছে যেমন, ক্লাবের চাঁদা, লাইব্রেরির চাঁদা, দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডার অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির বাৎসরিক অনুদান সেসব দেওয়া না দেওয়া অনেকটা স্বেচ্ছার ব্যাপার; ইচ্ছা না হলে, অসুবিধে হলে না দিলেও চলে।

বাংলা অভিধানে চাঁদা শব্দের অর্থ লেখা আছে, 'কোনও বিশেষ কার্য নির্বাহার্থে বহুজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ।' উদাহরণ, 'বারোয়ারি পুজোর চাঁদা।' এ ছাড়াও চাঁদা অর্থে বলা আছে, 'নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেয় মূল্য বা অর্থসাহায্য', যেমন, 'মাসিক পত্রের চাঁদা।'

প্রচলিত অভিধান অনুসারে চাঁদা শব্দটি এসেছে ফারসি চন্দ্ শব্দ থেকে। এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্যদিকে একটি পুরনো অভিধানে চাঁদা শব্দটিকে দেখানো হয়েছে প্রচলিত বাংলা শব্দ হিসেবে।

এই সূত্রে একটি প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করছি। পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষের আশ্চর্য বাংলা অনুবাদে সে বই অনেকেই পড়েছেন। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম সংক্রান্ত বৌদ্ধ-কাহিনী গ্রন্থ 'জাতক' প্রায় আরব্য উপন্যাসের মতোই চমকপ্রদ।

জাতকে 'ছন্দক' বলে একটি শব্দ আছে, ছন্দক শব্দের অর্থ হল, ইচ্ছাপূর্বক যাহা দেয়।

পারস্যের চন্দ্ এবং ভারতবর্ষের ছন্দক মূলত একই শব্দ কিনা শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন হয়তো এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু কেউ যদি বলে বাংলা চাঁদা শব্দটি অর্ধ-তৎসম বা তদ্ভব তাকে যুক্তি দিয়ে ঠেকানো কঠিন হবে।

অয়ি চপলমতি পাঠিকা, ওগো স্থিরচিত্ত পাঠক, এই হাস্যকর লেখকের রচনা পড়তে গিয়ে তোমরা এত জ্ঞানগর্ভ বিপাকে পড়বে জানলে হয়তো সাবানের বিজ্ঞাপন বা দূরদর্শনের হিন্দি সংবাদের মতো এই নিবন্ধটি সরাসরি টপকিয়ে যেতে। সুতরাং আপাতত তোমাদের জন্যেই একটি চাঁদা সংক্রান্ত গল্প বলে নিই।

পাড়ার ছেলেরা গেছে রমেশবাবুর বাড়িতে চাঁদা তুলতে, দুর্গাপুজোর চাঁদা। রমেশবাবুর ধনী

হিসেবে খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর ততোধিক খ্যাতি কৃপণ হিসেবে।

ছেলেরা রমেশবাবুকে ভালই চেনে, রমেশবাবুও ছেলেদের চেনেন। ছেলেরা চেপে ধরল, 'স্যার, এবার পুজোয় আপনাকে অন্তত পাঁচশো এক টাকা দিতেই হবে।'

নিজের বাড়ির বারান্দায় কোলাপসিবল গেটের নিরাপদ ব্যবধানে ইজিচেয়ারে বসে রমেশবাবু ছেলেদের আবদার খুব মনোনিবেশ সহকারে শুনলেন, তারপর ইজিচেয়ারে উঠে বসে বললেন, 'তোমরা তো জানো আমার মা আমার ছোট ভাইয়ের কাছে থাকতেন। আমার সেই ছোট ভাই যে কারখানায় কাজ করত সে কারখানা আজ আটমাস লক-আউট। আমার ছোট ভাই চেয়ার-টেবিল, বাসনপত্র বিক্রি করে এ কয়মাস চালাল। এখন আর তাও নেই। আমার মা তার ওখানে এখন প্রায় অনাহারে রয়েছে।'

রমেশবাবু এই ঘটনাটা বলে একটু থামলেন, তারপর বললেন, 'এদিকে আমার বড়দা যক্ষ্মারোগে হাসপাতালে আজ দেড় বছর। এক পয়সার সংগতি নেই, ওষুধ-পথ্য কিছুই কিনতে পারছে না। হাসপাতালের টাকাও দিতে পারেনি। তাকে হাসপাতাল থেকে বার করে দিয়েছে। সে হাসপাতালের সিঁড়ির নীচে ধুঁকছে আর অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিন গুনছে।'

ছেলেরা চাঁদার কথা বিস্মৃত হয়ে রমেশবাবুর কথা হতভম্ব হয়ে শুনছিল; রমেশবাবুর বক্তব্য অবশ্য এখনও শেষ হয়নি। তিনি আরও বললেন, 'আর আমার ভাগনে, একমাত্র ভাগনে রনটু, একই বোনের একই ছেলে, সেই রনটু তার অফিসের তহবিল তছরূপ করেছে। গত সপ্তাহে এসে বলছে, "মামা, আপাতত যদি পাঁচশো টাকাও ফেরত দিই, তা হলে বড়বাবু বলেছেন পুলিশে দেবেন না, না হলে জেল খাটতে হবে। অন্তত পাঁচশো টাকা তুমি আমাকে দাও," অনেক কাকুতি-মিনতি করল রনটু।'

এতটা বলার পর দম নেওয়ার জন্যে থামলেন রমেশবাবু, তারপর বললেন, 'দ্যাখো ছোকরার দল, আমার ছোট ভাই, বড়দা আর ভাগনের কথা শুনলে তো, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো এদের কাউকে আমি একটি পয়সাও দিয়েছি কিনা। দেখবে এদের কাউকে কিছুই দেইনি। তা হলে তোমরা আমার কাছে টাকা আশা করো কী করে?'

আধুনিককালের এই উদ্ভট উপাখ্যানের পরে এবার প্রাচীনকালের কথায় যাই।

যাঁরা ভাবেন চাঁদা একটা আধুনিক উৎপাত, আগে এ রকম ছিল না, তাঁরা ভুল ভাবেন। সব যুগে, সব কালে, সব জায়গায় চাঁদার উপদ্রব ছিল।

সুপ্রাচীন জাতক কাহিনীতে দেখা যায় যে, জগতের সমস্ত অধিবাসী চাঁদা তুলে দানের বা উৎসবের ব্যবস্থা করতেন। ১৬৩ সুসীম জাতকে দেখা যায় যে এই চাঁদা নিয়ে রীতিমতো বাদ-বিসম্বাদ হত। চাঁদা দ্বারা ক্রীতদ্রব্য তীর্থযাত্রীদের দেওয়া হবে নাকি বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেওয়া হবে তাই নিয়ে কলহ। অবশেষে সর্বসাধারণের মত নিয়ে দেখা গেল ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করাই অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা।

শুধু সুসীম জাতক কেন, অন্য জাতকেও যেমন ২২১ কাষায় জাতকে চাঁদার কথা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে, চাঁদা দান নির্বাহ করা হয়।

অবশ্য সেই জাতকের যুগ থেকে এ যাবৎ চাঁদা তোলার কায়দা ও ভঙ্গিমা অনেক পালটেছে। এই তো গত বছর দক্ষিণ কলকাতার একটি পুজো মণ্ডপের বাইরে চাঁদার খাতা হাতে কয়েকটি যুবক দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছে, 'পঙ্গু যুবকদের এই শারদীয়া পুজোয় যথাসাধ্য সাহায্য করুন।' যাঁরা চাঁদা তুলছিলেন তাঁদের কাউকে দেখে আপাতদৃষ্টিতে পঙ্গু মনে হল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে পঙ্গু? কোথায় সেই পঙ্গু যুবকেরা যারা এই পুজো করছে?' যুবকেরা মৃদু হেসে বলল, 'আমরাই পঙ্গু।' আমি অবাক হয়ে তাকাতে সামনের যুবকটি তার পাঞ্জাবির পকেট দুটো উলটিয়ে দেখাল যে একদম ফাঁকা, তারপর বুঝিয়ে বলল, 'বুঝলেন দাদা, পঙ্গু, মানে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু।'

চাঁদা কিন্তু খুশিমনে কেউই কখনও দেন না। একথা চাঁদা আদায়কারীরাও জানেন। অনেকে নানা কায়দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বলেন, 'সামনের শনিবার এসো,' 'গত বছরের রসিদ বই নিয়ে এসো,' 'আমি মণ্ডপে দিয়ে আসব' ইত্যাদি ইত্যাদি। চাঁদা আদায়কারীরা জানেন এসবই ঘোরানোর এবং অবশেষে একেবারে না দেওয়ার ফিকির।

তবে ফিকিরে সবসময় কাজ হয় না। এক পাড়ায় শুধু দুর্গাপুজোয় চাঁদা দিলে চলবে না, পুজোর সঙ্গে যাত্রা হচ্ছে, সেই যাত্রাগানের টিকিটও কাটতে হবে। টিকিট নিয়ে উদ্যোক্তারা এসেছে, গৃহস্থ বললেন, 'ওইদিন সন্ধ্যায় যে আমি অন্য জায়গায় থাকব। আমার জরুরি দরকার আছে। তোমাদের যাত্রায় তো আমি থাকতে পারব না। তবে, আমার মন পড়ে থাকবে তোমাদের আসরেই।' উদ্যোক্তারা বললেন, 'তা হলেই হল। আপনাকে সশরীরে না থাকলেও হবে, শুধু আপনার মন কয় টাকার সিটে থাকবে, দশ টাকার না পনেরো টাকার, সেটা বলে দিন, টিকিটটা রেখে দিয়ে যাচ্ছি।'

দামদর

মুড়ির দামের ঘটনাটা কিছুদিন আগেই অন্য জায়গায় লিখেছিলাম, কিন্তু দামদরের ব্যাপারে কোনও কিছু লিখতে গেলে এ গল্পটা বাদ দিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

গল্পটা থাক, আসল কথাটা বলি। আমার এক সহকর্মী আছেন মুড়িভক্ত মেদিনীপুরী। সকালে মুড়ি দিয়ে চা খান, দুপুরে অফিসে মুড়ি খেয়ে টিফিন করেন। সন্ধ্যায়ও বাড়ি ফিরে আবার চায়ের সঙ্গে মুড়ি চেবান। মুড়ি খাওয়ায় তাঁর অরুচি নেই, ক্লান্তি নেই।

হঠাৎ সেদিন দেখি দুপুরে অফিসে টিফিনের সময় মুড়িভক্ত ভদ্রলোক মুড়ি না খেয়ে আপেল খাচ্ছেন। ব্যাপারটা দেখে চমকে গেলাম, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি নিজেই বললেন, 'পয়সার টানাটানি যাচ্ছে, মুড়ি খেতে পারছি না তাই আপেল খাচ্ছি।'

ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম হল। মুড়ির কেজি প্রতি দাম চলছে বারো চোদ্দো টাকা। সে জায়গায় আপেল বড় জোর পাঁচ ছয় টাকা কেজি। সুতরাং পয়সা সাশ্রয় করার জন্যে মুড়ি না খেয়ে আপেল খাওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু খুব স্বাভাবিক কি? এই সেদিন পর্যন্ত মুড়ি ছিল সাধারণের, গরিবের খাবার আর আপেল, সে তো রাজা মহারাজা, বড়সাহেবের প্রাতরাশের টেবিলে দেখা যেত, তাও সিনেমার পর্দায়।

মুড়ি নিয়ে আরেকটা দুঃখের গল্প আছে। গল্পটা একদম টাটকা। সেদিন এক ভদ্রলোক আমার কাছে জীবনের সুখদুঃখের গল্প করছিলেন। কথায় কথায় নিজের প্রসঙ্গে বললেন, 'উনিশশো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্নয় এই কলকাতা শহরে সর্বস্বান্ত অবস্থায় একা একা। হাতে কোনও টাকা পয়সা নেই, কাজকর্ম নেই। সাতদিন শুধু মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি।' আমি ছাড়াও এই দুঃখের কাহিনীর আরেকজন শ্রোতা ছিলেন, তিনি একথা শুনে বললেন, 'তবু ভাল। এখন মুড়ির যা দাম, সর্বস্বান্ত হয়ে আর মুড়ি খেতে পারবেন না বরং টানা সাতদিন মুড়ি খেতে গেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন।'

গল্পের খাতিরে শুধু মুড়ির নামে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কোনও না কোনও অছিলায়, কারণে অকারণে সব জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। বন্যার জন্যে বাড়ছে, খরার জন্যে বাড়ছে, পুজোর জন্যে বাড়ছে, ঈদের জন্যে বাড়ছে, বড়দিনের জন্যে বাড়ছে। ট্রাক ধর্মঘটের জন্যে বাড়ছে, রেল রোখোর জন্যে বাড়ছে, কুলি ধর্মঘটের জন্যে বাড়ছে, বাংলা বন্ধ বা স্থানীয় হরতাল হলে তো কথাই নেই।

সব কারণ যে সবসময় বোধগম্য হয় তাও নয়। ট্রাক স্ট্রাইকে আলুর দাম বাড়ল অথচ আলু দ্রুত পচনশীল নয়। অন্যদিকে কলার দাম বাড়েনি যেটা রাত পোহালে পচে যাবে, অর্থাৎ ট্রাকে কিংবা অন্য কোনও পরিবহনে আসছে না। এলে পচতে বাধ্য।

হিসেব মিলছে না। একটি ছোট ছেলে তার বাবার কাছে পঞ্চাশটা পয়সা চেয়েছিল। বাবা বললেন, 'জিনিসপত্রের দাম এত বেশি, কী করে তোকে পঞ্চাশ পয়সা দিই বলত?' ছেলে বলল, 'দাম যখন বেশিই হয়েছে তা হলে পঞ্চাশ পয়সা নয়, পুরো একটা টাকাই না হয় দাও।'

ইতালি দেশের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের সেই বেদনার্ত রসিকতাটি এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। বড় দুঃখের রসিকতা এটি, গৃহস্থ বলছেন, 'আগে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বাজার থেকে ব্যাগ ভর্তি সওদা করে আনতাম। এখন ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে গিয়েও পকেট ভর্তি করে কোনও বাজার করে আনতে পারি না। এর পরে কী হবে, কে জানে।'

এক সাংবাদিক জিনিসের দাম বাড়ার ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট করে লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, লোকে যত টাকা উপার্জন করার আশা করেছিল তার চারগুণ টাকা উপার্জন করছে কিন্তু যেসব জিনিস কিনবে ভেবেছিল ওই বাড়তি টাকা দিয়েও তার চার ভাগের এক ভাগ জিনিস কিনতে পারছে না।

কেন দাম বাড়ে? জোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি বলে। টাকার চেয়ে মাল কম বলে এবং কারসাজিতে।

কার কারসাজি, কীসের কারসাজি—সে জটিলতা সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতির লোকেরা খোঁজ করুন। আমি এক বুড়ো দোকানদারের কথা জানি সে রাতে ভাত খেতে খেতে ছেলেদের বলল, 'বাজার বেশ চড়া যাচ্ছে, এখন সব জিনিসের দাম টাকায় চার আনা বাড়িয়ে দে।'

সকালে বড় ছেলে দোকান দেখে। সে দোকানের ঝাঁপ তুলেই সব জিনিসের সিকি দাম বাড়িয়ে দিল, চার টাকার জিনিসের দাম কেটে লিখল পাঁচ টাকা। দুপুরে ভাত খাওয়ার পরে মেজো ছেলে দোকানে গিয়ে আর এক দফা বাড়িয়ে সেটা সোয়া ছ'টাকা করল। ছোট ছেলে অফিসে কাজ করে, সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে সে দোকানে আসে। সে তখন সূক্ষ্ম হিসেব করে সাত টাকা আশি পয়সা (৭.৮০) গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিল। এক দিনে জিনিসের দাম প্রায় ডবল হয়ে গেল।

বাজারে জিনিস কম কিন্তু কিছু লোকের হাতে অনেক টাকা। তারা যে কোনও দামে জিনিস কিনবে।

বেনেটোলার মেসের রান্নার ঠাকুরের কথা মনে পড়ছে। ঠাকুরের ভাত কম পড়ত, তরকারি কম পড়ত, মাছ তো থাকতই না, কিন্তু ডাল, লোকে যত ইচ্ছে খাক, কখনও কম পড়ত না। সে কড়াই থেকে এক হাতা করে ডাল তুলত আর সঙ্গে সঙ্গে এক হাতা জল মেশাত। শেষে ডাল আর নেই, শুধু জল। অর্থনীতির অবস্থাও তাই দাঁড়িয়েছে। জিনিস নেই বাজারে শুধু টাকা আর টাকা।

পুনশ্চ : একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিবৃত করে শেষ করি। ঝড়বৃষ্টির পরে বাজারে গিয়েছিলাম। একটা এক মুঠো সাইজের ফুলকপির দাম জিজ্ঞাসা করলাম। তরকারিওলা আমার চেনা, আমার দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বলল, 'পাঁচ টাকা।' মুখ ফসকিয়ে আমার অজান্তে গলা দিয়ে করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল, 'বাবা'!

সেদিন লরি স্ট্রাইকের মধ্যে বাজারে সেই একই তরকারিওলা। সেই একই সাইজের ফুলকপির দাম জিজ্ঞাসা করলাম। আমার আগের উক্তি দোকানদারের মনে আছে দেখলাম, কঠিনতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বলল, 'ডবল বাবা'।

মিথ্যা কথা

পুরনো গল্পটা দিয়ে আরম্ভ করি। রাস্তায় কয়েকটা অল্পবয়সি ছেলে একটা রবারের বল কুড়িয়ে পেয়েছিল। বলটা কে নেবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বেধে যায়। রীতিমতো বাদবিতণ্ডার পরে শেষে তারা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা যে বলতে পারবে, সে-ই বলটার মালিক হবে।

সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক অতিশয় নীতিবাগীশ ভদ্রলোক। ছেলেদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি খুব বিচলিত বোধ করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেদের বাধা দিয়ে বললেন, 'এ কী সাংঘাতিক কথা! তোমরা মিথ্যা কথা বলতে যাবে কেন? এই যে আমাকে দেখছ, জানো, আমি জীবনে কোনওদিন মিথ্যা কথা বলিনি!'

ছেলেরা এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাদের কুড়িয়ে পাওয়া বলটা ভদ্রলোকের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এই বলটা আপনি নিন।'

নীতিবাগীশ ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সেকী! বলটা আমাকে কেন? আমি কেন নেব?'

ছেলেদের দলপতি জানাল, 'আপনি যা বললেন, তার চেয়ে সেরা মিথ্যা কথা আমরা কেউই বলতে পারব না। তাই বলটা আপনিই পেলেন।'

মিথ্যা কথা নিয়ে অনেক কথা। মহাজনেরা নানাজনে এ বিষয়ে নানা কথা বলেছেন। সব কথা উল্লেখ করার দরকার নেই। তবে সব ধর্মেই একথা বলা আছে যে মিথ্যা কথা মহাপাপ। কিন্তু এ সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের মতো লোক পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলেছে, অথবা বলা উচিত, মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে নির্বিকার ভাবে মিথ্যা কথা বলে এ রকম লোকের সংখ্যাও কিছু কম নেই। কেউ কেউ অহংকার করার জন্যে মিথ্যা কথা বলে। যেমন, বড় সাহেব বললেন, 'আমার চেয়ে ভাল ইংরেজি এ অফিসে কেউ লিখতে পারে না।' কিংবা 'আমার মামার বাড়িতে এগারোটা বড় বড় পুকুর ছিল।' কিংবা 'আমার মেজদা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পেয়েছিল।'

অনেকে আত্মরক্ষার জন্যে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অথবা পুলিশের জেরায় জর্জর হয়ে মিথ্যা কথা বলে। রাতে দেরি করে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কারণ দেখানোরও অনেকের প্রয়োজন পড়ে।

ইস্কুলের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী মিথ্যা কথা বলবে কিংবা অফিসে বড়বাবুর কাছে কনিষ্ঠ সহায়ক অসত্য অজুহাত দেবে দেরিতে আসার, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বাড়ির কাজের লোকটি বাজার করে এসে সত্যি হিসেব দেবে কিংবা থানায় ভাড়াটের বিরুদ্ধে এজাহারে বাড়িঅলা সম্পূর্ণ সত্য বিবৃতি দেবে, এ রকম আশা করাও অন্যায়।

এগুলোর তবু কার্যকারণ আছে। এসব মিথ্যা-ভাষণের প্রয়োজন বোঝা কঠিন নয় এবং যে মিথ্যা বলছে তার কাছে এর প্রয়োজনও রয়েছে।

কিন্তু এর বাইরে এক ধরনের প্রয়োজনহীন মিথ্যা কথা আছে। মিথ্যা কথা বলার আনন্দেই সেই কথা। তার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য নেই, কারণ বা প্রয়োজনও নেই। মনের আনন্দে, নির্দ্বিধায়

উলটো-পালটা, বাঁয়ে-ডাইনে মিথ্যা কথা বলা অনেকের স্বভাব, এবং বলতে না পারলে এরা দম বন্ধ হয়ে পেট ফেটে মরে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যায়।

বলা বাহুল্য, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, টবে নীলমণি লতার চাষ করা কিংবা কালোজামের সিরাপ বানানোর মতো বহু লোকের হবি হল মিথ্যা কথা বলা। খারাপ মিথ্যা কথা নয়, নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়, সরল, নিষ্পাপ মিথ্যা কথা বলা কারও হয়তো সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার।

সে হয়তো এমন কথা বলবে, যার কোনও মানে নেই, যাতে কারো কোনও ক্ষতি হবে না, তারও কোনও লাভ হবে না। সে হয়তো বলবে, সে একবার রামপুরহাটে স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের বাগানে হলুদ রঙের অপরাজিতা ফুল দেখেছিল। সে হয়তো বলবে, 'কাল দুপুরে অমুক ব্যাঙ্কে যখন ডাকাতি হয়, আমি সেখানে চেক ভাঙাতে গিয়েছিলাম,' তারপর সে সেই ডাকাতির এবং ডাকাতদের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং লোমহর্ষক বিবরণ দেবে। কিন্তু তার সে বিবৃতি যদি কোনও কারণে পুলিশের কানে পৌঁছায় এবং পুলিশ সেই সূত্রে যদি তাকে জেরা করে, তা হলে মহা গোলমাল। কারণ সে সেই ব্যাঙ্ক মোটেই চেনে না, কস্মিনকালে তার চত্বরে সে পদার্পণ করেনি, এবার তা ছাড়া কাল দুপুরে সে গিয়েছিল মেয়ের সঙ্গে মেয়ের ইস্কুলে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড আনতে।

তা যাই হোক, এ ধরনের মিথ্যা কথায় আমাদের কারও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। গল্প, উপন্যাস, রূপকথা সবই অল্পবিস্তর এ জাতের। সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে অলীকবাবুর অলৌকিক কলমে যা সাহিত্যিকেরা লেখেন তা মিথ্যা নয়, সত্যিও নয়।

শুধু তাই নয়।

'সদা সত্য কথা বলিবে' এই মহৎ উপদেশবাক্য সদা সর্বদা গ্রাহ্য নয়। প্রকৃত জ্ঞানীরা বলেছেন, অপ্রিয় সত্য বলবে না। হয়তো জ্ঞানীদের রুচি ও বিবেকে বেধেছিল, তাই তাঁরা সরাসরি বলতে পারেননি, 'প্রিয় মিথ্যাকথা বলো।'

বিদেশি প্রবাদ আছে, যে মিথ্যাকথা কাউকে সান্ত্বনা দেয়, সুখী করে সে অনেক ভাল যে সত্যকথা কাউকে আহত করে আঘাত করে তার চেয়ে।

এসব তত্ত্বকথা আপাতত থাক। একটা স্বর্গীয় গল্প বলে এ যাত্রা শেষ করি।

একটি সরল প্রকৃতির বালক তার মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মা, স্বর্গে কোনও মিথ্যেবাদী আছে?' প্রচণ্ড নীতিপরায়ণা মা বললেন, 'অসম্ভব।'

বালকটি তবুও মাতৃদেবীর কাছে আরও জানতে চাইল, 'মা, স্বর্গে কোনও মিথ্যেবাদী যেতে পারে?'

মা এবার খুব চটে গেলেন, রেগে বললেন, 'বলছি না, তা সম্ভব নয়। কোনও মিথ্যেবাদী কোনওদিন স্বর্গে যায়নি, যাবে না, যেতে পারবে না।'

খোকা তখন বলল, 'মা, তা হলে স্বর্গে তো বড় কষ্টের জীবন হবে।'

মাতৃদেবী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন? স্বর্গে কষ্ট কীসের?'

খোকা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'স্বর্গে কার সঙ্গে খেলা করব? কার সঙ্গে গল্প করব?'

খোকার মা অতঃপর কিছু বলার আগেই খোকা নিজেই গুছিয়ে বলল, 'স্বর্গে তো ভগবান ছাড়া বড় জোর ওই তোমাদের মহাত্মা গান্ধী আর রামকৃষ্ণদেব থাকবেন, সেখানে কার সঙ্গে গল্প করব, কার সঙ্গে খেলা করব?'

কে কোথা ধরা পড়ে

কবি বলেছিলেন, প্রেমের ফাঁদে কে কোথায় যে ধরা পড়ে সেটা কে জানে?

আমরা কবির সঙ্গে একমত নই। প্রেমের ফাঁদে কেউ যদি ধরা পড়ে অর্থাৎ গদ্য করে বলা যাক কেউ যদি প্রেমে পড়ে—সেটা জানা কিংবা বোঝার জন্যে খুব বেশি কষ্টের প্রয়োজন নেই; শুধু নির্দিষ্ট লোকটির মুখের দিকে তাকালেই যথেষ্ট।

প্রেমের লক্ষণ কী কী? এ বিষয়ে কবিরা যুগে যুগে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বৈষ্ণব কবিতায়, ভারতচন্দ্রে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ভূরি ভূরি বিবরণ রয়েছে, প্রেম ও প্রেমিক-প্রেমিকার বিভিন্ন দশার।

আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাব না। কাব্যিক বিশ্লেষণ থাক, হাসির গল্পই আমার উপজীব্য।

বুক ধড়ফড় করা, চোখ লাল হওয়া, অনবরত অকারণ স্বেদাক্ত ও রোমাঞ্চিত হওয়া সেই সঙ্গে রাতে ঘুম না হওয়া প্রেমের স্বাভাবিক লক্ষণ।

ঘুম না হওয়ার একটা কাহিনী মনে পড়ছে। এক যুবক এক ফ্যাক্টরি মালিকের তনয়ার প্রেমে পড়েছিল। তারপরে যথারীতি যা যা হওয়া উচিত এবং অবশেষে ওই রাতে ঘুম না হওয়ার রোগ তার দেখা দিল।

প্রেমিকের এই দশা সহ্য করতে না পেরে শেষে প্রেমিকা প্রেমিককে পরামর্শ দিল তার বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানাতে, বিশেষ করে রাতে ঘুম হচ্ছে না এই কথা বলতে।

পরের দিন প্রেমিকটি এল। আজ তার মুখ আরও বেশি শুকনো। প্রেমিকাটি দুরুদুরু বক্ষে এবং কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল? বাবার সঙ্গে কথা বলোনি।' ছেলেটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম।' 'তোমার যে ঘুম হচ্ছে না, একথা বলেছ?' মেয়েটি গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি বলল, 'তাও বলেছিলাম।' মেয়েটি বলল, 'বাবা কী বললেন?' ছেলেটি বলল, 'তোমার বাবা বললেন, যে তাঁর কারখানার নাইটগার্ড পালিয়েছে, আমি ইচ্ছে করলে ওই নাইটগার্ডের চাকরিটা নিতে পারি।'

প্রেমিকারা মাঝে-মধ্যে মুখের ভাষাও হারিয়ে ফেলে, তারা কী যে বলতে চায় কেউ বুঝতে পারে না, তারা নিজেরাই কি ছাই বুঝতে পারে।

এইরকম এক প্রেমিক একদা আমাকে তার প্রেমিকার রূপ বর্ণনা করছিল। বাঁশির মতো নাক, অমাবস্যার মধ্যরাত্রির মতো অন্ধকার চুল, উত্তর ভারতের কোনও শস্যক্ষেত্রে চৈত্রের সন্ধ্যায় আদিগন্ত উজ্জ্বল পাকা গমের মতো গায়ের রং, স্বর্ণচম্পকের কলির মতো হাতের আঙুল—পাগলের মতো বলে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ সবকিছুর পরে চোখে এসে ঠেকে গেল। কেমন জড়িয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর, বলল, 'তার চোখ দুটি দেখতে, চোখ দুটি দেখতে... দেখতে... চোখদুটি ঠিক...।'

এরপরে সে সম্পূর্ণ আটকিয়ে গেল। তার গলা দিয়ে আর একটিও শব্দ বেরল না। বাধ্য হয়ে এবং ভদ্রতাবশত আমি অনুরোধ করলাম, 'বলে ফেলো। থামলে কেন? চোখ দুটো দেখতে ঠিক...।' সে ঢোক গিলে আমতা আমতা করে যা বলল, তার কোনও মানে হয় না; সে বলল, 'তার চোখ

সময়

সেই জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি যে সময়টা ভাল নয়। হয়তো আমার এবং আমার বয়সিদের ভাগ্যটাই খারাপ, আমরা জন্মেছিলাম দুর্দিনে। মহাযুদ্ধের ঠিক আগে আগে আর জ্ঞান হয়েছিল দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের মুখোমুখি। তারপরের দাঙ্গা, পার্টিশান হিংসা আর প্রতিহিংসার রক্ত আর কালিমালিপ্ত সেই ছিন্নমূল ইতিহাস তার প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি অধ্যায়ে লেখা রয়েছে, বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে 'খারাপ সময়, আরও খারাপ, আরও খারাপ সময়।'

এই দুঃসময় যাকে বলে খারাপ সময় আসল মহাভারতের পাতায় পাতায় তার কথা লেখা আছে। এক অস্থির সময়ের সেই মহাকাব্যে জীবনের সব দুর্গতি, সব দুর্ঘটনা আদ্যন্ত বিবৃত হয়েছে। দুঃসময় নয়, আমরা এখানে শুধু সময়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকছি।

প্রথমে একটা রূপকথা বলি।

কলকাতা জি পি ও-র গম্বুজের মাথায় বড় গোলঘড়িটাকে খুব হিংসে করত এক হাতঘড়ি। সেই হাতঘড়ি যাঁর কবজিতে, তিনি কাজ করতেন ওই জি পি ও-র পাশেই একটা অফিসে। প্রতিদিন জি পি ও-র পাশে বাস বা মিনিবাস থেকে নেমে তিনি অভ্যাসবশত অন্তত একবার ঘাড় উঁচু করে জি পি ও-র ঘড়িটার সময় দেখে নিতেন। একবার হাতঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে দুটোর সময়ের তারতম্যও হিসেব করতেন।

হাতঘড়িটা এসব পছন্দ করত না। প্রতিদিন সে দেখত যে শুধু তার মালিকই নয়, রাস্তায় অন্য লোকেরাও মাথা তুলে জি পি ও-র ঘড়িটা দেখে নিচ্ছে। খুবই হিংসে হত হাতঘড়িটার।

এর মধ্যে একদিন হল কী এক সন্ধ্যাবেলা খুব ভিড়ের বাসে ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে গিয়ে হাতঘড়ির মালিকের কবজি থেকে স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ঘড়িটা ফুটপাথের একপাশে পড়ে গেল, কারও নজরে পড়ল না।

সেদিন অনেক রাতে যখন কেউ কোথাও নেই, অফিসপাড়ার লালদিঘির চারদিক নিঝুম তখন সেই হাতঘড়িটা জি পি ও-র গোল থাম বেয়ে বড় গোল ঘড়িটার চেয়েও অনেক উঁচুতে একদম মিনার চূড়ায় উঠে গেল।

আজকাল সেই হাতঘড়িটা সেখানেই থাকে। অত উঁচুতে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু যখনই রাস্তার লোকরা মাথা উঁচু করে বড় গোলঘড়িটায় সময় দেখে, সে ভাবে সবাই তাকে দেখছে। সে জানে না তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর একটা সাদামাটা গল্প মনে পড়ছে। যেমন হয়, একটি মেয়ে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল, অনুরাগ অনেক দূর গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার বাবাকে বলে যে সে অমুক ছেলেকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়।

এখন হয়েছে কী, মেয়েটির বাবা হলেন রীতিমতো অবস্থাপন্ন, যাকে বলে বড়লোক তাই। তাঁর নিজের ব্যবসা, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি। তাঁর ছেলেমেয়ের সংখ্যাও যৎসামান্য তিন-চারটি।

আর এদিকে ভাবী পাত্রটি মাত্র দেড় হাজার টাকা মাইনের একটি চাকরি করে, তাও নিতান্ত এক বাংলা খবরের কাগজে।

মেয়ের কথা শুনে বাবা চিন্তান্বিত হলেন, মেয়েকে বললেন, 'এটা তুমি ঠিক করছ না। ওই

ছেলেটি, কী যেন নাম বললে, কী যেন মাইনে পায়! ওতে তো তোমাদের মাসের মধ্যে তিনদিনও হবে না। বাকি সাতাশদিন কী করবে? উপোস করবে?'

মেয়েটি অনেকক্ষণ নিথর দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি কি মাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে?'

পিতৃদেব খুব শঙ্কিতভাবে যেন খুব অন্যায় করেছিলেন এইরকম মুখভঙ্গিমা করে বললেন, 'না তো।'

মেয়ে এবার হাতে ট্র্যাম্প কার্ড পেয়ে গেছে, সে বলল, 'তা হলে?' বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তা হলে?' মেয়ে বলল, 'শোনো। ভালবাসার ব্যাপার অন্যরকম। তখন সময় কাটে ঝড়ের বেগে। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে একেকটা মাস যাবে একটা দিনের মতো। একটা দিনের জন্যে দেড় হাজার টাকা এ বাজারেও কম নয়।'

সময় কিংবা টাকার এ ধরনের হিসেব হয়তো অনেকেই পছন্দ করবেন না। এর চেয়ে কঠিন হিসেব একটা জানি। কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। কারণ ঘটনাটা আমাদের বাড়িতেই ঘটেছিল।

সামান্য বিশদ করে বলছি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের একটি প্রাচীন দেয়ালঘড়ি আছে। সেটাকে প্রত্যেক রবিবার সকালে দম দেওয়া হয়। ঘড়িটা দেয়ালে প্রায় সাড়ে ছয় ফিট উপরে লাগানো। আমি পায়ে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে কায়ক্লেশে নাগাল পাই কিন্তু কয়েক বছর আগে একটা মিনিবাসে ডাইনোসর যুগের এক অতিকায় মহিলা চপ্পল পরিহিত আমার বাঁ এবং ডান দু'পায়ের উন্মুক্ত বুড়ো আঙুলকে একসঙ্গে দলিত এবং মথিত করলেন। তারপর থেকে পায়ের পাতায় ভর করে আর দাঁড়াতে পারি না। আমার স্ত্রী তিনি শত চেষ্টা করেও ঘড়ির কাছে পৌঁছতে পারেন না। আমার ভাই, বিজন, সেই এতদিন চাবি দিত। এখন এখানে নেই। আমার ছেলে এসব কাজ খুবই পছন্দ করে, কিন্তু যতবার সে ঘড়িতে দম দিয়েছে ততবার স্প্রিং কেটে গেছে। সাতবার চাবি ঘোরাতে হয় দম দেয়ার সময়, কিন্তু তাতে তার মন সন্তুষ্ট হয় না। আরও কষে দম দেয়, আর চাবি কেটে যায়। ইতিমধ্যে একটি ছোট ছেলে আমাদের বাড়িতে কাজে লেগেছিল। বয়েসের তুলনায় বেশ লম্বা, চমৎকার হাতে পায় ঘড়িটা। তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। প্রত্যেক রবিবার সকালে, লম্বা রোগা হাত তুলে সে গুণে গুণে পর পর সাতবার খুব নরম আর আলগা করে চাবি দিত। তাতেই বুড়ো ঘড়িটা সারা সপ্তাহ ঠিক চলত।

এই ছেলেটা, নাম ভৃগুলাল, বছর খানেক কাজ করবার পর একদিন দেশে যাবে। যেদিন সে দেশে যাবে আগের দিন ছিল রবিবার, ঘড়িটায় সাপ্তাহিক দম দেবার দিন।

ভৃগুলাল যথারীতি কাজকর্ম করছে। আমি বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। দেখলাম ঘড়িটায় দম দিচ্ছে। কিন্তু মাত্র একপাক দম দিয়েই সে থেমে গেল। আমি ভাবলাম ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? স্প্রিংটা কি আটকিয়ে গেছে? আমি বলাম, 'কীরে ভৃগুলাল, চাবিটা কি আটকে গেল? একবার মাত্র দম দিলি কেন?' ভৃগুলাল নির্বিকার গম্ভীরমুখে বলল, 'আমি তো আর কাল থেকে থাকছি না। তাই শুধু আজকের দিনের জন্য দমটুকু দিলাম।'

সবাই অবশ্য আমাদের ভৃগুলালের মতো সময়-সচেতন নয়। সময় বিষয়ে একেকজন একেক রকমভাবে ভাবনা করে। অনেকদিন আগে এক আধুনিক বাঙালি কবি লিখেছিলেন, 'ঘড়িটা হঠাৎ কেন থেমে যায়?'

'তোমরা কোথায়?'

ঘড়ি হল সময়ের প্রতীক। সে কারও কথায় থামে না বা চলে না। সে চলে তার নিজস্ব, নির্দিষ্ট গতিতে। নদীর স্রোতের জোয়ার-ভাঁটা, উঠতি-পড়তি, কম-বেশি গতি আছে। কিন্তু সময় চিরকাল সমগতি। সে কারও জন্যে কোথাও ছুটে যায় না, কারও জন্যে কোথাও অপেক্ষাও করে না।

পুনশ্চ: কয়েকদিন আগে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম হরিণদের নানারকম কাঁচা

তরকারি কুটে খেতে দেওয়া হয়েছে। যে লোকটা খাবার দিচ্ছিল তাকে বললাম, 'তরকারিগুলো সেদ্ধ করে দিলে হরিণদের তাড়াতাড়ি হজম হত।' সে লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল, 'এসব জন্তু জানোয়ারের সময়ের কোনও অভাব নেই। একটু দেরি করে হজম হলে এদের কোনও অসুবিধা হবে না।'

হায় কবি, তুমি শুধু কবি

ছন্দের খাতিরে এবং একটি ভাল চুরি করার লোভে এই নিবন্ধের নামকরণেই কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

আসলে কোনও কবিই শুধু কবি নন। তিনি চাকুরিজীবী, সাংবাদিক বা অধ্যাপক, শখ করে কিংবা প্রাণের তাগিদে কিংবা তেমন তেমন ক্ষেত্রে সম্পাদকের তাগিদে মাঝে মধ্যে কবিতা রচনা করে থাকেন।

সবসময় কবিতা লেখা বা কবিতা আওড়ানো, কাব্যসাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকা অথবা সদাসর্বদা পদ্যের সৌরভে মশগুল হয়ে থাকা এসবই এক ধরনের পাগলামি, মোটেই কবিত্বের লক্ষণ নয়। এ ধরনের লেখককে সবাই যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে।

শুধু কবি হওয়া কঠিন। অন্তত এদেশে কঠিন, কোনও জীবিকা হওয়া সম্ভব নয়। কবিতা লিখে জীবন ধারণ, সংসার প্রতিপালন, গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত, শুধুমাত্র কবিতা লিখে অসম্ভব। একটা সাধারণ কবিতার বইয়ের দাম বড় জোর দশ টাকা। সবচেয়ে জনপ্রিয় বইটি যদি বছরে তিনটি সংস্করণও হয় তবে তার যা রয়ালটি প্রকাশক দেবেন (অবশ্য যদি দেন) সেটা যে কোনও অফিসের নিম্নতম কর্মচারীর বার্ষিক বেতনের এক তৃতীয়াংশ। যে কোনও নামকরা ডাক্তার বা উকিলের একবেলার আয়ের চেয়েও হয়তো কম।

কবির আলোচনায় টাকা-পয়সা ডেকে আনা মোটেই উচিত হল না। আর তা ছাড়া, এত উচ্চমার্গের আলোচনা সঠিক হচ্ছে না।

কবিতার ও কবির বিষয়ে আলোচনার সঠিক পটভূমিকা হল, লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। অতঃপর আমরা সেই হাসি হাসি গন্ধের পৃথিবীতে প্রবেশ করছি।

একবার এক তরুণ কবি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখুন, সম্পাদকেরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।' এ রকম কথা অনেকের কাছ থেকে অনেকদিন ধরেই শুনছি, তবু ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন?' তিনি বললেন, 'ষড়যন্ত্র না হলে আমার একই কবিতা পরপর সাতজন সম্পাদক ফেরত দেন।'

অন্য এক কবির বিয়ের ব্যাপারে একটা অত্যন্ত জটিল গল্প শুনেছিলাম। ঠিক বিয়ে নয়, বিয়ের আগের ব্যাপার। বিয়ে তখন প্রায় ঠিক হওয়ার পর্যায়ে এসেছে, এই সময় তরুণ কবি তাঁর প্রেমিকাকে খুব আশা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আমি যে কবিতা লিখি সে কথাটা তুমি তোমার বাড়ির লোকদের বলেছ?'

কবির ধারণা কন্যাপক্ষের অর্থাৎ তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর কবিপ্রতিভার কথা শুনলে নিশ্চয় গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কবিপ্রেমিকা যা বললেন সে নিতান্ত ভয়াবহ। প্রেমিকা বললেন, 'দ্যাখো আমি সব আস্তে আস্তে ভাঙছি। অল্প অল্প করে মা-বাবাকে সব বোঝাতে হচ্ছে। সব ধীরে ধীরে খুলে বলছি।' কবি একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'কী ধীরে ধীরে খুলে বলছ? ব্যাপারটা কী?'

প্রেমিকাটি বললেন, 'দ্যাখো রাগ করবে না। সব কথা একবারে বললে আমাদের বিয়েটা হয়তো ভেঙেও যেতে পারে। তুমি যে জুয়ো খেলো, তুমি যে মাঝে মধ্যে মদ খাও, তুমি যে এখনও বি. এ. পাশ করতে পারোনি এগুলো আস্তে আস্তে বলেছি। তবে তুমি যে কবিতাও লেখো একথাটা বলার সাহস পাইনি এখন পর্যন্ত। একদিন অবস্থা বুঝে সময়মতো বলব।'

এই প্রেমিকাটি শেষ পর্যন্ত তার বাড়িতে তার দয়িতের কাব্যচর্চার কথা বলেছিল কিনা এবং সত্যিই জুয়োখেলা কিংবা মদ্যপানের চেয়েও কবিতা লেখা খারাপ কিনা আমরা সে অগ্নিগর্ভ আলোচনায় প্রবেশ করব না।

তবে সেই ওমর খৈয়াম কিংবা তারও অনেক আগে শুরু হয়েছে; মাইকেল মধুসূদন থেকে ডিলান টমাস ছুঁয়ে এই কবিপ্রধান কলকাতা শহরের খালাসিটোলা-বারদুয়ারিতে কবিতার সঙ্গে মদিরা, মদিরার সঙ্গে কবিতা অনেকদিন একাকার হয়ে গেছে।

শুধু মদ্যপান নয়, যেন জীবনযাপনে বিশৃঙ্খলা কবিত্বের প্রধান উপাদান—এইরকম ধারণা অনেকের; অনেক কবি যশোপ্রার্থীর। বিট প্রজন্মের কবিদের উল্লেখ বা অনুসরণ করে অনেক আধাকবিই বিশৃঙ্খলতার সপক্ষে একটা যুক্তি খুঁজে নেন। এতে কারও কোনও ক্ষতি বা লাভ হয় না, শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হন সেই ব্যক্তি—যিনি কী চাইছেন বা কী করছেন সেটা জানেন না।

শুনেছি কোনও এক পাড়ার এক বড়দা এক নাবালক মাতাল আধাকবিকে ড্রেন থেকে তুলে মাঘ মাসের মধ্যরাতে টিউবওয়েলের নীচে শুইয়ে স্নান করাতে করাতে বলেছিলেন, 'অমুকদার কাছে মদ খাওয়াটা শিখলি, কবিতা লেখাটা শিখতে পারলি না। কবিতা যা লিখিস তাতে তোর চা খাওয়ারও যোগ্যতা নেই।'

সকলেই কবি না, কেউ কেউ অকবি। যার কবিতা লেখা হবে, মদ খেলেও হবে, মদ না খেলেও হবে, ফুটপাথে বা ড্রেনে পড়ে থাকলেও হবে, ঘরে শুলেও হবে।

বোধহয় এসব গূঢ় চিন্তা করেই সেই বহু বিদিত গ্রিক দার্শনিক তাঁর আদর্শ কল্পরাজ্যের থেকে কবিদের নির্বাসনের চিন্তা করেছিলেন। এরও চারশো বছর পরে মহাকবি ভার্জিলের পরম সুহৃদ স্যাটায়ার রচনার জনক কবি হোরাস (হেরোটিয়াস) কবিদের এক বিরক্তিকর প্রজাতি বলে অভিহিত করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে এই হালকা রচনায় মাথা গলাব না। দু'-একজন বিপজ্জনক কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাই ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। বরং দু'-একটা পুরনো গল্প স্মরণ করি।

বড় ভাই উঠতি কবি, তার বয়েস একুশ। রাত দিন পাতার পর পাতা ছাইভস্ম ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে যাচ্ছে। তার লেখাপড়া চুলোয় গেছে, এমনকী নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। সারাদিন মনের আবেগে খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে যাচ্ছে আর নিজের কবিতা আওড়াচ্ছে।

দাদা, মানে এই কবি বড়ভাই বাথরুমে গেছে। তার নীচে আরও এক ভাই, এক বোন আছে। ভাইয়ের বয়েস বছর বারো আর বোন ছোট, চার-পাঁচ বছর বয়েস হবে।

ছোট বোনটি, নাম ওই খুকু, একটু চঞ্চলা স্বভাবের, এ বয়সের মেয়েরা যেমন হয়। হঠাৎ মেজো ভাই দেখল বোনটি দাদার কবিতার খাতাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে এল। মা তখন রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে কুটনো কাটছিলেন, ভাই ছুটে গিয়ে সেখানে নালিশ জানাল, 'মা, তাড়াতাড়ি এসো, সর্বনাশ হয়েছে, খুকু এইমাত্র দাদার কবিতার খাতা উনুনে

কবির ধারণা কন্যাপক্ষের অর্থাৎ তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর কবিপ্রতিভার কথা জানলে নিশ্চয় গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কবিপ্রেমিকা যা বললেন সে নিতান্ত ভয়াবহ। প্রেমিকা বললেন, 'দ্যাখো আমি সব আস্তে আস্তে ভাঙছি। অল্প অল্প করে মা-বাবাকে সব বোঝাতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে খুলে বলছি।' কবি একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'কী ধীরে ধীরে খুলে বলছ? ব্যাপারটা কী?'

প্রেমিকাটি বললেন, 'দ্যাখো রাগ করবে না। সব কথা একবারে বললে আমাদের বিয়েটা হয়তো ভেঙেও যেতে পারে। তুমি যে জুয়ো খেলো, তুমি যে মাঝে মধ্যে মদ খাও, তুমি যে এখনও বি. এ. পাশ করতে পারোনি এগুলো আস্তে আস্তে বলেছি। তবে তুমি যে কবিতাও লেখো একথাটা বলার সাহস পাইনি এখন পর্যন্ত। একদিন অবস্থা বুঝে সময়মতো বলব।'

এই প্রেমিকাটি শেষ পর্যন্ত তার বাড়িতে তার দয়িতের কাব্যচর্চার কথা বলেছিল কিনা এবং সত্যিই জুয়োখেলা কিংবা মদ্যপানের চেয়েও কবিতা লেখা খারাপ কিনা আমরা সে অগ্নিগর্ভ আলোচনায় প্রবেশ করব না।

তবে সেই ওমর খৈয়াম কিংবা তারও অনেক আগে শুরু হয়েছে; মাইকেল মধুসূদন থেকে ডিলান টমাস ছুঁয়ে এই কবিপ্রধান কলকাতা শহরের খালাসিটোলা-বারদুয়ারিতে কবিতার সঙ্গে মদিরা, মদিরার সঙ্গে কবিতা অনেকদিন একাকার হয়ে গেছে।

শুধু মদ্যপান নয়, যেন জীবনযাপনে বিশৃঙ্খলা কবিত্বের প্রধান উপাদান—এইরকম ধারণা অনেকের; অনেক কবি যশোপ্রার্থীর। বিট প্রজন্মের কবিদের উল্লেখ বা অনুসরণ করে অনেক আধাকবিই বিশৃঙ্খলতার সপক্ষে একটা যুক্তি খুঁজে নেন। এতে কারও কোনও ক্ষতি বা লাভ হয় না, শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হন সেই ব্যক্তি—যিনি কী চাইছেন বা কী করছেন সেটা জানেন না।

শুনেছি কোনও এক পাড়ার এক বড়দা এক নাবালক মাতাল আধাকবিকে ড্রেন থেকে তুলে মাঘ মাসের মধ্যরাতে টিউবওয়েলের নীচে শুইয়ে স্নান করাতে করাতে বলেছিলেন, 'অমুকদার কাছে মদ খাওয়াটা শিখলি, কবিতা লেখাটা শিখতে পারলি না। কবিতা যা লিখিস তাতে তোর চা খাওয়ারও যোগ্যতা নেই।'

সকলেই কবি না, কেউ কেউ অকবি। যার কবিতা লেখা হবে, মদ খেলেও হবে, মদ না খেলেও হবে, ফুটপাথে বা ড্রেনে পড়ে থাকলেও হবে, ঘরে শুলেও হবে।

বোধহয় এসব গূঢ় চিন্তা করেই সেই বহু বিদিত গ্রিক দার্শনিক তাঁর আদর্শ কল্পরাজ্যের থেকে কবিদের নির্বাসনের চিন্তা করেছিলেন। এরও চারশো বছর পরে মহাকবি ভার্জিলের পরম সুহৃদ স্যাটায়ার রচনার জনক কবি হোরাস (হেরোটিয়াস) কবিদের এক বিরক্তিকর প্রজাতি বলে অভিহিত করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে এই হালকা রচনায় মাথা গলাব না। দু'-একজন বিপজ্জনক কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাই ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। বরং দু'-একটা পুরনো গল্প স্মরণ করি।

বড় ভাই উঠতি কবি, তার বয়েস একুশ। রাত দিন পাতার পর পাতা ছাইভস্ম ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে যাচ্ছে। তার লেখাপড়া চুলোয় গেছে, এমনকী নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। সারাদিন মনের আবেগে খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে যাচ্ছে আর নিজের কবিতা আওড়াচ্ছে।

দাদা, মানে এই কবি বড়ভাই বাথরুমে গেছে। তার নীচে আরও এক ভাই, এক বোন আছে। ভাইয়ের বয়েস বছর বারো আর বোন ছোট, চার-পাঁচ বছর বয়েস হবে।

ছোট বোনটি, নাম ওই খুকু, একটু চঞ্চলা স্বভাবের, এ বয়সের মেয়েরা যেমন হয়। হঠাৎ মেজো ভাই দেখল বোনটি দাদার কবিতার খাতাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে এল। মা তখন রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে কুটনো কাটছিলেন, ভাই ছুটে গিয়ে সেখানে নালিশ জানাল, 'মা, তাড়াতাড়ি এসো, সর্বনাশ হয়েছে, খুকু এইমাত্র দাদার কবিতার খাতা উনুনে

আগুনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে।' মা-র মধ্যে কিন্তু ভাবান্তর দেখা গেল না, তিনি বললেন, 'সেকী। খুকু এরই মধ্যে কি পড়তে শিখেছে?'

শেষ গল্পটি তিরিশ বছরের পুরনো। তখনকার এক দুর্দান্ত ও দুর্মদ কবিকে মধ্যরাতে পুলিশ রাস্তায় মাতলামি করার অজুহাতে থানায় নিয়ে এল। রাতটা থানার লকআপে কাটল। পরদিন সকালে, সেই থানায় যে বড়বাবু তিনি আবার পুলিশ হলেও খুব নীতিবাগীশ, কবিকে ছেড়ে দেবার আগে একচোট উপদেশ দিলেন। অবশেষে মদ্যপানের বিরুদ্ধে একটা উদাহরণ দিয়ে কবিকে বললেন, 'আচ্ছা, এখানে যদি এক গামলা জল আর এক গামলা হুইস্কি রাখি, তারপর একটা গোরুকে নিয়ে আসি, সে কোনটা খাবে?'

এই অবান্তর প্রশ্নে কবি চুপ করে থাকায় বড়বাবু নিজেই প্রাঞ্জল হলেন, বললেন, 'বুঝলেন মশায়, সে আপনার মতো ওই মদটা খেতে যাবে না, স্বাভাবিকভাবেই সে জলটা খাবে।'

এতক্ষণ চুপ করে তাকার পরে কবি এবারে মুখ খুললেন, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'হ্যাঁ সেইজন্যেই সে গোরু, আর আমি কবি।'

রোগীর বন্ধু

রবীন্দ্রনাথের রোগীর বন্ধু প্রহসনের দুঃখীরাম ডাক্তার ছিলেন না। তিনি রোগীর বন্ধুও ছিলেন না। শুধু রোগী কেন, ডাক্তারদেরও তিনি শত্রুতা করেছেন।

দুঃখীরামের মতে, 'অ্যালোপ্যাথরা তো বিষ খাওয়ায়। ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।' আর, 'হোমিওপ্যাথি তো শুধু জলের ব্যবস্থা।' এবং বদ্যি দেখানোর চেয়ে দুঃখীরামের মতে, 'খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান না কেন?'

দুঃখীরামবাবুর প্রতি আমার নিজস্ব মনোভাব সদয় নয়। তিনি ডাক্তারদের অপবাদ দেন, রোগীকে অযথা ভয় দেখান। কিন্তু কালক্রমে, দৈবের অদৃশ্য লিখনে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আরেক দুঃখীরাম হয়ে উঠেছি।

হয়তো কোনও রোগী বা অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুভয় দেখানোর মতো অমানুষ আমি নই কিন্তু সেই কবে থেকে আমি ডাক্তারবাবুদের অপবাদ দিয়ে যাচ্ছি, তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছি তাঁরা যে আজও আমি অসুস্থ হলে আমাকে দেখতে আসেন, ওষুধের দোকানি আজও আমাকে ওষুধ দেন সেটাই আশ্চর্য।

অথচ ভাল ডাক্তার দেশে যে নেই তাতো নয়। আমি এক ডাক্তারবাবুকে জানি কঠিন রোগগ্রস্ত আমার এক আত্মীয়কে যিনি চিকিৎসা করছিলেন। সেই মহিলা একটি অনারোগ্য অসুখে ভুগছিলেন, তিনি জানতেন, (তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন), তিনি বুঝেছিলেন এই অসুখই তাঁর কাল, তবু স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত তিনি ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর পরমায়ু কত? তিনি আর কতদিন বাঁচবেন?

ডাক্তারবাবু ভাল লোক, সৎ লোক। একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনি কি টিভিতে কোনও নতুন সিরিয়াল দেখছেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কোনও রবিবাসরীয় বা সাময়িক পত্রিকায় কোনও ধারাবাহিক লেখা পড়তে আরম্ভ করেছেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এটা ঠিক করেননি। আর কোনও নতুন ধারাবাহিক সিরিয়াল দেখা বা ধারাবাহিক লেখা পড়া আরম্ভ করা উচিত হবে না।' ডাক্তারবাবুর বক্তব্য পরিষ্কার হলেও, ওই মহিলার পক্ষে ভাল নয়। ডাক্তারবাবুর মতে একটা ধারাবাহিক যতদিন চলবে ততদিন পর্যন্ত মহিলার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়। চিকিৎসকেরা অনেক সময় এ জাতীয় প্রশ্নে নিষ্ঠুর জবাব যে দেন না তা নয়, অনেক সময় না দিয়ে উপায় থাকে না।

এক চিকিৎসককে মধ্যরাতে ফোন করে ঘুম থেকে তুলেছিলেন এক অনিদ্রার রোগিণী। সারাদিন এবং সন্ধ্যার কঠোর পরিশ্রমের পর সদ্য ঘুমিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। ঘুম থেকে উঠে ফোন তুলে তিনি শুনতে পেলেন রোগিণীর প্রশ্ন, 'ডাক্তারবাবু আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

ডাক্তারবাবু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, কী হয়েছে?' রোগিণী বললেন, 'আপনি তো বেশ ঘুমোচ্ছেন। এদিকে আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না। দু'বার ঘুমের ওষুধ খেলাম। তাও ঘুম কেটে কেটে যাচ্ছে। এখন আমি কী যে করি?'

রোগিণীর জিজ্ঞাসা শুনে ডাক্তারবাবুর ঘুম সম্পূর্ণ চটে গেল। তিনি বললেন, 'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ফোন ধরে থাকুন। আমি আপনাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাচ্ছি।' এই বলে হেঁড়ে, বেসুরো গলায় ফোনে গান গাইতে লাগলেন, 'খুকু ঘুমোলো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে...' ইত্যাদি।

অনিদ্রা রোগিণীর এই গল্প সত্যি হলেও হয়তো হতে পারে। কিন্তু দুর্বল হৃদয়া রোগিণীর ঘটনাটা সত্যি নয়। এক কুৎসিত দর্শনা এবং দুর্বলহৃদয়া রোগিণী ডাক্তারবাবুকে বড় জ্বালাচ্ছিলেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে বলেছেন যে তাঁর হার্ট ভাল নয়, সাবধানে থাকতে। সবসময়ে লক্ষ রাখতে যে কখনও হাঁপ ধরে না যায়, কোনও শক না লাগে।

মহিলা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, 'আমি কি পাঁঠার মাংসের মেটে খেতে পারি?' 'আমি কি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আস্তে আস্তে উঠব?' 'আমি কি ভয়ের সিনেমা দেখতে পারি?'

একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তরে কোনওটায় 'হ্যাঁ', কোনওটায় 'না' বলতে বলতে অবশেষে ডাক্তারবাবু ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বললেন, 'দেখবেন কোনও কিছুতে যেন শক না লাগে। চমকে না ওঠেন হঠাৎ।' রোগিণী বললেন, 'যেমন?' রোগিণীর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'যেমন, আয়নায় মুখ দেখবেন না। কখনও আয়নার কাছে যাবেন না।'

এই কাল্পনিক ডাক্তার রোগীকে খুশি রাখতে চান না এবং নিতান্ত বাধ্য হয়ে, তিতিবিরক্ত হয়ে কটুবাক্য ব্যবহার করেছেন। তবে অনেক সময় চিকিৎসকেরা না বুঝেও রোগীর মনে আঘাত দিয়ে থাকেন।

এক তরুণ কবির চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা মাত্র কয়েকদিন আগে একটা কাগজে পড়লাম। এই কবিকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি, যখন সে নিতান্ত নাবালক অথচ কবিতা লেখা আরম্ভ করেছে তখন থেকে তাকে এবং তাদের দলের প্রায় সবাইকার সঙ্গে আমার একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। সে থাকে একটা প্রত্যন্ত জেলার সদর শহরে এবং সেখান থেকে ডাকে কবিতা পাঠায় কলকাতায়। সেখান থেকেই যোগাযোগ রক্ষা করে। আমি যতবার সেই শহরে গেছি তার এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছি, খোঁজখবর নিয়েছি। দুয়েকবার তারাও আমাকে উৎসাহভরে সভা সমিতিতে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায় এসে।

কিন্তু তরুণ কবিটি এবার মোক্ষম বিপদে পড়েছে। যাকে বলে রীতিমতো চিকিৎসা বিভ্রাটে। চিকিৎসা বিভ্রাটের অতুলনীয় বিচিত্র গল্প পরশুরাম লিখেছিলেন। কিন্তু অনেক সময়েই ব্যাপারটা অত সরস নয়।

তরুণ কবি স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন হাইড্রোসিল অপারেশন করার জন্যে। কিন্তু অপারেশন করার পরে নাকি বোঝা গেছে যে তার হাইড্রোসিল নয় হয়েছে ফাইলেরিয়া।

অবশ্যই এই দুই রোগের দুইরকম চিকিৎসা। যে ডাক্তার রোগ নির্ণয় করলেন আর যিনি অপারেশন করলেন, যে যাঁর মতো ভেবেছেন। সুখের বিষয় তরুণ কবি এখন ভাল আছেন এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু সবসময় সুখবর এত সহজ হয় না। দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে যাব না। এই সূত্রে একটা বিলিতি হাসির আখ্যান বলি।

গল্পটি পুরনো, বোধহয় আগেও লিখেছি। এক ব্যক্তি তার ডাক্তারকে বলেছিলেন, 'স্যার, একটু দেখেশুনে আমার চিকিৎসা করবেন। আমার জামাইবাবু গত মাসে মারা গেলেন, তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল টাইফয়েডের কিন্তু হয়েছিল নিউমোনিয়া। আমার অফিসের বড়বাবুর ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হল কিন্তু হয়েছিল এনসেফেলাইটিস। তিনিও মারা পড়েছেন।' শুনে চিকিৎসক গম্ভীর হয়ে রোগীকে আশ্বস্ত করলেন, 'অত ভয় পাবেন না। আমি যে রোগের চিকিৎসা করি, সেই রোগেই রোগীরা মারা যায়। আমি যদি আপনার টাইফয়েড বলে চিকিৎসা করি আপনি টাইফয়েডেই মারা যাবেন। নিউমোনিয়া বা ম্যালেরিয়ায় নয়।'

রসুন

কবিরাজ কুলতিলক শ্রীযুক্ত শিবকালী ভট্টাচার্য মহোদয়ের সাজানো বাগানে অনুপ্রবেশ করবার এ কোনও ব্যর্থ প্রয়াস নয়।

এই হাস্যকর নিবন্ধমালায় রসুন অন্তর্ভুক্ত করে আমি আমার পচা তরকারি বা মাছ-মাংসে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা আনতে চাচ্ছি, এমন কথা যদি কোনও নবীন পাঠক কিংবা প্রবীণা পাঠিকা ভেবে বসেন, এবং বক্র হাসেন শুধু তাঁর এবং তাঁদের নিতান্ত অবগতির জন্যে জানাই এ শুধু অলস মায়া। শুধুই ডাক্তারবাহিনী আর রোগীর কাহিনীর অন্তে অন্তত একটি ওষুধ বা একটি ভেষজ, অথবা একটি নিরোগদায়িনী লতা নিয়ে আলোচনা থাকা উচিত তাই রসুন নিয়ে এই নিবন্ধ।

রসুনের উপকারিতা এবং রোগ নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে সম্প্রতি কিছুদিন হল খুব শোরগোল উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল যে এখন যখন শরীরে শরীরে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদয়ে হৃদয়ে দুর্বলতা, গৃহে গৃহে স্নায়ু বৈকল্য সেইসময় রসুন এই সমস্ত রোগের প্রতিষেধকরূপে চিহ্নিত হয়ে বহুপ্রিয় হয়েছে।

নানারকম শোনা যাচ্ছে। যেমন এক কোয়াযুক্ত রসুন, দু'কোয়া বা ততোধিক কোয়াযুক্ত রসুনের

অনেক বেশি উপকার দেয়। সুযোগ বুঝে হাটে-বাজারে, বিবাদী বাগের ফুটপাতে এক কোয়া রসুনের ঝুড়ি নিয়ে ব্যাপারি দাঁড়িয়ে গেছে, এবং সে রসুনের দামও পঁচিশ-ত্রিশ টাকা কেজি।

দায়ে পড়ে, রসুনের গুণ বিশ্বাস করে বহু লোক কিনছেন। অতি শৌখিন ব্যক্তিও, যিনি ইনটিমেট সৌরভ এবং ওল্ড স্পাইস সেভিং লোশনে আসক্ত, তিনি পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে এই কটুগন্ধ পদার্থটি চিবিয়ে গলাধঃকরণ করছেন। সারাদিন গন্ধে তাঁর কাছে এগোনো যাচ্ছে না।

একদা কথা ছিল যে দৈনিক একটি করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকবে। আপেল স্বাস্থ্যের এবং শরীরের পক্ষে কতটা ভাল ও প্রয়োজনীয় এটা বোঝানোর জন্যেই একথা বলা হত।

অধুনাকাল আপেলের আর সে মর্যাদা নেই। তার স্থান নিয়েছে রসুন। এবং সে শুধু এই আয়ুর্বেদের দেশেই নয় সাহেবদের দেশেও। এখন আপেলের ওই প্রবাদ বাক্যের স্থলে যে রসিকতা বিলেতে চালু হয়েছে সেটি হল, 'প্রতিদিন একটা করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকবে আর প্রতিদিন একটা করে রসুন খেলে শুধু ডাক্তার নয় সবাই দূরে থাকবে।'

অর্থাৎ, রসুনের গন্ধে কেউই কাছে ঘেঁষবে না। সবাই দূরে দূরে থাকবে।

এই সূত্রে একটি সর্বাধুনিক ডায়েটিংয়ের গল্প মনে পড়ছে। কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গিনী এক মেমসাহেবকে ডাক্তার ওজন কমানোর জন্যে রসুনের ডায়েটিং করান। সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এক কোয়া রসুন, দুপুরে লাঞ্চের সময় রসুন বাটা মিশিয়ে স্যান্ডউইচ আবার রাতে ডিনারের সময় রসুন ফ্রাই। কয়েকদিন পরে মেমসাহেবের এক বান্ধবী তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'ওজন কিছু কমল?' সুরসিকা মেমসাহেব জবাব দিলেন, 'না ওজন তেমন কমেনি। তবে প্রেমিকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।'

রসুন দিয়ে অতিরিক্ত রসিকতা করার আগে দু'-একটি তথ্য স্বীকার করে নিই।

যদিও এই সেদিন পর্যন্ত বর্ণ-হিন্দুর রান্নাঘরে রসুনের প্রবেশাধিকার ছিল না। সারা পৃথিবীতে এখন প্রায় দুশো কোটি কিলোগ্রাম রসুন খাওয়া হয়। তার মানে এই যে মাথা প্রতি দু'দিনে এক কোয়া করে রসুন খাওয়া হয়।

সম্প্রতি এক ধরনের গন্ধহীন রসুনের বড়ি বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করে জাপান সেটা মার্কিন দেশের বাজারে ছেড়েছে এবং প্রথম বছরেই আমেরিকায় তিরিশ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

বলা বাহুল্য এ ধরনের গন্ধমুক্ত রসুনের বড়ি আমাদের দেশেও এখন চলছে, যে কোনও ওষুধের দোকানেই দু'-চার রকম এ ধরনের ওষুধের শিশি পাওয়া যায়। তার দামও বেশ চড়া। তবুও ভাল বিক্রি হচ্ছে সেটা যে কোনও কাগজে এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের বহর দেখলেই বোঝা যায়।

শুধু আমাদের সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নয়, সোয়া শো বছর আগে লুই পাস্তুরের মতো মহান বিজ্ঞানী রসুনের অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা ধরতে পেরেছিলেন। রসুনের মধ্যে গন্ধকের উপাদান রয়েছে। রসুন সংক্রমণ প্রতিহত করে। রক্তে কোলেস্টরল কমায়, মেদ বৃদ্ধি ঠেকিয়ে রাখে।

বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকেরা রসুনের নানা গুণের কথা এখন বলছেন। একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন যে রসুন শব্দের সন্ধি হল রস+উন, উন মানে কম যেমন ঊনত্রিশ মানে ত্রিশের এক কম। এতে অম্লরস ছাড়া আর সব রসই রয়েছে বলে এর নাম হয়েছে রসুন, মূল শব্দটি দেশজ বা বিদেশি নয় প্রকৃত সংস্কৃত।

অভিধান থেকে ব্যাপারটা যাচাই করতে গিয়ে সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' দেখে ব্যাপারটা প্রত্যয় হল। রসুন রান্নাঘরে যতই ব্রাত্য হোক, আলু কপি এ সমস্তের ঢের আগে থেকে রসুন ভারতবর্ষে রয়েছে।

সে যা হোক, অভিধানের সূত্রে অন্য একটি অপ্রাসঙ্গিক গল্প মনে পড়ছে। এক গ্রাম্য ব্যক্তি ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান দেখে স্বচেষ্টায় ইংরেজি শেখে। দুঃখের বিষয় সেই ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারিতে দু'-একটা ছাপার ভুল ছিল। সেই বইয়ে ইংরেজি গারলিক শব্দের অর্থে রসুন ছাপতে গিয়ে র শব্দটির নীচের বিন্দুটি বাদ পড়ে যায় ফলে রসুনের জায়গায় বসুন ছাপা হয়। তাই ওই ব্যক্তি

ধরে নিয়েছিল গারলিক মানে বসুন। ফলে একদিন যখন এক সাহেব তার বাড়িতে বেড়াতে এল, সে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সাহেবকে বলল, 'গারলিক স্যার, গারলিক'। অর্থাৎ বসুন স্যার, বসুন।'

এই গল্পটি নিতান্ত গোপাল ভাঁড় মার্কা। বহুদিন আগে বটতলার রসিকতার বইতে পড়েছিলাম। রসুন বিষয়ে একটা পুরনো মজার গল্প দিয়ে এই আখ্যান শেষ করব। তার আগে, সম্প্রতি একটি পত্রিকায় রসুন বিষয়ে কিছু তথ্য পেয়েছি সেটা জানাই।

আড়াইশো বছর আগে ফরাসি দেশে প্লেগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। মৃতদেহ সৎকারের জন্যে লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েকজন বন্দিকে ওই মৃতদেহ সৎকারের কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা কিন্তু প্লেগে আক্রান্ত হয়নি। পরে অনুসন্ধান করে জানা যায় তারা দু'বেলা রসুনের ঝোল খেত। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে ক্ষয়রোগ পর্যন্ত সব অসুখেই রসুন উপকারী, বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত চিকিৎসকেরা এ ধরনের মত দিয়েছেন। বলা হয়, বুলগেরিয়ার লোকেরা যে দীর্ঘজীবী তার কারণ হল তারা নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে রসুন খায় বলে।

তা হলে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যে বলতেন রসুন শরীর গরম করে, রসুন বেশি খেতে নেই। সেটা কেন বলতেন? বহুকাল ধরে যে ধারণা যুগপরম্পরায় চলে আসে তারও তো কোনও ভিত্তি থাকে।

সে যাক, আমরা মজার গল্পে ফিরে যাই। গল্পটি এর আগে যদি কেউ শুনে বা পড়ে থাকেন ক্ষমা করবেন।

এক বড় সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি দৈনিক লাঞ্চের সময় এক বোতল বাংলা মদ খেয়ে আসতেন। তারপর সাহেব যাতে গন্ধ না পান সেইজন্যে খুব কড়া জর্দা দিয়ে পান খেয়ে কাজে ফিরতেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ ঢুকল রসুনের চিন্তা। রসুন খেলে অসুখ হয় না, স্বাস্থ্য ভাল থাকে ইত্যাদি। তিনি রসুন চিবিয়ে খাওয়া শুরু করলেন এবং ঠিক করলেন দুপুরে মদ খেয়ে আসার সময় আর জর্দা পান খাবেন না তার বদলে রসুন চিবিয়ে আসবেন, সাহেব মদের গন্ধ টের পাবেন না।

সাহেব কিন্তু ঠিকই টের পেলেন এবং যা বললেন সেটা ভয়াবহ, 'দ্যাখো গত পনেরো বছর ধরে আমি তোমার ধেনো মদের সঙ্গে জর্দার গন্ধ সহ্য করে গেছি, কিন্তু এই যে এখন শুরু করেছ ধেনো মদের সঙ্গে রসুনের গন্ধ এটা আর সহ্য হচ্ছে না।'

রসিকতা

দুর্লভ মানবজন্মের মহামূল্য দিনগুলি ইয়ারকি দিয়ে কেটে যাচ্ছে আমার। কী কুক্ষণে যে রসিকতা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল যতবার তাকে ঘাড় থেকে ঝাঁকি দিয়ে ঠেলে দিতে যাই সে আমাকে আরও জড়িয়ে ধরে।

এখন মনে হচ্ছে আর পরিত্রাণ নেই। এ ভূতের হাত থেকে এ জন্মে আর পরিত্রাণ পাব না।

রসিকতার মহত্ত্ব সম্পর্কে কত বড় বড় কথাই যে এ যাবৎ শুনেছি। সেই এক দার্শনিক বলেছিলেন, যার রসবোধ নেই, সে মানুষই নয়। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের পার্থক্য এইখানে যে জানোয়ার রসিকতা করতে জানে না।

দার্শনিক মহোদয়ের এই আপ্তবাক্য অবশ্য আমার কাছে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। সুরসিক দু'-একটি জন্তু, বাঁদর, শুশুক এমনকী কুকুর-বিড়ালের কথা আমরা জানি। ছোট কুকুরছানার লেজ টুঁটি নিয়ে টেনে পালিয়ে যায় এমন ফাজিল কাকও অনেক দেখেছি।

জীবজন্তুর রসিকতা বিষয়ে কথা বাড়ানোর মতো রসদ আমার হাতে আজ নেই, আমি আপাতত রসিকতার স্বভাবচরিত্র নিয়ে সামান্য দু'-একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

রসিকতা ও হাসির গল্পের স্বভাব লক্ষণ হল যে এইসব গল্পগুলো মহাকাশের ধূমকেতুর মতো অনেকদিন পর পর ঘুরে ফিরে আসে। কিছুদিন ধরে কোনও একটা রসিকতা বৃত্তাকারে ঘুরপাক খায় হাটে-বাজারে, অফিস-কাছারিতে, ক্লাবে-বারে এগুলো লোকমুখে চলতে চলতে তারপর একদিন হারিয়ে যায়। কেউ আর মনে রাখে না। অনেকে একটা হাসির গল্প আজ হয়তো শুনল, তারপর তারা সেই গল্পটা কাল অন্যদের বলল। তারপর সেই অন্যেরা পরশুদিন আরও অন্যদের বলল সবাই খুব হাসাহাসি করল, তারপর যথারীতি একদিন ভুলে গেল।

যদি কেউ অনেকদিন বেঁচে থাকে, যদি তার স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় সে হয়তো দেখবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে সেই গল্পটা আবার ঘুরে এসেছে। লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। সেই গল্প লোকেরা বলছে, লোকেরা শুনছে। শুনে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

তিন-চার দশক আগের কোনও বিলিতি ম্যাগাজিন যদি খুলি, এমনকী আমাদের পুরনো 'ইদানীং' বা 'অচলপত্র', বিস্ময় সহকারে আবিষ্কার করব এখনকার সবচেয়ে বাজার-চালু গল্প সেইখানে ছাপা রয়েছে। এমনকী আমার এই অপাঠ্য মহাভারতেও হয়তো পাঠকেরা খুঁজে পাবেন সেইসব সরস উপাখ্যান।

একটা রসিকতার পরমায়ু পাঁচ-ছয় মাস, বড় জোর একবছর। হয়তো নিউইয়র্কে যেটা শোনা গেল যেদিন তার তিনদিনের মাথায় সেটা উড়ে এল লন্ডনে। সেখান থেকে অন্য আকারে অন্য ভাষায় পৌঁছাল দিল্লি, দিল্লি থেকে কল্কাতায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেই রসিকতা হলুদ হয়ে যাওয়া কাঁঠাল পাতার মতো উড়ে গেল মহাকালের হাওয়ায়। কিন্তু একদিন সেই রসিকতা আবার কোথায় কুড়িয়ে পেল সবুজতা, হরিৎ আভা, ঘরে ঘরে চায়ের আসরে, বার লাইব্রেরির কালো কোট পরা উকিলেরা, সাদা অ্যাপ্রন পরা, সাদা মুখোশে নাক ঢাকা শল্য চিকিৎসকবৃন্দ সকলেই আবার অবসরে বলতে লাগলেন, 'শুনেছেন সেদিন ভারতমাতা হোটেলে...।'

ভারতমাতা হোটেলের গল্পটা মর্মান্তিক হাসির গল্প। বিস্তারিত বলা প্রয়োজন।

এক ভদ্রলোক ভারতমাতা হোটেলে খেতে গিয়েছেন। ভারতমাতা হোটেলের স্পেশাল হল পাঁঠার মাংস। সেদিন নানা কাজ সেরে তাঁর হোটেলে যেতে যেতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে যায়, গিয়ে নির্দিষ্ট টেবিলে বসে ভদ্রলোক বেয়ারাকে বলেন, 'ভাত-মাংস।'

বেয়ারা পুরনো খদ্দেরকে দুঃখিত করতে চাননি তবু বাধ্য হয়ে বললেন, 'স্যার, মাংস ফুরিয়ে গেছে।'

এই কথা শুনে ভদ্রলোক উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বেয়ারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলল, 'স্যার উঠবেন না, আমি দেখছি, কী করা যায়। একটু চেষ্টা করে দেখছি।'

এই বলে বেয়ারা হোটেলের রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরের দরজার কাছেই শুয়ে ছিল একটা কুকুর। অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে বেয়ারাটি কুকুরের পা মাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার করে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল।

এদিকে হয়েছে কী শহরের মেয়র মহোদয় স্বয়ং কবুল করেছেন যে তাঁর শহরে পাঁঠার মাংসের বদলে হামেশাই কুকুরের মাংস চালানো হচ্ছে। মেয়র সাহেবের ওই উক্তি সুরঞ্জিত হয়ে প্রতিদিন কাগজে কাগজে বেরোচ্ছে।

সুতরাং কুকুরের আর্তনাদ শোনামাত্র ভদ্রলোক বুঝলেন এখনই তাঁকে মাংস দেয়ার জন্যে একটা কুকুর কাটা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজনালয় থেকে তিনি পলায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা

মাংসের ডেকচির তলা কুড়োনো কয়েক টুকরো হাড়, চর্বি সমেত একটু শুকনো ঝোল একটা প্লেটে নিয়ে এসে দেখে মাননীয় খদ্দের উধাও।

এই গল্প এখন কলকাতা শহরের বাজারে চলছে। কিন্তু তিরিশ বছর আগেও আরেকবার এ গল্প লোকমুখে ফিরেছে। তারও বহু আগে লন্ডনের স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনে এ গল্প ছাপা হয়েছিল। আরও পিছিয়ে গেলে হয়তো নাসিরুদ্দিনে অথবা মার্ক টোয়েনে এ গল্প পাওয়া যেতে পারে।

অতঃপর রসিকতার বিপজ্জনক দিকটি বলি।

কবি অরবিন্দ গুহ, যিনি ইন্দ্র মিত্র নামে সুপ্রসিদ্ধ, তাঁর মতো মজার গল্প ভূভারতে কখনও কাউকে বলতে শুনিনি। আমাদের চেনাজানা সব হাসির গল্প তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে অনবদ্য হয়ে ওঠে। সেই অরবিন্দ বহুদিন আগে একবার রসিকতা বিষয়ে এই ভয়াবহ গল্পটি বলেছিলেন।

অরবিন্দ একটা সরকারি অফিসে কাজ করতেন। সেই অফিসের এক বড়বাবুর বদ অভ্যাস ছিল হাসির গল্প করা। তিনি যে খুব ভাল রসিকতা করতে পারতেন তা নয়। কিন্তু প্রতিদিন দুপুরে টিফিনের সময় জমিয়ে আধঘণ্টা বা তারও বেশি সময়, টিফিনের সময় অতিক্রান্ত করে তিনি তাঁর যোগ্যতা মতো যথাসাধ্য হাসির গল্প সবাইকে শোনাতেন। যাঁরা শুনতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধস্তন কর্মচারী, তাঁর বিভাগেই কাজ করেন, তাঁরাও এসব গল্প শুনে, কোনও কোনও গল্প বারবার শুনে যথারীতি হাসতেন।

স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় অরবিন্দ নিজেও বড়বাবুর এই আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতেন। এইসময় অফিসের নিয়মানুযায়ী অরবিন্দ এই সুরসিক বড়বাবুর দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলি হয়ে গেলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল সম্ভবত অরবিন্দ অতঃপর আর এই মধ্যাহ্ন আড্ডায় আসবেন না। কিন্তু পুরনো জায়গার মায়াতেই হোক অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক পরের দিন বেলা দু'টোয় টিফিন হওয়া মাত্র অরবিন্দ পাঁচতলায় তাঁর নতুন শাখা থেকে নেমে চারতলার পুরনো শাখায় এলেন।

আজ বড়বাবু বেশ জমিয়ে বসেছেন, গতকাল সন্ধ্যাতেই তিনি বাড়ি ফেরার পথে একটা ইংরেজি পকেট জোকবুক ফুটপাথের দোকান থেকে দেড় টাকা দিয়ে কিনেছেন। আজ তাঁর মনের মধ্যে রসিকতার বড় বড় বুদবুদ উঠছে। টিফিনের সময় সেইসব রঙিন বুদবুদ একটার পর একটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন তিনি, অনুগত শ্রোতারা হাততালি দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

কিন্তু অরবিন্দ নির্বিকার। ভাবলেশহীন গম্ভীর মুখে একটার পর একটা হাসির গল্প শুনে চলেন তিনি। এই ব্যতিক্রম সকলেরই নজরে পড়ল, বিশেষ করে রসিক বড়বাবুর। তিনি অবশেষে বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কী হল অরবিন্দ? ব্যাপার কী? তোমার হলটা কী? এইরকম সব মজার গল্প, একবারও হাসছ না?'

তিক্ত, গম্ভীর বদনে অরবিন্দ উত্তর দিলেন, 'যারা হাসবার তারা হাসছে। আমি হাসব কেন? আমি তো এখন আর আপনার দপ্তরে কাজ করি না।'

অরবিন্দ গুহের গল্পের এই মর‍্যাল সব বাক্যবিলাসীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

স্বর্গ

রবীন্দ্রনাথকেও নাকি একবার নরকে যেতে হয়েছিল। গল্পটা পুরনো, জর্জ বিশ্বাসের নামে প্রচলিত রয়েছে। সম্প্রতি গল্পটা আবার শুনলাম।

সেটা সেই সময়ের কথা, যখন জর্জ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীত 'বিশুদ্ধ' না হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। তখন তিনিই গল্পটা বলেছিলেন, "আমি যখন মারা গেলাম, মারা গিয়ে দেখি নরকে গেছি, নরকে তো আমি যামুই। তা সেই নরকের বারান্দায় দেখি আলখাল্লা গায়ে দিয়া রবীন্দ্রনাথ হাঁটতেছেন। আমি তো অবাক, 'কইলাম, গুরুদেব আপনি এখানে!' গুরুদেব কইলেন, 'আমি ভদ্রঘরের মাইয়াদের স্টেজে নাচাইয়াছিলাম, তাই ভগবান আমারে নরকে পাঠাইছে।'

বলা বাহুল্য, অনন্য ও অদ্বিতীয় জর্জ বিশ্বাসের এ এক মর্মান্তিক বিদ্রূপ নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধে।

* * *

জর্জ বিশ্বাসকে দিয়েই যখন আরম্ভ করে ফেললাম, তা হলে নরক নয় স্বর্গের কথা হোক।

মানুষের জ্ঞান হওয়া অবধি স্বর্গ নিয়ে তার কল্পনার অভাব হয়নি। সব ধর্মে যেমন পাপ-পুণ্যের কথা আছে, তেমনই স্বর্গ নরকের কথা আছে। মানুষকে বলা হয়েছে পাপ কোরো না, মিথ্যে কথা বোলো না, কুকর্ম কোরো না, মানুষের উপর এইসব নিষেধাজ্ঞা জারি করে তারপর তাকে লোভ দেখানো হয়েছে স্বর্গবাসের।

সেই স্বপ্নের স্বর্গে অনন্ত বসন্ত, অনন্ত যৌবন। তার পারিজাত কাননে কোনওদিন ফুল ঝরে পড়ে না, স্বর্গ নর্তকীর চঞ্চল চরণ কোনওদিন ক্লান্ত হয় না, স্বর্গের অমৃতসুধা পান করে লিভার খারাপ হওয়ার অথবা হ্যাং-ওভার হওয়ার আশঙ্কা নেই।

মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠির স্ত্রী এবং ভাইদের নিয়ে এই স্বর্গে পৌঁছানোর জন্যে যাত্রা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সবাই পথে পড়ে যায়, এক সারমেয়বেশী ধর্ম ছাড়া তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আর কেউ ছিল না।

রামায়ণের লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে চেয়েছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত পারেননি। মৃত্যুর সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'শুভ কাজ শীঘ্র করতে হয়, আর অশুভ কাজে কালহরণ করতে হয়।' তবে স্বর্গের সিঁড়ি বানানোটা শুভ কাজ হত কিনা সেটা বলা কঠিন।

স্বর্গের সিঁড়ির আরও একটা গল্প আছে। সেটা পৌরাণিক উপকথা।

তখন সৃষ্টির আদিযুগ। পৃথিবীর সব মানুষের মুখে একই ভাষা। সেইসময় মানুষেরা ঠিক করল স্বর্গের সিঁড়ি বানাবে। সিঁড়ি বানানো শুরু হল, কাজ পুরোদমে চলছে, স্বর্গ প্রায় ছুঁই ছুঁই। ঈশ্বর তখন প্রমাদ গনলেন, সর্বনাশ! মানুষ যে সিঁড়ি পেয়ে সরাসরি স্বর্গে উঠে আসবে। তাঁর আর মাহাত্ম্য রক্ষা হবে কী করে? ঈশ্বর তখন বুদ্ধি করে একেক মানুষের মুখে একেকরকম ভাষা দিলেন। তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। এ চাইছে ইট, ও নিয়ে এল জল। সে চাইছে পাথর এ নিয়ে আসছে বালি। বিশাল কর্মকাণ্ড ভণ্ডুল হয়ে গেল। রচিত হল মানুষে মানুষে প্রথম ব্যবধান। ভাষার ব্যবধান। এ ব্যবধান ঈশ্বরেরই সৃষ্টি এবং তার কারণ ওই স্বর্গ।

নিউ টেস্টামেন্টে আছে, 'আমার পিতৃগৃহে রয়েছে বহু প্রাসাদ।' এই পিতৃগৃহই হল স্বর্গ।

এক অবিশ্বাসী পরিহাস করে এক খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'আজ্ঞে, বলতে পারেন স্বর্গের পথটা কোনদিকে?' ধর্মযাজক মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'এখন থেকে সরাসরি সোজা রাস্তায় যাবেন, তা হলেই স্বর্গে পৌঁছে যাবেন।'

এই যাজক যে ধর্মের অনুসারী সেই ধর্মের মূল গ্রন্থে এ রকম কথা বলা আছে যে সূচের ফুটো দিয়ে একটা উট পর্যন্ত গলে যেতে পারে কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা কখনওই স্বর্গে যেতে পারবে না।

বলা বাহুল্য ধনী ব্যক্তিরা স্বর্গে যাওয়া নিয়ে তেমন চিন্তিত নন। তার প্রধান কারণ হল এই যে ধনী হতে গেলে সাধারণত যেসব কাজ করতে হয় সেসব কাজ করে স্বর্গে যাওয়া যায় না।

তবে ভাল কাজ করলেই সর্বদা স্বর্গে যাওয়া যাবে এমন কোনও কথা নেই। একটা পুরনো গল্প এখানে আবার বলা যেতে পারে।

এক ভদ্রলোক মৃত্যুর পরে পরলোকে পৌঁছেছেন। পরলোকের দরজায় তিনি দেখলেন চিত্রগুপ্ত বসে রয়েছেন দরজার সামনে। তিনি চিত্রগুপ্তকে বললেন, 'আপনার খেরোর খাতাটা একবার বার করে দেখুন তো আমার পাপ-পুণ্যের হিসেবটা। আমি কি স্বর্গে যাব নাকি নরকে যেতে হবে?'

চিত্রগুপ্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার আবার খাতা কী? ওসব পৃথিবীর মানুষের মনগড়া কথা। আমি লেখাপড়াই শিখিনি কখনও, খাতা কী করে রাখব? পাপপুণ্যের হিসেব বলে কিছু নেই, স্বর্গ-নরক বলেও কিছু নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকে যাও।'

ভদ্রলোক দরজা দিয়ে পরলোকের ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন সেখানে ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে। হাজার হাজার লোক, মারামারি, গালাগালি, চুলোচুলি করছে পরস্পরের সঙ্গে। এর মধ্যে অনেক মহাজ্ঞানী, মহাজন, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ পর্যন্ত রয়েছেন। এঁরাও অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষায় কথা বলছেন, এঁকে তিনি লাথি মারছেন, তাঁকে ইনি থুথু ছিটোচ্ছেন।

এই অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে নবাগত ভদ্রলোক একদম হকচকিয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলেন পরলোকের দরজা দিয়ে। গেটের পাশে একটা মেহগনিকাঠের কালো চেয়ারে তখনও চিত্রগুপ্ত নির্বিকার, নির্লিপ্ত বসে রয়েছেন।

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে চিত্রগুপ্তকে বললেন, 'ভেতরে এসব কী ব্যাপার হচ্ছে? এইসব মহাপুরুষেরা এসব কী করছেন? কেন করছেন?'

শান্তভাবে চিত্রগুপ্ত বললেন, 'সেকথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কে মহাপুরুষ, কে মহাপুরুষ নয় তাও আমি জানি না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মানে?'

ততোধিক শান্তভাবে চিত্রগুপ্ত বললেন, 'মানে-টানে জানি না। তবে এতদিন ধরে একটা জিনিস লক্ষ করেছি যে এরা যখন একজন আসে, এসেই জিজ্ঞাসা করে, স্বর্গটা কোনদিকে। এদের যেইমাত্র বলি স্বর্গ নরক বলে কিছু নেই। আর ওই পাপপুণ্যের হিসেব-টিসেব সব বাজে কথা। এখানে কোনও রকমের হিসেব রাখা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো কেমন যেন ক্ষেপে যায়। পাগলের মতো করতে থাকে। তারপর শুরু হয় গালাগালি, হাতাহাতি, লাথালাথি।'

চিত্রগুপ্তের এইকথা শোনামাত্র নবাগত ভদ্রলোক এক দৌড়ে পরলোকের ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং প্রথমেই যাঁকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলেন, তাঁর ফটোতে মৃত্যুর আগের দিন সকালেও তিনি মালা দিয়েছেন।

পুনশ্চঃ একটি গ্রাম্য বালক তার বাবার সঙ্গে শহরে এসেছে। শহরের রাস্তাঘাট, ট্রাম-বাস, বহুতল বাড়ি যা কিছু সে দেখছে, দেখে বিস্মিত হচ্ছে। তার বাবা ঠিক করল যে একটু খুব উঁচু বাড়িতে ঢুকে ছেলেকে লিফটে চড়াবে। ছেলেটি এর আগে লিফটে চড়া তো দূরের কথা এ

জিনিস চোখেই দেখেনি। সুতরাং লিফটে চড়ার পরে লিফট যখন দ্রুতগতি উপরের দিকে উঠতে লাগল, ছেলেটি বিস্মিত হয়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা, ভগবান কি জানে যে আমরা স্বর্গে যাচ্ছি?'

পুনশ্চঃ : মহাত্মা মার্ক টোয়েনকে একদা এক ভদ্রমহিলা স্বর্গ এবং নরক বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চান। মার্ক টোয়েন করজোড়ে বলেন, 'মাফ করবেন। কোনওটারই নিন্দে করতে পারব না। দু'জায়গাতেই আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।'

দুর্ঘটনার আগে ও পরে

ডেভিড কপারফিল্ড নামক সেই বহুপঠিত, সুবিখ্যাত উপন্যাসে চার্লস ডিকেন্স মহোদয় দুর্ঘটনা বিষয়ে লিখেছিলেন যে, 'সবচেয়ে সুশৃঙ্খল পরিবারে যেমন দুর্ঘটনা ঘটবে, তেমনি ঘটবে বিশৃঙ্খল পরিবারে।'

ডিকেন্স সাহেব অন্য এক সূত্রে এই কথাটি বলেছিলেন, তবে তাঁর ওই মন্তব্য সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। দুর্ঘটনা কোন পরিবেশে, কখন ঘটবে সে বিষয়ে কারও পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। যদি বলা সম্ভব হয় তা হলে সেটাকে দুর্ঘটনা বলা যাবে না।

ইংরেজিতে 'গড্‌স অ্যাক্ট' (God's Act) বলে একটি কথা আছে। যা কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, রাস্তায় একটি কুকুর ছানাকে বাঁচাতে পাশ কাটাতে গিয়ে যাত্রীসুদ্ধ গাড়ি খাদে পড়ে গেল কিংবা বাথরুমে পা পিছলিয়ে পড়ে তোমার সাধের কোমর দুমড়িয়ে গেল, এ সবই গড্‌স অ্যাক্ট। পুরনো বাড়ির ছাদ মাথায় ভেঙে পড়ল কিংবা লিফটের দড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেল এগুলোও হয়তো গড্‌স অ্যাক্টের পর্যায়ে পড়ে তবে এর মধ্যে হয়তো মানুষী তদারকির অভাব বা অবহেলা। উপেক্ষার ব্যাপার থাকলে তখন সেটা আর ঈশ্বরীয় নয়। বরং সেখানে দোষী বা দায়ি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারলে তাকে ফৌজদারির সোর্পদ করে দণ্ড সংহিতা অনুসারে সাজা দেওয়াও সম্ভব।

দুর্ঘটনার কাহিনীর সেই আদিম উদাহরণটি স্মরণ করছি। সবাই জানে গল্পটা তাই খুব ছোট করে লিখছি।

রাজপথের পাশে একটি অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে। এক রাজমিস্ত্রি সেই নির্মীয়মাণ অট্টালিকার দ্বিতল থেকে পা পিছলিয়ে পড়ে গেলেন রাজপথে এক পথচারীর ঘাড়ে।

যথাভাগ্য! সেই পদস্খলিত রাজমিস্ত্রির কিছু হল না সেই দুর্ঘটনায়, পথচারী ভদ্রলোক কিন্তু ঘাড় ভেঙে নিহত হলেন। ভদ্রলোকের ছেলে রাজমিস্ত্রির বিরুদ্ধে মামলা আনলেন আদালতে। তাঁর বাবার মৃত্যুর বিচার চাই।

আদালত খুব মনোযোগ দিয়ে দুই পক্ষের এবং সাক্ষীদের সকলের সবকথা শুনলেন। তারপর অনেক বিবেচনা করে বললেন, 'এর আর কী করা যাবে। গড্‌স অ্যাক্ট। এতে কারও কোনও হাত নেই, আকস্মিক, নিতান্ত আকস্মিক এই দুর্ঘটনা, ওই রাজমিস্ত্রিকে কী সাজা দেব।'

কিন্তু মৃতের পুত্র ভয়ংকর জেদ করতে লাগলেন, বললেন, 'আমার বাবার মৃত্যুর জন্যে এই রাজমিস্ত্রি দায়ি। ওকে আপনি কী করে খালাস দেবেন?'

আদালত বাদীকে বললেন, 'কিন্তু ওই রাজমিস্ত্রির সঙ্গে তো আপনার বাবার কোনও শত্রুতা বা বিবাদ ছিল না। ওকী আর ইচ্ছা করে আপনার বাবার মাথার উপরে পড়েছে।'

কিন্তু মৃতের পুত্র ছাড়বে না, আরও জোর করতে লাগল। অবশেষে বিচারক সেই ঐতিহাসিক রায় দিলেন, 'রাজমিস্ত্রি পথ দিয়ে হেঁটে যাবে আর দোতলা থেকে মৃত ব্যক্তির পুত্র তার উপরে লাফিয়ে পড়বে। এ ছাড়া এই মামলার আর কোনও সাজা যুক্তিযুক্ত হবে না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উক্ত বাদী কখনওই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে রাজমিস্ত্রির উপরে পড়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেনি।

এই সূত্রে ছাদ থেকে রাস্তার লোকের ঘাড়ে পড়ার ঘটনা সম্পর্কে এক মহাজনের বক্তব্য বলি।

সেই মহাজন বলেছিলেন যে কেউ যদি একদিন হঠাৎ পা পিছলিয়ে ছাদ থেকে রাস্তার কোনও লোকের ঘাড়ে পড়ে তবে সেটা হবে দুর্ঘটনা।

আর যদি সেই লোকটি পরপর দু'দিন ওইভাবে পা পিছলিয়ে একটা পথচারীর ঘাড়ে পড়ে তা হলে সেটা হবে ইংরেজিতে যাকে বলে কয়েনসিডেন্স (coincidence) একটা চমকপ্রদ মিলের ঘটনা।

অতঃপর যদি তার পরের দিনও ওই ব্যক্তি উক্ত পথচারীর ঘাড়ে পড়ে তবে তখন আর তাকে দুর্ঘটনা বা কয়েনসিডেন্স বলে অভিহিত করা যাবে না। সেটা হবে অভ্যাস, একটি খারাপ অভ্যাসের নমুনা।

খবরের কাগজে দুর্ঘটনার সংবাদ ক্রমাগতই বের হয়। কখনও লোক ভর্তি ট্রাক খাদে পড়ে যায় কখনও ট্রামে-বাসে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, কখনও বা বিধ্বংসী আগুনে বিশাল বাজার পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

দু'রকম খুচরো দুর্ঘটনার খবর দৈনিকে প্রায় নিয়মিতই ছাপা হয়। এক, ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু এবং মোটর দুর্ঘটনায় যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকা আহত।

এইরকম সংবাদে ভুল করে একটি কাগজে এক যাত্রাদলের নায়িকার মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল। সে মহিলা কিন্তু মারা যাননি, দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছিলেন। তিনি খবরের কাগজ অফিসে ফোন করলেন, ফোন করে বলেন, 'দেখুন, আমি জলজ্যান্ত বেঁচে আছি। আর আপনারা আমার মৃত্যু সংবাদ আপনাদের কাগজে ছাপিয়ে দিলেন।'

খবরের কাগজের দপ্তর থেকে তাঁকে নাকি বলা হয়েছিল, 'ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম। যা হোক আমরা ভুলটা সংশোধন করে দিচ্ছি। কালকের কাগজেই আপনার জন্মসংবাদ ছেপে মৃত্যুটা শুধরে দিচ্ছি।'

তবে দুর্ঘটনার কাহিনী বহু সময়েই খুব তরলভাবে পরিবেশিত হয়।

এক কাল্পনিক কৃপণের একটাই মাত্র চামচে ছিল। সেই চামচের গা থেকে চিনি চেটে খেতে গিয়ে তিনি সেই চামচেটা গিলে ফেলেন। খবর পেয়ে পাড়ার ডাক্তার তাঁকে দেখতে আসেন, ওই ঘটনার দু'দিন পরে।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে?' ভদ্রলোক শুকনো মুখে বললেন, 'খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কী অসুবিধে?' ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, 'এই দু'দিন ধরে চায়ের চিনি গুলতে পারছি না। আঙুল চুবিয়ে গুলতে গেলে আঙুলে গরম চায়ের ছ্যাঁকা লাগছে।' বলে ডান হাতের তর্জনী তুলে ডাক্তারকে দেখালেন।

পুনশ্চঃ একটি অভাবিত কথোপকথন:—

(অল্প আগে একটি পথদুর্ঘটনা ঘটে গেছে, দুটি গাড়ি মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছে, দুটিরই হেডলাইট ভেঙেছে, সামনের বনেট দুমড়িয়ে গেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুই গাড়ির চালক এবং পুলিশ সার্জেন্ট, সেই সঙ্গে বহু পথচারী জটলা করছে, কেউ হতাহত হয়নি এটাই সুখের কথা।)

সার্জেন্ট সাহেব: (প্রথম ড্রাইভারের প্রতি) আপনি এবার যেতে পারেন।

দ্বিতীয় ড্রাইভার: আমি ?.

সার্জেন্ট সাহেব: আপনাকে থানায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় ড্রাইভার: কেন?

সার্জেন্ট সাহেব: কেন আবার কী? এই দুর্ঘটনার জন্যে আপনিই দায়ি, তাই আপনাকে থানায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় ড্রাইভার: আপনি বলছেন কী। আমি ছিলাম রাস্তার বাঁদিকে আর ওই ভদ্রলোক ডানদিকের থেকে এসে ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা দিলেন। এখনও আমার গাড়িটা বাঁদিকে রয়েছে।

সার্জেন্ট সাহেব: তা থাকুক। আপনিই দায়ি, আপনাকেই থানায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় ড্রাইভার (মারমুখী হয়ে): আশ্চর্য! কারণটা বলবেন কি ওই ভদ্রলোক থানায় না গিয়ে আমি কেন থানায় যাব?

সার্জেন্ট সাহেব (গম্ভীর মুখে): সত্যিই কারণটা জানতে চান? তা হলে শুনুন ওই ভদ্রলোক হলেন আমাদের পুলিশ কর্তার শালা আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভগ্নিপতি। এবার চলুন থানায়।

পণ্ডিত

'পণ্ডিত' শব্দটি সংস্কৃত হলেও ইংরেজি ভাষার সূত্রে এখন সারা পৃথিবীর শিক্ষিতসমাজে সুপরিচিত। ইংরেজি অভিধানে বহুকাল হল শব্দটি ঢুকে গেছে। ভারতীয় প্রায় সব ভাষাতেই শব্দটি সচল।

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'পণ্ডিত' শব্দটি অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত হয়। আগেও যে হত না তা নয়, টুলো পণ্ডিত বা বুনো পণ্ডিত এ জাতীয় বিশেষণযুক্ত কথা স্পষ্টই মনে করিয়ে দেয় যে পণ্ডিত শব্দের একটা হেয়ভাবে ব্যবহারও ছিল।

যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পণ্ডিত উপাধিতে ভাস্বর ছিলেন কিংবা তারপরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অথবা অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত বলে সম্মানিত হতেন সেই যুগেই 'কানা-কানা খানা-খানা কেমন লাগে কুমির ছানা' গল্পের শেয়ালপণ্ডিতমশাই ঘরে ঘরে জনপ্রিয়।

এই সময়েই এক স্বনামধন্য পণ্ডিত, খুব সম্ভব অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয় পণ্ডিতের এক নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন।

কয়েক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁকে এক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যাতে তিনি সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে রাজি হন সেই জন্যে তাঁরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত ইত্যাদি নানারকম বিশেষণে তোয়াজ ও তোষামোদ করতে লাগলেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয় পণ্ডিত হলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এইসব শুনে বললেন যে, 'হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমি অবশ্যই পণ্ডিত, তবে আমি হলাম সেই ধরনের পণ্ডিত—সর্ব কর্মং

পণ্ডয়তি য সঃ—অর্থাৎ সব কাজ পণ্ড করে দেয় যে।' এই বলে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের তিনি সভাপতি হতে রাজি না হয়ে বিদায় করে দিলেন।

পণ্ডিতদের সম্পর্কে চলতি অধিকাংশই তাদের বোকামির গল্প। বেশি লেখাপড়া জানা লোকের বৈষয়িক বা জাগতিক বুদ্ধির অভাব থাকে—এ রকম একটা ধারণা বহুদিন ধরেই চলছে।

এর বিপরীতধর্মী বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন এক পণ্ডিতের আখ্যান বলি। গল্পটা অন্য আকারেও অবশ্য প্রচলিত আছে।

আগেকার দিনে জমিদার বাড়িতে বৎসরান্তে পুজোর সময় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের বন্দোবস্ত ছিল। পণ্ডিতেরা পুজোর আগে ধনীগৃহে গিয়ে বার্ষিকী নিয়ে আসতেন। তাঁদের নামের তালিকা জমিদার বাড়ির নায়েবের খাতায় লেখা থাকত। সেই তালিকা দেখে যার যা প্রাপ্য বৎসরান্তে দেওয়া হত।

এক পণ্ডিতের ওই বার্ষিকীর খাতায় নাম ছিল। পরম্পর কয়েক বছর নানা কারণে তিনি বার্ষিকী নিতে জমিদার বাড়িতে আসতে পারেননি। এসব ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেউ দু'-তিন বছর বার্ষিকী নিতে না এলে তাঁর নাম খাতা থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হত।

এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সুতরাং দু'-তিন বছর পরে যখন পণ্ডিত আবার বার্ষিকী নিতে এলেন, এসে দেখলেন তাঁর নাম কাটা গেছে। গোমস্তা-নায়েবরা বললেন, এ বিষয়ে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। তখন বাধ্য হয়ে পণ্ডিতমশায় জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। জমিদারবাবু সদাশয় ব্যক্তি, তা ছাড়া সে বছরই তিনি সদ্য পিতামহ হয়েছেন, তাঁর প্রথম পুত্রের একটি পুত্র জন্মেছে। তিনি পণ্ডিতমশায়ের সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নায়েববাবুকে ডেকে আবার তাঁর নাম বার্ষিকীর খাতায় তুলে নিতে নির্দেশ দিলেন।

নায়েববাবু পণ্ডিতমশায়কে বাইরের সেরেস্তা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাতা খুলে তাঁর নাম লিখতে বসলেন। পণ্ডিতমশায়কে নাম জিজ্ঞাসা করাতে পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লিখুন, শ্রীযুক্ত বৃষ ভট্টাচার্য।'

এ রকম নাম শুনে নায়েবমশায় বিস্মিত হলেন, বললেন, 'বৃষ মানে তো ষাঁড়, গোরু। এটা আবার কী করে মানুষের নাম হল।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, এটা আমার নাম নয়, কিন্তু এই নামটাই লিখুন।' নায়েবের মুখে তাঁর এই অনুরোধে প্রশ্নবোধক একটা ভাব ফুটে উঠল, তখন পণ্ডিতমশায় বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন ভবিষ্যতে আর যাতে নাম কাটা না যায় সেজন্যে এই নামটাই বলছি, আপনারা তো হিন্দু হয়ে গোরু কাটতে পারবেন না। কী করে আমার বৃষ নাম কাটা যায় সেটা আমি দেখব।'

পুরনো দিনের লোককথায় পণ্ডিত কাহিনীর অন্ত নেই। তখনকার সমাজজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পণ্ডিতমশায়। তিনিই শিক্ষক, তিনিই পুরোহিত কখনও গুরুদেব, তিনিই বিধায়ক এমনকী কখনও কখনও তিনি জীবনদাতা কবিরাজ বা চিকিৎসক।

বিদ্যাসাগর মহোদয় এঁদের কথা লিখেছেন, মজা করেই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় পর্যন্ত তরল কাহিনীতে পণ্ডিতমশায়কে বারবার এনেছেন। শরৎচন্দ্র তো 'পণ্ডিতমশায়' নামে আখ্যানই রচনা করেছেন।

মহাজন কথিত গল্পগুলির মধ্যে একটি চমকপ্রদ গল্প আমরা স্মরণ করছি।

দুই ভাই। বড় ভাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। বেদ, উপনিষদ তাঁর নখাগ্রে। ছোট ভাই তেমন কিছু নন, তাঁর সম্বল পুরোহিত দর্পণ, যজমানি ব্যবসা তাঁর জমজমাট, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোকজন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে তারা তাঁকে নিয়ে যায় বিবাহে, শ্রাদ্ধে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে।

একবার তিনি দূরের এক গ্রামে একটা বিয়ে দিতে গেছেন, সেই সময় পাশের গ্রামের লোকেরা তাঁর কাছে একটা বিধান নিতে এল, ধোপাদের বাড়ির একটা শিশু মারা গেছে তাকে পোড়ানো হবে—না মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

ছোট ভাইকে না পাওয়ায় তারা বড় ভাইকে ধরল, 'ঠাকুরমশায় আপনি তো শাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিত, আপনিই এর বিধান দিন।'

বড় ভাই পড়লেন ঘোরতর ফ্যাসাদে। তিনি তাক থেকে বড় বড় পুঁথি নামিয়ে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ এমনকী রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের এবং শেষ পর্যন্ত কালিদাস বাণভট্টের অনেক পাতা ওলটালেন কিন্তু কোথাও কোনও সূত্র পেলেন না। তখন নিজের মনে সাত-পাঁচ অনেক কিছু ভেবেচিন্তে বললেন, 'পুঁতে ফেলাই উচিত হবে।'

লোকেরা বিধান নিয়ে চলে গেল। তারা যখন ফিরে যাচ্ছে ছোট ভাই তখন বিয়ে দিয়ে ফিরছেন, পথে দেখা। এদের মুখে সব কথা শুনে ছোট ভাই বুঝলেন বড় ভাই ভুল নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ এক্ষেত্রে পুড়িয়ে ফেলাই আচার-সম্মত। তিনি দ্রুত দাদার ভুল সংশোধন করে বললেন, 'দাদা ঠিকই বলেছেন তবে না পুঁতে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। পুঁতলেও চলে কিন্তু তার চেয়ে পোড়ানো ঠিক হবে। বাচ্চাটা পুঁতে ফেলার বয়েস পার হয়ে গেছে।'

ভাই বাড়ি এসে দাদাকে বললেন, 'দাদা, তুমি ভুল বিধান দিয়েছিলে, ওরা যদি না পুড়িয়ে পুঁতে ফেলত খুব অনাচার হত।' দাদা বললেন, 'কোনও অনাচার হত না আমি ভেবে-চিন্তেই পুঁততে বলেছিলাম।'

ছোটভাই বললেন, 'এত ভাবনাচিন্তা করে ভুল করলে?'

দাদা বললেন, 'যদি পোড়াতে বলতাম আর ওরা পুড়িয়ে ফেলত, তা হলে আসল ভুল হত যখন তুমি এসে বলতে যে না পুঁততে হবে। আমি পুঁতে রাখতে বললাম এই কারণে যে তুমি যদি এসে বলো পোড়াতে হবে তবে মাটি খুঁড়ে বাচ্চাটাকে তুলে পুড়িয়ে ফেললেই হবে কিন্তু একবার পোড়ানো হয়ে গেলে আর পোঁতা যেত না।'

এই অগ্রজ পণ্ডিতমশায়কে নিশ্চয় এরপরে আর কেউ নির্বোধ বলবে না।

সমস্যা

এই কিছুদিন আগে একজন আধুনিক কবি লিখেছিলেন,

'সেই যে লোকটা বলেছিল,
তার কোনও সমস্যা নেই।
আসলে সেই লোকটা
নিজেই একটা সমস্যা।'

এই কবিটিকে আমি ভাল করে চিনি না কিন্তু যদি কখনও সামনা-সামনি দেখা হয় তার সঙ্গে, আমার একটু বোঝাপড়া করার আছে।

আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। আলো নেই, জল নেই টেলিফোন বাজে না। আমাদের দরকারি চিঠি ডাকে হারিয়ে যায়। মাছের বাজারে আমরা ঢুকতে ভয় পাই। মেয়ের পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরয় না। ছেলের চাকরির দরখাস্তের উত্তর আসে না। সকালবেলা হরিণঘাটার দুধের গাড়ি আসে

না। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াতে বলেন অন্যথায় বাড়ি ছাড়তে বলেন। রাস্তায় বেরিয়ে বাসে উঠতে পারি না, উঠতে পারলে নামতে পারি না।

আমাদের সমস্যার শেষ নেই।

অথচ এ হেন সময়ে অবশেষে একজন সমস্যাহীন লোকের সন্ধান দিয়ে কবি নিজেই তাকে নিয়ে উপহাস করলেন। কবির সঙ্গে আমার বিশেষ বোঝাপড়া করার আছে।

আপাতত গোলমাল থাক। সমস্যা সংক্রান্ত নির্ভেজাল গল্পটি আগে বলি।

জাহাজডুবির পর প্রায় সবাই মৃত অথবা নিরুদ্দেশ। শুধু একজন যাত্রী কিছুটা ভাগ্যের জোরে, আর কিছুটা ভাল সাঁতার জানার দৌলতে সাঁতরিয়ে, প্রচুর সাঁতরিয়ে অবশেষে একটি নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়।

দ্বীপটি খুব খারাপ নয়। মানুষজন অবশ্য নেই, তবে হিংস্র জীবজন্তুও তেমন নেই। গাছে পাকা ফল আছে, মিষ্টি জলের ঝরনা আছে। ভালই দিন কেটে যাচ্ছিল জাহাজডুবির যাত্রীটির।

এর মধ্যে একদিন সেই ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধানে আরেকটি জাহাজ এল সভ্য পৃথিবী থেকে। অকুস্থলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই জাহাজের লোকেরা আগের জাহাজের কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারল না। অবশেষে একেবারে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের আড়ালে নির্জন দ্বীপটি নজরে পড়ল তল্লাশকারী জাহাজের ক্যাপটেনের।

তখন সেই দ্বীপের পাশে গিয়ে জাহাজটা ভিড়িয়ে দিলেন তিনি। জাহাজের ডেক থেকে ক্যাপটেন সাহেব নিরুদ্দেশ যাত্রীটিকে দেখতে পেলেন। ঘাসের বিছানায় সে পরম আরামে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাতের কাছেই নানারকম জানা অজানা লাল-সবুজ ফল।

দ্বীপের পাশে যে একটা জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে লোকটি সেটা খেয়াল করেনি। সে ভাবতেও পারেনি তাকে উদ্ধার করার জন্যে জাহাজ এসেছে। সে শান্তিতে চোখ বুজে আছে।

জাহাজের ক্যাপটেনের লোকটিকে দেখে খুব মায়া হল, একবার ভাবলেন, ও এখানে বেশ আছে, শান্তিতে আছে, তাই থাকুক, আমরা ফিরে যাই। কিন্তু সেটা কর্তব্যে অবহেলা করা হবে, তাই লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একবার জাহাজের সিটি বাজালেন। তন্দ্রাবিষ্ট লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে জেগে উঠল এবং জাহাজ দেখে দৌড়ে দ্বীপের কিনারে চলে এল।

জাহাজের ক্যাপটেন কিন্তু তখনই তাকে জাহাজে তুললেন না, তাকে বললেন, 'তুমি তো এখানে দেখছি চমৎকার আছ। ঝামেলাভরা পৃথিবীতে আবার সেই সমস্যা জর্জরিত জীবনে ফিরে গিয়ে কী হবে।' লোকটি এই কথা শুনে দোনামনা করতে লাগল, তার মনেও কেমন দ্বিধা দেখা দিল।

ঠিক এই সময়ে ক্যাপটেন সাহেব তাঁর খাস কামরা থেকে বিগত কয়েক সপ্তাহের এক গাদা খবরের কাগজ দ্বীপবন্দি লোকটির দিকে ছুড়ে দিলেন, দিয়ে বললেন, 'এই কাগজগুলো একবার পড়ো। এসব খবর পাঠ করার পরেও যদি সংসারে ফিরে যেতে চাও বলবে।'

লোকটি খবরের কাগজগুলো বগলদাবা করে দ্বীপের গহনে চলে গেল। তারপর সে আর ফিরে আসেনি। চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে জাহাজটি ফিরে যায়।

* * *

অতঃপর আরেকটি দার্শনিক সমস্যার গল্প বলি। এক ব্যক্তি হাওড়া স্টেশনের অনুসন্ধান কাউন্টারে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মশায়, এখান থেকে বর্ধমান যেতে কতক্ষণ লাগে?' কাউন্টার শীতল কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আড়াই ঘণ্টা।'

এবার ওই ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বর্ধমান থেকে এখানে আসতে কতক্ষণ লাগে?' এবার কাউন্টার উত্তপ্ত হল, 'এ প্রশ্নের মানে কী? এখান থেকে বর্ধমান যেতে যদি আড়াই ঘণ্টা

লাগে তবে বর্ধমান থেকে এখানে আসতেও আড়াই ঘণ্টা লাগবে। এই সামান্য কথাটা বুঝতে অসুবিধে কোথায়? কী সমস্যা?'

প্রশ্নকারী নির্বিকারভাবে বললেন, 'সমস্যা আছে।' কাউন্টারে ভিড় ছিল না, তাই কাউন্টার প্রশ্নোত্তরের খেই হারিয়ে ফেলেনি, তা ছাড়া তার মনে কৌতূহলও দেখা দিয়েছে। সুতরাং কাউন্টার ক্লার্ক জানতে চাইল, 'কী সমস্যা?' প্রশ্নকারী মৃদু হেসে বললেন, 'সমস্যা নয়? একবার ভেবে দেখুন তো, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাসে আসতে লাগে ন'মাস আর অক্টোবর থেকে ওই জানুয়ারিতে ফিরতে লাগে মাত্র তিনমাস। যাতায়াত কি সর্বদা একসময়ে হয়? হাওড়া থেকে বর্ধমান আড়াই ঘণ্টায় গেলেই বর্ধমান থেকে হাওড়ায় আড়াই ঘণ্টায় আসবে এমন কোনও কথা নেই।'

এই প্রশ্নকারীর যেমন সমস্যা আছে, তেমনিই সমস্যা সকলেরই আছে এবং থাকবে। এবার আমরা সমাধানের কথা ভাবি। এক সাহেব বুদ্ধিজীবী সমস্যা সমাধান নিয়ে একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যদি ন'টা টুপি থাকে আর দশটা মানুষ থাকে তবে একজন মানুষের মাথা কেটে সে সমস্যার সমাধান না করে অনেক ভাল হবে আর একটা টুপি বানিয়ে সে সমস্যার দূর করা।

তবে সব সময়ে সমস্যা দূর করতে চাইলেই যে সেটা দূর করা যায় তা নয়। মিশরদেশীয় আখ্যানটি স্মরণ করছি।

এক গৃহস্থের একটা বেতো ঘোড়া ছিল। সেটা এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে কোনও কর্মে লাগত না। শুধু শুধু সেটাকে দানাপানি খাওয়াতে হত।

গৃহস্থের বাড়ির পিছনে একটা শুকিয়ে যাওয়া কুয়ো ছিল। সেটায় কোনও জল ছিল না, একেবারে শুকনো, খটখটে। পড়বি তো পড়, একদিন সেই বেতো ঘোড়াটা সেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু চেষ্টা করার পর গৃহস্থ যখন বুঝতে পারল ঘোড়াটাকে কুয়ো থেকে তোলা অসম্ভব, সে এক বুদ্ধি করল, সে ঠিক করল মাটি ঢেলে কুয়োটাকে ঘোড়া সমেত বুজিয়ে দেবে, তাতে একসঙ্গে মজা কুয়ো আর বেতো ঘোড়ার সমস্যার সমাধান হবে।

সে কোদাল দিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাটি কেটে ঝুড়িতে করে এনে শুকনো কুয়োয় ঢালতে লাগল। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত অথবা বিপরীত ক্রমে ঘোড়ার পক্ষে বিপরীতে হিত।

গৃহস্থ কুয়োর মধ্যে যত মাটি ফেলে, ঘোড়া তত মাটির ওপরে উঠে দাঁড়ায়, এই করতে করতে সেই ঘোড়া একসময়ে কুয়োর ওপরে উঠে বেরিয়ে এল। কুয়ো বোজানো হল বটে কিন্তু গৃহস্থের বেতো ঘোড়ার সমস্যা রয়েই গেল।

* * *

পুনশ্চ

লেখার শেষে একটা অলৌকিক সমস্যার কথা বলি।

কয়েকদিন আগে এক বাড়িতে গেছি। বাড়ির ছোট মেয়েটি বাইরের ঘরে পুতুল নিয়ে খেলছে। তার কোলে দুটো পুতুল। আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী খুকু খবর কী?' খুকু ঠোঁট উলটিয়ে জবাব দিল, 'আর খবর। খুব বিপদ হয়েছে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার আবার কী বিপদ?' কোলের ডল পুতুলের মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে সাত বছরের খুকু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই দুটোকে নিয়েই পারছি না। এদিকে এই পুজোর সময় আমার আবার বাচ্চা হবে।'

স্বেচ্ছাসেবক

'স্বেচ্ছা' শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পর্কে আমার সামান্য আপত্তি আছে। আগেও আপত্তি জানিয়েছি, আজও আপত্তি জানাচ্ছি।

যেখানে ইচ্ছা বললেই হয়ে যায় সেখানে স্বেচ্ছা কেন? খবরের কাগজে দেখি, বেতারে শুনি, দূরদর্শনে দেখি এবং শুনি স্বেচ্ছায় রক্তদান। স্বেচ্ছা কথাটা কোথা থেকে এল? কেউ যদি স্বেচ্ছায় রক্তদান না করে সে তো মারাত্মক, রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার।

এরপরে হয়তো দেখা যাবে শ্রীযুক্ত অমুক স্বেচ্ছায় নেতৃত্বদান করেন তমুক মিছিলে, শ্রীমান অ এবং শ্রীমতী আ স্বেচ্ছায় পরিণয়জালে আবদ্ধ হয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে যা হোক আমাদের বিষয়বস্তু স্বেচ্ছা নয়, স্বেচ্ছাসেবক ইংরেজিতে যাকে বলে ভলানটিয়ার।

আজকাল স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নেই। যে কোনও সভায় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেলে দেখা যাবে বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দলে দলে ভলানটিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ গেটে দাঁড়িয়ে, কেউ হল বা সভার মধ্যে, কেউ মঞ্চে উঠে তত্ত্বাবধান করছে। তার মধ্যে পাড়ার বেকার যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মাননীয় বিচারপতি বা বিখ্যাত চিত্রতারকা। প্রত্যেকেরই বুকে সেফটিফিন বা ক্লিপ দিয়ে রঙিন বিচিত্র বর্ণ ব্যাজ লাগানো, তাতে লেখা 'গ্যান্ডেরিয়া বান্ধব সমিতি ১৯৮৭ হীরক জয়ন্তী উৎসব', অথবা 'সারা ভারত খো খো সম্মেলন রামপুরহাট', নিদেনপক্ষে 'ভারতীয় আরতিতে সন্ধ্যা সঙ্ঘ!'

সবাই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত এবং গর্বিতভাবে জামা, পাঞ্জাবি বা কোটের বুকপকেটে ব্যাজ ঝুলিয়ে তদ্বির-তদারকি, মাতব্বরি করে যান। এই ব্যাজ হল সর্দারির পাসপোর্ট। তবে অনেক সময় বিশেষ করে অনুষ্ঠানাদিতে এমন প্রায় দেখা যায় যে, ব্যাজধারী ভলানটিয়ারের তুলনায় দর্শকের সংখ্যা অনেক কম।

যে কোনও পুজো সুভেনির খুললেই তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পৃষ্ঠায় কর্মকর্তা এবং পৃষ্ঠপোষকদের তালিকার পরেই দেখা যায় দীর্ঘ এক-দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা। এইসব তালিকা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত, এতে কাউকেই বাদ দেওয়া হয় না। এক পাড়ায় হয়তো সাতজন বাচ্চু এবং পাঁচজন খোকন আছে, পরপর সাতবার বাচ্চু এবং পাঁচবার খোকন লেখা হয়েছে, যাতে কেউই এই ভেবে দুঃখিত না হয় যে, তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে ভয়াবহ কাণ্ড হতে পারে। কারণ, তার বাবাই হয়তো প্রতিমা নিয়ে আসার এবং বিসর্জনের লরিটা সরবরাহ করেন কিংবা তার কাকা এনে দেয় পুজো সুভেনিরের জন্য নামী সিগারেট কোম্পানির ব্যাক পেজ বিজ্ঞাপন।

এই স্বেচ্ছাসেবক বা ভলানটিয়ারদের তালিকায় যাদের নাম আছে, তার মধ্যে ছেলেমেয়ে উভয়ই আছে, তবে অধিকাংশই বালখিল্য, এখনও এরা ডাকনামেই পরিচিত এবং উপাধি ব্যবহারের যোগ্য হয়নি। কোনও বিশেষ কারণ না থাকলে পাড়ায় প্রায় এ রকম সবারই নাম ছাপা হয়ে যায় এই তালিকায়। সুতরাং, পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বা বিখ্যাত হয়েছে এমন বহু ব্যক্তির নাম প্রথম ছাপার অক্ষরে পাড়ার পুজো সুভেনিরে বেরিয়েছিল, এ রকম ঘটা বিশেষ বিচিত্র নয়।

সে যা হোক, এ তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবকরা, এই মুনাই, বুবাই, টুপাই ইত্যাদিরা এদের নাম স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মুদ্রিত হলেও এরা গণ্যের মধ্যে আসে না। এদের বড়জোর পুজোর

দিনগুলোতে অথবা বিসর্জনের দিনে একটা ব্যাজ পরতে দেওয়া হয়, অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না। পুজো বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাইরেও রাজনৈতিক মঞ্চে বা মিছিলেও বহু স্বেচ্ছাসেবক। তবে এদের বিষয়ে পরিহাস করার সাহস আমার নেই। পুরনো ফটোগ্রাফে প্রাচীন দিনের কংগ্রেস অধিবেশনের গান্ধী টুপি মাথায় দেওয়া, ঋজু, শক্ত চিবুক ভলানটিয়ারদের ছবি দেখা যায়। তাদের মুখেচোখে একটা নম্র দৃঢ়তা, একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ছিল। একালের রাস্তা আটকানো, তোলা আদায়কারী, চাঁদাবাজ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা অবশ্যই অসংগত হবে।

রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবকদের কথায় কাজ নেই। বরং চাঁদার প্রসঙ্গে যখন এসে গেছি সেখানেই যাই।

একটি ঘটনার কথা জানি। কোনও এক এলাকায় কিছুদিন হল নতুন একটি পরিবার এসেছে। সেই পরিবারের কর্তা ঠিক কী যে করেন সেটা ভাল করে কেউ এখনও জানতে পারেনি। তবে জিনিসপত্র, ফার্নিচার, পর্দা, দৈনিক বাজার সেই সঙ্গে বাড়ির লোকের সাজপোশাক, জামাজুতো দেখে রীতিমতো সচ্ছল মনে হয়।

পাড়ায় পুজোর ভলানটিয়ার মহোদয়েরা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলতে বেরিয়েছেন। অবশেষে এই নতুন পরিবারটির বাড়িতেও তাঁরা এলেন। তখন সন্ধ্যাবেলা, দরজায় কড়া নাড়তে বাড়ির ভিতর থেকে একটি বালক বেরিয়ে এল। এসে চাঁদার খাতা হাতে ভলানটিয়ারদের দেখে বলল, 'বাবা বাড়ি নেই।'

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়ও ওই একই ব্যাপার ঘটল, অর্থাৎ, 'বাবা বাড়ি নেই।' ভলানটিয়ার দল একটু ঘুরে ফেরার পথে আবার এলেন, তখনও 'বাবা বাড়ি নেই।'

এইরকম দু'-চারদিন রাত দশটা, সাড়ে দশটা পর্যন্ত চেষ্টা করেও গৃহস্বামীকে ধরা গেল না। ভলানটিয়ারদের সন্দেহ হল, মিথ্যে কথা বলছে না তো চাঁদা এড়ানোর জন্যে। কারণ, এ রকম হামেশাই হয়। ভলানটিয়ারদের মনোভাব অনুমান করেই বোধহয় অবশেষে একদিন বালকটি বলল, 'খালি খালি সন্ধ্যাবেলায় আসেন কেন? বাবাকে সন্ধ্যাবেলা পাওয়া যাবে না। সকালের দিকে সময় করে আসবেন, ঠিক পেয়ে যাবেন।'

সত্যিই তাই, পরের দিন সকালে যেতেই বাড়ির কর্তাকে পাওয়া গেল। কিন্তু চাঁদার কথা বলতেই কর্তা যা বললেন অভিজ্ঞ চাঁদা আদায়কারীরা পর্যন্ত সে রকম কথা জন্মেও শোনেনি।

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ও, আপনারা পাড়ার পুজোর জন্যে চাঁদা তুলতে এসেছেন? তা একটা কথা জানতে চাই, আপনারা কি বখশিস নেন?'

সাতসন্ধ্যা ঘুরে যাওয়া ভলানটিয়ার মহোদয়েরা এইরকম কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, সবচেয়ে তিরিক্ষে মেজাজের যিনি দলনেতা তিনি দাঁত খিচিয়ে বললেন, 'পাড়ায় নতুন এসেছেন একটু ভেবেচিন্তে, সাবধানে কথা বলবেন। আপনার কাছে বখশিস কে চাইছে মশায়, আমরা চাঁদা, পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছি।'

গৃহস্বামী হাত জোড় করে বললেন, 'আমি তো সেই জন্যেই জানতে চাইছি আপনারা বখশিস নেন কিনা?'

নবাগতের এইরকম ঔদ্ধত্য দেখে চাঁদা আদায়কারীরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, পেটানো দরকার না 'পেটো' দরকার এই সিদ্ধান্তে আসার আগেই গৃহস্বামী বললেন, 'আপনারা শুধু শুধু রাগ করবেন না, আগে আমার কথাটা শুনুন।'

ভলানটিয়ারদের একজন একটু ঠান্ডা মেজাজের তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথাটা কী শুনি?'

ভদ্রলোক তখন বললেন, 'দেখুন আমি চৌরঙ্গিতে একটা বারে বেয়ারার কাজ করি। আমার যা কিছু উপার্জন, সবই ওই বখশিস। তাই চাঁদা দেওয়ার আগে জানতে চাই, বলুন জানা উচিত কিনা, আপনাদেরও মানসম্ভ্রম আছে আপনাদের চাঁদা যাই দিই, সে তো ওই বখশিস, সেটা কি আপনারা নেবেন?'

চাঁদা আদায়কারী স্বেচ্ছাসেবকদের মানসম্ভ্রম বিষয়ে অন্য একটি পুরনো গল্প আছে।

কাহিনীটি সেই আমলের যখন পুজোর স্বেচ্ছাসেবক মানে চাঁদা আদায়কারীরা আজকের মতো এতটা বেপরোয়া বা মারমুখী ছিলেন না। তখন গৃহস্থকে তাঁরা সমীহ করে চলতেন এবং চাঁদা নিয়ে নিরীহ নাগরিকের উপর অহেতুক জুলুমবাজি চলত না।

সেই সময় পুজো কমিটির এক ঘরোয়া সভায় ভলানটিয়ারদের চাঁদার খাতা বিলি করা হচ্ছে, কে কোন অঞ্চলে চাঁদা আদায় করবে সেই এলাকা ভাগ করে দিচ্ছেন সম্পাদক।

সম্পাদক রীতিমতো ভারিক্কি, বয়েস প্রায় বছর পঞ্চাশ। হঠাৎ একজন ভলানটিয়ার চাঁদার খাতা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ওই রামলাল রোডে চাঁদা তুলতে পারব না। ওখানকার লোকগুলো ভীষণ তেরিয়া, চাঁদা চাইলেই মারতে আসে। গত তিন বছর ওখানে আমি চাঁদা তুলতে গিয়ে ঢের অপমান হয়েছি।' ভলানটিয়ারটির নাম প্রবোধ, তার মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সম্পাদক চোখ থেকে চশমা নাকের উপর নামিয়ে তাকে বললেন, 'দেখ, প্রবোধ চাঁদা তুলতে গিয়ে অপমান আবার কী? আজ ছত্রিশ বছর ধরে পুজো করছি। চাঁদা তুলতে গিয়ে লোকের বাড়িতে কত গালাগাল খেয়েছি, ঘাড় ধাক্কা খেয়েছি, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, দোতলা থেকে নোংরা জল, আবর্জনা মাথায় ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি যে আজ পর্যন্ত কেউ কোনওদিন আমাকে অপমান করতে পারেনি।'

স্বেচ্ছাসেবকদের চাঁদা আদায় নিয়ে আর একটা গল্প মনে পড়ছে, সেটা দিয়ে এই রচনা শেষ করা যাবে। তার আগে একটা আসল গল্প বলে নিই।

আসল গল্প মানে মদ খাওয়ার গল্প।

আগের বছর পুজোমণ্ডপে মদ খেয়ে ভলানটিয়ারেরা একটু বেলেল্লাপনা করেছিলেন। এ বছর সিদ্ধান্ত হয়েছে, না পুজোয় কোনও মদ খাওয়া মোটেই নয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে ভলানটিয়ারদের মূল কর্তা দু'জন নিজেদের মধ্যে গোপনে ঠিক করলেন যে, এক বোতল ব্রান্ডি কিনে রাখা হবে, রাতবিরেতে কোনও স্বেচ্ছাসেবক কখনও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে চাঙা করে তুলতে হবে তো। তাই এক বোতল মদ কিনে সিংহের ফাঁপানো কেশরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল।

কোনওরকমে সপ্তমীর দিনটা গেল। অষ্টমীর রাতে আর থাকতে পারলেন না এক নম্বর কর্তা, দুই নম্বরকে বললেন, 'ওরে, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, বুক ধড়ফড় করছে, সিংহের কেশর থেকে বোতলটা বার করে আন তো।' দুই নম্বর অম্লান বদনে বললেন, 'বোতলটা আর নেই তো। এক নম্বর হতভম্ব হয়ে বললেন, 'সে কী?' দুই নম্বর বললেন, 'হ্যাঁ কী আর করব, কাল যে আমারও শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল।'

এবার শেষ কাহিনী, আবার চাঁদা।

এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখা আমার। পুজোর আরতি হচ্ছে। পুজোর চাঁদা এ বছর ভাল ওঠেনি। একটা তামার থালায় কয়েকটা খুচরো পয়সা ফেলে সম্পাদক দু'জন ভলানটিয়ারকে সেই থালা হাতে দর্শকদের মধ্যে পাঠালেন যদি দর্শনী কিছু ওঠে। ঝনঝন করে পয়সা বাজাতে বাজাতে জনতার মধ্যে থালা ঘোরাতে লাগল ভলানটিয়ার দু'জন। দ্রুত ভিড় হালকা হয়ে গেল। একজন তাড়াতাড়ি সরতে গিয়ে থালাটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। সন্ত্রস্ত সম্পাদক অবস্থা দেখে ভলানটিয়ারদের নির্দেশ দিলেন, 'ওরে, পয়সা তুলতে হবে না। থালাটা কোনওরকমে রক্ষা কর, থালাটা শিগগির ফিরিয়ে আন।'

বক্তা ও বক্তৃতা

সেই গল্পটা তো সবাই জানেন। দীর্ঘ বক্তৃতার অন্তে এক বক্তা দেখলেন সভাকক্ষ সম্পূর্ণ শূন্য। শুধু একটি মাত্র লোক বসে রয়েছে। কোনও কোনও গল্পে এই লোকটি হলের দারোয়ান, চাবি হাতে অপেক্ষা করছে, বক্তৃতা শেষ হলে ঘরে তালা দেবে বলে। কোনও গল্পে সে হল মাইকওলা, মাইকটা খালি হলে ফেলে যেতে পারছে না। আবার আরও পুরনো গল্পে ওই লোকটি শতরঞ্জির মালিক, যে শতরঞ্জির ওপর দাঁড়িয়ে বা বসে বক্তা এতক্ষণ বক্তৃতা করছেন, বক্তৃতা শেষ হলেই সে শতরঞ্জিটা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

এই গল্পটি বহুল প্রচারিত। নানা জায়গায় নানাভাবে এই গল্পটি আমি শুনেছি। এমনকী বিহারের অজ পাড়াগাঁয়ে দেহাতি হিন্দিতে এক স্কুলশিক্ষক আমাকে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন। তাঁর গল্পে ওই শেষ শ্রোতাটি ছিল একজন চৌকিদার, যার উপরে স্থানীয় থানা থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই সভা সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়ার।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং কৌতুককর ছিল এক বিলিতি জোকবুকের গল্পটি। সেই গল্পটিও একটি বক্তৃতা সভা নিয়ে, একের পর এক বক্তা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। বিষয় খুবই গুরুতর যথা পারমাণবিক অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ অথবা আবহাওয়া দূষণ।

সে যাই হোক বক্তার অভাব হয় না এসব কোনও বিষয়েই। সুতরাং বক্তৃতা চলতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতা শেষ করার পর যথারীতি দেখতে পেলেন হলের মধ্যে একজন মাত্র ব্যক্তি বসে রয়েছেন। ডায়াস থেকে নেমে বক্তা যখন এই শেষ শ্রোতাটিকে তাঁর ধৈর্যশীলতা এবং আগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ দিতে যাবেন, দেখা গেল সেই শ্রোতাটিও ডায়াসের দিকে এগিয়ে আসছেন। বক্তা ভাবলেন শ্রোতা বুঝি তাঁকে কিছু বলতে চান। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। আসলে শ্রোতাটিও এই সভার একজন নির্দিষ্ট বক্তা। তিনি আগের বক্তাকে বললেন, 'আমি আপনার পরের বক্তা। আর তো কেউ নেই। একটু বসে শুনে যাবেন।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'অবশ্য আমি খালি সভাতেও বক্তৃতা করতে পারি।'

বক্তৃতা করা অনেকের কাছে নেশার মতো। দু'-চার দিন কোথাও বক্তৃতা দেওয়া বাদ পড়ে গেলে তাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসে। তাঁরা হাঁফিয়ে ওঠেন। তাঁরা হিল্লি, দিল্লি, গৌহাটি, ভাগলপুর ঘুরে বেড়ান বক্তৃতা করার জন্যে। সবসময় যে উদ্যোক্তারা তাঁদের যাতায়াতের খরচ বহন করেন এমন নয়, বহু ক্ষেত্রেই বক্তারা নিজেদের পয়সা খরচ করে নিকট দূর জায়গায় জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা করে আসেন।

ঠিক এ জাতের নয়, এর চেয়ে একটু উঁচু জাতের এক বক্তা এক মফস্বল শহরে গিয়েছেন বক্তৃতা করতে। সেই শহরের সভার উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন বক্তা ট্রেনে আসবেন তাই তাঁরা দলবেঁধে গাড়ি আসার নির্দিষ্ট সময়ে রেলস্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন বক্তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

কিন্তু বক্তা ভদ্রলোক নিজের গাড়িতে করে সড়ক পথে সেই শহরে আসেন। ফলে যখন তিনি সভামঞ্চে পৌঁছে গেছেন তখন অভ্যর্থনাকারীরা অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে রেল স্টেশনে।

পরে সভার শেষে এই ঘটনার জন্যে উদ্যোক্তারা যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সমিতির সভাপতি মহোদয় বক্তাকে বললেন, 'স্যার আপনি আসার সময় আমরা

আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারিনি তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু আপনি চলে যাওয়ার সময় সে ভুল হবে না। আমরা সবাই মিলে আপনাকে বিদায় দেব।'

সেই বক্তা ভদ্রলোক এ রকম দুঃখপ্রকাশ দেখে খুশি হয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। তার চেয়ে বক্তা থাক। বক্তৃতার কথা বলি।

অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম যে প্রত্যেক বক্তার তিনটে করে বক্তৃতা থাকে।

প্রথম বক্তৃতাটি হল, তিনি যে বক্তৃতাটি করবেন বলে ভেবেছেন। তারপর দ্বিতীয় হল, যে বক্তৃতাটি তিনি আসলে করলেন। এবং শেষ বক্তৃতা হল, প্রকৃত বক্তৃতা সারা হওয়ার পর যা বললে ভাল হত এবং যা না বললে ভাল হত এই বিবেচনা করে বক্তা মনে মনে যে আদর্শ বক্তৃতাটি রচনা করলেন।

অতঃপর দুটো বক্তৃতার আখ্যান বলি।

এক ছোট শহরের অধিবাসীরা তাঁদের শহরের এক সফল ধনী ব্যক্তিকে ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানাচ্ছিলেন। ধনী ভদ্রলোক এই শহরের আদি বাসিন্দা নন, তিনি বাইরে থেকে এখানে এসেছিলেন।

সংবর্ধনার জবাবে তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, 'বন্ধু ও প্রতিবেশীগণ, আপনাদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। আপনারা আমাকে অনেক দিয়েছেন। আপনাদের এই শহর আমাকে অনেক দিয়েছে। আমার মনে পড়ছে চল্লিশ বছর আগের কথা যখন আমি এক অপরিচিত আগন্তুক আপনাদের এই শহরে একাকী এসেছিলাম। আমার ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত চরণ। সঙ্গে কিছুই নেই। শুধু কাঁধে একটা ক্যানভাসের ঝোলা। এই সম্বল করে আমি এখানে এসেছিলাম। তারপর আমার এত সাফল্য এসেছে। এত উন্নতি হয়েছে।...'

ভদ্রলোক আরও অনেক কিছুই বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সভার মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা আপনার কাঁধের ওই ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে কী ছিল?'

বক্তা একটু ঢোঁক গিলে বললেন, 'লাখ পনেরো নগদ টাকা আর আড়াইশো ভরি সোনা।'

এ গল্পেরই অন্য একটা রকমফের। গল্পের মূল কাঠামো একই। সেই সফল ব্যবসায়ী, তাঁর ষাট বছর বা পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে গণসংবর্ধনা। তবে তাঁর বক্তৃতাটা একটু অন্যরকম। তিনি বললেন, 'আমার সেই মাঘ মাসের ঠান্ডা রাত্রির কথা মনে পড়ছে। দুর্দান্ত শীত, সঙ্গে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। আমি সেই দুর্যোগের মধ্যে এই শহরে এলাম। কাউকে চিনি না। কাউকে জানি না। আমার সারা শরীরে কোনও জামাকাপড় নেই। আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। কাঁপতে কাঁপতে কাঁদছি। ভাল করে গলা ছেড়ে কাঁদতেও পারছি না, গলায় জোর নেই। হাত-পা সেও চলছে না।'

সেই সময়ে হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু স্যার আমরা যে শুনেছিলাম আপনি এই শহরেই জন্মেছেন?'

বক্তা ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। আসলে আমি আমার জন্মদিনের কথা বলছিলাম, ওই মাঘ মাসে বৃষ্টির রাতে আমার জন্ম কিনা, তাই বলছিলাম।'

* * *

পুনশ্চঃ এক নির্বাচন প্রার্থী এক বিতর্কিত অথচ বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে ভোটের আগে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন।

সেই বিতর্কিত ভদ্রলোক এক বাক্যে ওই প্রার্থীকে সাহায্য করতে এবং তার জন্যে বক্তৃতা করতে রাজি হলেন, তবে বললেন যে, 'তুমি একবার ভাল করে ভেবে এসো, তোমার পক্ষে যদি আমি বক্তৃতা করি তা হলেই তোমার বেশি লাভ হবে নাকি তোমার বিপক্ষে বক্তৃতা করলে তোমার বেশি লাভ হবে?'

আবার বক্তৃতা

বক্তৃতা যাঁরা করেন অর্থাৎ বক্তাবৃন্দ এবং বক্তৃতা যাঁরা শোনেন অর্থাৎ শ্রোতাবৃন্দ উভয়েই জানেন যে বক্তৃতা হল অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার, রীতিমতো জটিল বিষয়।

বক্তৃতা একবার আরম্ভ হলে শ্রোতাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে কখন সে বক্তৃতা শেষ হবে। মজার কথা এই যে শুধু শ্রোতারাই নয়, বক্তা নিজেও বহু সময় জানেন না যে কখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হবে। কখনও কখনও বক্তৃতার খেই হারিয়ে যায় কী বিষয়ে বলছিলেন সেটা বক্তা ভুলে যান। অনেক সময় ঘুরে ফিরে একই জায়গায় বারবার চলে আসেন। একবার এক বক্তৃতায় বক্তা মহোদয়কে এগারোবার বলতে শুনেছিলাম 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' সেটা ছিল এক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী উৎসব। এগারোবার একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল তবুও বক্তব্যের কাছাকাছি ছিলেন তিনি।

ওই ভদ্রলোককে পরে একদিন অন্য এক জায়গায় 'বর্ষামঙ্গল' সংগীত উৎসবে উদ্বোধনী বক্তৃতা করতে শুনি। কিন্তু এবারেও উনি ওই 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' সাতবার উদ্ধৃতি দিলেন।

পরে বুঝেছিলাম এটা তাঁর মুদ্রাদোষ। তবে এমন অনেক বক্তা আছেন যাঁরা বক্তৃতা করতে উঠে কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যান কী বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন। এঁরা হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে দিলে শ্রোতাদের আশ্বস্ত হওয়ার তেমন কোনও কারণ নেই। কারণ মঞ্চে উপবিষ্ট অন্য কারও কাছ থেকে সেদিনের সভার বিষয় সম্পর্কে অনুচ্চ কণ্ঠে এবং নির্লজ্জভাবে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এঁরা আবার মাইকে ফিরে আসেন। এইবার তাঁদের বক্তব্য আবার শুরু হয়, 'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম...' এই বলে। বলা বাহুল্য এতক্ষণ যা বলছিলেন এবং এখন যা বলবেন তা মোটেই এক নয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাঁরা অনর্গল বক্তৃতা করে যেতে পারেন তাঁদের প্রাণশক্তি, ফুসফুস এবং কণ্ঠনালি খুবই সবল। রাষ্ট্রপুঞ্জে কৃষ্ণ মেননের অথবা ভুট্টোর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা সারা পৃথিবীতে বিস্ময় সঞ্চার করেছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা সম্পর্কে গল্প আছে যে এক ভদ্রলোক বক্তৃতা করতে করতে মধ্যরাত কাবার করে দেন। তারপর সেটা খেয়াল হতে লজ্জিত হয়ে নিজের শূন্য বাঁ হাতের মণিবন্ধটা দেখিয়ে বললেন, 'হাতে ঘড়ি নেই তাই সময়টা খেয়াল করিনি, একটু দেরি হয়ে গেল কেউ কিছু মনে করবেন না।' ক্লান্ত, নিদ্রাতুর শ্রোতাদের মধ্যে একজন হাই তুলতে তুলতে উঠে বলল, 'হাতে ঘড়ি না থাক, দেওয়ালে তো ক্যালেন্ডার ছিল। সেটা দেখলেই বুঝতে পারতেন পুরো একদিন পার করে দিয়েছেন।'

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা গল্প আছে, সেটা একটু জটিল। এক আশাবাদী বক্তা খুব বক্তৃতা করে চলছিলেন, শ্রোতারা ক্রমশ অধীর হয়ে উঠেছিল, অবশেষে সেই বক্তা বললেন, 'আমার বক্তৃতা আপনাদের জন্যে নয়, আমি বলছি পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে।' শ্রোতাদের মধ্যে তখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি থামবেন না। আর একটু বক্তৃতা চালিয়ে গেলেই পরবর্তী প্রজন্ম এসে যাবে।'

সব বক্তারই প্রধান দুশ্চিন্তা হল যে তাঁর বক্তৃতার সময় লোকজন হল থেকে উঠে না যায়। এ তো প্রায় সকলেরই জানা যে অনেক খ্যাতনামা লোক আছেন যাঁরা জীবনে তাঁদের নিজ ক্ষেত্রে

সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাঁদের বক্তৃতা কেউ শুনতে চায় না, তাঁরা মঞ্চে উঠলেই—এমনকী মঞ্চে ওঠার আগে তাঁদের নাম ঘোষণা মাত্রেই হল থেকে শ্রোতারা দল বেঁধে উঠে চলে যায়।

স্বীকার করা ভাল যে এর মধ্যে তেমন কোনও পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নেই। আসলে উক্ত বক্তাদের বক্তৃতার কুখ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে, সে বক্তৃতার কোনও চমক নেই, রস নেই, নতুন বক্তব্য নেই—শুধু কথার পর কথার পর কথা। কে শুনবে সেই ছাইপাঁশ কাঠের চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে।

তবে এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন এক বুদ্ধিমান হিন্দিভাষী বক্তা। যে কোনও অচেনা জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি যা বলতেন, তার তর্জমা নিম্নরূপ।

'বন্ধুগণ, আমি বক্তৃতা করার আগে একটা কথা জানাতে চাই। আমি যখন সভাকক্ষে আসছিলাম দেখলাম হলের বাইরের বারান্দায় এক পানওয়ালি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, হলের মধ্যে এক বাবু এসেছেন আমার কাছ থেকে একটা পান খেয়ে আর একটা প্যাকেট সিগারেট নিয়ে। কিন্তু দাম দিয়ে আসেননি। পানওয়ালিটি টাকার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি তাকে বললাম ভেতরে আসতে। কিন্তু সে হলের মধ্যে আসতে সংকোচ বোধ করছে।...

'সে যা হোক আমি বক্তৃতা আরম্ভ করছি। যিনি ওর কাছ থেকে পান সিগারেট খেয়ে এসেছেন পয়সা না দিয়ে তাঁকে অনুরোধ গরিব পানওয়ালিটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, একবার উঠে গিয়ে তার হিসাবটা মিটিয়ে দিয়ে আসবেন।'

বলা বাহুল্য, এর পরে একজন শ্রোতাও ভদ্রলোকের বক্তৃতাকালে সভা ছেড়ে উঠে যাননি। কারণ তা হলেই সকলে ধরে নেবে ইনিই ওই পানওয়ালির খাতক।

তবে সবাই যে বক্তৃতা করতে ভালবাসেন কিংবা সদাসর্বদা বক্তৃতা করতে ইচ্ছুক ও উৎসুক তা নয়। বরং অধিকাংশ লোকই বক্তৃতা করতে চায় না, বক্তৃতার নামে তাদের গায়ে জ্বর আসে।

এই ধরনের লোকদের জন্যে একটি সুখবর আছে। খবরটি এসেছে সুদূর পলিনেসিয়া থেকে।

পলিনেসিয়ার আদিম জাতিদের ওপরে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন এক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ। সেখানকার সামোয়া নামক এক গহন অরণ্য প্রদেশের সামন্তনেতা তাঁকে সাদর সংবর্ধনাজ্ঞাপন করেন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্যগীতাদির পরে সভার কার্যসূচিতে ছিল সামন্ত নেতা কর্তৃক নৃতত্ত্ববিদের প্রতি স্বাগত ভাষণ। সেই নৃতত্ত্ববিদ অবাক হয়ে দেখলেন যে ভাষণ দিতে সামন্তটি মোটেই উঠলেন না বরং অন্য এক ভাড়াটে বক্তা এসে তাঁর হয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে নৃতত্ত্ববিদের প্রশংসা ও গুণগান করলেন।

অবশ্যই সভার নির্ঘণ্টে এর পরেই ছিল নৃতত্ত্ববিদের ভাষণ অর্থাৎ ধন্যবাদজ্ঞাপন জাতীয় একটু বক্তৃতা।

বক্তৃতা করার জন্যে নৃতত্ত্ববিদ মহোদয় উঠতেই তাঁকে বাধা দেওয়া হল। বিস্মিত হয়ে তিনি জানতে চাইলেন সভার কার্যসূচিতে তাঁর বক্তৃতা রয়েছে তা হলে বক্তৃতা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? সামন্তনেতা তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে বক্তৃতা হল পেশাদারি ব্যাপার। ওর জন্যে আলাদা লোক নিযুক্ত করা আছে। তারা এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট। নৃতত্ত্ববিদকে কষ্ট করে নিজের ভাষণ দিতে হবে না তার জন্যে লোক মজুত আছে। যে একটু আগে সামন্তনেতার তরফে স্বাগত ভাষণ দিয়েছে সেই অতঃপর ধন্যবাদজ্ঞাপন করবে নৃতত্ত্ববিদের তরফে।

অবশেষে একটি উপদেশ।

কোনও সভায় বক্তৃতাকালে যদি কোনও বক্তা কোনও রসিকতা করেন তা হলে সে রসিকতা আপনার ভাল লাগুক অথবা না লাগুক, পছন্দ হোক বা নাই হোক চিৎকার করে অতি অবশ্য হো হো করে হাসবেন। চেষ্টা করবেন পাশের দর্শকদেরও দলে টানতে।

কারণ আপনারা যদি না হাসেন, ওই বক্তা ধরে নেবেন আপনারা তাঁর রসিকতাটি মোটেই ধরতে পারেননি। তিনি আবার এবং আবার, আপনারা না হাসা পর্যন্ত রসিকতাটি চালিয়ে যাবেন। তার থেকে প্রথমবারে একটু কষ্ট করে হেসে নেওয়াই ভাল নয় কি?

কলিংবেল

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠে আসছে।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।

কলিংবেল বেজে উঠল।...

সেই কবে জ্ঞান হওয়া থেকে, বলা উচিত, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পেরুনোর পর থেকেই, রহস্য উপন্যাস পড়ে আসছি। সেই থেকে আমার কলিংবেলের সঙ্গে পরিচয়। তখন কলিংবেল চোখেও দেখিনি, আমাদের বহু দূরের মফস্বল শহরে বিদ্যুৎই ছিল না কলিংবেল থাকবে কী করে?

কলিংবেল নামক বস্তুটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ পনেরো বছর বয়েসে কলকাতায় এসে। তার আগে আরও দু'-একবার কলকাতায় আসিনি তা নয়, কিন্তু আমরা উঠতাম শ্যামবাজারে, সেখানে কোনও বাড়িতে কলিংবেল তখন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মফস্বলের মতোই লোকেরা বাড়ির রোয়াকে উঠে ডাকত, 'শ্যামবাবু বাড়ি আছেন নাকি?' সাড়া না পেলে আরও চেঁচিয়ে তারপর উত্তরোত্তর চেঁচিয়ে শ্যামবাবুর অনুসন্ধান চলত যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তর আসে। আর তা ছাড়া দরজা খোলা থাকলে, একটু জানাশোনা থাকলে যে কোনও দিগ্‌গজের বাড়িতে যে কেউ উঠোনে বা ভিতরে ঢুকে পড়ত, এটা কোনও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, কোনও জানান দেওয়ার আবশ্যক ছিল না। এমনকী গলা-খাঁকারি দিতেও হত না।

কিন্তু ইতিমধ্যে মোহন সিরিজ, কিরীটি রায় রহস্য কাহিনীর পৃষ্ঠা অতিক্রম করে ক্রিং ক্রিং করে কলিংবেল এসে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বাংলা রহস্য উপন্যাসেই নয় এই ফাঁকে বিলিতি রোমাঞ্চমালাতেও ক্রমাগত শুনেছি কলিংবেলের শব্দ, কখনও শব্দের মুহূর্তেই শব্দের ঠিক ওপাশে মারাত্মক সমস্ত রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে। রোমহর্ষক না হলেও আমার এখনকার প্রিয়তম গোয়েন্দা নায়ক ফেলুদার বাড়িতে একবার বিনা বিদ্যুতেই লোডশেডিংয়ের সময় কলিংবেল বেজেছিল।

অবশ্য বিদ্যুৎহীন কলিংবেল যে নেই তা নয়, অনেক অফিসের টেবিলেই সেটা বাজে, সেটা বাজিয়ে বড় সাহেবরা কীভাবে চাপরাশিদের ডাকতেন, নাকি তখন চাপরাশিদের ডাকবার জন্যে চাপরাশি ছিল।

অফিসের কলিংবেল নয়, বাড়ির কলিংবেলের কথা বলি। বাড়ির দরজায় কলিংবেল দেখলেই আমার মফস্বলি মনে কীরকম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর একটা সম্ভাব্য কারণ বোধহয় এই, বছর পনেরো আগে একবার এক প্রচণ্ড বর্ষার দিনে সন্ধ্যাবেলা এক বাড়ির ভিজে দরজায় কলিংবেল টিপতে গিয়ে এমন সাংঘাতিক ইলেকট্রিক শক খেয়েছিলাম ভাবতে গেলে এখনও পায়ের তালু থেকে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝিনঝিন করে ওঠে। এর পর থেকে কোনও বাড়ির দরজায় কলিংবেল দেখলেই আমি ভয় পাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে যে বাড়িতে বিশেষ প্রয়োজনে সাত রাজ্য পার হয়ে চারবার ট্রাম বাস বদলিয়ে তারপর এসে পৌঁছেছি, সেখানে ঢুকতে কেমন একটা ভয় হয়, সাহস হয় না বেল টিপতে, ইচ্ছে হয় ফিরে যাই।

কিন্তু উপায় নেই। এখন এমন একটি বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন যার সদর দরজা বন্ধ থাকে না

এবং যে দরজায় একটি কলিংবেল লাগানো থাকে না। সদর দরজা হাট করে খুলে বাইরের ঘরে বসে যারা হইহই করে গল্প করত, তক্তপোশে বসে তাস খেলত সেই লোকেরা কোথায় গেল?

সে যা হোক, একটা কলিংবেল তবু ভাল, অনেক বাড়ির দরজায় একাধিক কলিংবেল লাগানো থাকে। তখন একটা সমস্যা, হেড না টেল, কোনটা আসল, উপরেরটা না নীচেরটা কোনটা বাজবে?

দুটোই বাজিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোনটা বাজে? বাজে মানে ক্রিয়াপদ, বিশেষণ নয়, কোনটা থেকে শব্দ বেরয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্রও কি ছিদ্রহীন? অনেক বাড়িতেই কলিংবেলের ঘণ্টা যন্ত্রটি থাকে বহিরাগতের শ্রুতি সীমার বাইরে, তখন বারবার বাজিয়ে অধীরভাবে কান পেতে থাকতে হয়, বেল বাজল কিনা, সিঁড়িতে কিংবা বারান্দায় কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা।

অনেক সময় আবার খুব গোলমালও হয়। একই সদর দরজায় দুটো বেল দুই পাশাপাশি ফ্ল্যাটের, কে বুঝবে? দুটি বেল উপরে নীচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার মিনিটে আটবার বাজানোর পর একসঙ্গে দুই প্রান্তে দুটি দরজা খুলে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেল, তখন বুঝিয়ে বলা কঠিন কেন এই অসৎ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছি।

অনেক কলিংবেলের নীচে ছোট ছোট অক্ষরে কীসব নির্দেশ লেখা থাকে। রোদে-বৃষ্টিতে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, যখন অস্পষ্ট ছিল না তখনও ঘাড় উঁচু করে দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে ওই ছোট ছোট বর্ণমালা থেকে কোনও অর্থ উদ্ধার করা খুব সহজ ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য এর আবার উলটোদিক আছে, সেখানে কলিংবেলের নীচেই একটা ঘণ্টার ছবি আঁকা থাকে যাতে কারও অসুবিধা না হয় বুঝতে যে এই ঘণ্টাটি বাজাতে হবে।

তবে কোনও কোনও বাড়িতে এও দেখেছি যে, তির কিংবা হাতচিহ্ন দিয়ে দূরে নির্দেশ দেওয়া আছে, পাশে ইংরেজি ও বাংলাতে লেখা, বেল ইন সাইড প্যাসেজ, ঘণ্টা পাশের প্যাসেজে। বলা বাহুল্য এ রকম ক্ষেত্রে দরজায় ধাক্কা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, পাশের অন্ধকার প্যাসেজে বেলের অনুসন্ধান করতে না যাওয়াই ভাল। অন্তত একবার গিয়ে আমার এক আত্মীয় পা পিছলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্য ভাল দেড় ঘণ্টার মাথায় আরেকজন সেই বেল বাজাতে এসেছিলেন এবং তিনিই আমার সেই আত্মীয়কে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে অতি সাবধানে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন।

সব দেখে শুনে তবুও আমাদের শিক্ষা হয় না। আমরা নিজেরাই বাড়িতে একটা কলিংবেল লাগিয়েছিলাম। ভালই চলছিল, কিন্তু মাসখানেকের মাথায় একদিন রাত দেড়টা নাগাদ সেটা একা একাই অকারণে বেজে ওঠে এবং সারারাত ধরে বাজতে থাকে, শেষে সাড়ে চারটা নাগাদ এক বিরক্ত প্রতিবেশী ঘুম থেকে উঠে এসে বুদ্ধি করে মেন সুইচ বন্ধ করে দেন, আমরা রক্ষা পাই।

ঈশ্বর সমীপে

একটি ছোট মেয়ে একটা গিনিপিগ পুষত। সবসময় গিনিপিগটাকে নিয়ে খেলা করত, খুবই ভালবাসত সে এই ছোট জন্তুটাকে, সাদা-কালো লোমের, জুলজুলে ফিকে নীল চোখের গিনিপিগটাকে।

যেমন হয়ে থাকে, একদিন গিনিপিগটা দেহরক্ষা করল। ছোট মেয়েটা তো কেঁদেকেটে অস্থির। কিছুদিন আগে তার এক দাদু মারা গিয়েছিল। তার দাদুকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ানো হয়েছিল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরল তার সাধের গিনিপিগটাকেও দাহ করে শেষ সৎকার করতে হবে। তাকে অনেক বোঝানো হল যে যেহেতু গিনিপিগ মানুষ নয় তাই এটাকে না পুড়িয়ে মাটি খুঁড়ে কবর দিতে হবে। তাকে আরও বোঝানো হল যেসব মানুষকে পোড়ানো হয় না, অধিকাংশকেই কবর দেওয়া হয়।

অনেক ভাবনাচিন্তা করে, চোখের জল মুছে অবশেষে মেয়েটি রাজি হল তার প্রিয় গিনিপিগকে কবর দিতে। তার বাবা একটা পুরনো জুতোর বাক্সে মৃত গিনিপিগটা ভরে বাড়ির পিছনের বাগানে একটা চৌকো মতন গর্ত করে তার মধ্যেই সেই জুতোর বাক্সটা সুদ্ধ গিনিপিগটা কবর দিলেন।

কবর দেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মেয়েটি তার বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা আমাদের এই বাক্সটা কি এবার স্বর্গে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবে?' মেয়েকে আশ্বস্ত করার জন্যে তার বাবা বললেন, 'তা নিশ্চয়ই যাবে।' তখন মেয়েটি মোক্ষম কথা বলল, 'বাবা ভগবান যখন বাক্স খুলে দেখবেন ভেতরে কোনও জুতো নেই, মরা গিনিপিগ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের উপর খুব চটে যাবেন।'

সত্যিই এক্ষেত্রে জুতোর বাক্স খুলে জুতো না পেয়ে ভগবান ওই বালিকাটি এবং তার পিতৃদেবের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা তা বলা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে ঈশ্বর বিষয়ে অনেকের চিন্তাই ওই মেয়েটির ভাবনার মতোই সাদামাটা।

এক সরলপ্রাণা সাধ্বী রমণীর কথা বলি। তিনি একটি বিখ্যাত কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি এই মন্দিরে আর কখনও যাননি।

সব বড় মন্দিরে যেমন হয় প্রধান দেবতা বা দেবী ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর ছোট বড় মন্দির পাশেই থাকে। এই কালী মন্দিরেও তাই। পাশেই শিবলিঙ্গ, তার পাশে অন্নপূর্ণার মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণ—এমনকী মন্দিরে ঢোকার গেটের পাশে একটা ছোট চালায় একটা শীতলা মন্দিরে সত্য অর্চিতা প্রতিমা অধিষ্ঠিতা রয়েছেন।

ভদ্রমহিলা শীতলা মন্দির পার হয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে সামনেই অন্নপূর্ণার মন্দির পেলেন, সেখানে গড় হয়ে প্রণাম করে তারপর আঁচল খুলে একটি রুপোর টাকা বার করে সামনের প্রণামীর থালায় রাখলেন। খাঁটি রুপোর বনেদি টাকা, পঞ্চাশ বছর আগের পঞ্চম জর্জীয় নিকষকুলীন রৌপ্যমুদ্রা। বহুদিন ধরে সুরক্ষিত। এই মুদ্রাটি তিনি এই মন্দিরের মা কালীর কাছে মানত করেছিলেন।

প্রণামীর থালায় টাকা রেখে অন্নপূর্ণার মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁর খেয়াল হল এটা কালী মন্দির নয়। সামনে উঠোনের ওপাশে খুব ভিড় ওখানেই রয়েছে মা কালীর মন্দির এবং এই রৌপ্যমুদ্রাটি এই অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নয় ওই কালীমাতার প্রাপ্য।

এরপর ভদ্রমহিলা প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন অন্নপূর্ণার প্রণামীর থালা থেকে রৌপ্যমুদ্রাটি উদ্ধার করার কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়নি। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে, ব্যথিত চিত্তে মানত পালন করা হল না বলে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সবাই তাঁকে বুঝিয়েছিল যে এতে কিছু আসে যায় না অন্নপূর্ণাকে দিলেই মা কালীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সেকথা মানেননি। বহু কষ্টে এবং রীতিমতো অর্থব্যয়ে অনুরূপ একটি নিকষকুলীন রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে পরেরবার তিনি সঠিক স্থানে দিয়ে এসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'এত কি দরকার ছিল?' তিনি বলেছিলেন 'মা কালী আমাকে গুরুতর বিপদের দিনে রক্ষা করেছিলেন। আমি মানত করেছিলাম, সে মানত রক্ষা না করলে মহাপাতকী হতাম।'

* * *

কঠিনতম স্বীকারোক্তি করেছিলেন আলেকজান্দার দুমা, 'থ্রি মাসকেটিয়ারস' খ্যাত সেই ঊনবিংশ শতকের বিপুল প্রতাপান্বিত ফরাসি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। বলা বাহুল্য, দুমা সাহেবের ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভগবৎভক্তি খুব প্রবল ছিল না।

সে যা হোক, হয়তো কোনও রচনার প্রয়োজনেই আলেকজান্দার দুমা একদা এক প্রবীণ যাজককে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর প্রার্থনাগুলো যেন তিনি দুমা সাহেবকে বলেন।

যাজক মহোদয় একটু বিস্মিত হয়ে উলটে দুমা সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি এসব বিশ্বাস করেন?' বুদ্ধিমান আলেকজান্দার দুমা বলেছিলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি এসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়বে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব।'

একথা মর্মান্তিক রকমে সত্যি। অধিকাংশ লোক ভূত আর ভগবানে বিপদে না পড়লে বিশ্বাস করে না।

বোধহয় শরৎচন্দ্রেরই একটি চরিত্র স্বীকার করেছিল যে সে ভূতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভয় করে। সেইরকমই আমাদের চারপাশে অধিকাংশ চরিত্র ভগবানকে তখনই ডাকে যখন তার বিপদ বা অসুবিধে হয়, নিজের প্রয়োজন পড়ে।

একটি বিলিতি গল্প মনে পড়ছে।

সেই এক সাহেবদের খোকা বড় হয়েছে, মানে আট বছর বয়েস হয়েছে তার। পাঁচ বছর বয়েস থেকেই সে মা-বাবার থেকে আলাদা ঘরে শোয়। তবে রাতে অন্ধকারে যাতে ভয় না পায় সেই জন্যে তার ঘরে সারা রাত ধরে একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বালিয়ে রাখা হয়।

' কিন্তু যেহেতু এখন তার আট বছর বয়েস হয়েছে সে বড় হয়েছে তাই অহেতুক ভয় পাওয়ার বয়েস তার চলে গেছে। তার মা একদিন রাতে শোয়ার সময় তাকে বললেন, 'খোকা, এখন তুমি বড় হয়ে গেছ। এখন আর তোমার খালি ঘরে অন্ধকারে ভয় পাওয়ার বয়েস নেই আজ রাত থেকে শোয়ার সময়ে তোমার ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হবে।'

এই পরিবারটি একটি গোঁড়া খ্রিস্টান পরিবার। প্রতিদিন রাতে শোওয়ার আগে এরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ঘুমোতে যায়। এই খোকাটিও তাই করে।

আজ যখন তার মা বলল যে আজ রাত থেকে তার ঘরে আর আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে না। দুয়েকবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করার পরে সে বলল, 'তা হলে মা শোয়ার আগের প্রার্থনাটা আরেকবার করি। এবার একটু মন দিয়ে করি।'

অর্থাৎ এতদিন সে দায়সারা প্রার্থনা করে এসেছে ঘরে আলো জ্বালা থাকে এই সাহসে কিন্তু আজ অন্ধকার ঘরে সাহস সঞ্চয় করার জন্যে তাকে একটু ভাল করে প্রার্থনা করতে হচ্ছে।

এই খোকাটির ঘটনা কোনও ব্যতিক্রমের ব্যাপার নয়। দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা, যেদিন চোখের জল নেমে আসে দুঃখের বরষায় সেই বিপদের, বঞ্চনার দিনেই সাধারণ

বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে, প্রার্থনা করে। সেদিন সে কালী বাড়িতে পুজো মানত করে, মসজিদে সিন্নি দেয়। ভাঙা গির্জার পাতাঝরা ধুলো ভরা চাতালে অনেকদিন পরে সেই সন্ধেবেলায় সে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসে।

সন্ধ্যের অবসন্ন বাতাসে কম্পমান ক্ষীণ দীপশিখা অসহায় মানুষের নীরব আকুতি নিবেদন করে সেই অমোঘ নিয়তির কাছে, যার অন্য নাম ঈশ্বর।

জীব জগতের আজব কথা

ছোটবেলায় বোধহয় এই নামে কিংবা এরই কাছাকাছি নামে একটা আশ্চর্য বই পড়েছিলাম। সে ছিল প্রকৃত তথ্যে ও বর্ণনায় ভরপুর রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সে জাতীয় কোনও তথ্যময় রোমাঞ্চকর নিবন্ধ রচনা যে আমার উদ্দেশ্য নয় সেটা পাঠিকা পাঠকেরা অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন। আমি হালকা লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব, তবে এবার শুধু মানুষ নয়, একটু জীবজন্তুর কথা বলি।

দিনের পর দিন ক্রমাগত স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ছাত্র-শিক্ষক এমনকী রোগী-ডাক্তার, উকিল ব্যবসায়ীর মতো বিপজ্জনক বিষয়ে অনবরত রসিকতা করে করে কলম ভোঁতা হয়ে গেছে। রসিকতাও বেশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, নিজেই টের পাই।

সুতরাং, আপাতত এ যাত্রা জীবজন্তুর উপর নির্ভর করতে যাচ্ছি। তবে পুরোপুরি জীবজন্তু নিয়ে রসিকতা করা সম্ভব হবে না, মানুষকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।

* * *

প্রথম গল্প এক অধ্যাপক এবং তাঁর গৃহপালিত গোরু নিয়ে। এ আখ্যানে অবশ্য মানুষের ভূমিকাই গুরুতর।

এক দর্শনের অধ্যাপক তাঁর পোষা গোরুকে নিয়ে একটা গবেষণা করছিলেন। গবেষণার বিষয়বস্তুটি রীতিমতো চমকপ্রদ এবং অভিনব।

অধ্যাপক মহোদয়ের ধারণা হয়েছিল যে জীবমাত্রকেই যা ইচ্ছে শেখানো যায়। সে যা কিছু করে সবই অভ্যাসবশত, তাকে ঠিকমতো শিক্ষা দিলেই সে তা করবে না। যেমন তাঁর নিজের পোষা গোরু, সে যে ঘাস বিচালি খায়, সে নিতান্ত একটা অভ্যাস মাত্র। তাকে ধীরে ধীরে খাওয়া ছাড়ানো শিক্ষা দিতে লাগলেন।

প্রতিদিন এক আঁটি, দু' আঁটি করে ঘাস বিচালি গোরুর বরাদ্দ খাদ্য থেকে কমিয়ে আনতে লাগলেন অধ্যাপক। এইভাবে কমাতে কমাতে অবশেষে একদিন গোরুটির খোরাক তিনি শূন্য পরিমাণে নামিয়ে আনতে সমর্থ হলেন।

দুঃখের বিষয় অনাহারে ক্লিষ্ট অবলা জীবটি সেই দিনই দেহত্যাগ করল। গোরুর মৃত্যুতে

অধ্যাপক একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর এতদিনের গবেষণা, এত পরিশ্রম বিফলে গেল। অধ্যাপক মহোদয় দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'অপূরণীয় ক্ষতি হল আমার গবেষণার। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করে বোকা গোরুটাকে যখন না খেয়ে বাঁচা শেখালাম, ঠিক তখনই গোরুটা মরে গেল।'

বলা বাহুল্য, এই আখ্যানের অধ্যাপক ভদ্রলোক তাঁর গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছিলেন এবং নিরীহ জীব আত্মদান করেও তাঁকে কোনও শিক্ষা দিতে পারেনি।

জীবজন্তুর শিক্ষার অন্য একটা গল্প। তবে সে গল্প গোরুর নয়, কুকুরের। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা উচিত যে গল্পটি বেশ পুরনো এবং কোনও কোনও পাঠক বা পাঠিকা অন্য কোথাও না হলেও আমার লেখাতেই হয়তো লেখাটি আগে পড়েছেন।

আমার প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক কুকুর পুষতেন এবং শুধু পোষা নয় প্রচণ্ড ভালবাসতেন তাঁর কুকুরকে। তাঁর কুকুরের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণাও তিনি পোষণ করতেন এবং সে জন্যে তাঁর অহংকারের কমতি ছিল না।

আমরা দু'জনে সকালে ময়দানের একই প্রান্তে মর্নিং ওয়াক করতে যাই। সেখানে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নানারকম কথা হয়। সেদিন হঠাৎ কুকুরের কথা উঠল এবং ভদ্রলোক দাবি করলেন যে তাঁর কুকুরের এখন এত বুদ্ধি হয়েছে যে সে মুখে মুখে বিয়োগ কষতে পারে। অবশ্য বড় বিয়োগ নয়, ছোট ছোট বিয়োগ।

সেদিন মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরার পথে তিনি জোর করেই আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সাত সকালে সিঁড়ি ভেঙে তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে উঠতে হল। তিনি চা আর বিস্কুট খাওয়ালেন।

চা খাওয়ার সময় তাঁর কুকুরটিও এল। প্রভুর বিস্কুটে ভাগ বসাল। আমাকেও দু'বার সামনের ডান পায়ের থাবা দিয়ে আঘাত করে আমার কাছে বিস্কুটের ভাগ চাইল। কুকুরটি যে বুদ্ধিমান এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু তাই বলে অঙ্ক কষতে পারবে, একেবারে বিয়োগ?

সামান্য পরেই সন্দেহের নিরসন হল। কুকুরটির প্রভু তাকে বললেন, 'নিউটন বল তো দশ থেকে দশ বিয়োগ করলে কত হয়? কুকুরটির নাম নিশ্চয় নিউটন, সে কিন্তু এই প্রশ্নে চুপ করে রইল। তার প্রভু আমাকে বললেন, 'দেখলেন?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী দেখলাম?' প্রভু বললেন, 'উত্তর শূন্য বলে চুপ করে আছে কিছু বলছে না।'

বলা বাহুল্য আমি আর কথা না বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে তরতর করে চারতলা থেকে নেমে এসেছিলাম।

ওপরের সেই গল্পটা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। তাঁদের কোনও দোষ নেই তবু তাঁদের জন্যেই জীবজন্তু বিষয়ক আর একটা অবিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বলছি।

এ কাহিনী অনেকদিন আগেকার। আমাদের অল্প বয়সের পাড়াগাঁয়ের গল্প।

এ গল্প খাঁটি সরষের তেলের যুগের। ভেজাল রেপসিডের যুগে এ গল্প বিশ্বাস করা কঠিন।

আদ্যিকালের এক কলুর বলদ। সকাল থেকে সে কলুর ঘানি ঘোরাচ্ছে তো ঘোরাচ্ছেই। তার দু' চোখে ঠুলি বাঁধা, ডাইনে-বাঁয়ে কিছুই সে দেখতে পারছে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে কলু মশায় মাঝে মধ্যে চেঁচাচ্ছেন, 'এই মোংলা, এই রবি, এই ভোমলা, এই সাধু জোরে ঘোর, জোরে পাক দে।' সে চিৎকার শুনে বলদটা মাঝে মাঝে তার চলার গতি বাড়াচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তিনি পথের ধারে কলু মশায়ের বাড়ির সামনে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে করতে বলদ-মানুষের এই নাটক দেখছিলেন। কিছুক্ষণ দেখার পরে সেই ভদ্রলোকের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল, তিনি কলু মশায়কে বললেন, 'আচ্ছা আপনার বলদকে আপনি এই যে চার পাঁচটা নামে ডাকছেন, এর কি সত্যিই এতগুলো নাম?'

হাতের খেলো হুঁকো টানতে টানতে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কলু মশায় বললেন, 'একটা বলদের কটা নাম রাখব? ওর একটাই নাম। ওর নাম মোংলা।'

পথচারী ভদ্রলোক অবাক প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে ওকে এতগুলো নামে ডাকছেন কেন?' এই জিজ্ঞাসা শুনে কলু মশায় পথচারীর কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'এদিকে একটু গাছের আড়ালে আসুন, আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু মোংলা জানতে পারলে সর্বনাশ হবে।'

হঠাৎ পথচারীকে একটা বড় তেঁতুল গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে কলু মশায় বললেন, 'দেখুন ওর নাম মোংলা। কিন্তু ওর চোখে তো ঠুলি বাঁধা। ও তো আশেপাশে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাই আমি যখন এই মোংলা, এই রবি, এই সাধু এইসব বলছি, ও ভাবছে ও একাই ঘানি টানছে না ওর সঙ্গে আরও অনেক বলদ রয়েছে এতে ও মনে ফুর্তি পায়, গায়ে জোর পায়। আরও শক্তি দিয়ে ঘানি টানে।'

* * *

পুনশ্চঃ আমার সেই অখাদ্য গল্পটা মনে আছে তো? ক্যাঙারু মা বাস থেকে নেমে ক্যাঙারু বাবাকে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে। খোকা পকেটে নেই। আমাদের খোকা এইমাত্র পকেটমারি হয়ে গেল।'

তামাক

গল্পটা অনেকদিনের পুরনো। পড়েছিলাম সেই 'অচলপত্র' কাগজে। সেও অনন্তকাল আগে, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই।

এ কালের মহাভারতের নবীন পাঠক, অচলপত্রের নামটা কি খুব অচেনা, খুব অপরিচিত মনে হচ্ছে? কখনও দেখেননি অচলপত্র পত্রিকা? মনে পড়ে দীপ্তেন সান্যাল?

আমাদের নব যৌবনের দিনে অচলপত্র ছিল আমাদের রসিকতা শিক্ষার পাঠশালা আর তাঁর পণ্ডিতমশাই ছিলেন দীপ্তেন সান্যাল।

অচলপত্রের সাহিত্য ব্যাপারটা খুব জরুরি ছিল না, উচ্চমানের ছিল এমনও বলা যাবে না কিন্তু সম্পাদক দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যালের রসবোধ ছিল তীক্ষ্ণ ও প্রখর, অনায়াস ও সহজাত হালকা চাল ছিল তাঁর কলমে এবং তাঁর কোনও কোনও রসিকতা ছিল অনন্য সাধারণ ও স্মরণীয়।

হাতের কাছে পুরনো অচলপত্র পত্রিকার একটা সংখ্যাও নেই, কাছাকাছি কারও কাছে আছে বলেও জানি না। তা হলে অচলপত্র স্মৃতিচারণ অন্তত একবার করা যেত।

আপাতত সে ইচ্ছা মুলতুবি থাক, তামাকের গল্প চাই। একবারে হবে না, দু'বারে লিখব।

সিগারেট দিয়ে শুরু করি। অচলপত্রের গল্পটা সিগারেট নিয়ে।

খগেনবাবু নামে এক ভদ্রলোক ময়দানে খেলা দেখতে গেছেন। খুব উত্তেজনাপূর্ণ খেলা, ফুটবল

লিগ মরশুমের একেবারে শেষ দিকের খেলা দুই মহারথীর মধ্যে। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন খগেনবাবু।

তখনও ইডেন গার্ডেনের স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা চালু হয়নি। সল্ট লেক স্টেডিয়ামের কথাই আসে না, প্রকৃত অর্থেই সে তখন অগাধ জলে।

উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন খগেনবাবুর ইচ্ছে হল একটা সিগারেট ধরাতে। খেলা এখন সেকেন্ড হাফের আধাআধি সময়ে এসে গেছে। এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে মাঠে ঢুকেছিলেন খগেনবাবু। প্রথমার্ধে এবং তারপরে হাফ টাইমের সময় প্রায় সব কয়টি সিগারেট তিনি খেয়ে ফেলেছেন। শেষবার যখন প্যাকেট পকেটে রাখেন তখন মাত্র একটা সিগারেট ছিল তাঁর প্যাকেটে। সেটা সযত্নে রক্ষা করেছেন এতক্ষণ, কিন্তু এবার আর পারলেন না।

গোলের মুখে বল প্রায় দেড় মিনিট ধরে ঘোরাঘুরি করছে। একটি গোলের ওপরেই খেলার চূড়ান্ত জয় পরাজয় নির্ভর করছে। খগেনবাবুর পাশের ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ তাঁর নাকে ঢুকে চুলবুল করছে। শেষ সিগারেটটাকে আর রেখে লাভ নেই।

পকেটে হাত দিলেন খগেনবাবু। স্পষ্ট মনে আছে ডানদিকের প্যান্টের পকেটে প্যাকেটটা রেখেছিলেন কিন্তু প্যাকেটটা সেখানে নেই। বাঁদিকের প্যান্টের পকেটে, তারপরে শার্টের ওপর পকেটে—সব জায়গায় তন্নতন্ন করে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজলেন খগেনবাবু।

না, কোথাও নেই। সিটের পাশে, এমনকী গ্যালারির নীচে পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন। সিগারেটের প্যাকেটটার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল আশ্চর্য।

পাশের ভদ্রলোক এখনও সিগারেট টেনে চলেছেন। তাঁর সিগারেটের ধোঁয়ায় মন উশখুশ করতে লাগল খগেনবাবুর। অবশেষে খগেনবাবু সিগারেটের নেশার টান সামলাতে না পেরে একটা ছোট চাতুরির আশ্রয় নিলেন। পাশের ধূমপানরত সহদর্শককে বললেন, 'দাদা, আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন?'

ভদ্রলোক খেলা দেখতে দেখতে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে খগেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। খগেনবাবু ভদ্রলোককে দেখিয়ে দেখিয়ে পকেটে সিগারেটের প্যাকেট খোঁজার একটা অভিনয় করলেন, তারপর মুখে একটা অস্ফুটপ্রায় 'ধুৎ' বলে দেশলাইয়ের বাক্সটা ফেরত দিয়ে দিলেন এই আশায় যে, ভদ্রলোক যখন দেখবেন যে তাঁর কাছে কোনও সিগারেট নেই, দেশলাই নিয়েও সিগারেট ধরাতে পারলেন না, তখন হয়তো দয়া করে একটা সিগারেট অফার করবেন।

দেশলাই বাক্সটা ফেরত দেওয়ার পর খগেনবাবু যা আশা করেছিলেন প্রায় তাই হল। পাশের ভদ্রলোক দেশলাই ফেরত পেয়ে এবং খগেনবাবুকে সিগারেট না ধরাতে দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন, 'কী হল সিগারেট ধরালেন না?'

খগেনবাবু করুণ মুখে বলেন, 'না। পকেটে একটা প্যাকেটে একটা মাত্র সিগারেট ছিল, কখন যে পড়ে গেছে প্যাকেটটা। আর তো সিগারেট নেই।'

ভদ্রলোক খগেনবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'কাঁচি সিগারেট? কাঁচির প্যাকেটে একটাই সিগারেট ছিল আপনার?' খগেনবাবু উৎসাহী হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। পেয়েছেন নাকি প্যাকেটটা?' ভদ্রলোক লজ্জিত কণ্ঠে স্বীকার করলেন, 'পেয়েছিলাম তো, কিন্তু আমার কাছেও যে কোনও সিগারেট ছিল না, আপনার সিগারেটটাই এতক্ষণ খেলাম।' বলে শেষ একটা সুখটান দিয়ে তিনি সিগারেটের দগ্ধাবশেষটুকু গ্যালারির নীচে নিক্ষেপ করলেন।

* * *

তামাকের আলোচনার বদলে সিগারেটের গল্পটা একটু বড় হয়ে গেল।

তামাকের নানা রকমফের। সরাসরি মুখে দিয়ে খাওয়ার খইনি, সুরতি। গন্ধ মশলা মিশিয়ে জর্দা, দোক্তা, গুণ্ডি। ওড়িয়া পানের দোকানে গুণ্ডি মোহিনীর খুব কদর, যেমন বিহারিদের কাছে খইনির। বাঙালির দুটোই বেশ চলে।

ধূমপান করার জন্যে আছে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, চুট্টি। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর অপু [illegible] খেয়েছিল, সেও এক জাতের সিগারেট।

আর তামাক খাওয়া বলতে যা বোঝায় সেই হুঁকো, গড়গড়া, অম্বুরী, বাদশাহী, রংপুরী তামাক; [illegible] নল, রুপোর খোল আজকের দ্রুতগতি জীবনে সে প্রায় সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

হুঁকো সম্পর্কে শেষ গল্পটা লিখে রাখি। পরে লোকে গল্পটা বুঝতেও পারবে না।

একটা হুঁকোর চারটে প্রধান অংশ। প্রথম অংশ কলকে, যার মধ্যে তামাক থাকে। তারপর নলচের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া নীচে নেমে আসে জলের পাত্রে, এই পাত্রই হল খোল। নারকোলের মালা দিয়ে ভাল খোল হয়, তবে সোনার, রুপোর, ব্রোঞ্জের পাত্রও হয়। চতুর্থ অংশটি আবশ্যিক নয়। সেটা হল নল। থেলো হুঁকো মানে নারকেলের মালার হুঁকোয় জরির কাজ করা অনেকরকম শৌখিন নল লাগানো থাকে।

ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য হুঁকোর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটুকু লিখে রাখলাম। এবার গল্পটা বলি।

এক ভদ্রলোক দাবি করেছিলেন যে, তাঁদের বাড়িতে একটা হুঁকো আছে যেটা নবাব আলিবর্দি খাঁ সাহেবের আমলের। এত পুরনো শুনে অনেকে সেই হুঁকোটা দেখতে চাইত। তখন ভদ্রলোক সে হুঁকোটা বার করে দেখতেন, সেটাকে দেখে কিন্তু তত পুরনো মনে হত না। সবই কেমন, খুব নতুন নতুন না হলেও মোটেই পুরনো নয়।

ভদ্রলোক এর যা ব্যাখ্যা দিতেন সেটা চমৎকার। যদিও হুঁকোটা সেই প্রাচীন দিনের, এর মধ্যে পুরনো অংশ এখন আর কিছুই নেই। কখনও কলকে, কখনও নল, কখনও খোল, কখনও নলচে বদলাতে বদলাতে সেই হুঁকোটাই সম্পূর্ণ চেহারাটা পালটিয়ে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, 'খোল-নলচে সমেত বদলিয়ে যাওয়া' প্রবাদটির উৎস এই গল্প।

আবার তামাক

অনেক ধূমপায়ী আছেন যাঁদের বলা হয় চেন স্মোকার (Chain Smoker), যাঁরা ধোঁয়ার শেকল তৈরি করেন, মানে ক্রমাগত, একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যান ধোঁয়ার শেকল অবিচ্ছিন্ন রেখে। এঁদের অনেকের দেশলাই পর্যন্ত থাকে না, একটা সিগারেটের আগুন থেকে অন্য সিগারেট, তার থেকে পরেরটা এইভাবে পরপর ধরিয়ে যান।

সেই সূত্র ধরে এই তামাক নিবন্ধমালা আমি ওই চেন স্মোকিংয়ের মতো টেনে নিয়ে যাব সেরকম আশঙ্কা করার কোনও কারণ নেই। আমি নিজে বহুকাল ধূমপান করি না এবং এ দেশের বিধিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ঘোষিত নির্দেশ—'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'—মান্য করে ধূমপান বা তামাক বিষয়ে আলোচনা এবারেই শেষ করব।

পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনও ধূমপায়ী নেই যে কখনও প্রতিজ্ঞা করেনি যে সে আর ধূমপান করবে না এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা এক সন্ধ্যার জন্যে হলেও চেষ্টা করে ধূমপান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেনি।

অবশ্য কয়েক ঘণ্টা বা বড়জোর কয়েকদিন বাদে সেই প্রতিজ্ঞা সে ভঙ্গ করেছে।

বোধহয় মার্ক টোয়েন সাহেবই বলেছিলেন যে 'ধূমপান ছেড়ে দেওয়া খুব সোজা, আমি নিজে বহুবার ছেড়েছি।' বঙ্কিম বাক্যবিলাসী মহামতি মার্ক টোয়েনের উক্তিটি আপাতশ্রবণে যতটা সরল মনে হচ্ছে তা কিন্তু নয়।

'আমি ধূমপান করা বহুবার ছেড়েছি', একথার আসল অর্থ হল 'ধূমপান ছেড়েছি এবং আবার ধরেছি'। এবং এই উক্তির বিশেষ তাৎপর্য হল ধূমপান কখনওই একেবারে ছাড়তে পারিনি, ছেড়েছি বটে, ছাড়বার চেষ্টা করেছি বটে তবে আবার ধরেছি, ধরতে হয়েছে।

মার্ট টোয়েন ছিলেন মার্কিনি সাহিত্যিক। গত শতকের ইংরেজ লেখকেরাও তামাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিপলিং বলেছিলেন চমৎকার কথা, 'একজন রমণী শুধুই রমণী, কিন্তু একটা ভাল চুরুট হল ধোঁয়া।'

চার্লস ল্যাম্ব লিখেছিলেন 'তামাকু বিদায়' (A Farewell to Tobacco), যাতে ছিল সেই দুই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি,

'তামাক,
আমি সব কিছু করতে পারি
তোমার জন্যে,
এক মরে যাওয়া ছাড়া।'

তামাক নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান, কাব্য সাহিত্যের কথা অনেক হল অতঃপর ধোঁয়ার মতো বায়বীয় বিষয়ে একটু তারল্যের দিকে যাই।

অনেক কাল আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, কোথায় যেন অন্য কী এক সূত্রে সেটা লিখেও ফেলেছি।

সে যা হোক, গল্পটা না হয় আরেকবার বলি। পুরনো কার্জন পার্কে (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) একদিন অফিসের শেষে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। অফিস ছুটি হয়েছে পাঁচটায়, তখনও অফিস টাইম দশটা-পাঁচটা ছিল সাড়ে দশটা-সাড়ে পাঁচটা হয়নি। কার সঙ্গে যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মেট্রোর সামনে ছ'টা নাগাদ, এক ঘণ্টা সময় হাতে, কী করব পার্কের একধারের বেঞ্চে বসে এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছিলাম। এবং সেই সঙ্গে ফণিমনসার দুর্গে ছুঁচো ইঁদুরদের ক্রীড়া কৌতুক দেখছিলাম।

আমি বসেছিলাম উত্তর-পশ্চিম কোনায় সর্বশেষ বেঞ্চে। কার্জন পার্ক তখনো এত গিজগিজে ভিড়ে ঠাসা হয়ে ওঠেনি। লোকজন যথেষ্টই ছিল কিন্তু এখনকার মতো এত গাদাগাদি ছিল না।

ওই বেঞ্চে আমার পাশেই বসেছিল এক আধা পাগল, আধা ভবঘুরে ধরনের লোক। জামাকাপড় খুব ফর্সা নয়, খুব ময়লাও নয়। ঠিক রাস্তায় শুয়ে থাকা টাইপ নয়। হয়তো কিছু করে, হয়তো কিছু করে না। সারাদিন পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, হয়তো রাতে বাড়ি ফিরে যায়।

তা এই লোকটি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বেঞ্চির সামনে ঘাসের ওপরে নেমে গেল। বেঞ্চির সামনে এবং আশেপাশে ঘাসের মধ্যে প্রচুর পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে রয়েছে। লোকটি উবু হয়ে বেছে বেছে সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল।

আমি তখন সিগারেট খেতাম। একটা সিগারেট একটু আগেই ধরিয়েছিলাম। লোকটির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে মাত্র দুটো টান দিয়েই সিগারেটটা ফেলে দিলাম, যাতে লোকটি একটা বড় অর্থাৎ কমপোড়া সিগারেট পায়।

এই লোকটি কিন্তু আমার ফেলা সিগারেটের টুকরো সমেত আরও বেশ কয়েকটি বড় টুকরো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট ছোট দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পকেটে ভরতে লাগল।

লোকটির এই খামখেয়ালিপনা লক্ষ করে আমি একটু অধৈর্য হলাম। আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বড় বড় সিগারেটের টুকরোগুলো বিশেষ করে আমার ফেলে দেওয়া টুকরোটা অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে বললাম, 'এই তো বেশ বড় টুকরো রয়েছে।'

লোকটি অত্যন্ত সন্দেহজনক ভঙ্গিতে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। তারপর অভিমানাহত কণ্ঠে আমাকে বলল, 'আপনি আমাকে যা ভেবেছেন আমি তা নই। আমি ফিলটার সিগারেট ছাড়া খাই না।'

অতঃপর একটা বাজে তস্য বাজে যাকে অকহতব্যই বলা যায় তেমন একটা গল্প বলি। এই গল্পটা যদি কোনও নীতিবাগীশ বলেন, 'অশ্লীল', কিংবা নীতিবাগীশিনী বলেন 'অসভ্য', আমি করজোড়ে বলব, 'ভাই, এ গল্পটা তো আগেও অন্যভাবে লিখেছিলাম তখন তো আপত্তি করেননি।'

অতীতে যদি আপত্তি না করে থাকেন তবে বর্তমানে কেন আপত্তি করবেন? আর আপত্তি করার মতো এ গল্পে কিছু আছে বলে যদি আপনি ভাবেন, সে আপনার নিজ গুণে তাতে আমার কোনও দোষ নেই।

বিড়ি-সিগারেট খেলে, চুরুট খেলে তো বটেই, মুখে গন্ধ পাওয়া যায়। অল্পবয়েসি ছেলেরা যখন প্রথম লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া শুরু করে তখন গুরুজনরা যাতে মুখের গন্ধ টের না পায় সেই জন্যে খুব কাছে ঘেঁষে না। আবার কেউ কচি পেয়ারা পাতা বা লেবুপাতা চিবিয়ে বাড়ি আসে কিংবা বাড়ি এসেই গায়ে সেন্ট পাউডার মাখে যাতে তামাকের গন্ধ চাপা পড়ে।

আমাদের গল্পটা অবশ্য এর থেকে আলাদা। এক নববিবাহিত যুবক তার বন্ধুর কাছে অনুযোগ করেছিল, 'ভাই বউয়ের মুখে বড় সিগারেটের গন্ধ'। বন্ধু বলল, 'তুই তো সিগারেট খাস না সেই জন্যে তোর অসুবিধা হচ্ছে। তোর বউ একালের মেয়ে দু'একটা সিগারেট খায় খাবে, স্কুল কলেজে পড়ার সময় হয়তো নেশা করে ফেলেছে। মুখে একটু আধটু গন্ধ, ও নিয়ে আপত্তি করতে যাস নে।' বর বলল, 'না রে সেটা কথা নয়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি বউ নিজেও সিগারেট খায় না। অথচ বউয়ের মুখে সিগারেটের গন্ধ? কেমন খটকা লাগে রে।'

অবশেষে একটি সরল আখ্যান দিয়ে তামাক বৃত্তান্ত শেষ করি।

এক মধ্যবয়সি রোগীকে বিশদভাবে পরীক্ষা করার পরে ডাক্তার নির্দেশ দিলেন, 'ডিম, আলু, মাংস—এসব খাওয়া কমাতে হবে। মিষ্টি বন্ধ, নুন চিনি কম। মদ একেবারে খাবেন না। ছোট মাছ খাবেন, ডালের সুপ। সিগারেট দৈনিক এক প্যাকেট, ঠিক দশটা।' রোগী কী একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার বললেন, 'না, কোনও আপত্তি নয়। কষ্ট করে যা বলছি মেনে চলতে হবে।'

সাতদিন পরে রোগী আবার এলেন ডাক্তারবাবুর কাছে, 'ডাক্তারবাবু, খুব কষ্ট হচ্ছে। আর পারছি না।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'কেন কী হল?' রোগী বললেন, 'ওই যে দশটা সিগারেটের কথা বলেছিলেন। সারা জীবন সিগারেটে টান দিইনি। এখন এই বয়েসে হঠাৎ দৈনিক দশটা করে সিগারেট খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

রোগী কাহিনী

বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ আছে, রোগ এবং অসুখ। রোগের মানে হল অসুস্থতা আর সুখের অভাব হল অসুখ। এই অসুখ শব্দটি খুব চমৎকার। আমরা রোগ হয়েছে একথা বলতে গিয়ে বলি, 'আমার অসুখ হয়েছে', অর্থাৎ 'আমি অসুস্থ হয়েছি।'

কিন্তু অন্য দিকে কেউ যদি কখনও বলে, 'আমি অসুখী', তার মানে এই নয় যে তার রোগ হয়েছে, সে রোগী, তার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হবে বা ওষুধ আনতে হবে।

সুখ-অসুখের ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে বরং সরাসরি রোগী কাহিনীতে প্রবেশ করি।

রোগ, রোগী ও চিকিৎসক নিয়ে গল্পের শেষ নেই। ডাক্তার আর রোগী, চিকিৎসা ও অচিকিৎসা এই সব নিয়ে হাজার হাজার মজার গল্প। শুধু অসুখ বা ডাক্তার বা নার্স নিয়ে বিলিতি জোকবুকের সংখ্যাও কম নয়।

সব চেয়ে বড় কথা, এই সুপ্রাচীন বিষয়ে আমি নিজেও আবার অবসরে অল্প-বিস্তর লিখেছি। বাংলা ভাষায় পরশুরাম কিংবা শিবরাম, এমনকী বাংলা রসিকতার পিতামহ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অসুখ ও চিকিৎসা নিয়ে অত্যন্ত সব সরস রচনা উপহার দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমি হয়তো খুব অনধিকার চর্চা করছি না, তবে এঁদের নামের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার ঔদ্ধত্যের অপরাধে যদি কোনও কুটিল পাঠক আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।

সে যা হোক, খুব বেশি পুরনো নয় আবার খুব বেশি পরিচিতও নয় এমন একটা তরল কাহিনী দিয়ে শুরু করছি। ডাক্তারি শিক্ষা দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

কল্পিত ডাক্তারি ক্লাসে অধ্যাপক-চিকিৎসক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, মনে করো, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে একজন রোগী এসেছেন, তাঁকে দেখে ঠিক অসুস্থ মনে হচ্ছে না। তিনি অনেক রকম রোগবালাই উপসর্গের কথা বললেন। কিন্তু তুমি যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মল-মূত্র, রক্ত-থুতু, শর্করা-রক্তচাপ ইত্যাদি গবেষণা করেও কোনও অসুখ ধরতে পারলে না। তোমার সন্দেহ হল রোগীর কোনও অসুখই হয়নি, এটা একেবারে মনের বাতিক। তখন তুমি কী করবে?'

একে একে সব ছাত্রই জবাব দিল, 'ওঁকে মাথার ডাক্তারের কাছে পাঠাব। ওঁর চিকিৎসা করতে হবে মনোসমীক্ষা দিয়ে।'

শুধু একটি চতুর ছাত্র বলল, 'তা করব কেন? আমি তাঁকে ওষুধ দেব, এমন ওষুধ যা খেয়ে তিনি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তখন আমি তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলব।'

শুনে অধ্যাপক মোহিত হয়ে গেলেন, বললেন, 'আশ্চর্য! সাধু, সাধ! তুমি ক্লাসে বসে অযথা কী সময় নষ্ট করছ। তুমি সোজা প্র্যাকটিস করতে চলে যাও। তোমার হবে।'

এর চেয়ে মারাত্মক গল্প ডাক্তার বিধানচন্দ্রের ঘাড়ে চাপানো আছে। মহাপুরুষদের নামে অনেক অলৌকিক এবং ততোধিক অমূলক গল্প চলে। খুব সম্ভব এ গল্পটাও তাই।

প্রবাদপ্রতিম সেই মহাচিকিৎসক নাকি একবার তাঁর পরিচিত এক স্নেহভাজনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমার শরীর খারাপ হলে তুমি অবশ্যই ডাক্তার দেখাবে, ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখাবে, কারণ ডাক্তারবাবুকে তো বাঁচতে হবে। তারপর ডাক্তারবাবু নিশ্চয় তোমার মল-মূত্র-রক্ত,

এক্স-রে, ই-সি-জি এসব করতে বলবেন; এসবও করবে, তুমি নিশ্চয় এসব করাবে কারণ এসব যাঁরা করেন তাঁদেরও তো বাঁচতে হবে। তারপর তোমার ডাক্তারবাবু সব দেখেশুনে অনেক মাথা ঘামিয়ে তোমাকে অনেক ওষুধ দেবেন। তুমি অবশ্য-অবশ্য সেসব ওষুধ কিনবে, কারণ এসব ওষুধ যাঁরা বানান, যাঁরা বেচেন, তাঁদের তো পয়সা চাই, তাঁদের তো বাঁচতে হবে।'

'আর তারপর?' এবার একটু গম্ভীর হয়ে মহামহিম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শ্রীমান স্নেহভাজনের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি ওসব ওষুধ মোটেই খাবে না। কারণ তোমাকেও নিশ্চয় বাঁচতে হবে।'

প্রায় এই গল্পই, একটু অন্য কায়দায় সেটা উপস্থাপন করা, একটা পুরনো ডাক্তারি জোকবুকে খুঁজে পেয়েছি। সে বইটি পেটেন্ট-পূর্ব ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিস্টের যুগের, যখন প্রেসক্রিপশন মানেই দাগাঙ্কিত শিশি। যার গায়ে লেখা, 'খাইবার পূর্বে ঝাঁকাইবেন।'

এবং/ অথবা 'ছিপি শক্ত করিয়া বন্ধ রাখিবেন।'

যা হোক, ওই পেটেন্ট-পূর্ব যুগের গল্পে ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাকে অনেক ভাল দেখছি আজ, যা যা বলেছি সব ঠিকঠাক করে যাচ্ছেন?'

রোগী হেসে বলল, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, যা যা বলেছেন সব ঠিকঠাক করে যাচ্ছি।' হঠাৎ ডাক্তারবাবুর রোগীর বিছানার পাশের টেবিলের ওপরে নজর পড়ল। সেখানে ওষুধের শিশি অক্ষত, অটুট রয়েছে। বিস্মিত ডাক্তারবাবু বললেন, 'কয় শিশি ওষুধ কিনেছিলেন?'

রোগী শিশির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, ওই এক শিশিই তো যথেষ্ট?'

বিমূঢ় ডাক্তারবাবু একটি অতি ক্ষীণ প্রশ্ন করলেন, 'তবে?'

সরল রোগী বললেন, 'তবে আবার কী? আপনিই তো বলে দিয়েছেন, ছিপি শক্ত করে বন্ধ রাখতে।'

ওষুধের শিশির গায়ের দ্বিতীয় নির্দেশটির গল্প প্রথমে চলে এল। প্রথম নির্দেশটি আরও স্পষ্ট, 'খাইবার পূর্বে ঝাঁকিবেন।'

এ বিষয়ে প্রচলিত গল্পটি অতি রদ্দি। শুধু লিখে রাখার জন্যে লিখছি। কোথাকার কে এক রোগী নাকি ওষুধ খাওয়ার সময়ে শিশি ঝাঁকানোর কথা খেয়াল করেনি। তার পরে ওষুধ পান করে শিশি নামাতে গিয়ে উক্ত নির্দেশটি তার দৃষ্টিতে আসে। তখন তো আর ওষুধের শিশি ঝাঁকিয়ে কোনও লাভ নেই, তাই তিনি নিজের বাড়ির বাইরের বাগানে লাফাচ্ছিলেন পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ওষুধটাকে ঝাঁকানোর জন্যে।

এতগুলি অস্বাভাবিক কাহিনী লেখার পরে এবার অন্তত একটা স্বাভাবিক কাহিনী লিখতে হয়। এক সার্জনের কাছে এক রোগী তাঁর অসুখের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য যান। রোগীটিকে যথাবিহিত পরীক্ষার পরে সার্জন সাহেব বললেন, 'অপারেশন ছাড়া গতি নেই।'

কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে তারপর রোগী বললেন, 'স্যার, আমার এই অপারেশনে কত খরচা হবে?'

সার্জন সাহেব জবাব দিলেন, 'তা আট-দশ হাজার টাকা লাগবে মোটামুটি।'

আট-দশ হাজার টাকা কম টাকা নয়, রোগী মাথায় হাত দিলেন, তারপর বললেন, 'এ তো অনেক টাকার ব্যাপার। আমার তো এখন অত টাকা নেই।'

সার্জন সাহেব দেখলেন রোগী পালাতে পারে, তিনি নরম করে বললেন, 'না পারলে একবারে সব টাকা দেবেন না, ধীরেসুস্থে দেবেন।'

রোগী এবার একটু আশ্বস্ত বোধ করলেন, একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ধীরে-সুস্থে কীরকম?'

ডাক্তার বললেন, 'এই ধরুন, এখন হাজার তিনেক টাকা দিলেন। তারপর মাসে মাসে এই পাঁচশো করে এক বছর।'

রোগী বললেন, 'আমার শালা ইনস্টলমেন্টে কালার টিভি কিনেছে, সেটার কিস্তিটা যেন অনেকটা এইরকম।'

সার্জেন সাহেব একটু গম্ভীর হলেন, রুমালে মুখ মুছে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি সত্যিই কিস্তিতে একটা রঙিন টিভি কিনছি।'

রোগী কাহিনী যখন শেষ পর্যন্ত কালার টিভি পর্যন্ত গড়াল, তাহলে অবশেষে আমরা সেই পুরনো রোগীটিকে আরেকবার স্মরণ করি।

সে এক মহাভিতু রোগী, সব সময়ে নিজের রোগ নিয়ে মাথা ঘামায়, একের পর এক ডাক্তার দেখিয়ে যায়।

একদিন সে এক ডাক্তারবাবুকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমি অসুখ নিয়ে চিন্তা করতে করতে পাগল হয়ে গেলাম। একেক সময় মনে হয় নিজেকে খুন করে ফেলি।'

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'দয়া করে এ ব্যাপারটা আমার উপরে ছেড়ে দিন।'

রোগী কাহিনীর শেষ গল্পে ডাক্তারবাবুই বলতে গেলে রোগী। তিনি তাঁর নতুন মডেলের হালফ্যাশনের গাড়ি কেনার পরেই খারাপ হয়ে যাওয়ায় গ্যারেজে সারাতে দিয়েছেন। সারানোর পর মিস্ত্রি যা বিল করলেন সেটা আগের পুরনো গাড়ির দ্বিগুণ। ডাক্তারবাবু কপালে চোখ তুলে বললেন, 'এত?'

সুরসিক মিস্ত্রি বললেন, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, আমাদের কাজ তো আর আপনাদের মতো নয়, সেই আদ্যিকালের পুরনো চেনা মডেল নিয়ে আপনাদের কারবার। আর আমাদের দিন-দিন নতুন মডেল, নতুন ঝামেলা। পয়সা তো কিছু বেশি লাগবেই।'

নরখাদকের কাহিনী

নরখাদক বিষয়ে আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। পৃথিবী থেকে নরখাদকেরা হয়তো চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আফ্রিকার কোনও গহনতম অরণ্যে কিংবা ভারত বা প্রশান্ত মহাসাগরের প্রক্ষিপ্ত কোনও অন্ধকার দ্বীপে কোনও কোনও মানব সম্প্রদায় আছে যারা একদা হয়তো মানুষ খেত কিন্তু এখনও খায়, এ বিষয়ে প্রামাণ্য কোনও সংবাদ জানা নেই।

রামায়ণ নর-বানরের সঙ্গে নরখাদক-রাক্ষসদের যুদ্ধের কাহিনী। মহাভারতেও রাক্ষসের কথা আছে। মহাবলী মধ্যম পাণ্ডব ভীম এবং রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ নিজেও মহাবীর ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহারথী প্রবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের পক্ষে লড়াই করে কৌরবপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ঘটোৎকচের সঙ্গে মহাসমরে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। অবশেষে কৌরবপক্ষীয়, মহাপরাক্রম, অসমসাহসী বীর অলম্বুষ রাক্ষসকে যখন ঘটোৎকচ নিহত করলেন তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অর্জুনকে হত্যা করার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত একাঘ্নী বাণ ব্যবহার করে কর্ণ ঘটোৎকচকে হত্যা করেন।

একাঘ্নী বাণ কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে রেখেছিলেন, দুর্যোধনের অনুরোধে বিশেষ প্রয়োজনে যখন কর্ণ এই বাণ ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলেন তখনই তিনি বুঝেছিলেন অর্জুনকে পরাজিত করা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

ঘটোৎকচ-ভীম-হিড়িম্বা কাহিনী মহাভারতের ঘরে ঘরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুপরিচিত। [illegible] পিতামহীদের ঘুমপাড়ানি গল্পে হিড়িম্বা-ঘটোৎকচ বারবার ফিরে ফিরে এসেছে।

ভীম-হিড়িম্বা বিষয়ে একটি অসম্ভব অমহাভারতীয় গল্প লিখেছিলেন অবিস্মরণীয় পরশুরাম। '[illegible]' নামে মাত্র আড়াইশো শব্দের সেই অতি ক্ষুদ্র আয়তনের গল্পটি 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' নামক সংগ্রহে প্রায় সকলেরই নিশ্চয় পড়া।

তবু নরখাদক সূত্রে গল্পটি আরেকবার স্মরণীয়। মৃগয়া করতে গিয়ে মধ্যম পাণ্ডব পাণ্ডবদের থেকে দলভ্রষ্ট হয়ে বনের মধ্যে এক তরুণ রাক্ষসের হাতে পড়েন। সে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় তার মার কাছে; সেই রাক্ষসী মা ব্রত করে উপোস করে আছে, ছেলেকে বলেছে একটি হৃষ্টপুষ্ট মানুষ নিয়ে আসতে ব্রত শেষ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্যে।

[illegible] ভীমকে ধরে নিয়ে যেতে ভীম শুনলেন রাক্ষসী দাসীকে আদেশ দিচ্ছে, 'মনুষ্যটিকে বড় বড় করিয়া কর্তন কর।... বক্ষস্থল ও বাহুদ্বয় ছেলের জন্য রাখিও, পদদ্বয় তোমার, মুণ্ডটি আমি খাইব।'

বলা বাহুল্য, এই রাক্ষসীই হিড়িম্বা এবং পুত্রটি ঘটোৎকচ। সুখের কথা দাসী কর্তন করার আগেই রাক্ষসী তার গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভীমকে দেখে চমকিয়ে যান এবং জিব কেটে বলেন, 'ও মা, ধর্মপুত্র যে! ছি ছি লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।'

* * *

পৌরাণিক নরখাদক থেকে সরস নরখাদকের কাহিনীতে যাই।

বছর কুড়ি বা তারও কিছু আগে নিউইয়র্কের একটি রঙ্গমঞ্চে একটি জনপ্রিয় নাটক হচ্ছিল ক্যানিবাল অর্থাৎ নরখাদকদের নিয়ে। সেই নাটকে একটি মজার গান ছিল, খুব বিখ্যাত হয়েছিল সেই গানটা ওই সময়। গানটা হল, প্রগতিশীল নরখাদক শিশুরা মানুষের মাংস খেতে আপত্তি জানাচ্ছে। তাদের মা জোর করে তাদের মানুষের মাংস খাওয়াতে চেষ্টা করছে। তারা মোটেই খেতে চাইছে না। কাঁদতে কাঁদতে গাইছে, 'উই শ্যাল নট ইট হিউম্যান বিইংস' (We shall not eat human beings) মানে খুব সোজা, 'আমরা মানুষ খাবো না'।

নাটক নয়, আধুনিক নরখাদকদের বিষয়ে একটি কাল্পনিক কাহিনী পড়েছিলাম অনেকদিন আগে একটা ইংরেজি জোকবুকে।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক দুঃসাহসিক সাহেব বিপজ্জনক এলাকায় প্রবেশ করে নরখাদকদের হাতে বন্দি হন। নরখাদকেরা তাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যায় এবং একটি গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। তারপর তাদের সর্দারকে খবর দেয়।

নরমুণ্ডের মালা গলায়, মাথায় রক্ত রঙিন পাগড়ি, হাতে ধারালো বল্লম, সর্দার এসে বন্দি ভ্রমণকারীকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে টিপে টুপে দেখলেন। তারপর কী একটা ইঙ্গিত করতেই চারদিকে দামামা বেজে উঠল। নরখাদক পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে যেখানে ছিল ওই দামামার ডাক শুনে সবাই ছুটে এল সেই গাছের কাছে, যে গাছে ভ্রমণকারীর বেঁধে রাখা হয়েছে।

ভ্রমণকারীর চোখের সামনেই মাটি খুঁড়ে বিরাট উনুন বানানো হল। শুকনো কাঠ দিয়ে সেই উনুন ধরিয়ে সেই উনুনের ওপরে এক অতিকায় কড়াই চাপানো হল, তাতে কী একটা তেল ঢালা হল প্রায় মণ খানেক।

এদিকে উনুনের চারপাশ ঘিরে নরখাদিকারা (নাকি নরখাদকীরা) বড় বড় পাথরের শিলে লোভনীয় গন্ধময় নানারকম বন্য মশলা নোড়া দিয়ে পিষতে লাগল। বন্দি পর্যটক স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এ সবই হচ্ছে তাঁকে রান্না করার পূর্বপ্রস্তুতি। মশলার গন্ধে তাঁর জিভে জল এসে গিয়েছিল, তা ছাড়া তিনি যথেষ্ট ক্ষুধার্তও ছিলেন, কিন্তু নিজের মাংস খাওয়ার কারণে নিজের জিভে

জল আসা অসংগত হবে এই ভেবে তিনি লালা সংবরণ করলেন। তা ছাড়া, আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার; মশলা বাটা প্রায় শেষ, উনুনের কড়ায় তেল প্রায় উত্তপ্ত হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই এ জন্মের মতো খেলা শেষ।

ঠিক সেই মুহূর্তে সর্দারও বললেন, 'খেলা শেষ'।

কিন্তু বন্দি পর্যটক সবিস্ময়ে শুনলেন সর্দার বললেন, 'দি এন্ড' (The end)। 'খেলা শেষ', 'তামাম সুদ' না বলে পরিচ্ছন্ন ইংরেজি উচ্চারণে এ রকম কথা বলায় পর্যটক চমকিয়ে গেলেন। কিন্তু চমকের তখনও কিছু বাকি ছিল। সর্দার খাঁটি ইংরেজিতে বন্দিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃত্যুর আগে তোমার শেষ ইচ্ছা কী?'

পরিষ্কার উচ্চারণে এমন একটি সভ্য প্রশ্ন শুনে পর্যটক মহোদয় বীরের মতো বললেন, 'স্যার, আপনার অনুমতি পেলে আমি একটা সিগারেট খেতাম।'

অনুমতি পেতে দেরি হল না। গাছের সঙ্গে দড়ির বাঁধন থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খুলে দেয়া হল। পর্যটকের পকেটেই সিগারেট ও লাইটার ছিল। তিনি একটা সিগারেট বার করে লাইটার জ্বালিয়ে ধরালেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল লাইটার জ্বালানো মাত্র। সর্দার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে কী যেন বললেন, মশলা বাটা থেমে গেল। উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে ফেলা হল। বোঝা গেল পর্যটককে খাওয়া হচ্ছে না। পর্যটক ভাবলেন এই অসভ্যেরা বোধহয় কোনদিন লাইটার দেখেনি, তাই ভয় পেয়ে গিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। যেমন সাহেবি বুদ্ধি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাইটার ক্লিক করে জ্বালিয়ে নরখাদকদের ভয় দেখিয়ে সব লুঠপাট করার চেষ্টা করলেন। তখন সর্দার তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ওরে হতভাগা, তুই ভেবেছিস লাইটার দেখে আমরা ভয় পেয়েছি। তোর মতো লাইটারওলা সাহেব আমরা হাজার হাজার খেয়েছি। আমরা ঠিক করেছিলাম, কেউ যদি একবারে লাইটার জ্বালাতে পারে তাকে খাবো না, তাই তোকে ছেড়ে দিচ্ছি'। অতঃপর একটা লাথি মেরে সে পর্যটককে তাড়িয়ে দিল।

পুনশ্চঃ নরখাদকীয় পুনশ্চে এবার দুটি ছোট গল্প :-

ক) ভদ্রমহিলারা কখনও সত্যি বয়েস বলেন না। নরখাদকদের হাতে বন্দিনী স্থির-চল্লিশ এক মহিলা যখন জানতে পারলেন যে এরা পঞ্চাশোর্ধ কোনও ব্যক্তির মাংস খায় না, তিনি কবুল করলেন যে তাঁর বয়েস বাহান্ন।

খ) এক নরখাদক শিশু আকাশে এরোপ্লেন দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, ওটা কী?' মা বলেছিলেন, 'ওটা কাঁকড়া বা চিংড়িমাছের মতো, খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের জিনিসটা খেতে হয়।'

আয় শীত, যায় শীত

বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে আমাদের টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলের পিছনের পার্কে। অতি নাবালক বয়েসে সেই পার্কের প্যান্ডেল থেকে মাঘ মাসের মধ্য রাত্রে যাত্রা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ঝিরঝির বৃষ্টি আর উত্তুরে হাওয়ায় হাড়কাঁপানো ঠান্ডা—এটাই ছিল আমার মনে শীতলতম স্মৃতি।

এর পরে এই সামান্য জীবনে নানা জায়গায় গিয়েছি এবং স্পষ্টই হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় টের পেয়েছি শীত কাকে বলে।

আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো যেমন বন্যার খবর নিয়ে মাতামাতি করে মাঝে-মধ্যেই লিখে দেয় এটাই স্মরণকালের মধ্যে চরমতম বন্যা কিংবা এত বড় বন্যা গত পঞ্চাশ বছরে হয়নি, তেমনিই মার্কিন দেশের কাগজগুলো শীত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।

এই তুষারতাড়িত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মধ্য জানুয়ারির ভরা শীতে আমি পৌঁছেছিলাম মার্কিন দেশে। ওয়াশিংটন শহরের এক হোটেলের কাচের জানলা দিয়ে জীবনে প্রথম বরফ পড়া দেখলাম। ঠিক বুঝতে পারিনি, ছেঁড়া তুলোর মতো বাতাসে হালকা ভেসে যাচ্ছে বরফের আঁশ। রাত তখন প্রায় দশটা। সেই সময় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে ফোন করলেন। তিনি থাকেন ওয়াশিংটন থেকে বেশ কিছু দূরে। একথা সেকথার পর আমি তাঁকে বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, বাইরে বরফ পড়ছে'!

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক খুবই অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'রেডিয়ো, টিভি, খবরের কাগজ কোথাও বরফের কথা লেখেনি। আপনি বলছেন বরফ পড়ছে।' তারপর আমাকে বললেন, 'আপনি তো আগে কখনও বোধহয় তুষারপাত দেখেননি?' আমি সবিনয়ে আমার অভিজ্ঞতার অভাবের কথা স্বীকার করলাম। তখন ওই ভদ্রলোক আমাকে কাচের জানলার বাইরে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি তার বর্ণনা করতে বললেন। আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি সেই মুহূর্তে তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই দেখেছেন। এই মাত্র দশটার খবরে বলল ওয়াশিংটনে বরফ পড়ছে। আমাদের এখানেও হয়তো আরও রাতের দিকে পড়বে।'

তবে ওয়াশিংটনে নয়, আসল শীতের ঝড় পেয়েছিলাম ওয়াশিংটন থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে নিউইয়র্কে। সেই ঠান্ডা বর্ণনায় আমি যাব না, শুধু মনে আছে মার্কিনি খবরের কাগজগুলো সেই রবিবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছিল, 'শতাব্দীর শীতলতম সপ্তাহ'।

আমরা গরমের দেশের লোক। শীতলতার কথা খুব বেশি জানি না। সুতরাং শীত নিয়ে দু'-একটা উষ্ণ কাহিনী বলি।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের এক হিমশীতল রাতে পূর্বপল্লীর ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে আমার পাশের খাটে ছিলেন এক অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সেদিন রাতে ভয়ংকর ঠান্ডা পড়েছিল। বিশেষ করে মেলার ভিড়ের উত্তাপ থেকে দোতলার সেই ঘরে এসে দারুণ শীত করছিল। রাতে কম্বলের নীচে শুয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম, দাঁতে দাঁত জোড়া লেগে গিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা রোদ্দুরে বসে তাপ পোয়াতে পোয়াতে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম। 'কাল কেমন ঠান্ডা বুঝলেন।' বৃদ্ধ বললেন, 'ভয়ানক'।

আমি বললাম, 'আমি কম্বলের নীচে ঠক ঠক করে কেঁপেছি, দাঁতে দাঁত জোড়া লেগে গিয়েছিল।' বৃদ্ধ স্বীকার করলেন, তিনিও খুব কেঁপেছেন। তবে দাঁতে দাঁতে জোড়া লাগেনি বা ঠক ঠক করেনি।

এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে তিনি হেসে বললেন, 'কারণ আমার দাঁতজোড়া মুখ থেকে খুলে কানের মধ্যে রেখেছিলাম। আমার তো বাঁধানো দাঁত'। এই গল্প যদি কোনও বুদ্ধিমানের খুব অবিশ্বাস্য মনে হয়, তবে পরের গল্পটি শুনে তাঁরা কী বলবেন, ঈশ্বর জানেন।

এ গল্প শুনেছিলাম হিমালয় অভিযাত্রী-দলের এক দুঃসাহসিকা মহিলার মুখে। গঙ্গোত্রীর পাহাড় চূড়ার তাঁবুতে বরফ ও বাতাস ভরা রাত্রিতে অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা বলতেন তা মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে শব্দ হয়ে বেরত না, বরফের জমাট টুকরো হয়ে বেরত। কে কী বলেছে সেটা জানার জন্যে পরের দিন সকালে ডেকচিতে স্টোভের উপর বসিয়ে সেই বরফের টুকরোগুলো গরম করলে কথাগুলো একের পর এক বেরিয়ে আসত যেমন বেরিয়ে আসে ক্যাসেট বা গ্রামোফোনের রেকর্ড থেকে।

শীত নিয়ে যথেষ্ট বাতুলতা হল। অতঃপর কাব্যকথায় যাই। সাধারণ মানুষের ভাল লাগুক অথবা নাই লাগুক, শীত কবিদের প্রিয়তম ঋতু। এই শতাব্দীর বিষণ্ণতম কবি নির্জন শীতের রাতে জানালার ধারে স্থবিরতার অপেক্ষায় প্রদীপ নিবিয়ে বসে থাকার কথা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার অক্ষরে অক্ষরে শীতের ঝরা পাতার আর হিমবাতাসের শব্দ শোনা যায়। বড় বিষণ্ণ, বড় শীতল সেই অনুভূতি।

আমাদের দেশের শীত তেমন প্রখর নয়। তবুও আমাদের অন্য এক যুগের অন্য এক কবির একটি পঙ্‌ক্তি, 'জাকু, ভানু, কৃশানু শীতের পরিত্রাণ', 'বহুদূরের এক হতভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনে'।

ভিন্ন পৃথিবীর প্রকৃত শীত-ঋতুর দেশের এক অমর মহাকবি কিন্তু তাঁর বিখ্যাত এক নাটকের একটি দুঃখিত গানে শীতের বাতাসকে বইতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'শীতের বাতাস তুমি বও, তুমি বও। মানুষের অকৃতজ্ঞতার মতো তুমি নির্দয় নও।'

এই মুহূর্তে এইখানে রবীন্দ্রনাথকেও কি স্মরণ করা উচিত নয়। কিন্তু তাহলে পাতার পর পাতা ভরে নিবন্ধ তার সীমানা ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং আয় শীত যায় শীত। কলকাতার শীত আসে আর এসেই চলে যায়। এত সংক্ষিপ্ত তার পরমায়ু কিছুতেই মনে পড়ে না ইংরেজ কবির সেই আশ্বাসের কথা, 'যদি শীত আসে তবে বসন্ত কি দূরে থাকবে?' আমাদের শীত আর বসন্ত একাকার। শীতের পিছনে নয় শীতের সঙ্গে আসে বসন্ত, তাই শীতের শ্রীপঞ্চমী আমাদের বসন্ত পঞ্চমী।

ঘটি-বাঙাল

অর্ধশতাব্দী আগে ধানসিঁড়ি নদীর তীরের আশ্চর্যতম বাঙাল কবি লিখেছিলেন, 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো?' সে প্রশ্নের ছিল রোমান্টিক অনুপ্রাস। অন্য অনুষঙ্গে, ভিন্ন প্রসঙ্গের সে এক বেদনাতর গাথা।

ঘটি-বাঙালের প্রসঙ্গও, দেশ ভাগের চার দশক পরে এখন প্রায় ওই 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো'র পর্যায়ে চলে গেছে।

আজ আর কে খেয়াল রাখে, কে ঘটি, কে বাঙাল। আগে তো ছিলই। বিশেষ করে পার্টিশনের পরে পরে যখন একের পর এক জনস্রোতের ধাক্কা, উদ্বাস্তু প্রবাহ এসে পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় আছড়ে পড়ল তখনই তুঙ্গে উঠেছিল ঘটি-বাঙালের বাদবিসম্বাদ। পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন জনপদে বহুদিন আগে থেকেই একটা করে বাঙালপাড়া ছিল। যেখানে সাধারণত পূর্ববঙ্গের লোকেরাই বসবাস করত। কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশে সেই অসম্ভব দেশভাগের পর আর সামান্য বাঙাল পাড়ায় কুলোল না। তরাই থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত যেখানেই কোনওক্রমে বাসযোগ্য জমি পাওয়া বা দখল করা সম্ভব হল সেখানেই গড়ে উঠল উদ্বাস্তু উপনিবেশ, কোথাও তার নাম কলোনি, কোথাও গড় বা নগর, যথা আজাদ কলোনি, আজাদগড় বা আজাদ নগর।

বাঙাল-ঘটির সংঘাতের দিন বহুকাল হল বিদায় নিয়েছে। ভঙ্গবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে চল্লিশ বছর বসবাস করে যে যার স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। সব বাড়িতেই এখন পোস্ত রান্না হয়। সেটা আর পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাঢ় দেশীয়দের একচেটিয়া নয়, রান্নায় ঝাল বেশি হলে এখন আর কেউ কাউকে বাঙাল বলে সন্দেহ করে না। খবরের কাগজে 'পূর্ববঙ্গীয় পাত্রী চাই' কিংবা 'পশ্চিমবঙ্গীয় ভাড়াটিয়া বাঞ্ছনীয়' এ ধরনের বিজ্ঞাপন ক্রমশই বিরল হয়ে আসছে।

পার্টিশনের পরে বাঙাল-ঘটির বিবাদ যতটা প্রখর হয়েছিল, ঠিক ততটা স্তিমিত হয়ে গেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। এখন আর সীমান্ত পেরিয়ে বাঙালেরা কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে আসে না, যারা আসে তারা বাঙাল নয়, তারা বাংলাদেশি। সেসব বাঙাল কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যাদের নিয়ে হাসির গান গাওয়া হত।

'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা
আমি ঢাকার বাঙাল নই।'

বলা বাহুল্য, ঢাকার বাঙালই ছিল, কুলীন শ্রেষ্ঠ বাঙাল কুলতিলক যাকে বলে কাঠ বাঙাল। তার হাবভাব, উচ্চারণ-আচরণ, অশন-ব্যসন সবই ছিল উঁচু তারে বাঁধা। গঙ্গার এই তীরের বহু শতাব্দীর মার্জিত নাগরিকতার সঙ্গে তার ছিল বিস্তর ফারাক।

* * *

বাঙাল-ঘটির আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমার তেমন কৌতুক বোধ হচ্ছে না।

এই আলোচনা করার অধিকার আমার জন্মগত। আমিও এক সাবেকি বাঙাল। পনেরো বছর

বয়েসে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি। তারপর ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে কবে এই নগর সভ্যতায় বিলীন হয়ে গেছি।

আমরা পূর্ববঙ্গীয় হলেও, সে মাত্র তিনশো বছরের ব্যাপার। মোঘল রাজত্বের মধ্যকালে বারো ভুঁইঞাদের সঙ্গে দিল্লিশ্বরের মারামারির যুগে নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদে আমরা পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরী পেরিয়ে পালিয়ে যাই, যশোহরের কালিয়া পরগনা থেকে উত্তর মধ্যবঙ্গের আটিয়া পরগনায়।

এখনকার যশোহর বাংলাদেশের মধ্যে হলেও সেটা কখনও বাঙালের এলাকা ছিল না। তখন তো নয়ই। কাপুরুষের মতো আমরা বাঙাল দেশে প্রবেশ করেছিলাম এবং আবার তিনশো বছর পরে কাপুরুষের মতো সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমি নিজে বিয়ে করেছি খাঁটি পশ্চিমবঙ্গে। বারেন্দ্র বংশীয় বলে আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বহুকাল ধরে বাঙাল ও ঘটি দুইই আছে। দুই সমাজের সমস্ত দোষগুণ আমাদের পারিবারিক রক্তে ও চরিত্রে মিলে আছে। এখনও যখন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে খেলা হয় আমরা কোনটা আমাদের দল ধরতে পারি না, ফলে যখন যে জেতে তারই পক্ষে চলে যাই। খেলা ড্র হলে দু'পক্ষকেই সমান গাল দিই।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের কথায় অন্য একটা কথা মনে পড়ছে, নিতান্ত দুঃখের কথা। এই দুই ফুটবল টিম যেমন বাঙাল-ঘটির প্রতীক, তেমনিই ইলিশ আর চিংড়ি এই দুই মাছ। দুটি মাছই আরও অনেকের মতো আমার ঠিক সমান প্রিয়। আজকের এই অগ্নিমূল্যের দিনে যখন বাজারে গিয়ে এই দুটি মাছের স্টল থেকে সমদূরত্বে থাকি, বারবার মনে পড়ে যায়, চল্লিশে-পঞ্চাশের কলকাতার কথা।

বাঙাল-ঘটির সেই মান অভিমান, চুলোচুলি, বাদবিসম্বাদের স্মরণীয় যুগে পুরো ব্যাপারটা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল-ইলিশ মাছ বনাম মোহনবাগান-চিংড়ি মাছ সংগ্রামে। সেই রেষারেষির মধ্যে কোথায় ছিল একটা কৌতুকের আভাস, পুরোটা দমবন্ধ ব্যাপার ছিল না।

সেদিনের বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথীরা মায় তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি তো বটেই বাঙাল-ঘটি নিয়ে লিখেছেন। আর সেই উদ্বাস্তু শিবিরে লোভী ভূতের মাছভাজা খাওয়ার চেষ্টা, বাঙালদের হাতে ভূতের নির্যাতন ও পলায়ন— শিবরাম চক্রবর্তীর সেই মর্মান্তিক গল্প পাঠ করে অনেক বাঙালই সেদিন হাসেননি।

এরও বহু আগে লেখা হয়েছিল,

'বাঙাল মনুষ্য নয়,
উড়ে এক জন্তু।
লাফ দিয়া গাছে ওঠে
হাত নেই কিন্তু ॥'

কিন্তু সর্বাধিক মর্মান্তিক গল্পটি লিখেছিলেন, বাঙাল-ঘটির চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের বহুকাল আগে বাংলা সরস রচনার পিতামহ প্রতিম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পুরনো গ্রন্থাবলি সিরিজের ত্রৈলোক্যনাথ গ্রন্থাবলির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম কাহিনীটির নামই হল 'বাঙাল নিধিরাম।'

বিসূচিকা রোগগ্রস্ত বাঙাল নিধিরাম মুমূর্ষু-অবস্থায় গঙ্গাতীরে শুয়ে ছটফট করছেন। বেলা দশটা, প্রচণ্ড সূর্য কিরণে জগৎ অগ্নিময়, নিধিরামের প্রাণ তবুও বাহির হয় না।

দু'জন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফেরার পথে কণ্ঠাগত প্রাণ নিধিরামকে দেখতে পেলেন। নিধিরাম তাঁদের বললেন, 'তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, যদি মুখে একটু জল দেন।'

বৃদ্ধরা জল দেওয়ার পরিবর্তে নিধিরামকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'মহাশয়ের নিবাস', 'মহাশয়ের

নাম' ইত্যাদি মামুলি কথা, সেসব প্রশ্ন কোনও মৃত্যু পথযাত্রীকে করা যায় না। সে যা হোক অবশেষে তাঁরা নিধিরামের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার ব্যাতোন (বেতন)?'

নিধিরাম তখন বললেন, 'আমি চাকরি করি না আমার বেতন নাই, যান আপনারা বাড়ি যান। আমার জলে কাজ নাই।'

গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় সেদিন বাঙাল নিধিরামের যে বিপর্যয় হয়েছিল, সেই দুর্ভোগের যুগ অবশ্য এখন আর নেই, বাঙাল-ঘটি মিলে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী নতুন প্রজন্মের বাঙালেরা প্রথম ধাক্কায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সন্তানেরা এখন অন্য প্রজন্মমুখী। তাদের কাছে এ দুয়ের পার্থক্য হাস্যকর।

হাস্যকর হোক যাই হোক, বাঙাল-ঘটি বাদবিসম্বাদের পালায় শেষ যবনিকা নেমে আসার আগে এটুকু স্মরণে রাখা ভাল যে, এই কলহে যতটা মান অভিমান ছিল ততটা তিক্ততা ছিল না, যতটা রেষারেষি ছিল ততটাই হাসাহাসি ছিল; অনেকটা শুকসারী গানের মতো এ বলে আমার এই ভাল তোমার ওই খারাপ, সেও বলে আমার এই ভাল তোমার ওই খারাপ।

চিড়িয়াখানায়

আমার এই অতি হাস্যকর লেখক-জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ঘটেছিল চিড়িয়াখানায়। ঘটনাটা অনেক সময় হাসতে হাসতে অনেককে বলেছি, তবে কখনও লিখিনি। এখনও লিখতে একটু সংকোচ হচ্ছে, একটু আত্মপ্রচারের মতো হয়ে যাচ্ছে। তবু লিখছি, বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকা দয়া করে লক্ষ করবেন নেহাত মজার গল্পের খাতিরেই ঘটনাটা লিখছি, আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

ষোলো-সতেরো বছর আগেকার কথা। সেটা উনিশশো একাত্তর সাল। বাংলাদেশ যুদ্ধের বছর। আমার নিজের লোকেরা সব দেশ থেকে শূন্য হাতে কর্পদকহীন অবস্থায় কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। রীতিমতো উদ্বেগ ও আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন যাচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হল, বাবা-মা এবং আর সবাই বাড়ি ফিরল। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

স্পষ্ট মনে আছে তারিখটা, নববর্ষের সকাল, বাহাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারি। ডোডো আর তাতাইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেছি। তাতাই আমার ছেলে, ডোডো তার বন্ধু। সেই সময়ে আমি সোমবারের আনন্দবাজারের আনন্দমেলার পাতায় সপ্তাহে সপ্তাহে ধারাবাহিক 'ডোডো-তাতাই' লিখছি।

এই সব দিনে যেমন হয়, সেদিন চিড়িয়াখানায় ভয়াবহ ভিড়। শোনা যায় এই সব ছুটির দিনে বিশেষত শীতকালে চিড়িয়াখানায় লক্ষাধিক লোক হয়। এক লক্ষ লোক অবশ্য এক সঙ্গে ঢোকে না। সারাদিন ধরে লম্বা লম্বা লাইন দিয়ে ঢোকে। তবে কোনও কোনও সময় অন্তত হাজার পঞ্চাশেক লোক চিড়িয়াখানার ভিতরে থাকে। তার মানেই গাদাগাদা মানুষ, গিজগিজে ভিড়।

ওই ভিড়ের মধ্যে বার বার ডোডো-তাতাই চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা খুবই

ছোট, বড় জোর পাঁচ-ছয় বছর বয়েস। চিড়িয়াখানার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যেখানে গণ্ডারের খন্দ রয়েছে সেই খন্দের রেলিংয়ের একপাশে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি ডোডো-তাতাইকে সাপের ঘর দেখতে পাঠালাম, সেখানে বিরাট লাইন দেখে আমি আর নিজে ঢুকলাম না। অনেকক্ষণ পরে ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দিক ভুল করে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম তার বিপরীতে দিকে হন-হন করে রওনা হল। আমি 'ডোডো-তাতাই, এই ডোডো-তাতাই' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম।

আমার সামনে দিয়ে একদল লোক যাচ্ছিল, পরনে ধুতি-শার্ট, গায়ে র‍্যাপার মফস্বলের লোক, কথার টান দেখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ বলে মনে হল। তারা আমার মুখে 'ডোডো-তাতাই' ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল, ততক্ষণে ডোডো-তাতাই ছুটে আমার কাছে চলে এসেছে। ওরা বুঝতে পারল, এই দু'জনের নাম ডোডো আর তাতাই। দলের মধ্যে একজন লোক বাচ্চা দুটোকে ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর আমার প্রতি কটাক্ষপাত করে আমাক শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বলল, 'শালা, আদেখলে, খবরের কাগজ দেখে ছেলেদের নাম রেখেছে।'

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে আমি সেদিন যথেষ্টই গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম এবং আমার রচনার এ রকম স্বীকৃতি পাব কখনওই আশা করিনি।

এই একটি ঘটনা ছাড়া চিড়িয়াখানা-জনিত আমার বাকি যা কিছু স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা তা খুব মধুর নয়। বানরের খাঁচার গায়ে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কী একটা জটিল লেখা ছিল, সেটা কাছে গিয়ে ভাল করে পড়তে যাচ্ছি, শিকের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাজি বানর আমার চোখ থেকে চশমাটা কেড়ে নেয়। তখন জেনেছিলাম, নোটিশটিতে অতি ক্ষুদ্র হরফে যা লেখা আছে তার মর্ম হল:-

'পাজি বানর আছে।
খাঁচার নিকটে আসিবেন না।'

এ ছাড়া অনেক আগে একবার ছোলা খাওয়াতে গিয়ে একটা কালো রাজহাঁস আমার হাতে ঠুকরে দেয়, অমন দীর্ঘগ্রীবা, ঝলমলে, রাজকীয় সৌন্দর্যময় একটি প্রাণী যে এত হিংস্র হতে পারে তা ভাবাই কঠিন।

শুধু রাজহাঁস কেন, একবার একটা জেব্রাও আমার হাত থেকে খাবার খেতে গিয়ে আচমকা ডানহাতের তর্জনীটা এমন চিবিয়ে দেয় যে একসঙ্গে দশ-পাতার বেশি লিখলেই এখনও আঙুলটা টনটন করে, বেশ ফুলে ওঠে। ফলে এ-জীবনে আবার কোনও বড় লেখা, এমনকী পুজোর উপন্যাস পর্যন্ত লেখা হল না। এর জন্য কোনও কোনও পাঠক অবশ্য জেব্রাটিকে প্রভূত ধন্যবাদই দেবেন।

আমি যখন যে শহরেই যাই, খুব অসুবিধা না হলে সেই শহরে একটা চিড়িয়াখানা থাকলে সেখানে একবার যাওয়ার চেষ্টা করি।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার গা-ঘেঁষেই বিশাল পাহাড়ি খাদ। হরিণের খাঁচার পাশ বরাবর ঢালু খাদ নেমে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি চিড়িয়াখানার এক কর্মচারীকে বলেছিলাম, 'এই খাদে নিশ্চয় মাঝে মাঝে কেউ কেউ পড়ে যায়।' সেই ব্যক্তি ঠোঁট উলটিয়ে আমাকে জবাব দিয়েছিল, 'মাঝে মাঝে পড়ে না, পড়লে একবারই পড়ে। পাঁচশো ফুট খাদের নীচে মাঝে মাঝে পড়ার সুযোগ কোথায়?'

বিদেশে আরও গোলমালে পড়েছিলাম। লস এঞ্জেলস শহরে এক মেমসাহেবকে আমি বলেছিলাম যে আমি জু দেখতে চাই। আমার বাঙাল উচ্চারণে 'জু' (Zoo) বোধহয় মেমসাহেবের কানে 'Jew' অর্থাৎ 'ইহুদি' হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরপর দু'বার যাচাই করলেন সত্যি আমি কী দেখতে চাই। আমি যখন তৃতীয়বারেও 'জু' বললাম, তিনি ধরে নিলেন, আমি নিশ্চয়ই কোনও ইহুদিকে দেখতে চাইছি। তিনি নিজে ইহুদি, দু'-পা এগিয়ে একদম আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেন সি মি, আই অ্যাম এ জু (Then see me, I am a Jew)।' ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমার বেশ সময় লেগেছিল।

সমান-সমান

পৃথিবীতে কোনও দুটো জিনিস সমান-সমান নয়। হাতের দুটো আঙুল এক সমান নয়। দুটো মানুষ, এমনকী যমজ দুই ভাইও কখনও একরকম হয় না। কোথাও কিছু পার্থক্য থাকেই।

শুধু মানুষ কেন একই গাছের একই ডালের দুটি পাতা যারা একই মুহূর্তে বিকশিত হয়েছে, একই রোদে হাওয়ায় একইরকম সবুজ হয়েছে, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সেই পাতা দুটির মধ্যেও বিস্তর না হোক সামান্য কিছু ফারাক রয়েছে। দুটি তুচ্ছ দুর্বাদল, দুটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পরস্পরের সঙ্গে তাদের যত মিলই থাকুক, তবু কিছু ব্যতিক্রম থাকবেই।

উপকথার সেই বিখ্যাত বানর এই অসমানত্বের সুযোগ নিয়েছিল। কাহিনীটা সুবিদিত, বিস্তারিত লেখার কিছু নেই। একটা বানরকে দেওয়া হয়েছিল একটা পিঠে দুই সমান অংশে ভাগ করতে। সেই থেকে 'বানরের পিঠে ভাগ' প্রবাদটি চালু হয়েছে।

প্রথমবার বানর পিঠেটি ভাগ করল, এক অংশ একটু বড় অন্য অংশ একটু ছোট। এবার বড় অংশটা একটু কমিয়ে ছোট অংশটার সমান করার জন্য বানর বড় অংশটায় একটা কামড় বসাল।

বানরের কামড়, সুতরাং সেটা একটু বড় কামড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রথম অংশটা এবার দ্বিতীয় অংশের চেয়ে ছোট হয়ে গেল। ফলে বানরকে দ্বিতীয় অংশে কামড় বসাতে হল প্রথম অংশের সমান করার জন্যে।

অতঃপর যা হওয়া উচিত তাই হল। দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের চেয়ে ছোট হয়ে গেল। ফলে আবার কামড়, এবার প্রথম অংশে, এবং পৌনঃপুনিকভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে কামড় দিতে দিতে বানর সম্পূর্ণ পিঠেটি উদরসাৎ করল। যারা বানরের কাছে পিঠে ভাগ করতে দিয়েছিল তারা শূন্যহাতে ফিরে গেল।

* * *

এবার সমান-সমানের দু'-একটা জাগতিক উদাহরণ দিই।

মার্কিন ধনকুবের এনড্রু কারনেগির কাছে একবার এক সমাজতন্ত্রী গিয়েছিলেন। সেই সমাজতন্ত্রী কারনেগিকে বোঝাতে লাগলেন যে একজন মানুষের এত বেশি ধনসম্পদ, অর্থ থাকা খুবই অন্যায়। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে অবিলম্বে কারনেগির সমস্ত সম্পদ সমস্ত মানুষের মধ্যে বণ্টিত হওয়া উচিত।

লোকটির কথা শুনতে কারনেগির মূল্যবান সময় বেশ কিছু ব্যয় হল, তবে তিনি মনোযোগ দিয়ে এবং হাসিমুখে লোকটির কথা ভাল করে শুনলেন। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে ডাকলেন, ডেকে বললেন, 'দ্যাখো তো, আমার সমস্ত সম্পত্তি বাড়ি-ঘর জমিজমা, শেয়ার ডিবেঞ্চার, কল-কারখানা সেইসঙ্গে নগদ আর ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা, বাজারে পাওনা সব মিলিয়ে কত টাকা হয়?'

কিছুক্ষণ হিসেব করে ব্যক্তিগত সচিব বললেন, 'স্যার মোটামুটি অর্থের হিসেবে সমস্ত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় একশো কোটি ডলার।'

এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগের কথা। তখনকার বাজারদরে এই টাকার মূল্য অপরিসীম! সে যা হোক, এরপরে কারনেগি সমাজতন্ত্রী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত?'

কারনেগি কেন এসব প্রশ্ন করছেন সেসব ধরতে না পেরে ভদ্রলোক বললেন, 'একশো দশ কোটি ছিল, তবে এখন বেড়ে প্রায় সোয়াশো কোটি হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরে রাখা কাগজের প্যাডে একশো কোটি ডলারকে সোয়াশো কোটি দিয়ে ভাগ করলেন কারনেগি, ভাগফল পাওয়া গেল আশি সেন্ট।

কারনেগি তখন তাঁর সচিবকে বললেন, 'এই ভদ্রলোককে ওঁর অংশের আশি সেন্ট দিয়ে দাও তো।' তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিটল তো আপনার সমস্যা?'

* * *

সমীকরণের সমস্যা অবশ্য এত সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জার্মান প্রবাদ আছে, একমাত্র গোরস্থানেই সবাই সমান। এ বিষয়ে স্কুলপাঠ্য বইতে সেই ইংরেজি কবিতা 'ডেথ দা লেভেলার' (Death the leveller) সেও তো প্রায় অনেকেরই পড়া।

মৃত্যুতে সবাই সমান, এই বহুস্বীকৃত এবং অতি প্রাচীন দর্শনতত্ত্ব নিয়ে ছেঁদো আলোচনার সুযোগ এই তরল কলমকারকে পাঠক দেবেন না। তবে তরলতর প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানকেও একটু স্মরণ করি, কারণ তিনি বলেছিলেন জীবনেও সবাই সমান।

হুইটম্যানের সেই 'মদীয় সঙ্গীত' (Song of myself) কবিতার থেকে অন্তত এই কয়টি পঙ্ক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

আমি যা ভাবি,
তুমিও তাই ভাবো।
কারণ প্রতিটি অণুকণা
যা আমার মধ্যে রয়েছে,
তা তোমার মধ্যেও রয়েছে।

কাব্য ও দর্শনান্তে এবার সমান সমানের আসল কাহিনীটি বলি।

শুকদেব একজন নবীন যুবক। এলোমেলো চুল। কবিস্বভাব, বেকার। দু'-চারটে টিউশনি করে। বয়েস নিতান্ত একুশ। কিন্তু এই বয়েসেই সে প্রেমে পড়েছে। এবং সে সামান্য প্রেম নয়, সে প্রেমে পড়েছে পাড়ারই দিদিস্থানীয়া এক পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া যুবতীর সঙ্গে। যুবতীটির নাম অনু।

অনুকে সুযোগ পেলেই শুকদেব বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কখনও মুখে বলে, কখনও চিঠি লেখে। অনু কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু শুকদেব নাছোড়বান্দা। অবশেষে বৃহৎ পীড়াপীড়ির পর অনু একদিন কবুল করল, 'ঠিক আছে, বাবাকে বলো।'

অনুর বাবা একজন ছিমছাম সরল প্রকৃতির (অর্থাৎ সাদা কথায় গবেট) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সারা জীবন সরকারি কাজ করে কেবল 'উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর মেমো নাম্বার...' করে তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি বহু আগেই লুপ্ত হয়েছে।

একদিন শুকদেব অনুর বাবার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেল। অনু একটা মর্নিং স্কুলে পড়ায়, সকালে বাড়ি থাকে না। ওটাই প্রশস্ত সময়। সকালের দিকে অনুর বাবা বাইরের বৈঠকখানা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, শুকদেব গিয়ে নমস্কার করে সামনে দাঁড়াল।

অনুর বাবা, 'কী চাই', জিজ্ঞাসা করাতে শুকদেব নিজের আত্মপরিচয় দিল। দিয়ে বলল, 'মেসোমশাই, আমি এই পাড়াতেই থাকি। আপনার মেয়ে অনুদির সঙ্গে আমার লাভ হয়েছে। অনুদিকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

এই সহজ প্রস্তাবে মেসোমশাই বিহ্বল বোধ করলেন, কিন্তু ওই 'অনুদি' শব্দটায় তাঁর কেমন খটকা লাগল, তিনি আর কিছু জানতে না চেয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবাজীবন, তোমার বয়স কত?'

শুকদেব গর্বিত হয়ে বলল, 'একুশ'।

অনুর বাবা বললেন, 'তোমাকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

চার বছর অপেক্ষা করতে হবে শুনে শুকদেব রীতিমতো দমে গেল, তবু বলল, 'চার বছর কেন মেসোমশায়?'

মেসোমশায় বললেন, 'এখন অনুর বয়েস পঁচিশ। চার বছর পরে তোমাদের দু'জনের বয়েস সমান-সমান হলে তখন বিবেচনা করে দেখব। এখন এসো।'

স্মৃতির খেয়া

হই হই করে বইমেলা চলছে শহরে। সারা বছর তুচ্ছাতিতুচ্ছ রসিকতায়, ইয়ারকি দিয়ে কেটে যায়। অন্তত এবার একটা বইয়ের কথা লিখি।

বাংলা কাগজের রীতি আছে, বৎসরান্তে লেখক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে জানতে চাওয়া এ বছর কী কী বই পড়লেন। তাঁরা যা বলেন, তার শতকরা নব্বইটি ইংরেজি বই। এমন কেউ কেউ আছেন এমনকী তার মধ্যে বঙ্গভাষার লেখকও আছেন যিনি একটিও বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করেন না। সস্তা, বাজিমাৎ করা, গিমিক সর্বস্ব কিংবা পণ্ডিত পাঠ্য বিলিতি শুষ্ক কাষ্ঠ গ্রন্থের চমৎকার একটি তালিকা পাওয়া যায় এসব প্রতিবেদনে। এঁরা বোধহয় মনে করেন বাংলা বইয়ের নাম করলে নিজেদের দাম কমে যাবে। আমার বিদ্যা অতদূর নয়। তা ছাড়া এই সামান্য কথিকায় অত কচকচি পোষাবে না।

সরাসরি একটা বাংলা বইয়ের কথা বলি, সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া'। বইটি আগে দেখেছিলাম, দশ বছর হল বেরিয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি। সম্প্রতি পড়লাম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাগিনেয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পাত্রী, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা আজীবন সংগীত সাধিকা সাহানা দেবী— তাঁর এই বইতে শান্তিনিকেতনের গান আর অসহযোগের আন্দোলন, দেশবন্ধুর শেষযাত্রা আর অরবিন্দের পণ্ডিচেরি অনায়াস ভাষায় সাবলীল সহজ বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন।

এই শতকের প্রথম দুই দশক। কত ঘটনা, কত আন্দোলন তারই ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকময় ঘটনাবলি। যে পৃথিবী চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমরা জন্মাবার আগেই সেই জগতের ছবি এঁকেছেন সাহানা দেবী।

বড় ঘটনা আপাতত থাক ইতিহাসের পৃষ্ঠার জন্যে। ইতিহাসে ঠাঁই পাবে না এমন দু'-একটা কৌতুকময় কাহিনী 'স্মৃতির খেয়া' থেকে তুলে দিচ্ছি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি বিয়েতে ঘরে দরজা বন্ধ করে মহিলাদের আসর বসেছে।

সেখানে সাহানা দেবী অতুলপ্রসাদের 'বঁধু ধরো ধরো মালা পরো গলে' গানটি গেয়ে নাচ শুরু করেছেন। হঠাৎ দেখা গেল ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সেই নাচ দেখছেন। সাহানা দেবী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কবিকে ধরলেন, 'আপনি যে বড় লুকিয়ে আমার নাচ দেখছিলেন?' উজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা চোখে কবি তাঁর সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি যদি কথা দাও যে নাচবে তাহলে আমি আবার একটা বিয়ে করি!'

* * *

পিতৃহীন সাহানা দেবী মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। মামা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধুর অনেক কাহিনী, অনেক গল্প স্মৃতির খেয়ায়।

সেটা সেই অসহযোগের বছর। ষাট ইঞ্চি বহরের শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি ছেড়ে দেশবন্ধু তখন চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের খদ্দর পরতে লেগেছেন। এই সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা সাহানা দেবী লিখছেন।

....'আমাদের এক পিসিমার বাড়িতে বিকেলের দিকে মামাবাবু বেড়াতে এসেছেন। এই পিসিমা দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। মামাবাবুর পরিধানে খদ্দরের ধুতি চাদর ইত্যাদি ছিল; কিন্তু পায়ে ছিল বিলিতি জুতো। দেখে পিসিমা ঠাট্টা করে দেওরকে বললেন, 'এ দিকে তো খদ্দর পরেছ, পায়ে তো দেখি বিলিতি জুতো!' মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বিলিতি বলেই তো পায়ের নীচে রাখতে ভালবাসি।'

* * *

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেই রসা রোডের দেশবন্ধুর বাড়ি থেকে ডাক পড়ত সাহানা দেবীর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গান শিখতে যাওয়ার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ যেবার কবির সঙ্গে আসতেন সেবার বেশির ভাগ গানই দীনেন্দ্রনাথ শেখাতেন, যদিও কবি সেখানে উপস্থিত থাকতেন। দীনেন্দ্রনাথ না এলে কবি নিজেই শেখাতেন।

একবার খুবই মজার একটা ব্যাপার হয়েছিল। দীনেন্দ্রনাথ কলকাতা এসেই টেলিফোনে সাহানা দেবীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'চলে এসো। অনেক নতুন গান আছে।'

সাহানা দেবী ছটফট করছেন যাওয়ার জন্যে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনও গাড়ি কিছুতেই জোগাড় করে ওঠা গেল না। ভবানীপুরের থেকে জোড়াসাঁকো কম দূরের পথ নয়, সাহানা দেবী আছেন মামার বাড়ি অর্থাৎ রসা রোডে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে (এখন যেটা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন) আর দীনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন— জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

প্রায় সত্তর আশি বছর আগের কথা এসব। রাস্তাঘাটে মহিলাদের যাতায়াত অত সহজ ছিল না, গাড়ি ঘোড়াও বা কোথায়।

সাহানা দেবী যেতে পারলেন না। কিন্তু তার জন্যে গান শেখা মোটেই বন্ধ রইল না। ব্যারিস্টার সি আর দাশের ব্যস্ত চেম্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টেলিফোনযোগে চোদ্দটা গান শিখে নিলেন সাহানা দেবী। দীনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে গাইছেন আর তিনি ভবানীপুর রসা রোডে টেলিফোন ধরে গান শিখছেন।

সাহানা দেবীর ভাষায়, 'সে ভারী মজা! কবি তো শুনে অবাক। এই কথা যে কত লোককে উনি পরে বলেছিলেন, এমন গান পাগলা আমি আর কোনও মেয়েকে দেখলুম না।'

গানের পরে অভিনয়ের কাহিনী বলি।

নিউ এম্পায়ারে 'বিসর্জন' অভিনয় হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জয়সিংহ।

অভিনয় আরম্ভ হত সাহানা দেবীর কণ্ঠে 'তিমির দুয়ার খোলো এসো এসো নীরব চরণে' গানটি দিয়ে। স্টেজে প্রবেশ করবার পথে সাহানা দেবী দেখলেন কবি জয়সিংহের সাজে সেজে ভোঁ হয়ে বসে আছেন, যেন কীসের মধ্যে তলিয়ে গেছেন।

সাহানা দেবীর ডাক নাম ঝুনু। তিনি গান শেষ করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসতেই রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ করে বললেন, 'ঝুনু, তুমি তো দেখছি বেশ সহজভাবে স্টেজে চলে যাও? ভয় ভাবনার ধার ধারো বলে তো মনে হয় না?'

সাহানা দেবী হেসে বললেন, 'আমার খুব আনন্দ হয়। খুব মজা লাগে স্টেজে ঢুকতে।'

একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ আরও মজা করে বললেন, 'তাই তো দেখছি। আর আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে এত স্টেজে অভিনয় করেও স্টেজে যাবার আগে আজও বলসঞ্চয় করে নেবার জন্যে একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নিতে হয়।' যাঁরা কাছে ছিলেন সবারই হেসে গড়িয়ে পড়বার মতন অবস্থা কবির এই রকম মজার ভঙ্গি করে বলা দেখে।

অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রে সাহানা দেবীর গায়ে জ্বর। সেই জ্বর গায়েই গান করলেন। সেদিন অভিনয় শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহানা দেবীর কাছে এসে কবি কৌতুকভরা নয়নে মৃদু মৃদু হেসে বললেন, 'শোনো ঝুনু, জ্বর হলে যদি তোমার এমন গান হয় তবে আমি তোমার জ্বর হয়েছে শুনে দুঃখ করব না খুশি হব, সে কথা তুমিই বলো, তোমার কী মত?'

* * *

অজস্র ঘটনা। উজ্জ্বল স্মৃতি চিত্রমালা। আর কিছু সরস কিছু ব্যক্তিগত ব্যথা। বেদনার সুখ-দুঃখের ভালবাসার কথা, গানের কথা। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু থেকে অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে দিলীপকুমার রায়। চমৎকার ভাষায় লেখা তরতর করে বয়ে গেছে স্মৃতির খেয়া। মহামানবদের আমাদের নিত্যদিনের চৌহদ্দির মধ্যে হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব আর গানের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন সাহানা। অনেক বড় কথার মধ্যে তুচ্ছ কৌতুকের স্মৃতিও তিনি জুড়ে দিয়েছেন। স্মৃতির খেয়ার মতো বই সচরাচর লেখা হয় না।

নব্বই অতিক্রান্ত হয়েছেন চিরসবুজ সাহানা দেবী। পণ্ডিচেরি আশ্রমে এখনও ভাগ্যবানেরা তাঁর কণ্ঠের গান, কোনও কোনও দিন গানের পর গান শুনতে পায়। এ রকম যেন আরও বহুদিন চলে।

অচলপত্র

ডাক্তার : অভিনন্দন রামবাবু। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।

রামবাবু : কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

ডাক্তার : মন খারাপ কেন? মাথা খারাপ সেরে গিয়ে মন খারাপ হল কেন?

রামবুবু : মন খারাপ হবে না? এতদিন নিজেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভাবতাম। এখন আবার সেই নিতান্ত রামবাবু হয়ে গেলাম।

* * *

তিরিশ বছরের পুরনো 'অচলপত্রে'র উপরের কথোপকথনটি পেশ করলাম। তাও স্মৃতি থেকে।

কয়েক সপ্তাহ আগে 'তামাক' পর্বে পুরনো অচলপত্রের আরেকটি গল্প লিখেছিলাম এবং সেই সূত্রে অচলপত্র নামক অধুনালুপ্ত জনপ্রিয় পত্রিকা এবং সে পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের কথা বলেছিলাম। একথা উল্লেখ করেছিলাম যে হাতের কাছে বা চেনাশোনা কোথাও 'অচলপত্র' পত্রিকা নেই, তা হলে অন্তত এক পর্ব অচলপত্র স্মৃতিচারণ করা যেত।

এক প্রাজ্ঞ পাঠক আমার সেই দুঃখ দূর করেছেন। বর্তমানের ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে মেদিনীপুরের মহিষাদল থেকে তিনি আমারে পাঠিয়েছেন পঁচিশ বছর আগের এক বছরের বাঁধানো অচলপত্র।

ভদ্রলোক অনুরোধ করেছেন, 'দয়া করে নামোল্লেখ করবেন না। ব্যবহার করেছেন দেখলেই আমার যোগ্য প্রাপ্তি ঘটবে।'

সুতরাং তাঁর নাম লিখে তাঁকে বিব্রত করব না, কিন্তু একথা স্বীকার করতে বাধা নেই একালে এ ধরনের পাঠক বিরল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পাঠক কাগজের পৃষ্ঠায় লেখা পড়ে তাঁর পঁচিশ বছর আগের বাঁধানো পত্রিকা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন— তাঁর প্রতি এই সামান্য লেখকের কৃতজ্ঞতা না জানালে অন্যায় হবে।

উনিশশো চৌষট্টি সালের বাঁধানো অচলপত্রের সেট এটা। অচলপত্রের সরসতা তখন অনেক কম। আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মাসিক অচলপত্র সাপ্তাহিক হয়েছে। রাজনীতির দিকেই ঝোঁক বেড়ে গেছে। মাসিক অচলপত্রের স্বর্ণযুগ গেছে পঞ্চাশের দশকে। সেটা ছিল রঙ্গব্যঙ্গের সরস সাহিত্য পত্রিকা। ষাটের দশকের রাজনৈতিক ঝাঁঝ ঢুকে যায় সাপ্তাহিক অচলপত্রে এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ অনাবশ্যক রাগ ও তিক্ততা।

অচলপত্রের প্রসঙ্গে রাগ ও তিক্ততার কথা থাক, বরং দুয়েকটা সরস উদাহরণ দিই।

এই নিবন্ধের প্রথমে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি সেটা স্মৃতি থেকে, রসিকতাটা মাসিক অচলপত্রের সময়কার। আর এর পরেরগুলি চৌষট্টি সালের সাপ্তাহিক অচলপত্র থেকে।

অচলপত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিভাগ ছিল 'সাহিত্য দুঃসংবাদ' এবং চিঠিপত্তরের জঞ্জাল। 'সাহিত্য দুঃসংবাদ' জনপ্রিয় হয়েছিল প্রধানত নারায়ণ দাশশর্মার তির্যক, সরস ও মর্মান্তিক মন্তব্যের জন্যে। এ ছাড়াও সাহিত্য দুঃসংবাদ বী. না. ব. এবং সম্পাদক স্বয়ং লিখতেন।

যতদূর মনে পড়ছে চিঠিপত্তরের জঞ্জাল সম্পাদক সাধারণত নিজেই দেখতেন।

তখন কেনেডি সদ্য নিহত হয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জনসন। চিঠিপত্তরের জঞ্জালে একজন প্রশ্ন করেছেন, 'কেনেডির তুলনায় জনসন কেমন?'

দীপ্তেন সান্যালের সরাসরি জবাব, 'এখনও বেবি জনসন।'

আরেকটি প্রশ্ন। 'পাঁঠার মাংস পাঁচ টাকা হয়ে গেল কি বরাবরের মতো?'

জবাব : 'না আরও বাড়বে পাঁঠার দাম। চলচ্চিত্র থেকে সাহিত্য-সংগীত- শিক্ষা-রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই পাঁঠার দাম বাড়তে থাকবে।'

আজ পঁচিশ বছর পরে যখন মাংসের দাম প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছুঁয়ে দশগুণ হয়েছে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে বলেই বলা যায়। শুধু মাংসের পাঁঠা নয়, সব রকম পাঁঠার দামই বাড়ছে, বাড়বে।

এই সময়েই একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, দীপ্তেন সান্যাল, নেহরু তখনও বেঁচে তবে অসুস্থতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এক পাঠক প্রশ্ন করলেন, 'জয়প্রকাশ নারায়ণ কি ভাবী পি-এম?' দীপ্তেন সান্যালের জবাব, 'ইন্দিরা থাকতে? সন্তান থাকতে অন্য কাউকে কেউ অ্যাডপট (Adopt) করে?'

ঠিক এই সময়েই পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতা কটাক্ষ করে দীপ্তেন লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।'

রাজনীতির কচকচি থাক। অচলপত্রের একটা সিনেমা সংক্রান্ত মন্তব্যের কথা বলি। মন্তব্যটি এক এবং অদ্বিতীয় সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে।

এক পাঠক চিঠি দিয়েছিলেন অচলপত্রে, 'সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্পের নাম পালটে চারুলতা করেছেন, জানেন?'

দীপ্তেন সান্যাল জবাব দিলেন, 'এখন তো কলির সন্ধে রবীন্দ্রনাথের নাম পালটে দেননি, বাঙালির চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য ভাল...'

এ ধরনের তিক্ত ও তির্যক মন্তব্য হয়তো অনেকেরই এখন আর পছন্দ নয়। কিন্তু বয়েসের গুণেই হোক বা চরিত্র দোষেই হোক আমরা এসব পড়ে বেশ মজা পেতাম।

একবার দীপ্তেনবাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'শুনছি, আপনি নাকি জেলে যাবেন এবার?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি কোথায় আছি বলে আপনার ধারণা?'

ঠিক এই রকম নয় তবে প্রায় সমজাতীয় একটা রসিকতাও ছাপা হয়েছিল অচলপত্রে, সেটা হুবহু তুলে দিচ্ছি...

জন্মান্তরে অবিশ্বাসী একজন জিজ্ঞেস করল তার জন্মান্তরে বিশ্বাসী এক বন্ধুকে যে, 'তা হলে তুমি কি বলতে চাও যে আমি আসছে বার শুয়োর হয়েও জন্মাতে পারি।'

জন্মান্তরে বিশ্বাসী বন্ধু শুনে বলল, 'না তা পারো না, দু'বার এক রূপ কেউ পরিগ্রহণ করে না।'

* * *

অচলপত্র প্রসঙ্গ শেষ করার আগে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা জানিয়ে রাখি। এক, অচলপত্রের প্রচ্ছদে একটি এবড়ো-খেবড়ো ক্যাকটাস গাছের অর্থাৎ ফণি-মনসার ছবি ছাপা হত। এবং দুই, প্রচ্ছদের নীচে লেখা থাকত, সর্বাধিক কম বিকৃত সাপ্তাহিক।

অবশেষে একটি অচলপত্রীয় রসিকতার উদাহরণ দিয়ে এই স্মৃতিচারণা শেষ করি:-

রোগী : ডাক্তারবাবু, আমার কী হবে?

ডাক্তার : পোস্টমর্টেমের পর বলা যাবে।

পুনশ্চ : আরেকটি অচলপত্রীয় আখ্যান।

এক চিত্রকর বহুদিন ধরে একটি ছবি আঁকছিলেন। তাঁকে যখন সবাই জিজ্ঞেস করল কীসের ছবি আঁকছেন, তিনি বললেন, 'ভগবানের ছবি আঁকছি।'

তখন সবাই বলল, 'সে কী করে সম্ভব। কেউ জানেই না ভগবান কী রকম দেখতে।'

চিত্রকর গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'এবার থেকে এই ছবি দেখে জানতে পারবে।'

সচিত্র ভারত

'লালেরা সব লালই ছিল, কৃষ্ণেরা লাল হচ্ছে কি? রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ মেনন, কৃষ্ণা হাতী সিংহেরা মন্দিরেতে ঠেকা দিয়ে ইন্দিরা গান ধরছে কি? রুশ ভালুকের কাঁধে চড়ে নাচছে ভারত ফিঙ্গেরা। আমরা সবাই নাচব কি?

অবাক কাণ্ড তেলাপোকা ধরছে যে আজ কাঁচপোকী।'

সজনীকান্ত দাস
শারদীয়া সচিত্র ভারত
১৩৬০

* * *

সচিত্র ভারত থেকে অসচিত্র এই মহাভারত অনেক দূর, সময়ের হিসেবে উপরোক্ত শারদীয়া সংখ্যা থেকে সাড়ে তিন দশকের দূরত্ব।

অল্প কিছুদিন আগে মহাভারতের এই কলমে স্বর্গীয় দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল মহোদয়ের অচলপত্রের কথা লিখেছিলাম। সেটাও সম্ভব হয়েছিল এক সহৃদয় পাঠকের সৌজন্যে, যিনি পুরনো অচলপত্র পাঠিয়ে আমাকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সেই সময়েই ভেবেছিলাম 'সচিত্র ভারত' নিয়েও আমার কিছু লেখা কর্তব্য। রসিকতার পাঠশালায় যেসব শিক্ষাদাতার কাছে আমি ঋণী তার মধ্যে অধুনালুপ্ত ওই সাপ্তাহিক সচিত্র ভারত পত্রিকার স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমার নিকটে।

একটা উদাহরণ দিই। অনেক দিন আগে সেই কাণ্ডজ্ঞানে উল্লেখ করেছিলাম।

'চুল কাটার সেলুন নিয়ে অনেক মজার ছবি এঁকে ছিলেন প্রমথ সমাদ্দার। প্রমথবাবুকে কেউ কি মনে রেখেছেন? আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর এবং তারো আগে কার্টুন আঁকতেন প্রমথ সমাদ্দার, তাঁর হাতের আঁকা এবং রসবোধ দুইই ছিল চমৎকার।'

কাণ্ডজ্ঞানে কেশচর্চার ওই নিবন্ধে যে কথাটা উল্লেখ করা হয়নি সেটা হল এই যে প্রমথ সমাদ্দারের ওই চমৎকার কার্টুনগুলো সবই আমি দেখেছিলাম সচিত্র ভারত সাপ্তাহিকে, সেই তিন যুগ আগে।

সচিত্র ভারতের ওই কার্টুনটার কথা বলি। সেলুনে এক ভদ্রলোক চুল কাটছেন। ভদ্রলোকের পায়ের কাছে ঠিক চেয়ারের নীচেই বসে রয়েছে একটি অতিকায় হিংস্রদর্শন কুকুর। কুকুরটি খুব মনোযোগ দিয়ে চুলকাটা লক্ষ করছে। সারমেয় প্রবরের এই মনোযোগ দেখে খদ্দের ক্ষৌরকারকে বললেন, 'আপনাদের এই কুকুরটা দেখছি খুব শিক্ষিত। কী রকম স্থির হয়ে বসে চুলকাটা দেখছে।' ক্ষৌরকার চুল কাটতে কাটতেই নিজের জিভ কেটে বললেন, 'না স্যার, শিক্ষিত-টিক্ষিত কিছু নয়, ও বড় লোভী স্যার।'

খদ্দের অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'লোভী?' ক্ষৌরকার উত্তর দিলেন, 'আমি স্যার অনেক সময়ে চুল কাটতে কাটতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে খদ্দেরদের জুলফির মাংস, কানের লতি এই সব হাত ফসকিয়ে কেটে ফেলি। আমার কুকুরটা সেই মাংসের টুকরোর লোভে বসে আছে স্যার।'

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা কার্টুন এটা। কিঞ্চিৎ ভুলভ্রান্তি, অতিরঞ্জন হয়তো হয়ে গেল। তবু স্বীকার করা ভাল যে এ রকম কার্টুন আজকাল চোখেই পড়ে না। সরল, সরস, নির্দোষ কার্টুনের দিন যেন সচিত্র ভারত আর প্রমথ সমাদ্দারের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

প্রমথ সমাদ্দার ছাড়াও সচিত্র ভারতে আরও কার্টুন আঁকতেন স্বনামধন্য কাফী খাঁ এবং শৈল চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে ছিলেন রবীন ভট্টাচার্য এবং অমিয় (ওমিয়ো-Omio)। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে একমাত্র কাফী খাঁ এবং শৈল চক্রবর্তী ছাড়া সবাই কার্টুনে ইংরেজিতে নাম সই করতেন। কাফী খাঁ তাঁর এই ছদ্মনামেই সই করতেন আর শৈল চক্রবর্তী কার্টুনের নীচে স্বাক্ষর দিতেন শ্রীশৈল।

সচিত্র ভারত ঠিক অচলপত্র জাতীয় কাগজ ছিল না। রাজনৈতিক বা সাময়িক ব্যাপারে তার খুব মাথাব্যথা ছিল না। তবে তখনকার দেশ পত্রিকায় 'ট্রামে বাসে' কিংবা পরবর্তীকালে আনন্দবাজারে শিবরাম চক্রবর্তীর 'অল্পবিস্তর' জাতীয় একটা কৌতুকী কলম ছিল যাতে সাময়িক ঘটনা নিয়ে সরস মন্তব্য করা হত।

একটা উদাহরণ দিই, 'এবার পূজার ভোগের চাউল বরাদ্দের জন্য সরকারি ভোগ কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রার্থীরা ইহাকে বলেন ভোগান্তি কমিটি।'

কার্টুন, কৌতুকী এবং হাসির লেখা থাকলেও সচিত্র ভারত ছিল উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা। পরশুরাম কিংবা বনফুল, সুবোধ ঘোষ কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমনকী অন্নদাশংকর রায় এই পত্রিকায় লিখতেন। কদাচিৎ তরুণ বা অনামি লেখকের রচনা দেখা যেত। কবিতা বা ভারী প্রবন্ধ কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

বিলিতি 'পাঞ্চ' জাতীয় কাগজ ছিল না সচিত্র ভারত তবে সরস সাহিত্যপত্র হিসেবে হয়তো 'নিউইয়র্কার' কাগজের সঙ্গে এর কিছুটা তুলনা চলতে পারে।

হাতের কাছে রয়েছে সচিত্র ভারতের শারদীয়া ১৩৬০ সালের সংখ্যাটি। যেখান থেকে এ নিবন্ধের প্রথমেই সজনীকান্ত দাসের 'খাপ ছাড়া' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছি।

এই সংখ্যাতেই পরশুরামের 'একগুঁয়ে বার্থার' মতো অবিস্মরণীয় গল্প প্রকাশিত হয়েছে, সে গল্পের ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী স্বয়ং। এ ছাড়া রয়েছে বনফুলের, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের, প্রমথনাথ বিশীর গল্প এবং অন্নদাশংকরের ছড়া।

সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত গল্প 'নিমের মধু'ও এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী এবং বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সরস গল্প।

* * *

নিজের অজান্তে একটু অ্যাকাডেমিক হয়ে গেল এই আলোচনাটি, এখন আর ফেরার পথ নেই। তবু সরসতার খাতিরে সচিত্র ভারতের দু'-একটা কৌতুকের কথা বলি।

প্রমথ সমাদ্দারের একটা কার্টুন। জেলের সুপার ওয়ার্ডেনকে বলছেন, 'কী—জেলের কয়েদিরা সব স্ট্রাইক করেছে? কাজ করছে না? লক আউট করে দাও জেলের দরজা।'

রবীন ভট্টাচার্যের কার্টুনগুচ্ছে রয়েছে একটি কৌতুক কাহিনী, কোনও ক্যাপশান নেই, ছবির মধ্যেই গল্প নিহিত রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছেন। স্ত্রী দু'হাতে জিনিস কিনছেন আর একটার পর একটা প্যাকেটের বোঝা স্বামীর কাঁধে চাপিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে প্যাকেটের নীচে ডুবে গেলেন স্বামী। বাজার থেকে বাড়ি ফিরে স্বামীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে প্যাকেটের বোঝায় মুখ ও অবয়ব ঢাকা স্বামীর ওপর থেকে প্যাকেটগুলো নামিয়ে নিতে দেখা গেল এ স্বামী সে স্বামী নয়, স্বামী বদলিয়ে গেছে প্যাকেটের নীচে।

অবশেষে পুরনো সচিত্র ভারত থেকে একটি মজার আখ্যান বলি, এটি একটি কথোপকথন।

সহকারী: স্যার বাইরে একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে।

স্যার: (মোটা ফাইল থেকে চোখ না তুলে) বলে দাও আমি খুব ব্যস্ত।

সহকারী: বলেছি স্যার। কিন্তু লোকটি বলছে, তার হল জীবন-মরণের ব্যাপার, ওই যাকে বলে লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন।

স্যার: কী সাংঘাতিক কথা। লোকটাকে নিয়ে এসো।

লোকটিকে সহকারী গিয়ে বাইরে থেকে স্যারের ঘরের মধ্যে নিয়ে এল, একটু পরে বোঝা গেল লোকটি লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট, জীবনবিমার দালাল।

এবারের নিবন্ধ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে গেল তবু সচিত্র ভারতের অন্তত আরেকটা সরস আখ্যান উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

মেসের ম্যানেজারবাবু নবনিযুক্ত ভৃত্যকে বলছেন, 'দ্যাখো বোর্ডারদের কারও বাড়ি থেকে যদি কোনও টেলিগ্রাম আসে বা খারাপ খবর, মৃত্যুসংবাদ, অসুখ-বিসুখ, মামলায় পরাজয় বা কারও পরীক্ষার ফেলের খবর অফিস থেকে সে মেসে ফেরা মাত্র বিকেলের চা জলখাবার বা রাতের খাওয়ার আগেই তাকে জানিয়ে দেবে।'

এই আদেশ শুনে সরল ভৃত্যটি প্রশ্ন করল, 'কেন বাবু?' ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আরে এতে খাবার অনেক বেঁচে যায়। মাস-খরচা অনেক কম পড়ে।'

রাম ও রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ শব্দটি অবশ্যই দ্বন্দ্ব সমাস। যার ব্যাসবাক্য হল রাম ও কৃষ্ণ। তবে কেউ কেউ জটিল করে 'যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ'—এইরকম ব্যাসবাক্য করলে তাতেও খুব আপত্তি করা উচিত হবে না।

আমাদের এবারের নিবন্ধের বক্তব্য খুব সরল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। রামায়ণের রামচন্দ্র সম্পর্কে পরমপুরুষ যেসব উপাখ্যান বলেছেন তারই কিছু উদ্ধৃতি এবারের সম্বল।

দূরদর্শনের দৌলতে রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য আবার আসমুদ্র হিমাচলকে আকর্ষণ করেছে। সেই সূত্রেই আমার এবারের এই রামলীলা।

সব আখ্যান হয়তো সব পাঠকের কাছে সরস মনে হবে না। কিছু কিছু কাহিনী সরসতার এলাকা পার হয়ে চিরায়ত দর্শনের সীমানায় পৌঁছে গেছে।

প্রথমেই দর্শন দিয়েই শুরু করি।

সীতাহরণের পর লঙ্কায় যাওয়ার পথে সামনে সমুদ্র দেখে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে করে ক্রুদ্ধ হয়ে রামকে বলেছিলেন, 'আমি বরুণকে বধ করব। এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না।'

রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ, এ যা কিছু দেখছ এসব তো স্বপ্নবৎ। অনিত্য। সমুদ্রও অনিত্য, তোমার রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা, সেটাও মিথ্যা।'

এর চেয়ে অনেক বেশি অনিত্য আখ্যান রাবণ জন্ম ও রাবণ বধের। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অসামান্য কথকতায় এ আখ্যান যে ভাবে বিবৃত করেছেন, পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদধন্য শ্রীম যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই রচনায় সেটা নিশ্চয় কেউ আশা করছেন না, সুতরাং ভরসা করে লিখি।

(ভরসা মানে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা)

কৈলাসে শিবঠাকুর আর তাঁর সুযোগ্য সহচর নন্দী বসে আছেন। হঠাৎ দুম করে একটা ভীষণ শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু এ কীসের শব্দ?'

শিবঠাকুর বললেন, 'এই মাত্র রাবণ জন্মাল, তাই এত শব্দ।'

কিছুক্ষণ পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হল। নন্দী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, এবার আবার কীসের শব্দ হল?'

শিব মৃদু হেসে বললেন, 'এবার রাবণ বধ হল।'

* * *

রামকৃষ্ণ এরপর বলেছেন, 'জন্ম মৃত্যু। এসব ভেলকির মতো। এই আছে। এই নেই। সব অনিত্য।...

...জলই সত্য। জলের ভুড়ভুড়ি। এই আছে, এই নেই। ভুড়ভুড়ি জলে মিশে যায়। যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।'

* * *

এরপরে রামকৃষ্ণ কথিত দুটি রামভক্তির গল্প স্মরণ করি। বলা বাহুল্য দুটিই রূপক গল্প। এতে লোককথার সঙ্গে ঈশ্বরভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্রথম গল্পটি একটি কাক নিয়ে, দ্বিতীয়টি একটা কোলাব্যাঙ নিয়ে।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বারবার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'ভাই এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশি রামনাম জপ করছে। একদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবছে, খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক হয়ে যায়।...'

কোলাব্যাঙের কাহিনীটি ততোধিক মর্মান্তিক। সে ঘটনাও পম্পা সরোবর তীরে।

রাম লক্ষ্মণ সরোবরের তীরের মাটিতে ধনুর্বাণ গুঁজে স্নান করতে নেমেছেন। স্নানের পরে উঠে লক্ষ্মণ মাটিতে গুঁজে রাখা বাণ তুলে দেখেন যে সেটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে রয়েছে। রাম তাই দেখে ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'ভাই দ্যাখো তো, বোধহয় কোনও জীবহিংসা হল।'

লক্ষ্মণ তখন মাটি খুঁড়ে দেখলেন একটি বেশ বড় কোলাব্যাঙ। শেষ অবস্থা। রাম করুণ স্বরে

বললেন, 'কেন তুমি শব্দ করোনি, চেঁচিয়ে ওঠোনি? আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চেঁচাও।'

কোলাব্যাঙ বলল, 'রাম, যখন আমাকে সাপে ধরে তখন আমি চেঁচাই, রাম রক্ষা করো, রাম বাঁচাও এই বলে। এখন দেখলাম রামই আমাকে মারছেন। তাই চুপ করে ছিলাম।'

দুটি কাহিনীরই বক্তব্য খুবই সরল ও স্পষ্ট। সারমর্ম বুঝতে অতি অশিক্ষিত, অতি সাধারণ লোকেরও কোনও অসুবিধে হয় না, হতে পারে না। যে কোনও কথাশিল্পীর পক্ষে এ বিষয়ে পরমপুরুষের ধারে কাছে পৌঁছনো অসম্ভব।

রাবণকে নিয়েও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনেক গল্প। সীতা তখন অশোক কাননে বন্দিনী। সীতাকে পাওয়ার জন্যে অনেক রকম ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে রাবণ। সেই সময় রাবণকে প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি সীতার জন্যে নানারকম মায়ারূপ ধরেছ। একবার রামরূপ ধারণ করে সীতার কাছে গিয়ে দেখো না।'

রাবণ বলল, 'যখন রামরূপ চিন্তা করি ব্রহ্মপদ পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা। তাহলে রামরূপ কী করে ধরব?'

সীতা এবং রাবণকে নিয়ে রামকৃষ্ণের অন্য একটা গল্প আরও বেশি অর্থবহ।

সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সীতার এ কথার মানে রাবণ বুঝতে পারেনি। তাই রাবণ এ কথা শুনে ভারী খুশি। সীতার এ কথা বলবার হেতু এই-যে রাবণের যতদূর যা হবার তা হয়েছে। সে পূর্ণচন্দ্রের মতো বিকশিত, এইবার দিনদিন তার চন্দ্রকলার হ্রাস পাবে, সে কৃষ্ণপক্ষের দিকে এগোচ্ছে।...

...আর রামচন্দ্র হলেন দ্বিতীয়ার চাঁদ। তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।'

* * *

পুনশ্চ:

এই রচনার অবশেষে অন্তত সামান্য একটু সরসতা না আনলে এই ধারাবাহিকের পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। তবু বলি এই জন্যে যদি কারও মনে সন্দেহ হয় যে পরবর্তী খণ্ড আখ্যানটি এই সামান্য গদ্যকারের নিতান্ত বানানো, তিনি দয়া করে উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৪৬) দেখে নেবেন। উপমা রামকৃষ্ণস্য নামক শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর বইয়ের একশো তেইশ নম্বর সংকলন সূত্রেই এটি রয়েছে।

গল্পটি খুব ছোট, খুবই সংক্ষিপ্ত।

...এক রামভক্ত রাতদিন হনুমানের চিন্তা করত। মনে করত আমি হনুমান হয়েছি।

শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হল যে তার একটু ল্যাজও হয়েছে।...

কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ

সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছি। রবিবারের বিলম্বিত সকাল, দূরদর্শনে সদ্য মহাভারত শেষ হয়েছে। দেখলাম সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মাকে যথাক্রমে পিতাশ্রী মাতাশ্রী বলে সম্বোধন করছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে দূরদর্শনে মহাভারত চিত্রমালার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এরা এ রকম সম্বোধন করা শিখেছে।

টিভি রামায়ণের মতো টিভি মহাভারতও ক্রমশ অপরিসীম জনপ্রিয়তার দিকে ধাবমান হচ্ছে। সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয়, যখন ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় গদাযুদ্ধ দেখা যাবে এবং যে কোনও মুদির দোকানে গদা কিনতে পাওয়া যাবে।

এখনই কোনও কোনও পাড়ায় মহাভারত প্রদর্শনের সময়ে পথে বিশেষ কোনও লোক থাকে না। বাজারহাট, রাস্তাঘাট—সব প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, অঘোষিত মহাকাব্যিক কার্ফু জারি হয়।

সংস্কৃত মহাভারত প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। বাংলায় পদ্যে কাশীরাম দাশ এবং গদ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ আর একালে রাজশেখর বসুর মহাভারত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তবে এর কোনওটাতেই কৃষ্ণ চরিত্র প্রধান নয়, কৃষ্ণ নায়ক নন। পাণ্ডবদের বন্ধু এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অর্জুনের রথের সারথি—মূল মহাভারতের কৃষ্ণ কথা প্রায় এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মহাভারতের কৃষ্ণ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃষ্ণ এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়। আগেরবারের নিবন্ধ ছিল রাম ও রামকৃষ্ণ, এবারের বিষয় কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ।

শ্রীরামের মতোই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়েও পরমপুরুষের অজস্র সরস মন্তব্য ও আখ্যান। মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীরও এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন।

যুধিষ্ঠির একবার স্থির করেছিলেন যে তাঁর সমস্ত পাপ কৃষ্ণকে সমর্পণ করে দেবেন এবং এই ভাবে তিনি পাপমুক্ত হবেন।

মধ্যমপাণ্ডব ভীম কিন্তু তখন যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিলেন এবং সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'অমন কাজটি করতে যেয়ো না।'

ভীমের এ কথা শুনে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

ভীম বললেন, 'কৃষ্ণকে যা কিছু অর্পণ করা যাবে তাই সহস্রগুণ হয়ে যাবে। তাঁকে এক গুণ যা দেওয়া যায় তাই হাজারগুণ হয়ে যায়। কৃষ্ণকে পাপ সমর্পণ করলে সে পাপও সহস্রগুণ হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য, 'তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডুষ অর্পণ। কৃষ্ণে ফল সমর্পণ।'

পরমপুরুষের মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে অপর একটি গল্প কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কার। এটা গীতার গল্প, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভের।

অর্জুন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, 'আমি যুদ্ধ করতে পারব না। জ্ঞাতিবধ করা আমার দ্বারা হবে না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু অর্জুন তোমাকে এ যুদ্ধ করতেই হবে। তোমার স্বভাবই করাবে।'

এর পরেও অর্জুন যুদ্ধ করতে আপত্তি করেন। জ্ঞাতি-বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, গুরু ও গুরুজনদের সঙ্গে প্রাণক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন যে 'তুমি যাদের হত্যা করবে বলে আপত্তি করছ তারা কিন্তু কেউই জীবিত নয়, এই সব লোক আগে থেকেই মরে রয়েছে।'

এটুকু তো সবাই জানে কিন্তু এই সূত্রে রামকৃষ্ণ শিখদের কথা বলেছেন। শিখরা ঠাকুরবাড়িতে এসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'শিখদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে সেও ঈশ্বর ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার জো নেই।'

শ্রীকৃষ্ণ রহস্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের কাজ আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কী বুঝব?' এই সূত্রে তিনি একাধিক আখ্যানকে উল্লেখ করেছেন।

ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত, দেহত্যাগের সময় হয়েছে। পাণ্ডবভ্রাতারা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে করে ভীষ্মের শরশয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন যে পিতামহ ভীষ্মের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

অর্জুন এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'কী আশ্চর্য! স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, যিনি কিনা অষ্টবসুর এক বসু তিনিও দেহত্যাগের সময় সংসারের মায়ায় কাঁদছেন।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন ভীষ্মদেবকে অর্জুনের এই কথা বলাতে ভীষ্মদেব বললেন, 'কৃষ্ণ তুমি অবশ্যই জানো, আমি সে কারণে কাঁদছি না। যখন চিন্তা করছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নেই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

* * *

শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব নিয়ে সমস্যা ছিল শুধু একজনার, তিনি মা যশোদা।

মা যশোদার প্রসঙ্গ রামকৃষ্ণ নানাসূত্রে বারবার টেনে এনেছেন।

যশোদা ভাবতেন আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে গোপালের অসুখ হবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না।

উদ্ধব যশোদাকে বলেছিলেন, 'মা তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন। তাঁর কী হবে?'

যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের সাক্ষাৎ ভগবান বা চিন্তামণি নয়, আমি আমার গোপালের কথা বলছি, আমার গোপাল কেমন আছে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ যশোদামায়ের আর একটি একই রকম গল্প বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ একবার যশোদাজননীকে বললেন, 'তোমাকে আমি নিত্যধাম দর্শন করাব। এসো যমুনায় স্নান করতে যাই।'

তাঁরা যেই ডুব দিয়েছেন, একেবারে গোলকদর্শন। অখণ্ড জ্যোতি দর্শন।

যশোদা কিন্তু এত সব দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না, কৃষ্ণকে বললেন, 'কৃষ্ণরে তোর ওই গোলকদর্শন, জ্যোতি দর্শন, ওসব আর দেখতে চাই না। এখন তোর সেই মানুষ রূপ দেখব। তোকে কোলে করব। তোকে খাওয়াব।'

রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহধারণ করলে রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই আছে। মনে হয় আমাদেরই মতো।'

পরিশেষে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই শ্রীকৃষ্ণ কথামালার অন্তে আমার নিজের একটি তুচ্ছ কাহিনী যোগ করি।

গল্পটি পুরনো, শ্রীকৃষ্ণের বয়েস নিয়ে। এক বৃদ্ধা কৃষ্ণকথকতা শুনতে শুনতে কথকঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা ঠাকুরমশায় শ্রীকৃষ্ণের বয়েস কত ছিল।'

ঠাকুরমশায় স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'একেক সময়, একেক রকম। যখন ছোট শিশুটি ছিলেন তখন বয়েস ছিল এক-দুই, তারপর বড় হলেন বালক হলেন, কিশোর হলেন তখন বয়েস দশ-বারো-পনেরো হল, তারপর বাড়তে বাড়তে বিশ-পঁচিশ যুবক হলেন, তারপর যখন প্রৌঢ় হলেন...'

এই পর্যন্ত শুনে বৃদ্ধাটি বাধা দিলেন, 'থাক, থাক, আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।'

স্বপ্ন ও রমণী

এই রকম বিপজ্জনক নামের গোলমেলে রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার আড়াল দিয়ে প্রবেশ করাই হয়তো নিরাপদ। 'স্বপ্ন' কবিতার সেই স্মৃতিগন্ধময়, উজ্জ্বল, অনিবার্য পঙ্‌ক্তিগুলি আরেকবার স্মরণ করি।

'দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকের উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে...'

নবীন বয়েসে যে বাঙালি তরুণ এই কবিতা পড়ে শিহরিত হননি, একবারের জন্যেও রোমাঞ্চিত হননি, তার জীবনযৌবন বৃথা। স্বপ্ন সকলেই দেখে। হয়তো সবাই স্বপ্নে শিপ্রা নদীপারে প্রথমা প্রিয়ার কাছে পৌঁছোয় না, কিংবা স্বপ্নে দেখতে পায় না যে 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।' এমনকী হিং টিং ছটের হবুচন্দ্র ভূপ কবে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার অর্থ ভেবে ভেবে গবুচন্দ্র চুপ হয়ে যান, সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, 'শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে'—আমাদের সকলের সে রকম স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্যও কদাচিত হয়। তবু স্বপ্ন সকলেই দেখে। শুধু মহিলাদের জড়িয়ে লাভ নেই স্ত্রী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু, দুগ্ধপোষ্য শিশু সকলেই স্বপ্ন দেখে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ভয় পেয়ে শিশু কেঁদে ওঠে আবার মুহূর্তের মধ্যে পরম কৌতুকে ঠোঁট টিপে হাসে। মৃত্যুপথযাত্রীও স্বপ্ন দেখে, যন্ত্রণায় জর্জর তার শরীর কিন্তু তার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখে পরম প্রশান্তি।

শুধু মানুষ নয়, স্বপ্ন জীবজন্তুও দেখে। আমাদের বাসায় একটি প্রৌঢ় কুকুর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে লড়াই করে ওঠে, তারপর তার ঘুম ভেঙে যায়, আচমকা জেগে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কুকুরের স্বপ্ন আপাতত থাক। মানুষের স্বপ্নে যাই।

প্রথমে সেই অতি পুরনো বাজে গল্পটা বলে নিই। গল্পটা আগেও কোথায় যেন বলেছি বলে মনে হচ্ছে, তাই একটু ঘুরিয়ে নাট্যাকারে লিখছি।

প্রথম দৃশ্য। মধ্যরাত

একটি ডবল বেডের খাটে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি নিদ্রিত।

স্বামী: (ঘুমের মধ্যে দুই বাহু প্রসারিত করে, উচ্চস্বরে) জলি, জলি, জলি।

স্ত্রী: (ঘুম ভেঙে উঠে, স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে তুলে) জলি? জলি কে?

স্বামী: (চোখ কচলাতে কচলাতে) জলি?

স্ত্রী: হ্যাঁ। এতক্ষণ স্বপ্নে যাকে জড়িয়ে ধরে জলি-জলি করে চেঁচাচ্ছিলে, সেই জলিটা কে আমি জানতে চাই।

স্বামী: (আলগোছে হাই তুলে) ও কিছু নয়।

স্ত্রী: কিছু নয়?

স্বামী: কী বিরক্ত করছ? জলি আসলে একটা ঘোড়ার নাম। দুপুরে রেস খেলতে গিয়েছিলাম না। জলিই তো বাজি জিতল। সেই পয়সা দিয়েই তো তোমার চকোলেটের বাক্স কিনে আনলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত কাল।

ডবল বেডের খাটে স্বামী একা নিদ্রিত। কাছে জানালার ধারে চেয়ারে বসে স্ত্রী খবরের কাগজ পড়ছেন। সামনের তেপায়া টেবিলের উপরে টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

স্ত্রী: (টেলিফোন তুলে) হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, কী নাম বললেন। আচ্ছা। ধরুন। ঘুমিয়ে আছে ডেকে দিচ্ছি।

স্ত্রী উঠে গিয়ে নিদ্রিত স্বামীকে ধাক্কা দিলেন।

স্বামী: (জেগে উঠে) কী হল?

স্ত্রী: তোমার ফোন।

স্বামী: কে ফোন করল? এই সকালে?

স্ত্রী: সেই যে জলি, রেসের ঘোড়াটার কথা রাতে বললে, সেই ঘোড়া ফোন করেছে। পুরনো গল্পই যখন বলছি, তা হলে অন্য এক সরস কাহিনীর আরেক মহিলার কথা বলি। সেই মহিলার স্বামী বেচারার কিন্তু কোনও দোষই ছিল না।

ভদ্রমহিলা একদিন রাতে ঘুম থেকে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায় পাশে গভীর নিদ্রামগ্ন পতিদেবতাকে দমাদম ঘুষি মারতে থাকেন।

স্বামী ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে জেগে উঠে মাথার বালিশটা বর্মের মতো ব্যবহার করে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করতে করতে আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল? আমাকে হঠাৎ মারছ কেন? আমি কী করলাম?' তখনও মারতে মারতে স্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কী করলাম? ন্যাকা আমার। বদমায়েসির আর জায়গা পাওনি।'

হতভম্ব স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কী বলছ? কী বদমায়েসি করলাম আমি?' স্বামীর এই সরল প্রশ্নে স্ত্রী এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'বদমায়েসি নয়? এই মাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম, তুমি লিলিকে নিয়ে সিনেমায় গেছ। তাকে আদর-টাদর করছ।'

অবাক হয়ে স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে লিলি? তার সঙ্গে আমি সিনেমায়?' ...ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্ত্রী বললেন, 'তুমি জানো না লিলি কে? লিলি হল সামনের বাড়ির নতুন বউটা। রোববার সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। লিলির সঙ্গে অত হেসে হেসে গল্প করলে, এখন বলছ কে লিলি?'

বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, নিরুত্তর স্বামীকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে স্ত্রী বললেন, 'আমি যদি আর কখনও স্বপ্নে লিলির সঙ্গে তোমাকে দেখি, চিরদিনের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যাব।'

স্বপ্নতত্ত্ব বড় কঠিন জিনিস। কেন এই সরলা মহিলা স্বপ্নে তাঁর স্বামীকে পাশের বাড়ির নতুন বউটির সঙ্গে দেখলেন, সে গভীর গবেষণার বিষয়।

শুধু এই সমস্ত জটিল স্বপ্ন নয়, আমাদের অনেক সুখস্বপ্ন, মধুর তন্দ্রার সর্বনাশ করে গেছেন মহামান্য সিগমুন্ড ফ্রয়েড গত শতকের শেষে এবং এই শতকের গোড়াতে। তারপরে তাঁর চেলাচামুণ্ডার হাতে ব্যাপারটা ভয়াবহ পরিণতি লাভ করেছে। ফ্রয়েডীয় মানুষের মনে কোনও কিছুই আর নিষ্পাপ নয়, কোনও ভাবনাই সহজ, সরল নয়। সব জটিল হয়ে গেছে। এমনকী স্বপ্নের মতো তরল জিনিসও। বহু যুগ আগে এক মহাকবি বলেছিলেন, স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম। আরও আগে, ঢের আগে সাহিত্যে স্বপ্নের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রামায়ণে রাজা দশরথ স্বপ্ন দেখেছেন, অশোককাননে সীতা স্বপ্ন দেখেছেন।

স্বপ্নের মধ্যে দেবতারা চিরকাল ধরে নিঃসঙ্গিনী, বিরহাতুরা রমণীদের দেখা দিয়েছেন, প্রয়োজন বোধে সঙ্গদান করেছেন। মায় রমণীরা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাঁদের গর্ভে ধারণ করেছেন স্বর্গীয় সন্তান।

এসব পুরনো কথা। স্বপ্নতত্ত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাপার। যে কোনও বড় পঞ্জিকায় ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে বেশ কয়েক পাতা ধরে স্বপ্নতত্ত্ব দেয়া থাকে। বটতলার বাইরে দোকানে স্বপ্নের বিষয়ে বই পাওয়া যায়। আর গবেষণাগ্রন্থের কোনও ভাষাতেই অভাব নেই। স্বপ্ন-বিজ্ঞানীরা এতকাল বলতেন যে স্বপ্নের নাকি কোনও রঙ নেই। সে শুধুই পুরনো দিনের সিনেমার মতো সাদাকালো। আমি নিজেও কখনও রঙিন স্বপ্ন দেখিনি, নিতান্তই সাদাকালো, আবছায়া।

কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, স্বপ্ন নাকি রঙিনও হতে পারে, স্বপ্নের মধ্যে নানা বর্ণের প্রতিফলন আসা অসম্ভব নয়। জানি না বিদেশি স্বপ্ন গবেষকরা কখনও ভারতীয় হিন্দি সিনেমা দেখেছেন কি না এবং তাদের রঙিন স্বপ্নের ধারণা বোম্বে সিনেমার স্বপ্নের দৃশ্য দেখে তৈরি হয়েছে কিনা। বলা বাহুল্য, রঙিন স্বপ্নের হলিউডি সিনেমারও একদা অভাব ছিল না। সে যা হোক, স্বপ্ন ও রমণী সংক্রান্ত শেষ আখ্যানটি লিখি। এ গল্পের নায়ক এক চুরচুর মাতাল, ধরা যাক, তার নাম তিনকড়ি দাস। গভীর রাতে টলমল করতে করতে বাড়ি ফিরছিলেন তিনকড়িবাবু। বাড়ির কাছেই রাস্তা থেকে তাঁর অতিশয় তরল অবস্থা দেখে পুলিশ তাঁকে ধরল।

তিনকড়িবাবু স্খলিত কণ্ঠে পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি কোনও অন্যায় করেননি, কাছেই তাঁর বাড়ি, তিনি বাড়ির কাছে রাস্তায় বায়ুসেবন করছেন। পুলিশ কি আর অত সহজে ছাড়ে?

তিনকড়িবাবু কোনও কথা সে বিশ্বাস করে না, শুধু বলে, 'থানায় চলো। তোমার বাড়ি এখানে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।' তিনকড়িবাবু তখন টলতে টলতে পুলিশকে নিয়ে নিজের বাড়ির সামনে এলেন, তারপর বাড়ির সদর দরজায় নেমপ্লেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'সেপাইজি, ওই যে দেখছেন নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে মি. তিনকড়ি দাস, ওই তিনকড়ি দাস হলাম আমি।' তারপর ডাকবাক্সে হাত দিয়ে কয়েকটা চিঠি বার করলেন। এবং বললেন, 'এই যে চিঠিগুলো সব তিনকড়ি দাসের নামে এসেছে, আমিই হলাম তিনকড়ি দাস।' তারপর তিনকড়ি দাস চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলে পুলিশকে সরাসরি শোবার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে গোলমেলে ব্যাপার, তিনকড়িবাবু স্ত্রীর পাশে কে এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, মুখে হাসির ছটা, বোধহয় স্বপ্ন দেখছে।

অদমিত তিনকড়িবাবু পুলিশকে বললেন, 'ওই যে মহিলা শুয়ে আছেন উনি হলেন আমার মানে তিনকড়ি দাসের স্ত্রী। আর ওঁর পাশে শুয়ে আছি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি হলাম আমি, এই তিনকড়ি দাস।'

এই অখাদ্য নিবন্ধ রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম। ইয়েটসের স্বপ্ন দিয়ে শেষ করি। এই স্বপ্নের মধ্যেও রমণী বিজড়িত। অনুবাদে কিছু স্বাধীনতা নিলাম। বিদুষী, বিদ্যাবতী পাঠিকার অনুমতি নিশ্চয় পাব। সামান্যই কয়েক পঙক্তি: কিন্তু আমি নিতান্ত গরিব। আমার আছে শুধু স্বপ্ন। আমি সেই স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছি তোমার পায়ের নীচে, প্রিয়তমা। প্রিয়তমা, তুমি একটু নরম করে হাঁটো, তোমার পায়ের নীচে আমার স্বপ্ন। তুমি আমার স্বপ্ন মাড়িয়ে দিয়ো না।

অবাঞ্ছিত আতিশয্য

আতিশয্য বিষয়ে দুটো প্রাচীন গ্রাম্য গল্প মনে পড়ছে। প্রথমে সে দুটো বলে নিই।

গল্পগুলো আজকের নয়, যেসব স্মৃতিমতী পাঠিকা এগুলো স্মরণ করতে পারবেন তাঁদের নিশ্চয় ঢের বয়েস হয়েছে, তাঁরা দয়া করে এবং নিজ গুণে এই অর্বাচীন হাস্যকর লেখককে ক্ষমা করে দেবেন।

গল্প দুটো প্রায় একই জাতের, সামান্য প্রকৃতিভেদ আছে। দুটো গল্পেই নব জামাতা শ্বশুরালয়ে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গী এক সেয়ানা বন্ধু।

প্রথম গল্পের জামাতা বাবাজীবনের একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস রয়েছে। তাঁর সেয়ানা সঙ্গীর দায়িত্ব হল রাশ টেনে রাখা। ঠিক হয়েছে জামাতা যদি অভ্যাসের দোষে শ্বশুরবাড়িতে বেফাঁস কিছু বাড়াবাড়ি বলে ফেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটি একটু কাশবেন বা গলাখাঁকারি দেবেন আর সেটা শোনামাত্র জামাতা তাঁর বক্তব্য অর্ধেক কমিয়ে ফেলবেন। জামাতা এবং তাঁর বন্ধু শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে বৈঠকখানা ঘরে এসে বসেছেন। শ্বশুরমশায় কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পরে জানতে চাইলেন পথে কোনও অসুবিধে হয়েছে কি না।

জামাতা বললেন, 'না তেমন কিছু হয়নি। তবে নৌকো করে নদী দিয়ে আসার সময় একটা প্রকাণ্ড কুমির দেখলাম।'

শ্বশুরমশায় বললেন, 'প্রকাণ্ড কুমির?'

জামাতা বললেন, 'সে প্রায় দুশো হাত লম্বা হবে।' শ্বশুরমশায়ের চোখ কপালে উঠল কুমিরের দৈর্ঘ্য শুনে। সেয়ানা বন্ধুটিও গলা খাঁকারি দিল।

জামাতা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করলেন, 'কুমিরটা যখন নৌকোর কাছে এল দেখে বুঝলাম দুশো না হলেও অন্তত একশো হাত হবে।'

এটাও অবিশ্বাস্য, সেয়ানা সুহৃদ আবার গলা খাঁকারি দিলেন, জামাতা তখন বেশ চিন্তা করে মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'নদীর মধ্যে আরেকটা নৌকোয় এক শিকারি ছিল সে বন্দুক দিয়ে গুলি করে কুমিরটা মেরে ফেলল। মরা কুমিরটা ডাঙায় ওঠানো হলে বুঝলাম হাত পঞ্চাশেক হবে।'

আবার গলা খাঁকারি, জামাতা বাবাজীবনের সংশোধন, 'ডাঙায় ওঠানোর পর ফিতে দিয়ে মেপে দেখা গেল ঠিক পঁচিশ হাত।'

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা রীতিমতো গোলমেলে হয়ে উঠেছে, শ্বশুরমশায় কেমন হতভম্ব হয়ে গেছেন সমস্ত ঘটনা শুনে, বন্ধুটির গলা খাঁকারি এবার তীব্রতর হল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই, জামাতা তাঁর বন্ধুটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আর কমাব কী করে। মাপা হয়ে গেছে, এরপর আর কমানো যাবে না।'

পরের কাহিনীটিতেও নব জামাতা আর তাঁর সেয়ানা বন্ধু শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। তবে এই গল্পে জামাতা নন তাঁর বন্ধুটিই অবাঞ্ছিত আতিশয্য দোষে পীড়িত।

শ্বশুর মহোদয় নব জামাতার সঙ্গে গল্পের ছলে নানা বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তবে কথাবার্তা প্রায় সবই চালাচ্ছেন বন্ধুবর। শ্বশুর প্রশ্ন করলেন, 'কালীঘাটের বাড়িটা তো তোমাদের নিজেদের?' বন্ধুটি বললেন, 'শুধু কালীঘাটের বাড়ির কথা বলছেন কী, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ,

টালিগঞ্জ, রাঁচি, মিহিজাম সব জায়গায় ওদের বাড়ি আছে।' শ্বশুরমশায় বললেন, 'তোমার এক কাকা বোধহয় দিল্লিতে থাকেন।'

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর বন্ধুটি বললেন, 'দিল্লি কী বলছেন, ওর আরেক কাকা থাকে বোম্বাইতে, দুই মামা আছে মস্কোতে, মেসো প্যারিসে, এক পিসেমশায় লন্ডনে, অন্য পিসেমশায় রামপুরহাটে।'

এই রকম ভালই চলছিল, কিন্তু এই সময় জামাই একটু হাঁচলেন, শ্বশুরমশায় বললেন, 'তোমার কি একটু সর্দিকাশি আছে?' বন্ধুটি বললেন, 'সর্দিকাশি কী বলছেন, ওর ছোটবেলা থেকে হুপিং কাশি, ওদের বাড়ির প্রত্যেকের শ্লেষ্মাকাশি, গুপোকাশি এমনকী যক্ষ্মাকাশিও পর্যন্ত রয়েছে।'

এরপর আর এই গল্প এগোতে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না।

জামাতা বাবাজীবন এবং তাঁর সেয়ানা সুহৃদের এই রদ্দি গল্পগুলি অত্যন্ত মোটা দাগের, কিন্তু এগুলির মধ্যে আসল সত্যটি নিহিত রয়েছে। সোজা কথা, কোনও কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু গোলমাল হবেই।

তা গোলমাল একটু হয় হোক। আমরা ইত্যবসরে আরও একটু গোলমেলে জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

বহুক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত আতিশয্য ব্যাপারটা ঘটে তোষামোদ বা খোশামোদ করতে গিয়ে। এই শব্দ দুটি সম্পর্কে এখানে সামান্য কিছু বলে রাখা ভাল। বাংলা ভাষায় তোষামোদ একটি আশ্চর্য শব্দ। তোষামোদ এবং খোশামোদ শব্দের অর্থ একই, স্তাবকতা, মনোরঞ্জন, চাটুবৃত্তি, মোসাহেবি ইত্যাদি। খোশামোদ শব্দটি প্রায় খাঁটি ফারসি শব্দ, মূল ফারসিতে শব্দটি হল, 'খুশ আমদ' মানে মনোরঞ্জন। তোষামোদ শব্দটি রচনা হয়েছে সংস্কৃত আর ফারসি মিলিয়ে। সংস্কৃত তুষ থেকে ফারসি খুশ-আমদ্ শব্দের দৃষ্টান্তে গঠিত। এ রকম শব্দ আমাদের ভাষায় খুব বেশি নেই।

সে যাই হোক, পণ্ডিতি করব না। গালগল্পে ফিরে যাই। তোষামোদের কথায় মহামহিম গোপাল ভাঁড় মহোদয়ের সেই বিখ্যাত গল্পটি স্মরণীয়।

রাজা তাঁর পারিষদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তাঁর মোসাহেব সবকটাতেই রাজাকে তাল দিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা প্রায় দৃষ্টিকটু (অথবা শ্রুতিকটু) পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আলোচনার বিষয় হল তরকারি। কথায় কথায় পটলের কথা উঠল। রাজা বললেন, 'পটল খুব ভাল তরকারি।' মোসাহেব সায় দিলেন 'ভাল মানে? খুব ভাল। ভাজা খান, সিদ্ধ খান, মাছে খান, নিরামিষ খান, সরষে বাটা খান, পটলের মতো তরকারি নেই, হুজুর।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু বড় তিতো।' মোসাহেব ঘাড় কাত করে সায় দিলেন, 'খুব তিতো, অতি বিদঘুটে।' রাজা বললেন, 'পটল মোটেই ভাল নয়। ভাল করে হজম হয় না।'

মোসাহেব বললেন, 'পটল মোটেই ভাল নয়। হজম করা খুব কঠিন। হাতি পর্যন্ত পটলের বিচি হজম করতে পারে না। পটল সাংঘাতিক জিনিস হুজুর।'

রাজা আর থাকতে পারলেন না। মোসাহেবকে বললেন, 'তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কখনও বলছ পটল খুব ভাল, কখনও বলছ পটল খুব খারাপ।' মোসাহেব হাত কচলিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হুজুর তা বলছি।' রাজা বললেন, 'তা হলে তোমার আসল কথাটা কী?' মোসাহেব আরও হাত কচলিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হুজুর, আমার কথাটা হল আমি তো আর পটলের গোলামি করি না, আমি আপনার গোলাম, আপনি যা বলেছেন আমি তাই বলেছি।'

স্বীকার করা উচিত এই মোসাহেবটি খুব উচ্চস্তরের নয়। স্তাবকতা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, সেটা প্রকট হয়ে গেলে, মোসাহেবি ধরা পড়ে গেলে চলবে না। তাতে সাহেব এবং মোসাহেব দু'জনেরই বেকায়দা।

মোসাহেব নিয়োগের কাহিনীটি বলি।

এক সাহেব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন মোসাহেব চেয়ে। অনেক লোক দরখাস্ত করেছে, সাক্ষাৎকার চলছে। সাহেব নিজেই তাঁর মোসাহেব বাছছেন। কিন্তু ঠিক মতো লোক পাওয়া

খুব কঠিন। অবশেষে অনেক জনের পরে এল আসল ব্যক্তি। সাহেব এবং ওই চাকুরি প্রার্থীর নিম্নোক্ত কথোপকথন থেকে এই আসল ব্যক্তিটিকে কিছুটা বোঝা যাবে।

সাহেব: তুমি কি মোসাহেবের কাজ পারবে?

ভাবী মোসাহেব: আমারো কেমন খটকা লাগছে, আমি কি মোসাহেবের কাজ পারব।

সাহেব: আমার মনে হচ্ছে তুমি পারলেও পারতে পারো।

ভাবী মোসাহেব: আমারও একেক সময় সাহস হচ্ছে, হয়তো পারলেও পারতে পারি।

সাহেব: কিন্তু পারবে কি?

ভাবী মোসাহেব: পারব কি?

সাহেব: মোসাহেবির কাজ খুব কঠিন।

ভাবী মোসাহেব: খুব কঠিন স্যার।

সাহেব: তবে চেষ্টা করলে হয়তো পেরে যাবে।

ভাবী মোসাহেব: চেষ্টা করলে পারব হয়তো।

সাহেব: তোমার তো বেশ এলেম আছে। মনে হচ্ছে ভাল ভাবেই পেরে যাবে।

ভাবী মোসাহেব: তা ঠিক স্যার। এখন মনে হচ্ছে খুব ভালই পারব।

সাহেব: কিন্তু শেষে যদি না পারো?

ভাবী মোসাহেব: সত্যি শেষে যদি না পারি আমিও খুব ভাবছি স্যার।

সাহেব: থামো, তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

ভাবী মোসাহেব: না স্যার, আমি আর ভাববো না।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যক্তিই মোসাহেবির কাজটা তখনই পেয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনে একজন অত্যন্ত সফল মোসাহেব হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

তবে অবাঞ্ছিত আতিশয্য অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিকটু বাড়াবাড়ি ব্যাপারটা শুধুই যে চাটুকারিতা এবং মোসাহেবির সঙ্গেই জড়িত এমন কথা বলা যাবে না।

অনেকের চরিত্রের মধ্যেই এই অসংগতি রয়েছে। এই রকম কারও বাড়িতে যান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে, 'আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার, গরিবের বাড়িতে আপনি আসবেন, এ তো ভাবাই যায় না, বসতে আজ্ঞা হোক', বলে চেয়ার ঠেলে বসিয়ে দিয়ে আপনাকে খালি ঘরে ফেলে সামনের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। আপনি বোকার মতো বসে থাকবেন তাঁর বাইরের ঘরে, এসেছিলেন এক মিনিটের এক প্রয়োজনে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে। গৃহকর্তা আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ফিরলেন হাতে এক চ্যাঙারি সিঙাড়া, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে, ঘরে ঢুকে দেখলেন আপনি দরদর করে ঘামছেন, তাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে কী লজ্জার কথা পাখাটা খুলে দিয়ে যাইনি।' বলে জোড়া হাতে পাখার সুইচটা অন করতে গিয়ে খাবারের চাঙারিটা হাত থেকে তিনি অবশ্যই ফেলে দেবেন। তিনি আবার ছুটবেন মোড়ের মাথায় গঙ্গারামে কিংবা সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে—

আপনি এই অবসরে অবশ্যই সরে পড়বেন কারণ আপনার হাতে আর অপেক্ষা করার মতো আধঘণ্টা সময় নেই। আর তা ছাড়া, ওই সন্দেশ রসগোল্লা, সিঙাড়া, কচুরি, ওগুলো সব আপনার পক্ষে বিষ, ডাক্তারের বারণ, আর ওসবের প্রতি আপনার তেমন রুচিও নেই। এরই রকমফের দেখা যায় সভা-সমিতিতে। যেখানে অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় শ্রোতাদের সঙ্গে অবিশ্বাস্য সমস্ত বিশেষণ এবং অলংকারে ভূষিত করে। স্পষ্ট মনে আছে, মফস্বলের এক সাহিত্যসভার শেষে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সভায় বলা হয়েছিল, 'ওঁর মতো মহাপ্রাণ বিশিষ্ট উজ্জ্বল পুরুষকে ক্ষুদ্র ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ছোট করতে চাই না।' এবং এর ঠিক পরের পঙ্‌ক্তি ছিল, 'এঁকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।' আরেক ধরনের আতিশয্য ঘটে মদ্যপানের আসরে। এমনিতে মাতালেরা মদ খেয়ে নানা রকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক হল কোনও কোনও মদ্যপ কিছুটা

পান করার পরে ঘরের কিংবা টেবিলের সকলকে পরের দিন সন্ধ্যায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসে। কেউ যদি সেই নিমন্ত্রণ এড়াতে চায়, তবে অব্যাহতি নেই। ভীষণ জোরাজোরি হবে নিমন্ত্রণ কর্তার তরফে, এমনকী কাঁদাকাটি, হাতে-পায়ে ধরা হবে নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্যে।

এইখানেই আসল বিপদ। কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সরল চিত্তে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং পরের দিন সন্ধ্যায় যদি ওই ব্যক্তির বাড়িতে যায় তাকে রীতিমতো জব্দ হতে হবে। নিমন্ত্রণ কর্তার বাড়ির লোকেরা বিস্মিত হবে তাকে দেখে কারণ সে বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা কিছুই বলেনি, এমনকী তার নিজেরই মনে নেই যে সে নিমন্ত্রণ করেছিল; সুতরাং যখন সে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করবে, 'আরে কী মনে করে', তখন দু'-চারটে বাজে কথা বলে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশেষে আতিশয্যহীনতার একটি চৈনিক উপাখ্যান দিয়ে দাঁড়ি টানি। এক কারখানা দেখতে গিয়েছেন জনৈক পর্যটক। চিনেদের একটি পারিবারিক সমাধিস্থলে গিয়ে দেখেন প্রত্যেকটি কবরের উপরে মৃতদের জন্যে ভূরিভোজ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহারি থালায়। দেখে পর্যটক খুব বিস্মিত হলেন। কিন্তু তিনি আরও বিস্মিত হলেন এরই মধ্যে একটি সমাধি দেখে যার উপরে থালায় মাত্র দুই কুচি শশা আর এক চিলতে লেবু দেওয়া রয়েছে। পর্যটক প্রশ্ন করলেন, 'প্রত্যেকের এত খাবার, এর এত কম কেন?' যে ব্যক্তি খাবার দিচ্ছিলেন তিনি বললেন, 'ওটা উং চুংয়ের কবর, মরার সময় উং চুং ডায়েটিং করছিল, তাই এই খাবার দেওয়া হয়। উং চুংকে বেশি খাবার দিলে শুধু শুধু নষ্ট হবে।'

অবাঞ্ছিত আতিশয্যের এখানেই ইতি।

যা দেবী সর্বভূতেষু

যা দেবী সর্বভূতেষু একটি চমৎকার শ্লোক, সর্বভূতেষুর পরে শক্তি, শান্তি, বিদ্যা যে-কোনও একটা দু' মাত্রার লাগসই শব্দ বসিয়ে দিলেই রোমাঞ্চকর মন্ত্রে পরিণত হয়,

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা,...
...যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেন সংস্থিতা,...

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নিপাতনে, আর্ষ প্রয়োগে বা প্যারোডিতে মেমরূপেন, শ্যালীরূপেন এমনকী গিন্নিরূপেন সংস্থিতাও শোনা গেছে।

অবশ্য দেবীপূজার পবিত্রমন্ত্র নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি করা রুচিসম্মত নয়।

বরং দুয়েকটা গুরুগম্ভীর কথা বলি।

দুর্গা খুব সুখের ব্যাপার নয়। বরং সংস্কৃত অর্থ ধরে আধুনিক বাঙালি কবির ভাষায় দুর্গাপূজার সময়টাকে 'সে বড় সুখের সময় নয়' বলা যায়।

সংস্কৃত থেকে অর্থ করলে বাংলায় দুর্গা শব্দের মানে দাঁড়ায় যাকে অতি দুঃখে পাওয়া যায়, যে দেবীকে পেতে কঠিন সাধনা করতে হয়।

দুর্গার স্বামীদেবতা শিবঠাকুরকে কত সহজে সন্তুষ্ট করা যায়, দুটো ধুতরোফুল, একটা কাঁচা বেল, ধান-দূর্বা আর ভগবান গোবিন্দ আরও সহজলভ্য, শুধু নাম জপলেই হয়ে যাবে বড়জোর উড়োখই গোবিন্দায় নমঃ।

দুর্গাঠাকুরের চাই অষ্টোপচার, ষোড়শোপচার, অষ্টোত্তর শত উপচার। পদ্মই তো চাই একশো আটটা। বেশ্যাবাড়ির দরজার মাটি চাই, যেখানে মানুষ তার সব পুণ্য বিসর্জন দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

ভাসমান সাদা মেঘ ও নীল আকাশ এবং তারও ঊর্ধ্বে আমাদের দৃষ্টির ওপরে দেব-দেবীদের জগৎ যার নাম স্বর্গ, সেই স্বর্গের দেবতারা শরৎকালে ঘুমিয়ে থাকেন। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ জয় করে সীতাকে উদ্ধারের জন্যে রাম ঠিক করলেন দুর্গাপূজা করবেন, দেবীর বর নেবেন।

সেটাও শরৎকাল, মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোনখানে, যেখানে নিঃসীম প্রান্তর শুভ্র কাশফুলে দোলায়িত, প্রাচীন আকাশের ছায়া ভাসা সাদা-নীল জলে থরে থরে উন্মোচিত এবং বিকচোন্মুখ লালকমল।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু সেটা পুজোর সময় নয়। দুর্গাপূজা হত বসন্তকালে এখন যে সময় বাসন্তীপুজো হয়। তবে লিখে রাখা ভাল যে বাংলাদেশের (পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই) প্রায় প্রতি মাসেই দুর্গাপূজার কোনও না কোনও রকম ব্যাপার আছে। জগদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, সর্বমঙ্গলা—সবাই, মহাদেবীর সবাই দুর্গাঠাকুরানী।

রামচন্দ্র শ্রীদুর্গার ঘুম ভাঙিয়ে অকালবোধন করলেন। কিন্তু দুর্গাদেবী তো মোটেই একা নন, কার্তিক আছেন, গণেশ আছেন, লক্ষ্মী আছেন, সরস্বতী আছেন এবং শুধু তাঁরা নন, তাঁদের বাহনেরা—হাঁস, ময়ূর, পেঁচা, ইঁদুর আছে। ঠাকুরানীর সিংহ আছে, অসুরের, তার নাম মহিষাসুর, তার মোষ আছে অথবা মোষের অসুর আছে, মোষের গলা কেটেই অসুর বেরচ্ছে।

এই এত সকলের ঘুম ভাঙিয়ে রামচন্দ্র অকালবোধন করলেন। তাতেও কম বাধা নাকি, আশ্বিনের ফুরফুরে বাতাসে, সোনালি রোদে দুর্গাঠাকরুণ পরিহাসপ্রবণা হয়ে উঠলেন।

বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে দিগ্বিদিক অন্বেষণ করে একশো আটটি রক্তপদ্মের জোগাড় করেছিলেন রামচন্দ্র। কিন্তু পুজোর সময় দেখা গেল একটা পদ্ম কম। দেবী স্বয়ং পরিহাস করে একটি পদ্ম লুকিয়ে ফেলেছেন।

অঞ্জলিদানের সময় যখন একশো সাতটি পদ্ম দেওয়ার পর একশো আটতম পদ্মটি রামচন্দ্র দেখতে পেলেন না তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন, দেবীকে সম্বোধন করে বললেন, 'মা, আমার একটি পদ্ম কম পড়েছে, তাই বলে তোমার আরাধনা অসম্পূর্ণ রাখব না। লোকে আমাকে কমললোচন বলে, আমি অস্ত্র দিয়ে আমার একটা চোখ উপড়িয়ে তোমার পদতলে অঞ্জলি দিচ্ছি। মা, তুমি গ্রহণ করো।'

দেবী দুর্গা তো নিষ্ঠুরা, নির্মমা নন, রামচন্দ্র নিজের কমললোচন উপড়িয়ে ফেলার আগেই রামচন্দ্রের হাত ধরে তিনি সেই লুকনো পদ্মটি ফেরত দিয়ে দিলেন।

এসব সত্ত্বেও বলি, শ্রীদুর্গা বৈদিক দেবতা নন। কোনও বেদেই তাঁর নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। শুধু নারায়ণ উপনিষদে এবং শুক্লযজুঃ সংহিতায় দেবী অর্থে দুর্গি শব্দ পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় অম্বিকা, সেও অবশ্য দুর্গাবাচক শব্দ।

পৃথিবীতে দুর্গাপূজার শুরু হয় সুরথ রাজার সময়ে। বিদর্ভ রাজ্যের নৃপতি ছিলেন শ্বেত রাজা। শ্বেত রাজা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্য দান করে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে বনে চলে যান। সেই সুরথ প্রথম পৃথিবীতে দুর্গাপূজা করেন।

তার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সুরথের রাজ্য শত্রুরা দখল করে নিয়েছিল। তখন মহর্ষি মেধস সুরথ রাজাকে উপদেশ দিলেন

নদীর তীরে মৃন্ময়ীদেবী অর্থাৎ মাটির প্রতিমা বানিয়ে তার আরাধনা করো। সেই আরাধনা করে মহারাজা সুরথ শুধুমাত্র হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন তা নয় জন্মজন্মান্তরেও দেবীকৃপায় ধন্য হয়েছিলেন।

মহারাজা সুরথ মরপৃথিবীর সামান্য মানুষ। তিনি মরপৃথিবীতে প্রথম শ্রীদুর্গার আরাধনা করেছিলেন।

কিন্তু তার আগে?

তার আগেও দুর্গাপূজা ছিল।

এমনকী দেবাদিদেব ব্রহ্মদেব মহাদেবী শ্রীদুর্গার আরাধনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসুর মধুকৈটভের অত্যাচারে দীর্ণ হয়ে ব্রহ্মা দুর্গার আরাধনা করেন।

দেবাদিদেব ইন্দ্র দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মীহীন অর্থাৎ একালের ভাষায় লক্ষ্মীর সঙ্গে সেপারেটেড হয়ে দুর্গাপূজা করে আবার লক্ষ্মীকে ফিরে পান। অর্থাৎ শ্রীদুর্গা হলেন দেবতাদের দেবতা। যেমন সাহিত্যে কোনও কোনও বড় লেখককে বলা হয় লেখকদের লেখক, তেমনই শ্রীদুর্গা হলেন দেবদেবীদের দেবী।

শাস্ত্রকথা অনেক হল। অতঃপর একালের পুজো নিয়ে একটা হালকা গল্প বলি। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় জল জমেছে। তবু পুজোর বাজার। দোকানে দোকানে ভিড়, হইচই। এমন সময়ে একই সঙ্গে ভিজে গলদঘর্ম হয়ে হন্তদন্ত এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন রাস্তার মোড়ের এক হোসিয়ারির দোকানে। তারপর দ্রুত নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলির মতো পরপর চারটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন দোকানদারের উদ্দেশে।

প্রশ্নগুলো হল, 'আমার গায়ে কত সাইজের গেঞ্জি হবে, হাতাওলা গেঞ্জি হবে কিনা, রাস্তার মোড়ে যে জল জমে আছে, সেটা কতটা গভীর এবং দাম কত?'

প্রশ্নগুলো একত্র পেয়ে দোকানদার ভদ্রলোকটির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আটত্রিশ ইঞ্চি, হাতাওলা গেঞ্জি হবে, হাঁটু পর্যন্ত, বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পুনশ্চ :

শুধুই মনোরঞ্জনের অজুহাতে অন্য একটি বকেয়া গল্পকে স্মরণ করি। যাঁরা গল্পটি ভুলে গিয়েছেন তাঁদের অবশ্যি কাহিনীটি এখনও ভাল লাগবে।

গল্পটি ছোট।

নববিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে স্বামী বের হয়েছে সারারাত সব মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখবার জন্যে। স্বামীর নাম সুরঞ্জন, তার চোখে এই বয়েসেই অতি হাইপাওয়ারের চশমা।

চশমা চোখে না থাকলে সুরঞ্জন প্রায় কিছুই দেখতে পারে না।

রাত দুটো নাগাদ স্বামী-স্ত্রী তেইশের পল্লী অতিক্রান্ত হয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে কালীঘাট দমকলের পাশে ফরোয়ার্ড ক্লাবের মণ্ডপে পৌঁছল।

মহানবমীর রাত। বৃষ্টি-বাদল নেই, আকাশ পরিষ্কার। রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক, মনে হয় না কলকাতার কিংবা আশপাশের কোনও এলাকার কোনও বাসায় আজ রাতে কোনও লোক আছে। সবাই হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে। জটলা, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি, মাঝে-মধ্যে একটু আধটু হাতাহাতিও হচ্ছে। শেষ পুজোর রাত, আজ আর পুলিশের তৈরি শক্ত বাঁশের ব্যারিকেড নেই। ভিড়ের ধাক্কা একেকবারে দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসছে, একেবারে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উঠে আসছে আবার এক মুহূর্ত থমকিয়ে উত্তর থেকে ফিরে দক্ষিণের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

এ রকমই একটি দক্ষিণমুখী ধাক্কার ঢেউয়ে আরোহণ করে সস্ত্রীক সুরঞ্জন ওই কালীঘাট দমকলের পাশে ফরোয়ার্ড ক্লাবের মণ্ডপের সামনে এসে পৌঁছল কিন্তু শেষ মুহূর্তে পেছনের একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কোনও রকমে সামান্য আহত হয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জন দেখে চোখের চশমা জোড়া

খুলে পড়ে গেছে এবং অনতিপরেই পায়ের কাছে মুচমুচ শব্দ শুনে বুঝতে পারল জনতার দ্বারা পদদলিত হয়ে চশমাটা চুরমার হয়ে গেল।

এরপর সব অন্ধকার।

গোলমালটা হয়েছিল শেষরাতে যখন সুরঞ্জন বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

সুরঞ্জনের বিধবা মা ঘুমচোখে দরজা খুলে দিয়ে হঠাৎ বউকে দেখে চমকিয়ে উঠে আরেকবার চোখ কচলিয়ে তারপর বললেন, 'ও সুরঞ্জন এ কে?'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার বউ। তোমার স্নেহের বউমা।'

সুরঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জনের মা বললেন, 'সুরঞ্জন তোর চশমা কী হল। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিস না।'

সুরঞ্জন বলল, 'ভিড়ের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে ভেঙে গেছে।'

সুরঞ্জনের মা বললেন, 'ওমা, তাই তো বলি, এ বউমা তো আমাদের বউমা নয়। নিজের বউ ফেলে এ পুজোর বাজারে কোন মণ্ডপ থেকে তুই কাদের বউ নিয়ে চলে এলি।'

মরণ রে

কবি বলেছিলেন,

> মরণ রে
> তুঁহু মম শ্যাম সমান।

এই কবিতা বাঙালি কবি মাত্রেই পাঠ করেছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার প্রথম কবিতাই এটা, এই বিখ্যাত কাব্যসংকলন আরম্ভই হয়েছে এই কবিতা দিয়ে, মরণ বন্দনা করে।

মরণ বন্দনা এক জিনিস আর মরণ নিয়ে রসিকতা করা অন্য জিনিস।

তবে মরণ নয় আমরা দুয়েকটি মরণোত্তর রসিকতা করব।

প্রথমেই কলকাতার বড়বাজারের ব্যবসায়ী বনমালী পালের কথা বলি। সম্প্রতি পালমশায় দেহত্যাগ করেছেন। জীবিতকালে নানা উপায়ে সাদা-কালো, খারাপ-ভাল বহু টাকা তিনি উপার্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না। মদ, পরস্ত্রী, বিলাস, ব্যসন, লাম্পট্যে টাকা ব্যয় করেছেন। কোনওদিন গরিব দুঃখী, আত্মীয়স্বজন প্রায় কাউকেই কোনও সাহায্য করেননি।

এখন তাঁর আত্মা স্বর্গের দুয়ারে এসে কড়া নাড়ছে। চিত্রগুপ্ত স্বর্গের দরজার ফাঁক দিয়ে পালমশায়কে একবার দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যে স্বর্গে ঢুকতে এসেছেন পৃথিবীতে অবস্থানকালে আপনি কী পুণ্যকাজ করেছেন যার জন্য স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন?'

পালমশায় বললেন, 'গত বছর মহালয়ার দিন একটা ভিখিরিকে দশ পয়সা দিয়েছিলুম আর আমার ভাগ্নের ক্যানসার হয়েছিল প্রায় বছর দশেক আগে, তখন তার মাকে মানে আমার দিদিকে পনেরোটা টাকা দিয়েছিলুম।

চিত্রগুপ্তের পিছনেই বসেছিলেন স্বয়ং যমরাজা। তিনি চিত্রগুপ্তকে আদেশ দিলেন রেকর্ড দেখতে। চিত্রগুপ্ত রেকর্ড দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, যা বলছে তা ঠিকই কিন্তু ওর রেকর্ড অতি স্বচ্ছ জীবনে এমন কোনও অপকর্ম নেই যা ও লোকটা করেনি।'

যমরাজা নিজেও রেকর্ডটা খুব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর চিত্রগুপ্তকে বললেন, 'তহবিল থেকে একে পনেরো টাকা দশ পয়সা দিয়ে দাও। আর ওকে নরকে যেতে বলো।'

আঠারো শতকের স্কটল্যান্ডের কবি রবার্ট বার্নস বলেছিলেন, 'হে মরণ, তুমি গরিব মানুষের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে ভাল।'

কবিরা মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতা করতে পারেন। সে অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু অতঃপর আমরা আরেকটি মরণোত্তর চরম ইয়ারকির গল্পে যাব।

ভবতারণবাবু গত মাসে মারা গিয়েছেন। যেমন সাধারণ বাঙালিরা হয় তিনিও যথেষ্ট পত্নীবৎসল ছিলেন। কঠিন অসুখে ভুগছিলেন ভবতারণবাবু, সেই যাকে ওযুগে টারমিনাল ডিজিজ (Terminal Disease) বলে।

ভবতারণবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তেশ্বরী ভবতারিণী দেবী। তাঁর দেব-দ্বিজে খুব ভক্তি। তার চেয়েও বড় কথা তিনি পরলোক, পুনর্জন্ম বেশ বিশ্বাস করেন।

মরণপূর্ব দিনগুলিতে ভবতারণ এবং ভবতারিণীর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল মৃত্যুর পরেও ভবতারণ এবং ভবতারিণী পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করবেন, অবশ্য যতটা সম্ভব ঠিক ততটাই।

ভবতারিণী প্ল্যানচেট আসক্তা ছিলেন। সোজা করে বোঝাতে গেলে প্ল্যানচেট ব্যাপারটা হল একটা অন্ধকার ঘরে একটা টেবিলের চারপাশে কয়েকজন বসে অশরীরী আত্মার আবাহন করা, যারা আবাহন করছে তাদের মধ্যে অন্তত একজন লোক যোগ্য মাধ্যম (Medium), যার মারফত পরলোকগত আত্মা আলাপচারিতায় ফিরে আসবে।

সেই সন্ধ্যার কথা বলছি। যে সন্ধ্যায় ভবতারিণী প্ল্যানচেট টেবিলে বসেছিলেন ভবতারণের আত্মার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। যথাকালে ভবতারণের আত্মা প্ল্যানচেটে এল। কিন্তু অতঃপর ভবতারণের আত্মা ভবতারিণীকে কী বলেছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত আছে, দুটো বক্তব্যই কথোপকথন আকারে নিবেদন করছি, অন্যথায় স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে না।

(এক)

ভবতারিণী : ওগো তুমি, তুমি কথা বলছ।

ভবতারণ : হ্যাঁ আমি, আমি কথা বলছি। তুমি কি বুঝতে পারছ না।

ভবতারিণী : বুঝতে পারছি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। ওগো, আবার তোমার সঙ্গে কোনওদিন কথা বলব এ কখনও ভাবিনি।

ভবতারণ : হুঁ।

ভবতারিণী : ওগো তুমি ভাল আছ? আমাকে ছেড়ে ভাল আছ?

ভবতারণ : খুব ভাল আছি। চমৎকার আছি।

ভবতারিণী (একটু দমে গিয়ে) : স্বর্গ খুব ভাল জায়গা, তাই না।

ভবতারণ : আমি স্বর্গে নেই, নরকে আছি।

(এ নাটিকার সারমর্ম হল এই যে ভবতারিণীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে নরকে থাকতেও ভবতারণের ভাল লাগছে, চমৎকার লাগছে।)

(দুই)

ভবতারিণী : ওগো তুমি, তুমি কথা বলছ।

ভবতারণ : হ্যাঁ আমি, আমি কথা বলছি। তুমি বুঝতে পারছ না।

ভবতারিণী : বুঝতে পারছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে...

(ভবতারিণীর কথা শেষ না করতে দিয়ে)

ভবতারণ : থামো তো একটু। সামনের ছাগলটা কী সুন্দর। একেবারে হরিণের মতো দেখতে। কী সুন্দর কালো চোখ।

ভবতারিণী : (বিস্মিত হয়ে) ছাগল।

ভবতারণ : হ্যাঁ ছাগল। সামনের মাঠে আবার আরেকটা ছাগল এসেছে। একেবারে সাদা ধবধবে, কী চমৎকার শিং, বোধহয় পেশোয়ারি ছাগল হবে।

ভবতারিণী : কী ছাগল, ছাগল করছ। মরে গিয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

ভবতারণ : মাথা খারাপ হবে কেন? তুমি কিছু বুঝতে পারছ না। আমি যে পাঁঠা হয়ে জন্মেছি, রামপাঁঠা।

(এই নাটিকার নিশ্চয় কোনও টিকা প্রয়োজন নেই।)

ধৈর্যের পরীক্ষা

যে কোনও স্কুলপাঠ্য রচনা বইয়ে ধৈর্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পাওয়া যাবে। সেখানে পাওয়া যাবে সেই রবার্ট ব্রুস না কী এক সাহেবের গল্প, যে ব্রুস সাহেব মাকড়সার জাল বোনা অনুধাবন করে গভীর ধৈর্য সহকারে বহুবার পরাজয়ের পর অবশেষে জয়লাভ করেন।

প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে, ধৈর্যহীন মানুষ তৈলহীন প্রদীপের মতো। এদিকে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন, 'যার ধৈর্য আছে তার সবই আছে, সে যা চায় সবই পাবে।'

'কোনও ক্ষত কি একদিনে শুকোয়? সে ধীরে ধীরে শুকোয়।' 'ওথেলো' নাটকে স্বয়ং শেক্সপিয়র বলেছিলেন, 'তার মতো দরিদ্র আর কেউ নেই যার ধৈর্য নেই।'

কোটেশন দিয়ে তাড়াতাড়ি করে রম্যরচনায় লাভ নেই। যথাসময়ে আবার না হয় কোটেশনে ফেরা যাবে। বরং ধৈর্যের প্রসঙ্গে সেই গাধার গল্পটায় আসি।

কলুর গাধার পুরনো গল্প। কলু বড় অত্যাচার করত গাধাটাকে, ভাল করে খেতে দিত না। মারধর করত। অন্যান্য জীবজন্তুর কাছে কলুর এহেন আচরণ নিয়ে গাধা খুবই দুঃখ করত।

একদিন পাশের বাড়ির গোরুর কাছে গাধাটি বলল, 'আজ সারাদিন কলু খেতে দেয়নি, তার ওপরে লাঠি দিয়ে নির্মম পিটিয়েছে।' গোরু বলল, 'তুমি পালিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

গাধা বলল, 'শুধু একটা আশায় ধৈর্য ধরে আছি।' 'আশাটা কী?' গোরু জিজ্ঞাসা করায় গাধা

গাধা দাঁড়িয়ে বলল, 'কলুর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। খুব সুন্দরী মেয়ে সে। সেই জন্য ধৈর্য ধরে আছি।

'ধৈর্য ধরে আছ, তা বেশ।' গোরু বলল, 'কী করে বুঝলে কলু তার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবে?' গাধা বলল, 'কলু যখন তার মেয়েকে পেটায় সে বারবার বলে ওই গাধার সঙ্গে তোর আমি বিয়ে দেব।'

ধৈর্য মানে অপেক্ষা করবার, সহ্য করবার ক্ষমতা। অভিধান এককথায় বলছে সহিষ্ণুতা। আর কবি বলেছিলেন, যত দিক থেকে যত বাধা, যত বিপত্তিই আসুক,

'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো বাঁধো বাঁধো বুক।'

আমার মতো চঞ্চল লোকের পক্ষে ধৈর্য সম্পর্কে লিখতে বসাই ভুল হয়েছে। এমন লোক অনেক আছেন যাঁরা কিছুতেই ধৈর্য হারান না, আবার ঠিক উলটো দিকে এমন লোক অনেক আছেন যাঁরা সহজেই সব কিছুতেই ধৈর্য হারান।

আমি নিশ্চয়ই ওই দ্বিতীয় দলে পড়ি। তবু ধৈর্য সম্পর্কে যখন লিখতে বসেছি ধৈর্য ধরে লিখতেই হবে। আবার যেহেতু এটা হালকা লেখা, নিতান্তই রম্যরচনা, গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ তোলাও অনুচিত হবে। আর একটা তরল কাহিনী দিয়ে তাই ধৈর্য ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি।

*

ঘটনাটা ঘটেছিল মফস্বলের এক স্ট্যান্ডে। কয়েকটা বাসের রুট এখানেই শেষ। এই পর্যন্ত সব গাড়ি এসে তারপর গাড়ি ফিরে যায় বিভিন্ন শহরে।

একদিন সকালবেলা পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম থেকে সৌদামিনী দেবী নাম্নী এক ভদ্রমহিলা রিকশায় করে সেই বাসস্ট্যান্ডে এলেন। তিনি কলকাতায় কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন, তাঁর নাতির খুব জ্বর হয়েছিল একেবারে যমে-মানুষে, যমদূতে-বৈদ্যে টানাটানি। সৌদামিনী দেবী সে সময় তাঁর নাতির আরোগ্যের জন্য কালীঘাটের কালীমায়ের কাছে পুজো মানত করেছিলেন মনে মনে গোপনে, আজ কয়েকদিন হল মা কালীর আশীর্বাদে নাতিটির জ্বর ছেড়েছে, সে সুস্থ হয়েছে।

মা কালীর কাছে মানত করে মানত রক্ষা না করলে মহাপাপ, পরের জন্মে কালীঘাটের রাস্তায় কুকুর হয়ে জন্মাতে হয়। সুতরাং নাতিটি সুস্থ হওয়ামাত্রই সৌদামিনী দেবী বাড়ির এবং তারপরে পাড়ার অনেককে অনুরোধ করেছেন তাঁকে কলকাতায় কালীঘাটে নিয়ে যেতে, কিন্তু কেউই তাঁকে সময় দিয়ে উঠতে পারেনি।

অবশেষে আজ সৌদামিনী দেবী নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন একা একাই কালীঘাট যাবেন বলে।

এ আর কঠিন কী?

সৌদামিনী দেবী আজ পর্যন্ত কতবার যে কালীঘাট গিয়েছেন তার হিসেব নেই। আগে তবু অসুবিধা ছিল, পাতাল রেল হওয়ার পরে এখন একেবারে যাতায়াতটা জলের মতো হয়ে গেছে। পিতামহী হলে কী হবে সৌদামিনী দেবী রীতিমতো শক্ত সমর্থ, ডাকসাইটে মহিলা।

তিনি জানেন শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে এক বাসে ধর্মতলায় পৌঁছাবেন। সেখানে যে কাউকে বললেন পাতাল রেলের সিঁড়ি দেখিয়ে দেবে এবং তারপরে পাতাল রেলে চড়ে ঠিক দশ মিনিটে কালীঘাট। ফিরবেনও সেই একইভাবে।

নিজেই সাহস করে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা করে বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছেছেন।

বাসস্ট্যান্ডের মুখেই দু'জন পুলিশ ডিউটি করে। সৌদামিনী দেবী তাঁদের কাছে রিকশাটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন, তারপর রিকশা থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, কলকাতা যাওয়ার বাস কোনটা? একেবারে ধর্মতলা পর্যন্ত যাবে?'

পুলিশ দু'জনের একজন বলল, 'বুড়িমা আপনি ওই সব থেকে পেছনে অশ্বত্থ গাছটার নীচে চলে যান, ওখান থেকে আটাত্তর নম্বর বাস ছাড়বে। সে বাস আপনাকে সোজা কলকাতায় ধর্মতলা পর্যন্ত নিয়ে যাবে।'

অশ্বত্থতলায় গিয়ে বুড়িমা রিকশা ছেড়ে দিয়ে বাসের জন্যে দাঁড়ালেন।

বুড়িমা বলা ঠিক হল না, পুলিশেরা বুড়িমা বললেও আমরা তাঁকে সৌদামিনী দেবীই বলব।

সে যা হোক, সৌদামিনী দেবী বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছেছেন ভর সকালে, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল' ঠিক তার দু'দণ্ডের মাথায়।

অতঃপর আরও বহু দণ্ড কেটে গেছে। মোড়ের সেপাইদের ডিউটি বদলের সময় হয়েছে। বেলা দুপুর।

যে সেপাইটি আটাত্তর নম্বর বাসের কথা বুড়িমা অর্থাৎ সৌদামিনী দেবীকে বলেছিলেন তিনি বিনিভাড়ায় একটা রিকশায় চড়ে বাড়ির পানে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলেন সৌদামিনী দেবী অশ্বত্থতলায় তখনও দাঁড়িয়ে। ঘন রোদ্দুরের মধ্যে ভাদ্রের অভিষেক আবহাওয়ায় বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অনতিবৃদ্ধা সৌদামিনী দেবী দরদর করে ঘামছেন।

সেপাই বাবাজি রিকশা থেকে নেমে এগিয়ে এলেন, 'বুড়িমা আপনি এখনও দাঁড়িয়ে।'

সৌদামিনী দেবী মানে বুড়িমা হেসে বললেন, 'বাহাত্তুরটা বাস ছেড়ে দিয়েছি, আর মাত্র ছয়টা বাস পরেই আমার বাস, তুমিই বলেছিলে। আটাত্তুর নম্বর, সেই আটাত্তুরের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। সরাসরি ধর্মতলায় পাতাল রেলের পাশে নামতে হবে তো?'

স্তম্ভিত সেপাই বুড়িমায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আটাত্তর নম্বর বাস কথাটার এই রকম একটা মানে হতে পারে সে তা ভাবেনি।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, 'একজন মানুষ দিনের পর দিন তার ফলের গাছটিকে দেখে, কখনও অধৈর্য হয়ে পড়ে, কবে ফল আসবে, কবে ফল পাকবে সেই আশায়।' সে চেষ্টা করুক এই ফল আসা, ফল পাকার পদ্ধতিকে দ্রুততর করতে, সে বৃক্ষ এবং ফল দুইয়েরই ক্ষতি করবে। কিন্তু সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুক যথা সময়ে সুপক্ক ফলটি তার কোঁচায় এসে পড়বে।'

খুব দামি কথা এবং গোছানো কথা। ধৈর্য সম্পর্কে বেঞ্জামিন ডিজরেলি যা বলেছিলেন, সেও প্রায় একইরকম তবে ডিজরেলির বক্তব্যে কিঞ্চিৎ কাব্যসুষমা ছিল।

ডিজরেলি বলেছিলেন, 'যখন গাছ মুকুলে ছেয়ে গেছে তখন ফল পাওয়া যাবে না, ফল পাওয়ার জন্যে মুকুলের শোভা উপভোগ করতে করতে অপেক্ষা করতে হবে।'

*

এসব তাত্ত্বিক কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই।

ধৈর্য বিষয়ে ঐতিহাসিক গল্পটিতে যাই। গল্পটি বিলিতি, তবে বাংলা ভাষায় মহামহিম শিবরাম চক্রবর্তী সমেত আরও কেউ কেউ গল্পটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছেন।

এক বাস কন্ডাক্টরের গালে এক ভদ্রমহিলা, ওই বাসেরই যাত্রিনী একটা চড় মেরেছিলেন। তাই নিয়ে হইচই গণ্ডগোল, পুলিশ, অবশেষে আদালত।

আদালতে কাঠগড়ায় ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে, বিচারক মহোদয় প্রশ্ন করছেন, 'আপনি হঠাৎ বিনা কারণে বাস কন্ডাক্টরকে চড় মারতে গেলেন কেন?'

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'বিনা কারণে নয়। আমি সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

বিচারক মহোদয় অতঃপর স্বভাবতই জানতে চাইলেন, 'বাসের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ কী করে এমন ধৈর্যহারা হয়ে গেলেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কন্ডাক্টরটি তিন-তিনবার আমার সিটের দিকে আসে, আমি ভাবি ভাড়া নিতে এসেছে, কিন্তু তিনবারই ভাড়া না নিয়ে ফিরে যায়।'

বিচারক মহোদয় বললেন, 'আশ্চর্য! এই সামান্যতেই আপনি ধৈর্য হারিয়ে কন্ডাক্টরকে চড় করলেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'খুব সামান্য নয় ব্যাপারটা, একটু ভাল করে শুনুন।'

'একটা কাপড়ের ছোট বটুয়ার মধ্যে আমি খুচরো পয়সা, কয়েন এইসব আলাদা করে রাখি ট্রাম-বাস ভাড়া, মুচির চটি সেলাই, মিঠেপান এইসব টুকটাক খরচের জন্যে।'

'এই ছোট বটুয়াটা থাকে আমার চামড়ার হাতব্যাগের মধ্যে। আমার চামড়ার হাতব্যাগটায় এবং তার মধ্যে ভেতরের খোপটায় চেন লাগানো। পয়সার বটুয়াটা ওই চেন লাগানো খোপটার মধ্যে রাখি।'

'এদিকে চামড়ার হাতব্যাগ হাতে করে কলকাতার ট্রামে-বাসের ভিড়ে যাতায়াত কঠিন। তাই আমি একটা শান্তিনিকেতনী হ্যান্ডলুমের ঝোলা, সেটা আবার খুব শক্তসমর্থ, রাস্তাঘাটে পকেটমার যাতে হাত গলাতে না পারে তাই শক্ত চেন টানা, সেই সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্টে বোতাম লাগানো, সেই ঝোলায় হাতব্যাগটা ভরে ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তাঘাটে বেরই।'

ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'এসব কথার মানে কী? এর সঙ্গে এই মামলার সম্পর্ক কী?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরুন, প্রায় সেরে এনেছি, এখুনি বুঝতে পারবেন মামলার ব্যাপারটা।'

এরপর একটু গলা খাঁকাড়ি দিয়ে কণ্ঠ সাফ করে ভদ্রমহিলা আবার শুরু করলেন, 'প্রথমবার যখন দেখলাম কন্ডাক্টর আমার সিটের দিকে আসছেন, আমি কাঁধ থেকে শান্তিনিকেতনী ঝোলা নামালাম, চেন টানলাম। বোতাম খুললাম। তারপর ভেতর থেকে চামড়ার হাতব্যাগ বার করলাম। চামড়ার হাতব্যাগ বার করে শান্তিনিকেতনী ঝোলার বোতাম আটকালাম, চেন টেনে দিলাম। ঝোলা বন্ধ করে কাঁধে রাখলাম। তারপর চামড়ার হাতব্যাগটা খুললাম তার ভেতরের খোপটায় চেন লাগানো, সেই চেন খুললাম। খুচরো পয়সার কাপড়ের বটুয়াটা বার করলাম। তারপর চামড়ার হাতব্যাগের ভেতরের খোপের চেনটা বন্ধ করলাম। তারপর চামড়ার হাতব্যাগটা বুজিয়ে শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে এবং চেনটা, বোতামগুলো খুললাম। এবার চামড়ার হাতব্যাগটা শান্তিনিকেতনী ঝোলায় ঢুকিয়ে ঝোলার চেন, বোতাম বন্ধ করলাম। তারপর ঝোলাটা আবার কাঁধে নিলাম। তখন হাতের কাপড়ের বটুয়ার দড়ির গিঁটটা খুললাম, খুলে আমার ভাড়া সত্তর পয়সা বার করে কাপড়ের বটুয়াটা বন্ধ করলাম।

'এবার কাঁধ থেকে শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা নামালাম...'

ধৈর্যহারা জজসাহেব বাধা দিলেন, 'আপনি আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখনই মাথা খারাপের কী হয়েছে, এখনও প্রথম কিস্তি হয়নি। আর একটু শুনুন।'

জজসাহেব বললেন, 'আর কী শুনব? এরপরে আপনি শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামাবেন তার মধ্যের চামড়ার ব্যাগটা বার করবেন।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি করবেন না। শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামালেই চলবে না, তার চেন খুলতে হবে, বোতাম খুলতে হবে। চামড়ার ব্যাগ বার করে তার চেন বন্ধ করতে হবে, বোতাম বন্ধ করতে হবে। চামড়ার ব্যাগ খুলে তার ভেতরের খোপের চেন খুলতে হবে সেখানে খুচরো পয়সার বটুয়াটা রাখতে হবে, ভেতরের খোপের চেন বন্ধ করতে হবে।'

জজসাহেব ততক্ষণে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'অসম্ভব।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখনই অসম্ভবের কী হয়েছে, অপেক্ষা করুন। সেই পয়সার বটুয়াটা ভাড়া

বার করে তারপর বন্ধ করে শান্তিনিকেতনী ঝোলায় ভরতে যাব দেখি কন্ডাক্টর আমার পর্যন্ত না এসে আবার সামনের দিকে ফিরে গেছেন। পয়সা হাতে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব? আবার চামড়ার ব্যাগের মধ্যের খোপ খুললাম।'

জজসাহেব তখন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, কপালের চুল ছিঁড়ছেন, মুখে বলছেন, 'আমি আর পারছি না। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। কাউকে থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছে করছে।' মৃদু হেসে মহিলা বললেন, 'তা হলে? এখনও তো প্রথম দফার অর্ধেক হয়নি। এ রকম তিন দফার পরে আমি চড় মেরেছিলাম।'

বহুকাল আগে 'সচিত্র ভারত' সাহিত্য পত্রিকায় অবিস্মরণীয় প্রমথ সমাদ্দারের একটি কার্টুন দেখেছিলাম। অন্য সূত্রে এই অসামান্য কার্টুনটির উল্লেখ আমি আগেও করেছি।

এবার ধৈর্যের সূত্রে যাই।

একটি ক্ষৌরকর্মশালায় ক্ষৌরকার মহোদয় সযত্নে চুল কাটছেন। আর ঠিক তাঁর পায়ের কাছে নিঃশব্দে, ধৈর্য ধরে একটি বিরাট কুকুর খুব মনোযোগ সহকারে প্রভুর কেশকর্তন দেখছে।

আজকের খদ্দেরটি নতুন। তিনি কেশচর্চায় কুকুরটির এই অভিনিবেশ দেখে ক্ষৌরকারকে বললেন, 'দাদা আপনার কুকুরটি কিন্তু খুব শিক্ষিত। কীরকম চুপচাপ বসে, কোনও গোলমাল না করে আপনার চুল কাটা দেখে যাচ্ছে।'

ক্ষৌরকার বললেন, 'শিক্ষিত না ছাই! ও একটা লোভী, অতি লোভী কুকুর।'

সরল প্রকৃতির খদ্দের বললেন, 'লোভ? লোভ আবার কী? চুলকাটা দেখার মধ্যে লোভের কী আছে?'

মৃদু হেসে ক্ষৌরকার বললেন, 'আমি আবার একটু অন্যমনস্ক কি না, অনেক সময় চুল কাটতে কাটতে কাস্টমারদের ঘাড়ের মাংস, কানের লতি এই সব হঠাৎ কেটে ফেলে বসি। ও আবার কাঁচা মাংস খুব ভালবাসে। তাই ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে।'

*

ঈশপের উপকথায় শেয়াল প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল, প্রচুর অধ্যবসায় দেখিয়েছিল। কিন্তু আখেরে তার লাভ হয়নি অবশেষে সে আঙুরফলের নামে অপবাদ দিয়ে 'আঙুরফল টক' নামক সেই বিখ্যাত মন্তব্যটি করে চলে যায়।

রুশো বলেছিলেন, 'ধৈর্য ধরে থাকা একটা খুবই তিক্ততার ব্যাপার, কিন্তু এর ফল খুব মধুর।'

ঈশপের শেয়ালের ক্ষেত্রে ফল মধুর হয়নি, ফল টক হয়েছিল।

আর ওই সেলুনের কুকুর, সে নিশ্চয় দু'-একটা ছিঁটেফোঁটা মাংস কখনও-সখনও পেয়ে যায় তাই অমন ভক্তের মতো বসে আছে।

এবং শুধু ওই কার্টুনের কুকুরটি নয় সামান্য একটু ছিঁটেফোঁটার জন্যে ভক্তের মতো ধৈর্য ধরে কত মানুষ কত জায়গায় অপেক্ষা করছে।

পুনশ্চঃ

গত শতকের গল্প। উত্তর কলকাতায় এক বনেদিবাড়ির বড়বাবু কিছুদিন বিগতদার হয়েছেন। তাঁর দেখভাল করে এক মধ্য বয়সিনী দেহবতী পরিচারিকা যার নাম ধৈর্য। কালোকেলো, ঢলোমলো।

শূন্য বিছানায় সারারাত বড়বাবুর ঘুম হয় না। ধৈর্য রাতে এসে জানলা দিয়ে বারবার তাঁকে দেখে

একদিন ঘুমের চোখে জানলা দিয়ে ধৈর্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়বাবু বললেন, 'তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি ধৈর্য।'

বড়বাবু বললেন, 'আমিও ধৈর্য।'

ভুল (১)

এবার একটু গতানুগতিকভাবে আরম্ভ করি, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা যেভাবে পরীক্ষার খাতায় প্রবন্ধ শুরু করে ঠিক সেইভাবে একটা ইংরেজি প্রবাদবাক্য দিয়ে।

প্রবাদবাক্যটি বিখ্যাত এবং ইংরেজি জানা লোকমাত্রেরই পরিচিত, To err is human. অর্থাৎ মানুষ ভুল করে।

তবে অনেকেই হয়তো জানেন না এটি একটি বাক্যের অর্ধাংশ, এর পরের অংশ হল, to forgive divine. সম্পূর্ণ বাক্যটি হল, To err is human, to forgive divine, প্রায় তিনশো বছর আগের এই বাক্যবন্ধ। রচনাকার মহামতি আলেকজান্ডার পোপ।

এরও বহু-বহুকাল আগে চিনদেশীয় দার্শনিক ও পণ্ডিত কনফুসিয়াস এই বলে মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, "ভুল করার মধ্যে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই।'

আসলে আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি সে জিনিসটা হল, কোনও কিছু ভুল করার পরে বুঝে ফেলা যে এই ভুলটা এর আগেও একবার আমি করেছিলাম।

আরেকজনের কথা মনে পড়ছে কিন্তু তাঁর নাম মনে পড়ছে না যিনি বলেছিলেন, মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল হল সেইটা যে ভুল থেকে সে কিছু শেখে না। এই কথাই আবার অন্যত্র অন্যভাবে পেয়েছি, সেখানে বলা হয়েছে, যে কখনও ভুল করে না সে কখনও কিছু শেখে না এবং যে কখনও ভুল করে না সে কখনও কিছু করেও না, আর কিছু না-করাটাই সবচেয়ে বড় ভুল।

লিখতে বসেছি রম্য নিবন্ধ। পাঠিকা শ্রীমতীর তাই ফরমাশ, কিন্তু ওপরের দুই অনুচ্ছেদ রীতিমতো শব্দধাঁধা বা ক্রশওয়ার্ড পাজল হয়ে গেল।

সুতরাং এবার তা হলে গল্প।

ঘটনাটির আমি প্রত্যক্ষদর্শী। রেলগাড়ির কামরায় দেখেছিলাম।

দূরপাল্লার দ্বিতীয় শ্রেণির স্লিপার কোচ। একটি ভদ্রমহিলা দুটি দুর্দান্ত বালককে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই বালকদুটির অত্যাচারে ও চাঞ্চল্যে কামরাসুদ্ধ লোক তটস্থ। এর জিনিস ছুড়ছে, ওর জিনিস ঘাঁটছে। কুঁজোর জল ঢেলে দিচ্ছে, লোকের হাতের বই ধরে টানাটানি করছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে তিতিবিরক্ত হয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দুর্দান্ত বালকদুটির অভিভাবিকাকে প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়া, এইমাত্র যে ছেলেটি লাথি মেরে আমার জুতোজোড়া বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে তার থেকে একটা মোজা বার করে ফুঁ দিয়ে বেলুনের মতো ফোলানোর চেষ্টা করছে, সেটি কি আপনার ছেলে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না, ও আমার ছেলে নয়, আপনি ভুল করেছেন। ও আমার বোনপো, আমার বড় বোনের ছেলে। এখন যে-ছেলেটি সামনের বাঁদিকের জানলা দিয়ে আপনার ছাতা ফেলে দিচ্ছে, সে হল আমার ছেলে।'

ভদ্রলোকের ভুলটা নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক নয়। কিন্তু এবার এক ভদ্রমহিলার মারাত্মক ভুলের একটা বহুদিনের পুরনো কাহিনী স্মরণ করি।

ঠিক কাহিনী নয়, কাহিনী-নাটিকা।

স্থান : আদালতের বিচারকক্ষ।

বিচারক বসে আছেন। উকিল, মুহুরি, পেয়াদা, পেশকাররা রয়েছেন যেমন থাকেন আদালতে। বাঁদিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এক জাঁদরেল মহিলা ডানদিকে আসামির কাঠগড়ায় এক প্রচণ্ড প্রহৃত ব্যক্তি, তার নাক ফাটা, চোখের কোণে কালশিটে, ফোলা ঠোঁটে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে।

বিচারক : (সাক্ষী মহোদয়ার উদ্দেশে) দেখুন মহাশয়া, আপনার সাহস দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত বোধ করছি। এমন একজন কুখ্যাত সিঁদেল চোর। তাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ধরে ফেললেন। এমন পেটানো পেটালেন।

আসামির কাঠগড়ায় চোর : (গোঙাতে গোঙাতে) হুজুর উনি মেরে আমার হাত গুঁড়ো করে দিয়েছেন, জান কয়লা করে দিয়েছেন।

বিচারক : (আসামির দিকে মুখ করে) চুপ। (সাক্ষীর দিকে মুখ করে) সত্যি ধন্য আপনার সাহস, ধন্য আপনার শক্তি।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় ভদ্রমহিলা : (বিনীতভাবে) না হুজুর, এটা শক্তি বা সাহসের ব্যাপার নয়। অন্ধকারে আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভুল করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার স্বামী বুঝি দেরি করে বাড়ি ফিরল।

অতঃপর একটা রমণীয় ভুলের গল্প বলি।

এক বড় কোম্পানির বাৎসরিক পিকনিক হচ্ছে গঙ্গার ধারের এক বাগানবাড়িতে। বছরের এই একটা দিন, এই উৎসবে কোম্পানির বড়সাহেব থেকে সদ্যনিযুক্ত কনিষ্ঠ কেরানি সবাই একত্র হয়। অনেকেই সপরিবারে আসেন।

এই বনভোজনে এক সুরূপা, সুবেশ ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুব আলাপ হল এক অল্পবয়সি কেরানির।

ভদ্রমহিলাকে অনেক কথা বলতে বলতে অবশেষে সে বলল, 'ওই যে ওখানে দেখছেন মোটা মতো হুমদো একটা লোক পিছন ফিরে চুরুট টানছে, ও হল আমাদের বড়সাহেব, ওর মতো বজ্জাত, শয়তান লোক আর এই ভূভারতে নেই।'

ভদ্রমহিলা এই কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন আমি কে?'

চমকিত হয়ে কেরানিটি বলল, 'না। তা তো জানি না। আমি কি কোনও ভুল করলাম?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি খুব বড় ভুল করেছেন। আমি ওই বড় সাহেবের স্ত্রী।'

সন্ত্রস্ত হয়ে কেরানিটি এবার প্রশ্ন করল, 'আপনি কি জানেন আমি কে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, একটু অবাক হয়েই বললেন, 'না, তা তো জানি না।'

কেরানিটি তখন বলল, 'যাক, তা হলে খুব বেঁচে গেছি। এবার তবে পালাই।' এই বলে সে অতি দ্রুত পিকনিকের আসর পরিত্যাগ করল, যাতে বড়সাহেব জানতে না পারে যে সে কে?

অতঃপর আর একটিমাত্র ভুলের আখ্যান আপাতত বাকি আছে। সেটা একটা খুব সাধারণ ভুলের গল্প, যা আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই ঘটে।

রমেশবাবু পাড়ার ইলেকট্রিকের দোকানে গিয়ে জানিয়ে এলেন যে তাঁর বাড়ির কলিংবেল খারাপ হয়েছে। সারানোর জন্যে কোনও মিস্ত্রি যেন পাঠানো হয়।

দু'দিন চলে গেল, তবু কোনও মিস্ত্রি এল না দেখে রমেশবাবু আবার সেই ইলেকট্রিকের দোকানে গেলেন, গিয়ে বললেন, 'কই, আপনার কোনও মিস্ত্রি তো দু'দিনের মধ্যে গেল না।'

দোকানদার বললেন, 'দু'দিন অন্তত চারবার আমার লোক আপনার বাড়ি থেকে কারো সাড়া না পেয়ে ফিরে এসেছে।'

রমেশবাবু অবাক, বাসায় তো সব সময়েই কেউ-না-কেউ ছিল। ফিরে আসার তো কথা নয়। দোকানদারকে এ কথা বলতে তিনি সেই মিস্ত্রিকে ডাকলেন। মিস্ত্রি এসে বলল যে, শুধু কাল-পরশু চারবার নয়, আজ সকালেও সে একবার গিয়ে ফিরে এসেছে। কলিংবেল টিপে টিপে তার দু'হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কেউ দরজা খোলেনি।

গল্পের গোরু

একবার এক নদীতে আগুন লেগেছিল। খুব আগুন। আগুন লেগে নদী দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। নদীর তীরে ছিল অনেক বড় বড় গাছ। আগুনের তীব্র আঁচ সইতে না পেরে অবশেষে সেই নদীর মাছগুলো প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠে পড়ে।

গুলিখোরদের আড্ডায় সেদিন সন্ধ্যায়ও জোর গল্প-গুজব চলছিল। বলা বাহুল্য, গল্পের চেয়ে গুজবই বেশি। সেখানেই এক নম্বর গুলিখোর এই গল্পটা বলেছিল।

কিন্তু অন্য যে কোনও আড্ডার মতোই গুলিখোরদের আড্ডাতেও এত সহজে গল্প বলে কেউ পার পায় না। তুমুল প্রতিবাদ উঠল অন্যান্য গুলিখোরদের, তারা বলল, 'এ হতেই পারে না।' গুলিখোর এর প্রতিবাদে যে কথাটা বলেছিল সেটা সবাই মেনে নিল।

দু'নম্বর গুলিখোরের অবশ্য সেদিন নেশা বেশি হয়েছিল। সে প্রায় গুম হয়েই বসেছিল, সে বিশেষ কিছুই বলেনি। দীর্ঘ একটা হাই তুলে দীর্ঘতর একটা তুড়ি মেরে সে সামান্য একটা প্রশ্ন করেছিল, 'মাছ কি গোরু যে গাছে উঠবে?'

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। সেই থেকে এবং তারও বহু আগে থেকে গল্পের গোরুরা গাছে উঠছে। অবশ্য তারও আগে নদীতে আগুন লাগছে।

রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর আর ঠাকুমার ঝুলির ভিতর দিয়ে সে গোরু প্রবেশ করেছে ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতীর গল্পে, পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবায়। আদি ও অকৃত্রিম শিবরাম চক্রবর্তী গল্পের গোরুকে বরাবরই গাছে উঠিয়েছেন এবং নামিয়েছেন।

গল্পের গোরুর কাহিনীটা প্রথম গোপাল ভাঁড়ের বইতেই দেখেছিলাম, তারপর এর নানারকম পাঠান্তর দেখেছি।

গোপাল ভাঁড়ের সহজলভ্য বইগুলোতে এখনও এ জাতীয় গল্পের ছড়াছড়ি। দুয়েকটি রীতিমতো ক্লাসিক।

তার মধ্যে অন্তত একটি গল্প আপাতত স্মরণ করা যাক। গোপাল ভাঁড়ের বাজার-চালু বইগুলি, যেগুলো কালীঘাট মন্দিরের চাতালে বা রেলগাড়ির কামরায় সদাসর্বদাই পাওয়া যায়, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই এই গল্প রয়েছে।

নদীয়াধিপতি রাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে গোপাল ভাঁড় ছাড়াও আরও একাধিক উলটোপালটা কথার লোক ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তিনি রাজদরবারে বসে যা-নয় তাই বাজে কথা বলে যেতেন। রাজার আত্মীয় বলে কেউই কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না, এমনকী গোপাল ভাঁড়ও পর্যন্ত নয়।

কিন্তু একদিন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন ভদ্রলোক। তিনি সেদিন গোপাল ভাঁড়কে বললেন, 'জানো গোপাল, আমার মামার বাড়িতে একখানা পেল্লায় লোহার কড়াই ছিল। সে বলতে গেলে একটা পুকুরের মতো, পুকুর নয় প্রায় দিঘিরই মতো। রান্নাঘরে সে কড়াই রাখা যেত না, আমার মামারা সেটাকে নদীর ধারে বালির চরে রেখে দিত। বর্ষাকালে সে কড়াইতে এত বৃষ্টির জল জমত যে লোকেরা নদীতে আর স্নান করতে যেত না, সেই কড়াইতেই তারা স্নান করত, সাঁতার কাটত।'

গোপাল ভাঁড় সেদিন আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলেন না।

তিনি বললেন, 'এবার আমার মামার বাড়ির গল্পটা বলি।' প্রতিপক্ষের দিকে কঠোর নেত্রপাত করে গোপাল ভাঁড় শুরু করলেন, 'আমার বড়মামা মাছ ধরতে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছিপে যেমন মাছ ধরতেন, তেমনি লোকজন জোগাড় করে জাল দিয়েও মাছ ধরতেন। একবার তাঁর জালে একটা মহারুই ধরা পড়ল, সে মাছটার ওজন একশো মণ, লম্বায় তিরিশ হাত পাশে দশ হাত। তিনি সেই রুইমাছ টুকরো করে কেটে, ভেজে সব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পাঠিয়ে ছিলেন। আমাদের বাড়িতেও এসেছিল এক মণ মাছ। কী অপূর্ব স্বাদ ছিল সেই মাছে, আহা, এখনও জিবে লেগে আছে।'

পরপর এমন দুটো গাঁজাখুরি গল্প শুনে রাজসভার অন্য পারিষদেরা স্তম্ভিত কিন্তু রাজার আত্মীয় যিনি তাঁর মামার বাড়ির কড়াইয়ের কথা বলেছিলেন, তিনি তীব্র আপত্তি তুললেন।

তাঁর আপত্তি দুই দফা :—

(এক) কোনও মাছ অত বড় হতে পারে না।

(দুই) অত বড় মাছ ভাজা হল কী করে। একশো মণ মাছ ভাজতে কত বড় কড়াই লাগে তা কি গোপাল জানে?

প্রথম আপত্তির কোনও জবাব দিলেন না গোপাল কিন্তু দ্বিতীয় আপত্তির মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বললেন, 'অবশ্যই জানি। শুধু আমি নই আমার মামারাও জানত। সেইজন্যেই আমার বড়মামা সেবার আপনার মামার বাড়ি থেকে সেই কড়াইখানা নিয়ে এসেছিল এবং সেই কড়াইতেই মাছটা ভাজা হয়েছিল।'

তারপর একটু থেমে গোপাল বললেন, 'আপনার মামার বাড়িতে সেবার আমার বড় মামা আড়াই মণ মাছ পাঠিয়েছিলেন। আপনিও দশ-বিশ টুকরো খেয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয় মনে আছে কী অপূর্ব স্বাদ ছিল সেই মাছের।'

এরই পাশাপাশি একটি বিলিতি গল্প আছে। সেটাকে জাতীয়করণ করে সুন্দরবনে নিয়ে আসছি।

পঞ্চাশ বছর আগের গল্প এটা। তখনও কলকাতার বেঙ্গল ক্লাবে নেটিভদের প্রবেশাধিকার ছিল না। শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গিনী ছাড়া ক্লাবের ত্রিসীমানায় যেসব ভারতীয়কে দেখতে পাওয়া যায় তারা সবাই হয় ভৃত্য, না হয় রাঁধুনি, বড়জোর বেয়ারা।

সে যা হোক এই ক্লাবের লনে একদিন রাতে জোর আড্ডা চলছে, এমন সময় স্থায়ী সদস্য টমসাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে এসে ঢুকলেন। তিনি যা বললেন সেটা অকল্পনীয়। প্রথমে ভাল করে কিছু বলতে পারছিলেন না, শুধু বলছিলেন 'গুড গড! কলকাতায় কী সাংঘাতিক কথা, কলকাতায় বাঘ।'

সবাই বলল, 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? কলকাতায় বাঘ তো আছেই। চিড়িয়াখানায় অন্তত সাতটা বাঘ আছে। তা ছাড়া মার্বেল প্যালেসে মল্লিকদের বাড়িতে এবং আরও অনেক জায়গায়ই নাকি পোষা বাঘ আছে।'

টমসাহেব বললেন, 'আরে না না পোষা বা বন্দি বাঘ নয়। একেবারে তরতাজা, টগবগে, জংলি রয়েল বেঙ্গল।'

টমসাহেব বললেন, 'ফোর্টের সামনের মাঠে আজ সন্ধ্যাবেলা একলা বসে বিয়ার খাচ্ছিলাম। ঘণ্টাখানেক আগের কথা। হঠাৎ ঘাড়ের ওপর গরম নিশ্বাস পড়ায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মস্ত হাঁড়ির মতো মাথা, বিশাল এক কেঁদো ডোরাকাটা বাঘ। ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে পুরো বিয়ারের বোতলটা সেই বাঘটার মাথায় ঢেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।'

টমসাহেবের এ রকম বাজে গল্প বানিয়ে বলার বাতিক আছে। আড্ডার কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু সেই টেবিলেই তখন ছিলেন জনসাহেব, টমসাহেবের চিরশত্রু।

টমসাহেবের গল্প শেষ হওয়ার পরে কিঞ্চিৎ শোরগোল উঠল, প্রায় সবাই বলতে লাগল বাজে, গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু জনসাহেব আজ সম্পূর্ণ বিপরীত রাস্তা ধরলেন, তিনি বললেন, 'অন্যান্য দিন টম হয়তো গালগল্প বানিয়ে বলে, তবে আজ যা বলেছে সম্পূর্ণ সত্যি। আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি টম এ গল্পটা বানিয়ে বলেনি।'

সবাই অবাক, সমস্বরে জিজ্ঞাসা উঠল, 'মানে?'

জনসাহেব বললেন, 'আধ ঘণ্টা আগে ফোর্টের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। স্ট্যান্ডের কাছে এসে দেখি, ওই টম যেমন বলল বিশাল কেঁদো এক রয়াল বেঙ্গল বাঘ হেলতে-দুলতে আসছে। বাঘটা কাছে আসতে সেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। দেখি যে মাথার লোমগুলো কেমন ভেজা ভেজা, হাতটাও কেমন চটচট করছে। শুঁকে দেখি বিয়ারের গন্ধ। এখন টমের কথা শুনে বুঝলাম রহস্যটা কী?'

টমসাহেব আর জনসাহেবের গল্প পড়ে যাদের বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে তাদের জন্যে আরও একটা গল্প আছে।

এই পরের গল্পের চরিত্রদ্বয়ের নামও টমসাহেব এবং জনসাহেব। তবে এ গল্পে তাঁরা দু'জনেই পাগল।

টমসাহেব আর জনসাহেব, যুগ্ম উন্মাদ। দু'জনে একই পাগলাগারদের আবাসিক। দু'জনে একযোগে বুদ্ধি করে একদিন সকালবেলায় প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে উন্মাদ আশ্রমের দেওয়াল টপকিয়ে পালিয়েছেন।

দেওয়ালের ওপাশেই একটা খাল। বর্ষাকাল, খালে গভীর জল। তবে আশার কথা এই যে খালপার ধরে কিছুদূর এগোলেই একটা বাঁশের সাঁকো আছে।

টমসাহেব এবং জনসাহেব সেই সাঁকোর দিকে দ্রুত ছুটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে উন্মাদ আশ্রমের রক্ষীরা টের পেয়েছে যে দু'জন পাগল পালিয়েছে। তারা দেওয়ালের ওপাশ দিয়ে ছুটে এসে দেখল কিছুদূর টমসাহেব আর জনসাহেব বাঁশের সাঁকোর দিকে প্রাণপণ দৌড়াচ্ছেন।

তাই দেখে আশ্রমের রক্ষীরাও তাঁদের পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে টমসাহেব এবং জনসাহেব সেই বাঁশের সাঁকোর ওপরে উঠে পড়েছেন।

বাঁশের সাঁকোটি পুরনো, নড়বড়ে এবং ভাঙা। খুব সাবধানে একজন যেতে পারে। কিন্তু কথাই তো আছে যে 'পাগলারে পাগলা সাঁকো নাড়াস না।' এ ক্ষেত্রে পাগল একজন নয়, দু'জন। আর দু'জনেই দ্রুতবেগে বাঁশের সাঁকোর ওপরে ছুটে যাচ্ছেন। ফলে যা হবার তাই হল, টমসাহেব এবং জনসাহেব উভয়েই নড়বড়ে সাঁকো ভেঙে খালের সুগভীর জলের মধ্যে পড়ে গেলেন।

রক্ষীরা তখন বাঁশের সাঁকোর কাছে খাল ধারে এসে গেছে। তারা দুই পলাতক রোগীর এই পরিণতি দেখে 'হায় হায়' করে উঠল। নিমজ্জিত ব্যক্তিদের জল থেকে উদ্ধার করার মতো সাঁতারে পটু তারা কেউই নয়। তা ছাড়া মধ্যবর্ষার খালের জল শুধু গভীরই নয়, খরস্রোতাও বটে।

তবে সুখের কথা এই যে রক্ষীরা দেখতে পেল টমসাহেব বেশ ভাল সাঁতার জানেন, তিনি তরতর করে সাঁতরিয়ে পারে এসে রক্ষীদের পাশে উঠলেন। ইচ্ছে করলে তিনি ওপাড়ে উঠে

পালিয়ে যেতে পারতেন, সাঁকোও ভেঙে গেছে, রক্ষীদের পক্ষে আর তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব হত না।

কিন্তু টমসাহেব পালানোর চেষ্টা না করে রক্ষীদের কাছেই ফিরে এলেন এবং শুধু তাই নয়, যখন দেখলেন জনসাহেব জল থেকে উঠে আসতে পারেননি মধ্যখালে হাবুডুবু খাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জীবন বিপন্ন করে জনসাহেবকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে আনলেন।

রক্ষীরা নিশ্চিন্ত মনে টমসাহেব আর জনসাহেবকে নিয়ে হাসপাতালে ফিরে এল। হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব যখন টমসাহেবের অতুল কীর্তির কথা শুনলেন তিনি ধরে নিলেন টমসাহেব তা হলে মোটামুটি সুস্থই হয়ে গেছেন।

অনেক কিছু বিবেচনা করে সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব ভাবলেন আজ বিকেলেই টমসাহেবকে একটা বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে ছেড়ে দেব, উনি তো ভালই হয়ে গেছেন। তিনি আরও ঠিক করলেন সেই সভায় জনসাহেবকেও বলা হবে যে তাঁকে শিগগিরই ছেড়ে দেওয়া হবে।

সেদিন বিকেলে যথারীতি সংবর্ধনা ও বিদায় সভার আয়োজন করা হল। হাসপাতালের ডাক্তার, রক্ষী, কর্মী এবং রোগীরা সবাই উপস্থিত, টমসাহেব গলায় মালা পরে মঞ্চে বসে আছেন। কিন্তু আশেপাশে কোথাও জনসাহেবকে দেখা যাচ্ছে না।

কর্তৃপক্ষের একজন ব্যাপারটা খেয়াল করলেন, আজকের সংবর্ধনার নায়ক টমসাহেব বটে কিন্তু এ ব্যাপারে জনসাহেবের ভূমিকাও কম নয়। তাঁকে ছাড়াও অনুষ্ঠান হয় কী করে? তখন খোঁজ পড়ল জনসাহেবের।

তাই দেখে টমসাহেব বললেন, 'কী হল, আপনারা জনসাহেবকে খুঁজছেন? আমি তো তাঁকে তিনতলার চিলেকোঠার ছাদে রোদ্দুরে শুকোতে দিয়েছি।'

এই বলে টমসাহেব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের তিনতলার ছাদে উঠলেন।

সেখানে দেখা গেল চিলেকোঠার সিলিংয়ের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে জনসাহেবকে ঝোলানো হয়েছে, তবে দড়ির গিঁটটা তেমন শক্ত নয়। জনসাহেবকে তাড়াতাড়ি দড়ি খুলে নামিয়ে দেখা গেল এখনও ধড়ে কিঞ্চিৎ প্রাণ আছে। তবে দড়ির টানে থুতনিটা ছড়ে গেছে।

জলের ছিটে দিয়ে, অনেক সেবাযত্ন করে কিছুক্ষণের মধ্যে জনসাহেবের সংজ্ঞা ফিরে এল। তখন জনসাহেব কোনওরকমে চিঁ চিঁ করে জানালেন, 'আমি তো জলে ডুবে একদম চুপসে গিয়েছিলাম। ছাদের এদিকটায় পশ্চিমের রোদটা আসে, তাই টম আমাকে এখানে রোদে শুকনোর জন্যে টাঙিয়ে দিয়েছিল।'

জীবন্ত মানুষকে গলায় দড়ি দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া, কিংবা কইমাছ এবং গোরুর গাছে ওঠা, দিঘির মতো বড় কড়াই বা বন্য বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া এই জাতীয় আজগুবি গল্পগুলোকে ইংরেজিতে বলে টল টেল মানে লম্বা কথিকা। সাদা বাংলায় গাঁজাখুরি গল্প বললেও এই গল্পগুলোর জন্যে একটি চমৎকার শব্দ আছে বাংলা ভাষায় সে শব্দটি হল আষাঢ়ে গল্প।

'আষাঢ়ে গল্প' শব্দটির বুৎপত্তি সম্পর্কে অভিধানে বিশেষ কিছু খুঁজে পাইনি।

চলন্তিকায় রাজশেখর বসু আষাঢ়ে গল্পের মানে দিয়েছেন অদ্ভুত, অসম্ভব ঘটনা সংবলিত গল্প। তার মানে শুধু গল্পটা অদ্ভুত হলে হবে না, গল্পটাকে অদ্ভুত ঘটনা সংবলিত হতে হবে।

সংসদ বাংলা অভিধান অবশ্য অনেক স্পষ্ট। সেখানে বলছে আষাঢ়ে মানে অদ্ভুত, মিথ্যা, অলীক। সংস্কৃত আষাঢ় শব্দের সঙ্গে বাংলা ইয়া প্রত্যয় যোগে আষাঢ়িয়া, এবং তারপরে আষাঢ়িয়া থেকে আষাঢ়ে।

অভিধানেই যখন হাত দিলাম একটু সুবল চন্দ্র মিত্রকেও ছুঁয়ে রাখি। বাংলা ভাষার অভিধানে সুবল মিত্র বলছেন আষাঢ়ে গল্পের মানে হল অদ্ভুত গল্প, কাল্পনিক কাহিনী, অবিশ্বাস্য কাহিনী।

গল্পের আগে আষাঢ়ে বিশেষণটি কেন তা কিন্তু জানা যাচ্ছে না। তবে আমরা অনুমান করতে পারি।

আষাঢ় মাস। সারাদিন রাত প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। ঘর থেকে বাইরে বেরনোর উপায় নেই অন্ধকার সন্ধ্যাবেলা, স্তিমিত কেরোসিন লণ্ঠন বা রেড়ির তেলের বাতিকে ঘিরে কয়েকজন কর্মহীন, অলস লোক বসে আছে। তাদেরই ভিতরে কেউ কল্পনার অশ্বের লাগাম ছেড়ে দিয়েছে। সেই অশ্বখুরের তাড়নায় আষাঢ়ে গল্পের গোরু উঠছে গাছে। বাঘের মাথায় বিয়ার ঢালছে মানুষ।

আর শুধু গল্পের গোরু কেন পদ্যের গোরুও গাছে ওঠে। সুকুমার রায়, এডোয়ার্ড লিয়ার কিংবা লুইস ক্যারল অবশ্যই শিরোধার্য কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গল্পের গোরুকে গাছে তোলার বদলে গল্পের রাজাকে দাঁড়ে তুলিয়েছিলেন।

স্মরণ করা যাতে পারে 'সোনার তরী'র 'হিং টিং ছট' কবিতা,...'

শিয়রে বসিয়া যেন তিনটি বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে—
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখ মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলালো তারা এলো এক বেদে
'পাখি উড়ে গেছে' বলে মরে কেঁদে কেঁদে।
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।'

পুনশ্চ : গল্পের গোরু নামক আষাঢ়ে নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে শেষ করা সমীচীন হবে না। সুতরাং আর একটি তরল কাহিনী যোগ করছি। অতি সংক্ষিপ্ত সেই কাহিনী এবং প্রকৃতই সেটা একটা আষাঢ়ে গল্প।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিময় এক আষাঢ়ে সন্ধ্যা। ঘরের মধ্যে বসে লোকেরা বিশ্রম্ভালাপ করছে। এক সময় মনে হল এতক্ষণে বুঝি বৃষ্টি থামল কিন্তু সবাই দ্রব্যগুণে ঝিম মেরে বসে আছে। অবশেষে একজন বলল, 'কেউ একজন বাইরে গিয়ে দেখে এসো তো বৃষ্টি ধরল কিনা?'

সেই কেউ একজন বলল, 'বাইরে যেতে হবে কেন? গোয়ালঘরে গোরুটা রয়েছে সেটাকে আয়-আয় করে ডাকলেই এখানে চলে আসবে।'

সবাই বলল, 'তাতে কী হবে?'

উত্তর পাওয়া গেল, 'গোরুটা এখানে এলে তার পিঠে হাত বুলিয়ে যদি দেখা যায় ভেজা তা হলে বৃষ্টি এখনো হচ্ছে, আর যদি দেখি শুকনো তা হলে বৃষ্টি থেমে গেছে।'

কাজের মেয়ে

কথাটা কাজের মেয়ে। কিন্তু সর্বদাই যে সে কাজের তা নয়, অনেক সময়েই সে অকাজের মেয়ে।

সে কাচের গেলাস ভেঙে ফেলে, সে ডালে নুন বেশি দেয়, ফ্রিজের দরজা ধপাস করে বন্ধ করে। কর্তা অফিস যাওয়ার মুখে ভাত খেতে বসেছেন, তাকে গৃহিণী একশো দই আনতে পাঠিয়েছেন, ঘণ্টা দেড়েক পরে, কর্তা অফিস চলে যাওয়ার ঢের ঢের বাদে একটা ছোট ভাঁড় হাতে সে বাড়ি ফিরল, দেরির কারণ দইয়ের দোকানের সামনে একটা পাগল কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। এতক্ষণ সে বান্ধবীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উন্মাদের কার্যক্রম অনুধাবন করছিল।

কিন্তু তার উপরে রাগ করা চলবে না।

সে মধ্যবিত্তের সংসারের নয়নের মণি, শিবরাত্রির সলতে। তাকে তোষণ করতে হবে, পোষণ করতে হবে।

বিনিময়ে সেও অনেক কিছু করবে। সে দশভুজা। সে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার চা, দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেলে তার সঞ্চিত দেশলাই থেকে কাঠি এনে দেবে বাবুর সিগারেট ধরাবার জন্য। সে ঘর ঝাঁট দেবে, বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, দরকার হলে ইস্তিরিও করবে। আগে তার একটা গল্প বলে নিই। তারপরে আবার তার কথা।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে কৃষ্ণকান্তবাবু দেখেন তিজেল হাঁড়ির মতো থমথমে মুখ তাঁর সহধর্মিণীর।

একটু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কৃষ্ণকান্তবাবু জানতে পারলেন যে বাড়ির কাজের মেয়েটি, নাম করুণা, রাগ করে কাজ ছেড়ে বিকেলবেলায় দেশে চলে গেছে। কৃষ্ণকান্তবাবু এ কথা শুনে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তাকে এমন কী বলেছিলে যে সে রাগ করল? দেশে চলে গেল?'

সহধর্মিণী রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তাকে কিছু বলিনি। তুমি বলেছিলে।'

কৃষ্ণকান্তবাবু এ কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, 'আমি? আমি আবার করুণাকে কবে কী বললাম?'

সহধর্মিণী পালটা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজ দুপুরে অফিস থেকে ফোন করে করুণাকে গালাগাল করনি?'

মাথায় হাত দিলেন কৃষ্ণকান্তবাবু। বললেন, 'সর্বনাশ! আমি তো ভেবেছিলাম ফোনটা তুমি ধরেছ, তোমাকেই তো গালাগাল করেছি, আমি কি বুঝতে পেরেছি যে করুণা ফোনটা ধরেছে?'

এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাহিনীর সারমর্ম হল গৃহিণীকে গালাগাল করা চলে, কাজের মেয়েকে গালাগাল করা চলে না। গৃহিণীকে ভালমন্দ যা বলা যায়, পরিচারিকাকে তা বললে সে কাজ ছেড়ে চলে যাবে। তাকে আর ফিরিয়েও আনা যাবে না, সে একেবারে দূরে দেশে চলে যাবে। ডায়মন্ডহারবারের গহনে কিংবা কাঁথির উপকূলে।

অনেকদিন আগে আরও একটি কাজের মেয়ের কথা লিখেছিলাম, এখনও কারও কারও তাকে হয়তো মনে আছে। এই সূত্রে তাকে আরেকবার স্মরণ করি।

সে ঘরের মেঝে মুছছিল। গৃহিণী তার পাশে দাঁড়িয়ে একটু ঘরমোছার নমুনা দেখে তাকে আরও ভাল করে মুছতে বললেন।

এই কথা শুনে পরিচারিকা বলল, 'ও কথা বোলো না বউদি, ওই অলক্ষণ কথা বোলো না।'

বউদি অবাক, ঘর মোছার আবার লক্ষণ, অলক্ষণ কী?

পরিচারিকা তখন বুঝিয়ে বলল, 'পাশের তেরো নম্বর বাড়ির বউদি ওই রকম বলতেন, আমি মেঝে মুছে মুছে ঝকঝকে করে দিয়েছিলাম। তারপর সেবাড়ির দাদাবাবু সেই মেঝেতে পা পিছলিয়ে পড়ে কোমর ভেঙে আজ সাড়ে তিন মাস হাসপাতালে।'

এই পরিষ্কার করার ব্যাপারে আমার স্ত্রী মিনতিকে একদা আমি ভয়াবহভাবে জব্দ হতে দেখেছিলাম। প্রায় নতুন কাজের মেয়েটি চেয়ার টেবিল ঝাড়ছিল। মিনতি এগিয়ে গিয়ে তাকে বলল, 'এই চেয়ারের হাতলে ধুলোটা কেমন জমে রয়েছে। অন্তত এক মাসের পুরনো ধুলো।'

কাজের মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'তার আমি কী জানি? আমি তো মাত্র সাতদিন এসেছি।'

ধুলো ঝাড়ার আর একটা কাহিনী আছে।

সেই একই গল্প। কাজের মেয়েটি ধুলো ঝাড়ছিল, গৃহিণী আলমারির মাথায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'করুণা, এখানে এত ধুলো জমে আস্তর পড়ে গেছে আমি ইচ্ছে করলে এর ওপরে আঙুল দিয়ে আমার নাম সই করতে পারি।'

করুণা বলল, 'বউদি, ওই তো তোমাদের সুবিধে। তোমরা লেখাপড়া জানো বলে নিজের নাম লিখতে পারো। আমরা তো লেখাপড়া জানিনে, নামসইও করতে পারিনে। আমাদের কত কষ্ট ভাবো তো।'

এসব ভেবে লাভ নেই।

বরং আর একটা অতি বাজে, অতি অবিশ্বাস্য কথিকা দিয়ে কাজের লোককে ছেড়ে দিই।

বাড়িতে নতুন কাজের লোক লেগেছে। গৃহিণী তাকে বললেন, 'দ্যাখো, আমি খুব বেশি কথা বলি না। যদি দ্যাখো যে আমি আঙুল তুলেছি, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে যে তোমাকে আমি ডাকছি, তোমাকে আসতে বলছি।'

নবনিযুক্তা পরিচারিকা বলল, 'গিন্নিমা, আমিও খুব কম কথার লোক। যদি দ্যাখেন আপনার আঙুল তোলা দেখে আমি ঘাড় নাড়ছি, বুঝবেন আমি আসছি না।'

বইমেলা

কবে কোথায় যেন এক মহিলা সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি সাহিত্যিক হতে গেলেন কেন?'

ভদ্রমহিলা নির্বিকার মুখে বলেছিলেন, 'বিছানায় শুয়ে করার মতো একজন মহিলার পক্ষে এটা একমাত্র সম্মানজনক কাজ।'

ভদ্রমহিলার সাহস ছিল। সব লেখক-লেখিকা এ রকম সাহসী হন না। তবে এই মুহূর্তে অন্য একজন সাহসী লেখকের কথা মনে পড়ছে।

সেই লেখককে অনুরূপ এক সাক্ষাৎকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন করা হয়েছিল।

লেখক ভদ্রলোক সাক্ষাৎকারের শেষভাগে চূড়ান্ত কথাটি বলেছিলেন, তিনি কবুল করলেন, 'পনেরো বছর লেখার পর আমি টের পাই সাহিত্যিক হওয়ার জন্যে যে প্রতিভা, কল্পনাশক্তি বা ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন সেসব কিছুই আমার নেই। আমি নেহাতই এক এলেবেলে লেখক।'

এর পরে বাধ্য হয়ে প্রশ্নকর্তা জানতে চাইলেন, 'তা হলে তার পরেও লিখছেন কেন?'

ভদ্রলোক ম্লান হেসে জবাব দিলেন, 'কী করব, এখন যে আমার নাম হয়ে গেছে। আমার বই হাজারে হাজারে বিক্রি হচ্ছে।'

কার বই, কোন বই কেন বিক্রি হয়, কেন বিক্রি হয় না তার কোনও সরল সূত্র নেই। এ বছর যে বই ছাপতে না ছাপতে এডিশন হয়ে যাচ্ছে, সামনের সালে সে বই সারা বছরে পাঁচশো কপি বিক্রি হতে পারে। যে বই লেখকের জীবিতাবস্থায় সবসুদ্ধ মাত্র দুশো কপি বিক্রি হয়েছে, লেখকের মৃত্যুর পরে সেই বই দৈনিক দুশো কপি করে বিক্রি হতে পারে।

আর, পাঠকের কাছে বই ভাল লাগা না লাগা? সেও এক তাজ্জব ব্যাপার।

স্পষ্ট মনে আছে এই গত বছরেই বইমেলায় কফির দোকানে দুই পাঠকের ভয়াবহ কথোপকথন।

একই টেবিলে আমিও বসেছিলাম।

একটা সদ্যপ্রকাশিত বই নিয়ে দুই অন্তরঙ্গ পাঠকের কঠিন বচসা :—

প্রথম পাঠক (তার হাতে সদ্য কেনা একটা বই) : এ রকম বই বাংলাভাষায় আর কখনো লেখা হয়নি।

দ্বিতীয় পাঠক (প্রায় চেঁচিয়ে) : রাবিশ।

প্রথম পাঠক (বিস্মিত, বিমূঢ়) : রাবিশ।

দ্বিতীয় পাঠক (আরও চেঁচিয়ে) : রাবিশ।

প্রথম পাঠক : 'স্বর্ণগোলকের রক্ত' রাবিশ! সুধানাথ দাসের 'স্বর্ণগোলকের রক্ত' রাবিশ?

দ্বিতীয় পাঠক : রাবিশ! রাবিশ!

প্রথম পাঠক : বইটা তুমি পড়েছ?

দ্বিতীয় পাঠক : যখন ধারাবাহিক বেরিয়েছিল, দু'-চার পঙ্‌ক্তি চোখ বুলিয়ে দেখেছি।

প্রথম পাঠক : এ রকম একটা বইয়ের মূল্য তুমি কী বোঝ? তুমি কখনও বই লিখেছ? লেখার চেষ্টা করে দেখেছ?

দ্বিতীয় পাঠক : বই বুঝবার জন্যে বই লেখার দরকার কী? পড়তে জানলেই হল।

প্রথম পাঠক : মানে?

দ্বিতীয় পাঠক : মানে আর কী? ডিমসেদ্ধ খেতে কী রকম সেটা জানার জন্যে ডিম পাড়ার দরকার নেই। একটা হাঁস কিংবা মুরগির চেয়ে একজন মানুষ অনেক ভাল জানে ডিমসেদ্ধ খেতে কী রকম, তার জন্যে তাকে ডিম পাড়তে হয় না।

পুনশ্চ [এক]

এর পরে আর কিছু বলার থাকে না।

কিন্তু আবার বইমেলায় সেই লেখককেও মনে পড়ছে, যিনি বলেছিলেন, 'সম্পাদক, প্রকাশক, সমালোচক এঁদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, এঁরা সবাই আমাকে আমার যোগ্যমূল্য দিতে চান।'

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল, 'তা হলে?'

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'যোগ্যমূল্যটা এত কম যে আমার পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়।'

পুনশ্চ [দুই]

শুধু যে মানুষেরাই বই পড়ে তা কিন্তু নয়। এক বিখ্যাত উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

সিনেমা দেখতে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তাঁর কুকুরকে সঙ্গে এনে আলাদা টিকিট কেটে পাশের সিটে বসিয়েছিলেন। তাঁকে হলের লোকেরা প্রশ্ন করেছিল, 'কুকুর কেন?'

ভদ্রমহিলা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'আমি যখন বইটা পড়ি তখন টাইগার, মানে আমার এই কুকুরটিও বইটা আমার সঙ্গে পড়েছিল। ওরও বইটা খুব ভাল লেগেছিল। তাই সিনেমাটাও টাইগারকে দেখাতে নিয়ে এলাম।'

স্ত্রী

সংস্কৃত প্রবচনে আছে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। এই প্রবচনটি একটি শ্লোকের শেষাংশ। সম্পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকটি হল;

আত্মবুদ্ধি শুভকরী
গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধি বিনাশায়
স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী ॥

এই শ্লোকের মানে হল, নিজের বুদ্ধি শুভকারী, বিশেষত গুরুর বুদ্ধি কিন্তু পরের বুদ্ধিতে বিনাশ হয় আর স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

এই স্ত্রীবুদ্ধির স্ত্রী সম্ভবত স্ত্রীজাতির স্ত্রী নয়, স্বামী-স্ত্রীর স্ত্রী। এই স্ত্রী ঠাকরুন এবার আমাদের এই রম্য নিবন্ধের বিষয়। বিষয়টি পুরনো, ইতিপূর্বে একাধিকবার এই বিপজ্জনক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছি, আবার সাহসে ভর করে স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথমে সুশিক্ষিতা স্ত্রীকে ধরে শুরু করি।

লাখকথার এককথা বলেছিলেন সেই খরবুদ্ধি ইংরেজ মহামতি স্যামুয়েল জনসন।

জনসনের বক্তব্য ছিল, একজন মানুষ তৃপ্ত হয় যদি তার নৈশভোজ উত্তম হয়। তার স্ত্রীর গ্রিকভাষায় ভাল কথা বলতে পারার চেয়ে উত্তম নৈশভোজ তার পক্ষে অনেক বেশি তৃপ্তিকর।

সংস্কৃত শ্লোক থেকে স্যামুয়েল জনসন পর্যন্ত দ্রুত পর্যটন করে আসা গেল। এবার চিরাচরিত হালকা গল্পে ফিরে যাই।

প্রথমেই সেই পুরনো গল্পটি স্মরণীয়। ঠিক গল্প নয়, এক নির্বোধ স্বামীর উক্তি, বহুকথিত, বহুলিখিত (আমি নিজেই অন্তত এর আগে তিনবার লিখেছি)।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এক ভদ্রলোকের স্ত্রী একদিন খুব সাজগোজ করেছে, খুব প্রসাধন করেছে, ভদ্রলোক স্ত্রীর এই রূপ দেখে মুগ্ধ। যাকে বল একেবারে গদগদ।

এবং অবশেষে কথাটি বলেই ফেললেন নিজের স্ত্রীকে। 'ওগো আজকে যে তোমাকে একেবারে পরস্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে।'

স্ত্রীঘটিত বিলিতি গল্পেই মজা বেশি।

এক মেমসাহেব তাঁর প্রতিবেশিনীর কাছে নালিশ করেছিলেন যে তাঁর পতিদেবতা প্রত্যেকদিন বহু রাত করে বাড়ি ফেরেন। হাজার রকম চেষ্টা করেও তিনি স্বামীর এই রাত করে বাড়ি ফেরা বন্ধ করতে পারেননি।

প্রতিবেশিনী বললেন, 'শোনো তুমি আমার পরামর্শ নও। আমার বরও এক সময়ে খুব দেরি করে রাতে ফিরত, প্রায় রাত কাবার করে। অনেক চেষ্টা করেও, অনেক অনুনয় বিনয়, রাগারাগি, চোখের জল, কথা বন্ধ—কিছুতেই কোনও কাজ হল না। তখন বাধ্য হয়ে একটা বুদ্ধি বার করলাম।'

বলা বাহুল্য, এরপর ওই মেমসাহেব তাঁর প্রতিবেশিনীর কাছে বুদ্ধিটা কী জানতে চাইলেন।

প্রতিবেশিনী যা বললেন তা চমৎকার, একদিন রাতে তাঁর স্বামী যথারীতি প্রায় রাত কাবার করে বাড়ি ফিরেছেন, তিনি তখন বিছানায় শুয়ে, স্বামীর পায়ের শব্দ শুনে বন্ধ চোখের পাতা না খুলেই তিনি বললেন, 'কে? স্যামুয়েল এতক্ষণে এলে?'

একথা শুনে মেমসাহেব বললেন, 'কিন্তু তাতে কী হল? এই এক জিজ্ঞাসাতেই আপনার স্বামী ভাল হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, তাই হল।' প্রতিবেশিনী মৃদু হেসে বললেন, 'আসলে আমার বরের নাম তো স্যামুয়েল নয়, ওর নাম জন। ও ভাবল কে না কে স্যামুয়েল নামে একটা লোক—ও যখন রাতের বেলায় থাকে না তখন আমার কাছে আসে। তারপর আর কেউ রাতে বাইরে থাকে?'

এ গল্পটা কিঞ্চিৎ গোলমেলে। এর পরের গল্পটা কিঞ্চিদধিক গোলমেলে।

দুই বন্ধু পার্কে বসে গল্প করছিল। বিকেল হয়েছে। গাছের ছায়া পড়েছে মাঠে। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে কিন্তু এক বন্ধু, তার নাম সুরনাথ, তার কিছুই ভাল লাগছে না। আসলে তার ভয়ংকর মাথা ধরেছে, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সুরনাথ তার দু'হাত দিয়ে কপালের দু'দিকের দুটো শিরা চেপে ধরে গুম মেরে বসে আছে, গল্প-টল্প কিছুই তার বিশেষ ভাল লাগছে না।

সুরনাথেব বন্ধু দিবানাথ সুরনাথের এই অবস্থা দেখে বলল, 'আমারও কয়েকদিন আগে খুবই মাথা ধরেছিল। অনেক বেদনাহর ট্যাবলেট, মলম, মাথাধোয়া, স্নান অডিকোলন—কিছুতেই কোনওরকম উপশম হয়নি।'

তারপর দিবানাথ একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'অবশেষে বউয়ের কোলে মাথা দিয়ে আধঘণ্টা শুয়ে রইলাম, বউ শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথায় একটু হাওয়া করল। আর, কী আশ্চর্য! মাথাধরাটা একদম ছেড়ে গেল। তারপর থেকে মাথা পরিষ্কার, একেবারে হালকা হয়ে গেছে।'

এই কথা শুনে সুরনাথ উঠে দাঁড়াল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বউ এখন বাসায় আছে, এখন গেলে পাওয়া যাবে?'

বিস্মিত হয়ে দিবানাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আমার বউকে দিয়ে কী হবে?'

সুরনাথ বলল, 'দ্যাখ, আমিও তো মাথাধরার বড়ি, অডিকোলনের প্রলেপ, আশ্চর্য মলম—সবরকম চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই তো কিছু হল না। এখন তুই যা বললি, শেষ চেষ্টাটুকু করে দেখি। তোর বউয়ের কোলে আধঘণ্টা মাথা রেখে শুয়ে থাকি, তোর বউ একটু শাড়ির আঁচল দিয়ে হাওয়া করুক, দেখি মাথাধরাটা যায় কিনা?'

পুনশ্চ :

সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম, সংস্কৃত শ্লোক দিয়েই শেষ করি।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করীর মতোই এই শ্লোকটিও বহু বিখ্যাত, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি শ্লোকটি স্মরণীয়.

শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যাম
আদদীপ্রাবরাদপি
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং
স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি

অর্থটা পরিষ্কার, তবু সোজা করে বলি, 'নিজের থেকেও নিকৃষ্ট লোকের কাছ থেকে শুভ বিদ্যা গ্রহণ করা যায়, অন্ত্যজ জাতির কাছে থেকেও ধর্মশিক্ষা নেওয়া যায় এবং খারাপ বংশ থেকেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যায়।'

প্রথম কোকিল

ইংরেজদের প্রকৃতি সচেতনতার কোনও তুলনা নেই। তারা বরফ পড়লে মাথা ঘামায়, বরফ না পড়লে মাথা ঘামায়, বরফ বেশি পড়লে মাথা ঘামায়, বরফ কম পড়লে মাথা ঘামায়। তারা প্যাচপেচে বৃষ্টির ঘোলা দিনকে আহ্লাদ করে বলে হোম ওয়েদার (Home weather)।

বসন্তের কোকিল প্রত্যেকবারই কুহুস্বরে ডাকে। কোনওবার একটু আগে, কোনওবার কিছু পরে। কিন্তু ইংরেজের কাছে তার নিস্তার নেই, বসন্তে যেদিন তার প্রথম ডাক শোনা যাবে তার পরের দিনই চিঠি বেরবে লন্ডনের টাইমস কাগজে, 'গতকাল ১৬ এপ্রিল সোমবার সকাল সাতটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে এসেক্সে কোকিলের ডাক শুনলাম। অন্য বছর তো এত তাড়াতাড়ি কোকিল ডাকে না?'

শুধু কোকিলের ডাক বা বরফ পড়া নয়, জগৎসংসারের তাবৎ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় সাধারণ ও অসাধারণ ইংরেজ, তাই নিয়ে চিঠি লেখে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়।

সমস্ত বিখ্যাত বিলিতি দৈনিকের প্রধান আকর্ষণ পাঠকদের ওইসব চিঠিপত্র।

পাঠকদের এইসব চিঠিপত্রের তিনটি সুসম্পাদিত সংকলন আমি দেখেছি। মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে অধুনাবধি টাইমস কাগজে সম্পাদক সমীপেষু যত চিঠি বেরিয়েছে এই তিনটি গ্রন্থই তার মনোজ্ঞ সংগ্রহ। বই তিনটির নাম যথাক্রমে প্রথম কোকিল (The first Cuckoo), দ্বিতীয় কোকিল (The second Cuckoo) এবং সর্বশেষ, তৃতীয় কোকিল (The third Cuckoo)।

টাইমসের পত্রদাতাদের মধ্যে কে নেই? মহামহিমান্বিতা মহারানি ভিক্টোরিয়া থেকে জর্জ বারনারড শ', সেনাপতি থেকে সাধারণ নাগরিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত অধ্যাপক থেকে মফস্বল তরুণী—সকলের সবরকম চিঠিই এর মধ্যে আছে।

দুয়েকটা নমুনা দর্শনীয়।

১৯৫৮ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখে শ্রীযুক্ত জে. গুডচাইল্ড নামে এক ভদ্রলোক চিঠি দিয়ে

টাইমসের সম্পাদককে জানিয়ে ছিলেন দুশো বছর আগে ১৭৮৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখের টাইমস কাগজে একটা ভুল হয়েছিল, একজন কবির নাম পল হোয়াইটহেড বলে ছাপা হয়েছিল, সেটা আসলে হবে উইলিয়াম হোয়াইটহেড—যিনি সে সময়ে পোয়েট লরিয়েট ছিলেন।

দুশো বছর আগের ভুল ধরার এমন নজির বুঝি টাইমস কাগজেই সম্ভব।

আরেকটা অন্য ধরনের চিঠির কথা বলি।

এন আর ডেভিস নামে ভদ্রলোক ১৯৩৭ সালের ৫ মে তারিখে কয়েকদিন আগে প্রকাশিত রয়টার পরিবেশিত একটি সংবাদে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

রয়টারের সংবাদে ছিল যে হলস্টেড নামক স্থানে এক দাড়িঅলা ভদ্রলোক তাঁর সাইকেলের খুলে-যাওয়া চেন পরাতে গিয়ে সেই চেনের সঙ্গে নিজের লম্বা দাড়ি জড়িয়ে ফেলেন।

ছোট একটি হালকা খবর। কিন্তু ডেভিসসাহেবের বক্তব্য হল যে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে সেই আঠারোশো বিরানব্বুই সালের বসন্তকালে তিনি হলস্টেডে ছিলেন এবং তখন হলস্টেড অঞ্চলের একটা জনপ্রিয় গান ছিল এক বুড়োর দাড়ি সাইকেলের চেনে আটকে যাওয়া নিয়ে। সেই গানটিই এখন উড়োখবর হয়েছে।

আমি এই তিনটি কোকিলগ্রন্থের অধিকাংশ পুনর্মুদ্রিত চিঠিগুলি কৌতূহলভরে, আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছি। প্রচুর গোলমেলে ঘটনা ও আশ্চর্য খবর আছে এই চিঠিগুলোর মধ্যে; তার মধ্যে আশ্চর্যতম বোধহয় এইটি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেটা। ব্রিটিশ বোমারু বিমান যেত জার্মানিতে বোমা ফেলতে। প্রত্যেক বোমারু বিমানের সঙ্গে থাকত একটি করে পায়রা। বিমান-যুদ্ধে ভূপতিত হলে পায়রাটি বেরিয়ে ফিরে আসত। পায়রার প্রত্যাবর্তন দেখে বিমানের ভাগ্য জানা যেত।

একজন বৈমানিক, যিনি ওইরকম একটি বিমান নিয়ে বোমা ফেলতে গিয়েছিলেন এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারপর কোনওরকমে বিমান নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, 'কী আশ্চর্য, এত বড় একটা ঘটনা গুলিগোলা, ঝাপটানি, তারই মধ্যে তাকিয়ে দেখি আমার পায়রাটা একটা ডিম পেড়েছে।'

দিনের-পর-দিন, বছরের পর বছর দশক-শতক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছে, পতন হয়েছে। ইংলন্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী হয়েছেন, আবার পুনরায় মূষিকে পরিণত হয়েছেন, দুই মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে এরই মধ্যে। প্লেগ মহামারী, জার্মান বোমা।

সেই সঙ্গে পাশাপাশি টাইমসের পাতায় ছাপা হয়েছে পাঠকের চিঠিপত্র, সম্পাদক সমীপেষু।

শুধু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নয়, দৈনন্দিন সমস্যা বা অভিযোগের ফিরিস্তিও নয়, প্রকাশিত হয়েছে অজস্র মজার চিঠি, যার ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মিস্টার জি প্রুনের চিঠিটির কথাই ধরা যাক।

কী এক কারণে তাঁর বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল টাইমস কাগজে ১৯৪৬ সালের ৪ মার্চ তারিখে।

সেই সূত্রে একটা পত্র নিক্ষেপ করেছিলেন মিস্টার প্রুন, টাইমসের সম্পাদকের উদ্দেশ্য। খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। চিঠিটি হুবহু পেশ করছি, অনুবাদে।

৭ মার্চ, ১৯৪৬

মহাশয়,

আপনার চৌঠা মার্চের সম্পাদকীয়।

মহাশয়, আপনি কি আপনার সম্পাদকীয়তে আমার বিষয়ে কিছু লিখেছেন?

মহাশয়, আপনি অভিযোগ করেছেন, আমি আমার লম্বা, ঝুলো গোঁফ নাচিয়ে কী-সব বলেছিলাম সে-বিষয়ে।

কিন্তু মহাশয়,

সারাজীবনে আমার কোনোদিন কোনো গোঁফ ছিল না।

এমনকী আমি যখন খুব নাবালক ছিলাম, শিশু ছিলাম, তখনো আমার কোনো গোঁফ ছিল না।

ইতি

ভবদীয়

পি. প্রুন

দ্বিতীয় কোকিল

প্রথম কোকিল যখন ভরসা করে লিখেই ফেলেছি তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোকিলেও হাত দেওয়া যায়।

দুই শতাব্দীকাল ধরে প্রকাশিত লন্ডন টাইমসের এই পত্র-সংকলন তিনটি একাধিক কারণে স্মরণীয় এবং অসামান্য।

দীর্ঘকালের টুকরো টুকরো ছবি, আশা-নিরাশা এবং অভাব-অভিযোগের ছিন্ন-চিত্রমালা এই চিঠিগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ রসবোধের এবং সাহিত্যগুণেরও সমন্বয় ঘটেছে এই পত্রাবলিতে।

কী সব বিচিত্র বিষয়ে চিঠি ছাপা হয়েছে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

১৯৪০ সালে এক ভদ্রলোক চিঠি লিখেছেন কী করে টেলিফোনে ভালভাবে কথাবার্তা বলা যায় সেই বিষয়ে। এরই পরের বছরে ১৯৪১ সালে বেশ কয়েকটি চিঠি পরপর বেরিয়েছিল। ধূমপানের জন্যে তামাকপাতার বদলে অন্য কোনও পাতা ব্যবহার করা যায় কিনা বিষয়ে। পাতাগুলোর লাতিন নাম আমি খুব ভাল ধরতে পারলাম না তবে মনে হল ধুতরোপাতা, তুলসীপাতা এমনকী শুকনো জামপাতার কথাও উপদেশ দেওয়া আছে।

বিশেষ মনোজ্ঞ আলোচনা আছে প্রেক্ষাগৃহে নাটক চলাকালীন কোনও দৃশ্যের অভিনয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে করতালি দেওয়া উচিত কিনা এ-বিষয়ে। এতে নাটকের রসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি হয়, পত্রদাতা এও জানিয়েছেন যে, স্বয়ং স্যার লরেল অলিভিয়া করতালি শুনে বিরক্ত হয়ে করতালি না দিতে অনুরোধ করেছিলেন দর্শকদের এবং অবশেষে দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, তাঁদের নিস্তব্ধতার জন্যে।

অতঃপর পত্রলেখক প্রশ্ন করেছিলেন,

'Can not managers ask audiences to restrain their clapping until the end of each act?'

'হলের ম্যানেজাররা কি দর্শকদের বলতে পারেন না যে একটা অঙ্ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দেবেন না?'

এই সেদিন, ১৯৭৬ সালে মজার সব চিঠি বেরিয়েছিল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের।

সেই যে যুগে আশ্চর্য সব কিছুকেই বিলিতি বলা হত, বিলিতি বেগুন (টমাটো), বিলিতি কুমড়ো (মিষ্টি কুমড়ো), বিলিতি মাটি (সিমেন্ট); সেই সময়েই কিংবা তার কিছু পরে আর-একটা প্রবাদ চালু হয়েছিল 'বিলেত দেশটা মাটির।'

বিলেত দেশটাও যে মাটির, সত্যি সত্যি মাটির, ১৯৭৬ সালের অরক্ষণীয়া কন্যার সাহেব বাবাদের চিঠিগুলো পড়লেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

কন্যাদায়, কন্যার বিবাহের খরচ সে শুধু পণ বা যৌতুক নয়, আদর আপ্যায়ন আছে, সামাজিকতা আছে, চার্চ আছে শুধু এই পোড়ার কপাল, ভারতবর্ষে নয়, দুয়েকটি নগণ্য মাতৃতান্ত্রিক ক্ষুদ্র সমাজ বাদ দিলে, সর্বত্রই সে দায় পাত্রীর বাবার ঘাড়ে এসে পড়ে।

প্রথম চিঠি লিখেছিলেন একত্রিশ তিন উনিশশো ছিয়াত্তরে সরল প্রকৃতির তিন কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত টেরেন্স অ্যালান। চিঠিটি ভিসুভিয়াসের লাভামুখ খুলে দিয়েছিল। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে অজস্র চিঠি এসেছিল।

পত্রদাতার প্রথমা কন্যা আত্মসম্মান প্রপীড়িতা শ্রীমতী ক্যারোলিন অ্যালান একটা অত্যন্ত রাগী, বদমেজাজি, চিঠি লিখেছিলেন তাঁর পিতৃদেবের বিরুদ্ধে। সেই চিঠিটি বিষয়ে একটু পরেই আসছি, চিঠিটি খুবই গোলমেলে।

কিন্তু তার আগে মাননীয় টেরেন্স অ্যালানের চিঠিটি একটু পড়ে নিই, বেশ বড় চিঠি একটু সংক্ষিপ্ত করছি:—

৩১/৩/১৯৭৬

টাইমস সম্পাদক সমীপেষু,

মহোদয়,

সেই এক কাল ছিল, যখন মেয়েরা বাড়িতে থাকত কোনও কাজে বেরত না, তাদের যোগ্য বর পাওয়া গেলে বাবা-মা ধন্য বোধ করতেন এবং যথেষ্ট খরচ-খরচা করে বিবাহ দিতেন।

কিন্তু আজকালকার বাজারে যখন মেয়েরাও বাইরে বেরচ্ছে, কাজ করছে তখন বিয়ের এবং বিয়ের ভোজের পুরো দায়টা কেন মেয়ের বাবার ঘাড়ে পড়বে? এখন আর মেয়ের মা-বাবা জামাতা নির্বাচনে কোনও অংশগ্রহণ করেন না, মেয়েও স্বাধীনা এবং আর্থিক সংগতিপনা অথচ বিয়ের ব্যয় সেই মেয়ের বাবাকেই নির্বাহ করতে হচ্ছে। ছেলের বাবার কি এ-ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব নেই?

ইতি

ভবদীয়

টেরেন্স অ্যালান

এই পত্রের পক্ষে বিপক্ষে অসংখ্য চিঠির মধ্যে আমরা শুধু অ্যালানসাহেবের কন্যা ক্যারোলিনের চিঠিটি উল্লেখ করছি। শ্রীমতি ক্যারোলিন শুধু তাঁর পিতৃদেবকে নয় অন্য এক সহযোগী পত্রদাতা মরিসনসাহেবকেও আক্রমণ করেছিলেন। আসলে মরিসনসাহেব একটা সমাধান বাতলে ছিলেন, সেটা হল বিয়ের কনের একটা মূল্য ধার্য করা যেটা পাত্রপক্ষ দেবে (আমাদের বরপণের উলটো) এবং সেই টাকাতেই মেয়ের বিয়ের ব্যয় নির্বাহ হবে। উত্তেজিতা ক্যারোলিন লিখেছেন, 'বিয়ের বাজারে আমাকে যদি নিলামেই তোলা নয় সেই নিলামের টাকা পুরোটা আমিই নেব, আর কেউ নয়, আমার বাবা এক পয়সাও নয়।'

পুনশ্চ:

এই পত্রাবলির এক দশক পরে ১৯৮৫ সালে লন্ডন টাইমস যোগাযোগ করেছিল শ্রীযুক্ত টেরেন্স অ্যালানের সঙ্গে।

স্মৃতি এবং টাইমস কিছু ভোলে না। টাইমস দুশো বছরের পুরনো ভুল সংশোধন করে।

শ্রীযুক্ত টেরেন্স অ্যালান জানিয়েছিলেন তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ১৯৮২ সালে। পরেরটিরও বিয়ে হয়ে গেছে এবং শেষ মেয়েটির আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হবে।

এবং বলা বাহুল্য, সব বিয়ের সমস্ত খরচটাই ফুলের মালা থেকে শ্যাম্পেন পর্যন্ত সবই বহন করতে হয়েছে টেরেন্স অ্যালানকে।

একথা টাইমস কাগজে কোথাও নেই, কেউ হয়তো স্বীকারও করবে না কিন্তু আমার কেমন মনে হয় এই খরচার জন্যে অ্যালানসাহেব মোটেই দুঃখিত হননি।

তৃতীয় কোকিল

প্রথম এবং দ্বিতীয় কোকিলের পরে, মাননীয় পাঠক, মাননীয়া পাঠিকা, তৃতীয় কোকিল অনিবার্য।

কিন্তু কথা দিচ্ছি, এসব রচনা আপনাদের যত ভালই লাগুক, (অথবা মতান্তরে, অথবা মনান্তরে) যত খারাপই লাগুক এই শেষ, এ-সম্পর্কে, এ-বিষয়ে শেষ কিস্তি।

সাহেবদের টাইমস কাগজের চিঠিপত্রে যাই ছাপা হোক কোকিল বিষয়ে সাহেব কবিরা যা-কিছু লিখে থাকুন কোকিল নিয়ে, আমরা অনেককাল ধরে কোকিল সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

কোকিল বসন্তের পাখি, কোকিল কাকের বাসায় ডিম পেড়ে যায়, কোকিল চাঁদিনী রাতে মর্মস্পর্শী বিলাপ করে। গল্পে, গানে, গাথায় গ্রাম্য কবির 'ও কোয়েল, ও কোয়েল' থেকে মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ কে না কোকিলের কথা ছত্রে-ছত্রে লিখেছেন।

সে যা হোক, এখনও আমাদের আলোচ্য টাইমস কাগজের কোকিল।

১৯৮৩ সালের চৌদ্দই জুন শ্রীমতী রোজমেরি স্যামসন টাইমস সম্পাদককে লিখেছিলেন,

মহোদয়,

গতকাল রাতে, প্রায় মধ্যযামে ঝড় আসার একটু আগে আমি, আমার স্বামী এবং আমাদের এক প্রতিবেশী বন্ধু স্পষ্ট কোকিলের ডাক শুনেছি। বেশ কয়েকবার শোনা গেছে সেই ডাক এবং মনে হয়েছে পাখিটা উড়তে উড়তে ডাকছে।

আমি এর আগে কখনও রাতেরবেলায় কোকিলের ডাক শুনিনি। পাখিটা কি আসন্ন ঝড়ের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিল? কিন্তু তা হলে অন্য কোকিলগুলো ওই সময়ে ডাকল না কেন?

ইতি
ভবদীয়
রোজমেরি স্যামসন

শ্রীমতী স্যামসনের এই চিঠি প্রকাশের চার দিন পরে ১৮ জুন তারিখে ডাঃ পামেলা প্রিয়েস্ট নাম্নী এক ভদ্রমহিলা প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন,

মহোদয়,

শ্রীমতী রোজমেরি স্যামসনের ঝড়ের রাতের কোকিল ডাকার বিষয়ে চিঠি পড়ে আমার মনে পড়ছে আমার ছোটবেলার কথা। যুদ্ধাক্রান্ত সমারসেটে একদিন যখন অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট কামানগুলো রাতেরবেলায় গর্জে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে একদিক থেকে একটা বুলবুলি আর অন্যদিক থেকে একটা কোকিল একসঙ্গে গান জুড়ে দিল।

ইতি
ভবদীয়
পামেলা প্রিয়েস্ট

কিন্তু এখানেই শেষ নয় এবং পরেও শ্রীমতী স্যামসনের চিঠির প্রসঙ্গে টাইমস কাগজের এক কৌতুকপরায়ণ পাঠক, ভদ্রলোকের নাম মিস্টার ডগলাস ভারনন। এক মজার চিঠি লিখেছেন,

মহাশয়,

শ্রীমতী রোজমেরি স্যামসন সম্ভবত জানে না যে কোকিলদের স্বভাবে একটা বিচিত্র দিক হল যে সে যদি কোনও মতে টের পায় যে আশপাশের কাছাকাছি কোথাও টাইমস পত্রিকার কোনও সম্ভাব্য পত্রদাতা রয়েছে তা হলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়, সে উলটো-পালটা আচরণ করতে থাকে।

ইতি
ভবদীয়
ডগলাস ভারনন

রাতেরবেলায় কোকিল ডাকা আমাদের দেশে কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। জ্যোৎস্না রাতে যখন চাঁদের আলোয় ছেয়ে যায় চরাচর, যখন গ্রীষ্মনিশীথে বাতাস চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন আমবাগানের লিচুবাগানের গভীর থেকে কোকিলের ডাক ভেসে আসা স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক, সে ডাক আমরা সবাই শুনেছি, সেই স্বর্গীয় সংগীত শুধু কবিদেরই নয় সাধারণ মানুষকেও মুগ্ধ করে, মোহিত করে, আপ্লুত করে।

কোকিলের প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ বেশি হয়ে গেল। এবার কোকিল সিরিজের শেষে টাইমস কাগজের আর-একটি চিত্তাকর্ষক চিঠির উল্লেখ করি।

এ চিঠিটা লিখেছিলেন বহুযুগ আগে, সেই জন ককবার্ন। বিষয় হল ঘড়ির ভুল সময়।

লন্ডন শহরের রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বড় বড় ঘড়ি লাগানো আছে বাড়ির গায়ে, বাড়ির চূড়ায়। যেমন আমাদের কলকাতা শহরেও কিছু কিছু আছে।

এইসব পথের ঘড়ির সময় বিষয়ে ককবার্ন সাহেব লিখেছিলেন,

মহোদয়,

লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তায় যেসব দেওয়াল ঘড়ি জনসাধারণকে সময় জানানোর জন্যে লাগানো আছে তাদের সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

রাজপথে একশো গজের মধ্যে এমন কয়েকটা ঘড়ি পাওয়া যাবে যার একেকটার কাঁটা একেকরকম সময় দিচ্ছে।

ঘড়িগুলোর নিজস্বতা আছে স্বীকার করতে হবে। একটা ঘড়ির সঙ্গে অন্য ঘড়ির বেশ দু'-চার মিনিট ফারাক।

কিন্তু এতে বৈচিত্র্য যাই ঘটুক না কেন, ভুল সময় দেখানো একটা অপরাধ।

অবিলম্বে একটা আইন প্রণয়ন করা উচিত, যে আইন বলে ঘড়ির মালিকদের বাধ্য করা হবে সঠিক সময় প্রদর্শন করতে অন্যথায় ঘড়ির ডায়াল খুলে ফেলা হবে যতদিন না ঘড়ি ঠিকমতো চালানো হয়।

ইতি
ভবদীয়
জন ককবার্ন

অমল ধবল পালে

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্ষাশেষে প্রথম শারদপ্রাতে আমি এই মহানগরীতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম।

এর আগে অবশ্য আরও দুয়েকবার নেহাত বেড়ানোর জন্যে এবং একবার মাসতুতো বোনের বিয়েতে মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছি। কিন্তু সেই শারদপ্রাতে সবুজ পাসপোর্ট, সবুজ পাঞ্জাবি, এই শহরে আমার পুরোপুরি আসা।

কলেজে ভর্তি হতে এসেছিলাম। তারপর খেলাচ্ছলে, সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু বোঝার আগে প্রায় চার দশক পূর্ণ হতে চলেছে।

সে বছর পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক পর্ষদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরতে একটু দেরি হয়েছিল। রেজাল্ট বেরনোর পরের দিনই বোধহয় আমাকে রওনা হতে হয়েছিল। তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এর পরে আর 'যাত্রাশুভ' ছিল না, সেটাই ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ দিন, তারপরই ভাদ্র মাস, যাত্রা নাস্তি। সুতরাং আমাকে তড়িঘড়ি রওনা হতে হল, বিকেলে রেজাল্ট এল, পরদিন সকালেই কলকাতা যাত্রা।

কত কী ভুলে গেছি এই সামান্য জীবনে।

কত মুখ, কত নাম, কত ঠিকানা। অনেক ভালবাসাভরা স্মৃতি, অনেক বেদনাভরা দুঃখ। কত কিছু আবছা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই চলে আসার দিনটিকে ভুলিনি।

সেটা ছিল একত্রিশে না বত্রিশে শ্রাবণ। আগের দিন আকাশ ঝকঝকে ছিল। বাড়ির মধ্যে উঠোনের পাশে গোলবারান্দায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। পরদিন কলকাতায় চলে আসার উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না চোখে।

মেঘ মুছে যাওয়া বর্ষণশেষের আকাশে হাজার হাজার তারা ঝিকমিক করে জ্বলছে। পায়ের কাছে, সিঁড়ির নীচে, অনেকদিন আগের ভুঁইচাঁপা ফুলগুলো, যাদের সবাই ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ সেদিনই সন্ধ্যায় মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উলটোদিকে হারান মিস্ত্রির বাড়িতে একটা বোকা শিউলিগাছ একটু আগেই ফুল ফোটানো শুরু করেছে। তার সঙ্গে বোকামি করছে আমাদের ভাঙা বাগানের বুড়ো কামিনীফুলের গাছটা, ঠিক চৈত্র মাসের মতো হঠাৎ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

পরেরদিন সকালে বাড়ির থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে বেরিয়ে চার মাইল দূরে নদীর ঘাট থেকে স্টিমারে উঠে বিকেল বিকেল সিরাজগঞ্জ রেলস্টেশন, সেখানের থেকে সন্ধ্যাবেলা সুরমা মেল, পরদিন ভোরবেলায় সরাসরি শেয়ালদা, মোক্ষনগরী কলকাতা।

সুন্দর সকালবেলায় অশ্রুসজলা জননী, চেনা বাড়িঘর, লোকজন, গাছপালা প্রাণপ্রিয় জন্মের শহর ছেড়ে টমটমগাড়িতে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আকাশ অন্ধকার করে তুমুল বৃষ্টি এল, জলের তোড়ে ঝাপসা হয়ে গেল চারপাশের দৃশ্য।

কোনওরকমে ভিজতে ভিজতে বাক্সবিছানা নিয়ে স্টিমারে গিয়ে উঠলাম। রীতিমতো দুর্যোগ, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া নেই তাই রক্ষা, স্টিমার ঠিক সময়েই ছাড়ল এবং পৌঁছাল। সারা দুপুর নদীতে কখনও ঝিরঝির করে, কখনও জোরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল।

সিরাজগঞ্জ ঘাটেও সমান বৃষ্টি। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টির বেগ প্রবলতর হল। তার মধ্যেই রওনা হল সুরমা মেল। ছোট ছোট সব স্টেশন সিরাজগঞ্জ টাউন, রায়পুর, সলপ বৃষ্টির মধ্যে ঢেকে রেখে ঈশ্বরদি জংশন, পদ্মার ওপরে সারা ব্রিজ, পোড়াদহ পার হয়ে এলাম; তখনও অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এরই মধ্যে শুল্কপ্রহরা, ছাড়পত্র সীমান্ত পেরোলাম।

এরপর শেষ রাতের দিকে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি আমার রাত পোহাল শারদপ্রাতে, রোদে ঝলমল করছে চারিধার, ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশে স্বচ্ছ সাদা মেঘ। অন্ধকার মেঘ বৃষ্টির কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত নেই, জলবৃষ্টির পৃথিবী ছেড়ে নীল দিগন্তের দিকে জোর ছুটছে সুরমা মেল।

এক এক করে ক্রমশ ছিটকিয়ে চলে যাচ্ছে পলতা, শ্যামনগর, শহরতলির স্টেশন আর কিছুক্ষণের মধ্যে কলকাতা। পহেলা ভাদ্র, শরৎকালের প্রথম প্রভাতে নীল আকাশের নীচে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মহানগরীতে এসে প্রবেশ করলাম।

এখনও যখন কোনও কোনও দিন বর্ষা শেষ হওয়ার মুখে হঠাৎ মেঘ কেটে নীল রংয়ের আকাশ ঝলমল করে ওঠে ঝকমকে রোদ্দুরে ভরে যায় আমাদের এই নগরীর রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, আমার মনে পড়ে যায় একদা এমনই এক শুভপ্রভাতে এই শহরে আমি চিরদিনের জন্য প্রবাসী হয়েছিলাম।

শিশুশিক্ষার বইতে ঋতু পরিচয়ে লেখা আছে, 'ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল'। যদিও ভাদ্র মাসের অনেকটাই, কোনও কোনও বছর প্রায় পুরোটাই, বর্ষাকালের মধ্যে পড়ে, এমনকী আশ্বিন মাসেও বর্ষা থেকে যায়, বিজয়া দশমীর দিন ঝড়জল তো প্রায় বাঁধা ব্যাপার, কবিও লিখেছেন মেঘে ঢাকা দারুণ দুর্দিনের আকূল আশ্বিনের কথা।

'শরৎ' কথাটির সরাসরি কোনও প্রতিশব্দ নেই ইংরেজিতে, Autumn হল হেমন্ত ঋতু, বিলিতি অভিধানের ভাষায় গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে আমাদের রয়েছে দীর্ঘ বর্ষাকাল। তবে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় অনেকেই শরৎকাল বোঝাতে Early Autumn বা আগ হেমন্ত কথাটি ব্যবহার করেন।

এই পর্যন্ত লেখার পরে অভিধান দেখতে গিয়ে খটকা লাগছে। আমরা ছোটবেলায় বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে যে ষড়ঋতুর কথা জেনেছিলাম সেই হিসেবে শরৎকাল হল ভাদ্র-আশ্বিন। সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত সরল বাঙ্গালা অভিধানে দেখছি যে শরৎকাল হল আশ্বিন-কার্তিক মাস। কিন্তু কার্তিক তো হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস সে কী করে শরতের সঙ্গে জুড়ে গেল?

রাজশেখর বসুও আমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারছেন না। তাঁর চলন্তিকায় দেখছি ওই একই কথা। শরৎ মানে আশ্বিন-কার্তিক, তবে তিনি একটু রফা করেছেন, ব্র্যাকেটে লিখেছেন মতান্তরে ভাদ্র-আশ্বিন। এ বিষয়ে অবশ্য আশুতোষ দেবের অনেক পুরনো 'সরল অভিধান' আমার পক্ষে রয়েছে। সেখানে শরৎ বলতে পরিষ্কার বলা আছে ভাদ্র-আশ্বিন মাস।

কলকাতায় এসে আমি উঠেছিলাম একেবারে শহরের খোদ মধ্যখানে এসপ্লানেডের ডেকার্স লেনে আমার ছোট মাসিমার কাছে। সেটা ছিল সরকারি কোয়ার্টার, সেই বাড়িতে তিনঘর বাঙালি

ছিল পুরো এলাকায় ধারে-কাছে কোনও বাঙালি ছিল না। তখনও সব ইংরেজ চলে যায়নি, তা ছাড়া প্রায় সবাই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, কিছু দক্ষিণ ভারতীয় খ্রিস্টান। পাশেই চিনেপাড়া। ইতস্তত এদিক ওদিক সন্দেহজনক এলাকা।

ওপাড়ায় দুর্গাপুজোর কথা তখন ভাবাই যেত না। কাছাকাছির মধ্যে দুর্গাপুজো বউবাজারে আর তালতলায়। অবশ্য সুরেন ব্যানার্জি রোডে নিউ মার্কেটের ওপাশে রানি রাসমণির বাড়ির প্রাচীন পুজোও ছিল, কিন্তু তখন আমরা তার খবর রাখতাম না।

তখন খবরের কাগজে প্রাচীন বা বিশিষ্ট পুজো নিয়ে এত লেখা, ছবি, আলোচনার আয়োজন ছিল না। লোকমুখে শুনেই সবাই ঠাকুর দেখতে বেরত, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে দমকলের প্রতিমা, শ্যামবাজার বা ভবানীপুরের ক্লাবের ঠাকুর।

অবশ্য কলকাতায় শরৎকালে ঠাকুর দর্শনের খুব একটা সুযোগ আমার হয়নি। তার কারণ তখনও বাড়ির লোকেরা সবাই দেশে। প্রত্যেকবারই পুজোর সময় ষষ্ঠীর দিন শেয়ালদা থেকে রেলে করে বাড়ি ফিরে যেতাম। শেয়ালদা স্টেশন চত্বরে তখন ঢাকের আওয়াজ গমগম করছে, সীমান্তের ওপার থেকে পুজোর চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, কুষ্ঠিয়া থেকে ঢাকিরা এসেছে কলকাতার পুজোয় চারদিনের মেয়াদে। এ তাদের বাৎসরিক বৃত্তি, সারা বছর ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে শুধু এই চারদিন মহানগরীর জন্যে।

শুনেছি এই এতদিন পরে, এখনও ঢাকিরা ওপার থেকে প্রায় একইভাবে শেয়ালদায় এসে পৌঁছায় পুজোর আগে, তবে আমি দেখিনি। ষষ্ঠীর সকালে এখন আর শেয়ালদায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বাড়ি যাওয়া অনেকদিন বন্ধ হয়েছে।

কলকাতায় থাকতে এসে আমার প্রথম যে শারদীয় অভিজ্ঞতা হল সে হল মহালয়ার পুণ্যপ্রভাতে। শেষ রাতে ঘুম জড়ানো চোখে বিছানায় বসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর পঙ্কজ মল্লিকের মহালয়ার দেবীবন্দনা।

আমরা যে সুদূর তেরো নদীর পারের ছোট মফস্বল শহরে বড় হয়েছিলাম সেখানে বেতারযন্ত্র তখনও যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়, ঘরে ঘরে রেডিয়ো পৌঁছোয়নি। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে ও-জিনিসটা ছিল না, পাড়াতেও বোধহয় নয়। সুতরাং কলকাতায় আসার আগে মহালয়ার ভোরের দেবীবন্দনার কোনও ধারণাই আমার ছিল না। শাস্ত্র, স্তোত্র, সংগীতের এমন ভাবগম্ভীর সমারোহ, উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি, শেষরাতের আধো অন্ধকারে সুরের মায়াজাল এক মফস্বল বালকের মুগ্ধ ও শিহরিত হওয়ার পক্ষে এর বেশি কিছু প্রয়োজন ছিল না।

শরৎকাল বলতে পঞ্জিকায় বা ক্যালেন্ডারে যাই বোঝাক, অভিধানের মানে যাই হোক এই শহরে শরৎকালের শুরু ওই মহালয়ার সকালে।

আমাদের ডেকার্স লেনের পাড়ায় চারদিকে যেমন কোনও বারোয়ারি পুজো ছিল না সেইজন্যে চাঁদার উৎপাতও ছিল না। তখন অবশ্য চাঁদা পুরোটা উৎপাত ছিল না। চোখ রাঙানি ছিল না, চাঁদা আদায়ের বেশির ভাগটাই ছিল আদর-আবদার। কিন্তু পুজো না থাকায় আমাদের এলাকায় সেই আদর-আবদারও ছিল না।

চাঁদা নয়। শিউলি ফুলও নয়।

ওই কাঠকট্টর পাড়ায় কোনও বাড়িতে উঠোন ছিল না। গলির মধ্যে একটাও গাছ ছিল না। কোনও জাতেরই গাছ নয়। ডেকার্স লেনের বাড়ির জানালায় বা বারান্দায় কিংবা গলির পথে মেম যুবতীর পাউডার পমেটম বা এসেন্সের উগ্র সুবাস হয়তো কখনও নাকে পেয়েছি কিন্তু ক্বচিৎ এক ঝলক শিউলি ফুলের গন্ধ কখনও বাতাসে আসেনি।

আর কাশফুল? শরৎকালের অন্য অনুষঙ্গ?

কাশফুলের প্রশ্নই আসে না। কলকাতায় কাশফুল ফুটল তো এই সেদিন। পাতাল রেলের মাটি কাটার পর হঠাৎই একদিন এক শারদীয় পুণ্যক্ষণে চৌরঙ্গির সীমানায় ময়দান জুড়ে ফুটে উঠল রাশি

রাশি কাশফুল। কাগজে কাগজে ছবি বেরল নীল আকাশের সাদা মেঘের নীচে কলকাতার ময়দানের হাওয়ায় আন্দোলিত ক্ষুদ্র কাশগুচ্ছের।

আমি কলকাতায় এসে শরৎকালের শিশির, শিউলিফুল বা কাশের গুচ্ছের দেখা পাইনি। প্রথম দিনের প্রবেশ কালে ঝলমলে রোদ্দুরের যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম সেটুকুই যা ছিল শারদীয়।

কিন্তু মহালয়ার দিন শেষ রাতের বেতার তরঙ্গাঘাতে নাগরিক শরৎকালের সঙ্গে পরিচয় হল। এর আগেই অবশ্য পুজোর বাজার কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। হকার্স কর্নার ব্যাপারটা তেমন চালু হয়নি। কেবল কলেজ স্ট্রিটে গোলদিঘির চারপাশে আর বোধহয় ধর্মতলায়। জুতোজামা, শাড়ির বাজার কলেজ স্ট্রিটে, বড়বাজারে। গড়িয়াহাটের রমণীশাসিত বাজার ভাল করে আরম্ভ হয়নি। শুধু দুয়েকটি বড় দোকান মোড়ের কাছাকাছি।

কলকাতার বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো যথা কমলালয়, ওয়াছেল মোল্লা, হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন তখনও জমজমাট। এত না হলেও কাগজে বিজ্ঞাপন বেরচ্ছে পুজোর কেনাকাটার। লাল সালুতে 'সেল, সেল' কিংবা সিনেমায় বিজ্ঞাপনের স্লাইড পুজোর বাজারের খবর বহন করছে।

আস্তে আস্তে টের পাওয়া যাচ্ছে শরৎকাল। মফস্বল থেকে, দিল্লি, পাটনা, বোম্বাই থেকে প্রবাসী বাঙালিরা ঘরে আসছে বছরকার দিনে। রাস্তাঘাটে সপরিবারে তাদের দেখলেই চেনা যাচ্ছে।

মহালয়ার দিন সকালের দেবীবন্দনায় যে নাগরিক শরৎকালের শুরু সেই দিন আরও কিছু বড় ব্যাপার ছিল।

গঙ্গায় তর্পণের স্নান কিংবা কালীঘাট অথবা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম করার মতো ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়াও মহালয়ার দিনটি লক্ষণীয় ছিল আরও দুটো কারণে।

প্রথম হল বিভিন্ন পত্রিকার শারদীয় সাহিত্যসম্ভার, যার ডাক নাম হল পুজো সংখ্যা। সেই সময়েই এগুলো জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে। কাগজগুলো যথাসম্ভব মহালয়ার দিনই বের হত। শারদীয় দেশ তখনও পুরোপুরি গল্প আর কবিতার। কিছুকাল পরে একটি করে উপন্যাসও থাকত। বড় উপন্যাস থাকত আনন্দবাজারে। বেরত মোটা কাগজে, বোর্ড বাঁধাই ছোটদের পূজাবার্ষিকী। তবে এত বেশি শারদীয় সংখ্যা তখন ছিল না। তখনও সিনেমার কাগজ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেনি। তবে অন্য ধরনের কিছু সাপ্তাহিক ও মাসিক ছিল, ছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতা কিংবা হুমায়ুন কবিরের চতুরঙ্গের মতো অভিজাত লিটল ম্যাগাজিন।

মহালয়ার দিন সকালে ধর্মতলার কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় পত্রিকার স্টলে দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে দাঁড়াতাম। সে এক রোমাঞ্চকর শারদীয় স্মৃতি।

আমি তখন উলটোপালটা দিস্তা দিস্তা কবিতা লিখে ছোট বড়, খ্যাত অখ্যাত সমস্ত পত্রিকায় পাঠিয়ে যাচ্ছি; সমস্ত সাধারণ ও বিশেষ সংখ্যায়, শারদীয়া সংখ্যায় অবশ্যই।

আস্তে আস্তে কাঁপা হাতে পত্রিকার পৃষ্ঠা খুলে সূচিপত্রে নিজের নাম খুঁজতাম। হঠাৎ কখনও হয়তো দু'-চার পঙ্‌ক্তি ছাপা হয়েছে। হয়তো বা পাদপূরণের জন্যেই। আনন্দে বিহ্বল হয়ে যাওয়ার বয়েস সেটা, খুশি মনে কার্জন পার্কের দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করতাম বর্ষাশেষের গাছের পাতা, মাঠের ঘাস অনেক বেশি সবুজ। গাছের পিছনে আকাশের নীলে সমুদ্রের চঞ্চলতা, অমল ধবল পাল তুলে সেখানে সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। পকেটের পয়সা দিয়ে আমার লেখা ছাপা হওয়া কাগজটি তখনই কিনে ফেলতাম। কমপ্লিমেনটারি কপি কবে পাওয়া যাবে কে জানে! ততদিন অপেক্ষা করার অবসর কোথায়।

মহালয়ার দিনের দ্বিতীয় বড় আকর্ষণ ছিল সারারাতের থিয়েটার। উত্তর কলকাতায় হাতিবাগানে তখন শ্রীরঙ্গম, রঙমহল, স্টার ইত্যাদি তিন-চারটি থিয়েটার হল পুজোর বাজারে জমজমাট বন্দোবস্ত করত।

এক রাতে তিনটি কি চারটি পালা। শেষরাতে আকাশ ফর্সা হয়ে কাকডাকা পর্যন্ত অভিনয়

চলত। থিয়েটার দেখা শেষ করে লোকেরা ফার্স্ট ট্রামে করে বাড়ি ফিরত। তখন রাস্তা জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে। গ্যাসের আলো নেবাতে কর্পোরেশনের লোকেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি অবশ্য কোনওদিন সারারাত জেগে থিয়েটার দেখিনি। সারারাত জাগার ক্ষমতা দিয়ে ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীতে পাঠাননি। জীবনে একদিনও আমি সারারাত জাগতে পারিনি। তবে এক মহালয়ার রাতে মফস্বলের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে 'হোল নাইট' থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে রাত দশটা না সাড়ে দশটায় প্রথম পালা, বোধহয় সেটার নাম ছিল 'গঙ্গাবতরণ'। শেষ হওয়ার আগেই সিটে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে উঠে হলের সামনের বারান্দায় একটা লম্বা হেলান দেওয়া কাঠের বেঞ্চি ছিল সেটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

ওই থিয়েটার হলের প্রাঙ্গণের মধ্যেই কিংবা আশেপাশে কোথাও সেদিন সারারাত ধরে টুপটুপ করে শিউলি ফুল ঝরে পড়েছিল, আমি ঘুম আর তন্দ্রা জড়ানো হাওয়ার সেই ফুলের সুবাস পেয়েছি।

ভোরবেলা আমার সঙ্গের লোকেরা আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল সেই কাঠের বেঞ্চি থেকে। দু'হাত দিয়ে চোখ কচলিয়ে কোনও রকমে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে সকলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখি বারান্দার একদিকে ওপাশের দেয়ালের সামনে একটা ছোট শিউলি গাছ থেকে অনেক ফুল উঠোনে ঝরে পড়ে রয়েছে। আমি রুমালে কয়েকটা শিউলি ফুল কুড়িয়ে নিলাম। বোধহয় সেই শেষবার। তারপর আর কখনও শিউলিফুল কুড়িয়েছি বলে মনে পড়ে না।

ভোরবেলায় ট্রামে হাতিবাগান থেকে এসপ্লানেড আসতে আসতে দেখলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট আর ওয়েলিংটনের রাস্তায় এধার ওধারে বাঁশ দিয়ে পুজোমণ্ডপের ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। এখনকার মতো এত নয়, তবুও যথেষ্ট। আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কলকাতায় আসার পর প্রথম কয়েক বছর এসপ্লানেড অঞ্চলে থাকার জন্যেই কোনও পাড়ার বা বারোয়ারি পুজোয় আমি জড়িয়ে পড়িনি। তার অন্য একটা কারণ অবশ্য এই যে আসল পুজোর সময় তো আমার থাকা হচ্ছে না। ষষ্ঠীর বোধন থেকে বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত থাকতে না পারলে পুজোর ব্যাপারে জড়িয়ে লাভ নেই।

তবে ডেকার্স লেনের পাড়া ছেড়ে আসার ঠিক শেষ বছরে ঠিক ওখানে না হলেও রাস্তার ওপারে গভর্নমেন্ট প্লেসে দুর্গাপুজো শুরু হয়। বারোয়ারি পাড়ার পুজো। সে বছর কী একটা অশান্তির জন্যে দেশে যাওয়া হয়নি। সেই পুজোতে আমি ছোটখাটো কিছু কিছু কর্তব্য পাড়াবাসী হিসেবে পালন করেছিলাম। খুব সম্ভব ডেকার্স লেনের মাদ্রাজ হ্যান্ডলুমের একটা ছোট আধ পাতা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম সেই পুজোর সুভেনিরে।

সত্যি সত্যি পাড়ার পুজোয় জড়িয়ে পড়ি অনেকদিন পর দক্ষিণ কলকাতায় পণ্ডিতিয়ায় এসে। পুজোর প্রথম মিটিং থেকে শেষ মিটিং, চাঁদা তোলার রসিদ বই ছাপা থেকে হিসেব মেটানো পর্যন্ত সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি সে পুজোর পৃষ্ঠপোষক কিংবা উপদেষ্টামণ্ডলীর তালিকায় একেবারে প্রথম সারিতে এখনও আমার নাম ছাপা হয়।

এই পুজোর মণ্ডপটি ছিল আমাদের একতলায় ফ্ল্যাটের সামনের তিন কোনাচে বসার ঘরের মুখোমুখি। জানলায় দাঁড়ালেই সামনাসামনি প্রতিমা দেখতে পেতাম।

আমাদের প্রিয় সারমেয়ী, তার নাম ছিল চিলি, একবার ঠিক ষষ্ঠীর দিন সকালে চিলির চারটে বাচ্চা হল। দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে।

পঞ্চমীর গভীর রাতে মণ্ডপে প্রতিমা এসেছে। ঘুমের মধ্যে হইচই, বাজনা শুনে বুঝতে পেরেছি। সকালবেলা বাড়ির মধ্যের উঠোনের ধারে পরিত্যক্ত পুরনো রান্নাঘরে চিলির কোলে দুই ছেলে, দুই মেয়ে। আর তখনই জানলা দিয়ে দেখছি ষষ্ঠীর সকাল আলো করে মণ্ডপ জুড়ে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে দুর্গাঠাকরুন এসেছেন।

একটা অধার্মিক, অশাস্ত্রীয় কাজ করে ফেললাম। আশাকরি ধর্মপ্রাণ কেউ অপরাধ নেবেন না।

চিলির পুরুষ বাচ্চা দুটোর নাম রাখলাম কার্তিক, গণেশ, আর মহিলা বাচ্চা দুটোর নাম হল লক্ষ্মী, সরস্বতী। সেই গণেশ এখনও প্রবল প্রতাপে আমাদের বাড়িতে রয়েছে। তার কম্বুকণ্ঠের গর্জনে পুরো পাড়া কাঁপে।

আর বেশি কথা নয়।

কলকাতার আকাশে আবার পেঁজা তুলোর মতো, বিশ্বস্ত সাদা ভেড়ার মতো হালকা মেঘেরা ফিরে এসেছে, আকাশে সেই সাবেকি নীল আভা, ময়দানের এদিক ওদিকে দু'-চারটি কাশফুল ফুটে ওঠার চেষ্টা করছে, শহরতলির গৃহস্থ বাড়ির আনাচে-কানাচে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর ঝরে পড়ছে পুরনো দিনের শিউলি ফুল।

রঙিন বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে দৈনিক কাগজের ক্রোড়পত্র। রাস্তায়, ফুটপাথে, দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। ছুটির ঘন্টা বাজছে, কলকাতা থেকে বাইরে ছুটছে মানুষ। বাইরে থেকে কলকাতায় ছুটছে আরও মানুষ।

একটা তুচ্ছ গল্প বলে শেষ করি।

সেই পণ্ডিতিয়া পাড়ার দুর্গাপুজোয় যেখানে অনেক বছর বারোয়ারি উৎসবে জড়িত ছিলাম, সেখানে গত বছরও একবার গিয়েছিলাম। পুরনো পাড়ার একটা অন্তরের টান থাকে। তা ছাড়া, পুরনো পরিচিত দু'-চারজন এখনও আছেন। আমার সঙ্গে তাঁদের কারও কারও এখনও যোগাযোগ আছে। আমি যাওয়ায় তাঁরা খুশিই হলেন।

ভালই হচ্ছে পুজো। বেশ ধূমধাম করেই। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম, হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে এসে আমার পাঞ্জাবির ঝুল ধরে টানতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'এই যে তারাপদবাবু, তারাপদবাবু।'

আমি বাচ্চাটিকে চিনতে না পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ছেলেটি কোন বাড়ির?'

কেউ কিছু বলার আগে বাচ্চাটিই জবাব দিল, 'আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি আপনার চলে যাওয়ার পরে হয়েছি।'

বাচ্চাটির কথা শুনে মজা পেলাম।

সেই সাদা মেঘ, সেই নীল আকাশ, প্রতিমার মুখে সেই একই আদল।

এরই মধ্যে অবল ধবল পালে সময়ের তরী বয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ফিরে আসছে সেই পুরনো শরৎকাল। নতুন কালের শিশু জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে। আমাদের বয়েস বাড়ছে।

স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি

মহামতি শেক্সপিয়ার তাঁর বিখ্যাত নাটক মার্চেন্ট অফ ভেনিসে একটা মারাত্মক কথা বলেছিলেন। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের নবম দৃশ্যে নারিসা নামে এক নারী চরিত্রের মুখে এই সংলাপটি রয়েছে।

"Hanging and wiving go by destiny" মানে হল ফাঁসি হওয়া আর স্ত্রী পাওয়া দুই-ই ভাগ্যের ব্যাপার। বিয়ে যে একটা চরম ব্যাপার, ফাঁসি কাঠে ঝোলার মতোই মারাত্মক এবং সেটা ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল, শেক্সপিয়ারের এই সংলাপের ব্যাখ্যা এটাই।

শেক্সপিয়ার ছাড়া সক্রেটিস আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল বিয়ের সুখই বেশি না বিয়ে না করার সুখই বেশি।

ওই গ্রিক দার্শনিক অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিলেন, এর কোনওটাই সুবিধের নয়।

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, বিয়ে করলেও সুবিধে হবে না আবার বিয়ে না করলেও সুবিধে হবে না এই হেঁয়ালির মানে কী?

সক্রেটিস সাহেবের পরিষ্কার উত্তর হল, "বিয়ে করলে একদিন আফসোস করতে হবে কেন বিয়ে করেছিলাম এই ভেবে। আবার বিয়ে না করলেও একদিন আফসোস করতে হবে কেন বিয়ে করলাম না এই ভেবে।"

অন্য এক দার্শনিক বলেছিলেন, সবচেয়ে ভাল বিয়ে হল সেটা যেখানে স্বামী কালা এবং স্ত্রী অন্ধ। কথাটার সাদা অর্থ হল বউ কী বলছে স্বামী শুনতে পাবে না আর স্বামী কী করছে (স্বামীরা সাধারণত খারাপ কাজই করে) স্ত্রী দেখতে পাবে না—সেটাই সর্বোত্তম বিবাহ।

তবে সক্রেটিস সাহেবের বক্তব্যের কাছাকাছি উত্তর ভারতের একটা কথা আছে।

কথাটা হল, "বিয়ে জিনিসটা দিল্লির লাড্ডু, খেলেও পস্তাবে, না খেলেও পস্তাবে।"

উটপাখির সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। চিড়িয়াখানায় উটপাখির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা জানতে চেয়েছিলেন, "এ জিনিসটা কী?"

সর্বত্রই কয়েকজন সবজান্তা লোক থাকে, ওই চিড়িয়াখানার মধ্যেও তার অভাব হয়নি। সেই সবজান্তা ব্যক্তিটি উটপাখি নিয়ে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝালেন তারপর বললেন, "সবচেয়ে মজার কথা এটা যে উটপাখি চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পায় না আর যা কিছুই খায় তার সবই হজম করতে পারে।"

উটপাখির এই যোগ্যতা শুনে সবজান্তা ভদ্রলোককে অবাক করে দিয়ে ভদ্রমহিলা স্বগতোক্তি করলেন, "আহা! আমার স্বামী যদি এমন হত।"

অর্থাৎ ভদ্রমহিলার পতিদেবতা যদি সবকিছু একটু কম দেখতে পেতেন আর ভদ্রমহিলার রান্না ছাইভস্ম খেয়ে হজম করতে পারতেন তা হলে কী ভালই না হত।

এরপর একটা বিয়ের গল্প বলি।

এক যুবক তার বন্ধুদের আড্ডায় সে কীরকম বউ আশা করে সেই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিল। সে বলেছিল, "আমার উপযুক্ত স্ত্রী হবে ঝলমলে, ঝকঝকে। সে কথা বলতে পারবে

সবচেয়ে সুন্দরভাবে, সে হবে স্মার্ট, সদাসর্বদাই সুসজ্জিতা, সব বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে তা ছাড়া সে নাচতে পারবে, ভাল গাইতে পারবে।"

ভাবী বধূর রূপগুণের এই ফিরিস্তি শুনে বন্ধুরা তো অবাক, শুধু তাদের মধ্যে একজন বলল, "একটা মেয়ের মধ্যে এতসব পাওয়া অসম্ভব, আসলে তুমি একটা টেলিভিশন সেট কিনতে চাইছ।"

অন্যদিকে এক চিরকুমারী বিলিতি মেমসাহেবের সেই পুরাতন উক্তিটিও স্মরণ করি। এক নাবালক ভাইপো পঞ্চাশ পেরোনো সেই অবিবাহিতা পিসিকে একদিন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, "সোনাপিসি তুমি কোনওদিন বিয়ে করলে না কেন? তুমি এখনও দেখতে ভাল, আগে নিশ্চয় আরও ভাল ছিলে, খাঁটি সুন্দরী ছিলে, তা ছাড়া লেখাপড়া জানো, ভাল চাকরি করো আমাদের মতো উচ্চবংশের মেয়ে তুমি। তবু তুমি বিয়ে করলে না।"

সোনাপিসি বুদ্ধিমতী রমণী, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রের অনাবিল কৌতূহল থামিয়ে খুব শান্ত গলায় তাকে নিজের বিবেচনার কথা জানালেন।

সব ভাইপোর নামই হয় বাচ্চু, যদিও এটা বিলেত দেশের গল্প তবু বাচ্চু নামটাই মানানসই। এই খণ্ডকাহিনীতে বাচ্চু নামটা ব্যবহার করছি।

সোনাপিসি নবযুবক বাচ্চুর মাথার ঘন চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, "বাচ্চু তুই তো জানিস, আমার একটা তোতাপাখি আছে সেটা সারাদিন চেঁচায়?"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ, সোনাপিসি ওই তো খাঁচার মধ্যে রয়েছে তোমার আচাভুয়া কাকাতুয়া। সারা সন্ধ্যা, কাকে যেন ধমকাচ্ছে।"

সোনাপিসি মন দিয়ে শুনে বললেন, "বাচ্চু তুই তো জানিস আমার একটা কুকুর আছে সেটা শুধু শুধু ঘেউ ঘেউ করে।"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ, সোনাপিসি ওই তো টাইগার, ভাগ্যিস চেনে বাঁধা আছে; আমাকে দেখার পর থেকে খালি লাফাচ্ছে আর গজরাচ্ছে, বাঁধা না থাকলে আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে দিত।"

সোনাপিসি ভাইপোর কুকুর বর্ণনা শুনে খুব খুশি হলেন তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার টম বেড়ালটাকে দেখেছিস?"

বাচ্চু বলল, "না তো। তোমার একটা বেড়ালও আছে নাকি?"

সোনাপিসি বললেন, "আরে টম কি বাড়িতে থাকে যে দেখবি। শুধু খিদের সময়ে খাবার খেতে আসে। তুই তো আসিস সন্ধেবেলায়, তখন টম থাকে বাইরে, সারারাত বাড়ি ফেরে না।"

এতসব বলার পর সোনাপিসি বললেন, "বাচ্চু এবার বুঝতে পেরেছিস আমি কেন বিয়ে করিনি?" বাচ্চু বলল, "না।"

সোনাপিসি বললেন, "বিয়ে করব কেন? আমার বরের কী দরকার। আমার তোতাপাখি সারাদিন ধমকায়, আমার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। আমার বেড়াল সারারাত বাইরে থাকে। আমার একটা বর থাকলে সে তো এই সবই করত।"

চিকিৎসা

সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে আছে?

যিনি তাঁর অসুস্থ পোষা কুকুরের জন্যে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন ডাক্তারের দোকানে। কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক সব শুনে এক বোতল ওষুধ দিলেন মহিলাকে।

ওষুধের বোতলটি হাতে নিয়ে অনেক নেড়ে-চেড়ে গায়ের লেবেলের বিবরণী আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়ার পর ভদ্রমহিলা কম্পাউন্ডারবাবুকে বললেন, 'কই এর মধ্যে এই লেবেলের গায়ে তো লেখা নেই যে এটা কুকুরের জন্য অথবা পশুর জন্য।'

এ কথা শুনে কম্পাউন্ডারবাবু জবাব দিলেন, সত্যিমিথ্যা যাই হোক এ রকম জবাব ওঁরা দিয়ে থাকেন, তিনি বললেন, 'আসলে এই ওষুধটা হল জন্তু আর মানুষ দুইয়েরই জন্যে, উভয়েরই কাজে লাগে।'

কম্পাউন্ডারবাবুর কথায় উল্লসিত হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'জন্তু আর মানুষ দুইয়েরই ওষুধ। তা হলে আরেক বোতল দিন। আমার স্বামীর জন্যেও একটা নিয়ে যাই।

এ হল স্বামীর চিকিৎসার গল্প।

এবার তা হলে স্ত্রীর চিকিৎসার গল্পও বলতে হয়।

এ গল্পটা একটু নিষ্ঠুর।

এক ভদ্রলোক এক ডাক্তারের খুবই প্রশংসা করছিলেন। সবাই প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কী?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীর সব অসুখ একদিনে সারিয়ে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী রাতদিন ঘ্যানঘ্যান করতেন মাথাব্যথা, কোমর ঝি ঝি করছে, চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। ডাক্তারবাবুর এক কথায় সব সেরে গেল।'

সবাই অবাক। সর্বরোগহর এমন কী কথা বললেন ডাক্তারবাবু?

তখন ভদ্রলোক জানালেন, 'ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীকে বলেছেন এগুলো সব বয়েস বাড়ার লক্ষণ। কোন মহিলা আর নিজের বয়েস বাড়ার কথা মানতে চান। আমার স্ত্রী এরপর থেকে একদম চুপ করে আছেন।'

এর কাছাকাছি আর একটি গল্প আছে অন্য মহিলাকে নিয়ে যিনি ডাক্তারবাবুর কাছে স্বামীর জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছেন। বৃদ্ধ স্বামী, তরুণী ভার্যা। অন্যান্য ওষুধপত্রের পর কয়েকটা স্লিপিং পিল দিলেন।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, এই পিলটা ওঁকে কখন দেব। ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে দেবেন না। আপনি সন্ধ্যাবেলা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। তা হলেই উনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবেন, সুস্থ হয়ে উঠবেন।

অসুখের এই গল্পে ডাক্তারবাবু একটু এগিয়ে আছেন, বৃদ্ধ রোগীর তরুণী ভার্যার ক্ষেত্রে এ রকম নির্দেশ সম্ভব।

এবার এক নাবালকের উপাখ্যানে যাই যেখানে ডাক্তারবাবু পিছিয়ে আছেন।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারে একটি ছোট শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার বয়েস হবে বছর চারেক। তার পিঠে একটা বড় ফোঁড়া উঠেছে।

সেই ফোঁড়াটা কাটতে হবে। ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডারবাবু আর শিশুটির মা তাকে জোর করে চেপে ধরে রাখল উপুড় অবস্থায়, ডাক্তারবাবু ফোঁড়াটা কাটতে লাগলেন। আর শিশুটি 'মরে গেলাম রে' 'মরে গেলাম রে' বলে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল।

অবশেষে ফোঁড়া কাটা সমাপ্ত হল। এখনও শিশুটি কাঁদছে আর রাগে গজরাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু শিশুটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে নানারকম বাবা-বাছা করতে লাগলেন, অবশেষে সেই পুরনো প্রশ্নটি করলেন, 'বাবা তুমি বড় হয়ে কী হবে?'

অশ্রু ও রোষকষায়িত লোচনে শিশুটি বলল, 'বড় হয়ে গুণ্ডা হব। তোকে পেটাব।'

এবার সরাসরি অন্যরকম অসুখের আলোচনায় যাওয়ার সময় হয়েছে।

জীবনবিমা করার সময় সকলকেই একটা ফর্ম পূরণ করতে হয়। সাধারণত বিমার এজেন্ট বা দালাল মহোদয়েরা বিমাকারকের সঙ্গে বসে এইসব ফর্ম পূরণ করেন।

বলা বাহুল্য যে কোনও সরকারি আধা-সরকারি ফর্মের মতো এই ফর্মের কলমগুলো ভরানো সহজ কর্ম নয়। এজেন্টসাহেবের সাহায্য না নিয়ে এসব ফর্ম পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।

এই ফর্মে বাবা-মা ইত্যাদি নিকটজনের আয়ু, অসুখ ইত্যাদির বিবরণ দিতে হয়। এজেন্টসাহেব একেকটা প্রশ্ন করে তথ্য জেনে নিচ্ছিলেন বিমাকারীর কাছ থেকে আর সেই সঙ্গে ফর্ম ভরে যাচ্ছেন এইরকম একটা ঘটনার আমি একবার সাক্ষী ছিলাম।

ঘটনাটি কৌতুকপ্রদ, কারণ বিমাকারী যে সরল উত্তরগুলি দিচ্ছিলেন সেগুলি লেখা কঠিন, যথা:—

প্রশ্ন: আপনার মা বেঁচে আছেন না মরে গেছেন?

উত্তর: মরে গেছেন।

প্রশ্ন: কীভাবে মারা গেছেন?

উত্তর: অসুখে।

প্রশ্ন: কী অসুখে?

উত্তর: এই মারাত্মক কিছু নয়, সাধারণ অসুখে।

আবার প্রশ্ন: আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

উত্তর: না, তিনিও মারা গেছেন।

প্রশ্ন: কীভাবে মারা গেলেন?

উত্তর: অসুখে।

আবার প্রশ্ন: কী অসুখে?

উত্তর: এই মারাত্মক কিছু নয়, সাধারণ অসুখে।

এ রকম সরল প্রকৃতির লোক অবশ্য সচরাচর দুর্লভ যিনি যে অসুখে লোক মারা যায় সেই অসুখকেও সাধারণ অসুখ ভাবেন, ভাবেন যে সেটা মারাত্মক কিছু নয়।

অন্য ধরনের একটা সত্যিকার মারাত্মক ঘটনার কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। গল্পটা মোটেই সত্যি নয়, বানানো।

গল্পটা এমনিতে খুব সরল এবং সরাসরি। একদিন এক সকালে এক ভদ্রমহিলা আমার সেই ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করেছেন, 'ডাক্তাবাবু কী সাংঘাতিক কথা আমার ছেলে এইমাত্র দুধ খেতে খেতে আস্ত একটা চামচে গিলে ফেলেছে।'

ডাক্তার বন্ধুটি এ কথা শুনে চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। আধ-ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমি এসে দেখছি। কিন্তু তার আগে এই সময়টুকু আপনি কী করবেন?'

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে নির্বিকার ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'কোনও অসুবিধে হবে না।

ভদ্দর আর একটা চামচে আছে। তা ছাড়া আমাদের সকালবেলার চা খাওয়া তো হয়েই গেছে। বিকেলের আগে আর চামচের দরকার পড়বে না।'

পেট থেকে চামচে বার করা কঠিন কাজ, হয়তো অপারেশনও করতে হবে কিন্তু আমাদের অনেকেরই এমন সব যৎসামান্য অসুখ আছে যা কিছুতেই সারে না।

যার সর্দি বা কাশির ধাত আছে, যার মাথাধরার ব্যামো আছে সেই ভুক্তভোগী জানে এর থেকে কোনও মুক্তি নেই। কতরকম চিকিৎসা, কতরকম পরীক্ষা, কত এলিক্সির ভিটামিন আর কম্পাউন্ড গলাধঃকরণ করার পরে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সেই যে বিলিতি একটা কথা আছে না তুমি যদি সর্দির চিকিৎসা করো তবে এক সপ্তাহে সারবে আর যদি কোনও চিকিৎসা না করো তা হলে সাতদিন লাগবে সারতে।

আমার একটা চোখের অসুখ আছে। বাইরের খোলা হাওয়ায় চোখ দিয়ে জল পড়ে।

আমাদের বাড়ির কাছেই ময়দান। আমি স্বাস্থ্যের খাতিরে সেখানে প্রতিদিন সকালে হাঁটতে যাই। কিন্তু যখন বর্ষাকাল কিংবা বিশেষ করে শীতকাল, যখন পুবালি কিংবা উত্তুরে হাওয়া হু হু করে বয় আমার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দখিনা হাওয়াতে এতটা হয়তো হয় না কিন্তু জল পড়ে।

সে যাই হোক অশ্রু সম্বরণ করার জন্যে এক বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসকের কাছে গেলাম, তিনি খুব যত্ন করে আমাকে দেখলেন, ওষুধ দিলেন চোখে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু কিছুতেই চোখের জল পড়া বন্ধ হল না। আবার তাঁর কাছে গেলাম। আবার তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন, এবার তিনি ওষুধ দিলেন, এবার আর চোখে দেওয়ার জন্যে নয়, খাওয়ার ওষুধ দিলেন।

এরপরেও কিছু হল না। আবার ময়দানে যাই আবার হাওয়া লেগে চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ে। আবার ডাক্তারসাহেবের শরণাপন্ন হলাম। আবার তিনি ওষুধ দিলেন তবে এবার আর চোখে দেওয়ার বা খাওয়ার জন্যে নয়, এবার সরাসরি ইঞ্জেকশন।

এতেও কিন্তু কোনও লাভ হল না। ময়দান ভ্রমণের সময় চোখ দিয়ে যথারীতি জল পড়তে লাগল।

ডাক্তারসাহেব কিন্তু এখনও হাল ছেড়ে দেননি বা হতাশ হননি। এবার তিনি আমার পরীক্ষা শুরু করলেন। রক্ত মূত্র সমেত আপাদমস্তক, এক্স-রে থেকে স্ক্যানিং এই শহরে যা কিছু করা সম্ভব সব আমার ওপরে করলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা গচ্চা গেল আমার।

অবশেষে একদিন ডাক্তারসাহেব আমাকে বললেন, 'আপনার রোগটা কিছুতেই ধরা গেল না।'

আমি বললাম, 'তা হলে এত কিছুর পরেও আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে যাবে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না তা কেন? আপনি আর সকালবেলায় খোলামাঠে হাঁটতে যাবেন না, তা হলেই আপনার চোখ দিয়ে জল পড়বে না।'

আমি অবশ্য ডাক্তারবাবুর উপদেশ মান্য করিনি, এখনও হাঁটতে যাই। এখনও হাওয়া লাগলে চোখ দিয়ে জল পড়ে আর ভাবি বৃথা অর্থ নষ্ট হল, বৃথা পরিশ্রম গেল এতসব ডাক্তারি পরীক্ষায়।

আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি বিলিতি জোকবুক সংস্করণ আছে, সেটি অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

এক রোগী তাঁর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্যার, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ঘণ্টাখানেক বড় মাথা ঘোরায়। মাথা ঝিমঝিম করে।'

ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন, 'তারপর?'

রোগী বললেন, 'তারপর মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে মাথাটা আর ঘোরে না।'

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করে তারপর পরামর্শ দিলেন 'আপনি এখন থেকে ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম থেকে উঠবেন।'

এ তবু মন্দের ভাল। বিলিতে গল্পের এই ভদ্রলোকের টাকা-পয়সা কিছু খরচ হয়নি, আমার মতো নানা জায়গায় দৌড়তে হয়নি, নানারকম পরীক্ষার জন্যে।

এতগুলি ভয়াবহ আখ্যানের পরে এতক্ষণে দুয়েকটা আজগুবি গল্পের সময় হয়েছে। আজগুবি গল্পের বিশেষ সুবিধে এই যে গল্পটা কোনও কারণে বিশ্বাসযোগ্য অথবা গ্রহণযোগ্য না হলেও গল্পের মজাটা উপভোগ করা যায়।

প্রথম গল্পটা এক ডাক্তারবাবুর রোগীদের ফল খাওয়ানোর বাতিক নিয়ে। তিনি সব রোগীকেই বলতেন, 'ফল খান, আরও ফল খান। ফলের কোনও কিছু ফেলবেন না, খোসাসুদ্ধ খাবেন। যার যে ফল পছন্দ সেই ফল খাবেন, যতটা পারবেন খাবেন।'

একদিন এক রোগী এসে ডাক্তারবাবুকে জানাল, 'ডাক্তারবাবু আপনার কথামতো খুব চেষ্টা করছি ফল খাওয়ার কিন্তু খেতে তো পারছি না।'

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন?'

রোগী বললেন, 'আপনি তো নিজের পছন্দসই ফল খেতে বলেছেন খোসাসুদ্ধ, তা আমার প্রিয় ফল হল নারকেল। দৈনিক সকালে উঠেই একটা নারকেল খোসাসুদ্ধ চিবোতে চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছি না।

এই বলে রোগী বেচারি ডাক্তারবাবুকে জিব বার করে দেখালেন, 'এই দেখুন ডাক্তারবাবু, নারকেলের ছোবড়ায় আমার জিব কেমন ছড়ে গিয়েছে। নারকেল কেন আমি এখন আর কিছুই খেতে পারছি না।'

এর পরের এবং এই রম্য নিবন্ধের শেষ আজগুবি আখ্যানটি হয়তো কারও কারও পুরনো বা চেনা মনে হতে পারে কিন্তু এই রচনায় মাননীয় ডাক্তারবাবুদের হৃদয়ে আঘাতকারী দুয়েকটি উপাখ্যান আছে বলেই তাঁদের হৃদয়ে আনন্দকারী এই গল্পটি স্মরণ করছি। এই গল্পে রোগীর উচিত শিক্ষা হয়েছে।

এক গোলমেলে রোগী ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়েছেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আপনার কী হয়েছে? আপনার কী কষ্ট? কী অসুবিধে?'

কিন্তু রোগী আগাগোড়া চুপ করে থাকেন, ডাক্তারবাবু যত প্রশ্ন করেন তত চুপ করে থাকেন।

তবে তিনি যে বোবা নন সেটা বোঝা গেল, যখন তিনি ডাক্তারকে বললেন 'আমি বলব কেন আমার কী অসুখ, আমার কী কষ্ট, আপনি ডাক্তার, আপনাকে আমি ভিজিট দিচ্ছি আপনিই বলুন আমার কী হয়েছে, কেন হয়েছে?'

ডাক্তারবাবু খুব চটে গেলেন এ কথা শুনে। তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে রোগীকে বললেন, 'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। আপনার যাওয়া উচিত হবে কোনও পশুচিকিৎসকের কাছে। শুধু তাঁরাই পারেন রোগীকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে চিকিৎসা করতে।

পুনশ্চঃ

কথাটা আগেও বলেছি, এবারও বলি

যে কোনও ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসার জন্যে যান দেখবেন অনিবার্যভাবে তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন,

'সকালে কী খান?...

দুপুরে কী খান?...

বিকেলে কিছু খান কিনা?

রাতে কী খান? মাছ, মাংস না নিরামিষ?'

আপনি হয়তো ভাবেন আপনি কী খাওয়া-দাওয়া করেন সেইসব জেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু আপনার চিকিৎসা করবেন।

তা কিন্তু মোটেই নয়।

আপনি কী খান বা না খান সেটা ডাক্তারবাবু জানতে চান আপনার আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্যে। কারণ তার ওপরই ভিত্তি করে তিনি আপনার চিকিৎসা করবেন। আপনার যত টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা আছে সেই মানের চিকিৎসা হবে আপনার।

ভূত ও রিপোর্টার

এই রম্যনিবন্ধের নাম পাঠ করে অনুগ্রহ করে কেউ আমাকে ভূতবিদ্বেষী ভাববেন না।

ভূতবিদ্বেষী হতে গেলে যে পরিমাণ সাহস, যে রকম মোটা বুকের পাটা লাগে তা আমার নেই, কস্মিনকালেও ছিল না।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। ভূতের সঙ্গে যদি আমার শত্রুতা নাই থাকবে, আমি যদি ভূতবিদ্বেষী নাই হই তা হলে ভূতের মতো একটি প্রাচীন জীবকে আমি কেন এমন বিপদে ফেলব, আমি কেন ভূতকে রিপোর্টারের মুখে ঠেলে দেব।

সত্যি কথাটা হল আমি ভূতকে রিপোর্টারসাহেবের মুখে ঠেলে দিইনি। রিপোর্টারসাহেবই তাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

সম্পাদক মহোদয় রিপোর্টারসাহেবকে পাঠিয়েছিলেন খরা কবলিত অঞ্চলে, সেই দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে একটা বাস্তবানুগ প্রতিবেদনের জন্যে।

কিন্তু রিপোর্টারসাহেব যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারেননি। তার আগেই প্রবল বৃষ্টি নামে এবং একটি স্থানীয় নদীতে ঢল ওঠে, পুরো এলাকা জলে ডুবে বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। খরার প্রতিবেদন করতে এসে বন্যার প্রতিবেদন করা সম্পাদক মহোদয়ের মনঃপূত হবে কিনা এই চিন্তা করে সদর অফিসে রিপোর্টার ফোন করতে গেলেন। কিন্তু এই বন্যায় ফোন অচল, টেলিগ্রামও তাই।

অকুস্থলের রেলস্টেশনে প্ল্যাটফর্মের পাশে একটা পোড়ো ঘরে জলবন্দি হয়ে রইলেন রিপোর্টারসাহেব।

যথাসময়ে এ জায়গায় পৌঁছাতে পারলে রিপোর্টারসাহেবের এত নিগ্রহ হত না।

কিন্তু এখানে আসতে পথে চারদিন দেরি হয়ে গেছে। সেটা অবশ রিপোর্টারসাহেবের দোষ নয়।

পথে এক জায়গায় আফ্রিকার সোমালিয়ায় গণধর্ষণের প্রতিবাদে রেল অবরোধ হয়েছিল। দেড়দিন রেলপথ আটকিয়ে রাখে অবরোধকারীরা। অবশেষে জংশন স্টেশন থেকে রেলের বড়সাহেব এসে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ভবিষ্যতে যাতে এ রকম আর না হয় সেটা তিনি দেখবেন। তখন রেললাইন অবরোধ ওঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা বেগতিক দেখে রেলের ড্রাইভার, ফায়ারম্যান এবং গার্ড—সবাই পলায়ন করেছেন, তাঁদের খুঁজে পেতে আনতে আরও দেড়দিন। অবশেষে রেলগাড়ি চালু করতে আরও একদিন। সবসুদ্ধ চারদিন দেরি হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় দিন থেকে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেটাও অবশ্য অবরোধ উঠে যাওয়ার একটা কারণ, চতুর্থ দিনের শেষে জলে ভাসতে ভাসতে রেলগাড়ি এসে যখন খরা

অঞ্চলে, জেলাসদরে পৌঁছেছে তখন সরকার সেটাকে বন্যাগ্রস্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন।

*

এত কথা অবশ্য ভূতের গল্পে আসা উচিত নয়। কিন্তু গল্পটা ছোট ও পুরনো। তাই পটভূমিকা রচনা করবার জন্যে ভণিতা একটু দীর্ঘ করতে হল।

*

ফোন বিকল। টেলিগ্রামের খুঁটি জলে উপড়িয়ে পড়ে আছে। ট্রেন আসছে না। রিলিফের নৌকা এখনও এসে পৌঁছয়নি।

প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে পোড়ো ঘরে রিপোর্টারসাহেব আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণত রেল প্ল্যাটফর্ম জলে ডোবে না। কিন্তু স্টেশন মাস্টারসাহেব বলেছেন দু' বছর আগেও নাকি ডুবেছিল, বিশেষ করে খরার পরে বন্যা হলে সে নাকি খুব মারাত্মক।

প্ল্যাটফর্মের পোড়ো ঘরের ভেতরটা একটা লোক লাগিয়ে সাফসুফ করিয়ে নিয়েছিলেন রিপোর্টারসাহেব। কিন্তু প্রথম রাতেই ফ্যাসাদে পড়লেন।

চারদিনের ক্লান্তির পরে মেঝের ওপরে চাদর বিছিয়ে মাথায় পোর্টফোলিও ব্যাগটা দিয়ে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘণ্টা কয়েক পরে কী একটা খসখস শব্দে ঘুম ভাঙল তাঁর। ঘুম চোখেই টের পেলেন ঘরের মধ্যে কী যেন একটা ঘুরছে।

চোখে অন্ধকারটা সয়ে যাওয়ার পর রিপোর্টারসাহেব দেখতে পেলেন ভাঙা ঘরের বেড়া ঘেঁষে ঘেঁষে জীর্ণ শীর্ণ কী একটা ছায়ার মতো ঘুরছে।

একবার গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

ছায়ামূর্তি পালটা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?' বেশ ন্যাকান্যাকা খোনা খোনা গলা। রিপোর্টারসাহেব সে গলা শুনে বুঝতে পারলেন তাঁর ঘরে ভূত ঢুকেছে। তিনি জানতে চাইলেন, 'তুমি কি ভূত?'

ভূত বলল, 'হ্যাঁ। আমি এই ঘরে থাকছি। তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ কেন?'

রিপোর্টারসাহেব খেয়াল হল কেউ কেউ তাঁকে এ ঘরে থাকতে মানা করেছিল, বোধহয় এই কারণেই কিন্তু এ নিয়ে এখন চিন্তা করে লাভ নেই। বরং ভূতের একটা ইন্টারভিউ যদি এই সুযোগে নেওয়া যায়। ভূতের মতো মানুষদের ইন্টারভিউ তো সারা জীবন ধরে নিচ্ছেন কিন্তু সাক্ষাৎ জ্যান্ত ভূতের সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্র জগতে হইহই পড়ে যাবে, সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক তৈরি হবে।

রিপোর্টার ভূতকে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, 'শোনো আমি একজন রিপোর্টার। তোমার ইন্টারভিউ নিতে চাই।'

রিপোর্টার এবং ইন্টারভিউ—এই শব্দ দুটো শুনে ভূত থর থর করে কাঁপতে লাগল, হাত জোড় করে বলল, 'আমি এই ঘর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার মতো থাকুন। আমাকে নিয়ে কিছু লিখতে যাবেন না।'

রিপোর্টার বললেন, 'এ তো ভয়ের কিছু নেই। তোমার নামও জানি না। তোমার ছবিও তোলা যাবে না। কেউ বুঝতেই পারবে না যে আমি তোমারই সঙ্গে কথা বলেছি। কাগজে লিখে দেব 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ভূত'।

এরপরেও ভূত ইতস্তত করছে দেখে রিপোর্টার বললেন, 'অবশ্য রিপোর্টের মধ্যে বার কয়েক 'বিশ্বস্ত সূত্রে' ব্যবহার করেও নামধাম গোপন করতে পারি।'

ভূত কী বুঝল কে জানে। সে বলল, 'আপনাদের পাল্লায় পড়লে কারও পরিত্রাণ নেই, তা আমি জানি। যাক, যা কপালে আছে হবে। কী জানতে চান বলুন।'

রিপোর্টার ততক্ষণে পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে ডট কলম, নোটবই সব বার করেছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথমে বলো, তুমি কী করে ভূত হলে?'

এর উত্তরে ভূত একটা আশ্চর্য কথা বলল। সে জানাল, 'আমি বোধহয় ভুল করে ভূত হয়েছি।'

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে রিপোর্টারসাহেব বললেন, 'ভুল করে ভূত? সে আবার কী?'

ভূত বলল, 'সে বড় দুঃখের কথা। বউয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করার জন্যে চারদিন আগে এই স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে নির্জন মাঠের পাশে রেললাইনে গলা দিয়ে শুয়েছিলাম।'

রিপোর্টার বললেন, 'কিন্তু চারদিন আগে তো রেললাইন অবরোধ ছিল।'

ভূত বলল, 'তা আমি জানব কী করে? একদিন, দু'দিন, তিনদিন চলে গেল রেল এল না। কিন্তু এল সাংঘাতিক বৃষ্টি। জলের তোড়ে আর খিদের চোটে আমি মারা পড়লাম। কিন্তু এ ভাবে মারা পড়লে তো আর ভূত হয় না। আনন্যাচারাল ডেথ বা অপমৃত্যু না হলে তো ভূত হওয়া যায় না। আমার মতো সাধারণ মৃত্যু, অনাহারে, না খেয়ে মৃত্যু তো এ দেশে সবসময়ে হচ্ছে। সেসব ক্ষেত্রে কি ভূত হয়?'

এই ভৌতিক প্রশ্ন শুনে রিপোর্টারের মনে একটা অন্যরকম সন্দেহ দেখা দিল। কারণ ভাঙা ঘরের ফাটা বেড়ার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো তখন ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে এবং রিপোর্টার দেখতে পেয়েছেন যে, ভূতের ছায়া পড়েছে জ্যোৎস্নার, যেটা অসম্ভব। রিপোর্টার ভূতকে বললেন, 'তুমি কি সত্যি ভূত? তোমার হাত দিয়ে আমাকে একটু ছোঁও দেখি।'

ভূত বলল, 'এত দূর থেকে হাত দিয়ে আমি আপনাকে ছোঁব কী করে?'

রিপোর্টার বললেন, 'তা হলে তো তুমি ভূত নও। ভূতেরা যে যতদূর ইচ্ছে হাত লম্বা করতে পারে।'

ভূত এবার খুব চিন্তা করল, তারপর বলল, 'তা হতে পারে। আমি বোধহয় এখনও ভূত হইনি। বোধহয় এখনও মারাও যাইনি। বৃষ্টির সময় রেললাইন থেকে উঠে এখানে চলে আসি। চারদিন পেটে অন্ন নেই। ভাবলাম মরে ভূত হয়ে গেছি।'

রিপোর্টারসাহেব তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে দুর্দিনের সঞ্চয় পাঁচশো গ্রাম চিঁড়ে আর একটু গুড়ের একটা ঠোঙা বার করে ভূততে খেতে দিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বহু কথা হল দু'জনের মধ্যে।

দু'দিন পরে কলকাতায় ফিরে রিপোর্টারসাহেব তাঁর প্রতিবেদন পেশ করলেন।

'বন্যাকবলিত অঞ্চলের ভুখা মানুষের আত্মকাহিনী।'

ও রকম মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন বহুকাল কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

হাঁচির গল্প

রম্যনিবন্ধ রচনার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হল তার নামকরণ। কোনও একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে লেখা হলে নামকরণ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। কিন্তু সবসময় বিশেষ ভাল বিষয় থাকে না; যেমন এবার। ফলে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এবারের এই পাঁচমিশেলি নিবন্ধের নাম হল 'অবশেষে হাঁচির গল্প'।

তা হোক এই নামটাই বা খারাপ কী?

রসায়নের ক্লাসে একটা কাচের পাত্রে কিছু অ্যাসিড নিয়ে এসেছেন অধ্যাপক মহোদয়। তারপর একটা বোতল থেকে অন্য কী একটা তরল পদার্থ সেই কাচের পাত্রে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ফেনা বুদবুদ ধোঁয়া উঠতে লাগল।

সে খুবই জ্বালাময়ী ধোঁয়া। ক্লাসসুদ্ধ সব ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক মহোদয় সমেত সকলেই খুব হাঁচতে-কাশতে লাগলেন। সেইসময় অধ্যাপক মহোদয় তাঁর হাতের আঙুল থেকে একটি সোনার আংটি খুলে নিয়ে সেই ফেনিল, বুদবুদময় তরল পদার্থের মধ্যে ফেলে দিয়ে হাঁচতে হাঁচতে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা কেউ বলতে পারো আমার এই আংটিটা এই অ্যাসিডের মধ্যে গলে যাবে কিনা?'

সবচেয়ে পেছনের বেঞ্চ থেকে একটি ফাজিল মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল... 'গলবে না স্যার'।

অধ্যাপক বললেন, 'তোমার উত্তর সঠিক, কিন্তু তুমি কী করে বুঝলে যে এটা গলবে না?'

মেয়েটি বলল, 'গলে যাবার ভয় থাকলে আপনি কিছুতেই স্যার সোনার আংটিটা অ্যাসিডের মধ্যে ফেলতেন না।' বলে খুব হাঁচতে লাগল।

অন্য একটা হাঁচির গল্প একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে। তার খুব সর্দি হয়েছে। সে বাসে একটা সিটে বসে স্কুলে যাচ্ছিল আর ক্রমাগত হাঁচছিল।

এক ভদ্রলোক এই ছেলেটির পাশে বসে যাচ্ছিলেন। এত হাঁচিতে বিরক্ত হয়ে এবং এতৎসত্ত্বেও ছেলেটি রুমাল ব্যবহার করছে না দেখে তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, তোমার রুমাল নেই?'

খোকা হাঁচতে হাঁচতে বলল, 'আছে। কিন্তু অচেনা লোককে আমি রুমাল ধার দিই না।'

হাঁচি ব্যাপারটা মারাত্মক।

সবাই হাঁচে। রাজা-প্রজা, গরিব-বড়লোক, বড়বাবু-কেরানি সবাই হাঁচে। হাঁচতে বাধ্য হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এমনকী দুধের শিশু, মুমূর্ষু ব্যক্তিও হাঁচে।

হাঁচা বন্ধ করা কঠিন। তবে ভদ্রলোকেরা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁচেন। কিন্তু সব সময় বাইরে যাওয়ার অবকাশ জোটে না, তার আগেই অদম্য হাঁচি স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

নিঃশব্দে বা গোপনে হাঁচা মোটেই সম্ভব নয়। অভিধানে হাঁচি মানে পরিষ্কার বলেছে, 'নাক সুড়সুড় করিবার ফলে নাক-মুখ দিয়া সশব্দে বায়ু নির্গম।' এখানে 'সশব্দে' শব্দটি লক্ষণীয়।

তা ছাড়া আরও একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এই আভিধানিক অর্থে, হাঁচি শুধু নাকের ব্যাপার নয়, মুখের ভূমিকাও রয়েছে এতে।

সে যা হোক, শুধু মানুষই যে হাঁচে তা নয়। আমি গোরুকেও হাঁচতে দেখেছি। আমাদের একটি বুড়ো পোষা কুকুর সামান্য ঠান্ডা লাগলে অনবরতই হাঁচে। একবার চিড়িয়াখানার একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারকেও সশব্দে হাঁচতে দেখেছি। শুধু সে হাঁচছিল তাই নয়, তার গলাও ঘড়ঘড় করছিল। সে রাগের বা গর্জনের ঘড়ঘড় নয়। নিতান্তই সর্দির ঘড়ঘড়।

তবে মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি জলচর প্রাণীরা হাঁচে কি না, কীট-পতঙ্গেরা হাঁচে কি না—সে-বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।

কিন্তু সাপ নাকি হাঁচে। প্রবাদকার বলেছেন, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তার মানে হয়তো এই সব হাঁচলে অন্যেরা, সাধারণ লোকেরা টের পাবে না। শুধু অভিজ্ঞ সাপের বেদেরাই বুঝতে পারবে সাপের হাঁচি।

এসব কথা থাক। মানুষের হাঁচির প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

হাঁচির সঙ্গে কাশির, এবং হাঁচিকাশির সঙ্গে সর্দির নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

সর্দি হলে অবশ্যই হাঁচি হওয়ার সম্ভাবনা এবং সর্দির জমাট-মাখা হাঁচিতে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

তবে সব সময়ে হাঁচি মানেই সর্দি নয়। হাঁচি নানা কারণে হতে পারে। রান্নাঘরে শুকনো লঙ্কা-ফোড়ন দিলে সেই ঝাঁঝে বসার ঘরে বসে আমরা হাঁচতে পারি। নাকে ধুলোময়লা গিয়ে কিংবা হঠাৎ রোদ্দুর থেকে ফিরে এসে অথবা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকে হাঁচি পেতে পারে।

চিকিৎসকেরা বলেন, হাঁপানি অথবা একজিমার মতোই হাঁচিও এক ধরনের অ্যালার্জি। কোনও জিনিস শরীরের বা মনের পছন্দ হচ্ছে না। তারই প্রকাশ হল অ্যালার্জি।

হাঁচিও অ্যালার্জি, মানে শারীরিক যন্ত্রের প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদের কারণ সদাসর্বদাই হয়তো স্পষ্ট নয়।

তবে হাঁচির মূল কারণ অধিকাংশ সময়েই সর্দি বা ঠান্ডা লাগা। এবং এই হাঁচি সংক্রামক। সর্দির পোকা এই হাঁচির সঙ্গে ঝড়ায়।

সবচেয়ে মারাত্মক কথা, সর্দি সারানোর কোনও উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কার হয়নি।

বিলিতি রসিকতা আছে, তুমি যদি সর্দি হলে চিকিৎসা না করাও তা হলে সেটা সারতে সাতদিন লাগবেন। আর যদি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ভালভাবে চিকিৎসা করাও তা হলে নিশ্চয় এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে, সর্দি থেকে ভাল হয়ে যাবে।

হাঁচি-কাশি, সর্দির সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল অন্য অসুখের চেয়ে এ অসুখে কষ্ট কম নয়, জ্বালা-যন্ত্রণাও কম নয়। কিন্তু সবাই জানে যে এ অসুখে কেউ মারা যায় না। তাই গুরুত্বও দেয় না। শুধু যে ভোগার সে ভোগে। হিতৈষীরা বড়জোর অনুকম্পা দেখিয়ে বলেন, 'সিজন চেঞ্জের সময়, একটু সাবধানে থাকতে হয়।'

বলা বাহুল্য, বছরের কোন সময়টা সিজন চেঞ্জের সময় নয়, সব সময়েই সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, শীত গিয়ে গরম পড়ছে, গরম থেকে বর্ষা, বর্ষা থেকে শীত। সারা বছরই সিজন চেঞ্জ, সারা বছরই হাঁচি-কাশি।

ভাষা-ভাষা

এক বৃদ্ধ বাঙালি ভদ্রলোক নার্সিংহোমে বিছানায় শুয়ে পরলোকের দিন গুনছেন। তাঁর খুবই খারাপ অসুখ, পরমায়ু প্রায় হয়ে এসেছে।

এইসময় তাঁর কী খেয়াল হল তিনি একদিন তাঁর ছেলেকে বললেন, 'আমার জন্য একজন সংস্কৃত মাস্টারমশাই রেখে দে তো। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে সংস্কৃত শিখব। সকাল-বিকাল দুইবেলা দু' ঘণ্টা করে আমার এখানে এসে পড়িয়ে যাবেন। তা হলে তাড়াতাড়ি শিখে ফেলব।'

পিতৃদেবের অনুরোধ শুনে পুত্র অবাক। অনেক ইতস্তত করে সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এ বয়েসে, এ শারীরিক অবস্থায় নতুন করে সংস্কৃত শিখে কী করবে, কী কাজে লাগবে সংস্কৃত?'

বাবা বললেন, 'তোরা যতই গোপন করিস আমি ধরে ফেলেছি আমি আর বেশিদিন নেই। মারা গেলে স্বর্গে গিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে তো, তখন দেবভাষা সংস্কৃত ছাড়া কোন ভাষায় কথা বলব?'

বৃদ্ধের পুত্রের সঙ্গে সেদিন একটি প্রগলভ পৌত্র তাকে দেখতে এসেছিল। সেই পৌত্রটি হঠাৎ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু দাদু তুমি যে স্বর্গেই যাবে তার কোনও গ্যারান্টি আছে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'না, নরকে গেলেও অসুবিধা হবে না, এতকাল দিল্লিতে, বেহারে ছিলুম। হিন্দি তো আমি বেশ ভাল কইতে পারি।'

এই ভাষাকাহিনীর সারমর্ম হল, হিন্দি নরকের ভাষা। জানি না গোঁড়া হিন্দি অনুরাগীরা চটে গেলেন কি না, তবে গল্প গল্পই এবং যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন কাউকে দুঃখিত করা বা আহত করার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই।

ভাষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাকরণের ভিতরে যদি যেতে হয় কিছুই করার নেই।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল আমাদের মাতৃভাষায় 'ভাষা' শব্দটির একাধিক মানে। যেমন, (১) বাঙাল ভাষায় একটা গ্রাম্য মাধুর্য আছে, আবার (২) বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের ভাষা অতুলনীয় কিংবা (৩) হিন্দি ভাষা শেখা কঠিন নয়।

এই তিনটি উদাহরণের প্রথম ক্ষেত্রে ভাষা শব্দটি ইংরেজির Dialect (বাঙাল ভাষা), দ্বিতীয় ক্ষেত্রে Style (বুদ্ধদেব বসুর রচনাভঙ্গি) এবং অবশেষে Language, হিন্দি ভাষা, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি।

রাজশেখর বসু ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য বা রূপে ব্যববহৃত শব্দগুলি এবং তাহার প্রয়োগ-প্রণালী।'

কী জানি, কিছু টের পাওয়ার আগে ব্যাপারটি বড় জটিল হয়ে গেল এবং আমারও স্মরণ রাখা উচিত ছিল, এই রচনাটির নাম ভাষা নয়—ভাষা-ভাষা এবং এটি একটি রম্যনিবন্ধ।

সে যা হোক, ভাষা শেখার মতো সোজা আর কিছু নেই। যে লেখাপড়া জানে না, অঙ্ক কষতে পারে না, নিজের বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত বলতে পারে না, সে কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতে পারে। সে ভাষা কেউ তাকে শেখায়নি, সে শিশুকালে পরিবেশ থেকে বিনা আয়াসে আয়ত্ত করেছে।

পাটনায় একটি বন্ধু কন্যাকে দেখেছিলাম, তার বয়েস সাত-আট, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। সে বাড়িতে ঠাকুমা-ঠাকুরদা, বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলে বাংলা ঝরঝর করে বলা শিখেছে, স্কুলে ইংরেজি এবং পাড়ার ও ভৃত্যদের সঙ্গে মেলামেশা করে হিন্দি শিখেছে। এই বয়েসে তিনটি ভাষাতেই সে চোস্ত।

এসব সুখবর, এবং এসব নিতান্তই শিশুদের জন্য।

বড় হয়ে সাবালক হয়ে ভাষা শেখা খুবই কঠিন। আর সবসময় সে-ভাষা শেখা কোনও সাজে লাগে না।

একবার আমার প্যারিস শহরে অল্প কিছুদিনের জন্যে যাওয়ার কথা। কার কাছে যেন শুনেছিলাম, ফরাসি সাহেবরা ইংরেজি শুনলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান, কোনও জবাব দেন না। তাঁদের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কথা বলতে হবে, না বললে উত্তর নেই।

অনেক খুঁজে পেতে একটি বিগিনার্স ফ্রেঞ্চ (Beginner's French) বই কিনে যাওয়ার আগে প্রায় প্রতিদিন সাত-আট ঘণ্টা ধরে পড়াশুনো করে বইটা যতটা সম্ভব আত্মস্থ করলাম।

কিন্তু প্যারিসে পৌঁছে অভিজ্ঞতা হল অতিশয় মর্মান্তিক। ওখানকার লোকেরা মানে ওইসব নাক উঁচু ফরাসি সাহেবরা মোটেই বিগিনার্স ফ্রেঞ্চে কথা বলে না। তারা পুরোপুরি ফরাসি ভাষায় কথা বলে এবং তথাকথিত বিগিনার্স ফ্রেঞ্চ তারা জানে না।

অতঃপর সেই শিশুটির গল্প বলি। সে এতদিন তার মা-বাবার সঙ্গে আমেরিকায় ছিল। অতি সম্প্রতি তারা কলকাতায় ফিরে এসেছে।

কলকাতায় এসে আপাতত কোনও ভাল স্কুল না পাওয়ায় এই শিশুটিকে, শিশুটির নাম রতন, পাড়ার কাছে একটা বাংলা স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, প্রবাসে সঠিক বাংলা বলতে শেখা শিশুটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ একরকম ভালই হল, বাংলা স্কুলে সহপাঠীদের আর দিদিমণিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মাতৃভাষা তাড়াতাড়ি শিখে যাবে।

একদিন রতন বাড়ি থেকে টিফিন নিতে ভুলে গেছে। দুপুরে টিফিনের সময় দিদিমণি লক্ষ করলেন রতন বারান্দায় একা একা বসে আছে। টিফিন খাচ্ছে না। তখন দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'রতন তুমি টিফিন খাচ্ছ না কেন?'

রতন বলল, 'আমার টিফিন না আছে।'

রতনের এইরকম ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে দিদিমণি বেশ পরিচিত। তিনি সংশোধন করে দিয়ে বললেন, 'কথাটা হবে—আমার টিফিন নেই। যেমন তোমার টিফিন নেই। তোমাদের টিফিন নেই। আমাদের টিফিন নেই। রামের টিফিন নেই, শ্যামের টিফিন নেই।'

দীর্ঘ উদাহরণ দিয়ে দিদিমণি থামামাত্র রতন প্রশ্ন করল, 'আজ সবার কেন টিফিন না আছে?'

পুনশ্চঃ

এক কুকুরের মালিক একদা বলেছিলেন যে, তাঁর কুকুর কুকুরের ভাষা ছাড়াও বাড়িতে একজন বিখ্যাত ট্রেনারের কাছে অন্য-এক ভাষাতে কথা বলা শিখছে। অন্য ভাষাটা কী জানতে চাইলে, ট্রেনারসাহেব বললেন, 'বেড়ালের ভাষা। কুকুরটা দৈনিক আধঘণ্টা করে মিউমিউ করা শিখছে।'

বালুকা ডাকিনী

বাজারে কোনও জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই জানেন, নতুন করে লেখার কিছু নেই—ঘি, মাখন, দালদা, তেল থেকে শুরু করে তরকারি, মাছ, চাল-ডাল, পাউরুটি, বিস্কুট, এমনকী কয়লা কেরোসিন পর্যন্ত আহারের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত সমস্ত কিছুরই অবস্থা একেবারে অবর্ণনীয়। চেষ্টা করলে জিনিস পাওয়া যাবে না তা নয়, কিন্তু তার জন্যে যে মূল্য দিতে হবে তাতে এক মাসের খরচ পাঁচদিনে ফুরিয়ে যাবে। বাকি পঁচিশ দিন কী করে চলবে?

একটা ছাগলের চারটে-পাঁচটা বাচ্চা হয়। কিন্তু মা-ছাগলের দুধের বাঁট মাত্র দুটো। দুটো বাচ্চায় দুধ খায় বাকি যে দুটো-তিনটে থাকে তারা মায়ের দুধ পায় না। শুধু লাফায়, ওই লাফিয়ে লাফিয়েই বড় হয়।

আমরাও যদি এইভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারতাম! সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন খাব বাকি পাঁচদিন ছাগলের বাচ্চার মতো লাফিয়ে কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের শিং নেই, লেজ নেই আরও অনেক কিছু নেই এবং আরও অনেক কিছু আছে যা ছাগলের নেই।

তবে কী হবে? বহু দিক বিবেচনা করে আমি একটি নিজস্ব সমাধান বার করেছি। অবশ্য আমার এই সমাধানে খুব মৌলিকত্ব আছে বলে আমি দাবি করতে পারি না।

ফুড-হ্যাবিট বা খাদ্যাভ্যাস বদলানোর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু সাবেকি মতে, ভাতের বদলে কাঁচকলা, রুটির বদলে বেগুন, সরষের তেলের বদলে বাদাম তেল ইত্যাদি প্রচেষ্টা এখন আর সম্ভব নয়। অতএব বেগুন-কাঁচকলা দুর্মূল্যতম তরকারি, বাদাম তেল বিলাসিতার সামগ্রী। মুড়ি-মিছরি এক দর হলে একসময়ে বিপর্যয় বোধ হত এখন মুড়ির দাম মিছরির চেয়ে বেশি। মুরগির মাংস তার কৌলীন্য হারাতে বসেছে, বাজারে পাঁঠার মাংস তার চেয়ে বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও এ রকম একটা অবস্থা অকল্পনীয় ছিল।

সুতরাং বাঁয়ে-ডাইনে, সামনে পিছনে কোনওদিকে খাদ্য তালিকা রদবদল করতে গেলে খরচ বাড়বে বই কমবে না।

কখনও বিটনুন দিয়ে কাগজের কুচি খেয়ে দেখেছেন? বিটনুন অভাবে সাধারণ নুন হলেও চলবে কিন্তু বিটনুনে যে স্বাদগন্ধ হবে শুকনো কাগজ খেতে গেলে সেটুকু দরকার। পুরনো খাতা-বই, খবরের কাগজ কাঁচি দিয়ে যত সূক্ষ্ম করে সম্ভব কুচি কুচি করে নিতে হবে। তারপরে অল্প জল ও বিটনুন দিয়ে মেখে ভাল করে রোদ্দুরে মুচমুচে করে শুকিয়ে নিতে হবে। অবশ্য কড়ার উপর চাপিয়ে উনুনে ঈষদুষ্ণ আঁচে লালচে করে ভেজে নিলে খুবই ভাল হয়, কিন্তু আমি গ্যাস, গয়লা, কেরোসিনের সাংঘাতিক দামের কথা বিবেচনা করে ওপাট চুকিয়ে দিতে চাই।

অবশ্য সকলের শুকনো খাবার ভাল লাগে না, হয়তো এই নোনতা কাগজের কুচি খেতে কারও কারও ভাল না লাগতেও পারে। যদিও একটু খরচ পড়বে কিন্তু তাদের কথা বিবেচনা করে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

খাওয়ার পক্ষে পুরনো কাপড়-চোপড় খুবই ভাল জিনিস। একটু পুরনো নরম ধুতি এক রাত্রি জলে ভিজিয়ে তারপর নুন, জিরেবাটা এবং লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মেখে যদি পাউরুটি পাওয়া যায় তবে পাউরুটির সঙ্গে স্যান্ডউইচ করে খেতে অপূর্ব।

পাউরুটি পাওয়া না গেলে, এঁচড় বা বিলিতি কুমড়োর খোসা (সংগ্রহ করা একটু কঠিন কিন্তু দাম আপাতত বেশি পড়বে না) পাউরুটির মতো স্লাইস করে তার মধ্যে ওই 'সল্টেড অ্যান্ড স্পাইসড' ধুতির টুকরো দিয়ে চমৎকার স্যান্ডউইচ হবে। যেটুকু খরচা শুধু ওই নুন-মশলার, বাকি আর সবই প্রায় বিনামূল্যে লভ্য।

নুন-লঙ্কার খরচ বাঁচানোও যে খুব কঠিন তা নয়। এ বিষয়েও আমি যথেষ্ট ভেবেচিন্তে এবং সময়োপযোগী গবেষণা করে একটা সমাধানে আসতে পেরেছি।

কলকাতা থেকে বেরিয়ে একটু শহরতলির দিকে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে নানা ধরনের ছোট ছোট গাছ ও আগাছা। একটু ধৈর্য ধরে ওই সমস্ত গাছের পাতা, শিকড়, ছাল ইত্যাদি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যাওয়ার সময় সঙ্গে একটা ব্লেড বা পেনসিল কাটা ছুরি থাকলে ভাল হয়। সেটা দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে বা শিকড় কেটে এবং পাতা ছিঁড়ে ধীরে ধীরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সব গাছেরই অল্পবিস্তর আলাদা স্বাদ আছে। কোনওটা ঝাল ঝাল, কোনওটা নোনতা নোনতা। খোশকা পাতা বেশ ঝাল, মণ্টের ডাল তিতে তিতে, সজনের ছাল রীতিমতো ঝাল—আমি নিজে এসব আবিষ্কার করেছি।

এইবার বিনাব্যয়ে খাদ্যাভ্যাস বদল। এক রাত্রি ভেজানো পুরানো ধুতির এক বর্গ হাতের একটা টুকরো তিনটে খোশকা পাতা এবং একশো গ্রাম পরিমাণ সজনের ছালের সঙ্গে বেটে দুটো মিষ্টি কুমড়োর স্লাইসের সঙ্গে স্যান্ডউইচ করুন। একদিনে বুঝতে পারবেন স্যান্ডউইচকে কেন হিন্দিতে বালুকা-ডাকিনী বলে। এরপরে আর কোনও খাইখরচা নেই, এবার বিনামূল্যে ছাগ শিশুর মতো লাফিয়ে দিন কাটান।

ফুটবল

ফুটবল খেলার অ আ ক খ জানে না এ রকম লোক বা স্ত্রীলোক এদেশে আজকাল বিরল। এমনকী আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি বাড়ির কাজের মেয়ে সে হয়তো গহন পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, সেও জানে গোল হওয়া কাকে বলে, গোল খেলে হারতে হয় এবং গোল দিলে জেতা যায়। ফুটবলের এই মূলসূত্রটি সে ভালভাবেই জানে।

অথচ ফুটবল খেলার বয়েস এদেশে, শুধু এদেশে কেন প্রায় সারা পৃথিবীতেই এক শতাব্দীর সামান্য কিছু বেশিকাল এবং ধীরে ধীরে ফুটবল জনপ্রিয় হয়েছে এই শতকেরই গোড়ায়।

ফুটবলের সবচেয়ে বড় কথা এ খেলার মোটামুটি নিয়মকানুন একেবারেই কঠিন নয়, নিতান্ত শিশুও বুঝতে পারে। এক অফসাইড এবং কিঞ্চিৎ পেনাল্টি ব্যাপারটা ছাড়া হ্যান্ডবল, ফাউল, কর্নার, থ্রো সকলেরই বোধগম্য। গোল তো বটেই।

আর তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বকাপের কল্যাণে এবং রেডিয়ো, ভিডিয়ো এবং দূরদর্শনের দৌলতে এখন ফুটবল সর্বজনের ঘরের মধ্যে এসে গেছে।

আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে হাডুডু বা কবাডির মতোই ফুটবল খুবই গ্রহণযোগ্য ক্রীড়া।

একটা চামড়ার বল আর একটু ঠান্ডা জায়গা, ঘাসে-ঢাকা মাঠ হোক কিংবা গলির মোড় হোক, পেলেই হল। একটা বলে একটা সিজন চলে যায়, একসঙ্গে বাইশজন খেলতে পারে। মাথাপ্রতি দৈনিক খরচ পড়ে পাঁচ থেকে দশ পয়সা।

একটা বল নিয়ে বাইশজন খেলে, একটা পুরনো রসরচনায় বিষয়টাকে একটু অন্যদিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

এ হল অনেকদিন আগের গল্প। তখনও কিন্তু ফুটবল খেলার রীতিনীতি, আইনকানুন সবাই জানে না।

সেই আদ্যিযুগে এক নটবর জমিদারবাবু তাঁর মহালে গিয়েছেন তদারকি করতে। বিকেলে ভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি, দেখলেন রাস্তার পাশে মাঠে তাঁর প্রজানন্দনেরা একটা গোলমতো চামড়ার জিনিসে লাথি মেরে কী যেন খেলছে পরম উৎসাহে।

জমিদারবাবু এর আগে ফুটবল খেলা কখনও দেখেননি, এ সম্পর্কে জানেন নাও কিছু।

তিনি বয়স্যদের মারফত গ্রামবাসীদের এবং ফুটবল খেলোয়াড়দের কাছ থেকে জেনে নিলেন এই মজাদার ব্যাপারটা কী এবং তারপর মাঠের ছেলেদের ডেকে বললেন, 'তোমরা আমার প্রজাদের ছেলে, আমি খুব দুঃখ পেলাম তোমরা বাইশজনে মাত্র একটা বলে খেলছ। আমি নায়েবমশায়কে বলছি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে আলাদা বল কিনে দেবেন।'

জায়গাটা ছিল নিম্ন পূর্ববঙ্গের নাবা অঞ্চল। সেখানকার গ্রাম্য কথ্য ভাষা একটু অন্যরকম, জমিদারবাবুর বক্তব্য না বুঝতে পেরে ছেলেরা হাঁ করে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। পরে যখন হৃদয়ঙ্গম হল ব্যাপারটা, বাইশটা বল পাওয়ার আনন্দে অবশ্যই 'হিপ হিপ হুর রে' করে উঠেছিল।

জমিদারবাবু 'হির হিপ হুর রে'—কথাটাও আগে শোনেনি..., তবে সে অন্য গল্প।

ঠিক এই জাতীয় আরেকটি গল্প আছে অনেক পরবর্তীকালের, বলা যায় এই আধুনিক সময়ের। এ গল্প এক কাল্পনিক মন্ত্রীকে নিয়ে, সেই তিনি যাঁর নামে অনেক মাথামোটা হাসিঠাট্টার গল্প একদা প্রচলিত ছিল বাজারে।

মাননীয় মন্ত্রীর একটি ফুটবল খেলার ফাইনাল ম্যাচে গিয়েছেন সভাপতি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করতে।

খেলার শেষে পুরস্কার প্রদানান্তে তাঁর ভাষণে তিনি বললেন, 'আমার খুব দুঃখ হচ্ছে এই দেখে যে এ বছর মাত্র দুটি টিম ফাইনালে উঠতে পেরেছে। আমাদের দেশে হাজার হাজার ফুটবল ক্লাব রয়েছে এরপর থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে, নজর রাখতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে আগামী মরশুম থেকে যতগুলি সম্ভব টিম ফাইনালে উঠতে পারে, ফাইনালে উঠে খেলতে পারে।'

অবশ্য এটি একটি অত্যন্ত হাস্যকর গল্প। শুধু মাননীয় মন্ত্রীর বিচারবুদ্ধির ওপর কটাক্ষপাত করা ছাড়া, তাঁকে হেয় করা ছাড়া এই গল্পের, এই জাতীয় সমস্ত গল্পেরই অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

অনেকদিন আগে এই জাতীয় হাস্যকর ইন্টারভিউ দেখেছিলাম একটি ইংরেজি হালকা ম্যাগাজিনে। শুনেছি পরবর্তীকালে সেটা ব্রিটিশ দূরদর্শনেও চিত্রান্তরিত হয়।

পরে জেনেছি ওই মজার সাক্ষাৎকার এবং দূরদর্শনে রূপান্তর যাঁদের করা তাঁরা ব্রিটিশ দূরদর্শনের অনতি সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে জনপ্রিয় কৌতুকজুটি। এই কৌতুকজুটি, যাঁদের নাম এরিক মোরকাম্বে এবং আরনি ওয়াইজ, তাঁরা পূর্বকালের চলচ্চিত্রের লরেল হার্ডি কিংবা মার্কস ব্রাদার্সের মতোই সর্বজনপ্রিয়।

এরিক মোরকাম্বের ফুটবলের ওপরে সাক্ষাৎকার থেকে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ উপহার দিচ্ছি:—

প্রশ্ন: আচ্ছা,আপনি কখনও নিজে ফুটবল খেলছেন?

উত্তর: না। নিজে একা কখনও খেলিনি। অন্যদের নিয়ে একসঙ্গে খেলেছি।

প্রশ্ন: কোথায় খেলতেন?

উত্তর: কেন? ফুটবল খেলার মাঠে।

প্রশ্ন: কী পজিশনে খেলতেন?

উত্তর: অধিকাংশ সময়েই দাঁড়িয়ে খেলতাম, তবে কখনও কখনও পড়ে গেলে শুয়ে বা বসে।

পুনশ্চ:

গল্পটা কার ঘাড়ে চাপাব—পি কে, নাকি অমল দত্ত নাকি সুভাষ ভৌমিক নাকি হাবিবসাহেব? অথবা মিস্টার এক্স ওয়াই জেড?

এঁদের কেউ কেউ আমার আবার বাল্যবন্ধু, কিংবা কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ।

তবু গল্পটা বলি।

কোচসাহেব খেলার আগে তাঁবুতে খেলোয়াড়দের বললেন, 'তোমরা খুব মনের জোরে সাহসের সঙ্গে খেলে যাও। এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও খেলায় হারিনি, ড্র করিনি, গোল খাইনি।'

একটি নতুন ছেলে, সে এবারই স্ট্যান্ডবাই হিসেবে সুযোগ পেয়েছে হঠাৎ কিছু না বুঝে বলে ফেলল, 'কিন্তু, স্যার এই তো আমাদের প্রথম খেলা এ মরশুমের।'

প্রশ্নোত্তর

এবার আমাদের প্রশ্নোত্তর-পর্ব।

এক ধরনের রসিকতা আছে—যা কথোপকথন বা চমকপ্রদ প্রশ্নোত্তরের সুবাদে অনেক সহজে বোধগম্য হয়; অন্তত কথকের বলা কিংবা লেখকের লেখার কাজটা যথেষ্ট সহজ হয়ে যায়।

একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে শুরু করি।

রাশভারি স্বামী তাঁর সরলা স্ত্রীকে নিয়ে এক চিনে হোটেলে খেতে গেছেন। প্রথমে সুপ পরিবেশিত হয়েছে।

স্ত্রী এই প্রথম চিনে হোটেলে এসেছেন। বারবার, আসার পথে এবং আগে স্বামীর কাছে খুঁতখুঁত করছেন, 'ওগো, সাপ, ব্যাঙ, আরশোলা, বাঁদরের খুলি অথবা কুকুরের লেজ—এসব কিন্তু আমি খেতে পারব না।'

স্বামী গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছেন, 'এসব জিনিস চিনে হোটেলে পাওয়া যায় না। এ-সমস্তই তোমার মনগড়া দুর্ভাবনা।'

এইবার সুপ খাওয়ার আদিপর্বে স্ত্রী বেচারা ম্লানমুখে সুপ খেতে খেতে স্বামীকে বললেন, 'ওগো আরশোলা না হোক, আরশোলার ডিম খাওয়া কি উচিত?'

স্বামীদেবতা গম্ভীর মুখে একটা চাপা ধমক দিয়ে স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী সমস্ত বাজে কথা বলছ! সুপটা চমৎকার হয়েছে। খেয়ে নাও।'

সুপ খাওয়া শেষ হওয়ার পর পরিতৃপ্ত স্বামী হোটেলের অন্য লোকেরা যাতে শুনতে না পায় এরকমভাবে গলা নামিয়ে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি হঠাৎ আরশোলার ডিমের কথা বললে কেন?

স্ত্রী বললেন, 'তখন বলেছিলাম, এখন আর কোনও ব্যাপার নেই।'

স্বামী বললেন, 'কেন?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'তোমার সুপের প্লেটে কয়েকটা আরশোলার ডিম ভাসতে দেখেছিলাম, সে তুমি সব খেয়ে নিয়েছ। তাই বলছিলাম, এখন আর কোনও ব্যাপার নেই।'

সারারাত বন্ধ জানলার বাইরে কয়েকটা মশা অপেক্ষায় ছিল।

ভোরবেলায় স্বামী ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু সংসারের কাজ আছে, স্ত্রী ঘুম থেকে উঠলেন, উঠে জানলাগুলো খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান মশাগুলো ঘরে ঢুকল। সারারাতের সেইসব অনাহারী মশা।

কিন্তু প্রশ্নটা হল, মশাগুলো ঘরে ঢুকে যখন নধরকান্তি স্বামীকে বিছানায় শায়িত দেখতে পেল, তারা নিজেদের মধ্যে কী কথা বলল?

মশাদের কথা সবাই বোঝে না, কিন্তু এই গল্পের নায়ক—মানে আমি সেদিন আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে বিছানায় শুয়েছিলাম। স্পষ্ট শুনলাম, মশারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'বহুদিন পরে বিছানায় প্রাতরাশ।'

তা হলে প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে দিই।—

প্রশ্ন: ভোরবেলায় ঘরে ঢুকে মশারা যদি দেখে তখনও বিছানায় ঘুমন্ত মানুষ শায়িত রয়েছে, তা হলে তখন তারা নিজেদের মধ্যে কী বলে?

উত্তর: মশারা পরস্পরকে বলে, 'চমৎকার আয়োজন। বিছানায় প্রাতরাশ।'

তবে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসাই থাকে সমাধানের জন্যে, উত্তরের জন্যে নয়। সেই প্রশ্নগুলি ঠিক প্রশ্ন নয়, বলা চলে আবেদন, প্রার্থনা বা অনুরোধ।

সেই স্থূলাঙ্গিনী মহিলাকে আরেকবার স্মরণ করি। একদিন একটা খুব ভিড়ের বাসে বহু কষ্টে বহু সহযাত্রীকে দলিত-মথিত করে এবং নিজে হাঁসফাস করতে করতে তিনি উঠে এসে কোনওরকমে হ্যান্ডেল ধরলেন, তার পরেই অতি কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কেউ কি আমাকে একটু বসবার জায়গা দেবেন না?'

সবাই জানেন, এ ধরনের, কাকুতিমিনতিতে মহানগরীর যানবাহনে খুব-একটা সুবিধে হয় না, কিন্তু উক্ত ভদ্রমহিলা তখন প্রচণ্ড ঘেমে গেছেন, দরদর টপটপ ঘামের জল পড়ছে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে, সমস্ত শরীর ঘামে-ভেজা, তার ওপরে মারাত্মক হাঁফাচ্ছেন।

অবশেষে সামনের সিটের এক অতি শীর্ণ, কৃশকায় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন এবং মহিলাকে বললেন, 'দিদি, আপনাকে পুরো জায়গা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি এই সামান্য চার আনা চাঁদা দিলাম আপনার বসার জন্য।'

পুনশ্চে যাওয়ার আগে মশার গল্পে আরেকবার যাই।

এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে কয়েকটা মশা অবাক হয়ে সবকিছু দেখছিল। ছোট মশাটি বড় মশাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়মামা, এরা যে রক্ত দিচ্ছে, হাসিমুখে রক্ত দিচ্ছে, সেটা আমাদের দেয় না কেন?'

বড়মামা উত্তর দিলেন, 'সেটাই তো দুঃখের কথা। এর এক শতাংশ রক্ত খাওয়ার চেষ্টা করলেই মানুষের হাতে আমাদের মারা পড়তে হবে।'

পুনশ্চ:

(এক) দূরদর্শনের একটি কাল্পনিক বিজ্ঞাপন:—

সুন্দরী তরুণী প্রশ্ন করছেন, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আমি আমার নিশ্বাসের দুর্গন্ধ কীভাবে দূর করতে পারি?'

ডাক্তারবাবু সুন্দরীর মুখমণ্ডল থেকে যথাসাধ্য দূরে নিজের মুখমণ্ডলকে সরিয়ে এবং তা ছাড়াও বাঁ-হাতে নিজের নাক টিপে ধরে উত্তর দিলেন, 'নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিন।'

(দুই) অন্য এক ডাক্তারের কূট প্রশ্ন এবং উত্তর:—

একঘেয়েমি ভাল নয়, এবার আর সুন্দরী তরুণী নয়, মধ্যবয়সি ভদ্রলোক, তবে তিনিও ডাক্তারখানায়। অবশ্য এ ডাক্তার সাধারণ ডাক্তার নন, ইনি মানসিক রোগের ডাক্তার।

ভদ্রলোকের সরাসরি প্রশ্ন: 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আমাকে আমার বাড়ির লোকেরা পাগল ভাবে কেন?'

ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন: 'কেন?'

ভদ্রলোকের উত্তর: 'কারণ আমি সাদা রুমালের চেয়ে রঙিন রুমাল বেশি পছন্দ করি।'

ডাক্তারবাবুর উত্তর: 'তাতে কী হয়েছে? আমিও সাদা রুমালের চেয়ে রঙিন রুমাল পছন্দ করি।'

ভদ্রলোকের এবার উত্তেজিত হওয়ার পালা, তিনি প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনিও রঙিন রুমাল পছন্দ করেন? কী আশ্চর্য! কী সৌভাগ্য আমার! কিন্তু একটা কথা বলুন ডাক্তারবাবু, সাদা রুমাল আপনি ভেজে খেতে পছন্দ করেন, নাকি সেদ্ধ করে খেতে? নাকি এমনিই কুচিকুচি করে একটু নেবুর রস আর কাসুন্দি দিয়ে?'

অসম্ভব

এক ডাক্তারবাবু নাকি রোগী দেখার পর দুটো বড়ি রোগীকে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই দুটো বড়ি খেলেই হয়ে যাবে। একটা বড়ি ঘুম থেকে ওঠার আগে খাবেন, আর একটা ঘুম থেকে ওঠার পরে খাবেন।'

রোগী বেচারা সরল বিশ্বাসে বড়ি দুটো নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে আবিষ্কার করে ব্যাপারটা অসম্ভব, ঘুম থেকে ওঠার আগে কী করে বড়ি খেতে হয় সে তা জানে না।

এই জাতীয় অন্য একজন রোগী আরেকরকম বিপদে পড়েছিলেন।

এমনিতে, খুব সোজা মনে হলেও সেটা খুবই একটা অসম্ভব সমস্যা।

ডাক্তারবাবু রোগীকে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর হাত-মুখ ধুয়ে ওষুধের বড়ি খালি পেটে খেয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পরের দিন খুব সকাল সকাল রোগী আবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এল।

ডাক্তারবাবুকে অনেক রাত পর্যন্ত রোগী দেখতে হয়, তাই সেই পরিশ্রমটা পুষিয়ে যেন সকালের দিকে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে। আজ রোগী যখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসেছে তখনও ডাক্তারবাবু শুয়ে আছেন। অনেক হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচির পর বিছানা ছেড়ে তিনি ঘরের বাইরে এলেন।

তাঁকে দেখতে পেয়েই রোগী বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনি যেভাবে ওষুধ খেতে বলেছিলেন তা মোটেই সম্ভব নয়।'

ঘুম জড়ানো চোখ কচলাতে কচলাতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কীভাবে ওষুধ খেতে বলেছিলাম?'

রোগী বলল, 'আপনি বলেছিলেন দুটো ওষুধের বড়ি খালি পেটে খেতে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, খুব অবাক হয়েই বললেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

রোগী বলল, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, আজ সকালে একটা বড়ি খাওয়ার পরে খেয়াল হল, এরপরে তো আর খালি পেট রইল না। এবার দ্বিতীয় বড়িটা খালিপেটে খাই কী করে?'

এই অসম্ভব সমস্যার কী সমাধান ডাক্তারবাবু করেছিলেন, তা আমরা জানি না।

মহাবীর নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন, 'একমাত্র মূর্খের অভিধানেই অসম্ভব শব্দটি পাওয়া যায়।'

মহাবীর নেপোলিয়ন মূর্খ ছিলেন না অবশ্যই। কিন্তু তাঁর এই উক্তিটি তাঁর নিজের জীবনেই খাটেনি।

অন্য এক ব্যক্তি একটু অন্যরকম কথা বলেছিলেন, কথাটার মূল্য আছে। কথাটা হল, 'কোনও কিছুই অসম্ভব নয় সেই লোকটির কাছে, যাকে এই কাজটি নিজেকে সমাধান করতে হবে না।'

তবে কিছু জিনিস তো অসম্ভব থাকবেই। সেই কত যুগ আগে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, গ্রিক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনেস পরিষ্কার বলেছিলেন, 'কাঁকড়ার পক্ষে কি আর সোজা হয়ে হাঁটা সম্ভব?'

অর্থাৎ কাঁকড়ার পক্ষে সোজা হয়ে হাঁটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী, তার শারীরিক গঠনের বিরোধী। সে চেষ্টা করলেও সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে না।

যে যা পারে তার পক্ষে সেটাই সম্ভব।

আমার পক্ষে হাজার চেষ্টা করেও শ্যামকুমারবাবুর বা ভবদুলালবাবুর মতো লেখা সম্ভব নয়।

এবং এও নিশ্চয়ই শ্যামকুমারবাবু বা ভবদুলালবাবু প্রাণপাত করেও আমার মতো লিখতে পারবেন না। শ্যামকুমারবাবু-শ্যামকুমারবাবুর মতো, ভবদুলালবাবু-ভবদুলালবাবুর মতো এবং আমি তারাপদবাবু-তারাপদবাবুর মতো লিখতে পারব।

বাজে কথা নয়, গল্প বলি।

অসম্ভবের শেষ গল্পটা একটু অন্যরকম।

একদিন সকালবেলা রাস্তায় দেখি একটি খবরের কাগজের হকার, খুবই অল্পবয়সি ছেলে, নানারকম দৈনিক পত্রিকার বিশাল বোঝা কাঁধে করে বিলি করতে বেরিয়েছে।

আমার একটু মায়া হল। ছেলেটিকে ডেকে বললাম, 'এ তো অসম্ভব কথা। এত ভারী কাগজের বোঝা বইতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না।'

ছেলেটি অমায়িক হেসে বলল, 'আমার কেন কষ্ট হবে স্যার? আমাকে তো আর এই খবরের কাগজগুলো পড়তে হয় না। আমি শুধু বিলি করি।'

পুনশ্চ:

এটি এক গাঁজাখোরের গল্প।

সে এক গাঁজার আড্ডা থেকে প্রভূত নেশা করে বাড়ি ফিরছিল।

এই ফেরার পথে সে একদিন একটা অসম্ভব সমস্যায় পড়েছিল। আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হলেও, বলাবাহুল্য গাঁজাখোরেরা প্রায়শই এ রকম সমস্যায় পড়ে থাকে।

এই গাঁজাখোরের বাড়ি এবং গাঁজা খাওয়ার আড্ডাটা একই রাস্তার দুই প্রান্তে। শুধু রাস্তার এপার আর ওপার। পূর্ব-পশ্চিম রাস্তার এপাশের ফুটপাতের শেষ মাথায় গাঁজাখোরের উত্তরমুখী বাড়ি আর অন্য মাথায় বিপরীত ফুটপাতে গাঁজার আড্ডা।

গাঁজার আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরার পথে কীরকম সব ঘুলিয়ে গেল গঞ্জিকাসেবীর, সে একবার একজনকে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা, রাস্তার ওপারটা কোথায়?' পথচারী উলটোদিকের ফুটপাত দেখিয়ে দেয়।

এরপর উলটোদিকে ওই একই প্রশ্ন করাতে ওদিকের পথচারী এপাশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

সেদিন আর গঞ্জিকাসেবীর বাড়ি ফেরা সম্ভব হল না। সারারাত ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে

লোকটি আর বলতে থাকল, 'এ তো অসম্ভব ঝামেলা। সবাই মিলে আমাকে পাগল পেয়েছে নাকি। রাস্তার এদিকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'এপার এদিকে আবার ওপারে গেলেই এদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, এপার এদিকে। ওপার যে কোনদিকে বাবা কে জানে?'

অনুমান করি এবং আশা করি যথাসময়ে নেশা কাটলে এই গঞ্জিকাসেবী ভদ্রলোক রাস্তার এপার এবং ওপারের তারতম্য ধরতে পেরেছিলেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিলেন।

পুনশ্চের গল্পটি এবারে বড় হয়ে গেল। সুতরাং যথোচিত এক ক্ষুদ্র পুনশ্চ জুড়ে দিয়ে শেষ করি।

পুনশ্চ: একটি অসম্ভব বিবাহ-বিচ্ছেদ।

এ রকম বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ফরাসি দেশ ছাড়া আর কোথায়ই-বা সম্ভব।

এক ফরাসি রমণী খুব গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত। অনেক খুঁজে খুঁজে সে একটা নতুন রহস্যকাহিনী কিনে এনেছে। এদিকে হয়েছে কী তার ফাজিল স্বামীর বইটা আগেই পড়া। সে টেবিল থেকে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বইটা তুলে নিয়ে মলাটে লিখে রাখল সেই খুনের কাহিনীর অপরাধীর নাম। ফলে গল্প পড়ার সমস্ত উত্তেজনাই মাটি।

নিষ্ঠুরতার দায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করলেন স্ত্রী এবং মামলাটা জিতলেন। ফরাসি আদালত কিনা।

রসিকতার উৎস সন্ধানে

(এক) পাঠিকা ঠাকুরানি

'যা দেবী সর্বভূতেষু
পাঠিকারূপেন সংস্থিতা
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ
নমঃ তস্মৈ নমো নমো।

মধ্যযুগের কবিরা, এমনকী গত শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কবিকুল তাঁদের রচনা শুরু করতে নারায়ণ, সরস্বতী, কিংবা গণেশের বন্দনা করে।

আমার নারায়ণ-নারায়ণী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ সবই ওই পাঠিকা ঠাকুরানি। তাঁর রাতুল চরণে এই দেহ নিবেদিত, তাঁর কোমল হৃদয়ে এই প্রাণ বিসর্জিত।

বেশি ভণিতা করে সময় এবং স্থান নষ্ট করতে চাই না। আসল কথাটা বলি। আসল কথা মানে আসল সমস্যা।

আসল সমস্যা ভুলো মন দিয়ে। বিস্মরণ নিয়ে।

আমরা কত কী ভুলে যাই। সেই যে দম্পতি ছুটিতে বেড়াতে যাবে বলে রেলস্টেশনে উপস্থিত হয়েছিল সতেরোটা বাক্স, এগারোটা ব্যাগ, আটটা খুচরো মাল, চারটে বেডিং (স্বামী-স্ত্রী দুজনের যুগ্ম এবং বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ব্যবস্থাসহ) এবং একটা জলের কুঁজো, একটা চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে—

ভালই চেনেন তাদের পাঠিকাকর্মী (আমার রচনাকে সর্বভারতীয় করতে চাই, অন্যথায় পাঠিকা ঠাকুরানিই আমার পছন্দ, অবশ্য বধূ ঠাকুরানির পরে)।

রেলস্টেশনে পৌঁছনোর পর স্ত্রীরত্ন স্বামীরত্নকে কী বলেছিল মনে আছে—

স্ত্রীরত্ন—ওগো এত জিনিস আনলাম, যদি ফ্রিজটাকেও আনতাম।

স্বামীরত্ন—ফ্রিজ নিয়ে কেউ ট্রেনে যায়?

স্ত্রীরত্ন—কিন্তু সেই ফ্রিজের উপরে যে আমাদের ট্রেনের টিকিট দুটো ফেলে এলাম।

এর পরের ঘটনার দায়িত্ব আমাদের নয়। কিন্তু অন্য একটা গোলমেলে গল্প মনে পড়ছে।

গল্পটা একেবারেই জটিল নয়, বরং বেশি সোজা। এক অনিদ্রার রোগী প্রচুর ওষুধ খেয়ে অবশেষে স্মৃতিভ্রংশের অসুখে পড়ল। এবং তারপর পরিণতি হল ভয়াবহ।

সে লোকটি ভুলে গেল যে সে অনিদ্রা রোগী। এরপর থেকে সে সারা দিনরাত ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।

স্যার ওয়ালটার স্কটের বিস্মৃতিশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। একদা তিনি একটি কবিতা লর্ড বায়রনের রচনা বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। মজার কথা এই যে ওই কবিতাটি মোটেই লর্ড বায়রনের লেখা ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা ওই কবিতাটি স্যার ওয়ালটার স্কট নিজেই লিখেছিলেন।

আমার অবস্থা এখন স্যার ওয়ালটার স্কটের চেয়েও করুণ। এখন পর্যন্ত আমার রম্যরচনার সংখ্যা সহস্রাধিক এক কিংবা তারও বেশি। এই এক সহস্র এক রচনার প্রত্যেকটিতে যদি আমি গড়ে পাঁচটা করেও রসিকতা করে থাকি, তা হলে এ যাবৎ লিখিত রসিকতার সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি।

আমি এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার রসিকতার দোদুল্যমান তরণী এখন স্বেচ্ছায় ভেসে যাচ্ছে।

হায়! কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো আমার তো সাহস নেই। আমি তো জোর গলায় বলতে পারি না, 'আমি স্বেচ্ছাচারী।' সর্বদা ভয়ে ভয়ে, সদাসংকোচে থাকি এই বুঝি নিজের করা পুরনো রসিকতা আবার করে ফেললাম, এই বুঝি ধীমতী, স্মরণসম্ভবা পাঠিকা ঠাকুরানি ঠোঁট উলটিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু? এই রসিকতাটা আর ক'বার করবেন?'

ক্ষমা চাই।

হে মুখরা পাঠিকা, তোমার কাছেও ক্ষমা চাই। তুমি আছ বলেই আমি আছি। তুমি পড়ো বলেই আমি লিখি। আমার লেখা ছাপা হয়। তুমি কেনো বলেই আমার বই বিক্রি হয়। আগে তোমাকে খুশি করার জন্য অন্যের লেখা থেকে চুরি করতাম, বিলিতি বই থেকে টুকতাম, এখন ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, নিজের লেখা থেকেই চুরি করছি, নিজের রচনা থেকে টুকছি।

সুতরাং আরেকবার সেই পুরনো কথাটা স্মরণ করি।

এক নদীতে দু'বার ডুব দেওয়া যায় না। একই বিছানায় দু'বার শোয়া যায় না। একই মুখের ছায়া যেমন মুকুরে দু'বার পড়ে না। তেমনি একই রসিকতা দু'বার করা যায় না।

মার্কিন দেশের লুইসানিয়ার নিউ আরলিনস শহরের প্রাচীন পৃথিবী মানে ওল্ড ওয়ার্লড (Old World) ক্লাবের ভাইস চেয়ার-পার্সন (Vice Chair person) শ্রীমতী থুরি এম এস (MS) লিওনা কার্পেন্টার শুধু প্রাচীন পৃথিবীর নয়, বর্তমান পৃথিবীরও সবচেয়ে সুরসিকা পাঠিকা (তিনি বাংলা জানেন না তাই আমার রক্ষা, না হলে সব ধরে ফেলতেন)।

জগৎ সংসারে এমন কোনও রসিকতা নেই যা লিওনা কার্পেন্টার পাঠ করেননি বা শোনেননি, কিন্তু সকলের সেটা খেয়াল থাকে না। থাকার কথাও নয়। এমনকী এই যে এই অধমাধম, শ্রীল শ্রীযুক্ত তারাপদ রায়, এই আমাকেও এমন সব রসিকতা অহরহ শুনতে হয় যেসব আমি নিজেই একাধিকবার লিখেছি।

এসব আলোচনা থাক। লিওনা মেমসাহেবের গল্প বলি।

মেমসাহেবের বয়েস হয়েছে মার্কিনিদের কৈশোর পেরোয় পঞ্চাশে, সে হিসেবে মধ্য পঞ্চাশের লিওনার এখন পূর্ণ যৌবন। তাঁর চেহারা এখন টইটম্বুর, ভরা বর্ষার দিঘির মতো। ফলে তাঁর স্তাবক-অনুস্তাবকের কোনও অভাব নেই। এর মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁকে রসিকতা শোনানোর চেষ্টাও করেন, মজার গল্প বলে আনন্দ দিতে চান। আমি মহিলার রসবোধ এবং রসিকতা জ্ঞান দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে যদিও সামান্য পরিচয় হয়েছিল মেমসাহেবের। একদিন এক মহোৎসাহী যুবক টাটকা রসিকতা ভেবে দুয়েকটা পচা গল্প বলল লিওনাকে। লিওনা শুনে খুব হাসলেন।

কিছুক্ষণ বাদে যুবকটি চলে যাওয়ার পরে লিওনাকে আমি বললাম, 'আচ্ছা আপনি যে এই রদ্দি গল্প শুনে হাসলেন, এ গল্প তো আপনি অনেক আগে থেকেই জানেন। নিজেও বলেছেন, নিশ্চয় দু'-চারবার।'

মৃদু হেসে বুদ্ধিমতী লিওনা বললেন, 'জানি কিন্তু ও যেভাবে বলেছিল তাতে আরও বেশি মজা পাচ্ছিলাম।'

আমি বললাম, 'কীসের মজা?'

লিওনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর মধুর হেসে বললেন, 'মজা নষ্ট হওয়ার মজা।'

এই বিলিতি গল্পটির এখানে হয়তো উপস্থাপন করার তেমন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু নিজের সুবিধের এবং আত্মরক্ষার জন্যে এই আখ্যানটি আমি বললাম।

মোটকথা, আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হল শ্রীযুক্তা লিওনা কার্পেন্টারের মতো সুরসিকা যদি পুরনো অখাদ্য হাসির গল্প, যা কিনা বহুশ্রুত এবং যাকে সাদা বাংলায় বলা চলে 'বস্তাপচা' তাই শুনে হাসতে পারেন তবে তুমি কেন হাসবে না।

গল্পটা যদি ধরতেও পারো, যদি মনে হয় চেনা চেনা, তুমি নিজেই হয়তো এ গল্প, এই রসিকতা অন্যদের কাছে করেছ তবু আরেকবার হাসো।

হাসতে দোষ নেই।

হাসো। তারাপদ রায়ের সঙ্গে হাসো।

আরেকবার হাসো।

(দুই) নস্যির কৌটো

'He must not laugh
at his own wheeze
A snuffbox has
no right to sneeze'.

ইংরেজি এই শ্লোকটির রচয়িতার নাম আমি জানি না তবে সাদা বাংলায় এর তরজমা করলে দাঁড়ায়—

নস্যির কৌটোর যেমন
নিজের হাঁচবার অধিকার নেই
তেমনি যে রসিকতা করে
তার অধিকার নেই হাসবার।

শ্লোকটি খারাপ নয় কিন্তু এর মর্মার্থ সর্বগ্রাহ্য নয়।

আমি নিজে দু'জন কালোত্তর মহারসিককে দেখেছি, একজন পরশুরাম এবং দ্বিতীয়জন শিবরাম। দু'জনেই আমার মহাগুরু। দু'জনের কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম।

পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসুর মতো গল্প বাংলা ভাষায় আর কেউ লেখেনি। এ রকম সহজ ও সরাসরি মন্তব্য করার পরে পরশুরামের গল্প নয়, গল্পের মধ্যের দুটো শ্লোক স্মরণ করছি।

প্রথমটিতে পাখোয়াজের তাল, চৌতাল, ছ'মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক—

ধাধা ধিন তা কৎ তাগে, গিন্নি ঘা দেন কর্তাকে
ধরে তাড়া করে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নি কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধরে ঘন ঘন ঘা কত ধূমধূম দিতে থাকে
টুটি টিপে ঝুঁটি ধরে উলটে পালটে ফ্যালে
গিন্নি ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নিধন কর্তা গাধা—'

অথবা একই গল্পে ঠিক এরই বিপরীতে

'ধনী শুনছ কিবা আনমনে,
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি
ডাকছে তোমায় বাঁশবনে
ওটা যে খ্যাঁকশিয়ালী,
দিও না কুলে কালি
রাত-বিরেতে শ্যাল কুকুরের
ছুঁচো প্যাঁচার ডাক শুনে।'

পাশাপাশি শিবরামকেও একটু স্মরণ করা যাক।

একটি নাটক রচনার ব্যাপারে নটশ্রেষ্ঠ আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ওপর অভিমানভরে তিনি লিখেছিলেন,

'শিশির ভাদুড়ী নহ
তুমি বোতলের।'

বলাবাহুল্য, আমার এই বর্তমান লেখায় পরশুরাম এবং শিবরামের এই শ্লোকগুলি নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। শুধু রসিকতার আবহ রচনা করার জন্যে স্মৃতি থেকে এগুলো উদ্ধার করলাম।

আসল জিজ্ঞাসা হল, নস্যির কৌটো হাঁচবে কি না? এইসব কাব্যকৌতুকী কিংবা নিজেদের অন্য কোনও রসিকতা পাঠ করে বা স্মরণ করে পরশুরাম এবং শিবরাম নিজের মনে হাসতেন কি না? অথবা যখন তাঁরা আড্ডায় যেতেন, গল্পগুজব করতেন, সরস কথাবার্তা বলতেন নিজেদের রসিকতায় তাঁরা হাসতেন কি না? যেমন আমি হাসি, আমি আমার অনেক রসিকতা শেষ করার আগে উত্তুঙ্গ আড্ডায় গল্পের মধ্যপথে কতবার যে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছি, সে গল্প আর শেষ করা হয়নি—এ রকম নজিরের অন্ত নেই।

আমার নিজের কথা এখানে থাক।

পরশুরাম সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বিশেষ কিছু নেই। একবার কলেজের কী একটা অনুষ্ঠানের জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

পরশুরামের পরিচিত মহলের লোকদের মুখে শুনেছি এবং লেখায় পড়েছি—তিনি সুরসিক হলেও স্বভাব-গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজের রসিকতায় নিজে হাসার লোক ছিলেন না।

শিবরাম চক্রবর্তী কিন্তু হাসতেন। রীতিমতো প্রাণ খুলে হাসতেন। একবার সরকারি কাজে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছুদিন ছিলাম। এর অব্যবহিত পরে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলাম, 'দেখুন কুলপি গিয়ে মালাই বরফের খোঁজ করলাম। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা

জুটল না, কুলপিতে এক ছটাক মালাই বরফ পাওয়া গেল না। কুলপির লোক মালাইয়ের নামই জানে কি।'

শিবরাম একচোট প্রাণ খুলে হাসলেন, তারপর বললেন, 'দ্যাখো একবার আমারও খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

শিবরাম বললেন, 'ওই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেই আক্রার বাজারে।'

আমি বললাম, 'কেন আক্রার বাজারে কী হল?'

শিবরাম বললেন, 'আক্রার বাজারে গিয়ে দেখি জিনিসপত্র ভারি সস্তা। এত দাম কম যে পিলে চমকে গিয়েছিল।' নিজের রসিকতায়, আক্রা শব্দের ব্যবহারে, নিজেই হাসতে লাগলেন শিবরাম।

স্পষ্ট মনে আছে, একবার গাড়ি করে কলকাতার বাইরের এক সাহিত্য অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলাম। শিবরাম এবং সেইসঙ্গে এক প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন, কথায় কথায় শিবরাম অধ্যাপককে বললেন, ওঁর এক ভাগ্নে আছে, সে একটা জানোয়ার।

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'জানোয়ার কেন?'

শিবরাম হো হো করে হেসে বললেন, 'জানোয়ার হবে না? বোন থেকে এসেছে যে।'

শিবরামের পানে (Pun) বোন আর বন একাকার।

রাজশেখর বসু নিশ্চয় এ ধরনের রসিকতা করতেন না। যতদুর জানি তাঁর ছিল মাপা কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত টিপ্পনি এবং কথাবার্তায় সংযত শব্দ ব্যবহার।

এঁরা দু'জনে আমার মহাগুরু। আমার রসিকতার প্রাথমিক শিক্ষা এবং উৎস হলেন এই দুই মহারথী।

অবশ্য গত শতকের ত্রৈলোক্যনাথ কিংবা এই শতকের অপ্রতিরোধ্য সৈয়দ মুজতবা আলিকে এই সূত্রে স্মরণ না করা মহাপাপ হবে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং বনফুলও অবশ্যই স্মরণীয়। আর সেইসঙ্গে সহযাত্রী ইন্দ্রমিত্র, সঞ্জীব, নবনীতা কিংবা হিমানীশকেও বাদ দেওয়া যাবে না।

শিবরামের ভাষায় বলা যেতে পারে, 'এদের বাদ দিলে বাদানুবাদ হবে।'

তরল রচনায় বাদানুবাদ কে চায়?

(তিন) তিমিঙ্গিল

হরির উপরে হরি
হরি বসে তায়
হরিরে দেখিয়া হরি
হরিতে লুকায়।

(তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'দেখিয়া' না 'হেরিয়া' মনে পড়ছে না।)

উপরে উদ্ধৃত ছড়াটি আসলে একটি ধাঁধা। একালের পাঠক-পাঠিকা সম্ভবত এ জাতীয় ধাঁধার সঙ্গে পরিচিত নন।

এটা একটি আভিধানিক ধাঁধা। 'হরি' শব্দের বহু রকমের অর্থ, হরির বহু মানে—জল, পদ্ম, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি। এই ধাঁধাটির ব্যাখ্যা হল—

জলের ওপরে পদ্ম
পদ্মের ওপরে ব্যাঙ বসে আছে
এমন সময় সাপ দেখে
ব্যাঙ জলের মধ্যে লুকাল।

রসিকতার নিবন্ধে এই ছড়াটি কেন এল তা বলার আগে তিমিঙ্গিলকে একবার স্মরণ করি।

তিমিঙ্গিলের কথা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন।

মহাসমুদ্রে তিমি হল সবচেয়ে বড় প্রাণী। কিন্তু সেই তিমিকে গিলে খায় এমন প্রাণীও আছে। তার নাম হল তিমিঙ্গিল। তবু ব্যাপারটা এখানে শেষ নয়, এর পরেও আছে তিমিঙ্গিলগিল যে তিমিঙ্গিলকে গিলে খায়, তারপরে তিমিঙ্গিল গিলগিল রয়েছে এবং এইভাবে গিল, গিল, গিল। ...গিল, গিল একের পর এক রয়েছে, এর কোনও অন্ত নেই।

রসিকতার কাহিনীও তাই, তার কোনও অন্ত নেই। গল্পের পর গল্প। এক গল্পের মধ্যে আরেক গল্প, আরেক গল্পের মধ্যে অন্য এক গল্প। বাঁধাকপির কিংবা পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো কিংবা ওই 'হরির ওপরে হরি, হরি বসে তায়' ধাঁধার মতো এক আখ্যান জড়িয়ে আরেক আখ্যান। তারই এ রকমের এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, একসময় থেকে অন্য সময়, এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক আড্ডাধারীর জবানি থেকে অন্য এক আড্ডাধারীর রচনায়। পরতে পরতে রসকাহিনীর সাবলীল বিস্তার, অবাধ গতিবিধি, এক গল্পের পিঠে আরেক গল্প, তার পিঠে আরেক গল্প—কোথায় সে আখ্যানের আরম্ভ, কোথায় তার উৎস—কবে কোন রসিকতাটি কে প্রথম করেছিল তার অনুসন্ধান অসম্ভব।

বিড়লা তারামণ্ডলে এক ভুবন বিখ্যাত সৌরবিজ্ঞানী পৃথিবীর জন্মরহস্য ও সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর অবস্থান নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ এবং কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তন আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার পর ভদ্রলোক অবশেষে শ্রোতাদের কাছে জানতে চাইলেন তাঁদের কারও কোনও প্রশ্ন আছে কিনা।

এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কী প্রশ্ন?'

বৃদ্ধা মহিলা বললেন, 'আপনার কথা ঠিক নয়।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন, প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

বৃদ্ধা জোর দিয়ে বললেন, 'ওসব আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, কক্ষপথ-টক্ষপথ সব বাজে কথা।'

বিস্মিততর ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

বৃদ্ধা বললেন, 'আপনি জানেন না। পৃথিবীর কোনও কক্ষপথ নেই। একটা অতিকায় কচ্ছপের পিঠে অবস্থান করছে পৃথিবী। ঘাস-মাটি, সোনা-দানা, হিরে-কয়লা এইসবের একটা পুরু আস্তর সেই কচ্ছপের পিঠের ওপরে আর সেটাই হল আমাদের পৃথিবী।'

বৃদ্ধার এই আনাড়ি জগতের মধ্যে একটা ফাঁক খুঁজে পেলেন বুদ্ধিমান সৌরবিজ্ঞানী। ফস করে প্রশ্ন করে বসলেন, 'কিন্তু সেই কচ্ছপ এই মহাকাশে, অনন্ত শূন্যে কী করে দাঁড়িয়ে আছে।'

বৃদ্ধা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক ওইরকম অন্য একটা কচ্ছপের পিঠে।'

সৌরবিজ্ঞানী অতঃপর হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, (তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কী উত্তর পাবেন তবু তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করল)। 'ওই দ্বিতীয় কচ্ছপটা কী করে মহাশূন্যে ভাসবে?'

বৃদ্ধা বললেন, 'এখনও বুঝতে পারছেন না? ওই কচ্ছপটা ঠিক ওইরকম আরেকটা কচ্ছপের পিঠে বসে আছে।'

মানে? কচ্ছপের পিঠে কচ্ছপ। দ্বিতীয় কচ্ছপ তৃতীয় কচ্ছপের পিঠে, তৃতীয় চতুর্থের এইভাবে অর্থাৎ ক্রমাগত কচ্ছপ।

মানে সেই হরির ওপরে হরি। রসিকতার পিঠে রসিকতা, রসিকতার ওপরে রসিকতা অর্থাৎ সেই হরির ওপরে হরি।

গোপনে পাঠক মহোদয়দের নিবেদন করছি, আমি জানি, আপনারা কেউ ভুলেও আমার লেখা

কখনও পড়েননি। আমার ভাল হয়েছে না খারাপ হয়েছে সেই আমি জানি না, আপনি ইচ্ছে হলে আপনাদের জননী-জায়া বা কন্যকার কাছে জেনে নেবেন—

তবে আপাতত এই রসিকতাগুলো আমি করছি শুধু জায়াদের জন্যে। কারণ এই আখ্যানগুলো জায়ামুখী।

বেশি আড়ম্বর না করে এক-দুই-তিন করে সাজিয়ে দিচ্ছি।

(১) রসময়বাবুকে তাঁর স্ত্রী রসময়ী দেবী খুব বিরক্ত করছিলেন। বিরক্ত করছিলেন বললে অবশ্য খুব কম বলা হবে, বলা উচিত যাচ্ছেতাই করছিলেন। নানাপ্রকার কটু মন্তব্য, গঞ্জনা, তিক্ত জ্বালাধরা বাক্যবাণ রসময়বাবুকে ক্ষতবিক্ষত, জর্জরিত করছিল।

অবশেষে রসময়বাবু থাকতে না পেরে দাঁত কিড়মিড় করে স্ত্রীকে বললেন, 'দ্যাখো এখনও সাবধান হও। তুমি খুঁচিয়ে আমার ভেতরের থেকে জানোয়ারটাকে বার করে এনো না।'

রসময়ীদেবী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'সে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোমার ওই জানোয়ার ধরার জন্যে আমি একটা ইঁদুরের কল কিনে রেখেছি।'

(২) স্বামী-স্ত্রীর কলহে ও লড়াইয়ে কে জেতে?

আপাতদৃষ্টিতে এক রাউন্ডে স্ত্রী আবার অন্য রাউন্ডে হয়তো স্বামী জিতেছে বলে মনে হতে পারে। আবার কখনও হয়তো স্বামী ভাবছেন তিনি জিতেছেন আবার ঠিক সেইসময়ে স্ত্রীও ভাবেন তিনি জিতেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে কেউ জেতে না এবং কেউ হারেও না।

এ বিষয়ে এক স্বামী তাঁর বন্ধুদের কাছে গর্ব করেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে তাঁর স্ত্রীকে হামাগুড়ি দিতে হয়।

সবাই অবাক। স্ত্রী বেচারির কেন হামাগুড়ি দিতে হয়?

স্বামী বললেন, 'ঝগড়া আরম্ভ হওয়া মাত্র আমি খাটের নীচে লুকোই। আমার বউকে তখন ঝগড়া করতে গেলে হামাগুড়ি দিতেই হবে। উবু হয়ে বসে চেঁচাতে হবে।

(৩) একবার এক জনপ্রিয় প্রসাধন নির্মাতা তাঁর প্রচার-সচিবকে বললেন, 'দ্যাখো, গৃহিনীরাই সংসার চালায়। আমি তাদের কাছে আমার পণ্যের সংবাদ সরাসরি পৌঁছে দিতে চাই। টিভিতে সিনেমায় বিবিধ ভারতীতে, খবরের কাগজে, পত্রিকায় অনেক তো বিজ্ঞাপন দিলাম। মা লক্ষ্মীদের কাছে এবার থেকে চিঠি মারফত যোগাযোগ করতে চাই।'

প্রাচীন ও বিচক্ষণ প্রচার-সচিব বললেন, 'আজ্ঞে।'

প্রসাধন নির্মাতা বললেন, 'আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়, আজ্ঞে ঢের হয়েছে। এবার বলো মা লক্ষ্মীদের নাম ঠিকানা জোগাড় করবে কী উপায়ে আর তারপর চিঠি পাঠালেও সে চিঠি তারা পড়বে তার কি নিশ্চয়তা আছে?'

প্রচার সচিব সারাজীবন ধরে অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁর। তিনি বহুরকম চিন্তা করে তারপর মালিককে বললেন, 'দেখুন স্যার। টেলিফোন ডিরেকটরি থেকে কর্তাদের নাম ঠিকানা ধরে চিঠি দিলেই চলবে।'

'তা হলেই হয়েছে।' খেঁচিয়ে উঠলেন মালিক। 'কর্তারা সে চিঠি পড়তে যাবেন কেন? গিন্নিদের কাছে সে চিঠি পৌঁছাবেই না। কর্তারা পাওয়ামাত্র সে চিঠি বাজে জঞ্জাল ভেবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে।'

প্রচার-সচিব বললেন, 'চিঠি তো ডাকবাক্সে যায় দুপুরবেলায়। কর্তারা তখন অফিসে। বাড়ির ডাকের চিঠি গিন্নিদের হাতেই প্রথম পৌঁছয়।'

মালিক বলেন, 'তা না হয় পৌঁছাল কিন্তু কর্তার নামে চিঠি গিন্নিরা পড়বে কেন?'

এতক্ষণে প্রচার-সচিব মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'আলবাত পড়বে স্যার। শুধু একটা কায়দা করতে হবে।'

বিস্মিত মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী কায়দা?'

প্রচারসচিব বললেন, 'খুব সোজা আর পুরনো কায়দা স্যার, চিঠিগুলো নীলরংয়ের খামে সেন্ট মাখিয়ে পাঠাতে হবে। ঠিকানা লেখা হবে মেয়েলি হরফে আর খামের ওপরে লেখা থাকবে 'একান্ত ব্যক্তিগত'। একটু মুচকি হেসে প্রচার-সচিব যোগ করলেন, 'আপনিই বলুন স্যার, এ চিঠির খাম খুলে না পড়ে মা লক্ষ্মীরা থাকতে পারবেন?'

জায়াজড়িত এই গল্পত্রয় শুধু পাঠিকারাই পড়লেন? কিন্তু এমন কোনও পাঠক যদি কেউ পাঠ করে থাকেন এই মেয়ে হাসানো কথিকা তাঁর দয়া ও শ্রমের জন্যে আমি তাঁকে একটি পুরস্কার দিতে চাই।

পুরস্কার আর কিছুই নয় একটি উপদেশ:—

'যদি আপনার গৃহিনীর কখনও কোনও কারণে ঠান্ডা লেগে বা সর্দিতে গলা বসে যায়, মহিলা যদি কথা বলতে না পারেন, দয়া করে ডাক্তার দেখাতে যাবেন না, এই দুর্মূল্যের বাজারে ডাক্তার দেখিয়ে পয়সা খরচ করে লাভ নেই। বরং সেদিন খুব আড্ডা-টাড্ডা দিয়ে, তাস-টাস খেলে পারলে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করে একটু বেশি রাতে বাড়ি ফিরবেন। দেখবেন আপনার গৃহিনীর কণ্ঠস্বর কেমন সতেজ ফিরে এসেছে।

(চার) উৎস সন্ধানে

Here is to the joke, one good old joke
The joke that our fathers told...
When Adam was young it was on his tongue
And Woah got in the swim...
We will hear it again to night.

তিমিঙ্গিল অধ্যায়কে সরস করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক গল্প বলা হয়ে গেল। শুধু বলা হল এই কারণে যে এইসব গল্পের কোনও দেশ কাল জাতিধর্ম নেই। তবে কোনও হাসির গল্পই বোধহয় শেষ পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সেই গল্পটি মনে আছে?

দোতলায় শোয়ার ঘরে দুই বোন খেলা করছে। হঠাৎ খেলা থামিয়ে বড় বোন ছোট বোনকে বলল, 'দ্যাখ, আমার মনে হচ্ছে, নীচের বসবার ঘরে বাইরের কোনও লোক বেড়াতে এসেছেন।'

জীবন অনভিজ্ঞা ছোট বোন প্রশ্ন করল, 'কী করে বুঝতে পারলি দিদি?'

'শুনতে পাচ্ছিস না?' দিদি প্রশ্ন করল।

'কী শুনতে পাচ্ছি?' বোন বলল।

এবার দিদি বোঝাল, 'কেন শুনতে পাচ্ছিস না বাবা মজার গল্প বলছে আর মা হাসছে। বাবার গল্প শুনে মা কখনও হাসে? বাইরের লোক রয়েছে বলেই না।'

*

বিগত তিমিঙ্গিল পর্বে স্বামী-ঘটিত যে কয়টি সরস কথিকার উল্লেখ করেছি সেগুলির একটিও যে আমার মৌলিক রচনা নয় সেটা নিশ্চয় সবাই ধরতে পেরেছেন।

কিন্তু তার জন্যে আমার কিছু আসে যায় না। আমি মোটেই লজ্জিত বা সংকুচিত নই একথা স্বীকার করতে যে আমার লেখার অন্তত চার আনা অংশ কখনওই আমার নয়।

তবে এগুলো কার লেখা বা কার বলা কিংবা মোটামুটি বলা যায় কার রচনা সেটা আমি জানি না, কেউ জানে না।

এসব গল্প স্থান-কালের সীমানা মানে না। দেশে দেশে কালে কালে ঘুরে বেড়ায় এই সরস গল্পগুলো। লোকমুখে, আড্ডায়-আড্ডায়, চায়ের দোকানে, সরাবখানায়, বার লাইব্রেরিতে, টিচারস রুমে, খবরের কাগজের ডেস্কে এমনকী পাড়ার রকে, কলেজের লাস্ট বেঞ্চে এই গল্প একেকজন একেকভাবে বলে। মুখে মুখে একটু রদবদল হয়, গল্পের নায়িকা গাউনের বদলে শাড়ি পরে আসে। চঞ্চল গৃহিনী হতভাগ্য স্বামীর কখনও টাই ধরে, কখনও টিকি ধরে, কখনও দাড়ি ধরে আবার অশ্লীল রঙ্গকথায় অন্য কোনও অকথ্য জিনিস ধরে টানে।

কিন্তু অন্তর্নিহিত গল্পটা একই।

একবার ভারতীয় এক আদালতে এক ডাকসাইটে উকিল সওয়াল করছিলেন। জটিল ও সুদীর্ঘ সেই সওয়াল, তিনি বড় বড়, মোটা মোটা আইনের বই খুলে একটার পর একটা নজির নিজের স্বার্থে দেখাচ্ছিলেন।

এই নজিরগুলির অধিকাংশই বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলের। অবশেষে মাননীয় আদালত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'উকিলবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন এ দেশটা বিলেত নয়, ভারত। বিলিতি নজির দেখিয়ে এখানে সুরাহা হবে না।'

উকিলবাবু বিনীতভাবে বললেন, (কেই বা আদালতকে চটাতে চায়), 'কিন্তু, ইয়োর অনার, আইনের মূল কথা, অন্তর্নিহিত বক্তব্য শেষ পর্যন্ত তো একই।'

বিচারক মহোদয় অধৈর্য হয়ে বললেন, 'তা হলে আপনি বলতে চান, প্যান্ট আর ধুতি এক জিনিস।'

উকিলবাবু একটু থমকে গিয়ে তারপর খুব সাবধানে জবাব দিলেন, 'ইয়োর অনার, ধুতি আর প্যান্ট হয়তো এক জিনিস নয়, কিন্তু, কিন্তু ইয়োর অনার, যদি দোষ না ধরেন বলি...'

ইয়োর অনার গর্জে উঠলেন, 'কী দোষ ধরব? কী বলতে চান আপনি?'

উকিলবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আজ্ঞে যা বলতে চাই, মোদ্দা কথাটা হল ধুতি আর প্যান্ট হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয় এক না, কিন্তু ইয়োর অনার, আমরা সবাই তো জানি যে ধুতি আর প্যান্টের অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা এক, একেবারে এক।'

ডাক্তারবাবু নমস্কার

ডাক্তারবাবুদের কথা বলতে গেলে সাতকাহন। ছয়কাহন আগেই বলা হয়ে গেছে, এবার শেষকাহন। এরপরেও যদি কিছু বাকি থাকে থাকবে, আমার কিছু করার নেই।

ডাক্তার নিয়ে এবারের প্রথম গল্পটা নিতান্তই গোলমেলে কিন্তু এটা যে সত্যি গল্প সেটা নিশ্চয় হলফ করে বলতে হবে না।

এক রোগী গেছেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু তাঁকে খুবই যত্ন করে দেখলেন। অনেক দেখেশুনে ডাক্তারবাবুর কেমন খটকা লাগল, রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে আপনি বলছেন যে রাতের দিকে কানটা কেমন ভোঁ ভোঁ করে?'

রোগী ঘাড় নত করে স্বীকার করলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবুর আবার জিজ্ঞাসা, 'সকালে ঘুম থেকে প্রত্যেকদিনই খুব মাথা ব্যথা নিয়ে ওঠেন?'

রোগী এবারও হ্যাঁ বললেন।

'ঘাড়ের পিছনে একটা টনটনে ব্যথা হয়?' ডাক্তারবাবু পুনরায় প্রশ্ন করতে রোগী জানালেন যে, সত্যিই বাঁ ঘাড়ের পিছন দিকে প্রায় সব সময়েই খুবই টনটনে ব্যথা।

এবার ডাক্তারবাবু খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। শেষ প্রশ্ন করলেন, 'রাতে ঘুম হয় না, বুক ধড়ফড় করে?' রোগী বললেন, 'ঠিক তাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কী হয়েছে বলুন না?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বলতে পারলে তো ভালই হত, আমাও তো ওইসব উপসর্গ দেখা দিয়েছে। কিন্তু কিছুতে ধরতে পারছি না কী অসুখটা হয়েছে। কত বড় বড় ডাক্তার দেখালুম, চিকিৎসা করলুম, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে সবকিছু—কিছুই ধরা পড়ছে না।'

অসুখ ধরতে না পারার অন্য একটা গল্প আছে এরই পাশাপাশি।

গল্পের প্রথম অংশটুকু প্রায় একইরকম। রোগী গেছেন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে, কিন্তু কী হয়েছে কিছুই তিনি ভাল করে বলছেন না। ডাক্তার যত জিজ্ঞাসা করেন, আপনার অসুবিধেটা কী? রোগী জবাব দেন, 'সেটা তো আপনি বার করবেন। সে জন্যেই আপনাকে ভিজিট দিয়ে দেখাতে এসেছি।'

অতঃপর ডাক্তারবাবু গম্ভীর হতে বাধ্য হলেন। ভুরু কুঁচকিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'আপনার উচিত ছিল কোনও পশু চিকিৎসককে ডাকা, আপনার প্রয়োজন গোরুর বা ঘোড়ার ডাক্তার।'

এই কথায় রোগী ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, ডাক্তারকে চেঁচিয়ে বললেন, 'এসব কথার মানে কী? আমি কি পশু? আমি কি গোরু না ঘোড়া? আমার কেন পশুচিকিৎসক, গোরুর ডাক্তার লাগবে?'

ডাক্তারবাবু শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'আপনি পশু কি না, আপনি গোরু কি না, আপনি ঘোড়া কি না সে আপনি জানেন, আমি জানি না। কিন্তু কোনও রোগীকে কী তার কষ্ট, কী হয়েছে জিজ্ঞাসা না করে তার চিকিৎসা করতে পারে একমাত্র পশুচিকিৎসকরা। আপনার প্রয়োজন একজন অবোলা জীবের ডাক্তার, আমাকে কেন ডেকেছেন বুঝতে পারলাম না।'

খেলাচ্ছলে চা খেতে খেতে দুটো খেলো গল্প লিখে ফেললাম।

পুনরায় ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি।

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ফলের খোসা ফেলে দেবেন না। খোসাসুদ্ধ ফল খাবেন, ওটাই পুষ্টিকর, ওর মধ্যেই যত খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন।

ডাক্তারবাবু আপেল, নাসপাতি, পেয়ারা বা সফেদার কথাই বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন রোগী এসে বললেন, 'না ডাক্তারবাবু অসম্ভব। ফলের খোসা খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

ডাক্তারবাবু খুবই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? কেন?' রোগী উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি খাই বাতাবি লেবু আর নারকেল। তার খোসা খাই কী করে? আজ সারা সকাল চেষ্টা করেও পারিনি। নারকেলের ছোবড়ায় জিভ ছড়ে গেছে। আপনি আমাকে মাফ করুন।'

ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই এই রোগীকে মাফ করেছিলেন এবং অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য পথ্য দিয়েছিলেন।

চিকিৎসা এবং পথ্যের পর এবার আসল ব্যাপারে যাচ্ছি, ব্যাপারটা হল ডাক্তারবাবুর ভিজিট।

রোগীর মরণাপন্ন অবস্থা। বহুদিন শয্যাশায়ী থেকে আর্থিক অবস্থাও অতি শোচনীয়।

ডাক্তারবাবু এইমাত্র রোগীকে দেখে গেছেন। ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর ক্ষীণকণ্ঠে রোগী তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'ওগো, তুমি যে ডাক্তারবাবুকে এখন ভিজিট দিতে পারছ না, সে কথা বলায় ডাক্তারবাবু কিছু বললেন?' স্ত্রী বললেন, 'ডাক্তারবাবু ভাল লোক। আমার কথা শুনে বললেন, চিন্তার কিছু নেই, তোমার জীবনবিমার টাকা পেয়ে মিটিয়ে দিলেই হবে।'

অতঃপর সেই অতিশয় দুঃখজনক গল্পটা আরেকবার বলি। গল্পটা যতই পুরনো হোক এ গল্পটার তুলনা হয় না।

রোগীকে দেখে ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন। রোগী ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তারবাবু কী দেখলেন?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'কী আর দেখব? আপনাকে দেখলে আমার বারবার নেপালবাবুর কথা মনে পড়ে।'

এ কথা শুনে আতঙ্কিত রোগী ডুকরিয়ে উঠলেন, 'ডাক্তারবাবু কোন নেপালবাবুর কথা বলছেন, এই যিনি ওই মোড়ের সামনে হলদে দোতলা বাড়িটায় থাকতেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন। আমি ওই নেপালবাবুর কথাই বলছি।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু', রোগী আর্তকণ্ঠে বললেন, 'ওই নেপালবাবু যে গত সপ্তাহে ক্যানসারে মারা গেলেন। আমারও কি ক্যানসার হল?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তা নয়। তবে নেপালবাবুও আপনার মতো ভিজিট দিতেন না কিনা, তাই আপনি যখনই আসেন আপনাকে চেম্বারে ঢুকতে দেখলেই নেপালবাবুর কথা মনে পড়ে।'

আত্মনেপদী

বড় কঠিন নামকরণ হয়ে গেল সরস রচনার পক্ষে। শব্দটি চট করে কোনও অভিধানে পাওয়া যাবে না।

এমনকী চলন্তিকায় পর্যন্ত নেই। সংসদ এবং সুবল মিত্রে আছে, তবে আত্মনেপদী নয়, আত্মনেপদ, অর্থ দেওয়া আছে। আত্মফল ভাগিত্ব প্রকাশক তিঙন্ত পদ।

বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ব্যাপারটা সরাসরি সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে এসেছে।

আমার সমস্যা অন্য। এতকাল ধরে এত লোকের আমি প্রশংসা করে আসছি কিন্তু কখনও কোথাও কাউকে আমার প্রশংসা করতে দেখিনি। তাই অবশেষে নিজের প্রশংসায় নিজেই রত হয়েছি। তাই এই আত্মনেপদী।

একটি সর্বজন পরিচিত কাহিনী নিজের নামে চালিয়ে আমি এখন খেলাচ্ছলে নিজের গুণকীর্তন করছি।

অথচ এই ব্যাপারে নিজেকে খুব একটা দোষী বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এর আগে আরও অনেকেই আত্মপ্রচারের প্রয়োজনে সময় সুযোগ মতো অনেকরকম অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। গল্পটা রোগী ডাক্তারের।

এই গল্পটার মধ্যে একটা মজার মারপ্যাচ আছে।

বিষণ্ণবদন স্থূলদেহ, স্ফীতোদর, সদাসর্বদা ঘর্মাক্ত অশক্ত কলেবর এক রোগী গেছেন এক বড় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তারবাবু রোগীকে চেনেন না, এই প্রথম দেখছেন তাঁকে। সুতরাং যা-যা করার সবই করলেন। নাড়ি টিপলেন, জিব দেখলেন, বুকে স্টেথস্কোপ যন্ত্র লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে অন্তর্নিহিত আওয়াজ শুনলেন।

তারপর প্রেসারের যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ যত্ন করে মাপলেন। খুব চেপে ধরে পেট টিপলেন। ছোট টর্চলাইটের সূচিমুখ আলোকলিসা দিয়ে নাক, কান এবং গলার ভিতর, যতটা দেখা যায়, দেখলেন।

রোগী এদিকে বলছে, "ডাক্তারবাবু, আমার শরীর খুবই খারাপ। কিন্তু কী হয়েছে কিছুই ধরতে পারছি না।"

ডাক্তারবাবু খুবই যত্নশীল, খুবই সাবধান। তিনি কোথাও খারাপ কিছু না পেয়ে আবার রোগীর পিঠে স্টেথস্কোপ লাগালেন। ড্রয়ারের দেরাজ খুলে একটা কালো রবারের হাতুড়ি বার করে রোগীর দুটো হাঁটুতে মারলেন, রোগীর স্নায়ুচেতনা পরীক্ষার জন্য।

কিন্তু ডাক্তারবাবু খারাপ কিছু পেলেন না।

অতঃপর চিন্তিত ডাক্তারবাবু রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ঠিক বুঝিয়ে বলুন তো আপনার কী হয়েছে? কী শরীর খারাপ লাগে আপনার?"

শুকনো মুখে, করুণ কণ্ঠে রোগী বললেন, "কী বলব ডাক্তারবাবু। মনে কোনও আনন্দ পাই না। সুখ নেই। সবসময় কেমন মন খারাপ, বিষণ্ণতা। কিছু ভাল লাগে না। মাথা সবসময় টিনটিন করে। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। কোনও কাজে আনন্দ পাই না।"

ডাক্তারবাবু চিন্তিত মুখে ভ্রূকুঞ্চন করে রোগীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ তো একেবারে মানসিক কেস। শরীরে আধিব্যাধি কিছু নেই, সব মনে। এর কী প্রতিকার করবেন তিনি? কী প্রতিকার করতে পারেন?

রোগীর স্বাস্থ্য যেমন মারাত্মক, গলার স্বরও তেমন মারাত্মক।

সেই মারাত্মক গলায় যথাসম্ভব খ্যান-খ্যান করতে করতে রোগী তখনও বলে চলেছেন, "কোনও কাজে আনন্দ পাই না। মনে আনন্দ নেই, কোনও ফুর্তি নেই। কতকাল ভাল করে প্রাণ খুলে হাসিনি।"

"হাসিনি" কথাটা শুনে ডাক্তারবাবুর কেমন সম্বিত ফিরে এল। ডাক্তারবাবু রোগীকে বললেন, "আপনার অসুখের ঠিক কোনও চিকিৎসা নেই। কোনও ওষুধ-বিষুধ দরকার হবে না। একটা ভাল পরামর্শ দিচ্ছি।"

এরপর একটু থেমে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আপনি তারাপদ রায়ের নাম জানেন?"

রোগী বিষণ্ণ চোখে তাঁর গোলমেলে কণ্ঠকে যতটা অস্ফুট করা যায় তাই করে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "তা জানি।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা হলে তো ভালই হল। শুনুন আপনাকে একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি।"

রোগী আকুল হয়ে জানতে চাইলেন, "কী সুপরামর্শ?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "খুব সোজা পরামর্শ।"

"এই পরামর্শ পালন করলে মুখে হাসি ফুটবে। মনে আনন্দ হবে। জীবনে ফুর্তি আসবে। তা ছাড়া..."

ডাক্তারের মুখের কথা শুনে নিয়ে উত্তেজিত রোগী প্রশ্ন করলেন, "তা ছাড়া?"

রোগীর প্রশ্নে অনাবিল হেসে সহৃদয় চিকিৎসক মহোদয় বললেন, "এতে ওষুধ-বিষুধ, ডাক্তারের ভিজিটের চেয়ে কম খরচ লাগবে।"

রোগী এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কৌচ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ডাক্তারবাবু বলুন, এর জন্য আমাকে কী করতে হবে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "প্রায় কিছুই না। একটু আগে তো বললেন, তারাপদ রায়ের নাম জানেন, সেই তারাপদ রায়ের কথা বলছি।"

রোগী করুণতর নয়নে বিষণ্ণতর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রায় যাত্রার বিবেকের স্বগতোক্তির মতো মিনমিন করে বললেন, "তারাপদ রায়?" ডাক্তারবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তিনিই আপনার একমাত্র

ওষুধ। আপনি তারাপদবাবুর লেখা পড়ুন, তারাপদবাবুর লেখা কাণ্ডজ্ঞান, জ্ঞানগম্যি এইসব বই পড়ুন। আপনার বিদ্বান, বুদ্ধিমান, লেখাপড়া জানা আত্মীয়বন্ধু প্রতিবেশী যদি এতে হাসাহাসি করে, লুকিয়ে পড়ুন।"

এই সুপরামর্শ শুনে তখন রোগী একদম চুপসিয়ে গেছেন, শুধু মিয়োনো গলায় বললেন, "তারপর।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তারপর আর কী? তারাপদ রায়ের রচনা পড়ে আপনার মনে আনন্দ, মুখে হাসি, জীবনে ফুর্তি সব ফিরে আসবে।"

সেই স্থূলোদর, স্ফীতদেহ, ভারীকণ্ঠ রোগী বললেন, "ডাক্তারবাবু, এটা সম্ভব নয়, হতে পারে না।"

অবাকিত ডাক্তারবাবু মুখে আর কোনও কথা না খুঁজে পেয়ে বললেন, "কেন?"

ম্লানতম কণ্ঠে, বিষণ্ণতম মুখে স্থূলদেহ ঘর্মাক্ত কলেবর রোগী বললেন, "ডাক্তারবাবু। আমিই তারাপদ রায়।"

ভাগলপুরের পাঞ্জাবি

রেলগাড়ির কামরার জানালা দিয়ে অনেক দামদর করে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের হকারের কাছ থেকে একটা চাদর কিনেছিলাম। মধ্য রাত, বোধহয় ভাগলপুর স্টেশন ছিল সেটা, বেশ কয়েক বছর আগেরকার কথা।

ফিকে হলুদ রঙের। বেশ শক্ত বুনোট, লম্বায় চওড়ায় বেশ প্রমাণ সাইজের চাদর সেটা। বেশ একটা মুগা-মুগা ভাব আছে, লোকাল জিনিস, দামও তেমন বেশি ছিল না।

অল্প শীতে বাড়ির মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে গায়ে দেওয়ার জন্যে চমৎকার চাদর। এবং তাই ভেবেই কিনেছিলাম।

কিন্তু কলকাতায় এসে যে কী দুর্মতি হল অবশ্য কারণও একটা ছিল, তখন সবে মোটা হতে শুরু করেছি, পুরানো জামা-প্যান্ট, পাঞ্জাবিগুলো কেমন টাইট হচ্ছে, ফিট করছে না, সেই ভাগলপুরি চাদরটা দরজির দোকানে নিয়ে সেটা কেটে একটা পাঞ্জাবি বানাতে বললাম।

ক্রমশ মোটা হয়ে যাচ্ছি এই চিন্তা মাথায় রেখে কিন্তু কথায় গোপন করে দরজিমশায়কে বললাম, 'একটু বড়সড় ঢিলেঢালা করে বানাবেন, কাপড়টা শ্রিঙ্ক করতে পারে।'

দরজি ভদ্রলোক অবশ্য ও জাতীয় নির্দেশের পক্ষপাতী নয়, জামাকাপড় একটু চাপা, একটু বেশি ফিট করার দিকে তাঁর ঝোঁক। তিনি আমার অনুরোধ রাখেননি। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলাম ঢিলেঢালা মোটেই করেননি, বরং টাইটের দিকে।

যা হোক পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে লাগলাম। এদিকে ঠিক সেই সময়ে আমার দেহে মেদের জোয়ার শুরু হয়েছে। বন্ধুবান্ধব আমার বুদ্ধির প্রশংসা করা আরম্ভ করেছে, বলছে, 'এতদিনে তোর বুদ্ধি খুলেছে, তোর মাথা ফ্যাট, ঘিলুর চর্বি গলে শরীরে নামছে।'

বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা, অপমান, কোনওদিনই আমি সেসব কিছু গায়ে মাখিনি, তা হলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানগম্যি নিয়ে আমি করে খেতে পারতাম না।

বন্ধুদের এই কটুকথার মধ্যে অবশ্য একটা সত্যি ব্যাপার ছিল, দেহের ওজন বাড়লে স্বাভাবিক কারণেই লাফালাফি, দৌড়ঝাঁপ কমে যায়, জীবনে স্থিরতা আসে, ঠান্ডা মাথায় বসে চিন্তা করে কাজ করা যায়, বোকামি কমে।

তখন আমার বোকামি দ্রুত, অতি দ্রুত কমছে। সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন বাড়ছে, ওজনের সঙ্গে তাল রেখে আয়তন মানে প্রস্থ। প্রস্থ এত বাড়ছে যে মনে হচ্ছে, দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে, আগে লোকেরা আমাকে লম্বা না হলেও বেঁটে ভাবত না। আমাকে বেঁটে ভাবা তখন থেকেই আরম্ভ।

অফিস-কাছারি করি। সেখানে শার্ট-প্যান্ট পরেই যেতে হয়, সেটাই প্রচলিত বিধি। আবার অবসরে রবিবার বা ছুটির দিনে কখনও পাঞ্জাবি গায়ে দেওয়ার সুযোগ জোটে।

এই ভাবে প্রথম মাস দুয়েকে দু'-তিন ঘণ্টা করে পাঁচ-সাতবার পাঞ্জাবিটা পরিধান করার সুযোগ মিলল।

অবশ্য ওটাকে সুযোগ না বলে দুর্যোগই বলা উচিত। কারণ তখন আমি প্রতিনিয়ত ফুলে ফেঁপে উঠছি। জগু বাজারের মতো অকুস্থলে বাঙালি দোকানদারেরা পর্যন্ত আমাকে বাজারে দেখলে, 'আইয়ে শেঠজি' বলে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে।

তখন আমার দমবন্ধ অবস্থা। পেটমোটা ওয়াটারকুলার বোতলের ছিপি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশির কর্ক যেমন খাপে খাপে ফিট করে যায়, যেমন নিশ্ছিদ্র, না বাতাস—সেই ভাগলপুরি চাদরের পাঞ্জাবিটা সেই ভাবে আমার শরীরে চেপে বসে। দম আটকিয়ে আসে মনে হয় আমি ভীম ভবানী, বুকের ওপর হাতি নিয়েছি। জামার বোতাম আটকাই না, শুধু হাঁসফাঁস করি। অথচ নতুন পাঞ্জাবি, ফেলেও দিতে পারি না।

ভাগ্য ভাল, এই দু' মাসের ব্যবহারে পাঞ্জাবিটা বেশ মলিন হয়েছিল, সুতরাং এটি একদিন আমার সুলক্ষণা স্ত্রীর নজরে পড়ল তিনি সেটা ধোপাবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

সপ্তাহ খানেক বাদে ধোপাবাড়ি থেকে পাঞ্জাবিটা ফেরত এল। ফিকে হলুদ ফিকেতর হলুদ হয়েছে তবে সর্বত্র নয়। একটু চিতাবাঘ চিতাবাঘ ভাব সেই সঙ্গে বুনোটটা আর তত জমজমাট নয় কেমন ঝ্যালঝেলে মনে হল। ভয় হল হয়তো আরও ছোট হয়ে গেছে।

পরের রবিবার দিন সকালবেলায় বাসায় এক সম্পাদিকার আসার কথা ছিল, তাঁর সৌজন্যে ভয়ে ভয়ে ভাঁজ ভেঙে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলাম, কতটা ছোট হয়েছে, গায় দেওয়া যাচ্ছে কি না। কিন্তু কী আশ্চর্য, পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে গায়ে চাপিয়ে, আবিষ্কার করলাম মোটেই টাইট নয়। চমৎকার ঢিলেঢালা, হৃদয় থেকে নাভির মধ্যে চমৎকার বাতাস খেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে উঠলাম, ধরে নিলাম আমার মেদ ঝরেছে, ওজন কমছে, আয়তন কমছে। গলির মোড়ের ওষুধের দোকানে একটা ওজনের মেশিন বসিয়েছে, সেখানে ছুটে গিয়ে গর্তে একটা আধুলি ঠেলে ওজন নিলাম। কিন্তু এ কী? আমার ওজন আরও দু' কেজি বেড়েছে। তা হলে?

তা হলে? ব্যাপারটা বুঝলাম আর দেড়মাস পরে। ততদিনে ওই পাঞ্জাবি আমার শরীরে আবার প্রায় প্রকৃতিদত্ত চামড়ার মতো টাইট হয়ে বসে গেছে। অর্থাৎ আমি আরও প্রসারিত হয়েছি।

এদিকে পাঞ্জাবিটা আবার ময়লা হয়েছে, দেড় মাসের মাথায় ধোপাবাড়ি থেকে আরেকবার কেচে আসতে গায়ে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম শরীরে সুন্দর গলে যাচ্ছে, বেশ ঢিলেঢালা যেমন আমার পছন্দ। আমার মেদাধিক্য এবং ভুঁড়ি দুইই বেশ ঢাকা পড়েছে। কাচতে দেওয়ার আগের সেই টাইট অবস্থাটা আর নেই তবে একটা অসুবিধা হয়েছে জামার ঝুল এবং সেইসঙ্গে হাতা দুটো খুব বেড়ে গেছে। আজকাল লম্বা ঝুল পাঞ্জাবি চলছে, সে যাহোক, কিন্তু হাতা দুটো প্রায় ছয় ইঞ্চি বেড়ে

গেছে, একসঙ্গে হাতা ও দস্তানার কাজ করছে, তার মধ্য থেকে হাত দুটো বের করে আনা বেশ কঠিন। কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে গৃহিণী সে সমস্যা দূর করলেন।

ইতিমধ্যে আমার মনে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। পরের বারে পাঞ্জাবিটা ধোপার বাড়িতে না পাঠিয়ে এক ছুটির দিনের সকালে আমি নিজেই কাচলাম। কেচে একটা হ্যাঙারে করে ছাদে ঝুলিয়ে দিলাম।

এর পর কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম পাঞ্জাবি বেড়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ঝুল এগোচ্ছে, হাত লম্বা হচ্ছে। বিকালে শুকোনোর পর গায়ে দিয়ে দেখি আমার মোটা হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে পাঞ্জাবিটা বেড়েছে, একটু বেশিই বেড়েছে, একটু ঢিলেই হয়েছে, সেটা আমার পক্ষে বেশ ভাল।

ইতিমধ্যে গত কিছুকাল ধরে আমি প্রবল স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছি। কত দামি দামি শৌখিন জামাকাপড় ছোট হয়ে গেছে, বরবাদ হয়ে গেছে।

কিন্তু পাঞ্জাবিটা আছে। ঝুল এখন সেমিজের মতো প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত, আলখাল্লাই বলা চলে তবে হাতা দুটো প্রত্যেকবার কাচার পর তিন ইঞ্চি করে ছেঁটে নিই, না হলে একটু অসুবিধা হয়।

পুজোর বাজার

পুজোর বাজারে পুজোর লেখাই লিখতে হবে তেমন কোনও কথা নেই। আর আমি ঠিক সে রকম বাঁধাধরা জাতের লেখকও নই, যা ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে উলটো-পালটা বাজে লেখাতেই আমার বেশি ফুর্তি। বেশি আনন্দ।

তবু শিরোনামের অমর্যাদা করা উচিত হবে না।

প্রথমে পুজোয় কলকাতা ভ্রমণের একটা গল্প বলি।

রামলোচন সিং এবং মহম্মদ মোকাররম হোসেন পুজোর বাজারে কলকাতায় আসেন সুদূর আরা জেলা থেকে। তাঁরা আসেন ট্রামে বাসে পকেট মারতে। তাঁদের বিশেষ কোনও দোষ নেই। পুরুষানুক্রমে তাঁরা কলকাতায় পুজোর মরশুমে আসেন। তাঁদের বড় থেকে বড় ঠাকুরদা আসতেন গাঁট কাটতে, গঙ্গায় ভাড়াটে নৌকো করে আসতেন সুতানটি কিংবা চেতলার হাটে।

কালক্রমে তাদের ঠাকুরদা আসতেন কিঞ্চিৎ হেঁটে কিঞ্চিৎ এক্কায় এবং বাকিটুকু রেলগাড়িতে, তিনি গঙ্গা পার হয়ে সোজা বড়বাজারে চলে যেতেন জোব্বা কাটতে।

রামলোচনের ঠাকুরদা ক্ষণজীবী ছিলেন। জোব্বা কাটার যুগেই তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু মোকাররম হোসেনের পিতামহকে এক জীবনে জোব্বাকাটা থেকে পিরানকাটায় পরিণত হতে হয়।

ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। জোব্বার চেহারাটা লম্বাচওড়া, ঢিলেঢালা, একদম উনবিংশ শতাব্দীর মতো। হৃদপিণ্ডের একটু নীচে ছড়ানো, প্রশস্ত একটাই পকেট জোব্বার।

কিন্তু পিরান নিয়ে বড় সমস্যা। তার বাঁয়ে, ডাইনে, বুকে, বুকের ডান পাশে বাঁ পাশে, ভিতরে

পকেটের পর পকেট। কোন পকেটে সুগন্ধি আতরমাখানো লাল তুলোট কাগজে সৌদমিনী দেব্যার 'যাও পাখি বলো তারে' চিঠি ভাঁজ করে রাখা আছে, কোন পকেটে আছে লম্বা ফর্দ সিঁথির সিঁদুর থেকে পায়ের আলতা পর্যন্ত, কিংবা চাবির তোড়া বা রুমাল। ধরাই কঠিন টাকাপয়সা বা দামি জিনিস পিরানের ঠিক কোন পকেটে আছে, অথচ জোব্বার ছিল মাত্র একটা পকেট, সহজেই লক্ষ্যভেদ করা যেত।

সে যা হোক জোব্বাকাটা, পিরানকাটা যুগও বহুদিন অবসান হয়েছে। এখন চলেছে সরাসরি পকেটকাটার যুগ। কোটের পকেট, প্যান্টের পকেট, পাঞ্জাবির পকেট, পাজামার পকেট, শালোয়ারের পকেট, কামিজের পকেট, ফ্রকের পকেট, পেটিকোটের পকেট আরও কতরকম কত খারাপ খারাপ জায়গায় খারাপ খারাপ পকেট।

পুজোর মরশুমে সারা ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশ থেকে ব্যাপারি, ভিখিরি, বাঈজি, বেশ্যা, চোর, জোচ্চোর, পকেটমার তাদের তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় ছুটে আসে। ভিড়ের শহরে যে যার ব্যবসা পুরোদমে চালায়। আমাদের এই উপকাহিনীর রামলোচন এবং মোকাররমও আসে, ব্যবসা চালায়।

এরা দু'জনেই দক্ষ কারিগর। তা ছাড়া আরা জেলার পকেটমারেরা একটু সাবধানীও বটে, চট করে তারা ধরা পড়ে না।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিপরীত। নেহাতই চাকরির প্রয়োজনে আমি কয়েক বছর কারা কল্যাণ পরিদর্শক সমিতির মেম্বার ছিলাম, মানে মাসে একবার দেখতে যেতে হত কারাবাসী মহাজনদের সুখ-সুবিধের কোনও অন্তরায় আছে কিনা, তাদের কোনও অভিযোগ আছে কিনা।

পরপর কয়েকবছর শীতকালে জেলখানায় রামলোচন আর মোকাররমের সঙ্গে দেখা হল। রীতিমতো চেনা পরিচয় যাকে বাংলায় বলে 'জানপয়ছান' তাই হল।

তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পরে অবশেষে একদা জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা প্রত্যেকবার জেলে আসেন? প্রত্যেকবার ধরা পড়ার জন্যে সেই আরা থেকে কলকাতায় আসেন?

দু'জনেই মিটমিট করে হেসে যা বললেন, তার গূঢ়ার্থ হল, 'বাবুমশায়, আমরা ধরা পড়ি না, ধরা দিই।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তখন তাঁরা বললেন তাঁদের যা কাজ কারবার সেসবই মহালয়া থেকে শ্যামাপুজোর মধ্যে শেষ হয়ে যায়, যা কিছু আয় উপার্জন হয় এই একমাসে, সব বিশ্বস্তসূত্রে দেহাতে পাঠিয়ে তাঁরা অবশেষে একদিন পুলিশের কাছে খেলাচ্ছলে ধরা দেন।

কিন্তু কেন?

পকেটমার মহোদয় বললেন, আরায় বড় শীত। পকেটমারিতে জেল হয় তিনমাস। একমাস বিচার। সবসুদ্ধু নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চারমাস কলকাতার জেলে উষ্ণ আরামে কাটিয়ে ঠিক ফসল কাটার মরশুমে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। সবচেয়ে বড় কথা এই চারমাস তাঁদের কোনও খাইখরচা, থাকা খরচা, কিছুই লাগে না।

পুনশ্চ:

অবশেষে একটা সত্যিকারের লোমহর্ষক গল্প বলি।

এই শরতে এক বিদেশি আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিলেন। খাঁটি বিলিতি ইংরেজ সাহেব।

কলকাতার তিনশো বছরের কী একটা ব্যাপার নিয়ে এই শহরে আজ কিছুদিন হল, ঘুরঘুর করছেন। স্বভাবতই ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গেও হয়েছে। আর বিদেশিরা কলকাতায় এলে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তো একবার দেখা করবেই কিংবা দেখা করার চেষ্টা করবেই।

এইসব প্রধান রায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তিনি যখন জানলেন যে আমারও পদবি রায়, তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, এত 'রায়' কেন, এত 'রায়' পদবি কোথা থেকে এল।

আমি অনায়াসে আমার আশ্চর্য ইংরেজিতে সাহেবকে বোঝাতে পারতাম যে 'রায়' ঠিক পদবি নয়, 'রায়' হল উপাধি। মুসলমান আমল থেকে চলে আসছে খুব সম্ভব নবাবদের দেওয়া উপাধি ইত্যাদি কথা সাহেবকে বলতে পারতাম।

কিন্তু তা করিনি। সাহেবকে একটা ট্যাক্সিতে করে গরচায় নিয়ে গেলাম। সেখানে একটা ছোট কারখানা করেছে আমার এক জ্ঞাতিভাই।

কারখানার নাম 'রায় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি'। বেশ বড় বড় করে ইংরাজিতে সাইনবোর্ড লেখা: 'RAY MANUFACTURING COMPANY'.

একটু দূরে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে, গাড়ির জানলা দিয়ে অঙ্গুলিনির্দেশ করে সাহেবকে সাইনবোর্ড দেখালাম। অনেক সাহেবরা একটু মাথামোটা হয়, তাই ভাল করে বুঝিয়ে বললাম, 'ওই হল রায় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, এবার বুঝতে পারছ তো এত রায় কোথা থেকে আসে?'

এই পুজোর বাজারে পুনশ্চের পরেও একটা ঘটনা বাকি থেকে যাচ্ছে। এইমাত্র শুনলাম আমার ভাই বিজনের কাছ থেকে, সে কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিল একজোড়া চটি কিনতে।

ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, ছেঁড়া জামা, উড়ুক্কু চুল দুই রঙের দুইপাটি চটি তার মধ্যে একটা লেডিস চটি বগলে করে বিজন বাড়ি ফিরল।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বিজন বলল, 'দাদা, এই পুজোর বাজারে অনেক লোক পাগল হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই, কিন্তু তোমার মাথার কী অবস্থা।'

বিজন বলল, 'আমার মাথার কথা বাদ দাও, এইমাত্র কলেজ স্ট্রিট ডাবপট্টিতে একসঙ্গে দুটো পাগল দেখে এলাম।'

আমি বললাম, 'তারা কী করছে? কী করে বুঝতে পারলে তারা পাগল?'

বিজন চমৎকার বলল, 'পাগল না হলে একটা লোক একশো টাকা নোটের তাড়া হাতে নিয়ে একটা একটা করে নোট রাস্তায় ছুড়ে ফেলে! আর অন্য লোকটা সেই নোটগুলো বারবার কুড়িয়ে ফেরত এনে তাকে দেয়! প্রথম লোকটা আবার ছোড়ে দ্বিতীয় লোকটা আবার ফেরত দেয়।'

আমি বললাম, 'কেন এ রকম করছিল তারা?'

বিজন বলল, 'পুজোর বাজার। পাগল হয়ে গেছে।'

অপমান

...'অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সমান'...
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই বহুখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করেনি এবং শোনেনি এমন বঙ্গভাষী খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকেই ছাত্রজীবনে পরীক্ষার খাতায় এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা লিখেছেন, এখনও হয়তো অনেকের মুখস্থ আছে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি, হয়তো বা পুরো কবিতাটিই।

'অপমানিত' নামের এই কবিতাটি শুধু বাংলাতেই নয়, ভাষান্তরিত হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও যথেষ্ট সুপরিচিত।

এই কবিতার মূল কথা ছিল—"যাকে তুমি নীচে ফেল সে তোমাকে নীচে বাঁধবে, তুমি যাকে পেছনে রেখেছ সে তোমাকে পেছনে টানছে।"

সবাই জানেন, এই 'তুমি' কোনও মানুষ নয়, এখানে সমাজের কথা বলা হয়েছে। এই সামান্য তরল রচনায় সমাজ নিয়ে কোনও রসিকতা করার সাহস আমার নেই, বিশেষ করে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে প্রথমেই জড়িত করে ফেলেছি।

আমি বরং ব্যক্তিগত মান-অপমানের তুচ্ছ কাহিনীতে যাই; সেখানেও অবশ্য অপমানিত লোকটিকে যতক্ষণ চেনা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্তই আমি নিরাপদ।

প্রথমে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে এক রাজনৈতিক নেতাকে স্মরণ করি। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় একটি সাহিত্যসভায় আমরা কিছু না বুঝে ভুল করে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম।

গিয়ে দেখি এই বিতর্কিত নেতা, মেধার থেকে পেশির জন্যেই যিনি বেশি পরিচিত, তিনি সেই সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

যেমন হয়, আমাদের সঙ্গে নেতা ভদ্রলোক অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেন, আমরা তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। তাঁর বিষয়ে আমাদের মনে মনে যে একটা ভুল ধারণা ছিল তার জন্যে মনে মনেই লজ্জিত বোধ করলাম।

সে যা হোক, আসল ঘটনা অন্য। আসল ঘটনা হল ভদ্রলোকের বক্তৃতা। আমাদের সুস্বাগতম জানিয়ে ভদ্রলোক উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন, 'আপনারা এত গুণীজন এখানে এসেছেন, সে জন্যে সামান্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপনাদের অপমান করতে চাই না।'

এবং ঠিক পরেই তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের প্রত্যেককে শতশত ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

জানি না, সেদিন আমরা সত্যি সত্যি অপমানিত হয়েছিলাম কিনা।

কিন্তু আমরা তো এমন অনেক লোককে জানি, যাঁরা কোনওদিন অপমানিত হননি। কেউ তাঁদের কোনওদিন অপমান করতে পারবে না। তাঁদের অপমানবোধই নেই।

এই সূত্রে একটি পুরনো চিঠি আগাগোড়া উদ্ধৃত করছি। এটি ঠিক হাসির নয়, একটি করুণ কাহিনী।

শ্রীদুর্গা শরণম্
কলিকাতা
৭ই ভাদ্র
প্রিয় গদাধর,

কলিকাতায় আসিবার পর গত আড়াই মাস নানা কারণে আমি তোমাকে কোনও পত্র দিতে পারি নাই।

ইহার মানে এই নয় যে আমি তোমাদের ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু যাহাকে বলে "মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল" আমারও সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

এখানে জয়রামবাবুর বাড়িতে যখন আমি বাজার সরকারের চাকুরি লইয়া আসিলাম, তুমি সকলই জান, আশা ছিল বেতন কম হইলেও সৎভাবে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।

এখানে আসিবার দুই-তিনদিনের মধ্যে ইহাদের ব্যবহারে আমি তাজ্জব হইয়া গিয়াছি। ইহারা কী চায়, বুঝিতে পারি না।

একদিন বড় বড় বেগুন আনিলাম, খুব রাগারাগি করিল, বড় বেগুন যেন বিষ। পরের দিন ছোট ছোট আলু আনিলাম, আলুর ব্যাগ রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

অন্যান্য ব্যাপার আরও জটিল। একদিন এ-বাড়ির বড় গিন্নিমা সন্ধেবেলা আমাকে সদরের দরজা ভেজাইয়া দিতে বলিলেন। আমি জানি ইহা আমার কাজ নয়, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলির মোড়ের টিউবওয়েল হইতে চারি বালতি জল আনিয়া বাহিরের দরজা ভেজাইলাম, সে বড় গিন্নিমার আদেশ বলিয়াই। কিন্তু ইহার পরিণাম কী হইল? বাড়ির সমস্ত লোক, এমনকী ঝি-চাকর পর্যন্ত উল্লুক, বেল্লিক, গাধা বলিয়া গালাগাল করিতে লাগিল।

এইরকম অনবরত চলিতেছে।

সেদিন বিকালে ছোটসাহেব একজোড়া কোট-প্যান্টলুন তাড়াতাড়ি ধোপার বাড়ি হইতে ইস্তারি করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন, সন্ধেবেলা পার্টি আছে, এই পোশাক পরিয়া যাইবেন। আমি কী করিয়া জানিব বাড়ির সামনের কাচের জানলা-দরজা দেওয়া দামি দোকানে জামাকাপড় ইস্তারি করা হয়। আমি রাস্তায় রাস্তায় ভাঁটিখানা খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে বহু পথ ঘুরিয়া, বহু পথ ঘুলাইয়া চেতলা হইতে রাত বারোটা নাগাদ কোট-প্যান্ট ইস্তারি করিয়া যখন পরিশ্রান্ত, ঘর্মাক্ত, অভুক্ত অবস্থায় আসিয়াছি তখন ছোটসাহেব অন্য পোশাকে, (সেটি কিঞ্চিৎ ময়লা, দোমড়ানো) পার্টি হইতে টলিতে টলিতে ফিরিতেছেন। হঠাৎ আমাকে ধোপদুরস্ত টাটকা ইস্তারি-করা কোট-প্যান্ট হাতে সম্মুখে দেখিয়া তিনি কেমন উত্তেজিত হইয়া শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলিতে লাগিলেন। বাচ্চা তবু পূর্বে শুনিয়াছি, ছোটসাহেব আরও কিছু-কিছু অশ্রাব্য শব্দের পুত ও ভাই বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেলাগিলেন।

ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়াছে পরশুদিন, ৫ই ভাদ্র, শনিবার সন্ধেবেলা। প্রতি শনিবার এ-বাড়িতে বড়সাহেব পার্টি দেন। একতলার বাইরের ঘরে পার্টি হয়। আট-দশজন লোক আসে, মদ খাওয়া হয়। আমি বাড়ির মধ্যে রান্নাঘর হইতে মাছভাজা, মাংসের বড়া এইসব আনিয়া দিই। ফ্রিজ খুলিয়া সোডা, বরফ, জল।

পরশুদিন রাত্রিতে হঠাৎ সোডা ফুরাইয়া গেল। বড়সাহেব আমাকে রাস্তার দোকান হইতে সোডা আনিতে বলিলেন। আমি বুদ্ধি করিয়া বড়সাহেবকে খুশি করিবার জন্য আইসক্রিম সোডা আনিলাম। আমি যদিও কোনওদিন মদ খাই নাই; সোডা খাইয়াছি, সোডা অতি বিস্বাদ। একদিন আইসক্রিম-সোডা খাইয়াছিলাম, খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাই যত্ন করিয়া আইসক্রিম-সোডা

আনিয়া বড়সাহেব ও তাঁহার ইয়ারদের পানীয়ের গেলাসে ঢালিয়া দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা খেপিয়া গেল। ওয়াক থুঃ, ওয়াক থুঃ করিতে লাগলি। উহারা নাকি হুইস্কি খাইতেছিল। হুইস্কির সঙ্গে আইসক্রিম-সোডা মিশাইয়া খাইলে নাকি বমি আসে। যখন সবাই জানিতে পারিল আইসক্রিম-সোডা আমিই আনিয়াছি, সবাই আমাকে তাড়া করিয়া আসিল। এক মাতাল স্টুপিড, স্কাউন্ড্রেল বলিয়া আমার কান মলিয়া দিল। বড়সাহেব নিজে পা হইতে চপ্পল খুলিয়া সেই চপ্পল আমার মুখে মারিয়া ঠোঁট ফাটাইয়া দিলেন।

ভাই গদাধর, আর কী লিখিব। সবই তো বুঝিলে। ইহারা আমাকে অহর্নিশি গালাগাল করিতেছে। "শুয়োরের বাচ্চা," "পুঙ্গির পুত" এইসব বলিতেছে, জুতা মারিয়া ঠোঁট ফাটাইয়া দিয়াছে।

আমি ভয়ংকর দুশ্চিন্তায় আছি। ইহার উপরে ইহারা আবার আমাকে অপমান না করে। যতই কষ্ট হউক, গদাধর, তুমি আমাকে জানো, অপমান করিলে আমি এই কাজ তখনই ছাড়িয়া দিব। না-খাইয়া থাকিব তবু ভাল, তবু অপমানিত হইয়া কাজ করিব না।

ইতি
তোমার বন্ধু
ভবনাথ

জীবজন্তু (১)

জীবজন্তু নিয়ে রসিকতার গল্পগুলি অধিকাংশই নেহাতই আজগুবি।

রূপকথা কিংবা ঠাকুমার ঝুলির জন্তুজানোয়ারেরা যেমন মানুষের মতো কথা বলতে পারে, হালকা গল্পের পশুপাখিও তাই।

তবে আমরা আপাতত সরাসরি শুধু পশুপাখির গল্পে যাচ্ছি না। যেসব গল্পে পশুপাখির সঙ্গে মানুষ জড়িত আছে, সে গল্পগুলোকেই বলছি।

প্রথমে গল্প নয়, একটা সাবেকি ধাঁধা স্মরণ করি।

উটপাখির গলা অত লম্বা কেন?

এই প্রশ্নের সরলতম উত্তর হল উটপাখির মাথাটা শরীর থেকে এত দূরে যে তার গলা অত লম্বা না হলে শরীরের সঙ্গে মাথা জুড়ে থাকত না।

যেমন এক ধরনের বেঁটে জাতের কুকুর আছে যাদের পা খুব ছোট ছোট। এই কুকুরের ব্যাপারটা উটপাখির ঠিক উলটো। কচ্ছপের মতো ছোট পা। তাই দেখে কুকুরের মালিককে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার কুকুরের পা এত ছোট যে নেই বললেই চলে।'

কুকুরের মালিক গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'তা বলছেন কেন? যতটুকু লম্বা হওয়া প্রয়োজন

তা তো আছে, পাগুলো মেঝে তো ছুঁয়েছে।'

এই কুকুরটিই একবার হারিয়ে গিয়েছিল। প্রিয় কুকুরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে কুকুরের প্রভু এপাশে-ওপাশে চারিদিকে সেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

অবশেষে যখন কিছুতেই কুকুরের খোঁজ পাওয়া গেল না, এক শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ দিলেন, 'আপনি একটা কাজ করুন, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন।'

কুকুরের মালিক ভদ্রলোক বিরাগকণ্ঠে বললেন, 'তাতে আর লাভ কী হবে? আমার কুকুর তো আর পড়তে পারে না।'

ঠিক এই জাতের আর-একটা গল্প আছে।

সে গল্পে এক ভদ্রমহিলা তাঁর বেড়ালের দুধ খাওয়ার জন্যে একটা কাঁসার বাটি কিনতে গিয়েছিলেন দোকানে। তিনি অনেক বাছাই করে চমৎকার একটি পদ্মকাটা রেকাবি কিনলেন তাঁর বেড়ালের জন্যে। দোকানদারকে একথা বললেনও যে, 'এই রেকাবিটা কিনেছি আমার পোষা বেড়ালের জন্য।'

দোকানদার তাই শুনে বললেন, 'আপনার এত আদরের বেড়াল, নিশ্চয়ই তার একটা নাম আছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তা থাকবে না কেন? আমার বেড়ালের নাম পুঁটিরানি।'

তখন দোকানদার বললেন, 'চমৎকার নাম আপনার বেড়ালের। পুঁটিরানি নামটা রেকাবির গায়ে লিখিয়ে দেব। পঞ্চাশ পয়সা করে চার অক্ষরে মাত্র দু'টাকা লাগবে।'

ভদ্রমহিলা কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'না। নাম লেখার দরকার নেই। আমার বেড়াল তো পড়তে-টড়তে মোটেই পারে না।'

কুকুর-বেড়াল কেন, কোনও জন্তুই পড়তে পারে না। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু গৃহপালিতই হোক অথবা বুনো জন্তুই হোক, তাদের অশিক্ষিত বলা যাবে না। তাদের জীবনচর্চা মানুষের চেয়ে বহুক্ষেত্রেই অনেক পরিচ্ছন্ন।

ওয়ালট হুইটম্যান বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে আমি বেশ বসবাস করতে পারব, থাকতে পারব। তারা কেমন নির্লিপ্ত ও আত্মনির্ভর। আমি অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করি। তারা কখনও কী হবে, কী হতে পারে—তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে অন্ধকার বিছানায় জেগে থাকে না, নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে পরিতাপ করে না। তারা কখনওই অসন্তুষ্ট নয়, তারা কিছু জমায় না, কিছু নেই বলে তারা দুঃখিত নয়।'

এতখানি জ্ঞানগর্ভ কথার পরে এবার ঘোড়ার গল্পে যাই। ঠিক ঘোড়া নয়, বলা উচিত মানুষের গল্প।

এক ঘোড়ার মালিকের পোষা ঘোড়াটি বুড়ো হয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, কিছুতেই চলতে চায় না। টিমিয়ে টিমিয়ে টুকুস টুকুস করে চলে। ওই যাকে বেতো ঘোড়া বলে তাই আর কী।

অবশেষে একদিন ঘোড়ার মালিক ঘোড়াকে নিয়ে গেল পশুচিকিৎসকের কাছে। পশুচিকিৎসক জানতে চাইলেন, 'এর হয়েছেটা কী?' ঘোড়ার মালিক বলল, 'তা আমি বলতে পারছি না। একটু বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু তা ছাড়া আর-কিছু অসুখ তো দেখতে পাচ্ছি না।'

পশুচিকিৎসক বললেন, 'ঠিক আছে, কোনও চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি। আমি একটা স্পেশাল টনিক বানিয়েছি, সেটা এক চামচে খাওয়ালেই ভাল হয়ে যাবে।'

যে কথা সেই কাজ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে এক চামচে স্পেশাল টনিক মুখে পড়ামাত্র ঘোড়াটা চিঁহিহি হ্রেষাধ্বনি করে বিদ্যুৎবেগে ছুট লাগাল। সে তার যৌবনেও কোনওদিন এত জোরে

ছোটেনি।

ঘোড়ার মালিক সেই দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়ে পশুচিকিৎসককে বলল, 'আপনার ওষুধের দাম কত?'

পশুচিকিৎসক বললেন, 'এক চামচে টনিক দশ টাকা লাগবে।'

ঘোড়ার মালিক পকেট থেকে তিরিশ টাকা বার করে পশুচিকিৎসককে দিয়ে বলল, 'আর দু' চামচ আপনার ওই স্পেশাল টনিক আমাকে দিন, আমাকে যে এখন ছুটে গিয়ে ঘোড়াটা ধরতে হবে। এর মধ্যে সেটা কতদূর চলে গেল কে জানে। ওর ডবল জোরে দৌড়তে হবে।'

অবশেষে ভেড়ার গল্প। এ গল্পটাও পুরানো।

একটি ছেলে তার বাবার সঙ্গে কলকাতার ময়দানে বেড়াতে গেছে। যেমন হয়, এক জায়গায় দলবেঁধে অনেকগুলো ভেড়া চরছে।

ছেলে অনেকক্ষণ ধরে নানারকম বায়নাক্কা করছিল। আইসক্রিম খাব, বাদাম কিনব, বাঁদরনাচ দেখব ইত্যাদি। ছেলেকে অন্যমনস্ক করার জন্য বাবা বললেন, 'গোনো তো ক'টা ভেড়া আছে।'

ছেলে মন দিয়ে গুনছে তো গুনছেই, গোনা আর শেষ হয় না। বাবা বিস্মিত হলেন, ভেড়ার সংখ্যা তো বেশি নয়, এত সময় লাগছে কেন গুনতে।

অবশেষে ছেলেটি বলল, 'একত্রিশটা ভেড়া আছে।'

বাবা বললেন, 'মাত্র একত্রিশটা ভেড়া গুনতে তোমার এত সময় লাগল?'

ছেলে বলল, 'আগে ভেড়াগুলোর পায়ের সংখ্যা গুনে বার করলাম একশো চব্বিশটা। তার পরে সেটাকে চার দিয়ে ভাগ করে পেলাম একত্রিশটা ভেড়া।'

পুজোর ছুটি

সেই যে অনেকদিন আগে ছোটদের কাগজের এক পুজো সংখ্যায় কে একজন ছড়াকার ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছিল।

'জানেন ছোটবাবু
আমার ছুটি নাই।'

সেই লোকটা ছড়া লিখে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি, কিন্তু তার ছড়ার এই ভাঙা পঙ্‌ক্তি দুটো এখনও আমার মাথার মধ্যে ঘোরে। বিশেষ করে যখন বৃষ্টিধোয়া ঝলমলে নীল আকাশে মাথানড়া তুলোর পুতুলবুড়োর সাদা চুলের মতো মেঘ আর পুরনো দিনের কটন মিলের নতুন ধোলাই ধুতির

মতো ধবধবে ফিনফিনে সাদা রোদ সেই সঙ্গে বাতাসে উত্তরের হিম আভাস আমার কেমন যেন মনে হয় এ জীবনে ছুটি বড় কম, এমন ভাল ভাল দিন হেলায় চলে যাচ্ছে।

ইয়োর অনার, মি লর্ড, উকিলবাবু, ব্যারিস্টার সাহেব আমি আপনাদের হিংসে করি। মাস্টারমশাই, প্রফেসার স্যার আমি আপনাদের ঈর্ষা করি।

কত দীর্ঘ শারদীয় অবকাশ আপনাদের, আশ্বিনের আশ্চর্য দিনগুলি, তার শিউলির সৌরভ, শিশিরের স্নিগ্ধতা, তার আলোছায়ার কারুকাজ—সবই শুধু আপনাদের জন্যে। আমাদের জন্যে ভিক্ষুকের ভাঙা এনামেলের তোবড়ানো বাটিতে পয়সা ছোড়ার শব্দের মতো টুংটাং সামান্য দু'-চারদিন।

ইংরেজ কবি এপ্রিল মাসের কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন, এপ্রিল হল নিষ্ঠুরতম মাস। সাদা বাংলায় এপ্রিল নয়, আশ্বিন হল নিষ্ঠুরতম মাস। মনে হয়, এই বুঝি সব ফিরিয়ে দিল, যা কিছু হারিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে। যা কিছু ভুলে গিয়েছিলাম, গন্ধময় কুসুম, শুভ্রতাময় মেঘ, হাস্যময় রোদ আর স্নেহময় শিশির—সবই ঘরের কাছে পৌঁছে দেয় আশ্বিন, কিন্তু পাওয়ার আগেই সব কিছু মিলিয়ে যায়; বেজে ওঠে ছুটি শেষের ঘণ্টা, তালা খোলে অফিসের দরজার।

পুজোর ছুটি মানেই বেড়াতে যাওয়া, বাক্স প্যাটরা বাঁধা, রেলের টিকিট কাটা, বাঙালির একটাই বিলাস, ভ্রমণ।

পরশুরাম তাঁর বিখ্যাত গল্প কচি সংসদে লিখেছিলেন,...'আর বৃষ্টি হইবে না।...জলে স্থলে মরুৎ-ব্যোমে দেহ মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগবিজয়ে যাইতেন।...ভ্রমণের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে...এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট পরিবর্তন...'

বেড়ানো আবার একেকজনের একেকরকম। কেউ একই জায়গায় বছরের পর বছর যায়, কেউ একেক বছর একেক জায়গায় যায়।

প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে আমার এক প্রবীণ আত্মীয় হাজারিবাগে যেতেন, হাজারিবাগ ছাড়া তিনি আর কোথাও যাবেন না। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বারবার হাজারিবাগ কেন? একঘেয়ে লাগে না?'

তিনি বলেছিলেন, 'একঘেয়ে লাগলে কী হবে, ওখানকার জল হাওয়ার কোনও তুলনা হয় না।'

আমি বলেছিলাম, 'খুব ভাল জল হাওয়া?'

তিনি বললেন, 'ভাল মানে কী? গত তিন বছরে ওখানে মাত্র পাঁচজন লোক মারা গেছে। তার মধ্যে তিনজন হল ওখানকার শ্মশানের ডোম, আর বাকি দু'জন হল কবরখানার মজুর। বেচারারা দিনের পর দিন কোনও কাজ না পেয়ে পয়সার অভাবে না খেয়ে মারা গেছে।'

এ অবশ্য নিতান্ত বাজে গল্প।

শুধু পুজোর ছুটি নয়, তবু আমার মতো করে বলছি।

এক সওদাগরি অফিসের বড় কর্তা অর্থাৎ মালিকের কাছে একবার জানতে চেয়েছিলাম, 'আপনার অফিসের সাধারণ কর্মচারীরা, কেরানি পিওন—এঁরা বছরে কতদিন ছুটি পান?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এক মাস।'

আমি সরকারি কাজে গিয়েছিলাম। আগে থেকেই কিছু কিছু খবর আমার হাতে ছিল, কর্মচারী ইউনিয়নগুলি সেসব তথ্য সরবরাহ করেছিল, আমি সেই তথ্যের ওপরে নির্ভর করে বললাম, 'কিন্তু আমি শুনলাম, এক মাস নয়, বছরে পনেরো দিন ছুটি দেন আপনি।'

কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে, কিঞ্চিৎ চিন্তা করে তারপরে ব্যবসায়ী মহোদয় বললেন, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক তা নয়। ওরা পনেরো দিনের ছুটিই পায়, কিন্তু আসলে সেটা এক মাস।'

আমি বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন, বছরে আমিও পনেরো দিনের ছুটি নিই। সেই পনেরো দিন আমি নেই, সুতরাং অফিস ভোঁ ভোঁ, এদেরও পুরো ছুটি। তাই পনেরো দিন প্লাস পনেরো দিন, এক মাস বলেছি।'

অনুমান করি, এবার পুজোর ছুটিতে খুব বেশি লোক বাইরে যাবেন না। কাগজে দেখছি দার্জিলিং যাওয়ার খুব ভিড়। কারণ দার্জিলিং নিরাপদ। কাশ্মীর বা পাঞ্জাব যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া অসম বা শিলং যেতেও অনেকে ভরসা পাচ্ছেন না। উত্তর, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতেও রেল অবরোধ, সড়ক অবরোধ। কোথাও গিয়ে, পৌঁছিয়ে নামতেই হয়তো দেখা যাবে সেদিনই আটচল্লিশ ঘণ্টার বন্ধ ডাকা হয়েছে।

যাঁদের টাকা পয়সা আছে, তাঁরা যদি এই পুজোর ছুটিতে ব্যাঙ্কক বা সিঙ্গাপুর, ইউরোপ বা আমেরিকায় যান তাঁদের কথা আলাদা। তবে আমাদের মতো লোকের পক্ষে এই পুজোয় কলকাতায় থাকাই সবচেয়ে সোজা ও ভাল; অন্তত পুজোর কয়দিন যে কলকাতায় কোনও গোলমাল হবে না, এমনকী হয়তো লোডশেডিং পর্যন্ত নয়—একথা কলকাতার অতি বড় নিন্দুকেও জানে।

সুতরাং কোথাও যাব না, গলিতেই থাকব।

পুজোর ছুটির পর কেউ হয়তো জানতে চাইবেন, 'পুজোর ছুটিতে পুরী যাবেন বলেছিলেন, কেমন লাগল পুরী?'

আমি বলব, 'পুরী তো গতবছর যাওয়ার কথা ছিল, গতবছর পুরী যাইনি। এ বছর তো দিল্লি যাব বলেছিলাম।'

তিনি হয়তো জানতে চাইবেন, 'কেমন লাগল এবার দিল্লিতে?'

আমি ম্লান হেসে বলব, 'দিল্লিও যাইনি।'

ক্রিমিনাল

আগে দুষ্কৃতকারী শব্দটি ব্যবহার হত। সম্প্রতি বাংলা খবরের কাগজে ক্রিমিনাল অর্থে দুষ্কৃতী শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল দুষ্কৃতী শব্দটি শুদ্ধ নয়, কিন্তু চলন্তিকায় দেখছি শব্দটি রয়েছে, বরং রাজশেখর বসু দুষ্কৃতকারী শব্দটি গ্রহণ করেননি।

সুবলচন্দ্র মিত্রের আধুনিক বাংলা অভিধানেও দেখছি দুষ্কৃতী বা দুষ্কৃতকারী নেই. অনুমান করি, হত্যাকারীর অনুকরণে দুষ্কৃতকারী শব্দটি কখনও রচিত হয়েছিল এবং তখন বিবেচনা করা হয়নি দুষ্কৃতী বলে একটি শব্দ আছে।

দুষ্কৃতী ব্যাকরণের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় দুষ্কৃতী বিষয়ক কাহিনীগুলি।

প্রথমে চোর দিয়ে আরম্ভ করাই উচিত।

এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল চুরির অপরাধে। সে নাকি এক গয়নার দোকানে চুরি করেছিল, বেশ কিছু গয়নাগাটি।

সে এক উকিলবাবুর কাছে গেল। সেই উকিলবাবু আবার খুব সাধু মানুষ, কখনও কোনও মিথ্যে মামলা নেন না।

তা এই মক্কেলটি উকিলবাবুর কাছে গিয়ে তার মামলার কথা বলতে উকিলবাবু বললেন, 'দেখুন দুটো শর্তে আমি আপনার এই মামলা নিতে পারি। এক নম্বর হল, আপনি সত্যিই নির্দোষ, চুরি করেননি। এবং দুই নম্বর হল, আপনি আমাকে পাঁচশো টাকা ফি দেবেন।'

মক্কেল সব শুনে যথেষ্ট চিন্তা করে ঘাড় চুলকিয়ে বললে, 'হুজুর, আপনার ওই এক নম্বর তো ঠিক আছে কিন্তু দুই নম্বর মানে আপনার ফিয়ের ব্যাপারটা, স্যার খুব টানাটানি চলছে, বিপদেও পড়েছি, একটা অনুরোধ করি দুশো টাকা নগদে দেব আর দুটো কানের দুল সঙ্গে একটা আংটি দেব। খাঁটি সোনা, বড় জুয়েলারির দোকানের মাল স্যার।'

চুরির পরে ছেনতাই।

ছেনতাইয়ের মতো রোমহর্ষক কাহিনী কলকাতার পটভূমিকায় না রেখে নিউইয়র্কে নিয়ে যাই। আসলে সেখানেই এ ব্যাপারটা খুব বেশি ঘটে কি না।

যা হোক সেই নিউ ইয়র্কের গহনে এক গলিতে এক বাঙালিনী হেঁটে একজনের বাড়ি খুঁজে যাচ্ছিলেন। পুরনো নিউইয়র্কের রাস্তাঘাট জটিল এবং কালক্রমে তিনি এক কৃষ্ণবর্ণ ছেনতাইকারীর মুখোমুখি হলেন।

ভদ্রমহিলা সরল হলেও বুদ্ধিমতী, ছেনতাইকারী দাবি করা মাত্র বিনা প্রতিবাদে তিনি তাঁর হাতব্যাগটি দুষ্কৃতকারীর হাতে তুলে দিলেন। মহিলার সারল্য এবং তদুপরি বিনা বাধায় মাল পেয়ে যাওয়ায় ছেনতাইকারী নিগ্রোটি একটু খুশি হয়ে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মহিলাকে দিয়ে বলল, 'মেমসাহেব আমার এই কার্ডটা রাখুন, এ পাড়ায় অনেক খারাপ ছেনতাই পার্টি আছে, তারা আপনাকে মারধোর করতে পারে, আপনার গলার হার, কানের দুল ছিঁড়ে নিতে পারে, আরও খারাপ কাজ করতে পারে। আপনি এ পাড়ায় এলে আমার এই কার্ডটা লোককে দেখাবেন। তারা আমার কাছে পৌঁছে দেবে, তখন শুধু হাতব্যাগটা দিয়ে চলে যাবেন।'

চুরি, ছেনতাইয়ের পর অবশ্যই খুন, রাহাজানি। তবে একটা কথা বলে রাখি রাহা মানে পথ। রাহাজানি আর পথে ছেনতাই একই ব্যাপার।

সে ঠিক আছে, খুন নয়, এই মুহূর্তে অতটা সইবে না।

আগে একটা পরোপকারী ডাকাতের গল্প বলি।

না ইনি মহামহিম রঘু ডাকাত নন, রবিন হুড নন, এমনকী অতীতের অনন্ত সিংহও নন।

ইনি একজন সাধারণ, অতি সামান্য ব্যাঙ্ক ডাকাত।

ইনি ভুল করে একদিন দলবল নিয়ে এক প্রত্যন্ত বিন্যাসিত সরকারি ব্যাঙ্ক শাখায় ঢুকেছিলেন।

এই কাল্পনিক ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থেকে দারোয়ান সবাই তস্কর, সবাই ডাকাত, সবাই দস্যু। যেমন যেমন টাকা সরকার থেকে এসেছে, গ্রাহকদের কাছ থেকে জমা পড়েছে এঁরা সবাই মিলে ভাগেযোগে কিছু খাতায় মানে লেজারে তুলেছেন, কিছু নিজেদের পকেটে তুলেছেন।

তিনি ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে রিভলবার তুলে যেই বললেন যে সবাই মাথার ওপরে হাত তুলুন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সবাই মাথার ওপরে হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন।

এঁদের এ রকম আহ্লাদের কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে দস্যু মহাশয় জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার?'

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, 'কিছুই ব্যাপার নয় স্যার। ওই ভল্টে টাকা রয়েছে, আপনি সব টাকা নিয়ে যান আর সেই সঙ্গে আমাদের এই সব হিসেবের খাতা লেজার বুক এগুলোও নিয়ে যান।

অর্থাৎ, ডাকাতরা খাতাপত্র নিয়ে গেলে এঁদের আর তহবিল তছরুপ ধরা পড়বে না, এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবেন।

অতঃপর খুন, মার্ডার।

সরোজবাবুর প্রতিবেশী কাল রাত সাড়ে দশটায় খুন হয়েছেন।

এখন থানায় সরোজবাবুকে পুলিশ জেরা করছে।

পুলিশ: কাল রাত দশটার সময় আপনি কী করছিলেন?

সরোজবাবু: বাসায় ছিলাম।

পুলিশ: বাসায় কী করছিলেন?

সরোজবাবু: আমার স্ত্রী ভুনিখিচুড়ি রান্না করেছিলেন, তাই দিয়ে রাতের খাওয়া সারছিলাম।

পুলিশ: ঠিক আছে। তারপর রাত সাড়ে দশটার সময় কী করছিলেন?

সরোজবাবু: শোয়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরাচ্ছিলাম।

পুলিশ: প্রমাণ কী?

সরোজবাবু: আপনি আমার স্ত্রীর রান্না ভুনিখিচুড়ি একবার খেয়ে দেখুন তারপর বুঝতে পারবেন, আমি সত্য বলছি কি না?

অনেকগুলো বাজে গল্প হল, এবার একটা বলি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

কলকাতার ভিড়ের ট্রামে একবার এক পকেটমার আমার প্যান্টের পকেটে হাত গলিয়েছিলেন।

তখন টাইট প্যান্টের যুগ। আমি তার পেলব করস্পর্শ টের পেয়ে একটু কোনাকুনি ঘুরে যেতেই তার হাতটা আমার পকেটে আটকে গেল।

লোকটি কাকুতি-মিনুতি করতে লাগল, বলল, 'দাদা, একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান, হাতটা বার করতে পারছি না, হাতটায় ব্যথা করছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার পকেটে আপনার হাত কী করছে?'

সে বলল, 'খুব ঘেমে গিয়েছিলাম। ভাবলাম শুকনো রুমাল যদি থাকে।'

আমি বললাম, 'তা আমাকে বলতে পারতেন।'

লোকটি বলল, 'ছোট বয়সে মা বারণ করে দিয়েছিলেন রাস্তাঘাটে অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবি না, সেই জন্যেই তো।

নেহাত সাদা বাংলায় ক্রাইম শব্দের মানে অপরাধ, ক্রিমিন্যাল অপরাধী।

অপরাধীর মতো সোজা এবং গ্রহণযোগ্য শব্দ হাতের কাছে থাকতেও কেন দুষ্কৃতী বা দুষ্কৃতকারী শব্দের দরকার পড়ল ক্রিমিন্যাল বোঝাতে, সে আমার ঠিক বোধগম্য নয়।

হয়তো এমন হতে পারে অপরাধী শব্দটা তেমন জোরদার নয়। একথা ঠিক যে দোষ করা বা অপরাধ করা এক জিনিস আর ক্রাইম অন্য জিনিস। দোষী বা অপরাধী বললে মনে যে রেখাপাত হয় তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট, অনেক তীক্ষ্ণ ক্রিমিন্যাল বা দুষ্কৃতী শব্দ।

আমি জানি আমার পাঠকেরা শব্দতত্ত্ব থেকে গালগল্পে অনেক বেশি আগ্রহী তাই আমাকে মানে মানে পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে।

এই সামান্য নিবন্ধে ইতিমধ্যে চোর ডাকাত, খুন রাহাজানি এমনকী পকেটমারের কাহিনী বলা হয়ে গেছে।

এবার অপহরণে আসি। মানুষ অপহরণ।

অপহরণ কোনও নতুন যুগের অপরাধ না। এক যুগে তো অধিকাংশ বিয়েই হত কন্যা অপহরণ করে। রামায়ণের সীতা হরণের কাহিনী সর্ববিদিত, যদিও সেখানে অপহরণকারী রাবণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, তাকে সবংশে নিধন হতে হয়েছিল।

মহাভারতেও রয়েছে অর্জুন কর্তৃক বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা হরণের এবং পরে সুভদ্রা বিবাহের কাহিনী। সম্প্রতি আবার অপহরণ ব্যাপারটা নানা জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোথাও হয়তো বিপ্লবীরা মন্ত্রীতনয়া অথবা কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধানকে অপহরণ করে গোয়েন্দা চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখে তাদের বিনিময়ে সরকারের হাতে বন্দি স্বপক্ষীয় বিপ্লবীদের মুক্তি দাবি করছে। আবার কোথাও হয়তো মামুলি অপহরণ, কিডনাপিং, বড়লোকের ছেলেকে বা মেয়েকে তুলে নিয়ে রাখা হচ্ছে গোপন জায়গায় তার মুক্তিপণ হিসেবে চাওয়া হচ্ছে বিশাল টাকা।

এইরকম একটি অপহরণের গল্প সম্প্রতি আমার কানে এসেছে।

বড়বাজারে জরির আর পানের তবকের ব্যবসায়ী মূলচাঁদ খুরানা। ধনকুবের, তার টাকার কোনও হিসেবনিকেশ নেই। যৎকিঞ্চিৎ হিসেবনিকেশ আয়কর দপ্তর জানে কিন্তু সেটাও ভয়াবহ।

যা হোক মূলচাঁদবাবুর দুই ছেলে। যমজ, এখন বালক তারা। ফুলচাঁদ খুরানা এবং দুলচাঁদ খুরানা। দু'জনেই ডনবসকোতে পড়ে।

শুধু যমজ নয়। দুলচাঁদ আর ফুলচাঁদ একরকম দেখতে। আকারে-প্রকারে, আচারে, আচরণে, গাত্রবর্ণে, মুখশ্রীতে, কণ্ঠস্বরে চলাবলায় কারও সাধ্য নেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা বন্ধুরও ধরার জো নেই কে ফুলচাঁদ, কে দুলচাঁদ?

পূর্ব কলকাতার বিখ্যাত বিহারি মস্তান ফেচু সিং এবং আবুল কালাম বহুদিন ধরেই ফুলচাঁদ আর দুলচাঁদের দিকে নজর রাখছিল, অবশেষে একদিন সুযোগ পেয়ে দুপুরবেলা ইস্কুলের কাছে পার্কসার্কাসের মোড়ে একলা পেয়ে দু'জনকে তুলে মেটিয়াবুরুজে আবুল কালামের শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল, তারপর যেমন হয়ে থাকে।

অস্বাক্ষরিত একটি পত্র পেলেন মূলচাঁদ খুরানা। বড়বাজারে তাঁর গদিতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

চিঠিটির বয়ান,

মুলচন্দর সাহেব,

আপনার দুই ছেলে ফুলচাঁদ আর দুলচাঁদকে আমরা kidnap করিয়াছি। তারা এখনও নিরাপদে আছে। আপনি যদি দশ লাখ টাকা তাদের বিনিময়ে দেন তাহারা ছাড়ান পাইবে না হইলে মৃত্যু অনিবার্য। দিতে চাহিলে চৌরঙ্গি থিয়েটার রোডের মোড়ে যে মাথাভাঙা ফাটা ল্যাম্পপোস্ট আছে

তাহার ফোকরে আজ সন্ধ্যায় একটি চিঠি রাখিয়া যাইবেন। সেই চিঠিতে যেন লেখা থাকে কী নগদ টাকা দিতে পারিবেন। আমাদের লোক নিকটেই থাকিবে, চিঠিটি সঙ্গে সঙ্গে লইবে এবং পরবর্তী সংবাদ গদিতে পাইবেন।

সাবধান পুলিশে খবর দিবেন না। বালকদ্বয়ের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবেন না।

নমস্কার

এই চিঠি পেয়ে মূলচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, তাঁর বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কিন্তু মূলচাঁদজি ঠান্ডা মাথার মানুষ, তিনি ভেবে দেখলেন পুলিশে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। টাকা দিয়ে দেওয়াটা ভাল। কিন্তু দশ লাখ টাকা তিনি দেবেন না। ফুলচাঁদ আর দুলচাঁদ দু'জনে তো একই জিনিস, আগাগোড়া একরকম। একজনকে পেলেই চলে যাবে। কয়েকদিনের মধ্যে অন্যজনের দুঃখ ভুলে যাবেন।

মূলচাঁদ খুরানা চিঠি দিলেন, 'দশ লাখ টাকা নেই। তবে আপাতত একজনকে ছেড়ে দিলে পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারি।'

চিঠি পেয়ে অপহরণকারীরা বুঝল যে মূলচাঁদজি তাদের ওপরে ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। তবে তারাও ছাড়বার লোক নন, তারা জানাল:

মূলচাঁদজি,

আপনার মতোই আমাদের পাইকারি হিসাব।

ফুলচাঁদ, দুলচাঁদ দুইজনের একত্রে ফেরত মূল্য দশ লাখ টাকা বটে তবে খুচরা লইতে গেলে একেক জনের জন্যে সাত লাখ টাকা লাগিবে।

কী করিবেন জানাইবেন।

নমস্কার

অতঃপর মূলচাঁদজি কী করেছিলেন তা আমার এই রম্য নিবন্ধের বিষয় নয়।

ক্রিমিন্যালের শেষ বিষয় প্রতারণা। কয়েক বছর আগের ব্যাপার এটা।

আমেরিকা না কোথা থেকে এক সাহেব এসেছিল দিল্লিতে। বিখ্যাত লোকদের নামের সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের জিনিস বহুমূল্যে সে সংগ্রহ করেছিল। যেমন মতিলাল নেহরুর জুতো, জহরলালের টুপি, রাজেন্দ্রপ্রসাদের কোট, রবীন্দ্রনাথের সেভিং সেট, সরোজিনী নাইডুর টুথব্রাশ।

মহাপুরুষের উত্তরাধিকারীরা কিংবা এইসব জিনিস যাদের কাছে আছে, যারা যত্ন করে রেখে দিয়েছে তারা যদি এগুলো চড়া দামে সংগ্রাহকের কাছে বেচে দেয় তা হলে আইনত বিশেষ কিছু করার নেই।

পুলিশ তাই এ নিয়ে মাথা গলায়নি। কিন্তু গোপনসূত্রে পুলিশের কাছে খোঁজ এল আমেদাবাদের এক আশ্রম থেকে একজন লোক মহাত্মা গান্ধীর খসে পড়ে যাওয়া পুরনো দাঁত যা সেখানে রক্ষিত ছিল সেগুলো চুরি করে এনে বেচেছে।

পুলিশের বেশি সময় লাগল না লোকটিকে পাকড়াও করতে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার লোকটিকে গ্রেপ্তার করার পর তার কাছে পাওয়া গেল বড় একটা রেশমের ঝোলা, সেই ঝোলার গায়ে গুজরাটিতে লেখা, 'মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দাঁত।' ঝোলার মধ্যে বহু দাঁত, পুলিশ গুনে দেখল দাঁতের সংখ্যা একশো চুয়ান্ন।

এত দাঁত ছিল মহাত্মার?

রবিবারের মহাভারত

আমার এই নিবন্ধের নামকরণ দেখে পাঠিকা যদি মনে করেন যে 'রবিবারের মহাভারত' হয়তো নতুন কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম, তা হলে সেটা ভুল হবে।

এ নিবন্ধ দূরদর্শনের মহাভারত নিয়ে, যা সারা দেশকে রবিবার সকালে বাড়ির মধ্যে বন্দি করে রাখত।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সেই বিখ্যাত বর্ণনা:

...গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শতশত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ-নীচ অট্টালিকা।...বাজারে দোকান বন্ধ, হাটে হাট লাগে নাই। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না'...

মন্বন্তর-তাড়িত এক জনপদের প্রাচীন ছবি প্রতি রবিবার মহাভারতীয় সকালে বারবার ফিরে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বর্ণনা দিয়েছিলেন, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলে গেছে, তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করেছে, দাতারা দান বন্ধ করেছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করেছে, 'শিশুও বুঝে আর সাহস করিয়া কাঁদে না।'

এক বিদেশি পর্যটকের বর্ণনায় আছে, মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ যখন পূর্বভারতে এসে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট, সেরেস্তা-কাছারি, কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তাঘাট, বাজার-হাট চারদিক শুনশান হয়ে গেল।

ইতিহাস এবং আনন্দমঠের ক্লাসিকতার পর মহাভারত-বৃত্তান্তকে প্রাণাধিকা চপলা পাঠিকার জন্যে কতটা লঘু করা যাবে বুঝতে পারছি না। আপাতত শিবরাম চক্রবর্তীকে স্মরণ করি।

আসল মহাভারত হল ব্যাসদেবের। আর বাংলায় কাশীদাসী মহাভারত, সাবলীল পয়ারে রচিত সে এক অসামান্য কালজয়ী গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় মহাভারত রয়েছে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের এবং রাজশেখর বসুর।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নিতান্ত এক অবান্তর কারণে স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তীকে মনে পড়ে যেত রবিবার সকালে চোপড়ার মহাভারত দেখতে বসলে।

ওই যে মহাভারতের শুরুতেই গীতার সেই বিখ্যাত 'মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া হত, বিনা কারণেই আমার তখন শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পটি মনে পড়ত।

গল্পটি একটু প্যাঁচালো। গল্পকারের এক বন্ধুর খুড়শাশুড়ি সদ্য পরলোকগমন করেছেন। গল্পকারের মনে ধারণা হয়েছে যে বন্ধুটি নিশ্চয়ই শোকে অভিভূত ও মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। খুড়শাশুড়ি-বিয়োগের এই গভীর শোকের দিনে প্রাণের বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে গল্পকার গীতার শ্লোক আওড়াতে লাগলেন বন্ধুর কাছে।

আসল ঘটনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা বাহুল্য, খুড়শাশুড়ির শোকে বন্ধু মোটেই মুহ্যমান হয়ে পড়েনি। সে ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কিনেছে, মেট্রো সিনেমায় গ্রেটা গারবোর ছবি দেখতে যাচ্ছে।

সেই সময় লেখক তার কাছে গিয়ে তাকে শোনাচ্ছে গীতার বাণী, 'নৈনং ছিদ্রন্তি...সূঁচও ইহাকে ছিদ্র করিতে পারে না, আগুনও ইহাকে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শুনে বন্ধুটি একেবারে খেপে গেল। চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ইহাকে-তাহাকে—কাহাকে? এসব কী হচ্ছে কী? আমার বাড়িতে এগুলো কী হচ্ছে?'

মহাভারতের আরম্ভে গীতার ওই শ্লোক 'মা ফলেষু কদাচন...' শোনামাত্র প্রতি রবিবার সকালে শিবরামের গল্পের চরিত্রের মতো আমারও চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হত, 'এসব কী হচ্ছে কী? আমার বাড়িতে এগুলো কী হচ্ছে?'

কিন্তু তা বলিনি। বরং শান্ত হয়ে বসে মহাভারত দেখেছি। রবিবার সকালে মহাভারতের সময়টা ছিল আমাদের বাড়িতে সকলের একসঙ্গে বাইরের ঘরে বসে নিঃশব্দে ছুটির দিনের জলখাবার খাওয়ার সময়।

খুব সুবিধে। এই সময় বাড়িতে কেউ আসে না। এমনকী ধোপা, নাপিত পর্যন্ত নয়। আমরা মনোযোগ দিয়ে মহাভারত দেখি এবং খাই। কৃষ্ণের মাখনচুরি দেখতে দেখতে মাখন না-মাখানো পাঁউরুটি, জিলিপি আর সিঙ্গাড়া কিংবা নিমকি দিয়ে প্রাতঃরাশ সারি।

একদিন একটু ব্যতিক্রম হল। মহাভারত শুরুর দিকের ঘটনা এটা। সবে শিশু শ্রীকৃষ্ণ বালকে পরিণত হতে যাচ্ছেন, পটভূমিকায় কিশোরী শ্রীরাধিকাকেও দেখা যাচ্ছে। বাইরের ঘরের টেবিলে যথারীতি পাঁউরুটি জিলিপি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে, আমরা খেতে আরম্ভ করতে যাচ্ছি, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমি একটু বিব্রত হয়েই দরজা খুললাম। খুলে দেখি হীরক দাঁড়িয়ে আছে, সে আমার এক পুরনো বন্ধু।

হীরক ঘরে ঢুকে আমরা মহাভারত দেখছি দেখে পরম বিরক্তি প্রকাশ করল। 'তোমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে এই রাবিশ মহাভারত দেখছ!' গজগজ করতে করতে সে পাশের একটা খালি চেয়ারে বসল। তারপর বলল, এ পাড়াতেই কোনও এক ডাক্তারকে দেখাতে এসেছে। কিন্তু ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ, দরজায় নোটিশ লাগানো আছে: 'মহাভারত চলাকালীন রোগী দেখা বন্ধ।'

মহাভারতের ওপরে হীরক অত্যন্ত খ্যাপা। ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকতে না পেরে সে সময় কাটানোর জন্যে পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেখানেও বেয়ারা, বয়, দোকানদার সবাই পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে 'মহাভারত' দেখায় ব্যস্ত। অবশেষে বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হীরক আমাদের বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এখানেও সেই মহাভারত।

হীরক গজগজ করতে লাগল এবং গজগজ করতে করতেই হাতের সামনের থালা থেকে পাঁউরুটি, জিলিপি, নিমকি তুলে তুলে খেতে লাগল।

একসময় মহাভারত এবং হীরকের খাওয়া শেষ হল। আমরা বাড়ির কেউই কিছু খাইনি। বড়জোর এক স্লাইস রুটি বা একটা জিলিপি। বাকি সবটা হীরক গলাধঃকরণ করেছে। অবশেষে পর পর দু' গেলাস জল খেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'যাই। ডাক্তারের চেম্বার বোধ হয় এবার খুলল।'

ভদ্রতার খাতিরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তারের কাছে কেন যাচ্ছ? তোমার কী হয়েছে?' হীরক বলল, 'আর বোলো না। একদম খিদে হয় না, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।'

আমরা হতবাক হয়ে পারিবারিক প্রাতরাশের শূন্য থালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মহাভারতের কৃপায় চারজনের খাবার হীরক একা খেয়েছে, এবার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে আরও খাবারের প্রয়োজনে।

পুনশ্চ একটি বিদেশি গল্প ও উপসংহার:

দুটি ক্যাথলিক শিশু নিজেদের মধ্যে ধর্ম-আলোচনা করছিল। প্রথমজন যাজকের সন্তান। সে বলল, 'রবিবার কাজ করা মহাপাপ।' দ্বিতীয়জনের বাবা পুলিশে কাজ করেন। সে প্রশ্ন করল, 'কেন, রবিবার কাজ করলে কী হবে?' যাজকতনয় উত্তর দিল, 'স্বর্গে যেতে পারবে না।' দ্বিতীয়জন

জানাল, 'আমার বাবাকে যে রবিবার কাজ করতে হয়।' যাজকতনয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বলল, 'তা করুক। তোমার বাবার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই, স্বর্গে পুলিশ দিয়ে কী হবে?'

গল্পটি নিমিত্তমাত্র। আসল কথা হল খ্রিস্টানরা অনন্তকাল চেষ্টা করে যাচ্ছেন রবিবারকে ধর্মবার করতে, শুধু ধর্মের জন্যে, কোনও ঐহিক কাজের জন্যে নয় সাবাথ বা রবিবার।

রবিবারের সকালে প্রথম সাগরের রামায়ণ এবং চোপরার মহাভারত ভারতীয়দের সেই ধর্মবারে পৌঁছে দিয়েছিল।

আইনের আঙিনায়

গল্পটা অন্তত একবার লিখেছিলাম আগে, বোধহয় 'বিদ্যাবুদ্ধি'তে।

ধরে নিচ্ছি, তখন কেউ কেউ হয়তো গল্পটা পড়েননি, আর যাঁরা পড়েছিলেন তাঁরাও ভুলে গেছেন।

গল্পটা একটু সাবধানে লিখতে হবে, আইন-আদালতের ব্যাপার, সামান্য এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই।

এক ব্যক্তি এক ফৌজদারি মামলার উকিলের চেম্বারে এসেছে সন্ধ্যাবেলা। চুরির মামলায় লোকটি গতকালই বহু কষ্টে জামিন পেয়ে হাজত থেকে খালাস পেয়েছে। আগের উকিল তার পছন্দ হয়নি।

খালাস পাওয়ার পর অন্যদের পরামর্শ শুনে সে আজ এই নতুন উকিলের কাছে এসেছে। উকিলবাবু এই লোকটিকে দেখে বুঝতে পারলেন, এর এমন কিছু কথা আছে, যা সর্বসমক্ষে আলোচনা করা যাবে না। লোকটিকে তিনি ইশারায় অপেক্ষা করতে বললেন। উকিলবাবুর জমজমাট পশার। অনেক রাত হল চেম্বার খালি হতে। অবশেষে শূন্য চেম্বারে মুখোমুখি বসে উকিলবাবু মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কেসটা কীসের?'

লোকটি অম্লান বদনে জবাব দিল, 'আজ্ঞে চুরির।'

এ রকম জবাব শোনা উকিলবাবুর অভ্যেস আছে। পরবর্তী প্রশ্ন মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চুরির?'

মক্কেল উত্তর দিল, 'আজ্ঞে এক কেস বিলিতি হুইস্কির।'

উকিলবাবু একথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'তা কেসটা কোথায়?' সেই হুইস্কির কেসের তথা চুরির কেসের শেষে কী হল, তা আমরা জানি না। অন্য একটি গল্প জানি।

আদালতে একটা মামলা কতদিন ধরে যে চলে তার ইয়ত্তা নেই। শোনা যায়, কলকাতা হাইকোর্টে এমন সব মামলা আছে, যেগুলি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরনো।

সুদর্শনবাবু বলে আমার এক বন্ধু একবার এক গোলমেলে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। টাকাপয়সা বেশি নেই ভদ্রলোকের, কিন্তু একজন উকিল না-হলে তো মামলা করা যায় না।

আমার পরিচিত একটি ছেলে, আমাদের পুরনো পাড়ার প্রতিবেশীর ছেলে, তখন সদ্য উকিল

হয়েছে, গাউন কাঁধে আদালতে যাতায়াত শুরু করেছে। আমি তার কাছে সুদর্শনবাবুকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু উকিল দেখে সুদর্শনবাবু মোটেই খুশি হলেন না। একেবারেই ভারভারিক্কি নয়, নিতান্ত বাচ্চা উকিল।

উকিলের সামনে মুখে বলেও ফেললেন কথাটা সুদর্শনবাবু। 'তুমি এত তরুণ, এত অল্পবয়সি, তা আমি ভাবিনি। তুমি কি আমার মামলাটা করতে পারবে?' 'তুমি' করেই বললেন সুদর্শনবাবু।

তরুণ উকিলটি কিন্তু সহজে মক্কেল ছাড়বার পাত্র নয়। একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তারপর সুদর্শনবাবুকে বলল, 'আগে দেখুনই না মামলাটা কতদিন ধরে চলে, মামলা শেষ হতে হতে আমি প্রবীণ হয়ে যাব।'

আদালতি সময়ের আরও একরকম ব্যাপার আছে।

এক মারামারির মামলা চলছে আদালতে। সাক্ষীর জেরা শেষ হতে হতে দেড়টা বাজল। এবার কিছুক্ষণ বিরতি। এরপর আবার আড়াইটের সময় আদালত বসবে। তখন উকিলবাবুরা যাঁর যাঁর বক্তৃতা পেশ করবেন। তবে সাক্ষীর জেরা হয়ে যাওয়ার পরে মামলার আর বিশেষ কিছু থাকে না। মোটামুটি বোঝা যায় মামলার ফলাফল কী হবে।

এ রকম একটি মামলায় কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামি সাক্ষীর জেরা হয়ে যাওয়ার পর বিরতির সময় জনান্তিকে তার উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, আর কতক্ষণ লাগবে?'

একটু ভেবে উকিলবাবু বললেন, 'আমার বোধহয় পনেরো মিনিট আর তোমার বোধহয় দু'বছর।'

অর্থাৎ, উকিলবাবু বুঝতে পেরেছেন যে, তার মক্কেলের অন্তত দু'বছর সাজা হবে।

এই উকিলবাবুর কথাই কিনা সেটা হলফ করে হয়তো বলতে পারব না, তবে আরেকটা গল্পও জানি।

এক আদালতের বার লাইব্রেরির মেম্বাররা অর্থাৎ মাননীয় উকিলবাবুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁরা কেউই কখনও মক্কেলের কাছ থেকে বত্রিশ টাকার কম ফি নেবেন না।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, জনৈক ব্যবহারজীবী তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে মাত্র উনিশ টাকা ষাট পয়সা পারিশ্রমিক নিয়েছেন।

বিশেষ জরুরি অধিবেশন বসল মাননীয় বার লাইব্রেরির—রীতিমতো জেনারেল মিটিং, সমস্ত উকিলবাবু সেখানে উপস্থিত।

অভিযুক্ত উকিলবাবুকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করা হল, 'যেখানে নিম্নতম ফি বত্রিশ টাকা ধার্য করা হয়েছে, আপনি কেন কম নিলেন?'

এক প্রবীণ উকিল প্রশ্ন করলেন, 'শুধু কম নয়, আপনি কী করে উনিশ টাকা ষাট পয়সার মতো এমন হাস্যকর ফি নিলেন। অন্তত বিশ টাকাও তো নিতে পারতেন।'

উক্ত প্রবীণ উকিলের উদ্দেশে উনিশ টাকা ষাট পয়সার উকিলবাবু বললেন, 'দাদা, এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।'

একসঙ্গে পুরো বার লাইব্রেরি গর্জে উঠল, 'কেন?'

উনিশ টাকা ষাট পয়সার উকিলবাবু আবার বললেন, 'উপায় ছিল না।'

একসঙ্গে পুরো বার লাইব্রেরি আবার গর্জে উঠল, 'উপায় ছিল না কেন?'

উকিলবাবু বললেন, 'কারণ আমার মক্কেলের এর চেয়ে বেশি পয়সা ছিল না। যা ছিল সবই আমি নিয়েছি।'

অতঃপর বার লাইব্রেরির সমস্ত সদস্য, সব উকিলবাবু 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন, কারণ একজন উকিল এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারেন?

এতসব অবমাননাকর আখ্যানের অবশেষে একটি নিতান্ত সরল ও সত্য কাহিনী নিবেদন করা যাক।

ফৌজদারি আদালতের কাঠগড়ায় আসামি মামলা শেষ হওয়ার আগেই, তাঁর পাশের উকিলবাবুর আরগুমেন্ট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আদালতের উদ্দেশে নিবেদন করল, 'হুজুর, আমি স্বীকার করছি, আমিই দোষী।'

এই স্বীকারোক্তি শুনে চমকে উঠলেন আসামি পক্ষের দুঁদে উকিল, ছুটে গেলেন তাঁর মক্কেলের কাছে। বললেন, 'আপনি প্রথমেই এই স্বীকারোক্তি করলেন না কেন? আমাদের অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত।'

আসামি বলল, 'স্যার, আমি জানতাম আমি নির্দোষ। তাই পয়সা খরচ করে আপনাকে রেখেছিলাম। কিন্তু মামলার সাক্ষীদের কথা শুনে আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, আমি নিশ্চয়ই নির্দোষ নই।'

পুনশ্চ

অনেকক্ষণ ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে মক্কেলের সমস্ত কথা শুনলেন ব্যারিস্টার সাহেব। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকিয়ে মক্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি জানেন যে আপনি যেটা করতে চাইছেন, সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি?'

একটুও দ্বিধা না করে মক্কেল জবাব দিলেন, 'সেটা জানি বলেই তো আপনার কাছে এসেছি।'

বুদ্ধি

আমি গরিব মানুষ। আমার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আয়ব্যয়ের ভয়াবহ পার্থক্য আমাকে বুদ্ধি খরচ করে মেটাতে হয়। টাকার অভাবে বুদ্ধি খরচ করি।

বুদ্ধি ব্যাপারটা খুব জটিল। যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। বিদ্যা, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি হয়তো চেষ্টা করে বাড়ানো যায়, বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ব্যাপারটা অটল অনড়। তার আর বাড়াকমা নেই। অতি বার্ধক্যে সেনিলিটি বা মানসিক জড়তা না-আসা পর্যন্ত যার যতটুকু বুদ্ধি আছে, তার খুব কমতি হয় না। এই তো সেদিন বুদ্ধির ব্যাপারটা উঠেছিল ভারতীয় সংসদে। জনৈক মাননীয় সংসদ-সদস্য সদাসর্বদা টুপিপরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই গরমে মাথায় টুপি পরে থাকেন কী করে? অস্বস্তি হয় না, কষ্ট হয় না?'

এই অ-সংসদসুলভ প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী সরস জবাব দিয়েছিলেন, 'আরে মশায়, টুপি নয়, টুপির নীচের জিনিসটাই আসল কথা।' টুপির নীচে মাথা, মাথা মানেই বুদ্ধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টুপির বদলে প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে তাঁর বুদ্ধির দিকে নিয়ে গেছেন।

র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসন একদা বলেছিলেন, 'বুদ্ধিমান মানুষের নির্বোধ মানুষের ব্যাপারে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকারটা হল নির্বোধকে পরামর্শ দেওয়া।'

বুদ্ধি বিষয়ে আরও-একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন অন্য এক বিদেশি প্রবন্ধকার। তাঁর বক্তব্য

ছিল যে, বুদ্ধি হল টাকার মতো। যতক্ষণ-না লোকে জানতে পারছে তোমার কতটা আছে, ধরে নিচ্ছে তোমার অনেক আছে।

কথাটা অবশ্য খুব সরল নয়। সোজা ব্যাপার হল—যার তেমন বুদ্ধি নেই, তার চুপচাপ থাকাই ভাল। তার বুদ্ধির দৌড় দেখলে লোকে বুঝে যাবে যে সে নির্বোধ। কিন্তু সে যদি বুদ্ধি প্রকাশ করতে না যায়, তা হলে হয়তো তাকে সবাই বুদ্ধিমান বলেই বিবেচনা করবে।

আমাদের ছোটবেলায় 'বুদ্ধির অঙ্ক' বলে একটা সমস্যা ছিল, হয়তো এখনও আছে।

সে এক ভয়াবহ ব্যাপার।

এক তেলতেলে বাঁশ বেয়ে বাঁদর উঠছে। সেই বাঁদর মিনিটে তিন ফুট ওঠে, আবার পরের মিনিটে আড়াই ফুট নেমে যায়। কতক্ষণে সে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার বংশদণ্ডের শীর্ষে পৌঁছবে।

শ্রীমতী লীলা মজুমদারের গল্পে পড়েছি—এক সরেস ছাত্র এই অঙ্কের উত্তর বার করেছিল আড়াইখানা নাকি সাড়ে তিনখানা বাঁদর।

হয়তো অনেকেরই মনে আছে, আরও সব নানারকম বুদ্ধির অঙ্ক ছিল—চৌবাচ্চার দুই নল দিয়ে দুই ধারায় জল ঢুকছে আর ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, কতক্ষণে চৌবাচ্চা পূর্ণ হবে, কিংবা সেই অনৈতিক জিজ্ঞাসা, কতটা খাঁটি তেলে কতটা ভেজাল তেল মেশালে কত লাভ।

বুদ্ধির অঙ্ক নিয়ে আর এগিয়ে লাভ নেই। আমার সাহসও নেই, এ আমার বিষয় নয়, এ বিষয়ে আমি একেবারে কাঁচা। বরং বুদ্ধির গল্পে যাই।

সেদিন এক সাহিত্যবাসরে বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত পরিতোষ সেন একটা গল্প বলেছিলেন। একবার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এক বালকের আঁকা একটি ছবি দেখেছিলেন। এই ছবিতে আছে গভীর বনের মধ্যে একটি লোক ঢুকেছে, কিন্তু বনের ওপরে যে আকাশ, সেই আকাশে চাঁদ ও সূর্য দুই-ই রয়েছে।

পরিতোষবাবু বালকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটা কী করে সম্ভব? একই সঙ্গে দিনরাত, আকাশে চাঁদ আর সূর্য?'

বুদ্ধিমান বালকটি এই প্রশ্নের একটি অসম্ভব উত্তর দিয়েছিল। সে বলল, ছবির ওই লোকটি জঙ্গলে ঢুকেছে দিনের বেলায়, তখন আকাশ সূর্য ছিল কিন্তু তার জঙ্গল থেকে বেরতে বেরতে রাত হয়ে গেছে, চাঁদ উঠে গেছে, তাই জঙ্গলের ওপরে আকাশে একসঙ্গে প্রথমে সূর্য আর পরে চাঁদ এঁকে দিয়েছি।

এর পর এক ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে নিয়ে একটি বুদ্ধির গল্প। তবে তার আগে নিউটনসাহেবের সেই মজার ঘটনাটি মনে করিয়ে দিই।

নিউটনসাহেব তাঁর পোষা খরগোশের জন্যে একটি বাক্স বানিয়েছেন। দুটো খরগোশ। একটা বড় খরগোশ আর একটা ছোট খরগোশ। নিউটনসাহেবের বাক্সে দুটো দরজা, একটা বড় দরজা, একটা ছোট দরজা। সবাই জানতে চাইল—দুটো দরজা কেন। নিউটন ব্যাখ্যা করলেন, 'বাঃ রে! খরগোশ যে দুটো। এই বড় দরজা দিয়ে বড় খরগোশটা ঢুকবে আর ছোট দরজা দিয়ে ছোট খরগোশটা।' অতবড় বৈজ্ঞানিককে কে বোঝাবে যে শুধু বড় দরজাটা থাকলেই হত, ছোট বড় দুটো খরগোশই সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে পারত। ছোট খরগোশের জন্যে আলাদা ছোট দরজা অপ্রয়োজনীয়।

অতঃপর যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রসঙ্গে আসছি, তিনি সত্যেন বসু। এই সাদাসিধে, উদার প্রকৃতির, সরলচিত্ত, দিলখোলা মানুষটিকে অনেক সময়েই দেখা যেত কলকাতার ট্রামে-বাসে সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করছেন। তাঁর যে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি, তিনি যে বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিক—একথা তাঁকে দেখে বোঝা যেত না। তাঁর নিজেরও হয়তো খেয়াল থাকত না।

সে যা হোক, একবার তিনি একটা প্রাইভেট বাসে চড়ে আসছেন, কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে নামবেন। পরনে বাঙালি বেশ, একমাথা পাকা চুল। নামার সময় তাঁর কামিজের পকেট বাসের

দরজার হ্যান্ডেলে আটকে গেছে। তিনি সামনের দিকে এগোতে পারছেন না। টানাটানি করছেন পকেটটাকে।

তখন বাসের কন্ডাক্টর তাঁকে একটু পিছিয়ে এসে বাসের হ্যান্ডেল থেকে পকেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে নামতে পরামর্শ দিল। সেই পরামর্শমতো সঙ্গে সঙ্গে পকেটটা হ্যান্ডেল থেকে ছেড়ে গেল, সত্যেন বসু বাস থেকে নেমে গেলেন। নামতে নামতে শুনতে পেলেন চলমান বাস থেকে কন্ডাক্টর তাঁর টাকামাথার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'এত বয়েস হল আপনার এখনও ব্রেনটাকে খাটাতে শিখলেন না।'

আরেকটা আখ্যান বাকি আছে। সেটা আমার নিজেকে নিয়ে।

কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা ছোট গ্রাম্য বাড়ি ছিল আমার। সেই বাড়ির ভেতরের উঠোন কুপিয়ে একটা তরকারির বাগান করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অসুবিধে হল প্রতিবেশীর পায়রাগুলোকে নিয়ে।

কোপানো উঠোনে ডাঁটা আর মুলো চাষ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু যেই ডাঁটার আর মুলোর বিচি ছড়িয়ে দিই, পায়রাগুলো এসে খুঁটে খুঁটে সেগুলো খেয়ে যায়। দু'বার-তিনবার এরকম হল।

যে-গোয়ালা আমাকে দুধ দেয়, সে একদিন সকালে আমার দুর্দশা দেখে বলল, 'একটু বুদ্ধি খরচ করুন।' আমি বললাম, 'কীরকম?'

গোয়ালা তখন তার দুধের বালতিটি বারান্দায় নামিয়ে রেখে বাগানের পাশে আমার কাছে এল। তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুড়ে খুলে ঢেলে এমন ভঙ্গি করল যেন বীজ ছিটিয়ে দিচ্ছে। পায়রাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগানে। কিন্তু বীজ খুঁজে না পেয়ে আবার গিয়ে সামনের গাছে বসল।

গোয়ালা পরপর তিন-চারবার কয়েক মিনিট অন্তর এইরকম বীজ ছোড়ার ভঙ্গি করল। প্রত্যেকবারই পায়রাগুলো নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। অবশেষে শেষের বার আর জব্দ হওয়ার ভয়ে গাছ থেকে নামল না। তখন গোয়ালা আমাকে বলল, 'এবার বীজ বুনে দিন, ওরা আর খেতে আসবে না।'

সত্যিই তাই হল, বুদ্ধির জয় হল।

শাশুড়ি

আমাদের দেশের বধূ বনাম শাশুড়ি কাহিনীগুলি একালে খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। অমানুষিক নির্যাতন থেকে হত্যা বা আত্মহত্যা খবরের কাগজের পাতায় কোনও সংবাদ পাঠ করেই এখন আর পাঠক বিহ্বল, বিচলিত বোধ করেন না। এ-ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি ও বোধ কেমন বোবা হয়ে গেছে।

গান্ধীজি বলেছিলেন, একদা অন্য এক সূত্রে, এ আমার পাপ, তোমার পাপ, সকলের পাপ।

এই পাপ কাহিনী এই তরল কথামালায় নিতান্ত বেমানান। আমরা সাত সাগর বেরিয়ে বিলেত যাচ্ছি বিলিতি মেমসাহেব শাশুড়ি নিয়ে আসতে। তার মধ্যে কিন্তু মজার ব্যাপার আছে।

বিলিতি শাশুড়ির প্রধান ব্যাপার হল, তিনি কনের মা, মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকেন। তিনি সাবেকি চিন্তার লোক, কর্তৃত্বপরায়ণা এবং হয়তো-বা স্বার্থপর। কন্যা-জামাতার কোনও কোনও ঘটনায় তিনি অনেক সময় নিজেকে এমন জড়িয়ে ফেলেন যে, তাঁকে সঠিক অর্থে বুদ্ধিমতীও বলা চলে না।

শাশুড়ি ঠাকরুন বহুদিন ধরে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে আছেন, সে যে কত কাল তা মনে করাও কঠিন।

একটা গল্পে আছে জামাতা বলছে, 'ইনি তোমার মা' আর বউ বলছে, 'ইনি তোমার মা'। সেই মা মানে এদের যে-কোনও একজনার মা এবং অন্যজনার শাশুড়ি, তিনি এতকাল এ-বাড়িতে রয়েছেন যে দু'জনাই ভুলে গেছে, উনি ঠিক সত্যিকারের কার মা।

বিলেতে একটা চলতি রসিকতা আছে শাশুড়ি নিয়ে। সেটি একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর।

প্রশ্নটি হল, 'একাধিক বিবাহের সাজা কী?'

উত্তর হল: 'একাধিক বিবাহের সাজা হচ্ছে একাদিক শাশুড়ি।'

সাহেবরা শাশুড়ি ঠাকরুনের, আমাদের প্রণম্য, পরমারাধ্যা শ্বশ্রুমাতা দেবীর উপস্থিতি বা অবস্থিতি সাজার পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছেন, ব্যাপারটা মোটেই ভাল করেননি।

বিলেতের শাশুড়িকে নিয়ে নিতান্ত মর্মান্তিক সব গল্প আছে।

সেই গল্পটার কথা মনে করা যাক।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী স্বামীকে জানালেন, 'আজ বাড়িতে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। হঠাৎ ভয়াবহ দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারত।'

এ রকম দৈনন্দিন রিপোর্ট স্বামী নিয়মিত পেয়ে থাকেন, তবু সহধর্মিনীর প্রতি ভদ্রতাবশত তিনি অফিসের কোট খুলে হ্যাঙারে ঝোলাতে ঝোলাতে টাইয়ের নটটায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? আবার কী হল?'

সহধর্মিণী বললেন, 'আমাদের বাইরের ঘরের পুরনো দেওয়াল-ঘড়িটা হঠাৎ দেওয়াল থেকে খুলে নীচে পড়ল, এই বিকেলবেলায় আমরা তখন বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। আর কী বলব, কী সাংঘাতিক কথা, ঘড়িটা পড়ার এক মিনিট আগে মা ওই ঘড়িটার তলা দিয়ে চা খেতে বাইরের ঘরে ঢুকেছে।'

স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, ওই দেওয়াল-ঘড়িটা চিরদিন স্লো চলছে।'

সব সময় মেম-ললনারা যে তাঁদের মাতৃদেবীর এসব কটুকাটব্য, তিক্ত মন্তব্য মেনে নেন তা কিন্তু মোটেই নয়।

গল্পে পড়েছি স্ত্রী বলছেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমার লজ্জা করে না। অমন খারাপ কথা শাশুড়িদের নিয়ে তুমি বলছ কী করে?'

এরপরেও পতিদেবতা নিবৃত্ত না-হওয়ায় ভদ্রমহিলা বললেন, রীতিমতো গলার জোরে বললেন, 'সব শাশুড়ি কি খারাপ হয়? কত ভাল ভাল শাশুড়ি আছেন, সবাইকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না।'

এই কথা শুনে পতিদেবতা মোটেই শান্ত না হয়ে অতঃপর যা বললেন, সেটা বাঁকা কথা। সে-কথার মধ্যে রাগের চেয়ে শ্লেষ বেশি।

স্বামীদেবতা বললেন, 'দেখো শাশুড়িদের নিয়ে আমার কাছে ওকালতি করতে এসো না। আমি এখনও পর্যন্ত তোমার শাশুড়ির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনিনি। কোনও কটুকাটব্য করিনি তোমার শাশুড়ির নামে।'

স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'মানে?'

একবার গলাখাঁকারি দিয়ে গলার মধ্যের শব্দযন্ত্রটা আরেকটু সক্রিয় করে স্বামী বললেন, 'মানে

খুব সোজা। আমার একটাও অভিযোগ নেই তোমার শাশুড়ির বিরুদ্ধে। আমার যা-কিছু অভিযোগ আমার নিজের শাশুড়ির বিরুদ্ধে এবং সে অধিকার আমার আছে।'

পুনশ্চঃ

শাশুড়ির গল্প মোটামুটি হল, তা আবার বিলিতি মেমসাহেব শাশুড়ি।

একটা দিশি শ্বশুরের গল্প দিয়ে এবারের নিবন্ধ শেষ না করা অন্যায় হবে।

জামাই শ্বশুরবাড়িতে গেছে। শ্বশুরের পায়ে খুব দামি জুতো। সেদিকে সে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ আর ফেরাতে পারে না। যতক্ষণ কথা বলছে, সেই জুতোর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

শ্বশুরমশাই আঁচ করতে পারলেন, বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'বাবাজীবন, তোমার কি জুতোজোড়া খুব পছন্দ হয়েছে?'

জামাতা সলজ্জ হেসে স্বীকার করল, 'খুবই সুন্দর এই জুতোজোড়া।'

শ্বশুর বললেন, 'এ তো আর কলকাতায় পাওয়া যায় না। আগ্রা থেকে আনিয়েছিলাম, খাস তাজমহল ট্যানারির চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো।' তারপর একটু থেমে জামাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার যদি জুতোজোড়া এত পছন্দ হয়ে থাকে, তুমি এ-জোড়া নিতে পারো।'

এই বলে শ্বশুরমশাই নিজের পা থেকে ওই জুতোজোড়া খুলে জামাতার পায়ের সামনে রেখে, জামাতার পায়ের একটা মানসিক মাপ নিয়ে বললেন, 'নিয়ে নাও জুতোজোড়া, তোমাকে চমৎকার ফিট করবে।'

তখন জামাতাবাবাজি আমতা আমতা করছে, যদিও মনে মনে খুব খুশি। যা হোক একটু ইতস্তত করে তারপর সে মুখে বলল, 'কিন্তু কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেই সুন্দর জুতোজোড়া কী হল? কী বলবেন?'

শ্বশুরমশাই কোনওরকম চিন্তা না করে পরিষ্কার জবাব দিলেন, 'কী আর বলব? বলব, একটা রাস্তার কুকুর জুতোজোড়া নিয়ে পালিয়েছে।'

দেয়া-নেয়া

আমার মধ্য যৌবনের রোম্যান্টিক বাংলা ছবি সেটা, বোধহয় তনুজারানি এবং উত্তমরাজা। বইটার নাম দেয়া-নেয়া। এ রকম ছবি সেই শেষ দেখা। তারপর বয়েস বেড়ে গেল, ঘরে দূরদর্শন এল, সিনেমা হলে ভাঙা চেয়ার বদলানো হল না, লোডশেডিংয়ে এয়ার-কন্ডিশনার বন্ধ হল। বহুকাল সিনেমা হলে গিয়ে আর সিনেমা দেখা হয় না। কখনও কদাচিৎ সত্যজিৎ রায় বা অনুরূপ অপ্রতিরোধ্য কিছু এলে হয়তো যাই, কিন্তু বাজারের বাণিজ্যিক সিনেমা আর দেখা হয়ে ওঠে না।

দেয়া-নেয়া চমৎকার একটা বাংলা শব্দ, খাঁটি বাংলা সমাসবদ্ধ শব্দ। এর পিতামহী হলেন আদান-প্রদান, সেটাও সংস্কৃত দ্বন্দ্ব সমাস,—দেয়া-নেয়াও তাই।

খুব সোজা, সরল ব্যাপার দেয়া ও নেয়া, দেয়া-নেয়া। যেমন রাম ও লক্ষ্মণ, রাম-লক্ষ্মণ। রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ খবরের কাগজের দৌলতে রামমন্দির-বাবরি মসজিদ।

রাজনৈতিক জটিলতায় না গিয়ে বলি, যেমন হিন্দু ও মুসলমান হিন্দু-মুসলমান, যেমন মন ও প্রাণ মনপ্রাণ, যেমন কুকুর ও বিড়াল কুকুর-বিড়াল— তেমনি দেয়া-নেয়া, তেমনি আদান-প্রদান।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিতে গেলে কিছু মূল্যবান জিনিস বন্ধক বা মর্টগেজ রাখতে হয়। বহুকাল আগের গল্প এটা। চট্টগ্রামের এক ব্যাপারি স্থানীয় ব্যাঙ্কের একটি শাখায় এক হাজার টাকা ঋণ করতে গিয়েছিলেন। সে আমলে এক হাজার টাকা অনেক টাকা—পঞ্চাশ-ষাট তোলা সোনার দাম—যার মূল্য আজকের বাজারে তিন লক্ষ টাকা।

ব্যাঙ্কের বড়বাবু ব্যাপারির কথা শুনে বললেন, 'আপনাকে অবশ্যই আমরা এক হাজার টাকা ধার দিতে পারি, কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী আপনাকে কিছু সম্পত্তি আমাদের কাছে বন্ধক রাখতে হবে, যতদিন-না ঋণ শোধ হয়।'

ব্যাপারি বললেন, 'এটা কোনও অসুবিধের ব্যাপার নয়। আমার পাঁচশো নৌকো আছে। সেগুলো বরং আপনাদের জিম্মায় বন্ধক রাখছি। আমার টাকা জোগাড় হয়ে গেলেই আমি সুদ সমেত আপনাদের ধার পরিশোধ করে নৌকাগুলো ছাড়িয়ে নেব।'

ব্যাঙ্ক রাজি হয়ে গেল। সুপ্রস্তাব। সুতরাং রাজি না-হওয়ার কোনও কারণ নেই।

ব্যাপারি ভদ্রলোকের রেঙ্গুন না আকিয়াব— কোথায় যেন ব্যবসাগত কারণে বহু টাকা আটকে ছিল। কিছুতেই তাঁর কর্মচারীরা সে টাকা আদায় করতে পারছিল না।

ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকা ধার নিয়ে ব্যাপারি নিজেই চলে গেলেন আকিয়াবে এবং যথাশীঘ্র যথাসাধ্য বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধার করে ফিরলেন।

চাটগাঁয় ফিরে ঘাটে নেমে প্রথমেই ঝোলাভর্তি টাকা নিয়ে তিনি ব্যাঙ্কে গিয়ে আসল এক হাজার আর সুদ একশো এগারো টাকা ঝোলা থেকে গুনে গুনে বার করে ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করে বন্ধকী নৌকোগুলো ছাড়িয়ে নিলেন।

লোকটির ঝোলাভর্তি অর্থ দেখে যেমন হয়, ব্যাঙ্কের বড়বাবুর লোভ হল। তিনি বললেন, 'এই টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছেন কেন? এগুলো আমাদের ব্যাঙ্কে জমা রাখুন।'

সর্তক দৃষ্টিতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারি বললেন, 'তা রাখতে পারি। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনারা আমার কাছে কী বন্ধক রাখবেন? আপনাদের কতগুলো নৌকো আছে?'

অনেকদিন পরে এবার আমার নিজের একটা গল্প বলি।

হাবড়ায়, অশোকনগরের বাড়ির পাশের একফালি উঠোনে একবার আমি ভেবেছিলাম নিজের হাতে তরকারি চাষ করব। এতে সংসারের সাশ্রয় তো হবেই, সেইসঙ্গে ব্যায়াম হবে, টাটকা আনাজ নিজের বাড়িতেই পাওয়া যাবে।

কোদাল দিয়ে উঠোন কোপানো শুরু করলাম। অল্প একটু কোপানোর পর দেখি, মাটির মধ্যে একটা সিকি। সেটা পেয়ে মনে আনন্দ হল, ভগবান পারিশ্রমিক হাতে হাতে প্রদান করছেন।

কয়েক মিনিট পরে একটা আধুলি পেলাম। তারপরে আবার একটা সিকি। একটু বাদে দুটো দশ পয়সা, একটা পাঁচ পয়সা। এইভাবে মাটি কুপিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পয়সা উপার্জন করার পরে আমার কেমন রহস্যময় মনে হল ব্যাপারটা।

আসলে রহস্য আর কিছু নয়। আমার শার্টের পকেটে একটা ফুটো ছিল। এ পয়সাগুলো আমারই— মাটি কোপানোর সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একে একে পড়ে গিয়েছে, আর তাই আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

আরেকটি গল্প মনে পড়ছে। সেটি ঠিক আদান-প্রদান, দেয়া-নেয়ার নয়। আদান-প্রদান না-হওয়ার গল্প।

এক ধনবান ব্যবসায়ীর একমাত্র সুন্দরী কন্যার বহু প্রেমিকের মধ্যে একজন ছিল অতি দরিদ্র।

দরিদ্র হলেও প্রেমিকটি মোটেই নির্বোধ নয়। সে জানত, মেয়েটি তাকে কখনও বিয়ে করবে না; তবু একদা এক অতি দুর্বল মুহূর্তে সে মেয়েটির হাত ধরে প্রশ্ন করল, 'প্রেয়সী, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

প্রেয়সী বলল, 'তুমি জানো আমার ব্যাপারটা?'

প্রেমিক বলল, 'আমি জানি তুমি খুব বড়লোক।'

প্রেয়সী বলল, 'আমার দাম এক কোটি টাকা, তার চেয়ে বেশিও হতে পারে।'

প্রেমিক বলল, 'তবু তুমি বলো তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা?'

প্রেয়সী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'না।'

প্রেমিক বলল, 'আমি জানতাম।'

এবার বিব্রতা প্রেয়সী একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জানতেই যদি, তাহলে শুধু শুধু তুমি আমাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

প্রেমিকটি শুকনো হেসে বলল, 'শুধু একবার যাচাই করে দেখলাম, এক কোটি টাকা হাতছাড়া হলে কেমন লাগে।'

পুনশ্চ ঃ

বেকার যুবক রাঘবেন্দ্রকে কফিহাউসের টেবিলে তার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিল, 'রাঘু, তুই যদি হঠাৎ দেখিস তোর পাঞ্জাবির পকেটে পাঁচশো টাকা রয়েছে, তাহলে তুই কী করবি?'

একটুও না ভেবে রাঘবেন্দ্র বলল, 'তাহলে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাব। আমাকে ভাবতে হবে, কার পাঞ্জাবি আমি ভুল করে গায়ে দিয়ে এসেছি।'

হে হিসাব

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি এবং বলে এসেছি হিসাব, পরে কলকাতায় এসে জেনেছি হিসেব।

হিসাব কিংবা হিসেব যাই হোক জিনিসটা সোজা নয়, জিনিসটাকে শেষ পর্যন্ত মেলাতেই হবে।

হিসেব যারা বোঝে ঠিকই বোঝে, যারা বোঝে না কখনও বোঝে না। প্রগলভ এক বণিক তাঁর এক নিম্নবিত্ত বন্ধুকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার চেয়ে সুখী।'

বন্ধুটি অবাক, মাত্র গতকালই তাঁর একটি কন্যাসন্তান হয়েছে এবং দুঃখের বিষয় এটি তাঁর সপ্তম কন্যা। তিনি বললেন, 'এ কী বলছ সাধু? আমি গরিব মানুষ। আমার সাত-সাতটা মেয়ে আর তুমি কোটিপতি, সাতকোটি টাকার মালিক, আমি কী করে তোমার চেয়ে সুখী?'

কোটিপতি বললেন, 'দ্যাখো সাত কোটির পরও আমার নিবৃত্তি হয়নি, আমার আরো চাই, কিন্তু সাত মেয়ের পরে তুমি কি আরও চাও?'

বলাবাহুল্য, বুদ্ধিমতী পাঠিকা অবশ্যই ধরতে পেরেছেন, যদি তিনি কন্যা-সন্তানের জননী হন তা হলে তো অবশ্য অবশ্য নিশ্চয়ই, এই দুই হিসেবের তুলনায় একটা বড় গোঁজামিল আছে।

হিসাব শব্দটি বাংলাভাষায় এসেছে সরাসরি আরবি থেকে। বাংলায় একটি চমৎকার শব্দ হিসাবনিকাশ, হিসাব ও নিকাশ দ্বন্দ্ব সমাস, প্রথম অংশটি তো আরবি আর দ্বিতীয় অংশ নিষ্কাশন থেকে নিকাশ, সংস্কৃত থেকে বাংলায় উদ্ভব শব্দ। তবে 'হিসাব' চলতি বাংলায় অনেকদিন হল 'হিসেব' হয়ে গেছে। এই নিবন্ধের নামে "হিসাব" শব্দ ব্যবহার করলেও আমরা রচনায় "হিসেব" শব্দটি ব্যবহার করছি।

হিসেব কিন্তু সবসময় মেলে না।

সব হিসেব কোনোদিন কখনও মেলে না। কত লোক আছে সারাজীবন ধরে হিসেব কষে যায়। খাতার পর খাতা ভরে যায় দীর্ঘ কাটাকুটিতে, পেনসিল ফুরনোর আগে পেনসিলের ইরেজার ফুরিয়ে যায়, কিন্তু হিসেব মেলে না। শ্লেট ছেয়ে যায় ধূসর অস্পষ্টতায়, শেষ পর্যন্ত হাতে থাকে সেই সুকুমার রায়ের "হ য ব র ল" বর্ণিত পেনসিল।

তবু ঠিক হাসিঠাট্টার কথা নয়। এমন অনেক দুর্ভাগ্য মানুষ আছে যাদের কোনও হিসেব কখনও মেলে না, সেই যে গানের কথা রয়েছে না যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে। ভাগ্যের কাছে পরাজিত মানুষের দুঃখের গান, সে এই হিসেব না মেলারই গান।

এসব কথা যাক। দুঃখের কথা, বেদনার কথা আমার বলার প্রয়োজন নেই, এসব কথা বলার অনেক ভাল ভাল লোক আছে।

সুতরাং হালকা গল্প বলি। বহু পুরনো সব গল্প। শুধু লেখার জন্যে লেখা।

সেই মাস্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়ছে যিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি যদি তোমার বাবাকে একশো টাকা দিই, আর তিনি যদি মাসে মাসে দশ টাকা করে আমাকে শোধ দেন তাহলে আট মাস পরে তাঁর কাছে আমার কত টাকা পাওনা থাকবে?'

প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নির্বিকারভাবে ছাত্রটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'একশো টাকা'।

উত্তর শুনে মাস্টার মশায় ধমকিয়ে উঠলেন, 'সে কী! মাসে মাসে দশ টাকা করে আট মাসে শোধ দেওয়ার পরেও একশো টাকা পাওনা থাকে কী করে?'

ছেলেটি আবার একইরকম নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'হ্যাঁ একশো টাকাই পাওনা থাকবে।' তারপর মাস্টার মশাইকে দ্বিতীয়বার ধমকানোর সুযোগ না দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলল, 'আপনি তো আর আমার বাবাকে চেনেন না। আমার বাবা কোনও টাকাই শোধ দেবে না।'

এক্ষেত্রে মাস্টার মশাইয়ের হিসেব মিলল না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবে।

তবে অভিজ্ঞতাই সব নয়, জ্ঞান ব্যাপারটাও জরুরি।

স্কুলের নিচু ক্লাসে এক-দুই শেখাতেন দিদিমণি। খুব ছোট একটা মেয়েকে একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সুরমা বলো তো তিন আর এক যোগ করলে কত হবে?'

অনেক চিন্তা করে, অনেক মাথা ঘামিয়ে অবশেষে সুরমা বলল, 'দিদিমণি বলতে পারছি না।'

তখন দিদিমণি বললেন, 'তুমি ভারী কাঁচা অঙ্কে। তিন আর একে চার হবে, এই সামান্য যোগটুকু কষতে পারলে না?'

এবার কিন্তু সুরমা ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল, 'কিন্তু দিদিমণি তা তো হতে পারে না।'

দিদিমণি অবাক হলেন, 'কেন হতে পারে না!'

সুরমা বলল, 'আপনিই তো কালকে বললেন, দুয়ে-দুয়ে চার হয়। তা একবার দুয়ে-দুয়ে চার হয়ে গেলে, তারপর আবার কী করে তিন আর এক যোগ দিলে চার হবে?'

তবে সবাই যে একরকম হিসেব শিখবে, সবাইকে যে একইরকম হিসেব শিখতে হবে তার কোনো কথা নেই।

কিছুদিন আগে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে তার বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গল্প। বাচ্চা মানে খুবই বাচ্চা এবং খুবই পাকা। তার নাম মনোরমা।

কথায় কথায় মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি গুনতে পারো, এক দুই গুনতে শিখেছ?'

মনোরমা বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'বলো দেখি।'

মনোরমা গড়গড় করে বলে গেল, 'টেক্কা, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।'

দশ পর্যন্ত গুণে মনোরমা থেমে গেল, কিন্তু শুরুতেই একের বদলে টেক্কা শুনে আমার কেমন খটকা লাগল।

আমি মনোরমাকে বললাম, 'তার পরে?'

একটু চুপ করে থেকে মনোরমা বলল, 'গোলাম, বিবি, সাহেব।'

ভেতরের ঘর থেকে তখন চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, 'থ্রি নো ট্রামপস,' 'ফোর ডায়মন্ডস'...।

তুমুল তাস খেলা চলছে। মনোরমার বাবা, মা, কাকা, পিসি তাদের বন্ধুবান্ধব দিনরাত তাস খেলছে। মনোরমার এক দুইয়ের হিসেবে দুয়েকটা তাস ঢুকে যাবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

পুনশ্চ ঃ

অবশেষে পাঠক-পাঠিকাদের হিসেবের দৌড় একটু পরীক্ষা করে দেখি।

একটা সোজা প্রশ্ন করছি।

বলতে পারেন, যদি কারো জন্ম হয় উনিশশো পঞ্চাশ সালে, তার এখন বয়েস কত?

এর উত্তর যত সোজা ভাবছেন, তা কিন্তু নয়। এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আপনাকে অবশ্যই একটা প্রশ্ন করে প্রশ্নকর্তার কাছে জেনে নিতে হবে যাঁর বয়েসের কথা জানতে চাওয়া হচ্ছে, তিনি কি পুরুষ না স্ত্রীলোক?

একেক জিনিসের হিসেব একেক রকম।

মাছ (১)

ভগবানের প্রথম অবতার হল মাছ।

মাছ হল আমাদের দেবতা।

আবার প্রেমের দেবতা, কামের দেবতা মদনের নাম হল মীনকেতন, মীনধ্বজ। মদনের পতাকার প্রতীক মাছ।

বাঙ্গালি হিন্দুর সব মঙ্গলকার্যে মাছ অপরিহার্য। বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে তো বটেই, শুভ বিজয়াদশমীতে, শ্রীপঞ্চমীতে জোড়া মাছ লাগবে। জোড়া ইলিশ যদি নেহাতই না জোটে, আঁশওয়ালা একজোড়া মাছের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে বরণ করতে হবে।

এদিকে আবার রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির অন্যতম হল মীনরাশি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক কবিতায় লিখেছিলেন যে, তিনি যদিও সঠিক জানেন না— তাঁর ধারণা, তাঁর হল মীনরাশি, কারণ 'যেরকম মাছ ভালবাসি।'

আরো অনেক আগে বাঙালির অন্য এক প্রাণের কবি প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

অবশ্য এই দুধে-ভাতের সঙ্গে মাছে-ভাতের জন্যে দুর্বলতাও আমাদের কম নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙালির আহার তালিকা থেকে দুধ-ভাত অনেকদিন বিদায় নিয়েছে। কষ্টেসৃষ্টে মাছে-ভাতে এখনও একটু টিকে আছে।

মাছের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মেছোগল্পের কথাও বলতে হয়। মেছোগল্প মানে আঁশটে গন্ধওয়ালা গল্প, যাকে ইংরেজিতে বলে ফিশি টেল (Fishy tale)। কোনো ঘটনা বা ব্যাপার সন্দেহজনক বা গোলমেলে মনে হলে বলা হয় ফিশি ব্যাপার।

মাছের গল্প প্রথমে যেটা মনে পড়ছে, সেটা এক মৎস্য-শিকারির। অবশ্য মাছের অধিকাংশ গল্পই হতভাগ্য মৎস্য-শিকারিকে নিয়ে।

ধরেই নেওয়া হয়, যাঁরা ছিপ দিয়ে মাছ ধরেন, তাঁরা তাঁদের মাছ শিকারের গল্পগুলো একটু বানিয়ে বানিয়ে বলেন। কথাই আছে যে একজন মৎস্য-শিকারি তখনই সত্যি কথা বলেন, যখন অন্য কোনও মৎস্য-শিকারি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "ও লোকটা মিথ্যুক।"

একটা সত্যি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে অসংগত হবে না। আমার এক কাকা ছিলেন শৌখিন মৎস্য-শিকারি। ছিপ, বঁড়শি, চার, টোপ ইত্যাদিতে ছিল তাঁর প্রবল উৎসাহ। আর উৎসাহ ছিল মাছের গল্প বা মাছ ধরার গল্প বলায়।

একদিন লক্ষ করলাম, কাকা লোকদের একটা কাতলা মাছের গল্প বলছেন যে, মাছটা তাঁর ছিপের সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু গল্পটার গোলমাল হল এই যে, কাকা একেকজন লোককে মাছটার আকার একেকরকম দেখাচ্ছেন।

বেশ কয়েকবার এ-ঘটনা ঘটবার পর আমি কাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একেকবার একেকজন লোককে কাতলা মাছটার সাইজ একেকরকম বলছ কেন?"

মৃদু হেসে কাকা বললেন, "যে যতটা বিশ্বাস করবে, যে যেমন বিশ্বাস করবে তাকে তেমন সাইজ বলি। আমি কখনও কাউকে মাছটার আকার তত বড় বলি না যত বড় সে বিশ্বাস করবে না।"

ছিপ-বঁড়শি দিয়ে মাছ-ধরার কাহিনীর সঙ্গে এবার জাল দিয়ে মাছ ধরার গল্প বলতে হয়।

কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণে একবার ফাল্গুন মাসে দেখি, সারি সারি ইলিশ মাছ ধরার নৌকো। ফাল্গুন মাসে ইলিশ মাছ একটু অস্বাভাবিক। তীরের কাছ দিয়ে একটা নৌকো যাচ্ছিল। আমি সেই নৌকোর মাঝিদের চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা যে এখন ইলিশ মাছ ধরতে যাচ্ছেন, এটা কি ইলিশ মাছের সময়?"

অত্যন্ত বিরক্ত মুখে এক প্রবীণ জেলে নৌকো থেকে আমাকে জানালেন, "দেখুন, যখন ইলিশের সময়, একটা ইলিশও তখন নদীতে আসেনি, আবার এখন যখন ইলিশের সময় নয়, তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে হাজারে-হাজারে ইলিশ নদীতে চলে এসেছে। তা ইলিশরা নিজেরাই যদি তাদের নিয়ম না মানে, আমরা সে নিয়ম মেনে কী করব?"

অনেক হাসির ব্যাপার হল। এবার একটা দুঃখের গল্প বলি।

গল্পটা খুবই পুরনো, খুবই দুঃখের, চিরকালের এবং চিরদেশের। যে কোনো শৌখিন মাছশিকারি, যিনি কিনা ছিপ-বঁড়শি, চার-টোপের কারবারি, তাঁর মনের গোপনতম দুঃখের সত্য কাহিনী এটা।

সাতদিন ধরে চারের মশলা জোগাড় করা হয়েছে। তেলের ঘানি থেকে আনা হয়েছে সরষের খোল— যা তিনদিন জলে ভিজিয়ে সারা বাড়ি পচা গন্ধে ভরে গিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হালুইকরের দোকান থেকে নিয়ে আসা চিনির গাদ, যেটা মিষ্টি বানানোর কড়াইয়ের ওপরের সাদা ফেনা থেকে কালো লোহার হাতায় তুলে উনুনের পাশে একটা বড় গামলায় রেখে দেওয়া হয়।

হাজার বোতল চোলাই মদের মাদার টিংচার (mother tincture) এক হাতা চিনির গাদ।

সেই চিনির গাদের মদির সৌরভে শুধু বাড়ি বা পাড়া নয়, পুরো এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এবং এখানেই শেষ নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একাঙ্গী, টম্বল, ছোটএলাচ, মেথি— এইসব দামি মশলা সমূহের ভাজা গুঁড়ো। তার গন্ধও কম মনোহর নয়।

এ হল চারের কথা। এর পরে টোপ আছে, হুইল আছে সুতো আছে, বঁড়শি আছে, ফাতনা আছে। সে এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার।

কিন্তু ফল কী হল?

সারাদিনের পণ্ডশ্রমের শেষে শূন্য হাতে এবং ব্যথিত হৃদয়ে মৎস্য-শিকারি ফিরলেন। যথারীতি একটি মাছও তিনি ধরতে পারেননি। কিন্তু বাড়িতে তো খালিহাতে যাওয়া যায় না— সে তো মহা হাসাহাসির ব্যাপার হবে। ফেরার পথে ভদ্রলোক এক মাছের দোকানে গিয়ে চারটে মোটামুটি সাইজের মাছ কিনলেন তার পর মাছওয়ালাকে বললেন, "ভাই, মাছগুলো আমাকে দূর থেকে ছুড়ে ছুড়ে দাও তো। আমি ধরি।"

মাছওয়ালা অবাক হয়ে বললে, "কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "তাহলে আর কিছু না হোক, বাড়ি গিয়ে বলতে পারব মাছগুলো আমিই ধরেছি। শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না।"

পুনশ্চ ঃ

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে একজন লোক ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল। হঠাৎ তার ছিপে ধরা পড়ল একটা অতিকায় বোয়াল মাছ।

একটু টানা-হ্যাঁচড়ার পর বোয়াল মাছটা অতর্কিতে বঁড়শির সুতোয় জোর ঝাঁকি দিতে লোকটা ছিপ সমেত জলে পড়ে গেল।

অতঃপর শুরু হল মাছে-মানুষে লড়াই। একদিকে বঁড়শির ও-প্রান্তে মহাবলী বোয়াল মাছ মাছের শিকারিকে টানছে, অন্যদিকে জলের মধ্যে ছিপ হাতে লোকটা মাছটাকে খেলিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

রাস্তা দিয়ে সরল প্রকৃতির এক গ্রাম্য লোক যাচ্ছিল। সে এই দৃশ্য দেখে স্বগতোক্তি করল, "আমি বুঝতে পারছি না মানুষ মাছ ধরছে, না মাছ মানুষ ধরছে।"

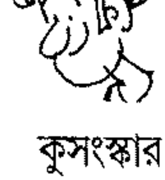

কুসংস্কার

কুসংস্কার একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। একটা বোকামি। কেউ কেউ বলবেন নির্বুদ্ধিতা।

কিন্তু বলুন তো, অফিসে বেরবার সময়ে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে একটা নমস্কার করে বেরতে ঠিক কয় পয়সা খরচ হয়। কিংবা ট্রামে যেতে যেতে কালীঘাট পার্কের পাশে কেউ যদি মাথা একটু নিচু করে, চোখ একটু বুজে থাকে তাতে কার ক্ষতি?

হ্যাঁ ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি হয়।

দৈবদুর্বিপাক, গ্রহের ফের কাটানোর জন্যে আমাদের জানাশোনার মধ্যে কত লোক মাদুলি-কবচে, যাগযজ্ঞে, হোম-স্বস্ত্যয়নে বহু টাকা ব্যয় করে। বহু অর্থ যায় জ্যোতিষী, পুরোহিত, মোল্লার পিছনে।

কত লোক বাড়ি থেকে বেরতে গিয়ে চৌকাঠে অন্যমনস্কভাবে হোঁচট খেয়ে সেটাকে বেরনোর পক্ষে বাধা বা অমঙ্গল ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে আবার পাঁচ মিনিট বসে ফাঁড়া কাটিয়ে তার পর বেরয়। অনেকে হাঁচির সঙ্গে বা টিকটিকির ডাক শুনেও এ রকম করতে পারে, কিন্তু ওই পাঁচ মিনিট দেরি করে বেরনোয় তার ট্রেন ফেল হয়ে যায় কিংবা ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি করে ট্রেনে উঠতে গিয়ে তার কোনো দুর্ঘটনাও হতে পারে এবং হয়েও থাকে।

হাঁচি, কাশি, টিকটিকির ডাক, পেছন থেকে ডাকা কিংবা ফাঁড়া, খারাপ সময় তুঙ্গে বৃহস্পতি অথবা বক্রী শনি— এসব শুধু যে আমাদের মতো গরিব দেশের অশিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত দৈব-নির্ভর মানুষেরাই মেনে চলে তা নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, এমন কোনো দেশ নেই যেখানে কুসংস্কার নেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নেই।

পাঁঠা-মানত থেকে সতীদাহ, অনামিকায় মূল্যবান নীলাধারণ থেকে কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে পরীক্ষার হলে বা চাকরির ইন্টারভিউতে যাওয়া— এসবই কুসংস্কারের নানারকম হেরফের। কোনোটা মৃদু, কোনোটা বেশ জোরালো, কোনোটা সামান্য, কোনোটা মারাত্মক।

কতরকম কুসংস্কার যে কত দেশে রয়েছে তার আর কোনো ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশে কালো বেড়াল অমঙ্গল, অথচ সাহেবদের কাছে কালো বেড়াল সৌভাগ্যসূচক।

বাঙালির কুসংস্কারের একটা দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যাবে খনার বচনে। পথিমধ্যে মৃতদেহ চোখে পড়লে মঙ্গল, শেয়াল বাঁদিকে পড়লে শুভ কিন্তু ডানহাতে অশুভ— এইরকম খুঁটিনাটি ছোট-বড় আরো কত কী।

আমাদের অল্প বয়সে ভাতের থালায় আঁকিবুকি কাটলে মা-ঠাকুরমারা বলতেন অমঙ্গল হবে। বাড়িতে ধার দেনা হবে। আসলে অনেক কুসংস্কারই প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের একটা বেড়াজাল।

কুসংস্কার সম্পর্কে এক সাহেব বলেছিলেন যে, কুসংস্কার হল মনের বিষ। আর সেই বিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, কুসংস্কার হল দুর্বল মনের ধর্ম। তবে ভলতেয়ার সরাসরি বলেছিলেন কুসংস্কারকে ধ্বংস করে ফেলতে।

তবে সব প্রচলিত কুসংস্কার পরিবেশ বা সমাজ থেকে পাওয়া বা পারিবারিক সূত্রে লব্ধ তা নয়। একজন হয়তো একজোড়া নতুন চপ্পল প্রথম দিনেই পায়ে দিয়ে ট্রামে উঠতে একটু হোঁচট খেয়েছিল, তার মনে কিন্তু সেই নতুন চপ্পলজোড়া সম্পর্কে একটু খট্‌কা জন্মাল, পরের দিন ওই চপ্পল পায়ে দিয়ে আবার সে যদি কোথাও সামান্য হোঁচট খায় বা আঘাত পায়— সে হয়তো আর কখনও ওই নতুন জুতোজোড়া পায়ে দেবে না।

চরম বিজ্ঞান ও মুক্তমনের দেশ বলে যার খ্যাতি— সেই মার্কিন দেশে কুসংস্কার মজ্জায় মজ্জায়, হাড়ে হাড়ে।

পুরো আমেরিকায় এমন কোনো শহর পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো গলিতে বা রাস্তায় তেরো নম্বর বাড়ি আছে। ঠিক একইভাবে হোটেলে তেরো নম্বর ঘর নেই, বহুতল অট্টালিকায় ত্রয়োদশতল নেই— বারোর পরেই চৌদ্দ, তেরো একেবারেই অদৃশ্য।

আগামী উনিশশো সাতানব্বুই খুবই খারাপ বছর। কারণ এক-নয়-নয়—সাত (১৯৯৭) হল ছাব্বিশ অর্থাৎ তেরোর দ্বিগুণ। শুধু তেরোই মারাত্মক, ডবল তেরো ভাবাই যায় না!

কুসংস্কারের অন্য একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি।

আমেরিকায় যে-কোনও হোটেলের ঘরে থাকুন, অবশ্যই দেখবেন বিছানাটা বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে লাগানো। অর্থাৎ বিছানা থেকে নামতে গেলে ডানদিক থেকে নামতে হবে।

এর কারণ আর কিছুই নয়, একটা বহু প্রাচীন কুসংস্কার। যা-কিছু শুভ এবং ঈশ্বরীয় সব দেহের ডানদিকে রয়েছে, আর খারাপ, শয়তানীয় ব্যাপার-স্যাপার শরীরের বাঁদিকে অবস্থান করে। ফলে কেউ সকালবেলায় বিছানার বাঁদিক দিয়ে নামলে, সারাদিন নানা খারাপ ব্যাপার তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে। তার সারাদিন খারাপ যাবে।

এই রম্য নিবন্ধটি কেমন যেন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের মতো হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বিষয়গুলোই এমন ঘটেছে।

তবু সাহেবি কুসংস্কারের অন্তত একটা মজার গল্প বলি।

বিলেত দেশটায় মইয়ের নীচে দিয়ে হেঁটে যাওয়া খুব অশুভ বলে পরিগণিত হয়। কেউ যদি দেখে কোথাও দেওয়ালে বা গাছের সঙ্গে একটা মই ঠেস দিয়ে রাখা আছে, সে পারতপক্ষে সেই মইয়ের তলা দিয়ে হেঁটে যাবে না। যদি ভুল করে বা না দেখে কেউ হেঁটে যায় তবে তার খুবই অশুভ কিছু, খুব অমঙ্গল হওয়ার আশঙ্কা।

এই ব্যাপার নিয়ে এক সাহেবের আধুনিকা মেমসাহেব একদিন স্বামীকে পরিহাস করে বলেছিলেন, 'ওগো, তোমার সেই আমাদের প্রথম আলাপের দিনটি মনে আছে? সেই যে তুমি হঠাৎ খেয়াল করলে, আমরা দু'জনে একটা মইয়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছি আর তুমি বললে, এবার খুব সাংঘাতিক কিছু আমার জীবনে ঘটবে। কই, তারপরে তো দশ বছর হয়ে গেল, সেরকম সাংঘাতিক কিছু কি ঘটল?' সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, 'ঘটেনি?'

পুনশ্চ ঃ

এক ঃ আমরা অনেকেই মুখ ফুটে বলি বটে আমাদের কোনো কুসংস্কার নেই। কিন্তু একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, যদি পাশাপাশি দুটো শুভবিবাহের তারিখ থাকে মাসের বারো, আর তেরো, যদি বিয়েটা হয় নিজের মেয়ের, তাহলে কি তেরো তারিখটা বাদ দিয়ে বারো তারিখটাই নির্দিষ্ট করবেন না?

দুই ঃ এক ফাঁসির আসামিকে জেলারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার ভাগ্যে এ রকম ঘটল কেন?'

ফাঁসির আসামি বললেন, 'আর বলবেন না। তেরোর গেরো।'

জেলারবাবু বললেন, 'মানে?'

সেটা ছিল জুরির বিচারের যুগ, ফাঁসির আসামি বললেন, 'বারোজন জুরি আর একজন জজ— এই তেরোজনে মিলে আমার এই সর্বনাশ করল।"

জুয়া (১)

জুয়াখেলা পৃথিবীতে বহুকাল ধরে চলছে। মানুষের রক্তে বাজি ধরার একটা নেশা আছে। সব দেশে সব কালে জুয়াখেলা ছিল।

মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার কাহিনী আছে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের একটিই মাত্র দোষ ছিল, তিনি সর্বস্ব এমনকী ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে বাজি রেখে অক্ষক্রীড়ায় মত্ত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা যুদ্ধের সেই কারণ।

এই ঘটনার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হল, এমন যে সাংঘাতিক দ্যূতক্রীড়া সেটা শাস্ত্রসম্মত ছিল, রাজদরবারে প্রকাশ্যে খেলা হত।

সাধারণ মানুষ কিন্তু কখনও জুয়াখেলাকে অত সহজভাবে নেয়নি। জোচ্চোর নামে যে শব্দটি প্রচলিত আছে, সেটি জুয়া থেকে এসেছে, তার মানে হল জুয়াচোর অর্থাৎ যে ঠকায়, প্রবঞ্চক।

জুয়া খেলতে বারণ করেছিলেন মার্ক টোয়েন। তিনি বলেছিলেন, 'জীবনে দু'রকম সময়ে জুয়াখেলা উচিত নয়, যখন তোমার পয়সা আছে এবং যখন তোমার পয়সা নেই।' অর্থাৎ জীবনে কোনো সময়েই জুয়াখেলা উচিত নয়।

তবু মানুষ জুয়া খেলে। জুয়াখেলার নেশা তার রক্তের মধ্যে রয়েছে।

কালীপুজোর রাতে বোম্বাইতে, কাশীতে, কলকাতার বড়বাজারে কোটি-কোটি টাকা হাত-বদল হয় জুয়াখেলায়। সারারাত ধরে চলে সেই উত্তেজনা।

ঘরের কাছে কাঠমান্ডুতে দলে দলে টুরিস্ট যায় শুধু জুয়াখেলার জন্যে। খবরের কাগজে পরিষ্কার বিজ্ঞাপন থাকে— কোন হোটেলে উঠলে কত টাকা জুয়োর কুপন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

আমেরিকার লা ভেগাসের প্রধান আকর্ষণই হল জুয়া। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোক যায় সেখানে নানারকম জুয়াখেলার টানে। প্যারিসের মন্টে কার্লোতেও জুয়াখেলার প্রচণ্ড ভিড়।

জুয়াখেলার নানারকম চেহারা।

তাস-পাশা-শতরঞ্জ থেকে ঘোড়দৌড়। কুকুরদৌড়, উটদৌড় এমন কী বৃষ্টি হবে কি হবে না আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবার্তা বা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে হরদম বাজি ধরে জুয়াড়িরা। তার চেয়েও মারাত্মক কথা সেই বাজির টানাপোড়েনে, ওঠানামায় প্রকৃত প্রতিফলিত হয় বিশেষ রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির তৎকালীন জনপ্রিয়তা বা জয়ের সম্ভাবনা।

জুয়াখেলার গল্প অনেক। আগে ঘরসংসার দিয়ে শুরু করি।

ছেলে নতুন বিয়ে করেছে। একদিন বিয়ের কয়েক মাস পরে ছেলেকে মা বললেন, 'হ্যাঁরে খোকা, তুই এসব কী করছিস?'

ছেলে বলল, 'কী করছি মা?'

মা বললেন, 'আমি শুনলাম তুই নতুন বউমাকে জুয়া খেলতে শিখিয়েছিস। তার সঙ্গে বসে সন্ধেবেলা জুয়া খেলিস।'

ছেলে বলল, 'এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না মা।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী? কেন?'

ছেলে বলল, 'মা তোমার নতুন বউমাটি একটি পাকা চোর। আমার পকেটে যা টাকা থাকে সব তুলে নেয়। তাই জুয়াখেলা ধরিয়েছি। ওকে হারিয়ে ওর কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করতে হয়।'

এ-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছেলের রীতিমতো আত্মবিশ্বাস আছে যে— সে বউকে হারাতে পারবে জুয়া খেলে।

কিন্তু জুয়া এত সহজ জিনিস নয়। শুধু আত্মবিশ্বাসে জুয়াখেলা জেতা যায় না। ভাগ্য লাগে, কিছুটা হিসেব লাগে এবং কখনও কখনও হাত সাফাইয়ের ব্যাপারটাও হয়তো থাকে।

সেই যে একদা এক জুয়াড়িকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি ফ্ল্যাশ (Flash— তাসের বাজি) খেলে সব সময় জেতেন, কিন্তু রেস(Race— ঘোড়ার বাজি) খেলে এত হারেন কী করে?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'কী আর করব? তাসের মতো রেসের ঘোড়াগুলোকে যে শাফ্‌ল করা যায় না।'

জুয়ার নেশা বড় কঠিন নেশা। এ-নেশায় কত রথী-মহারথী, রাজাবাদশা যে সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

বিলেতে, আমেরিকায় জুয়ার নেশার চিকিৎসা আছে। মনস্তত্ত্ববিদেরা সেই চিকিৎসা করেন— যা খুবই ব্যয়বহুল।

এক প্রচণ্ড জুয়াড়ি এইরকম এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। বহু অর্থব্যয় করে বহু মাস পরে তাঁর উন্নতি দেখা দিল। একদিন ডাক্তার নিঃসন্দেহ হলেন যে রোগী দোষমুক্ত হয়েছে। ডাক্তার রোগীকে সেকথা জানালেন।

রোগী এ খবর শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, 'তাহলে তো খুব সুখবর। চলুন একটা পানশালায় যাওয়া যাক, দু'পাত্র পানীয় খেয়ে ব্যাপারটা সেলিব্রেট করি।'

এতদিন ডাক্তারবাবু রোগীর কাছ থেকে বহু টাকা নিয়েছেন। তাঁর একটু সংকোচ হচ্ছিল, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তা যাব, কিন্তু আজকের খরচটা আমি বহন করব।'

রোগী বললেন, 'তা কেন? সুস্থ হলাম আমি আর খরচ করবেন আপনি?'

এর পরেও ডাক্তারবাবু কী একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, তখন রোগী বললেন, 'ঠিক আছে। তর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এক প্যাকেট তাস হবে আপনার কাছে?'

এতদিন তাসের জুয়ার চিকিৎসা করা হয়েছে রোগীর, তাই ডাক্তারবাবু একটু আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'তাস দিয়ে কী হবে?'

রোগী বললেন, 'তর্ক মিটমাট হয়ে যেত।'

স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কীভাবে?'

রোগী বললেন, 'তাসের প্যাকেট থেকে দু'জনে দুটো তাস টানতুম। তারপরে যার তাসটা ছোট হত সেই দামটা দিত।'

সেদিন এই রোগীকে নিয়ে অসুখ সেরে যাওয়া সেলিব্রেট করতে ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন কিনা আমার জোকবুকে সে খবরটা নেই।

এসো বসি আহারে

আমি সুদূর মফস্বলের লোক। প্রথম প্রথম খটকা লাগত, রেস্টুরেন্ট না রেস্তোরাঁ? কাফে না কেফ্, তা নিয়েও চিন্তা করেছি।

যতদূর মনে পড়ে, কফিহাউসের বাইরে দরজার মুখে কাঠের বোর্ডে লেখা থাকত, রাইট অব অ্যাডমিশন রিজার্ভড (Right of admission reserved)। এই নোটিশ দেখে চিন্তিত হয়ে কফিহাউসে প্রথম প্রথম প্রবেশ করতে ইতস্তত করেছি; চল্লিশ বছর আগের সেই কথা এখনও অস্পষ্ট মনে আছে।

আমাদের জন্মশহরে চায়ের দোকান যে দু'-চারটে ছিল না তা নয়, সেখানেও লোকেরা সকাল সন্ধেয় আড্ডা দিত, তৃষ্ণা নিবারণ করত। কিন্তু ওই রেস্টুরেন্ট বা রেস্তোরাঁ কথাটি তখনও চালু হয়নি; লোকে বলত চায়ের দোকান, একটু মার্জিতরা বলতেন চায়ের স্টল, টি স্টল। তবে ওই পর্যন্তই, কফির দোকান বা কফিখানা যাকে বড় শহরে বলে, কফিহাউস সেসব কিছু ছিল না। প্রত্যন্ত বঙ্গের গহনে তখনও তিক্ত কষায় কফির স্বাদ অনুপ্রবেশ করেনি।

ভুল হয়ে যাচ্ছে।

লিখতে বসেছিলাম 'এসো বসি আহারে।' কিন্তু আহার কোথায়, এ তো পানীয়ের কথা হয়ে যাচ্ছে। তাও তেমন তেমন পানীয়— সিদ্ধি বা হুইস্কি, হাঁড়িয়া কিংবা রাম, নিদেনপক্ষে বিয়ার বা ভাঙের শরবত হলে কথা ছিল। ছিঃ ছিঃ তারাপদ, ছিঃ ছিঃ, এতদিনে তুমি চা-কফি দিয়ে মন মজাতে বসেছ? তোমার ডগমগে পাঠিকা এত সহজে সন্তুষ্ট হবেন না।

সুতরাং মোটা গদ্যে যাই।

প্রথমে খাওয়া নয়, খাওয়ার পরের কথা বলি। বহু হোটেলেরই সমস্যা হল লোকেরা খাওয়ার পর কাঁটা চামচ পকেটে ভরে নিয়ে যায়।

হায়দরাবাদে এক খানদানি ভোজনালয় তথা সরাবখানায় দেখেছিলাম, ইংরেজি আর উর্দুতে দুটি নোটিশ হোটেলের ভেতরের সামনের দেওয়ালে ঝলমল করছে।

বাংলা করলে নোটিশটার সাদা ভাষায় মানে দাঁড়ায় ঃ

'মাননীয় অভ্যাগতবৃন্দ,

আমাদের কাঁটা-চামচগুলো হজমের ওষুধ নয়। ভোজনের পরে ওগুলো গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই।'

অন্য একটা ভোজনালয়ের গল্প বলি। এটা অবশ্য আমার চোখে-দেখা নয়, বিলিতি বইতে পড়া।

সদা হইচই, সদা-জাগরিত এক জনপ্রিয় মার্কিনি ভোজনালয়ে এক ব্যক্তি ঢুকেছে। যে-কোনো বড় হোটেলে নানা ধরনের উলটোপালটা লোক ঢোকে। হোটেলের ম্যানেজার সাহেবের কাজই হল সেদিকে নজর রাখা এবং সম্ভবমতো তার যথাসাধ্য সমাধান করা।

আমাদের আলোচ্য গল্পের এই ভদ্রমহোদয় যিনি ভোজনালয়ে প্রবেশ করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তিনি বেশ শান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির। কিন্তু তিনি টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর যখন খাবার আনার আগে বেয়ারা প্লেট ছুরি-কাঁটা, ন্যাপকিন এনে দিল, ভদ্রলোক হাত মোছার সেই ন্যাপকিনটা নিয়ে গলায় বাঁধলেন— বাচ্চাদের গলায় যেমন মায়েরা বেঁধে দেয় খাওয়ার আগে, যাতে জামাকাপড়ে তেল-মশলার খাবারের দাগ না লাগে।

কিন্তু নাকউঁচু ভোজনালয়ের খুঁতখুঁতে ম্যানেজার সাহেবের এ ব্যাপারটা পছন্দ নয়, একটা বড় হোটেলের পক্ষে এ ভারী হাস্যকর দৃশ্য।

কী করবেন ভেবে না পেয়ে, অনেকটা চিন্তা করে তিনি তাঁর ভোজনালয়ের সবচেয়ে চতুর বেয়ারাকে ডেকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন।

বেয়ারাটি বলল, 'স্যার, এ কোনো ব্যাপার নয়। আমি এক সেকেন্ডে সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

তার পর সে গুটিগুটি সেই সদাশয় গ্রাহকের কাছে গিয়ে সেলুনের নাপিতের মতো খুব নিচুগ্রামে মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, চুল কাটবেন না দাড়ি কামাবেন?'

স্যার মহাশয় চুল কাটতেও আসেননি, দাড়ি কামাতেও আসেননি। তিনি এসেছেন খেতে, চটপট গলা থেকে ন্যাপকিনটা খুলে নিয়ে বললেন, 'চুল-দাড়ি নয়, এক প্লেট স্টেক আর এক বাটি সুপ।'

এবার কলকাতার এক বিখ্যাত চিনে দোকানের কথা বলি। সেও অনেককাল আগের কথা।

তখনও আমরা চিনে খাবারের সঙ্গে তেমন পরিচিত হইনি। সব খাবারের নামটাও সড়গড় হয়নি। বেয়ারা যখন খেতে বসার পর আমাদের হাতে ড্রাগন-আঁকা একটা মেনু ধরিয়ে দিল, একটু ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। অধিকাংশ খাবারের নামের মানে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে ফ্রায়েড-রাইস কিছুটা বুঝতে পারলাম, আর সবশেষে দেখলাম লেখা আছে চৌ এন চিক। চিনে হোটেলে যখন এসেছি একটু চৌ বা চাও খেতে হবে। মনে হল চিক যখন দেখছি, এটা সম্ভবত চিকেনের চৌ— তাই অর্ডার দিলাম। অর্ডার পেয়ে বেয়ারা বেচারি বিস্মিত হয়ে গেল। সে বলল, 'স্যার, এটা খাবার জিনিস নয়, এটা আমাদের ম্যানেজারের নাম।'

পুনশ্চ ঃ

একটি হোটেল নাটিকার অংশ ঃ

বেয়ারা ঃ আমাদের বিরিয়ানি কেমন লাগল স্যার আপনার? আসল জাফরান দিয়ে তৈরি।

গ্রাহক ঃ চমৎকার।

বেয়ারা ঃ আর আমাদের মাংসের কাবাব? এমন মোগলাই কাবাব এ-শহরে আর কোনো

দোকানে পাবেন না। ঠিক যতটুকু সেদ্ধ, যতটুকু ভাজা হওয়া উচিত, একেবারে ততটুকু। তা ছাড়া সব খাঁটি মশলা। আপনার ভাল লাগেনি স্যার?

গ্রাহক ঃ চমৎকার, খুব ভাল লেগেছে, খুবই ভাল কাবাব তোমাদের।

বেয়ারা ঃ আপনি তো আবার ফিশ তন্দুরি নিয়েছিলেন। এ রকম তাজা মাছ দিয়ে ফিশ তন্দুরি কোথাও বানায় না। যে খায় সেই প্রশংসা করে। আপনার কেমন লাগল স্যার?

গ্রাহক ঃ চমৎকার। সচরাচর এমন পাওয়া যায় না। খুব ভাল মাছ খেলাম।

বেয়ারা ঃ (একটু ইতস্তত করে, একবার খুব ক্ষীণ একটা গলাখাঁকারি দিয়ে) তাহলে স্যার আপনি এত মনখারাপ করে মুখ কালো করে বসে আছেন কেন? আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

গ্রাহক ঃ অস্বস্তি আমারও হচ্ছে। সে তোমাদের খাবার খেয়ে নয়। সে তোমাদের খাবারের বিল পেয়ে। অত টাকা তো আমার কাছে নেই।

শুভ নববর্ষ

আমি মফস্বল পূর্ববঙ্গের যে অজ অঞ্চল থেকে এসেছি সেখানে পয়লা বৈশাখের চেয়ে চৈত্র সংক্রান্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

চৈত্র সংক্রান্তি মানে চড়ক সংক্রান্তি, নীল পুজো ও গাজনের মেলা। বর্ষশেষের সেই উৎসব ছিল পালাগানে, মেলায় যাত্রায় জমজমাট।

পয়লা বৈশাখের মেলা কোথাও কোথাও ছিল না তা বোধহয় নয় কিন্তু আমাদের ছোট শহরের বৈশাখী মেলাটা হত বাংলা বছরের প্রথম রবিবারে। এক অপরিচিতা গ্রাম্য রমণীর নামে সেই মেলা 'মদনের মার মেলা' আমার বাল্যস্মৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে।

এই এতকাল পরে আজ আর কারো কাছে সদুত্তর পাওয়া যাবে না 'মদনের মা' কে ছিল এবং কেনই বা তার নামে মেলা।

আবার এমনও তো হতে পারে মদন মানে মদনগোপাল নামের কোনও বিগ্রহ, সেই বিগ্রহের জননী, জগজ্জননীর মেলা ছিল সেটা।

কার কাছে যেন সেদিন শুনলাম মেলাটা নাকি এখনও হয়। মেলা আর হাট সহজে উঠে যায় না। কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, গ্রামগঞ্জ অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু পোড়ো মাঠে ভাঙা মসজিদের উঠোনে বুনো অশথ গাছের ছায়ায় বছরের নির্দিষ্ট দিনে মেলা যথাসময়ে ফিরে আসে। শেষ রাতে বড় কালো কড়াই নিয়ে জিলিপিওয়ালা মাঠের একপাশে বড় গর্ত করে উনুন খোঁড়ে, গোরুর গাড়িতে খড় বিছিয়ে মাটির হাঁড়ি মালসা নিয়ে কুমোরের সওদা এসে যায় পথের ধারে, কোথা থেকে তালপাতার ভেঁপু আর বাঁশের বাঁশির লোকটাও তার বাপ ঠাকুরদার মতো বাঁশি বাজাতে বাজাতে মেলায় ফিরে আসে। মেলা জমে যায়।

পয়লা বৈশাখ শাস্ত্রীয় কোনও ব্যাপার নয়, নেহাতই সামাজিক অনুষ্ঠান। এই সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্যবসায়িক ব্যাপার শুভ হালখাতা।

অক্ষয় তৃতীয়া বাদ দিলে পয়লা বৈশাখেই অধিকাংশ বাঙালি দোকানে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নতুন খাতা খোলা হয়।

রথযাত্রাতে যেমন চিৎপুরে যাত্রা কোম্পানির বছর শুরু হয়, বাংলার প্রকাশন ব্যবসায় কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় হালখাতা পয়লা বৈশাখ, শুভ নববর্ষ উপলক্ষে বইয়ের দোকান ও প্রকাশক প্রতিষ্ঠানগুলি লেখক পাঠক শুভানুধ্যায়ীর ভিড়ে জমজমাট।

লেখাপড়ার শুভ হালখাতাও এখন শেষ পর্যন্ত পয়লা বৈশাখে এসে গেছে। আমাদের ছোট বয়সে শিক্ষাবর্ষ শুরু হত ইংরেজি নতুন বছরে। এখন বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে মাধ্যমিক পার হয়ে ইস্কুলের শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে বাংলা বছরে।

আমাদের সেই সাবেককালের ওয়ান-টু-থ্রি ইত্যাদি ছাড়াও এখন তার নীচে রয়েছে আরও কয়েক ধাপ নার্সারি ওয়ান-টু-থ্রি বা অন্য নামে কেজি ওয়ান-টু-থ্রি। সে এক বিশাল শিশুমেধ যজ্ঞ। মহাভারতীয় ভাষায় বলা চলে শিশুপাল বধ।

আড়াই বছর তিন বছর বয়েসে তথাকথিত কেজি বা নার্সারিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে শিশুরা।

বাংলা নববর্ষে শিশুপাল বধের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বলি।

কাহিনীটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু বোধহয় সত্যি। নার্সারি ওয়ানের একটি ছেলেকে নার্সারি টুতে প্রমোশন দেয়া হয়নি। শিশুটির উত্তেজিত পিতা শিশু শিক্ষালয়ে এসেছেন তাঁর ছেলে কেন প্রমোশন পায়নি সেটা জানতে।

জানা গেল ছেলেটি অঙ্কে ফেল করেছে। শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'দেখুন আপনার ছেলে অঙ্কে একেবারে কাঁচা। এই দেখুন আপনার সামনেই পরীক্ষা করছি।'

তারপর ফেলগ্রস্ত শিশুটিকে কাছে ডেকে নিয়ে দিদিমণি বললেন, 'আচ্ছা বলো তো কার্তবীর্যার্জুন, (ছেলেটির ওইটাই নাম, বাবা মায়ের সন্তানের নামকরণে অভিনবত্বের পরিণাম), ভেবে চিন্তে বল। তোমার যদি দুটো কলা থাকে আর আমি যদি দুটো কলা তোমাকে দিই তাহলে সবসুদ্ধ তোমার কতগুলো কলা হবে।'

অম্লান বদনে কার্তবীর্যার্জুন উত্তর দিল, 'তিনটে কলা হবে।'

দিদিমণি ছাত্রের বাবাকে বললেন, 'দেখলেন তো?'

শিশুটির বাবা এতে আরও উত্তেজিত হয়ে গেলেন, তারপর পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার মধ্য থেকে একটা টাকা নিয়ে দিদিমণির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সামান্য একটা কলার জন্যে আমার ছেলে ফেল! এই নিন একটা কলার দাম এক টাকা, এইবার ছেলেক পাস করিয়ে দিন।'

অবান্তর কদলী কাহিনী দিয়ে শুভ নববর্ষের রম্য নিবন্ধ ভারাক্রান্ত করা অনুচিত হল।

গতবছরের একটা ঘটনা বলি।

গতবছর পয়লা বৈশাখে বাল্যস্মৃতি স্মরণে রেখে আমার এক সুগায়িকা বান্ধবীর দুই শিশু দৌহিত্রকে দুটি সাধারণ বাঁশের বাঁশি কিনে দিয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, মেলা-টেলা না হলে এমনিতে রাস্তাঘাটে দোকানে বাজারে বাঁশের বাঁশি কোথাও পাওয়া যাবে না।

কালীঘাট বাজারের সামনে বহুকালের একটা পুরনো দোকানে পাওয়া যায়, ও-পাড়ার পুরনো দিনের বাসিন্দা বলে এটা আমি জানতাম এবং নতুন বছরে কালীমন্দির হয়ে আসার পথে সেখান থেকেই আমি বাঁশি দুটি সংগ্রহ করেছিলাম।

সেদিন ওই গায়িকা বান্ধবীর বাড়িতে আমার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখেই থাকে। আমি জানতাম ওই দৌহিত্রদ্বয়, যাদের বয়েস যথাক্রমে সাত এবং পাঁচ তাদের মা-বাবার সঙ্গে ওই দিন মামার বাড়িতে আসবে। তাই তাদের জন্যে বাঁশি দুটো নিয়ে গেলাম।

বাঁশি দুটো পেয়ে নাবালকদ্বয় মহা আনন্দিত। দু'জনেই প্যাঁ পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে নিজেরা ক্লান্ত হল এবং আমাদের ক্লান্ত করে তুলল।

বড় নাতিটির নাম সূর্য এবং ছোটটির নাম চন্দ্র। অনেক সাধ্যসাধনার পরে দু'জনে বারান্দায় গিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজাতে লাগল।

আমার বান্ধবীটি বললেন, 'দু'ভাই সর্বদাই ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে। আজ বাঁশি পেয়ে ঝগড়াটা করছে না।'

কিন্তু বান্ধবীর কথা শেষ হতে না হতে, দু'ভাই বারান্দা থেকে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ছুটে এলো।

বড় ভাই সূর্য চেঁচাতে চেঁচাতে, তার হাতে ফাটা বাঁশি। ছোট ভাই চন্দ্র ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁদতে কাঁদতে।

'কী হল? কী ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করায় সূর্য বলল, 'চন্দ্র আমার বাঁশি ফাটিয়ে দিয়েছে।'

তাদের দিদিমা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওইটুকু ছেলে চন্দ্র কী ভাবে ফাটাল তোমার বাঁশি?'

নির্বিকারভাবে সূর্য বলল, 'চন্দ্র ঠিকমতো ভাবে বাজাতে পারছিল না। তাই ওর মাথায় আমার বাঁশিটা দিয়ে মেরেছিলাম। মারামাত্র আমার বাঁশিটা ফেটে গেল।'

সূর্য চন্দ্রের এই গল্পের পরে অবশেষে একটা ছোটবেলার, মানে আমার নিজের ছোটবেলার গল্প দিয়ে শেষ।

ফকির জাতীয় একজন লোক থাকত আমাদের শহরের প্রান্তে। সম্ভবত তার নাম ছিল মানিকলাল কিংবা মানিকচাঁদ।

বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে ভোরবেলায় গৃহস্থের বাড়িতে উঠোনে এসে মানিকচাঁদ একটা ভাঙা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান শুনিয়ে যেত। তার বিনিময়ে কিছু দক্ষিণা পেত সে।

দুঃখের কথা, তার ছিল ভয়ংকর বেসুরো আর হেঁড়ে গলা, গান গাওয়ার উপযুক্ত একেবারেই নয়। মফস্বল শহরের ঊষাকালে নিস্তব্ধ পরিবেশ চমকে চমকে উঠত তার গানের গমকে। ঘুম থেকে শিশুরা কেঁদে জেগে উঠত। অসুস্থ ব্যক্তির বুক ধড়ফড় করত।

স্পষ্ট মনে আছে, একবার এক পয়লা বৈশাখের সকালে গান গাওয়ার পরে আমার সুরসিকা পিতামহী মানিকচাঁদকে একটা আনি আর একটা সিকি দিয়ে বলেছিলেন, 'মানিক এই আনিটা দিলাম গান গাওয়ার জন্য। আর এই সিকিটা গান থামানোর জন্য।'

রমণী সমাজে

পুরো কথাটা হল 'সুত-মিত-রমণী সমাজে'। সুত মানে হল পুত্র, মিত মনে হল মিত্র এবং সেইসঙ্গে রমণী সমাজ। বিষয়টা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই শুধু রমণী-সমাজই থাক এবারের বিষয়।

প্রথমে একটা মেয়েদের ক্লাব দিয়ে আরম্ভ করি। সেখানে এক পুরুষ-বক্তা কঠোর ভাষায় আধুনিকা রমণীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ঘোর নিন্দা করছিলেন। কতক্ষণ আর মহিলা শ্রোতারা সহ্য করবেন; সভাকক্ষ থেকে কয়েকজন রেগে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজন টেবিল চাপড়াতে লাগলেন।

তাতেও কিন্তু ভদ্রলোক নিরস্ত হলেন না। অবশেষে একজন অতি-মুখরা রমণী উঠে সরাসরি তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, মশায়, আপনি যে ধরনের উচ্ছৃঙ্খল মেয়ের নিন্দে করছেন, জীবনে সে রকম একটি মেয়েও কি আপনি দেখেছেন?

প্রশ্নকারিণীর দিকে শীতল হিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বক্তা অতি ঠান্ডা গলায় জানালেন, 'একটি মানে? সে ধরনের একটিকে তো আমি নিজেই বিয়ে করেছি।'

এর পরে অবশ্য আর কথা চলে না।

মহিলাদের সম্পর্কে কটূক্তি, নিন্দা চিরকালই পুরুষমানুষেরা করেছে— এ তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা ছোট বয়সে গ্রামাঞ্চলে শুনেছি, মহিলাদের মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। সেই ধুতি-শাড়ির পৃথিবীতে প্রচলিত কথাই ছিল বারো হাত কাপড়ে কাছা দেয় না যারা, অর্থাৎ মহিলারা, তারা আবার মনুষ্য পদবাচ্য কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বঙ্গদেশীয় পূর্বপুরুষেরা তখনও দক্ষিণী রমণীদের দেখেননি, যারা সত্যিই কাছা দিয়ে শাড়ি পরে। তখনও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ, নানা অঞ্চল এত কাছাকাছি হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে বাংলার অভ্যন্তরে, এমনকী ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের মতো শহরেও দক্ষিণ ভারতীয় খুব কম দেখা যেত, বলা উচিত দেখা যেত না।

এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথাও খেয়াল রাখা উচিত— কাছা দিয়ে শাড়ি পরার চল যাদের মধ্যে ছিল, তারাও কিন্তু আর কাছা দিয়ে শাড়ি পরছে না। কিছু কিছু সাবেকি পরিবারে হয়তো এখনও কাছা দেওয়ার চল আছে, তবে সারা ভারতে এখন শাড়ি পরার একটাই রীতি, তবে হিন্দুস্থানি ঢঙে অনেকে আঁচলটা বুকের ডানদিকে না দিয়ে বাঁয়ে দেয়।

রম্যরচনার বিষয়বস্তু থেকে একটু দূরে সরে গেলাম। তা ছাড়া শাড়ির ব্যাপারটা আমার বিষয়বস্তু হতে পারে না।

সুতরাং আবার মহিলাদের কথায় যাই।

মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের পার্থক্য বোঝাতে এক মহাপুরুষ একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোনও পুরুষমানুষকে যদি কোনও কথা বলো তা হলে সে এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে সেই কথা বেরিয়ে যাবে।

আর যদি কোনও মহিলাকে কোনও কথা বলো তা হলে সে দু' কান দিয়ে শুনবে, তারপর আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলেই সেই কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

শিল্পী পিকাসো একদা একটি বিপজ্জনক রসিকতা করেছিলেন মেয়েদের সম্পর্কে। কে যেন

ইঁকে এমনি এমনিই কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, বিশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় ক্রমশ বেশি বুড়োটে দেখায় কেন?'

এই প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর। তারপর একটু ঠোঁট টিপে হেসে উত্তর দিলেন, 'মেয়েদের ছেলেদের থেকে বেশি বুড়োটে দেখায়, তার কারণটা সম্ভবত এই যে, একজন পঁচিশ বছর বয়সি মহিলা, তার বয়সটা হয়তো সত্যিই পঁচিশ নয়, তিরিশ কিংবা হয়তো চল্লিশও হতে পারে।'

সত্যিই মেয়েদের বয়স ব্যাপারটা খুব গোলমেলে— এ নিয়ে জগৎসংসারে কতরকম ঠাট্টাই না প্রচলিত আছে।

সেই গল্পটা তো সবাই জানে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলেছিল, 'তোমার বয়সটা বলো?' প্রেমিকা হঠাৎ এই প্রশ্নে অবাক হয়ে বলেছিল, 'কেন? হঠাৎ ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমার বয়স দিয়ে কী হবে?'

প্রেমিক বলেছিল, 'তোমার যত বয়স, তত নম্বর ঘোড়ার ওপর বাজি রাখব। দেখি তুমি কীরকম লাকি।'

প্রেমিকা সলজ্জ হেসে বলেছিল, 'চব্বিশ' এবং দুরুদুরু হৃদয়ে ঘোড়দৌড়ের বাজির পরিণতি লক্ষ করছিল। ঘোড়দৌড় শেষ হল, বাজি জিতল বত্রিশ নম্বর ঘোড়া এবং প্রেমিকা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কারণ নিশ্চয় একটাই, সে যদি তার সঠিক বয়েসটা বলত, বাজিটা তারাই জিতত।

অনেক গোলমেলে লোক আছেন, যাঁরা বলেন, মেয়েরা সত্যি সত্যি মোট বয়সটা কমান না কখনও। গড়ে ঠিকই থাকে, শুধু নিজের বয়সটা যতটুকু কমান ততটাই যোগ দিয়ে দেন ননদের কিংবা বান্ধবীর বয়সের সঙ্গে।

মেয়েদের শাড়ি হল, বয়স হল এবার অন্য কিছু বলি, বুদ্ধির কথা বলি।

গল্পটি বিদেশি। এক মহিলা এক বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে— মানে যেসব বিশাল দোকানে জামা-জুতো, বই-খাতা, খেলনা স্টেশনারি— যাবতীয় জিনিস বিক্রি হয়, সেখানে গিয়ে দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন।

ম্যানেজার ভদ্রমহিলার সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি কোনও জিনিস পছন্দ না-হলে সে-জিনিস কেনার পরে ফেরত নেন?'

কঠিন প্রশ্ন। ম্যানেজার সাহেব বেশ একটু চিন্তা করে বললেন, 'জিনিসটা কী, সেটা দেখতে হবে।'

ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে বললেন, 'জিনিসটা হল একটা বই।'

ম্যানেজার বইটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখে বললেন, 'কেন, বইটা কী দোষ করল? খুব নাম করা লেখকের বই।'

মহিলা বললেন, 'বইটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। শেষটা ভাল হয়নি। তাই ফেরত দিতে চাই।'

স্বপ্ন

এক অনতিবিখ্যাত ইংরেজ কবি প্রশ্ন করেছিলেন:

যদি স্বপ্ন বিক্রি হত,
যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত
সুখের স্বপ্ন আর দুঃখের স্বপ্ন
আনন্দের স্বপ্ন আর বেদনার স্বপ্ন
যদি রাস্তায় রাস্তায় 'স্বপ্ন চাই' বলে
হেঁকে বেড়াত ফেরিওয়ালা—
তুমি তার কাছ থেকে কীরকম স্বপ্ন কিনতে?

কবির এই জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। অন্য এক কবি তাঁর এক বহুবিদিত পঙ্‌ক্তিতে বলেছিলেন, 'আমাদের মধুরতম সংগীতগুলি করুণতম দুঃখের কথা বলে।'

স্বপ্নের পক্ষে অবশ্য মধুর হওয়া কঠিন। স্বপ্ন স্বপ্নই, দিনের আলোয় সেটা চুরমার হয়ে মিলিয়ে যায়। সুখস্বপ্ন বলে কিছু নেই, সব সুখস্বপ্নই হারিয়ে যাওয়ার অথবা না পাওয়ার দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা।

স্বপ্নের কোনও বিকল্পও নেই। বাংলা কিংবা ইংরেজি, কোনও অভিধানেই স্বপ্ন কিংবা ড্রিম (Dream) শব্দটির কোনও প্রকৃত প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে না, শুধু একটু ইনিয়ে বিনিয়ে মানেটা ব্যাখ্যা করা আছে। রাজশেখরবাবুর চলন্তিকায় স্বপ্ন শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'নিদ্রাবস্থায় মনের ক্রিয়া'। সি ও ডি অর্থাৎ কনসাইজ অক্সফোর্ডে বলা হয়েছে vision।

স্বপ্ন কবিতার কাছাকাছি একটা ব্যাপার। কবিতার মতোই স্পষ্ট অস্পষ্ট বাস্তব অবাস্তব, স্বপ্ন এই পৃথিবীর মধ্যে অন্য এক পৃথিবী। ধরা ছোঁয়ার খুব কাছে, কিন্তু বাইরে।

স্বপ্ন নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের অন্ত নেই। মনোবিজ্ঞানী থেকে বুজরুক জ্যোতিষী সবাই স্বপ্নের কারবারি, স্বপ্নের ব্যাখ্যাদার। পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা বোধহয় নেই, যে ভাষায় স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ নেই।

স্বপ্ন নিয়ে তত্ত্বের কথা থাক। কবিতার কথাও আপাতত মুলতুবি। স্বপ্ন নিয়ে একটা রূপকথার কাহিনী। হিমানী নামে একটি মেয়ের কাহিনী।

হিমানী খুব স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে।

কত রকমের যে স্বপ্ন দেখে হিমানী, পাহাড়ের স্বপ্ন, সমুদ্রের স্বপ্ন, নদীর স্বপ্ন, নৌকার স্বপ্ন।

কোনও দিন কোনও নৌকায় চড়েনি হিমানী, তবু সে কখনও কখনও নৌকার স্বপ্ন দেখে, অচেনা নদীর কালো জলে ছোট ডিঙি নৌকায় দুলতে দুলতে স্বপ্নের মধ্যে হিমানী ভেসে যায়, তীরে আসে।

শেষ রাত্রের দিকে যখন বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, কালো জামদানির ঘোমটা খুলে নীলাম্বরীর ওড়নায় মুখ ঢাকে আকাশ, যখন দূরের তারাগুলোকে শিশিরবিন্দুর মতো দেখায়, উঠোনের সিঁড়ির পাশে অযত্নের তৃণদলের শিষের ওপরে শিশিরবিন্দুগুলোকে দূর আকাশের তারার মতো দেখায়, তখনই আশ্চর্য সব স্বপ্ন এসে ভিড় করে হিমানীর চোখের পাতার নীচে।

সারারাতের ঘন গভীর ঘুমের শেষে তখন হালকা আমেজ মেশা তন্দ্রায় দূরের নীল পাহাড়ের স্বপ্ন দেখে হিমানী, ঊর্মিচপল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে, নদী আর নৌকা তো রয়েছেই। রয়েছে আরও কত কী?

স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে হিমানী।

দিন আর রাতের মধ্যেকার সামান্য একটু আবছায়া, রহস্যময় সময় হিমানী স্বপ্নের ঘোরে থাকে।

স্বপ্নের মধ্যেই থাকে। তার বাইরে যাওয়ার সাহস নেই তার। স্বপ্নের ভিতরে ডিঙি নৌকায় মাঝেমধ্যে একটুখানি ভেসে গেলেও, স্বপ্ন ভাঙার আগেই যথাস্থানে ফিরে আসে হিমানী। তারপর ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে যথারীতি জীবন। আবার পরের দিন প্রদোষের জন্য প্রতীক্ষা। স্বপ্নের জন্য প্রতীক্ষা। সামান্য কিছুক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ভেসে তারপর ফিরে আসা।

কিন্তু একদিন স্বপ্নের ভেতর থেকে হিমানী আর ফিরে আসতে পারল না।

কোথায় যে সে চলে গেল কে জানে?

কয়েকদিন হল স্বপ্নের মধ্যে এক রাজপুত্র দেখা দিচ্ছিল হিমানীকে। কী সুন্দর দেখতে সেই রাজপুত্র। লম্বা, ফরসা, বাঁশির মতো নাক, পটল-চেরা চোখ, মাথায় সোনার মুকুট, তাতে হিরে মুক্তো বসানো, গায়ে জরির পোশাক, রুপোর নাগরা পায়ে।

শেষ রাতের আকাশ যখন কালো জামদানির ঘোমটা খুলে নীলাম্বরী ওড়না পরে, তখন সে আসে। কখনও দূরে নীল পাহাড়ের ঢাল ভেঙে ধুলো আর পাথরকুচি উড়িয়ে সাদা ডানা লাগানো সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে নেমে আসে স্বপ্নের রাজপুত্র। কখনও সে আসে ময়ূরপঙ্খী সোনালি জাহাজে চড়ে সাগরের ঢেউয়ে দুলতে দুলতে হাজার রঙের নিশান উড়িয়ে।

ছোট নদীর সেই ডিঙি নৌকা, সেটা এখন স্বপ্নের এক পাশে পড়ে থাকে। তাতে আর ওঠা হয় না হিমানীর। সে শুধু অবাক হয়ে দেখে কোনওদিন রাজকুমারের পক্ষীরাজ ঘোড়া, কোনওদিন রাজকুমারের ময়ূরপঙ্খী জাহাজ আর কোনওদিন শুধু রাজকুমারকে।

এক-একদিন রাজকুমার খুব কাছে আসে, একেবারে হিমানীর বিছানায়, বালিশের পাশে চলে আসে। তন্দ্রার মধ্যে হিমানীর ঠোঁটে গালে লাগে ঘোড়ার নাকের গরম নিশ্বাস, ময়ূরপঙ্খী জাহাজের রঙিন পালের শীতল বাতাস।

হিমানীকে রাজকুমার শিয়রে এসে 'এসো', 'এসো' বলে ডাকে, হিমানীর কেমন ভয় হয়, তার সাহস হয় না রাজকুমারের সঙ্গে যেতে। চোখ শক্ত করে বন্ধ করে, হিমানী বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে দিনের সব আলো জানলা দিয়ে হিমানীর চোখেমুখে, বিছানায় এসে পড়ে। পক্ষীরাজ ঘোড়া আর ময়ূরপঙ্খী জাহাজ নিয়ে রাজকুমার ফিরে যায়।

হিমানী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। হাতমুখ ধোয়। আর একটা দিন শুরু হয়।

কিন্তু একদিন ব্যতিক্রম তো হবেই।

তাই হল।

সেদিন সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। হিমানীর ঘরের বন্ধ জানলার কাচে সারারাত নিরবচ্ছিন্ন ঝিরঝির ঝিরঝির করে শব্দ। সেদিন আর আকাশের তারা নেই, ঘাসের শিষে শিশিরবিন্দুও নেই। আকাশ পৃথিবী বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে একাকার।

আজও হিমানীর স্বপ্নে রাজকুমার এল। শেষ রাতে বৃষ্টি যখন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, বাতাস যখন আরও বেশি সোঁ সোঁ করে আওয়াজ করছে, রাজকুমার হিমানীকে এসে জড়িয়ে ধরল। তারপর সে কোনও কিছু টের পাওয়ার আগে সাদা ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল তাকে। ছুটে চলল ঘোড়া পাখা মেলে। বৃষ্টিতে রাজকুমারের জামাকাপড়, জরির ঝলমলে পোশাক কিছুই ভিজছে না, এমনকী ঘোড়ার গায়ের লোম পর্যন্ত ভিজছে না।

অঝোর বৃষ্টির মধ্যে হিমানীকে কোলে তুলে উড়ে চলেছে রাজকুমার। হিমানীর গায়েও

একফোঁটা বৃষ্টির জলের ছোঁয়া লাগছে না। কেমন ভয় লাগল হিমানীর, সে তার স্বপ্নের রাজকুমারের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?' প্রশ্ন শুনে রাজকুমার অবাক হয়ে বলল, 'আমি কী করে বলব? এ তো তোমার স্বপ্ন, তুমিই জান কোথায় যাচ্ছ?'

স্বপ্নের রাজকুমারের কোলে সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে এখন হিমানী যেখানে ইচ্ছে যাক, তার রূপকথার পৃথিবীতে সে যতক্ষণ থাকতে পারে থাকুক, ইতিমধ্যে স্বপ্ন নিয়ে অন্তত দুটো গরম গল্প বলি।

দুটোই দাম্পত্য কাহিনী। অনেকদিন আগে দুই জায়গায় দুই সূত্রে লিখেছিলাম গল্প দুটো, এবার একত্র করছি।

স্বভাবতই এবং স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ স্বামী-স্ত্রী একই শয্যায় শয়ন করেন এবং সেই হেতু একই স্বপ্নের তারা অংশীদার।

সে যা হোক একটি গল্প একটু সরল, সেটাই আগে বলি। স্বামী সারারাত ঘুমের মধ্যে 'জলি' 'জলি' করে কাকে যেন ডেকেছেন, খুঁজেছেন। বলাবাহুল্য জলি সহধর্মিনীর নাম নয়। সুতরাং ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে সারারাত স্বপ্নের মধ্যে 'জলি-জলি' করলে, জানতে পারি কি জলিটা কে?'

স্বামী বেচারা থতমত খেয়ে গিয়ে দু'বার ঢোঁক গিলে বললেন, 'আরে না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়, জলি কোনও মেয়েছেলে-টেলের নাম নয়, জলি হল একটা রেসের ঘোড়া, কাল রেস খেলতে গিয়েছিলাম না, ওই জলির ওপরেই বাজি ধরেছিলাম।'

তখনকার মতো স্বামী পার পেয়ে গেলেন। একটু পরে স্বামী বাথরুমে দাড়ি কামাতে গেছেন এমন সময় একটা ফোন এল। স্ত্রী ধরলেন সেই ফোনটা, তারপর ফোনটা নামিয়ে বাথরুমে গিয়ে স্বামীকে বললেন, 'কাল যে রেসের ঘোড়াটার ওপরে তুমি বাজি ধরেছিলে, ওই যে তোমার জলি নামের ঘোড়াটা, সেই ঘোড়াটা তোমাকে ফোনে ডাকছে।'

এবার জটিল গল্পটিতে যাই। গল্পটি ছোট কিন্তু মারাত্মক।

মধ্যরাতে বউ ঘুম ভেঙে উঠে পাশে শায়িত ও নিদ্রিত স্বামীকে বুকেপিঠে দমাদম ঘুষি মারতে লাগল। স্বামীর প্রহৃত হওয়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু এ রকম অতর্কিতে ঘুমের মধ্যে মার খেয়ে সে বেচারা ঘাবড়িয়ে গেল। কেবল চেঁচাতে লাগল, 'কী হল, আমার কী দোষ, আমি কী করলাম?'

ইতিমধ্যে প্রহারকারিণী ক্লান্ত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে, স্ত্রীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্বামী প্রশ্ন করল, 'বলো না কী হয়েছে। কাঁদছ কেন? মারলে কেন?'

এই প্রশ্নে ফোঁপানি থামিয়ে স্ত্রী বলল, 'আমি যদি আর কখনও স্বপ্নে দেখি যে, তুমি অন্য কোনও মেয়েকে আদর করছ, তা হলে আমি সুইসাইড করব, আত্মহত্যা করব।'

এ রকম একটি মারাত্মক কাহিনী দিয়ে রম্য নিবন্ধ শেষ করা উচিত হবে না, বিশেষ করে যে নিবন্ধের নাম 'স্বপ্ন'।

কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম, কবিতা দিয়েই শেষ করি। মূল কবিতাটি নিতান্ত স্বপ্নময়, লেখক উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস। আমার প্রথম অনুবাদ সামান্য কয়েক পঙক্তি নিবেদন করছি:

আমি নিতান্ত দরিদ্র
আমার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।
আমার সেই স্বপ্নগুলি
আমি তোমার পায়ের তলায় বিছিয়ে দিয়েছি,
তুমি একটু সাবধানে যেয়ো,
দেখো আমার স্বপ্নগুলো
তোমার পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ো না।

কলকাতা তিনহাজার তিনশো

কলকাতার বয়স যে মাত্র তিনশো বছর একথা আমি স্বীকার করি না, বিশ্বাস তো করিই না। পণ্ডিতেরা যে যাই বলুন কোনও পণ্ডিতের, কোনও ঐতিহাসিকের সঙ্গেই এ বিষয়ে আমি একেবারেই একমত নই।

তাতে অবশ্য পণ্ডিত মহোদয়দের কিছু এসে যায় না। তাঁরা মনের আনন্দে সভা করে যাচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন, বড় বড় সুগম্ভীর তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখছেন দৈনিকের ক্রোড়পত্রে, নামীদামি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায়। সেসব সংখ্যা অলংকরণ করেছেন বড় শিল্পীরা, কী চমৎকার সেইসব ড্রইং। জব জার্নক থুড়ি জব হবে না, আমাদের বাল্যকালের জব চার্নক ইতিমধ্যে জোব চার্নক হয়ে গেছেন। তা সেই জোব সাহেব কলকাতার গঙ্গার ঘাটে পদার্পণ করছেন বটতলায়, কী আশ্চর্য সেই বটগাছ যার পাতাগুলো একেবারে আমপাতার মতো আর আলখাল্লা পরা চার্নক হুবহু ইতিহাস বইয়ের নানা সাহেবের মতো দেখতে।

এদিকে হে-কলকাতা, আহা কলকাতা, ওগো কলকাতা আ-মরি কলকাতা, কলকাতা-কলকাতা সর্বসমেত কাল দুপুর পর্যন্ত এক হাজার সাতশো বত্রিশটা গান ও আবৃত্তির ক্যাসেট বেরিয়েছে। গায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আমলা, অধ্যাপক, সবাই প্রাণপণ কলকাতা তিনশো-র পিছনে দৌড়চ্ছেন।

দৌড়চ্ছেন মানে সত্যিই দৌড়চ্ছেন, লিটারালি দৌড়চ্ছেন। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার নেতাজির মূর্তি থেকে সল্ট লেক, গোলপার্ক থেকে রবীন্দ্রসদন প্রবল বৃষ্টিতে, ঘোর ঠান্ডায়, প্রখর রৌদ্রে রাস্তার যানবাহন তুচ্ছ করে, জীবন বিপন্ন করে বৃদ্ধ ঐতিহাসিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছেন প্রবীণ কবি। দু'জনেই কলকাতার জন্য দৌড়চ্ছেন, সবাই কলকাতার জন্য দৌড়চ্ছে।

কেউ খেয়াল করছেন না। কলকাতার কোনও বয়স থাকতে পারে না। কোনও জায়গারই কোনও আলাদা বয়স নেই, সব জায়গাই পৃথিবীর সমান বয়সি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি একটা অনিয়মিত পত্রিকায় যথাসাধ্য নিয়মিত লিখতাম। তখনও কলকাতা তিনশোর হুজুগ ওঠেনি। কিন্তু সেই সম্পাদক মহোদয়ের ঘটে কিছু বুদ্ধি ছিল, তাঁর কাগজের নাম ছিল কলকাতা দু'হাজার। অবশ্য এখন আমি যদি কোনও কাগজ করি তবে ঠিক করেছি যে তার নাম দেব কলকাতা ১০,০০,০০,০০,০০০,০০০ অর্থাৎ কলকাতা দশ অক্ষৌহিণী।

কলকাতার উল্লেখ যে আবুল ফজলের আইন-ই আকবরি গ্রন্থে রয়েছে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে যে গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতার কথা বলা আছে কলকাতা তিনশোর কল্যাণে এবং সংবাদপত্রসহ অধ্যাপক মহোদয়, মাস্টারমশাইদের দৌলতে সেসব খবর সবাই জানে। এসব থলেপচা বিষয় নিয়ে আমার কিছু লেখার ইচ্ছে নেই, যোগ্যতাও অবশ্যই নেই।

কিন্তু আমি যাব আরও পিছনে। কলকাতা যে কত পুরনো সেটা প্রতিপন্ন করার জন্য আমার তূণীরে আছে দুটি অব্যর্থ শর।

প্রথম শরটি সংক্ষেপে নিক্ষেপ করি।

নবদ্বীপবাসী প্রাচ্য বিদ্যার্ণব জ্ঞানেন্দ্রনাথ তর্ক বাচস্পতির কাছে আমি স্বয়ং একথা শুনেছি। সবাই

নিশ্চয় অবগত আছেন সংস্কৃত ভাষায় বা পুরাণ সাহিত্যে আমার দখল অপরিসীম নয়। সুতরাং এটা শোনা কথা।

তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমাকে যা বলেছিলেন তা আমার মতো অভাজনের পক্ষে যাচাই বা পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, যে রকম শুনেছি তাই লিখছি।

বাচস্পতি মহোদয়ের মতে কলকাতার তিনশো বছর বয়স ব্যাপারটা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কলিকাতা কথাটা আসলে কালিকাতা। কালী, কালিকা, কালিকাতা।

কালিকাতা নামে কারও কোনওরকম সংশয় থাকা উচিত নয় কারণ সত্যিই তো কোনও জায়গার কোনও বাঁধা নাম নেই। চোখের সামনেই তো পিকিং, ফেচিং, বেজিং, ভেটজিং হয়ে গেল। ভাইজাগ হল বিশাখাপত্তনম। বোম্বাই, বোম্বে, দ্রুত মুম্বাই হওয়ার দিকে এগোচ্ছে।

আর সত্যিই তো কলকাতার নামের অন্ত নেই। কলকাতার মতো এমন জায়গা আর কোথায় আছে যার সাধুভাষায় আর চলিতভাষায় দু'রকম নাম, কলিকাতা আর কলকাতা। বাঙালেরা বলে কইলকাতা।

ঢাকা গেলে শিক্ষিত লোকেরা জানতে চান, 'কেলকাটা থেকে কবে আসলেন?'

হিন্দুস্থানিরা বলেন 'কলকাত্তা'। ওড়িয়ারা খুব জোরের সঙ্গে বলেন 'ক্লীকাতা'।

সাহেবদের তো কথাই নেই— ক্যালকাটা থেকে কালকুত্তা, একেক জাতের সাহেবের কাছে কলকাতার একেকরকম নামডাক।

তা এইসব নামের মধ্যে সবচেয়ে আদি নাম কালিকাতা। কালীঘাটের কালিকা মন্দির থেকে কালিকাতা, জন থেকে যেমন জনতা, শূন্য থেকে যেমন শূন্যতা, পূর্ণ থেকে যেমন পূর্ণতা, মানব শব্দ থেকে যেমন মানবতা ঠিক তেমনভাবেই কালিকা শব্দ থেকে কালিকাতা।

কলিতীর্থ কালীঘাটের কালিকামন্দির আজকের ব্যাপার নয়, তিনশো বছরের ব্যাপারও নয়। সেই দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক যুগে পাগল শিব প্রমথেশ পিতৃগৃহে অভিমানে অপমানে দেহত্যাগকারিণী সতী পার্বতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নাচন শুরু করেছিলেন, সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলেন, সেগুলো পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

কালীঘাটে পড়েছিল সতীর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল। আমরা যখন কথায় কথায় কাউকে হেয় করার জন্য বলি, 'তুই আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নস।'

আমরা কী সাংঘাতিক কথা বলি তা কি আমরা জানি।

সে যা হোক, সেই দক্ষযজ্ঞ মহাদেবের সেই প্রলয় নাচন সে কি আজকের কথা!

চার্নকের বাপঠাকুরদা চৌদ্দপুরুষ তখন জন্মায়নি, সে তাদের চোদ্দ হাজার পুরুষ আগের কথা। চার্নক সাহেবের আদি পূর্বপুরুষেরা সেই টিউডর, নরমানেরা এমনকী স্যাক্সন বা ডেনেরা পর্যন্ত তখনও এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়নি।

তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছেন যে কালিকাপুরাণই হল কালিকাতাপুরাণ। কালিকাপুরাণে যে বরাহ উপাখ্যান আছে, নরকাসুরের উপাখ্যান আছে সেসব যে কলকাতার পটভূমিতেই রচিত, বাচস্পতি মহোদয়ের মতে, সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়, এবং সেইজন্যেই কলকাতার বয়স কালিকাপুরাণের চেয়ে কম নয়, কম হতে পারে না।

মনে রাখতে হবে কালিকাপুরাণ যদিও ব্যাসাদি মুনি প্রণীত ব্রহ্মপুরাণ বা পদ্মপুরাণের মতো মূল পুরাণ নয়, একটি উপপুরাণ, তবুও তার প্রাচীনতা প্রশ্নাতীত।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমার মনের মধ্যে যেটুকু সংশয় বা প্রশ্ন উঠেছিল তা দূর হল ডক্টর বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার পরে। কলকাতার প্রাচীনতার সপক্ষে আমার তূণীরে দ্বিতীয় শরটি ডক্টর ভট্টাচার্যই দান করেছেন।

ডক্টর বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য কোনও সামান্য কেউকেটা লোক নন। ইন্টারন্যাশনাল মহাভারত সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি ও প্রাণপুরুষ। একশো দশ বাই তেত্রিশ গরচা চতুর্থ লেনে তাঁরই বসবার ঘরে আন্তর্জাতিক মহাভারত সমিতির হেড অফিস।

ডক্টর ভট্টাচার্য আমাকে যা বললেন তা নিতান্ত প্রণিধানযোগ্য। মহাভারতের নাকি একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে যেটি কোনও বিশেষ কারণে বেদব্যাস মূল মহাভারত থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কাশীরাম দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়রাও এই অংশটুকু মহাভারতে রাখতে সাহস পাননি।

সম্প্রতি ডক্টর ভট্টাচার্য দূরদর্শনে মহাভারতের প্রযোজক প্রমোদসম্রাট মিস্টার বি. আর. চোপরা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন এই প্রক্ষিপ্ত অংশে, তিনি কথাও দিয়েছিলেন বিবেচনা করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেননি।

ঘটনাটি মহাভারতের বনপর্বের শেষভাগের। বারো বৎসর বনবাসের পরে পাণ্ডবদের যখন এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময় এল তাঁরা গোড়াতেই বিরাটনগরে গিয়ে ছদ্মবেশে এক বছর কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেননি। তাঁরা প্রথমে অন্যত্র, হস্তিনাপুর থেকে যতদূরে সম্ভব থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি।

ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। বনবাসের বারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার মুখে পাঞ্চালিসহ পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের স্থান ঠিক করার জন্য গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগোতে লাগলেন। তাঁরা শুনেছিলেন সাগরদ্বীপে গঙ্গার মোহনায় কপিলমুনির আশ্রম আছে এবং তার চারপাশে জনমানবহীন গহন সব জঙ্গল। পাণ্ডবেরা ভাবলেন এই একটা বছর ওই জঙ্গলে কোনওক্রমে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দেবেন।

গঙ্গার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক অপরাহ্ন বেলায় দ্রৌপদী ও পাণ্ডবেরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছালেন যেখান থেকে সাগরদ্বীপ খুব দূরে নয়। এখানে গঙ্গানদীর মূল ধারা থেকে একটা সংকীর্ণ শাখা বেরিয়েছে লোকেরা যাকে বলে কাটিগঙ্গা।

কাটিগঙ্গার পূর্বধারে গ্রাম-নগর, মন্দির দেবস্থান। কিঞ্চিৎ খোঁজখবর করে পাণ্ডবেরা জানতে পারলেন কাটিগঙ্গার পাড় দিয়ে কপিলমুনির আশ্রমে যাওয়াই নিরাপদ এবং পথও কিছুটা কম। তাঁরা গঙ্গা অতিক্রম করে কাটিগঙ্গার পশ্চিমতীরে এসে পৌঁছালেন। সেটা গ্রীষ্মকাল। কাটিগঙ্গা মাত্র পনেরো-বিশ হাত চওড়া, তাতে কোমরজলের বেশি জল নেই। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। অন্তত সেদিনের মতো রাত্রিবাসের একটা জায়গা প্রয়োজন। তা ছাড়া ওপারে কালিকামন্দির দেখা যাচ্ছে একটা, সেখানে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, ঢাকের বাজনাও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, 'টাকডুমাডুম', সেই সঙ্গে পাঁঠার আর্তনাদ ব্যা ব্যা ব্যা। দ্রৌপদী মেষবলি দেখতে খুব ভালবাসেন। তিনি যে যজ্ঞ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেই যজ্ঞে পাঞ্চালরাজ একশো আটটি মোষ বলি দিয়েছিলেন, সেই জন্মলগ্ন থেকে দ্রৌপদীর পশুবলির ওপরে ঝোঁক।

বারো বছর বনবাসে পশুবলি দেখার খুব একটা সুযোগ দ্রৌপদী পাননি। কখনও ভীম গদার আঘাতে একটা বাইসন বা নীলগাই মেরে এনেছে, কখনও অর্জুন তির দিয়ে হরিণ বা সম্বর মেরে এনেছে, নকুল ও সহদেব সাধ্যমতো খরগোশ বা বন্য কুক্কুট শিকার করে গলায় মালার মতো করে পরে এসেছে। কিন্তু রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আসার পর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দ্রৌপদীর পশুবলি দেখা হয়নি।

আজ বলির বাজনা শুনে দ্রৌপদীর হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠেছে। তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে বায়না ধরলেন, 'ধর্মপুত্র আমি ওই কালিকামন্দিরে গিয়ে মেষবলি দেখব।'

প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সাবধানী, ধুরন্ধর, বহুদর্শী লোক। একটা অচেনা জনপদের অচেনা মন্দিরে দল বেঁধে, ভাইবউ নিয়ে হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত কতটা নিরাপদ বিশেষত দ্রৌপদীর মতো সুন্দরী গৃহিণী যেখানে সঙ্গে রয়েছে, তাই একটু চিন্তা করে তিনি ভীমকে অনুরোধ

করলেন, 'মধ্যম পাণ্ডব, পাঞ্চালি ওপারের কালিকামন্দিরে মেষবলি দেখতে যেতে চাইছে, তুমি একটু ওপারে গিয়ে দেখ দেখি স্থানটা নিরাপদ কি না?'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পেয়ে মহাবলী ভীম 'যথা আজ্ঞা' বলে এক লাফে কাটিগঙ্গা পেরিয়ে ওপারে চলে গেলেন।

কিন্তু ওপারে যাওয়ার পরে ভীমের আচার আচরণে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল। এপারে দাঁড়িয়ে চার পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী দেখলেন ভীম কাটিগঙ্গা পার হয়েই হঠাৎ হাতের গদা দিয়ে পাড়ের জমি মাপতে লাগলেন, এবং মুখে কী সব বিড়বিড় করতে লাগলেন।

ঘটনা দেখে যুধিষ্ঠির চিন্তায় পড়লেন, তাঁর কেমন খটকা লাগল, ভীমের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। এপার থেকে যুধিষ্ঠির চেঁচিয়ে বললেন, 'ভীমসেন অযথা বিলম্ব করছ। তাড়াতাড়ি করো। আমাদের জানাও যে আমরা ওপারে আসব কি না?'

এই কথা শুনে মাথার ওপরে গদা বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে রোষ কষায়িত লোচনে ভীমগর্জনে ভীমসেন বললেন, 'এদিকে এক পা বাড়িয়েছ তো একদম মাথা গদার এক আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব।'

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণলেন, সত্যিই তো বারো বৎসর বনবাসের কষ্টে তারপরে শেষ কয়দিনের পথশ্রমের ফলে মধ্যম পাণ্ডবের মস্তিষ্ক-বিকার দেখা দিয়েছে, তিনি তাড়াতাড়ি অর্জুনকে অনুরোধ করলেন, 'ধনঞ্জয়, তুমি একবার ওপারে গিয়ে দেখ তো মধ্যম পাণ্ডব এ রকম করছে কেন?'

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ওপারে চলে গেলেন। তারপর যা কোনওদিন কখনও হয়নি ভীম অর্জুনকে দেখে তাড়া করে এলেন।

স্থিরচিত্ত অর্জুনও বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'জনে কাদার ওপরে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। দু'জনেই দু'জনকে বলতে লাগলেন, এ এলাকা আমার। শয়তান, তুই এখান থেকে ভাগ, না হলে আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। রীতিমতো গচ্ছ-কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

দ্রৌপদীকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব দুই মাদ্রীপুত্রকে নির্দেশ দিলেন ওপারে দৌড়ে গিয়ে ভীমার্জুনের বিবাদ মেটাতে।

কিন্তু নকুল-সহদেব ওপারে পৌঁছতে গোলমাল আরও বেড়ে গেল। এবার চার পাণ্ডবে শুরু হল তুমুল ধস্তাধস্তি, জাপটাজাপটি। এ ওকে মারে, ও তাকে মারে। ভীম লাথি মেরে ফেলে দেয় অর্জুনকে, নকুল ভীমের কেশাকর্ষণ করে, সহদেব ঘুষি চালাতে থাকে নকুলের ওপরে। খামচাখামচি, কামড়া-কামড়ি ভয়াবহ ব্যাপার, ছোটখাটো কুরুক্ষেত্র একটা।

কাটিগঙ্গার এপারে দাঁড়িয়ে এই ভয়াবহ ভ্রাতৃকলহের তথা পতিকলহের দৃশ্য দেখে দ্রুপদনন্দিনী থরথর করে কাঁপতে লাগলেন, কিন্তু মহামতি যুধিষ্ঠির সর্বজ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী পুরুষ। তিনি মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে অপর প্রান্তে বিবাদরত ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভালই হয়েছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করো, দ্রৌপদী এখন থেকে আমার একার।'

এই কথা শোনা মাত্র ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব এক দৌড়ে কাটিগঙ্গা পার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে তাড়া করে এলেন। এসে দেখলেন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। ইতিমধ্যে ভীম অর্জুন নকুল সহদেবের সংবিত ফিরে এসেছে। তাঁরা যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে জিভ কেটে স্বীকার করলেন, 'মহা অপরাধ হয়ে গেছে। ওপারে গিয়ে মাথার মধ্যে কীরকম হয়ে গিয়েছিল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে হিতাহিত বোধশূন্য হয়ে পড়েছিলাম। কী করছিলাম কিছুই বুঝতে পারিনি।'

তখন মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির বললেন, 'তোমাদের কারও কোনও দোষ নেই। কাটিগঙ্গার ওপারে ওই

কালিকা মন্দির আর কালিকাপুরাণোক্ত দুর্দান্ত কালিকাতা নগরী। ওখানে গেলে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর হয়ে ওঠে। যে যার ভাগ গোছাতে ব্যস্ত থাকে। ভাইয়েরা ভাইয়ের সঙ্গে কলহে, মারামারিতে, বাদবিসম্বাদে মেতে ওঠে।'

এই বলে যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন, 'আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। এই স্থান থেকে যত তাড়াতাড়ি যতদূর যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।' দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব কালিকাতা নগরী বর্জন করে যে পথ ধরে এসেছিলেন সে পথ ধরে ফিরে গেলেন সেই রাতেই।

এই কাহিনী পুরোপুরিই আমার ডক্টর বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যের কাছে শ্রুত। তিনি আমাকে আরও দুটো তথ্য দিয়েছিলেন।

এক, এই ঘটনার কারণেই কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলা হয়।

এবং দুই, মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতের সমস্ত রাজাই কোনও না কোনও পক্ষে লড়েছিল। বঙ্গদেশ লড়েছিল দুর্যোধনের পক্ষে।

কলকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে এই মহাভারতীয় কাহিনী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু কালিকাতা তথা কলিকাতা তথা কলকাতা মহানগরী যে কৌরবপাণ্ডবের আমলেও ছিল এ বিষয়ে নিশ্চয় কারও মনে অতঃপর আর কোনও সন্দেহ থাকছে না। অধ্যাপক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিকেরা যে যা ইচ্ছে বলুন, দুটো প্রমাণের মতো প্রমাণ দিয়ে দিলাম।

মহাভারতের কথা
অমৃত সমান।
তারাপদ রায় কহে
শুন বুঝমান ॥

আবার বইমেলা

বইমেলা সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা তা নিতান্তই পাঠক বা ক্রেতার। কবি, লেখক বা গ্রন্থকার হিসেবে বইমেলায় প্রবেশ করার কোনও সুযোগ কখনও আমার হয়নি। লাইনে দাঁড়িয়ে কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে আর সকলের মতো সারি দিয়ে বইমেলায় আমি ঢুকি। বইমেলার উদ্যোক্তারা, হয়তো সংগত কারণেই, আমাকে কখনও গ্রন্থকার বা কবি হিসেবে খাতির করেননি।

তবে আমি থাকি বইমেলার মাঠের খুব কাছে। প্রতিদিনই সকালে এবং ছুটির দিনে বিকেলেও আমি আমার বৃদ্ধ সারমেয়টিকে নিয়ে এরই কাছাকাছি এলাকার ময়দানে বা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের চারপাশে শৌখিন ভ্রমণচর্চা করি।

ওই কাছে থাকি বলেই বইমেলার সময়ে আমি প্রথম দিনে একসঙ্গে আট-দশটা প্রবেশপত্র ক্রয় করে রাখি। কারণ শেষের দিকে ভিড় বেড়ে যায়। তখন টিকিট কাটা যেন কঠিন হয়ে পড়ে, বহু সময় লাগে।

বিকেলের দিকে অফিস থেকে ফিরে একটু হাতমুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে ধীরেসুস্থে বইমেলায় পৌঁছাই। বইমেলায় পৌঁছে কিন্তু এই ধীরতা বা সুস্থতা থাকে না। ভিড়, চেঁচামেচি, হইচই, হট্টগোল। বইমেলার মতো এত ভিড়, এত ধুলো কলকাতার আর কোনও মেলাতেই হয় না, শেয়ালদার রথের মেলাতেও নয়।

বইমেলায় আমি যে খুবই বই-টই কিনি তা নয়। কারণটা খুবই সরল, বইমেলায় যে কমিশনে বই বিক্রি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কমিশন আমি কলেজ স্ট্রিটে পাই।

তবু বইমেলায় যাই। বই কিনেও ফেলি। সেগুলো একটু আলাদা ধরনের বই। হয়তো সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

আমার বই কেনার ব্যাপারটা অবশ্য সৈয়দ মুজতবা আলি কথিত ভদ্রমহিলার মতো নয়। এই মহিলার কথা আমি নিজেও এর আগে লিখেছি, তবু এখানে তাঁকে আরেকবার স্মরণ করা হয়তো অন্যায় হবে না।

তবে এ যাত্রায় গল্পটা সংক্ষিপ্ত করে বলছি।

এক ভদ্রমহিলা একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, মানে যে রকম দোকানে মনিহারি, প্রসাধন দ্রব্য থেকে শুরু করে জামাকাপড়, ঘড়ি, কলম, বইখাতা ইত্যাদি সব জাতীয় জিনিসপত্রই পাওয়া যায়, তাঁর স্বামীর জন্মদিনের জন্য একটা উপহার কিনতে গিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা সিগারেট কেস দেখলেন, চপ্পল দেখলেন, নেকটাই দেখলেন, শার্ট, জরিদার পাঞ্জাবি সবই ঘুরে ঘুরে দেখলেন কিন্তু কিছুই তাঁর পছন্দ হল না। দোকানের মালিক দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ লক্ষ করেছিলেন, অবশেষে তিনি ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

যখন তিনি শুনলেন মহিলা তাঁর স্বামীর জন্য উপহার কিনতে এসেছেন, তিনি মহিলাকে বললেন, 'দাঁড়ান, আমি আপনাকে বেছে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে মহিলাকে রঙিন টেবিল ল্যাম্প, বেতের লাঠি, হাতির দাঁতের এলাচ রাখার বাক্স কত কী দেখালেন, কিন্তু মহিলা যা কিছুই দেখেন, বলেন, 'না ঠিক এই জিনিস আমার বরের একটা আছে।' দোকানি অবশেষে অপারগ হয়ে মহিলাকে বললেন, 'তা হলে বইয়ের সেকশনে যান, সেখান থেকে নতুন একটা বই নিয়ে যান।' এই পরামর্শ শুনে নির্বিকার ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'বই চলবে না, আমার বরের বইও আছে একটা।'

এই গল্পর সমান্তরাল আরেকটা গল্পও বিদ্যাবুদ্ধি নাকি জ্ঞানগম্যিতে লিখেছিলাম। প্রায় একই ব্যাপার, জন্মদিনের উপহার ও বই নিয়ে সেই গল্প।

ওই একই মহিলা একই দোকানে গিয়েছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এবার একটা বই কিনতে গিয়েছেন। দোকানের সেই মালিক ভদ্রমহিলাকে দেখে এগিয়ে এলেন এবং যখন শুনলেন ইনি এবার বই কিনতে এসেছেন, তাঁর প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড়, কোনও রকমে সামলে উঠে তিনি বললেন, 'সে কী, ম্যাডাম, আপনি না সেবার বললেন, আপনাদের একটা বই আছে। আরেকটা বই কী কাজে লাগবে?' ম্যাডাম বললেন, 'আমার জন্মদিনে আমার বর একটা টেবিল ল্যাম্প দিয়েছে। সেটা ব্যবহার করার জন্য আমার নিজের একটা বই চাই। আগের বইটা তো আমার বরের।'

বইমেলার, বইমেলার প্রকাশক, গ্রন্থকার এবং দোকানদারের ভাগ্য ভাল যে ওই ভদ্রমহিলা কিংবা আমার মতো খদ্দের বইমেলায় খুব বেশি যায় না।

বইমেলায় ধুলো ভরা কিংবা জলকাদা ভরা উঠোনে গাদাগাদি রুদ্ধশ্বাস ভিড়ে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় চিরদিনের পাঠক। সে নির্বিচারে বইয়ের পাতা ওলটায়, নির্বিকারভাবে বই কেনে কিংবা কেনে না, লোলুপ দৃষ্টিতে চাটে শো কেসের নতুন বইয়ের আহ্লাদি মলাট।

মোটা কাচ, স্টিলের ফ্রেম, গোল চশমা রিটায়ার্ড মাস্টারমশাই হুমড়ি খেয়ে পড়বেন শালোয়ার কামিজ পরিহিতা ও কলেজের কিশোরী পাঠিকার গায়ে; নবীন যুগের নবীন কবি মোটা আমলার নেকটাই ধরে ঝুলে পড়বে, বলবে, 'দাদা, একটা কবিতার বই।' গাঁজাভরা সিগারেট টেনে পৃথিবীর শেষ পাঠক বলবে, 'ধুৎ!' এই হল বইমেলা।

বইমেলা নিয়ে কয়েক বছর আগে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। মজার কথা এই যে কবিতাটির নাম ছিল 'প্রতিবাদের কবিতা' এবং ওই নামের একটি কাব্য সংকলনের জন্য কবিতাটি রচনা করেছিলাম। সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। কবিতাটি কঠিন নয়, আরেকবার নিবেদন করছি।

সে বছর বইমেলায়
ময়দানের শেষ প্রান্তের নিঃসঙ্গ বকুল গাছটির
ডালে ডালে পাতায় পাতায়
লাল নীল টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

বকুল গাছের সেটা মোটেই পছন্দ হয়নি।
এমনিই এত ভিড়, হট্টগোল
ধুলো আর ছেঁড়া কাগজ
এত ব্যর্থ পাঠক আর অসফল লেখক
এগুলো বকুল গাছ স্বভাবতই ভালবাসে না।

তারপর ওই লাল নীল আলো সবুজ পাতার মধ্যে
পুরো শীতকালটা
বকুলগাছ গম্ভীর হয়ে রইল।
এমনকী যেদিন গভীর রাতে গভীর হাওয়ায়
ভিক্টোরিয়ার চূড়ায় কৃষ্ণপরী
অনেকদিন পরে ডানা মেলে ধরল,
বকুল গাছ একবারের জন্যও
মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল না।

শুধু পরের ফাল্গুনে
ময়দানের শেষ প্রান্তের সবুজ ঘাস ছেয়ে গিয়েছিল
নিঃশব্দ প্রতিবাদের অনন্ত সাদা ফুলে।

* * *

এই গুরুগুরু গম্ভীর গম্ভীর নিবন্ধটি শেষ করার মুহূর্তে আমার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলি বইমেলা বিষয়ে।

একদিন বইমেলা ভাঙার পর বেরিয়ে আসছি। রাস্তায় ভিড়, লোকে লোকারণ্য, এমন সময় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা। কেমন যেন চেনা চেনা, কিন্তু কিছুতে মেলাতে পারলাম না।

ভদ্রমহিলাও আমাকে দেখেছেন, তিনি হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমার থতমত ভাব দেখে চমকে গিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি বোধহয় ভুল করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার এক বাচ্চার বাবা।'

ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম কিন্তু কিছু বলার আগেই তিনি ধুলো আর ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে মনে পড়ল অনেক দিন আগে প্রাইমারি ইস্কুলে আমার ছেলে একদা তাঁর ছাত্র ছিল।

এক সর্দারের গল্প (১)

না, এক কিস্তিতে সম্ভব হবে না। একাধিক কিস্তি লিখতেই হবে।

সর্দার মানে যা তা, যেমন তেমন সর্দার নয়, রীতিমতো সর্দার খুশবন্ত সিং। এই বিতর্কিত সাংবাদিক যতটা সম্ভব সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদনা অথবা মৌলিক চিন্তার জন্য বিখ্যাত তার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় তাঁর অসামান্য রসিকতার জন্য। উপহাস, পরিহাস, কটু বাক্য কখনও কিঞ্চিৎ শ্লীলতার সীমানা ছাড়িয়ে বহু বহুবার অসামান্য সব মন্তব্যের জন্মদাতা, রচনাকার সর্দার খুশবন্ত সিং।

সর্দার খুশবন্তের সব রসিকতাই যে তাঁর নিজস্ব তাও নয়। অবশ্য রসিকতার আবার নিজস্ব, পরস্ব কী, রসিকতা পাঁচজনের। মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো ভাগেযোগে উপভোগ করার।

খুশবন্ত সিংয়ের রসিকতাগুলো তিনভাগে ভাগ করা যায়, (এক) যেগুলো সর্দারজির নিজেরই চিন্তা বা রচনা, যদিও হলপ করে বলা কঠিন তবুও যেগুলো সম্ভবত তাঁর মৌলিক ভাবনা।

(দুই) যে রসিকতাগুলো সুপ্রচলিত অথবা পূর্বপ্রচলিত, যেগুলোকে, অনেকটা আমি যে রকম করে থাকি, নিজের কায়দায় নিজের ভঙ্গিতে নতুন ফ্রেমে উপস্থাপন করেছেন খুশবন্ত। তবে বলা বাহুল্য সর্দারজির উপস্থাপনার সঙ্গে আমার উপস্থাপনার কোনও তুলনা হয় না। আমি তাঁর কাছে নাবালক।

(তিন) শেষের ব্যাপারটাই সবচেয়ে সহজ কিন্তু সবচেয়ে ভাল এবং জনপ্রিয়। এই রসিকতাগুলো আর কিছুই না। নানা জায়গা থেকে নানা পাঠকপাঠিকা যা কিছু মজার গল্প তরল আখ্যান শুনেছেন সেগুলো খুশবন্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার থেকে বেছে হয়তো বা কিঞ্চিৎ সম্পাদনা করে প্রেরকের নাম উল্লেখ করে (অর্থাৎ ঋণ স্বীকার করে) তিনি সেগুলি ছাপিয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে সর্দার খুশবন্ত সিং তাঁর সুদীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের এইসব রসিকতাগুলো থেকে বেছে নিয়ে একটি জোকবুক বার করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুবই জনপ্রিয় হয়। এডিশনের পর এডিশনের পর এডিশন।

ফলে সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের আরও জোকবুক বেরিয়েছে। প্রথম বইটির এর মধ্যেই দশটি সংস্করণ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিও সমানই জনপ্রিয় হতে চলেছে। তারও পরে আরও খণ্ড বেরিয়েছে কি না আমি জানি না, তবে জানি সেগুলোও সমান জনপ্রিয় হবে।

* * *

সর্দার খুশবন্ত সিংহের মতো ঝলমল চরিত্র এবং তাঁর জোকবুকের মতো ঝলমল গ্রন্থ নিয়ে আমি আপাতত যে ভনিতা করলাম তা আমার মূর্খতারই পরিচায়ক।

সুতরাং আমি আর সময় নষ্ট না করে সরাসরি রসিকতায় যাই। খুশবন্তীয় রসিকতা।

আমি ইতিপূর্বে যে তিনধরনের রসিকতার উল্লেখ করেছি, এক সর্দারের গল্পের প্রথম কিস্তিতে সেই তিন জাতের আখ্যানই পেশ করছি পর্যায়ক্রমে।

খুশবন্ত সাহেবের নিজের গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। তবে আগেও বলেছি এবারেও বলি, রসিকতা গল্পে কোনটা যে কার নিজের গল্প কোনটাই বা অন্যের গল্প কেউ বলতে পারবে না দেবতারাও না।

যা হোক আমার এই প্রথম গল্পটায় খুশবন্ত সিংয়ের দুটো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।

প্রথমে বৈশিষ্ট্যটি অসাধারণ, সর্দার সাহেবের অধিকাংশ ঠাট্টা নিজেকে নিয়ে, নিজেদের নিয়ে, এ গল্পেও তাই এক সর্দার পরিবার নিয়ে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সেটা কিঞ্চিৎ গোলমেলে, একটু অশালীনতার দিকে ঝোঁক সর্দার সাহেবের, ব্যাপারটা আমার তেমন আসে না, নব যৌবনেই আসেনি আর এই পড়ন্ত যৌবনে? কিন্তু একটু রেখেঢেকে লিখতে (মানে অনুবাদ করতে) আপত্তি কী?

কী আছে, আগে লিখি তো তারপর বোঝা যাবে।

এক সর্দার পরিবারে নতুন বিয়ে হয়ে একটি বউ এসেছে। বউয়ের বর চার ভাইয়ের মধ্যে একজন। ভাসুর, দেওর, বর সব ভাই একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকে। একই সঙ্গে চাষবাস করে।

প্রতিদিন সকালে বাড়ির পুরুষেরা জমিতে যায় চাষের কাজে, তারপর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আসে। তখন সবাই একসঙ্গে খেতে বসে। নতুন বউ আর শাশুড়ি ওড়নায় মুখ ঢেকে তাদের খাবার দেয়।

বিয়ের দিন পনেরোর মাথায় নববধূ তার শাশুড়িকে খুব নরমভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ওই যে আপনার চার ছেলে একসঙ্গে চাষে যায়, একসঙ্গে চাষ থেকে ফেরে তারপর একসঙ্গে খেতে বসে ওর মধ্যে ঠিক কোনজন আমার বর?'

এই প্রশ্ন শুনে হেসে শাশুড়ি উত্তর দিলেন, 'বউরানি, তোমার মাত্র দুই হপ্তা বিয়ে হয়েছে, আমার বিয়ে হয়েছে আজ পঁচিশ বছর, এখন পর্যন্ত আমি আমার স্বামীকে তার ভাইদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারলাম না। জানতেই পারলাম না কে আমার স্বামী, কেই বা দেওর, কেই বা ভাসুর?'

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প।

এই গল্পগুলো পুরনো এবং প্রচলিত। সর্দার খুশবন্ত সিং নিজের মতো করে লিখেছেন। যেমন:

এক ধোপার গাধা অন্য একটা গাধার কাছে দুঃখ করছিল তার মালিক তাকে ভালভাবে খেতে দেয় না। তার থাকবার জায়গা নেই সে বৃষ্টিতে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতের ঠান্ডা হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপে। তার ওপরে মালিক তাকে দিয়ে ভারী ভারী বোঝা বওয়ায়, বোঝা টানতে না পারলে বেত দিয়ে মারে।

তার এই দুঃখের কাহিনী শুনে গাধা বন্ধুটি বলল, 'তুমি কেন পালিয়ে যাও না?'

ধোপার গাধাটি বলল, 'আমি পালাই না শুধু একটি লোভে। আমার একটি বড় আশা আছে। সেটা যে কোনও দিন পূরণ হতে পারে।'

গাধা বন্ধুটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী আশা? কী পূরণ হবে?'

ধোপার গাধা বলল, 'ধোপার একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে। ধোপা তাকেও খুব মারধোর করে, বেত মারতে মারতে বলে, একদিন তোর আমি কী করি দেখিস, তোকে আমি ওই গাধাটার সঙ্গে বিয়ে দেব। বদ মেয়ে!' একটু থেমে নিয়ে করুণ হাসি হেসে ধোপার গাধা বলল, 'আমি তো সেই আশাতেই সব কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছি।'

সর্বশেষে হল খুশবন্ত সিংকে পাঠকদের প্রেরিত রসিকতা। এগুলোর সংখ্যাই বেশি।

নয়াদিল্লির জে পি সিং কাকা নামে এক ভদ্রলোক এই রসিকতাটি খুশবন্তকে পাঠিয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসায় স্ত্রী স্বামীকে প্রশ্ন করল, 'কী হল আজ এত তাড়াতাড়ি এলে?'

স্বামী অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'কী বলব, অফিসের বড়সাহেব আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, জাহান্নমে যাও। কী আর করব, বাড়ি চলে এলাম।'

এক সর্দারের গল্প (২)

সর্দার খুশবন্ত সিং তাঁর জোকবুক আরম্ভ করেছেন যে রসিকতাটা দিয়ে সেটি তাঁর নিজস্ব নয়, এক সর্দারণী তাঁকে সেটা প্রেরণ করেছেন।

গল্পটি এক দাড়িওলা বাঙালি ভদ্রলোক এবং এক সর্দারজিকে নিয়ে।

যেমন হয় এইসব গল্পে, এই দু'জনের মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলছিল, বাদানুবাদের বিষয় আর কিছু নয়, বাঙালি না পাঞ্জাবি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কারা বেশি আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ কলহকোলাহলের পর দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে একেকজন তাঁর জাতির একজন করে শহিদের নাম করবেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর গাল থেকে একটা দাড়ি উপড়িয়ে নেবেন।

শুরু হল ভয়ানক দাড়ি ছেঁড়া লড়াই। দাড়িওয়ালা বাঙালি ভদ্রলোকটি প্রথমেই 'ক্ষুদিরাম' বলে সর্দারজির গাল থেকে একটা দাড়ি ছিঁড়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজি 'ভকত সিং' বলে বাঙালি ভদ্রলোকের একটি দাড়ি উৎপাটন করলেন।

ভালই চলছিল, হঠাৎ বাঙালি ভদ্রলোকের কী মতিভ্রম হল। এক নিশ্বাসে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' বলে একটানে সর্দারজির তিনটে দাড়ি তুলে ফেললেন। এবং এখানেই হল বাঙালি ভদ্রলোকের প্রকৃত সর্বনাশ। ক্ষিপ্ত সর্দারজি হাতের বিশাল থাবায় বাঙালি ভদ্রলোকের গালের সমস্ত দাড়ি একসঙ্গে ধরে 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' বলে একটানে যথাসাধ্য উপড়িয়ে ফেললেন।

সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। সেদিনের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

খুশবন্ত সিং তাঁর দ্বিতীয় গল্পটি পেয়েছেন নয়াদিল্লির প্রেম খান্না নামে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

গল্পটি বেশ জটিল।

এক গোহাটায় এক চাষি গিয়েছেন একটা ভাল গোরু কিনতে।

গোরুর পাইকার একটা নধরকান্তি যুবতী গাভী দেখিয়ে বলল, 'এর দাম পাঁচ হাজার টাকা। সদ্য যুবতী। বছরে একবার বিয়োবে, দৈনিক দশ কিলো করে ঘন মিষ্টি দুধ দেবে।'

দামটা একটু বেশি মনে হওয়ায় গোরুর ক্রেতা চাষি ভদ্রলোক পাশের অন্য একটা গোরু দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এটার দাম কত হবে?'

বিক্রেতা বললেন, 'এর দাম হবে দশ হাজার। এর বেশ বয়স হয়েছে, বিগত যৌবনাই বলা যায়। এখনও পর্যন্ত কোনও বাচ্চা দেয়নি। দুধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

এই শুনে স্তম্ভিত হয়ে ক্রেতা বললেন, 'আপনি কী ধরনের গোরুর পাইকার। একটা বাঁজা, বুড়ি গোরুর ডবল দাম চাইছেন।'

এই শুনে পাইকার গম্ভীর হয়ে বলল, 'দাদা আপনার কাছে না থাকুক আমার কাছে চরিত্রের তো একটা দাম আছে।'

খুশবন্ত সাহেবের জোকবুকে চরিত্রঘটিত গল্পের ছড়াছড়ি, আসলে সর্দারজির ঝোঁকটা একটু ওই দিকে।

এই বইতেই দুই ব্যক্তির পরলোকে দেখা হওয়ার গল্প। পৃথিবীতে থাকার সময়ে দু'জনের মধ্যে স্বল্প পরিচয় ছিল।

এখন ওপারে দেখা হতে একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, আপনি কীভাবে মারা গেলেন?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'আমি মারা গিয়েছিলাম অতিরিক্ত ঠান্ডায় জমে। আপনি কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন?'

প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'সে বড় দুঃখের গল্প। একদিন সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আমার মনে হল আমার স্ত্রী যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর ঘরে যেন অন্য কোনও লোক রয়েছে। তারপর আমি তো ঘরে ঢুকে ঘরের আনাচেকানাচে, বারান্দায়, সিঁড়ির নীচে আলমারির পেছনে সব জায়গায় খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কাউকে খুঁজে পেলাম না। তখন আমার মনটা খুব ভেঙে গেল। ছিঃ, ছিঃ, আমি আমার স্ত্রীকে চরিত্রহীনা ভেবেছি। মনের দুঃখে হার্টফেল করে মারা গেলাম আমি।'

এই শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'দাদা, একটু বুদ্ধি করে আপনাদের বড় রেফ্রিজারেটারটা যদি একটু খুলে দেখতেন, আমিও ঠান্ডায় জমে মারা যেতাম না, আপনিও হার্টফেল করে মারা পড়তেন না।'

চরিত্রের পরে শিক্ষা।

সর্দার খুশবন্ত সিংহের পরবর্তী গল্পটি, তাঁর নিজস্ব, এটা কেউ তাঁকে ধার দেয়নি, তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত হাসিম আলি একদা এক বক্তৃতায় এই গল্পটি বলেছিলেন।

এ গল্পটিও পরলোকের। মৃত্যুর পরে এক উপাচার্য পরলোকে পৌঁছতে চিত্রগুপ্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পৃথিবীতে কী করতেন?'

উপাচার্য বললেন, 'মৃত্যুর আগে অল্প কিছুকাল আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলাম। তার আগে...'

উপাচার্যের কথা শেষ না হতে চিত্রগুপ্ত বললেন, 'তার আগে আর জেনে দরকার নেই। আপনার যথেষ্ট পাপভোগ হয়ে গেছে, আপনি এই সামনের দরজা দিয়ে স্বর্গে চলে যান।'

পিছনেই অন্য এক আগন্তুক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও চিত্রগুপ্তের নির্দেশ শুনে সামনের উপাচার্য ভদ্রলোকের পিছু পিছু স্বর্গের দরজার দিকে রওনা হলেন।

চিত্রগুপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বাধা দিয়ে বললেন, 'একী আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'আমিও উপাচার্য ছিলাম। একবার নয়, পর পর তিনবার তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

চিত্রগুপ্ত মৃদু হেসে বললেন, 'তা হলে তো আপনার নরক ভোগ অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনি পিছনের দরজা দিয়ে নরকে চলে যান।'

অবশেষে আরেকটি বিশুদ্ধ খুশবন্তীয় গল্প।

ইস্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাসে একটি ছোট বাচ্চা ভরতি হতে এসেছে, তার বড় ভাই শিবু ওই ইস্কুলেই ক্লাস টেনে পড়ে। বড় ছেলেটি এই বাচ্চাটিকে নিজের ভাই বলে হেডমাস্টারের কাছে ভরতি করাতে এসেছে। কিন্তু বাচ্চাটিকে যখন হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিবু তোমার কী হয়?' সে বলল, 'দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

হেডমাস্টার মশায় অবাক হয়ে বললেন, 'শিবু তুমি বলছ আপন ভাই, আর এ বলছে দূর সম্পর্ক।'

শিবু বলল, 'স্যার, কারণ আছে। আমরা হলাম দশ ভাই বোন। আমি সবচেয়ে বড়, এ সবচেয়ে ছোট, আমাদের মধ্যে আর আট ভাইবোন আছে। তাই ও বলছে দূর সম্পর্ক।'

এক সর্দারের গল্প (৩)

অনুমান করি সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের গল্পে এখনও পাঠক-পাঠিকা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি এবং সেই ভরসাতেই আরেকটি কিস্তিতে হাত দিচ্ছি। এবং কথা দিচ্ছি, সর্দার কথামালার এটাই শেষ কিস্তি।

শেষ কিস্তির প্রথম আখ্যানটি এক সর্দারজি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে।

এই ট্যাক্সিওলা সর্দারজি আর খুশবন্ত সিং একই গ্রামের লোক। মাঝে মাঝে দিল্লির রাজপথে দু'জনের দেখা হয়, উভয়ে উভয়ের কুশল বিনিময় করেন।

একদিন ট্যাক্সি ড্রাইভার সর্দারজি খুশবন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন তুমি কোথায় কাজ করছ? কত মাইনে পাচ্ছ?' সর্দার খুশবন্ত সিং তখন বিড়লা বাড়ির পত্রিকা হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক, খুশবন্ত এত কথা না বলে সংক্ষেপে বললেন, 'আমি এখন বিড়লাদের ওখানে কাজ করি।' বলা বাহুল্য মাইনের কথাটা উচ্চবাচ্য করলেন না।

কিন্তু ট্যাক্সিওলা সর্দারজি বিড়লাদের কথা শুনে বললেন, 'আমি যদি বিড়লা হতাম তা হলে বিড়লাদের চেয়েও বড়লোক হতাম।'

খুশবন্ত সিং এই কথা শুনে অবাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ভাবে?'

ট্যাক্সির সর্দারজি বললেন, 'বিড়লাদের আয় তো আমার থাকতই, সেই সঙ্গে ট্যাক্সি চালিয়ে আরও কিছু আয় বাড়াতাম। তার মানে বিড়লাদের চেয়ে বড়লোক হতাম।'

জ্ঞানপিপাসা বিষয়ে খুশবন্ত সিংয়ের গল্পটি পুরনো, বেশ পুরনো কিন্তু চমৎকার।

একটি বালক, স্কুলের মাঝারি ক্লাসের ছাত্র, তার বাবার কাছে জানতে চাইছে, 'বাবা, এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম যারা উঠেছিল তাদের নামগুলো কী?'

বাবা দু'-চারবার 'তেনজি, তেনজি' করে তারপর বললেন, 'পুরো নামগুলো মনে পড়ছে না।'

ছেলে একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা পাঞ্জাবের পাঁচটা নদী যেন কী কী?'

বাবা এবারও আমতা আমতা করে বললেন, 'ভুলে গেছি, নর্মদা-টর্মদা এইসব কী যেন?'

ছেলেটির জিজ্ঞাসা এর পরেও থামেনি, এরপর সে জানতে চাইল, 'আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কী?' তারপরে, 'কোন কোন ভারতীয় আজ পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ পেয়েছে?' এবং তারও পরে 'কোন কোন ভারতীয় ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হয়েছে?'

দুঃখের বিষয়, এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদান বাবার পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে ছেলের মুখে অসন্তোষের ভাব দেখা দিল, তখন বাবা বললেন, 'কিন্তু তুমি থেমো না, তুমি জিজ্ঞাসা করে যাও, যদি জিজ্ঞাসা না করো, কী করে তুমি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে?'

এগুলি সাদামাটা গল্প। খুশবন্ত সাহেবের এইরকম আরেকটা সাদামাটা পুরনো গল্প হল তাঁর এক স্বজাতির আত্মহত্যা করা নিয়ে।

এক সর্দারজি এক হাতে এক বোতল পানীয় এবং অন্য হাতে খাবার ভরতি টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে রেললাইনের ওপর বসে আছেন।

তাই দেখে রেললাইনের পাশে পথচারী এক ভদ্রলোক বললেন, 'সর্দারজি, আপনি ওভাবে রেললাইনের ওপর বসে থাকবেন না, যে কোনও সময়ে রেলগাড়ি এসে গেলে আপনি রেলে কাটা পড়ে মারা যাবেন।'

নিরাসক্ত কণ্ঠে সর্দারজি বললেন, 'আমি মারা যেতেই চাই। আমি আত্মহত্যা করতেই এসেছি।'

বিস্মিত পথচারী তখন বললেন, 'তা হলে আপনার সঙ্গে এত সব খাবার-দাবার, পানীয় কী জন্য?'

সর্দারজি বললেন, 'দেখ আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি ঠিকই কিন্তু অনাহারে মরার আমার কোনও ইচ্ছে নেই।

একথা শোনার পর পথচারীর মুখে জিজ্ঞাসাচিহ্ন দেখে সর্দারজি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'দেখ রেলগাড়ি কখন আসে না আসে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। হয়তো দেড়দিন, দু'দিন এলই না। শেষে কি আত্মহত্যা করতে এসে উপোস করে মারা যাব নাকি। তাই খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

গল্পটা লেখার পর মনে হচ্ছে, গল্পটা আগেও একবার আমি লিখেছিলাম। যা হোক, এবার খুশবন্ত সিং মারফত আরেকবার হল। গল্পটা মূলে আমারও নয়। খুশবন্ত সাহেবেরও নয়; সেই অজ্ঞাত পরিচয় সুরসিক ব্যক্তিটি যিনি ভারতীয় রেল সম্পর্কে এই চমৎকার পরিহাসটি করেছিলেন, এই সুযোগে তাঁকে নমস্কার জানাই।

এসব গল্প তো আছেই কিন্তু খুশবন্ত সিংয়ের বাহাদুরি হল রাজনৈতিক টিপ্পনিতে।

জোকবুকের একটা গল্পে আছে, ইংলন্ডের রানি এলিজাবেথকে এক ধুরন্ধর ব্রিটিশ সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা রানিমা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাহেব আততায়ীর গুলিতে নিহত না হয়ে যদি সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ নিহত হতেন, তা হলে কী হত?'

হার ম্যাজেস্টি ইংলন্ডের মহামান্যা রাজ্ঞী সাংবাদিকদের ধারেকাছে সচরাচর ঘেঁষেন না। নিয়ম নেই। কিন্তু সেই সময়টা রাজবাড়ির কয়েকটা মুখরোচক খবর নিয়ে কোনও কোনও সংবাদপত্র কিছু কিছু কেচ্ছা করছিল, যা রাজতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়।

এমতাবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রানিমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'খবরের কাগজের লোকদের চটাবেন না, একটু হাসিখুশি রাখবেন।'

সুতরাং রানিমা এই সাংবাদিককে ঠোঁট উলটিয়ে, ভুরু কুঁচকিয়ে বিদায় না দিয়ে তার প্রশ্নটি একবার মনোযোগ দিয়ে ভেবে নিয়ে বললেন, 'তুমি বলছ কেনেডি মারা না গিয়ে ক্রুশ্চেভ মারা গেলে কী হত?'

সাংবাদিকটি উৎসাহ করে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

রানিমা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'দেখ, আমার মনে হয় ওনাসিস মিসেস ক্রুশ্চেভকে বিয়ে করতেন না।'

সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের আর একটি অনুরূপ রাজনৈতিক রসিকতা দিয়ে সর্দার কথামালা শেষ করছি।

রসিকতাটি আসলে একটি প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল কোথায়?

উত্তর: দু' দেশের কোথাওই রুবল দিয়ে কিছু কেনা যায় না।

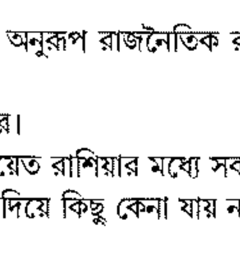

জল

জলই জীবন।

জলের কথা লিখব না, তা হতে পারে না।

ভাতের কথা যে খুব বেশি লিখেছি তা বোধহয় নয়। কিন্তু একটা কথা সত্যি যে আজ পর্যন্ত যা কিছু হালকা লেখা লিখেছি সমস্তই ভাতের জন্য। হয়তো সত্যিতর কথাটা হল ঠিক ভাত নয়, এটা ঘি-ভাতের জন্য। শিরায় মজ্জায় রক্তে, নাড়িতে পেশিতে ধমনীতে বহমান নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বাসনার এই হল প্রাপ্য।

এসব বাজে কথা আপাতত থাক। এবারের বিষয়বস্তু জল। জলের কথাই বলি।

কিন্তু জলভাতের জল ঠিক সেই জল নয় যে জলের কথা সপ্তদশ শতকের এক ইংরেজ ধর্ম বিশারদ টমাস কুলার বলেছিলেন, 'জলের মূল্য আমরা কখনওই বুঝতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না কুয়ো শুকিয়ে যায়।'

এই মহৎ মন্তব্যের আধুনিক ভাষান্তরকরণ হওয়া উচিত, জলের মূল্য তখনই বোঝা যায় যখন গলির মোড়ের নলকূপ ভেঙে যায় এবং সেই সঙ্গে নোটিশ বেরয় খবরের কাগজে 'টালা পাম্প আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকবে।'

আসল কথায় ফিরে আসি।

এই অনুচ্ছেদ শুধু তাঁদের জন্য যাঁরা ভাল কিংবা মাঝারি ব্যাকরণ জানেন।

বাংলায় আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি শব্দের অনেক সময় অনেক রকম মানে হয়। স্থাবর সংস্কৃতে কিংবা মন্থর প্রাকৃতে ও সুযোগ ছিল না।

'সর্বনাশ! না বুঝে এ কী লিখে ফেললাম। প্রাণাধিকা পাঠিকাঠাকুরানি, তোমার পড়ার পরে আজকের লেখার পাতা পুড়িয়ে কিংবা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো।

তোমার স্বামী বড় পণ্ডিত, এসব ছেলেখেলা যেন তাঁর নজরে না আসে।'

এতখানি সাবধানতা অবলম্বন করার পর ভয়ে ভয়ে দু'-একটা কথা বলি।

জলভাত অর্থাৎ জলের জন্য ভাত, জলের দ্বারা ভাত, যা জল তাই ভাত, জল থেকে ভাত এতসব, এসব কিছু নয় নিতান্তই জল ও ভাত, জলভাত। আলু পটল, রাম রহিম, শরৎ বঙ্কিম, রেখা অমিতাভর মতো সামান্য দ্বন্দ্ব সমাস।

সেই কতকাল আগে জল বিষয়ে মহামতি শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, খুব সম্ভব হেনরি ছয় (Henry VI) কিংবা ওই জাতের কোনও নাটকে, 'জল সেখানেই শান্তভাবে বয়ে যায় যেখানে নদী খুব গভীর।'

এই সামান্য জলভাতে অনিবার্য কারণেই ভাতের পরিমাণ কম জলের পরিমাণ বেশি। গরিব গৃহস্থের নুন আনতে যে পান্তা ফুরোয় সে পান্তায় ভাতের বদলে জলই বেশি থাকে।

বেশি জলের একটা গল্প মনে পড়ছে।

সাবেকি গল্প। যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, তাঁদের ধন্যবাদ। যাঁরা জানেন না বা ভুলে গিয়েছেন কিংবা ভুলে গিয়েছিলেন শুধু তাঁদের জন্য এই বেশি জলের গল্পটা।

মামা ভাগ্নে একসঙ্গে মদ খেত। সত্যের খাতিরে লেখা উচিত মামার কাছেই ভাগ্নে মদ খাওয়া শিখেছিল।

কিন্তু মামাবাবু ছিলেন সেয়ানা মাতাল, সেই যাকে গ্রামেগঞ্জে বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। তিনি পেগ (পানীয়ের ইউনিট) মেপে প্রয়োজনমতো জল সোডা বরফ মিশিয়ে ধীরে ধীরে তারিয়ে তারিয়ে চুক চুক করে নিজের মদটুকু খেতেন।

ভাগিনেয় বাবাজি প্রথম প্রথম মামাবাবুর হাতে খড়ি পেয়ে মামাবাবুর আদর্শই অনুসরণ করেছিল।

কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিন, কয়েক মাস। ধীরে ধীরে তার স্বরূপ প্রকাশিত হল।

এবং তার সেই সুপ্রকাশিত স্বরূপ দেখে মামাবাবু বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভাগ্নে তখন আর বরফ, জল কিংবা সোডার ধার ধারে না।

যাকে সাদা বাংলায় বলে কাঁচা, ইংরেজিতে বলে নিট কিংবা 'স্ট্রেইট ফ্রম দি বটল', (Straight from the bottle), ভাগ্নের যাত্রা সেই পথে।

কিন্তু একই গেলাসের ইয়ার হলেও হাজার হলেও মামা হাজার হলেও ভাগ্নে। আপন মায়ের পেটের বোনের আপন ছেলে তার এই পরিণতি মামার পক্ষে মেনে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

যখন ভাগ্নে সামনে বসে পান করে, মামা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন গেলাসে পানীয়ের প্রবেশ মাত্র তার মধ্যে প্রচুর সাদাজল ঢেলে দেওয়ার। নেহাতই কর্পোরেশনের কলের জল কিংবা গলির মোড়ের টিউবওয়েলের জল। মুখ বিকৃত করে, দাঁতে দাঁত ঘষে ভাগনে মামার প্রতি সামাজিক সম্মান প্রদর্শন করার সূত্রে সেই জলো পানীয় চোখ এবং নাক বুজে খেয়ে নেয়। শুকনো জিভটাকেও একটু গুটিয়ে রাখে। তার জিভে জলো পানীয়ের স্বাদ লাগে না। এইভাবে দিনকাল, মামা-ভাগিনেয়ের মদ্যপান ভালই চলছিল। একদিন, শুধু একদিন গোলমাল হল।

ভাগিনেয় বাবাজি সহসা বুকে বিস্তর ব্যথা নিয়ে একদিন গভীর রাতে নিজের বাড়ির এবং প্রতিবেশীদের নিদ্রাভঙ্গ করে অ্যামবুলেন্সে উঠে হাসপাতাল যাত্রা করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে খবর পেয়ে মামাবাবু হাসপাতালে ভাগ্নেকে দেখতে গেলেন।

এর পরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত, কিঞ্চিৎ আলাপ।

মামা: তোর কী হয়েছে?

ভাগ্নে: বুকে জল জমে গেছে।

মামা: কী করে বুকে জল জমল?

ভাগ্নে: তুমি সবচেয়ে ভাল জান।

মামা: আমি সবচেয়ে ভাল জানি?

ভাগ্নে: হ্যাঁ। তুমি জান। তুমি সবচেয়ে ভাল জান। তুমি বার বার আমার ড্রিঙ্কে জল মেশাতে। বলতে, বলতে জল বেশি করে নিতে।

মামা: কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

ভাগ্নে: কী আর হয়েছে। বুকে জল জমে গেছে। এতদিন যা কিছু মদ খেয়েছিলাম সব বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে, শুধু তুমি যে জলটুকু দিয়েছিলে সবটা বুকে বসে গেছে।

একটু আগের জলের গল্পটা বড় নির্জলা। এতক্ষণ পরে একটা জলো জলো গল্প বলি। জলের গল্প তারপরেই শেষ।

গল্পটা অকল্পনীয়। সে কবিও নেই সে দারোগাও নেই।

দারোগা সাহেব মাতাল কবিকে ফুটপাত থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে পরপর দুটি বাটিতে একটায় নিতান্ত পরিচ্ছন্ন গভীর নলকূপের জল অন্যটিতে ভাল রাম ছয় আউন্স রেখে কবিকে বললেন, 'একটা গোরুকে যদি বলি তা হলে সে কোনটা খাবে!' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে দারোগা সাহেব বললেন, 'গোরুটা রাম ছোঁবে না, জলটা খাবে।'

কবি মাথা তুলে বললেন, 'সেই জন্যই সে গোরু. আর সেইজন্যই আমি কবি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন

জলভাত একেক সময় খুব হালকা আর তরল হয়ে যাচ্ছে। জলের পরিমাণ বেশি হলে জলো হবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবু এবার আমরা একটু রাস্তা বদল করছি, এবার আমাদের পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা।

সংস্কৃত সাহিত্যের টীকাকারেরা বলেছিলেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। একালের অবিস্মরণীয় লেখক, রামকৃষ্ণ জীবনীকার স্বর্গত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'উপমা রামকৃষ্ণস্য।'

সরাসরি রামকৃষ্ণদেবের দু'-একটা চিরচেনা সরস গল্প দিয়ে শুরু করি।

মায়াকে যদি চিনতে পার আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল।

যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বললে, 'আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে।' তখন সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরের গল্পটি আরও চমকপ্রদ।

ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে বেচে। তারা কতদিক সামলে কাজ করে।

ঢেঁকির পাট পড়ছে। এক হাতে ধানগুলি *ঠেলে* দিচ্ছে। আর এক হাতে ছেলেকে কোলে কোরে মাই দিচ্ছে।

আবার খদ্দের এসেছে। ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলছে, তা হলে তুমি যে কয় পয়সা ধার আছে, সে কয় পয়সা দিয়ে যেয়ো আর জিনিস নিয়ে যেয়ো।

ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে, ধান *ঠেলে* দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা একসঙ্গে করছে।

কিন্তু পনেরো আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে পাছে হাতে পড়ে যায়।

আর বাকি এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া, খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া।

না হলে সর্বনাশ।

ঢেঁকির পাটে হাত পড়ে যাবে।

শুধু উপমা বা গল্প নয়, কথনভঙ্গি, বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা সেখানেও রামকৃষ্ণ অতুলনীয়, বিশ্বের সেরা কথাসাহিত্যিক রামকৃষ্ণের কাছে শিখে নিতে পারেন কী করে কী ভাবে কীসের কথা বলতে হয়। কী ভাবে বললে লোকে বুঝবে, শুধু বুঝবে তাই নয় কথাটা লোকের হৃদয়ঙ্গম হবে।

একাধিক সংক্ষিপ্ত উদাহরণ হাতের কাছেই উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী শান্তরূপানন্দের 'উপদেশাবলী' পুস্তিকায় রয়েছে।

যেমন,

ক) যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে— গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হল। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

খ) যতক্ষণ না হাটে পৌঁছনো যায় ততক্ষণ দূর হতে শুধু হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছালে আর একরকম, তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে।

'আলু নাও।' 'পয়সা দাও।' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

গ) এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন— যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়— বুঝলে?

* * *

ঈশ্বর ব্যাপারটা আমি ভাল বুঝি না। অল্প বয়সে হালকা কবিতায় ঈশ্বরকে নিয়ে অল্পবিস্তর ঠাট্টা তামাশা করেছি, তবে সেও অনেকদিন আগের কথা।

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রামকৃষ্ণ কথায় ঈশ্বরকে উল্লেখ না করে উপায় নেই।

কিন্তু এ ঈশ্বর (রামকৃষ্ণের ঈশ্বর) সে ঈশ্বর নয়। এ ঈশ্বর পাশের বাড়ির মেয়ে, অকালমৃত বাল্যবন্ধু। ভালবাসার আত্মীয়।

দু'-একটা উদাহরণ অবান্তর হবে না।

প্রথম উদাহরণে ঈশ্বর বা ভগবান বড়লোকের মেয়ে।

রামকৃষ্ণ বলেছেন,

'চিকের ভেতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না।

ভগবান ঠিক সেই রূপে বিরাজ করছেন।'

অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না তেমনি মনস্থির না হলে তাতে ভগবানেরও প্রকাশ হয় না।'

এই সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক, তবুও রামকৃষ্ণের একটা অবিস্মরণীয় নির্দেশ আবার স্মরণ করছি।

'সংসারে নষ্ট মেয়ের মতো থাকবে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।'

শুধু রামকৃষ্ণের উপমাই পারে ঈশ্বরকে উপপতির সঙ্গে তুলনা করতে।

অতঃপর রামকৃষ্ণ কথিত একটি গুরুশিষ্য সংবাদ উপস্থাপন করি একটু কাটছাঁট করে কথিকার আকারে—

শিষ্য: কেমন করে ভগবানকে পাব?

গুরু: আমার সঙ্গে এসো।

গুরু শিষ্যকে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন এবং খানিকটা পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন।

গুরু: তোমার জলের ভেতর কেমন হয়েছিল?

শিষ্য: প্রাণ আটুবাটু করছিল— যেন প্রাণ যায়।

গুরু: দেখ, ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ এ রকম আটুবাটু করে তবেই তুমি তাকে লাভ করবে।

কথিকার পরে রামকৃষ্ণের একটা চমৎকার গল্প বলি, প্রায় হুবহু স্বামী শান্তরূপানন্দের ভাষায়।

একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল। কুটুমবাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কী কী জিনিস লেখা ছিল।

জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন।

অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নেই।

কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কী লেখা আছে।

লেখা এই, 'পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে। একখানা কাপড় পাঠাইবে,...' আরও কত কী। তখন

আর চিঠির দরকার নেই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরলেন।

চিঠির দরকার কতক্ষণ?

যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

গাধা

সেদিন কে যেন আমাকে বললেন, 'আপনি কখনও গাধাকে নিয়ে কিছু লেখেননি।'

মহামতি ক্লিন্টনের ভারত সফরকালে আগ্রার গাধারা ক্লিন্টন সাহেবের তাজমহল দর্শনের সময় স্থানীয় প্রশাসনকে খুব হয়রানি করেছিল। সেই সময় একবার গাধা নিয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু।

ক্লিন্টন সফরের আগে অন্যান্য শহরের মতো আগ্রাতেও ভিখিরি, ভবঘুরে, অটো, ঝুপড়ি ইত্যাদি উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এই সঙ্গে শহরের সব গাধাও আগ্রার বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

যাঁরাই আগ্রায় গেছেন, লক্ষ করেছেন আগ্রার রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে গাধা। গাধার জন্যে ট্রাফিক আটকিয়ে যাচ্ছে, বাজারে ঢোকা যাচ্ছে না। এমনকী অফিস-কাছারির ঘরে বারান্দায় গাধা গটগট করে হাঁটছে।

ক্লিন্টন সফরের সময় সাময়িকভাবে সেই গাধাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল আগ্রা নগরী থেকে। কিন্তু প্রশাসনের শুধু হয়রানি হয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি। শহর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাধাকুলকে। কিন্তু যেদিন ক্লিন্টন তাজদর্শনে আগ্রা এলেন, সেদিনই দেখা গেল শহরে ঢোকার বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে কিলবিল করে ফিরে আসছে বিতাড়িত গর্দভেরা। এত গাধা দেখে মাননীয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিচলিত বোধ করেছিলেন কিনা, তা অবশ্য বলা কঠিন।

তা, ক্লাবের নৈশ আড্ডায় বারান্দায় বসে যখন গাধা নিয়ে এই সব আলোচনা হচ্ছিল, আমাকে আচমকা একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে গাধা নিয়ে আমি কখনও নাকি কিছু লিখিনি।

এ অনুযোগ অবশ্য সত্যি নয়। গাধা সম্পর্কে ইতস্তত আমি বেশ কয়েকবার লিখেছি। এমন কি 'বভ্রুবাহন' নামক একটি গাধার গল্পও একদা লিখেছিলাম। তবে মোট অর্থে গাধা বা গর্দভ শীর্ষক কোনও রচনা আমি এর আগে লিখিনি।

কিন্তু নৈশকালীন এ ধরনের তরল আড্ডায় এসব সাফাই মোটেই গ্রাহ্য হয় না।

তাই আমি রহস্য করে বললাম, 'গাধা নিয়ে কিছু লেখা তো কঠিন ব্যাপার নয়। একটা আয়না সামনে নিয়ে বসলে আমি তরতর করে লিখে যেতে পারব।'

ব্যাপারটা সেদিন ওখানেই মিটে গেল, কিন্তু গাধার ভাবনা আমার মাথায় ঢুকে গেল।

গাধা বিষয়ে আমি কিছু কম জানি না। ভেবেচিন্তে চেষ্টা করলে অনায়াসে একগ্রন্থ 'গাধাসিরিজ' লিখে ফেলতে পারি।

প্রথমেই সেই বহুপরিচিত গোলমেলে গল্পটি দিয়ে শুরু করি।

স্বামী-স্ত্রী এবং আট-দশ বছরের একটি ছেলে, এই সুখী পরিবারটি বিহারের একটি স্বাস্থ্যকর

শহরে বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে গেছে। দুঃখের বিষয়, এই প্রবাসেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি চলছে। আজ বিকেলে রীতিমতো দাম্পত্যকলহ হয়ে গেছে। স্ত্রী হোটেলের ঘর থেকে বেরননি। স্বামী ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সামনের একটা সবুজ ঘাসের মাঠ, চারদিক গাছ দিয়ে ঘেরা। ভদ্রলোক ছেলেকে নিয়ে মাঠের পাশে দাঁড়ালেন। মা-বাবার নৈমিত্তিক কলহে উদাসীন ছেলে বকবক করে কথা বলে যাচ্ছে, প্রশ্ন করছে।

সামনের মাঠে একটা গাধা চরছে। কলকাতার ছেলে, আগে গাধা দেখেনি, সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা এটা কী? বাবা বললেন, 'এটা একটা গাধা।' একটু পরে আর একটা গাধা এসে জুটল, ছেলের প্রশ্নে বাবা বললেন, 'এটা গাধার বউ।'

একথা শুনে ছেলের সরল প্রশ্ন, 'বাবা, গাধারা বিয়ে করে?' বাবা বিরসবদনে বললেন, 'হ্যাঁ। গাধারাই শুধু বিয়ে করে।'

গাধার কথা সহজে ফুরতে চায় না। প্রথমে ভেবেছিলাম, কী লিখব। তারপর লিখতে লিখতে এখন দেখছি, অনেক কথাই লেখার আছে।

তবে গাধা নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না। গাধা সিরিজের এটাই শেষ কিন্তু। পরে আবার কখনও না হয় লেখা যাবে।

গাধা নিয়ে আমার একটা তিক্ত বাল্যস্মৃতি আছে।

তখন আমি স্কুলের মাঝারি ক্লাসের ছাত্র, সেভেন এইট হবে। আমাদের সংস্কৃতের সেকেন্ড পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত রগচটা প্রকৃতির ছেলে, রীতিমতো মারকুটে স্বভাব। একদিন 'পঞ্চতন্ত্র' পড়াতে পড়াতেই বোধ হয় তিনি প্রশ্ন করলেন, 'রাসভ মানে কী?'

ক্লাসে কেউই পারল না মানেটা বলতে। তখন পণ্ডিতমশাই আদেশ করলেন, 'এই শ্রেণীকক্ষে যারা রাসভ রয়েছ, সবাই উঠে দাঁড়াও।'

কেউই উঠে দাঁড়াল না। আমার যে কী খেয়াল হল আমি প্রায় কিছু না বুঝে একাই উঠে দাঁড়ালাম। তখন কি আর জানতাম যে রাসভ মানে গাধা, তা হলে কি উঠে দাঁড়াই।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'তুমি দাঁড়ালে যে, তুমি কি রাসভ?'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তাই দাঁড়ালাম।'

পণ্ডিতমশাই রেগে গেলেন, 'তা হলে এই শ্রেণীকক্ষে তুমি আর আমি দু'জনে রাসভ! আমাদের চার চরণ কোথায়?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'স্যার, আমার দুই চরণ আর আপনার দুই চরণ, এই নিয়ে চার চরণ।'

এবার পণ্ডিতমশাই খেপে গেলেন, তালপাতার হাতপাখার ডাঁট দিয়ে আমাকে মারতে লাগলেন। অর্ধেক গর্দভত্বের রাগে তিনি দিশেহারা হয়ে পেটালেন।

গাধামির জন্যে জীবনে বহুবার বহুরকম মার খেয়েছি কিন্তু অমন পিটুনি আর খাইনি।

অবশেষে একটি সুপ্রাচীন আশাব্যঞ্জক কাহিনী দিয়ে গাধা বৃত্তান্তের ইতি টানছি। এক ধোপা তার গাধাকে কারণে অকারণে প্রচণ্ড পেটাত। গাধার বন্ধু ছিল প্রতিবেশীদের এক বলদ। সেই বলদ একদিন গাধাকে বলল, 'তুমি কী জন্যে পড়ে পড়ে মার খাও, পালিয়ে গেলেই পার।'

গাধা বলল, 'পালাতে চাইলেই তো পালাতে পারি, কিন্তু একটা আশায় বুক বেঁধে এখানে আছি।' গাধার সেই আশাব্যঞ্জক ব্যাপারটা এই রকম। ধোপার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে। ধোপা তাকে পাঠশালায় ভর্তি করেছে। কিন্তু সেই মেয়ের লেখাপড়ায় মোটেই মন নেই, সে সারাদিন খেলে বেড়ায়। গাধার মতোই মেয়েকেও পেটায়, আর বলে, 'লেখাপড়া না করলে তোকে ওই গাধার সঙ্গে বিয়ে দেব।' ব্যাপারটা বিবৃত করে, গলা নামিয়ে গাধা বন্ধু বলদকে বলল, 'মেয়েটার একদম লেখাপড়ায় মন নেই। আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল বলে।'

গাধারা ছিল, আছে, এবং থাকবে।

হাওয়াই

যথারীতি অন্যান্য বছরের মতো এবার আমার ছুটি, তিন মাসের ছুটি। আগস্ট থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত, এই তিনমাস।

সম্বৎসর আমার এই অন্তর্ধানের সময়, আমার জন্যে নয়, আপনারা কেউ কেউ গঙ্গারামের জন্যে অধীর হয়ে পড়েন, কেউ কেউ সম্পাদককে পত্রাঘাত করবেন।

কিন্তু লিখব তো আমি, আমি লেখা না পাঠালে সম্পাদক কী করবে?

এবছর সম্পাদক মহোদয়ের সঙ্গে আমার ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছে। ছুটিতে যেখানেই যাই, ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা করে ছোটখাটো 'কি খবর' তাঁকে পাঠাব। পাঠকেরা লক্ষ রাখুন, ভদ্রলোকের চুক্তি কতটা পূরণ করতে পারি, দেখুন।

অতঃপর মূল প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এবার আমাদের বিষয় 'হাওয়াই', মহাসাগরের কোলে মায়াদ্বীপ হাওয়াই। আগে স্বাধীন ছিল, উনিশশো উনষাট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পঞ্চাশতম রাজ্য।

সেই কবে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন,

'হাওয়াই দ্বীপে যাইনি,
দক্ষিণ সমুদ্রের কোনো দ্বীপপুঞ্জে...
...হে ইডি, হাইডি, হা-ই।...
...হে ইডি, হাইডি, হা-ই।...

সাম্রাজ্যবাদ এবং মেকি সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদময় এই কবিতাটি আমাদের যৌবনকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

কিন্তু সেজন্যে নয়, বিদেশ যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে 'কি খবর' লিখতে গিয়ে খেয়াল হল আমিও হাওয়াই দ্বীপে যাইনি। এবার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হচ্ছে না।

আমার যাত্রাসূচি ব্যাংকক-টোকিও হয়ে সানফ্রানসিসকো। টোকিও থেকে সানফ্রানসিসকো প্রায় দশ-বারো ঘণ্টা একটানা প্লেন-জার্নি। মধ্যপথে হাওয়াই দ্বীপ একটা স্টপওভার নিলে, সামান্য খরচে যেমন হাওয়াই ভ্রমণ হয়ে যায়, তেমনই শারীরিক স্বস্তির ব্যবস্থাও হয়। বিমানযাত্রা বড় জোর একটানা চার-পাঁচ ঘণ্টা পোষায়, তার চেয়ে বেশি হলে বিরক্তিকর, কষ্টকর এবং অস্বাস্থ্যকর। অথচ আমাদের দেশ থেকে বিলেত-আমেরিকা যেতে হলে বাঁয়ে অতলান্তিক কিংবা ডাইনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি না দিয়ে উপায় নেই। এবং সেই পাড়ি দেওয়ার সময় স্থানমাহাত্ম্য অনুযায়ী একটানা আট ঘণ্টা থেকে আঠারো ঘণ্টা বিমানে।

এসব অবশ্য অন্য কথা।

আসল কথাটা হল, হাওয়াই দ্বীপ যাব মনস্থ করেও যাচ্ছি না। সোজা টোকিও থেকে সানফ্রানসিসকো যাচ্ছি।

মাননীয় প্রবীণ সাংসদ শ্রীযুক্ত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় হাওয়াই দ্বীপে, বোধহয় হনলুলু বিমানবন্দরে মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের অসৌজন্যে যে রকম হেনস্থা হয়েছেন, তার বিস্তৃত বিবরণ খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।

ক্ষুব্ধ সোমনাথবাবু কারও কারও কাছে নাকি জানতে চেয়েছেন, 'আমি কি টেররিস্টের মতো দেখতে?'

এরপর আমার মতো সামান্য ভারতীয় কী করে হাওয়াই ভ্রমণে সাহস পাবে?

হাওয়াই যাত্রা আপাতত স্থগিত, সরাসরি সানফ্রানসিসকো গিয়ে দেখি সেখানে কেমন অভ্যর্থনা হয়।

হাওয়াই শব্দটির মধ্যে একটা ভারতীয় ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু সেজন্যে নয়, হাওয়াই শব্দটি আমাদের পরিচিত এবং ব্যবহৃত বহু বস্তুর নামকরণের কাজে লেগেছে। সম্ভবত হাওয়াই দ্বীপ থেকে আগত এই অর্থে হাওয়াই নামকরণ।

এককালে হাওয়াই গিটার খুব জনপ্রিয় ছিল। এই কলকাতা শহরে অনেক ঘরেই হাওয়াই গিটারের চর্চা হত, বড় বড় অনুষ্ঠানে, বেতারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে বাজত।

হাওয়াই শার্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ব্যাপার। পুরনো রীতির শার্ট এখন আবার ফিরে আসছে, কিন্তু হাওয়াই শার্টের কদর কমেনি।

হাওয়াই চটি আমি প্রথম দেখি উনিশশো ঊনষাট কিংবা ষাট সালে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মন্ত্রী স্বর্গীয় তরুণকান্তি ঘোষের পায়ে। বাটার তৈরি একটা হলুদ রঙের হাওয়াই, দাম পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা তখন বেশ দামি।

এসব ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার পরে এবার একটা ঐতিহাসিক কাহিনী বলি।

স্বাধীন হাওয়াইয়ের রানি কুইন লিলিয়োকালানিকে রানি ভিক্টোরিয়া বাকিংহাম প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে হাওয়াইয়ের রানি কুইন ভিক্টোরিয়াকে বলেন, 'আমার গায়ে ইংরেজের রক্ত রয়েছে।'

ভিক্টোরিয়া জানতে চান, 'সেটা কী ভাবে?'

কুইন লিলিয়োকালানি উত্তর দেন, 'আমার ঠাকুরদার বাবা ইংরেজ অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুককে খেয়েছিলেন।'

সুনন্দর জার্নাল

প্রথমে একটা ভুতের গল্প উদ্ধৃত করছি। সুনন্দর জার্নালের পরলোকগত যশস্বী লেখক এই গল্পের সূচনায় কবুল করেছেন, 'গল্পটি আপনারা সকলেই জানেন।...ভালো গল্প দু-বার শুনলেও ক্লান্তি আসে না। সুতরাং পুনরাবৃত্তি অমার্জনীয় হবে না ভরসা করছি।'

আমি নিজেও পুনরাবৃত্তি-এক্সপার্ট, কিন্তু আমার ভণিতা কখনও এত উচ্চমানের হয় না। তবে ভূতের গল্পের ক্ষেত্রে আমি হয়তো বলতাম, সব ভূতের গল্পই পুরনো, সুতরাং আমার কোনও দোষ নেই।

সে যা হোক, আগে গল্পটা হোক।

অতি সংক্ষিপ্ত এক ভৌতিক কাহিনী—

অন্ধকার রাত্রি। কোনও দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেন। তারই একটি কামরায় মুখোমুখি দু'জন যাত্রী। একজন নিবিষ্ট চিত্তে একটি পত্রিকা পড়ছেন, অপর জন নীরবে বসে আছেন।

যিনি পত্রিকা পাঠ করছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে চোখ তুললেন। সহযাত্রীদের উদ্দেশ করে বললেন, এতে একটা হানাবাড়ির বিবরণ আছে। স্রেফ গাঁজা। ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করি না।

দ্বিতীয় যাত্রী বললেন, ওঃ, করেন না নাকি? আর বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শুধু এইটুকুই গল্প অতঃপর প্রথম যাত্রীটির কী হয়েছিল গল্পে তা বলা নেই। সুনন্দর জার্নালের মতে, 'বলবার প্রয়োজন নেই।'

অনাবশ্যক মেদ বর্জিত, ছিপছিপে চাবুকের মতো ঝকমকে ছুরির মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য রচনা সুনন্দর জার্নাল।

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ দীর্ঘ আট বছর ধরে এই জার্নাল 'দেশ' পত্রিকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

লিখন কুশলতা এবং বিষয়বস্তুর সর্বজননীতায় অসামান্য জনপ্রিয় হয়েছিল সুনন্দর জার্নাল। ঠিক হালকা হাসির ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সরসতার কোনও অভাব ছিল না এই চলমান রচনায়।

মাত্র কয়েকটি নিবন্ধের নাম উল্লেখ করছি এই জার্নালের বিষয়-বৈচিত্র্য বোঝানোর জন্যে। পরপর পাঁচটি রচনার নাম হল, 'হরে মুরারে', 'আমার রাশিফল', 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', 'পাণ্ডুর বই' এবং 'জয় ঘটোৎকচ নাইট'। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে পরপর পাঁচ সপ্তাহে ১৯৬৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। পরপর এই রকম সব রকমারি বিষয়। ভাবা যায়।

মনে আছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাঙালি পাঠক উন্মুখ হয়ে থাকতেন সুনন্দর জার্নালের জন্যে। এমন অনেক পাঠককে জানতাম যিনি সপ্তাহান্তে 'দেশ' পত্রিকা হাতে পেয়ে প্রথমেই সুনন্দর জার্নালের পৃষ্ঠাটি খুলতেন।

পড়তে সবসুদ্ধ দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগত না। আটশো-নয়শো শব্দের মধ্যে সীমিত ঝরঝরে ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনা ও বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে দৈনন্দিন জীবন থেকে, খবরের কাগজের সংবাদ থেকে।

কিন্তু শুধু সংবাদভাষ্য নয়। সরস আলোচনা, তীক্ষ্ণ মন্তব্যে সুনন্দর জার্নাল ছিল একটি প্রাঞ্জল ধারাবাহিক, পৌনঃপুনিকতার একঘেয়েমি এই জার্নালকে স্পর্শ করেনি।

এই জার্নাল লিখতে লিখতেই উনিশশো সত্তর সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে ও পরে একাধিকবার সুনন্দর জার্নাল বই হয়ে বেরিয়েছে। যে কারণেই হোক সেসব বই পাঠকের কাছে পৌঁছয়নি, সেই বইগুলির প্রকাশ ছিল একটু দায়সারা গোছের।

অনেকদিন পরে এ বছর বইমেলায় 'সুনন্দর জার্নাল' মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয়ে রাতারাতি বেস্টসেলার হয়ে গেছে। আমি দেখেছি লোকে লাইন দিয়ে 'সুনন্দর জার্নাল' কিনছে। আসলে এখন পর্যন্ত পাঠক এই ধরনের রচনা পছন্দ করে, ব্যাপারটা আমি হাড়ে হাড়ে জানি।

অবশেষে ছোটমুখে একটা বড় কথা।

গঙ্গারাম আমার টেবিলে 'সুনন্দর জার্নাল' দেখে বললেন, 'সুনন্দের জার্নাল নয় কেন?' আমি বললাম, 'নারায়ণবাবু শুধু জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন না, কৃতবিদ্য অধ্যাপক ছিলেন, তাও বাংলা সাহিত্যের। তিনি কি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভুল লিখে গেছেন, কেউ কিছু বলেনি।' গঙ্গারাম বললেন, 'তা বলতে পারি না, কিন্তু ভেবে দেখুন রামের বনবাস, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সর্বত্র একাকার, এমনকী রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

আমি চুপ করে রইলাম। বাংলা বানান-ব্যাকরণের নিয়মকানুন সত্যিই ভাল জানি না।

সরস কলকাতা

এবার আমার বিদায় গাথা লেখার কথা। আমি কয়েকমাস থাকব না সেই কথা জানাতে চাই।

আগে বলতাম 'যাই'।

মা-ঠাকুরমা বলতেন, 'যাই বলতে নেই, বলো আসি।'

এখন আর মা-ঠাকুমাও নেই, যাওয়া-আসাও নেই। তবু যেতে হয়, আমি তো শক্তি কবি নই যে 'চলে যেতে পারি কিন্তু কেন যাব?'

বলছি। আপনারা অনুগ্রহ করে ছুটি মঞ্জুর করবেন।

আগের পর্বে সরস কবিতার কথা লিখেছি। তখন লক্ষ করেছিলাম গত শতকের সরস কবিতার একটা বড় অংশ কলকাতাকে বিষয় করে।

বিদায় বেলায় কয়েক গুচ্ছ সরস কলকাতা নিবেদন করছি।

প্রথমেই মহাগুরু কালীপ্রসন্ন সিংহকে স্মরণ করি—

'আজব শহর কলকেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি
মিথ্যে কথার কি কেতা ॥
হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে...'

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে কলকাতা নিয়ে অনেক রঙ্গ আছে। এককালে লোকের ঠোঁটে গুনগুন ফিরত,

'রানী মুদিনীর গলি,
সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে
পয়সা নেবে না।
ঠোঙা করে শালপাতাতে
চাট ফেরে হাতে হাতে,
তেল মাখা মটর ভাজা
মোলাম বেদানা।'

অমৃতলাল বসুর শনিবারের বারবেলা চমৎকার,

ঝি-রা ঘুমুলো পাড়া জুড়ালো
জল ফুরুল কলে।
বাজিয়ে শাঁক ডাকায় নাক,
সাজের বাতি জ্বলে।

সরস কলকাতায় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতমশায়কে স্মরণ না করা অনুচিত হবে। তাঁর 'কলকাতা কেবল ভুলে ভরা, সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে, বোকায় পড়ে ধরা।...ধাঁধায় পড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই হাটে-মাঠে, একদিন দেখতে যাব নিমের গাছটি নিমতলার ওই ঘাটে।'

অবশেষে মহাকবি হেমচন্দ্রকে স্মরণ করে আমি এবারের মতো বিষয়ান্তরে যাচ্ছি।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শহর বন্দনা লিখেছিলেন, 'হুতোম প্যাঁচার গান।'

এ হুতোম প্যাঁচা টেকচাঁদ ঠাকুর নন, মহাকবি হেমচন্দ্র স্বয়ং।

কলির শহর কলকাতা বিষয়ে হেমচন্দ্র লিখেছেন,

'কলির শহর কলকাতাটির
পায়ে নমস্কার
যার জাঁক জমকে ভাগীরথীর
দুধার গুলজার।...
তোর ভজন-গুণে ভোজন কালে
সব হাঁড়ি সমান,
ও তোর কেষ্ট ভজা, বেম্মাচাচা,
হিঁদু মুসলমান।'...

পুনশ্চ: চোখের জলে ভেজা, বেদনা বিধুর বাঙালি হৃদয়ের খুব কাছের একটা গান, বারবার আমাদের জীবন ছুঁয়ে যায়,

একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি
অভিরামের দীপান্তর মাগো
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।'

ক্ষুদিরাম-অভিরাম কোনও সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ নয়, লোকাতীত এক স্বপ্ন, স্বাধীনতার অন্বেষণ।

একটি অন্ধ ভিখিরি কেন যে খঞ্জনি বাজিয়ে আজ এই ভরসকালে তার সাদামাটা কণ্ঠে এই গানটি শুনিয়ে গেল।

আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। আপনারা একবার বিদায় দিন, ঘুরে আসি। মাস তিনেকের ছুটি চাই। একটু বাইরে যাব। পরে এসে আবার আপনাদের জিজ্ঞাসা করব, 'কি খবর?' অবশ্য সম্পাদক মহোদয় যদি অনুমোদন করেন।

সুতরাং এবারের মতো দীনবন্ধু মিত্রকে স্মরণ করে সালাম, নমস্কার, গুড বাই—

আল্লা আল্লা বলরে ভাই,

পালা করলাম শেষ।

সরস কবিতা

'ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল,
খুশির খুশি, মহাখুশি
সপত্নী কোন্দল।...
...তুমি আমার
পান্তাভাতে বেগুন পোড়া
ফ্যানসাভাতে ঘি
কেমন করে বলব বঁধু
তুমি আমার কি?'

কিংবা হঠাৎ যদি কখনও কথাচ্ছলে কিংবা কোনও কিছু লিখতে গিয়ে যদি মনে পড়ে,

'কামরূপেতে কাগ মরেছে
কাশীধামে হাহাকার।'

চট করে হয়তো বলতে পারব না লেখাটা কোথায় আছে, কোন বইতে আছে? আর সেই বইটাই বা কোথায়? এ রকম বই হাতের নাগালে সবসময়ে থাকে না।

তদুপরি এ সমস্যাও কখনও কখনও থাকে, 'এটা কার লেখা?' তা হলে তো খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের 'বাংলা আধুনিক সরস কবিতা' ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সম্প্রতি প্রয়াত দেবতোষ বসু পর্যন্ত কবির হাস্যময় কবিতা দুই মলাটের মধ্যে উপস্থিত করেছেন।

সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বেশ কয়েক বছর আগে দেবীপ্রসাদ 'রঙীন কবিতা' নামে অনুরূপ একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, সেই সংকলনে শুরুর কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। এখন আধুনিক হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আরম্ভ।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আরম্ভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দিয়ে। পরবর্তীকালে অনেকগুলি সংকলন অনিবার্যভাবে জীবনানন্দ দিয়ে, তারপরে নবীনতর কোনও প্রধান কবিকে দিয়ে আধুনিকতার সূত্রপাত করানো হয়েছে। আধুনিক বলতে কী বোঝায় সেই জটিল ও সমাধানহীন আলোচনায় যাব না।

আধুনিক-অনাধুনিক যাই হোক 'রঙিন কবিতা' নাম অনেক যথার্থ ছিল। এ ধরনের সংকলনে সব কবিতা সরস হয় না, তবে কাব্যগুণে রঙিন বলতে বাধা নেই। তবে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকেরা যাই বলুন, ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা বঙ্কিমকে আধুনিক বলতে আমাদের কারও কারও সংগত কারণেই বাধে।

সে যা হোক কচকচি করে লাভ নেই। বিশেষত হাতের সামনে যখন রয়েছে তিনশো পৃষ্ঠা হাস্যময় রঙিন কবিতা।

পাতা ওলটালেই চোখে পড়ছে,

ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধরে
বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

এ কবিতা চেনানোর দরকার নেই, এ তো ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। একটু দূরেই রয়েছে রামনারায়ণ তর্করত্নের সেই বিখ্যাত ফলার কাব্য—

'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু-চারি আদার কুচি।
কচুরি তাহাতে খান দুই।...

অদূরেই রয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,

'গা তোলো রে, নিশি অবসান, প্রাণ।
বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।'

সুপ্রভাতের এমন বর্ণনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কলমেই সম্ভব ছিল।

আরেকটু এগিয়ে এসে প্রায় আধুনিক কালে, মনীশ ঘটকের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি—

'তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্ধবী।'

এবং অন্নদাশঙ্কর,

'করেছি পণ, নেবো না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।'

আর উদ্ধৃতি দিয়ে লাভ নেই। সংগ্রহে রাখার মতো বই। দাম বেশি নয়, পঁচাশি টাকা।

সবশেষে একটা কথা, সরস কবিতাগুলি, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের মতো কালো বর্ডার দিয়ে ছাপা হয়েছে কেন, সেটা কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

পুনশ্চ:

এই সংকলনের গুরুত্ব আমার কাছে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি এই কারণে যে সদ্য পরলোকগত আমাদের অনুজ কবি দেবতোষ বসুর একটি অসামান্য সরস কবিতা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রচার বিমুখ, সুকবি দেবতোষের প্রতি বিভিন্ন সংকলনকারেরা অনেক সময়েই সুবিচার করেননি।

আরেকটা কথা। এ বইতে দেবতোষের জন্মসাল ভুল দেওয়া হয়েছে। সে আমার থেকে পরিষ্কার দু'বছরের ছোট। তার জন্মসাল ১৯৩৬ নয়, ১৯৩৮। তাকে তার কৈশোরকাল থেকেই চিনি বলে এ কথা হলফ করে বলতে পারি।

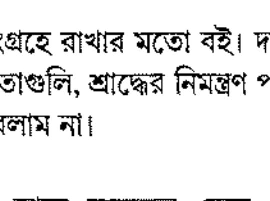

স্টুপিডেস্ট

স্টুপিড-স্টুপিডার-স্টুপিডেস্ট। যেমন গুড-বেটার-বেস্ট। কিন্তু স্টুপিডার স্টুপিডেস্ট ব্যাকরণগ্রাহ্য কিনা, অভিধানসম্মত কিনা সে আলোচনায় যেতে চাই না। আমার বিদ্যায় কুলোবে না। তবে এমনিতে একটা প্রচলিত প্রবচন জানি, আই অ্যাম স্টুপিড, ইউ আর স্টুপিডার, হি ইজ স্টুপিডেস্ট (I am stupid, you are stupider, he is stupidest.)। চলতি বাংলায় এর অর্থ করা যেতে পারে, আমি একটি গাধা, তুমি আমার চেয়ে বড় গাধা, আর সে হল সবচেয়ে বড় গাধা।

সে যা হোক, এবার বিদেশে গিয়ে নানারকম বই কেনার সুযোগ পেয়েছি।

এবার বিদেশে অধিকাংশ সময় ছিলাম মার্কিন দেশের পশ্চিম উপকূলে সানফ্রানসিসকো সন্নিহিত বিদ্যানগরী বার্কলেতে। বার্কলের বিখ্যাত পাবলিক লাইব্রেরির ছোট শহরের মধ্যে অনেকগুলি শাখা। প্রধান শাখাটির বৎসরাধিককাল ধরে সংস্কার চলছে।

তা এই বার্কলে পাবলিক লাইব্রেরির একটি দোকান আছে, শহরের প্রধান সড়ক টেলিগ্রাফ অ্যাভিনিউয়ের পিছন দিকে। কয়েকজন বুড়ি মেমসাহেব দোকানটি পরিচালনা করছেন। এই দোকানে বার্কলে গ্রন্থাগারের উদ্বৃত্ত এবং ব্যবহৃত বই নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। পেপারব্যাক বই যেগুলোর নতুন দাম পাঁচ-সাত এমনকি দশ ডলার, সেগুলো এক ডলার বা অর্ধেক ডলারে পাওয়া যায়।

এই দোকান থেকে ফরাসি লেখক সিমেনোর গোয়েন্দাকাহিনী, আগাথা ক্রিস্টি গ্রন্থাবলী, আর্থার কনান ডয়েলের শার্লক হোমস কাহিনীর প্রথম সংস্করণের পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপি ইত্যাদি রহস্য, সঙ্গে চার্লস ডিকেন্স, কাফকা, হেনরি মিলার, অ্যালেন গিনসবার্গ, এমনকী টলস্টয়, তুর্গেনিভ, গোগল-এর আমি অসংখ্য বই কিনেছি। অবশ্য সবগুলি পেপারব্যাক নয়, কোনও কোনওটার দাম এক ডলারের বেশি ছিল। সবচেয়ে বেশি দাম দিয়েছিলাম ওয়েবস্টারের একটা প্রায় নতুন ইংরেজি ডিক্সনারির—চার ডলার।

এই দোকানের অন্য একটা আকর্ষণ বিনামূল্যের বই। প্রতিদিনই শ'খানেক বই দরজার বাইরে র‍্যাকে সাজানো থাকত, যে যতগুলো চাও তুলে নিয়ে যাও।

যেসব বই পরিচালকরা মনে করতেন বিক্রয়যোগ্য নয় সেগুলো বাইরের বিনামূল্যের র‍্যাকে চালান করতেন। এই র‍্যাক থেকে আমি বেশ কয়েকটি মজার বই নিয়ে এসেছি। তারই একটি হল 'The 776 Stupidest things ever said'—মানে করা যেতে পারে, '৭৭৬টি বোকাতম উক্তি।'

বোকা উক্তি অর্থাৎ যাকে বলে স্লিপ অফ টাং (Slip of tongue), স্খলিত বচন।

এ ব্যাপারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি গল্প বলেছিলেন, সেই গল্পটি আগে বলে নিই।

এক বৃদ্ধ বিছানা থেকে নেমে হাঁটাচলা করতে পারতেন না। আত্মীয়েরা তাঁর বিছানায় বেডপ্যানের বন্দোবস্ত করেছিলেন। একদিন সকালে দেখা গেল তিনি বেডপ্যানে মূত্রত্যাগ না করে বিছানায় করেছেন। ভদ্রলোকের বড় ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, এটা কী করেছ?' জ্ঞান টনটনে বৃদ্ধ জিব কেটে বললেন, 'সরি, স্লিপ অফ টাং।'

তবে এই বইয়ের সাতশো ছিয়াত্তরটি গোলমেলে উক্তির সবগুলি স্লিপ অফ টাং নয়, অধিকাংশই বক্তার নিজস্ব ঘরানার বচন।

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ার সময় এসেছে।

হলিউডের চলচ্চিত্র-সম্রাট স্যামুয়েল গোল্ডউইন একবার বলেছিলেন, 'আজ সকালে আমার মাথায় একটা অসামান্য, বিরাট আইডিয়া এসেছিল, কিন্তু আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়নি।'

এই গোল্ডউইন সাহেবই অন্য একবার বলেছিলেন, 'আমাদের কমেডি সিনেমাগুলো মোটেই হাসবার ব্যাপার নয়।'

এই বইতেই রয়েছে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির পর অনৃত ভাষণ সম্পর্কে রিচার্ড নিক্সনের সেই অবিশ্বাস্য উক্তি, 'আমি মিথ্যে কথা মোটেই বলিনি। আমি যা বলেছিলাম, পরে অসত্য মনে হয়েছিল।'

এরই পাশাপাশি হোয়াইট হাউসের এক অনামী ফটোগ্রাফারের এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তিনি বলেছিলেন, 'ভাল খবর হল যুদ্ধ শেষ হয়েছে। খারাপ খবর হল আমরা হেরে গেছি।' বলা বাহুল্য, সেদিনই সায়গনের দখল নিয়েছিল কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনী।

বইটির নামেই প্রকাশ ৭৭৬টি উক্তি এতে উদ্ধৃত হয়েছে। এই উক্তিগুলি যে সমস্ত নামে জড়িত তার অধিকাংশই আমাদের অপরিচিত। কিন্তু তাঁরা মার্কিন সমাজের কেষ্টবিষ্টু। অবশেষে এমনই এক কেষ্টবিষ্টুকে উদ্ধৃত করছি—

'আমার মাথা এক্স-রে করা হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, আমার মাথায় কিছু নেই।'

অবনী, বাড়ি আছো?

অল্পায়ু বংশের সন্তান সত্যজিৎ রায় অবশ্য খুব দীর্ঘায়ু হননি। তবে অপরিণত বয়েসে অকালমৃত্যু নয়, তিনি সত্তর পেরিয়ে মারা গিয়েছিলেন। বংশে অকালমৃত্যু ছিল বলে সত্যজিৎ কখনও কখনও আয়ুর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁর অভিমত ছিল, আশি-নব্বইয়ের বেশি বাঁচা ভাল নয়।

আমাদের মাতামহী-পিতামহীরা বাল্যকালে চিবুক ধরে বলতেন, 'শতায়ু হও।' প্রবীণ পণ্ডিতমশায় সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বলতেন, 'নিরাপদে শতং জীবেৎ।'

এই নিরাপদে কথাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন শ্রাদ্ধের আমন্ত্রণপত্রে পরলোকগতের বিষয়ে কখনও কখনও উল্লেখ থাকে, 'সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে।'

রাজশেখর বসু, বাঙালির পরশুরাম সুস্থ শরীরে আশি পেরিয়ে পরলোক গমন করেছিলেন। তাঁর একটি অসামান্য গল্পে এক শতায়ু ব্যক্তির শতবার্ষিক জয়ন্তী-দিবসের কথা বলেছিলেন। এই শতায়ু ব্যক্তি অতীত ও বর্তমানকে ঘুলিয়ে ফেলেছেন। এমন হাস্যময় বেদনার গল্প বাংলাভাষায় খুব বেশি রচিত হয়নি।

শতায়ু হওয়া সোজা কথা নয়। আমি এখন যে বয়েসে এসে পৌঁছেছি, বাকি জীবন যদি এর অর্ধেক সময় বাঁচি তা হলে আমি শতজীবী হব।

পেছনদিকে তাকালে মনে হয় কিছুই নয়, মাত্র তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর। উনিশশো সাতষট্টি, আটষট্টি সন।

মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। পুরনো কালীঘাট বাড়ি। দোতলার ভাঙা বারান্দায় আমার ছেলে তাতাই টলমল হাঁটছে। ধুলিধূসর রাইটার্স বিল্ডিং-এর নগণ্য প্রান্তে আমার সামান্য স্থান। সন্ধ্যায় জড়াজড়ি আড্ডা, কবিতা, স্বপ্ন। বাড়ি গিয়ে ঘুমনোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তথা শক্তির তারস্বরে চিৎকার। 'টর্পেডো, টর্পেডো'—টর্পেডো মানে তারাপদ, শক্তির কাছে সেটাই আমার ডাকনাম।

আমি সাড়া দিতাম না। মিনতিকে বলতাম, 'চুপ।' সে-ও খুব চাপা স্বরে। কিন্তু শক্তিকে এড়ানো যেত না। সে আরেকটু ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দক্ষিণ দিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে এক বৃদ্ধকে ডাকত, 'অবনী, বাড়ি আছো? অবনী, অবনী বাড়ি আছো?' আমার প্রতিবেশী সেই অবনী ছিলেন আমার দূর সম্পর্কের দাদাশ্বশুর। তিনি শক্তির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতেন না। সেই অতিবৃদ্ধ বাড়ির সদর দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেন, দেখতে আসতেন কে তাঁকে এতকাল পরে নাম ধরে ডাকছে।

আমি দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। মাত্র গত সপ্তাহেই অবনীদাদুর সঙ্গে শক্তির পরিচয় হয়েছে তাতাইয়ের জন্মদিনে।

সেদিন রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে শক্তিকে দেখে অবনীদাদু বললেন, 'আপনি?'

শক্তি বলল, 'আরে বুড়ো, আজকেও বাড়ি আছো? আজ তোমার একশো বছরের জন্মদিন, সেটাও খেয়াল নেই?'

ঘুম-চোখে অবনী বললেন, 'একশো বছর? তা হবে।'

জুয়া (২)

আটলান্টিক সিটি। বাংলায় বলা যায় অতলান্তিক নগর। নামেই মালুম। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী একটি ঝলমলে, জমজমাট শহর। বিত্তবান দেশের জুয়া নগরী। আকারে, আয়তনে বা জনসংখ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এই বিলাসবহুল, হোটেলাকীর্ণ শহর সারা পৃথিবীর টুরিস্টদের কাছে পরম আকর্ষণীয়। আকর্ষণের প্রধান কারণ জুয়া খেলা।

শ্রীমতী আলোলিকা মুখোপাধ্যায় তাঁর চমৎকার এবং অপ্রতিরোধ্য মার্কিনি জার্নালে এই শহর এবং এখানে অনুষ্ঠিত এক মহোৎসবের কথা লিখেছিলেন, বছর দুয়েক আগে।

সে সময় 'বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন' এখানে হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি উত্তর আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বাঙালিদের সর্ববৃহৎ বাৎসরিক উৎসব, ঘুরে ঘুরে মার্কিন দেশ ও কানাডার নানা প্রান্তে বিভিন্ন শহরে বছর বছর হয়ে থাকে। মার্কিন দেশ ও কানাডার বাইরে থেকেও, বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ এবং ইউরোপ থেকে বাঙালিরা আসেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত এক বাঙাল দম্পতির সঙ্গে সে বছর আমার পরিচয় হয়েছিল। আমিও সপরিবারে ওই উৎসবে সামিল হয়েছিলাম, মিনতি-কৃত্তিবাস সহ। বিরাট ব্যাপার। রাজসূয় যজ্ঞ। হাজার-হাজার লোকের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত। কলকাতা থেকে বড় গিটার-বাজিয়ে, অভিনেতা, সাহিত্যিকরা এসেছেন।

অহোরাত্র প্রায় নিশ্ছিদ্র প্রোগ্রাম। স্থানীয় কলাকুশলীরা আছেন, তাঁদের অনুষ্ঠান আছে। বাংলাদেশ থেকেও অনেক জ্ঞানী- গুণী এসেছেন। সম্মেলনে উপস্থিতির সংখ্যা দশ-পনেরো হাজার কিংবা তারও বেশি হতে পারে।

সে যা হোক, এ নিবন্ধ বঙ্গ সম্মেলন নিয়ে আমি লিখতে বসিনি, আমি লিখতে যাচ্ছি, জীবনে আমার প্রথম ও শেষবার জুয়াখেলা নিয়ে। তবে এখানে স্বীকার করে রাখা উচিত, ভূ-ভারতে বাঙালির এতবড় এবং এত বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না।

অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তনের মতো অহোরাত্র অনুষ্ঠান। বিশাল মূল মঞ্চ ছাড়াও অনেকগুলি ছোট-বড় মঞ্চ, সেমিনার হল। হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে মধ্যে মধ্যেই হল থেকে বাইরে আসছি। কনফারেন্স হল থেকে বেরুতেই সমুদ্রের বাতাস ঝড়ের মতো বইছে। একটু দূরেই সিজার, তাজমহল ইত্যাদি নামের বিশ্ববিখ্যাত হোটেলগুলি। সবগুলিই উন্নতমানের জুয়ার আড্ডা, ক্যাসিনোর জন্য বিখ্যাত। এই সবই একটু দূরে সমুদ্রের তট ঘেঁষে। বারবার আমাকে টানছে।

তবু নিমন্ত্রিত হয়ে এসে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়া ভদ্রতা নয়। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এত নৃত্য-গীত, এত যাত্রা-থিয়েটার, এত আলোচনা, বক্তৃতা একসঙ্গে—আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

ইতিমধ্যে স্বল্প বিরতি। পান-ভোজনের জন্য অল্প কিছু সময়। এরপরে সারারাত প্রোগ্রাম। একাধিক নাটক আছে, গান আছে। আরও কত কী আছে।

তা থাক। স্বল্প-বিরতির এই সুযোগে আমি আর মিনতি বেরিয়ে পড়লাম। কৃত্তিবাসকে আশপাশে দেখলাম না। এখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব, চেনাশোনা মানুষজন। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছে।

আমি ও মিনতি আলোকোজ্জ্বল সমুদ্রতীরের দিকে পা বাড়িয়েছি, কৃত্তিবাস কোথা থেকে দেখতে পেয়ে একটু পরে ছুটে এসে আমাদের ধরল।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, দূরে সমুদ্রগর্জন, শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইছে। সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তায় ঝলমলে দোকানপাট, বার, ক্যাসিনো, প্রাসাদোপম হোটেলমালা পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমরাও সে ডাকে সাড়া দিলাম।

আটলান্টিক সিটি আমার পরিচিত শহর। আমেরিকায় এর আগে বেশ কয়েকবার এলেও এই শহরে আমি আগে আসিনি, কিন্তু শহরটাকে একটু চিনি। ওই তো দেখা যাচ্ছে ক্যাসিনোর জন্য বিখ্যাত সিজার হোটেল, তার পাশে তাজমহল। ওপাশ দিয়ে রাস্তা গেছে বিচে নামার মধ্যে একটা কাঠের সাঁকো।

গোয়েন্দা গল্প, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী, থ্রিলার জাতীয় বই আমার পরম প্রিয়। আগাথা ক্রিস্টি বা কনান ডয়েল শুধু নয়, ফরাসি লেখক জর্জ সিমেনো বা ব্রিটিশ ডরোথি সেয়ার্স যখন যা পেয়েছি গোগ্রাসে পড়েছি। জেমস হেডলি চেসের রগরগে থ্রিলার সেও পেলেই পড়ি। এই হেডলি চেসের বইতে বারবার ফিরে আসে আটলান্টিক সিটি, পশ্চিম উপকূলে বা নিউ ইয়র্কে খুন-ডাকাতি করে চেসের দুর্বৃত্তেরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়। সিজার হোটেলের ঘর, বারান্দা, ক্যাসিনো-লাউঞ্জ, বিভিন্ন বার আমার নখদর্পণে না হলেও, বই পড়ে চেনা।

ইতিমধ্যে কনফারেন্স হল থেকে বিরতির সুযোগে প্রায় দশ বারো হাজার লোক বাইরে বেরিয়েছে। দূর থেকে হাট বা মেলায় যেমন গমগম শব্দ কানে আসে, এখানেও তাই শোনা যাচ্ছে। অসংখ্য ছায়া ছায়া মানুষকে দেখাও যাচ্ছে, সমুদ্রের দিকে আসছে।

কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সাহেব মেম, সাহেবই বেশি, ছড়ি হাতে নৈশভোজের শেষে সমুদ্রবায়ু সেবনে বেরিয়েছেন। শুধু জুয়াড়ি বা দুর্বৃত্তের নয়, অবসরপ্রাপ্তদেরও প্রিয় নিবাস আটলান্টিক সিটি। বোধহয় স্বাস্থ্যকর স্থান, দূষণহীন তো বটেই।

ভ্রমণকারী সাহেব মেমরা অদূরে অসংখ্য মানুষ দেখে এবং গোলমালের শব্দ শুনে বারবার বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কী ব্যাপার। আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের বোঝালাম, 'দশ-বারো হাজার বাঙালি একত্রে এদিকে থাকছে। সাহেবরা আপনারা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের কথা শুনেছেন তো, এরা সেখানকার লোক। আর বাইরে থাকবেন না, যে যার বাড়ি ফিরে যান।'

কাছাকাছি কোনও এক বঙ্গসন্তানের হাতের ক্যাসেট প্লেয়ারে তখন বাজছে সুমনের গান...কিচ্ছু বলা যায় না।

সাহেবরা কী বুঝলেন কে জানে। অতি দ্রুত ত্রস্ত পদে তাঁরা পশ্চাপসরণ করলেন।

এবার সামনেই সিজার হোটেল। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে গেলেই ক্যাসিনো লাউঞ্জ। বহু লোক সেখানে দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত।

আমি ঠিক করলাম, জীবনে এই শেষ সুযোগ। জীবনে অন্তত একবার জুয়া খেলার পাপটা করি। আমি একথা বলতে কৃত্তিবাস বলল, 'কত টাকা আছে তোমার সঙ্গে?'

'খুচরো দশ ডলারের মতো হবে।'

আমার একথা শুনে বেশি টাকা নষ্ট হচ্ছে না এটা ধরে নিয়ে কৃত্তিবাস তার মাকে নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে গেল। বলে গেল, 'এখানেই থেকো, আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

এদিক-ওদিক ঘুরে এর-ওর খেলা দেখে আমি ক্যাসিনোর রীতিনীতি, খেলার কায়দা বুঝে নিলাম। সোজা কথা, পয়সা দিয়ে বোতাম টিপে অপেক্ষা করো, ভাগ্যে মিললে দু'গুণ, চারগুণ কিংবা আরও বহুগুণ টাকা ক্যাসিনোর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসবে, না মিললে পয়সা গচ্চা।

বিগিনার্স লাক অর্থাৎ নবিশের ভাগ্য বলে ইংরেজিতে একটা কথা আছে। আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটল। দুয়েকবার বাদ দিয়ে আমি ক্রমাগত জিততে লাগলাম। আমার কোটের দুই পকেট, প্যান্টের দুই পকেট, হাতের আঁজলা ভরে গেল মার্কিনি মুদ্রায়। মোট পরিমাণ অন্তত হাজার ডলার হবে। কম কথা নাকি। ভারতীয় টাকায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

উঠব উঠব ভাবছিলাম, এমন সময় দেখি স্ত্রী-পুত্র আমার দিকে আসছে। কী রকম রোখ চেপে গিয়েছিল ভাবলাম শেষ দানটা যা আছে সব দিয়ে খেলি। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। আজ সিজার হোটেলকে ভিখিরি করে দিয়ে যাব, আমার অন্তত কয়েক লাখ টাকা হবে।

কিন্তু যেমন হয়, যা হয়ে থাকে, তাই হল। অবশেষে এবার একটি বিরাট শূন্য, একটা গোল্লা পেলাম। শূন্যহস্তে ক্যাসিনো ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে মিনতি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একী, তোমার মুখ এত ফ্যাকাশে কেন? ট্রাভেলারস চেক ভাঙিয়ে খেলনি তো? কত টাকা হারলে?'

আমি বললাম, 'দশ ডলার। সেই দশ ডলার ছিল, সেটাই হেরেছি।'

কৃত্তিবাস বলল, 'দশ ডলার হেরে মুখ অত শুকনো করতে হবে না। চল তাড়াতাড়ি চল, খুব খিদে পেয়েছে। এর পরে সম্মেলনে আর খাবার পাওয়া যাবে না।'

তারপর ক্যাসিনো থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, 'এখানে প্রত্যেকদিন কত লোক হাজার হাজার ডলার হারে। আর তুমি তো মাত্র দশ ডলার!'

সময়ের হিসেব

সর্বাণী-সর্বানন্দদের ফ্ল্যাটটা তেমন বড় নয়। এই যে রকমটা হয় আর কী। একটা মোটামুটি শোবার ঘর। এক চিলতে বাইরের ঘর। একটু খাওয়ার জায়গা। কোনও এক্সট্রা ঘর বা গেস্ট রুম বলে কিছু নেই। অতিথি অভ্যাগত এলে একটু অসুবিধে হয়ে থাকে বইকী।

তাই বলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসবে না তা তো হতে পারে না। যারা বাইরের থেকে আসবে, কলকাতায় থেকে গেলে তাদের রাতের শোবার জায়গাও দিতে হবে।

গতকাল সন্ধ্যাবেলা শ্যামানন্দ দত্ত পাটনা থেকে এসেছেন। কলকাতায় এসে সর্বানন্দদের ফ্ল্যাটে উঠেছেন। শ্যামানন্দ দত্ত সর্বানন্দের কাকা, সেই সূত্রে সর্বাণীর খুড়শ্বশুর।

শ্যামানন্দ সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। সরকারি কাজ করতেন। পাটনা সেক্রেটারিয়েটে পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করেছেন। বড়বাবু পর্যন্ত হয়েছেন।

শ্যামানন্দ রাশভারী, ধর্মপ্রাণ লোক। তদুপরি চিরকুমার। রিটায়ার করার পরে চারিদিকে তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন। কোনও অসুবিধে নেই, ঝাড়া হাত পা। যেখানে যে আত্মীয় আছেন, চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছেন অমুক তারিখে যাচ্ছি। আদর-আপ্যায়ন তেমন না হলে সোজা হোটেলে চলে যাচ্ছেন।

শ্যামানন্দ কলকাতায় ভাইপো সর্বানন্দের বাড়িতে এসে উঠেছেন কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর কালীপ্রণাম করতে যাবেন বলে। এ বাড়িতে অবশ্য তাঁর আপ্যায়নে ত্রুটি হবে না। সর্বানন্দ-সর্বাণী তেমন দম্পতি নয়। তা ছাড়া ওয়ারিশহীন সচ্ছল কাকাকে কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ করার মতো নির্বোধ সর্বানন্দ নন।

এমনকী এ ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত সতর্কতাও গ্রহণ করেছেন সর্বানন্দ। স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন, 'কাকা প্রবীণ মানুষ, উনি যে দু'-এক দিন থাকবেন তোমার ওই চুড়িদার, শালোয়ার-কামিজ এসব না পরে শাড়ি পরেই থাকো।' সর্বাণী এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেননি।

ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে সোফা-কাম-বেডে বিছানা করে দেয়া হয়েছে শ্যামানন্দের, সেখানেই আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পদ্মাসনে জপ করছেন। অসমতল সোফা-কাম-বেড পদ্মাসনের পক্ষে অনুকূল জায়গা নয়। কিন্তু শ্যামানন্দের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম।

সর্বাণীকে এর আগে শ্যামানন্দ মাত্র একবার দেখেছেন, সেও সেই বিয়ের সময়। এখানে আসার আগে একটু খটকা ছিল, নতুন যুগের আধুনিকা মেয়ে, কী জানি কেমন ব্যবহার হবে।

শ্যামানন্দ ধার্মিক ব্যক্তি হলেও, আহারে বিহারে তাঁর অরুচি বা সংস্কার নেই। মাছ-মাংস-ডিম সবই খান। কাল সন্ধ্যাতেই এখানে পৌঁছে সর্বাণীকে তিনি সেকথা বলে দিয়েছেন।

কাল রাতে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছেন। আজ সকালে একটু আগে সর্বাণী এসে জেনে গিয়েছেন তিনি সকালে সাধারণত চা আর ডিম সেদ্ধ এবং টোস্ট খান। সর্বাণী জেনে নিয়েছেন, হাফ বয়েল ডিমই তাঁর পছন্দ, কারণ ডেলি ডিম সেদ্ধ খেলে তাঁর হজমে কষ্ট হয়।

এখন বাইরের ঘরে পদ্মাসনে বসে শ্যামানন্দ, রান্নাঘর থেকে টুকটাক শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ তাঁর কানে এল মিঠে গানের সুর। সর্বাণীর গানের গলাটা ভাল। তিনি গুনগুন করে ভজন গাইছেন,

'ম্যায় নে চাকর রাখো,

চাকর রাখো, চাকর রাখো জি।'

শ্যামানন্দের মনটা খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল। বউমার গুণ আছে, কেমন চমৎকার ধর্মের গান গাইছে। হঠাৎ গানটা মাঝপথে থেমে গেল। শ্যামানন্দ একটু অবাক হলেন, 'বউমা, বউমা' করে সর্বাণীকে ডাকলেন।

একটু পরেই সর্বাণী আসতে তাকে শ্যামানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'চমৎকার গাইছিলে, গানটা বন্ধ করলে কেন?'

সর্বাণী বললেন, 'আজ্ঞে, হাফ বয়েলে ওই পর্যন্তই গাই। এর চেয়ে বেশি হলে ডিম বেশি সেদ্ধ হয়ে যায়।'

এই উত্তরে বিভ্রান্ত শ্যামানন্দকে এসে উদ্ধার করলেন সর্বানন্দ। সর্বানন্দ কাকাকে বুঝিয়ে বললেন, সর্বাণী গান গেয়ে গেয়ে রান্নার সময়ের হিসেব রাখে। এই ভজনটা পুরো গাইলে সেই সময়ে ডিম সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে যায়। ভাত সেদ্ধ হতে 'আগুনের পরশমণি' দু'বার গাইতে হয়, ডাল সেদ্ধ করার সময় 'জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।'

একটু পরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে সর্বাণী এলেন। শ্যামানন্দ ডিম খেয়ে দেখলেন হাফ ভজনে হাফ বয়েল চমৎকার হয়েছে।

কেনাকাটা: জুতো

বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে যে সব লোক মনে করে যে তাদের বুদ্ধি দোকানদারের থেকে কিছু কম নয়, তারা আর যাই হোক বুদ্ধিমান লোক মোটেই নয়।

আমাদের সর্বানন্দ দত্তও খুব একটা বুদ্ধিমান লোক নন এবং সে কারণেই তিনি যে বাজারে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খাবেন, তাতে আর সন্দেহ কী।

সর্বানন্দের গত দু' বছরের জুতো কেনার অভিজ্ঞতার কথা বলি।

জুতো কেনা বছর কয়েক হল ভারী ঝকমারি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পুজোর মরশুমে কোনও কোনও জুতোর দোকানে এত বড় লাইন হয় যে চাল, চিনি, কেরোসিনের জন্যও অতবড় কিউ দেখা যায় না। একমাত্র ফুটবলের ফাইনাল বা ক্রিকেটের ওয়ান ডে ম্যাচের লাইনের সঙ্গে তার তুলনা হয়।

সর্বানন্দের সকালের বাজার আছে। দুপুরের অফিস আছে, সন্ধ্যাবেলার আড্ডা আছে। রবিবার ও ছুটির দিনের গ্যাঞ্জাম আছে। লাইন দেওয়ার সময় তাঁর নেই। সেই জন্যে রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও এবং পাড়ার দোকানে কেরোসিন তেল এলেও লাইন বাঁচানোর জন্য তিনি ব্ল্যাকে ভাল দামে কেরোসিন কেনেন। অবশ্য সর্বাণীকে সেটা বুঝতে দেন না, তা হলে গোলমাল হবে।

সুতরাং লাইন দিয়ে জুতো কেনার কথা সর্বানন্দ ভাবতেও পারেন না। কলকাতার সাবেকি চিনেপাড়ার জুতোর দোকানে কিন্তু ভিড় তেমন নেই। পুজোর সময় বলে দু'-চারজন ক্রেতা অবশ্য আছে, কিন্তু গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি নেই।

ভিড় এড়ানোর জন্য, গত বছর পুজোতেই, এক বন্ধুর পরামর্শে সর্বানন্দ চিনেবাজারে জুতো কিনতে যান। সেখানে প্রথমেই তাঁর একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সর্বানন্দ জানতেন না চিনে দোকানের ঐতিহ্য, সেখানে কেনাকাটা মানেই দামদর এবং সে এক অবাস্তব ব্যাপার। পাঁচশো টাকা দাম চাওয়া জিনিসের কেউ সরাসরি দুশো টাকা দাম বললে সে জিনিসটা পাবে না। কিন্তু সময় দিয়ে খেলিয়ে খেলিয়ে কথা কাটাকাটি করে সেটার দাম দেড়শো টাকায় নামিয়ে আনা খুব কঠিন নয়।

সর্বানন্দ যখন দোকানে বসেছিলেন, তাঁর পাশের ভদ্রলোক একজোড়া নিউকাট পছন্দ করে, জুতোর দাম জানতে চাইলেন।

প্রৌঢ় চৈনিক চর্মকার, স্থূলদেহী, গায়ে কালো হাতকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি, অধমাঙ্গে গোলাপ ফুলের ছাপ দেওয়া চিত্রবিচিত্র হাফপ্যান্ট (বর্তমান নাম বারমুডা) কুতকুতে চোখে এবং নির্বিকার মুখে বলল, 'এইত হান তেলেত লুপিক (এইট হান্ড্রেড রুপিস)।

দামের বহর দেখে সর্বানন্দ তখনই দোকান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে শুনতে পেলেন, বিচক্ষণ ক্রেতা বলছেন, 'ওয়ান হান্ড্রেড টেন রুপিস।'

ঘটনার গতিক দেখে সর্বানন্দ রঙ্গস্থল থেকে পলায়ন করলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। এর পরেই তাঁর পালা।

সর্বানন্দকে নতুন লোক দেখে হাসি মুখে অভিনন্দন জানিয়ে চিনে দোকানদার 'নাইন হানতেলেত' থেকে শুরু করল, সর্বানন্দ কেমন মরিয়া হয়ে উঠলেন, সর্বানন্দ বললেন, 'থ্রি হানড্রেড'। চিনেটি একটু দাম নামাল বলল, 'ছিক (সিক্স) হানতেলেত'। সর্বানন্দ সঙ্গে সঙ্গে নিজের দামও কমিয়ে দিয়ে বললেন, 'টু হানড্রেড।'

খদ্দের আগের দাম থেকে নেমে যাওয়ায় চিনেটা চমকিয়ে গেল, এ রকম সে আগে দেখেনি। সে আরেকটু কমিয়ে পাঁচশো টাকায় নামল এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বানন্দ দাম কমিয়ে বললেন, 'ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স রুপিস সিক্সটি সিক্স পয়সা।' আসলে সর্বানন্দ মনে মনে স্থির করে নিয়েছেন যে চিনেটা যা বলবে আমি তার এক তৃতীয়াংশ বলব। চিনেটা হতবাক হয়ে আত্মসমর্পণ করল। আর বিশেষ দামদরের মধ্যে না গিয়ে তিনশো টাকায় জুতো জোড়া রফা করল।

জুতো জোড়ার হয়তো দাম খুব বেশি লাগল না কিন্তু এই জুতোজোড়া সর্বানন্দের পক্ষে খুব সুখকর হয়নি। তাঁর লাগে আট নম্বর জুতো, কিন্তু ধড়িবাজ চিনেটা আট নম্বরের অভাবে একটা ছোট সাইজের সাত নম্বর জুতো গছিয়ে দিল। বলল, 'নরম চামড়ার জুতো, পায়ে দিতে দিতে ছেড়ে যাবে।'

সেই এক সাইজ কম জুতো পায়ে দিয়ে পুরো এক বছর সর্বানন্দ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছেন। তাই এবার সর্বানন্দ প্রতিজ্ঞা করেছেন ছোট সাইজের জুতো কিনবেন না, বাক চাতুরিতে প্রতারিত হবেন না।

সেই একই দোকান, একই দোকানদার। দোকানদারের অবশ্য গত বছরের কথা মনে আছে, তাই আর দরদামের মধ্যে না গিয়ে তিনশো টাকাতেই জুতোর দাম রফা হল। কিন্তু এবারও আট নম্বর নেই। চিনেটা এবার একটা নয় নম্বর জুতো গছাল।

এ জুতো জোড়া টাইট হয়নি বটে কিন্তু ভীষণ ঢলঢলে হয়েছে। সেদিন সকালে তাড়াতাড়ি বাজারে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন চেঁচালেন, 'দাদা আপনার জুতো জোড়া এখানে রয়ে গেল, কখন পা থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে গেছে টেরও পাননি।'

রাতে ক্ষতিটা হল, নতুন জুতো জোড়া গচ্চা গেল। পানশালা থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন পায়ে জুতো নেই, কোথায় পড়ে গেছে কে জানে?

ভেজা চপ্পল

এই বর্ষায় সর্বানন্দ খুব সর্দিকাশিতে ভুগল। একটু জ্বর জ্বরও হয়েছিল। মুঠো মুঠো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে, বোতলের পর বোতল ব্রান্ডি গরম জল দিয়ে পান করে কোনও উপশম হল না।

কথায় বলে সর্দি চিকিৎসা করলে, ওষুধ খেলে সাতদিনে সারে; চিকিৎসা না করলে, ওষুধ-বিষুধ না খেলে সারতে এক সপ্তাহ লাগে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এক সপ্তাহে বা সাতদিনে সর্বানন্দের সর্দি, কাশি, ঘুষঘুষে জ্বর ছাড়ল না।

সর্বাণী একটু খুশি হয়েছে। কারণ সর্বানন্দের নৈশ অভিযান বন্ধ হয়েছে, তবে সে বাসায় বসেই দেদার ব্র্যান্ডি পান করছে। তাতে অবশ্য সর্বাণীর আপত্তি নেই।

কিন্তু ক'দিন আর অকর্মার মতো বিছানায় শুয়ে থাকা যায়? এক সপ্তাহ ছুটি নেয়ার পর সর্বানন্দ অফিস যাতায়াত করছে। বৃষ্টি এখনও কম বেশি হয়ে যাচ্ছে, সর্বানন্দ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হাতে একটা ছাতা রাখছে মাথা বাঁচানোর জন্য।

কিন্তু শুধু মাথা বাঁচানোই যথেষ্ট নয়। বৃষ্টি এলে পায়ের জুতো জোড়াও ভিজে যায়। সর্দিজ্বরে রোগীর পক্ষে ভেজা জুতো মারাত্মক। সর্বানন্দ চেষ্টা করে পায়ের জুতো না ভেজাতে। কিন্তু সব সময় সম্ভব নয়।

সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে মিনিবাসের জন্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় ধুমসিয়ে বৃষ্টি এল। সে কী জলের তোড়, একেবারে যাকে বলে ছাতাভাঙা বৃষ্টি।

অফিসের কাছের এই বাসস্টপটার অসুবিধে হল এর ধারে পাশে কোথাও মাথা গোঁজার জায়গা নেই। ফুটপাথ ধরে অন্তত একশো মিটার বড় কম্পাউন্ডওয়ালা পাঁচিল ঘেরা সাহেব কোম্পানির বাড়ি। তার পরেও কিছুটা ছুটে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়। সেখানে দোকান-টোকান, গাড়িবারান্দা, ঢাকা জায়গা আছে।

জোর বৃষ্টি আসতে সর্বানন্দ মোড়ের দিকে ছুটল। একটু ছুটতেই হাওয়ার ঝাপটায় শৌখিন ছাতাটা উলটে গেল। সেই অবস্থাতেই দৌড়ে মোড়ে পৌঁছিয়ে সর্বানন্দ একটা গাড়িবারান্দার নীচে আশ্রয় পেল।

তখন জামাকাপড় ভিজে সপসপে। মাথার চুল দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। কিন্তু সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা হয়েছে পায়ের জুতোজোড়ার। মোজা সুদ্ধ মোকাসিন জোড়া চিপলে অন্তত এক লিটার জল বেরোবে।

সর্বানন্দ বর্ষার ঝোড়ো, ঠান্ডা বাতাসে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আশঙ্কা করতে লাগলেন এখনই অধিকতর কম্প সহকারে জ্বর আসবে। এই সময়েই গাড়িবারান্দায় পিছন ফিরে তাঁর নজর গেল। এই ভিড়-ভাটার মধ্যে সেখানে চোখে গোল কাচের ভাঙা চশমা চোখে এক বুড়ো মুচি খুব মনোযোগ দিয়ে চপ্পল বানাচ্ছে। তার পিছনের দেয়ালেও পেরেকের সঙ্গে কয়েক জোড়া নতুন চপ্পল ঝুলছে।

পকেটের মানিব্যাগ বের করে সর্বানন্দ দেখলেন শ'দেড়েক টাকা আছে। তারপর চর্মকারের কাছ থেকে অনেক সমাদর করে এক জোড়া চপ্পল কিনে ফেললেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়।

চপ্পল কিনে পায়ের ভিজে জুতো মোজাগুলো খুলে ফেললেন সর্বানন্দ। তারপর হাতব্যাগ থেকে

সেদিনের খবরের কাগজ বের করে ভেজা জুতো-মোজা তার মধ্যে জড়িয়ে ব্যাগে রেখে দিলেন। এবার খালি পায়ে নতুন চপ্পল পরে নিলেন।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। একটা মিনিবাস এসে যেতে সর্বানন্দ তাতে লাফিয়ে উঠলেন। শুকনো পায়ে, নতুন চপ্পল পরে বেশ আরাম লাগছিল।

কিন্তু বিপত্তি হল বাস থেকে নামার সময়। আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে। এখানেও বাসস্টপ থেকে নামার পর তাঁর বাড়ি প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালেন সর্বানন্দ।

একটু পরে খেয়াল হল পায়ে নতুন চপ্পল জোড়া রয়েছে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে। সামনে একটা বকুল গাছ আছে। সেই গাছের নীচে বৃষ্টির ঝাপটা কম, সেখানে দাঁড়িয়ে চপ্পল দুটো খুলে হাতে নিতে গেলেন সর্বানন্দ। এরপর এটুকু পথ খালি পায়েই হেঁটে যাবেন।

কিন্তু পায়ের থেকে চপ্পল খুলতে পারলেন না সর্বানন্দ। আঠার মতো আটকিয়ে গেছে চপ্পল জোড়া। ওপর দিকে পায়ের পাতা, নীচের দিকে পায়ের তলা সব আটকিয়ে গেছে চপ্পলের সঙ্গে।

বাড়িতে গিয়েও সুবিধে হল না। কিছুতেই চটি জোড়া পা থেকে খুলতে পারলেন না। তিনি আর সর্বাণী মিলে টানাটানি করলেন। তারপর সর্বাণীর বুদ্ধিমতো গরম জলের গামলায় পা দুটো চোবালেন তাতে বোধহয় ক্ষতিই হল, চপ্পল জোড়া আরও এঁটে আটকিয়ে গেল। তখন বিপরীত চিকিৎসা, ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে দু'পায়ের পাতায় ঘষা হল, বরফজলে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আধঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা হল।

কিছু হল না। এক শিশি গ্লিসারিন, এক কৌটো নারকেল তেল পদসেবায় ব্যয় হল। কিছু হল না।

অবশেষে রাতে চপ্পল সুদ্ধ পায়ে সর্বানন্দ বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এবং কী আশ্চর্য! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সর্বানন্দ দেখেন সাপের খোলসের মতো চটি জোড়া পায়ের কাছে পড়ে আছে। সেগুলোকে অবশ্য পাদুকা বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে চামড়ার খেলনা নৌকো।

জয়বাবা শান্তিনাথ

সর্বানন্দের অফিসে তাঁর সঙ্গেই কাজ করেন শান্তিবাবু, শান্তিলাল চৌধুরী। বছর দুয়েক আগে পাটনা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

শান্তিবাবু বাংলা ভালভাবেই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণে কেমন একটা দেহাতি, হিন্দি ঘেঁষা টান। শান্তিবাবু অবশ্য বলেন তিনি বিহারি নন, তবে কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা পাটনার বাসিন্দা।

সর্বানন্দ এবং শান্তিবাবু একই বিভাগে কাজ করেন। প্রায় কাছাকাছিই দু'জনে বসেন। অফিসের কাজকর্ম করতে করতে টুকটাক কথাবার্তা হয়, গল্পগুজব হয়। কখনও দু'জনে টিফিন এক সঙ্গে ভাগ করে খান। এই দু'বছরে দু'জনের মধ্যে একটা হালকা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

শান্তিলালের একটা বড় গুণ এই যে তিনি মদ খান না। মদের প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে চলেন।

সর্বানন্দ কখনও-সখনও শান্তিবাবুকে তাঁর সঙ্গে নৈশ বিহারে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু শান্তিবাবু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি এবং সরাসরি বলেছেন, 'আমি ড্রিঙ্ক করা হেট করি। আপনার সব ভাল, কিন্তু এই একটা খারাপ দোষ। ভাবি টোলারেট করে কী করে?'

ফলে আজকাল সর্বানন্দ শান্তিলালের কাছে মদ্যপানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। এই অফিসে আরও সাঙ্গপাঙ্গ আছেন তাঁরাই সঙ্গী হন।

সে যা হোক, এর মধ্যে একদিন শান্তিবাবু সর্বানন্দকে বললেন, 'আজ আমার বাড়িতে সন্ধেবেলা চলুন। এমন জিনিস খাওয়াব, মদের নেশা ভুলে যাবেন।'

সর্বানন্দ অবাক। এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে গোছের মনের অবস্থা হল তাঁর। শান্তিবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার? আপনার বাড়িতে কি পার্টি-টার্টি আছে না কি আজকে?'

শান্তিলাল বললেন, 'ওসব জিনিস আমাদের ঘরে চলে না। আজ আমাদের বাড়িতে শান্তিনাথের পুজো। চলুন বহুত মজা পাবেন।'

'শান্তিনাথের পুজো?' নিজের মনেই প্রশ্নটা করে ফেললেন সর্বানন্দ, 'আপনার নামের গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন নাকি নিজের বাড়িতে? আমি গিয়ে কী করব? ওসব পুজো-টুজো আমার সয় না।'

শান্তিবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমার নাম তো শান্তিলাল আছে, আমাদের ঠাকুরের নাম আছে শান্তিনাথ। দেবাদিদেব মহাদেব আছেন উনি। চলুন, মজা পাবেন।'

আজও সর্বানন্দকে শান্তিলালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে শান্তিনাথের পুজোয় যেতে হল। গিয়ে দেখলেন, পুজোর ছলে সেটা একটা গাঁজার আখড়া। শান্তিলালের বাড়ির লোকজন পাটনায়, তিনি জোড়াবাগানের একটা গলিতে একটা ঘরে একাই থাকেন। সেই ঘরে আরও পাঁচ-সাতজন দেশোয়ালি ভাই একত্র হয়েছে। তার মধ্যে একজন, কাঁধে পৈতে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা 'ব্যোম-ব্যোম' করে পুজো করছেন, মাঝেমধ্যে 'জয় বাবা শান্তিনাথ' বলে হাঁক ছাড়ছেন, বাকিরা সবাই তখন তাঁর সঙ্গে কোরাসে ধুয়ো ধরছেন।

হাতে হাতে গাঁজার ছোট ছোট কলকে ঘুরছে। একজনের টান দেওয়া হয়ে গেলে সে পাশের লোকের হাতে ছিলিম এগিয়ে দিচ্ছে। গাঁজার ধোঁয়ার ঘর পরিপূর্ণ। কটু ও মাদক গন্ধ থই থই করছে।

ধাপে ধাপে একটা ছিলিম সর্বানন্দের হাতেও এসে গেল। ভদ্রতার খাতিরে সর্বানন্দকে টান দিতে হল। প্রথমে একটু ঝাঁঝ লেগেছিল, গলা থেকে বুক পর্যন্ত একটা ধাক্কা। ক্রমে সয়ে গেল। তখন সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন এঁরা শুধু গাঁজাই টানছেন না, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন।

সেই গল্পগুজব শুনে সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন গঞ্জিকা সেবনের মাহাত্ম্য। মদ খেয়ে চুরচুর হয়েও ও ধরনের আলাপ-আলোচনা সম্ভব নয়।

সর্বানন্দের বাঁ পাশের কালোয়ার ভদ্রলোক বললেন, 'কী সাংঘাতিক গরম পড়েছে এবার।'

ডানপাশের হিন্দি হাইস্কুলের মাস্টারমশায় বললেন, 'এ আর কী গরম। বাহাত্তুর সালের গর্মিতে আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে হাঁসগুলো পেট থেকে সেদ্ধ ডিম পাড়ত।'

এই কথা শুনে সামনের দশাসই ভদ্রলোক বজরঙ্গবলী ব্যায়ামাগারের কুস্তির শিক্ষক হো হো করে হেসে উঠলেন বললেন, 'আরে মুঙ্গেরে আমার মামার বাড়িতে গরমের দিনে গোরুর বাঁটে একা একাই দুধ জ্বাল হয়ে ঘন হয়ে যায়, গোরুর বাঁট ধরে দুইলে ঘন ক্ষীর বেরিয়ে আসে।'

ঝিম মেরে বসে ছিলেন শান্তিলাল, তিনি চোখ বোজা অবস্থাতেই বললেন, 'আমি তো আজকাল আর চায়ের জল গরম করি না। কলের জলে চা পাতা ছেড়ে দিই, তাতেই চা হয়ে যায়।'

সর্বানন্দ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর নয়। কেউ খেয়াল করছে না। এবার কাটতে হবে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। ধোঁয়া ভরতি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হতে তিনি শান্তিলালকে বললেন, 'এই গরমে আমি ধোঁয়া হয়ে গেছি।' এই বলে ধোঁয়া কাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

টেলিফোন

সর্বাণী ও সর্বানন্দের মধ্যে কলহ-বিবাদ, বাদ বিসম্বাদ কয়েকদিন হল প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ মিটে গেছে। অর্থাৎ শাস্ত্রে যাকে বলে দাম্পত্য কলহ, সেটা দত্তবাড়িতে এখন আর নেই বললেই চলে।

এসব জেনে যাঁরা বিস্মিত বোধ করছেন তাঁদের ঘটনাটা খুলে বলি। এই সপ্তাহের গোড়ার দিকে সর্বানন্দের ঘর আলো করে একটি টেলিফোন এসেছে। লাল রঙের ঝকঝকে টেলিফোন। সেলুলার কর্ডলেস এসব কিছু নয়। নিতান্তই সাধারণ একটি টেলিফোন। কিন্তু সেই যথেষ্ট।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই এখন টেলিফোন-অন্ত প্রাণ, দু'জনে কলহ করার অবকাশই পাচ্ছেন না। সর্বাণী রাতদিন টেলিফোনটা পরিষ্কার সাদা কাপড় দিয়ে মুছছেন। পাশে দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ ডিরেকশন দিয়ে যাচ্ছেন।

এক ফাঁকে সর্বাণীদেবী নিউ মার্কেটে গিয়ে দুটো ভাল লেসের ঢাকনা কিনে এনেছেন ফোন ঢেকে রাখার জন্য। সেটা দিয়ে ফোনটা যত্নে ঢেকে রাখা হয়। অবশ্য সর্বানন্দ বলেছেন, এভাবে ফোনটাকে চাদর মুড়ি দিয়ে রাখলে ফোনটা ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ফোন এলে বাজবে না।

সর্বাণী জানেন। এটা সর্বানন্দের রসিকতা। কারণ লেসের রুমাল ঢাকা ফোনটা যথারীতি ক্রিং ক্রিং করে বাজে। তবে ফোন না এলে বাজবে কী করে।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। এর মধ্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের প্রত্যেককে তিন-চারবার করে ফোন করা হয়ে গেছে। সেই তুলনায় ফোন কম এসেছে, সে তো হবেই কে আর বিনা প্রয়োজনে পয়সা খরচ করে ফোন করতে যায়।

সর্বানন্দ সর্বাণীকেও যখন তখন যাকে তাকে ফোন করতে নিষেধ করেছেন। ফোনের বিল উঠবে সেইজন্য তো বটেই, তা ছাড়াও অন্যেরা অপ্রয়োজনীয় ফোন পেয়ে বিরক্ত হবে, ভাববে হাভাতে, নতুন ফোন নিয়ে আমাদের বার বার ফোন করে যাচ্ছে।

কিন্তু ফোন কিছুক্ষণ না বাজলেই সর্বাণীর মনে সন্দেহ হয়, খারাপ হয়ে যায়নি তো। রিসিভার তুলে দেখেন ডায়ালটোন আছে কি না কিন্তু তাতেও মন শান্ত হয় না, প্রতিবেশী বউদিকে ফোন করে বলেন, 'বউদি, আমাদের ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে কি না বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে একবার ফোন করুন না।' বউদি বলেন, 'ফোন খারাপ হয়ে থাকলে তুমি ফোনে কথা বলছ কী করে।'

সর্বাণীর এসব দুশ্চিন্তার দিন অবশ্য শেষ হয়েছে। গতকাল থেকে কী হয়েছে কে জানে, টেলিফোন বাজছে তো বাজছেই। দু' মিনিট পর পর ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বেজে উঠছে।

প্রথমে কিছুটা উল্লসিত হলেও, অনতিবিলম্বে, সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়ার পরে পর পর দু'বার ফোনটা ধরার পর সর্বাণী ব্যাপারটার ভয়াবহতা টের পেলেন।

'হ্যালো হাজরা থানা?' সর্বাণী হ্যাঁ, না কিছু বলার আগেই, ওদিক থেকে প্রশ্ন, 'কাল রাতে বসুশ্রী সিনেমার পাশ থেকে মিস্টার হেপে মান্নাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছিলেন। তিনি কি এখনও লক-আপে আছেন?'

তাড়াতাড়ি 'রং নম্বর' বলে সর্বাণী টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার বেজে উঠল, 'হ্যালো আপনি কি বড়বাবুর ওয়াইফ বলছেন, বড়বাবু বোধহয় মাল-টাল টেনে এ-বেলা পর্যন্ত

ঘুমোচ্ছেন, ওঁরা কাছ থেকে একটু জেনে দিন তো কালীঘাট খালে লাশটা কার। ওটা জনদরদি, সমাজ সেবক মিস্টার হেপে মান্নার লাশ?'

সর্বাণী ফোন নামিয়ে রেখে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্রিং, ক্রিং। এবার সর্বাণীকে অব্যাহতি দিয়ে সর্বানন্দ এসে ফোনটা ধরলেন। এবার নতুন কেস, ভারী মিষ্টি আর মোলায়েম গলা, 'বল তো আমি কে বলছি?' 'শালা' বলে সর্বানন্দ ফোন রেখে দিলেন। তবে রিসিভারের ওপরে বসালেন না, পাশে বসিয়ে দিলেন। যাতে কোনও ফোন আর না আসতে পারে।

সেভাবেই ফোনটা আপাতত কয়েকদিন থাকবে।

পরিশেষে

খিটিমিটিটা সাতসকালেই শুরু হয়ে যায়। সাতসকালের মানেটা কী, ঠিক কতটা সকাল তা অবশ্য জানি না। হাতের কাছে অভিধানেও শব্দটা পেলাম না। লিখতে বসে এসব নিয়ে ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়।

আমাদের এই গল্পে সাতসকাল হল সকাল সাতটা, সেই সময়েই চায়ের টেবিলে বসে দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে যায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে।

দামিনী একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। একটু রাত করে ঘুমনো, একটু বেলা করে ওঠা বহুদিনের পুরনো অভ্যেস তাঁর। ততক্ষণে ধর্মদাস লেকের ধার দিয়ে এক চক্কর দিয়ে আসেন। সকালে না হাঁটলে তাঁর রক্তে অক্সিজেন খেলে না, সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে।

আগে বাইরের দরজা ভেজিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে যেতেন। ভিতরের ঘরে দামিনী ঘুমোতেন। কিন্তু ব্যবস্থাটা নিরাপদ নয়। একটা ইয়েলগা তালা দরজায় লাগালে সমস্যাটা ঘুচে যায়, বাইরে থেকে টেনে দিলেই হবে। পরে ফেরার সময় বাইরে থেকেই চাবি দিয়ে খোলা যাবে। কিন্তু ওসব তালা এদিকে কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যায় না। ওদিকে বা কোন দিকে পাওয়া যায়, ধর্মদাসের সে বিষয়ে কোনও ধারণা নেই।

আজ কিছুদিন হল ধর্মদাস তাঁর বইয়ের আলমারির তালাটা খুলে বেরনোর সময়ে বাইরের দরজায় লাগিয়ে যান। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়। কাল সকালেই দামিনীর সত্তর বছরের দাদা এসেছিলেন, দামিনী জানতেনই না যে দরজা বাইরে থেকে ধর্মদাস তালা বন্ধ করে যান। যখন এটা সদ্য নিদ্রোত্থিতা দামিনী বুঝতে পারলেন, তিনি রাগে গজরাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। দরজার ওপার থেকেই দাদার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রভাতী আলাপ সারতে হল। যাওয়ার সময়ে মোক্ষম কথাটি বলে গেলেন তিনি, 'ধর্মদাস কি আজকাল তোকে তালা দিয়ে রাখে নাকি? বুড়ো বয়সে এসব বাতিক খুব খারাপ।'

সেদিন মুড়োঝাঁটা কিংবা চেলা কাঠ পিঠে ভাঙা ছাড়া আর সবই করেছিলেন দামিনী। ধর্মদাসের কোনও দোষই ছিল না। নিতান্ত প্রাতঃভ্রমণের মতো একটি নিরামিষ অথচ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ধর্মদাস নিগৃহীত হলেন।

আমরা সকাল বেলায় ওই নজিরটি উপস্থাপন করলাম শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্য যে ধর্মদাসবাবুর সারাদিন কেমন কাটে।

বাড়ির বাজার ধর্মদাস নিজেই করেন। বেগুনের পোকা বেগুন ছাড়া আর কোথায় থাকবে, বাজারের বেগুনে পোকা বেরুল। এই দুর্মূল্যের বাজারে পাঁচশো গ্রাম বেগুন কিনেছিলেন ধর্মদাস।

ছোট ছোট বেগুন। প্রায় পনেরো বিশটা উঠেছিল ওই আধ কেজিতে। দাম একটু কম বলে ধর্মদাস কিনেছিলেন। কিন্তু দামিনী তরকারি কুটতে গিয়ে দেখলেন প্রত্যেকটি বেগুনে বিজবিজ করছে পোকা। পাঁচশো গ্রাম বেগুনে প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম পোকা।

খেপে গিয়ে দামিনী সেই বেগুনের পোকাগুলো ভেজে বেগুনভাজার বদলে ধর্মদাসকে দিলেন।

এ রকম প্রায়ই হয়। অনেক সময় দামিনী পচা মাছ ছুড়ে মারেন ধর্মদাসকে, খারাপ ময়দা মাথায় ঢেলে দেন।

ধর্মদাস কী আর করবেন, হাঁটেন। সকালে আর বেরনোর সাহস পান না। একটু বেলা করে, দামিনী ঘুম থেকে উঠলে তারপর হাঁটতে বেরোন। রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে হাঁটেন।

আবার হাঁটতে হাঁটতে বাজারে যান, ডাকঘরে যান, পেনশন আনতে যান। বিকেলের দিকে ফের লেকে গিয়ে পায়চারি করেন।

সকালের ভ্রমণকারীরা বিকেলের দিকে কেউ কেউ আসেন। তাঁরা ধর্মদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সকালে আর আসেন না কেন?' ধর্মদাস চুপ করে থাকেন।

একদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নির্যাতিত হওয়ার পরে ধর্মদাস দামিনীর কাছে হেনস্থা হওয়ার কথাটা কবুল করে ফেললেন।

ধর্মদাসের পুরনো ভ্রমণসঙ্গী রমেশবাবু। দু'জনে এক সময়ে একই অফিসে কাজ করতেন। তিনি ধর্মদাসকে বলেন, 'আপনার স্ত্রীকে এত ভয় করেন আপনি? আপনি কি মশায় ইঁদুর নাকি!'

ধর্মদাস বললেন, 'ইঁদুর হলে তো ভালই ছিল?'

রমেশবাবু বললেন, 'সে কী! কেন?'

ধর্মদাস বললেন, 'আমার স্ত্রী ইঁদুরকে খুব ভয় পান কি না?'

একদিন অবশ্য ধর্মদাস একটা আশার কথা শোনালেন, বললেন, 'বুঝলেন রমেশবাবু, আমার স্ত্রীকে আজ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছিল।'

রমেশবাবু শিহরিত। জানতে চাইলেন, 'কেন, আপনি কী করেছিলেন?

ধর্মদাস বললেন, 'কিছুই করিনি। শুধু খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলাম।'

পুনশ্চঃ

সর্বানন্দ-সর্বাণী কাহিনী একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। তাই একটু মুখবদল করলাম।

তবে উল্লেখযোগ্য এই যে ধর্মদাস-দামিনী আমাদের সর্বাণীর বাবা-মা, সর্বানন্দের শ্বশুর-শাশুড়ি। এবং আমি হলফ করে বলে দিতে পারি যে একদিন সর্বানন্দ-সর্বাণীরও একই পরিণতি হবে। সেদিকেই তারা এগোচ্ছে।

জনগণের জোক!

জনগণের জোক!

জনগণের কৌতুক!

জনগণ? এই বিংশ শতকের শেষ বেলায় এসে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি জনগণ শব্দটার সর্বনাশ হয়ে গেছে। জনগণের নামে এই শতাব্দীতে দেশে দেশে কয়েকজন মুষ্টিমেয় মানুষ হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ করেছে, অন্যায় অত্যাচার করেছে।

এই নিবন্ধে সেসব বিষয় আলোচ্য নয়।

অবশ্য নামকরণ দেখে কারও মনে হতে পারে আমি হয়তো সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়ে একটি রাজনৈতিক আলোচনা করতে যাচ্ছি।

কিন্তু রাজনীতি আমার বিষয় নয়। রাজনীতি আমার আসে না।

সে যাই হোক, জনগণের কৌতুক নিয়ে বলার আগে জনগণ বিষয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এক মহকুমা শহরে সাহিত্যসভায় গিয়েছিলাম। শীতকাল, বউবাজার থেকে বড় এক বাক্স জয়নগরের মোয়া নিয়ে গিয়েছিলাম। সাহিত্যসভার কর্মকর্তা স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা। ভদ্রলোক জয়নগরের মোয়ার কথা বা নাম আগে কখনও শোনেননি।

তাঁর হাতে মোয়ার বাক্সটা তুলে দিয়ে বললাম, 'জয়নগরের মোয়া। আপনাদের জন্যে এনেছি।'

বললাম, 'জয়নগরের মোয়া', ভদ্রলোক শুনলেন, 'জনগণের মোয়া।'

'জনগণের মোয়া!' এই বলে তিনি বাক্স খুলে একটার পর একটা মোয়া খেতে লাগলেন। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশটি মোয়া একাই খেয়ে ফেললেন।

সে যা হোক, এবার প্রকৃত জনগণের জোকে আসছি।

হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে খুশবন্ত সিং-এর পঞ্চম জোকবুক কিনেছিলাম চল্লিশ টাকা দিয়ে, ট্রেনে উঠে বাংলা জোকবুক পেয়ে গেলাম। গোপাল ভাঁড়ের আধুনিক সংস্করণ বটতলার চটি বই, দাম লেখা আছে দশ টাকা। রেলযাত্রী 'সুরসিক প্যাসেঞ্জার ভাই বোনেদের জন্যে পাঁচ টাকা মাত্র'। কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিক্রেতা ভদ্রলোক গড়গড় করে একটার পর একটা মজার গল্প মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। জনগণ সেসব শুনে যে খুব হাসছেন তা নয়।

আমার কিন্তু বইটা পড়তে খারাপ লাগল না। দু'-চারটে জলো ও মেঠো রসিকতা আছে, সে তো খুশবন্ত সিং-এর বইতেও আছে। এ বইতে দু'-চারটে নতুন কৌতুকী পেয়ে গেলাম।

উদাহরণ—

(১) একজন নেতা নির্বাচনী ভাষণ দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে চাকরকে বললেন, এই হাবু, আমার হাত-পা একটু টিপে দে তো। বড্ড ব্যথা করছে।

হাবু বলল, বাবু চেঁচিয়ে তো আপনার গলা বেশি ক্লান্ত। আপনার গলাটাই আগে টিপে দিই।

(২) একটা ছেলের জামায় আগুন লাগতে সে ছুটে পুকুরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, এমন সময় এক বিড়িখোর বলল, 'একটু দাঁড়াও ভাই। আমি বিড়িটা একটু ধরিয়ে নিই।'

(৩) এক ভদ্রমহিলাকে পতি হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ জিজ্ঞাসা করল,

আপনার তো পিস্তল রয়েছে, আপনি কষ্ট করে আপনার স্বামীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করতে গেলেন কেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, আমি আমার ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙাতে চাইনি। তারা ঘুমিয়ে ছিল, পিস্তলের গুলির শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যেত যে।

এই রসিকতাটিও চমৎকার।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ক্লাসে মাধ্যাকর্ষণ বোঝাচ্ছেন দিদিমণি। সেই নিউটন ও আপেলের গল্প।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বলো তো, আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে কেন? ওপরেও তো উঠতে পারে।'

একটি মেয়ে হাত তুলল। দিদিমণি বললেন, 'ভেরি গুড, তুমি বলো।'

মেয়েটি বলল, 'আপেল ওপর দিকে উঠে গেলে লাভ কী? নীচে পড়লেই তো মানুষ খাবে, তাই নীচে পড়ে।'

পুনশ্চ:

এই জোকবুকের শ্রেষ্ঠ জোক।

সিনেমা দেখতে দেখতে স্বামী-স্ত্রী খুব বকবক করছিল। পাশে বসে থাকা এক দর্শক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মশাই আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' ভদ্রলোক বললেন, 'স্বামী-স্ত্রীর কথা আপনি শুনবেন কেন?'

মকারান্ত

এক
লুজ ক্যারেকটার

আমার নিন্দুকেরা অবশ্যই এই ভেবে খুশি হবেন যে তারাপদ এতদিনে উপযুক্ত বিষয় পেয়েছেন। তা তাঁরা যাই বলুন আমি লুজ ক্যারেকটার দিয়েই শুরু করছি। 'লুজ ক্যারেকটার' শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলে রাখি ইংরেজি 'character' এবং বাংলা 'চরিত্র' শব্দ দুটি এক নয়, দুইয়ের মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

সে যা হোক। আমাদের বিষয় চরিত্র নয়, চরিত্র দোষ। বাংলা অভিধানে, রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় চরিত্রদোষের অর্থ দেওয়া আছে, 'লাম্পট্য, সুরাসক্তি।'

আমার এই ক্ষুদ্র রম্য নিবন্ধে এই দুটো বিষয়েই মনোনিবেশ করব। প্রথমে লাম্পট্য এবং সেই সূত্রে এই খণ্ড অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে লুজ ক্যারেকটার বা স্খলিত চরিত্র।

শ্রীযুক্ত তপন সিংহ পরিচালিত 'বাঞ্ছারামের বাগান' চলচ্চিত্রটি যাঁরা কখনও দেখেছেন, তাঁদের কাছে 'লুজ ক্যারেকটার' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করার মানে হয় না। এই সিনেমায় অভিনেতা দীপঙ্কর

দে এক বৃদ্ধের ভূমিকায় ছিলেন, তিনি তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কাউকে গালাগাল দেওয়ার জন্য 'লুজ ক্যারেকটার' বলে অভিহিত করতেন। লুজের উচ্চারণ ছিল, 'লু-উ-উ-হ্।'

তা এই সব লুজ ক্যারেকটার বা লম্পট চরিত্রের লোকেদের আমরা সবাই মোটামুটি অল্প-বিস্তর চিনি। আমার আপনার মতোই এঁরাও সংসারে বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এঁরা সাধারণত ফিটফাট থাকেন । এঁরা সর্বদাই হাসিমুখ। ঘাড়ে পাউডার, চুলে টেরিকাটা, রুমালে সুরভি। এঁরা রমণীমোহন। ওঁদেরই জন্য শাস্ত্রে উপদেশবাক্য রচিত হয়েছিল, 'পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবে।'

এই সব 'লুজ ক্যারেকটার' বা লম্পট বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখবার অধিকার বা যোগ্যতা আমার নেই। বহুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় 'বিদ্যাবুদ্ধি'-তে লাম্পট্য নিয়ে কিঞ্চিৎ অনধিকার চর্চা করেছিলাম।

সেও করেছিলাম বিলিতি বই টুকে। আমাদের দেশে এ রকম গুরুতর বিষয় নিয়ে মজার গল্প হয় না। লাম্পট্য নিয়ে মজা করতে গেলে সবাই ছি ছি করবে।

এই সব কাহিনীমালার নায়ক ছিলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি বাঁকা চোখে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'মাইরি বলছি, তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে না, একেবারে পরস্ত্রীর মতো।'

এই ভদ্রলোক সম্পর্কে অন্য একটি গল্পে দেখা যায় যে তাঁর সেই পরস্ত্রীর মতো সুন্দরী স্ত্রী তাঁর এক বান্ধবীর কাছে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছেন।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর এক পুরনো বান্ধবী দেখা করতে এসেছেন। বলাবাহুল্য, ভদ্রমহিলার পতিদেবতা তখন বাসায় নেই। বান্ধবী ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞাসা করাতে স্ত্রী বললেন, 'ও কোনওদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে না। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। কোথায় যে যায়? কী যে করে? আমি খুবই চিন্তায় থাকি।'

এ পর্যন্ত শুনে অভিজ্ঞা বান্ধবী বললেন, 'কোথায় যায়, কী করে—ওসব না জানাই ভাল। জানতে পারলে আরও বেশি চিন্তায় থাকবে।'

কোনও বিবাহিত ব্যক্তির চরিত্রদোষ হলে তা তিনি যতই বুদ্ধিমান হন, যতই কায়দাকানুন বুদ্ধি করুন শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী সেটা ধরে ফেলবেন।

মিস্টার চৌধুরী গত কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত সংগোপনে এবং সযতনে অফিসে তাঁর সহকর্মিণীর সঙ্গে প্রবল প্রেমলীলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুবোধ বালকের মতো দৈনিক যথাসময়ে বাড়ি ফিরতেন যাতে তাঁর স্ত্রী কোনওরকম সন্দেহ না করেন। এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মিসেস চৌধুরী কিছু টের পাচ্ছেন না।

কিন্তু গোলমাল হল মিস্টার চৌধুরীর জন্মদিনে। সেদিন মিসেস চৌধুরী এক বোতল একটি বহু বিজ্ঞাপিত চুল পড়ে যাওয়ার ঔষধ স্বামীকে উপহার দিলেন।

মিস্টার চৌধুরী মধ্যযৌবনে পৌঁছেছেন কিন্তু এখনও তাঁর ঘনকৃষ্ণ কেশ, ব্যাকব্রাশ করলে মাথায় ঢেউ খেলে যায়। তিনি জন্মদিনে স্ত্রীর কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'এটা কী দিলে আমাকে? আমার কি চুল উঠছে?'

'তোমার উঠছে না,' মিসেস চৌধুরী খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'কিন্তু তোমার প্রেমিকার খুব চুল উঠছে। রোজই তোমার কোটে লেগে থাকে। আমাকে বুরুশ করে পরিষ্কার করতে হয়।'

এর পরের গল্পটি নিতান্ত ঘরোয়া।

একটি শিশুর জন্য গৃহশিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছে। নবযুবতী এক মহিলা বাসায় শিশুটিকে পড়াতে আসেন। তখন বাসায় শিশুটি এবং একটি কাজের মেয়ে ছাড়া প্রায় কেউই থাকে না।

এর মধ্যে একদিন শিক্ষিকা পড়াতে এসেছেন। সেদিন শিশুটির বাবা-মা দুজনেই বাসায় রয়েছেন, কী যেন একটা ছুটির দিন ছিল সেটা।

সে যা হোক, সেদিন শিক্ষিকা যখন পড়ানো শেষ করে চলে যাচ্ছেন, তখন শিশুটির মা দাঁড়িয়ে। মাতৃদেবী শিশুকে বললেন, 'দিদিমণিকে টা-টা, বাই-বাই করো। দিদিমণিকে একটা চুমো খাও।'

অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে 'টা-টা, বাই-বাই' করে শিশুটি বলল, 'আমি কিন্তু কিছুতেই দিদিমণিকে চুমু খাব না।'

মা অবাক, 'সে কী? কেন?'

শিশুটি বলল, 'চুমু খেলে দিদিমণি আমাকে চড় মারবে।'

মা বললেন, 'ছি! ছি! চুমু খেলে দিদিমণি চড় মারবে কেন?'

শিশু জানাল, 'একটু আগে বাবা দিদিমণিকে চুমু খেয়েছিল। বাবাকে দিদিমণি একটা চড় মেরেছে।'

লাম্পট্য অবশ্য সদাসর্বদাই একতরফা বা পুরুষালি ব্যাপার নয়। এক হাতে তালি বাজে না। মহিলারাও চরিত্রদোষে ভোগেন।

এক ভদ্রমহিলাকে তাঁর স্বামী একদিন দিনদুপুরে নিজের বাড়িতে শয়নঘরের মধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে আপত্তিকর, অশালীন অবস্থায় ধরে ফেলেন।

হই হই কাণ্ড। ফাটাফাটি ব্যাপার!

ঘটনাটা শেষপর্যন্ত থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়াল। প্রবীণ বিচক্ষণ দারোগাবাবু সব ঘটনা শুনে তারপর ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আপনি তা হলে আপনার স্বামীকে ঠকাচ্ছিলেন?'

ভদ্রমহিলা ফোঁস করে উঠলেন, 'আমি ঠকাচ্ছিলাম? আমার বরই আমাকে ঠকিয়েছে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'সে আবার কী ব্যাপার?'

ভদ্রমহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'ও আমাকে বেরনোর সময় বলে গিয়েছিল, ফিরতে রাত হবে। দুপুরের মধ্যেই ফিরে এসে আমাকে জব্দ করল। ওই তো ঠকাল। আমি আর কী ঠকালাম।'

এ রকম সব গোলমেলে গল্প বেশি না বলাই বোধহয় উচিত। শুধু আর একটি এবং সেটি পুরনো গল্প।

সকালের খবরের কাগজে একটি রোমহর্ষক সংবাদ বেরিয়েছে। চা খেতে খেতে সংবাদটা পড়ে বিনতা শিউরিয়ে উঠল, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার।'

তার রুমমেট সুরমা এই শুনে কাগজটা হাতে নিয়ে সংবাদটা পড়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

এই শুনে বিনতা বলল, 'আর কী সাংঘাতিক হবে? ফিল্মস্টার ভুবনমোহন এক মহিলার সঙ্গে একটি হোটেল কক্ষে ছিলেন, এমন সময় দরজায় করাঘাত। ভুবনমোহন উঠে দরজা খুলে দিতেই ভুবনমোহনের স্ত্রী বিউটিরানি দেবী ঘরের মধ্যে অতর্কিতে প্রবেশ করে ভুবনমোহনের সঙ্গিনীকে রিভলভার দিয়ে ছয়টি গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মৃত্যু হয়।'

সংবাদপত্রের খবরটি সংক্ষিপ্ত করে বলে বিনতা আবার বলল, 'আর কী সাংঘাতিক হবে?'

সুরমা বলল, 'গতকাল ভুবনমোহন-এর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার। মাথা ধরেছে বলে যেতে পারিনি। গেলে ওই হোটেলের ঘরে আমিই বিউটিরানির রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতাম।'

শুনে বিনতা বলল, 'সর্বনাশ!'

তখন সরমা বললে, 'তা হলে বল, ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

দুই
পানাসক্তি

'যদ্যপি আমার গুরু
শুঁড়ি বাড়ি যায়,
তদ্যপি আমার গুরু
নিত্যানন্দ রায়।'

লম্পটের পরে আমাদের দ্বিতীয়াংশ মদ্যপ নিয়ে।

কথায় আছে, 'মাতালের সাক্ষী শুঁড়ি।' শুঁড়ি হল মদ বিক্রেতা। শুঁড়িবাড়িতে লোকে মদ খেতে যায়।

এ নিয়ে আলোচনার আগে একটা জিনিস স্পষ্ট করা দরকার। লম্পট আর মদ্যপ, এক জিনিস নয়। বহু লম্পট আছে যারা সুরা স্পর্শ করে না । আবার প্রকৃত মদ্যপের লাম্পট্য আসক্তি নেই। যে মদ খায় সে শুধু মদই খায় আর মদ তাকে খায়, তার আর কিছুই করার থাকে না। তবে এমন অনেক লোক আছে, যারা কিছু পরিমাণ মদ্যপান করে খুন-ডাকাতি করতে যায়, বলাৎকারের চেষ্টা করে কিংবা বলাৎকার করেই ফেলে, তাদের কথা আলাদা।

এদিকে লম্পটের মদ্যপ হলে বিপদ। তাকে ভেবেচিন্তে, মেপে চলতে হয়। তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে নানারকম অভিনয় করতে হয়, মুখোশ পরতে হয়।

মাতালের মুখোশ নেই। সে অভিনয় করতেও অপারগ। তার পক্ষে রমণীর মন জয় করা কঠিন। তবে কখনও কখনও দেখা যায় (মদ্যপের প্রতি সহানুভূতি চিন্তা) অনুকম্পাবশত অনেক মহিলা কোনও কোনও মাতালের জন্য দুর্বলতা পোষণ করেন, অবশ্য সেই মদ্যপ যদি কোনও কবি বা শিল্পী কিংবা বখে যাওয়া প্রতিভা হয়।

এসব তত্ত্বকথা, কচকচি মোটেই সুবিধের নয়। বরং এবার মাতালের গল্পে চলে যাই।

তবে এখানে আমার একটা বিশেষ অসুবিধে আছে। মদ ও মাতাল নিয়ে এযাবৎকাল আমি এত বেশি গল্পকথা লিখেছি যে পাঠক-পাঠিকাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—গল্পগুলো নতুন তো? নাকি নতুন বোতলে পুরনো মদ।

সত্যি কথা এই যে, শুধু মদ আর মাতাল নয়, যে কোনও বিষয়েই নতুন গল্প পাওয়া কঠিন। তবু এরপরে যে গল্পগুলি পাঠকের দরবারে পেশ করছি তার একাধিক গল্প টাটকা এবং আনকোরা।

প্রথম গল্পটি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের, এ গল্পটি জ্ঞানত অদ্যাবধি কোথাও লিখিনি।

মধ্য কলকাতায় পুরনো জানবাজার অঞ্চলে একদা বারদোয়ারি নামে একটি দিশি মদের পানশালা অর্থাৎ শুঁড়িখানা ছিল। হয়তো এখনও আছে, বাজার-ভাঁটিখানা-মেলা-বেশ্যাপাড়া-ধর্মস্থান এগুলো সহজে অবলুপ্ত হয় না। উঠে গেলেও আশেপাশে টিকে থাকে।

সে যা হোক, নবীন যৌবনে বন্ধুবান্ধব সহযোগে কখনও কখনও এই বারদোয়ারিতে যেতাম। সেখানে এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুধামাধববাবু। মিলের ধুতি আর নীল ফুলশার্ট, নেহাত ছাপোষা গৃহস্থ। তিনি বেলঘরিয়া থেকে এই বারদোয়ারিতে আসতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এত দূর আসেন?' তিনি বলেছিলেন, 'পাঁইটে চারআনা সস্তা হয়।' এরপরে যখন আমি বললাম, 'যাতায়াত খরচা তো আছে।'

সুধামাধববাবু বলেছিলেন, 'যাতায়াত খরচা হিসাব করে যতক্ষণ পর্যন্ত মদের দামে উশুল না হয় খেয়ে যাই। ঠকবার লোক আমি নই।'

এ রকম যুক্তি মাতালের পক্ষেই সম্ভব।

এই মাতালই ড্রেনে পড়ে গেলে পুলিশকে বলে, 'এখন আর আমি তোমার এলাকায় নই, যাও জলপুলিশ ডেকে আনো।'

এইরকম এক মাতাল রাস্তায় ভিক্ষে করছিল।

তাকে এক পথচারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিক্ষে করছ কেন?' সে জবাব দিল, 'মদ খাওয়ার জন্য।' এরপর আবার প্রশ্ন, 'মদ খাবে কেন?' জবাব, 'ভিক্ষে করার সাহস সঞ্চয় করার জন্য।'

অবশেষে পানাসক্তি এবং লাম্পট্যের একটি যুগ্ম গল্প বলি। দুঃখের বিষয় গল্পটি পুরনো, কিন্তু অসামান্য।

গভীর রাতে মত্তাবস্থায় অনিমেষবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় চাবিটা লাগানোর চেষ্টা করছেন, এমন সময় পুলিশের জমাদার তাঁকে ধরে।

জমাদারকে দেখে অনিমেষবাবু তাঁকে বাড়িটা একটু শক্ত করে ধরতে বলেন কারণ বাড়িটা এত কাঁপছে যে তিনি চাবি লাগাতে পারছেন না।

জমাদার সাহেব অনিমেষবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এত রাতে এখানে কী হচ্ছে?'

অনিমেষবাবু বলেন, 'এটাই আমার বাড়ি। আমি বাড়ির মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

ঘুঘু জমাদার সাহেব কোনও কথা সহজে বিশ্বাস করেন না, তিনি অনিমেষবাবুকে বললেন, 'চলুন আপনাকে ভেতরে দিয়ে আসি।' টলটলায়মান অনিমেষবাবুকে ধরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে জমাদার সাহেব দেখলেন ঘরের মধ্যে বিছানায় এক মহিলা এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে অনিমেষবাবু বললেন, 'এবার বুঝছেন তো এটা আমার বাড়ি। ওই বিছানায় শুয়ে আছেন আমার মিসেস, আর যাকে জড়িয়ে ধরে আছেন সে হলাম আমি।'

এতদূর লেখার পরে দু'-একজন স্মরণীয় চরিত্রের কথা মনে পড়ছে। যাঁদের নাম বলা যাবে না। যাঁরা ছিলেন সোনায় সোহাগা। যেমন লম্পট, তেমনই মদ্যপ। ওপরের গল্পে পুরুষটি মদ্যপ এবং স্ত্রীটি লম্পট, অবশ্য মহিলাকে লম্পট বলা যায় কিনা কে জানে।

তা যাক কিংবা না যাক মদ্যপ-কাম-লম্পটের একটা পুরনো গল্প বলি।

এ গল্পের ভদ্রলোক আসলে মদ্যপ, লম্পট হওয়ার চেষ্টা করছেন। নবলব্ধা বন্ধুপত্নীর সাহচর্যে লাম্পট্যের সাহস সঞ্চয় করার জন্য তিনি ক্রমাগত মদ খেয়ে যাচ্ছিলেন। বাধা দিলেন বন্ধুপত্নী, তিনিও যথাসাধ্য সঙ্গ দিচ্ছিলেন। অবশেষে মহিলা বাধা দিলেন, 'ওগো তুমি আর মদ খেয়ো না, তোমার মুখ কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।'

পুনশ্চ :

জনৈক মন্ত্রীর বন্ধু হলেন এক বিখ্যাত অভিনেতা। সেই অভিনেতা আবার প্রচণ্ড মদ্যপ। রীতিমতো পেঁচি মাতাল। রাস্তাঘাটে গোলমাল বাধানো তাঁর স্বভাব।

সেই অভিনেতা একদা ঘোরতর গোলমাল করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন যে পুলিশ তাঁকে ধরে চালান দিল। পরের দিন আদালত থেকে অভিনেতাকে জেলে পাঠানো হল।

যথাসময়ে মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে এই খবর পৌঁছল। কিন্তু তাঁর পক্ষে তো আইন শিথিল করে অভিনেতাকে কারাগার থেকে বার করে আনা সম্ভব নয়। অন্য দিকে তাঁর প্রিয় অভিনেতা মাতলামির দায়ে অভিযুক্ত এটাও তাঁর খারাপ লাগছে।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে তিনি জেলে গেলেন অভিনেতার সঙ্গে দেখা করতে। জেলের মধ্যে অভিনেতার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে অত্যন্ত মুগ্ধ মন্ত্রী বললেন, 'আমি শুনলাম আপনি মদ খাওয়ার জন্য এখানে এসেছেন।'

হো হো করে হেসে উঠলেন প্রবীণ অভিনেতা। মন্ত্রীকে বললেন, 'কী যা তা বলছ। মদ খাওয়ার জন্য কেউ জেলে আসে। তার জন্য কত রকম কত ভাল জায়গা আছে। তোমাকে সত্যি বলছি, তিন দিন এখানে আছি, কেউ আমাকে এক ফোঁটা মদও খেতে দেয়নি।'

কয়েকটি প্রশ্ন

নানা জায়গায় এই প্রশ্নগুলি পেয়েছি। এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। পাঠক-পাঠিকাদের জন্য শুধু প্রশ্নগুলিই পেশ করছি।

প্রথমে একটি বিলিতি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি।

সেই এক মার্কিন মেমসাহেব। মেম বৃদ্ধা এবং ধনবতী। তিনি বছর দশেক হল বিধবা হয়েছেন, ছেলেপিলেও কিছু নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামীর এবং শ্বশুরালয়ের অঢেল ধনসম্পত্তি পেয়েছেন।

স্বামীর পরলোকগমনের পর থেকে ভদ্রমহিলার বাতিক দেখা দিয়েছে দেশ-ভ্রমণের। বছর বছর সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু নিয়মিত আয় না থাকলে, ধনসম্পত্তিতে টান পড়ে যায়। এই মহিলার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যদিও এখনও বেশ ধনী, আগের মতো সচ্ছলতা আর নেই। তা ছাড়া ওদেশে সঞ্চিত অর্থের ওপরে সুদের হার অত্যন্ত কম, আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক।

আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানিগুলি 'রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড', টিকিট বেচে। গোলাকার পৃথিবীর এক দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করে, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ হয়ে অবশেষে আতলান্তিক অতিক্রম করে আবার ইউরোপ থেকে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন।

মেমসাহেব বছর বছর বেড়াতে বেরোন। এ বছর জাপান, ও বছর চিন। এবার হংকং, ওবার সিঙ্গাপুর বা লন্ডন বা প্যারিস, আবার আমেরিকায় ফিরে আসা।

বছর বছর 'রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' টিকিটের দাম বেড়েই চলেছে। ভদ্রমহিলা এবার বিমান কোম্পানির অফিসে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারাই না বিজ্ঞাপন দেন পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে থাকছে?'

কোনও কোম্পানি এ রকম খদ্দেরকে চটাতে চায় না। মুখপাত্র জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে, ঠিক তাই।' এবার বুড়ি মেম গর্জে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে ফি-বছর পৃথিবী ঘোরার টিকিটের দাম বাড়াচ্ছ কেন?'

এরপরে আর একটা অন্যরকম প্রশ্ন।

মহেশচন্দ্র সকালবেলায় কাগজে তাঁর নিজের মৃত্যু সংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বন্ধু রমেশচন্দ্রকে ফোন করলেন, 'তুমি আজকের কাগজে আমার মৃত্যু সংবাদ পড়েছ, রমেশ?'

রমেশচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ, সংবাদটা পড়ে খুবই দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তুমি এখন কোথা থেকে ফোন করছ?'

অতঃপর আর একটি জীবন-মরণের প্রশ্ন।

গৃহিণী একদিন তাঁর পতিদেবতাকে বললেন, 'ওগো বাজারে আনারস পাওয়া যায় না?'

পতিদেবতা বললেন, 'চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে। কিন্তু কেন?' তিনি ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন তাঁর ঘরনি কবে আনারস সম্পর্কে এত উৎসাহী ছিলেন।

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না, সহধর্মিণী বললেন, 'দেখ, কাল আমার মা আসছেন।'

গৃহলক্ষ্মীর মা, শাশুড়ি ঠাকুরানি সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা ভাবতে কিংবা বলতে চান না

গৃহস্বামী। কিন্তু এই সংসারে উক্ত প্রবীণা মহিলার প্রাক্তন উপস্থিতিগুলি সত্যি খুব সুখের হয়নি। বহুবার তিনি দাম্পত্য কলহের কারণ হয়েছেন।

পতিদেবতা শঙ্কিত হলেন, 'তোমার মা আসছেন?'

গৃহিণী বললেন, 'সেইজন্যেই তো তোমাকে একটা আনারস আনতে বলেছি। মা যে কী ভালবাসে না আনারস। একটা আনারসের জন্য মা অর্ধেক প্রাণ দিতে পারে।'

কথাটা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে পতিদেবতা প্রশ্ন করলেন, 'তাই যদি হয়, দুটো আনারসই না হয় নিয়ে আসি তোমার মার জন্যে?'

গঙ্গারামের প্রশ্ন

গঙ্গারাম একবার একটি মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়েছিল। মেয়েটি রূপসী বা বিদুষী নয় কিন্তু খুবই বড়লোকের মেয়ে। মেয়েটির নাম করুণা। সেই ধনী ব্যক্তির কাছে গিয়ে গঙ্গারাম বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভদ্রলোকের তিন মেয়ে। অরুণা, বরুণা, করুণা। ভদ্রলোককে যখন গঙ্গারাম বলল, 'আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।' ভদ্রলোক বললেন, 'দেখ, তুমি আমার কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাও জানি না। ছোটটি করুণা, তার বয়স তিরিশ বছর। তুমি যদি তাকে বিয়ে করো তোমাকে এক লক্ষ যৌতুক দেব। মেজোটি বরুণা, তার বয়স পঁয়তিরিশ, তাকে বিয়ে করলে দু' লক্ষ টাকা যৌতুক দেব। এর ওপর আছে অরুণা, চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে, তাকে যদি বিয়ে কর পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে, তারপর গঙ্গারাম প্রশ্ন করল, 'স্যার, ওই অরুণার চেয়ে বড় আর কোনও মেয়ে নেই আপনার?'

খাওয়া-দাওয়া

সুহৃদপ্রতিম শ্রীযুক্ত সমর নাগ আমাকে একটি বিজয়ার শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, যেমন পাঠিয়ে থাকেন প্রতি বছর। শ্রীযুক্ত নাগ খ্যাতনামা শিল্পোদ্যোগী এবং বাস্তুকার। আমার ভিটেবাড়িটি তাঁরই রচনা।

তিনি তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় লিখেছেন, 'আশা করি বহুকাঙ্ক্ষিত শারদাবকাশের দিনগুলি বাংলা গান/সাহিত্য, বেহিসেবি-খাওয়া-দাওয়া...ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে রম্য হয়ে উঠেছিল।'...

পুজোর সময় একটু বেহিসেবি খাওয়া-দাওয়া হয়েই থাকে। বৎসরান্তে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়, গল্পগুজব আড্ডা হয়।

যে কোনও সরেস আড্ডা মানেই অনেকটা পান-ভোজন। যাঁরা সারা বছর পান করেন না, অথবা নিয়মিত পান করেন না, এই পুজোর কয়দিন আড্ডার মৌতাতে তাঁরাও কেউ কেউ পান করেন, ভালই পান করেন। অনেক গৃহিণী তথা অভিভাবক পুজোর কয়দিন এহেন কাজে কোনও দোষ ধরেন না।

কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ে, অনেকটা অনুরোধে এবং প্রধানত সঙ্গদোষে, দলে পড়ে পুজোর সময়টায় খাওয়া-দাওয়ার অনাচার ঘটে।

এর মধ্যে স্মৃতিদেবীরও অনেকটা দায়িত্ব আছে। সাদা মেঘের সঙ্গে মনে ফিরে আসে বাল্য ও কৈশোরের দিন।

উঠোনের একপাশে বড় মাটির উনুন করে দিনরাত মুড়ি ভাজা হচ্ছে, খই ভাজা হচ্ছে। ঢেঁকিতে চিড়ে কোটা হচ্ছে। চাল কোটা হচ্ছে। গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। মোয়া তৈরি হবে। কতরকমের মোয়া। মুড়ির মোয়া, চিড়ের মোয়া, খইয়ের মোয়া। মুড়কি।

কারও কি এখনও মনে আছে ঢ্যাপের মোয়া। ঢ্যাপ আর এইচা হল শালুক ও পদ্মের বিচি। সেই বিচি কুচিয়ে খই ভাজা হত। গোল গোল সাদা খই, হোমিওপ্যাথিক বড়ির থেকে সামান্য বড় আকারের। ঢ্যাপের থেকে এইচার খই একটু বড়।

আর নাড়ু? তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, ডালের গুঁড়োর নাড়ু, এমনকী মুড়িগুঁড়োর নাড়ু।

এ ছাড়া রয়েছে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, চমচম ইত্যাদির সমারোহ। ক্ষীর, পায়েস।

মাছের কথা বলে শেষ করা যাবে না। পুঁটি থেকে রুই, আড়, চিতল, কই-মাগুর, বিজয়া দশমীর জোড়া ইলিশ। কোনওটা লঙ্কাপোড়া ঝোল, কোনওটা সরষে বাটা কিংবা ভাপা। ঝাল-ঝোল বা চচ্চড়ি।

সেসব খাবার তো এখন আর সহজলভ্য নয়। খাওয়াই হয় না।

তখনকার অতিভোজন খাদ্যগুণে খুব একটা অস্বাস্থ্যকর ছিল না। কিন্তু এখন তো সেই প্যাকেটের বিরিয়ানি, মাংসের কোর্মা বা কালিয়া। তেল ঝাল, মশলার কাই।

এখন আবার হয়েছে ফাস্ট ফুড। এগ রোল, চিকেন চওমিন। সস্তার সস দিয়ে মুখরোচক চটজলদি খাবার। বড়জোর অতীত দিনের মোগলাই পরোটা ও কষামাংস কিংবা ঢাকাই পরোটা ও ছোলার ডাল। স্বাদে গন্ধে এ সবেরও যথেষ্ট অবনতি হয়েছে।

কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। এই রকমই হয়।

তার থেকে দুটো পুরনো দিনের ভোজনবীরের কাহিনী বলি।

তবে তার আগে একটু তত্ত্বকথা। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারটা কী সেটা একটু আলোচনা করি।

যেমন খেলাধুলা, তেমনই খাওয়া-দাওয়া।

খেলতে গেলে যেমন গায়ে একটু ধুলো লাগবেই। সেই রকমই তেমন তেমন খাওয়া হলে দাওয়াতেই পড়ে থাকতে হবে, উঠে দাঁড়ানোর সাধ্য হবে না।

আমার এক প্রতিবেশী বললেন, 'আগে লোকে দাওয়ায়, মানে বাড়ির উঠোনে ভোজের আয়োজন করত, অনেক সংসারে আবার দাওয়াতেই খাওয়া হত। সেই থেকে খাওয়া-দাওয়া শব্দটি তৈরি হয়েছে।

সে যা হোক আমরা এত কচকচিতে যাব না।

সুকুমার রায় 'খাই খাই' লিখেছিলেন। তাতে দীর্ঘ ভোজনতালিকা দেওয়া আছে। তার থেকে আলাদা আমার নিজস্ব পছন্দের কথাগুলি লিখে রাখি।

সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি, লাউ চিংড়ি, মুড়িঘণ্ট, সরষে বাটা ইলিশ মাছের ঝোল, ঘি-গরম মশলা দেওয়া পেঁয়াজ ও রসুন ছাড়া কালীপুজোর রান্নার মতো মাংসের হালকা ঝোল, পুঁটি মাছের টক, টক দই।

খুব ভালবাসি মাছের তেলের বড়া, পাঁপড় ভাজা, মৌরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি, প্রন বল। আড় মাছ, মাগুর মাছ ভালবাসি।

কেউ যদি নিমন্ত্রণ করতে চান এসব মনে রাখবেন।

আর কী লিখব?

পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার দুই ভোজনরসিকের গল্প বলি। অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এই দুটি সুপ্রাচীন গল্প না বললে এ রচনা সম্পূর্ণ হবে না।

অতুলনীয় সুনির্মল বসু তাঁর কবিতায় একটি গল্প নবীন পাঠক-পাঠিকাদের চমৎকার উপহার দিয়ে গেছেন।

গল্পটি অসামান্য। একটু আমার মতো করে বলি।

সেই এক পুরনো দিনের ভোজবাড়ি। নিমন্ত্রিতেরা সারি বেঁধে পাত পেড়ে খাচ্ছে। অবাধ খাওয়া-দাওয়া। মাছ-মাংস, লুচি-পোলাও, দই-মিষ্টি।

জনৈক ভোক্তা সেই সুক্তো, চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া থেকে অবিরাম খেয়ে যাচ্ছেন। মাছ-মাংস তরকারি-মুড়িঘণ্ট দু'-এক কিস্তিতে তাঁর পোষাচ্ছে না। সেই সঙ্গে অনুরূপ সাদা ভাত, লুচি কিংবা পোলাও।

এর পরেও আছে দই ও মিষ্টি। এক হাঁড়ি দই, মনে রাখতে হবে আড়াই সেরের হাঁড়ি সেই সঙ্গে প্রমাণ সাইজের দশটি রসগোল্লা আর আটটি পানতুয়া খেয়ে ধুতির কষি ঢিলে দিতে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে নিজের পাতের ওপরে গড়িয়ে পড়লেন।

দশজন লোক ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বারান্দায় চিত করে শুইয়ে দিল, শালপাতার পাখা দিয়ে তার মুখে মাথায় এবং স্ফীতোদরে দু'জন ব্যক্তি হাওয়া করতে লাগল, মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল, ডাক্তার-বৈদ্যকে তলব করা হল কিন্তু সংজ্ঞাহীন ওই ভোজন রসিকের জ্ঞান আর ফেরে না।

অবশেষে তিনি পাশ ফিরে শোয়াতে একটু আশার সঞ্চার হল। ডাক্তারবাবু তাঁর কানের কাছে গিয়ে 'এখন কেমন বোধ করছেন?' জিজ্ঞাসা করাতে তিনি 'হুঁ হুঁ' করলেন।

তখন ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ খুলে দুটো হজমি গুলি বার করে তাঁকে বললেন, 'একটু হাঁ করুন, এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নিন, আরাম হবে।'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না'। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'যদি দুটো ট্যাবলেটের জায়গা পেটে থাকত তা হলে আরও একটা পানতুয়া খেতাম।'

দ্বিতীয় কাহিনীটি প্রায় এই রকমই।

এখানেও সেই ভোজের আসর। সেই ভোজনবীরের গল্প।

ভোজনবীর একটু দেরি করে ভোজবাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর আসার আগেই প্রথম ব্যাচ বসে গেছে। যেমন হয়, ইনি ভাবলেন যা কিছু ভাল খাবার বোধ হয় প্রথম ব্যাচের লোকেরাই খেয়ে ফেলল।

পরের ব্যাচে খেতে বসে তিনি কিছু কম খেলেন না। খেতে খেতে পেট ফুলে জয়ঢাক, আগের গল্পের লোকটির মতোই ইনি সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কাছেই এক নদী ছিল। পাড়ার কোবরেজ মশায় বললেন, 'নদীর চড়ায় নিয়ে চিত করে শুইয়ে দিন। খোলা বাতাসে একটু আরাম হবে। কোনও ভয় নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপশম হয়ে যাবে।'

নদীর ধারে বালির ওপরে ভোজনবীরকে শুইয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি ফিরলেন। কিছুক্ষণ পর নদীর স্নিগ্ধ বাতাসে তাঁর অল্প জ্ঞান ফিরল।

এর মধ্যে হয়েছে কী, নদীর স্রোতে একটা পেট-ফোলা মরা গোরু ভাসতে ভাসতে ভোজনবীরের পাশে এসে উঠেছে। জ্ঞান ফিরতে হাত ছড়াতে গিয়ে ভোজনবীরের হাত পড়ল মরা গোরুর ফোলা পেটে। একটু হাত বুলিয়ে ফোলা পেটের বিশাল উচ্চতা অনুভব করে ভোজনবীর স্বগতোক্তি করলেন, 'ইনি নিশ্চয় আমার আগের ব্যাচে বসেছিলেন।'

বলাবাহুল্য

বনফুল জন্মশতবর্ষে বনফুলকে স্মরণ করে এই রম্য কথিকা রচনা করছি।

অবশ্য বলাবাহুল্য নয়, বনফুল লিখেছিলেন 'বলাই বাহুল্য'। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে বনফুলের নাম ছিল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। নিজেকে নিয়ে রসিকতা করার জন্যে যে মানসিক প্রসারতা এবং সরস বোধের প্রয়োজন পড়ে, সেটা বনফুল তথা বলাইচাঁদের ছিল।

'বলাই বাহুল্য' গল্পটা বিখ্যাত। সেই জন্যে একদা আমি এই গল্প নিজের মতো করে ঘুরিয়ে এবং ছোট করে লিখেছিলাম। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে এবার-ও তাই করছি।

বলাই আর কানাই দুই বন্ধু দুই রকম। বলাই রোগা, বেঁটে, গায়ের রং কালো, তার ওপরে সে গরিব, কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না।

কানাই ঠিক বিপরীত। সুদর্শন, গৌরবর্ণ, লম্বা। সে ধনীর ছেলে। নিজেও ভাল উপার্জন করে।

বলাইয়ের শুধু এক জায়গায় জিত, সে প্রেমে সফল। তার প্রেমিকা শ্রীমতী মানসী রূপবতী, বিদ্যাবতী, গুণবতী।

একদা বলাই তার বন্ধু কানাইয়ের সঙ্গে প্রেমিকা মানসীর পরিচয় করিয়ে দিল।

তারপর?

তারপর আর কী? বলাই বাহুল্য।

শ্রীমান পাঠক, শ্রীমতী পাঠিকা আপনাদের হাতের লেখা, ওই যাকে বলে হস্তাক্ষর খুবই খারাপ, প্রায় আমার মতো? একটা উদাহরণ দিই। একদা এক কাগজে আমার নাম তারাপদ না হয়ে, 'তাড়াপদ' হয়েছিল। আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি জানি আমার হস্ত লিপিতে 'র' এবং 'ড়' এই দুই অক্ষরে খুব পার্থক্য হয় না, যেমন হয় না আমার বাঙাল উচ্চারণে।

সে যা হোক, আপনাদের কারও হাতের লেখা যদি আমার মতোই খারাপ হয়, কিংবা তার কাছাকাছি, আমি আপনাকে একটি গূঢ় উপদেশ দিতে পারি।

উপদেশটি হল এই যে নিজের গুরুত্ব বোঝানোর যদি কোথাও কখনও প্রয়োজন বোধ করেন, দম্ভভরে বলবেন, 'এমন একটা কাজ আছে, যা এই পৃথিবীতে আমি একা করতে পারি আর কেউ পারে না।'

স্বভাবতই শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করবেন, 'কী সেই মহৎ কাজ।'

আপনি বলবেন, 'আমার নিজের হাতের লেখা পাঠ করা।'

প্রসঙ্গান্তরে যাই।

সেদিন একটা বহুতল বাড়িতে শ্রীযুক্ত নরেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নরেশবাবুকে আমি চিনি না। আমাকে যেতে হয়েছিল সামাজিক প্রয়োজনে, তাঁর পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের তিনি অভিভাবক। সেই যুবকটি আমার ভাগিনেয়ীর প্রণয়ী এবং পাণিপ্রার্থী।

সামাজিকতার খাতিরে আমি নরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে গিয়েছিলাম।

বোধহয় তখন লোডশেডিং বা পাওয়ার কাট ছিল, বহুতল বাড়ির লিফটটি বন্ধ। সিঁড়ির মুখে একটি বালক খেলা করছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খোকা, এ বাড়িতে নরেশ চৌধুরীর ফ্ল্যাটটা কোথায়?'

খোকা বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন।' এই বলে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। আমার এই বয়েসে দ্রুত সিঁড়ি ভাঙা খুব কষ্টের, হঠাৎ কখনও মারাত্মক হতে পারে, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু মেয়ের বিয়ে, কী করা যাবে।

হাঁফাতে-হাঁফাতে, ঘামতে-ঘামতে সিঁড়ি বাইতে লাগলাম। ওঠা আর শেষ হয় না। তিনতলা-চারতলা-পাঁচতলা অবশেষে ছয়তলা উঠে খোকা থামল, সিঁড়ির বাঁদিকে এগিয়ে একটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই ফ্ল্যাটটা হল চৌধুরী জেঠুর।'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছে নরেশ চৌধুরীর ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে ডানদিকের দেওয়ালের কলিংবেল টিপলাম।

খোকা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে এসে আমাকে বলল, 'বেল টিপছেন কেন?'

আমি বললাম, 'তবে?'

খোকা বলল, 'দেখছেন না, দরজায় তালা। তার ওপরে লোডশেডিং।'

সত্যিই দরজায় তালা। আমি বললাম, 'তা হলে?'

খোকা বলল, 'তা হলে?'

আমি বললাম, 'আমি যে নরেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

খোকা বলল, 'আমরা যখন ওপরে উঠলাম, তিনি তো নীচে নামছিলেন, সাদা সাফারি স্যুট দোতালার সিঁড়িতে তাঁকে দেখেননি?'

পুনশ্চ:

আরম্ভেই আমার রচনায় পাঠক-পাঠিকাদের বাংলা জ্ঞান একটু যাচাই করে নিচ্ছি।

বলুন তো, গলাধাক্কা দেওয়া এবং গলায় গামছা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

অর্থনৈতিক বিচারে পার্থক্য যথেষ্টই। গলা ধাক্কা দিতে হাতের কবজির জোর লাগে কিন্তু কোনও পয়সা খরচ নেই। গলায় গামছা দিতে গেলে হাতের জোর তো লাগেই, তদুপরি একটা গামছা ক্রয় করতে হয়, যার দাম কম নয়।

তবে আসল পার্থক্য হল এইখানে যে, লোককে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, আর গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনা হয়। এবং তখনই সোনায় সোহাগা হয়, যখন গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

শরৎচন্দ্র এবং রসিকতা

একদা সুপ্রচলিত (কিন্তু এখন অনিয়মিত) লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'সাগরপারে' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক ডা. হিরণ্ময় ভট্টাচার্য সম্প্রতি ডাকে আমাকে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠিয়েছেন।

বইটি একটি একাঙ্ক নাটিকা, নাম 'রসিক শরৎচন্দ্র'।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঠিক এই নামে হিরণ্ময়বাবুর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও আছে। একই নামের সেই বইটি শরৎচন্দ্রের রসিকতা এবং অনুরূপ বিষয়াদি নিয়ে রম্যরচনাধর্মী প্রবন্ধের সংকলন।

ঠিক এই জাতীয় আরও অনেকগুলি বই হিরণ্ময়বাবু ইতিপূর্বে রচনা করেছেন, যেমন—রসিক রবীন্দ্রনাথ, রসিক সুভাষচন্দ্র।

ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সরসতার গুণে তথ্যবহুল এই বইগুলি পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয়।

'রসিক শরৎচন্দ্র' নাটিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারের, বড়জোর তিন হাজার শব্দের। বড় বড় পাইকা হরফে ছাপা। মূল রচনাটি বড় জোর হাফ ক্রাউনের কুড়ি-বাইশ পৃষ্ঠা হবে, অর্থাৎ হাজার তিনেক শব্দ।

এই নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল গত বছরের গ্রীষ্মে লন্ডন শহরে কনওয়ে হলে।

'বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' হয়েছিল লন্ডন শহরে। সেখানেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই 'রসিক শরৎচন্দ্র' নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় আটানব্বুই সালের তেইশে মে তারিখে।

শ্রোতাদের পছন্দসই হয়েছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে হিরণ্ময়বাবু এই পুস্তিকার ভূমিকায় একথা বলতেন না যে, 'তিন অঙ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের ইচ্ছে আছে।'

সে যা হোক, এই নাটিকাটি শরৎচন্দ্রের একটি অপারেশন নিয়ে। হিরণ্ময়বাবু নিজে সম্ভবত ডাক্তার। এই নাটকের প্রথম দিনের অভিনয়ের অধিকাংশ কুশীলবই দেখা যাচ্ছে চিকিৎসক, নাটকের বিষয়বস্তুও ডাক্তারি সংক্রান্ত।

অল্প বয়সে, যখন শরৎচন্দ্র লেখক হননি সেই সময়ে তাঁকে হার্নিয়া অপারেশন করাতে হয়, সেই অপারেশনটি হয়েছিল একটি ছোট হাসপাতালে।

শরৎচন্দ্রের অপারেশন করতে গিয়ে সেই হাসপাতাল এক ধরনের অভাবিত গোলমালে পড়েছিল। ব্যাপারটা রীতিমতো হাসির ঘটনা।

সেই ঘটনা নিয়েই এই নাটিকা। খুব সংক্ষিপ্ত করে মূল ব্যাপারটা বলি।

কথিত আছে, অতি অল্প বয়েসেই শরৎচন্দ্র নানারকম নেশাভাং করতেন। ফলে অপারেশনের আগে যখন শরৎচন্দ্রকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করার কথা, তিনি আর সহজে অজ্ঞান হন না। নিয়মিত নেশা করার ফলে ওই ক্লোরোফর্মের প্রভাব নেই তাঁর ওপরে।

এখানে হাসপাতালের ডাক্তারের ডায়ালগটি তুলে দিচ্ছি—

'হায়! হায়! বদমায়েশটা আমার চার আউন্স ক্লোরোফর্ম হজম করে ফেলল।...কত কষ্টে ভিক্ষে-সিক্ষে করে আমি হাসপাতাল চালাই। এ রকম আর কয়েকটা কেস পেলেই আমার দফা রফা—লালবাতি জ্বালিয়ে ছাড়বে।'

বলাবাহুল্য, এ গল্প শরৎচন্দ্রের নিজেরই বলা। নিজের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এ রকম গল্প অনেকেই

বলেছেন। তার সব হয়তো সত্যি নয়, নেহাতই মজা করার জন্য বলা।

শরৎচন্দ্রের কথা নয়, শরৎচন্দ্রকে নিয়ে অন্য এক শরৎচন্দ্রের কথা বলি।

শরৎচন্দ্রের সময়ে আর একজন শরৎচন্দ্র খুব বিখ্যাত ছিলেন, তিনি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি দাদাঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই দাদাঠাকুর অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। তিনি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, তার নাম 'বিদূষক'।

সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে এক সমাবেশে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্রের দেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখে হেসে সম্বোধন করলেন, 'এই যে 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র।'

সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর বললেন, 'এই যে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র!'

পৃথিবী

ধাঁধা অনেক রকমের হয়।

এক ধরনের ধাঁধা আছে যার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত। যেমন প্রশ্ন ছিল, সূর্যমুখীর বাপের বাড়ি কোন নগর? উত্তর কোন্নগর।

আমাদের বাল্যবয়সে ঠিক এ রকম আরেকটা মজার ধাঁধায় প্রশ্ন ছিল, পৃথিবীটা কার বশ?

খুব সহজ এর উত্তর। সোজা, সরল জবাব, পৃথিবী টাকার বশ। পৃথিবীটা 'টা' 'কার' শব্দের সঙ্গে 'টাকার' হয়েছে।

টাকার প্রসঙ্গে একালে এ রকম ধাঁধা আর রচিত হবে না, টাকার দিন আপাতত শেষ হয়ে আছে।

এখন ডলার, ইউরো ডলার, পাউন্ডের দিন। আমরা জ্ঞানত দেখেছি, এক ডলার পাঁচ টাকা, এক পাউন্ড পনেরো-ষোলো টাকা। এখন ডলারের দাম চল্লিশ পেরিয়ে ধীরস্থির পদক্ষেপে পঞ্চাশ টাকার দিকে এগোচ্ছে। বাংলাদেশি টাকা, পাকিস্তানি রুপি, ইন্দোনেশীয় রুপেয়া, তাদের অবস্থা আরও খারাপ।

টাকার সঙ্গে পৃথিবীর একটা মিল আছে। দুই-ই গোলাকার। কাগজের নোটের যুগে গোলাকার টাকার মুদ্রা অবশ্য অদৃশ্য হয়েছিল। এখন আবার সগৌরবে গোল মুদ্রা এসেছে। বরং এক টাকা, দু' টাকা, পাঁচ টাকার নোট বিদায় নিয়েছে।

শুধু গোলাকার নয়। টাকা আর পৃথিবী দুই-ই গোলমেলে। একদা এক বিশপ বলেছিলেন, এই পৃথিবীটা চৌকো আর গোল গর্তে ভর্তি। মানুষেরাও স্বভাবত চৌকো এবং গোল আকারের। অসুবিধে হল উক্ত বিখ্যাত বিশপের ভাষায়, গোলাকার লোকেরা চৌকো গর্তে, আর চৌকো লোকেরা গোল গর্তে রয়েছে। তাই এত গোলমাল।

এ বিষয়ে আমাদের গঙ্গারামের অভিজ্ঞতাও স্মরণীয়।

গঙ্গারাম সরকারি চাকরি করে। পে-কমিশনের দৌলতে তার মাইনে অনেকটা বেড়েছে। তার চেয়েও বড় কথা হাতে একটা থোক টাকা পেয়েছে, এরিয়ার অর্থাৎ বকেয়া পাওনা হিসেবে।

নিউ মার্কেটের সামনের রাস্তায় বড় বড় দরজির দোকান, কোনওটা বহুকালের পুরনো। সেই সেকালের সাহেব সুবোদের জামাকাপড় বানাত তারা।

বহুকাল গঙ্গারামের শখ ছিল নিউ মার্কেটের ওখান থেকে একটা স্যুট বানানোর।

অবশেষে এবার কিছু কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে নিউ মার্কেটের সামনে বার্ট্রাম স্ট্রিটের একটা প্রাচীন দোকানে একটা স্যুট বানাতে দিল।

বৃদ্ধ দরজি, তাঁর ঠাকুরদা চার্লস টেগার্টের কোট বানাতেন। তাঁর বাবা ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নীচে-ওপরে চার পকেট শার্ট বানাতেন। তিনি উত্তমকুমারের গলাবন্ধ কোট বানিয়েছেন। সেই বৃদ্ধ ছাব্বিশ রকম মাপ নেওয়ার পর গঙ্গারামকে বললেন, 'সামনের মাসের মাঝামাঝি এসে একবার ট্রায়াল দিয়ে যাবেন।'

গঙ্গারাম বিস্মিত হল, ট্রায়াল দিতে যদি এক মাসের বেশি লাগে তা হলে কোট প্যান্ট হাতে পেতে দেড়-দু' মাস লেগে যাবে! সেটা ছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। গঙ্গারাম হিসেব করে দেখল কোট পেতে পেতে জানুয়ারি শেষ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ কলকাতার শীত কাবার, এ বছর আর ওই সাধের স্যুট পরা হবে না।

দরজি প্রবীণ ও রাশভারী। অনেক ভেবে চিন্তে গঙ্গারাম তাঁকে বলল, 'দেখুন, এই এত বড় পৃথিবীটা বানাতে ভগবান মাত্র ছয় দিন সময় নিয়েছিলেন। আর আপনি একটা স্যুট বানাতে দেড় মাস সময় লাগিয়ে দেবেন।'

দ্বিধাহীন কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, 'ওসব শাস্ত্রের কথা শুনেছি। কিন্তু ভগবানের তৈরি পৃথিবীটার হাল কী হয়েছে দেখেছেন। আপনার কোট-প্যান্টের ওই রকম হাল হলে আপনি আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন?'

সত্যি সাম্প্রতিক পৃথিবীটার হাল ভাল নয়। শোষণ-দূষণ-দারিদ্র্য-যুদ্ধ, পৃথিবীর এখন শোচনীয় অবস্থা। পঞ্চাশ বছর আগে যে তরুণ কবি এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি আজ স্বপ্ন দেখারও সাহস পেতেন না।

এদিকে সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, কেন যে কী, কী সে উপকার, কী সে ক্ষতি। যিনি যাই বলুন, কোনও অঙ্কই ঠিকঠাক মেলে না।

একদল ডাক্তার মানুষকে বেশি করে হাসতে বলছেন, তাতে নাকি মন ও শরীর ভাল থাকবে। অন্য এক দল বেশি করে কাঁদতে বলছেন, মন ও শরীর ভাল থাকবে।

আবহাওয়াবিদরা পৃথিবীর পরিণাম নিয়ে চিন্তিত। এক দল বলছেন, পৃথিবী ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, অন্যেরা বলছেন পৃথিবী ক্রমশ গরম হয়ে যাচ্ছে।

ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, হাসি-কান্না, ঠান্ডা-গরম জানি না, কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, এই পৃথিবীতে আমরা আর তেমন ভাল নেই। শরীর ভাল নেই। মন ভাল নেই।

এই সোনালি শরতে শেফালি-ঝরা সকালবেলাতে একথা বলতে ভাল লাগছে না, তবু সত্যি মন ভাল নেই।

হে পৃথিবী, হে আদি জননী বসুধা, তোমার সন্তানসন্ততি ভাল নেই।

সুখের লাগিয়া

বৈষ্ণব কবি বলেছেন, 'সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু।' অবশ্য তাঁর সেই ঘর অনলে পুড়ে গিয়েছিল। সেই আক্ষেপ থেকেই এই কবিতা।

সুখ নিয়ে বড় অসুবিধে এই যে, সুখের দিনে কবিতা হয় না। সুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা, সেদিন কাব্য রচনার জন্যে দিস্তে দিস্তে কাগজ দরকার পড়ে।

আমাদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন আছেন?' আমরা জবাবে বলি, 'ভাল আছি।' এটা কিন্তু কথার কথা, দায়সারা কথা। তা ছাড়াও এই 'ভাল আছি' ব্যাপারটা ঠিক সুখে আছি নয়। সুখ অনেক বড় ব্যাপার।

সুখ কী, বুঝতে গেলে অসুখ কী, সেটা জানতে হবে। সুখের অভাব হল অসুখ। সুখ-অসুখ দুই মিলে একত্রে দ্বন্দ্ব সমাস।

এই অসুখের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। সামান্য একটা সাদাসিধে প্রশ্ন—'এই যে ভাল তো?' কিংবা 'কেমন আছেন?' জিজ্ঞাসা করে কখনও কখনও গুরুতর বিপদে পড়তে হয়।

এ রকম মামুলি জিজ্ঞাসার প্রচলিত মামুলি উত্তর হল, 'এক রকম' কিংবা বড়জোর খুব স্মার্ট কেউ কেউ বলেন, 'ভেবে দেখতে হবে।'

তবু এমন ব্যক্তিত্ব এই ধরা-সংসারে আছেন যাঁকে, 'কেমন আছেন?' বললেই যিনি ধরে নেন 'কেমন আছি' সেটা বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন এবং তিনি একটা ফিরিস্তি দিতে শুরু করেন।

(ক) গিন্নিকে বেড়ালে কামড়িয়েছে।

(খ) ছোট মেয়ের জলবসন্ত হয়েছে।

(গ) বড় মেয়ে নাইন থেকে টেনে উঠতে ফেল করেছে।

(ঘ) নতুন জুতো পায়ে দিয়ে পায়ে ফোসকা পড়েছে।

(ঙ) শেষ রাতে হাঁপের টান ওঠে।

পুরো লিখতে গেলে কুলোবে না, তবে যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁদের এ ব্যাপারে ক্লান্তি নেই।

এক বিদেশি দার্শনিক বলেছিলেন যে, সুখী মানুষ শুধু বসন্তের দিনেই সুখী নয়, সব ঋতুতেই সে সুখী। বার্নার্ড শ' বলেছিলেন, সুখ উপভোগ করতে গেলে সুখ উৎপন্ন করতে হবে।

সুখের বিষয়ে একটা পুরনো ইংরেজি কবিতাও মনে পড়ছে কিন্তু কবির নামটা মনে পড়ছে না। কবিতাটির নাম ছিল বোধহয় 'জীবনের গান' কিংবা ওইরকম কিছু।

'আমি আছি, আমি বেঁচে আছি, আমি সুখী,
আকাশ নীল তাই আমি সুখী,
পাড়াগাঁয়ের পথে আমি সুখী,
আমি সুখী শিশির পড়ে বলে।'

এত দূর লিখে তারপর ভাবলাম, সুখ নিয়ে অন্যের কথা জানা যাক। গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুখ সম্বন্ধে তোমার ধারণাটি ঠিক কী?'

গঙ্গারাম বলল, 'দাদা, বিয়ের পরে পরেই এক নামকরা জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম।

জানেন তো, বিয়ের মধুচন্দ্রিমা কাটতে না-কাটতেই আপনার বউমার সঙ্গে আমার ফাটাফাটি-কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সেই জন্যে জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম। রীতিমতো দক্ষিণা দিয়ে জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম।'

ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না, তাই বললাম, 'জ্যোতিষী কী বললেন?'

গঙ্গারাম স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, 'সে অনেক কথা। দাদা, এক কাপ চা খেতে পারি?'

আমি লিখতে লাগলাম। তার আগে বাড়ির মধ্যে চায়ের কথা বলে দিলাম। গঙ্গারাম খবরের কাগজ পড়তে লাগল। একটু পরে চা এল, চা পান করতে করতে গলা ভিজিয়ে গঙ্গারাম তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

'কলকাতার সবচেয়ে নামকরা জ্যোতিষীর কাছে গেলাম। এক হাজার এক টাকা দক্ষিণা, তাই দিলাম। জ্যোতিষীঠাকুর প্রথমে আমার পা দেখলেন,তাঁর কনসালটিং রুমে ডাক্তারখানার মতো একটা কোচ ছিল, সেখানে আমাকে শুইয়ে লাল কাচওয়ালা টর্চ ফেলে আমার কপাল তন্ন তন্ন করে দেখলেন। পাঁচশো পাওয়ার আলো ফেলে আমার হাত আতস কাচ দিয়ে দেখলেন। অবশেষে বললেন, 'বলুন কী জানতে চান?'

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে গঙ্গারাম কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। আমি বললাম, 'তারপর?'

গঙ্গারাম বলল, 'জ্যোতিষীঠাকুর জানতে চাইলেন—তোমার কী জিজ্ঞাসা? তখন আমি বললাম, ঠাকুর আমি সদ্য বিয়ে করেছি। ঠাকুর বললেন, সে আমি জেনে গেছি। তখন আমি বললাম, ঠাকুর আপনি আমাকে বলে দিন, বিবাহিত জীবনে আমি সুখী হব কিনা?'

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'জ্যোতিষীঠাকুর কী বললেন?'

গঙ্গারাম বলল, 'সেটাই তো বলছি। ঠাকুর বললেন যে, প্রথম পাঁচ বছর খুব ঝামেলা যাবে। আমি প্রশ্ন করলাম, তারপরে সুখী হব? ঠাকুর বললেন, সুখী হবে না, তবে সয়ে যাবে।'

অন্দর মহলে

রসিকতা, তা সে মুখে বলি কিংবা লিখিতভাবেই করি, তার একটা প্রধান অসুবিধে এই যে জের টানতে হয়।

এক রসিকতা আর এক রসিকতাকে ডেকে আনে। সময় বা সুযোগ বুঝে কাজে লাগানোর জন্যে তুলে রাখা সম্ভব নয়, হয় ছেড়ে দিতে হয়, অথবা ব্যবহার করতে হয়।

শাশুড়ি বউমার কাহিনী অনেক লিখেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি কিছু খুঁটিনাটি বাদ রয়ে গেছে।

মাতৃসমা শাশুড়ি ঠাকুরানিকে এতটা বঞ্চিত করা উচিত হবে না তাই পুনরায় অন্দরমহলে প্রবেশ করছি।

প্রথমে শাশুড়ি ঠাকুরানির সম্পর্কে একটি কাহিনী স্মরণ করি।

প্রবল দাম্পত্য কলহ চলছে। যথারীতি স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে সেই পুরনো অভিযোগ আনয়ন করলেন, 'তুমি আমাকে শুধু নয়, আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে অপছন্দ করো, ঘেন্না করো।'

স্বামী উত্তর দিল, 'একথা ঠিক নয়, আমি অন্তত একজন তোমার আত্মীয়কে আমার যে কোনও আত্মীয়ের চেয়ে বেশি পছন্দ করি।'

বউ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সেই আত্মীয়টি কে, শুনি।'

বর বলল, 'তোমার শাশুড়ি।'

বর-বউ থেকে শাশুড়ি-বউমার আসল গল্পে যাই।

তার আগে বলে নিই, শুধু একালে নয়, কোনও কালেই শাশুড়ি-বউমার সম্পর্ক সব সময়ে খুব মধুর ছিল না।

আমরা ছোটবেলায় শাশুড়ি ঠাকরুনের ছড়া শুনেছি, সেটি বধূমাতার উদ্দেশে শাশুড়ির উক্তি,

'শীতকালে জার গোটা
গরম কালে ঘামাচি,
কোন কালে আছিলা বউ
সর্বাঙ্গে রূপসী?'

না। সেকাল থেকে একাল, শাশুড়ির চোখে বউ কোনওকালেই সর্বাঙ্গে রূপসী নয়।

একালের একটি কাহিনী বলি। খুব আধুনিক কাহিনী।

এ গল্পের বধূমাতা নিতান্তই নব বধূ, সদ্য বিয়ের পালা মিটেছে।

বাঙালি গৃহস্থবাড়ির বিয়ের পালা তো কম লম্বা নয়। সেই কনে দেখা, গায়ে হলুদ, আশীর্বাদ থেকে বিয়ে—বাসি বিয়ে, ফুলশয্যা, বউ-ভাত, দ্বিরাগমন, অষ্টমঙ্গল, অবশেষে স্বপ্নের মধুচন্দ্রিমা।

অবশেষে সেই মধুচন্দ্রিমা পালাও শেষ হয়েছে। এখন নববধূ পারিবারিক সাদামাটা জীবনে প্রবেশ করেছে। সে নিজে আজ একটা রান্না করেছে।

শাশুড়ি ঠাকরুন টেবিলে খেতে বসেছেন। ভদ্রমহিলার পিত্রালয় ছিল উত্তরবঙ্গের এমন এক জেলায় যেখানে ঔ-কার উচ্চারণ নেই, নৌকাকে বলে নোকা, কৌতূহলকে বলে কতুহল, তিনি বউমাকে বলেন বোমা।

তা শাশুড়িকে বউ তার রান্নার পদ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বাপের বাড়িতে সবাই বলে, আমি বেগুন ভর্তা আর পায়েসটা খুব ভাল করতে পারি।'

ব্যাজার মুখে প্লেট থেকে বউমার বানানো প্রথম খাদ্যদ্রব্য এক চামচে তুলে নিলেন। তারপর সেটা মুখে ঢেলে কোনও রকমে গলাধঃকরণ করে, শাশুড়ি প্রশ্ন করলেন, 'তা বোমা, আজ এটা কী বানালে, বেগুন ভর্তা না পায়েস?'

শাশুড়ি সংক্রান্ত একটি করুণ কাহিনী কিছুদিন আগে আমার বয়স্য গঙ্গারাম আমাকে বলেছিল। অধিকাংশ গঙ্গারাম কাহিনীর মতো এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেটা পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করবেন।

গঙ্গারাম সকালবেলা বাজার করতে যাচ্ছিল, রাস্তায় দেখে সামনে একটি লোক খই ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে, পিছনে একটি শবযাত্রা।

প্রথমে শববাহকেরা শব বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তার এক পাশে এক ভদ্রলোক, তার সঙ্গে একটি কুকুর। পিছনে শবানুগামীদের দীর্ঘ মিছিল।

যে ভদ্রলোক কুকুর নিয়ে মৃতদেহের পাশে হাঁটছিলেন, তাঁকে খুব শোকাভিভূত মনে হচ্ছিল না, বরং মুখের মধ্যে যেন একটা চাপা উৎফুল্ল ভাব।

গঙ্গারাম ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, এত বড় শোক মিছিল, কে মারা গেছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার শাশুড়ি ঠাকরুন। হঠাৎই মারা গেলেন।'

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কী হয়েছিল তাঁর?'

ভদ্রলোক তাঁর পাশের কুকুরটাকে দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না, আমার এই কুকুরটা তাঁকে কামড়ে দিয়েছিল।'

গঙ্গারামের মনে সব সময়েই নানা বদবুদ্ধি থাকে। সে অনুরোধ করল, 'দাদা, আপনার কুকুরটাকে দু'-এক দিনের জন্যে ধার নিতে পারি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'লাইনে আসতে হবে। এই মিছিলের পিছে দাঁড়িয়ে যান। শ্মশানে গিয়ে লিস্টি করব। আপনার পালা যখন আসবে, খবর পাঠাব।'

জোক বুক

সর্দার খুশবন্ত সিং এ দেশের বিখ্যাততম এবং প্রাচীনতম সাংবাদিকদের একজন। তাঁর বয়েস এখন পঁচাশি। সাংবাদিকতার জন্যে যতটা নয় তার চেয়ে খুশবন্ত সিং অনেক বেশি বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) তাঁর গোলমেলে কথাবার্তা এবং আচরণের জন্যে। এ ব্যাপারে তিনি শিল্পী মকবুল ফিদা হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সম্প্রতি খুশবন্ত আর একটি গোলমাল করেছেন। যেটি আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়েছে। দিল্লিতে একটি নৈশ আসরে খুশবন্ত সাহেব পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের কন্যাকে একটি চুম্বন করেছেন, প্রকাশ্যে সর্বজন সমক্ষে।

এই সংবাদে কট্টর সংরক্ষণশীল পাকিস্তানে তুমুল আলোড়ন দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানি বিদেশ মন্ত্রক তাদের রাষ্ট্রদূতকে পরোয়ানা পাঠিয়েছে, কেন সে এমন পার্টিতে যায় যেখানে তার কন্যার পবিত্রতা রক্ষা পায় না। আশঙ্কা করা হচ্ছে রাষ্ট্রদূতের চাকরিটি যাবে এবং তার চেয়েও কঠিন শাস্তি হতে পারে।

সে যা হোক সর্দার খুশবন্ত সিংহকে আমরা আপাতত স্মরণ করছি তাঁর পাঁচ নম্বর জোক বুকটির জন্যে।

বছর দশেক আগে আমি এক নম্বর জোক বুকটি কিনেছিলাম হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে দশ টাকা দিয়ে। তারপরেই দুই, তিন এবং চার নম্বর বই, সবগুলি আমি যথাসময়ে ওই হাওড়া প্ল্যাটফর্মেই কিনেছি। সম্প্রতি পঞ্চম জোক বুক বেরিয়েছে। এখন দাম হয়েছে চল্লিশ টাকা। এ বইটাও হাওড়া স্টেশনেই কিনলাম।

সর্দার খুশবন্ত সিং হিন্দুস্থান টাইমস এবং ট্রিবিউন পত্রিকায় সপ্তাহান্তিক কলম লেখেন। সেই কলমের শেষাংশে গঙ্গারামের মতো, একটা হাসিখুশির টেইল পিস থাকে।

এই টেইল পিসগুলি পাঠকদের অবদান। তাঁরা পত্রযোগে, খুশবন্তের কলমে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে, নানারকম রঙ্গ-রসিকতা, কৌতুকী প্রেরণ করেন। তিনি তার থেকে বেছে নিয়ে সম্পাদনা করে তাঁর কলমে প্রকাশ করেন। খুশবন্তের রসবোধ খারাপ নয়, বাছাই মোটামুটি। তবে সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন রসিকতা অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করা, সে এক বিড়ম্বনা। আমি ভুক্তভোগী, আমি জানি এটা কত কঠিন কাজ।

খুশবন্ত সিং-এর জোক বুক (৫) থেকে একটি অপরিচিত কৌতুকী পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

রসিকতাটি সাদাসিধে।

এক নববিবাহিতা তার বান্ধবীকে বলছে, 'আমার বর বলেছে, আমি নাকি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতমা।'

বান্ধবী প্রশ্ন করল, 'তাতে তুই কী বললি?'

নববিবাহিতা বলল, 'আমি বললাম, বাকি ছয় আশ্চর্যকে আমি মুখোমুখি দেখতে চাই।'

সান্টা, বান্টা

আমাদের যেমন গঙ্গারাম তেমনই সর্দার খুশবন্ত সিং-দের সান্টা-বান্টা, সান্টা সিং এবং বান্টা সিং।

সান্টা সিং ও বান্টা সিং মায়ের পেটের ভাই নয়। কখনও তারা বন্ধু বা প্রতিবেশী, সহযোগী কিংবা পরস্পরের পরিপূরক। কখনও বা আলাদা-আলাদা।

সান্টা-বান্টা খুশবন্ত সিং-এর কলমে প্রথম বিখ্যাত হয় সেই যখন ইংলিশ চ্যানেলের নীচে দিয়ে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে ভূগর্ভ পথ তৈরি করা হয়।

সারা পৃথিবী থেকে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হয়েছিল এই টানেল তৈরির জন্য। জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সব দেশ থেকেই এই বিশাল কাজের জন্য বিশাল বিশাল সব প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পেশ করেছিল।

সান্টা-বান্টাও টেন্ডার দেয়। দেখা গেল তাদের চাহিদা সবচেয়ে কম। জাপানিদের একশো ভাগের একভাগ, মার্কিনদের হাজার ভাগের এক ভাগ।

টেন্ডার দেখে টানেলের কর্মকর্তারা সান্টা-বান্টাকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন, 'কী করে, এত কম খরচায় টানেল তৈরি হবে।'

সান্টা বলল, 'খরচ তো একটু বাড়িয়েই ধরেছি।'

কর্তৃপক্ষ বললেন, 'সে কী?'

বান্টা বলল, 'চ্যানেলের এপাশ থেকে আমি খুঁড়তে খুঁড়তে এগোব। আর ওপাশ থেকে সান্টা খুঁড়তে খুঁড়তে আসবে। এইভাবে দু'জনে যখন মুখোমুখি হব চ্যানেল সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। খরচ অর্ধেক হয়ে যাবে।'

বিস্মিত কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু দু'জনে যদি মুখোমুখি দেখা না হয়?'

সান্টা বলল, 'তা হলেও কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। দু'জনে যে যার মতো এগিয়ে যাবে। খরচ বেশি হবে কিন্তু আপনারা দুটো টানেল পেয়ে যাবেন।'

বলাবাহুল্য, এই টানেল তৈরির কাজ সান্টা-বান্টা পায়নি।

এরপর সান্টা-বান্টা রোবট যন্ত্রমানব তৈরির কারখানা করল।

সেই যন্ত্রমানব বিক্রি করার জন্যে তারা মার্কিন দেশে গেছে। আমেরিকানরা যাচাই না করে কোনও জিনিস কেনে না।

সান্টা-বান্টা যখন বলল, 'আমাদের তৈরি এই রোবটের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনও রোবটের মধ্যে নেই।'

মার্কিন ক্রেতা সংগতভাবেই জানতে চাইল, 'সেই বৈশিষ্ট্যটি কী?'

সান্টা বলল, 'মানুষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাই।'

ক্রেতা জানতে চাইল, 'কী সেটা?'

বান্টা বলল, 'আমাদের রোবট কখনও কোনও ভুল করলে অন্য রোবটের ঘাড়ে দোষ দেয়।'

সান্টা-বান্টার একবার ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কথায় কথায় সান্টা ভগবানকে বলল, 'প্রভু শুনেছি যে আপনার দিন-রাত সব খুবই লম্বা লম্বা। আমাদের এক লক্ষ বছর আপনার কতটা সময়?'

ভগবান বললেন, 'বৎসগণ, তোমাদের এক লক্ষ বছর আমার ঠিক এক মিনিট।'

তখন বান্টা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভু আমাদের এক কোটি টাকা আপনার কাছে কত?'

ভগবান বললেন, 'তোমাদের এক কোটি টাকার মূল্য আমার কাছে এক টাকা মাত্র।'

চতুর সান্টা বলল, 'প্রভু আমাদের দয়া করে একটা টাকা দিন না।'

ভগবান বললেন, 'ঠিক আছে, এক মিনিট সবুর করো।'

অবশেষে সান্টার একটা সমস্যার কথা বলি।

সান্টা খুব মোটা হয়ে গেছে। দিল্লিতে পাড়ার ডাক্তারের কাছে সে গেছে। ডাক্তার সাহেব তাকে বললেন, 'দৈনিক সকাল-বিকেল দশ মাইল করে দৌড়তে হবে। এইভাবে তিন মাস দৌড়লে অন্তত পনেরো কেজি ওজন কমবে।'

তিন মাস পরে ডাক্তার সান্টার ফোন পেলেন, 'ডাক্তার সাহেব দৌড়ে দৌড়ে আমার কুড়ি কেজি ওজন কমে গেছে।'

ডাক্তার বললেন, 'খুব ভাল।'

সান্টা বলল, 'আর ভাল! দৌড়তে দৌড়তে আমি কলকাতা পর্যন্ত চলে এসেছি। এই ফোন তো আমি কলকাতা থেকেই করছি।'

সরল শৈশব

বালক-বালিকার পর এবার আমরা সরল শৈশবে যেতে পারি। প্রথমে একটা মহিলা শিশুর কাহিনী।

একটি ছয়-সাত বছরের বালিকার জন্মদিন। বিকেলবেলায় তার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফোন এল। বন্ধুর মা ফোন করেছেন, জন্মদিনের বালিকাটিই সেই ফোন ধরেছে।

বন্ধুর মা বললেন, 'অহনা, তোমার বন্ধু হীরকের জ্বর হয়েছে। বাবা, সে তো আজ তোমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যেতে পারছে না।'

পাকা বুড়ির মতো অহনা বলল, 'জ্বর হলে আর কী করে আসবে হীরক?' তারপর একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'হীরককে বলবেন, আমার উপহারটা যেন ঠিক করে রেখে দেয়, ভাল হলেই নিয়ে

আসবে। না হলে আমি তবে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।' এই হল সরল শৈশব।

অনুরূপ আর-একটি জন্মদিনের গল্প আমি একদা লিখেছিলাম। প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে সেই গল্পটিও আর-একবার বলছি। একটু ঘুরিয়ে বলছি।

এ ঘটনা অনেকদিন আগেকার। তা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর হবে।

একটি বছর আটেকের বালকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল রাজপথে।

আমরা দু'জনে প্রতিদিন সকালে একই সময় মোড়ের মাথায় রাস্তার একটা জায়গায় এসে দাঁড়াতাম। বালকটির স্কুলের বাস আসত। আমার অফিসের গাড়ি। দৈনিকই রাস্তায় অল্পস্বল্প দাঁড়িয়ে থাকতে হত গাড়ির অপেক্ষায়। এইভাবেই পথে দাঁড়িয়ে শিশুটির সঙ্গে আলাপ হয়। সেই আলাপ ক্রমশ একটি অসম বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

সে তার স্কুলের কথা, বাড়ির কথা, পোষা বেড়ালের কথা আমাকে বলত। আমি তাকে দু'-একটা মজার গল্প কখনও কখনও বলতাম।

এর মধ্যে একদিন সে আমাকে বলল, 'সামনের রবিবার আমার জন্মদিন। তুমি সন্ধেবেলা আমাদের বাসায় এসো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি যে তোমাদের বাড়ি চিনি না।'

ছেলেটি বলল, 'সে খুব সোজা। এই সামনের গলিটা দিয়ে ঢুকে বাঁয়ের দিকে তিনটে বাড়ি ছেড়ে, লাল দোতলা বাড়ির আমরা দোতলায় থাকি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখবে, দরজায় বাবার নেমপ্লেট লাগানো আছে, সিতাংশু চৌধুরী। নেমপ্লেটের পাশে কলিংবেল। তুমি তোমার কনুই দিয়ে বেলটা টিপলেই, আমি দরজা খুলে দেব।'

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কনুই দিয়ে কলিংবেল টিপতে যাব কেন?'

ছেলেটি গম্ভীর মুখে বলল, 'বারে, তুমি আমার জন্মদিনে উপহার নিয়ে আসবে না?'

আমি বললাম, 'তাতে কী হয়েছে?'

'উপহারের প্যাকেটে যে তোমার দু'হাত জোড়া থাকবে, তাই তোমাকে বলছি কনুই দিয়ে কলিংবেলটা টিপতে।'

এরপরে সেই সরল শিশুটিকেও একবার স্মরণ করতে হয়।

শিশুটি একটি তিন বছরের বালিকা। আমি তাদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। যাঁর কাছে গেছি তিনি বাড়িতে নেই। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছি।

এমন সময় তিন বছরের মেয়েটি এল। সে বেশ কিছুক্ষণ আমাকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল।

তারপর ওই বাইরের ঘরের সোফার নীচ থেকে একটা ঝাঁটা, ঘর ঝাড় দেওয়ার ফুলঝাড়ু, বার করল। সেটা আমাকে দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কী?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ঝাঁটা।'

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'তুই একটা পাঁঠা।'

এই বলে সে চলে গেল। আমিও আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে সে আমাকে ঝাঁটাপেটা করেনি।

পুনশ্চ:

আমার প্রতিবেশীর চার বছরের নাতনি সেদিন নার্সারি স্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ঢোকার মুখে আমার সদর দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, 'জানিস, আমি আজ লিখতে শিখেছি।'

স্কুলের ব্যাগ খুলে, একটা খাতা খুলে সে তার লেখা শেখার নমুনা দেখাল। রীতিমতো হিজিবিজি।

আমি সেটা দেখে বললাম, 'কী লিখেছ, পড়ো দেখি।'

সে বলল, 'পড়তে তো শিখিনি। আমি শুধু লিখতে শিখেছি।'

কথা বলার বিপদ

রসরাজ শিবরাম চক্রবর্তী নিজেকে পানাসক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই পান অবশ্য কোনও মদ্য জাতীয় তরল পানীয় নয়, এমনকী নিতান্ত তাম্বুলও নয়। এ হল ইংরেজি পান (Pun), শব্দে শব্দে ধ্বনিগত মিলের ব্যবহারে কৌতুক সৃষ্টি। ইংরেজি ভাষায় 'পান'-এর মোক্ষম সব ব্যবহার পাওয়া যায়।

বাংলায় রবীন্দ্রনাথ থেকেই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দিলীপ রায় একবার পণ্ডিচেরি থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পরনে লাল রেশমের উজ্জ্বল পোশাক। রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে বলেছিলেন, 'প্রসাধন তো যথেষ্টই হয়েছে, সাধন কেমন হচ্ছে?' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দিলীপ রায় তখন পণ্ডিচেরি আশ্রমে সাধনারত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের মৌখিক কৌতুকীতে, 'পান'-এর এ জাতীয় বহু চমৎকার ব্যবহার হয়েছে।

আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও একসময় কথায় কথায় 'পান' ব্যবহার করা যথেষ্টই ছিল।

আমি সেই সময় শুয়োরের মাংস বা হ্যাম কখনও কখনও খেতাম। পরে কোথায় পড়লাম হ্যাম খেলে পেটে পোকা হয়। একথা আমার বন্ধু কবি সুধেন্দু মল্লিককে বলাতে সে বলেছিল, 'ভয়ের কোনও কারণ নেই, তুমি তো আর হ্যামেশা খাচ্ছ না।'

বাঙালতা-দুষ্ট উচ্চারণ থেকে তখনও আমি মুক্ত হইনি, (এখনও হয়েছি কি?)।

তখন আমি সে সময়কার সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় একটা ফিচার লিখতাম, কিন্তু ইংরেজি বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করতাম ফেচার বা ফ্যাচার। সুধেন্দু আমাকে জিজ্ঞাসা করত, 'কী হে তোমার ফ্যাচাং কেমন চলছে?'

ব্যক্তিগত কথা থাক। যাঁকে দিয়ে আরম্ভ করেছি সেই মহামহিম শিবরাম চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে আসি। তিনি তাঁর হাসির গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে পান প্রাচুর্যে ভরপুর করে দিয়ে গেছেন।

'মস্তিষ্কের পিণ্ড চটকে পণ্ডিত' কিংবা 'একশো একার জমি আমার কুঞ্জকাকার একার', 'স্বামী মানেই আসামী',—

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। শিবরামের ভাষায় বলা যায়, তিনি শুধু পানাসক্তই ছিলেন না, তিনি বেশ্যাসক্তও ছিলেন, বেশি + আসক্ত = বেশ্যাসক্ত।

শিব্রাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'শিবরাম চক্রবর্তীর মতো কথা বলার বিপদ'। তাঁর নিজের নাম এবং পদবি শিবরাম এবং চক্রবর্তী এই নিয়ে তিনি কত যে শব্দের মজা, কথার খেলা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

শিবরামের কথা অতঃপর একদিন বিস্তারিতভাবে বলা যাবে, আপাতত কথা বলার বিপদের কথা বলি।

এক মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা। তাঁর স্বামী কর্মরত অবস্থায় বাড়ি ফেরার পথে চোলাই খেয়ে লরি চাপা পড়ে মারা গেছেন। মহা নচ্ছার ছিলেন তিনি, কিন্তু আইনত তাঁর স্ত্রীকে একটি কাজ দিতে হবে।

আমি কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মমাফিক বিধবা মহিলার সাক্ষাৎকার নিলাম, 'আপনাদের কটি ছেলেমেয়ে?'

বিধবা বললেন, 'দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে।'

আমি বললাম, 'একত্রে পাঁচটি।'

বিধবা বলেন, 'আমাকে কি কুকুর-বেড়াল ঠাউরেছেন? একত্রে নয়। একজন-একজন করে এক বছর দেড় বছর বাদে বাদে আমার ছেলেমেয়েরা সব জন্মেছে।'

আমি হতভম্ব হয়ে বিধবা মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যি, কথা বলার কী বিপদ!

পুনশ্চ:

শুধু সাবালকদের সঙ্গেই কথা বলার বিপদ আছে, তা নয়, শিশুদের জগতেও অনেক রকম মারপ্যাঁচ থাকে।

সেদিন পার্কে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। আমার সামনেই ঘাসের ওপরে চুলে লাল রিবন বাঁধা একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে আপন মনে খেলা করছিল। শিশুটির বয়েস বড় জোর পাঁচ-ছয় হবে।

মেয়েটিকে ডেকে একটু আলাপ করার লোভ হল। তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না।

এবার তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি ইস্কুলে যাও?'

মেয়েটি চটপট জবাব দিল, 'ইস্কুলে আমি যাই না, আমাকে পাঠানো হয়।' এরপর আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে আবার খেলতে চলে গেল।

সিগারেট

খবরের কাগজে দেখলাম, হাওড়া স্টেশনে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরে অবশ্য রেল কোম্পানির বিজ্ঞাপনদৃষ্টে জানা গেল যে শুধু হাওড়া স্টেশনেই নয়, সব স্টেশনেই, সব প্ল্যাটফর্মে, রেলগাড়ির ভেতরে সিগারেট বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে।

আমার একটু মায়া হচ্ছে, হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে যে টোব্যাকো কর্নারটি ছিল সেই সিগারেট বিপণিটির জন্য। সেই দোকানটি অদ্যাবধি চালু ছিল কি না তা ঠিক জানি না। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে বন্ধুবান্ধবী, পরিচিত জনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একদা এটাই ছিল ঠিকানা। যাত্রা শুরুর জংশন।

আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতাম হাওড়া স্টেশনে দেখা হবে। হয়তো বন্ধুবান্ধব মিলে বাইরে যাব। ওই টোবাকো কর্নারে পরস্পরের দেখা হত। জায়গাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল, লোকে সিগারেট কিনতে আসত, কিনে চলে যেত।

অন্য সর্বত্র ভিড়। এখানটা একটু ফাঁকা, মাথার ওপরে স্টেশনের বড় ঘড়ি। নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে নিজেদের মধ্যে দেখা হয়ে যেত। তারপর যাত্রা শুরু।

ওই দোকান থেকে আমরা বেশি করে সিগারেট কিনে নিতাম। একটু সস্তা হত, মনে আছে ঠিক চল্লিশ বছর আগে যখন এক প্যাকেট চার্মিনারের দাম পুরনো সাত পয়সা তখন আট-আনা মানে

বত্রিশ পয়সায় এ দোকানে পাঁচ প্যাকেট চারমিনার পাওয়া যেত, তিন পয়সা সাশ্রয় হত। সে কম নয়, সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে ধর্মতলা থেকে কালীঘাট।

বহুদিন পরে হাওড়া স্টেশনে সিগারেট বিক্রি বন্ধের খবরে, এসব কথা মনে পড়ল। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভেসে গেছে চল্লিশ বছর। আমি অবশ্য এখন আর ধূমপান করি না, কিন্তু একদা শৃঙ্খলিত ধূমপায়ী ছিলাম, দৈনিক চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিগারেট খেয়েছি।

এ-বিষয়ে অবশ্য আদর্শ ছিলেন আমার এক খুল্ল-প্রপিতামহ। তিনি মৃত্যুশয্যায় শুয়েও নাকি হুঁকো টেনেছেন।

কথিত আছে স্থানীয় কবিরাজ তাঁকে বলেছিলেন, 'রায় মশায়, এখন আর তামাক খাবেন না। নিশ্বাসে তামাকে গন্ধ লেগে থাকবে। যখন পরলোকে পৌঁছবেন চিত্রগুপ্ত আপনার নিশ্বাসে তামাকের গন্ধ পাবে।'

বৃদ্ধ মুখ থেকে ক্ষণিকের জন্য গড়গড়ার নল বার করে নাকি বলেছিলেন, 'নিশ্বাস থাকবে কোথায়? আমার তো ধারণা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেই পরলোক যাব।'

পাটিগণিত

আমাকে যাঁরা বাল্যকাল থেকে ভালভাবে চেনেন, তাঁদের অধিকাংশই কালক্রমে ধরাধাম পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাটিগণিত বিষয়ক এই রম্যনিবন্ধ রচনা করছি।

আসল কথা হল, পাটিগণিত নিয়ে কোনও কিছুই লিখবার অধিকার আমার নেই।

অঙ্ক অর্থাৎ পাটিগণিত বিষয়ক আমার বাল্য কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলি অনেকেই জানেন। দায়ি অবশ্য আমি নিজেই, নিজের আত্মগ্লানির এই গল্পগুলি নানাজনকে নানা সময়ে বলেছি, দু'-একবার যে লিখিনি তাও নয়।

সেই প্রথমবার যেবার অঙ্কে শূন্য পেলাম, তখন আমি স্কুলের খুব নিচু ক্লাসে। রেজাল্ট বেরনোর পর রোষান্বিত পিতৃদেবের প্রহার থেকে সেবার আমাকে রক্ষা করেছিলেন আমার পরমা স্নেহময়ী পিসিমা।

পিসিমা যখন শুনলেন, আমি অঙ্কে শূন্য পেয়েছি বলে বাবা আমাকে মারতে যাচ্ছেন, তিনি ছুটে এসে মধ্যস্থতা করলেন, বাবাকে বললেন, 'জটু, খোকন যে কিছুই পায়নি তা তো নয়, শূন্য তো পেয়েছে। কতজন যে শূন্যও পায় না।' (বলা বাহুল্য জটু এবং খোকন যথাক্রমে বাবার এবং আমার ডাকনাম)

সেই শিশু বয়সে 'কিছুই যে পায়নি, তা তো নয়, শূন্য তো পেয়েছে', এই কথার অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য হয়নি। কিন্তু এখন এতকাল পরে জীবনের শেষ ভাগে পৌঁছে কেমন যেন মনে হচ্ছে শূন্য পাওয়াটা কম পাওয়া নয়।

দার্শনিকতা করে লাভ নেই, আমার পরবর্তী কৃতিত্বের কথা বলি।

তখন আমি স্কুলের একটু উঁচু ক্লাসে উঠেছি। সে বছর পরীক্ষায় অবশ্য শূন্য বা গোল্লা পাইনি, এগারো পেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে ইংরেজিতে একুশ, বাংলায় চব্বিশ।

রেজাল্ট দেখে পিতৃদেব রেগে আগুন, এই মারেন তো সেই মারেন, আমাকে ধমক দিলেন, 'পরীক্ষার ফল এটা কী হয়েছে, অঙ্কে এগারো, ইংরেজিতে একুশ, বাংলায় চব্বিশ।'

আমার মনে নেই, কিন্তু অনেকের কাছে শুনেছি, আমি নাকি বাবাকে বলেছিলাম, 'ওই রকমই হয়। যারা লিটারেচারে ভাল হয়, তারা অঙ্কে কাঁচা হয়।'

আমরা শিশুকালে পাঠশালায় পড়েছি ধারাপাত। দশ একে দশ, দশ দু'গুণে কুড়ি ইত্যাদি নামতা। আর আর্যা। সেই শুভঙ্করী আর্যা, এখন কি কারও মনে আছে।

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।'

এতকাল পরে ছড়াটি একটু গোলমাল হতে পারে কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার এ রকমই।

এই আর্যার মানেই বা কী, প্রয়োজনই বা কী ছিল? অথচ এর জন্যে কী পরিশ্রমই না করেছি, শৈশবের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি পণ্ডশ্রমে ব্যয় করেছি।

আমরা বড় হয়ে পড়েছি যাদববাবুর পাটিগণিত। আমরা মানে, বাপ-জ্যাঠা-দাদা-ছোট ভাই-বোনেরা সবাই ওই যাদববাবুর বই পড়েছে। যাদববাবু হলেন খ্যাতনামা অঙ্কবিশারদ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে বাঙালি তাঁর বই পড়ে অঙ্ক কষা শিখেছে।

এই বইয়েই ছিল, বানর আর তৈলাক্ত বাঁশের সেই রহস্যময় অঙ্ক। তেল মাখানো বাঁশ বেয়ে একটি বানর সেকেন্ডে তিন ফুট ওঠে আর পরের সেকেন্ড দু' ফুট নেমে যায়। বাঁশটির দৈর্ঘ্য যদি কুড়ি ফুট হয়, তবে কত সেকেন্ডে সে বাঁশের ডগায় উঠবে।

লীলা মজুমদার মহাশয়ার গল্পের নায়ক এই অঙ্কের উত্তর বার করেছিল আড়াইটা বানর।

এর চেয়েও মারাত্মক শিবরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাহিনীতে দুইয়ে-দুইয়ে চার না হয়ে দুইয়ে দুইয়ে দুধ হয়েছিল। অবশ্য পরের দুইয়ে-দুইয়ে ক্রিয়াপদ, গোরু দুইয়ে-দুইয়ে দুধ।

তা, সেই যাদববাবুর পাটিগণিতেরও অনাচার কিছু কম ছিল না।

দুধ দোয়ানোর গল্পে সেই দুধে জল মেশানোর লাভ-ক্ষতির প্রশ্নের কথা মনে পড়ছে।

এক গোয়ালা তিন পয়সা মূল্যের বারো সের দুধের সঙ্গে পাঁচ সের জল মিশিয়ে আড়াই পয়সা সের দরে বিক্রয় করল। তার লাভ বা ক্ষতি কত হল?

হায় রে? কোথায় গেল সেই তিন পয়সা, আড়াই পয়সা সেরে দুধ! জল মেশানো কিন্তু অব্যাহত রয়েছে।

অপচয়ের কথাও যথেষ্ট ছিল।

একটি পঞ্চাশ গ্যালন চৌবাচ্চায় ঘণ্টায় পাঁচ গ্যালন করে জল প্রবেশ করছে আর একটা ফুটো দিয়ে প্রতি দু' ঘণ্টায় তিন গ্যালন করে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কতক্ষণ লাগবে?

অঙ্কের সেই সব ভয়াবহ বিভীষিকাময় দিন এখনও শেষ হয়নি। তবে ক্যালকুলেটার, কমপিউটারের যুগ এসে গেছে। আগামীদিনে মাথার কাজ অনেকটাই ওই গণকযন্ত্র করবে।

ইত্যবসরে একালের অঙ্কের গল্প একটা বলে এই আখ্যান শেষ করি।

নার্সারি স্কুলের দিদিমণি এক শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার এক হাতে যদি চারটে আপেল থাকে আর অন্য হাতে তিনটে আপেল, তা হলে আমার কী আছে?'

নির্বিকার কণ্ঠে শিশুটি বলল, 'তা হলে আপনার হাত খুব বড় আছে আন্টি।'

পুনশ্চ

হিসাব রক্ষকের চাকরির এক ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম। এক প্রার্থীকে সে বছরের হিসেব

দেখিয়ে বললাম, 'এদিকে আয়, ওদিকে ব্যয়। ভাল করে যোগ-বিয়োগ করে হিসেবটা দেখে বলুন তো কী অবস্থায় আছি।'

প্রার্থী বললেন, 'স্যার, আপনি যেমন চাইবেন তেমনই হবে। যোগ-বিয়োগ আমি সেই ভাবে করব।

গ্রন্থবার্তা

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ এবং শ্রীমতী সুচরিতা নিয়োগী, স্বামী-স্ত্রী। এখনও তত বুড়ো হননি, এমন দম্পতি।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পেনশনার। একজন রেলে, অন্যজন এ জি বেঙ্গলে কাজ করতেন। মহার্ঘ ভাতা সমেত পেনশন থেকে যা আয় হয় তাতে দু'জনের ভালই চলে যায়। বিশেষ কোনও দায়-দায়িত্ব নেই, বরং সুরাহা আছে। সন্তান-সন্ততি বলতে একটি মাত্র মেয়ে ও তার বর, একটি নাতনি। মেয়ে-জামাই দু'জনেই ডাক্তার, বহুদিন লন্ডনে আছে, নাতনিটিও তাদের কাছে। বিলেত থেকে টুকটাক উপহার আসে।

এখানে কলকাতায় বেলেঘাটায় পৈতৃক বাড়িতে প্রমথেশবাবু থাকেন। তাঁর একমাত্র স্বভাবদোষ, রবিবার দুপুরে পাঁঠার মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া। পাঁঠার মাংস আজকাল সহজলভ্য নয়, সর্বত্রই খাসির মাংস, তিনি রবিবার সাতসকালে উঠে বেলগাছিয়া চলে যান পাঁঠার মাংস কিনতে। সেই মাংস সুচরিতা পেঁয়াজ-রসুন বাদ দিয়ে ছোট আলু আর ঘি, গরম মশলা দিয়ে সাবেকি, সাত্ত্বিকভাবে রান্না করেন।

সুচরিতা দেবীরও কোনও দোষ নেই, শুধু জর্দা পান ছাড়া। যে কোনও রকম জর্দা হলেই হয়, কিন্তু পানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ জর্দা তাঁর চাই। তিনি নিজেই নিজের পান সাজেন, চুন-খয়ের, জাঁতি-বাটা সমেত পানের সব সরঞ্জাম তাঁর সাজানো রয়েছে।

এ ছাড়াও নিয়োগী দম্পতির, স্বামী-স্ত্রী দু'জনারই একটি সাধারণ দোষ আছে, সেটি হল বই পড়া। বলা বাহুল্য, শুধু তাই নয় খবরের কাগজ, পত্রিকা, ম্যাগাজিন যা হাতের কাছে পান তাই পড়েন।

আশেপাশের পাড়ার দু'-তিনটে পাঠাগারের তাঁরা সদস্য। অবসরের পর থেকে শুধুই বই পড়ে যাচ্ছেন। বই মানে বাংলা গল্প-উপন্যাস। বঙ্কিম-শরৎ থেকে সুনীল-শীর্ষেন্দু, শংকর-বুদ্ধদেব গুহ, এঁদের যেখানে যে বই পান, মিস্টার এবং মিসেস নিয়োগী গোগ্রাসে আত্মস্থ করেন। দুঃখের বিষয় তারাপদ রায়ের লেখা তাঁদের মোটেই পছন্দ নয়। এত হালকা লেখায় তাঁদের মনের সায় নেই।

সে যা হোক, নতুন বই আর নিয়োগীরা খুঁজে পান না। প্রতি বছর পুজোর সময় সবরকম কাগজ মিলিয়ে গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেগুলির আয়তন খুবই ছোট। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর দুমাসের খোরাক চলে যায়। তারপর আবার ভুখা। প্রমথেশ এবং সুচরিতা হাজার চেষ্টা করেও নতুন পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ করতে পারেন না। আবার করে কৃষ্ণকান্তের উইল, শ্রীকান্ত, নৌকাডুবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়েন।

অবশেষে স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি ছোট সিদ্ধান্তে এলেন। দু'জনেই মোটামুটি ইংরেজি জানেন, তাঁরা ঠিক করলেন, এবার থেকে ইংরেজি বই পড়া আরম্ভ করবেন।

একটি সুযোগও এসে গেল। বাড়িতে পুরনো বই-কাগজের ফেরিওয়ালা খবরের কাগজ কিনতে এসেছিল, তার ঝোলায় অন্য বাড়ি থেকে কেনা সামনের পাতা ছেঁড়া, একটু পুরনো, জীর্ণ ইংরেজি বই পাওয়া গেল। প্রমথেশ বইটা তুলে দেখলেন, একটা নাটক, একটু খটমট ভাষা, তবে নীচে ফুটনোটে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

ফেরিওয়ালার ঝোলায় একটা কয়েক মাস আগের রিডার্স ডাইজেস্টও পাওয়া গেল। খুচরো কাহিনী ও টুকরো তথ্যের এই বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকাটি প্রমথেশবাবুর খুবই প্রিয়, কিন্তু দাম বেশি বলে কিনতে পারেন না।

ফেরিওয়ালা এই দুটি বই ওজন করে একটু আগেই হয়তো একটাকা বা দেড়টাকা দিয়ে কিনেছে, এখন দাঁও বুঝে প্রমথেশবাবুর কাছ থেকে ওই দুটোর জন্যে পাঁচ দু' গুণে দশ টাকা নিল।

রিডার্স ডাইজেস্ট হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে প্রমথেশ সুচরিতার হাতে নাটকটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি এই নাটকটা পড়ার চেষ্টা করো দেখি, দরকার হলে ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারিটা সঙ্গে রাখো।'

সুচরিতা অধ্যবসায়ী পাঠিকা, চোখে চশমা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাটক পড়া শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে বাজার করে ফিরে এসে প্রমথেশ দেখেন নাটক পাঠ প্রায় অর্ধেক শেষ। সুচরিতা রীতিমতো উত্তেজিত, বললেন, 'দুর্ধর্ষ কাহিনী, রীতিমতো রহস্য-রোমাঞ্চ, ফেলুদা-ব্যোমকেশ এমনকী নীহার গুপ্ত কোথায় লাগে! তার ওপরে কত কোটেশন, সেই ছোটবেলায় ইস্কুল-কলেজে পড়েছি এমন সব কোটেশন।'

ঘণ্টা দুয়েক পরে একটানে বইটা পড়া শেষ করতে প্রমথেশ সুচরিতাকে প্রশ্ন করলেন, 'ভাল?' সুচরিতা বললেন, 'সাংঘাতিক কাহিনী। রক্তেরাঙা নাটক। খুন-আত্মহত্যা, অশরীরী আত্মা। ভাই ভাইকে খুন করে তার কাজকর্ম এমনকী বউ পর্যন্ত কেড়ে নিল। বোকা ভাইপো রাতে অশরীরী কণ্ঠস্বর শোনে। সে তার প্রেমিকার বাবাকে, ভাইকে এমনকী নিজের কাকাকে খুন করল, তারপর নিজেই আত্মহত্যা করল। কী মারাত্মক সব ঘটনা। টিভি সিরিয়াল হলে যা জমবে।'

পাশের বাড়িতে থাকেন অধ্যাপক নিবারণ রায়। তিনি কলেজে ইংরেজি পড়ান, প্রমথেশ তাঁকে নিয়ে ছেঁড়া বইটা দেখালেন, তিনি বইটি এক পাতা উলটিয়েই বললেন, 'এ তো শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট।'

প্রেমিক-প্রেমিকা

একদা এক ঈর্ষাপরায়ণ প্রেমিক তার প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার আগে, আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে ভালবেসেছে।'

সবাই জানেন, বিশেষত পাঠিকা ঠাকুরানিরা জানেন, এসব প্রশ্নের উত্তর হয় না, সহজে উত্তরে দেয়া যায় না।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেমিক নাছোড়বান্দা, তাকে জানতেই হবে সে তার প্রেমিকার প্রথম প্রেমিক কি না। অবশেষে বাধ্য হয়ে প্রেমিকা কবুল করল, খুবই সংক্ষিপ্ত সেই কবুলিয়ত, 'হ্যাঁ।'

এবার প্রেমিকবাবু উত্তেজিত হয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করল, প্রেমিকার কাছে দাবি করল, 'তুমি তার নাম-ঠিকানা বলো, আমি তাকে দেখে নেব।'

প্রেমিকের এবম্বিধ অবস্থা দেখে প্রেমিকা বেচারিনি কম্প্রকণ্ঠে জানাল, 'সে যে অনেকজন, কম পক্ষে দশ-পনেরো হবে, তুমি একা এতজনের সঙ্গে লড়বে কী করে?'

হিন্দি ফিল্মে অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র এবং অনুরূপ আরও অনেকে একা খালি হাতে এমন দশ-পনেরো জনের সঙ্গে লড়েছেন এবং জিতেছেন। আমাদের এই হাঁটুঝুল পাঞ্জাবি, আলিগড়ি পাজামার প্রেমিক যুবকটি মারদাঙ্গায় চিত্রতারকাদের মতো সব্যসাচী নন, তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধার পর পুরুষোচিত ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করে ঘোষণা করলেন, 'একেকটাকে হাতের কাছে পাব আর তক্তা করে দেব।'

আর-এক প্রেমকাহিনী একটু অন্য জাতের।

ঘটনাটি অতি সাম্প্রতিককালের, তাই কিঞ্চিৎ রয়েসয়ে, রেখে ঢেকে বলতে হচ্ছে।

সূর্য আর চন্দ্র দু'জনে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। আজ কিছুদিন হল চন্দ্র রোহিণী নামের একটি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। দুঃখের বিষয় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকায় এর মধ্যে সূর্যের সঙ্গে রোহিণীর পরিচয় হয়নি। তবে চন্দ্রের কাছে রোহিণীর কথা শুনেছে। ক্লাবের টেবিলে অথবা অসময়ে টেলিফোনে গদগদ গলায় চন্দ্র রোহিণীর রূপগুণের ব্যাখ্যান করেছে বন্ধু সূর্যের কাছে।

অবশেষে এই বড়দিনের সন্ধ্যায় এক টইটুম্বুর পার্টিতে সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল চন্দ্রের প্রেমিকা রোহিণীর। চন্দ্রের পছন্দ দেখে খুব খুশি হল সূর্য, চমৎকার মেয়ে রোহিণী, ঝকমকে, ঝলমলে। বিদ্যাবুদ্ধিও আছে।

খুব আলাপ জমে গেল সূর্যের বন্ধুর প্রেমিকার সঙ্গে। এই পর্বও ভালই চলছিল কিন্তু বড়দিনের পরের দিন সকালে হ্যাংওভার-ক্লিষ্ট সূর্য একটা ফোন পেল সাতসকালে, 'হ্যালো, সূর্য আমি রোহিণী বলছি, খুব ভাল লাগল কালকে। তা আজ সন্ধ্যাবেলা কী করছ?'

একটু ইতস্তত করে সূর্য বলল, 'তেমন কিছু নয়।'

রোহিণী বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, 'আমাদের বাড়িতে চলে এসো।'

কী আর বলবে সূর্য, রাজি হয়ে গেল। তারপর বন্ধু চন্দ্রকে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা বলল। চন্দ্র আকাশ থেকে পড়ল, সেকী, আমি তো কিছু জানি না।

সন্ধ্যাবেলা রোহিণীদের বাসায় গিয়ে সূর্য অবাক। আর কেউ নেই। সুসজ্জিতা, সুরভিময়ী একা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এমন একটা মোহময়ী সন্ধ্যা সূর্যের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না।

এই রকম চলল কয়েক সপ্তাহ। প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় রোহিণীর ডাক আসে। এদিকে চন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের দূরত্ব তৈরি হয়েছে, প্রতিদিনই বাড়ছে।

চন্দ্র আজকাল কদাচিৎ ফোন করে সূর্যকে। সূর্য ফোন করলে ফোন নামিয়ে রাখে। ক্লাবে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

সূর্য কিন্তু বন্ধুত্বের অবমাননা করেনি। গল্পগুজব হাসিঠাট্টার বেশি রোহিণীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এগোয়নি, অবশ্য রোহিণীও খুব একটা বাড়াবাড়ি করেনি।

যবনিকা উত্তোলন হল দেড় মাসের মাথায়। একদিন সকালে চন্দ্র ফোন করে বলল, 'আজ সন্ধ্যাবেলা রোহিণীদের বাসায় আসিস।' বিস্ময়ের পর বিস্ময়, একটু পরেই ফোনে রোহিণী একই অনুরোধ করল।

সেদিন সন্ধ্যায় রোহিণীদের বাড়িতে গিয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতা হল সূর্যের। শুধু সূর্যের নয়, সূর্য-চন্দ্র দু'জনারই। রোহিণী জানাল এ দেড়মাস সে চন্দ্রের প্রেমের গভীরতা, সূর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় চন্দ্র কতখানি ধৈর্যহারা, ঈর্ষাপরায়ণ, এসব বিচার করছিল। চন্দ্র সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এ খেলার আর প্রয়োজন নেই। সুতরাং 'ধন্যবাদ', রোহিণী উঠে গিয়ে সূর্যের ললাটে, এই প্রথম, একটি স্নেহচুম্বন নিবেদন করল।

পুনশ্চ:

চন্দ্র-সূর্যের ব্যাপারই আলাদা। এবার ঘরের কাছে আসি। ঘরের কাছে মানে গঙ্গারাম। গঙ্গারাম তখন চুটিয়ে প্রেম করছে আর কবিতা লিখছে। প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় ঠিকঠাক। গঙ্গারাম তখন প্রেমিকাকে বলল, 'মানসী, আমি যে কবিতা লিখি সেকথা বাড়িতে বলেছ?' মানসী বলল, 'তুমি যে আধা বেকার, তুমি যে মাঝেমধ্যে মদ খাও, রেসের মাঠে যাও এসব কথাই বাড়িতে জানিয়েছি। কিন্তু কবিতা লেখার কথাটা বলিনি। তা হলে কিন্তু বিয়ে ভেঙে যাবে। বাবা-মা এতটা সহ্য করবেন না।'

ডাক্তারবাবু

সত্যি মিথ্যে জানি না।

হলফ করে কিছু বলতে পারব না।

ডাক্তারবাবুরা মানী লোক, তাঁরা আমাদের প্রাণের প্রহরী। তাঁদের নিয়ে হালকা ঠাট্টা, হাসাহাসি মোটেই উচিত নয়।

গল্পটা আমাকে যিনি বলেছেন, তাঁর নাম বলা যাবে না। তিনিও মানী ব্যক্তি, একটু রাখ-ঢাক করে গল্পটা লিখছি।

না লেখাই বোধহয় ভাল ছিল। কিন্তু আমার তো পরিত্রাণ নেই। দিনান্তে, নিশান্তে, মাসান্তে আমাকে অনবরত হাসির গল্প লিখতেই হবে। এই আমার নিয়তি।

ডাক্তারবাবুরা নিজ গুণে দয়া করে ক্ষমা করবেন, আগে যেমন অনেকবার করেছেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ কলকাতার একটি বাজার থেকে ডাক্তারবাবু পরিচারকসহ বাজার করে বেরচ্ছেন। এটি তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। হাজারো চাপের মধ্যেও সন্ধ্যায় একবার বাজারে আসা চাই। নিজের পছন্দমতো তরিতরকারি, ফলমূল, মাছ কিনতে তিনি ভালবাসেন।

বাজার থেকে বেরনোর মুখে একই পাড়ার এক ভদ্রলোক, ডাক্তারবাবুর পুরনো রুগি, তাঁর সঙ্গে দেখা।

এই ভদ্রলোক একটু তরল প্রকৃতির। পুজোর পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর এই প্রথম দেখা। ভদ্রলোক বাজারে ঢুকছেন, ডাক্তারবাবু বেরচ্ছেন। দু'জনে মুখোমুখি হতে ডাক্তারবাবু নমস্কার করে ভদ্রলোককে বললেন, 'শুভ বিজয়া'। ভদ্রলোকও যথারীতি প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'শুভ বিজয়া।'

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ডাক্তারবাবু এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কেমন আছি শুনলে আপনি খুশি হবেন না।'

বিস্মিত ডাক্তারবাবু বললেন, 'মানে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ভাল আছি। কিন্তু আমি ভাল থাকলে তো আপনারই ক্ষতি, সে কথা শুনলে আপনি খুশি হবেন কেন?'

এরপরে কী হয়েছিল, জানি না। কিন্তু যে ভদ্রলোক এই গল্পটা আমাকে বলেছেন তিনি অনেকদিন আগে ডাক্তারবাবুদের নিয়ে অন্য এক ব্যাপার বলেছিলেন। সে ব্যাপারটা আমি তখনকার পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে ছিলাম, নতুনদের জন্যে আবার লিখছি।

অধিকাংশ ডাক্তারবাবু রুগিকে একটা ধরাবাঁধা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, 'রাতে কী খান?'

রুগির চিকিৎসার জন্যে তার নৈশাহারের খোঁজ নেওয়া খুব জরুরি নয়। ডাক্তাররা না কি এই প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে চান, রোগীর আর্থিক অবস্থা কেমন, সে অসুখের জন্য কতটা খরচ করতে পারবে।

কেউ হয়তো বলবে, রাতে আর কী খাব, ওই দিনে যা খাই ভাত-ডাল-তরকারি, মাছ থাকলে মাছ, অল্প করে খাই। অন্যজন বলেন, রাতে তেমন কিছু খাই না, একটু দুধ-খই খাই, কেউ হয়তো অম্বলের, ক্ষুধামান্দ্যের রোগী। রাতের বেলা এক মুঠো মুড়ি জলে ভিজিয়ে খান।

আবার অন্যদিকও আছে। সংগতি সম্পন্ন রোগী হুইস্কি সহকারে চিকেন তন্দুরি দিয়ে নৈশাহার সমাপন করেন। আবার সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধনী মহিলা রাতে সামান্য আট-দশটা ঘিয়ে ভাজা লুচি রাবড়ি কিংবা রাজভোগ দিয়ে খান।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। রোগীর নৈশাহার অনুযায়ী ডাক্তারের বিল, রোগীর চিকিৎসা হয়।

সব ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই এরকম নন।

রোগীর আহারের সূত্রে সেই মরমি ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ছে।

ডাক্তারবাবুর রুগিটি স্থূলোদর এবং খাদ্যলোলুপ। তার কোনও অসুখই নেই, আবার সব অসুখই আছে। রক্তচাপ, সুগার, মেদাধিক্য, পা ফোলা, ঘাড় ব্যথা ইত্যাদি নানা ঝামেলা, সবই অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের ফলে ভয়াবহ মোটা হওয়ার জন্যে।

ডাক্তারবাবু রোগীর কাছে জানতে চাইলেন তাঁর দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে। বিস্তারিত বিবরণ শুনে ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল, সকালে শিঙাড়া, নিমকি, জিলিপি ইত্যাদির প্রাতরাশ দিয়ে শুরু আর অনেক রাতে মাংস পরোটা দিয়ে সমাপ্তি।

ডাক্তারবাবু পরিবর্তিত খাদ্য তালিকা তৈরি করে দিলেন। ক্রিমক্রেকার বিস্কুট, শশা, মুড়ি, ছোট মাছ, হালকা ডাল, ভাত ইত্যাদি।

পরের মাসে ডাক্তারবাবু এসে দেখেন যে রোগীর ওজন আরও তিন পাউন্ড বেড়েছে। রোগী রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে।

ডাক্তারবাবু অবাক। ব্যাপারটা কী?

অথচ রোগী বললেন, তিনি ডায়েটিং করছেন। ডাক্তারবাবুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন।

অনেক চেষ্টার পরে ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন, ভদ্রলোক আগে শিঙাড়া, জিলিপি, পরোটা-মাংস যা যা খেতেন সেসব খেয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে যোগ হয়েছে এই ডায়েটিংয়ের বিস্কুট, শশা, ডাল-ভাত ইত্যাদি। ওটার বদলে যে এটা খেতে হবে রোগী সেটাই মানেনি।

পুনশ্চ

ডাক্তার-রুগির গল্প শেষ হওয়ার নয়। এর বাইরের একটা গল্প বলি।

একটি ছেলে তার বাবাকে বলল, 'বাবা আমি পশু চিকিৎসক হব।'

বাবা অবাক। ছেলে চিকিৎসক না হয়ে পশু-চিকিৎসক হতে চাইছে কেন?

কারণটা অবশ্য পরিষ্কার। বালকটি প্রতিদিনই কাগজে দেখছে, চিকিৎসকেরা কারণে-অকারণে নিগৃহীত হচ্ছেন। হাসপাতাল, নার্সিংহোম ভাঙচুর হচ্ছে।

ছেলেটি বাবাকে বলল, 'আর যাই হোক পশু-চিকিৎসক হলে, চিকিৎসায় ভুল-টুল যতই হোক মারধোর খেতে হবে না। জীবজন্তুরা ঝামেলা বাধাবে না।

বধূমাতা

সংস্কৃত 'বধূমাতা' থেকে বাংলায় বউমা। 'বউমা' এই সমাসবদ্ধ ক্ষুদ্র শব্দটি খুবই সুন্দর ও মধুর।

কন্যাসমা পুত্রবধূর সম্বোধনটি মধুর হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনিই মাতৃতুল্যা শ্বশুর ঠাকুরানি হলেন মা, আজকাল অবশ্য 'শাশুড়ি-মা' সম্বোধনও শোনা যাচ্ছে। নবযুগের বধূমাতারা স্বামীর মাকে মা বলতে সংকোচ বা অসুবিধা বোধ করেন।

এই সূত্রে বাংলা শাশুড়ি শব্দটিও কিন্তু লক্ষণীয়। শ্বশুরের লিঙ্গান্তর, প্রশ্নপত্রের ভাষায় লিঙ্গ-পরিবর্তন হল শাশুড়ি। আদিতে একটা ব ফলা সমেত শ্বশুর শব্দটি বেশ ছিমছাম। কিন্তু যেমন ময়ুর-ময়ূরী, তেমন শ্বশুর-শ্বশুরি নয় কেন? শাশুড়িতে ব ফলা কোথায় গেল, র কী করে ড় হল, আবার কোথা থেকে এল।

শাশুড়ি বউমার এই দুঃখজনক আলোচনার ব্যঞ্জনগত এই প্রশ্নগুলো নিয়ে সময় ও স্থান নষ্ট করার সুযোগ নেই।

সুতরাং গল্পে যাচ্ছি, এবং ওই যা বললাম, দুঃখজনক গল্প।

বউ যদি বলেন, দুঃখজনক কেন তা হলে গল্পগুলো অনুধাবন করুন।

সারাদিন অফিসে বিস্তর খাটাখাটি করে সন্ধ্যাবেলায় বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরে তরুণ গৃহকর্তাটি দেখলেন সর্বনাশ! বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া।

প্রশ্ন উঠবে, এ আর নতুন কী? এ তো চিরাচরিত ঘটনা। এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে।

টুকটাক, খুটখাট, চিৎকার-চেঁচামেচি আর তার থেকে ব্যাপারটা অনেক বেশিদূর গড়িয়েছে।

গৃহকর্তা ঘরে ফিরে দেখলেন যে তাঁর জননী বাইরের ঘরে সোফায় বসে বসে কাঁদছেন। ওপাশে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘর, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ, তার মানে সেখানে স্ত্রী রয়েছেন দরজা বন্ধ করে।

মা পায়ের কাছে একটা পুরনো সুটকেশ নিয়ে বসে রয়েছেন। ছেলেকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন, 'তুই আমাকে একটা বৃদ্ধাবাসে রেখে আয়, আমি আর তোর বাসায় থাকব না।'

বৃদ্ধাবাসে জায়গা পাওয়া যায় না। আগে থেকে দরখাস্ত করতে হয়। ছেলে মাকে জানাল।

মা বললেন, 'তা হলে আমাকে যে কোনও জায়গায়, যে কোনও রাস্তার মোড়ে ছেড়ে আয়, আমি ফুটপাথে থাকব। ভিক্ষে করে খাব। তবু তোর বাড়িতে আর একদণ্ড থাকব না।'

কিন্তু আজ ব্যাপার গুরুতর। অনেক চেষ্টার পর মায়ের কাছ থেকে তরুণটি জানতে পারল, বউ মায়ের কাচের ফুলদানি ভেঙে দিয়েছে। মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তিরিশ বছরের পুরনো বিলিতি ফুলদানি, আমার বিয়েতে রাঙামামা উপহার দিয়েছিলেন।'

কিন্তু ফুলদানি ভাঙল কী করে? অনেক চেষ্টা করে যুবকটি বুঝতে পারলেন বউয়ের খুব একটা দোষ নেই। শাশুড়ি ঠাকরুন উত্তেজনার মাথায় বউমাকে ফুলদানিটা ছুড়ে মেরেছিলেন। তরুণী নববধূ মোক্ষম মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে যাওয়ায় ফুলদানিটা তার গায়ে না লেগে দেওয়ালে লেগে ভেঙে যায়।

এ গল্পের শেষ নেই। বলা বাহুল্য, শাশুড়ি ঠাকরুনের এখনও বৃদ্ধাবাসে যাওয়া হয়নি। হয়তো কোনও দিনই হবে না। চিরদিন এ ভাবেই চলবে।

তবে শোনা যায়, ফুলদানি ভাঙার ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই শাশুড়ি ঠাকুরানির মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছিল।

একদিন দুপুরবেলা, তখন ছেলে অফিসে, কোথাকার এক বৃদ্ধাবাস থেকে উদ্যোক্তারা পাড়ার মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরছিল আশ্রমের জন্যে জিনিসপত্র, রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য।

বাসায় কড়া নাড়তে দরজা খুলে সংগ্রাহকদের কথা শোনার পর ভিতরের ঘরে গিয়ে বউমা ঘুমন্ত শাশুড়িকে টেনে নিয়ে আসেন বৃদ্ধাবাসে দান করবেন বলে। সেদিন নাকি বহু কষ্টে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন শাশুড়ি ঠাকরুন।

অবশ্য অতঃপর আর বৃদ্ধাবাসের জন্যে কোনওদিন আবদার করেননি তিনি। তবুও ঝগড়া, গোলমাল থামেনি। অবশেষে স্ত্রী এবং মায়ের নৈমিত্তিক ঝগড়ায় অতিষ্ঠ ছেলে একদিন তার বউকে বলেছিল, 'আচ্ছা তুমি আর মা মিলেমিশে থাকতে পার না?'

বউ বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে তারপর সোজা বলেছিল, 'না। পারি না।'

অনুনয়ের কণ্ঠে স্বামী বেচারা বলে, 'দ্যাখো, আমাদের বাড়ির ওই কুকুর বেড়াল, ভুলো আর হুলো ওরা দু'জন দু' জগতের জানোয়ার হয়েও কেমন মিলেমিশে সহাবস্থান করছে, তুমি আর মা দু'জনে কি সে ভাবে থাকতে পার না?'

বউ বলল, 'তুমি বেড়ালের লেজটা কুকুরের লেজের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বেঁধে দাও, তারপর দ্যাখো ভুলো আর হুলো কেমন সহাবস্থান করে?'

কেনাবেচা

কেনারাম এবং বেচারাম শিশুসাহিত্যের এবং আধা রূপকথার পরিচিত এবং প্রিয় চরিত্র। এক ধরনের কিশোর কাহিনীতে এদের প্রবেশ একদা ছিল অনিবার্য।

কেনারাম কেনে, বেচারাম বেচে। এই দুই ব্যক্তিকে আমরা ভালভাবেই চিনি। প্রথম ব্যক্তিটি, ওই কেনারাম হয়তো আমি নিজেই এবং আপনিও যদি না আপনি ব্যবসায়ী বা দোকানদার হন। তা হলে আপনি বেচারাম।

ধ্বনিসাদৃশ্য থাকলেও বেচারাম কিন্তু মোটেই বেচারা নয়। কেনাবেচায় বেচারামেরই নাম।

তবে এমন লোকও আছেন, যিনি একসঙ্গে একই জিনিস কেনাবেচা করেন, কেনেন এবং তারপরেই বেচেন। পরের দিন হয়তো বা কাল বেচেছেন তাই আবার কেনেন।

এঁদের বলা হয় দালাল, যেমন শেয়ারের দালাল, পাটের দালাল ইত্যাদি। পুরনো বোম্বাই এখনকার মুম্বাইয়ের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান এলাকাই হল দেশের আর্থিক প্রাণকেন্দ্র দালাল স্ট্রিট।

দালাল শব্দটি অসম্মানজনক নয়। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে দালাল শব্দটির অর্থের অধঃপতন হয়েছে।

একদা অন্য দশটা জীবিকার মতোই দালালি একটি জীবিকা বলে পরিগণিত হত। আমার মাতামহ পাট ব্যবসায়ী ছিলেন। হাট থেকে পাট কিনে পাটকলের সাহেবদের কাছে বেচতেন। খুব ছোটবেলায় রেলগাড়িতে দিদিমার সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছি, এক সহযাত্রিণী দিদিমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্বামী কী করেন?'

নির্বিকারভাবে, সসম্মানে মাতামহী তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার কর্তা দালাল। পাটের দালালি করেন।'

আজকাল কেউ চট করে স্বীকার করবেন না যে তিনি দালাল, কিংবা তাঁর কেউ দালালি করেন।

দালালকে ইংরেজিতে বলে ব্রোকার (Broker)। শেয়ারের দালাল হলেন স্টক ব্রোকার। দুটি অভিধানে দালাল শব্দটির দু' রকম অর্থ দেয়া আছে। 'চলন্তিকা' বলছে দালাল মানে হল যে ব্যক্তি ক্রেতার সহিত বিক্রেতার যোগ ঘটায়। অতি সাম্প্রতিক 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' বলছে দালাল মানে হল যে পারিশ্রমিক নিয়ে কেনাবেচায় সাহায্য করে।

আর কেনাবেচা বা দালালি নিয়ে শাব্দিক কচকচি নয়, এবার একটি গল্পে আসি।

কেনাবেচার ব্যাপারে এই গল্পটা আমি শুনেছিলাম টাঙ্গাইল বাজারে। সম্প্রতি একটা বিলিতি জোক বুকেও একটা গল্প পেলাম। যত দূর মনে পড়ছে, ইতিমধ্যে বসানো অন্য চেহারায় এই একই গল্প আমি নিজেও কোথায় যেন বলেছি।

কিস্টো (কৃষ্ণ) ঘোষ নামে জনৈক গ্রাম্য গোয়ালা শহরে এসেছেন কেনাকাটা করতে। এ দোকান সে দোকান ঘুরে তিনি গোরুর দড়ি কিনেছেন, দুধ দোয়ার গামলা কিনেছেন। অবশেষে একটা সাইকেলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জর্দা পান চিবোতে চিবোতে একটা কাঁচি সিগারেট মনের সুখে টানছেন।

এমন সময় সাইকেলের দোকানদার কৃষ্ণ ঘোষকে বললেন, 'ও কিস্টোবাবু, এত গোরু দিয়ে কী করেন? একটা সাইকেল কিনুন।'

কৃষ্ণ ঘোষ বললেন, 'সাইকেল দিয়ে কী করব?'

দোকানদার বললেন, 'সাইকেল চড়বেন। আর পায়ে হাঁটতে হবে না। গোরুর পিঠে চড়ে তো আর যাতায়াত করতে পারবেন না। সাইকেলে আরামে চলাফেরা করতে পারবেন।'

কৃষ্ণ ঘোষ নাকি কিছুক্ষণ চিন্তা করে দোকানদারকে বললেন, 'তা তো পারব। কিন্তু আপনার সাইকেল দুইলে কি দুধ পাওয়া যাবে?'

এর পরে সেই সাইকেল বিক্রি হয়েছিল কি না গল্পের শেষে সেটা ছিল না।

অবশেষে নাটিকাকারে শেষ গল্প।

ক্রেতা ও দোকানি

ক্রেতা: মুগের ডাল আছে?

দোকানদার: না।

ক্রেতা: ঘি আছে?

দোকানদার: না তো।

ক্রেতা: গোবিন্দভোগ চাল আছে?

দোকানদার: না, ওটাও নেই।

ক্রেতা: গরমমশলা?

দোকানদার: সেও ফুরিয়ে গেছে।

ক্রেতা: তালা আছে?

দোকানদার: হ্যাঁ, তালা আছে। ভাল তালা আছে।

ক্রেতা: তা হলে এবার দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে, তালা লাগিয়ে দিন।

বালিশ

আমাদের ছোট বয়েসে একটা কথার কথা ছিল, 'নালিশ করে কয়টা বালিশ পেলি?'

নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, বাদবিতণ্ডা হলে ছোটরা কেউ অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে নালিশ করত এবং সে নালিশ যদি বিফলে যেত (প্রায়ই যেত), তা হলে নালিশকারীকে অন্যেরা বিদ্রূপ করত, 'কী রে নালিশ করে কয়টা বালিশ পেলি।'

বলা বাহুল্য, এখানে নালিশ শব্দটির সঙ্গে বালিশের সুমসৃণ মিলবশত এই আশ্চর্য বাক্যটির উৎপত্তি। এই শব্দটির কোনও প্রতীকী অর্থ খুঁজতে যাওয়া অনর্থক হবে।

তবে বালক বয়েসে, নালিশ করে বালিশ না পেলেও বালিশ আমাদের অপার আনন্দ দিয়েছে সে আনন্দ সুখস্বপ্ন কিংবা সুখনিদ্রার নয়। বালক বয়েসে কেই বা তার তোয়াক্কা করে। বালিশের দৌলতে আমরা পেয়েছি অনাবিল উত্তেজনার আনন্দ।

রাতে আমাদের ছোটদের খাওয়া হয়ে গেলে বড়রা যখন খেতে বসত আমরা শোয়ার ঘরে চলে আসতাম। আমার আর দাদার শোয়ার জায়গা ছিল দালানের মধ্যের ঘরে, ঠাকুমার খাটে। খাট নয়, সেটা ছিল কালো মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক, বিশাল আয়তন, বিরাট বিছানা।

অল্প কিছুদিন আগেই আমাদের সেই চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া ছোট শহরে বরিশালের বিখ্যাত নট্ট কোম্পানি এসে যাত্রা করে গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল 'কর্ণার্জুন' পালা।

সেই কর্ণার্জুনের ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ প্রতি রাতে পুনরভিনীত হত আমাদের বিছানায়। দাদা হত দুর্যোধন, আমি মোটাসোটা ছিলাম বলে আমি হতাম ভীম। কিন্তু এই খণ্ডপালায় প্রায় নিয়মিতই ভীম পরাজিত হত। মহাকাব্যের অনুশাসনের প্রতি দাদার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না।

ভিতরের বারান্দায় যেই ঠাকুমার পায়ের শব্দ শুনতাম, সকলের খাওয়া-দাওয়া তদারক করে, কাজের লোকদের শুতে পাঠিয়ে তিনি যখন ফিরতেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে যে যার পাশবালিশ কোলে নিয়ে মাথার বালিশে চোখ বুজে শক্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম। এবং আশ্চর্যভাবে ঠাকুমা বিছানায় ওঠার আগেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যেতাম।

এখনও যখন কোনও কোনও বিনিদ্র রজনীতে বালিশে মাথা দিয়ে অসহায় শুয়ে থাকি, নিদ্রাসুন্দরী দেবী আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করেন, আমি তাঁকে বলি, 'আজ তুমি আমার সঙ্গে চাতুরি করছ, সেই বালকদের সঙ্গে তুমি চাতুরি করার চেষ্টা তো করনি।'

একবার আমার আর দাদার লড়াই খুব বেশি জমে গিয়েছিল। দাদার পাশবালিশটা ফেটে যায়, বালিশের ওয়াড় উপচিয়ে শিমুল তুলো সারা বিছানায়, সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

ভীম-দুর্যোধন গদাযুদ্ধের সেই সমাপ্তি।

বালিশের ব্যাপারে আমার আরেকটা বাল্যস্মৃতি আছে। আমাদের শহরের পাশের একটা গ্রামে আমার বড় পিসিমার বিয়ে হয়েছিল। বড় পিসিমা সেখানে থাকতেন না, পিসেমশায় সদরে ওকালতি করতেন। পিসিমার সেই শ্বশুরবাড়িতে এক রাতে ডাকাতি হয়। খবর পেয়ে অন্য অনেকের সঙ্গে পরের দিন সকালবেলা আমি সে বাড়িতে যাই।

সেখানে গিয়ে দেখি পুরো বাড়ি তুলোয় তুলো ঘর। বাড়িতে যত বালিশ ছিল, কোলবালিশ, মাথার বালিশ সব ডাকাতেরা ফালা ফালা করে ছিঁড়েছে। দাদা বলেছিল, ডাকাতেরা সারারাত না শুয়ে, না ঘুমিয়ে কষ্ট করে ডাকাতি করে আর সাধারণ লোক বালিশ মাথায় দিয়ে আরাম করে ঘুমোয়। এই রাগে ডাকাতেরা বালিশ পেলেই ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে।

আসলে ব্যাপারটা হল সেকালে তো ব্যাঙ্কের ভল্ট, বাড়িতে স্টিলের আলমারি এসব ছিল না, লোকেরা অনেক সময় দামি গয়না, টাকা এসব বালিশের তুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত। এ তথ্য ডাকাতদের জানা ছিল তাই তারা বালিশ ছিঁড়ত।

অবশেষে আমার নিজের বালিশের প্রসঙ্গে আসি। বছর পঁচিশ আগে আমি 'মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে' নামে কবিতায় লিখেছিলাম, 'বালিশ তেমন নরম নয়, বালিশ তেমন শক্ত নয়।' এখনও অনুরূপ বালিশই আমার পছন্দ। তবে দুটো মাথার বালিশ চাই। আর একটা পাশবালিশ (কোলবালিশ)।

অনেকে অবশ্য এতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁদের কানবালিশ চাই, নাকবালিশ চাই, এমনকী গোড়ালি-বালিশ চাই।

অথচ বড় বড় হোটেল, সরকারি ডাকবাংলোয় বালিশ নিয়ে কী কৃপণতা! বিছানা প্রতি একটা মাথার বালিশ, তার বেশি কিছুতেই নয়, কোলবালিশ তো নয়ই।

কলকাতা বিমানবন্দরে একটা গেস্ট হাউসের সুন্দর বিজ্ঞাপন দেখাত, এখনও আছে কিনা, জানি না, সেখানে বলা ছিল এই অতিথিশালায় কোলবালিশের বন্দোবস্ত আছে।

তবু হোটেল বা বাংলোর বালিশ না, পৃথিবীর নরমঙ্গল উপাধান নয়, সবার চেয়ে আপন

আমার বালিশ। তার তুলোর আঁশে আঁশে জড়ানো রয়েছে আমার অনেক সুখস্বপ্ন, অনেক জ্যোৎস্নাময় রাত, তারাভরা আকাশ, শেষরাতে হঠাৎ বৃষ্টির ছাট আর বহু বিনিদ্র রজনীর দুঃখ আর অভিমান ভরা স্মৃতি। সে আমার সব জানে, এই পড়ন্ত বয়েসে শুধু তার কাছেই আমার কোনও লজ্জা নেই।

আপ রুচি খানা

আপ রুচি খানা।

নিজের রুচিমতো খাবে।

আর পরের রুচিমতো পরবে, অর্থাৎ জামাকাপড় পরিধান করবে।

এই হল আপ্তবাক্য। কিন্তু আপ্তবাক্য তো সদা সর্বদা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের রুচিমতো, ইচ্ছেমতো সব সময় কি সব জিনিস খাওয়া হয়?

আমরা তো সন্দেশ, রসগোল্লা, দই-মিষ্টি খেতে ভালবাসি। কিন্তু তা খাওয়া হয় না, ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন। বিয়েবাড়িতে পাশের লোকেরা যখন বিরিয়ানি, ফ্রাই, কাটলেট ইত্যাদি প্রাণপণ খাচ্ছেন, আপনি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, আপনার প্লেটে তখন সাদা ভাত, শুক্তো, পনিরের ঝোল। এসবই চিকিৎসক মহোদয়ের নির্দেশ। আপনি ব্যতিক্রমী হতে চাইলেও পারবেন না, কারণ, সবাই জানে আপনার রক্তে চিনি এবং শ্যাওলা খুব বেশি। আপনি বিরিয়ানি, ফ্রাই ইত্যাদি খেতে চাইলে গৃহকর্তাই বাধা দেবেন।

এ তো গেল ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা। খাওয়ার কথাও ভাবা যেতে পারে।

আমরা কি সব কিছু স্বেচ্ছায় খাই? তা তো নয়। আমরা মুখ কুঁচকিয়ে, চোখ বুজে কবিরাজ মশাইয়ের দেয়া নিমপাতার পাঁচন পাথরের গেলাসে করে খাই। আমরা বন্ধুর অনুরোধে, তাকে সঙ্গ দিতে গরমের দিনের দুপুরে ঘামতে ঘামতে বিস্বাদ তেতো বিয়ার খাই। আমরা শ্যালিকা ঠাকুরানিকে কিংবা প্রিয় বান্ধবীকে খুশি করার জন্যে তাঁর আবিষ্কৃত, তাঁর নির্মিত আদা-কাঁচকলার সাহী কাবাব (প্রিয় বান্ধবী জনৈকা শ্রীমতি সাহা, সাহা থেকে সাহী) যতটা সম্ভব মুখ অবিকৃত করে খাওয়ার চেষ্টা করি।

নিজে রান্না করে খেলে অবশ্য নিজের রুচিমতো কিছুটা খাওয়া-দাওয়া করা যায়। কিন্তু সেটা কখনও চেষ্টা করে দেখেছেন?

হাত পুড়ে গেছে, মুখে আগুনের ঝলক কিংবা তেলকালি লেগেছে, জামায় ঝোল, হাতে হলুদ—রান্না করতে গিয়ে এমন হতেই পারে। কিন্তু নির্বিবাদে আপনার পছন্দমতো রান্না করতে পেরেছেন কি?

গাড়িতে যেমন ব্যাকসিট ড্রাইভিং আছে, স্বামী গাড়ি চালান আর স্ত্রী গাড়ির পিছনের সিটে বসে ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। 'আস্তে', 'এইবার খুব স্পিডে' 'সামনের গোরুর গাড়িটা বাঁদিকে কাটাও', 'ধুৎ, তুমি একেবারে যাচ্ছেতাই', 'হ্যাঁ হ্যাঁ আরও বাঁয়ে, আরও বাঁয়ে', 'আরে সাবধান, এ যে একেবারে নর্দমার মধ্যে'।

রান্নাঘরেও ঠিক তাই। ঠিক পিছনেই গৃহিণী। 'আর কয়েকটা লঙ্কা, না না আস্ত নয় ভেঙে দাও', 'জিরের কৌটো কোথায়?', 'না না সাদা জিরে নয়, কালোজিরে', 'দই দিচ্ছ কেন, দই দিয়ে কী হবে?' আপনার ডান হাত থেকে দইয়ের বাটিটা আর বাঁ হাত থেকে স্টিলের খুন্তিটা কেড়ে নিয়ে আপনাকে বিতাড়িত করে সহধর্মিনী এবার রান্নায় হাত দিলেন। আপনার স্বপ্নের দই ইলিশ কিংবা মাটন রেজালা রান্না করা আর হল না। তা হলে বলুন তো কী করে নিজের রুচিমতো খানা হবে?

এই ভর সন্ধ্যায় খালি পেটে লোভনীয় খাবারের কথা আর বলব না, বরং পরিধানে যাই।

পরিধান, অর্থাৎ জামা কাপড়। আপ্ত নির্দেশ হল অন্যের রুচি অনুযায়ী পোশাক পরবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত একটি আলোচনা পরে করছি, আগে দুয়েকটি তথ্য বিবেচনা করি।

মাত্র তিরিশ চল্লিশ বছরে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষের সাজপোশাকের বিস্তর বদল হয়েছে। কিশোরী থেকে অনতিযুবতী বাঙালি মহিলার প্রধান পোশাক এখন শালোয়ার কামিজ, গ্রামে শহরে সর্বত্র। এটা বাড়ির বাইরের পোশাক, বাড়ির মধ্যে ম্যাক্সি বা ওই জাতীয় অন্য কিছু। মাত্র চল্লিশ বছর আগেও এ রকম সম্ভব ছিল না। শাশুড়ি মা ঝলমলে শালোয়ার কামিজ পরে, কপালে সিঁথিতে ডগমগে সিঁদুর, হাতে মোটা সাদা শাঁখা, বেনারসি পরিহিতা নতুন বউমাকে নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিচ্ছেন, এখন এ অতি পরিচিত দৃশ্য। অথচ এই তো সেদিন, বড়জোর তিরিশ বছর, প্রথম যে মেয়েটি শালোয়ার কামিজ পরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজে গেল, সে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আর এখন তো মহিলারা প্যান্ট, লুঙ্গি, হাফ-শার্ট সব কিছুই পরিধান করছেন। ভালই দেখায়। সমাজও মেনে নিয়েছে।

পুরুষেরাও ধুতি থেকে প্যান্টে দ্রুত চলে এসেছে। পঞ্চাশের দশকে লালবাজারের বিখ্যাত গোয়েন্দা দেবী রায় ধুতি পরে অফিস যেতেন। রাইটার্সেও পদাধিকারিকেরা প্রায় সবাই ধুতি পরতেন, কেরানিবাবুরা তো বটেই।

ধুতি শাড়ি কাজকর্মের পৃথিবীতে প্রায় বিদায় নিয়েছে। প্রথমদিকে সবাই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। সেই সময়ের একটি গল্পে আছে ক্রু কাট চুল, রঙিন চকরাবকরা জামা, স্ট্রাইপ প্যান্ট পরা কৃশকায় এক যুবতীকে এক বিয়েবাড়িতে দেখে গঙ্গারাম যুবক ভেবেছিল। ভোজনের সময় মন্তব্য করেছিল, 'ওই ছেলেটি কিছুই খাচ্ছে না।' সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে প্রতিবাদ আসে, 'ও ছেলে নয়, মেয়ে, আমার মেয়ে। ডায়েটিং করছে।' গঙ্গারাম বক্তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলেছিল, 'আপনিই বুঝি ওই মেয়েটির বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ পোশাক করা পাশের ব্যক্তিটি প্রতিবাদ জানান, 'আমি ওর বাবা নই, আমি ওর মা।'

কাণ্ডজ্ঞান

না।

না। কাণ্ডজ্ঞান নয়।

খুব ভাল করে ভেবে বলছি আমি। 'কাণ্ডজ্ঞান' নামে কোনও রচনা কখনও লিখিনি। পাগলের কাণ্ডজ্ঞান লিখেছি, মাতালের কাণ্ডজ্ঞান লিখেছি, কিন্তু নির্ভেজাল কাণ্ডজ্ঞান, নৈব নৈব চ। কখনও নয়, কখনও নয়। কখনও 'কাণ্ডজ্ঞান' শিরোনামে কোনও লেখা আমি লিখিনি।

সারা জীবন ধরে কাগজ-কলম-কালি এবং সময় অপব্যয় করে রাশি রাশি কবিতা, গল্প, নিবন্ধ রচনা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ক'জনাই বা আমার লেখা পড়ে দেখেছে। আমার যা কিছু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সে ওই 'কাণ্ডজ্ঞান' থেকে, যা ধারাবাহিক ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রায় বিশ বছর আগে বেরিয়েছিল এবং পরে বই হয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বেরয়।

কিন্তু মজার কথা এই যে কাণ্ডজ্ঞান নামে আমার কোনও নির্দিষ্ট রচনা নেই, ধারাবাহিক রচনামালার নাম ছিল 'কাণ্ডজ্ঞান', পরে বইয়ের নামও হয় 'কাণ্ডজ্ঞান'।

তা এতদিন পরে পাপস্খালনের চেষ্টা করছি, অবশেষে কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে এই ছোট আলোচনা।

কাণ্ডজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, মহামতি নিউটনের সেই খরগোশের খাঁচায় দুটো দরজা করা। একটা খরগোশ বড়, একটা ছোট খরগোশ। নিউটন মিস্ত্রিকে বললেন, দুটো দরজা করতে, একটা বড় দরজা, বড় খরগোশের জন্যে, অন্যটা ছোট দরজা, ছোট খরগোশ যাতায়াত করবে। ছোট খরগোশ যে বড় দরজাতেও অবাধে যেতে পারবে, আসতে পারবে, তার জন্যে আলাদা দরজার প্রয়োজন নেই, সেই যৎসামান্য কাণ্ডজ্ঞানটুকু না থাকার জন্যেই জ্ঞানতপস্বী নিউটন হলেন মহামতি।

কাণ্ডজ্ঞান সম্বল আমাদের মতো সাধারণ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শনের সীমায় গিয়ে আটকিয়ে যাই। আমাদের সমস্ত খরগোশের একটা দরজাতেই কাজ মিটে যায়।

পরশুরাম জ্ঞানমার্গের কথা বলেছিলেন। জ্ঞানমার্গে বিচরণের ক্ষমতা আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষের নেই। আমাদের নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান। কাণ্ডজ্ঞানের সীমানাতেই ফিরে যাচ্ছি।

সীমানা পশ্চিম গোলার্ধ। ইউরোপের কিংবা আমেরিকার কোনও বড় শহরের একটি পাঁচতারা হোটেল। অধিকাংশ পাঁচতারা হোটেলের অন্যতম তারা হল একটি সুইমিং পুল। এই পাঁচতারা হোটেলটিতে একটি দুটি নয়, পরপর তিনটি সুইমিং পুল। হোটেলের ম্যানেজার সাহেব সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান, 'এই প্রথমটা হল গরম জলের সুইমিং পুল, এটাই সবচেয়ে পপুলার।' এরপর আরেকটু এগিয়ে দ্বিতীয়টি দেখান, 'এটি হল ঠান্ডা জলের পুল, অনেকে এটাও পছন্দ করেন।' অবশেষে তৃতীয় একটি পুলের কাছে এসে থামেন। এই পুলটি শূন্য, ঠান্ডা বা গরম জল-টল কিছু নেই। ম্যানেজার বুঝিয়ে বলেন, 'আবার অনেক গেস্ট এমন থাকে, যে তাঁরা সুইমিং পুল চান কিন্তু জল পছন্দ করেন না। তাঁদের জন্যে এই শুকনো পুল।'

কাণ্ডজ্ঞানের নমুনা হিসেবে এই কাহিনীটি চমৎকার। তবে শুধু পাঁচতারা হোটেলের দুঁদে ম্যানেজারেরাই নয়, কাণ্ডজ্ঞান শিশুদেরও থাকতে পারে, নিরক্ষরদেরও থাকতে পারে।

মাস্টারমশায় শিশু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যদি আমার বাঁ হাতে পাঁচটা আর ডান হাতে

ছয়টা কমলালেবু থাকে তবে আমার হাতে'..., মাস্টারমশায় প্রশ্ন শেষ করার আগেই ছাত্র বলল, 'তবে আপনার হাত খুব বড় বড় স্যার। পাঁচটা-ছয়টা করে কমলালেবু একেক হাতে কম কথা নাকি।'

অবশেষে একটি পাড়াগেঁয়ে কাণ্ডজ্ঞানের গল্প বলার আছে। হরিরাম আর রামহরি গাছ থেকে নারকেল পাড়ছিল। হরিরাম গাছে উঠেছিল আর রামহরি নীচে নারকেল কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ এক কাঁদি নারকেল রামহরির মাথায় পতিত হয়ে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। ব্যাপার দেখে গাছের ওপর থেকে হরিরাম প্রশ্ন করে, 'রামহরি বেঁচে আছিস না মরে গেছিস?' ভূমিশয্যা থেকে রামহরি বলল, 'বেঁচে আছি।' হরিরাম বলল, 'তুই যা মিথ্যেবাদী হয়তো মরে গেছিস, বলছিস বেঁচে আছি।' রামহরি বলল, 'আমারও মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি, না হলে তুই আমাকে মিথ্যেবাদী বলার সাহস পাস কী করে?'

দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাই যখন বিষয়বস্তু তবে বিমান দুর্ঘটনা দিয়েই শুরু করি।

খবরের কাগজের পাতায়, বিভিন্ন বৈদ্যুতিন তথা বেতার মাধ্যমে বিমান দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। কামকাটকায় বিমান ভেঙে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, সে খবর কাগজের প্রথম পাতায় আর ঘরের পাশে বরিশালে নৌকাডুবিতে তিরিশজন নিহত, চল্লিশজন নিখোঁজ সে খবর সপ্তম পাতায়। বাস দুর্ঘটনা, ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহত শতাধিক না গেলে তেমন পাত্তা পায় না।

বিমান ভ্রমণের আদি যুগে, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রমথ সমাদ্দারের কার্টুন দেখেছিলাম, বিমান ভেঙে পড়ে আছে। এক গুরুতর আহত যাত্রী অচেতন ভূমি-শায়িত পাইলটকে ধাক্কা দিয়ে প্রশ্ন করছে, 'ও পাইলট সাহেব, বেঁচে আছেন কি? আমার রিটার্ন টিকিটের কী হবে?'

অধিকাংশ দুর্ঘটনাতেই অবশ্য রিটার্ন টিকিটের সমস্যা থাকে না, সেগুলো ইংরেজিতে যাকে বলে fatal accident, বাংলায় বলা হয় মারক দুর্ঘটনা।

আমরা ও রকম দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাব। আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয় একটি সামান্য কান-কাটার কাহিনী।

দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এই কাহিনীটি আগেও বলেছি। পুরনো গল্প। তবে আগে যাঁরা শুনেছেন বা পড়েছেন তাঁদেরও হয়তো খারাপ লাগবে না।

উল্টোডাঙা আজাদ হিন্দস মিল একটি কাঠ চেরাইয়ের কারখানা। এখানে বৈদ্যুতিক করাতে সব রকম কাঠ কাটা হয়। হেডমিস্ত্রি বঙ্কুবাবু মাপমতো কাঠ কাটা হচ্ছে কি না পেনসিল-নোটবুক নিয়ে তার তদারকি করছিলেন। কী মাপে কাঠ কাটা হবে, নোটবুকে পেনসিল দিয়ে হিসেব কষে তিনি চেরাই মিস্ত্রিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

হঠাৎ লোডশেডিং হল, বিদ্যুতের করাত খ্যাচাং করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে বিদ্যুৎ ফিরে আসতে আবার চেরাই মেশিন চালু করা হল। কিন্তু কোথাও এবার একটু গোলমাল হয়েছে।

করাতের মধ্য থেকে কেমন একটা কিচি-কিচ কিচি-কিচ শব্দ বেরচ্ছে, করাতের গতিও

এলোমেলো। বঙ্কুবাবু হেডমিস্ত্রি, কারখানার সব দায়িত্ব তাঁর, তিনি আগ বাড়িয়ে দেখতে গেলেন করাতের কী হয়েছে।

এরই মধ্যে চেরাই মিস্ত্রি সোলেমান করাত কলের ওপর থেকে 'বঙ্কুদা সাবধান, বঙ্কুদা সাবধান' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু তখন আর সাবধান হওয়ার সুযোগ নেই। বঙ্কুমিস্ত্রির ডান কান করাত কলে খ্যাচাং করে কেটে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কানটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে চেরাই করা কাঠের ফাঁকে গিয়ে পড়েছে। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি কাঠ সরিয়ে কান উদ্ধার করা হল। এবার বঙ্কুমিস্ত্রিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে কানটা জুড়ে দেওয়া যায় কি না।

বঙ্কুমিস্ত্রি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, কাটা জায়গাটা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কানটা কুড়িয়ে এনে বঙ্কুবাবুকে দেখাতে, তিনি কিন্তু একবার দেখেই বলে দিলেন, 'এ কান আমার নয়।'

কেন নয়? এখানে আরেকটা কাটা কান আসবে কোথা থেকে? এই রকম সব প্রশ্নের জবাবে বঙ্কুবাবুর একটাই জবাব, 'ওটা আমার কান হতেই পারে না। আমার কানের পিছনে আমার পেনসিল গোঁজা ছিল। এটার পিছনে তো পেনসিল নেই।'

পেনসিলটা কাঠের গাদার পাশেই পড়ে ছিল। একজন সেটা কুড়িয়ে এনে দিল। সেটা হাতে নিয়ে বঙ্কুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ এটা আমার পেনসিল, কিন্তু এই কাটা কানটা আমার নয়।'

সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'কেন আবার?' বলে কাটা কানটা বাঁ হাতে এবং পেনসিলটা ডান হাতে ধরে সেই কানটায় পেনসিলটা গোঁজার চেষ্টা করে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে, ওই কানটায় পেনসিল গোঁজা যাচ্ছে না। 'এ কানটা আমার হতে পারে না। আজ তিরিশ বছর ধরে কানে পেনসিল গুঁজে আসছি। পেনসিল গোঁজা যাচ্ছে না আর এখন আমি তোমাদের চাপে পড়ে স্বীকার করব যে এটা আমার কান?'

বিজনের রক্তমাংস

পঞ্চাশের দশকে 'বিজনের রক্তমাংস' নামে এক তরুণ লেখকের একটি গল্প খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই রচনার সঙ্গে সেই গল্পের কোনও সম্পর্ক নেই।

এই রচনা যে বিজনকে নিয়ে সে আমার ছোট ভাই। বিজনের কথা আমি মাঝে মধ্যেই লিখি। আপনারা অনেকেই তাকে চেনেন।

বিজন হল সেই ব্যক্তি যে একবার নিউ মার্কেটে মাংস কিনতে গিয়ে শুধু পেঁয়াজ আর আলু কিনে, মাংসের খালি থলে হাতে ফিরে এসেছিল। 'মাংস কী হল' জানতে চাওয়ায় সে বলেছিল 'মাংস নেই। পাঁঠারা স্ট্রাইক করেছে।' অনেক রকম জেরা করার পর অবশেষে জানা যায়, পাঁঠা-খাসি নয়, স্ট্রাইক করেছে নিউ মার্কেটের মাংসের দোকানিরা, পুরসভা নতুন কী বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তারই প্রতিবাদে।

চিনতে পারছেন বিজনকে?

এই বিজনকেই বেড়ালে কামড়ে দিয়েছিল। তখন তার দশ বছর বয়েস, ফোর না ফাইভে পড়ে। ইস্কুলের হোমটাস্কে ছিল বেড়াল-এর ওপরে রচনা লেখার কাজ।

যেহেতু বেড়ালের ওপর রচনা লিখতে দিয়েছে, তাই খাতায় না লিখে একটা হুলো বেড়ালকে কোলের ওপর চিত করে শুইয়ে বিজন সেই হুলোর পেটের ওপরে রচনা লিখছিল। রচনাটির প্রথম পংক্তি 'আমি বিড়াল ভালবাসি' লেখার আগেই বুড়ো হুলোটি হঠাৎ খ্যাঁক করে বিজনের হাতে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

বিজন সমগ্র লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমি অতটা পারব না। তা ছাড়া এখানে ওখানে বিজনের নাম উল্লেখ না করে সেসব গল্প অনেকবার অনেক রকম করে লিখেছি।

আপাতত বিশদ গল্পে যাচ্ছি না।

প্রথমে বিজনের বুদ্ধির একটা নমুনা পেশ করছি।

বিজন একদিন বাজার থেকে বেশ বড় একটা এঁচোড় নিয়ে এসেছে। ঠিক বঙ্গীয় এঁচোড় নয়, সুবৃহৎ মাদ্রাজি কাঁচা কাঁঠাল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যেগুলো গ্রীষ্মকালে কলকাতায় চালান আসে। আকারে বড় হলেও তরকারি হিসেবে বাংলা এঁচোড়ের মতো উপাদেয় নয়।

বিজনের বউদি, মানে আমার স্ত্রী মিনতি, এই এঁচোড় দেখে বেশ একটু রাগারাগি করলেন, তার সঙ্গে সঙ্গত করলেন আমাদের কাজের মেয়ে কানন। তিনি কাঁঠালটা সিকি পরিমাণ কুটে আর কুটলেন না, দেখালেন ভেতরটা পেকে হলুদ হয়ে এসেছে, বললেন, 'পাকা কাঁঠাল দিয়ে এঁচোড়ের ডালনা হবে কী করে?'

যেটুকু কোটা হয়েছিল তাই দিয়েই অল্প করে এঁচোড়ের তরকারি করা হল। বাকি অংশ বিজন দখল নিল। সে একটু শুঁকে আমাদেরও শুঁকতে দিল। হলুদ হয়ে আসা কোয়াগুলোতে পাকা কাঁঠালের অল্প ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। বিজন আমাদের বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা আছে না, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো?' আমি কবুল করলাম, 'হ্যাঁ তা আছে।'

বিজন তখন একটা চটের থলের মধ্যে কাঁঠালটা ঢুকিয়ে মশলা বাটা নোড়া দিয়ে ধীরে ধীরে পেটাতে লাগল। বিজনের কলাকৌশলে সেদিন দুপুরে এঁচোড়ের তরকারি ছাড়াও ওই একটা কাঁঠালের কোয়া আমরা বিকেলে মুড়ি দিয়ে খেলাম। পিটিয়ে নরম হয়েছে কোয়াগুলো, কিন্তু কেমন যেন ছিবড়ে ছিবড়ে, তা ছাড়া পানসেও বটে মিষ্টি কম।

কী আর করব, কনিষ্ঠ সহোদরের অনুরোধে ওই কাঁঠাল তিন কোয়া খেলাম। কিন্তু শতাধিক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রাতের ভোজনের জন্যে।

রাতে ডালের সঙ্গে সাধারণত ভাজা কিছু থাকে না। কিন্তু সেদিন ছিল। কাঁঠালের বিচি ভাজা। দুপুরে যে এঁচোড়ের ডালনা খেয়েছি, বিকেলে যে কাঁঠালের কোয়া খেয়েছি তারই বিচি ভাজা। কাঁচা কাঁঠালের বিচি, তাই ভাজার মধ্যে একটু কষা স্বাদ, কিন্তু খেতে খারাপ লাগল না। ডালের সঙ্গে ভাত মেখে মুচ মুচ করে খেলাম।

ব্যাপারটা আমাকে এত চমকিত করে ফেলল যে বর্ণনা করা কঠিন। একই কাঁঠালের দুপুরে তরকারি, বিকেলে পাকা কোয়া, রাতে বিচি ভাজা—একই দিনে শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য। অভিভূত অবস্থায় সাতদিনের মধ্যে এই বিষয়ে একটা উপন্যাস রচনা করেছিলাম। বিশ্বাস না হয়, আমার লেখা নতুন উপন্যাস 'সর্বনাশ' পড়ে দেখবেন।

বিলিতি বিয়ার-পাব

বিয়ার-পাব মানে বিয়ার পানশালা। পাবলিক হাউস সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে পাব, ইংরেজিতে লেখা হয় pub।

পাব একান্তই বিলিতি ব্যাপার, ইংল্যান্ড দেশীয় কিংবা আরও গুটিয়ে এনে বলা যায় লন্ডন নগরীয়। মার্কিন দেশে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দুয়েকটা বিয়ার-পাব দেখা যে যায় না তা নয় তবে সেগুলো প্রধান পানশালা নয়। আমাদের দেশে, কাছাকাছির মধ্যে ব্যাঙ্কক, হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি মহানগরেও দুয়েকটা ইতস্তত বিয়ার-পাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লন্ডনের বিয়ার-পাবের চরিত্র সেগুলোর মধ্যে নেই।

আগে এই কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় এবং মফস্বল শহরেও চায়ের স্টল ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় সুতৃপ্তি, বনফুল, বিজলি গ্রিল ইত্যাদি চরিত্রবান সব রেস্তোরাঁ ছিল । সেগুলোর চেহারা, মালিক, খদ্দের, আড্ডার প্রকৃতি সবই বিশিষ্ট ছিল। একটা ঘরোয়া প্রকৃতি ছিল ওই দোকানগুলোর, একটা স্থানীয় চেহারা। স্বতন্ত্র চরিত্র।

দুঃখের বিষয় আমাদের যৌবনকালে এবং তারও বহু আগের পিতৃ-পিতৃব্যদের আমল থেকে এই যে বিশিষ্ট চায়ের দোকানগুলো ছিল এগুলো আজকাল আর নেই বললেই চলে। সবই প্রায় উঠে গেছে।

ব্রিটিশ পাব কিন্তু এখনও আছে, সেই রমরমা নেই, বহাল তবিয়তে না হলেও আছে। একেক পাড়া বা এলাকায় একটি কি দুটি নির্দিষ্ট পাব। তাদের খদ্দেররা বহু বহুকালের পুরনো। তাদের রুচি, মর্জি সবই পাব মালিকের নখদর্পণে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন, সুখ-দুঃখ সবই পাব মালিক জানে। পাব হল কিছুটা ক্লাব, কিছুটা আড্ডা, কিছুটা বৈঠকখানা—পুরো ইংরেজিয়ানা, এর কোনও বিকল্প নেই। যেমন বিকল্প ছিল না আমাদের সুতৃপ্তি রেস্তোরাঁর কিংবা বসন্ত কেবিনের।

সে যা হোক, সম্প্রতি বিয়ার-পাবের কথা উঠেছে অন্য এক অকল্পনীয় দিক থেকে।

গ্রেট ট্রেন রবারির কথা মনে আছে? ও রকম দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতি এর,আগে আর হয়নি।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। উনিশশো তেষট্টি সালের এক রাতে গ্লাসগো থেকে লন্ডন যাচ্ছিল নাইট মেল ট্রেন। সেই ট্রেনে ডাকাতি হল সরকারি টাকা পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড। এখন বোঝা যাবে না, কিন্তু আজকের হিসেব অনুযায়ী এ ছিল বিরাট টাকার অঙ্ক।

এই ট্রেন ডাকাতি নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় সব সিনেমা হয়েছিল, লন্ডনে ও হলিউডে। আমাদের বলিউডেও অনেক পরে এই জাতীয় একটা ছবি হয়েছিল।

এই ট্রেন ডাকাতির পান্ডা, যাকে নায়ক করে এই সিনেমাগুলো করা হয়েছিল, সেই রনি বিগস ছিলেন যে কোনও কলকাতাইয়ার মতোই লন্ডনিয়া। ধীরে সুস্থে পাড়ার পাবের শীতল অভ্যন্তরে প্রাচীন অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণতায় সফেন বিয়ার মগে চুমুক দিতে দিতে এই ব্যক্তি ডাকাতির ছক কষেছিলেন।

সে ছক ব্যর্থ হয়নি। ডাকাতির বিপুল অর্থ করতলগত করে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যান, সেখানে ব্রাজিল দেশে বসবাস করেন রনি বিগস। কারণ সেখানে তিনি নিরাপদ, ব্রিটিশ সরকারের কোনও আবেদন বা নির্দেশের কোনও পাত্তা দেওয়া হয় না ব্রাজিলে।

রাজার হালে ব্রাজিলে জীবনযাপন করেছেন শ্রীযুক্ত রনি বিগস। কিন্তু এখন তিনি ক্লান্ত।

ব্রিটিশ প্রশাসন হাজার চেষ্টা করেও যাকে ধরতে পারেনি, যার কেশ স্পর্শ করতে পারেনি সেই রনি বিগস বলছেন, লন্ডনে ফিরে যেতে চাই।

সংবাদপত্রের লোকেরা জানতে চেয়েছে, 'ব্রাজিলে তো চমৎকার আছেন। আবার লন্ডনে ফিরে কী করবেন? সেখানে আপনি যাওয়া মাত্র আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।'

শ্রীযুক্ত বিগস বলেছেন, 'তা যাই হোক, আমি লন্ডন ফিরতে চাই।' শুধু একবার, মৃত্যুর আগে শুধু শেষবার লন্ডনে তাঁর প্রিয়তম পাবে বসে এক গেলাস বিয়ার—এই তাঁর শেষ বাসনা।

শেষ সংবাদ এই যে তিনি লন্ডনে ফিরে গেছেন এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশ তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিয়ার-পাবে যেতে দেবে কি না, এখনই বলা কঠিন।

রাজনীতি

রাজনীতি নিয়ে আমি সাধারণত কিছু লিখি না, বিষয়টি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি।

কিন্তু ঘাড়ের ওপরে একটা নির্বাচনের গরম নিশ্বাস মুহুর্মুহু পড়ছে। খবরের কাগজ, দূরদর্শন সব কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে। কীসে কী হচ্ছে, কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

আর রাজনীতির কুশীলবেরা অনেকেই এমন সব আচরণ করছেন, মুখ ফসকিয়ে কিংবা কিছু না ভেবে এমন সব কথা বলছেন, যার কোনও মানে হয় না। আর টেনেটুনে মানে বার করলে সে খুবই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।

নিজের প্রচার করতে গিয়ে বিপক্ষের অহেতুক নিন্দেমন্দ করা কিংবা বিপক্ষকে গালিগালাজ করা নিশ্চয় অশালীন এবং অনৈতিক কাজ। সাধারণ নাগরিক এগুলো যে বিশেষ পছন্দ করেন তাও নয়। কিন্তু চলছে, চলবে।

এমন অনেক রাজনৈতিক বক্তা আছেন যাঁরা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে অক্লান্তভাবে, ভগ্ন কণ্ঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে যেতে পারেন।

একবার বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে পার্কের একপাশে একটি জনসভার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখি বক্তা ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন তো বলেই যাচ্ছেন। সেটা অবশ্য নির্বাচনের সময় ছিল না। ভদ্রলোক রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে বলছিলেন। মধ্যে মধ্যেই শুনছিলাম, 'ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে', 'জাতির এহেন পরম দুর্দিনে', 'চতুর্দিকে চক্রান্তের বেড়াজাল' এইরকম সব মার্কামারা পংক্তি।

পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বক্তা কতক্ষণ বলছেন?' উদাসীন প্রকৃতির ভদ্রলোক আলগোছে বললেন, 'তা, প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বিষয়ে বলছেন?' ভদ্রলোক চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'তা বলতে পারব না। উনি এখনও খোলসা করে কিছু বলেননি।'

নির্বাচনী বক্তৃতায় কিন্তু খোলসা না করে বলে কোনও উপায় নেই। সে বক্তৃতা অধরা, অছোঁয়া

হলে চলবে না। মোদ্দা কথাটি বলতেই হবে, 'আমরা ভাল। আমাদের ভোট দাও। ওরা খারাপ, ওদের ভোট দিয়ো না।' খুব বেশি রাখ-ঢাক না করে একথাও বলতে হয়, 'আমরা ভাল, তবু যদি আমাদের ভোট না দেন, তা হলে টের পাবেন আমরা কত খারাপ।'

নির্বাচন প্রার্থীকে সামনে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সেই সাবেকি পদযাত্রা 'ভোট ফর', 'ভোট ফর'। মুখে গদগদ হাসি, জোড়কর, বিনয়-বিহ্বল, ভদ্রতার জেরক্স কপি মাননীয় প্রার্থী পাড়ার মধ্যে ঘুরছেন।

বড় রাস্তায় বড় মিছিল। মোটর গাড়ি, জিপ, এসকর্ট কার, মোটর সাইকেল বাহিনী, সাইকেল মিছিল, আগে-পিছে লরিতে মাইক-ফেস্টুন-পতাকা—সে সমস্তই লোক দেখানো, খবরের কাগজ আর দূরদর্শনকে চমক দেওয়ার জন্যে। না হলে, এই চলমান জনতার মধ্যে, এই চৌমাথায়, বাজারে, রাজপথে ক'জনাই বা এলাকার ভোটার।

সুতরাং হাতজোড় করে গলির মধ্যে ঢুকতেই হয়। বউদির লাল চা। মাসিমার চিনি কম, নুন বেশি লেবুর শরবত। বড়মার সজনেডাঁটা-চচ্চড়ি খেতে খেতে নির্বাচন প্রার্থী গলির মধ্যে চলেছেন।

কোথাও কোনও বাড়ির একটা ভাল বাইরের ঘর পেলে কিংবা সামনে একটু উঠোন পেলে, কিংবা ছোটখাটো জমি পেলে প্রার্থী মহোদয়, একটা সভা সেরে নিচ্ছেন। একে বলে ঘরোয়া আলোচনা বা পথসভা।

শহরতলির একটা এলাকার কথা বলছি। পাশাপাশি দুটো প্রায় একই রকম বাড়ি। একটি বৃদ্ধাবাস, অন্যটি মানসিক হাসপাতাল।

ভুল করে দলবলসহ ভোট প্রার্থী উন্মাদ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। সেখানে উত্তেজনার কোনও অভাব হল না। প্রায় সকলেই 'ভোটের লোক এসে গেছে। আসুন, আসুন,' ইত্যাদি বলে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

এমনিতেই নির্বাচনের বাজারে সাধারণ মানুষেরই কেমন একটা খ্যাপা-খ্যাপা ভাব। এরা যে পাগল, ও বাড়িটা যে পাগলগারদ সেটা ভোটের লোকেরা টের পেল না। বাড়ির পিছনে এক চিলতে উঠোন, সেখানে বৈশাখের প্রথম রৌদ্রে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন, মুহুর্মুহু হাততালি পড়তে লাগল। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা চলল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর্যায়ে বক্তা লক্ষ করলেন দু' ব্যক্তি একটু আলাদাভাবে দূরে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতা শুনে হাততালি-টাততালি কিছুই দেয়নি। বক্তৃতা শেষে নির্বাচন প্রার্থী সেই দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, আপনারা আলাদা কেন?'

তারা বলল, 'আমরা কি পাগল যে ভোটের বক্তৃতা শুনে হাততালি দেব। এটা পাগলাগারদ। আমরা এখানকার কর্মচারী। আপনার কথা শুনে যারা লাফালাফি করছে, হাততালি দিয়েছে তারা সবাই এখানকার পাগল।'

চপলতা

আসুন এবার একটু চপলতা করা যাক।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, সারা বছর ধরে চপলতাই তো করে থাকেন, এ আর নতুন কথা কী?

অভিযোগ নতমস্তকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একে বৈশাখের দাবদাহ, দগ্ধ তাম্র দিন চারদিক জ্বলেপুড়ে ছারখার তার সঙ্গে নির্বাচনী মহারণ, চাপান-উতোর, উতোর-চাপান, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, হাতাহাতি এমনকী রক্তপাত, মৃত্যু। সাধারণ, নির্বিবাদী মানুষের পক্ষে অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য। কিন্তু বলার কেউ নেই, 'থামুন। এই রক্তরঙ্গ থামান। এই উত্তেজনা থামান। আমরা আপনাদেরই লোক। আমরা আপনাদেরই ভোট দেব। আমরা আপনাদেরই ভোট দিয়েছি। আমাদের জন্যে এত হানাহানি করবেন না।'

চপলতা করতে গিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক আলোচনায় চলে এলাম। এ বাজারে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভোটের রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নেই।

এবং সেই জন্যেই একটু হালকা হওয়ার জন্য এবারে একটু অতি তরল চপলতায় যাই। আপনাদের উত্তেজিত স্নায়ু ও শিরাগুলি হালকা থেকে হয়তো একটু আরাম পাবে।

চাপল্যের কোনও দিনক্ষণ, বাঁধা মুহূর্ত নেই। স্থান-কাল, বয়েস নেই।

প্রবীণ বয়েসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোনও এক নিরুপমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন,

> চপলতা যদি আজ কিছু ঘটে,
> করিয়ো ক্ষমা
> হে নিরুপমা।

না। আমার তেমন কোনও নিরুপমা নেই যার সঙ্গে চপলতা করতে পারি।

শিবরাম চক্রবর্তীর অনুকরণে বলতে পারি আমার যে নিরুপমা ছিলেন তিনি ঝরিয়া চলে গেছেন। ওই রবীন্দ্রনাথই তো বলেছিলেন, 'ফাগুনের ফুল গেছে ঝরিয়া।'

এই ভৈরব, রুদ্র, বৈশাখে গত বসন্তের ফাগুনের ফুলের কথা থাক বরং দুয়েকটা লোকায়ত গল্প বলি।

প্রথম গল্পটা পিতা-পুত্রের।

ছেলে এসে বাবাকে বলেছে, 'বাবা আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে?'

বাবা বললেন, 'জানো তোমার বয়েসে আমরা টাকার কথা ভাবতেই পারতাম না, আমরা বাবার কাছে টাকা চাইতাম না, পয়সা চাইতাম।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ছেলে বলল, 'ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক। তুমি আমাকে পাঁচশো পয়সা দাও।'

দ্বিতীয় গল্প প্রেমিক-প্রেমিকার।

বিকেলে প্রেমিক এসে তার প্রেমিকাকে বলল, 'আজ সন্ধ্যাবেলা দারুণ জমবে।'

প্রেমিকা বলল, 'কী করে জমবে? আমাকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।'

প্রেমিক বলল, 'আরে এই দেখো না, আজ সন্ধ্যা ছটা-নটার শোয়ে 'ঘর জামাই এম এল এ চাই' সিনেমার তিনটে টিকিট কিনে এনেছি।'

বিভ্রান্ত প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের দু'জনের জন্যে তিনটে টিকিট কেন?'

প্রেমিক বলল, 'আরে ওই টিকিটগুলো কি আমাদের জন্যে নাকি। ওগুলো তোমার বাবা, মা, ছোটভাইয়ের জন্যে।'

অবশেষে রাজনীতি দিয়ে শেষ করি।

এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি এমন কী করতে পারেন, যা অন্যে পারে না।'

প্রবীণ রাজনীতিবিদ মধুর হেসে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি আমার নিজের হাতের লেখা পড়তে পারি, যা অন্য কেউ পারে না। হাজার চেষ্টা করেও পারে না।'

বাগ্বিধি

বাক্+বিধি=বাগ্বিধি

সোজাসুজি বলা যায় কথা বলার নিয়ম। কিন্তু কথা বলার সত্যিই কি কোনও নিয়ম আছে? কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা কি সম্ভব?

সংস্কৃত শ্লোককার বলেছিলেন, শত কথা বলো কিন্তু কিছু লিখো না। লিখলে রেকর্ড থাকে, স্থিতধী শ্লোককার তাই না লিখে শতং বদ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু কথা বলার বিপদও কিছু কম নয়, বিশেষ করে বেশি কথা বলার বিপদ কিছু বেশি। আমার গুরুদেব শিবরাম একবার গল্প লিখেছিলেন, 'শিব্রাম চক্রবর্তীর মত কথা বলার বিপদ'। সেই ভয়াবহ জটিলতায় আমরা যেতে চাই না।

তবে একথা বলব যে লেখার চেয়ে কখনও কখনও কথা বলাও কম বিপজ্জনক্ নয়।

লেখা তবু পরে কাটাকুটি করা চলে, সংশোধন করা চলে, তেমন ক্ষেত্রে ছিঁড়ে ফেলাও যায়। কিন্তু কথা তো ফেরত নেওয়া যায় না। টিউব থেকে বেরনো টুথপেস্টের মতো মুখ থেকে বেরনো কথা আর টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, বেশি চেষ্টা করলে পেস্ট আরও ছড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ভোটের রণাঙ্গনে খ্যাতনাম্নী চিত্রতারকা শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় দূরদর্শনে একটি অনর্থক উক্তি করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, যতবার তিনি তাঁর প্রথম উক্তি ব্যাখ্যা করতে যান ততই জট আরও বেড়ে যায়। যাই হোক, নির্বাচনে হেরে তিনি আপাতত সমালোচনার উর্ধ্বে।

অহেতুক কথা বলার বিপদ যথেষ্টই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আজকাল তরুণী মাত্রেই সুরভিতা। দেশি-বিদেশি নানারকমের পারফিউমে এদের আসক্তি। উৎসব-অনুষ্ঠানে শুধু নয়, রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, অফিস-কাছারিতেও এঁরা সৌরভ বিস্তার করেন।

এইরকম এক আধুনিকা তরুণী বাসে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশের সিটে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি এই তরুণীর সুগন্ধে বিমোহিত হয়ে গেলেন। এ রকম সুগন্ধি পারফিউম কোথায় পাওয়া যায়, কে জানে?

শেষপর্যন্ত কৌতূহল দমন করতে না পেরে ভদ্রলোক পার্শ্ববর্তিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি যে পারফিউমটা ব্যবহার করেছেন, ওটার নামটা বলবেন।'

তরুণীটি প্রসাধনীটির নাম বলল, কোন দোকানে পাওয়া যাবে সেটাও বলল, তারপর প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি কী জন্যে কিনবেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার স্ত্রীকে একটা উপহার দেব ভাবছি।'

তরুণীটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সর্বনাশ! ও কাজ করতে যাবেন না। তা হলে রাস্তাঘাটে আজেবাজে লোক আপনার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইবে, কী পারফিউম, কোথায় পাওয়া যায় এইসব কথা।'

বলা বাহুল্য এই ভদ্রলোক এর পরে অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন।

সাবধান হয়ে কথা না বলার বিপদ মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি, সেখানেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

ডাক্তারির মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ছাত্রকে মুমূর্ষু রোগীর ওষুধ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন। প্রয়োজনীয় ওষুধটির নাম ছাত্রটি ঠিকই বলল। এবার অধ্যাপক ওষুধের পরিমাণ জানতে চাইলেন। ছাত্রটির আত্মপ্রত্যয় এসে গেছে, সে চট করে বলে বসল, 'দশ গ্রেইন।'

বলার পরে পরীক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল উত্তর ভুল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'স্যার দশ গ্রেইন নয় ওষুধের পরিমাণ পাঁচ গ্রেইন হবে।'

নির্বিকার অধ্যাপক বললেন, 'আর কোনও উপায় নেই। রোগী এক মিনিট আগে মরে গেছে। সামনের বছর আবার এসো।'

পুনশ্চ:

বেশি কথা বলার বিপদ

আদালতের কাঠগড়ায় চুরির মামলার আসামি দাঁড়িয়ে, দুই পক্ষের উকিলের বক্তব্য সাক্ষীদের জবানবন্দি ইত্যাদি সব শেষ, এবার হাকিম সাহেব আসামিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই চিরাচরিত প্রশ্ন:

হাকিম: আপনি দোষী না নির্দোষ।

আসামি: নির্দোষ। হুজুর আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

একবার নথিপত্রে খুব ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাকিম সাহেব আসামিকে বললেন, 'আপনি এর আগে কখনও জেল খেটেছেন?' প্রশ্ন শুনে আসামি করজোড়ে বলল, 'না স্যার। কখনওই না। এর আগে কখনওই আমি চুরি করিনি।' আসামির বক্তব্যের বিপজ্জনক এই শেষ পঙ্‌ক্তিটি বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই স্বীকারোক্তির জন্যেই এবার জেল খাটতে হল তাকে।

মশা ও লবণহ্রদ

ডোডো-তাতাইয়ের যুগ, মানে সত্তরের দশকের গোড়া থেকে মশা নিয়ে এ পর্যন্ত আমি কিছু কম লিখিনি। তাতে কোনও ফায়দা হয়নি। মশার অত্যাচার কমা দূরে থাক আরও বেড়ে গেছে। আগে দু'-এক জায়গা, যেমন কেশনগর (অর্থাৎ কেষ্টনগর) মশার জন্য কুখ্যাত ছিল। অন্নদাশংকর তাঁর অবিস্মরণীয় ছড়ায় কেশনগরের মশাকে অমর করেছেন,

'মশায়,
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।'

ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গের সুদূর টাঙাইল শহরে বড় হয়েছি। সেখানে মশা ছিল, ম্যালেরিয়া ছিল কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ, সেটা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল।

পরে কৈশোর বয়েসে কলকাতায় এসে এসপ্ল্যানেডে এবং পরে পারিবারিক বাসা কালীঘাটে সতেরো বছর কাটিয়েছি। শীত-গ্রীষ্মে-বর্ষায় কোনও মশা ছিল না। মশা ছিল বালিগঞ্জে-টালিগঞ্জে, মশা ছিল কাশীপুরে-দমদমে। সোজা কথা কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত আসল কলকাতায় সেকালে কোনও মশা ছিল না।

মশারিও দুর্লভ ছিল। ধর্মতলায় অনন্ত মল্লিকের দোকানে কিংবা বউবাজারের বা বড়বাজারের বিছানা পট্টিতে এবং চেতলার হাটে মফস্বলের লোকদের জন্য মশারি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। কলকাতাতে বাতিকগ্রস্ত এবং/কিংবা শৌখিন কেউ কেউ মশারি ব্যবহার করতেন। আমরা ধর্মতলা থেকে দেশে যাওয়ার সময় মশারি কিনে নিয়ে যেতাম।

এখন তো আর শ্যামবাজার বা কালীঘাট বেছে লাভ নেই। সব জায়গাই এক রকম। একই রকম মশা।

সেই গত বছর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে এক স্পষ্টবাদী কেয়ারটেকারের কথা লিখেছিলাম না? তাঁকে বারংবার স্মরণ করি।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'দাদা, এখানে মশা কেমন?' দাদা অম্লানবদনে জবাব দিয়েছিলেন, 'মশা আর কেমন হবে? ছোট ছোট, কালো কালো, পাখা আছে, ওড়ার সময় গুনগুন করে গান গায়, সুযোগ পেলে কামড়ায়।'

আসলে সব জায়গার মশাই এ রকম। কৃষ্ণকায়, সংগীত ও দংশন প্রবণ। তবু, কয়েক বছর আগে সল্টলেকে এসে মনে হয়েছিল এখানে মশা একটু অন্যরকম। যতটা উড়ে উড়ে গান গায়, ততটা কামড়ায় না। আসলে সংখ্যায় ছিল খুব কম। নতুন জনপদ, নতুন বাড়িঘর ঠিকমতো দখল নিতে পারছিল না।

কিন্তু এখন আমরা মশার খাসতালুকের প্রজা। আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে মশা। কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'রেতে মশা, দিনে মাছি'র কথা বলেছিলেন, সল্টলেকে এখন দিনেরেতে মশা। এতই মশা যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে উঠে মন্ত্রী বললেন, 'আগে মশা তাড়াও।' অন্য এক মঞ্চে দেখলাম ভি-আই-পিদের মিনারাল ওয়াটারের বোতলের সঙ্গে এক টিউব করে মশার মলম দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, মশা মারার তেল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কম দামি তেল হওয়ার জন্যে তেলের জোর কম বলে মশার জোর বেড়েছে। স্থানীয় এক মাননীয় অধিবাসী বললেন, বাদুড় পুষলে উপকার পাওয়া যাবে, বাদুড় ঘণ্টায় অনেকগুলো করে মশা খায়। গঙ্গারাম শুনে বললে, একসঙ্গে অনেকগুলো বাদুড় যদি অনেকগুলো মশা খেতে থাকে তা হলে যে শব্দ উৎপন্ন হবে, সেটা ৬৫ ডেসিবেলের বেশি হবে।

এত সব শোনার পরেও আমি নিজে একটা বুদ্ধি বের করেছি। গত সপ্তাহে শ্রীনিকেতনে গ্রামীণ কবিতা উৎসবে গিয়েছিলাম। তিনদিন ছিলাম না। যাওয়ার দিন সকালবেলা উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার সময় অন্যান্য দিনের মতো মশারিটা তুলে দিলাম না, একটু এলোমেলো করে দিলাম, ঘরের আনাচে-কানাচে যেখানে যত মশা ছিল ছুটে এসে মশারির মধ্যে ঢুকে গেল। যখন দেখলাম বহু মশা ঢুকে গেছে, মশারিটা টান টান করে গুঁজে দিলাম। যেমন শোয়ার সময় গোঁজা হয়।

এরপর তিনদিন মশারির মধ্যে বন্দি ওই মশারা। ফিরে এসে যখন মশারি তুললাম, বহু মশা মৃত, অধিকাংশই জীবন্মৃত। তিনদিন অনাহারে থাকা ওইটুকু জীবের পক্ষে কম কঠিন নয়। জীবন্মৃতেরা কোনওরকমে মশারির নীচ থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তারা আর ফেরেনি এবং তাদের মুখে এই দুর্বিপাকের কাহিনী শুনে অন্য মশারাও আমার ঘরে এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

যদ্দৃষ্টং

যদ্দৃষ্টং মানে যা দেখেছি। পুরো বাক্যটি হল, 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।'

মানে হল, 'যা দেখেছি, তাই লিখেছি।'

যেমন লিখতেন কোম্পানির আমলের কলকাতায় বাঙালি কেরানিরা। ইংরেজি-না-জানা ওই বাবুরা ইংরেজিতে লেখা নথি থেকে নকল করতেন, ফলে নথির মধ্যে একটা মাছি মরে থাকলে সেটার পর্যন্ত হুবহু নকল পরের নথিতে ঢুকে যেত। সেই জন্যেই 'মাছিমারা কেরানি' কথাটা উদ্ভুত হয়।

'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্' আমার সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। আমিও তো সারাজীবন ধরে এত যে লিখে গেলাম এর প্রায় সবই তো যা দেখেছি, যা পড়েছি সেই সব থেকে খুঁটে খুঁটে টুকে টুকে।

একটি ইস্কুলের ছেলের কথা মনে পড়ছে। তখন তার ইস্কুলে অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে, সেদিন তার বাংলা পরীক্ষা। চিরকাল যেমন হয়, যথারীতি বাংলা পরীক্ষায় গোরুর বিষয়ে রচনা এসেছে।

ছেলেটি, ধরা যাক তার নাম রাম, তার সিট জানলার পাশে। সে প্রথমেই গোরুর বিষয়ে রচনায় হাত দিয়েছে। খুব মন দিয়ে লিখছে, মাঝে মধ্যে মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, আবার মাথা গুঁজে লিখছে।

রামের ঠিক পিছনের বেঞ্চে সিট পড়েছে শ্যামের। সে আবার রামের চিরশত্রু।

সহসা পরীক্ষাকক্ষের নীরবতা বিদীর্ণ করে শ্যামের বীভৎস কণ্ঠ শোনা গেল, 'টুকছে, স্যার, রাম টুকছে।'

শিক্ষক মহোদয় যিনি পরীক্ষাকক্ষে গার্ড দিচ্ছিলেন, তিনি অকুস্থলে ছুটে এলেন। তিনি রামের খাতা উলটিয়ে দেখলেন, তার জামাপ্যান্টের পকেট তল্লাশি করলেন এবং শালীন-অশালীন আরও যা যা করা সম্ভব সবই করলেন, কিন্তু সন্দেহজনক কোনও কাগজ পেলেন না।

ইতিমধ্যে শ্যাম চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'স্যার ওখানে নয়, ওখানে নয়, বাইরে দেখুন।'

বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। শীতকালের প্যাঁচালো হাওয়া, বেশ ঠান্ডা। তারই মধ্যে স্যার বেরলেন র‍্যাপার দিয়ে কান ঢেকে। তিনি ভেবেছিলেন, রাম বুঝি নকলের কাগজ জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে কিছুই নেই, একদম ফাঁকা। শুধু একটু দূরে একটা কাঁঠালগাছের নীচে একটা গোরু চোখ বুজে শীতে কুঁকড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্যার ফিরে এলেন। শ্যামকে ধমকাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই শ্যাম বলল, 'স্যার আপনি বুঝতে পেরেছেন তো?'

স্যার খেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বুঝতে পেরেছি?'

শ্যাম বলল, 'গাছতলায় ওই যে গোরুটা। ওই গোরুটা দেখে টুকে টুকে রাম গোরুর রচনা লিখছে।'

এ হল 'যা দেখেছি তাই লিখেছি' অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতমের চূড়ান্ত উদাহরণ। ওর মধ্যে কোনও দোষ নেই। বড় লেখক, বড় শিল্পী সবাই এ কাজ করেন। জীবনের আনাচে-কানাচে যেখানে যেমন দেখতে পান, তাঁদের রচনা, ছবিতে কুশলী তুলি বা কলমের টানে ফুটিয়ে তোলেন, তার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিলায়ে সানন্দে স্বীকার করেন, 'যা দেখেছি তুলনা তার নাই।'

সবাই অবশ্য নিজে দেখে লিখতে পারেন না। তাঁরা টুকে লেখেন। ওই যাঁরা দেখে লিখেছিলেন, তাঁদের লেখা দেখে টুকে লেখেন।

অন্নদাশঙ্কর একদা লিখেছিলেন,

শ্রীমান সমরেশ সেন,
পড়েছি যা লিখেছেন,
লিখেছেন যা পড়েছেন।'

কেউ কেউ বলেন, এখানে কবি সমর সেনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? কল্লোলের প্রধান লেখকেরা প্রায় সবাই, শিবরাম, মুজতবা এমনকী পরশুরাম পর্যন্ত এ গুণে গুণী।

কিন্তু কেউ আমার মতো নয়। আমিই সেই হতভাগ্য লেখক যে অন্য লেখকদের লেখাই শুধু নয় নিজের পুরনো লেখাও টোকে।

সম্পাদকেরা জানেন, পাঠকেরা বোঝেন—কিন্তু কেউ কিছু বলেন না, এই রক্ষা।

বয়েস বাড়ছে

আমাদের টাঙাইলের বাড়িতে অনেকরকম বই ছিল। পাঁচ পুরুষের ভিটেবাড়ি। উকিলের বাড়ি। প্রায় সবাই এম এ বি এল, বি এ বি এল। অধিকাংশই আইনের বই, এরই ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র-মিলটন এবং অনেকরকম আজব বই।

এসবের মধ্যে একটি বই ছিল কলম্বাসের জীবনী। পৃথিবীর যে কোনও ঘরকুনো লোকের মতোই কলম্বাস আমার চিরদিনের হিরো। সেই কলম্বাসের জীবনীকার ওয়াশিংটন আরভিং বলেছিলেন, 'যদি দেখেন লোকেরা আপনাকে বলছে খুব ইয়াং, খুব যুবক দেখাচ্ছে, বুঝে নেবেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।'

তারাপদ রায় নামে এক ব্যক্তিকে আমি জানি, সে লোকটা নিজের চোখের সামনে বুড়ো হয়ে গেল কিন্তু একবারও টের পায়নি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল গোলাকার থপথপে হয়ে গেছে, দাঁতের গোড়া সব নড়বড়ে হয়ে গেছে, পা ঢোলা, কোমরে বাত। হঠাৎ হঠাৎ হাঁফ ধরা, শেষরাতে শ্বাসকষ্ট।

প্রথম প্রথম বার্ধক্যের স্বাদ পাওয়ার পরে তারাপদ বয়েসের বিরুদ্ধে একটু লড়ার চেষ্টা করেছিল। একটু হাঁটাহাঁটি, একটু ডায়েটিং। কিন্তু কোনও সুবিধে হয়নি।

এই সময়ে একবার তারাপদ রায়ের বাঁ পা ফুলে গিয়েছিল, রীতিমতো ব্যথা। জুতো পায়ে দিতে, সামান্য হাঁটাহাঁটি করতে কষ্ট।

পুরনো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে তিনি তারাপদকে বললেন, 'বয়েস বাড়ছে, বুড়ো হচ্ছেন, এখন এ রকম একটু-আধটু হবে। চিকিৎসা করে লাভ নেই, মানিয়ে নিতে হবে।'

তারাপদ ছাড়ার পাত্র নয়, সে জানে বুড়ো রোগী পেলে ডাক্তারেরা খুশি হয়, কারণ অসুখ বা ব্যারাম যাই হোক, ধরতে পারার দরকার নেই, বললেই হল, 'বুড়ো বয়েসে এ রকম হয়।'

কিন্তু তারাপদ সাধারণ বুড়ো নয়, সে ডাক্তারকে বলল, 'দেখুন বুড়ো হওয়ার জন্য যদি এই চরণশূল হয়ে থাকে তবে শুধু বাঁ পায়ে হল কেন, আমার বাঁ পা আর ডান পা দুটো তো সমান বয়েসি, ডান পা চরণশূল থেকে রেহাই পেল কী করে?'

ডাক্তারবাবু কী বলেছিলেন সে এই রম্যনিবন্ধের বিষয় হতে পারে না।

বরং বিষয়ান্তরে যাই। বয়েসের ব্যাপারটা অল্প একটু বুঝতে পেরেছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেই কবে নবযৌবনে শক্তি লিখেছিলেন,

'বয়েস দাঁড়ায়ে থাকে
কোনও মাঠে স্কেলকাঠি হাতে,
মানুষ মাপিতে যায়,
মানুষী মাপিতে যায়,
বালকেরা হাসে।'

নিতান্ত কবিকল্পনা, কিন্তু কত স্বচ্ছ। একটু ভাবুন। উচ্চতা মাপার স্কেলকাঠির মতো বয়েসের স্কেলকাঠি। দিন যাচ্ছে, সময় যাচ্ছে—মাঠের মধ্যে সেই স্কেলকাঠি— মানুষ যাচ্ছে, মানুষী যাচ্ছে, বয়েস বাড়ছে সেটা ধরা পড়ছে স্কেলকাঠিতে, স্কেলকাঠি কিন্তু স্থির রয়েছে।

শক্তি হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেল। অথচ সেই সে আমাদের অনেককে বুড়ো বলে সম্বোধন করত, বলত, 'এই বুড়ো, আমি কিন্তু কোনওদিন বুড়ো হবো না। আমি অনেকদিন বাঁচবো।'

(শক্তির মৃত্যুদিন ছিল এই সপ্তাহে, তাই বোধহয় এসব কথা মনে পড়ছে। না হলে রম্যনিবন্ধে, সপ্তাহান্তে হালকা হাসির এই প্রতিবেদনে মৃত্যু আসে কী করে?)

মৃত্যু নয়, বয়েস বাড়ার কথা বলি। এ বিষয়ে জটিলতম এই কাহিনীটি অন্য প্রসঙ্গে আগে বলেছি, তবু বলি।

বছর বারো আগের কথা। তখন আমি নিকটবর্তী এক জেলা সদরে আমলা। মফস্বলে আমলাদের বিষয়-বহির্ভূত নানা কাজ করতে হয়, নানারকম তদারকি, সালিশি।

এক হাউসিং-এস্টেটের লোকেরা এসে অভিযোগ করল যে তাদের এস্টেটের যে দারোয়ান সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে। স্বামী-স্ত্রী দুইপক্ষই সমান, যেমন দেব তেমন দেবা। শেষরাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কর্কশ চিৎকার, কুৎসিত গালিগালাজ—পাড়ায় কাক-চিল পর্যন্ত আসে না। প্রতিবেশীরা ঝালাপালা হয়ে গেছেন। আজ সেই বুড়ো-বুড়িকে সঙ্গে করে তারা এসেছেন এর প্রতিকার চাই।

বুড়ো-বুড়িকে দেখলাম। অনতিবৃদ্ধ অতি সাধারণ দম্পতি। বুড়োর সঙ্গে আলাদা করে কথা বললাম। মামুলি সরকারি প্রশ্ন, 'আপনার বয়েস?' উত্তর, 'ষাট'। 'আপনার স্ত্রীর বয়েস?' উত্তর, 'সত্তর'। একটু সন্দেহ হওয়ায় আমি জিজ্ঞেস করি, 'বিয়ের সময় আপনার বয়েস?' উত্তর, 'পঁচিশ!' 'তখন আপনার স্ত্রীর বয়েস?' উত্তর, 'কুড়ি'। আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম, 'তা হলে এখন আপনার স্ত্রীর বয়েস পঞ্চান্ন না হয়ে আপনার থেকে দশ বছর বেশি হল কী করে?'

আমার ঘরের দরজার বাইরে বেঞ্চির ওপরে বসে থাকা স্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'মেয়েমানুষের যে কী বাড়, আপনাকে আর কী বলব হুজুর!'

সেই দাম্পত্যকলহের কী মীমাংসা হয়েছিল, সে গল্প পরে হবে।

ধানাই-পানাই

এই নিবন্ধের নামকরণে এ রকম একটি ব্রাত্য শব্দের ব্যবহারে কারও যদি আপত্তি থাকে, তিনি স্বচ্ছন্দে এর নামকরণ করতে পারেন 'শব্দরূপ'।

'ধানাই-পানাই'কে ব্রাত্য শব্দ বলাও হয়তো ঠিক হচ্ছে না। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল অভিধানে শব্দটির স্থান হয়নি। অবশ্য হাতের কাছে রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় শব্দটি রয়েছে, অর্থ দেয়া আছে, 'অসম্বদ্ধ বাগজাল বিস্তার'।

সপ্তাহান্তে কয়েক ইঞ্চি গদ্য রচনা করতে গিয়ে এমন অনেক শব্দের মুখোমুখি হই, পরিচিত প্রবাদবাক্যের মধ্যে এমন অন্যরকম আভাস পাই—যা আমাকে ভাবায়।

বলতে পারেন, লেখেন তো ওই হাবিজাবি গদ্য, কখনও কদাচিৎ অগভীর পদ্য, শব্দ নিয়ে আপনার এত ভাবনা কীসের।

সত্যি কথা স্বীকার করতে গেলে শব্দ নিয়ে, শব্দের ব্যবহার করা নিয়ে আমি যে খুব একটা বিচলিত তা নিশ্চয়ই নয় কিন্তু কখনও কখনও কোনও কোনও শব্দের অর্থ, ব্যবহার কিংবা উদ্ভব নিয়ে মনে প্রশ্ন যে জাগে না তা তো নয়। তত নির্বিকার নই।

যেমন এই ধানাই-পানাই শব্দটি।

শব্দটি কেমন গোলমেলে। প্রথম শুনলে মনে হবে অর্থহীন শব্দ। শব্দটি নিশ্চয়ই সংস্কৃতজ নয়, সংস্কৃত থেকে আসা শব্দগুলির, তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতদ্ভব সেগুলির ওপরে একটু ভাল করে চোখ বোলালেই তাদের সংস্কৃত চেহারা আন্দাজ করা যায়।

আবার আরবি-ফারসি-তুর্কি-মুসলমানি শব্দও নয়, সেগুলোর চেহারা আলাদা। এদিকে বিদেশি শব্দ, ইউরোপীয় ভাষা থেকে আগত ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ শব্দের মেজাজ অন্যতর।

অবশ্য হতে পারে বাংলা দেশি শব্দ, প্রাচীন অনার্য শব্দ। কিন্তু ধানাই-পানাই শুনলে খুব পুরনো শব্দ মনে হয় না। মনে হয় প্রায় আধুনিক, খুব কাছাকাছি সময়ের শব্দ এটা, যেমন তুলোধোনা, যেমন বাহিরফট্টাই।

এতদিনে হঠাৎ মনে হল ধানাই এবং পানাই এই দুটি আলাদা কথা একত্র হয়ে ধানাই-পানাই হয়েছে। ধানাই ও পানাই, ধানাই-পানাই দ্বন্দ্ব সমাস।

এর পরে কী করে মাথার মধ্যে খেলে গেল যে ওই ধানাই এবং পানাই আসলে হল ধা নাই এবং পা নাই। অর্থাৎ এমন ব্যাপার যার মধ্যে ধা এবং পা—এই দুটি নেই।

চকিতে মনে পড়ে গেল, 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। ধা এবং পা বাদ দিয়ে যদি কেউ শুধুই সারেগামানি করে যায় সে হবে খুবই একঘেয়ে ও অসম্বদ্ধ সুর রচনা, হয়তো বা নিরর্থক।

ধানাই-পানাই ঠিক তাই। অনেকক্ষণ ধরে আমি যদি উলটোপালটা একই কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যাই, আপনারা বলবেন, 'তুমি ধানাই-পানাই করছো।'

সুরসিক হিমানীশ গোস্বামীকে ফোন করেছিলাম ধানাই-পানাই নিয়ে আমার ব্যাখ্যা জানাতে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী বাংলা শব্দের ব্যাপারে একজন বিশেষ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। তিনি বললেন, 'আপনার ধানাই-পানাইয়ের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। তবু শব্দটির অন্য কোনও উৎস আছে কি না সেটাই দেখতে হবে।'

এরপর হিমানীশ আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন যেটা তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব, '"দরদিয়া মরমিয়া" গানটি তো শুনেছেন। এর মানে কী বলতে পারেন?'

আমি 'জানি না' বলতে হিমানীশ বললেন, 'মোগলাই হোটেলে এক ব্যক্তি অনেক কিছু খেয়ে তারপর হেঁচকি তুলতে লাগলেন। তাঁর কাছে বেয়ারা বিল নিয়ে যেতে তিনি বললেন, "দেখছ, আমি মরতে বসেছি। এখন বিল নিয়ে এসেছ?" বেয়ারা এই কথা হোটেলের ম্যানেজারকে গিয়ে বলায় তিনি ছুটে এসে সেই খদ্দেরকে বললেন, "মর মিঞা দর দিয়া," অর্থাৎ, 'দাম দিয়ে মারা যাও।' এরপর ফোনের মধ্যেই গম্ভীর হয়ে হিমানীশ বললেন, 'গানের পঙক্তিটি এর থেকেই এসেছে।' হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার একটা ভাল শব্দ নিয়ে বলি।

মা শব্দের মানে হল লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী কথাটি দ্বিত্ব দোষে দুষ্ট। মাধব হলেন লক্ষ্মীর স্বামী, বিষ্ণু। ধব শব্দটি দেখুন, এর থেকেই সধবা এবং বিধবা। লোকে যখন রসিকতা করে কোনও অবিবাহিতা মহিলাকে বলে অধবা, সেটাও খুব একটা ভুল নয়।

আমপাতা জোড়া-জোড়া

'আমপাতা জোড়া-জোড়া,
মারব চাবুক ছুটবে ঘোড়া...'

এ ছড়ার দিন বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার দিন আর নেই। হয়তো গ্রামগঞ্জের দিকে গেলে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যাবে নিঃসঙ্গ কোনও অশ্বারোহীকে, ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছেন। দু'-একটা আদ্যিকালের এক্কা কিংবা টমটম গাড়িও হয়তো চোখে পড়বে চিরকালের ভাঙা রাস্তায় সওয়ার নিয়ে চলেছে। চোখে পড়বে দু'-একটা মালবাহী ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়িও।

নগর ও শহরাঞ্চলে এখন ঘোড়া দেখতে গেলে রেসের মাঠে কিংবা সার্কাসের তাঁবুতে যেতে হবে। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গোটা তিনেক প্রাগৈতিহাসিক ফিটন গাড়িও কয়েকবছর আগে পর্যন্ত দেখা যেত, এখনও আছে কি না বলতে পারি না।

অথচ এই তো সেদিন, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে, দেশ থেকে যেদিন কলকাতায় এলাম, শেয়ালদা স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েই কলকাতার বাসায় গিয়েছি।

আমাদের বাল্যকালে রূপকথার গল্পে পড়েছি, রাজপুরীতে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সেসব রাজপুরী আমরা স্বচক্ষে দেখিনি তবে ঘোড়াশালে ঘোড়া ব্যাপারটা বুঝতাম। হাতিশালে হাতি আমার বাল্য বয়েসেরও আগের ব্যাপার, হয়তো আমার শিশু প্রপিতামহই তাঁর কালে ব্যাপারটা বুঝতেন।

তবে, ঘোড়া তখনও ছিল। আমাদের মফস্বলে উকিলবাড়িতে মক্কেলরা অনেকেই আসত ঘোড়ায় চড়ে। চোখের সামনে ধীরে ধীরে দেখেছি অশ্বারোহীর সংখ্যা কমছে, সাইকেলারোহীর সংখ্যা বাড়ছে। সাইকেল বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত সব ঘোড়াকেই আউট করে দিল। শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র ঘোড়া সেটি ছিল গয়েশ পালের।

গয়েশ পাল ছিলেন একজন তস্কর প্রধান। এমনিতে তাঁর হাটে সোনারুপোর দোকান ছিল। সেই দোকানে বসেই তিনি স্থানীয় গৃহস্থের ধন-দৌলতের তাৎক্ষণিক আঁচ করলেন। যথাসময়ে যথাস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করে অন্তরালে থেকে তস্করবৃত্তি পালন করতেন। বলা বাহুল্য, কাজটি বিপজ্জনক ছিল। মাঝে মধ্যেই তাঁকে পুলিশ ধরত। তাঁকেও উকিল-আদালত করতে হত।

গয়েশবাবুকেই দেখেছি শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় করে যাতায়াত করতে। তিনি খুব সকাল সকাল আমাদের বাড়িতে এসে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম খুলে একটা লম্বা দড়ি দিয়ে কাছারিঘরের পাশে একটা সুপারি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধতেন। পরে সন্ধ্যাবেলা কাছারির কাজ শেষ হলে আমাদের বাসায় ফিরে ঘোড়ায় উঠে গ্রামে ফিরে যেতেন। অন্তর্বর্তী আট-দশ ঘণ্টা ঘোড়াটি থাকত আমার আর দাদার হেফাজতে। চাবুক হাতে আমরা তার সওয়ারি হওয়ার চেষ্টা করতাম। ঘোড়াটিকে আমরা নিশ্চয়ই খুবই নির্যাতন করতাম। কারণ একবার সেই ঘোড়া আমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছিল। এখনও ঘোড়ার দাঁতের চৌকো চিহ্ন আমার ঘাড়ে স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘোড়ার ঘটনা এতকাল পরে মনে পড়ল খবরের কাগজে একটা সংবাদ দেখে। মাননীয়া মানেকা

গান্ধীর উদ্যোগে পশুক্লেশ নিবারণী বিধি সমূহে এখন থেকে একটা নতুন মাত্রা যোগ হতে যাচ্ছে। এখন থেকে ঘোড়াকে আর চাবুক মারা যাবে না। চাবুকের বদলে হালকা ধরনের কোনও কিছু প্রয়োগ করতে হবে।

খবরটি পাঠ করে গঙ্গারাম একটি বাঁকা কথা বলল, 'এরপর হয়তো সরকারি নির্দেশ থাকবে যে গোরু দোয়া যাবে না।'

গঙ্গারামকে তেমন পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'ঘোড়ার গল্পে গোরু কেন?'

গঙ্গারাম বলল, 'আপনি বুঝি গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পটা পড়েননি?'

আমি বললাম, 'কোন গল্পটা?'

গঙ্গারাম বলল, 'পুরনো গল্প। এক গৃহস্থ তীর্থে গিয়েছেন। যাওয়ার সময় তাঁর গোরু রেখে গেছেন প্রতিবেশীর কাছে। ফিরে এসে গোরু ফেরত চাইতে তিনি বললেন, 'খুবই দুঃখের কথা, তোমার গোরু হঠাৎ মরে গেছে।' এ কথা কেউ বিশ্বাস করে? তখন সেই প্রতিবেশী ওই গৃহস্থকে গো-ভাগাড়ে নিয়ে একটি কঙ্কাল দেখালেন। কিন্তু দেখা গেল সেটি ঘোড়ার কঙ্কাল। গৃহস্থ প্রতিবেশীকে সেকথা বলতে প্রতিবেশী বললেন, 'কী আর বলব দাদা, তোমার গোরু ওই ঘোড়ারোগেই মারা গেছে।'

এ গল্পের মানে কী ধরতে পারলাম না। তবে গঙ্গারাম তো এই রকম গল্পই বলে।

ভ্রমণকাহিনী (২)

'ডোডো-তাতাই' কাহিনীমালায় এক জায়গায় আছে, ডোডোবাবু (নাকি তাতাইবাবু) একবার দূরপাল্লার ট্রেনে কোনও দূরদেশ থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। রেলগাড়ির ওই কামরাতেই ডোডোবাবুর সহযাত্রী ছিলেন এক সর্দারজি।

আসানসোল স্টেশন চলে যাবার পরই সর্দারজি চঞ্চল হয়ে উঠলেন, হাওড়া কতদূর, হাওড়া পৌঁছোতে আর কতক্ষণ লাগবে, মুহুর্মুহু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ভদ্রলোক ডোডোবাবুসহ অন্যান্য যাত্রীদের অস্থির করে তুললেন।

স্বভাবোচিত ঠান্ডা মাথায় ডোডোবাবু প্রথমদিকে সর্দারজিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, হাওড়া এখনও দূরে আছে, হাওড়া স্টেশনে আমিও নামব। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ইতিমধ্যে সর্দারজি তাঁর হাতব্যাগ খুলে গুরুমুখী ভাষায় ছাপা একটি রেলওয়ে টাইমটেবিল বার করে ফেলেছেন। দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের জানলা দিয়ে ক্রম অপসৃয়মান ছোট স্টেশনগুলির নাম তিনি পাঠ করার চেষ্টা করছেন, পাঠ করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর টাইমটেবিলে মিলিয়ে নিচ্ছেন, হাওড়া আর কতদূর?

অবশেষে যথানিয়মে ট্রেন বর্ধমান, ব্যান্ডেল পেরোল। উদ্বিগ্ন সর্দারজি তাঁর বিশাল ট্রাঙ্ক, বিপুল বিছানা গাড়ির দরজার কাছে নিয়ে রেখে এসে ফাঁসির আসামির মতো থমথমে মুখে নিজের সিটে এসে বসলেন। শেষ পর্যন্ত উত্তরপাড়া, বালি স্টেশনও পার হয়ে গেল, ঝড়ের বেগে এক্সপ্রেস ট্রেন

ছুটছে, কোথাও দাঁড়াচ্ছে না, সর্দারজি আশঙ্কান্বিত হয়ে ডোডোবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই ট্রেনটা হাওড়ায় দাঁড়াবে তো?'

কামরাসুদ্ধ যাত্রী এই সরল প্রশ্ন শুনে থমকিয়ে গেল। শুধু ডোডোবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা সর্দারজি হাওড়ায় ট্রেনটা না দাঁড়ালে কী হবে?'

উত্তেজিত সর্দারজি বললেন, 'তা হলে আমার সর্বনাশ হবে।'

ডোডোবাবু বললেন, 'সর্বনাশ আমাদের সকলেরই হবে। হাওড়ায় ট্রেন না দাঁড়ালে আমরা সবাই মারা পড়ব, ট্রেন স্টেশনের দেয়াল ভেঙে গঙ্গায় গিয়ে পড়বে।'

ভ্রমণকাহিনী পর্বে সর্দারজি বিষয়ক আর একটি নিষ্কলুষ কাহিনী আছে।

দুই সর্দারজি এক নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন দুপুরে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যায় যখন ঘুম ভাঙল তখন দিগন্তে চাঁদ উঠেছে। সেদিন আবার পূর্ণিমা, বিরাট ঝলমলে চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চারদিক ফুটফুট করছে।

গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রথম সর্দারজি ভাবছিলেন, 'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, কে জানে। এখন তো মনে হচ্ছে সকাল হয়েছে। সারারাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম নাকি?'

দ্বিতীয় সর্দারজিরও ওই একই চিন্তা। কিন্তু তিনি চুপ করে না থেকে রাস্তায় গিয়ে এক তৃতীয় সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই ওই যে আকাশে গোল থালামতো জিনিসটা উঠেছে, যে জিনিসটা এত আলো দিচ্ছে, ওটা চাঁদ না সূর্য?'

প্রশ্ন শুনে তৃতীয় সর্দারজি বহুক্ষণ ধরে পূর্ণিমা চাঁদটি নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বেশ কয়েকবার ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'ভাই আমি এখানে মাত্র এক বছর হল এসেছি। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ভাল বুঝি না। ওটা চাঁদ কি সূর্য সেটা বলতে পারব না।'

পুনশ্চ:

একবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে বাড়ির কাছেই পাশাপাশি দুটো মুদির দোকান। একটি সাবেকি, পুরনো আমলের দোকান। পাশেরটি নতুন হয়েছে।

যেদিন প্রথম সেই পুরনো দোকানে মালপত্র কিনতে গেলাম, প্রবীণ দোকানি বললেন, 'সাবধান! পাশের ওই নতুন মুদিখানা থেকে কোনও জিনিস কিনতে যাবেন না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

মুদি ভদ্রলোক গলা নামিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্রী কণ্ঠে বললেন, 'ওদের তো দাঁড়িপাল্লা ছিল না। আমাদের পুরনো দাঁড়িপাল্লা কিনে নিয়ে গেছে।'

হাস্যকবি সম্মেলন

সুকুমার রায় লিখেছেন না, 'লাল গানে নীল সুর হাসি-হাসি গন্ধ', বারবার সেই লাল গান, নীল সুরের কথা ভাবছিলাম।

ব্যাপারটা খুলেই বলি।

'হাস্যকবি সম্মেলন' মানে হাসির কবিতার লেখকদের সম্মেলন। দিল্লি, মুম্বই, পটনায় খুবই চালু অনুষ্ঠান এটা। জনপ্রিয় বটে।

আমাদের কবি সম্মেলনের মতো নীরস নয়।

বাংলা ভাষায় লঘু মেজাজের সঙ্গে গভীর অনুভূতির হালকা হাসির কবিতা লিখে গেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়। আমাদের কালে অজিতকৃষ্ণ বসু কিংবা আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ফেলনা নন। কিন্তু এঁরা কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছেন হাসির কবিতার সঙ্গে খোল, ঢোল, মৃদঙ্গ, করতাল। এমনকী এস্রাজ, বেহালা।

ডি এল রায়ের গানের সঙ্গে বাজনা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু হাস্যকবি সম্মেলন তো গান নয় পুরোই কবিতা। হিন্দি বলয়ের সংস্কৃতি জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

একজন কবিতা পড়ছেন। সঙ্গে দু'-একজন তাল দিচ্ছেন। আবার তিনি একই কবিতায় ফিরছেন প্রতি অনুচ্ছেদ অন্তর। এবার তিনি গান গেয়ে একই দু'পঙ্‌ক্তি নিবেদন করছেন, সঙ্গে হরেক রকম দিশি-বিদিশি বাদ্যযন্ত্র। আমি এসেছিলাম একটা আমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু অনুষ্ঠানটি ঠিক হজম করতে পারিনি। এইসব পদ্য-গীতের ফাঁকে ফাঁকে ছিল টুকরো টুকরো হাসির গল্প। তার কিছু কিছু উপভোগ করেছি।

দিল্লিওয়ালা এক কবি, বোধহয় তাঁর নাম ভগবতীপ্রসাদ একটা মজার গল্প বললেন। তিনি কোনও কাজে এক ডাকঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁকে একটি পোস্টকার্ড দিয়ে বললেন, 'আমার হাতে বাতব্যথা, আপনি যদি আমার চিঠিটা লিখে দেন।'

ভগবতীবাবু কী আর করবেন, তিনি ঠিকানাসমেত চিঠিটা লিখে দিলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে বেশ একটু উলটেপালটে দেখলেন, তারপর পোস্টকার্ডটি ভগবতীপ্রসাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নীচের দিকে একটু জায়গা আছে। যদি আরেকটা লাইন লিখে দেন।'

বাধ্য হয়ে ভগবতীবাবু বললেন, 'কী লিখতে হবে বলুন।' বৃদ্ধ বললেন, 'লিখুন, খারাপ হাতের লেখার জন্যে দুঃখিত।'

সত্যিই চমৎকার গল্প। আরও দুয়েকটি রীতিমতো ভাল গল্প শুনেছিলাম। আর একটি বলছি।

ঝাঁঝা থেকে এসেছেন এক কাব্যরত্ন। শ্রীযুক্ত মুরারি ঝা। অতিরিক্ত সুরসিক ব্যক্তি।

মুরারিবাবু বললেন যে তিনি ঠিক ঝাঁঝার লোক নন। তবে তাঁর পদবি ঝা হওয়ায় তিনি ঝাঁঝাকেই তাঁর বাসস্থান বলে বেছে নিয়েছেন। এটা বলার সময় ভদ্রলোকের মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল, কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।

স্বাস্থ্যবান, কৃষ্ণকায়, গাট্টাগোট্টা ভদ্রলোককে কেউ ঘাঁটাল না।

এরপর মুরারিবাবু বললেন যে তাঁর নামের অর্থ হল কালো মানুষদের শত্রু। তিনি ব্যাখ্যা

করলেন, মুরারি = মুর + অরি, স্বরসন্ধি, আর মুর মানে হল কৃষ্ণাঙ্গ বা কালো মানুষ, যেমন শেক্সপিয়ার সাহেবের 'ওথেলো দ্য মুর'।

অভিধানে অবশ্য 'মুর' শব্দের মানে একটু অন্যরকম বলছে, সে যা হোক মুরারিবাবু শ্রোতাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমি কালোদের শত্রু নই, আমি নিজেই কালো।'

মুরারিবাবু কাব্যরত্ন হলেও কাব্যচর্চা করলেন না। তিনি গুটিকয় মজার গল্প করলেন। দু'-একটি বেশ ভাল, তারই একটি মনে পড়ছে!

মুরারিবাবু রেলগাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁর পাশের সিটে বসেছিলেন সর্দারজি। সহসা মুরারিবাবু লক্ষ করলেন যে সহযাত্রী সর্দারজির একপায়ে লাল মোজা, অন্য পায়ে সাদা মোজা।

এ রকম মজার/মোজার ব্যাপার দেখে মুরারিবাবু কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল এটা হয়তো নতুন কোনও স্টাইল।

শেষ পর্যন্ত মুরারিবাবু সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিংজি, আপনার দু'পায়ে দু'রকম মোজা। আগে কখনও এ রকম কোথাও দেখিনি।' সর্দারজি নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার আরও এক জোড়া মোজা আছে, কিন্তু দেখলাম সেটারও এক পাটি লাল আর অন্যটা সাদা।'

মুরারিবাবুর প্রকাশভঙ্গি চমৎকার। সেদিন খুব হেসেছিলাম। কিন্তু আজ লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে ঠিক এই রকম একটা গল্প আগেও শুনেছি।

মুড়ি-মিছরি

আগে একটা কথা ছিল 'মুড়ি-মিছরির এক দর' অর্থাৎ ছোট-বড়, খারাপ-ভাল, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সবই যেখানে একদর অথবা যখন একদর, কিংবা সেই সময়টা মোটেই সুবিধের নয়। মুড়ি-মিছরির একদর হওয়া উচিত নয়।

একালে কিন্তু একথা আর বলা যাবে না।

একদা মুড়ি ছিল সহজলভ্য, গরিবানা খাবার। দামে কম। আর মিছরি ছিল দুর্লভ। দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। অনেকে বলেন, মিশর থেকে আসত বলে মিছরি। যেমন চিন থেকে চিনি, গৌড় থেকে গুড়।

সে যা হোক মিছরি ছিল সে আমলে, মুড়ির তুলনায় অনেক বেশি মহার্ঘ। তার ব্যবহার ছিল বড়লোকের শরবতে আর ঠাকুরঘরের প্রসাদে। দেবভোগ্য মিছরি আর শস্তা মুড়ির একদর হলে আশঙ্কারই কথা।

কিন্তু এখন তো তাই হয়েছে। মুড়ি-মিছরি একদর হয়ে গেছে। দুয়েরই দাম কুড়িটাকা কেজি। কোথাও কোথাও সামান্য কম বা বেশি হতে পারে।

শুধু মুড়ি-মিছরি নয়। প্রৌঢ় পাঠক আরেকটু মনে করুন। আমাদের বাল্যকালে চিকেন বা মুরগির মাংস ছিল দুর্লভ ও দুর্মূল্য। হোটেলে রেস্তোরাঁয়, সাহেব আধাসাহেবদের ডাইনিং রুমে দেখা মিলত এই সুখাদ্যের।

আমাদের মতো ব্রাত্যজনের জন্য ছিল পাঁঠা-খাসির শস্তা মাংস। এই সেদিনও, মাত্র চল্লিশ বছর আগে এই মাংস ছিল দুটাকা-আড়াই টাকা সের। সে জায়গায় একটা আধসেরি দিশি মুরগির দাম পড়ত চার-পাঁচ টাকা।

সব কিছুরই কালক্রমে দাম বেড়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে চালের দাম সবচেয়ে বেশি হয়েছিল টাকা-টাকা সের। এখন তো সদাসর্বদা এর থেকে পনেরো-বিশগুণ দাম দিয়ে চাল কিনতে হয়।

যে বাংলা উপন্যাসের দাম ছিল দুই কিংবা আড়াই টাকা এখন তার দাম ষাট টাকা। আপনি ইস্কুলে দেড় টাকা মাস মাইনে দিয়ে পড়েছেন, আপনার নাতির জন্যে মাস মাইনে সাতশো টাকা।

সাধারণ জিনিস থেকে সোনাদানায় যাই। আমার একটা রেকর্ড আছে। আগে বিখ্যাত সুরের ডায়েরিতে পুরনো দিনের সোনার দামের বিবরণ ছাপা হত। সুরের ডায়েরি বহুমূল্য হয়ে যাওয়ার পর এবং চমৎকার সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ডায়েরি উপহারে সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় আজকাল আর সুরের ডায়েরি দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং জানি না সেই স্বর্ণ বিবরণী এখনও দেওয়া হয় কি না।

আমার কাছে একটা পুরনো ডায়েরি কী করে রয়ে গেছে, সেখানে সোনার দামের একটা হিসেব দেখছি, প্রায় ষাট বছরের মূল্য তালিকা।

১৯৪০ সালে পুজোর সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে এক ভরি গয়নার সোনার দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। যুদ্ধের বাজারে দাম ওঠানামা করতে করতে পঁয়তাল্লিশ সালের শেষে সোনার দাম দ্বিগুণ হল। চিন যুদ্ধের সময় বাষট্টি সালে সোনার দাম আবার ডবল হয়ে ভরি প্রতি দাম দাঁড়াল প্রায় সোয়াশো টাকা। বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশ যুদ্ধের ঠিক আগে এক ভরি সোনার দাম প্রায় দুশো টাকায় পৌঁছোল। অবশেষে বাড়তে বাড়তে এখন তো প্রতি ভরির দাম এর পঁচিশ গুণ।

সোনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দু'হাজার টাকা বিঘে মানে একশো টাকা কাঠার জমি এখন লক্ষ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

শুধু সোনা বা মাটি নয়, বাড়ি ভাড়া বা গাড়ি ভাড়া নয়, মাছ-মাংস, তরি-তরিকারি, জামা-কাপড়, ওষুধ-ডাক্তার সব কিছুর মূল্য বাড়ছে তো বাড়ছেই।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর এক প্রতিবেদনে একদা চমৎকার বলেছিলেন,

'আগে পকেট ভরা টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে ব্যাগ ভরে জিনিস কিনে আনতাম। এমন দিন আসছে যখন ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে পকেট ভর্তি জিনিস কিনে আনতে হবে।'

গণ্ডারের দুধ

টু প্লাস টু ফোরই হবে, থ্রি কিংবা ফাইভ হবে না—এই ইংরেজি প্রবচনটা শিবরাম চক্রবর্তী একবার একটু ঘুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তিনি বলেছিলেন, দুয়ে দুয়ে সব সময়ে চার হবে তা নয় অনেক সময় দুয়ে দুয়ে দুধও হয়।

শিবরাম চক্রবর্তীর এই দুধ দোয়ানোর কথা মনে পড়ল সাম্প্রতিক একটি সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে। সংবাদটি গণ্ডারের দুধ দোয়ানো সংক্রান্ত। সংবাদটি অনেকেই হয়তো দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। তার আগে হাতির দুধের গল্পটা বলে নিই।

গল্পটি অবশ্য আমার পক্ষে খুব সম্মানজনক নয়। না, এমন আশঙ্কা করবেন না কেউ যে আমার মেদবহুল সুস্বাস্থ্য দেখে কেউ আমাকে হাতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সে রকম কেউ করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু তা করেনি, অন্তত আমার জ্ঞাতসারে নয়।

আমারই অস্ত্রে আমাকে ঘায়েল করেছিল একটি প্রগলভা বালিকা। কয়েকমাস আগে গিয়েছিলাম বাঁকুড়ায়। সেই সময়ে জঙ্গলের হাতি এসে জনপদে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিয়েছে। ঘরদোর ভেঙে ফেলছে হাতির পাল। ধানখেত চষে ফেলছে। মানুষজন আহত হচ্ছে, নিহতও হচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় হস্তিযূথের ছবি বেরচ্ছে। এদিকে শহরে গুজব রটেছে যে হাতির পাল এদিকেই আসছে। চারদিকে সাজসাজ রব উঠে গিয়েছে। বাজারে, রাস্তায়, অফিসে-আদালতে সর্বত্র হাতির কথা।

বাঁকুড়া শহরে আমি পুরনো বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি। বন্ধুদের আবার জমিজমা আছে জঙ্গলের দিকে গ্রামে। ফলত বন্ধুদের বাড়িতে হাতির গল্প, লোমহর্ষক সেসব কাহিনী—আরও বেশি বেশি হচ্ছে।

এই রকম এক আলোচনার সময়ে হঠাৎ বন্ধুর ভাইঝি, সুরম্যা, বছর বারো বয়েস হবে, ক্লাস এইটে পড়ে, হঠাৎ বলে বসল, 'হাতির দুধ খুব স্বাস্থ্যকর।'

এ রকম কথা আগে আর শুনিনি, তাই বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে প্রশ্ন করলাম 'কে বলেছে?'

সুরম্যা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'কে আবার বলবে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কী প্রত্যক্ষ প্রমাণ?'

সুরম্যা বলল, 'হাতির দুধ খেয়ে একটা বাচ্চার তিন মাসে কুড়ি কেজি ওজন বেড়েছে।'

সুরম্যার কথা শুনে তার জ্যাঠা মানে আমার বন্ধু মিটমিট করে হাসছিলেন। আমি সুরম্যাকে বললাম, 'কত বড় বাচ্চা?'

সুরম্যা জানাল, 'এক বছরের বাচ্চা।'

আমি বললাম, 'অসম্ভব। এক বছরের বাচ্চার ওজনই দশ কেজি হবে না। তার ওজন বাড়বে কুড়ি কেজি?'

সুরম্যা বলল, 'ও তুমি বুঝি মানুষের বাচ্চার কথা ভেবেছ। মানুষের নয় হাতির বাচ্চা, একটা হাতির বাচ্চার মায়ের দুধ খেয়ে তিনমাসে কুড়ি কেজি ওজন বেড়ে গেছে।'

এবার গণ্ডারের দুধ দোয়ার প্রসঙ্গে আসি। সম্প্রতি, এই গরমের দিনেও অসময়ে গুয়াহাটি শহরের চিড়িয়াখানায় খুব ভিড় হচ্ছে। সবাই যে জীবজন্তু দেখছে তা কিন্তু নয়, সবাই যাচ্ছে গণ্ডারের দুধ দোয়ানো দেখতে।

শনিরাম বোড়ো চিড়িয়াখানার জনৈক কর্মচারী। সে গোরুর মতো করে গণ্ডারের দুধ দোয়ায়।

শনিরামের আসল কাজ ছিল গণ্ডারের খাঁচা পরিষ্কার করা এবং গণ্ডারের খাবার দেওয়া। এ কাজ করতে প্রথম সে খুব ভয় পেত। কিন্তু তাকে তার শ্বশুরমশায় বলেছিলেন যে কোনও হিংস্র জীবজন্তুকে আদরযত্নে-ভালবাসায় বশ মানানো যায়।

কিন্তু গণ্ডার অত্যন্ত খামখেয়ালি প্রাণী। প্রায় বিনা প্ররোচনাতেই সে অনেক সময় মানুষকে বা অন্য পশুকে আক্রমণ করে। তবুও সাহসে ভর করে শনিরাম ধীরে ধীরে খাঁচায় গণ্ডারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত করে এবং গণ্ডারের বাচ্চা আলাদা খাঁচায় রেখে গণ্ডারের দুধ দোয়া আরম্ভ করে।

আশ্চর্যের বিষয় এই দুধ দোয়ানোয় মা গণ্ডার শনিরামকে মোটেই বাধা দেয়নি। এ ঘটনা শুরু হয়েছিল বছর পনেরো আগে। তারপর শনিরাম বছরের পর বছর দুগ্ধবতী গণ্ডার জননীদের দোহন করে যাচ্ছে।

এবং এ কাজে এখন সে একা নয়। তার একটি দোসর জুটছে। তার নাম উমেশ রাজবংশী।

উমেশ রাজবংশীও গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার কর্মচারী। সে শনিরামের কাছ থেকে গণ্ডারের দুধ দোয়া ভাল ভাবেই শিখে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তারও কোনও ভয়ডর নেই।

ফলে চিড়িয়াখানায় একসঙ্গে দুটি দুগ্ধবতী গণ্ডার হলে, পাশাপাশি খাঁচায়, শনিরাম আর উমেশ বালতি নিয়ে গণ্ডারের দুধ দোয়ায়। এই দৃশ্য দেখতে চিড়িয়াখানায় ভিড় উপচিয়ে ওঠে।

কিন্তু জানা যাচ্ছে না, এই গণ্ডারের ওই দুধ দিয়ে কী হয়। শনিরাম বা উমেশ কি খায়। নাকি অন্য মানুষেরা কিনে খায়। অবশ্য জল মিশিয়ে গোরুর দুধের সঙ্গে ভেজালও দেওয়া হতে পারে।

আমি ভাবছি, বাঁকুড়ার সুরম্যার গল্পের মতো গণ্ডারের দুধ নিয়মিত খেয়ে কোনও মানুষের ওজন তিনমাসে কুড়ি কেজি বেড়ে যাবে না তো?

তৈজসপত্র

এই নিবন্ধনিভ লঘু রচনার নামকরণেই মারাত্মক ভুল হয়ে গেল।

এবারের বিষয় তেজপাতা। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে তৈজসপত্র লিখে বেকায়দা হয়ে গেছে। অভিধান বা ব্যাকরণ কিছুই আমাকে সাহায্য করছে না এ বিষয়ে। অভিধানে অবশ্য তেজপাতা এবং তেজপত্র দুইই আছে। যার অর্থ সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'দারুচিনি জাতীয় বৃক্ষবিশেষের পত্র।' অন্যদিকে তৈজসপত্রের মানে হল বাসন-কোসন। তৈজস হল ধাতুনির্মিত। ধাতু নির্মিত বাসনপত্র, কাঁসা পিতলের ঘটি-বাটি-থালা-গেলাস এই সব।

অভিধান এবং/অথবা ব্যাকরণ নিয়ে বাচালতা আপাতত থাক। তেজপাতার সুরভি-বিহ্বল পৃথিবীর কথা বলি।

সে ছিল শৈশবের কল্পনার জগৎ। আমার ধারণায় ছিল সে এক অসম্ভব কল্পবৃক্ষ। রূপকথার পৃথিবীর সেই গাছের পাতা ছিল তেজপাতা, তার ফুল হল লবঙ্গ, তার কচি ফল হল সাদা ছোট এলাচ, তার পাকা ফল হল বড় এলাচ। সে গাছের বাকল হল দারুচিনি বা দালচিনি। সেই দারুচিনির খোসায়, শুকনো তেজপাতায় আর লবঙ্গফুলের ডেলার থেকে ঝরে পড়া জোয়ানের বিন্দু বিন্দু দানায় ছেয়ে থাকে সেই কল্পবৃক্ষের তলা।

বড় হয়ে জেনেছি এ রকম কোনও গাছ জগৎসংসারে নেই, হয় না। মশলার খবর পেয়েছি ইতিহাসের বইয়ে, ভূগোলের মানচিত্রে আর জীবনানন্দ দাশের কবিতায়।

টাঙ্গাইলে আমার বন্ধু মইদুলদের বাসায় একবার একটা লবঙ্গের গাছ দেখেছিলাম। এমন হতে পারে, ওদের বিশ্বাস ছিল যে ওটা লবঙ্গের গাছ। যা নাও হতে পারে। আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হয়নি। একটিও লবঙ্গ সে গাছে দেখিনি।

এই রকম ভাবে জীবনের ষাটবছর চলে গেল। শৈশবের সেই কল্পবৃক্ষের রোমাঞ্চ আজকাল আর অনুভব করি না। কিন্তু এবার শীতের শেষে শান্তিনিকেতনে তেজপাতা গাছের দেখা পেলাম।

সঠিক সময়-তারিখ হল পহেলা মার্চ, শনিবার অপরাহ্ণ। কলকাতা লবণহ্রদ নিবাসিনী শ্রীযুক্ত মিনতি রায় শান্তিনিকেতন গুরুপল্লীতে সেনবাড়িতে গিয়েছিলেন, এই প্রতিবেদকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

উল্লিখিত বাড়িটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রায় সমবয়সি। বিশাল এলাকা জুড়ে অসংখ্য গাছপালা, পুষ্করিণী তার মধ্যে দুই দিকে টানা বারান্দা দেওয়া এক প্রাচীন অট্টালিকা। শীতশেষের আবছায়া অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার নিবিড়তার দিকে এগোচ্ছে। জানা-অজানা নানারকম দিনমানের পাখি ফিরে আসছে বড় বড় গাছের আশ্রয়ে। আমগাছ মুকুলে ছেয়ে গেছে।

দেশি-বিদেশি নানা রকমের গাছ সে বাড়িতে। তারই মধ্যে থেকে একটা নাতিদীর্ঘ গাছের একটা ডাল ভেঙে গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী নীলাঞ্জনা আমাদের উপহার দিলেন। বললেন, 'এটা তেজপাতার ডাল। এই কাঁচা পাতাগুলো শুকিয়ে নিলেই তেজপাতা হয়ে যাবে।'

এত সহজে হাতের নাগালে তেজপাতার গাছ! সেই শীতের সন্ধ্যায় আর একবার শিহরিত হয়েছিলাম।

তখনই গুনে দেখেছিলাম গাছের ডালটিতে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট আটচল্লিশটি পাতা আছে। আমরা শ্রীমতী নীলাঞ্জনাকে বলেছিলাম, 'পাতাগুলো শুকিয়ে নিয়ে এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে তোমাকে বিস্তারিত জানাব।'

আজ সেই সুযোগ মিলেছে। আজকেই শেষ তেজপাতাও ফুরল, আজ কিশমিশ দিয়ে, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল হয়েছিল। সেই ব্যঞ্জন ছিল এই শেষতম তেজপাতাটির সৌরভ ভরপুর।

বাকি সাতচল্লিশটি তেজপাতার হিসেব এই রকম।

প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে কলকাতায় এসে দুটো-দুটো করে চারটে পাতা নষ্ট হয়েছিল সত্যিই তেজপাতা কিনা পরখ করার জন্যে পাতা ছিঁড়ে, গন্ধ শুঁকে।

এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় পরে প্লাস্টিকের প্যাকেটে পুরে বাকি পাতাগুলোকে ছাদে শুকোতে দিই। চৈত্রমাসের প্রখর কালবোশেখিতে প্লাস্টিকের প্যাকেটটি ছাদ থেকে উড়ে বাড়ির পাশের পার্কে গিয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে মিনতিদেবী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ঘাসের ওপরে পাতাভরা প্লাস্টিকের ব্যাগটা দেখে চিনতে পারেন। এবং সেটিকে উদ্ধার করেন।

ছাদের ওপরে যে তেজপাতা শুকোতে দিয়েছি সেটা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এর পরে আমরা সতর্ক হয়ে যাই। প্লাস্টিকের প্যাকেটটি দক্ষিণের জানালার শিকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিই। পুরো চৈত্রমাস তেজপাতাগুলি দক্ষিণের হাওয়ায় দুলে দুলে রোদ্দুরে শুকোয়।

অবশেষে শুভনববর্ষে, বাংলা পহেলা বৈশাখে প্যাকেট খুলে শুকনো তেজপাতাগুলি বের করা হয়।

দুঃখের বিষয় সেই সময় গুনে দেখা যায় কী করে বন্ধ এবং দোদুল্যমান প্যাকেটের মধ্যে থেকে চারটি পাতা কমে গেছে। আর মাত্র চল্লিশটি পাতা আছে।

এদিকে ওই পয়লা বৈশাখেই ঘি-ভাত, মাংস এবং পায়েসে সাতটি মহার্ঘ পাতা ব্যয় হয়ে যায়। এর পরে আমরা খুব সাবধান হয়ে যাই, না হলে গত তিনমাস আমরা মাত্র তেত্রিশটি তেজপাতা দিয়ে চালাতে পারতাম না। কালেভদ্রে মোহনভোগ, ছানার পায়েস বা মোচার ঘণ্ট হলে তেজপাতা ব্যবহার করা হয়েছে।

আজকের ছোলার ডালের সঙ্গে নিঃশেষে তেজপাতা ফুরল, এই রকম চিন্তায় যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে বসে আছি, মিনতিদেবী জানালেন, এখনও তাঁর কাছে চারটে তেজপাতা আছে, সেই চারটি যেগুলো আমরা হারিয়ে গেছে ধরে নিয়েছিলাম, সেগুলো তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন আমাদের অদূর বিবাহবার্ষিকীর জন্যে।

তেজপাতা পুনরুদ্ধারের এই সংবাদে হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না। তবে এটা জানি, চারটে তেজপাতার জন্যে অন্তত চারশো টাকার বাজার করতে হবে।

পুলিশ

'মাছের মধ্যে ইলিশ।
আর মানুষের মধ্যে পুলিশ।'

এই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি দুটি যে মহাজন (মতান্তরে মহাকবি) রচনা করেছিলেন তিনি খুব প্রাচীন ব্যক্তি নন।

ইলিশের প্রাচীনত্ব নিয়ে একটু আধটু আলোচনা চালানো যেতে পারে। তেমন তেমন দিগ্গজ পণ্ডিত এ সুযোগ পেলে চর্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাস-কাশীরাম-আলাওল, এমনকী যে বৈষ্ণবকাব্য (আমিষগন্ধ নাহি তায়)—তার মধ্যে ইলিশ কিংবা ইলিশের আভাস খুঁজে হদ্দ হয়ে যেতেন।

সেদিক থেকে পুলিশ অনেক আধুনিক। সেপাই-শান্ত্রী-লেঠেল-বরকন্দাজ, পাইক-কোতোয়াল চিরকালই ছিল, কিন্তু পুলিশ এল ইংরেজদের হাত ধরে মাত্র আড়াইশো বছর আগে।

পুলিশ এসেই জনমানসে তার অবস্থান পাকা করে নিয়েছিল। তার কী খাতির, কী রমরমা। গ্রাম্য কবিয়াল তাকে রাজার আসনে, তার চেয়েও বেশি শ্রীকৃষ্ণের আসনে, ভগবানের আসনে বসিয়ে গান বেঁধেছিল,

লাল পাগড়ি মাথে
তুমি রাজা হলে মথুরাতে।

সেই লাল পাগড়ির গৌরব, তার জলুস অনেকদিন বিদায় নিয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে টুপি,

প্রয়োজনবোধে হেলমেট। লাল পাগড়ি এখনও রয়ে গেছে পুরনো সাদাকালো বাংলা সিনেমায় আর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মাণিক-জয়ন্ত-সুন্দরবাবুর রোমাঞ্চকর কাহিনীমালায়।

লাল পাগড়িওয়ালা পুলিশকে মানুষ যেমন ভয় করেছে এখনকার টুপিওলা পুলিশকেও মানুষ তেমনিই ভয় পায়। ঠিক ভয় পাওয়া নয় ব্যাপারটা, পুলিশকে মানুষ এড়িয়ে যেতে চায়। সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে থেকে পুলিশ সম্পর্কে এই আতঙ্কের ভাব হাজারো জনসংযোগ সভা কিংবা বন্ধুত্বমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতা করে কিঞ্চিৎ কমানো যেতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে কবিদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক কেন যেন একটু স্নেহ ভালবাসার। শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যেই নয় সবরকম পুলিশের মধ্যে কবির সংখ্যা খুব বেশি। সেপাই হোক বা দারোগা, সব থানাতেই একজন করে থানাকবি আছে। লালবাজারে বা ভবানীভবনে তো পুলিশকবির ছড়াছড়ি। প্রত্যেক থানাতে একটি করে দেয়াল পত্রিকা এবং বছরে একটি করে কবিসম্মেলনের আয়োজন করলে খুব ভাল হয়।

কবি তুষার রায় একদা এক চমৎকার কবিতায় পুলিশকে অনুরোধ করেছিলেন,

'ওরে, ও ভাই পুলিশ
আমাকে দেখে টুপিটা তোর
একটুখানি খুলিস।'

পুলিশের সঙ্গে সত্যিকারের দহরম-মহরম ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা, 'সারাদিন আমাদের পিছু পিছু ঘুরেছে পুলিশ।' তিনিই লক্ষ করেছিলেন যে কুচকাওয়াজের শেষে পুলিশেও গাইল রবীন্দ্রসংগীত। (বহু পুরনো স্মৃতি থেকে এসব উদ্ধৃতি। ভুল হলে পাঠক নিজগুণে সংশোধন করে নেবেন।)

এবার আমি পুলিশের একটা দুঃখের কথা বলি। বছর দশেক আগে হাওড়ার এক যুবক ডি এস পি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখুন সাধারণ লোকে আমাদের মানুষের মধ্যে গণ্য করে না।'

আমি বললাম, 'মানে?'

তিনি বললেন, 'আজকেই দুপুরে অফিসের কাজে একটা বাড়িতে গিয়েছিলাম। ইউনিফর্ম পরা ছিল, আমার সঙ্গে সেই পাড়ারই এক ভদ্রলোক ছিলেন। বাড়ির দরজায় গিয়ে বেল বাজাতে কাজের মেয়েটি দরজা খুলে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঘোষণা করলে, 'বাইরে একজন ভদ্রলোক আর একজন পুলিশ এসেছে।'

অবশেষে পুলিশ ঘটিত একটি নাবালকসুলভ কাহিনী। নাবালকসুলভ হলেও এর মধ্যে যে তত্ত্বকথা আছে সে খুব জটিল।

একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রায় সব ছাত্রই খ্রিস্টান বাড়ির।

রবিবারের ছুটির দিনে ছেলেরা স্কুলের মাঠে খেলছে। একটি সরল প্রকৃতির ছেলে, ভোলা, সে বললে, 'সবদিন রবিবার হলে কী ভাল হত। কাজ করতে হত না, পড়াশুনো করতে হত না।'

তার বন্ধু কালু, এক পাদরির ভাগ্নে, সে বলল, 'তা হবে কী করে? রবিবার হল সাবাথ (Sabbath), প্রেয়ার আর খেলার দিন। আজকে কাজ করলে, পড়াশুনো করলে পাপ হয়। সেসব করতে হয় অন্যদিন। আজকে কাজ করলে যিশু রাগ করবে। স্বর্গে যেতে পারবে না।'

ভোলার মুখ কালো হয়ে গেল, তার বাবা পুলিশে কাজ করে। সে বলল, 'কিন্তু আমার বাবা যে পুলিশে কাজ করে। রবিবারে ডিউটি থাকে।'

কালু বুদ্ধিমান ছেলে। একটু ভেবে সে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। তোর বাবার তো আর স্বর্গে যেতে হচ্ছে না। স্বর্গে তো পুলিশ লাগে না।'

গোরু

গৌঃ গাবৌ গাঃ। বিসর্গগুলি ঠিক বসালাম কি? ব্যাকরণ কৌমুদী হাতের কাছে থাকলে মিলিয়ে দেখতে পারতাম।

গোরু সম্পর্কে আমার বিদ্যা সপ্তম শ্রেণীর শব্দরূপ পর্যন্ত। অবশ্য ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে আমি আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করতে পারতাম। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু কালীঘাট মন্দিরের সামনের ফুটপাথ থেকে 'সরল গো চিকিৎসা' নামে একটা চটি বই ছয়আনা দিয়ে কিনে আমাকে উপহার দিয়েছিল, তাতে লিখে দিয়েছিল,

'নিজের চিকিৎসা নিজে করো।'

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা সেই সময়ে খুব সম্মানজনক মনে হয়নি। তবে জীবনের ষাট বছর পার হয়ে এখন আর সম্মান-অসম্মানের সূক্ষ্ম পার্থক্য আমাকে মোটেই ভাবায় না, ধরতেও পারি না। গল্পের খাতিরেই ঘটনাটা লিখলাম।

এখন তো গোরু ব্যাপারটা খুবই গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের হিন্দিভাষী অঞ্চলের বিশাল অংশের নামকরণ হয়েছে গো-বলয়।

গো-বলয়ের একটি প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম রাবড়ি দেবী। তাঁর নাকি রমরমা দুধের ব্যবসা। বছরে লক্ষাধিক টাকা আয়। তাঁরই টাকায় তাঁর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বামী বাড়ি-ঘর, জোত-জমি করেছেন। সে ভদ্রলোক আবার গাওলার মানে গোখাদ্য চুরির মামলায় আসামি, যে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত জামিন না-মঞ্জুর করেছেন। ভদ্রলোকের কপালে লাপসি ভক্ষণ (লাপসি জেলের খাবার) অনিবার্য। তিনি বিপদ বুঝে সহধর্মিণী রাবড়িদেবীকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

অনায়াসে এ বিষয়ে লাপসির বদলে রাবড়ি এই নামে একটি চমৎকার সুরক্ষা নিবন্ধ লেখা যায়।

কিন্তু তা আমি লিখব না। আমার লেখাকে রাজনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিতে আমি ইচ্ছুক নই। (বাচ্চালোক তালি লাগাও।)

এবার আমি গোরুর গল্প বলব।

প্রথমে স্কুলে যাই। স্কুলের মাঝারি ক্লাশে 'গোরু' বিষয়ক রচনা প্রশ্নকর্তাদের খুব প্রিয় বিষয়।

যথারীতি একটি পরীক্ষায় গোরুর বিষয়ে রচনা এসেছিল। দুটি ছেলে পাশাপাশি বসে লিখছিল। হঠাৎ একটি ছেলে শিক্ষককে ডেকে বলল, 'স্যার, ভুবন টুকছে।' পাশের ছেলেটি ভুবন, সে প্রতিবাদ করতেই অভিযোগকারী ছেলেটি বলল, 'স্যার, ওই জানলার ওপাশে দেখুন।'

স্যার দেখলেন জানলার ওপাশে কিছু নেই। স্কুলের দারোয়ানের একটা গোরু কাঁঠালগাছের নীচে শুয়ে আছে। অভিযোগকারী জানাল, 'ওই গোরুটাকে দেখে টুকে টুকে ভুবন ওর গোরুর রচনা লিখছে।'

পরের গল্পটি আরও গোলমেলে।

ছাত্র গোরুর রচনা অবশ্যই আসবে জেনে মুখস্থ করে গিয়েছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষক রচনা লিখতে দিয়েছেন, 'আমার বাবা।'

ছাত্রটি আর কী করবে? সে ভেবেচিন্তে বাবাকে গোরুর স্থলাভিষিক্ত করল। বেশ গুছিয়ে লিখল।

'আমার বাবা খুব উপকারী জন্তু। আমার বাবা ঘাস খায়। দু'বেলা দু' বালতি দুধ দেয়। বাবার দুটো শিং আছে, চারটে পা আছে। বাবা আমাদের খুব কাজে লাগে। বাবার চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হয়।'

এ হল শিশুসুলভ ব্যাপার। অবশেষে গোরু বিষয়ে বয়স্কোচিত কাহিনী বলি।

এক গ্রাম্য গৃহস্থ সারাদিন বনে বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে তার পালিয়ে যাওয়া গোরুকে খুঁজেছেন এবং পাননি। তারপরে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, কাঁটাঝোপের আঁচড়ে কিঞ্চিৎ রক্তাক্ত অবস্থায় সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসেছেন।

উঠোনে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি দাওয়ায় বসা ছেলেকে বললেন, 'ভাই, এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো।'

গৃহস্থী (= গৃহস্থের স্ত্রী) পাশের রান্নাঘরে বসে রাতের রান্না করছিলেন। স্বামী ছেলেকে ভাই বলছে শুনে তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি উঠোনে নেমে স্বামীকে বললেন, 'বানরমুখো, মিনসে। বদমায়েসির জায়গা পাওনি। সাঁঝবেলায় ঘরে ফিরে এসে ছেলেকে বলছ, 'ভাই।'

স্ত্রীর এই কঠোর ব্যবহারে গৃহস্থের কিন্তু কোনও ভাববিকার দেখা গেল না। সহধর্মিণীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে পড়ে তিনি নরম গলায় বললেন, 'মা, মাগো। গোরু হারিয়ে গেলে মানুষের কী দশা হয়, তোমাকে আর কী বলব মা জননী।'

এ গল্প এর আগে সবাই শুনেছে। আমিই তো কতবার বললাম কিন্তু এসব গল্প পুরনো হয় না।

অণুনাটিকা

দক্ষিণ কলকাতার শরৎ বসু রোড নিবাসিনী শ্রীমতী স্নিগ্ধা দাশগুপ্তা নাম্নী এক মহিলা, আমাকে কিছুদিন আগে ফোন করেছিলেন।

স্নিগ্ধা দেবীর উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি হাসির গল্প লেখা শিখতে চান। সেই জন্য তিনি আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশিনী, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে জেনে নিতে চান কী করে হাসির গল্প লিখতে হয়।

হাসির গল্প নামক মার্কামারা রচনা লেখারও যে একটা শেখার ব্যাপার আছে, এ কথা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি। হাসির কথা যখন যে রকম মনে হয়েছে লিখেছি। কখনও কখনও শুনে বা পড়ে আবার নেহাত খারাপ ছাত্রের মতো অন্য কোনও বই থেকে বেমালুম টুকে লোক হাসাতে চেষ্টা করেছি।

এ ধরনের হাবিজাবি লেখার লোক বিশেষ নেই বলে, সম্পাদক মহোদয়েরা গম্ভীর মুখে, নিতান্তই অপারগ হয়ে, সেগুলো গ্রহণ করেছেন। আর কম্পোজিটর এবং প্রুফ রিডারবাবুরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, 'যেমন হাতের লেখা, তেমনই রসিকতার ছিরি।'

এর পরেও গোমড়ামুখো, বিদ্যাবুদ্ধি ভারাক্রান্ত পাঠকেরা কেন যে এসব লেখা পড়েছেন, কেন যে হাজার গোঁজামিল দেয়া প্রকাশকেরা বই করে ছেপেছেন সব রহস্য আমার জানা নেই।

শ্রীমতী স্নিগ্ধা দাশগুপ্তের ফোন পাওয়ার পরে আমার মনে হল, সত্যিই তো উপযুক্ত বয়েসে যদি

উপযুক্ত মানুষের কাছে আমি হাসির গল্প লেখাটা ঠিকমতো শিখতে পারতাম, কত ভাল হত।

আমি যখন লেখার মকশো শুরু করি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সেই পঞ্চাশ-ষাটের যুগে সেই সময় শিবরাম চক্রবর্তী এবং পরশুরাম দু'জনাই জীবিত ছিলেন। দু'জনকেই অল্প বিস্তর চিনতাম। শিবরামের সঙ্গে তো বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল। কিন্তু তাঁদের কাউকে সাহস করে বলে উঠতে পারিনি, 'হাসির গল্প লেখাটা একটু শিখিয়ে দেবেন?' আসলে এ রকম কোনও বুদ্ধি মাথায় খেলেইনি।

শ্রীমতী দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ, তিনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। কিন্তু এই যাট বছর বয়েসে গুরু পাব কোথায়? আর তেমন গুরু পেলেও আমার মতো অজ মূর্খ, শুষ্ক কাউকে তিনি শিষ্য গ্রহণ করবেন কেন?

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী দাশগুপ্তের বিষয়ে আমার মনের মধ্যে প্রবল কৌতূহল দেখা দিয়েছে। তদুপরি হাসির গল্প লেখা শেখা বলতে তিনি কী বোঝেন, সেই শিক্ষার পাঠক্রম কী হবে বা হওয়া উচিত সেসব নিয়েও শ্রীমতীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আছে। তবে তাঁকে বলেছিলাম, এখন একটু ব্যস্ত আছি, পুজোর লেখার মরশুম চলছে, তিরিশে জুনের পর আপনার সঙ্গে বসব। তিনিও সানন্দে রাজি হয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয়, শ্রীমতী দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে আরও দুবার ফোন করেছেন। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এই 'কী খবরে' দুটি অণুনাটিকা পেশ করেছিলাম। স্নিগ্ধা দেবী আমাকে বলছেন, হাসির গল্পের চেয়ে এই রকম অণুনাটিকা ঢের ভাল, এই রকম অণুনাটিকা যেন বেশ কয়েকটা লিখি। উপরোধে ঢেঁকি গেলার একটা ব্যাপার আছে, এবারের অণুনাটিকাগুলি প্রায় তাই।

এক

স্থান: একটি থানার মধ্যে দারোগাবাবুর সামনে এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন।

ভদ্রলোক: স্যার, গতকাল আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আমার স্ত্রী পালিয়ে গেছেন।

দারোগাবাবু (ডায়েরি লিখতে লিখতে): আপনার বন্ধুর নাম বলুন।

ভদ্রলোক: তা জানি না। নাম বলতে পারব না।

দারোগাবাবু (ডায়েরি লেখা বন্ধ করে): তবে যে বললেন, 'আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু'।

ভদ্রলোক: সে তো ঠিকই বলেছি। শ্রেষ্ঠবন্ধু না হলে আর আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, আমার স্ত্রীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে?

দুই

স্থান: একটি চুল কাটার সেলুন। অন্যান্য ক্ষৌরকারেরা বিভিন্ন খদ্দেরের চুল, দাড়ি কাটতে ব্যস্ত রয়েছে। এমন সময় কোট-প্যান্ট-টাই পরা এক ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক দাড়ি কামাতে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের খুব তাড়াতাড়ি থাকায় সেলুনের শিক্ষানবিশ নাবালক ক্ষৌরকারটি তাঁর দাড়ি কামানোয় হাত দিল।

শিক্ষানবিশ (অল্প কিছুক্ষণ দাড়ি কামানোর পরে): স্যার, আপনার নেকটাইটায় কি নীল স্ট্রাইপের মধ্যে লাল ফোঁটা-টোঁটা আছে?

ভদ্রলোক: না। শুধু নীল স্টাইপ। লাল ফোঁটা আবার দেখছ কোথায়?

শিক্ষানবিশ: (দাড়ি কামানো থামিয়ে) তা হলে সর্বনাশ হয়েছে স্যার।

ভদ্রলোক: কীসের সর্বনাশ? এসব কী বলছ তুমি? ও কী? দাড়ি কামানো বন্ধ করলে কেন, তাড়াতাড়ি হাত চালাও।

শিক্ষানবিশ: আমি আর হাত চালাতে পারব না স্যার। আপনার গাল আমি সাংঘাতিক কেটে ফেলেছি। আপনার নেকটাইয়ের নীল স্ট্রাইপ লাল ফোঁটায় ভরে গেছে।

তিন

স্থান: একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার অফিস ঘর। টেবিলের ওপরে টেলিফোন বাজছে। বড়দিমণি ফোন ধরলেন।

বড়দিমণি: হ্যালো, হ্যালো।

টেলিফোনে কচি কণ্ঠস্বর: কে, বড়দিমণি বলছেন?

বড়দিমণি: হ্যাঁ, বলুন।

টেলিফোনে কচি কণ্ঠস্বর: ক্লাস টুয়ের সায়ন্তনী চক্রবর্তীর খুব জ্বর হয়েছে, সে আজ স্কুলে যেতে পারবে না।

বড়দিমণি: আপনি কে বলছেন?

টেলিফোনে কচি কণ্ঠস্বর: আমি মা বলছি।

বড়দিমণি: মা?

টেলিফোনে কচি কণ্ঠস্বর: হ্যাঁ, আমি আমার মা বলছি।

পুনশ্চ:

এক

বড়সাহেবের ঘর। ছোটবাবু একটি দরখাস্ত হাতে করে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বড়সাহেব ব্যস্তভাবে নথি দেখছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে ছোটবাবুকে দেখলেন।

বড়সাহেব: কী ব্যাপার।

ছোটবাবু: (হাতের দরখাস্ত বড়সাহেবের সামনে পেশ করে) স্যার, এই একটি ছুটির আবেদন।

বড় সাহেব: এই তো সাতদিন ছুটি কাটিয়ে এলেন বিয়ে করার জন্যে। আবার ছুটি?

ছোটবাবু: ওই স্যার, একটু হানিমুনে যাব, সেই জন্যে যদি কয়েকদিন ছুটি পেতাম।

বড়সাহেব: কয়দিন ছুটি চাই?

ছোটবাবু: (বিনীতভাবে, হাত কচলাতে কচলাতে) সে স্যার আপনিই ঠিক করে দিন।

বড়সাহেব: কী করে ঠিক করব? আমি তো আপনার স্ত্রীকে দেখিনি, কী করে বুঝব হানিমুনে ক'দিন লাগবে।

দুই

স্থান: মধ্য কলকাতার, একটি হোটেল।

খদ্দের: (রাগত ভাবে) বেয়ারা এটা কী দিয়েছ?

বেয়ারা: মাংসের ঝোল স্যার।

খদ্দের: এটা মাংসের ঝোল? এটা তো মুখে তোলা যায় না। যাও তোমার ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো।

বেয়ারা: তাতে কোনও লাভ হবে না, স্যার।

খদ্দের: (চটে গিয়ে) কেন?

বেয়ারা: (বিনীতভাবে) ম্যানেজারবাবুও এ মাংস খেতে পারবেন না, স্যার।

তিন

স্থান: দন্ত চিকিৎসকের চেম্বার। ডাক্তারবাবু রোগীর দাঁত তুলতে উদ্যত।

রোগী: (পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে) ওরে বাবারে, মরে গেলাম রে!

ডাক্তারবাবু: আপনি এমন সাংঘাতিক চেঁচাচ্ছেন কেন, আমি তো এখন পর্যন্ত আপনার দাঁতে হাত দিইনি।

রোগী: দাঁত নয়, দাঁত নয়।

ডাক্তারবাবু: তবে?

রোগী: আপনি আপনার জুতোর গোড়ালির নীচে আমার বাঁ-পায়ের-বুড়ো আঙুলটি থেঁতলে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁত তোলার নিকুচি করেছে। আপনি ভাল চান তো এখনই আমার পায়ের ওপর থেকে জুতো সরান।

যদিদং হৃদয়ং

ঘটনাটা সব খবরের কাগজে অল্প বিস্তর প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরের সাগরমেলার প্রতিবেদকেরা সকলেই বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন। দু'-একটি দৈনিক কাগজে ছবিও ছাপা হয়েছে।

পৌষ মাসের শেষ দিন মকর সংক্রান্তি। দিনটা ছিল মেঘলা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি। লক্ষাধিক পুণ্যার্থী সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হয়েছিল, শীত বৃষ্টি, আহার-নিদ্রা উপেক্ষা করে পুণ্য মুহূর্তে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে।

সমুদ্রের দিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। সমুদ্রের তীরে এক জায়গায় বেশ ভিড়। সেখানে একটা বিয়ে হচ্ছে। একটু আগেই রাত বারোটা বেজে গেছে।

দুটি খবরের কাগজে সে বিয়ের ছবি আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। কোনওটাতেই পাত্রীর মুখ ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটি ছবিতে পাত্রের মুখ বেশ স্পষ্ট। দেখে মনে হয় পাত্র বছর পনেরো-ষোলোর বালক।

পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত ভবানী দেবনাথ, সাকিন নামখানা। পাত্রী হলেন শ্রীমতী দুর্গা পাণ্ডা, তাঁর বাড়ি ওই সাগরদ্বীপেই।

পাত্রীর বাবা স্থানীয় দরজি। পাত্র ভ্যান রিকশা চালান নামখানা বন্দরে।

মধ্যরাতের লোকজনভরা তীর্থমেলায় এ রকম একটি বিবাহবাসরে কৌতূহলী দর্শকের অভাব হয়নি। নিতান্ত বালক-বালিকার বিয়ে দেখে অনেকেই প্রশ্ন করে, 'পাত্রের বয়স কত? পাত্রীর বয়স কত?'

আইন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পাত্র নিজেই শিখিয়ে দেওয়া উত্তর দিয়েছিল যে তার বয়স আঠারো। কিন্তু আঠারো বছর বয়সে ভোট দেওয়া যায় বটে, পুরুষেরা বিয়ে করতে পারে না। আঠারো বছর বয়সের মেয়েদের বিয়ে সিদ্ধ, কিন্তু ছেলেদের বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ।

পাত্র শ্রীযুক্ত ভবানী দেবনাথ, আর যা হোক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিবাসী, যেখানকার লোকেরা আইনি চতুরতার জন্যে বঙ্গবিখ্যাত। কোনও কাজ না থাকলে তারা নাকি সদরে আদালতে যায় প্রতিবেশী, বন্ধু বা জ্ঞাতির নামে মামলা দায়ের করতে।

সুতরাং শ্রীযুক্ত ভবানীই বা কম কীসে। তিনি যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন আঠারো বছর বয়েস বলাটা ভুল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নিজের বয়েস এক ধাপে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে পঁচিশে তুলে দিলেন।

উৎসাহী জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে বিয়ে আরম্ভ হওয়ার একটু পরেই মালা বদল করে পাত্র-পাত্রী একটি হোগলার কুঠিতে আশ্রয় নিলেন। বাকি মন্ত্র-তন্ত্রের কাজ যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে পুরোহিত শ্রীদিলীপ পাণ্ডাই চালিয়ে গেলেন।

হঠাৎ এমন দিনে এমন জায়গায় এই বিয়ে কেন, এই প্রশ্নের জবাবে দিলীপবাবু বললেন, 'মকর সংক্রান্তির মতো এমন পুণ্য তিথি বিরল। পৌষ মাসে বিয়ে অশুভ। রাত বারোটায় পৌষ মাস শেষ হয়ে গেলে মাঘের পুণ্যলগ্নে উপযুক্ত পাত্রীকে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল।'

পুরোহিতমশায়কে বলা যেত, রাত বারোটায় দিন শেষ হয় বিলিতি মতে। হিন্দু মতে নতুন দিন শুরু হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে, মধ্যযামে নয়।

কিন্তু একথা পুরোহিতকে বলা হয়নি। তবে যে শতশত জনতা সেই বিবাহ বাসরে ভিড় করেছিল তাদের কেউ কেউ পাত্রপাত্রীর অভিভাবকদের বলেছিল। 'ছেলের বয়স তো একুশ হয়নি দেখা যাচ্ছে। এভাবে বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু আইনে এ বিয়ে টিকবে না।'

কিন্তু একথা শুনে বরকর্তা বলেছিলেন, 'এই মকর সংক্রান্তি সাক্ষী, কপিল মুনি সাক্ষী, আকাশ সাক্ষী, গঙ্গা সাক্ষী, ভগবান সাক্ষী। কী বলছেন, এ বিয়ে আইনে টিকবে না! আইন কি ভগবানের চেয়ে বড়?'

গঙ্গাসাগরের শীতার্ত মধ্য রাতে, বিভ্রান্ত সমুদ্র এবং আকুল বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি। আমলা, পুলিশ, শহুরে শিক্ষিত নাগরিক অনেকেই সেই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন।

এমন বাদল দিনে

হাওয়া-অফিস যাই বলুন, তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী নস্যাৎ করে পালিয়ে যাওয়া হুলো বেড়ালের মতো বর্ষা নিঃশব্দে ফিরে এসেছে।

এবং এখন অন্তত মাস তিনেক সে থাকবে। তার বিদায় নিতে নিতে শরৎকাল গড়িয়ে যাবে।

ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কী কী দিনে অবশ্যই বৃষ্টি হবে তা নিয়ে সাধারণ বঙ্গবাসীর একটা সংস্কার আছে। এর মধ্যে প্রথমেই আছে আষাঢ়ের প্রথমভাগে হিন্দুর অম্বুবাচী তদুপরি পয়লা আষাঢ়।

সেই কতকাল আগে মহাকবি কালিদাস 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র কথা লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও কবিতায় সেই বক্তব্যে ডিটু দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা এ বছর উপগ্রহ বলেছিল, মৌসুমি বৃষ্টি এসে যাচ্ছে ৮ জুন। তারপর পিছোতে, পিছোতে, আকাশে মেঘ করে, মেঘ ভেসে যায় বৃষ্টি আর আসে না। চটচটে ঘাম, গরম চল্লিশ ডিগ্রি ছোঁয় ছোঁয়, প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম।

অধীর প্রতীক্ষা করতে করতে অবশেষে বৃষ্টির ভরসা যখন প্রায় সবাই ছেড়ে দিয়েছে ঠিক তখনই পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামল। জ্যৈষ্ঠশেষের স্বেদসিক্ত, গ্রীষ্ম জর্জরিত নিশাবসানে জানালায় দেখি বৃষ্টির মেঘ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। তারপরে তুমুল বৃষ্টি।

মধ্যে কয়েকদিন বৃষ্টির খামতি হয়েছিল। দু'-একদিন হল বর্ষা রাজরানির মতো ফিরে এসেছে।

সে যা হোক, বাঙালির চিরাচরিত ভাবনায় সারা বছরে অবশ্যম্ভাবী বৃষ্টির কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট আছে। পয়লা আষাঢ়, অম্বুবাচীর পরে রথযাত্রার দিন, সোজা রথ আর উলটো রথ দু'দিনই নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে। বৃষ্টিভেজা নয় এমন রথের দিন কল্পনাই করা যায় না। তা হলে তো পাঁপড় ভাজার স্বাদই পাওয়া যাবে না।

রথের পর বৃষ্টিবহ তিথি হল ঝুলন পূর্ণিমা। তারপরে মনসা পুজো। অবশেষে বিজয়া দশমী। এক বছরের মতো বৃষ্টির পালা শেষ। তবে পূর্ববঙ্গে কার্তিক মাসের গোড়ায় কাটতান নামে একটা ধারাবাহিক বৃষ্টি আমরা ছোটবেলায় দেখেছি।

তবে সেই সব পঞ্জিকাসিদ্ধ বৃষ্টির বাইরে আধুনিক যুগে দুটি নতুন বৃষ্টির দিন যুক্ত হয়েছে।

এর একটি হল পঁচিশ বৈশাখ। কোথাও কিছু নেই। কোথা থেকে ঝড়বৃষ্টি এসে প্যান্ডেল ভাসাবেই। ভেজা বাঁয়া তবলায় তবলচির হাতের তালু বারবার পিছলিয়ে যাবে।

আর আছে ভরা বর্ষায় আমাদের স্বাধীনতা দিবস, বৃষ্টিসিক্ত পনেরোই আগাস্ট। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা প্রতিটি স্বাধীনতা দিবসে অঝোরে ভেজে।

আষাঢ় মাসের এই বৃষ্টির দিনে দু'-একটা আষাঢ়ে গল্প স্মরণ করি। প্রথম গল্পটি বহু কথিত, বহু পঠিত গোপাল ভাঁড়ের। গল্পটি আমিও মাঝে মধ্যে লিখে থাকি, সেই সুবাদে আবারও লিখছি।

প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে পরপর কয়েকদিন। কৃষ্ণনগরের পথঘাট অতিশয় কর্দমাক্ত, ভয়াবহ পিচ্ছিল। গোপাল ভাঁড়ের, এই রকম দুর্যোগের দিনে রাজসভায় আসতে দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুবই কড়া প্রশাসক। গোপাল ভাঁড় আসতে তিনি দেরি করার কৈফিয়ত চাইলেন।

গোপাল বললেন, 'রাস্তা যা পিছল হাঁটতে গেলে এক পা এগোলে দু' পা পিছিয়ে যেতে হয়।'

রাজা বললেন, 'তা হলে এলে কী করে?'

গোপাল বললেন, 'বুদ্ধি করে উলটো দিকে মুখ করে হাঁটতে লাগলাম, তাই এসে পৌঁছাতে পারলাম।'

বৃষ্টির প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পটি একটু অন্যরকম। ইহুদিদের নাকি বৃষ্টিতে ছাতা দরকার পড়ে না। তারা বৃষ্টির ধারার ফাঁকের মধ্য দিয়ে গলে শুকনো বেরিয়ে আসে।

তবে ভয়াবহ গল্প লিখেছিলেন হিমানীশ গোস্বামী। সেই গল্পের বিষয়বস্তু হল, জোর বৃষ্টিতে রাইটার্স বিলডিংসের সামনে রাস্তায় প্রচুর জল জমেছে। একেবারে থই থই জল। আর সেই জলে ডুবে সেচ দপ্তরের বড়বাবু মারা গিয়েছেন। সেই জন্যে রাইটার্স ছুটি হয়ে গেছে।

এমন আষাঢ়ে গল্প শুধু এমন বাদল দিনে বলা যায়।

ফাঁসি

ফাঁসি! অবশেষে এ রকম মারাত্মক বিষয় নিয়ে রম্যরচনা? সর্বনাশ! কিন্তু সম্পাদক মহোদয়, আমার কী দোষ? আপনারাই তো দলবদ্ধভাবে আমাকে এই অনিবার্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

গত দশ-পনেরো বছরে আমাকে বোধহয় হাজারখানেক রম্যরচনা নামক এই অখাদ্য ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে হয়েছে। সাপ-ব্যাঙ, হাঁচি-কাশি, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি হরেক দ্রব্য ব্যবহার করেছি। অবশেষে এখন দেওয়ালে পিঠ পড়েছে। এখন খুন-ধর্ষণ-ফাঁসি এই সব ভয়াবহ উপাদানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

সুতরাং নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

জটিল আলোচনায় প্রবেশের ছলে ফাঁসির বিষয়ে দু'-একটা গল্প বলে নিই।

ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকের কথা। তখনও সব জেলার সদর জেলে ফাঁসির কাঠগড়া তৈরি হয়নি। কোথাও তেমন ফাঁসির হুকুম হলে শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে ফাঁকা জায়গায় ফাঁসির বন্দোবস্ত করা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমাদের ভারতবর্ষে স্মরণকাল থেকে প্রাণদণ্ডের প্রচলন আছে, কিন্তু ফাঁসি দেওয়া ছিল না। এটি একটি নির্ভেজাল ইংরেজ অবদান।

ভারতবর্ষে প্রাণদণ্ড হত শূলে চড়িয়ে কিংবা কোতল করে। কখনও কখনও জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে হিংস্র জন্তু দিয়ে খাওয়ানো হত। কখনও হাতির পদদলিত করে হত্যা করে সাজা দেওয়া হত। সেসব নৃশংস এবং নিষ্ঠুর বর্ণনায় কাজ নেই।

সে যা হোক ইংরেজরা এসে ফাঁসির প্রচলন করল। ফাঁসির সেই প্রথম যুগের গল্প। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে বধ্যভূমিতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামিকে শান্ত্রীরা নিয়ে যাচ্ছে।

যাওয়ার পথে তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। আসামি তীব্র আপত্তি করতে লাগল। এইরকম ঘন দুর্যোগের মধ্যে, ঝড় জল মাথায় করে সে এতটা পথ হাঁটতে পারবে না। তা ছাড়া আজ কিনা তার ফাঁসি।

এই কথা শুনে শান্ত্রীপ্রধান যা বললেন সেটা স্মরণীয়। শান্ত্রীপ্রধান বললেন, 'ওহে শুধু শুধু চেঁচামেচি করছ। তুমি তো কাঠগড়া পর্যন্ত শুধু যাচ্ছ, সেখানেই তুমি শেষ। তোমাকে আর ফিরতে হচ্ছে না। আমাদের কথা ভেবে দেখো, তোমাকে ফাঁসিতে চড়িয়ে তারপরে এই দুর্যোগে এতটা পথ আবার হেঁটে ফিরতে হবে।'

ফাঁসির মতো নিষ্ঠুর বিয়োগান্ত বিষয়ে কিন্তু সরস কাহিনীর অভাব নেই। দু'-একটি আগে কোথাও কোথাও এদিক ওদিক বলেছি, এবার একত্রে দেখা যাক।

রামাবতার যাদব একজন কুখ্যাত কঞ্জুষ ব্যক্তি। সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু এবং ব্যবসার অংশীদারকে লস্যির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে খুন করেছিলেন।

কিন্তু রামাবতারবাবুর শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশ সন্দেহবশত তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান দেয় এবং যথাসময়ে দায়রা আদালতের বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। এরপরে ওপরের আদালতগুলিতেও সেই প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল থাকে।

রামাবতারবাবু পাটনা জেলে রয়েছেন। ফাঁসির দিন ঘনিয়ে এসেছে। জেলের ভিতর খুব তোড়জোড় চলছে।

দু'-চার বছরে একটি ফাঁসির কেস হয়। ফাঁসির মঞ্চ অব্যবহারে পড়ে থাকে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের আগে মঞ্চ সারাই হয়, নতুন দড়ি কেনা হয়, কপিকলে গ্রিজ দেওয়া হয়। ফাঁসির আসামির ওজনের দ্বিগুণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে টেস্ট করা হয়। ফাঁসির সময়ে একচুল এদিক ওদিক হলে সাংঘাতিক কথা।

ফাঁসির আসামিদের জেলার সাহেব বিধি মতো খোঁজখবর নেন। এইরকম একদিন রামাবতার জেলার সাহেবকে বললেন, 'স্যার, জেলের মধ্যে খুব ব্যস্ততা দেখছি আজ কয়দিন। এটা কি আমার ফাঁসির ব্যবস্থা করার জন্যে?'

কী আর করবেন জেলারসাহেব, মৌনভাবে ব্যাপারটা স্বীকার করলেন।

রামাবতার বললেন, 'খুব খরচ হচ্ছে স্যার?'

জেলারসাহেব চুপ করে থাকলেও, তাঁর পাশে ডেপুটি জেলার ছিলেন। তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে।' এই বলে তিনি খরচের একটা ফিরিস্তি দিলেন মুখে মুখে।

যথা, ফাঁসি কাঠ সারানো হাজার টাকা, তিন মণ বালির বস্তা পাঁচশো টাকা, মোম দিয়ে পাকানো দুই প্রস্থ দড়ি দেড়শো টাকা, কপিকলের গ্রিজ ইত্যাদি দুশো টাকা। এ ছাড়া ফাঁসুড়েকে দিতে হবে পাঁচশো টাকা আর তার দুই সহকারীকে দুশো-দুশো চারশো টাকা।

মুখে মুখে হিসেব করে ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, 'তা, তিন হাজার টাকার বেশি খরচা হয়ে যাবে।'

রামাবতার সেদিন এই খরচের বিষয়টা নিয়ে খুব ভাবাভাবি করলেন। পরদিন সকালে আবার যখন জেলার-ডেপুটি জেলার রোঁদে বেরিয়েছেন রামাবতার যাদব করজোড়ে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।'

কারা কর্তৃপক্ষ ফাঁসির আসামিকে স্বাভাবিকভাবেই একটু মায়ার চোখে দেখেন। জেলার সাহেব বললেন, 'বলুন, কী নিবেদন।'

রামাবতার বললেন, 'হুজুর, আমার ফাঁসির আয়োজনে সরকারের তিন হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে।'

জেলার সাহেব বললেন, 'এর চেয়ে বেশিও হতে পারে। শুনলাম, ফাঁসুড়েদের মজুরি বেড়ে যাচ্ছে।'

রামাবতার বললেন, 'আমার কথা শুনুন স্যার। আমাকে এক হাজার টাকা দিন আর দশ-পনেরো টাকা দিয়ে এক গাছা দড়ি কিনে দিন। উঠোনের ওই নিম গাছটার ডালে আমি নিজেই গলায় দড়ি দিচ্ছি। এতে সরকারেরও দু'-আড়াই হাজার টাকা সাশ্রয় হবে। আর আমারও হাজার টাকা থাকবে।'

সবাই অবশ্য রামাবতার যাদবের মতো বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন হয় না। বেশ কয়েক বছর আগে পুরনো ফাঁসুড়ে জগা পরিণত বয়েসে মারা যাওয়ার পর তার ছেলেকে ফাঁসুড়ে নিয়োগ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই ফাঁসুড়ের কাজটি পূর্ণ সময়ের নয়, দৈনিক তো আর ফাঁসি হয় না। এটা একটা সাময়িক কাজ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশগত।

কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলেটির ফাঁসুড়ে হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সে ছিল খুব নরম স্বভাবের লোক। কাউকে ফাঁসি দেওয়ার কথা সে ভাবতে পারে না।

কিন্তু পারিবারিক বৃত্তি মানুষ সহজে ছাড়তে প্যারে না। সুতরাং বাবার মৃত্যুর পর জগার ছেলে নগা সরকারি ফাঁসুড়ে নিযুক্ত হল এবং দুঃখের বিষয় নিযুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যে একটা ফাঁসির কেস এসে গেল। নগাকে জেল থেকে তলব করা হল ফাঁসুড়ের কর্তব্য পালনের জন্য।

কর্তব্যের দায়ে নগা নির্দিষ্ট দিনে জেলখানায় এসেছে। বারবার তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা কাঁপছে। নগার এই অবস্থা দেখে সে যাকে ফাঁসি দিতে এসেছে সেই কয়েদি বলল, 'আপনি এত ঘামছেন কেন? আপনাকে এত অস্থির দেখাচ্ছে কেন?'

নগা বলল, 'ভাই, ঘামছি কি সাধে? আমার বুক টিপ টিপ করছে। আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। জানো, এর আগে কোনওদিন আমি কাউকে ফাঁসি দিইনি। এই আমার প্রথম ফাঁসি।'

এই শুনে ফাঁসির আসামি বলল, 'তাতে কী হয়েছে? আমার তো কোনও ভয় করছে না। আমার তো এর আগে ফাঁসি হয়নি। এটা আমারও প্রথম ফাঁসি।'

লেপ

'একটা পুরানো লেপ ভেঙে ফেলে, আরেকটা নতুন বানাতে, সাড়ে সাতশো তুলো কম পড়ে যায়'...

এই পঙ্‌ক্তি দুটি, অনেকদিন, তা প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগে লেখা, আমারই একটি কবিতার প্রথমাংশ।

পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ করে থাকবেন যে চৌর্যবৃত্তির প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এদিক-ওদিকের নানা রচনার থেকে টুকে, এর-ওর গল্পগুজব, কথাবার্তা শুনে আমি লিখি, ওই যাকে 'টুকলিফাই' করা বলে তাই আর কী।

অভ্যাস এমন খারাপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে আজ কিছুদিন হল আমি নিজের লেখা থেকেও টোকা শুরু করেছি। সবচেয়ে খারাপ হল, এর মধ্যে নিজের আগেকার লেখা কবিতাও ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এ জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যাঁরা কবিতা ভালবাসেন না, যাঁদের কবিতা দেখলে বা শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায়—তাঁরাও দয়া করে মার্জনা করবেন। তবে একটা কথা, একটু খেয়াল করলে দেখবেন, এগুলি ঠিক কট্টর কবিতা নয়, কবিতার মতো, পড়লে হয়তো খুব খারাপ লাগবে না।

সে যা হোক, এবার লেপ প্রসঙ্গে আসি। আমার সেই লেপ কবিতায় দুটি প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্ন দুটি আজও আমার মনে আছে।

এই ভরা শীতকাল। ধনুকে টঙ্কার তুলে ধুনুরিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বাড়ির সামনে বসে, ওই বাড়ির বারান্দায় বসে তুলো ধুনছে, লাল শালু সেলাই করছে। যতই তুলো ধোনা, লেপ বানানো চোখে পড়ে আমার সেই পুরনো প্রশ্ন দুটি ফিরে আসে।

প্রথম প্রশ্নটি আগেই বলেছি। একটি পুরনো লেপ ভেঙে নতুন লেপ বানাতে আবার তুলো লাগবে কেন, সাড়ে সাতশো কিংবা এক কেজি তুলো কেন কম পড়বে?

কেমন করে কম পড়বে। অমন আঁটোসাঁটো শক্ত সেলাই করা লেপের মধ্যে থেকে সাড়ে সাতশো তুলো কোথা গেল, অতটা তুলো কোথায় উধাও হয়ে গেল?

অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন এটা, আজও এর উত্তর পাইনি। ওই কবিতায় যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল সেটা একটু অন্যরকম, ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত।

প্রশ্নটি সোজা করে এইভাবে উত্থাপন করা যায়, লেপ এমন নরম জিনিস, অমন কোমল, সেই লেপ কেন ভাঙতে হয়। পাথরের বাটি নয়, কাচের পেয়ালা নয়, পুরনো বাড়ি নয়, ফুটপাথে হকারের দোকান নয়, নরম কোমল লেপ সেটা কেন ভাঙতে হবে?

এসব প্রশ্ন উত্তরের আশা না রেখেই করা। বরং এবার লেপ বিষয়ে পুরনো প্রসঙ্গে যাই।

আমাদের ছোটবেলায় সংসারে সবকিছু নিয়েই বিধি নিষেধ ছিল, লেপ নিয়েও ছিল। কার্তিক মাসে লেপ বার করা চলবে না। অঘ্রানে নামাতে হবে। সম্ভবত লেপের অপব্যবহার ঠেকানোর জন্যেই এই বিধি।

কিন্তু এই বিধির মধ্যেও কিছু ফাঁক ছিল। কার্তিকে লেপ নামানো নিষেধ কিন্তু আশ্বিনে সে বাধা নেই। প্রত্যেকবার আশ্বিনের শেষে ঠাকুমা আমাকে বলতেন, 'ওরে, লেপটা নামিয়ে আমার শরীরে ছুঁইয়ে রাখ।' অর্থাৎ এর পরে কার্তিক মাসে যদি লেপ গায়ে দিতে ইচ্ছে হয়, বা দরকার পড়ে তাতে কোনও বিধিনিষেধ ভঙ্গ হবে না।

এই লেপ নামানোর কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ছে সেও এক বিরাট ব্যাপার। দালানের সব ঘরে ছাদের সঙ্গে বড় বড় হুক ছিল, যেমন পাখা লাগানোর জন্যে থাকে। তখন তো পাড়াগাঁয়ে বিদ্যুৎ ছিল না, কিন্তু ছাদের কড়িকাঠের সঙ্গে লোহার শিকলে হুক বা মোটা বঁড়শি ঝুলত। সেই হুকের সঙ্গে বড় বড় চটের বস্তায় ভরে লেপ ঝুলিয়ে রাখা হত।

পূর্ববঙ্গে প্রবাদ আছে যে হালের গোরু বেচে ব্রাহ্মণ চৈত্র মাসে লেপ বানিয়েছিল। এ কথার অর্থ এই যে, ওই প্রবাদ কাহিনীর ব্রাহ্মণ পুরো শীতকাল লেপ ছাড়া বহু কষ্টে কাটিয়েও আর শেষ রক্ষা করতে পারেনি। চৈত্র মাসে এমন ঠান্ডা পড়ল যে তাকে হালের গোরু বেচে লেপ বানাতে হল। নবীন শহুরে পাঠক, তুমি হালের গোরুর মানে বোঝো। সত্যিই এক-এক বছর চৈত্র মাসেও এমন হাড় কাঁপানো শীত পড়ত আমাদের সেই অনতি উত্তর মধ্যবঙ্গে, উত্তুরে বাতাস পাহাড়ে ফিরে যাওয়ার আগে শেষবার জানান দিয়ে যেত। সেই চৈত্র শীত, তার জন্যে হালের গোরুও বেচতে হত, এ যেন মেয়ের বিয়ের জন্যে ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙানো।

তাই সাধারণত লেপ তুলে ফেলা হত চৈত্রের শেষে। ছাদে তুলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে লেপকে শায়েস্তা করা হত, তারপর রোদে দেওয়া হত। গরম সোডার জলে লেপের ওয়াড় সেদ্ধ হত, তারপর কেচে তুলে ফেলা হত।

এরপর ওই সব ভরা হত চটের বস্তায়, সেই বস্তার মুখ বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত ছাদের হুকে। সেও এক কঠিন ব্যাপার। বাড়িতে মই ছিল না। টেবিলের ওপর চেয়ার, তার ওপরে টুল, তার ওপরে দোদুল্যমান দাঁড়িয়ে সার্কাসের কসরতের কায়দায় সেই সব লেপের বস্তা ঝোলানো সকলের কর্ম ছিল না।

এখন লেপ আর ছাদের সঙ্গে ঝোলানো হয় না। শীত চলে গেলে বিছানাতেই তোষকের নীচে রেখে দেওয়া হয়।

কলকাতার শীতে লেপ গায়ে দেবার খুব একটা দরকারও পড়ে না। তা ছাড়া লেপ গায়ে দেবার আমার একটা ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে। রাতের ঘুমের মধ্যে শরীরের ওপরে লেপ ঘুরে যায় লম্বার দিকটা পাশে চলে যায়, পাশের দিকটা লম্বায় চলে আসে। ফলে গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শীত নিবারণ হয়। তার চেয়ে আমার কাঁথাই ভাল। পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি নরম কাঁথা, তার মধ্যে গুটিসুটি দিয়ে কলকাতার শীতের রাত চমৎকার কেটে যায়।

ব্যাটবল

ক্রিকেট নিয়ে আমাকে লিখতে বলা কেন? খেলিনি। দূর, গরিব মফস্বলে আমরা ছোট বয়েসে যে খেলা খেলেছি সেটা অনেকটা ক্রিকেটের মতো, কিন্তু ক্রিকেট নয়, আমরা খেলেছি ব্যাটবল।

কিন্তু কলকাতা যখনই ক্রিকেট-জ্বরে আক্রান্ত হয়, ক্রীড়া উত্তাপের থার্মোমিটারে পারদের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে আমার মতো ক্রিকেট অর্বাচীনের ওপর চাপ আসে খেলা নিয়ে লেখার জন্যে। গত পনেরো বছর নিয়মিতভাবে এ ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে।

আমি ক্রিকেটের সূক্ষ্ম ব্যাপারটা কিছুই বুঝি না। ক্রিকেট সংক্রান্ত গল্পগুজবেও খুব রুচি নেই। এ বিষয়ে বইও পড়িনি।

একথা ঠিক ক্রিকেটের মোটা দাগের ব্যাপারগুলো যেমন রান করা, আউট হওয়া, বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি, ক্যাচ ফসকানো, হিট-উইকেট—এগুলো আমি ভালই বুঝতে পারি। তবে এল বি ডব্লু আর রান আউট নিয়ে অনেক সময়েই খটকায় ভুগি।

ক্রিকেট নিয়ে লেখার অধিকার আছে সুনীল গাভাসকার কিংবা পঙ্কজ রায়ের, স্বমহিমাতেই তাঁরা ক্রিকেটের জটিলতম সমস্যায় আলোকপাত করতে পারেন, উপদেশ দিতে পারেন, ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জোরে লিখতে পারেন শ্যামসুন্দর ঘোষ কিংবা জয়ন্ত চক্রবর্তী।

এ কথা অবশ্য সত্যি যে সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বন্ধু-ভ্রাতা, চুনী গোস্বামী আমার সুহৃদ, একদা অরুণলালের পাড়ায় বাস করতাম, এখনও সান্ধ্যপানীয় প্রয়োজন হলে সেটা সংগ্রহ করি প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটারের সুরাবিপণি থেকে। কিন্তু তাই বলে এসবের কোনও একটি বা একাধিক কারণে আমি ক্রিকেট সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা অর্জন করেছি তা তো নয়।

আসলে সমস্যাটার শুরু হয়েছিল প্রায় চার দশক আগে। বোধহয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সন্তোষকুমার ঘোষ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে রাজি করিয়ে ছিলেন তখনকার ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচের প্রাত্যহিক ক্রীড়াবিবরণী লিখতে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিক, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্ত্যকুমার ছিলেন ভাষার জাদুকর এবং প্রকৃত ক্রিকেট বোদ্ধা। তাঁর সেই ক্রীড়াভাষ্য সে সময়ে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

তারপর ক্রিকেট-রসিক এবং সুরসিক শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ক্রীড়া কৌতুকময় প্রতিবেদন ও আলোচনাগুলি পাঠকদের মুগ্ধ করে। সেই সময়ে আমার প্রাণের বন্ধু মতি নন্দী খেলা ও সাহিত্যকে এক সঙ্গে মিলিয়ে ছিলেন। গল্পে-উপন্যাসে খেলা ঢুকে গেল, ক্রীড়াসংবাদ সাহিত্য হয়ে উঠল।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বাংলা ভাষার ক্রীড়া সাংবাদিকেরা অনেকেই এখন কবিতার ভাষায় প্রতিবেদন রচনা করেন। যুক্তি, তথ্য সেখানে থাকে কিন্তু তার পরিবেশন খুবই চিত্তগ্রাহী।

ঠিক এর মধ্যে আমি কোথা থেকে এলাম, তা নিয়ে আমি কিছুটা ভেবেছি। ক্রিকেট পুজোর বোধনের ঢাকে কাঠি পড়লেই কেন আমার খোঁজ পড়ে। এ যাবৎ কত যে উলটো-পালটা, ভুল-শুদ্ধ লিখেছি পাঠক-পাঠিকারা হাসতে হাসতে মার্জনা করে দিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় একটি চমৎকার যুগ্ম শব্দ আছে ক্রীড়া-কৌতুক। ক্রীড়া ও কৌতুক, ক্রীড়া-কৌতুক পরিষ্কার দ্বন্দ্ব সমাস।

এই ক্রীড়া-কৌতুকই আমার কাল হয়েছে। ক্রীড়া যখন শুরু হয়েছে, সঙ্গে কৌতুকও চাই। সেই কৌতুকে ক্রীড়া ব্যাপারটা রীতিমতো বেসামাল হয়ে যায়। তা হোক। বৈচিত্র্যের জন্যে একটু কৌতুক চাই।

কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে কৌতুককাহিনী তো তেমন জানি না। রচনার প্রসঙ্গেই বলেছি যে আমাদের ছেলেবয়সে আমরা ক্রিকেট খেলিনি। খেলেছি ব্যাটবল।

ব্যাটবলের প্রসঙ্গে আসছি। তার আগে একটি অল্প দিন আগের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

অলস, কর্মহীন দুপুরবেলায় ঘুমোব না প্রতিজ্ঞা করে বিছানায় বসে অন্যমনস্কভাবে রেডিয়োর নব ঘোরাচ্ছিলাম। এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। বাংলাদেশের কোনও কেন্দ্র থেকে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী প্রচার হচ্ছে, শুনতে পেলাম 'বেটে বলে হুলো না।' যিনি বাঙাল ভাষার ব্যাপারটায় সড়গড় নন তাঁর পক্ষে কথাটা বোঝা কঠিন। তিনি ভাবতে পারেন কোনও এক ব্যক্তির কথা হচ্ছে, সেই ব্যক্তি বেঁটে কিন্তু তাই বলে হুলো বা পাজি বেড়ালের মতো নয়।

আসলে কথাটা হল, 'ব্যাট-বলে হল না।' বোলার বল করেছেন। ব্যাটসম্যান ব্যাট হাঁকিয়েছেন, কিন্তু ব্যাটে বল লাগেনি।

এই ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে আমি ফিরে গেলাম। ব্যাটবলের পৃথিবীতে। যেখানে আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়েছিলাম।

স্কুল-কলেজে এবং অফিসার্স ক্লাবে দেখেছি বটে কিন্তু ক্রিকেটের ব্যাট আমাদের হাত দিয়ে ছোঁয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তক্তা কেটে ব্যাটের আকার করে ছুতোর মিস্ত্রি দিয়ে বানানো হত আমাদের ব্যাট। তার সাইজের হেরফের হত, লম্বায়-পাশে কম বেশি। তবে খুব বেঢপ হত না।

অফিসার্স ক্লাবের মালিদের কাছ থেকে ব্যবহৃত টেনিসবল কিনে আনতাম, তিন আনা চার আনা দাম। ছয় আনা খরচ করলে পাড়ার মুচি চামড়ার বল সেলাই করে বানিয়ে দিত। রবারের টুকরো, চামড়ার কুচি, ছোট ছোট পাথরকুচি, এই সব পোরা থাকত সেই বলের পেটে। ব্যাট দিয়ে মারলে ক্রিকেট বলের মতোই শব্দ হত, যেটা টেনিস বলে হত না।

উইকেট তৈরি হত বাঁশের লগা বা কঞ্চি দিয়ে। একদিকে তিনটে, সেদিকে ব্যাটসম্যান আর অন্যদিকে একটা, সেদিকে বোলার। বল সর্বদাই একদিক থেকে হত, দিক বদল হত না। ওভারের শেষে ব্যাটসম্যানদের স্থান বদল হত।

উঁচুনিচু জমির মতো একটু সমতল জায়গায় খেলার মাঠ। চার পাশেই ঝোপজঙ্গল, খানা ডোবা। ছোট মাঠ। বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি অতি সহজেই হত তাই বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারিতে চার বা ছয় না হয়ে যথাক্রমে দুই এবং তিন হত। চারদিকে ডোবা জঙ্গল এইসব থাকায় মাঝে মাঝে বল হারিয়ে যেত। অনেক আলোচনা করে, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বল হারিয়ে গেলে হবে সেঞ্চুরি। কিন্তু যে সেঞ্চুরি করবে, তাকে বলের দামটা দিতে হবে। এই নিয়মের ফলে আমাদের খেলায় সেঞ্চুরি করা একদম কমে গিয়েছিল।

কয়েক বছর আগেও দেশে গিয়ে দেখেছি আমাদের সেই ব্যাটবল খেলা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। ছেলেরা দল বেঁধে মনের আনন্দে তক্তাকাটা ব্যাট দিয়ে রবারের বল হইচই করে পেটাচ্ছে।

পুনশ্চঃ

অবশেষে ক্রিকেটের একটা নতুন গল্প বলি।

খেলার মাঠ থেকে দিনের শেষে বেরচ্ছি। এমন সময় পাশ থেকে দেখি চার-পাঁচজন যুবক গরদের পাঞ্জাবি, তাঁতের ধুতি পরিহিত অন্য একটি যুবককে এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, মুখে বলছে, 'দাদা, তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিন বর যাচ্ছে।'

'খেলার মাঠে বর?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্নটা করতেই গরদের পাঞ্জাবি বলল, 'গোধূলি লগ্নে বিয়ে হলে আজ আমার এমন রোমাঞ্চকর খেলাটা দেখা হত না। ভাগ্যিস লগ্ন পড়েছে রাত দশটায়।' এই বলে সে একটু সলজ্জ চেয়ে দ্রুত পা চালাল।

স্বপ্ন

'স্বপ্নেও দিয়েছো ফাঁকি,
'আসছি' বলে যেইমাত্র এলে,
ঘুম ভাঙলো।'

সারা জীবন এক রহস্যময়ী রমণী স্বপ্নের মধ্যে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চলেছে। আমার বয়স বেড়ে বেড়ে তিনকাল গিয়ে এখন এককাল ঠেকেছে, তার কিন্তু বয়েসের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও সে কিশোরী, কখনও পূর্ণ যুবতী, কখনও বা প্রায় প্রবীণা। কখনও তার মুখের আদল আভাসে পাওয়া যায়, কখনও তাকে চিনে ফেলি চকিতে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সে অধরা, অপরিচিতা। চিনেও চিনতে পারি না তাকে। আ-কৈশোর আমি ভুগে আসছি স্বপ্নদোষে। এই অসুখের কোনও চিকিৎসা নেই। যদিও রাস্তাঘাটে নিউজ প্রিন্টে ছাপা শস্তা লিফলেট, পাবলিক ইউরিনালের দেয়ালে সাঁটা বিজ্ঞাপনে হাতুড়ে ডাক্তার এবং হেকিমেরা এই রোগের ওষুধ বাতলিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ এক দুর্জয় ব্যাধি। কখনওই সারবার নয়। স্বপ্নের সেই অমোঘ ছায়াময়ী সারাজীবন আমার সঙ্গে সহবাস করে আসছে।

একবার, অনেক দিন, তা প্রায় বছর তিন আগে 'রঙিন ছাতা' নামে একটি কবিতায় আমি লিখেছিলাম, 'স্বপ্নের কোনো রঙ নেই, শস্তার সিনেমার মতো স্বপ্ন শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হতে পারে।'

একথাটা সম্ভবত আমি লিখেছিলাম কোনও বিলিতি নিবন্ধের সূত্র ধরে। কিন্তু এতকাল স্বপ্ন দেখার পরে এখন মনে হচ্ছে সবই সাদা-কালো নয়, দু'-একটা রঙিন স্বপ্নও তো কখনও কখনও দেখেছি। হয়তো দেখেছি। তবে সে সমস্তই দিবা স্বপ্ন। চাটাইয়ে শুয়ে লাখ টাকার খোয়াব দেখা। দিবা স্বপ্নের ফিরিস্তি দিতে গেলে কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে। বরং নিশি স্বপ্নেই থাকি।

'একদা স্বপ্নের সঙ্গে ছিল লুকোচুরি
অহরহ কবিতার
চোর চোর বুড়ি বুড়ি খেলা'...

স্বপ্নের সেই রহস্যময়ীকে ধরতে না পারার আক্ষেপে তখন লিখেছিলাম স্বপ্ন বদলের কথা—

আশেপাশে জ্ঞাতি পড়শি ঘুমানোর পরে
স্বপ্ন বদলের হাওয়া এসে ক্ষণতরে
দুপুর রাতের ঘরে
ঢুকে যায় পরীর মতন।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর স্বপ্ন বদল হয়নি।

স্বপ্নে সেই একই রহস্যময়ী চিরদিন ঘুরে ফিরে এসেছে, আজও আসে। বর্ষার রাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দে পা মিলিয়ে এখনও সে আসে। সে

আসে গ্রীষ্মের শেষ রাতে প্রদীপ নিভায়ে। অন্ধকার ঘরে গাঢ় ঘুমের ফাঁক ফোকর দিয়ে সে আসে। দুটি বাহুলতা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এই স্বপ্ন জাতিস্মর। শুধু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নয় মনে হয় জন্মের পর জন্ম, স্বপ্নের ভিতরে সে এসেছে। স্বপ্নসুন্দরীর কথায় আবার এখনই ফিরে আসব। তার আগে স্বপ্নের সওদাগর, ইংরেজিতে যাকে বলে Dream Merchant সেই জীবনানন্দ দাশের কথা একটু বলি। ব্যাপারটা প্রাসঙ্গিক। উনিশশো বাষট্টি সালে, মানে জীবনানন্দের অভাবিত মৃত্যুর আট বছর পর যখন আমার নিজের বয়েস সদ্য পঁচিশ পেরিয়েছে সেই সময়ে জীবনানন্দের উদ্দেশে একটি কবিতায় আমি যা লিখেছিলাম তা এখনও সত্যি। জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে এখনও স্বপ্নের মধ্যে আমার দেখা হয়। আমার সেই কবিতাটির শেষাংশ ছিল এই রকম:

আট বছর আগেকার
লাশকাটা ঘর থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে—
প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
কোনও পরিচয় নেই,
কোনও আত্মীয়তা নেই, কেন,
আমার স্বপ্নের মধ্যে কেন?

সম্পাদক মশায়, বিশ্বাস করুন, খোয়াবনামা তত নিষ্ঠুর আমি করতে চাইনি। কিন্তু জীবনানন্দের ভূত ঘাড় থেকেও নামেনি, স্বপ্ন ছেড়েও চলে যায়নি। তাই, যতই লিখি,

'এসো স্বপ্ন, রাজহাঁস, বকুলের মালা
এতদিন পরে
একবার শেষবার এসো।'—

স্বপ্নের মধ্যে সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। লাশকাটা ঘরের রক্তমাখা ঠোঁট আর পাখির নীড়ের মতো চোখ—স্বপ্নে কোনও ব্যবধান থাকে না। ঘুমের মধ্যে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে বীভৎস ও সুন্দর, প্রেম ও নিষ্ঠুরতা।

বড়দিন

হই হই করে বড়দিন চলে গেল।

চিনে লণ্ঠন, রঙিন কাগজের শিকল, গোলাপ ফুলের তোড়া, হই হুল্লোড়, রাতজাগা পার্টি। তারই সঙ্গে ফরাসি সুরভির রমণীয় মৌতাত, বিদেশি মদিরার বিহ্বলতা। শেষ রাতে স্খলিত চরণে ফেরা।

নতুন বউ, এই অঘ্রানের শেষে বিয়ে হয়েছে। তাকে নিয়ে খোকা বড়দিনের বাসরে গিয়েছিল। খোকার চোখে মোটা কাচের চশমা, বাঁয়ে প্লাস সাত, ডাইনে প্লাস আট। বড়দিনের রাতের হুল্লোড়ে খোকাবাবু চশমাটি হারিয়ে ফেলেছে। শেষ রাতে টলতে টলতে বউয়ের হাত ধরে খোকাবাবু এসে ফ্ল্যাটের বেল বাজাতে খোকাবাবুর বুড়ো বাপ এসে দরজা খুলে দিলেন। তিনি বউমাকে দেখে

দু'বার চোখ কচলালেন, তারপর বললেন, 'খোকা, এ কী করেছিস তুই। এ তো তোর বউ নয়। তোর বউ কোথায়? এ কার বউ নিয়ে এলি বড়দিনের পার্টি থেকে?'

পাঠিকা ঠাকুরানি রাগ করবেন না। এ গল্প আমার কাছেই আগে শুনেছেন। কিন্তু বড়দিনের গল্প তো এই রকমই হবে। সান্তাক্লস তাঁর ঝোলায় ভরে বড়দিনের আগের রাতে সকলের জন্যে কত কী নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি কোনওদিন আমার জন্যে কিছু আনেননি, একটা গল্পও নয়। আমার তো ক্ষমতার সীমা আছে, আমি আর কত বানাব?

বড়দিনের সাহেবি উৎসবে সাহেবপাড়ায় যাই। উদ্ভিন্ন যৌবনে আমার কলকাতাবাসের প্রথম ছয় বছর এই এলাকায় কাটিয়েছিলাম।

এখন যে লোকেরা সাহেবপাড়ার সেকালের বড়দিন নিয়ে, এই যে এত আহা-উহু করে সেটা নিতান্ত আদিখ্যেতা। বড়দিন খ্রিস্টানদের উৎসব, সাধারণ হিন্দু বাঙালির এতে কোনও অংশ ছিল না। পার্ক স্ট্রিটে, চৌরঙ্গিতে এই যে এত মাতামাতি এটাও শুরু হয়েছে যাটের দশকের গোড়ায়।

দু'-চারজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বাড়িতে ভেট আসত। কোনও কোনও হোটেলে বল নাচ হত। দামি রেস্তোরাঁয় চিনে লণ্ঠন জ্বলত। দু'-চারটে বড় দোকানের শো-কেসে ক্রিস্টমাস ট্রি। মেট্রো-লাইট হাউসে হলিউডের নতুন ছবি। হাওড়া ময়দানে জেমিনি সার্কাস।

এসব সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকেও দেখেছি খ্রিস্টমাস-খ্রিস্টমাস ইভের মধ্যরাতে গির্জার হলগুলি অধিকাংশ ফাঁকা। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে পাকিস্তান, সিংহল, বার্মা, নেপাল থেকে খ্রিস্টান প্রতিনিধি আসতেন তবুও হল ভরত না। এখন তো বড়দিনের মধ্যরাতে সেখানে গিজ গিজ করছে ভিড়। পার্টি, পার্ক স্ট্রিটের পানশালা হয়ে লোকেরা ভিড় জমাচ্ছে চার্চে, নেহাতই হুজুকবশত। এর মধ্যে ধর্মকর্মের কোনও ব্যাপার নেই।

বড়দিন কথাটা কী করে এল, এ নিয়ে আমি খুব হদিশ করেছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য পাইনি। বাংলা অভিধানগুলিও এ বিষয়ে নীরব, বড়দিন মানে খ্রিস্টমাস বলে ছেড়ে দিয়েছে।

আসলে বড়দিন মোটেই বড় নয়, বছরের সবচেয়ে ছোট দিনগুলির একটা। এ বছর ২৩-২৪ ডিসেম্বর সূর্যোদয় হয়েছে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে আর সূর্যাস্ত হয়েছে ৪টা ৫২ মিনিটে, এই দুটি দিনই উৎসবের মধ্যে হ্রস্বতম। এর চেয়ে বড়দিন মাত্র এক মিনিটের বড়, সূর্যোদয় হয় একই সময়ে, অস্ত যায় এক মিনিট দেরিতে।

এক মিনিট কোনও ব্যাপার নয়। সোজা কথা হল বড়দিন খুবই ছোট দিন। সাহেবদের খ্রিস্টমাস কী করে ভারতবর্ষে বড়দিন হয়ে গেল সে রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

গবেষণা আমার দ্বারা হবে না। বরং একটা গল্প বলি। গল্পটা শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী আমাকে বলেছিলেন, পরে এটা আমি বোধহয় আনন্দবাজারে জ্ঞানগম্যিতে লিখেছিলাম।

আমি যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। যদিও গল্পের বিষয়টি একটু ক্যাঁচালো।

এক বাড়িতে দুটো কুকুর। একটা অ্যালসেশিয়ান বিশাল বড় সাইজের। দেখলে বুক কাঁপে। অন্যটা ছোটখাটো, সাদা পমেরিয়ান। কেমন যেন লাজুক লাজুক স্বভাব।

আমি আর হিমানীশ দু'জনে কী যেন কাজে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম। কুকুর দুটোকে দেখিয়ে হিমানীশ আমাকে বললেন, 'জানেন ওই যে বড় কুকুরটা দেখছেন ওটাই ছোট কুকুর, আর এই সাদা ছোট কুকুরটাই আসলে বড় কুকুর।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মানে?'

হিমানীশ বুঝিয়ে বললেন, 'বড় কুকুরটার মাত্র দেড় বছর বয়েস, ওটাই ছোট কুকুর। আর ওই ছোট কুকুরটার বয়েস দশ বছর, ওটাই বড় কুকুর।'

বড়দিনের প্রসঙ্গ এলেই আমার কেমন যেন হিমানীশের ওই বড় কুকুর, ছোট কুকুরের কথাটা মনে পড়ে।

ধনীরাম

ধনীরামের কাহিনী প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইংরেজি দৈনিক, ধনীরামকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে, তাঁর ওপরে সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছেন।

এখন যখন রাজাগজারা কাঠগড়ায়; জোচ্চুরি, প্রবঞ্চনার মামলায় রথী মহারথীদের মধ্যে কে যে অভিযুক্ত, কে যে অভিযুক্ত নয় তাই মনে রাখা কঠিন, তখন শ্রীযুক্ত ধনীরামকে এত গুরুত্ব দেওয়া কেন, ধনীরামও তো ফেঁসে গেছেন ওই জোচ্চুরিরই মামলায়।

ধনীরামের জীবনকাহিনী একটু সংক্ষিপ্ত করে বলি, তাতে তাঁর কৃতিত্বের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

অন্য আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো যৌবন বয়েসে শ্রীযুক্ত ধনীরাম চাকরিতে ঢুকেছিলেন। রেলের হেড অফিসের চাকরি, এসটাব্লিশমেন্ট দপ্তরে। বদলি, প্রমোশন, অবসরগ্রহণ সবই এই দপ্তরের মাধ্যমে হয়।

দুঃখের বিষয়, দু'-তিন বছরের মধ্যে ধনীরামের চাকরিটি গেল দুর্নীতির দায়ে পড়ে।

ধনীরাম অফিস ছাড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু এতে তাঁর বিশেষ কোনও ক্ষতি হল না। বরং লাভই হল। চাকরি ছেড়ে চলে আসার সময় তিনি গোপনে অফিসের একটি রাবার স্ট্যাম্প, কয়েক রকম ছাপানো ফর্ম ইত্যাদি নিজের ব্যাগে ভরে নিয়ে এলেন। এই সঙ্গে তিনি অফিসের ফাইল থেকে কোন কোন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছুটির দরখাস্ত করেছেন তার একটা তালিকা তৈরি করে সঙ্গে নিলেন।

এর পরের কাজ খুব সোজা। সব চেয়ে জরুরি, ছুটির দরখাস্ত যে স্টেশনমাস্টারমশায়ের, যাঁর বৃদ্ধ বাবা মৃত্যুশয্যায় কিংবা দেশের বাড়িতে যাঁর সন্তানসম্ভবা পূর্ণগর্ভা স্ত্রী একাকিনী রয়েছেন সেই স্টেশনমাস্টারের ওখানে গেলেন ধনীরাম।

অফিস থেকে চুরি করে নিয়ে আসা সরকারি ফর্মে শূন্যস্থান পূরণ করে ছুটি মঞ্জুর করে তার নীচে রবার স্ট্যাম্পের ছাপ লাগিয়ে সঙ্গে অস্পষ্ট সরকারি স্বাক্ষর, ধনীরাম কাগজটা স্টেশনমাস্টারের হাতে দিলেন। সেই সরকারি কাগজের নীচে একথাও মুদ্রিত রয়েছে যে প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে রেল কর্তৃপক্ষ ছুটির সময়ে বর্তমান স্টেশনমাস্টারের স্থলাভিষিক্ত যিনি হবেন তাঁর মারফতই এই বার্তা পাঠাচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত ধনীরাম তাঁর স্বল্প মেয়াদি চাকরি জীবনে হেড অফিসের টেবিলে বসে এ রকম দু'-চারটি অর্ডার দেখেছেন, এবার সেটাই ব্যবহার করলেন।

এই অর্ডার পেয়ে স্টেশনমাস্টারমশায় যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সরল মনে ধনীরামকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে স্বগৃহে যাত্রা করলেন।

ধনীরাম এখন এই স্টেশনের সর্বেসর্বা। আর কিছু নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই শুধু দৈনিকের টিকিট বিক্রির টাকা গুনে গুনে নিয়ে রসিদ দিয়ে দেন।

তিরিশ দিন পরে এক মাসের ছুটির শেষে, আগের স্টেশনমাস্টারমশায় ফিরবেন। শ্রীযুক্ত ধনীরাম তার কিছু আগেই কেটে পড়লেন ছাব্বিশ দিনের মাথায়, এই ছাব্বিশ দিনের টিকিট বিক্রির টাকা, জরিমানা, লাইসেন্স ফি যা কিছু রেল কোম্পানির আয় তার এক পয়সাও ধনীরাম কোম্পানির সদর অফিসে জমা দেননি।

ধনীরাম নিরুদ্দেশ হলেন। পুরনো স্টেশনমাস্টারমশায়ের ফিরে এসে ব্যাপারটা বুঝতে সপ্তাহখানেক লাগল। তার পরেও হেড অফিসের লাগল তিন মাস।

এরই মধ্যে আরও দুটো স্টেশনে ভারপ্রাপ্ত স্টেশনমাস্টারকে ছুটি দিয়ে, একজনকে বিয়ে করতে পাঠিয়ে এবং অন্যজনকে গয়াধামে মা-বাবার পিণ্ড দিতে অবকাশ দিয়ে, ধনীরাম উনিশ দিন এবং সতেরো দিন স্টেশনমাস্টারি করেছেন।

ধনীরাম অবশেষে ধরা পড়েছিলেন।

ক্রমশ ধনীরামের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় খুব বেড়ে গিয়েছিল। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তা ছাড়া স্টেশনে স্টেশনে উড়ো খবর রটে গিয়েছিল। ধনীরাম ধরা পড়লেন চতুর্থ স্টেশনে, তাঁর হাজতবাস শুরু হল।

পর পর কয়েকটা প্রতারণার মামলায় ধনীরামকে বহুবার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। ফৌজদারি আদালতের কর্মপদ্ধতি বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধে হল না। বছর কয়েক জেল খেটে তিনি যখন খালাস হয়ে বেরলেন তখন পরবর্তী কার্যকলাপ ঠিক করে ফেলেছেন।

এক ছুটি প্রার্থী ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে জাল ছুটির অর্ডার ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে বিদায় করে বিচারকের আসনে বসলেন ধনীরাম। এর পর টাকা নিয়ে খুন-ডাকাতি-রাহাজানির মামলার আসামিদের বেকসুর খালাস করে দিতে লাগলেন।

এবারও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। একের পর এক গোলমেলে রায় দেখে পুলিশের মনে কেমন খটকা লাগল। এক মাসের মধ্যেই ধনীরাম গ্রেপ্তার হলেন। তিনি এখন আবার হাজতে।

ধনীরামের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানবার জন্যে এবার আমাদের আবার কয়েকবছর অপেক্ষা করতে হবে।

হয়তো ধনীরাম তাঁর জেলের জেলার সাহেবকে ছুটি দিয়ে নিজেই জেলার সেজে বসবেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ফাঁসির আসামিদের জেল থেকে ছেড়ে দেবেন।

তার পূর্বেই অবশ্য ধনীরামের নাম গিনেস বুক অফ রেকর্ডে ওঠা উচিত।

ব্যাঙ্ক

এক সময়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমানো খুব মজা ছিল। টাকা ক্রমাগতই জমে যেত। যদিও সুদের হার বেশ কম ছিল, আসল টাকাটাই জমে জমে বেড়ে যেত। টাকা যত ইচ্ছে জমিয়ে যাও, কোনও অসুবিধে বা বাধা নেই। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে ফর্ম পূরণ করে টাকা জমা দিলেই হল।

কিন্তু টাকা তোলা যেত না। উইথড্রয়াল ফর্ম কিংবা চেকের সই কিছুতেই মিলত না। টাকা তোলার জন্যে ব্যাঙ্কে চেক জমা দেওয়া মাত্র ওপাশের কেরানিবাবু একবার চেকের সইয়ের দিকে তাকিয়ে তারপর চেকধারীর মুখের দিকে তাকাতেন। তারপর কিছুক্ষণ কী যেন খুব চিন্তা করতেন, বোধ হয় প্রাপকের মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করতেন, সইটা ঠিক কি না। এই ব্যক্তি এই টাকা পাওয়ার যোগ্য কি না।

এরপর তিনি চেকের ওপরে একটা নম্বর লিখে ঠিক সেই নম্বরের একটা পেতলের চাকতি চেকওলার হাতে তুলে দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা লাল খাতার মধ্যে চেকটিকে সেই কেরানিবাবু লুকিয়ে ফেলতেন।

ব্যাস, এর পর দু'ঘণ্টা বিরতি। তবে বুদ্ধিমান লোকেরা এই বিরতির সুযোগ খুব একটা গ্রহণ করতেন না। ব্যাঙ্কের মধ্যে অপেক্ষা করতেন। কারণ এক ঘণ্টার মাথায় একটা শোরগোল উঠবে। ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে তারস্বরে চিৎকার উঠবে, 'সতেরো নম্বর চেক, সতেরো নম্বর।'

টোকেন অর্থাৎ সেই পেতলের চাকতির ওপরে দৃষ্টিপাত করে অবধারিতভাবে দেখতে পেতাম আমারই সতেরো নম্বর। দুরুদুরু হৃদয়ে চুরির মামলার আসামির মতো ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করতাম। কোনও একটা টেবিলে পৌঁছে জানতে পারতাম, সই মেলেনি। বিজয়ীর উল্লসিত হাসি হাসতে হাসতে সেই টেবিলের ভদ্রলোক জানাতেন, সইয়ের টির মাথা ছোট এবং ওয়াইয়ের লেজ লম্বা হয়েছে। নিজের চেক হলে হয়তো বলতাম, 'দিন এখনই আর একটা সই করে দিচ্ছি।' কিন্তু তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'আজ আর হবে না। চেক নেওয়ার সময় শেষ। আর একদিন আসুন।'

শিবরাম চক্রবর্তী অবশ্য এর চেয়েও জটিল সমস্যার কথা লিখেছিলেন। তাঁর গল্পের এক চরিত্র পোস্টাফিসে টাকা রাখতেন। টাকা তোলার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের থেকে পোস্টাফিস ছিল দশ কাঠি ওপরে, কস্মিনকালেই সই মিলত না।

শিবরামের গল্পের সেই দেহাতি চরিত্র ছিলেন অতিশয় কৃপণ। তিনি তাঁর ভাষায় 'পুস্টাফিসে' টাকা জমাতেন, টাকা কখনওই তোলা যাবে না, ঘোরতর প্রয়োজনের মুহূর্তেও পোস্টাফিসে সই কিছুতেই মিলবে না । টাকা তোলা যাবে না। তদুপরি সেই ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিয়ে হিন্দিতে সই করতেন। বাংলা সই যদিও বা কালেভদ্রে মিলে যায়, 'হিন্দি সহি' কখনওই মেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।

আজকাল তো পোস্টাফিসেও চেকবই চালু হয়েছে। আর ব্যাঙ্কে সইয়ের ব্যাপার, সরাসরি নিজের টাকা তোলবার ব্যাপারে, অনেক জায়গাতেই উঠে যেতে বসেছে। কোনও সইসাবুদ নয়, দিনে রাতে যে কোনও সময় 'এনি টাইম মানি', একটা বাক্সে প্ল্যাস্টিকের কার্ড গলিয়ে দিলেই ঈপ্সিত অর্থ বেরিয়ে আসবে। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্র এখন টেলার সিস্টেম, কাউন্টারের এ পাশ থেকে চেক গলিয়ে দিলে দু'-এক মিনিটের মধ্যে ওপাশ থেকে টাকা উঠে আসে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি সদ্য উপার্জন করা আরম্ভ করে একটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। সেই সময়ে বাড়ি থেকেও অল্প কিছু টাকা আমি পেয়েছিলাম।

পুরো টাকাটা আমি ব্যাঙ্কে জমা দিই। কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে দেখি বিশাল ঝামেলা, আমার চেকে কোনও না কোনও খুঁত বেরতই। সেই সময়ে একদিন অফিস কামাই করে প্রচুর ধ্বস্তাধ্বস্তি করে সঞ্চিত অর্থের প্রায় নব্বই ভাগ তুলে ফেলি। এবং তারপরে দীর্ঘদিন আর ব্যাঙ্কমুখী হইনি।

তখন ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন আমি একদম জানতাম না। বছর দু'-এক পরে ব্যাঙ্ক থেকে পাঠানো একটা রেজেস্ট্রি চিঠি থেকে আমি জানতে পারি, আমার অ্যাকাউন্ট অবলুপ্ত হয়ে গেছে। একশো টাকার কম জমা থাকায় প্রতি মাসে দশ টাকা করে কাটতে কাটতে আমার জমা শূন্য হয়ে গেছে।

এর পরে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

প্রিয় ম্যানেজার সাহেব,

আপনাদের হিসেবমতো যে তারিখে আমার জমা শূন্য বলে জানিয়েছেন আমি অঙ্ক কষে দেখলাম সেই তারিখে শূন্য নয় আমার জমা মাইনাস তিরিশ। শূন্য হত আরও চার-পাঁচ মাস আগে।

সে যা হোক, এই হিসাব অনুযায়ী আমার কাছে আপনার ব্যাঙ্কের তিরিশ টাকা জমা আছে। যদিও আপনাদের চেক বই দেওয়া যায়নি আপনাদের জমা একশো টাকার কম, সুতরাং এখন

থেকে প্রতি মাসে আপনাদের পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। এইভাবে আগামী ছাব্বিশ মাস বাদে আপনাদের কাছে আমার একশো তিরিশ (৫ × ২৬) টাকা পাওনা হবে।

এর মধ্যে আপনাদের জমা তিরিশ টাকা বাদ দিয়ে বাকি একশো টাকা আপনারা আমাকে দেবেন।

শোধবোধ হয়ে যাবে। ইতি।

বলাবাহুল্য ব্যাঙ্ক এ পত্রের কোনও উত্তর দেয়নি, আমিও আর খোঁজ নিইনি।

এখন অবশ্য দিনকাল অনেক বদলেছে। ব্যাঙ্ক থেকে নিজের সঞ্চিত বা চেকবাবদ প্রাপ্য অর্থই শুধু তোলা যায়, তা নয়, ঋণও পাওয়া যায়।

কিছুকাল আগে আমি যখন বাড়ি তৈরি করার জন্যে ঋণ চাইতে ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলাম, পুরনো ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরে যাচ্ছিলাম। যাতে অধমর্ণের মতো চেহারা দেখায়। ব্যাঙ্কের লোকদের মায়া হয়।

আমার স্ত্রী কিন্তু বাধা দিলেন, বললেন, 'ভাল, দামি জামাকাপড় পরে যাও। যাতে ব্যাঙ্কের লোকেরা বুঝতে পারে তুমি সচ্ছল লোক, ঋণ শোধ দিতে পারবে।'

স্ত্রীর কথাই শুনেছিলাম।

জাহান্নাম

ইংরেজিতে কথাটা হল, 'Go to hell'। সাদা বাংলায় মেজাজি ব্যক্তিরা কোনও কিছু না-পসন্দ হলেই বলেন, 'জাহান্নামে যাও'। কেউ কেউ বেশি জোর দেওয়ার জন্যে সামনে একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ করে বলেন, জাঁহান্নামে। চন্দ্রবিন্দু যোগ করাটা অবশ্যই অহেতুক, আসল ফারসি শব্দটি হল জহান্নাম, সেখানে চন্দ্রবিন্দুর কোনও সুযোগ নেই।

সে যা হোক জাহান্নামে যাও মানে হল গোল্লায় যাও। নিপাত যাও। তফাত যাও।

শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ চক্রবর্তী জাঁদরেল সরকারি আমলা ছিলেন। কোনও উলটোপালটা কিছু বরদাস্ত করতে পারতেন না। কেউ কোনও কাজের জন্যে এসেছে, কেউ কোনও দরখাস্ত দিয়েছে— সরাসরি মুখের ওপর বলে দিয়েছেন, 'জাহান্নামে যাও।' শেষের দিকে এটা তাঁর মুখের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়, প্রায় তাই।

নরনারায়ণবাবুকে এর জন্যে দু'-একবার বেশ বিপদেও পড়তে হয়েছে। একদা এক ধর্মপ্রাণ, আধা মৌলবাদী পঞ্চায়েত প্রধানকে, 'জাহান্নামে যান', বলায় গুরুতর বিপদে পড়েছিলেন। পরের দিন উক্ত প্রধান তাঁর গ্রামের লোকদের সঙ্গে নিয়ে অফিস প্রাঙ্গণে এসে হল্লা বাধায়। স্থানীয় এক মন্ত্রীর সহায়তায় সেবার তিনি রক্ষা পান।

তাতেও অবশ্য নরনারায়ণবাবুর চরিত্র খুব একটা বদলায়নি। মুদ্রাদোষটি তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেননি। তবে পরবর্তীকালে সাবধান হয়েছিলেন।

আজ কয়েক বছর হল নরনারায়ণবাবু সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি পূর্ব

কলকাতার লবণহ্রদ এলাকায় একটি বাড়ি তৈরি করে সম্প্রতি মূল কলকাতা থেকে চলে এসেছেন।

লবণহ্রদ এমনিতে শান্তিপূর্ণ এলাকা। বারোয়ারির চাঁদার অত্যাচার নেই, মাস্তান নেই, বোমাবাজি নেই, শব্দদূষণ নেই। প্রতিবেশীরা সকলেই নরনারায়ণবাবুর মতোই অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক।

পানীয় জলের একটু কষ্ট আছে। মশার উৎপাত আছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কলকাতার থেকে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি।

নরনারায়ণবাবু এসব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু একটা জিনিস মেনে নিতে পারেননি সেটা হল লবণহ্রদের ক্যানভাসার।

লবণহ্রদের ক্যানভাসারের অত্যাচার নিয়ে আমি এর আগেও লিখেছি। এখন আর বিস্তারিত বলার কিছু নেই। সেই শেষ রাত থেকে শুরু হয়। পুরনো কাগজ, শিশিবোতলওয়ালা, ধূপওয়ালা, হরিনামওয়ালা, মাছওয়ালা, তরকারিওয়ালা, ফলওয়ালা, সে এক বিশাল ফিরিস্তি।

তবু এরা তো পুরনো যুগের চেনা ফেরিওয়ালা। এদের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হল নতুন যুগের কোট-প্যান্ট-টাই পরা, সুটেড-বুটেড ফেরিওয়ালা। এরা সব মালটিন্যাশনালের ক্যানভাসার। কেউ পেস্ট-কন্ট্রোল, ইঁদুর-আরশোলা নির্মূল করতে চায়। কেউ পানীয় জল বিশুদ্ধ করতে চায়। কেউ বা মাইক্রোওভেন বা সাবানকাচার মেশিন বেচতে চায়।

সময় নেই, অসময় নেই। কলিংবেল বাজছে। নরনারায়ণবাবু দরজা খুলে টাই-পরা মুখশ্রী দেখেই পুরনো অভ্যাসমতো খেঁকিয়ে উঠছেন, 'জাহান্নামে যাও।' নরনারায়ণবাবুর মুখ খেঁকানিতে অবশ্য একটু কাজ হয়েছে, যারা একবার এসেছে তারা আর দ্বিতীয়বার তাঁর বাড়িতে আসছে না। সেই একজন জল ফিলটার করার মেশিন বেচে, পাঁচ-সাত দিন পর পর আসে, এসে বেল দেয়, নরনারায়ণবাবু দরজা খুলে তাকে দেখেই সেই 'জাহান্নামে যাও' বলে ভাগিয়ে দেন।

অবশ্য আজ কয়েক সপ্তাহ হল সেই ক্যানভাসারটি আসছে না। বাইপাসে গাড়ি চাপা পড়ে সে মারা গেছে। এদিকে নরনারায়ণবাবুও এ ঘটনার কয়েকদিন আগে মারা গেছেন এবং প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী হেতু যথারীতি নরকে গেছেন। অর্থাৎ জাহান্নামবাসী হয়েছেন।

একদিন নরকের বাইরের ঘরে বসে আছেন, এমন সময় নরনারায়ণবাবুর সামনে সেই ক্যানভাসারটি উদয় হল। নরনারায়ণবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এখানেও এসেছ?' ক্যানভাসারটি হেসে বলল, 'আপনিই তো বলেছিলেন থাকতে। আপনি বলতেন না, জাহান্নামে যাও।'

ইতিহাস

আগে নাম ছিল লালদিঘি। এখনও নামটা আছে লোকমুখে, অনেকটা ডাকনামের মতো। কিন্তু ইতিমধ্যে দু' দফায় দুটো পোশাকি নাম জুটেছে এই দিঘির।

শতাধিক বৎসর আগে ইংরেজ বড়লাট ডালহৌসির নামে লালদিঘির নামকরণ হয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ার। ছাত্রজীবনে কলকাতায় এসে রিকুইজিশন করা সরকারি কোয়ার্টারে বছর ছয়েক ছিলাম ওই ডালহৌসি পাড়ায়।

নাম বদলাল অনেক পরে, তখন আমি অফিসে চাকরি করি, রাইটার্স বিল্ডিংসে। হঠাৎ একটা নামবদলের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে গেল বিবাদী বাগ। অমর শহিদ বিনয়-বাদল-দীনেশের নাম জড়িয়ে, অক্টারলোনি মনুমেন্ট হয়ে গেল শহিদ মিনার, তার মাথায় মুকুট পর্যন্ত হয়ে গেল লাল। সত্যজিৎ রায় এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

সে যা হোক। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম এসব নাম মোটেই টিকবে না, পাবলিক নেবে না, অতি অল্পদিনেই বরবাদ হয়ে যাবে।

এই সূত্রে ওই সময়ের অন্য একটা ঘটনার কথা বলি।

একদিন বাসায় ডাকবাক্সে একটা মুদ্রিত চিঠি পেলাম। পুনর্মিলন উৎসবের আমন্ত্রণপত্র। চিঠিটা এসেছে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের মৌলানা আজাদ কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের প্রস্তুতি কমিটির তরুণ সম্পাদকের কাছ থেকে।

আমি সেই সম্পাদককে চিঠি দিয়ে জানালাম, 'আমি লেখাপড়া করেছি ওয়েলেসলি স্ট্রিটের সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে। আমি রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড চিনি না, সে রাস্তায় কস্মিনকালে যাইনি। মৌলানা আজাদ কলেজেও কখনও পড়িনি। আমি এই পুনর্মিলন উৎসবে কী সুবাদে যোগদান করব?'

উৎসাহী সম্পাদক আমার চিঠি পাওয়ার পর সদলবলে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি সংশোধিত হতে রাজি হইনি।

তবে একটা কথা অনস্বীকার্য। বিবাদী বাগ, শহিদ মিনার ইত্যাদি সম্পর্কে আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা মোটেই মেলেনি। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শহিদ মিনার, বিবাদী বাগ চমৎকার চালু হয়ে যায়। দূর দূর থেকে মিছিল আসে। দূর পাড়াগাঁয়ের চাষি জানে মিছিলের সঙ্গে সে যাচ্ছে শহিদ মিনারে। গোবরডাঙায় এক ঠাকুমা আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর পৌত্র কাজ করে বিবাদী বাগের একটা অফিসে।

সেই বিবাদী বাগ এবং তার সঙ্গীরা এখন একটু বিপাকে পড়েছে। খবরের কাগজে দেখছি পুরনো সাহেবি নাম ফিরে আসছে। সাহেবি নাম মানে অবশ্য ইংরেজ আমলের নাম।

বিবাদী বাগ আবার হবে ডালহৌসি স্কোয়ার। জওহরলাল নেহরু রোড হবে চৌরঙ্গি রোড, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড আবার ক্লাইভ স্ট্রিট হবে।

কেউ কেউ বলছেন দিশি নামগুলো পুরোপুরি উঠে যাবে না। সাহেবি নামগুলোর পাশেই থাকবে। কেউ কেউ বলছেন, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুরনো ঔপনিবেশিক মূর্তিগুলির পুনর্বাসন হবে।

এই জানুয়ারিতে মুক্ত অর্থনীতির মহোৎসবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর আসছেন কলকাতায়, তার আগেই নাকি এই সব পরিবর্তন হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কলকাতায়! কম কথা নাকি, সেই ঔপনিবেশিক আমলেই মাননীয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরা এদিকে পা বাড়াতে চাননি। এ বিষয়ে আমি এক সামান্য কলমকার এবং কবিযশপ্রার্থী একটু ঘুরিয়ে একটা কবিতা লিখেছি। কবিতাটি পদ্যভাষায় নয়, আমি যেমন লিখি এই 'কি খবরে'র ভাষায় লেখা। আশা করি সকলেরই বোধগম্য হবে। কবিতাটির নাম

'কলকাতার স্ট্রিট ডিরেক্টরি'

পলাশীর শেষ যুদ্ধে
সিরাজদৌল্লার পথে সুভাষচন্দ্র
ক্লাইভের কাছে হেরে গেলেন নেতাজি।
বিনয়-বাদল-দীনেশ পরাস্ত হলেন
ডালহৌসির সঙ্গে লড়াইয়ে।
এমনকী মহাবীর হো চি মিন
পথ ছেড়ে দিলেন হ্যারিংটনকে।

ভিক্টোরিয়ার নির্বাসন থেকে
আউটরামের, টগবগে ঘোড়া
বিজয় গৌরবে ছুটে আসছে
পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের দিকে।
জওহরলালের লাল গোলাপ
তাকে ঠেকাতে পারবে না।
বুদ্ধিমান গান্ধী অবস্থা বুঝে
লাঠি হাতে আগেই পালিয়েছেন
ময়দানের পিছন দিকে।

চৌরঙ্গির শেষতম প্রান্তে
কমরেড লেনিনের ভ্রুকুঞ্চন তীক্ষ্ণ হচ্ছে
ঘোড়াটা এই দিকেই
আসছে নাকি?

লুঙ্গি

দশ দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে ছিলাম। প্রয়াগ-কাশীতে তীর্থ করলাম। সেই সঙ্গে এলাহাবাদে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। সেই যাকে রথ দেখা আর কলা বেচা বলে, এক সঙ্গে তাই আর কী।

এই দশ দিনের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে শহরে, তুচ্ছ লুঙ্গি নিয়ে।

একদা এক লুঙ্গির কথা আমি লিখেছিলাম 'কাণ্ডজ্ঞানে'। সে অবশ্য সত্যি ঘটনা অবলম্বনে, খবরের কাগজের প্রতিবেদন অনুসরণ করে রম্য রচনা।

বছর দশেক আগের কথা। পূর্ব কলকাতার এক সরকারি ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে ডাকাতি হয় প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ব্যাঙ্কের খদ্দের, কর্মচারী, সশস্ত্র প্রহরী সবাইকে আটকিয়ে রেখে ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা ডাকাতেরা লুঠ করে। কিন্তু ডাকাতেরা বোধহয় টাকার পরিমাণ অনুমান করতে পারেনি। তাদের থলে কম পড়ে যায়, তখন তারা ব্যাঙ্কে উপস্থিত লুঙ্গি পরা এক খদ্দেরের লুঙ্গি কেড়ে নেয়। এবং বাড়তি টাকা সেই লুঙ্গিতে বেঁধে নিয়ে যায়।

লুঙ্গিহীন বা উলুঙ্গি সেই খদ্দেরের হতচকিত মানসিক অবস্থা, পুলিশ ও এর পরবর্তী ঘটনাবলি ছিল আমার সেই রম্যরচনার বিষয়।

এবারের বিষয় কিন্তু আরও বেশি জটিল। কে বা কারা রটিয়ে দিয়েছিলেন, রাস্তায় লুঙ্গি পরা লোক দেখলেই পুলিশ ধরছে। ভয়ানক গুজব, এই গুজবের রেশ বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাহাবাদে ইংরেজি কাগজে পড়েছি, বেনারসে হিন্দি কাগজে।

অন্য আরও নানারকম গুজবের মতো এই গুজবের একটা ভুল ভিত্তি রয়েছে। মাননীয় বিদেশি অতিথিদের জন্যে শহর, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার পর ওই সব অঞ্চলের ভবঘুরেদের সরিয়ে দেওয়া হয়। গরিব ভবঘুরের পরনে আর কী থাকবে, বড়জোর লুঙ্গি। লোকে এটা দেখে ভাবে যে সব লুঙ্গি পরা লোককেই পুলিশ ধরছে।

গুজবের এই সরলীকৃত ব্যাখ্যাটা কতটা গ্রহণযোগ্য তা আমি জানি না। কিন্তু কলকাতায় এসে এই ব্যাখ্যাই শুনেছি।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে লুঙ্গি পরেন, খবরের কাগজের ছবিতে দেখেছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই লুঙ্গি পরেন, সাদা দক্ষিণী লুঙ্গি। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাড়িতে লুঙ্গিপরা দেখেছি, শম্ভু মিত্রকেও দেখেছি। শিবনারায়ণ রায় লুঙ্গি পরে যত্রতত্র, সভাসমিতিতে যান। মধ্যে মহিলারা লুঙ্গি পরা আরম্ভ করেছিলেন, ফ্যাশন হিসেবে। সে ফ্যাশন অবশ্য টেকেনি।

আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র লুঙ্গি পরি। আমার পূর্বপুরুষেরা কেউ লুঙ্গি পরেননি, বাসায়-বাইরে সব সময়েই ধুতি। আমার ছেলে বা ভাইয়েরা লুঙ্গি পরে না। আমার মেমসাহেব বউমা কী একটা পোশাক এনেছিলেন জাপান থেকে সেটা বরং অনেকটা লুঙ্গি জাতীয়।

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাসে লুঙ্গির উল্লেখ পেলাম না। সুকুমার সেনের বঙ্গভূমিকাতেও লুঙ্গি নেই।

লুন্‌গ্গী শব্দটি বর্মি। এ ছাড়াও আমার ছেলেবেলায় তফন শুনেছি, যার মানে লুঙ্গি।

যতদূর মনে হয় এই বর্মা মুলুক থেকেই লুঙ্গি বাঙালি সমাজে এসেছে। আজকাল বাঙালি পুরুষ

প্রায় সবাই লুঙ্গি পরে। পঞ্চাশ বছর আগে অভিজাত ব্যক্তিরা নৈশ বা ঘরোয়া পোশাক হিসেবে লুঙ্গি ব্যবহার করতেন আর খুব দরিদ্র ব্যক্তিরা পরতেন ধুতির বিলাসিতা করা সম্ভব ছিল না বলে।

এসব ঐতিহাসিক বিষয় থাক, এবার আমার নিজের সমস্যাটা বলি। তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরব। কিন্তু কোথাও লুঙ্গি নেই। আলনা, রেলিং, খাটের বাজু, চেয়ারের হাতল সব জায়গায় খুঁজলাম। আমার ছোটভাই বিজন বাসায় ছিল না। সে এসে বলল, 'লুঙ্গি? সে আমি সব সরিয়ে রেখেছি।' এই বলে বাড়ির পাশের বাগানে গিয়ে একটা জবাগাছতলা খুঁড়ে মাটির নীচ থেকে আমার পুরনো লুঙ্গি দুটো প্লাস্টিকের মোড়কে জড়ানো অবস্থায় বার করে বলল, 'পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পুলিশ যদি বাড়ি সার্চ করে লুঙ্গি পায়। যা ভয় পেয়েছিলাম।'

হায় গুজব! হায় পুলিশ! হায় কলকাতা!

সেই বই

বইমেলায় অগ্নিকাণ্ডের পরের দিন সকালে মেলার মাঠের পাশ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা আধপোড়া ইংরেজি বই থেকে কয়েকটি ছত্র পেশ করেছিলাম। কারও কারও হয়তো ভাল লেগেছিল উদ্ধৃতিগুলি।

সেই পোড়া বইটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দিলেন শ্রীমতী অরুণা চক্রবর্তী। শ্রীমতী চক্রবর্তী হাওড়ার বাসিন্দা, বর্ধমানের রেললাইনের আশেপাশে কোনও কলেজের ইংরেজির শিক্ষিকা। তিনি আমাকে সেই বইটির একটি অদগ্ধ কপি লোক মারফত পাঠিয়েছেন। বইটি তিনি এই বইমেলাতেই আগুন লাগার আগের দিন কিনেছিলেন। কিন্তু অক্ষত বইটি আমাকে পাঠিয়ে অরুণাদেবী আমাকে আদেশ করেছেন, 'এই সেই বই। পোড়া বই ফেলে দিন। তারপর এই বই থেকে যত ইচ্ছে টুকুন।...

...কিন্তু কাউকে বইয়ের নাম বা লেখকের নাম বলবেন না, আপনার লেখাতেও ছাপবেন না। এত ভাল লেখা যে কেউ চুরি করুক, তা আমি চাই না।'

অরুণাদেবীর এই চিঠি পড়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। টুকে লেখায় আমার ক্লান্তি নেই, গ্লানি নেই। কিন্তু এই বইয়ের ব্যাপারটা একটু আলাদা।

আপাতত এইটুকু ভণিতাই যথেষ্ট। এখনই দেখছি এই বইটা আমার কাজে লাগছে। বুঝতে পারছি, বইটা ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে।

কেন কাজে লাগবে তার দু'-একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

(এক) আদালতের বারান্দায় দুঁদে উকিলের সঙ্গে পুরনো মক্কেলের দেখা হয়েছে। উকিলবাবু বললেন, 'আরে কী আশ্চর্য? আমি শুনেছিলাম আপনি মরে গেছেন।'

মক্কেল বললেন, 'সে কী করে সম্ভব? আপনি তো দেখছেন আপনার সামনে আমি জলজ্যান্ত বেঁচে আছি।'

সন্দেহবোধক মুখে দুঁদে উকিল বললেন, 'সবই তো বুঝতে পারছি। কিন্তু যে বলেছিল আপনি মরে গেছেন, সে কিন্তু আপনার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।'

(দুই) এক পুরনো কয়েদি খুব আমুদে আর হাসিখুশি গোছের। জেলখানায় সে অনেকদিন রয়েছে। এখানকার সকলের সঙ্গেই তার চেনাজানা, গল্পগুজব।

কিন্তু জেলার সাহেব একটা জিনিস লক্ষ করেছেন, জেলখানার প্রায় প্রতিটি আসামির কাছেই লোকজন দেখা করতে আসে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কখনও বা পুরনো সাকরেদ কিংবা ফৌজদারি মামলার উকিলবাবু।

কিন্তু এই প্রৌঢ় কয়েদিটির কাছে কোনওদিন কেউ আসে না। একদিন কৌতূহলবশত জেলার সাহেব এই কয়েদিকে বললেন, 'তোমার কি নিজের জন কেউ নেই?'

কয়েদিটি বললেন, 'তা থাকবে না কেন?'

জেলার বললেন, 'কেউ তো কখনও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে না।'

প্রৌঢ় কয়েদিটি জেলার সাহেবের এই প্রশ্নে হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, 'কী করে আসবে? তারা তো বাইরে নেই, তারা সকলেই এই জেলের ভিতরে রয়েছে।'

ধ্বংসের মুখোমুখি

গোলদিঘি অর্থাৎ কলেজ স্কোয়ারের পিছনে দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের একেবারে শেষ প্রান্তে প্যারাডাইস এবং প্যারাগন নামে দুটি বিখ্যাত শরবতের দোকান ছিল। এখন একটি আছে।

তখনকার কলকাতায় শরবতের খুব চাহিদা ছিল। লোকে ঠান্ডা বিয়ার না খেয়ে গ্রীষ্মের দিনে শীতল শরবত খেত। সে শরবতে সিদ্ধি মেশানো থাকলে সেই পানীয়ের মাদকতা বিয়ারের চেয়ে কম নয়। তা ছাড়া তখন কফিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

হাজরার মোড়ে, রাসবিহারীর মোড়ে শরবতের দোকান ছিল। বিবেকানন্দ রোড দিয়ে বড়বাজার পর্যন্ত, এদিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট জুড়ে শরবত বিপণি।

এই শরবতের দোকানগুলির মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে সুপরিচিত ছিল ওই গোলদিঘির প্যারাডাইস এবং প্যারাগন।

এই দুটো দোকানের কোনও একটার সাইনবোর্ড, ঠিক কোনটার মনে পড়ছে না, ছিল খুব মজার। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের সেই সাইনবোর্ডের কথা এখনও অনেকের মনে আছে, আমার তো আছেই।

সেই সাইনবোর্ডে আঁকা ছিল একটা কার্টুন জাতীয় বড় আকারের মজার ছবি। রাস্তায় শরবতের গেলাস হাতে একজন লোক গাড়ি চাপা পড়েছে, কিংবা তাকে গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে। সে আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে গেছে। কিন্তু ওই অবস্থাতেও সে খুব কষ্ট করে শরবতটা রক্ষা করেছে, শরবতের গেলাস ওই ভীষণ বিপর্যস্ত অবস্থাতেও সে হাতে সোজা করে রেখেছে। এই ছবির সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে ক্যাপশন:

আসল জিনিসটা খুব বেঁচে গেছে বাবা।

এতকাল পরে এই সাইনবোর্ডটার কথা অবশ্য কোনও অবান্তর কারণে মনে পড়েনি।

দু' দিন আগেই অ্যাসোসিয়েটেড ফ্রি প্রেস প্রচারিত সংবাদে জানা গেছে যে গত তিরিশে নভেম্বর, শনিবার পৃথিবীটা খুব বাঁচা বেঁচে গেছে। এ বিষয়ে এই দৈনিকেও ইতিমধ্যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদের উৎপত্তিস্থল মস্কো। জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিয়ানদের বিপুল দখল রয়েছে। সেই কতকাল আগে তারা মহাকাশে স্পুটনিক পাঠিয়েছিল। রাশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রনমির জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন একটি গ্রহখণ্ড, যার নাম দেওয়া হয়েছে টটাটিস, অল্পের জন্যে পৃথিবীর ওপরে এসে পড়েনি। পড়লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। পৃথিবীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই দুর্বুদ্ধি টটাটিসের বছর চারেক আগেও একবার হয়েছিল।

টটাটিসের পথ অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের মতো সুনির্দিষ্ট নয়, কিংবা সেটা এতই জটিল যে গ্রহবিজ্ঞানীরা অনুধাবন করতে অক্ষম।

তবে সুখের কথা টটাটিসের এইরকম রহস্য-রোমাঞ্চময় নাম এবং সেই সঙ্গে তার পৃথিবীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোবৃত্তির কথা বিজ্ঞানীরা আগে প্রচার করেননি।

তা হলে তো হইচই পড়ে যেত। পরশুরাম গগন চটির গল্প লিখেছিলেন। আমরা অল্প বয়েসে চেতাবনীর কথা শুনেছি। মাঝে-মধ্যেই দু'-চার দশ বছর বাদে রব ওঠে অমুক দিন, অমুক সময়ে জগৎ-সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হইচই কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিনে বাজারহাট ফাঁকা, রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি জনশূন্য, শুনশান।

সুখের বিষয় খবরটা আগে জানা যায়নি। আতঙ্কিত হওয়ার রোমাঞ্চ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

তবে মারাত্মক খবর হল, টটাটিস আবার ফিরে আসবে। তার নাকি গোঁ চেপে গেছে। চার বছরের মাথায় দু' হাজার সনের নভেম্বর-ডিসেম্বরে দিগভ্রান্ত গ্রহখণ্ড টটাটিস আবার পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে পারে।

হিসেবি মানুষ এখন থেকেই দিন গুনতে থাকুন।

ফুরসতনামা

কত বললাম যে ফুরসত কোথায় যে ফুরসতনামা লিখব? বাক্স-বিছানা সব বাঁধা হয়ে গেছে, আজ বাদে কাল বাইরে যাচ্ছি—কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। ফুরসতনামা লিখতেই হবে যাওয়ার আগে লেখা দিয়ে যেতে হবে।

তখন বললাম যে লঘু ইয়ার্কির চুটিয়ে রসিকতা করার সময় নয় এটা। চারদিকে কেমন থমথম করছে। তা ছাড়া এই ঠান্ডায় বোতলের ঘিয়ের মতো মাথার ঘিলু কেমন জমে গেছে। আগে মাথায় জোরে ঝাঁকি দিলে ছলাত-ছলাত করে শব্দ বেরত, তারপর লিখতে বসলেই ফুরফুর করে ফুরসতনামার মতো তরল লেখা তরতরিয়ে বেরত। এখন তো ঘিলুই জমে গেছে।

এ ওজরও খাটল না। আপত্তি টিকল না। এবারের ফুরসতনামা আমাকে নাকি লিখতেই হবে।

ঠিক আছে তাই লিখছি। তবে অন্য একজনের কাঁধে বন্দুক রেখে।

হাতের কাছে একটি বিচিত্র পুরনো বই রয়েছে। বইটির নাম 'মহর্ষি বলেছেন' (দ্য মহর্ষি

সেইজ)। বইটির লেখকের নাম আল বলিসকা। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে একটি পুষি বেড়ালকে। বইটির প্রকাশক কিন্তু ভুবনবিখ্যাত। নিউইয়র্কের পকেট বুক কোম্পানি। যাদের প্রতীক চিহ্ন হল ক্যাঙারু।

মহর্ষি বলেছেন মানে মহর্ষি রজনীশ বা এখনকার চন্দ্রস্বামীর মতো কোনও ব্যক্তির বচনসুধা বলে মনে হতে পারে, যে কোনও ধরনের গোলমেলে কথাই এদের মুখে বসিয়ে চালানো সম্ভব।

আল বলিসকা সেই কাজটিই করেছেন। যতরকম উলটোপালটা চমকপ্রদ কথা এক প্রকল্পিত স্বামীজির নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

এবারের ফুরসতনামা ওই স্বামীজি তথা মহর্ষির বাছাই করা উক্তিসমূহের সংকলন। তবে এই সূত্রে একথা জানিয়ে রাখা ভাল যে এর মধ্যে অল্প কিছু বক্র উক্তি আমি আমার কোনও কোনও কবিতায় কখনও কখনও ব্যবহার করেছি। আমার কবিতার পাঠকদের তাই সেগুলো চেনা মনে হতে পারে।

যেমন ধরা যাক, আমার একটি কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি ছিল—

'যে লোকটা বলেছিলো
আমার কোনও সমস্যা নেই
সেই লোকটা নিজেই একটা সমস্যা।'

অথবা, কেউ কেউ হয়তো স্মরণ করতে পারেন যে একদা আমি একটা কবিতায় লিখেছিলাম, সেটাও ওই সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারই।

কোনও সমস্যাই এমন বড় হতে পারে না
কোনও সমস্যাই এমন জটিল হতে পারে
না
যে সমস্যার সামনে থেকে
পালিয়ে যাওয়া যাবে না।'

আর পদ্যচর্চা নয়। এই রচনার পাঠক-পাঠিকাদের সেটা সহ্য হবে না। সমস্যাও মাথায় থাক, এবার আমরা সরাসরি মহর্ষি প্রবচনে যাচ্ছি।

মহর্ষি বলেছেন, 'তুমি যখন লোকেদের তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা বলছ, জেনে রাখবে অর্ধেক লোক তোমার কথা শুনছে না, বাকি অর্ধেক তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে মনে আনন্দ পাচ্ছে।'

এ রকম, নির্মম সত্য কথা মহর্ষি আরও অনেক বলেছেন।

কিছু লোককে অনেক দিনের জন্যে এবং অনেক লোককে অল্পদিনের জন্যে বোকা বানানো যায় কিন্তু সব লোককে সব সময়ের জন্যে বোকা বানানো সম্ভব নয়। এ রকম একটা কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন বলে আমরা জানি।

মহর্ষি বলেছেন এর চেয়েও বাস্তব কথা। কথাটি হল, 'তুমি অবশ্যই সব লোককে সবসময় বোকা বানাতে পারবে না তার একটা কারণ হল এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তোমাকেই হয়তো বোকা বানাবে, বোকা বানানোর চেষ্টা করে যাবে।'

ধন্যবাদ মহর্ষি, আপনার এই মহামূল্যবান উপদেশটির জন্যে আপনাকে বহু ধন্যবাদ, সেই সঙ্গে আপনাকে আরও স্মরণ করছি এই দুটি আপ্তবাক্যের জন্যে।

এক, যদি একশো বছর বাঁচতে চাও তা হলে তোমাকে প্রথমে নিরানব্বুই বছর বাঁচতে আর তার পরে আর এক বছর খুব সাবধানে থাকতে হবে।

দুই, গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন তার রূপ ও গন্ধের কোনও তারতম্য হবে না। তবে যদি গোলাপের নাম ক্রিসেনথিমাম, বগেনভেলিয়া কিংবা রডোড্রেনডেন রাখা হয় তবে বানান করতে একটু অসুবিধা হবে বইকী।

মহর্ষি মহিলাদের বিষয়ে কিছু লাগসই উক্তি করেছেন। তার দু'-একটি যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

একজন সত্যবাদী মহিলা কখনওই মিথ্যা কথা বলেন না তিনটি বিষয় ছাড়া। এই তিনটি বিষয় হল তাঁর বয়েস, তাঁর ওজন এবং তাঁর স্বামীর মাইনে।

মহিলাদের বিষয়ে মহর্ষি একটি বিপজ্জনক পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঘণ্টার মতো মহিলাদেরও মাঝে মাঝে পেটাতে হয়।

রমণীরা বিভিন্ন বয়েসে বিভিন্ন মহাদেশের মতো। তেরো থেকে আঠারো, কুমারী পৃথিবী, রহস্যময়ী আফ্রিকা। আঠারো থেকে তিরিশ সে হল উষ্ণ, উত্তপ্ত এশিয়া। তিরিশের পরে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সে আমেরিকা, উচ্ছল, উজ্জ্বল বর্ণময়ী। পঁয়তাল্লিশের পরে পঞ্চান্ন-ষাট অবধি ফুরিয়ে যাওয়া ইউরোপ, তবে দু'-একটি আকর্ষণ তখনও আছে। আর তার পরে অবশেষে সে হল অস্ট্রেলিয়া—তার কারণ কোথায় সে আছে, সেটা সবাই জানে, কিন্তু তা নিয়ে কারও কোনও কৌতূহল নেই।

টেলিভিশন সম্পর্কে মহর্ষি দু' জায়গায় বলেছেন, দুটোই যথাযথ।

প্রথম বলেছেন যে দূরদর্শন হল পুরনো সিনেমার গোরস্থান। আর দ্বিতীয় কথা বলেছেন, মাথাধরা দেখতে কী রকম! টিভির বাক্স আবিষ্কার না হলে সেটা কোনওদিন জানাই যেত না।

তবে মহর্ষি একথা বলেছেন যে টিভি কখনওই খবরের কাগজের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না। সেটা সম্ভব হবে না।

টিভি দিয়ে কখনও ঠোঙা বানানো যাবে না। ঘুড়ি বানানো যাবে না। বই-খাতায় মলাট দেওয়া যাবে না।

তবে টিভি দিয়ে উনুন ধরানো যাবে। খবরের কাগজের চেয়ে অনেক বেশি ভাল জ্বলবে টিভি। কিন্তু গরমের সময় লোডশেডিং হলে খবরের কাগজের মতো টিভি দিয়ে কখনও হাওয়া খাওয়া যাবে না।

অবশেষে এটিকেট।

এটিকেট কাকে বলে? মহর্ষি বলেছেন, এটিকেট হল কঠিন ব্যাপার, এটিকেট বোধ সবার থাকে না। মুখ না খুলে হাই তোলাই হল আসল এটিকেটের উদাহরণ।

পুনশ্চঃ টাকমাথা লোকদের সম্পর্কে মহর্ষির পরামর্শ, নিজেকে টাকওলা না ভেবে অন্যদের চুলওলা ভাবতে শিখুন।

পোড়া বই

চিরকাল বিদগ্ধ পাঠকের কথা শুনেছি। এবারের বইমেলা নিজেই বিদগ্ধ হয়েছিল।

পুড়ে যাওয়ার পরের দিন খুব সকালে বইমেলায় গিয়েছিলাম। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছিল বইমেলায় আগুন লেগেছে শুনে। কিন্তু সেদিনের সন্ধ্যাবেলার মেঘ ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই শীতের রাত্রে সুদূর সল্টলেক থেকে ময়দানে যেতে ভরসা পাইনি।

ময়দানের যে জায়গাটায় বইমেলা, সেই জায়গাটা আমার খুব চেনা। এর বিপরীত দিকে চৌরঙ্গি রোডের ওপারে রাসেল স্ট্রিটের কাছে প্রায় দশ-বারো বছর ছিলাম। ময়দানের এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন ভোরে হেঁটেছি সে সময়।

মেলার কাছে পৌঁছে সবাই যা দেখেছে আমিও তাই দেখলাম। জলে-কাদায় মাখামাখি পোড়া কাগজ, বাঁশ-কাঠ, ইতস্তত জুতো ও চপ্পলের পাটি। ভিজে যাওয়া পোড়া কাগজের একটা গন্ধ আছে, সকালবেলার বাতাসে সেটা থমথম করছে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসছিলাম। গেটের এপাশটায় দেখি আধপোড়া বইয়ের গাদা। যেসব বই উদ্ধার করা হয়েছিল, তার মধ্যে বেশি পুড়ে যাওয়া বইগুলো বিক্রি হবে না বলে পুস্তক ব্যবসায়ীরা ফেলে দিয়েছেন।

কী বই, কীরকম বই কৌতূহলভরে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে সামনে থেকে একটা বই তুলে নিলাম। একটা ইংরেজি বই, বেশ ভাল প্রকাশকের ছাপা। আশেপাশে আরও দু'-চারখানা একইরকম বই। এরই মধ্যে একখানা বই পেয়ে গেলাম কৌতুককাহিনীর। দুই মলাটই পোড়া, সামনের দিকে প্রায় ফর্মা দুয়েক নেই, মধ্যের অংশও আধপোড়া, শেষটুকু ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

বইটির কী নাম, কার লেখা, কিছুই জানি না। কোনওদিন হয়তো জানাও যাবে না। তবে এসব বইয়ের মজা এই যে ইতস্তত দু'-চার পৃষ্ঠাও পড়া যায়।

বইটা হাতে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। অবশিষ্ট পাতাগুলি যেটুকু পড়া যাচ্ছে পড়ে মনে হচ্ছে কৌতূহল-উদ্দীপক এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুককাহিনীর সংকলন এবং সবই বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে।

একেবারে সামনের দিকে অর্ধদগ্ধ পৃষ্ঠাগুলি মহেঞ্জোদরোর শিলালিপির মতো বহু চেষ্টায় পাঠোদ্ধার করে প্রথমেই পেয়ে গেলাম ফ্রয়েডকে নিয়ে একটা কাহিনী।

আধুনিক মানুষের চিন্তাধারাকে যাঁরা গত শতকের শেষে এবং এই শতকের প্রথমে সবচেয়ে বেশি ঝাঁকি দিয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁদের অন্যতম শুধু নন, বিশিষ্টতমদের একজন।

ফ্রয়েড যদিও পরে নাজি অত্যাচারের ভয়ে লন্ডন চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবু তাঁর বসবাস, কাজকর্ম, প্রতিষ্ঠা সবই ভিয়েনায়।

তখন ফ্রয়েড খুবই বিখ্যাত। জগৎজোড়া নাম তাঁর। সারা পৃথিবী থেকে মনোরোগীরা তাঁর কাছে আসে, তাঁদের অধিকাংশই সচ্ছল এবং অভিজাত পরিবারের।

ধীরে ধীরে সরকারি আয়কর দপ্তরের নজরে এল ব্যাপারটা। আয়কর দপ্তর ফ্রয়েডকে নোটিশ পাঠালেন তাঁর বার্ষিক আয় জানানোর জন্যে। নোটিশটি পেয়ে ফ্রয়েড খুব হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'যাক, এতদিনে তা হলে আমার কাজের একটা সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া গেল।'

* * *

আততায়ীর গুলিতে নিহত দুই শতকের দুই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাদৃশ্যের একটা তালিকা এই বইতে পেলাম।

সাদৃশ্যগুলি প্রায় অবিশ্বাস্য। হাজার বছরেও দুটি হত্যাকাহিনী ও তার নায়ক এবং আততায়ীদের মধ্যে এতখানি মিল পাওয়া অসম্ভব।

মার্কিন রাষ্ট্রপতিদ্বয় হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন এবং জন এফ কেনেডি। লিঙ্কন জন্মেছিলেন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে আর কেনেডি জন্মেছিলেন ঠিক একশো বছর পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে।

আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে, কেনেডি ১৯৬০-এ।

দুই রাষ্ট্রপতিকেই মাথার পিছনে গুলি করে হত্যা করা হয়। দু'জনারই স্ত্রী সেই সময়ে সঙ্গে ছিলেন। লিঙ্কনের হত্যাকারী বুল জন্মেছিলেন ১৮৩৯ সালে, কেনেডির হত্যাকারী অসওয়াল্ড জন্মায় ১৯৩৯ সালে। দু'জনেই একশো বছর ব্যবধানে একই শহরের অধিবাসী ছিল। দু'জনারই মৃত্যু হয়েছিল গ্রেপ্তার হওয়ার পরে, আদালতে হাজির হওয়ার আগে।

খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে লিঙ্কনের হত্যাকারী বুল থিয়েটারের মধ্যে লিঙ্কনকে মেরে গাড়ি

করে পালিয়েছিল। আর কেনেডির হত্যাকারী অসওয়াল্ড কেনেডিকে গাড়ির মধ্যে মেরে থিয়েটারের মধ্যে পালিয়েছিল।

আর বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ মিল আছে এই দুই রাষ্ট্রপতির মধ্যে। লিঙ্কনের ব্যক্তিগত সচিবের নাম ছিল কেনেডি আর কেনেডির ব্যক্তিগত সচিবের নাম ছিল লিঙ্কন।

এবং এটাও উল্লেখযোগ্য যে লিঙ্কনের পর যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হন তাঁর নাম জনসন। কেনেডির পরের রাষ্ট্রপতির নামও জনসন।

এ রকম আরও বহু বৃত্তান্ত রয়েছে বইটিতে। সব পড়া যাচ্ছে না, যেটুকু পড়া যাচ্ছে সেটুকুও ভাল করে পড়া যাচ্ছে না। অনুমানে পড়তে হচ্ছে।

আজকালের মধ্যে আর একদিন বইমেলায় নাম-না-জানা, পুড়ে যাওয়া, পড়ে পাওয়া বইটির খোঁজ করব। আসল বইটিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। পেয়ে গেলে আরও দু'-চারটি অনুরূপ বৃত্তান্ত 'কী খবর' পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেব।

বার্তাকু ভক্ষণ বিল

সপ্তাহ কয়েক আগে কাশী থেকে ফিরে এই বিষয়টি নিয়ে লিখেছিলাম। লাউ সদৃশ, অতিকায় এবং অতিবিখ্যাত রামনগরের বেগুন, যার কয়েকটি আমি কলকাতায় এনে ভাগাভাগি করে আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যে বিলি করেছিলাম।

এসব কথা লেখার কোনও মানে হয় না। ভুল করে লিখে ফেলেছিলাম।

লেখা বেরনোর পর থেকে যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, 'অমন আশ্চর্য বেগুন, আমাদেরও একটু দিলে পারতেন।' শুধু এই নয়, টেলিফোনে এবং চিঠিতেও অনুযোগ-অভিযোগ পেলাম।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছি যাদের বেগুনের ভাগ দিয়েছি তাদেরই একজনের কাছ থেকে।

বেগুন বণ্টনের দিন কয়েক পরে আমার প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে একটা টেলিফোন পেলাম।

টেলিফোনটা খুবই রহস্যময়। কারণ যাঁর সঙ্গে দু'বেলা মুখোমুখি দেখা হচ্ছে তিনি হঠাৎ টেলিফোনে কথা বলছেন। আর যা বলছেন, সেটাও গোলমেলে, 'দাদা, একটা বিল পাঠিয়ে দিলাম। টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবেন।'

কীসের বিল, কেন বিল কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু পরে ওঁদের কাজের মেয়ে এসে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে গেল।

খাম খুলে দেখলাম, মুদি দোকানের ফর্দ যেমন হয়, তেমনই একটা লম্বা কাগজ। কাগজের মাথায় তারিখ দেওয়া, তার নীচে গোটা গোটা মেয়েলি হরফে লেখা,

বার্তাকু ভক্ষণ বিল

ছোট বয়সে ঠাকুমা, পিসিমার জন্যে পঞ্জিকা দেখা অভ্যেস হয়েছিল। সেখানে তিথি বিশেষে লেখা থাকত, 'বার্তাকু ভক্ষণ নিষেধ'। সেই তখন থেকেই জানি যে বার্তাকু মানে হল বেগুন।

সুতরাং মুদিখানার ফর্দ সদৃশ লম্বা কাগজখানা যে বেগুন খাওয়ার বিল সেটা অনুমান করতে অসুবিধে হল না।

দেখলাম লম্বা বিল। দিন তারিখ দিয়ে চারদিনের বিল করা হয়েছে।

প্রথম দিনের বিল মোটামুটি বোধগম্য হল।

সোমবার ১৩ জানুয়ারি

সরষের তেল	৫০০ গ্রাম	২০ টাকা
বেসন	২৫০ গ্রাম	১১ টাকা
চালের গুঁড়ো	১০০ গ্রাম	১.৫০ টাকা
নুন মশলা (আনুমানিক)		২.০০ টাকা
জ্বালানি (আনুমানিক)		৪.০০ টাকা
		মোট ৩৮.৫০ টাকা

প্রথম দিনের বিল দেখে যেটা বোঝা গেল তা হল যে-পরিমাণ বেগুন দিয়েছিলাম প্রতিবেশিনী সবটাই বেসন দিয়ে ভেজে খেয়েছেন। সংসারে তিনটি মাত্র প্রাণী, প্রতিবেশিনী এবং স্বামী ও পুত্র; তিনজনের পক্ষে এতখানি পরিমাণ বেসন-মণ্ডিত বেগুন ভাজা হজম করা কঠিন।

এবং সত্যিই তাই হয়েছে। পরের তিন দিনের বিলে তারই প্রতিফলন। প্রথম দিন রোগমুক্ত হওয়ার স্বচেষ্টা। সেদিনের হিসেবে রয়েছে এক বোতল জোয়ানের আরক। কুড়িটা অম্লবিনাশক ট্যাবলেটের দাম। মোট চুয়াল্লিশ টাকা।

কিন্তু এত সহজে অসুখ সারেনি। বোধহয় তিনজনই অসুখে পড়েছিল। পরের দিন ডাক্তারের ভিজিট বাবদ পঞ্চাশ টাকা লেখা আছে বিলে, সেই সঙ্গে নানারকম ওষুধ বাবদ পঁচাশি টাকা। বিলের শেষ দিনেও প্রায় অনুরূপ। ডাক্তারের ভিজিট লাগেনি, তবে ওষুধের দাম লেগেছে নব্বুই টাকা।

বার্তাকু ভক্ষণের বিলটি পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিবেচনা করে দেখলাম। এবং সিদ্ধান্ত করলাম যে বিলটি পাঠিয়ে প্রতিবেশিনী মোটেই দোষের কাজ করেননি, বিশেষ করে আমারই দেওয়া বেগুন খেয়ে যখন তাঁদের এই বিপত্তি।

প্রতিবেশিনীকে ফোন করে নিজের দায় স্বীকার করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কেমন আছেন?'

প্রতিবেশিনী বললেন, 'আজকে মোটামুটি ভাল। আজকে আমরা সবাই ভাত খেয়েছি। তিনদিন বাদে আজ প্রথম।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই তিনদিন তা হলে কী খেয়েছেন?'

প্রতিবেশিনী বললেন, 'কী আর খাব? দুয়েকটা বিস্কুট, লেবুজল, টক দই, চিঁড়ের মণ্ড, মুড়ি ভেজানো, সাবু, বার্লি এই সব খেয়েছি।'

আমি শুনে বললাম, 'আপনার বিল আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' প্রতিবেশিনী কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ফোনটা নামিয়ে রেখে বিল নিয়ে বসলাম।

যোগ দিয়ে দেখলাম, প্রতিবেশিনীর বার্তাকু ভক্ষণ বিল সাকুল্যে আড়াইশো টাকার কিছু বেশি হয়েছে।।

বিলের নীচে বেশ কিছুটা সাদা কাগজ রয়েছে সেখানে চারদিনের যোগফল দুইশো সাতান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা বসিয়ে তার নীচে পরিষ্কার করে লিখলাম, 'তিনদিনের দুই বেলা করে

তিনজনের মোট আঠারোটি মিল বাদ। প্রতিটি মিল বাবদ গড় ব্যয় পঁচিশ টাকা ধরলে মোট সাশ্রয় সাড়ে চারশো টাকা। এর থেকে তিনদিনের পথ্য বাবদ খুব বেশি হলে একশো টাকা এবং পূর্বোক্ত বিলের দুশো সাড়ে সাতান্ন টাকা বাদ দিলে এখন আপনার কাছে আমার প্রাপ্য সাড়ে বিরানব্বই টাকা। অনুগ্রহ করিয়া দ্রুত মিটাইয়া দিবেন। মনে রাখিবেন, ইহার মধ্যে বেগুনের দাম ধরি নাই।'

অ্যালেন গিনসবার্গ

অ্যালেন গিনসবার্গ মারা গেলেন। এখনকার সময়ের জীবিত মার্কিন কবিদের মধ্যে তিনি বিখ্যাততম ছিলেন এবং সেটা শুধু কবিত্বের কারণে নয়।

অ্যালেন নোবেল প্রাইজ তো দূরের কথা মার্কিন পুরস্কার পুলিতজার প্রাইজ পর্যন্ত পাননি। তবে পুলিতজারের জন্যে তিনি বিবেচিত হয়েছিলেন এবং গত বছর সেটা অল্পের জন্য পাননি।

অ্যালেনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে। তাঁর কথাবার্তা, আচার আচরণ নিয়ে গত চল্লিশ বছর ধরে মার্কিন সমাজ আলোড়িত হয়েছে। কখনও সমকামিতার সপক্ষে, কখনও আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে, কখনও বা বাংলাদেশ যুদ্ধের সমর্থনে অ্যালেন গিনসবার্গের বিবিধ কার্যক্রমের মধ্যে আধুনিক মানুষ এক চিরবিদ্রোহী, প্রতিবাদমুখর সত্তাকে বারবার আবিষ্কার করেছে।

হোয়াইট হাউস তাঁকে সমঝিয়ে চলেছে। রিপাবলিকান হোক বা ডেমক্র্যাট হোক, প্রশাসনের পর প্রশাসন তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। কখন, কোন মুহূর্তে অ্যালেন চেঁচিয়ে উঠবেন, 'এটা কী হচ্ছে?' এই চিন্তা প্রবল ক্ষমতাশালী মার্কিন প্রশাসনকে শঙ্কিত রেখেছে।

প্রতিবাদের সেই কণ্ঠটি পূর্ব উপকূলের নিউ ইয়র্ক থেকে পশ্চিম উপকূলের সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত যুবমানসকে বারংবার আন্দোলিত করেছে। আমেরিকার বাইরেও তাঁর প্রভাব এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল অকল্পনীয়।

বিপরীত পৃথিবীতে এই সুদূর কলকাতায় আমরাও কয়েকজন তাঁর কাছের মানুষ ছিলাম। যত ক্ষীণই হোক এক মানসিক যোগাযোগ ছিল, আত্মীয়তা ছিল।

অ্যালেন গিনসবার্গ মারা গেলেন এক শনিবার ভোররাতে তাঁর নিউ ইয়র্কের বাসাবাড়িতে আত্মীয়পরিজন পরিবৃত হয়ে। তখন কলকাতায় রবিবার বিকেল, সেই সন্ধ্যাতেই সানফ্রান্সিসকো থেকে আমার ছেলে কৃত্তিবাস ফোন করে জানাল, 'বাবা, অ্যালেনকাকা বেঁচে নেই।'

পঁয়ত্রিশ বছরের পরিচয়। তখন আমি অবিবাহিত, শীর্ণদেহ এক নবীন যুবক, সবে পাখা মেলেছি। কৃত্তিবাসের আড্ডার সঙ্গে অ্যালেন এবং তাঁর বন্ধু সদাহাস্যময় পিটার অরলভস্কি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। শক্তি আমাকে 'টর্পেডো' বলে ডাকত, আমার কথাবার্তা চালচলন দেখে অ্যালেন এবং পিটারও আমাকে 'টর্পেডো' (তারাপদ'র অপভ্রংশ) বলে ডাকা শুরু করল। পরবর্তীকালে নিউ ইয়র্কে আমার সঙ্গে অ্যালেন পিটারের দেখা হয়েছে, তখনও আমি টর্পেডো।

এই পরিসরে অ্যালেনের কবিত্ব বা মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই, আমি একটা ব্যক্তিগত ঘটনার কথা বলি।

ঘটনাটা ঘটেছিল কলকাতায় আমাদের কালীঘাটের পুরনো বাড়িতে। সেই ভাঙা বাড়িতে তখন আমি একাই থাকি। ১৯৬২ সাল, অ্যালেন পিটার এই উভপুরুষ কবিদম্পতি কলকাতায়। সুনীল-শক্তি এবং প্রয়াত শংকর চট্টোপাধ্যায় একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়িতে এল, তাদের সঙ্গে কয়েকটা ট্যাবলেট, যত্নে কাগজে মোড়ানো, অ্যালেন দিয়েছে। নতুন কোনও ড্রাগ বোধ হয় নাম মেসকালিন। ড্রাগ জমানার তখন সবে শুরু। এসব ট্যাবলেট তখন আমেরিকাতেও খুব পরিচিত নয়।

মোট ছয়টা ট্যাবলেট। সুনীল দুটো, শক্তি দুটো, শংকর দুটো, সুনীল জানত আমি কিছুতেই খাব না, তা ছাড়া আমার ওপর গুরু দায়িত্ব ড্রাগ খাওয়ার পর ওদের পর্যবেক্ষণ করা, প্রয়োজন পড়লে ডাক্তার ডাকা কিংবা তেমন অবস্থা হলে রকম বুঝে শ্মশানে বা মর্গে প্রেরণ করা।

সুনীল আর শক্তি জল দিয়ে দুটো দুটো করে ট্যাবলেট খেল, কিন্তু শংকর শেষ পর্যন্ত খেতে সাহস পেল না।

হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, অসংলগ্ন নানারকম কথাবার্তা বলে কিছুক্ষণ পরে সুনীল আর শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ল। শংকর একটু পরে বাড়ি ফিরে গেল। আমিও খাটের একপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সুনীল শক্তি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে গেল। পরে এই ঘটনার বিবরণ সুনীল কোথাও কোথাও দিয়েছে। তবে শক্তির কথাটা মনে আছে? শক্তিকে সকালে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কী রকম বুঝলি?' শক্তি হেসে বলেছিল, 'মাথাটা একদম সাফ হয়ে গেছে।'

শংকর যে ট্যাবলেট দুটো রেখে গিয়েছিল সেটা আমি যত্ন করে আমার ওষুধের বাক্সে রেখে দিয়েছিলাম। অ্যালেন যখন জানতে পারল দুটো ট্যাবলেট রয়ে গেছে, সে আমাকে বলল, সাবধানে রেখে দিতে। কলকাতা থেকে যাওয়ার আগে ফেরত নিয়ে যাবে, এই ড্রাগ নিষিদ্ধ এবং দুষ্প্রাপ্য।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ট্যাবলেট দুটোর কথা। একদিন খুব ভোরবেলা অ্যালেন আর পিটার এসে উপস্থিত কালীঘাট বাসায়, কাল চলে যাচ্ছে, ট্যাবলেট দুটো ফেরত নিতে এসেছে।

ওষুধের বাক্স খুলে বোকা বনে গেলাম। মনে আছে সাদা, গোল সাধারণ চেহারার ট্যাবলেট, আর দশটা ওষুধের মতোই দেখতে। এখন আর চিনতে পারছি না কোনটা সেই নিষিদ্ধ ড্রাগ। যথাসাধ্য অনুমান করে দুটো ট্যাবলেট বেছে নিয়ে অ্যালেনকে দিলাম, দিয়ে বললাম, 'যদি খেয়ে দ্যাখো নেশা হচ্ছে না, বুঝবে বাইকোলেটস খেয়েছ। পরের দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ো না যেন।'

প্যাঁচ

প্যাঁচ যে কী জিনিস, যিনি কখনও না কখনও প্যাঁচে পড়েছেন তিনি বিলক্ষণ জানেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথও প্যাঁচ ব্যাপারটা জেনেছিলেন। উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা প্রণিধানযোগ্য হবে।

'যিশু চরিতের' প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে যাও না?'

সে কহিল 'না'।

কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না, আমরা তাহাদের ঘরে যাই না।'

আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?'

সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরলভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।'"

কবি অজিত দত্ত তাঁর 'নইলে' নামক এক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন,

'প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?...
...দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।'

কবি কুস্তির প্যাঁচের কথা লিখেছেন। কিন্তু সে তো খুবই মোটা দাগের ব্যাপার। আসল প্যাঁচ হল বুদ্ধির, সে অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, তাঁদের বুদ্ধি এতই প্যাঁচালো যে বলা হয় যে তাঁদের মগজের মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিলে সেটা স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে। এবং তখন সেই স্ক্রু দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে টাইট দেবেন, যত ইচ্ছে টাইট দেবেন।

শুধু টাইট দেয়ার জন্যেও লোক রীতিমতো বিনা কারণেও বুদ্ধির প্যাঁচ কষে। নানা জনকে নানাভাবে জব্দ করে।

গোপাল ভাঁড়ের রেলগাড়ি-সংস্করণের একটি পুস্তিকার প্রচ্ছদের কথা আমি আগে বলেছি। প্যাঁচালো কথার চমৎকার উদাহরণ।

প্রচ্ছদের ছবিতে আছে, হাতে হাতঘড়ি পরা এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে অন্য এক ভদ্রলোক সময় জানতে চাইছেন, 'দাদা, আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে?'

ঘড়িওলা এর যা উত্তর দিলেন তা অভাবনীয়। তিনি উলটে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার ক'টা চাই।'

প্যাঁচালো কথার সবচেয়ে বেশি বিনিময় হয় আদালত কক্ষে, রাজনৈতিক আলোচনায়, হাটে-বাজারে।

বাজারের গল্পটা খুব পুরনো, কিন্তু চিরনতুন। বিশেষ করে বৎসরান্তের এই আমের সিজনে।

অনেকের যেমন অভ্যাস থাকে, এক ভদ্রলোক আমের বাজারে পাকা আম টিপে টিপে দেখছেন। বলা বাহুল্য, আমের দোকানদার তাঁকে মানা করে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি অবিচল। অবশেষে আমের দোকানি উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন, আশেপাশের আমওলাদের বলতে লাগলেন, 'ওরে, তোরা আর চিন্তা করিস না। আমের ডাক্তার এসে গেছে, ডাক্তারবাবু সব খারাপ আম টিপে টিপে দেখে চিকিৎসা করবেন। তোদের সব আম নিয়ে আয়।'

দাম্পত্য কলহের প্যাঁচ অবশ্য এত স্থূল সাধারণত হয় না।

গ্রীষ্মের দুপুরে সারা দুপুর কষ্ট করে, রান্নাঘরে ঘামে নেয়ে নীলিমা তাঁর স্বামীর জন্যে মাটন বিরিয়ানি রান্না করেছেন। প্রতিদিন তাঁর স্বামী অফিস থেকে এসে সন্ধ্যাবেলা খাওয়া নিয়ে খুঁতখুঁত করেন, আজ তাঁকে চমকে দেবেন।

বিরিয়ানি রান্না শেষ করে খাওয়ার টেবিলে সেটা রেখে নীলিমা স্নান করতে গেছেন, ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর প্রিয় কুকুর লোভা টেবিলে উঠে সেই বিরিয়ানি গবগব করে খাচ্ছে।

একটু পরে স্বামী অফিস থেকে ফিরে আসতে তাঁকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে নীলিমা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। স্বামী নীলিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'লোভা মরে গেছে তাই কী হয়েছে, তোমাকে কালকেই আরেকটা লোভার মতো কুকুর এনে দেব।' এই প্যাঁচের কথার সোজা মানে হল, 'বেঁচেছি, তোমার বিরিয়ানি খেলে বাঁচতাম না।'

প্যাঁচালো বুদ্ধি যে শুধু বড়দেরই থাকে তা নয়। অল্প বয়েসিদের মধ্যেও এর অভাব নেই।

স্কুলের ক্লাসে মাস্টারমশায় ছেলেদের বাসা থেকে রচনা লিখে আনতে বলেছিলেন। মোটামুটি তিন পৃষ্ঠার মধ্যে রচনা লিখতে হবে, বিষয় 'আলস্য'।

নির্দিষ্ট দিনে অন্যান্য ছাত্রেরা ক্লাসে এসে তাদের রচনার খাতা জমা দিল। প্রত্যেকেই যে যেমন পারে তিন পৃষ্ঠার মতো করে রচনা লিখেছে।

শুধু একটি ছেলে ব্যতিক্রম।

তার রচনার খাতায় প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় লেখা আছে, 'আলস্য'। তারপর পরপর তিন পৃষ্ঠা সাদা। তৃতীয় পৃষ্ঠার নীচে বড় বড় হরফে লেখা আছে—

'এর নাম আলস্য।'

অবশ্য এর চেয়েও প্যাঁচালো বুদ্ধি ছিল সেই ছেলেটির যাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি সাঁতার কাটতে পারো?' সে বলেছিল, 'সময়—সময়।' আমি অবাক, 'সময়—সময় মানে?' ছেলেটি অম্লানবদনে বলল, 'সময় সময় মানে ওই যখন জলে নামি তখন।'

শিশুশিক্ষা (২)

এক মনোবিজ্ঞানী সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে মানসিক অবস্থান পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এই বিজ্ঞানীর তথাকথিত সাজ-সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি নিজের খুশি ও বিবেচনামতো নানাধরনের জিনিস দিয়ে শিশুদের পরীক্ষা করতেন, শিশুমনের অতল রহস্যের সন্ধান করতেন।

মনোবিজ্ঞানীর কাছে একটা ছবি ছিল। বেড়ালের ছবি, একটা বেড়ালের বাচ্চা কাঁদছে আর তার সামনে বেড়ালের মা গম্ভীর মুখে বসে আছে।

সেদিন বিজ্ঞানী দুটি শিশুর মানসিকতা সমীক্ষা করছিলেন।

এর মধ্যে একটি শিশু এসেছে রীতিমতো বড়লোকের বাড়ি থেকে, ধনী পরিবারের সন্তান।

দ্বিতীয় শিশুটি নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির, বেশ গরিব পরিবারের।

মনোবিজ্ঞানী প্রথম শিশুটিকে বেড়ালের মা আর বাচ্চার ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বেড়ালের বাচ্চাটা কাঁদছে কেন বলো তো?'

বড়লোকের বাড়ির ছেলেটি বলল, 'বেড়ালের বাচ্চার পেট ভরে আছে, সে খেতে চাইছে না। কিন্তু বেড়ালের মা জোর করছে তাকে আরও খাওয়ানোর জন্য।

দেখছেন না মায়ের মুখটা কেমন থমথমে। আর বাচ্চাটা খাবে না বলে কাঁদছে।'

ধনী ছেলেটি বিদায় নেওয়ার পর গরিবের ছেলেটিকে সেই একই ছবি দেখালেন সমীক্ষক। এবং একই প্রশ্ন তাকেও করলেন। গরিবের ছেলেটিও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটি মন দিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'বেড়ালের বাচ্চাটা মার কাছে খেতে চাইছে। ওর খিদে লেগেছে, তাই এত কাঁদছে। ওর মা খেতে দিতে পারছে না বলে মন খারাপ করে বসে আছে।'

পাড়ার ইস্কুলে পরিতোষবাবুর নাতিকে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনিকেত নামে সেই শিশুটি ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অসফল হয়ে অনিকেত বাড়ি ফিরে আসে।

অনিকেত পাড়ার ইস্কুলে ভর্তি হতে পারেনি বলে অনিকেতের ঠাকুরদা পরিতোষবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 'ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হবে, তার আবার পরীক্ষা, তার আবার মৌখিক, পাড়ার মধ্যে ইস্কুল, আমরাই দেখেশুনে রাখি। আর সেই ইস্কুলই আমার নাতিকে নেবে না।'... এইরকম মনোভাব পরিতোষবাবুর।

তিনি শ্রীমান অনিকেতকে নিয়ে ইস্কুলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সোজা বড়দিদিমণির ঘরে।

বড়দিদিমণি পরিতোষবাবুকে চেনেন, এখন অনিকেতকে দেখেও চিনতে পারলেন। বুদ্ধিমতী মহিলা পরিতোষবাবুকে বসতে বলে তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সোজাসুজি বললেন, 'আপনার নাতিকে আমরা নিতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

এই 'দুঃখিত' কথাটা শুনে পরিতোষবাবুর আরও রাগ হল। শুকনো দুঃখ প্রকাশ নয়, তিনি চান সুরাহা। পরিতোষবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আমার নাতি শ্রীমান অনিকেত কীসে অযোগ্য প্রমাণিত হল।'

এ ধরনের প্রশ্নে বড়দিদিমণি মোটেই কোনও উত্তর দেন না। কিন্তু হাতে কাজ আছে। আপাতত এই পরিতোষবাবুকে বিদায় করতে হবে।

বড়দিদিমণি বললেন, 'আপনার নাতি সব বিষয়েই কাঁচা। অঙ্কে তো বিশেষ করে কাঁচা। একবছর বাসায় পড়ে সড়গড় হোক। সামনের বছর নিয়ে নেব।'

এর পরেও পরিতোষবাবু ইতস্তত করছেন দেখে বড়দিদিমণি অনিকেতকে তাঁর কাছে ডাকলেন। তার পর পরিতোষবাবুকে বললেন, 'আমি আপনার সামনে আপনার নাতির টেস্ট নিচ্ছি। আপনি নিজেই দেখুন সে কেমন যোগ্য।'

দপ্তরি দিয়ে বড়দিদিমণি অঙ্কের দিদিমণি সুরমাকে ডেকে পাঠালেন। ছোটখাটো সুরমাদি খুটখুট করে চলে এলেন। তাঁকে বড়দি বললেন, 'সুরমা, এই ছেলেটির অঙ্কের একটা মৌখিক পরীক্ষা নাও তো, ক্লাস ওয়ানের জন্য।'

সুরমাদি অনিকেতকে একবার ভাল করে দেখে বললেন, 'একে তো আজ সকালেই একবার টেস্ট করেছি।'

সুরমাদির কথা শুনে বড়দিদিমণি বললেন, 'তা হোক। তুমি এর ঠাকুরদার সামনে ওর একটা টেস্ট নিয়ে দেখাও তো।'

সুরমাদি অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারলেন। বড়দিদিমণির পাশের চেয়ারে বসে পরিতোষবাবুর নাতিকে প্রশ্ন করলেন, 'কী নাম তোমার?'

উত্তর এল, 'অনিকেত।'

সুরমাদি বললেন, 'আচ্ছা বাবা অনিকেত, তুমি বলো দেখি, তোমাকে যদি চারটে কলা দিই, তার মধ্যে তুমি যদি দুটো খেয়ে ফেলো, তা হলে আর কটা কলা থাকবে?'

অনেক ভেবেচিন্তে অনিকেত উত্তর দিল, 'একটা।'

বড়দি পরিতোষবাবুকে বললেন, 'দেখলেন তো!'

পরিতোষবাবু আর কী দেখবেন, তিনি ততক্ষণে পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার করে তার থেকে এক টাকার একটা কয়েন বার করেছেন। সেই টাকাটা বড়দির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'মাত্র একটা কলার জন্যে আমার নাতি ফেল হয়ে যাবে। এই নিন একটা কলার দাম দিয়ে দিলাম। এবার আমার নাতিকে ভর্তি করে নিন।'

লেখাপড়া

আমার ঠাকুরদা, বড় ঠাকুর (= বড় ঠাকুরদা=প্রপিতামহ) স্কুলের যে শেষ পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, কলেজপূর্ব সেই সার্বজনীন পরীক্ষার নাম ছিল এন্ট্রান্স। বাংলায় বলা হত প্রবেশিকা পরীক্ষা। সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে পরীক্ষা পরিচালনা করা হত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক সীমা তখন ছিল বিশাল। এখনকার বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম এমনকী রেঙ্গুন, একালের মায়নামারের ইয়াঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই সাম্রাজ্য।

এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দশ হাজারে উঠতে চার যুগ পেরিয়ে গিয়েছিল। এখন তো যে কোনও জেলাতেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দশ হাজার পেরিয়ে যায়।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা উঠে গেছে সেও নব্বই বছর হয়ে গেল। আমাদের ছোটবেলায় এন্ট্রান্স পাশ ব্যক্তিদের দেখেছি। এমনকী এন্ট্রান্স ফেল লোকেরা দাবি করতেন আমাদের সময়কার গ্র্যাজুয়েটদের থেকে তাঁরা বেশি লেখাপড়া জানেন। যে কোনও ছাত্রের এন্ট্রান্স পরীক্ষার অধিকার ছিল না, স্কুল থেকে বিশেষ কড়াকড়ি করা হত।

এই শতকের প্রথম দশকের শেষে এন্ট্রান্স অবলুপ্ত হল। এন্ট্রান্স পাশ কেউ এখন আর বোধহয় বেঁচে নেই, শেষ প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তিটি দশ-বিশ বছর আগে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে পরলোকগমন করেছেন।

এন্ট্রান্সের পরে এল ম্যাট্রিকুলেশন, সংক্ষেপে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। নীতিবাগীশ এক সংস্কৃত পণ্ডিত এর নামকরণ করেছিলেন মাতৃকুলনাশন পরীক্ষা। তবে বাংলায় প্রবেশিকা পরীক্ষাই বলা হত।

প্রবেশিকা অর্থে বিদ্যালয়ের পড়া সাঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পরীক্ষা। এই নামকরণের মধ্যে একটা ব্যঞ্জনা স্পষ্ট যে এই পরীক্ষা কোনওমতে পাশ করলেই কলেজে পড়া যাবে। এখন আর সমতুল্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যঞ্জনা মোটেই অর্থবহ নয়। সবাই কেন অনেকেই কলেজে ভর্তি হতে পারে না।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা চার দশকের কিছু বেশিকাল চালু ছিল। আমি আর আমার বাবা-কাকা সবাই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। মনে আছে ক্লাস নাইনে উঠে সব খাতা বইয়ে মোটা হরফে লিখেছিলাম,

তারাপদ রায়

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, ১৯৫১।

ওই ১৯৫১ ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ বছর। পরের বছর থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হল। পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে স্বয়ংশাসিত পর্ষদের হাতে চলে গেল।

এর পরের ইতিহাস খুব জটিল। কোথাও কোথাও স্কুল ফাইনাল রইল, ১৯৬১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক চালু হল। এগারো ক্লাসের পরীক্ষা। অনেকটা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ধাঁচে। এদিকে পাশাপাশি স্কুল ফাইনাল পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পি ইউ বা প্রিইউনিভার্সিটি, তার জন্যে কলেজে পড়তে হবে।

সম্প্রতি বছর বিশেক দশ ক্লাস আর বারো ক্লাস, মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক কিঞ্চিৎ স্থিতাবস্থায় এসেছে। সে সম্পর্কে কিছু কিছু বলার আছে। কিন্তু আর আলোচনা নয়।

সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। মোটামুটি প্রতি তিনজনে দু'জন পাশ করেছে। এ এমন একটি পরীক্ষা যার সঙ্গে শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ সকলের নাড়ির যোগ আছে। সকলেই খোঁজ নেয়, মহামায়া স্কুলের রেজাল্ট কেমন হল, বাবলি কি স্টার পেয়েছে, চয়ন কি আবার ফেল করল।

পাশ ফেলের কথা যাক। আমার এই ষাট বছরের জীবনে দেখেছি কত পাশ করা লোক জীবন যুদ্ধে ডাঁহা ফেল। আবার কত ফেল করা লোককে হই হই করে বাঁচতে দেখেছি।

গরমে প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডায় সংকুচিত হয় এর একটা উদাহরণ দিতে বলা হয়েছিল একটি ছাত্রকে। ছাত্রটি উত্তর দিয়েছিল, 'দিন। দিন, স্যার। গ্রীষ্মকালে গরমে বেড়ে যায় আবার শীতকালে ঠান্ডায় ছোট হয়ে যায়।'

একটি ছাত্রকে আফ্রিকার তিনটি জন্তুর নাম করতে বলা হয়েছিল, সে বলেছিল, 'সিংহ, সিংহী আর সিংহের বাচ্চা।'

অন্য একজনকে 'মিছরির ছুরি' এই ব্যঞ্জনাময় শব্দদ্বয় দিয়ে বাক্যরচনা করতে দেওয়া হয়েছিল। সে লিখেছিল, 'আজকাল মিছরির ছুরির দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছে।'

এই সব উত্তরদাতারা কেউই ভাল ছাত্র ছিল না। এই তিনজনকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। অল্প বয়সের স্কুলের পরীক্ষায় এরা ভাল করতে পারেনি। কিন্তু জীবনের বড় পরীক্ষায় চমৎকার পাশ করেছে।

সর্বশেষে সেই মাননীয় অধ্যাপককে স্মরণ করি। ভদ্রলোক ছিলেন জৈব রসায়নের পণ্ডিত। পরে তাঁর ঝোঁক পড়েছিল একই সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যায়।

এ সমস্তই ঠিক ছিল।

কিন্তু মন্দভাগ্য ছিল তাঁর পোষা বেড়ালটির। যেমন হয়, গঙ্গা-যমুনা নামে সেই সাদা-কালো বেড়ালটি দুধ-মাছ খেতে ভালবাসত।

অধ্যাপক মহোদয় দীর্ঘ গবেষণা করে জেনেছেন দুধ-মাছের যা খাদ্যগুণ সবই জলে সিদ্ধ করা খবরের কাগজে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ে।

এবার হতভাগ্য বেড়ালটিকে তিনি দুধ-মাছ বন্ধ করে খবরের কাগজ খেতে দিতে লাগলেন। একজন সাংবাদিক একথা শুনে অধ্যাপকের খোঁজ নিলেন। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

অধ্যাপক বললেন, 'দেখুন কী দুঃখের কথা, আমার বেড়ালটা সব সংস্কার তুচ্ছ করে যেদিন কাগজ খাওয়া শুরু করল, সেদিনই মারা গেল।'

ডেটলাইন শান্তিনিকেতন

হেডলাইনটা ডেটলাইন হয়ে খবরের কাগজের ভাষা হয়ে গেল। খুব ছোট বা অখ্যাত জায়গা যখন সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে, সেই অকুস্থল থেকে বাঘা বাঘা সাংবাদিকেরা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন,

'ডেটলাইন জুগুয়া:

এখানে ভূমিকম্পের দোলা থামেনি। শত শত বাড়িঘর রাস্তার পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চারদিকে মৃতদেহ।'...

অথবা,

'ডেটলাইন গোবিন্দগঞ্জ:

মা কালীর ভর হওয়ার পরে বাতাসীবালা দেবী যে পাঁঠাকাটা খাঁড়া দিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাসুর-জা এবং সেই সঙ্গে আরও যোলো জন বাড়ির লোক এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মুণ্ডু ছেদন করেন, স্থানীয় থানার দারোগা ভূতনাথবাবু সেই খাঁড়াটিকে একটি নয়ানজুলি হতে উদ্ধার করেছেন।'...

...ভূতনাথবাবুর মনে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে, এত ভোঁতা একটা খাঁড়া দিয়ে কী করে অতগুলো মাথা সাবলীলভাবে কাটা হয়েছে।'

ভূতনাথবাবুর সমস্যার সমাধান নেই। তা ছাড়া ডেটলাইন মার্কা সংবাদগুলো ধারাবাহিকতা রক্ষা

করে না। নতুন যুগের সদা চঞ্চল রিপোর্টাররা অবলীলাক্রমে এক ডেটলাইন থেকে অন্য ডেটলাইনে সরে যায়।

ডেটলাইন নয়, আমাদের ছিল ক্যাম্প। চাকরির অনেকটাই কেটেছে মাঠেঘাটে দৌড়াদৌড়ি করে। আমরা হেডকোয়ার্টারে প্রতিবেদন পাঠাতাম,

ক্যাম্প রামপুরহাট:

'আজ এক বিশাল জনসভায় স্থানীয় বিধায়ক একশো তেরো জন ভূমিহীন কৃষককে পাট্টা বিলি করেছেন।'

অথবা, ক্যাম্প সন্দেশখালি:

'গতকাল এক সান্ধ্য বৈঠকে এগারো জন বর্গাদারকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।'

* * *

সে যা হোক, ক্যাম্প নয় আমরা এবার ডেটলাইনে আসছি। ডেটলাইন শান্তিনিকেতন:

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মহীশূরস্থ ভারতীয় ভাষা সংস্থান বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শিশুদের জন্য ছড়া রচনার কর্মশালা করছেন। বাংলা ভাষার কর্মশালাটি বিশ্বভারতীর সহযোগিতায় শান্তিনিকেতনে হচ্ছে। এই ছড়া কর্মশালায় প্রবীণ জ্যোতিভূষণ চাকী থেকে শুরু করে অতি তরুণ নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত জনা দশেক ছড়াকার এসেছেন। আমি সেই অর্থে ছড়াকার নই, কেন আমাকে ডাকা হয়েছে জানি না। তবে আমি এসেছি এক পক্ষকাল শান্তিনিকেতন থাকার লোভে।

এসে দেখছি ভিড়, হইচই, উত্তেজনা নেই। শীত-শেষের চমৎকার সব দিন। পাখির গান, মলয় পবন, বাগানে বাগানে মরশুমি ফুল, গাছে গাছে নব মুকুল।

সবই ভাল। কিন্তু দল বেঁধে ছড়া লেখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। দৈনিক দুপুরে ছড়া কর্মশালায় দশজনকে বসতে হচ্ছে ছড়া রচনার জন্যে। শীতল দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কাপের পর কাপ চা। সে এক প্রাণান্তকর পরিবেশ। এই পরিবেশে আমি এখন পর্যন্ত একটি মাত্র ছড়া লিখে উঠতে পেরেছি। যার শেষ কয় পঙ্‌ক্তি হল,

একটা ছড়া হামা দেয়
একটা ছড়া হাঁটে
ভুবনডাঙার মাঠে
দশটা মানুষ
ভুতের মতন খাটে।

শান্তিনিকেতনে এসে আমার সবচেয়ে বড় লাভ যেটা হয়েছে সেটা হল নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা। অনেকদিন পরে রীতিমতো জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। সুদর্শন, সুশিক্ষিত নিমাই চট্টোপাধ্যায় সুরসিক এবং সুভাষী।

নিমাই চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের পুরনো ছাত্র। শুভময় ঘোষ, অমর্ত্য সেনের প্রায় সমসাময়িক। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নিমাই লন্ডনে যান। সেই থেকে তিনি সেখানে। কিন্তু কলকাতা বা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীতে বাড়ি কিনেছেন, নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে।

নিমাই এবং স্ত্রী শ্রীমতী জয়া চট্টোপাধ্যায়কে লন্ডন শহরের সমস্ত বাঙালি, বহু ভারতীয় এবং বেশ কিছু সাহেব এক ডাকে চেনেন। নিমাই দীর্ঘদিন বি বি সি-র সঙ্গে যুক্ত আছেন।

নিমাইয়ের কথা নয়। নিমাইয়ের গল্পের কথা বলি। শান্তিনিকেতনের সেই যুগে নিমাইয়ের স্ত্রী জয়ার সঙ্গে একটি ছাত্র পড়তেন, তাঁর নাম ছিল সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাঢ় অঞ্চলে ঠাকুর পদবি দুর্লভ নয় আর রবীন্দ্রনাথ নাম তো বাংলার কেন ভারতের ঘরে ঘরে। কিন্তু এই মণি-কাঞ্চন যোগটি মারাত্মক।

পঞ্চাশের দশকের এক পৌষমেলার গল্প বললেন নিমাই। এখনকার মতো না হলেও তখনও বেশ ভিড় হত। সেই পৌষমেলায় আরও অনেক ছাত্রের মতোই স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন নিমাইসখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যথারীতি সেই পৌষমেলায় অফিসঘরের মাইকে প্রচারিত হয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুমি যেখানেই থাকো অবিলম্বে মঞ্চে চলে এসো।' সেই হিমশীতল পৌষের রাতে মেলায় সমবেত হাজার হাজার মানুষ মাইকে এই ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

নিমাই এবং জয়া, উভয়েই এই নতুন রবি ঠাকুরের জীবনের একটা ট্র্যাজেডির কথা বললেন। এক বিখ্যাত পণ্ডিতের কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন নিমাইদের রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কন্যার প্রেমিকের নাম শুনে সেই পণ্ডিত সম্ভাব্য বিবাহ বরবাদ করে দেন শুধু একটি যুক্তিতে, 'রবি ঠাকুরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে আমি কিছুতেই দেব না।'

নিমাই শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীতে তাঁর বাড়ির নাম দিয়েছেন, 'প্রত্যাবর্তন'; কিন্তু এই নামকরণ সহজে হয়নি। শান্তিনিকেতনে বাড়ির নামকরণ রবীন্দ্র অনুসারী হওয়া উচিত এই ভেবে তিনি প্রথমে বাড়ির নাম রাখেন 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা।' এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিবাদের মুখে পড়ে নাম বদল হয়ে দাঁড়ায়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', শান্তিনিকেতনের ছেলে শান্তিনিকেতনে ফিরেছে সেই অর্থে। এটাও চলেনি তাই অবশেষে শুধুই 'প্রত্যাবর্তন'।

নিমাই-চরিত মানস সহজে শেষ হওয়ার নয়। আপাতত সত্যজিৎ রায়ের গল্পটা বলে শেষ করি।

নিমাইকে খুব পছন্দ করতেন সত্যজিৎ। বিলেতেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নিমাই নিজে লম্বা-চওড়া, সত্যজিৎ আরও বেশি লম্বা। একদিন হঠাৎ সত্যজিৎকে নিমাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি পাঞ্জাবি কেনেন কোথা থেকে?' মৃদু হেসে সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'তুমি বোধ হয় জানো না, দরজি বলে একটা ব্যাপার আছে।'

যেভাবে গল্প তৈরি হয়

বিখ্যাত ব্যক্তিদের, বিশেষ করে মহাপুরুষদের বিষয়ে অনেক অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক গল্প শোনা যায়।

এই গল্পগুলি অবাস্তব হলেও সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে মানানসই। কোনও একটি ক্ষীণ সূত্র ধরে কাহিনীগুলি জনমানসে পল্লবিত হয়ে অতিরঞ্জিত আকারে প্রচার পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় সম্পর্কে দুটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়।

দুটি গল্পই বিখ্যাত। একটি হল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে দর্শকাসন থেকে উত্তেজিত বিদ্যাসাগরের চটি নিক্ষেপ। আর দ্বিতীয়টি হল, মায়ের বার্তা পেয়ে ঝড়-বাদলের অন্ধকার রাতে উত্তাল দামোদর নদী সাঁতরিয়ে বিদ্যাসাগরের মাতৃসমীপে গমন।

জনসাধারণের খুব প্রিয় এই গল্প দুটি এবং এ রকম বেশ আরও কয়েকটি আছে।

কিন্তু এসব কাহিনীর যে কোনওরকম বাস্তব ভিত্তি নেই, গবেষকরা বিশেষ করে ইন্দ্র মিত্র তাঁর 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর কেন? আমাদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত উদাহরণ ঋত্বিক ঘটক কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কত চমকপ্রদ কাহিনী এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।

অল্পকাল আগে প্রয়াত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথাই বলি। এ রকম বর্ণময়, উজ্জ্বল চরিত্রের মানুষ জগৎ-সংসারে বিরল। সাধারণ মানুষ বোধহয় কবিদের এ রকম ঝলমলে, গোলমেলে দেখতেই ভালবাসেন।

শক্তি সম্পর্কে সত্যি-মিথ্যে মেশানো কত গল্পকাহিনী বাজারে। একা এক ডবল-ডেকারে করে অতিক্রান্ত মধ্যরাতে গলির মধ্যে স্বগৃহে ফেরা, থানায় বড়বাবুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করা, মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা, 'কি এখনও বাংলা খাচ্ছো কি না?'—এই সব অলীক গল্প লোকের মুখে মুখে এখনও ফেরে।

তবে বিশেষ ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু হিসেবে আমি হলফ করে বলতে পারি, এই কাহিনীগুলি আসল ঘটনার ধারে কাছেও যায় না। আসল ঘটনাগুলি কম রোমাঞ্চকর ছিল না, তবু জনসাধারণ গল্পগুলি তাদের মনের মতো করে রচনা করে নিয়েছে।

এইভাবে গল্প রচনা করার একটা আশ্চর্য উদাহরণ সম্প্রতি চোখে পড়ল।

আজ কিছুদিন হল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে আমাদের দেশে খুব আদিখ্যেতা চলেছে। মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম জিন্না, নেতাজি সুভাষ, পণ্ডিত নেহরু—ইত্যাদি তদানীন্তন নেতাদের বিষয়ে নানারকম গল্পগাথা প্রচারিত হচ্ছে। এতদিন পরে তার আর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়।

এরই মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে।

প্রতিবেদক বুধনি মাঝিন নাম্নী এক সাঁওতাল রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রসঙ্গে।

উনিশশো উনষাট সালের আটই ডিসেম্বর তারিখে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পাঞ্চেত বাঁধ উদ্বোধন করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু।

এই চল্লিশ বছরের পুরনো ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে, 'জওহরলালকে বিয়ে করার জন্যে বিতাড়িত বুধনি', শিরোনামে প্রতিবেদক একটি রোমাঞ্চকর ও লাগসই আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে জওহরলাল চরিত্রের মহিমা প্রস্ফুটিত।

প্রতিবেদক যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার এইরকম—

নেহরু বাঁধ উদ্বোধন করতে এসে সমবেত জনতার মধ্যে তরুণী বুধনি মাঝিনকে দেখতে পান। তখন নেহরু নিজে বাঁধ উদ্বোধন না করে বুধনিকে এই মহৎ কর্ম সম্পাদন করার জন্যে ভিড়ের মধ্যে থেকে মঞ্চে ডেকে আনেন।

নেহরুর অনুরোধে বুধনি বাঁধ উদ্বোধন করেন, সুইচ টিপে ড্যামের দরজা খুলে দেন। তারপরে সাঁওতালি ভাষায় বুধনি মাঝিন একটি ছোট সাঁওতালি বক্তৃতাও করেন।

এরপর বুধনি মাঝিনকে অভিভূত জওহরলাল নেহরু তাঁর গলার সোনার হার খুলে পরিয়ে দেন। এবং সেটাই হল বুধনির কাল। পরপুরুষের কণ্ঠহার গলায় পরায় তাকে সমাজ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়। গত চল্লিশ বছর নির্বাসিতার জীবনযাপন করছেন পাঞ্চেত বাঁধের উদ্বোধনকারিণী শ্রীমতী বুধনি মাঝিন।

জনৈকা আদিবাসী রমণী ও প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত এই প্রতিবেদনটি এক অর্থে অসাধারণ, কিন্তু অনেকটাই মিথ্যা।

সত্য ঘটনা হল, বুধনিকে জনতার মধ্য থেকে নেহরু ডেকে আনেননি, তাঁকে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ এই কাজের জন্যে মনোনীত করেছিলেন কয়েকমাস আগে থেকেই। তাঁকে রীতিমতো রিহার্সাল দেওয়ানো হয় নিয়মিতভাবে এবং তার সংক্ষিপ্ত সাঁওতালি ভাষণটিও পাখিপড়া করে শেখানো হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, নেহরু তাঁকে নিজের গলার সোনার হার খুলে পরাননি, এই উপলক্ষে একটি রুপোর হাঁসুলি ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বুধনির জন্যে বানিয়েছিলেন, সেটাই নেহরু তাকে দেন।

আর সমাজ থেকে নির্বাসন? সে গল্প একেবারেই আলাদা।

হায় ভীরু প্রেম

ভালবাসা নাকি চাঁদের মতো। কখনও এক অবস্থায় থাকে না। হয় বাড়ে না-হয় কমে। চন্দ্রকলার মতো হয় প্রেম ক্রম বিকশিত হয় নতুবা ক্রম বিনাশিত হয়।

জানি এসব ছেঁদো দার্শনিক তত্ত্ব এই হালকা হাসির লঘু নিবন্ধে আর যাই হোক তারাপদ রায়ের কাছে কেউ আশা করেন না। সুতরাং আপাতত তরল কাহিনীর স্রোতে কিছুটা এগোনো যাক। ধরা যাক সেই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা যাঁরা দীর্ঘ প্রেমলীলার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারপরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের দু'জনের মধ্যে কোথাও কোনও বিষয়ে সামান্যতম মিল নেই। শুধু একটা জায়গায় মিল ছিল দু'জনের, দু'জনারই বিয়ের তারিখ এক, তা ছাড়া দু'জনারই এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

এ-গল্পটা আসলে সেই পুরনো গল্পটার মতো যেখানে গল্পের নায়ক দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কারও ভাল বিয়ে হয়নি একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া।' স্বামী-স্ত্রীর প্রসঙ্গে যথাস্থানে আসা যাবে, এখন প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

অনেকদিন আগে একটি ছেলে আমাকে বলেছিল যে, তার যে প্রেমিকা সেই মেয়েটি যমজ সন্তানের একজন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দু'জনার মধ্যে ঠিক কোনজন তোমার প্রেমিকা বুঝতে তোমার কোনও অসুবিধা হয় না?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে আমাকে জানিয়েছিল, আরে না, না দাদা, অসুবিধে হবে কেন? ওর ভাইয়ের একটা গোঁফ আছে যে। এই রকম অন্য একটি ক্ষেত্রে আমি নিজে যে জবাবটা দিয়েছিলাম সেটাও এই সূত্রে স্মরণীয়। সে অনেককাল আগের কথা। জনৈক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার স্ত্রী এবং শ্যালিকা দু'জনেই তো একরকম দেখতে, কে আপনার স্ত্রী, কে আপনার শ্যালিকা চটপট বুঝতে অসুবিধে হয় না আপনার?

যাঁরা বিদ্যাবুদ্ধি পড়েছেন তাঁরা জানেন আমি কী বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম, বোঝার খুব চেষ্টা করি না।

সেই কবে পবিত্র বাইবেলে লেখা হয়েছিল ভালবাসা মৃত্যুর মতোই শক্তিশালী। এই বাইবেল-বাক্য স্মরণে রেখেই বোধহয় একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে এক আবেগবিহ্বল মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তা হলে তুমি খুব দুঃখ পাবে?

প্রেমিকের এই শিশুসুলভ প্রশ্নে খুবই কৌতুক বোধ করেছিল যুবতীটি কিন্তু মুখে বলেছিল, 'নিশ্চয়'।

এরপর প্রেমিক জানতে চেয়েছিল, তুমি খুব কাঁদবে?

প্রেমিকা বলেছিল, কাঁদব না কেন?

তখন সেই প্রেমিক অন্যায় আবদার করে বসল, একটু কেঁদে দেখাও না।

এই অনুরোধ রক্ষা করার বদলে একটি অতি নিষ্ঠুর জবাব দিয়েছিল যুবতীটি, একটু মরে দেখাও না।

জানি না, এর পরেও ভালবাসা মৃত্যুর মতো শক্তিশালী ছিল কি না, এর পরেও টিকেছিল কিনা।

প্রেম ও মৃত্যুর ব্যাপারে সেই ঘটনাটাও মনে পড়ছে। প্রেম নিবেদন করার পরে প্রত্যাখ্যাত

হওয়ার পরে খুবই ভেঙে পড়েছিল সেই প্রেমিক। শুধু প্রণয় নিবেদন নয়, সে কিন্তু পরিণয় প্রস্তাবও দিয়েছিল। মেয়েটি রাজি না হওয়ায় সে বেচারা একেবারে মুষড়িয়ে যায়, প্রায় কান্নাকাটি করে আর কী।

মেয়েটি তখন সমবেদনার সুরে জিজ্ঞাসা করল, কী হল তোমার? এত ভেঙে পড়লে কেন, শেষে আত্মহত্যা করবে নাকি?

ছেলেটি বলল, এসব ক্ষেত্রে আমি সাধারণত আত্মহত্যাই করে থাকি।

অন্য এক ঘটনায় এক বাক্যবাগীশ প্রেমিক তার দয়িতাকে বড় গলায় বলেছিল, আমি দরকার হলে মৃত্যুর সামনেও দাঁড়াতে পারি। ভালবাসার কথা চলছিল এক পার্কের পাশের বেঞ্চিতে বসে। এমন সময় পার্কের ভিতরে ভারী একটা শোরগোল উঠল। সবাই যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগল। একটু পরেই বোঝা গেল ব্যাপারটা, দূরে দেখা গেল শিং উঁচিয়ে একটা বিরাট পাগলা ষাঁড় ছুটে আসছে। প্রেমিক-প্রেমিকা যে বেঞ্চিতে বসে ছিল দেখা গেল ফোঁস ফোঁস করতে করতে সেই দিকেই ষাঁড়টা ছুটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে উঠে শ্রীযুক্ত প্রেমিক আর্তচিৎকার দিয়ে এক লাফে পার্কের রেলিং পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ে ছুট লাগাল। এদিকে প্রেমিকের এই আর্তচিৎকার শুনে এবং দীর্ঘ লম্ফ দেখেই বোধহয় ষাঁড়টি গতিপথ বদল করে অন্য দিকে ধাবমান হল।

একটু পরে ষাঁড়টি যে রকম ভীমবেগে এসেছিল ঠিক সেভাবেই পার্কের খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিরাপদ দূরত্ব থেকে শ্রীযুক্ত প্রেমিক এর পরে গুটিগুটি প্রেমিকার কাছে ফিরে এল।

ভালবাসার মানুষের এই কাপুরুষতা দেখে প্রেমিকাটি তখন রীতিমতো উত্তেজিতা। প্রেমিক সামনে আসতেই তাকে চেপে ধরল, এইমাত্র তুমিই না বলেছিলে আমার জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারো আর একটা ষাঁড় দেখেই আমাকে ফেলে ছুটে পালালে। শ্রীযুক্ত প্রেমিক মাথা চুলকিয়ে বলল, কী করব বলো, ষাঁড়টা যে মৃত ছিল না।

শুধু ষাঁড় দেখেই যে প্রেমিকেরা পলায়নপর হয় তা কিন্তু নয়। কমলার বাবা কমলাকে বলেছিলেন, ওই যে অমিত না অসিত কী নাম যেন ছেলেটির, ওই যে ছেলেটি তোমার লাভার, ওর সঙ্গে আর কোনওদিন তোমার দেখা হবে না।

এই শুনে কমলা ডুকরে কেঁদে উঠল, কী করেছ তুমি তার, বলো কী করেছ?

কমলার বাবা বললেন, আমি তার কী করব, কিছুই করিনি। সে আমার কাছে একশো টাকা ধার চেয়েছিল, সেই টাকাটা তাকে দিয়েছি।

টাকাপয়সার ব্যাপার আরও আছে।

জয়ন্তীর সঙ্গে জয়ন্তর নতুন আলাপ।

দু'জনে গলির মোড়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফুচকা খাচ্ছিল। হঠাৎ জয়ন্তের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাই দেখে জয়ন্তী জানতে চাইল, কী ব্যাপার জয়ন্তদা, কী হল আপনার।

জয়ন্ত বলল, ওই যে পটল না কী যেন নাম, তোমার সেই বিচ্ছু ভাইটা— আমাদের ফুচকা খেতে দেখে ফেলেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে জয়ন্তী বলল, কই, কোথাও তো পটলাকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি নিশ্চয় ভুল দেখেছেন জয়ন্তদা।

জয়ন্ত বলল, ওই দেখো সামনের ফুটপাতের ল্যাম্পপোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়ন্তী ভাল করে দেখে বলল, এ তো পটলা নয়। ও হল ছেন্টু, আমার খুড়তুতো ভাই।

জয়ন্ত বলল, তাতে কিছু সুবিধে হচ্ছে?

জয়ন্তী বলল, খুবই সুবিধে। এসব জায়গায় পটলা পঞ্চাশ টাকার কমে ছাড়ে না। ছেন্টুটা বোকাসোকা ভালমানুষ, ওকে আপনার বিশ টাকা দিলেই হবে।

এই জয়ন্ত-জয়ন্তীর বিয়েতে প্রতিবেশী হিসেবে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। তারা দু'জনেই এখন

সুখী দম্পতি। পটলার মাঝে মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

আমি নিজে এক প্রাচীন পাপী, দীর্ঘদিন আগে সেই কবে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছিলাম। প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী লিখতে গিয়ে আমি বার বার দাম্পত্য কাহিনীতে চলে যাচ্ছি। কিন্তু চৌকশ লোকেরা বলেন দাম্পত্য-প্রেম প্রেম নয়, বৈষ্ণব কবির সেই রজকিনী প্রেমের মতো নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়। এতে অবশ্য আমারই সুবিধে, সবাই জানেন, কাজকর্মে আমার তেমন ফুর্তি নেই। মদালসা নবীনা পাঠিকা হয়তো একটু দুঃখিত হবেন, কিন্তু এ বয়সে, যখন তিনকাল গিয়ে এক্কালে ঠেকার বয়সে প্রায় এসে গেছি, আমি একটু ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাই। প্রেমবিষয়ক দুটি অধরা, অছোঁয়া গল্প বলি।

এক নৈশ সমাহারে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ঘরের এক প্রান্তে একটা পাতাবাহারের টবের পাশে দাঁড়িয়ে। সেখানেও এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক, তাঁর কৌতূহলও কম নয়, তিনি জানতে চাইলেন, তুমি ওই হলের মধ্যে হইচই হাসি-তামাশা থেকে এখানে চলে এলে কেন?

মেয়েটি বলল, আরে পুরুষমানুষগুলো, বেঁটে-লম্বা রোগা-মোটা, কালো-ফরসা, যুবক-বুড়ো সবাই আমাকে বিরক্ত করছে, খালি জানতে চাইছে, আমি থাকি কোথায়? বর্তমান ভদ্রলোক এবার সুন্দরীকে আপাদমস্তক ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, তা তুমি জবাবে কী বললে? খুব ছোট একটা হাই চাঁপার কলির মতো আঙুলের তুড়ি দিয়ে নিবৃত্ত করে সুন্দরী বলল, কী আর বলব? বললাম যে আমি শহরতলিতে থাকি।

মুখে তুড়ি দেওয়ার সময় সুন্দরী যে দেহবিভঙ্গ রচনা করেছিল বর্তমান ভদ্রলোক তার পর স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিলেন, এবার খুবই আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু সত্যি তুমি থাকো কোথায়?

এবার সুন্দরী নয়নধনুকে শর সংযোজন করে বলল, ওই তো বললাম না, আমি তো শহরতলিতে থাকি।

এই রকমই অধরা গল্প অন্য একটা। কোথা থেকে টুকে যেন লিখেছিলাম, এখন গ্রন্থস্থ অবস্থায় শোধবোধ-এ আছে। নিজের কাছে নিজেই অনুমতি নিয়ে গল্পটি আবার বলছি।... পার্টিতে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, হা-প্রেম লোকেরা তাকে দেখে অভিভূত হয়ে যেত। তার ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করত।

একদা এক উদ্‌ভ্রান্ত, প্রেমপাগল যুবক সেই যুবতীকে এক আসরে পেয়ে আর কিছুতেই কাছ ছাড়া করছে না। তার চোখে গদগদ দৃষ্টি তার কণ্ঠে ভালবাসার মধু। কিন্তু মেয়েটির সে কিছুতেই পাত্তা পেল না। কতবার অনুরোধ করল, জানতে চাইল, আপনি কি একা এসেছেন, আপনি কী করে ফিরবেন, আমি আপনাকে নামিয়ে দেব, মেয়েটি হ্যাঁ, না, থ্যাঙ্ক ইউ ইত্যাদি টুকটাক সংক্ষিপ্ত জবাবে পাশ কাটিয়ে গেল।

অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে যুবকটি বলল, আপনার ফোননম্বরটা যদি দেন, কোনওদিন যদি ফোন করি।

মেয়েটি বলল, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে পাবেন।

অতঃপর মরিয়া হয়ে যুবকটি শেষতম মোক্ষম প্রশ্নটি করল, কিন্তু আপনার নাম।

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, সে-ও ওই টেলিফোন ডিরেক্টরির মধ্যে পাবেন।

মেয়েরা যে সহজে পাত্তা দিতে চায় না, অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করে এ তো সকলেরই জানা কথা।

অল্প বয়সে আমার এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, প্রেম পারাপারে ঝাঁপিয়ে দেখুন অনেক মেয়েই আপনার সঙ্গে সাঁতরাতে রাজি হবেন, অনেকটা দূর সাঁতরাবেন, কিন্তু কিছুতেই তীরে উঠে ঘর বাঁধতে চাইবেন না।

আমি একটু বোকার মতো বলেছিলাম, মানে?

সহকর্মী করুণ হেসে বলেছিলেন, মানে আর কী? বহু মেয়ে আছে যারা বিয়ে করতে চায় না।

আমি বললাম, জানলেন কী করে?

কী করে আর, সহকর্মী বললেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আমি যে অনেককেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দেখেছি।

আমার এই সহকর্মী বন্ধুটির মতো অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেকেরই আছে। তবে আমার নেই। কোনওদিন কোনও মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার এমনকী তার প্রেমে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এতদিন পরে এ নিয়ে কোনও আফসোসও নেই আমার। যাক সেসব অন্য কথা। এইবার কাহিনীমালার বিরতি টানতে হয়। তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, শেষ গল্পটি বড়ই মর্মান্তিক।

বলরাম বনলতাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলল, দেখো, হয়তো আমি বলহরির মতো দেখতে সুন্দর নই; হয়তো আমরা বলহরির মতো বড়লোক নই, তার মতো আমার এয়ার কন্ডিশন বাড়ি নেই, সাজানো ফ্ল্যাট নেই কিন্তু বনলতা আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। এক মুহূর্তও থাকতে পারব না।

কোনওরকমে আলিঙ্গন ছাড়িয়ে বনলতা বলল, সে তো আমি বুঝতে পারছি, আমিই কী তোমাকে কম ভালবাসি নাকি। কিন্তু এই যে বারবার বলহরি বলহরি বলছ, এই বলহরি লোকটা কোথায় থাকে বলো তো?

তথাপি:

তথাপি একটা এমন গল্প বাদ থেকে গেল যে সেটা না বললে অন্যায় হবে। ঠিক গল্পও নয়, একটা প্রশ্ন।

খুবই সাধারণ, সাদামাটা জিজ্ঞাসা এটা। সেই সাবেকি পুরনো একটা প্রশ্ন।

গভীর আপ্লুত কণ্ঠে প্রেমিক বেচারা প্রেমিকাকে প্রশ্ন করলেন, আনোয়ারা আমিই কি তোমার জীবনে প্রথম?

আনোয়ারা মৃদু হেসে বললেন, ছিঃ ছিঃ এসব কী প্রশ্ন করছ? তুমি ছাড়া আর কে? আর অন্য কারও কথা আসে কী করে?

আনোয়ার বলল, তবু একেক সময় কেমন যেন খটকা লাগে।

আনোয়ারা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, এই এক সমস্যা তোমাদের এই পুরুষমানুষদের নিয়ে। সবাই জানতে চায় সেই প্রথম কিনা?

পুনশ্চ:

অবশেষে নিজের প্রেমের কথা বলি।

অনেকদিন আগে, তা প্রায় তিরিশ বছর, আমার এক বন্ধু কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছিলেন না। আমরা দুপুরে একসঙ্গে চা খেতাম, আড্ডা দিতাম। একদিন কার কাছে শুনলাম, তাঁর জ্বর হয়েছে। ভাবলাম একদিন দেখে আসা উচিত। পরের দিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কলেজ স্ট্রিটের মেসবাড়ি, তখন মেসবাড়ি ব্যাপারটা কলকাতায় ভালভাবেই রয়েছে। আমার বন্ধুটি থাকতেন দোতলায়। ভরদুপুরের মেসবাড়ি একেবারে ফাঁকা, একতলার খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে থাকলাম। বেশ একটু পরে তাঁর সাড়া পেলাম কিন্তু তার আগে দ্রুতপদে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে একটি লাল শাড়ি-পরা মেয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দোতলায় আমার বন্ধুর ঘরে গিয়ে পৌঁছতে তিনি আমাকে বললেন, জ্বরটা ছেড়ে গেছে। আমি তাঁকে বললাম, হ্যাঁ, দেখলাম, এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। প্রেম সম্বন্ধে আমার এই গোলমেলে মনোভাব কতটা সত্যি, এ বয়সে আর বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না। তবে আমার এই কর্কশ কণ্ঠ, গোলাকার চেহারা, তদুপরি নিয়ত প্রতিবাদ-প্রবণ মন, কোনও দিনই সফল প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। মেয়েরা আমাকে ভয় করতে পারে, ভক্তি করতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে, কিন্তু কখনও ভালবাসবে কিনা আমার গভীর সন্দেহ আছে।

প্রেমে বিশ্বাস করি কি না এই প্রশ্নে আমার সংক্ষিপ্ত জবাব হল, প্রেম আমার কাছে অনেকটা ভূতের মতো। ভূতে বিশ্বাস করি না কিন্তু ভয় পাই, প্রেমেও ভয় পাই। আগে হয়তো কখনও প্রেমে পড়লেও পড়তে পারতাম, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। তার একমাত্র কারণ অবশ্য আমার বয়স

নয়। এ বয়সেও ঢের ঢের লোক প্রেমে পড়ে। আমার অসুবিধে অন্যরকম। যতদূর শুনেছি এবং সেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে পড়ে আসছি, প্রেমিকা খুব ভালভাবে ভাল ভাল সামগ্রী রেঁধে খুব যত্ন করে খাওয়ায়। আমার পক্ষে ভাল জিনিস খাওয়া এখন বিষতুল্য। এমনিই যা খাই তাতে শরীর ফুলেফেঁপে রয়েছে। তা ছাড়া প্রেম করলে শুধু রেস্তোরাঁয় বা কফিহাউসে নয়, পার্কে, নদীর ধারে হাত-পা ছড়িয়ে প্রেমিকার পাশে অনেকক্ষণ বসে থাকার নিয়ম আছে। কিন্তু আমি মেঝেতে বা উঠোনে বসতে পারি না। ওরকমভাবে বসলে দশ মিনিটেই আমার পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন সাহেবের কথা মনে পড়ে। তিনি প্রচণ্ড স্থূলাকার ছিলেন। একদা এক আসরে তিনি কায়দামাফিক হাঁটু গেড়ে বসে এক সুন্দরীকে প্রেম নিবেদন করতে যান। তারপর সুন্দরী সেই পটভূমি থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও আর গিবন সাহেব উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। প্রায় আধঘণ্টা পরে বহুজনের সাহায্যে তিনি উঠে দাঁড়ান। মদনদেবের কাছে আমার প্রার্থনা, এই পরিণতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

মাতালের গল্প

প্রায় অনুরূপ নামে আমার যে অতিচপল, অতিতরল গল্পগুচ্ছ রয়েছে, সেই গ্রন্থের পাঠকেরা অবশ্যই আশঙ্কা করতে পারেন, আমি হয়তো আবার সেই একই গল্প করতে বসেছি।

তাঁদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। আমার স্বভাবচরিত্র তাঁরা ভালভাবেই জানেন। চুরি করতে করতে আমার এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে, আজকাল আমি নিজের লেখা থেকে পর্যন্ত চুরি করছি।

যাই হোক, আশ্বাস দিচ্ছি, নামে এক হলেও এবারে আর নিজের লেখা বা অন্য কারও রচনা থেকে চুরি নয়, সরাসরি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে। তদুপরি মোটেই হাসির গল্প নয়, করুণ কাহিনী, ওই যাকে বলে 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে'।

অবশ্য প্রথম আখ্যানটি করুণ কিনা বলা কঠিন। ঘটনাটি দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা হয়ে কলকাতার লোকদের মুখে মুখে ফিরেছে গত পক্ষে।

কলকাতার ময়দানে কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে ক্রিকেট-ফুটবল ম্যাচ লাইন দিয়ে টিকিট কেটে দেখেনি, এ-শহরে এমন লোক বিরল। এবং এই সৌভাগ্যবানেদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যিনি জীবনে টিকিটের লাইনে বা প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে কারণে কিংবা অকারণে কলকাতার প্রবাদপ্রসিদ্ধ মাউন্ট পুলিশদের হাতে এবং তাদের ঘোড়াদের পায়ে লাঞ্ছিত হননি।

ময়দানের শেষ প্রান্ত মানে উত্তর সীমানা থেকে সোজা রাস্তা এসে পড়েছে চৌরঙ্গিতে। চৌরঙ্গির আগে ময়দান এলাকায় সেই রাস্তার নাম রানি রাসমণি রোড। সেই রাসমণিকে জানবাজারে তাঁর নিজের বাড়িতে যেতে হলে যেতে হবে সুরেন ব্যানার্জি রোড দিয়ে। এই সুরেন ব্যানার্জি রোডে প্রথমে একটু এগিয়ে কলকাতা পুরসভার বিপরীতে এলিট সিনেমার পাশে মাউন্ট পুলিশের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার পুলিশের সদর দপ্তর।

এই সদর দপ্তরের চারপাশেই মানে জানবাজার, মেট্রো গলি, নিউ মার্কেট, ধর্মতলা ইত্যাদি স্থানে

প্রচুর নেশার রসদ, পানীয়ের ঠেক। সুতরাং কোনও মধ্যরাতে, কোনও ঘোড়সওয়ার সেপাই সারাদিন ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার পর এই পরিবেশে যদি কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত হয়ে চুরচুর মেজাজে একটির পর একটি আস্তাবলবদ্ধ ঘোড়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে যান, তাতে আশ্চর্য না হলেও চলবে।

সেদিন মধ্য রজনীতে নগরীর রাজপথে এক অপূর্ব দৃশ্য। একের পর এক আস্তাবল-মুক্ত, লাগামহীন ঘোড়া দুলকি চালে ময়দানের দিকে চলেছে। জন্মাবধি ওই একটি রাস্তাই তারা চেনে। ময়দানেই তাদের গতিবিধি। সেই দিকেই তারা যাত্রা করেছে।

গ্রীষ্মরজনীর শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় সেইদিন সে এক অনৈসর্গিক, অভূতপূর্ব দৃশ্য কলকাতার প্রাচীন রাস্তায়। এই সময়ে রসভঙ্গ ঘটেছিল এক দায়িত্ববান কর্মীর অনুপ্রবেশে। ইনি লক্ষ করেন যে, শূন্যপৃষ্ঠ মুক্ত অশ্বগুলি ময়দানগামী হয়েছে। ইনি এদের প্রত্যেকের নাম জানেন এবং শিক্ষিত অশ্ববৃন্দ নিজেরাও নিজেদের আলাদা নাম সম্বন্ধে সচেতন। সুতরাং পিছন থেকে উচ্চস্বরে তাদের নাম ধরে ডাকামাত্র তারা কান উঁচু করে সেই ডাক শুনে, একটি করুণ হ্রেষাধ্বনি করে মুখ ঘুরিয়ে আবার গুটিগুটি নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল।

এই কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি করুণ দুর্গাপুরের মাতালদের কাহিনী। খুব সংক্ষেপে সেটি বলব। কারণ, করুণা আমার বিষয় নয়।

দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলের একটি স্থানীয় বিবাহে একটি ভাড়াটে বাসে বরযাত্রীরা বিবাহসভায় যাচ্ছিল। এর মধ্যে একদল মদের হাঁড়ি নিয়ে উঠেছিল বাসের ছাদে। মদ্যপান, সেই সঙ্গে গান, তারপরে চলন্ত বাসের ছাদে যূথবদ্ধ নাচ। বাসের চালক নাকি দু'বার গাড়ি থামিয়ে এদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মাতাল না শোনে বিপদের বাণী।'

নৃত্যগীত চমৎকার চলছিল এবং চলত, যদি না রাস্তার ওপরে একটা রেলওয়ে ব্রিজ বাধা হয়ে দাঁড়াত। আর, বাধা মানে বিশাল বাধা। চলন্ত বাসের ওপর থেকে ব্রিজে ধাক্কা খেয়ে নর্তকেরা ছিটকে পড়লেন চারদিকে। বেশ কয়েকজন মৃত, বাকিরা জীবন্মৃত।

এই করুণ কাহিনীর পরে এবার একটু হালকা গল্প বলি। রসিকতা দিয়েই শেষ করি।

আলোচ্য বিষয়টি একটি কথোপকথন, পানশালায় জনান্তিকে শোনা।

একটি টেবিলে দু'জন মুখোমুখি বসে মদ্যপান করছেন, দু'জনেই অনেকক্ষণ ধরে পান করছেন, এখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে। এই দু'জনের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত কখ অবিবাহিত, দ্বিতীয়জন শ্রীযুক্ত গঘ বিবাহিত, মাত্র বছরখানেক আগে বিয়ে করেছেন।

শ্রীযুক্ত কখ: দাদা, বাড়ি চলুন। অনেক রাত হল।

শ্রীযুক্ত গঘ: আরেকটু বসো।

শ্রীযুক্ত কখ: দাদা, এই যে আপনি এত দেরি করে বাড়ি ফেরেন, বউদি আপনাকে মিস করেন না।

শ্রীযুক্ত গঘ: কদাচিৎ।

শ্রীযুক্ত কখ: কদাচিৎ?

শ্রীযুক্ত গঘ: হ্যাঁ, ভাই। তোমাদের বউদিদির হাতের টিপ অসামান্য। স্কুলে ভাল বাস্কেটবল খেলতেন। লক্ষ্য অব্যর্থ। হাতা, খুন্তি, ফুলদানি, জুতো, বই— যা কিছু ছুড়ে মারেন, একেবারে অব্যর্থ। কখনও কদাচিৎ আমাকে মিস করেন।

মনের কথা

'সই লো সই
দুটো মনের কথা কই।'

মন, তুমি কৃষিকাজ জানো না।

শুধু কৃষিকাজই নয় মন অনেক কিছু জানে না। আবার এমন অনেক কিছু জানে যা ভাবা যায় না।

তাই তার এত ব্যাকুলতা, এত অস্থিরতা। তাই সে মেঘের সঙ্গী হতে চায়। তাই তার কোথাও হারিয়ে যাওয়ার মানা নেই। সে জন্যেই 'সই লো সই, দুটো মনের কথা কই', দুটো মনের কথা শোনার জন্যে মন নিজেই মনের মানুষ খোঁজে।

কিন্তু মনের মন্থরতম, গোপনতম কথা বলার লোক মেলা কঠিন। সব কথা কাকেই বা বলা যায়। তবু মন হু হু করে ওঠে সব কথা বলার জন্যে, স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, মা-বাপ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নয়, এমন কাউকে সব কথা বলা যিনি নির্বিকারভাবে এসব কথা শুনে যাবেন, যাঁর কাছে মনের ভার উজাড় করা যাবে।

এই মনের ভার উজাড় করার জন্যে সাহেবদের দেশে মনস্তত্ত্ববিদেরা রয়েছেন। আমাদের দেশে মনের চিকিৎসার এখনও তেমন প্রচলন ঘটেনি।

মানুষ মনে মনে নিজেকে কত কী ভাবে। নিজেকে কেউ ভাবে রাজা উজির, কেউ ভাবে উত্তমকুমার। কিন্তু সবাই যে ভালর দিকে ভাবেন তা নয়, এক সাহেব নিজেকে ভাবতেন কুকুর। এক মনোবিজ্ঞানী বহুদিন ধরে তাঁকে দেখলেন, তাঁর চিকিৎসা করলেন, তাঁকে বোঝালেন যে, 'তুমি কুকুর হতে যাবে কেন, তুমি একটি আস্ত মানুষ।' সাহেবের ধীরে ধীরে চৈতন্যোদয় হল, তখন একদিন সেই মনোবিজ্ঞানী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যে কুকুর নন, সেটা তা হলে এত দিনে বুঝতে পেরেছেন।' সাহেব বললেন যে, 'হ্যাঁ স্যার, এখন আর আমার মনে ওসব ধারণা নেই।'

'মনোবিজ্ঞানী' তখন বললেন, 'তা হলে তো আপনি এখন বেশ ভাল আছেন।' এই কথা শুনে সাহেব বললেন, 'নিশ্চয় স্যার। আপনি আমার এই নাকের নীচে হাত দিন, দেখুন কেমন সুন্দর ঠান্ডা।' ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কুকুরদের শরীর ভাল থাকলে নাকের নীচটা ঠান্ডা থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে সাহেবের কথা শুনে মনোবিজ্ঞানী নিশ্চয়ই খুবই হতাশ হয়েছিলেন, কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন সাহেবের কুকুরত্ব এখনও যায়নি।

সত্যিই এসব ব্যাপার সহজে যাওয়ার নয়। এক মেমসাহেবের ধারণা ছিল যে তিনি গোরু। বহু চেষ্টা করেও মনোডাক্তার যখন তাঁকে মনুষ্যত্বে ফেরাতে পারলেন না, তিনি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা মেমসাহেব আপনি কবে থেকে বুঝতে পারলেন যে আপনি গোরু।' মেমসাহেব নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন, 'সেই যবে বাছুর ছিলাম সেই তখন থেকে।'

এসব মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়ে, পুনর্মনুষ্য হয়ে সবাই যে খুশি হয় তা নয়। এক ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পরে আক্ষেপ করেছিলেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমি একটা বিশাল গণ্ডার ছিলাম, আর আজ আমি সামান্য একটা মানুষ।'

প্রাতঃস্মরণীয় শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'দুইয়ে দুইয়ে শুধু চার হয় তা নয়, অনেক সময়

দুইও হয়।' যাঁদের মানসিক সমস্যা আছে তাঁদের ব্যাপার আরও সূক্ষ্ম। তাঁদের কেউ কেউ ভাবেন দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ কিংবা তিন হয়। আবার কেউ কেউ ঠিকই জানেন দুইয়ে দুইয়ে চারই হবে কিন্তু তাঁদের চারটা তেমন পছন্দ নয়, তাঁদের বক্তব্য চার না হয়ে অন্য কিছু হলে ভাল হত।

এগুলি জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, এবার সরল ব্যাপারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। এক মানসিক হাসপাতালে পাশাপাশি দুটি ঘর, নয় নম্বর ঘর এবং দশ নম্বর ঘর। নয় নম্বর ঘরে রয়েছেন ভূতনাথ আর দশ নম্বর ঘরে রয়েছেন দেবনাথ। ভূতনাথবাবু এবং দেবনাথবাবু দু'জনারই মনের চিকিৎসা চলছে। দু'জনেরই ব্যাপারটা খুবই জটিল, যদিও বাইরে থেকে দেখে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। তাঁদের মানসিক বৈকল্যের একমাত্র লক্ষণ যে তাঁরা সর্বক্ষণ 'জপমালা', 'জপমালা' করছেন, জপের মালার মতো সারাদিন এই নাম জপছেন দু'জনে। একদিন পরিদর্শক এসেছেন হাসপাতালে। তিনি এই দুই ভদ্রলোকের বিচিত্র ব্যাপার দেখে ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইলেন, এঁদের মাথা খারাপ হল কী করে আর ওই জপমালাই বা কে? ডাক্তারবাবু যা বললেন তা অতিশয় চমকপ্রদ, 'ওই যে ভূতনাথবাবু জপমালা নামে এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন, তারপর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জপমালাদেবীকে বিয়ে করতে না পেরে এই রকম হয়ে গেছেন।' এই পর্যন্ত শুনে পরিদর্শক মহাশয় সরলভাবে বললেন, 'এই দেবনাথবাবু উনিও প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, ওই একই জপমালা পালকে জীবনে না পেয়ে সারাদিন 'জপমালা', 'জপমালা' জপে যাচ্ছেন।' ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'না। আসল ব্যাপার ঠিক এর উলটো। দেবনাথবাবু প্রেমে সফল হয়ে জপমালাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। ঘটনাবলি দু'জনার ক্ষেত্রে দু'রকম ফল দিয়েছে। ভূতনাথবাবু জপমালাদেবীকে না পেয়ে পাগল হয়ে গেছেন আর দেবনাথবাবু জপমালাদেবীকে পেয়ে পাগল হয়ে গেছেন।'

সুতরাং কী কারণে কার মনে কী হয় কেউ বলতে পারে না। এ বিষয়ে এর আগে আমি অনেক লিখেছি, আমারও আর কিছু বলার নেই। শুধু শুধু চর্বিত চর্বণে, গোরুর মতো জাবর কেটে কী লাভ! সব শেষে সেই ভদ্রলোককে মনে পড়ছে, খেয়াল করতে পারছি না তাঁর কথা এই শেষ মেলেও লিখে ফেলেছি কি না। পাঠক-পাঠিকা আমার অনুরূপ একশো আটটি দোষ ক্ষমা করেছেন নিশ্চয় এর পরেও ক্ষমা করবেন।

খুব ছোট করে বলছি। আমার এক অনতি পরিচিত খ্যাপা প্রতিবেশী জীবনগোপালবাবু সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 'মিস্টার রায়, আমার নাম যদি জীবনগোপাল না হত, তা হলে কী বিপদ হত?' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কী বিপদ?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনারা সবাই আমাকে জীবনগোপাল বলেন, আমার নাম যদি জীবনগোপাল না হত তা হলে কী হত?'

এই জীবনবাবুর মানসিক সমস্যাগুলি অতি বিচিত্র। তিনি খুব আইসক্রিম ভালবাসেন, তাঁর মন চায় আইসক্রিম খেতে।

কিন্তু এদিকে আবার তাঁর অসুখের ভীষণ বাতিক। সব সময়েই ভয় পাচ্ছেন এই বুঝি কোনও মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত হল। আবার আইসক্রিমের লোভও ত্যাগ করতে পারেন না। অবশেষে তিনি নিজেই এর একটা মধ্যবর্তী সমাধান বার করেছেন। বাজার থেকে আইসক্রিম কিনে এনে আজকাল ফুটিয়ে খাচ্ছেন।

কিন্তু এ তো তবু ভাল। গত রবিবার সকালবেলা বাসায় যখন চা খেতে বসেছি হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে জীবনবাবুর চিৎকারে চায়ের পেয়ালা ফেলে ছুটে গেলাম।

কী ব্যাপার? আজ কিছুদিন হল জীবনবাবুর মাড়ি ফোলা, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে, তিনি কাল সন্ধ্যাবেলা দাঁতের ডাক্তার দেখিয়েছেন, ডাক্তারবাবু তাঁকে কয়েকদিন টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে বারণ করেছেন, বলেছেন আঙুল দিয়ে দাঁত মাজতে।

কিন্তু হাতের আঙুলে তো কত রকম জীবাণু, অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকতে পারে বিশেষ করে নখের কোণে। সুতরাং মোক্ষম পথ বেছে নিয়েছেন জীবনবাবু, দাঁত মাজায় নিজের

ডান হাতের তর্জনীটা জীবাণু মুক্ত করার জন্য টগবগে গরম জলে চুবিয়েছেন এবং তারই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এই আর্তচিৎকার।

আমি গিয়ে দেখলাম জীবনবাবুর আঙুলে মুহূর্তের মধ্যে বিশাল ফোসকা পড়ে গেছে আর তিনি তর্জনী মাথার ওপরে তুলে লাফাচ্ছেন। জীবনবাবু লাফাতে থাকুন। ততক্ষণে এই নিবন্ধ শেষে আপনাদের একটা উপদেশ দিচ্ছি।

পাগলকে হেলাফেলা করবেন না, বিপদ হতে পারে।

কফিহাউসের দরজায় এক বলবান পাগল কাউকে ঢুকতে কিংবা বেরতে দেখলে দুটো টাকা চাইত একজনের কফি খাওয়ার জন্যে। এক সদয় ভদ্রলোক তাকে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলেছিলেন 'এক কাপ কেন, আপনি পাঁচ কাপ কফি খান এই টাকা দিয়ে।' পরের দিন সেই সদয় ভদ্রলোক যখন আবার কফিহাউসে ঢুকছেন সেই বলবান পাগল এক ঘুষি মেরে তাঁকে চিত করে ফেলে দিল। হতবাক এবং মর্মাহত ভদ্রলোক কিছুই না বুঝতে পেরে সিঁড়ির ওপর থেকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? কাল দশটা টাকা দিয়েছিলাম, এই বুঝি তার প্রতিদান?'

পাগল তখন গজরাচ্ছে, গজরাতে গজরাতে সে বলল, 'শালা, তোর জন্য পাঁচ কাপ কফি খেয়ে কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি।'

পুনশ্চ:

এ গল্পটা তো সবাই জানেন তবু আবার বলি। মানসিক চিকিৎসালয়ে এক ভদ্রলোক গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনাদের এখান থেকে কি আজকালের মধ্যে কোনও পাগল পালিয়েছে?'

চিকিৎসালয়ের লোকেরা অবাক হয়ে বলেছিল, 'কই না তো।' কিন্তু আপনি হঠাৎ আমাদের এখানে এসে এ প্রশ্ন করছেন কেন?' এই প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'বাসায় গিয়ে শুনলাম আমার স্ত্রী যেন কার সঙ্গে পালিয়েছে। কিন্তু পাগল ছাড়া আর কে আমার বউকে নিয়ে পালাবে, তাই খোঁজ করতে এলাম।'

চিনা-অচিনা

সেই কবে চিনাংশুক থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর চিনি, চিনেজবা, চিনেমাটি এমনকী সধবার সিঁথেয় চিনে সিঁদুর। আমি চিনি গো চিনি তারে। চিনেদের সঙ্গে আমাদের বহুকালের চেনা। তাদের আর আমাদের গল্পগুজব হিমালয়ের গিরিপথ ধরে বহুকাল ধরে যাতায়াত করছে দু'দিকে।

সম্প্রতি ইন্দ্র মিত্র 'রহস্যালাপ' গ্রন্থে 'চীনে রঙ্গ' পরিচ্ছেদে অসামান্য কয়েকটি রসকথিকা বাঙালি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি মাতালের গল্পও রয়েছে। 'সিদ্ধি' দিয়ে যেমন সব শুভকাজের কেনাকাটার সূচনা করতে হয়, তেমনিই মাতাল-কাহিনী শিরোধার্য করে চিনে রঙ্গে প্রবেশ করি।

এক বাড়িতে খুব খানাপিনা হচ্ছে। বিশাল পার্টি। বন্ধুবান্ধব, কাছের-দূরের অতিথি অভ্যাগতে

জমজমাট সন্ধ্যা ক্রমশ গভীর রাতের দিকে গড়াচ্ছে। এই সময়ে একজন অতিথি ঘোষণা করলেন, 'যাদের দূরে চলে যেতে হবে, তাদের এখনই চলে যাওয়া উচিত।'

একথায় কাজ হল। ধীরে ধীরে সবাই যে যার বাড়ির পথ ধরল। শুধু যিনি একথাটা বললেন, তিনি গেলেন না, বাড়ির কর্তার সঙ্গে বসে মদ খেয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে মদ যখন প্রায় শেষ, তিনি আবার ঘোষণা করলেন, 'যাদের যেতে হবে তাদের এখনই চলে যাওয়া ভাল।'

বাড়ির কর্তা একথা শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী কথা? এখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু তুমি বাকি আছ যাওয়ার, আর কে যাবে?'

এবার ঘোষণাকারী বললেন, 'সেই কথাই যে বলছি। আমি তো এখানেই শুয়ে পড়ব, আমাকে তো যেতে হবে না। তোমাকেই এখান থেকে হেঁটে নিজের শোয়ার ঘরে যেতে হবে।'

মাতালের গল্পের মতোই চিনে ডাক্তারের গল্পও চমৎকার। এককালে কলকাতায় চিনে ডাক্তার বলতে দাঁতের ডাক্তার বোঝাত। এই সেদিনও কলকাতার রাস্তাঘাটে পাড়ায় পাড়ায় 'Chinese Dentist' লেখা সাইনবোর্ড চোখে পড়ত, এখন আর তেমন দেখি না।

সে যা হোক, এ হল আসল চিনে ডাক্তারের গল্প। চিন দেশের চিকিৎসকের গল্প। এই গল্পে চিকিৎসক মহোদয় নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খুব খারাপ অসুখ, বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

চিকিৎসকমহোদয়ের এক বন্ধু এসেছেন তাঁকে দেখতে। তিনি সেই বন্ধুকে বললেন, 'দেখো আমার কাছে একটি চমৎকার ওষুধ আছে। যে কোনও অসুখই হোক, যত মারাত্মকই হোক, সেই ওষুধ এক ডোজ খেলে সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্তি। তারপর আর কোনও অসুখ হবে না, হেসে খেলে ফুর্তি করে একশো বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা যাবে।'

এই কথা শুনে স্বাভাবিক কারণেই বন্ধুটি বললেন, 'তা হলে তুমি নিজেই খাচ্ছ না কেন অমন আশ্চর্য একটা ওষুধ?' এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন, বহুদিন পরে হাসলেন, তারপর বললেন, 'কী বলছ তুমি? কোনও দিন শুনেছ, কোনও বড় ডাক্তার নিজের অসুখে নিজে ওষুধ দিয়েছে? নিজের অসুখ নিজে চিকিৎসা করেছে?'

মাতালের গল্প হল, ডাক্তারের গল্প হল, এরপর চিনে শিল্পীর গল্প।

শিল্পী মানে চিত্রকর, আর্টিস্ট। চিত্রকর মহোদয় নতুন গ্যালারি করেছেন। গ্যালারির দরজার দু'পাশে নিজের এবং নিজের স্ত্রীর ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ একদিন চিত্রকরের শ্বশুরমশায় এসেছেন। ঘরের সামনে নিজের মেয়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে জামাতাকে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী? কে এই মেয়েটি? কার ছবি এঁকেছ তুমি?'

জামাতা বেচারি করজোড়ে বললেন, 'সে কী চিনতে পারছেন না? এ তো আমার স্ত্রীর, আপনার মেয়ের ছবি।'

এবার পাশের ছবিটির দিকে তাকিয়ে শ্বশুরমশায় বললেন, 'তাই নাকি! তা হলে তুমি আমার মেয়ের ছবির পাশে একটা অচেনা পুরুষমানুষের ছবি টাঙিয়ে দিয়েছ কেন?'

চিনে রঙ্গের শেষ নেই। এবারের গল্পে শ্বশুরমশায় নেই, শাশুড়ি ঠাকরুন আছেন। পুরনো যুগের গল্প। তখনও আয়না সহজলভ্য নয়। ঘরে ঘরে আয়না ছিল না।

এদিকে, গ্রামের বাজারে নতুন আয়না এসেছে। শাশুড়ি ঠাকরুন এসেছেন দেখে জামাতা বাবাজীবন বহু ব্যয়ে একটি আয়না কিনে এনেছেন। সেটি তিনি বাজার থেকে ফিরে স্ত্রীর হাতে দিয়েছেন। সেই আয়নায় বউ নিজের মুখ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল, তারপর আয়নাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'মা আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার বর বাড়িতে আরেকজন বউ নিয়ে এসেছে।'

মেয়ের হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে শাশুড়ি আয়নাটায় নিজের মুখ দেখতে পেলেন, তিনিও মেয়ের মতোই কেঁদে উঠলেন, 'ওরে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। ওরে তোর বর কি শুধু আরেকজন বউ নিয়ে এসেছে, এ যে দেখছি আরেকটা শাশুড়িও নিয়ে এসেছে।'

পুনশ্চ: চিনে রঙ্গের অনেকগুলিই পুরনো চেনা গল্প। চেনা অথবা চিনে গল্প। সেই চিনা গল্প দিয়েই শেষ করি।

এ গল্পটির উৎস কোথায় তা জানি না, কিন্তু ছোট বয়সে এ গল্প আমরাও শুনেছি। তবে, ইন্দ্রমিত্র তাঁর 'চীনে রঙ্গ' পরিচ্ছেদে যে অসামান্যভাবে পরিবেশন করেছেন এই রসকাহিনী, সে ভাবে আগে শুনিনি। এটাও ডাক্তারের গল্প। এই গল্পের ডাক্তারবাবুর ছেলেও ডাক্তারি পড়ে।

ডাক্তারবাবু ভিন গাঁয়ে রোগী দেখতে গিয়েছেন নদী পার হয়ে। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন সেই গাঁয়ে পর পর তিনজন রোগী মারা গেল ডাক্তারবাবুর হাতে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে ডাক্তারবাবুকে তাড়া করে এল। গত্যন্তর না দেখে ডাক্তারবাবু ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিনি সাঁতার জানতেন, গ্রামবাসীরা জানত না। প্রাণপণে নদী সাঁতরে নিজের বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, ছেলে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। 'কী বই পড়ছ', জিজ্ঞাসা করায় ছেলে বলল, 'ডাক্তারি বই পড়ছি।' ভেজা জামাকাপড় পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ডাক্তারি বই পড়া দরকার, কিন্তু সাঁতার জানা আরও বেশি দরকার।'

কয়েকটি অবিশ্বাস্য রসিকতা

মনীষী অক্ষয় সরকারের সুরসিক পিতৃদেব চুঁচুড়ার গঙ্গাচরণ সরকারের কথা আগে একবার লিখেছি। কিন্তু আমারই দোষে একটা চমৎকার, প্রায় অবিশ্বাস্য উপাখ্যান বাদ রয়ে গেছে।

অক্ষয়চন্দ্র একবার বাবা গঙ্গাচরণের সঙ্গে থিয়েটার গেছেন, 'মেঘনাদ বধ' নাটক। মেঘনাদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর স্ত্রী প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন। পাশে চিতা সাজানো হয়েছে। সেই চিতার পাশে রাবণ এসে বিরাট এক ডায়ালগ দিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

এখন মঞ্চে চিতার সামনে প্রমীলা একা। এদিকে, চিতা নিভতে বসেছে, তাই দেখে প্রমীলা নিজেই নিজের চিতা ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, ওদিকে, তাঁকে ডায়ালগও দিতে হবে।

এই দৃশ্য দেখে স্বাভাবিক কারণেই অক্ষয় সরকার বললেন, 'এদের কি কেউ নেই? এত বড় লঙ্কারাজ্য, ভৃত্য-পরিচারক, কাজের লোকেরা সব গেল কোথায়?'

ছেলেরা কথা শুনে গঙ্গারচণ নাকি বলেছিলেন, 'রাম কি আর কাউকে রেখেছে রে? রাক্ষসপুরী একেবারে শূন্য করে দিয়েছে।'

এর পরের গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এক পকেটমারকে নিয়ে। গল্পটি সম্ভবত সত্যি নয়, কিন্তু বেশ ভাল।

তখনও কলকাতার আর হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার ওপরে নতুন বা পুরনো কোনও লোহার সাঁকোই তৈরি হয়নি, ভাসমান কাঠের পুল দিয়ে পারাপার করতে হয়। একদিন শরৎচন্দ্র পায়ে হেঁটে সাঁকো পার হয়ে হাওড়া ফিরছিলেন। তাঁর জামার বুকপকেটে চেন দেওয়া পকেটঘড়ি। অনেকের হয়তো এখনও মনে আছে যে, তখনকার জামায়-পাঞ্জাবিতে বুকপকেটের মধ্যে তিন কোনাচে ঘড়ির পকেট থাকত। যাদের ঘড়ি নেই তারা সেই পকেটে টাকার নোট, দরকারি কাগজ— এই সব রাখত।

আমরা ছোট বয়েসে দর্জির দোকানে বায়না করতুম, 'ওপরের পকেটের মধ্যে ঘড়ির পকেট দিতে হবে।' সেটা ছিল সাবালকত্বের সোপান বেয়ে ওঠার প্রথম ধাপ।

সে যা হোক, ভরদুপুর। হাওড়ার পুলে খুব ভিড়, লোক ঠেলাঠেলি। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি হাঁটছেন, এমন সময় তাঁর খেয়াল হল কেউ একজন তাঁর ঘড়ির পকেট থেকে চেনটা ধরে টান দিয়েছে, ঘড়িটা তুলে নেবার জন্যে।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শরৎচন্দ্র পকেটমারের হাত ধরে ফেললেন, 'কী ব্যাপার? এটা কী হচ্ছে?' শরৎচন্দ্রের ধমকের জবাবে পকেটমার বলে উঠল, 'স্যার ক'টা বাজে আপনার ঘড়িতে, তাই দেখতে যাচ্ছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র পকেটমারের পিঠে একটা দুম করে ঘুষি মেরে বললেন, 'একটা।'

ঘুষি খেয়ে একটু দম নিয়ে পকেটমার বলল, 'খুব বেঁচে গেলাম স্যার।' শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানে?' 'মানে আর কী স্যার?' পকেটমার বলল, 'বারোটা বাজলে শেষ হয়ে যেতাম যে।'

অতঃপর দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র, যাঁকে বলা হত শরৎ পণ্ডিত। শরৎ পণ্ডিতের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মধুর রসিকতার সম্পর্ক ছিল। তখন শরৎ পণ্ডিত 'বিদূষক' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। এদিকে, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে চারদিকে শোরগোল তুলেছে।

এই সময়ে একদিন এক সাহিত্যবাসরে দুই শরৎচন্দ্রে দেখা। দাদাঠাকুরকে আসতে দেখে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নাকি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, 'এসো, এসো হে, বিদূষক শরৎচন্দ্র।'

দাদাঠাকুরও সহজে ছেড়ে কথা বলার লোক নন। তিনিও নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'কেমন আছো, চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র।'

এই গল্পটি বহুশ্রুত, বহুস্মৃত। কিন্তু কেমন অবিশ্বাস্য, বোধহয় সত্যি নয়। সত্যি না হলেও, বিশেষ কিছু আসে যায় না। এবং শরৎ পণ্ডিত মানে দাদাঠাকুরের নিজের সম্পর্কে একটি বিশ্বাসযোগ্য কথা স্মরণ করি।

দাদাঠাকুরকে কে একজন নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার উপাধি পণ্ডিত হল কী করে?' তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমি পণ্ডিত নই তো তবে পণ্ডিত কে? আমি পণ্ড থেকে পণ্ডিত। যখন কোনও কিছু খণ্ড খণ্ড করা হয় তখন সেটা হয় খণ্ডিত, ঠিক সেইরকম আমি যখন যেখানে যাই সেখানে সব পণ্ড হয়ে যায়। আর, সেই সুবাদেই আমি হলাম পণ্ডিত, শরৎ পণ্ডিত।'

অবশেষে নবদ্বীপধাম একটি বিখ্যাত প্রাচীন রসিকতার কাহিনী স্মরণ করি। এটিও প্রায় অবিশ্বাস্য।

বহুযুগ ধরে নবদ্বীপধামে ছিল বাংলার সংস্কৃতির রাজধানী। পাণ্ডিত্য ও রসবোধ নবদ্বীপের ঘরে ঘরে।

নবদ্বীপের এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন। ব্রাহ্মণীর নাম পঞ্চাননদেবী। সেদিন খেতে বসে ভাতের থালার পাশে জল না দেখে পণ্ডিত বুঝলেন গৃহিণী জল দিতে ভুলে গেছেন। পণ্ডিত গৃহিণীকে সম্বোধন করে বললেন, 'পাঁচি, পঞ্চী, প্রপঞ্চি, পঞ্চাননী, বারি আনয়।'

ব্রাহ্মণী সুরসিকা, তিনি উত্তর দিলেন, 'আর্য, আচার্য, ভট্টাচার্য, শিরোধার্য, গঙ্গোদকম বা কূপোদকম (গঙ্গার জল না কুয়োর জল)?

মনের চিকিৎসা

চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোনও রসিকতা করা উচিত নয়। কিন্তু অনেকেই জানেন, বিশেষ করে আমার চিকিৎসকমহোদয়রা জানেন জীবনে কোনও নিষেধই আমি তেমন মানিনি। তা ছাড়া লোকে কি হাসে না, হাসপাতালের ঘরে, ডাক্তারের চেম্বারে, নার্সিংহোমের বারান্দায়? এমনকী শ্মশানের শবযাত্রীরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পরিহাস করে কখনও কখনও হো হো করে হেসে ওঠে। শ্মশানের ধোঁয়া-ভরা আমিষ-গন্ধ বাতাসে সেই হাসি বেমানান হলেও বিরল বা অস্বাভাবিক নয়।

চিকিৎসাসংক্রান্ত হাসির আখ্যানগুলির একটি বড় অংশ মানসিক চিকিৎসক নিয়ে।

এই সূত্রে প্রথম যে গল্পটি মনে পড়ছে সেটি এসেছে সরাসরি উন্মাদ আশ্রমের অভ্যন্তর থেকে। হাসপাতালের সুপারসাহেব একদিন পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে দেখলেন যে তাঁর এক আবাসিক খুব মন দিয়ে কী যেন লিখছেন। তিনি আবাসিককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী লিখছেন?' সদ্য-আবাসিক সেই মানসিক রোগী লেখা থেকে বিরত না হয়ে, মাথা না-তুলে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'এই একটা চিঠি লিখছি।'

এর পরে কিছু না বললে খারাপ দেখায় তাই নেহাত সৌজন্যবশত সুপারসাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কাকে লিখছেন?'

এইবার রোগী মুখ তুলে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'চিঠিটা আমাকেই লিখছি। আমার তো আমি ছাড়া কেউ নেই।'

সুপারসাহেবের মতো পোড়খাওয়া লোক, তিনিও এ রকম দার্শনিক বক্তব্য জীবনে শোনেননি। একটু অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেকে নিজে চিঠি লিখছেন?'

পাগলবাবু অমায়িক হেসে বললেন, 'ঠিক তাই।'

তখনই সুপারসাহেব বাধ্য হয়ে বললেন, 'তা হলে আপনি নিজেকে কী লিখলেন।'

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন পাগলবাবু, 'চিঠিটা আগে আমার কাছে আসুক, পড়ে দেখি, তা হলেই তো বলতে পারব চিঠিতে কী লেখা আছে।'

পাগলবাবু চিঠিটা পান, ইতিমধ্যে আমরা অন্য গল্পে ঘুরে আসি। গল্পটি মর্মস্পর্শী।

মনের ডাক্তারবাবুর কাছে এক রোগী এসেছেন, রোগী ভদ্রলোকটি বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে, ফিটফাট, ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। যথারীতি ডাক্তারবাবু রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অসুবিধাটা কী?' রোগী করুণ কণ্ঠে জানালেন, 'আর বলবেন না স্যার, আমার কাজকর্ম মাথায় উঠেছে, উপার্জন বন্ধ হতে চলেছে।'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'কেন, কী হয়েছে আপনার?' রোগী বললেন, 'আজ কিছু দিন হল কী হয়েছে না লোকজন, ভিড়ভাট্টা দেখলে আমার মাথা রিমঝিম করে, বুক দুরদুর করে, হাত পা অবশ হয়ে আসে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'তাতে কী আসে যায়? যাবেন না ভিড়ের মধ্যে। লোকজন হই-হট্টগোল এড়িয়ে চলবেন।' ডাক্তারবাবুর পরামর্শ শুনে রোগী ডুকরিয়ে উঠলেন, 'তা হলে যে সর্বনাশ হবে, আমি ধনে-প্রাণে মারা পড়ব। আমার কারবার মাথায় উঠবে।' রোগীর এই কাতরোক্তি শুনে ডাক্তারবাবু স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু কী কারবার আপনার তা তো বললেন না।' রোগী এবার কবুল করলেন, 'স্যার, আমি একজন পকেটমার।'

অন্য এক মানসিক রোগী ডাক্তারকে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, সব সময়ে কেমন অবসন্ন বোধ করি, কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। আমার মনে হয় আমার এমন কিছু দরকার যাতে আমার চনমনে ভাবটা ফিরে আসে। আমার সেই লড়াকু ভাব, যাতে যা কিছু সহ্য হয় না, যা কিছু অপছন্দ করি তা দেখলে রেগে উঠতে পারি, খেপে যেতে পারি। আমাকে এমন একটা ওষুধ দিন যাতে আমি উত্তেজিত হতে পারি।'

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে আপনার কোনও ওষুধ লাগবে না, চিকিৎসাও নয়।' এই কথা শুনে রোগী কিছুক্ষণ ধরে ঝিম মেরে বসে থেকে তারপর মিনমিন করে বললেন, 'তা হলে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার কোনও ওষুধ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। আপনি যা যা চাইছেন তার জন্যে আমার বিলই যথেষ্ট।' এই বলে ডাক্তারবাবু ড্রয়ার খুলে বার করে নিজের বিলটার নীচে সই দিয়ে রোগীকে বললেন, 'আমার বিলটা দেখুন। এই বিলটা দেখলেই আপনার ঝিমঝিম ভাব কেটে যাবে। মাথায় রক্ত উঠে যাবে। সারা শরীর চনমনে হয়ে উঠবে। আপনি রেগে উঠবেন, খেপে যাবেন, উত্তেজিত হবেন। আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া লড়াকু ভাবটা ফিরে আসবে।' তারপর বিলটা রোগীর হাতে তুলে দিয়ে নরমভাবে বললেন, 'কিন্তু তার আগে অবশ্যই আমার বিলটা মিটিয়ে দেবেন।'

অতঃপর একটি কথোপকথন দিয়ে সাঙ্গ করি। অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার ওপরে একটি সেমিনার শুনতে গেছেন অনিদ্রার রোগী। বিখ্যাত এক মনোচিকিৎসক ইনসোমনিয়ার বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতান্তে রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে এই কথোপকথন:

রোগী: ডাক্তারবাবু আপনার বক্তৃতা শুনে আমার খুব উপকার হল।

ডাক্তারবাবু: আমার বক্তৃতা আপনার ভাল লেগেছে?

রোগী: না, ঠিক তা নয়। আসলে আপনার বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেকদিন পরে বেশ ভাল ঘুম হল।

কান্তকবি

'স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।
মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগিরে।'...

সেই রজনীকান্ত সেন। যিনি সেই বঙ্গভঙ্গের বছরে, উনিশশো পাঁচ সালে, গান বেঁধেছিলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'। রাজশাহির পল্লীকবি বাংলার জাতীয় কবি হয়েছিলেন।

রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছিলেন। পাবনা জেলায় বাড়ি, ওকালতি করতেন রাজশাহিতে। মেধাবী ছাত্র ছিলেন, সাঁতারে ব্যায়ামে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অসামান্য

সংগীতস্রষ্টা, সুরকার, গায়ক রজনীকান্ত এখনও রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের সঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু এই 'শেষমেশ' রচনামালায় আমরা তাঁকে এতকাল পরে স্মরণ করছি তাঁর কৌতুকবোধের জন্যে। মধ্যযৌবনে, তাঁর প্রতিভা সূর্য যখন মধ্যগগনে তখনই তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে দেহত্যাগ করেন। তবু তাঁর গানের মতোই কৌতুককুসুমগুলি বাঙালির মানস-সলিলে এখনও ভাসমান।

সে আমলে অনেকেই নানা কারণে, বিশেষত পুত্রার্থে একাধিকবার বিবাহ করতেন। আইনের বাধা ছিল না, সামাজিক বিধিনিষেধও ছিল না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ সমাজের চোখে গর্হিত অপরাধ ছিল না।

এক বন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে রজনীকান্ত বরযাত্রী গিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে কিন্তু প্রথমা স্ত্রী বর্তমান অবস্থাতেই। বিয়ের পর বর-বউ নিয়ে ফেরার পথে নতুন বউয়ের জ্বর এল।

সে ছিল গভীর জ্বরের যুগ। কালাজ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, সান্নিপাতিক, পিলেজ্বর, তিলেজ্বর। বাঙালি সারা বছর ধরে জ্বরে ভুগত।

রজনীকান্তের বন্ধু নববধূর সঙ্গে সামনে নৌকায় ছিলেন। সেকালে বঙ্গজীবনের অঙ্গ ছিল থার্মোমিটার। নববধূর দেহতাপ থার্মোমিটারে মেপে উদ্বিগ্ন চিত্তে সামনের নৌকো থেকে বর পিছনের নৌকোয় বরযাত্রী রজনীকান্তকে বললেন, 'নতুন বউয়ের খুব জ্বর।'

রজনীকান্ত জানতে চাইলেন, 'কত জ্বর?'

বন্ধুবর বললেন, 'থার্মোমিটারে দেখছি একশো তিন।'

রজনীকান্ত বললেন, 'আগেও এক সতীন। এখনও একশো তিন।'

রজনীকান্ত ওকালতি করতেন রাজশাহি আদালতে।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিংবা নিজের জীবিকা বিষয়ে তাঁর কোনও মোহবোধ ছিল না।

এই প্রসঙ্গে রাজশাহি আদালতের বার লাইব্রেরিতে কথিত রজনীকান্তের অনেক গল্পই আজও স্মরণীয়। সংক্ষেপে দুয়েকটি গল্প বলি।

এক গ্রাম্য ব্যক্তি দুটো গোরু নিয়ে যাচ্ছে। একটি গোরু হৃষ্টপুষ্ট অন্যটি ক্ষীণ। সেই একই রাস্তা দিয়ে জনৈক ব্যবহারজীবী যাচ্ছিলেন। তিনি চাষিকে বললেন, 'ওহে তোমার একটা গোরু এত মোটা আর অন্যটা দেখছি খুবই রোগা। তুমি ভাল করে ওটাকে খেতে দাও না কেন?' সেই শুনে চাষি বলল, 'না উকিলবাবু, তা নয়। আসলে আমার ওই যে মোটা ষাঁড়টা দেখছেন ওটা হল উকিল। আর, ওই রোগা ষাঁড়টা হল মক্কেল। বুঝলেন তো উকিলবাবু।'

উকিল-মক্কেল বিষয়ে রজনীকান্তের আর একটি অসামান্য কাহিনী; এই গল্পটি কথোপকথনের আকারে না লিখলে হবে না:—

উকিলবাবু: বিয়ের সময় তোমার বয়েস কত ছিল?

মক্কেল: আজ্ঞে, সতেরো বছর।

উকিলবাবু: তখন তোমার স্ত্রীর বয়েস কত ছিল?

মক্কেল: আজ্ঞে, তেরো বছর।

উকিলবাবু: এখন তোমার বয়স কত?

মক্কেল: আজ্ঞে, তিরিশ বছর।

উকিলবাবু: এখন তোমার স্ত্রীর বয়েস কত?

মক্কেল: আজ্ঞে, সে প্রায় ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ অন্তত হবে।

উকিলবাবু: সে কী হে? তোমার বউয়ের বয়স হঠাৎ বেশি হয়ে গেল কেমন করে?

মক্কেল: হুজুর, ওই কথাটাই যে কোনও ভদ্রলোককে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। মেয়েমানুষের বাড় যে বড় বেশি।

সত্যিই এই কথোপকথনের কোনও তুলনা নেই। যে কোনও নাটকের যে কোনও দৃশ্যে এই কথোপকথনটা থাকলে শুধু এই বাক্যালাপের জোরেই সেই নাটকটি উতরিয়ে যাবে। উকিল রজনীকান্তের পরে অবশেষে কবি রজনীকান্তের কাছে যাই।

কবি রজনীকান্তের একটি কাহিনী বলি। সেটিও চমৎকার।

সে বছর রজনীকান্তের 'অমৃত' নামে কবিতার বই, নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে একদিন সেকালের কবি রসময় লাহা কান্তকবির সমীপে এলেন, সেকালের পক্ষে রসময়বাবু খুবই আধুনিক, তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'ছাইভস্ম', তিনি সেই কবিতার বইটি রজনীকান্তকে উপহার দিলেন।

অতঃপর কান্তকবি তাঁর 'অমৃত' কাব্যগ্রন্থটি লাহাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'ছাইভস্ম দিয়ে অমৃত নিয়ে যান।'

জ্যোতিষী

একযুগ আগে, সেই কাণ্ডজ্ঞানের আমলে কিছু না বুঝে সরলভাবে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ বিষয়ে হালকা কথা লিখে ঘোরতর বিপদে পড়েছিলাম।

সেই রাজার কথা কি মনে আছে, যাঁর গল্প কোথা থেকে টুকে যেন লিখেছিলাম। গল্পটা তেমন বড় নয়, যাঁরা আগে পড়েননি, যাঁরা বোধহয় পড়েছিলেন কিন্তু এখন ভুলে গেছেন, তাঁদের সকলের জন্যে গল্পটা আরেকবার বলা চলে।

এক যে ছিল রাজা। রাজা চমৎকার রাজত্ব করছিলেন মনের সুখে, আনন্দ মনে। সকালে রাজসভা, পাত্র-মিত্র, অমাত্য, নর্তকী। দুপুরে ভুরিভোজন ও দিবানিদ্রা। সন্ধ্যায় বয়স্য ও মোসাহেবদের সঙ্গে প্রাণ ভরে সুরাপান এবং সেই সঙ্গে নাচগান।

এর মধ্যে একদিন সকালবেলায় রাজসভায় এক জ্যোতিষী এসে উপস্থিত। গণকঠাকুরের কাঁধে নামাবলি, কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় জবাফুল বাঁধা টিকি, হাতে লাল খেরোয় বাঁধানো গণনার খাতা, পায়ে কাঠের খড়ম। রাজসভার সকলেই তাঁকে দেখে রীতিমতো অভিভূত হয়ে গেল। জ্যোতিষঠাকুরকে সবাই খুব সমীহ-সম্ভ্রম করতে লাগল।

মুখে মুখে রটে গেল যে ইনি ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী। মানুষের হাত দেখে তার ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান ঝরঝর করে বলে দিতে পারেন। অতীত বা বর্তমানের কথা না হয় বলেই দেওয়া গেল, গণকঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

বলা বাহুল্য, রাজামশায়ের হাতও জ্যোতিষঠাকুর দেখলেন। লাল খেরোর খাতা খুলে অনেক আঁকিবুঁকি, কাটাকুটি করলেন। ক্রমশ জ্যোতিষঠাকুরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, তাঁকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাল।

উৎকণ্ঠিত রাজামশায় জানতে চাইলেন, 'কী হল, গণকঠাকুর মশায়? কোনও খারাপ কিছু দেখলেন নাকি? কোনও দুর্ভাবনার কারণ আছে?'

'আর খারাপ! আর দুর্ভাবনা!' সজোরে নিজের কপাল চাপড়ালেন গণকঠাকুর, তারপর একেবারে ডুকরে উঠলেন, 'সর্বনাশ শিয়রে এসে পড়েছে। যাকে বলে সেই শিরে সংক্রান্তি।'

এর পরে শুধু রাজামশায় কেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য, সভাসদ সবাই হাহাকার করে উঠলেন, সকলের মুখেই শুধু এক প্রশ্ন, 'হাতে কী দেখলেন, কী এত মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে।'

সবাইকে থামিয়ে দিয়ে গণঠাকুর বললেন, 'রাজামশায়ের ভয়ংকর শনির দশা চলছে। একটা কিছু প্রতিবিধান না করলে, অবিলম্বে কোনও ব্যবস্থা না নিলে, কয়েকদিনের মধ্যে রাজামশায়ের মৃত্যু অনিবার্য।'

এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে রাজসভার সকলের মুখ সাদা হয়ে গেল। রাজামশায় নিজে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। শুধু তরুণ সেনাপতির মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল, এই একটু আগেই রাজামশায় চমৎকার সুস্থ, সতেজ, হাসিখুশি ছিলেন আর এই গণক খেরোর খাতা খুলে কী না কী হিসেব করল, রাজামশায় তাতেই এত ঘাবড়িয়ে গেলেন!

তরুণ সেনাপতি গণকঠাকুরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা গণকঠাকুর, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার বিচার সঠিক, আপনার গণনা নির্ভুল?'

এই প্রশ্ন শুনে গণকঠাকুর হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, 'সেনাপতিমশায়, আপনার বয়েস কম, আপনি অনভিজ্ঞ, তাই জানেন না জ্যোতিষ গণনা কখনওই ভুল হয় না। আমি যা বলছি, তা অভ্রান্ত।'

সেনাপতি তখন জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি নিজের ভাগ্য কখনও গণনা করেছেন?' জ্যোতিষী প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'অবশ্যই।'

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি হিসেব করে দেখেছেন আপনার পরমায়ু আর কত দিন?'

জ্যোতিষী বললেন, 'সে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। আপনার চেয়ে বেশি বাঁচব।'

জ্যোতিষীর কথা শোনামাত্র সেনাপতি তাঁর কোমরের খাপ থেকে তীক্ষ্ণ তরবারি বের করে এক কোপে জ্যোতিষীর গলা কেটে ফেললেন। রাজসভার গালিচায় ধড় থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। বীভৎস রক্তারক্তি কাণ্ড, স্তম্ভিত রাজা বললেন, 'সর্বনাশ! এটা কী হল। আমার ব্রহ্মহত্যা হল।'

সেনাপতি বললেন, 'হুজুর, আমাকে ক্ষমা করবেন। জ্যোতিষঠাকুর বলেছিলেন, আপনার আয়ু আর নেই। আর তাঁর নিজের পরমায়ু আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। দেখলেন তো তাঁর আয়ু এক মুহূর্তও ছিল না। যিনি নিজের আয়ু জানেন না, তিনি অন্যের ভাগ্য, অন্যের আয়ু কী করে বিচার করেন?'

জ্যোতিষীর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ সভাসদেরা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেলেন। রক্তমাখা গালিচাটা ফেলে দিতে হল।

রাজামশায়ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন।

আবার জ্যোতিষী

শাস্ত্রে মূকের কথা বলার এবং পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের কথা আছে। কিন্তু সেখানে অন্ধ বা দৃষ্টিহীনের দেখার কথা কিছু নেই।

সম্প্রতি একটি পত্রিকায় রবিবাসরীয় গ্রহরত্নের, জ্যোতিষের এলাকায় একটি বিজ্ঞাপন দেখে চমকিত হলাম। এক জন্মান্ধ হাত দেখছেন এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান হুবহু মিলিয়ে দিচ্ছেন।

খবরের কাগজে আরও একটা খবর পড়লাম। হাসির বিষয় নয়, ভয়াবহ খবর। কুচবিহারের মদনমোহনের বিগ্রহ চুরি করার ব্যাপারে মূর্তিচোরদের সাহায্য করার জন্য যে কয়জন সরকারি কর্মচারী ধরা পড়েছেন এবং বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের একজনের ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটে গেছে জ্যোতিষের কল্যাণে।

ছাপোষা কর্মচারী নিজের ভাগ্যগণনা করতে গিয়েছিলেন। খুবই উপযুক্ত স্থানে গিয়েছিলেন, তাঁরই বিভাগীয় ওপরওয়ালা স্বয়ং হাত দেখেন, ছক বিচার করেন। অনেক দেখে-শুনে গণকঠাকুর অভিমত দিয়েছিলেন, কর্মচারীটির আশু ভবিষ্যৎ খুবই বিপজ্জনক এবং গ্রহশান্তি করা ছাড়া পরিত্রাণ নেই। এই গ্রহশান্তির জন্য অতি অবশ্য অবিলম্বে একটি মূল্যবান প্রস্তর ধারণ করতে হবে যার ব্যয় অন্তত পনেরো-বিশ হাজার টাকা।

মূর্তিচোরদের কাছে ঘুষ পাওয়া সোনা বেচে ওই কর্মচারীটি হাজার বারো টাকা পেয়েছিলেন, আর কয়েকহাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই, প্রস্তর ধারণ করলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হল না। একেই বলে বিধির বিড়ম্বনা।

গ্রেপ্তারির পরে কর্মচারীটির বোন সাশ্রুনয়নে বলেছেন, 'আমার দাদা কখনওই ঘুষ খেত না। কখনওই এ রকম ছিল না। ওই হাত দেখাতে, ভবিষ্যৎ জানতে গিয়ে এই বিপদে পড়ল।'

খুব দুঃখের ব্যাপার হলেও সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়াটি এই সূত্রে মনে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেই কতকাল আগে ও পাড়ার নন্দখুড়ো আমাদের নন্দ গোঁসাইয়ের কথা লিখেছিলেন সুকুমার রায়।

ভালই ছিলেন নন্দখুড়ো, হুঁকো হাতে হাস্যমুখে। অমায়িক শান্ত বুড়ো, অসুখ-বিসুখ ছিল না। হঠাৎ কী হল, হাত দেখাতে গেলেন, ফিরে এলেন ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে। খুড়োকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কী হয়েছে নন্দ গোঁসাই? কাঁদছ কেন?'...

...খুড়ো বলে, বলব কি আর,
হাতে আমার স্পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি,
ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা
ফিরছি কত গ্রহের ফেরে
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে
তখন আমায় রাখবে কে রে?

সংবাদপত্র দিয়েই যখন শুরু করেছি, আরেকবার সেখানে ফিরে যাই। কয়েক সপ্তাহ আগে সংবাদপত্রে পড়লাম কলকাতায় 'জ্যোতিষ সম্মেলন' হচ্ছে। সেখানে যুক্তিবাদীরা কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে গিয়ে সম্মেলনের সংগঠকদের হাতে প্রহৃত হলেন। অনেকগুলো পত্রিকায় সম্মেলনের বিবরণ এবং গোলমালের বর্ণনা শুনে মনে হল সংগঠকেরা আগে থেকেই আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

পরে জানা গেছে যে, ওই সম্মেলনের উদ্যোক্তা জ্যোতিষীরা আগে থেকেই গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে জানতে পেরেছিলেন যে সম্মেলনে গোলমাল হবে এবং সেই জন্য তাঁরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

যাঁরা খবরের কাগজে এই সংবাদটি পাঠ করেছেন, জ্যোতিষ গণনার এ জাতীয় উৎকর্ষে নিশ্চয়ই তাঁরা যথেষ্টই চমকিত হয়েছেন। তবে এই পৃথিবীতে মন্দ লোকের অভাব নেই। তাঁরা সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখেন, সব কিছুতেই কটাক্ষ করেন।

সংবাদপত্রে এই খবর পাঠ করে জনৈক পাঠক একটি প্রশ্ন তুলেছেন। জ্যোতিষঠাকুরেরা শুধু শুধু যুক্তিবাদীদের মারধর করতে গেলেন। তাঁরা তো অনায়াসেই শনি কিংবা রাহু লেলিয়ে দিতে পারতেন যুক্তিবাদীদের ওপর। শনির কোপে, রাহুর দোষে যুক্তিবাদীরা ছারখার হয়ে যেতেন। অন্যথায় সরাসরি করতে পারতেন শত্রুনিধন যজ্ঞ, এ দাওয়াই অব্যর্থ, 'মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে শত্রু পরাস্ত হইয়া থাকে।' পঞ্জিকায় দেখেছি, খরচও খুব বেশি নয়, 'মাত্র নয়শত নিরানব্বই টাকা।' তবে বিশেষ জরুরি হলে কিংবা শত্রু মহাপরাক্রমী হলে এই সঙ্গে 'বগলামুখী কবচ' ধারণ করলে ফল আরও জোরদার হত। বগলামুখী কবচের খরচও খুব বেশি নয়, মাত্র এক হাজার একশো এগারো টাকা।

পুনশ্চ:

আপনি জ্যোতিষ শিখতে চান?

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রথম পাঠ আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি নিতান্ত বিনামূল্যে। অবশ্য শিক্ষান্তে সন্তুষ্ট হলে আপনি আমাকে যে কোনও উপঢৌকন পাঠালে আমি আপত্তি করব না। তবে দয়া করে মন্ত্রপূত আংটি, কবচ বা মাদুলি পাঠাবেন না যেন, এসবে আমার বড় ভয়।

এবার জ্যোতিষের প্রথম পাঠ। যে কোনও ব্যক্তির হাত দেখুন।

দেখে তাঁকে বলুন, 'আপনার শত্রুদের মধ্যে একজন আছেন, যাঁর নামের আদ্যক্ষর ইংরেজি (S),' দেখবেন তিনি কেমন অভিভূত হন। কারণ বাঙালির শত্রুর অভাব নেই এবং অসংখ্য লোকের নামের আদ্যক্ষর এস। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই। মিলবেই মিলবে।

পথের ভিখিরি

কথায় বলে 'লোকটা একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে।' সাধারণত এ রকম কথা বলা হয় যার সম্বন্ধে সে রেস বা জুয়া খেলে, কিংবা শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি করে অথবা নিতান্ত ভাগ্যবিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তবে ভাষাটা ঠিক সমবেদনার নয়। পথের ভিখিরি ভিখিরিদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জাতের।

পথের ভিখিরি নিয়ে গল্পের আদিঅন্ত নেই। এর মধ্যে অনেক কাহিনীই বহুশ্রুত। সুতরাং একটি অতি সম্প্রতি শোনা গল্প দিয়েই আরম্ভ করা উচিত হবে।

রাস্তার মোড়ে যথারীতি জনৈক ভিক্ষুক পথচারীদের কাছে পয়সা চাইছিল। তবে নিতান্ত পয়সা নয়, সে পুরো একটা টাকা চাইছিল পাউরুটি কিনে খাবার জন্যে। এক ভদ্রলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেদিন কোনও কারণে তিনি খুব দিলদরিয়া হয়ে পড়েছিলেন। ভিখিরিটির প্রসারিত করতলে তিনি পকেট থেকে প্রথমে একটা এক টাকার কয়েন, তার পরে আরেকটা এক টাকার কয়েন, মোট দু' টাকা বার করে দিলেন। টাকা দুটো গ্রহণ করে ভিখিরিটি বলল, 'স্যার, আর একটা আধুলি যদি দিতেন।' ভদ্রলোক থমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন, দু' টাকায় পাউরুটি হবে না? তুমি তো এতক্ষণ এক টাকা চাইছিলে পাউরুটি কেনার জন্যে।' ভিখিরিটি করুণ মুখে বলল, 'স্যার পাউরুটি নয়, আড়াই টাকা পেলে একটা কেক কিনে খেতাম।' দাতা ভদ্রলোক অবাক হলেন, 'পাউরুটি চলবে না, কেক খেতে হবে?' ভিখিরি সবিনয়ে বলল, 'আজ একটা কেক খেতে পারলে ভাল হত স্যার, আজ আমার জন্মদিন কিনা।'

এই দুঃখজনক কাহিনীর পরে যতই পুরনো হোক দু'-তিনটে হাসির গল্প বলা প্রয়োজন।

সেই ভিখিরির কথা তো সকলেই জানেন যে আগে রাস্তায় একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে বসত, তাকে একদিন দেখা গেল সে দু'পাশে দুটো থালা নিয়ে বসেছে। তাকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কী হে, এতদিন একটা থালা ছিল, এখন দুটো থালা হল কী জন্যে?' বুদ্ধিমান ভিখিরি একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল, 'একটা ব্রাঞ্চ অফিস খুললাম স্যার।'

কিন্তু গরিব দীনদুঃখী ভিখিরিকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সত্যিই কি কোনও মানে হয়?

এক কৃপণ ভদ্রলোকের কাছে এক অন্ধ ভিখিরি পঞ্চাশ পয়সা প্রার্থনা করে। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে ভিখিরিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিন্তু তুমি কি পুরোপুরি অন্ধ?' ভিখিরিটিকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার একটা চোখ খারাপ বটে কিন্তু আরেকটা চোখে বেশ দেখতে পাও।' ভিখিরি বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই ঠিক বড়বাবু, আপনি আমাকে তা হলে দুটো চোখের জন্য পঞ্চাশ পয়সা না দিয়ে একটা চোখের জন্য পঁচিশ পয়সাই দিন।'

অন্ধ ভিখিরির সমস্যার শেষ নেই। এক খঞ্জ ভিখিরির থালায় একটা সিকি দিয়ে দয়ালু মহিলা বলেছিলেন, 'বাবা, তবু ভাল তুমি খোঁড়া, অন্ধ নও। তুমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছ।' ভিখিরিটি বলেছিল, 'সত্যি বলেছেন মা, অন্ধ হলে বড় অসুবিধে হয়। অন্ধ হয়ে দেখেছি লোকে বড় বেশি অচল পয়সা দেয়।'

এর চেয়ে মারাত্মক অন্য এক ভিখিরি ও তার ভাইয়ের গল্প। গল্পটি শুধু মিথ্যে নয়, অবিশ্বাস্য।

দুই ভাই একই রাস্তার দুই দিকে দুই মোড়ে ভিক্ষা করে। এক ভাই বোবা ভিখিরি, অন্য ভাই অন্ধ ভিখিরি। এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে সেখানে দণ্ডায়মান অন্ধ ভিখিরির থালায় প্রতিদিন নিয়ম করে একটা দশ পয়সা দিতেন। সেদিন এসে দেখেন, মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরিটি নেই। তার জায়গায় অন্য একজন ভিক্ষুক থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে এই নতুন ভিক্ষুকের কাছে ওই ভদ্রলোক জানতে চাইলেন 'এখানে যে অন্ধ ভিখিরিটি নিয়মিত দাঁড়ায় সে গেল কোথায়?' নতুন ভিখিরিটি অম্লানবদনে জবাব দিল, 'বাবু ওই অন্ধ ভিখিরিটি আমার ভাই। ও আজকে একটু সিনেমা দেখতে গেছে, ওই সামনের হলটায়। তাই আমি ওর জায়গায় ভিক্ষে করছি।'

দয়ালু ভদ্রলোক অন্ধ ভিখিরি সিনেমা দেখতে গেছে জেনে হতভম্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর বিস্মিত হওয়ার তখনও বাকি ছিল, কারণ নতুন ভিখিরিটি এর পরে আরেকটি প্রসঙ্গ যোগ করল, সে মধুর হেসে বলল, 'আমি হলাম গিয়ে ওর দাদা, ওই সামনের মোড়ের বোবা ভিখিরি। আজ ও না থাকায় এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।'

এর পরে পথের ভিখিরির কাহিনী আর বাড়াব না। শুধু অল্প কিছুদিন আগে আমারই বলা একটা খুচরো গল্প নিতান্ত কারণে পুনর্বার স্মরণ করছি।

পথের ভিখিরি অনেকসময় অনেক ভদ্রলোক হয়ে থাকে। কেউ পকেটমার হয়েছে বলে ব্যারাকপুর যাওয়ার ট্রেন ভাড়া প্রার্থনা করে, কেউ মুমূর্ষু রোগীর জন্যে ওষুধ কিনতে বেরিয়ে টাকা হারিয়ে প্রেসক্রিপশন হাতে ভিক্ষে করে, কেউ বা তেউনি জড়িয়ে গুরুদশায় সাহায্য চায়। এই রকম এক ভদ্রলোককে রাস্তায় ভিক্ষে করতে দেখে এক পথচারী তাঁকে চিনে ফেলেন এবং প্রশ্ন করেন, 'আপনি ভিক্ষে করছেন? আপনি সেই 'অর্থ উপার্জনের সহস্র পন্থা' গ্রন্থের লেখক নন?' ভদ্র ভিক্ষুক গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সহস্র পন্থার মধ্যে এটাও একটা পন্থা।'

গুরু-শিষ্য সংবাদ

এবারের আলোচনা লেখাপড়া, পড়াশুনা নিয়ে।

অবশ্য এসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাপারে আমার মাথা না-গলানোই উচিত। লেখাপড়া, পড়াশুনা আমার বিশেষ কিছু নেই। আমার বিদ্যের দৌড় আমার ক্লান্ত পাঠকদের অজানা নয়, সেটা লুকোনো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবে ওই লেখাপড়ার লেখাটা কিছুটা অভ্যাসবশত, কিছুটা অর্থলোভে একটু আধটু এখনও করে যাচ্ছি। সেসব লেখা পাঠ করে অনেকেই যে হাস্য সংবরণ করতে পারেন না, সে সংবাদও আমার জানা আছে। আমার সম্পাদকেরাও জানেন, তাই মাঝে মধ্যে আমার তত্ত্বতালাশ করেন।

সেসব কথা এখন থাকুক। সেসব দুঃখের কথা বলতে গেলে সাতকাহন, ফুরবার নয়। যে জন্যে আমার লেখা, সেই হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতা তা হলে জমবে না।

আমরা সরাসরি লেখাপড়ার আলোচনায় যাচ্ছি। লেখাপড়া মানে ছাত্র-মাস্টারমশায়, গুরু-শিষ্যের কথা।

লেখাপড়ার গল্প প্রথমে একটা ইস্কুল দিয়ে শুরু করি। একটি ইস্কুলের ছাত্র তার মাস্টারমশায়কে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, 'স্যার স্কুল আমার একদম ভাল লাগে না। অথচ ভেবে দেখুন অন্তত ষোলো বছর বয়েস পর্যন্ত এই স্কুলে আমাকে থাকতে হবে।'

মাস্টারমশায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'একবার ভেবে দ্যাখো আমার কথা। আমারও তো স্কুলটা একদম ভাল লাগে না, অসহ্য লাগে। অথচ আমাকে এখানে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়েস পর্যন্ত থাকতে হবে।'

এই গল্পেরই একটা রকমফের আছে। এ গল্পটা শৈবালের গল্প।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শৈবাল বলল, 'মা, আমি ইস্কুলে যাব না।'

বলা বাহুল্য শৈবাল এ রকম মাঝেমাঝেই করে।

শৈবালের মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কেন যাবে না?'

শৈবাল বিরক্তিভরা গলায় বলল, 'কেন আবার কী? আমার ইস্কুলে যেতে ভাল লাগে না।'

শৈবালের মা আবার শীতল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ভাল লাগে না?'

শৈবাল বলল, 'ইস্কুলের ছেলেরা আমাকে একদম পছন্দ করে না। ইস্কুলের মাস্টারমশায়রাও আমাকে পছন্দ করেন না। দারোয়ান, বেয়ারা দপ্তরি কেউ আমাকে দেখতে পারে না। আমি ইস্কুলে কিছুতেই যাব না।'

এতক্ষণে শৈবালের মা বললেন, 'না তা হতে পারে না। শৈবাল এসব তোমার মনগড়া কথা। তা ছাড়া তুমি তো বাচ্চা ছেলে নও। তোমার চল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে। আর তুমি হলে ইস্কুলের হেডমাস্টার, তোমার না গেলে চলবে?'

ইস্কুল বিষয়ক এ রকম দুটো গোলমেলে গল্প লেখার পর একটু তত্ত্বকথা বলি।

ভিক্টর হুগো বলেছিলেন, 'একটা ইস্কুল খোলা মানে হল একটা জেলখানা বন্ধ করে দেয়া।'

কথাটার অর্থ সুদূর প্রসারী। লেখাপড়া শিখলে মানুষ দুষ্কর্ম করবে না, অপরাধ করবে না ফলে তাকে জেলে যেতে হবে না।

তবে আজকাল যখন দেখি লেখাপড়া করা, বিদ্বান, শিক্ষিত ভদ্রলোক কত রকম অবর্ণনীয় অপরাধ করছে জাল জোচ্চুরি, ঘুষ, বধূহত্যা, ধর্ষণ তখন কেমন যেন খটকা লাগে।

একটা পুরনো কালের বিলিতি প্রবাদ বাক্য ছিল যে সব মানুষের প্রকৃতিই একরকম, শুধু লেখাপড়াই তাদের আলাদা করে তোলে, স্বতন্ত্র করে গড়ে।

এই সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে আর একটা কথাও মনে পড়ছে। মূল কথাটি কার জানি না, তবে আমরা আমাদের এক অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলাম। তিনি কিছুদিন আগে বিগত হয়েছেন। এই সূত্রে তাঁকে স্মরণ করে কিঞ্চিৎ স্মৃতি তর্পণ করছি।

কথাটা অবশ্য স্মরণযোগ্য।

অধ্যাপকমহোদয় বলেছিলেন, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য নয় বড় উকিল কিংবা ভাল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার অথবা বড় নেতা বানানো, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হল মানুষ বানানো, মানুষের মতো মানুষ বানানো।

এ সম্পর্কে শেষ আপ্তবাক্যটি লিখে তার আবার সরস কথিকায় প্রবেশ করব।

রাস্তাঘাটে বইয়ের ভারে ন্যুজ হয়ে, ক্লান্ত অক্ষম পায়ে শিশুর দল বিদ্যালয় থেকে যাতায়াত করছে। খাতা বইয়ের ঝোলা তাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, তাদের মুখে হাসি নেই, তাদের চলনেবলনে শিশুসুলভ চঞ্চলতা নেই।

দেখলে মায়া হয়। এদের অমল শৈশব কত দুঃখে, কত কষ্টে কাটছে।

আর কে লক্ষ্মণের একটা পুরানো কার্টুনের কথা মনে পড়ছে। একটা ছয়-সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে তাঁর বাবা হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে স্তম্ভিত হয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর হেডমাস্টার মশায় গম্ভীরভাবে সেই ভদ্রলোককে বলছেন, 'আপনার ছেলেকে ক্লাসে তোলা যাবে

না। এর প্রমোশন হবে না। ও ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, জীববিদ্যা এই সব বিষয়ে খুব খারাপ করেছে।

কিন্তু এতটুকু ছেলে এত সব শিখবে কী করে? আর শিখেই বা কী লাভ হবে? দু'দিনের মধ্যেই ভুলে যাবে, যেতে বাধ্য। তখন আবার নতুন করে শিখতে হবে।

এই সূত্রেই আমার শেষ আপ্তবাক্যটি।

একটা সরু গলা শিশির মধ্যে তাড়াতাড়ি যদি জল ভরার চেষ্টা করো, দেখতে পাবে জল ভেতরে প্রায় কিছুই যায়নি। প্রায় সবটাই উপচিয়ে পড়ে গেছে।

তেমনিই একটি শিশুকে জোর করে তাড়াতাড়ি অনেক কিছু গলাধঃকরণ করাতে যাও, দেখবে কিছুই সে খাচ্ছে না, খেতে পারছে না। জোর করে চাপানো সব খাদ্য উপচিয়ে বাইরে পড়ে যাচ্ছে, তার অন্তরে কিছু ঢুকছে না।

তবে শিক্ষা মানে শুধু বই পড়া নয়।

একটা আমেরিকান কাহিনী জানি। শিকাগো শহরের এক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রান্সিস ওয়েল্যান্ড পার্কার, সেই পার্কার সাহেবকে এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা স্যার, আমার বাচ্চার শিক্ষাদান আমি কবে থেকে শুরু করব?'

পার্কার প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বাচ্চা কবে জন্মাবে?'

মহিলা হেসে বললেন, 'জন্মাবে কী? তার তো এখন পাঁচ বছর বয়েস।'

পার্কার বললেন, 'তা হলে আর সময় নষ্ট করবেন না। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচটা বছর এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। বাচ্চার শিক্ষা শুরু করে দিন।'

শিক্ষা শুরু হল। এবার তবে ইস্কুলে যাই।

ইস্কুলের গল্প মানে পরীক্ষার গল্প। পরীক্ষার নম্বর নিয়ে গল্প।

এ বিষয়ে আমার নিজের একটা অতি পুরানো পচামার্কা গল্প আছে। গল্পটা আগে যাঁরা পড়েছেন, দয়া করে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

এই ভগ্নকাহিনী অন্যের পক্ষে যথেষ্টই হাসির, আমার পক্ষে খুবই দুঃখের।

জীবনের অন্যান্য পরীক্ষার মতোই স্কুলের পরীক্ষাতেও আমি কখনও কখনও শূন্য পেতাম। অঙ্কের খাতায় একসময় এটা বাঁধাধরা ব্যাপার হয়েছিল।

একবার ওইরকম শূন্য পেয়ে, যাকে ছোট বয়সে আমরা বলতাম গোল্লা, তাই পেয়ে বাড়ি এসে দেখি বাবা অগ্নিমূর্তি, কী করে ভাইদের কাছে আগেই জেনে গেছেন যে আমি জিরো পেয়েছি।

বাড়ি পৌঁছানো মাত্র বাবা আমাকে এই মারেন কি সেই মারেন। সেই যাত্রা আমার পরম স্নেহশীলা পিসিমা আমাকে রক্ষা করেন তাঁর একটি প্রবাদপ্রতিম উক্তির দ্বারা।

উক্তিটি হল, 'শুধু শুধু খোকাকে মারতে যাচ্ছ কেন? খোকা একেবারে কিছু যে পায়নি তাতো নয়, জিরো তো পেয়েছে।'

পরীক্ষায় জিরো পাওয়া নিয়ে অন্য একটা গল্প আছে। সেটা অবশ্য এত মজার নয়, তবু বলা যেতে পারে।

পরীক্ষার খাতায় গোল্লা পেয়ে একটি দুঃখিত ছাত্র অধ্যাপককে বলেছিল, 'কিন্তু স্যার, আমি তো কখনও ভাবতে পারি না যে আমি গোল্লা পাওয়ার উপযুক্ত।'

পরীক্ষক মহোদয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খাটো গলায় বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ জিরোর নীচে কিছু নেই বলে তোমাকে জিরোর থেকে কম দিতে পারলাম না।'

পরীক্ষার নম্বর নিয়ে আরও একটা গল্প মনে পড়ছে। সেটা অবশ্য ভালর দিকে।

টিউটোরিয়াল ক্লাসে অধ্যাপিকা পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে ছাত্রীকে বললেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল যে তোমাকে আশ মিটিয়ে নম্বর দিই।'

ছাত্রীটি খাতা নিয়ে দেখে যে সে পঁচাশি পেয়েছে। তখন সে খাতাটাকে দিদিমণির দিকে এগিয়ে

দিয়ে বলল, 'দিদিমণি আপনার আশা অপূর্ণ রাখবেন কেন, পঁচাশি যখন দিয়েছেন; আর মাত্র পনেরো দিয়ে পুরো একশোই করে দিন।'

একশো অবশ্যই কেউ কখনও পায় না। পায় না বলা ঠিক হচ্ছে না। এখন পায় কি না জানি না, আমাদের সময় পেত না। মাস্টারমশায়দের কে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছিল একশো দেয়া যাবে না। এক বা দুই কমিয়ে নিরানব্বুই বা আটানব্বুই দেয়া হত শতকরা একশোভাগ শুদ্ধ খাতায়। এই মানসিক দীনতার এই কৃষ্টি-কৃপণতার কী ব্যাখ্যা তা অবশ্য আমি জানি না।

এই প্রসঙ্গে সাড়ে তিন দশক আগে আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তাদের অভিজ্ঞতা একটু স্মরণ করি। আমার মনে হয়, আশঙ্কা হয় সে প্যাটার্ন এখনও বদলায়নি, এখনও রয়েছে। আমার বাপ-ঠাকুরদার আমলেও সেই একই প্যাটার্ন নাকি ছিল। কয়েকবছর আগে আমার ছেলের আমলেও সেই একই নম্বরদান প্রণালী দেখেছি।

বলা বাহুল্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। নতুন কালের অর্বাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা শূন্য, জিরো এবং গোল্লা।

অনার্স এবং এম এ দুটোই এখন আট পেপার, এক সময়ে যথাক্রমে ছয় ও আট পেপার ছিল।

সে যা হোক ছকটা পরিষ্কার।

প্রত্যেক পেপার বা পত্রে একশো নম্বর। প্রত্যেক পত্রের দুটো করে অংশ, তাকে বলা হয় হাফ, মানে প্রত্যেক পেপারে দুই হাফ। প্রত্যেক হাফে পাঁচটা করে প্রশ্ন, তার মধ্যে যে কোনও তিনটে উত্তর, দিতে হবে।

প্রত্যেক পেপারে একশো নম্বর অর্থাৎ হাতে পঞ্চাশ। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশ্নে মোট নম্বর হল ১৬.৬৬৬৬৬৬৬..., পুরো ছয়টি প্রশ্নের নম্বর যোগ দিলে তখনও দশমিক শূন্য শূন্য চার কম থাকছে, হৃদয়বান প্রশ্নকর্তারা অবশ্য এই খামতি পূরণের জন্য অবশিষ্ট নম্বরটুকু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা বা বিচক্ষণতার জন্য নির্দিষ্ট করতেন।

তবে সে-ও নিতান্ত চক্ষু লজ্জার জন্য।

কারণ ষোলো, সাড়ে ষোলো থেকে পৌনে সতেরো নম্বর সীমা যাই হোক, যে যতই ভাল লিখুক তাকে কোনও প্রশ্নে দশের বেশি দেওয়া হত না।

একদম লটারি খেলা। আট-দু'গুণে ষোলোটা অর্ধপত্র মানে হাফে প্রতিটি প্রশ্নে দশ করে পেয়ে শতকরা ষাট পেলে তবে প্রথম শ্রেণী।

বিনা কারণে বেশি কথা হয়ে গেল। কিন্তু এখানে তো শেষ করা যায় না। রম্যরচনাকে সমস্যা জর্জরিত অথবা জিজ্ঞাসা চিহ্নিত করার পাপ আর যেই করুক আমি নিশ্চয় করব না।

সুতরাং এইটি শেষ গল্প।

গল্পটি আমার নিজের।

একটি অপাপবিদ্ধ শিশু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় একতলার সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় আমার কাছে আসে। তার বয়েস ছয় সাত।

আমি একটি ক্ষীণ প্রশ্ন করি, 'তুমি এলে, তোমার বাবা মা কী করছেন।'

মেয়েটির নাম নিনো, সে গোল গোল চোখ করে বলে, 'কী আর করবে আমার হোমওয়ার্ক করছে।'

আমি বলি, 'দু'জনে করছে কেন?'

নিনো বলে, 'কে ঠিক করবে তা কি আমি জানি?'

আমি বলি, 'তবে?'

নিনো বলে, 'তাই নিয়েই তো গোলমাল। মা বলে, আমার হোম ওয়ার্ক ঠিক, বাবা বলে আমার।'

আমি বলি, 'তবে? নিনোদেবী, তুমিই তোমার বাবা মায়ের সব গোলমালের কারণ।'

নিনো একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'তা কেন? বাবামায়ের কোনও বিষয়েই তো মিল নেই।'

প্রবীণ ও নির্বোধ তারাপদ রায়, মানে আমি, অনেকক্ষণ নিনোর দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপর তাকে বলি, 'তোমার বাবা-মা-র কোনও বিষয়েই মিল নেই?'

নিনো করুণ চোখে তাকাল তারপর বললে, 'জেঠু, একটা বড় মিল আছে, আমার বাবামায়ের একই দিনে বিয়ে হয়েছিল।'

ভুলোমন স্বামী

ভুলোমন অধ্যাপক নিয়ে অনেকরকম গল্প আছে। সেই অধ্যাপকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকেই বিবাহিত এবং তাঁদের স্ত্রী বিদ্যমান।

স্বামীদেবতা যদি ভুলোমন হন, সেটা পত্নীঠাকুরানির পক্ষে সুবিধেজনক হয় না অসুবিধেজনক হয় এ রকম জটিল প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে প্রথমে একটি নিরতিশয় সরল প্রকৃতির ভুলোমন স্বামীর গল্প বলি। একদিন এই ভুলোমন স্বামী বাড়ি থেকে হনহন করে বেরিয়েছেন, একটা বিশেষ জরুরি দরকারে তিনি কোথায় যেন তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়েই এক ডাক্তারের চেম্বার। পাড়ার পুরানো ডাক্তার, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে রীতিমতো বন্ধুত্ব রয়েছে ভদ্রলোকের। হনহন করে ডাক্তারের চেম্বারের মধ্যে প্রবেশ করলেন ভদ্রলোক। ভর দুপুর। ডাক্তারখানা একদম খালি। ডাক্তারবাবু একা একা বসে ঝিমোচ্ছিলেন, হঠাৎ ভদ্রলোকের প্রবেশে তিনি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, খুশিও হলেন। রাস্তার ধারে ফুটপাথের একটা দোকানে একটা হাঁক দিয়ে দু'ভাঁড় আদা-চা আনতে বলে ডাক্তারবাবু ভদ্রলোককে 'আসুন, আসুন' বলে স্বাগত জানালেন।

গনগনে দুপুরে উষ্ণ চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে দু'জনের আড্ডা জমে উঠল। কলকাতার ফুটবল মরশুমে দলবদল, খলনায়কের অশ্লীল গান, ইলিশের চড়া দাম, পুজো এসে গেল ইত্যাদি বিষয়ে আধঘণ্টাখানেক আলোচনার পর ভদ্রলোক উঠলেন, সেইসময় ডাক্তারবাবু মামুলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমনিতে সব ভাল তো? বাড়িতে বউদি ভাল আছেন?' দ্বিতীয় প্রশ্নটি শোনামাত্র ভদ্রলোক ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন, ডাক্তারবাবুকে বললেন, 'সর্বনাশ, আমি তো একেবারে গিয়েছিলাম, আমি তো আপনাকেই ডাকতে এসেছিলাম।'

বিস্মিত ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' ভুলোমন স্বামী বললেন, 'আর কেন? আপনার বউদি বাসায় ফিট হয়ে পড়ে আছেন। আপনাকেই ডাকতে এসেছিলাম। এতক্ষণে কেমন আছে কে জানে, এখন তাড়াতাড়ি চলুন।'

সুখের কথা, এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জ্ঞান একা একাই ফিরে এসেছিল, চিকিৎসার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি।

ভু.ম. স্বামীর এর পরের গল্পটি অবশ্য অবিশ্বাস্য এবং আরও গোলমেলে। ঘটনাটি নাকি কোনও এক বছর শারদীয়া পুজোর আগে। ভদ্রলোক বাজারে গিয়েছিলেন। হাতে একটা বিরাট লিস্টি। সেই লিস্টিতে জামা, কাপড়, জুতো, মোজা, স্টেশনারি জিনিস, প্রসাধন দ্রব্যাদি সবই রয়েছে। সব

কিনে-কেটে তিনি একটা ট্যাক্সি ধরলেন কিন্তু তাঁর মনে হল তিনি কী যেন একটা ফেলে যাচ্ছেন। হাতের লিস্টির সঙ্গে নতুন কেনা প্যাকেটগুলো দু'বার-তিনবার মেলালেন। না, সবই তো ঠিকই আছে, কিছুই তো ফেলে আসেননি। পকেটে হাতড়িয়ে দেখলেন মানিব্যাগ, কলম, রুমাল, সিগারেট, দেশলাই সবই ঠিকঠাক আছে। অবশ্য তাঁর মনে বারবার খটকা লাগছে, কী যেন ফেলে এসেছেন মনে হচ্ছে। সমস্যার সমাধান হল বাড়ি ফিরে। ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নামামাত্র মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, মা কোথায়?' ভু.ম. স্বামী দোকানে-বাজারে কোথায় যে স্ত্রীকে ফেলে এলেন কে জানে।

অন্য একজন ভু.ম. স্বামীর কথা বিলক্ষণ জানি। তিনি আমাদের খুব কাছের লোক, তাঁর স্ত্রীও আমাদের নিজের লোক। এই ভূ.ম. স্বামী ভদ্রলোকটি একজন চূড়ান্ত চুরুটখোর। কখনও তাঁর চুরুটের আগুন নেভে না। একদিন ভদ্রলোক খেয়াল না করে অ্যাশট্রেতে রাখা জ্বলন্ত চুরুট হাতে তুলে আগুনের দিকটা নিজের মুখে গুঁজে দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট পুড়ে গিয়ে আর্ত চিৎকার করে চুরুটটা মাটিতে ফেলে দেন।

এই ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছেই ছিলেন। পরে ভদ্রমহিলা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস তুমি মুখে দেওয়া মাত্র ভুলটা বুঝতে পারলে, তাই শুধু ঠোঁটটার ওপর দিয়ে গেছে, না হলে মুখের ভেতর জিব-টিব, তালু-টালু পর্যন্ত পুড়ে যেতে পারত।' সেই অর্থে ভুলোমন আমরা সকলেই। আমরা প্রয়োজনীয় লোকের ঠিকানা ভুলে যাই, ফোন নম্বর হারিয়ে ফেলি। শ্যালিকার ননদের নাম ভুলে যাই। আমরা ট্রামে কিংবা রেস্তোঁরায় ছাতা ফেলে আসি, ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে ভুলে যাই। তবে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় বোধহয় চিঠি পোস্ট করতে। লোকে লেখা চিঠি পকেটে ভরে নিয়ে পোস্ট না করে বাসায় ফিরে আসে, তখন পকেটের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় ডাকে না ফেলা জরুরি পত্রটি।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের নায়ককে তাঁর স্ত্রী চিঠি ডাকে দিতে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেই রাস্তায় বেরিয়েছেন সবাই তাঁকে বলতে লাগল, 'দাদা, বউদির চিঠিটা পোস্ট করতে ভুলবেন না।' বাসেও তাই হল, অফিসেও তাই হল, এমনকী চিঠিটা ডাকে ফেলে দেওয়ার পরেও চেনা-অচেনা লোকেরা তাঁকে বলতে লাগল, 'দাদা, বউদির চিঠিটা পোস্ট করেছেন তো?' এর কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, ভদ্রলোকের জামার পিঠে তাঁর স্ত্রী আলপিন দিয়ে গেঁথে একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, 'আমার বরের খুব ভুলোমন, ওঁকে দয়া করে আমার চিঠিটা পোস্ট করতে মনে করিয়ে দেবেন।' অবশেষে চিঠি ডাকে দেওয়ার কথোপকথন দিয়ে ভুলোমন কাহিনী শেষ করি।

স্ত্রী: আমার চিঠিটা পোস্ট করেছ?

স্বামী: না।

স্ত্রী: পোস্ট করোনি। অথচ তোমাকে আমি পইপই করে বলেছিলাম।

স্বামী: কিন্তু।

স্ত্রী: কিন্তু আবার কী? আমার জরুরি চিঠিটা তুমি পোস্ট করলে না?

স্বামী: কিন্তু দোষ আমার নয়, দোষ তোমার।

স্ত্রী: আমার আবার কী দোষ?

স্বামী: চিঠিটা দ্যাখো। তুমি চিঠিটার ঠিকানা লেখনি।

বই চুরি

বারবার নানা জায়গায় নানা বিষয়ে লিখছি। এবার একটু নিজের ব্যাপারে লিখলে সেটা বোধহয় খুব দোষের হবে না।

ব্যাপারটা অবশ্য মজার নয়, বরং দুঃখের ঘটনাই বলা যেতে পারে।

প্রকাশক মহোদয়ের কাছে শুনলাম এবারের বইমেলায় সর্বপ্রথম যে বইটা চুরি গিয়েছিল সেই বইটা আমার। বলা বাহুল্য, চুরিটা ধরা পড়েছিল, তাই জানা গিয়েছিল।

সামান্য সাদামাটা ছেলেমানুষি হাসিঠাট্টার একটা বই 'জলভাত'। সেই বইটা চুরি করার আগ্রহ হতে পারে, ভেবে খুব অবাক লাগল।

এই সূত্রে অল্প কিছুদিন আগের অন্য একটা বই চুরির ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক এবং বেদনারই। খবরের কাগজে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং পরে এ-বিষয়ে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ চুরি করে বইটিকে লুকিয়ে বেরিয়ে আসার পথে এক ভদ্রলোক ধরা পড়েন। উৎসাহী কর্মকর্তারা ওই ভদ্রলোককে পুলিশে দেন।

খবরের কাগজের অনবধানতাবশত ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা কাগজে ছাপা হয়। তাঁর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর পুলিশ ওই ব্যক্তির বাড়ি তল্লাশি করে আরও অনেক বই পায়, যেগুলো জাতীয় গ্রন্থাগার সমেত আরও কোনও কোনও লাইব্রেরি থেকে চুরি করে সংগৃহীত।

তবে এর মধ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায় এই তস্কর ভদ্রলোকটি সামান্য চোর নন। ইনি বই বিক্রি করার জন্য চুরি করতেন না। ইনি ছিলেন প্রকৃত পুস্তকপ্রেমিক। মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করাই নেশা, চুরি করাটা পেশা নয়।

খবরের কাগজে তখন সংবাদের অভাব চলছিল। তাই এই বই চুরি ধরা পড়ার ব্যাপারটা গুরুত্ব পায় এবং বেশ কয়েকদিন ধরে লেখালেখি চলে।

ইতিমধ্যে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। কাগজে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় অপমানের জ্বালায় ওই তস্কর ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন। কাহিনীর যবনিকা পতন হল, বিয়োগান্ত নাটকের আদলে। এবং তখনই পুলিশ-প্রশাসন-খবরের কাগজ বুঝতে পারল ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

বই চুরির ঘটনাকে কখনওই খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমন কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি কি আছেন যিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে তাঁর বাড়িতে সমস্ত বইই তাঁর নিজের? নিজের বই যেগুলো নয় সেগুলো যে তিনি চুরি করে, লুকিয়ে কোথাও থেকে নিয়ে এসেছেন তা হয়তো নয় কিন্তু একথা সত্যি যে তিনি ধার করে পড়তে এনে ফেরত দেননি এবং সেও এক্ষেত্রে চুরিরই নামান্তর।

সেই পুরনো গল্পটা তো সবারই জানা আছে। গল্পটা কখনও বার্নার্ড শ, কখনও হরিনাথ দে, কখনও বা অন্য কোনও খ্যাতনামা পণ্ডিতকে নিয়ে বলা হয়।

সেই পণ্ডিতমহোদয়ের বাড়িতে অজস্র বই, ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে মেজের ওপরে ডাঁই করে রাখা। তাই দেখে এক শুভানুধ্যায়ী বলেছিলেন, 'আপনার এত বই সব এত অযত্নে রেখেছেন, দুয়েকটা আলমারি বা সেলফ তো রাখতে পারেন।' পণ্ডিত এবার হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'ভাই,

বইগুলো যে ভাবে সংগ্রহ করেছি, আলমারি বা তাক তো সেভাবে সংগ্রহ করা যাবে না।'

এবার আসল কথায় যাই। সেকথাটা হল আমার বইটা চুরি হওয়া নিয়ে।

এত বড় একটা বইমেলায় এত বইয়ের দোকানের এত হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে এই তস্কর ভদ্রলোক হঠাৎ আমার মতো অভাজনের একটি নগণ্য গ্রন্থ চুরি করতে গেলেন কেন?

প্রথমে এই ভেবে মনে মনে গৌরব বোধ করলাম যে পাঠকদের কাছে আমার লেখা বইয়ের আকর্ষণ এতই দুর্বার যে জনৈক পাঠক ন্যায়নীতির সমস্ত সংস্কার ও দ্বিধা ভেঙে আমার বইটি চুরি করেছেন, নিতান্তই মানসিক তাগিদে তিনি এই কাজটি করেছেন।

কিন্তু এর পরেই মনে হল, হয়তো আমার বইয়ের চাহিদা নেই, একেবারে বিক্রি হয় না, তাই প্রকাশকমহোদয় আমার বইগুলো দোকানের কোনও এক অপরিচিত অবহেলিত প্রান্তে ঢেলে রেখেছিলেন, সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা সহজ ভেবে ওই ভদ্রলোক বইটি তুলে নেন এবং দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়েন।

এইরকম খারাপভাল যখন দ্রুত চিন্তা করছি প্রকাশকমহোদয় জানালেন, 'সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে লোকটা ধরা পড়ায় পকেট থেকে টাকা বার করে আপনার বইটা কিনে নিয়ে চলে গেল।'

আমিও খুব আশ্চর্য হলাম এবং এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে আমার বইটা অন্তত এক কপি বিক্রি হয়েছে।

ফিলমি-ফিলমি

শুধু একবার ফিলমিতে হল না। তাই আরেকবার, তাই ফিলমি-ফিলমি।

বলে রাখা ভাল 'ফিলমি' শব্দটি মোটেই সুবিধের নয়। বাংলা তো নয়ই, না হিন্দি না ইংরেজি, মুম্বাই ঘরানার শব্দ। তদুপরি ফিলমি-ফিলমি শব্দযুগ্ম আরও গোলমেলে হয়ে গেল।

কিন্তু 'ফিলমি-জোকস' নামে এই চটি বইখানিতে রয়েছে বেশ ভাল কিছু উপাখ্যান। এর মধ্যে অবশ্যই কিছু আদিরসাত্মক যা আমার রুচিতে বাধে। বাকি কিছুর সঙ্গে বিখ্যাত নায়ক-নায়িকাদের নামধাম জড়িত, সেটাও এড়িয়ে যেতে হবে। সুতরাং মোটামুটি পরিবেশনযোগ্য দু'-চারটি আখ্যান বেছে নিতে হচ্ছে।

যেমন এই প্রথম গল্পটা। এক নায়িকার স্বামী মারা গেছেন বা আত্মহত্যা করেছেন। নায়িকা যথেষ্ট ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন এই লোকটিকে। সরলচিত্ত, আবেগময়, ধনবান যুবক, পাত্র হিসেবে মোটেই খারাপ নয়।

কিন্তু যেমন হয়। নায়িকার কর্মব্যস্ত, মোহময়ী বহুমুখী জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলেন না এই যুবকটি। একদিন তিনি আত্মহত্যা করলেন।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই নায়িকার খুবই বিরক্ত লাগছিল তাঁর বরকে। কেমন চাকচিক্য ও জৌলুসহীন, সাদামাটা, তার ওপরে ঘ্যানঘেনে স্বভাবের। সব সময়ে জানতে চাইছে, কোথায় গিয়েছিলে, কে ফোন করেছিল, এত দেরি হল কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি সব বাজে প্রশ্ন।

কিন্তু আজ বরের মৃত্যুর পরে এই সরল লোকটির জন্য নায়িকার খুব মায়া হল। অনেক অবহেলা, উপহাস করেছেন নায়িকা তাঁর বরকে। এখন কেমন যেন মনে হল এতটা উপেক্ষা না করলেও পারতেন। নায়িকার খুবই কান্না পেল। নির্জন ঘরে দরজা বন্ধ করে পুলিশ ও খবরের কাগজের রিপোর্টারের হাত এড়িয়ে বহুকাল পরে আজ নায়িকা প্রাণ খুলে কাঁদবেন।

কিন্তু দুঃখের কথা নায়িকার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরল না। অনেকক্ষণ, অনেক চেষ্টা করার পর তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি কাঁদতে ভুলে গেছেন, গ্লিসারিন ছাড়া তাঁর চোখে আর কোনওদিন জল আসবে না। শত দুঃখে, শত শোকেও না।

এতবড় একটা করুণ কাহিনীর পরে এবার একটা সত্যিকারের হাসির গল্প বলা যাক। গল্পটা খুবই পরিচ্ছন্ন। পাত্র-পাত্রীর নাম ব্যবহারে অসুবিধে নেই। সবাই জানেন যে হিন্দি সিনেমার প্রসিদ্ধতম নায়ক শ্রীযুক্ত অমিতাভ বচ্চন খুবই লম্বা, যাকে সাদা বাংলায় ঢ্যাঙা বলে।

একবার চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যের শ্যুটিংয়ের সময় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিছু ভুলত্রুটি হওয়ার পর কয়েকবার চিত্রগ্রহণ করতে হয় এবং তার ফলে আরও দেরি হয়।

বরফের ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কম কথা নয়। কিন্তু বোম্বাই চলচ্চিত্রের নায়কদের নাকি এ রকম বহু কষ্টই করতে হয়। সে যা হোক, চলচ্চিত্রের এই শ্যুটিংয়ে অমিতাভ বচ্চনের সামনেই ছিলেন অতীতের দিকপাল খল-নায়িকা। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সুরসিকা নাদিরা, যিনি এই কাহিনীর পার্শ্বচরিত্রে একজন অভিনেত্রী।

শ্রীযুক্ত বচ্চনকে বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্রীমতী নাদিরা বললেন, 'বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে তো তোমার সর্দি লেগে যাবে। তবে তোমার একটা বড় সুবিধে রয়েছে। তুমি এত ঢ্যাঙা যে পা থেকে তোমার নাক পর্যন্ত ঠান্ডা পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। তার আগেই ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ-টষুধ খেয়ে নিয়ো।' পরের আখ্যানটি একালের দুই নায়িকা-নায়িকা নিয়ে। গল্পটি নিতান্ত নির্বিষ এবং নিরামিষ বটে। নামধাম গোপন না করেই বলি। অবশ্য নামধাম গোপন করার তেমন কোনও প্রশ্ন নেই। এ গল্প একদা দিলীপকুমার ও সায়রাবানুর নামে, পরে বেশ কয়েকজোড়া দম্পতি পার হয়ে এখন এসে ঠেকেছে নতুন যুগের তারকা দম্পতি হিমালয় ও ভাগ্যশ্রীর নামে।

বিয়ের কিছুকাল পরে শ্রীমতী ভাগ্যশ্রী নাকি একদিন অনুযোগ করে যে, 'ওগো তুমি বিয়ের আগে আমাকে কত কী উপহার দিতে, কিন্তু এখন আর দাও না কেন?'

সুন্দরী চিত্রতারকা স্ত্রীর এই প্রশ্ন শুনে নির্বিকার হিমালয় উত্তর দিয়েছিল, 'আমি আর কেন উপহার দিতে যাব তোমাকে? মাছ বঁড়শিতে গাঁথা হয়ে যাওয়ার পর কেউ কি আর সেই মাছকে টোপ খাওয়াতে যায়।'

এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল অন্য এক তারকা দম্পতির ক্ষেত্রে। এদের কিন্তু পরিচয় দেওয়া যাবে না। স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার কি মনে হয় না, অনেক ভাল হত তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি আমাকে বিয়ে করত?'

স্বামী হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, এ রকম আমার মনে হয় না। আমি কারও খারাপ চাই না।'

পুনশ্চ:

একটি চিত্রনাটিকা।

সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী প্রবীণ নায়ককে বললেন: আমার সবচেয়ে ভাল লাগে আপনার ওই ঝকঝকে দাঁতের হাসি। প্রবীণ নায়ক মুখ থেকে বাঁধানো দাঁতজোড়া খুলে বললেন: এই নাও, তোমাকে এটা উপহার দিলাম।

চার্চিল

এই ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের জন্ম, মৃত্যু বা অভিষেকের শতবার্ষিকী, রজত বা হীরকজয়ন্তী কিছু নয়। বড় জোর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসপঞ্জি খুলে বলা যেতে পারে, মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান স্থপতি, চার্চিলের প্রতি যুদ্ধলক্ষ্মী প্রসন্ন হওয়ার এটা সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর।

আশ্চর্য কাণ্ড! স্মৃতি-বিস্মৃতির গলিঘুঁজিগুলি বড় আলোছায়া-ঘেরা, বড়ই রহস্যময়।

বঙ্গীয় সংবাদ-বিদ্যার মহাগুরু বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মনে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা, আর সেই সূত্রে উইনস্টন চার্চিল।

চার্চিল মানে স্যার উইনস্টন লিওনার্ড স্পেন্সার চার্চিল। আমাদের অল্প বয়েসে, চার্চিল সাহেব তখন মধ্যগগনের সূর্য, একটি ছেঁদো রসিকতা ছিল তাঁর নাম নিয়ে। এটি একটি ধাঁধামূলক রসিকতা। প্রশ্ন করা হত, বলো তো চার্চিলের কয় পা? চার্চিল মানে চারটি চিলপাখি হলে উত্তর হল: পায়ের সংখ্যা চার দু'গুণে আট। আবার চার্চিল যদি গোটা মানুষ হন, যে-ব্যক্তি বিলেতের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর তো দুটো পা। জানি না এই রসিকতা তর্জমা করে চার্চিল সাহেবের কাছে পৌঁছেছিল কি না! নিশ্চয়ই পৌঁছয়নি। কোনও বঙ্গভাষী তাঁর কাছাকাছি ছিলেন বলে শুনিনি। তা ছাড়া এই নাক-উঁচু, নীল-রক্ত ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ছিল রাজা-প্রজা সম্পর্ক; তিনিই তো ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পাততাড়ি গোটানোর অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করতে চাই না।' সেসব যাই হোক, এতদিন পরে আর রাগ পুষে লাভ নেই। তা ছাড়া উইনস্টন চার্চিলের কাছে আজকের সভ্য পৃথিবীর একটা বড় ঋণ রয়েছে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অক্লান্ত যোদ্ধা।

চার্চিল ছিলেন সুরসিক, তর্কবীর। তাঁর বিখ্যাত উক্তিগুলি বাদ দিয়ে দুয়েকটি কম-পরিচিত রসিকতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদা বিরোধীপক্ষের এক মহিলা এম পি চার্চিলকে বলেছিলেন 'মি. চার্চিল, আপনার ওই খোঁচা গোঁফ আর ওঁছা যুক্তি— এ-দুটোর কোনওটাই আমার পছন্দ নয়।'

তিক্ত হাসি হেসে চার্চিল বলেছিলেন, 'এ-দুটোর কোনওটার সংস্পর্শেই আসার সুযোগ আপনার হবে না, মহোদয়া, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

এই হল চার্চিলের বিরোধীর সঙ্গে বাক্যালাপ। অনুগামীর সঙ্গে কথাও কম চিত্তগ্রাহী নয়। একদিন এক অনুগামী উচ্ছ্বাসভরে চার্চিলকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা স্যার, এই যে এত লোক সব সময়ে আপনার বক্তৃতা শুনতে ভিড় করে আসে, এতে আপনি গৌরব বোধ করেন না? এতে আপনার রোমাঞ্চ হয় না?'

চার্চিল জবাব দিয়েছিলেন, 'গৌরব বোধ করি বইকী। রোমাঞ্চ হয় বইকী। কিন্তু তুমি একবার ভেবে দ্যাখো তো যে যদি আমার বক্তৃতার বদলে আমাকে আজ ফাঁসি দেওয়া হত, তা হলে লোক আরও কত বেশি হত।'

চার্চিলের অন্য একটি কাহিনী, সেই যাকে বলে সেয়ানে-সেয়ানে। জর্জ বার্নার্ড শ বনাম উইনস্টন চার্চিল। বলা বাহুল্য, এঁরা দু'জন সমসাময়িক। তখন বার্নার্ড শ-এর বিখ্যাত নাটক 'পিগম্যালিয়ন' লন্ডনের মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। অভিনয়ের প্রথম দিনের শো-এর দুটি পাশ চার্চিলকে পাঠিয়ে দিয়ে

বার্নার্ড শ চার্চিলকে লিখেছিলেন, 'একটি পাশ আপনার জন্যে আর দ্বিতীয়টি আপনার কোনও বন্ধুর জন্যে, অবশ্য যদি আপনার কোনও বন্ধু থাকে।' এর উত্তরে পাশ দুটি ফেরত পাঠিয়ে চার্চিল জানালেন, 'দুঃখিত, আমি আজ যেতে পারছি না। তবে কাল আপনার শো-তে যেতে পারি। অবশ্য কাল কিংবা আর-কখনও যদি আপনার শো হয়।'

এর চেয়ে তির্যক মন্তব্য চার্চিলের রাজনীতি বিষয়ে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, ভাল রাজনীতিবিদের যোগ্যতা কী হওয়া উচিত। চার্চিল বলেছিলেন, 'বিশেষ কিছু নয়। শুধু তাকে দূরদর্শী হতে হবে; সে যেন ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটা ঠিকমতো বলতে পারে। আর যখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলবে না, তখন যেন ব্যাখ্যা দিতে পারে, কেন মিলল না।' এবার চার্চিল সম্পর্কে একটি পরিচিত গল্প বলি। চার্চিলের আশি বছরের জন্মদিনে এক তরুণ ফটোগ্রাফার তাঁর ফটো তুলতে গিয়েছিল। সে মাতব্বরি করে বলেছিল, 'আমি আশা করি আপনার জন্মশতবর্ষেও এসে এমনিভাবে ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারব।' তরুণ ফটোগ্রাফারের উৎসাহে এক কলসি ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে চার্চিল তার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, 'কেন নয় ছোকরা? তোমার স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই দেখছি। নিশ্চয়ই ততদিন বেঁচে থাকবে।'

পুনশ্চ: অবশেষে চার্চিল-সূত্রে একটি অ-চার্চিল গল্প।

বাংলায় যাকে ডালকুত্তা বলে, ইংরেজিতে তা-ই বুলডগ। আবার ওই থ্যাবড়া মুখের জন্যে চার্চিল-যুগে ওর নাম হয় চার্চিল ডগ। এই বুলডগ তথা চার্চিল ডগের থেকে কিঞ্চিৎ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একটি বাচ্চা ছেলে কুকুরটিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। তাকে যখন বলা হল, 'তুমি কুকুরটাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছ কেন?' সে নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'ও অনেক আগে থেকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।'

পঞ্জিকা

সেই বিজ্ঞাপনটা বোধহয় আজও আছে, সেই যেখানে খুব বড় বড় আধ ইঞ্চি সাইজের হরফে লেখা ছিল—

'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়'

এবং তার নীচে ছিল সবল পেশি, উন্নতবক্ষ এক তেজোদৃপ্ত পুরুষ মানুষের ছবি, এবং তারও নীচে খুব ছোট ছোট, বোধহয় বর্জয়েস কিংবা স্মল পাইকা অক্ষরে লেখা, 'এখনও আবিষ্কার হয় নাই।'

তার মানে, 'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় এখনও আবিষ্কার হয় নাই।'

ইলেকট্রিক সলিউশনের মতো অত্যাশ্চর্য নামের, এই অমোঘ ওষুধটির বিজ্ঞাপন এই সেদিনো দেখেছি কিন্তু হাতের সামনের পঞ্জিকাটায় খুঁজে পাচ্ছি না।

যেমন খুঁজে পাচ্ছি না, সেই কবেকার জাঞ্জিবারের রাক্ষুসে লাল মুলোর সচিত্র বিজ্ঞপ্তি, যে মুলোর প্রতিটির ওজন 'ন্যূনপক্ষে' আড়াই সের।

অথবা 'ফুল আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে' কিংবা 'ছবির মতো ঘড়ির' বিজ্ঞাপন যে ঘড়ির মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা— নতুন পঞ্জিকায় সেটাও দেখতে পাচ্ছি না।

ফুল আর ঘড়ির দুটো বিজ্ঞাপনই অবশ্য জোচ্চুরি। গোটা দশেক পরিচিত নামের ফুলের ছবির নীচে জ্যোতিষের ভাষায় ভূত ভবিষ্যৎ লেখা আছে। আপনি পোস্ট কার্ডে ফুলের নাম জানালে ভি পি ডাকে ভাগ্যফল চলে আসবে।

কিন্তু আমি একবার ধুতুরা এবং আর একবার সজনে ফুলের নাম পাঠিয়ে ভাগ্যফল পাইনি, কারণ গোলাপ বকুল জবা— এই সব সাধারণ ফুলের নামেই ভাগ্যফল তৈরি করা আছে; অন্যরকম নামের ফুলের কোনও ভাগ্যবিচার নেই।

ঘড়ির ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। ছবির মতো ঘড়ির জন্য টাকা পাঠালে ঘড়ি নয় তার বদলে ঘড়ির ছবি আসবে ওই সাড়ে তিন টাকার বিনিময়ে একেবারে 'ছবির মতো ঘড়ি'।

পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক কথাই এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। বরং পঞ্জিকার বিয়ে কিছু বলি।

ইরেজি নববর্ষের যেমন ক্যালেন্ডার যার শৌখিন নাম দেয়ালপঞ্জি, বাংলা নববর্ষে তেমনই পঞ্জিকা, যদিও বাংলা দেয়ালপঞ্জিও ইংরেজি কেতায় তৈরি হয় এবং সেগুলো খুবই কাজে লাগে কারণ তাতে বার, তারিখ, ছুটির দিন ছাড়াও পূর্ণিমা অমাবস্যা, একাদশী, গ্রহণ, পুজো, পার্বণের হদিশ পাওয়া যায় এক নজরে।

অভিধানমতে পঞ্জিকা হল সেই পুস্তক যার মধ্যে তারিখ, তিথি, পর্বদিন, শুভদিন ইত্যাদি থাকে। আমরা পূর্ববঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় পঞ্জিকা বলতাম, এখানে চলিত ভাষায় পাঁজি বলে। কাব্য বা সাহিত্য করে পঞ্জিও অবশ্য বলা হয়, যেমন একটু আগে লিখেছি দেয়ালপঞ্জি।

আমাদের অল্প বয়সে পঞ্জিকা ছিল মোটামুটি তিন রকমের। ফুল পঞ্জিকা, হাফ পঞ্জিকা এবং পকেট পঞ্জিকা। এখনও তিন রকমই আছে তবে নামগুলো একটু বদলে গেছে। ফুল পঞ্জিকা হয়েছে ডাইরেক্টরি, হাফ পঞ্জিকা হয়েছে ফুল পঞ্জিকা আর পকেট পঞ্জিকা প্রমোশন পেয়ে হয়েছে হাফ পঞ্জিকা।

ব্যাপারটা অনেকটা মিলের ধুতি শাড়ির মতো। একালের মধ্যবিত্ত বাড়িতে মিলের ধুতি-শাড়ি খুব একটা কেনা হয় না তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সবচেয়ে মোটা শাড়ি হল ফাইন, আর সুপার ফাইন হল সাদামাটা। সত্যিই যেগুলো ফাইন বা সুপার ফাইন, মিহি সুতোয় বোনা, সেগুলোর সব বাহারি নাম মহারাজা ধুতি, রাজকুমারী শাড়ি, প্রিমিয়ার 'অ্যারিস্টোক্র্যাট' ইত্যাদি।

অবশ্য এ-বিষয়ে লুঙ্গির নামকরণের কোনও তুলনা নেই। দক্ষিণ ভারত থেকে যে চমৎকার লুঙ্গিগুলো কলকাতায় আসে, যেগুলো চিৎপুরে নাখোদা মসজিদের আশপাশের দোকানে পাওয়া যায় সেগুলোর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামেই পরিচয়। বেশ ভাল লুঙ্গি হল অফিসার্স লুঙ্গি, কর্নেল লুঙ্গি। তবে সবচেয়ে ভাল, অভিজাত লুঙ্গি হল সাব ইন্সপেক্টর দারোগা লুঙ্গি। সেদিন শুনলাম বড় দারোগা লুঙ্গিও বেরিয়েছে সে আরও উচ্চমানের। সাধারণ চলনসই লুঙ্গির নাম হল রিপোর্টার লুঙ্গি।

ব্যাপারটা কথায় কথায় একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। আমার লেখার সীমাও শেষ। তবু পঞ্জিকা সম্পর্কে আরও দুয়েকটা কথা লেখার আছে।

আমাদের ছোটবেলার ছোট শহরে সবসুদ্ধ বড় পঞ্জিকা ছিল গোটা সাতেক। কালীবাড়িতে একটা, আদালতে একটা, বাজারে মহাজনি গদিতে একটা, আর কোনও কোনও সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে। যতদূর মনে পড়ে, মেজর মফিজ ডাক্তারের চেম্বারেও একটা ফুল পঞ্জিকা রাখা হত।

হাফ পঞ্জিকা, পকেট পঞ্জিকা হাটে-বাজারে কাছারির বটতলাতেও বৎসরান্তে পাওয়া যেত। কিন্তু ফুল পঞ্জিকা পাওয়া যেত শুধুমাত্র একটা বাইরের দোকানে, ভারত লাইব্রেরিতে। ঠিক যে কয়টা ফুল পঞ্জিকা বিক্রি হবে গোনা-গুনতি সেই কয়টা ভারত লাইব্রেরি কলকাতা থেকে আনাত। কারণ একটা কপি বেশি হলেও নতুন বছরের পর সেটার বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

যে বছর আমাদের পঞ্জিকা হারিয়ে যায়, সেবার দ্বিতীয় একটা পঞ্জিকা কিনতে গিয়ে বোঝা যায় যে দ্বিতীয় পঞ্জিকা সংগ্রহ করতে গেলে কলকাতা বা ঢাকা থেকে আনাতে হবে। ভারত লাইব্রেরির স্টকে আর কিছু নেই।

পঞ্জিকা হারানোর ঘটনাটা বলে শেষ করি।

আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া পুরনো বাড়িতে সব কিছু হারাত। গয়নাগাঁটি, বাসন-কোসন ঘড়ি, কলম, গোরু, ছাগল সব কিছু। আমরা অল্পবয়সিরা সদাসর্বদা হারিয়ে যেতাম, পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে ঝিয়ের গেলাস হারিয়ে আসা, জ্যাঠামশাই আদালতে ছাতা হারিয়ে আসতেন, ছোট পিসিমা ব্রাহ্মমন্দিরে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গিয়ে নতুন চটি হারিয়ে আসতেন।

সুতরাং পঞ্জিকা হারিয়ে যাওয়া কোনও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ঘটনাটা জটিল ও রহস্যময়। সেই জন্যেই বলা।

চৈত্র সংক্রান্তির দুয়েকদিন আগেই আদালত থেকে ফেরার পথে মুহুরিবাবু পঞ্জিকা কিনে আনতেন। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় কাছারি ঘরে লণ্ঠনের আলোতে বসে খুব ভাল করে সেটায় বাঁশকাগজ দিয়ে মলাট লাগাতেন।

এরপর নীলপুজোর দিনে সেটা যেত গাঁয়ের বাড়িতে শিবমন্দিরে, সেখান থেকে ফিরে সিঁদুর হলুদের কৌটা দিয়ে পরের পরের দিন পয়লা বৈশাখে সেটাকে বরণ করা হবে। তারপর থেকে সে পাঁজি থাকত পুজোর ঘরে। প্রয়োজন মতো সারা বছর ব্যবহৃত হত।

দুয়েকদিন পরেই অক্ষয় তৃতীয়ার লগ্নক্ষণ দেখতে গিয়ে দেখা গেল সেই বাঁশকাগজের মলাট দেয়া বইটা মোটেই নতুন পঞ্জিকা নয়, সেটা হল কাকার একটা বই কে পি বসুর অ্যালজেব্রা। কী করে সেই পঞ্জিকার সঙ্গে এই বইয়ের বদল হয়েছিল, সেই পঞ্জিকাই বা কোথায় গেল এসব রহস্যের সমাধান কোনওদিনই হয়নি।

নিমন্ত্রণ

নিমন্ত্রণ কথাটার মধ্যে একটা বাজনা আছে, একটা জৌলুস আছে, সেই তুলনায় ইংরেজি 'ইনভিটেশন' শব্দটা খুব সাদামাটা।

জন্মদিন বা বড়দিনের নিমন্ত্রণ আমরা সাহেবদের কাছ থেকে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের নিমন্ত্রণের তালিকাও অতি-দীর্ঘ।

শুধু বিয়ের নিমন্ত্রণের কথাই ধরা যাক, পাকা দেখার নিমন্ত্রণ, আশীর্বাদের নিমন্ত্রণ, গায়ে হলুদের নিমন্ত্রণ, তারপর বিয়ে, বাসি বিয়ে, ফুলশয্যা, বউভাত, অষ্টমঙ্গলা থেকে দ্বিরাগমন পর্যন্ত নিমন্ত্রণের আর শেষ নেই।

একজন সাধারণ বঙ্গজনের কথাই ধরা যাক, তিনি জন্মানোর আগে থেকেই তাঁকে নিয়ে নিমন্ত্রণের সূচনা। মাতৃগর্ভে থাকার সময়েই তাঁর আসন্ন জন্ম নিয়ে সাধের নিমন্ত্রণ। তারপর আটকড়াই থেকে অন্নপ্রাশন, বছর বছর জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী। এমনকী মৃত্যুর পরে চতুর্থী, ঘাট, শ্রাদ্ধ, মৎস্যমুখী। এবং সেখানেও শেষ নয়, যতদিন না গয়াধামে পিণ্ডদান করা হচ্ছে, বৎসরে বৎসরে বার্ষিক শ্রাদ্ধ। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং সরাসরি নিমন্ত্রণপত্রে চলে যাই। নিমন্ত্রণপত্র মানে বিয়ের, শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। এই বিয়ের মরশুমে হলুদ এবং সিঁদুর কৌটা দেওয়া

গোলাপি নিমন্ত্রণ চিঠিতে বাড়িতে বাড়িতে ডাকবাক্স ভরে গেছে। নানা আকারের, রংবেরংয়ের সব চিঠি।

কিন্তু এই সব চিঠিরই এক গৎ, বাঁধা বুলি। সেই 'ওঁ প্রজাপতয়ে নম' দিয়ে শুরু আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের উল্লেখ দিয়ে শেষ।

অধিকাংশ বিয়ের-চিঠিতে দুটি বাঁধা বয়ান দেখা যায়, যার সঙ্গে বিয়ের কোনও যোগ বা সম্পর্ক নেই।

প্রথমটি হল ওই অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন বা Guest Control Act. এ বিষয়ে একটি কথা বলার আছে। অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন পালিত হবে, এ কথার অর্থ কী?

আমি কোনও আইন মান্য করব, একথা আমাকে ঘোষণা করতে হবে কেন? তা হলে তো প্রত্যেককেই গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরতে হয়। যাতে লেখা থাকবে,

'আমি চুরি করব না',
'আমি ডাকাতি করব না'
'আমি খুন করব না', ইত্যাদি।

আমি আইন মান্য করে চলব, আইন ভঙ্গ করব না, একথা ঘোষণা করতে হবে কেন? এটাই তো স্বাভাবিক। এর জন্যে মুদ্রিত নোটিশের কী প্রয়োজন!

নিমন্ত্রণপত্রের আরও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক ব্যাপার আছে। সম্ভাষণের কথাই ধরা যাক। শ্রাদ্ধের চিঠিতে 'সময়োচিত নিবেদন', বলা যায়, চলতে পারে। কিন্তু শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের সম্ভাষণ?

সুকুমার রায়ের হযবরল বইয়ের 'কার্যঞ্চাগে' মনে হলে হাসি পায়। কিন্তু 'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর' এখনও প্রায় প্রতিটি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত হয়। নিমন্ত্রণকর্তা বহুক্ষেত্রেই সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। তিনি যে ভেবেচিন্তে এ রকম সম্ভাষণ করেন, তা নয়। কিন্তু সবিনয় নিবেদন করতে বাধা কোথায়?

অবশেষে নিমন্ত্রণপত্রের সবচেয়ে নীচে চলে যাই। যেখানে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন'... ইত্যাদির নীচে লেখা আছে, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।'

এই বাঁধা গৎ বা বয়ানটির ব্যাপারটাও গোলমেলে।

আমি এখন পর্যন্ত একটি বাড়ি ছাড়া আর কোথাও দেখিনি উপহার গ্রহণ না করতে। শুধু অনেকদিন আগে দেখেছিলাম এক কন্যাকর্তা উপহার দেওয়ার সময় কিছু বলেননি, কিন্তু পরের দিন ট্যাক্সি ভাড়া করিয়ে লোক দিয়ে সব উপহার বাসায় বাসায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুটো উপহারের উপহারদাতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। সে দুটো কন্যাকর্তা নিজে গিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। আর একটি ব্যাপার শুনেছি। যদিও সেই নিমন্ত্রণপত্রটি আমি স্বচক্ষে দেখিনি। এক পণভারাতুর কন্যার পিতা (একদা কবিতা লিখতেন) নিমন্ত্রণপত্রের শেষে যোগ করিয়েছিলেন,

'নাই খাদ্য, নাই পানীয়,
আসতে পারেন এই শর্তে
লৌকিকতার পরিবর্তে
আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।'

নিমন্ত্রণপত্রের ব্যাপারটা মোটামুটি হল। এবার একটু নিমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টা করি।

নিমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টার গল্পটা খুবই করুণ। অনেকদিন আগে পাটনা শহরে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। কী একটা সাহিত্যসভায় আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম। সময়টা বোধহয় মে মাস, রবীন্দ্রজয়ন্তীর কাছাকাছি সময়। পাটনায় পৌঁছেই বিকেলে সাহিত্যসভা। তারপরে সন্ধ্যায় নৈশবাসর, সেখানে প্রচণ্ড হই-হল্লা-ফুর্তি।

সেই হই হল্লার মধ্যে স্থানীয় এক সাহিত্যপ্রেমিক আমাদের অনুরোধ করলেন, পরদিন তাঁর ওখানে মধ্যাহ্নভোজন করতে। যেহেতু আমাদের ফেরার গাড়ি পরদিন রাতে সুতরাং, আমরা রাজি হয়ে গেলাম। পরের দিন দুপুরে বুঝতে পারলাম, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। খরগ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে পাটনা শহর গনগন করে জ্বলছে, লু বইছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। চারদিক থেকে আগুনের হলকা আসছে।

কোনও রকমে রিকশা জোগাড় করে অচেনা শহরে অনেক ঘুরপাক খেয়ে নিমন্ত্রণকর্তার গৃহে পৌঁছলাম। তিনি তো আমাদের দেখে অবাক। আমরা খবর পাইনি শুনে, তিনি খুবই খেদ প্রকাশ করলেন, একটু আগেই তিনি আমাদের হোটেলে ফোন করে আমাদের জানাতে বলে দিয়েছেন, 'ইনভিটেশন ক্যানসেল হো গয়া।'

মাছ (২)

'আয়রে আয় ছেলের দল মাছ ধরিতে যাই'— বাংলাভাষার শিশু-ভোলানো ছড়ার জালে ঝলমল করছে নানা বর্ণের, নানা আকারের মাছ। দাদার হাতে কলম ছিল ছুড়ে মেরেছে, কারণ ও-পারেতে রুই-কাতলা ভেসে উঠছে। তাতে রুই-কাতলার মতো বড় মাছের কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না; কিন্তু দাদার কলমটা গেছে। অত বড় মাছ চোখে পড়ার উত্তেজনায় এটা হয়েছে। তা ছাড়া, মাছ ধরেও যে খুব সুবিধে হয়েছে সব সময় তা নয়— সেই একবার তো শুধু ধরা মাছটাই চিলে নিয়ে গেল তাই নয়, মাছ ধরার ছিপটাও নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে।

কেবল ছড়ার ছন্দলহরী নয়, আমার বাল্যস্মৃতি ভরে আছে মাছের ঘ্রাণে। সে ঘ্রাণ শুধু কাঁচা মাছের আঁশটে গন্ধের নয়, তার পাশাপাশি রয়েছে সারা বাড়ি উঠোন-অন্দর-বাইরে ভ্রাম্যমাণ মাছ ভাজার বা সাঁতলানোর ভারী সুঘ্রাণ এবং সর্বোপরি মশলা ও মদের গন্ধ-মেশানো মাছের চারের মৌতাত।

আমার ছেলেবেলার পূর্ববঙ্গীয় মফস্বলে মাছকে সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না। 'বাঙালীর জীবনে নারী'র মতোই চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ রচনা করা যায় 'বাঙ্গালীর জীবনে মাছ' নাম দিয়ে। আমাদের জীবনচর্চায় মাছ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মাছ দশাবতারের প্রথম অবতার। পুজো-পার্বণে, আহারে-বাসনে মাছ অপরিহার্য। সরস্বতী পুজোয় যে জোড়া ইলিশকে বরণ করতে হবে তাকেই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়ে মঙ্গলাচরণ করে বিদায় জানাতে হবে বিজয়া দশমীতে।

অন্নপ্রাশনে ভাতের শিশুর মুখে ছোঁয়াতে হবে এক টুকরো মাছ। ভোজের পাতে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াতে হবে অন্তত দু'রকম মাছ— একটা সরষেবাটা ঝোল, আর-একটা ঘি-গরমমশলা দিয়ে। তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে অসুখ সারার পর অন্নপথ্য হবে একটু গলা ভাত আর লেবুর রস দিয়ে কাঁচকলা সেদ্ধ সহযোগে মাগুর বা শিঙি মাছ দিয়ে। মাছ পাঠাতে হবে বিয়ের তত্ত্বে, আশীর্বাদে, পাকা-দেখায়। ঝালে-ঝোলে-চচ্চড়িতে বিয়ের ভোজ হবে জমজমাট। মরার পরেও মাছ; শ্রাদ্ধ মিটে যাওয়ার পরে মৎস্যমুখী হবিষ্য-উত্তর নিয়মভঙ্গ।

বৈষ্ণব কবিরা নিরামিষ, নিকষিত হেম ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে মাছের ছড়াছড়ি। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বুদ্ধদেব বসু তপসে মাছ থেকে ইলিশ মাছ— বাঙালি কবিরা মাছের জয়জয়কার করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নমুনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'পাতলা করে কাটো সখি কাতলা মাছটিরে'। তাঁরই ছড়ায় খেঁদুবাবুর এঁদো পুকুরে মাছ ভেসে ওঠায়, সেই মরা মাছের চচ্চড়িতে পদ্মমণি লঙ্কা ঠেসে দিয়েছিল।

বাংলা সিনেমায় এমন কোনও নায়ক নেই যিনি কোনও-না-কোনও ছবিতে মাছের মুড়ো চিবিয়ে খাননি। এখনও এমন কোনও দিন নেই যেদিন বাংলা খবরের কাগজে মাছ নিয়ে কোনও সংবাদ থাকে না। সে সংবাদ বাংলাদেশের ইলিশ নিয়েই হোক অথবা সুন্দরবনে গলদা চিংড়ি প্রকল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে হোক।

মাছ ধরা ভেতো বাঙালির প্রিয়তম শখ। এ-শখ নাগরিক জীবনে তেমন পূরণ হয় না। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে এমন কোনও বাড়ি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যে-বাড়িতে মাছ ধরার ছিপ নেই। মহানগরেও আছেন অদম্য মৎস্যশিকারিরা, যাঁরা দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা বহুমূল্য একশো টাকার টিকিট কেটে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকেন পুকুরের জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরার আশায়— যদিও মাছের দেখা মেলে কচিৎ-কদাচিৎ।

এক মিউনিসিপ্যাল পুকুরে বিনা অনুমতিতে মাছ ধরার অপরাধে এক ভদ্রলোক ধরা পড়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই ভদ্রলোক, যিনি কখনও বঁড়শিতে মাছ ধরতে পারেন না, সেদিন দুটো ছোট মাছ ধরেছিলেন। অন্যান্য দিন যখন কোনও মাছ তিনি ধরতে পারেন না, তখন লজ্জায় বাজার থেকে দুটো মাছ কিনে নিয়ে যেতেন; বাসায় গিয়ে বলতেন, ছিপে ধরেছি। তাঁর সহধর্মিণী কিন্তু এই চালাকি ধরে ফেলেছিলেন, ফলত যথারীতি নানারকম গঞ্জনা, টিটকিরি। আজ মিউনিসিপ্যাল পুকুরে ধরা পড়ার পর বিনা অনুমতিতে মাছ শিকার করার অপরাধে তাঁর পঞ্চাশটাকা জরিমানা হল; অবশ্য শিকার-করা মাছ দুটো তিনি ফেরত পেলেন। আজ হাসিমুখে পঞ্চাশটাকা জরিমানা দিয়ে জরিমানার রসিদ হাতে করে বাড়ি ফিরলেন, দজ্জাল বউকে দেখাবেন, 'এ মাছ ধরা মাছ না কেনা মাছ, এই রসিদ দেখো।'

মাছ শিকারের হাজারো গল্প। সবাই কিছু কিছু জানে, আমিও অনেক শিখেছি। সবচেয়ে বেশি গল্প— যে মাছ বঁড়শিতে আটকে ছিল কিন্তু ডাঙায় তোলা যায়নি, তার আগেই পালিয়ে ছিল— সেই মাছ নিয়ে। গল্পে এই সব মাছের আয়তন সাধারণত খুবই বড় হয়। এক ভদ্রলোক তাঁর ছিপ থেকে ছুটে-যাওয়া মাছের দৈর্ঘ্য একেক জনকে একেক রকম দেখাতেন।

এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'কী আর করব? যে যেমন বিশ্বাস করে তাকে সেইরকম বলি।' অন্য একজন এই সব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারতেন না। তাঁর ছিপের ছুটে-যাওয়া মাছ ক্রমশ বড় হতে লাগল, দেড় হাত থেকে দু'হাত-আড়াই হাত শেষে চার হাতে পৌঁছল।

তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'পলাতক মাছটা যে জলের মধ্যে বড় হচ্ছে। যেমন-যেমন বড় হচ্ছে, তেমন-তেমন দেখাচ্ছি।'

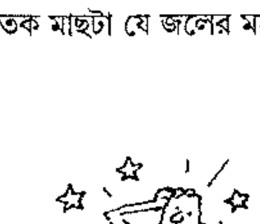

জানোয়ার

বহু বছর আগের কথা সেবার কেন যেন আমি একটু বেশি অসুখ-বিসুখে ভুগছিলাম। তেমন মারাত্মক কিছু নয়, এই একটু জ্বরজাটি, অল্পস্বল্প পেটের গোলমাল। তা হলেও মাঝে মধ্যেই আমাকে দু'-চারদিন শয্যাশায়ী থাকতে হত।

সেইসময় আমার এক প্রাণের বন্ধু, আমার অসুখের খবর পেয়ে একদিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। বন্ধুটি সুরসিক। আসার সময় ফুটপাথ থেকে তখনকার দু'টাকা দামের একটা চটি বই আমার জন্য কিনে এনেছেন। বইটির নাম, 'সচিত্র পশুচিকিৎসা'। পুস্তিকাটি বন্ধুবর আমাকে উপহার দিয়ে বললেন, 'তোমার যেমন হামেশায় অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, এত ডাক্তার-বৈদ্যের খরচ জোগাবে কোথা থেকে, তাই এই বইটি কিনে নিয়ে এলাম। এখন থেকে নিজের চিকিৎসা নিজে করবে।'

এই অপমানজনক দুঃখের গল্পটি এতদিন পরেও ভুলিনি। পুরনো বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ ওই 'সচিত্র পশুচিকিৎসা' বইটি হাতে এল। পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। এদিকে এর মধ্যেই একটি সাময়িক পত্রিকায় পশুর অসুখ বিষয়ে সম্প্রতি একটি নিবন্ধ পাঠ করলাম। সেই রচনা পড়ে যা জানলাম সে খুবই চমকপ্রদ। বানরদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রীতি এবং সামাজিক চেতনা এতই প্রবল যে যদি কোনও কারণে কোনও বানর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, খাদ্য সংগ্রহে অপারগ হয়ে পড়ে, তখন অন্য বানরেরা নিজেরা খাবার না খেয়ে সেই অসুস্থ সঙ্গীকে খাবার জোগায়।

স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরূপ আচরণ মানুষের কাছে সবসময় আশা করা যায় না। তবে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, বোধহয় নিরাপদও নয়।

হঠাৎ কোনও একদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমরা আবিষ্কার করলাম যে বিছানায় আমাদের লেজ খসে পড়ে রয়েছে। আমরা বানর থেকে মানুষ হয়েছি— ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়। বানর থেকে মানুষ বনতে আমাদের হাজার লক্ষ বছর লেগেছে। তবু এখনও বানরেরা অনেক সময় মানুষের মতো আচরণও করে। আবার মানুষও বহু সময়ে বানর বা তার থেকে নিকৃষ্টতম পশুর মতো আচরণ করে। শুধু বানরই বা কেন, প্রায় সব জন্তু জানোয়ারের মধ্যে মানুষের মতো কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়। তাদের আচার-আচরণ আমরা মানুষের মাপকাঠিতেই বিচার করি। সামান্য যে পিঁপড়ে, সেই যে কবি অমিয় চক্রবর্তীর, 'আহা পিঁপড়ে, ছোট পিঁপড়ে ঘুরুক, দেখুক, থাকুক', সেই পিঁপড়েও মানুষের মতোই গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। তারও সমাজ সংসার আছে, তারও আচার-ব্যবহার-আচরণ সবই নিয়ম নির্দিষ্ট।

কিন্তু শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এক পিঁপড়ে গবেষক জানিয়েছেন যে পিঁপড়েরা ঘুম থেকে উঠে অবিকল মানুষের মতোই আচরণ করে। ঘুম থেকে জেগে উঠে তারা প্রথমে ঠিক আমাদের মতো আড়মোড়া ভাঙে, তারপর হাই তোলে। পিঁপড়ের ঘুমই এক আশ্চর্য, অকল্পনীয় ব্যাপার, তারপর সেই ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙা এবং হাই তোলা— সত্যি ভাবা যায় না।

অতঃপর প্রসঙ্গান্তরে যাই। এই আলোচনায় এই প্রসঙ্গ যথাযথ হচ্ছে না কিন্তু পরে ভুলে যেতে পারি এই আশঙ্কায় পাঠকদের জানিয়ে রাখছি। কেউ কেউ হয়তো পত্রান্তরে খবরটি ইতিমধ্যেই পাঠ করেছেন।

বিষয়টি হল, পশুখাদ্য নিয়ে। এখানে অবশ্য পশু মানে সবরকম জানোয়ার নয়। গবাদি পশু।

গবাদি পশুর খাদ্য সমস্যা চিরকালই রয়েছে। বিশেষত খরা অঞ্চলে যেখানে সাধারণ মানুষের খাদ্যই জোটে না, সেখানে আবার পশুখাদ্য? শুধু খড়ের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, তাও সহজলভ্য নয়।

সম্প্রতি এ-ব্যাপারে আশার আলো দেখিয়েছেন গুজরাত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয়টি রীতিমতো হাস্যকর হলেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিস্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, গবাদি পশুকে কাগজ খাইয়ে তার শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়। দৈনিক খাবারের সাতভাগের একভাগ যদি ফেলে দেওয়া, ব্যবহৃত পুরনো কাগজ দেওয়া হয় তা হলে গোরুমোষের পক্ষে ওই খাবার হজম করে প্রয়োজনীয় শক্তি বা ক্যালোরি সংগ্রহ করা সম্ভব। ওই গবেষণায় নাকি এটাও জানা গেছে যে ছাপা কাগজ যদি হয় তবে ওই ছাপার কালির জন্যে কাগজের শক্তিমাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং সেটা গোরুদের পক্ষে খুবই উপযোগী।

এ পর্যন্ত বোঝা গেল। কিন্তু গোরুরা কাগজ খাবে কি না, না খেলে তাদের কীভাবে কাগজ খাওয়ানো যাবে, গবেষণাকারীরা সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। তবে মুদ্রিত কাগজের আর একটি ভাল ব্যবহার জানা গেল সেটাও কম কথা নয়।

এই জাতীয় গবেষণালব্ধ বক্তব্যে আস্থা রাখা খুব কঠিন। তার চেয়ে একটি কাল্পনিক সরস কাহিনীতে শেষ করি।

বানরের কাণ্ডকারখানাই সবচেয়ে মজার। উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডের এক সিদ্ধির শরবতের দোকানে একবার একটা বানর গিয়েছিল শরবত খাবার জন্যে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা, ফুর ফুর করে দক্ষিণের বাতাস বইছে, এমন সময় শরবতের দোকানের সামনের কাঠের বেঞ্চিতে এসে একটি বানর বসল। সেও আরও দশজনের মতো শরবত পান করতে এসেছে। কিন্তু মুখ ভেংচিয়ে, দাঁত-নখ দেখিয়ে দোকানদারকে ভয় পাইয়ে মুফতে শরবত খেতে সে আসেনি।

তার হাতে করকরে একটা দশটাকার নোট। পরপর দু' গেলাস ঠান্ডা শরবত খাওয়ার পর নোটটা দোকানদারকে দিয়ে সে একটু দাঁড়িয়ে রইল খুচরো পাওয়ার আশায়। তখন দোকানদার বলল, 'ওই পুরো দশটাকাই দাম, একেক গেলাস পাঁচটাকা করে।'

এই শুনে বানরটা ফিরে যাচ্ছিল, তখন দোকানদার বলল, 'দ্যাখো, আরেকটা কথা বলছি, আজ পঁচিশ বছর শরবতের দোকান করেছি, কোনওদিন কোনও বানরকে শরবত কিনে খেতে দেখিনি।'

এর জবাবে বানরটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর কোনও দিন দেখবেও না। শরবতের যা দাম, বানরদের সাধ্য কী যে শরবত কিনে খাবে?'

তুমি যে আমার

এই নিবন্ধের নাম 'তুমি যে আমার' না হয়ে 'আমি যে তোমার' হলেও কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। বলাবাহুল্য, এই কাহিনীমালার উপজীব্য দাম্পত্য জীবন।

সবাই জানেন, ভুক্তভোগীরা ভাল করেই জানেন যে বড়ই বিপজ্জনক এই বিষয় এবং সেই জন্যে অনেকেই আমার দুঃসাহসের তারিফ করেন সেকথা আমার জানা আছে।

এই দুঃসাহসিক গল্পকথা শুরু করা যাক দুটো নৈশ কাহিনী দিয়ে। দুটি কাহিনীই প্রায় একরকম, শুধু শেষের দিকে একটু ব্যতিক্রম।

মধ্যরাত অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। মহানগরীর নির্জন রাস্তায় এক ব্যক্তি ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ, যেমন হয়, তার পথ আটকিয়ে দাঁড়াল এক মূর্তিমান পুলিশ। তারপর সেই পুলিশ লোকটিকে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ও হে, এই এত রাতে কোথায় যাচ্ছ।' সহসা পুলিশ দেখে লোকটি একটু চমকিয়ে গিয়েছিল। অল্প পরে ধাতস্থ হয়ে সে পুলিশকে জানাল, 'জমাদারসাহেব, একটা বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছি।'

জমাদারসাহেব ঘাগু লোক, এত সহজে ছাড়বার লোক তিনি নন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ারকি নাকি? এত রাতে বক্তৃতা হবে কোথায়?'

লোকটি জবাব দিল, 'হুজুর, আমার বাড়িতে।' জমাদার সাহেব ধমকিয়ে উঠলেন, 'তোমার আবার কীসের বক্তৃতা? কে বক্তৃতা করবে?'

লোকটি করজোড়ে বলল, 'হুজুর আমার স্ত্রী বক্তৃতা করবেন। বিশ্বাস না হয় তো দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন। প্রতিদিনই এ রকম হয়, দেরি করে বাড়ি ফেরার বিষয়ে প্রতি রাতেই আমার স্ত্রী এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করেন।'

পরের কাহিনীটি এই একই। ওই মধ্যরাত, মহানগরীর নির্জন রাজপথে একাকী পথিক জমাদারসাহেবের মুখোমুখি। তবে এই গল্পের জমাদারসাহেব অল্প কিছুক্ষণ আগে গাঁজাপার্কে বসে কয়েক ছিলিম গাঁজা টেনে এসেছেন, ফলত, তাঁর মন এখন কিছুটা বায়বীয়, তাঁর হৃদয় বেশ আপ্লুত। তিনি মধ্যরজনীর পথিককে বিশাল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সস্নেহে বললেন, 'বাবা, এত রাতে রাস্তায় ঘুরছ, ঘরে কি তোমার বউ নেই? সে যে রাগ করবে।'

নৈশ পথিক বললেন, 'স্যার ঠিকই ধরেছেন, আমি বিয়ে করিনি, ঘরে আমার বউ নেই।' জমাদার সাহেব অতঃপর পথিককে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, ঝরঝর করে তাঁর চোখের জলের ফোঁটা হতভাগ্য নৈশভ্রমণকারীর চোখ মুখ গাল মাথা ভিজিয়ে দিল। সেই সঙ্গে ফ্যাসফেঁসে গেঁজেল কণ্ঠে জমাদার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা তুমি যদি বিয়ে না করে থাক, ঘরে যদি তোমার বউ না থাকে, তবে কীসের দুঃখে তুমি এত রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছ?'

অতঃপর এক হতভাগ্য স্বামীর কথা বলি। বেচারার নতুন বিয়ে হয়েছে। নবপরিণীতা পত্নী খুব আহ্লাদ করে এই প্রথম মাংস রান্না করেছে।

স্বামীর থালায় মাংস তুলে দিয়ে নবীনা স্ত্রী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'ওগো, একটু চেখে বলো তো এই মাংসটা কেমন রান্না করেছি।' তারপর একটু থেমে বলল, 'জানো আজ আমি প্রথম মাংস রান্না করলাম।

একটু মুখে দিয়ে স্বামীর কেমন খটকা লাগল, কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ, স্ত্রীকে সে কথা জানাতে স্ত্রী বলল, 'ও কিছু নয় বার্নল দিয়েছি কি না তাই।' স্বামী স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'বার্নল দিয়ে মাংস রান্না করেছ?' স্ত্রী বলল, 'মাংসটা একটু পুড়ে গিয়েছিল কিনা তাই বার্নল লাগিয়ে দিলাম।' অবশেষে এই নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা উচিত হবে কিনা এই ভেবে এতক্ষণে এই ঘটনাটা লিখছি। দয়া করে কেউ অবিশ্বাস কোরো না, বড় সত্য ঘটনা। আমার অফিসেই ঘটেছিল।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার ব্যাপারে কর্মচারীদের একটি নমিনেশন ফর্ম দিতে হয়, যাতে লিখতে হয় যে এই ব্যক্তিকে আমি মনোনয়ন করলাম আমার অবর্তমানে, (অর্থাৎ মৃত্যু হলে) ইনি এই টাকাটা পাবেন। তারপরে লিখতে হয় যাঁকে মনোময়ন করা হল তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক কী।

সবাই এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা পুত্রকে মনোনয়ন করেন, অবিবাহিতেরা মাকে মনোনয়ন করেন। নির্দিষ্ট ফর্মে প্রথমে নিজের নাম, তারপরে মনোনীতজনের নাম এবং তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র বা মা লেখা হয়।

এইরকম একটি ফর্মে একবার দেখেছিলাম এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে মনোনীত করেছেন, স্ত্রীর নাম ঠিকই লিখেছেন কিন্তু ঠিক তার পরের ঘরে সম্পর্কের জায়গায় লিখেছেন, 'খুব খারাপ সম্পর্ক, মোটেই বনিবনা নেই।' একথা তিনি বুঝে লিখেছিলেন, নাকি না বুঝে সেটা কিন্তু জানতে পারিনি।

পুনশ্চ: স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রীকে ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে বললেন, 'ওগো রোগা হওয়ার ট্যাবলেট তো তুমি অনেক খেলে, কিন্তু কিছুতেই তো কিছু হল না। এবার তোমাকে ডাক্তারবাবু এই ট্যাবলেটগুলো দিয়েছেন, এগুলো কিন্তু খাওয়ার জন্যে নয়।' এই বলে স্বামী পঁচিশটা গোল আকারের ট্যাবলেটের একটা শিশি স্ত্রীর হাতে দিলেন। স্ত্রী বললেন, 'তা হলে এই ট্যাবলেটগুলো কী কাজে লাগবে?' স্বামী বললেন, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন, দিনে তিনবার এই ট্যাবলেটগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে, তারপর সেগুলো গুনে গুনে কুড়িয়ে শিশিতে তুলে নেবে। দ্যাখো এতে যদি রোগা হওয়া যায়।'

সৈয়দ মুজতবা আলি

অনেকদিন পরে এবার একজন জ্যান্ত মানুষের কথায় আসছি, সৈয়দ মুজতবা আলি।

আমার এই অল্পবেশি চার দশকের সাহিত্যজীবনে কত উত্থানপতন দেখলাম। কত দিগ্বিজয়ী লেখককে ঘোড়া থেকে ছিটকিয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়তে দেখলাম। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছিল যে লেখককে, মৃত্যুর দু' বছর পরে তাঁর আর কোনও পাত্তা নেই। তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন নেই, তাঁর রচনার আলোচনা নেই, থাকলেও দায়সারা। দোকানের শো-কেসে তাঁর বই নেই। শৌখিন পাঠিকার বালিশের নীচে কেশতেলে সিক্ত সেই পুরনো পত্রিকা আছে কিন্তু তাতে তাঁর কোনও কথা নেই।

বেশি বলে লাভ নেই। মোদ্দা ব্যাপার হল, জীবদ্দশায় অতি বিখ্যাত, অতি জনপ্রিয় অনেক

লেখকই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মরে যান। দু'-চার দিন ওই শ্রাদ্ধশান্তি, নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত টিকে থাকেন। তারপর কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে মুজতবা বেঁচে রয়েছেন। এখনও তাঁর বই, গ্রন্থাবলি প্রকাশক ছাপেন। লোকে কেনে লোকে পড়ে। 'কোরক' নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা এই বইমেলায় সৈয়দ মুজতবা আলির ওপরে একটি সংখ্যা বার করেছেন। প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার রীতিমতো গ্রহণযোগ্য সংকলন।

'শেষমেষ' নামক এই তরল নিবন্ধমালায় পুস্তক বা পত্রিকা সমালোচনার সুযোগ নেই। আমরা সে ব্যাপারে যাচ্ছি না। সৈয়দ মুজতবা আলির অতি বিখ্যাত, অতি পরিচিত সরস কবিতা কথিকাগুলি পুনরুদ্ধার করারও কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সেই সব রসিকতার আখ্যান বাঙালি পাঠকের খুবই পরিচিত।

কোরকের এই মুজতবা সংখ্যায় আমি মুজতবা সাহেবের কয়েকটি অলিখিত রসিকতার সন্ধান পেলাম, তাঁর চিঠি বা আলাপচারিতা থেকে এইগুলি উৎকলিত। বলাবাহুল্য, মুজতবা-বাক্যের কোনও তুলনা নেই। শেষমেষের পাঠক-পাঠিকারা একবার দেখুন।

বিশিষ্ট চর্মরোগ চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ ডা. মহম্মদ আব্দুল ওয়ালির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল সৈয়দ মুজতবা আলির।

ডাক্তার ওয়ালি এক বৃষ্টির দিনের গল্প বলেছেন। সকালবেলা প্রতিবেশী এক বন্ধুর বাড়িতে চা-পানের আসর বসেছে। সে আসরের মধ্যমণি, বলা বাহুল্য, সৈয়দ মুজতবা আলি। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, এমন সময় মুজতবা উঠে দাঁড়ালেন আরামকেদারা ছেড়ে একবার নিজের বাসায় যাবেন, সেখান থেকে কী একটা দরকারি বই নিয়ে আসবেন। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। 'যাবেন না, যাবেন না। বাইরে বেরবেন না।'

মুজতবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' সবাই বলল, 'দেখছেন না বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে ভিজে যাবেন যে।' শুনে মুজতবা হেসে বললেন, 'আমি মিছরি না চিনি? ভিজলে কি আমি গলে যাব।'

অল্পক্ষণ পরে নিজের বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় বইটি হাতে নিয়ে মুজতবা ফিরে এলেন। তারপর হাসতে হাসতে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কী জানো যে ইহুদিরা ছাতা কেনে না।' সবাই বলল, 'না, এ রকম কথা তো আমরা কখনও শুনিনি।' মুজতবা বললেন, 'না, শুনে থাকো তাতে কিছু আসে যায় না। তবে কারণটা জানতে চাও কি?' সবাই জিজ্ঞাসা করল, 'কী কারণ?' মুজতবা বললেন, 'ইহুদিরা এতই বুদ্ধিমান ও হিসেবি যে তারা বৃষ্টির ফাঁক দিয়ে হাঁটতে পারে, তাই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটলেও তারা ভেজে না।'

আরেকবার প্রাণীবিজ্ঞানের এক নবীন অধ্যাপক ও গবেষককে নিয়ে ওয়ালি সাহেব মুজতবা আলির কাছে গেছেন। তাকে দেখে বক্রদৃষ্টিতে তিনি শুধালেন, 'হঠাৎ এখানে এসে হাজির কেন?' ওয়ালি সাহেব বললেন, 'আপনার ভক্ত। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহে এসেছে।' মুজতবা আলি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না। না। না। আসল মতলবটা হল এই চ্যাংড়া অধ্যাপকের রিসার্চ সেক্টরে জন্তু-জানোয়ারের নিশ্চয় কিছু অভাব ঘটেছে। তাই আমাকে দেখতে এসেছে। পছন্দ হয় কি না।'

সৈয়দ মুজতবা আলি সম্পর্কে আর একটি মারাত্মক গল্প লিখেছেন ওয়ালিসাহেব। সৈয়দ মুজতবা আলি অতিথিবৎসল ভদ্রলোক ছিলেন। একবার সপরিবারে ওয়ালিসাহেবকে তিনি নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে মুজতবা সাহেব বেশ কিছুটা পথ অতিথিদের এগিয়ে দিয়ে এলেন। অনেকটা পথ এগিয়ে দেওয়ার পরে স্বাভাবিক সৌজন্যবশত ওয়ালিসাহেব আপত্তি জানালেন, 'অনেকটা পথ এসে গেলেন, আপনি আর এগোবেন না।' কিন্তু মুজতবা আলি আরও অনেকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত ফিরে আসার সময় বললেন, 'আমি আমার বন্ধুদের ঠিক সেই পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যাই যেখান থেকে তাদের ফিরে আসার আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না।'

পুনশ্চ:

শেষ কাহিনীটি শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের। এই 'কোরক' কাগজেই তাঁর সৈয়দ মুজতবা আলি সম্পর্কে 'কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত মুজতবার 'দেশে বিদেশে' বইটির একটি রিভিউ করেছিলেন। সেটি পড়ে মুজতবা রাধাপ্রসাদবাবুকে এক কপি ওই বই 'দেশে বিদেশে' পাঠিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে লেখেন, 'শাঁটুল মামু, (রাধাপ্রসাদের ডাকনাম শাঁটুল) তুমি আমার বইয়ের যে রকম বেশরম প্রশংসা করেছ তা থেকে পরিষ্কার মালুম হচ্ছে তুমি আমার লেখাটা পড়োনি। যাতে ভাল করে পড়তে পারো সেজন্য এই বইটা দিলাম।'

ধারদেনা

মহাগুরু শিবরাম শতবর্ষে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করছি।

আমাদের এবারের বিষয় ধারদেনা। ধার সকলেই করে থাকে। যে বড়লোক প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকে, শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলিতি গাড়ি চড়ে, যখন-তখন দিল্লি-হিল্লি-লন্ডন-নিউইয়র্ক যায়, বাজারে তার ধার কোটি কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের কাছে, সরকারের কাছে এমনকী কোম্পানির নামে শেয়ার বেচে আপামর জনতার কাছে।

হিসেব নিলে দেখা যাবে এদের নিজের অর্থ মোটেই নেই সবই অন্যের পরস্মৈপদী।

এর তুলনায় সাধারণ গৃহস্থ মোটামুটি ভাল। তার হয়তো ব্যাঙ্কের কাছে বাড়ি তৈরির ঋণ—তার হয়তো আত্মীয়-বন্ধুর কাছে মেয়ের বিয়ের সময়, পিতৃশ্রাদ্ধের সময় কিছু ঋণ আছে।

কিন্তু তার সামান্য আয় থেকে সে শোধ দেওয়ার চেষ্টা করছে, এটাই মধ্যবিত্ত মানসিকতা।

বড়লোকেরা এই সব ঋণশোধ নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করেন না। তাঁদের আমোদ-প্রমোদ বিলাসিতা সবই ঋণের টাকা থেকে।

আমাদের এই দেশে হাজার-হাজার কোটি-কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ঋণ রয়েছে—এইসব লোকেদের।

আবার যে ভিখারি পাশের ভিখারির কাছ থেকে একটা বিড়ি, বা দু' মুঠো চাল ধার করে—সেটাও কিন্তু সে শোধ দেয়। নিম্নমধ্যবিত্তরাও ব্যাঙ্ক থেকে না পেলেও প্রয়োজনে আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীর কাছ থেকে টাকা ধার নেয় এবং যথাকালে শোধ দেওয়ার চেষ্টা করে।

গরিবের সমাজে যথাকালে ঋণ শোধ না দেওয়া অসম্মান বলে পরিগণিত হয়।

বড়লোকেদের "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই চাণক্য শ্লোকে আস্থা নেই।

সে যাহোক শিবরাম চক্রবর্তীকে স্মরণ করার পরে এতসব বড় বড় কথা না বলাই ভাল। বরং শিবরামের ধার শোধ করার সহজ পদ্ধতিটি বলি—যতদুর মনে পড়ছে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধনের কাহিনী। শিবরাম কোনও এক সপ্তাহের গোড়ায় হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে শ-পাঁচেক টাকা ধার করেছেন।

তারপর সপ্তাহের মাঝামাঝি গোবর্ধনের কাছ থেকে টাকা-ধার নিয়ে ওই টাকা শোধ করেছেন। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ চলল তারপর একদিন হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন দু'-ভাইকে একত্রে পেয়ে—

শিবরাম বললেন দেখ আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে থাকতে চাই না। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রথমে হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে টাকা দেবে আবার সপ্তাহের মাঝখানে সেই টাকা গোবর্ধন হর্ষবর্ধনকে দেবে।

এইভাবে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন, গোবর্ধন-হর্ষবর্ধন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলবে। ঋণ গ্রহীতার আর ঋণশোধের প্রয়োজন কী?

কেউ কোনও উপকার করলে তাকে 'চিরঋণী থাকব' বলে এক ধরনের ভদ্রতা আছে।

কিন্তু সত্যিই যদি কারওর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তাকে যদি বলি চিরঋণী থাকব—তাহলে সে বোধহয় আঁতকে উঠবে।

অবশ্য শিবরাম যে কৌশলে ওপরের গল্পে ঋণশোধ করেছেন তারপরে চিরঋণী থাকার প্রশ্ন আসে না। এখানে ঋণ নিয়মিত শোধ হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে রবিবাসরীয় সংবাদপত্রে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। মনে রাখার মতো গল্প।

গল্প লেখক একদিন সকালবেলা খবরের কাগজে দেখতে পেলেন লটারিতে তাঁর নম্বর উঠেছে, দশ বিশ টাকা নয়—প্রথম পুরস্কার দশ লক্ষ টাকা।

এই টাকা পেয়েও তাঁর মাথা কিন্তু ঠিক রইল। তিনি বুঝতে পারলেন লটারির টিকিটের খবর গোপন করা যাবে না—সবাই জেনে যাবে এবং নানা অছিলায় টাকা চাইতে থাকবে।

মনে মনে এই রকম ব্যক্তিদের সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করে তিনি একের পর এক ফোন করতে লাগলেন, "ভাই বড় বিপদে পড়েছি—হাজার দশেক টাকা দেবে?" সবাই নানা অজুহাতে তাঁকে এড়িয়ে গেল। এবার গল্প লেখক নিশ্চিত তাঁর কাছে আর কেউ টাকা চাইতে আসবে না।

শিবরাম চক্রবর্তী

ঠিক পঁচিশে বৈশাখের মুখোমুখি 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। শিবরাম চক্রবর্তী স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লেখা চাই। মে মাসের মধ্যেই দিতে হবে।

বাংলায় বৈশাখ, ইংরেজিতে মে দুই-ই রবীন্দ্রনাথের মাস। কথাসাহিত্যের চিঠি পেয়ে মনে পড়ে গেল বহুকাল আগে শিবরাম চক্রবর্তীর অল্পবিস্তরের একটি কবিতা।

অল্পবিস্তর ছিল শিবরাম চক্রবর্তীর সাপ্তাহিক কলাম আনন্দবাজারে। সেখানে শিবরাম চক্রবর্তী শুধু নিজের টীকা-টিপ্পনি মন্তব্যাদি ছাপতেন তাই নয়, বাইরে থেকে পাঠানো চিঠিপত্র থেকে অনেক কিছু উদ্ধৃত করে ছাপতেন।

একথা স্বীকার না করলে গুরু পাপ হবে এই অল্পবিস্তরের পৃষ্ঠাতেই হাস্যকর লেখায় আমার হাতেখড়ি। অল্পবিস্তরই আমাকে প্রথম খ্যাতির স্বাদ দিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তী আমার মজাগুরু। তাঁরই হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রাসাদের সরস মিষ্টান্নের ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম।

সে যা হোক, পঁচিশে বৈশাখের কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখে অল্পবিস্তরের সেই আশ্চর্য কবিতাটি আমার আবার মনে পড়ে। কত কী ভুলে গিয়েছি চল্লিশ বছরে কিন্তু সেই কবিতাটি আশ্চর্য মনে আছে।

চাকর পরিলো ধুতি
গিলে করা পাঞ্জাবি
তাহারে কহিনু ডাকি
আজ "তুই কোথায় যাবি"?
কোঁচাটি লইয়া হাতে
হাসি হাসি বদনে
কহিল "যাইব আমি রবীন্দ্রসদনে।"

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিবরাম আমার সঙ্গেও একটা ব্যক্তিগত রসিকতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য। বয়সের হিসাবে আমার বাবার চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড়। তবু ছোটখাটো ব্যাপারেও হালকা রসিকতা করতে ছাড়তেন না।

তখন আমি বেকার, একুশ-বাইশ বছর বয়স, সদ্য এম. এ পরীক্ষা দিয়েছি, কলেজ স্ট্রিট-এর ফুটপাতে ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। তখন আমার সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে তাঁর মেসের ঘরের দেয়ালে আমার নাম ঠিকানা লেখা হয়ে গিয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে যেমন কখনও কখনও থাকত, সেদিন একটি মেয়ে ছিল।

আমাকে দেখে শিবরাম চক্রবর্তী কাছে ডাকলেন। এবং হঠাৎ মেয়েটিকে দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই একে বিয়ে করবি?"

আমি স্তম্ভিত, মেয়েটি তথৈবচ। আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলল, "না। একে আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমার পছন্দ আপনাকে, আমি আপনাকে বিয়ে করব।"

শিবরাম চক্রবর্তী গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে পারব না। আমার তো পাত্রী ঠিক আছে।"

মেয়েটি চেপে ধরল। আপনার যত সব বাজে কথা। আপনার পাত্রীকে কখনও দেখতে পাই না কেন। শিবরাম বললেন, "কীভাবে দেখবেন? সে তো গিয়েছে ঝরিয়ায়।"

আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে প্রশ্ন কররাম, ঝরিয়ায়? শিবরাম মৃদু হেসে বললেন, "শোনোনি ঠাকুর গান লিখেছেন, 'ফাগুনের ফুল গেছে ঝরিয়া'।"

শিবরামের অনুরূপ আর একটি রসিকতার কথা মনে পড়ছে। ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করে উত্তর সীমান্তে চিন যখন বিস্তর ভারতীয় এলাকা দখল করে নিল শিবরাম বলেছিলেন অল্পবিস্তরের কলামে, রবীন্দ্রনাথ তো আগেই বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তো লিখেই গিয়েছেন, "একদিন চিনে নেবে তারে।"

শিবরামকে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। সব গল্প বলা যাবে না। শুধু দুঃখের ঘটনা বলি। শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন শিবরাম চক্রবর্তী। নাটকের নাম হয় ষোড়শী। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত ও অভিনীত ষোড়শী খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে শিশির ভাদুড়ীর ব্যবহারে শিবরাম ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি তখন শিশির ভাদুড়ীর সম্পর্কে লিখেছিলেন, "শিশির ভাদুড়ী নহ তুমি বোতলের—"

শরৎচন্দ্রের কাছেও শিবরাম এই প্রসঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও কোনও সুরাহা হয়নি। শরৎচন্দ্রের পরিষদ-প্রধান ছিলেন অবিনাশ ঘোষাল। অল্প কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর ভেলি মারা গিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে, শিবরাম লিখলেন সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি,

“ভেলির বিনাশ নাই ভেলি অবিনাশ”

শিবরাম, শুধু শিবরাম, শুধু শিবরাম চক্রবর্তী পারতেন এমন সরস প্রতিশোধ নিতে। শিবরাম চক্রবর্তী অমর রহে।

যাচ্ছেতাই লেখা লিখছি

পরিণত বয়সে খ্যাতি ও সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শিখরে উঠে মহামতি পিকাসো এক করুণ স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “মানুষ এখন আর শিল্পের মধ্যে সমবেদনা বা অনুপ্রেরণার খোঁজ করে না। সংস্কৃতিবান মানুষেরা, যাঁরা ধনী, অলস, বেহিসাবি, গোলমেলে তাঁরা সব সময়ই নতুন কিছু চান, অসাধারণ কিছু চান। এবং আমিও গতিক বুঝে সেই কিউবিসম-এর যুগ থেকে এই সব লোককে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি। অবাস্তব বিমূর্ত হিজিবিজি অর্থহীন যা কিছু আমার মাথায় এসেছে তাই দিয়ে।

এই লোকগুলি যত কম বুঝতে পেরেছে, তত আমার প্রশংসা করেছে। আমি নিজেকে এ রকম সব নিরর্থক খেলায় নিযুক্ত করেছিলাম। এবং এই সব ছবির গোলকধাঁধা ও জটিল হিজিবিজিতে যা হওয়ার তাই হল। আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম খুব দ্রুত। এ যুগে ছবির জগতে একজন সেলিব্রিটি মানে অগাধ অর্থ, প্রচুর বিক্রি, প্রচুর আয় ও সম্পদ।

এখন সবাই জানে আমি অতি বিখ্যাত এবং ধনী। কিন্তু যখন আমি নিজের সঙ্গে থাকি, তখন আমার সাহস হয় না নিজেকে শিল্পী বলে ভাবতে। আজ আমি বুঝি আমি সামান্য এক জনচিত্ত মনোরঞ্জনকারী, যে জানে, যে বুঝতে পেরেছে জনসাধারণ কী চায়।”

শুধুমাত্র পিকাসোই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। জীবনবোধের কোন পর্যায়ে চলে গেলে মানুষ এ রকম সাহসী ও বিনয়ী হতে পারে। আমাদের প্রধান শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজেকে কেষ্ট-বিষ্টু ভাবেন। সবাই অমরত্বের সিঁড়ি ধরে দ্রুত গতিতে উঠে যাচ্ছেন। কারও মনে কোনও গ্লানি নেই।

কোথায় কবে পিকাসোর এই উদ্ধৃতিটা পেয়েছিলাম, সে এখন আর মনে নেই। বহুকাল মানিব্যাগের মধ্যে ছিল।

মানিব্যাগ বদলের সময় টাকা-পয়সা খুচরো কাগজপত্র সুদ্ধ পরের মানিব্যাগ-এ চলে এসেছে। আগে কখনও কখনও খুলে পড়তাম। আমার নিজের দুর্দশা দেখে মন খারাপ হত, চোখে জল আসত। এবার মানিব্যাগ বদলানোর সময় কাগজটা আবার চোখে পড়ল। খুবই জীর্ণ অবস্থা। ভাজা পাঁপরের মতো।

আমি পিকাসো নই। পিকাসোর প্রতিভা কণামাত্র আমার নেই। তাঁর মতো প্রতিভা ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভাগ্যে কখনও জুটবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই লেখাটুকু পড়তে পড়তে এর বক্তব্যের সঙ্গে আমি আমার মনের মিল খুঁজে পাই।

আমিও তো এক প্রতারক লেখক। জনপ্রিয়তার লোভে সারা বছর ধরে, বছরের পর বছর,

আবার বছরের পর বছর সেই একঘেয়ে যাচ্ছেতাই লেখা লিখে যাচ্ছি। বোকা বোকা বস্তাপচা রসিকতা করে যাচ্ছি। আমার নিজের উপর কেমন মায়া হয়। এইরকম লেখার কথা কি ছিল? কী লিখতে চেয়েছিলাম? কী লিখলাম?...

...এই পর্যন্ত লিখেছি এই সময় গঙ্গারাম এসে উদ্ধার করল। গঙ্গারাম প্রশ্ন করল, 'সেই জগৎজয়ী লেখকের কথা মনে আছে, যিনি বলেছিলেন বিশ পঁচিশটা বই লিখে আমি টের পেলাম আমার কোনও প্রতিভা নেই। লেখক হিসাবে আমি অযোগ্য।'

তারপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তা হলে লিখছেন কেন? লিখে যাচ্ছেন কেন?' তিনি দুঃখের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'কী করব। কোনও উপায় নেই, আমি যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছি, জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছি'।"

দুর্বৃত্তের শাসানি

খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ছেয়ে গিয়েছে খুন-জখম-ডাকাতি ছিনতাইয়ের ঘটনায়। আমরা একটু দুর্বৃত্তায়ন করলে কেউ কিছু মনে করবেন না।

সেই এক দুর্বৃত্তের গল্প তো সবাই জানে। জেলে গিয়েও তার দুষ্টবুদ্ধি মোটেই হ্রাস পায়নি। জেল থেকে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিল, বাড়ির পেছনে বাগানটার দিকে একটু নজর রেখো—ওখানে অনেক পরিশ্রম করে, কষ্ট করে পাওয়া টাকা-পয়সা গয়নাগাটি পুঁতে রেখেছি। বাগানটায় সবসময় নজর রাখবে।" এই চিঠি যেদিন স্ত্রী পেলেন, তার পরের দিনই গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন বড় বড় কোদাল নিয়ে এসে হাজির। তারা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "চোরাই জিনিসপত্র টাকা-পয়সাগুলি কোথায় পোঁতা হয়েছে।"

স্ত্রী বললেন, "আমি কিছুই জানি না। এই চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন।" গোয়েন্দা পুলিশের এই চিঠি পড়ার দরকার পড়ল না। তারা আগেই পোস্ট অফিস থেকে ওই চিঠি জেরক্স করে নিয়েছে।

এরপর তারা ধারালো বড় বড় কোদালে কুপিয়ে বাড়ির পিছনের উঠোন চষে ফেলল। চোরাই মাল, টাকা-পয়সা-গয়নাগাটি কিছু পাওয়া গেল না। তারা গালাগালি করতে করতে চলে গেল, পরদিন আসামির স্ত্রী জেলে আসামিকে চিঠি পাঠাল, "পুলিশ সারা উঠোন চষে ফেলেছে কিন্তু কিছুই পায়নি।"

এবার জেলখানা থেকে উত্তর এল, "খুব ভাল কথা—তুমি ওই চষা উঠোনে এবার আলু পুঁতে দাও।"

গভীর রাতে বাড়ি ফিরছিলেন পরেশবাবু। হঠাৎ দু'জন লোক তাঁকে আক্রমণ করে। নরেশবাবুর হাতে ঘড়ি ছিল না, পকেটে কলম ছিল না, কিন্তু এই লোকগুলো নরেশবাবুকে ছাড়ল না।

টাকাপয়সা যা আছে ছিনিয়ে নেওয়া চেষ্টা করল। নরেশবাবু প্রচণ্ড বাধা দিতে লাগলেন। দারুণ জাপটা জাপটি ধস্তাধস্তি শুরু হল। নরেশবাবু একা গুণ্ডাদের সঙ্গে পারবেন কী করে? তিনি ঘণ্টা খানেক লড়বার পর আত্মসমর্পণ করলেন।

ততক্ষণে একজন দুর্বৃত্তের জামা ছিঁড়ে দিয়েছেন, আর এক দুর্বৃত্তের চশমা চোখ থেকে পড়ে পদতলে চূর্ণ হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত নরেশবাবুর সমস্ত পকেট হাতড়ে একটাকা পঁয়ষট্টি পয়সা বেরুল। তার মধ্যে দশ পাঁচ পয়সাও রয়েছে, যা আজকাল চলে না।

লোকগুলো ওই একটাকা পঁয়ষট্টি পয়সা নরেশবাবুর মুখে ছুড়ে মেরে বলল, "সামান্য এই ক'টা পয়সার জন্য কী লড়াটা লড়লেন—জামা ছিঁড়ে দিয়েছেন, চশমা ভেঙে দিয়েছেন।"

একথা শুনে নরেশবাবু রেগে গেলেন। তাঁর আত্মসম্মানে লাগল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "মাত্র এই ক'টা পয়সা নয়, আমার পায়ের জুতোর মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট রয়েছে।"

এরপরের গল্পটি আরও করুণ। একটি সিনেমা হলে তথাকথিত আর্ট ফিল্ম হচ্ছিল। সেখানে কিছু না বুঝে এক ভদ্রবেশী ছিনতাইকারি প্রবেশ করেছিল। সে দেখল একের পর এক দর্শক ছবিটি না দেখে—ধীরে ধীরে উঠে চলে যাচ্ছে।

একটু পরে ছিনতাইকারি উঠল। সরাসরি টিকিট ঘরে গিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করে বলল, "লোক ঠকানোর জায়গা পাওনি—এসব কি ছবি না কী? দিন, টাকা ফেরত দিন।" ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি ইতস্তত করছে দেখে দুর্বৃত্তটি বলল, "শুধু আমার টাকা নয়, যারা সিনেমা না দেখে চলে যাচ্ছে সবার টাকা আমায় ফেরত দিন।"

নিজের কোট খুলতে পারে না

বৃদ্ধদের নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক রঙ্গ-রসিকতা-ছেলেখেলা করলাম। বৃদ্ধরা অনেকেই আমার প্রতি চটেছেন। আমি নিজেও প্রায় বৃদ্ধ। আয়নার আমি সুযোগ পেলেই আমাকে ধমকাচ্ছে, বলছে, হচ্ছেটা কী!

সুতরাং, আপাতত বৃদ্ধরা কিঞ্চিৎ দূরে থাকুন, ছেলেদের নিয়ে, মানে, শিশুদের নিয়ে একটু ছেলেখেলা করি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"জগৎ পারাবারের তীরে—
শিশুরা করে খেলা—"

বছর কয়েক আগে একালের রঙ্গ সাহিত্যিক এই সুবাদে লিখেছিলেন, শিশুরা শুধু জগৎ পারাবারের তীরেই খেলা করে না, তারা আলমারির মাথায়, ছাদের কার্নিশে, রাজপথে চলন্ত ট্রাফিকের মধ্যে, মাঠে-ঘাটে যেখানে পারে খেলা করে।

খেলার কথায় পরে যাচ্ছি, আপাতত একটা লেখাপড়ার গল্প বলে নিই।

আমার এক অসমবয়সি অনুরাগিণীর পাঁচ বছরের মেয়েটি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমি যেদিন বিকেলবেলায় তাদের বাসায় যাই, তখন সে স্কুল থেকে ফিরল।

আমি তাকে ডেকে বললাম, "বাঃ! স্কুলে যাচ্ছ? আজ কী শিখলে?"

সে শুকনো মুখে জবাব দিল, "আজ কিছু শেখা হয়নি। কাল আবার যেতে হবে।"

আমি তাকে বোঝাতে গেলাম, না শুধু কাল নয়, আরও কত কাল তাকে বইয়ের বোঝা কাঁধে করে, পরীক্ষার চিন্তা মাথায় করে দশ-বারো-বিশ বছর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে, গ্রীষ্মের রোদে পুড়তে পুড়তে হাজার হাজার দিন ক্লাসে যেতে হবে।

বাচ্চাদের বুদ্ধির গল্প দুই-একটা বলি। এত লেখাপড়া, বইখাতার অত্যাচারে ও বিদ্যার পাহাড়ের নীচে চাপা পড়েও বালকের বুদ্ধিবৃত্তির অভাব হয় না।

একটি বালককে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মনে করো তুমি পার্কে খেলতে গিয়ে একটা টাকার ব্যাগ পেয়েছ, বড় চটের থলেভর্তি টাকা—প্রায় পাঁচ দশ লাখ—টাকার মালিক যদি তোমার কাছে আসে, তা হলে কি তুমি তাকে টাকাটা ফেরত দেবে?

ছেলেটি সামান্য ভেবে নিয়ে তারপর বলল, "ওই টাকার মালিক যদি গরিব হয়, তা হলে নিশ্চয় দেব।"

আর একবার একটি মেলায় একটি ছোট মেয়েকে দেখেছিলাম তার হাতে আঁকা গ্রিটিংস কার্ড দু' টাকা করে বেচছে। আমি কিনতে গেলে সে আমাকে বলল, সে এই টাকা নিজে নেবে না। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তা হলে এই টাকা কী করবে?"

মেয়েটি বলল, দেশের যত লোক না খেয়ে আছে, তাদের পাউরুটি কিনে খাওয়াবে। আমি বললাম, "খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি একা কী করে এত বড় কাজ করবে?"

সে গর্বিতভাবে বলল, "আমি একা নই, আমার বন্ধু বাচ্চু, সে ওই গেটের কাছে এ রকম গ্রিটিংস কার্ড বেচছে।" অন্য এক শিশুর কথা মনে পড়ছে। সেই শিশুটির কথা কতবার বলেছি। তাকে স্কুলের দিদিমণি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কাক কালো কেন?"

সে শশব্যস্তভাবে উত্তর দিয়েছিল, "কাক কী করবে? কাকের মাও কালো। বাবাও কালো।"

এরই সঙ্গে আর-একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "ভাল্লুকের গায়ের কোট কেন ভাল্লুক কখনওই খোলে না?"

সে চটজলদি জবাব দিয়েছিল, "কী করে খুলবে? ভগবান যে বোতামগুলো লুকিয়ে রেখেছে।"

ভোজসভা শেষে বক্তৃতা

টোস্ট বলতে আমরা অল্প বয়সে এক ধরনের বিস্কুট বুঝতাম। আটার চেয়ে ভুষি বেশি দিয়ে এবং খুব সম্ভব অল্প গুড় কিংবা চিনির গাদ দিয়ে তৈরি বড় বড় বিস্কুট। আমাদের ছোটবেলায় দাম ছিল এক পয়সা, কি দু'পয়সা।

অনেক লোক এটাকে বলত লেড়ে বিস্কুট। কেউ কেউ বলত ডগ বিস্কুট। অবশ্য কুকুরের খাবার বিস্কুট ভেবে এই নাম বলা হত। কিন্তু সাহেবরা যাকে ডগ বিস্কুট বলেন, সে একটু আলাদা জিনিস। কুকুরদের জন্যে তৈরি। বেশ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম আছে। আমি গোপনে খেয়ে দেখেছি, বেশ সুস্বাদু।

আজকাল ওই টোস্ট বিস্কুট আবার খুব চালু হয়েছে। অনেকেই খাচ্ছে। মধ্যবিত্তের চায়ের টেবিলে পৌঁছে গিয়েছে। বড় বড় বিস্কুট কোম্পানি পর্যন্ত টোস্ট বিস্কুট তৈরি করছে। ভাল ব্রান্ডের একটা বড় প্যাকেটের দাম কুড়ি টাকা। ক্রিম ক্র্যাকার কিংবা থিন অ্যারারুটের চেয়ে দাম বেশিই বলা যায়। টোস্ট বলতে এর পরে পাউরুটি টোস্টের কথা। স্বর্ণ বর্ণ মাখন আচ্ছাদিত হিরের মিহি টুকরোর মতো বড় দানার ঝকঝকে চিনি। শুধু ব্রেকফাস্টের জন্য নয়, যে কোনও সময়ই এ রকম ভাল খাবার পাওয়া সৌভাগ্য।

আগে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় যেমন মোটামুটি ভাল রেস্তোরাঁ পাওয়া যেত, ভাল চা পাওয়া যেত, তেমনই মাখন টোস্ট ও ওমলেট। সেই ওমলেট, সেই মাখন টোস্ট এখন আর মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না। তার জায়গায় মিলতে পারে তেল চপচপে শস্তা স্যস-সিক্ত এগরোল। বড়জোর চাউমিন নামক এক জটিল রহস্যময় খাবার।

বৃথা কালব্যয় করলাম। এখনও আসল টোস্টের কথাই বলা হয়নি। সাহেবদের পৃথিবীতে পান-ভোজন, বক্তৃতা ইত্যাদি একই পরম্পরায় আসে। কবিতার ভাষায় যাকে বলা যায় পরম্পরীণ বা ধারাবাহিক। এই ভোজসভা শেষ হয় বক্তৃতা দিয়ে। ভোজনান্তের এই বক্তৃতা নিয়ে অনেক চমৎকার রসিকতা আছে।

পুরাকালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামিদের গ্রিক দেশে সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হত, হাজার হাজার দর্শক সিংহের সেই মহাভোজ দেখত। হাততালি দিত। মৃত্যুভয় পীড়িত অসহায় মানুষের দুর্দশা দেখে আনন্দে উল্লসিত হত। হয়তো বা অন্যান্য দুর্বৃত্ত কিছুটা ভয়ও পেত।

একদিন এক আসামিকে যেই সিংহ আক্রমণ করতে এসেছে, সেই আসামি ভয় না পেয়ে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সিংহের কানে কানে কী যেন বলল। সিংহটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিছু না বলে লেজ গুটিয়ে লুকিয়ে পড়ল। সবাই অবাক। রাজা সেই আসামিকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সিংহকে কী এমন বললে যে সে ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেল।" লোকটি বলল, "হুজুর আমি সিংহকে বলেছি যে, আমাকে খাবার পরে তোমাকে বক্তৃতা করতে হবে। এই চারদিকে এত লোক তোমার বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। সিংহ এই শুনে পালিয়েছে। বক্তৃতা করতে হবে শুনে ভয়ে।"

এই ভোজনান্ত বক্তৃতা তারই বিপরীত দিকে রয়েছে টোস্ট বা উদ্‌বোধন বক্তৃতা। টোস্ট হল পান-ভোজন শুরু হওয়ার আগে কিঞ্চিৎ সুরা গেলাস থেকে ঠোঁটে ছুঁয়ে অধিবেশন আরম্ভ করা।

অনেক সময় এই সূত্রে ছোট বক্তৃতাও হয় মাননীয় অতিথিদের উদ্দেশ্যে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিদেশের এক ভোজসভায় অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে টোস্টের সময় দেখা যায় বাকি সবারই ওষ্ঠ সুরাসিক্ত হলেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বিশুদ্ধ জল পান করছেন। তা এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন কিশোর বয়সের পর তিনি মদ ছোঁননি। এর উলটোটাও অবশ্য দেখা যায়। এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা কিশোর বয়সের পর জল ছোঁননি। মানে শুধু মদ খেয়েছেন।

মৃত্যুপথযাত্রী এক সরাবখানার মালিকের ঠোঁটে শেষ মুহূর্তে জল দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, বাবা, আমাকে মুখে যা দিয়েছ, সে জিনিস দোকানে দোকান বেচতে যেয়ো না, কেউ কিনবে না।

শুধু পাঠিকারা চিঠি লেখে

এক গ্রামে এক বৃদ্ধ পেটুক ব্রাহ্মণ। তাঁর এমনিতে কোনও দোষ নেই। শুধু খেতে খুব ভালবাসেন।

বৃদ্ধ মানুষটি ভাল। সবাই তাঁকে খাওয়াতেও ভালবাসে। পাড়ার লোক একবার একটা বিরাট নৌকা ভাড়া করে পিকনিক করতে গিয়েছে। পিকনিক হবে গ্রাম থেকে দূরে। একটা নদীর চড়ায়।

নৌকো ভর্তি চাল, ডাল, তেল, কাঠ নিয়ে সবাই পিকনিক করতে রওনা হল। যাওয়ার সময় তারা ব্রাহ্মণকে নিয়ে যেতে ভুলল না। আহা, গরিব ব্রাহ্মণ লোকটি খেতে ভালবাসে। আমাদের সঙ্গে ও পিকনিক যাবে।

নৌকো যখন চড়ার ধারে ভিড়তে গিয়েছে ঘাট থেকে, তার একটু আগে নৌকোর গলুই ধাক্কা খেল বড় পাথরে। নৌকো উলটে গেল।

ব্রাহ্মণ সাঁতার জানতেন, তিনি সাঁতরিয়ে চড়ায় উঠলেন, বাকি সব জলে ডুবে মারা গেল।

অত ভাল ভাল খাবার সব জলে গেল। পেটপুরে খাওয়া হল না। ব্রাহ্মণ খাবারের শোকে কিছুক্ষণ কাঁদলেন।

ওই চড়ায় অন্য যে লোকজন ছিল তারা এসে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?" তখন ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার গ্রামের লোকেরা সব জলে ডুবে মারা গিয়েছে।"

লোকজন আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণের কী একটা খেয়াল হল। তিনি কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "ওরে আমার কী সর্বনাশ হল রে।"

যাঁরা ব্রাহ্মণের পাশে ভিড় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করলেন, "যারা মারা গিয়েছে তারা সবাই কি আপনার আত্মীয়স্বজন?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "না, না, না এর মধ্যে আমার আত্মীয় নেই।" তখন সবাই বলল, "তবে এত দুঃখ কীসের আপনার।" ব্রাহ্মণ বলল, "আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।" আবার জিজ্ঞাসা, "কী সর্বনাশ?" ব্রাহ্মণ বলল, "পনেরো বিশটা লোক একই দিনে মরে গিয়েছে। তার মানে একই দিনে শ্রাদ্ধ হবে। যেখানে পনেরো বিশটা শ্রাদ্ধ ধীরেসুস্থে কয়েক বছরে খেতাম, এবার একদিনেই সব ক'টা শ্রাদ্ধ খেতে হবে। আমার ক্ষতি আপনাদের কী করে বোঝাব।"

গল্পটা কেমন যেন চেনা চেনা, নিতান্ত গ্রাম্য গল্প। অনেকদিন আগে অল্প বয়সে শোনা, কিংবা হয়তো শস্তার বাংলা জোক বুকে পড়েছিলাম। কিন্তু এবার আমাকে এই গল্পটি পাঠিয়েছেন রামপুরহাট থেকে স্বপ্না চক্রবর্তী।

তিনি লিখেছেন গঙ্গারামের মোটা গল্পগুলির চেয়ে আমাদের এই গেঁয়ো গল্প অনেক ভাল। আপনার কলমে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন।

তবে অন্য একটি গল্প পরীক্ষা না করেই বলতে পারি সত্যিই চমৎকার, গল্পটি কেয়া দত্ত পাঠিয়েছেন নববারাকপুর থেকে। হয়তো সত্যি গল্প। কেয়া দত্ত লিখেছেন, "সেদিন রাতে আমাদের বাড়িতে একটা চোর ধরা পড়েছিল, আমার গুরুগম্ভীর নীতিবাগীশ শ্বশুরমশাই তাকে খুব ধমকালেন তারপরে বললেন, "তোর লজ্জা করে না, লোকের বাড়িতে চুরি করিস।" শ্রীমান চোর অম্লান বদনে বলল, "সেই জন্যই তো রাতের বেলায় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে চুরি করতে আসি।"

এই সময় গঙ্গারাম বলল, "আপনাকে শুধু পাঠিকারা চিঠি লেখে কেন? পাঠক নেই?" আমি বললাম, "এত কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।"

হাতিবাগানের বেলা চক্রবর্তীর গল্পটা শোন। বেলা চক্রবর্তী বলছেন, তার দেওর আর্ট কলেজে পড়ছে। আর বাড়ির সব সাদা দেয়ালে তুলি দিয়ে, পেনসিল দিয়ে যা ইচ্ছে ছবি এঁকে যাচ্ছে। সেদিন ওর দেওর শুধু পেনসিল দিয়ে এমন সুন্দর মাকড়সার জাল দেয়ালে এঁকেছে যে বাড়ির কাজের মেয়ে বারবার ঝাঁট দিয়েও সেই জালটা সরাতে পারেনি, সে বুঝতেই পারেনি ওটা সত্যিকারের জাল নয়। এটুকু শুনে গঙ্গারাম বলল, "অসম্ভব।" আমি বললাম, "অসম্ভব কেন?"

গঙ্গারাম বলল, "কোনও কাজের মেয়ে দেয়াল ঝাঁট দেয় না, তা ছাড়া এক জায়গায় একাধিক ঝাঁট দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কোনও কাজের মেয়েই তা দেবে না।"

গঙ্গারাম বলল, "এসব গল্প লিখে বাজারে আপনার দুর্নাম হবে।"

আমি আর কী বলব। চুপ করে থাকলাম।

গঙ্গারাম বলল। "তার চেয়ে আমার বন্ধু শিবলাল শীলের গল্পটা লিখুন।"

"শিবলাল শীল আবার কে? তার গল্পটাই বা কী?" আমি প্রশ্ন করি।

গঙ্গারাম বলল, "শিবলালের বউ ফুলশয্যার রাতে শিবলালকে বলে, তুমি দাড়ি কামাওনি।" শিবলাল বলল, "আমি দৈনিক অন্তত বিশ-পঁচিশবার দাড়ি কামাই।"

শিবলাল প্রাচীন ক্ষৌরকার বংশের সন্তান। শিবলালের ভাষায় চুল-দাড়ি কামিয়ে তারা পয়সা কামায়। দৈনিক বিশ-পঁচিশবার দাড়ি কামানো তার কাছে কিছুই নয়। সেটাই তার জীবিকা। কিন্তু এটুকুতে তো আর গল্প হয় না। "বাকিটুকু পরের দিন হবে।" বলে গঙ্গারাম চলে গেল।

পাসপোর্ট ফোটোর মতো

দু'দিন বললে অবশ্যই বেশি হয়ে যাবে, কিন্তু পৌনে দু'দিন তো বটেই। বিমান পথে পৌনে দু'দিন। অস্নাত, অনিদ্রিত, অশায়িত প্রায় কুড়ি ঘণ্টা।

হিসাবটা এইরকম। কলকাতার বাড়ি থেকে বেরলাম শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায়। সিঙ্গাপুর-হংকং হয়ে সানফ্রানসিসকো বিমানবন্দর থেকে বার্কলে শহরে পুত্রের বাসায় পৌঁছতে শনিবার রাত সাড়ে ন'টা, তখন কলকাতায় রবিবার সকাল দশটা। হিসাব করলে দাঁড়ায় সাড়ে সাঁইত্রিশ ঘণ্টা।

এই বিস্তর সময়ের অধিকাংশ সময়ই বিমানের অভ্যন্তরে। বিমানবন্দরে যেটুকু সময় তার অবশ্য আকর্ষণ আছে। রঙিন আলোর বাহার, দোকান-পসরা, বার-রেস্তোরাঁ, যাত্রীর ব্যস্ততা, মোটামুটি সময় কেটে যায়।

কিন্তু বিমানের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট চার বর্গফুট ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে শারীরিক ক্লেশ যতটা হয়, মানসিক ক্লান্তি তার চেয়ে কম নয়। নিজেকে কেমন অপ্রয়োজনীয়, অপদার্থ মনে হয়। মাঝে-মধ্যে খাদ্য ও পানীয় আসে। খাদ্য অঢেল, কিন্তু আমার রুচির সঙ্গে মেলে না, তখন এক মুঠো ডাল-ভাত, একটু আলু বা মাছ ভাজা হলে বর্তে যেতাম। সেই সময় নুন-তেল মশলাহীন সেদ্ধ মাছ। খেজুরের

রসসিক্ত সামুদ্রিক শামুক ও শ্যাওলা কিংবা পিপারমেন্টের স্বাদে-গন্ধে ভরা প্যাস্ট্রি—খুব সামান্য সামান্য করে মুখে তুলে চাখা যায় কিন্তু খাওয়া যায় না। আমার তো গা গুলিয়ে ওঠে।

পানীয় অঢেল নয়, তবে চাইলে দেয়। বারবার চাইতে হয়। কিন্তু খালি পেটে আর কতটা পানীয় গ্রহণ করা যায়? পানীয় অবশ্য সব রকমেরই আছে, কিন্তু কোনওটাই খুব উচ্চমানের নয়।

খাদ্য-পানীয় রেখে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের সামনের চেয়ারের পিছনে একটা করে টেবিল রাখা আছে। সেটি সামনের চেয়ারের গায়ে ভাঁজ করা থাকে, প্রয়োজনমতো টেনে টেবিলের মতো ব্যবহার করা যায়। তবে আমার মতো খুব বলবান বা ভুঁড়িমান ব্যক্তির ভুঁড়িতে ঠেকে যাওয়ায় অনেক সময় এই টেবিল খোলা যায় না, খোলা গেলেও সযত্নলালিত প্রিয় ভুঁড়িতে টেবিল চেপে বসে যায়। দশ ঘণ্টা পরেও ভুঁড়ির চামড়ার গায়ে ভাল দাগ থাকে, হিন্দি সিনেমায় চাবুকাহত নির্দোষ নায়কের পৃষ্ঠদেশে যে রকম দেখা যায়।

এ রকম অতি ক্ষুদ্রাকার টেবিলের পরিকল্পনা কার মাথায় প্রথম এসেছিল সেটা জানা কঠিন, হয়তো চেষ্টা করলেও জানা যাবে না। কিন্তু নিউজার্সিবাসিনী এক সুরসিকা মহিলা একদা আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। ভদ্রমহিলা দুর বিমানযাত্রায় আমার পার্শ্ববর্তিনী ছিলেন। টেবিলের সঙ্গে আমার ভুঁড়ির কসরত দেখার পর তিনি আমাকে জানান যে, এই টেবিলের বুদ্ধি যার মাথায় এসেছিল, তারই মামা গুজিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। গুজিয়া, পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় জানেন যে, ক্ষুদ্রতম আকারের চিনি-চুরচুর মিষ্টি, পুজো-আর্চায় বাতাসা বা নকুলদানার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের অল্প বয়সে দাম ছিল পুরনো দু'পয়সা, এখন বোধহয় পঞ্চাশ পয়সা বা এক টাকা। অনেকদিন দেখিনি, হয়তো আজকাল পাওয়াই যায় না।

গুজিয়ার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, আপাতত বিমানভ্রমণে ফিরে আসি। আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রায় আতলান্তিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের এপারে-ওপারে যে পরিমাণ অনাহার, ধকল ও ক্যালোরি ব্যয় হয়, কেউ যদি মাসে দু'বার 'রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' করে, তার পনেরো পাউন্ড ওজন কমবেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রত্যেক বছরেই আমার এ রকম হয়।

অনেকদিন আগে একবার, সেই প্রথমবার, মার্কিন দেশ থেকে পাঁচ সপ্তাহ ভ্রমণান্তে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে ফিরেছিলাম। তখন ওজন নিয়ে মাথা ঘামাতাম না, সে-বয়স তখনও হয়নি। তবে ওজন নিশ্চয়ই অনেক কমে গিয়েছিল। শার্টের কাঁধ, প্যান্টের কোমর সব কেমন ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছিল।

তা, ওই অবস্থায় তো দমদম বিমানবন্দরে এসে নামলাম। আমার সহধর্মিণী আরও অনেকের সঙ্গে বিমানবন্দরে আমাকে বরণ করতে গিয়েচিলেন। আমার চেহারার ওই অবস্থা দেখে আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "এ কী হাল হয়েছে তোমার? তোমাকে না তোমার পাসপোর্ট ফোটোর মতো দেখাচ্ছে।" এই মন্তব্যের অর্থ বুঝতে কারও কষ্ট হলে নিজের পাসপোর্ট ফোটোর সঙ্গে নিজের চেহারা আয়নায় মেলাবেন।

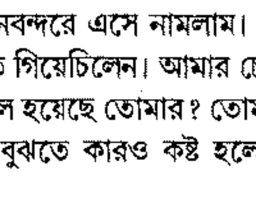

আগে পাঁচ ডলারে, এখন?

এক খদ্দের রেস্তোরাঁয় এসেছেন, এসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছেন।

একটু পরে চা এল। কিন্তু এ কী? চায়ের মধ্যে কী একটা পোকা ভাসছে।

খদ্দের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কী?"

বেয়ারা ভাল করে পেয়ালার মধ্যে দেখে নিয়ে বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না। আমি আবার পোকামাকড় ভাল চিনি না। দেখি, ম্যানেজারবাবুকে ডেকে দিচ্ছি, তিনি হয়তো বলতে পারবেন।"

'ঠাকুমাকে বলা যায় এমন চারশোটি হাসির গল্প' নামে যে সংকলনটি পাড়ার মোড়ের বইয়ের দোকানি আমার জন্যে বেছে রেখেছেন এই গল্প সেই বই থেকে।

এই গল্পটি পুরনো ধাঁচের। এইরকম ধাঁচের গল্প অনেক আছে, যেমন 'বিদ্যাবুদ্ধি'-তে লিখেছিলাম।

রেস্তোরাঁতে খাবার অর্ডার দিতে গিয়ে বেয়ারার হাতে কালচে ঘায়ের মতো দাগ দেখে খদ্দের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার কি একজিমা আছে?" বেয়ারা বিনীতভাবে বলেছিল, "না, স্যার। তবে কিমা আছে, কাটলেট আছে, চপ আছে, ফিশফ্রাই আছে।"

সে যা হোক, ক্লাইভ মারডক সম্পাদক এই চারশো মজার গল্পের মধ্যে ভাল গল্পের সংখ্যা খুব কম নয়।

এই বইয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বোঝাতে বলা হয়েছে, পূর্বে পাঁচ ডলারে যে জুতো জোড়া কেনা যেত, এখন সেটা মেরামত করতে পাঁচ ডলার লাগে।

এই বইতে আছে ভবিষ্যৎ আয়করদাতার পূরণের জন্যে আয়কর দফতরের একটি আগামি দিনের কাল্পনিক ফর্ম।

১। গত আর্থিক বছরে আপনি কত আয় করেছেন?

২। তার মধ্যে কত টাকা অবশিষ্ট আছে?

৩। উপরের (২) অর্থাৎ ব্যয় করার পরে আয়ের যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে, সেটা অবিলম্বে ট্রেজারি চালান করে সরকারি কোষাগারে জমা দিন।

সতর্ক-বার্তা উপরের (৩) অমান্য করলে উপরের (২) সরাসরি বাজেয়াপ্ত হবে এবং তদুপরি জরিমানা হবে। 'জরিমানা' শব্দটি বড় অক্ষরে (বোল্ড টাইপে) ছাপা।

আয়কর দফতর নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি জমাটি রসিকতা আছে এই বইতে।

এক ব্যক্তি আয়কর কর্তাকে পাঁচটি একশো ডলারের নোট খামে পাঠিয়ে স্বাক্ষরবিহীন পত্রে লিখেছেন, দু' হাজার এক সালে আয়করে কিছু জোচ্চুরি করেছিলাম। সেকথা ভেবে এখন আমার রাতে ঘুম হয় না। পাঁচশো ডলার পাঠালাম। এর পরেও যদি ঘুম না-হয়, বাকি টাকা পাঠাব। ইতি জনৈক আয়কর দাতা।

দ্বিতীয় গল্পটি মর্মান্তিক। এক মুমূর্ষু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর প্রিয় বন্ধু দেখা করতে এসেছেন। বোধহয় এটাই শেষ দেখা। মুমূর্ষু ভদ্রলোক প্রিয় বন্ধুকে বললেন, "ভাই, তোমাকে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে। আমার মৃত্যুর পরে আমাকে কিন্তু কবর দিয়ো না, আমাকে পোড়াবে। পোড়ানোর যে ছাইটুকু থাকবে সেটা একটা শক্ত জ্যাকেটে ভরে, সঙ্গে আমার এই চিঠিটা দিয়ে

আয়কর প্রশাসনকে পাঠাবে।" দেখা গেল সেই চিঠিতে লেখা আছে, 'আমার সর্বস্ব দিলাম।'

নীচে মুমূর্ষুর কাঁপা-কাঁপা সই।

আয়কর খুবই বিব্রতকর এবং বিরক্তিকর। আমরা বরং এই বইয়ের আর একটি গল্প স্পষ্ট করে দেখি।

একটা সিনেমার গল্প, একেবারে ঝকঝকে নতুন। আমি অন্তত আগে কখনও শুনিনি বা পড়িনি।

বহু বিজ্ঞাপিত, বহু প্রচারিত, ঢোল-ঢক্কা নিনাদিত একটি সিনেমা প্রথম দিনেই ফ্লপ। ইন্টারভ্যালের আগেই হল প্রায় খালি। দর্শকদের মধ্যে এক কুখ্যাত মস্তানও ছিলেন। তিনি কাউন্টারে গিয়ে একটা রিভলবার তাক করে ক্যাশিয়ারকে বললেন, "যাচ্ছেতাই বই। টাকা ফেরত দাও। শুধু আমার টাকা নয়, হলের সকলের টাকা ফেরত দাও।"

এত বুড়ো হব নাকো

সাহেবরা যাদের বলেন সিনিয়র সিটিজেন (Senior Citizen) সেই সিনিয়রিটির বার্ধক্যের সবরকম সুবিধাগুলো খুঁজে খুঁজে নেব। আয়করে সুবিধা নেব, ব্যাঙ্ক ডিপোজিটে সুদের হার বেশি পাব, রেল-বিমানের ভাড়ায় কনসেশন নেব। কোথাও গেলে যুবকেরা উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দেবে, বাসে-ট্রামে তো অবশ্যই। না ছাড়লে মনে মনে রাগ করব, দিনে দিনে কী হচ্ছে?

এর পরেও কেউ যদি রাস্তাঘাটে 'দাদু' বলে ডাকে, কেউ যদি 'বুড়ো' বলে? রাগ করব, খেপে যাব, মনে দুঃখ পাব?

বয়েস বেড়ে গিয়েছে, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, বুড়ো হচ্ছি এসব সত্য সবাই মেনে নিতে পারেন না। তাঁদের কাছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মতো 'বয়েস দাঁড়ায়ে থাকে, কোনও মাঠে স্কেল-কাঠি হাতে, মানুষ মাপিতে যায় মানুষী মাপিতে যায়...'। তাঁরা হয়তো ভাবেন, মাপতে না গেলেই হল। চুলে কলপ দেন, মুখে ফেসিয়াল করেন, আর এক প্রস্থ রঙিন জামাকাপড় তৈরি করতে দেন। এসব বেশি বয়েসের পক্ষে বেমানান কি না ভাবার অবকাশ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কোনও দিন এত বুড়ো হব নাকো আমি।' পড়ন্ত বয়েসে নায়িকার উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তার চেয়ে ভাল, তুমি চলে এসো একা'... যেন কোনও নবীন কবি বলছেন।

বার্ধক্যের প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর কবিতায় শীত-হেমন্ত এবং বার্ধক্য একাকার হয়ে গিয়েছিল—শীতের রাত, কুয়াশা, সন্ধ্যার বাতাস, স্থবিরতা, শিশিরের শব্দ জীবনানন্দের কাব্যে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনানন্দ বার্ধক্য উপভোগ করে যেতে পারেননি, বুড়ো হওয়ার আগেই এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আপাতত বার্ধক্য নিয়ে কাব্যকথা থাক।

দু'-একটা সুখ-দুঃখের নতুন পুরনো গল্প বলি।

আমার এক পুরনো দিনের মাস্টারমশাইয়ের বয়স প্রায় পঁচাশি হয়ে গিয়েছে। সেই কোন পুরনো

আমলে কলেজের নিচু ক্লাসে তাঁর কাছে সাহিত্যপাঠ করেছিলাম, কিঞ্চিৎ ঋণ তাঁর কাছে আমার আছে। আমার বাড়ির থেকে খুব দূরে থাকেন না। সুখের কথা, তাঁর স্ত্রীও বেঁচে আছেন।

কখনও কখনও ছুটির দিনের সকালে আমি তাঁকে দেখতে যাই, অনেক সময়েই একটা উদ্দেশ্য থাকে, তাঁর কাছে কিছু জানতে যাই।

গত রবিবার সকালে তাঁর বাসায় গিয়েছি, শুনলাম তিনি বাসায় নেই। গুরুপত্নী বললেন, "চিকিৎসকের পরামর্শে তোমাদের মাস্টারমশাই হাঁটতে বেরিয়েছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কখন ফিরবেন?"

গুরুপত্নী বললেন, "বলা অসম্ভব।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেন, কতটা হাঁটবেন?"

গুরুপত্নী বললেন, "ডাক্তার দু' কিলোমিটার হাঁটতে বলেছেন।"

মাস্টারমশাই কখন ফিরবেন ঠিক নেই বুঝে আমি উঠে পড়লাম।

গুরুপত্নীকে বললাম, "আমি তা হলে বিকেলের দিকে আসব।"

তিনি হেসে বললেন, "দু' কিলোমিটার হাঁটা শেষ করতে করতে বিকেল পার হয়ে অনেকদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়।" তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "রাতের দিকেও এসে লাভ নেই। সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েন, চারটি খেয়ে তখনই শুয়ে পড়েন।"

বৃদ্ধ বয়সে অনেকের মাথায় অনেক রকম ঝোঁক চাপে। এই বৃদ্ধকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বরং আমরা বৃদ্ধান্তরে যাই।

ডাক্তার ও বৃদ্ধের গল্পের অন্ত নেই।

অল্প বয়সে, যতদিন রক্ত গরম থাকে, রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে, হৃদস্পন্দন ঠিক থাকে তখন খুব বেকায়দায় না পড়লে ডাক্তারের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রত্যেক বৃদ্ধের ডাক্তার আছে, অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব নির্দিষ্ট চিকিৎসক।

এক বৃদ্ধের ডান পা ফুলে গিয়েছে, সঙ্গে বেশ ব্যথা। তিনি গৃহ চিকিৎসককে দেখাতে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন। ওষুধ খেয়ে কিন্তু বৃদ্ধ রোগী নিবৃত্ত হলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, "আমার ডান পা-টা হঠাৎ ফুলল কেন, আর এত ব্যথাই বা কেন?"

প্রশ্ন শুনে ডাক্তারবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, "ও কিছু নয়। বয়স তো হয়েছে আপনার, এ রকম একটু-আধটু হবে।"

বৃদ্ধটি কর্মজীবনে ফৌজদারি আদালতের উকিল ছিলেন। এ ধরনের কথা বলে তাঁর কাছে পার পাওয়া কঠিন। তিনি ডাক্তারবাবুকে ধরলেন, "দ্যাখো ডাক্তার, আমার ডান পা আর বাঁ পা তো একসঙ্গেই জন্মেছে, দুটোরই সমান বয়েস। তবে একা ডান পা ফুলবে, ডান পায়ে যন্ত্রণা হবে আর পাশেই বাঁ পা, সহোদর, সমবয়সি, তার ক্ষেত্রে ফোলা-যন্ত্রণা কিছু নেই কেন?"

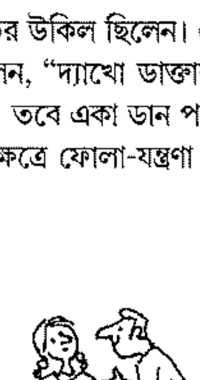

অপ্রত্যাশিত

আশা। প্রত্যাশা। প্রতি + আশা = প্রত্যাশা। আশা আর প্রত্যাশার অর্থ খুব কাছাকাছি। প্রায় একই রকম। তবে প্রত্যাশায় একটু জোর আছে, কোনও ন্যায্য প্রাপ্যের জন্যে আশা হল প্রত্যাশা। আশা-প্রত্যাশা আরও জোরালো শব্দ। উদাহরণ, জীবনের কাছে আমার প্রায় কোনও আশা প্রত্যাশা নেই। এ রচনা কিন্তু আশা প্রত্যাশা নিয়ে নয়। প্রত্যাশা থেকে প্রত্যাশিত। যার বিপরীত হল অপ্রত্যাশিত অর্থাৎ যা প্রত্যাশিত নয় মানে যা আশা করা যায় না।

অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমে সেই এক ফোটোগ্রাফারের কথা মনে পড়ে। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক শ্মশানযাত্রার আগে এক মৃতদেহের ফোটো তোলার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি চিরাচরিত অভ্যাসবশত মৃতদেহের মুখের দিকে ক্যামেরার লেন্স তাক করে শাটার টিপবার ক্ষণে মুখে বলেছিলেন, (বলে ফেলেছিলেন), 'স্মাইল প্লিজ'। বলা বাহুল্য, এমন অপ্রত্যাশিত অনুরোধ সেই মৃতদেহের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। চারপাশে আত্মীয় পরিজনও চমকে গিয়েছিলেন।

অবশ্য চমকানোর এখানেই শেষ নয়। এর চেয়ে অপ্রত্যাশিত একটা পুরনো কাহিনী মনে পড়েছে, যাতে চমক আরও বেশি।

তখনও জমিদারি তালুকদারির যুগ শেষ হয়নি। পাড়াগাঁয়ের প্রধান জমিদার। বয়স হলে যা হয়, জমিদার মশায় নানারকম অসুখে ভোগেন, শ্লেষ্মা, কাশি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

স্থানীয় কবিরাজ মশায় জমিদারবাবুকে দেখতে গেছেন। জমিদারবাবু যথারীতি বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে হুঁকো টানছেন আর খক খক করে কাশছেন।

কবিরাজ মশায় পাশের চেয়ারে আসন গ্রহণ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ লক্ষ করলেন জমিদার মশায়ের হুঁকোর নলটা অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। তিনি উঁকি দিয়ে দেখলেন হুঁকোর নলটা ভিতরের ঘরের মধ্য দিয়ে ওপাশের বারান্দায় চলে গেছে, এখান থেকে হুঁকোটা দেখাই যাচ্ছে না।

অবাক হয়ে সেই নলের দিকে তাকিয়ে কবিরাজ মশায় বললেন, 'এটা কী ব্যাপার?'

জমিদারবাবু বললেন, 'আপনার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করছি।'

কবিরাজ মশায় আরও অবাক, 'আমি আবার কী উপদেশ দিয়েছিলাম?'

জমিদারবাবু বললেন, 'সেদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন না, তামাক থেকে দূরে থাকুন। তাই তো পনেরো হাত লম্বা নল কিনেছি, পাক্কা সাড়ে বাইশ ফুট। আর কতদূরে থাকব, বলুন?'

অপ্রত্যাশিত কথামালায় বোধহয় এই গুজবটিরও স্থান পাওয়া উচিত।

এখনকার মুম্বাই তৎকালীন বোম্বাইয়ের ভুবনমোহিনী নৃত্য পটিয়সী নায়িকা শ্রীদেবীর কাছে একবার বিয়ের প্রস্তাব পৌঁছে ছিল কোটিপতি এক সুদর্শন, সুশিক্ষিত, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। সদ্বংশজাত, সুভদ্র এই যুবক সর্বত্র সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত ছিলেন মিস্টার লাল হিসাবে। মিস্টার লালের মতো সুপাত্র সুন্দরী চিত্রতারকাদের কপালেও কদাচিৎ জোটে। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত কারণে শ্রীদেবী এই প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন।

অনেক বিচার বিবেচনায় অবশেষে সুন্দরী শ্রীদেবী বলেছিলেন, 'মি. লালের স্ত্রী হলে আমি তো শ্রীদেবী লাল হব। আমি চাই না লোকে আমাকে শ্রীদেবীলাল বলুক।'

(যাঁরা জানেন না তাঁদের জানাই দেবীলাল ছিলেন উত্তর ভারতের এক গোলমেলে রাজনীতিক। সম্ভবত একবার ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন।)

শ্রীদেবীর আপত্তির কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা চলে কি?

গরমের পাখা মাঘ মাসে

কয়েক বছর আগে, পূর্ব শহরতলির এই নতুন পাড়ায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই অনুভব করি যে, এই এলাকায় প্রয়োজন এবং মানুষজনের তুলনায় ফেরিওয়ালার সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেশি।

সেই কলিকাতা-কমলালয়, মহাস্থবির জাতক কিংবা রাধাপ্রসাদ গুপ্তের স্মৃতিবিহ্বল রচনায় যতরকম ফেরিওলার ডাকের কথা পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল, এতকাল পরে এখানে এসে সব শুনতে পাচ্ছি।

তা নিশ্চয় নয়, হারিয়ে যাওয়া ফেরিওয়ালার ডাকগুলো তালিকা করে পেশ করতে গেলে সে এক নতুন মহাভারত হয়ে যাবে। এই সামান্য রচনার পরিসীমায় কুলোবে না।

এ-পাড়ায় এসে সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত হয়েছিলাম যে ফেরিওলাকে দেখে, তাঁকে ঠিক ফেরিওলা বলা উচিত হবে না।

আলোচ্য ফেরিওলা হলেন একজন তুলোর ধুনকর। তিনি তাঁর বেহালার মতো গুণ টানা তুলো ধুনবার যন্ত্রটি কাঁধে করে বাজাতে বাজাতে গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ান, সঙ্গে একটা ছোট ছেলে থাকে সে তারস্বরে চেঁচায়, "লেপ বানাই, লেপ বানাই।"

এ-বাড়িতে এসেছিলাম শ্রাবণের শেষে, ভাদ্র মাসের মুখোমুখি। নতুন বাড়ি, চুন-সিমেন্টের উত্তাপ, পাদপহীন খোলামেলা জায়গার অসহিষ্ণু আর্দ্রতা, সেই সঙ্গে তাল পাকা গরম।

সেই অসহ্য গরমের ভরদুপুর বেলা ধুনকরের টঙ্কার এবং 'লেপ বানাই' চিৎকার শুনে খুবই বিচলিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এখন আবার লেপ বানাবে কে?

এরই কয়েক মাস পরে এক জবর ঠান্ডা মাঘ মাসের সন্ধ্যায় হঠাৎ শুনতে পেলাম বন্ধ জানলার ওপারে রাস্তা দিয়ে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে, "শীতল পাটি, তালপাতার পাখা।"

জানলার খড়খড়ি উঁচু করে দেখলাম। কৌতূহল হল, এই জবুথবু শীতের রাতে কে বিক্রি করতে এসেছে গরমের আরাম হাতপাখা আর শীতলপাটি।

ফেরিওয়ালাকে দেখে মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিল, কী রকম যেন একটা খটকা।

খটকাটা দূর হতে ছ' মাস লাগল।

ছ' মাস পরে আবার গ্রীষ্ম। লোডশেডিংয়ের দুরন্ত দুপুর। ভিজে গামছা দিয়ে হাত-মুখ-শরীর মুছতে মুছতে ভাবছি, একটা হাতপাখা, একটা শীতলপাটি থাকলে কিছুটা আরাম হত।

এমন সময় গত গ্রীষ্মের সেই ফেরিওলার ডাক "লেপ বানাই, লেপ বানাই।" সেই সঙ্গে ধুন যন্ত্রের ছড়িতে তীব্র টঙ্কার।

বাইরে গরমের হলকা সত্ত্বেও দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ধুনুরি সামনে আসতে তাকে

বললাম, "এই গরমে কে লেপ বানাবে? এই যে এত রোদে ঘুরছ ঘামতে ঘামতে, কেউ তোমার কাছে লেপ বানাতে দিয়েছে?"

ধুনুরি বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছে, এই কালই আপনাদের ব্লকের ৭৯৪ নম্বর বাড়ির বুড়োবাবু একটা ডবল লেপ বানালেন।"

বুড়ো বাবার এমন মতিভ্রম কেন, শীতগ্রীষ্ম বোধ কী করে নষ্ট হয়ে গেল, তা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামালাম, ধুনুরি নিজের মতো চলে গেল।

ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ ছ'মাস পরে এক ঘন ঠান্ডার সন্ধ্যায় আবার ফেরিওলার ডাক, "তালপাখা, শীতলপাটি। তালপাখা, শীতলপাটি।"

বাইরে উত্তরের হাওয়া। তবু রাস্তায় বেরলাম। এবার চিনতে পারলাম, এ সেই ধুনুরি, এরা দু'জনে একই ব্যক্তি। এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই মাঘ মাসের রাতে হাতপাখা, শীতলপাটি কেউ কিনল?"

ফেরিওলা বলল, "কেন কিনবে না। ৭৯৪ নম্বর বাড়ির বুড়ো বাবুই তো একডজন হাতপাখা আজই কিনলেন।"

এলাকায় প্রায় দু'বছর বসবাস করছি, ৭৯৪ নম্বরের বুড়োবাবুর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে। তাঁকে তো খামখেয়ালি বা পাগল বলে মনে হয় না। পরদিন সকালে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, "হিসেবটা একমাত্র বুঝুন।"

এসব হিসেব জীবনে আমি কখনও বুঝতে পারিনি। বলা বাহুল্য, এবারেও পারলাম না। হিসেবটা এ রকম—মাঘ মাসে তালপাতার পাখা গরমের দিনের তুলনায় অর্ধেক দামে পাওয়া যায়, তেমনি শীতের দিনে যেখানে একটা লেপ বানাতে আড়াইশো টাকা লাগে, গরমে লাগে দেড়শো।

বাংলায় কেন হয় না

'রোমীয়' বানানে দীর্ঘ-ঈ-কার দেখে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, এই 'রোমীয়' মহাকবি শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েটের নায়ক নয়। এই রোমীয় হল রোম দেশীয়, রোম নগরীর রসিকতা অথবা ইতালির রসিকতা।

প্রাচীন বাংলা কবিতায় বোধহয় ছিল, গৃহিণী খোঁজ নিচ্ছেন রোমে রসুনের দাম কত? এই প্রশ্ন অবশ্য সন্ধ্যাভাষার কাছাকাছি যুগের হেঁয়ালি পদ্য।

সে যা হোক, ইস্কুলে একটা প্রবাদবাক্য মুখস্থ করেছিলাম, সব রাস্তাই রোমে যাবে। অন্য বহু প্রবাদ-প্রবচনের এই প্রবচন মোটেই মেলেনি। সারা পৃথিবীর কত রাস্তাতেই তো গেলাম, এই তো এই মুহূর্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী সানফ্রানসিসকোর নগরগুলিতে বসে এই কিস্তি রচনা করছি, কিন্তু আজও আমার রোমে যাওয়া হয়নি।

সে-দুঃখ আপাতত মাথায় থাকুক, পায়ের নীচের সরষে যদি কোনও দিন রোমের দিকে গড়ায় খুবই খুশি হব। কিন্তু, আপাতত আনন্দে আছি অন্য কারণে।

কারণটা বলার আগে একটা হালকা গল্প বলে নিই। একটা কার্টুন গল্প। জনৈক ভিক্ষুক রাস্তায় বসে ভিক্ষা করছে, তার গলায় একটা প্ল্যাকার্ড ঝোলানো, তাতে লেখা, 'জন্মান্ধ'। তার পাশ দিয়ে দু'জন পেশাদার ভিক্ষুক যেতে যেতে আলোচনা করছে, "এ লোকটা আমাদের সিনিয়র। জন্ম থেকেই ব্যবসা শুরু করেছে।"

আমার পছন্দ মতো একটা বই দু'দিন আগে হাতে পেয়েছি। বইটির খুব দাম, মার্কিন মুদ্রায় ১৬ ডলার, ৯৫ সেন্ট। মানে প্রায় সতেরো ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ৮০০ টাকার বেশি। ডলারে জিনিস কিনতে গিয়ে টাকার কথা ভাবলে কিছুই কেনা হয় না। ছেলের উপার্জনের টাকা বলে একটু সংকোচ ছিল, কিন্তু লোভে পড়ে চোখ বুজে বইটা কিনে ফেললাম।

বইটির নাম 'Joy of Italian Humar', লেখকের নাম হেনরি ডি স্প্যালডিং। বলা বাহুল্য, একটু আগের কৌতুকটি এই বই থেকেই নেওয়া। রসিকতাটি যে অতি উচ্চমানের তা বলতে পারব না, কিন্তু বেশ টাটকা, এর আগে কোথাও পড়েছি বা শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

স্প্যালডিংসাহেব সেই রোম নগরের আদি যুগ থেকে এখনকার দিন পর্যন্ত সরস গল্প, রচনা, উক্তির এক বিস্ময়কর সংকলন তৈরি করেছেন। বাংলায় এ রকম কেন হয় না। আমাদের সংকলন-সম্পাদকদের দৌড় বড়জোর বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর পর্যন্ত। এ নিয়ে আক্ষেপের সুযোগ এখানে নেই, বরং নবলব্ধ রসিকতার দু'-একটি নিবেদন করেই খানিকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করি।

ওই বইয়েই পেলাম, বেনামি চিঠির গল্প। ভদ্রলোক একটা কুৎসামূলক চিঠি পেয়ে কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেললেন, তা দেখে তাঁর বন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি বললেন, "কোনও ভদ্রলোক বেনামি চিঠি লেখে না, আমি যদি কখনও লিখি তার নীচে সই করে দিই।"

দ্বিতীয় রসিকতাটি এত সূক্ষ্ম নয়।

মা তাঁর নাবালক পুত্রকে স্কুল বোর্ডিংয়ে একটা জামা পাঠিয়েছেন। জামার বুক পকেটে একটা চিঠি, খামের ওপরে লেখা, স্নেহের খোকা,

জামার পকেটে হাত দিলেই চিঠিটা পাবে।

ইতি আশীর্বাদক তোমার মা।

মধ্যযুগ

আমার কিছুই নেই, তবু আমার কিছু চাই না। আটশো টাকা দিয়ে রোমীয় রসিকতার বই কিনেছি, টাকাটা উশুল করে নিতে হবে তাই ইতালির হাস্যরস নিয়ে এই দ্বিতীয় কিস্তি।

'ইতালীয় রসিকতার আনন্দ' গ্রন্থের সূত্রে এবারে দুটো চিঠি দিয়ে শুরু করছি। দ্বিতীয় চিঠিটি প্রথম চিঠির উত্তর:—(এক) শ্রীচরণেষু কাকা, এই চিঠি লিখতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। আমি জানি আপনি আমাকে করুণা করবেন, কিন্তু আমি নিতান্ত অপারগ হয়ে এই চিঠি লিখছি। এই মুহূর্তে আমার একশো টাকা দরকার, ভীষণ দরকার। না হলে ঘোরতর বিপদে পড়বে। যে লোক এই চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে, আপনার উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করবে। ইতি—লজ্জানত গঙ্গারাম

পুনশ্চ: এই চিঠি পাঠানোর পর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ পরেই আমি পত্রবাহকের কাছ থেকে চিঠিটি ফিরিয়ে আনার জন্য তার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি, রীতিমতো দৌড় শুরু করি। কিন্তু তাকে ধরতে পারি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, এই চিঠি যে নিয়ে যাচ্ছে তার যেন কিছু হয়। এই চিঠি যেন আপনি না পান, কখনও আপনার কাছে না পৌঁছায় আমার এই অপমানজনক আবেদন।

ইতি গঙ্গারাম

(দুই) স্নেহের গঙ্গারাম, লজ্জা বা অনুশোচনার কোনও প্রয়োজন নেই। তোমার চিঠি আমার কাছে পৌঁছয়নি। কীভাবে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, তোমার লোকটি কিছুই বলতে পারল না। ভাল থেকো। ইতি—আশীর্বাদক কাকা। এ-কাহিনীকে যদি সেয়ানে-সেয়ানে বলা যায় তবে পরের কাহিনীগুলি অবশ্যই বোচা কাহিনী।

প্রথমটি একটি মধ্যযুগীয় গল্প।

গির্জায় ধর্মযাজক বক্তৃতা করছিলেন, "ঈশ্বর পরম দয়ালু। তাঁর দয়ায় সব কিছুই সম্ভব। বাইবেলে আছে মাত্র সাতটি রুটি ছিঁড়ে পাঁচশো লোকের আহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল।" একথা শুনে জনৈক ভক্ত বললেন, "ফাদার, আপনি ভুল বললেন। বইয়ে আছে (গসপেল-এ) পাঁচশো নয়, পাঁচ হাজার লোকের খাওয়া হয় সাতটি রুটিতে।" পুরোহিত বিব্রত হয়ে বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি, লোকে পাঁচশো বিশ্বাস করতে চায় না, পাঁচ হাজার বললে তো হাসাহাসি করবে।"

মধ্যযুগ যে আমাদের যুগ থেকে খুব আলাদা ছিল না, তার প্রমাণ রয়েছে ওপরের কাহিনীতে। ধনবান, শহুরে যুবক কিঞ্চিৎ প্রমত্ত অবস্থায় পথে এক অপরিচিতা সাধারণ রমণীকে প্রেম নিবেদন করে। মহিলার সামনে আভূমি কুর্নিশ করে ছদ্ম প্রশংসায় যুবক জানায়, "অয়ি বনিতা, এ-জন্মে আমি তোমার মতো সুন্দরী দেখিনি।" এতাদৃশ প্রশংসা শুনে মহিলাটি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, "আহা, আমি যদি আপনার সম্পর্কে ঠিক ওই কথা বলতে পারতাম।" যুবকটির এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এসেছে, কুর্নিশ গুটিয়ে নিয়ে সে বলল, "পারতেন, নিশ্চয়ই পারতেন। যদি আপনি আমার মতো মিথ্যুক হতেন।"

আর গল্প এবারে নয়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি প্রবচনের কথা বলি। প্রবচনটির উৎস রোমান পণ্ডিত টেরেস বলেছিলেন, "আমার সবই আছে যদিও আমার কিছুই নেই। আমার কিছুই নেই তবে আমার কিছু চাই না।" টেরেসই বলেছিলেন, "কঠোর আইন অনেক সময়েই কঠোর অবিচার।" এবং এই অমূল্য কথাটিও টেরেস বলেছিলেন, "এমন কোনও কথাই এখন বলা হচ্ছে না, যা কি না আগে কখনও বলা হয়নি।"

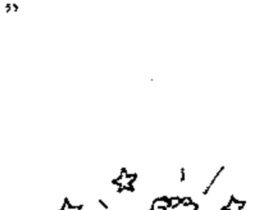

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি আমার চেনা জায়গা। এই শহরের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ আছে। আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে দেশভাগ দাঙ্গার দুর্দিনে আমার ছেলেবেলার মানুষেরা কৈশোরের সহচর-সহচরিরা অনেকেই পূর্ববঙ্গের আমাদের প্রত্যন্ত মহকুমা শহর থেকে পাহাড়তলির এই শহরে মাথা গোঁজার জন্য আসে।

আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়েছিলাম, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল শহরে। টাঙ্গাইল থেকে যমুনা নদী পার হয়ে সিরাজগঞ্জের রেল ধরে আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে আসতে হত। সিরাজগঞ্জের রেললাইন ঈশ্বরদি পৌঁছে একদিকে রানাঘাট, নৈহাটি, কলকাতার দিকে চলে গেছে, আর অন্যটি উত্তরবঙ্গের দিকে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষেরা অনেকেই ঈশ্বরদি থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে প্রধানত জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহারে এসে আশ্রয় নেয়। বলা বাহুল্য, এইসব অঞ্চলের বিশেষ করে শিলিগুড়ির বর্তমান মানুষজনের একটা বেশ বড় অংশ টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর দুই তীরের উদ্বাস্তু সম্প্রদায়। শিলিগুড়ির বর্তমান প্রজন্ম সেই জীবনের কথা স্বাভাবিক কারণেই জানে না।

সে যাই হোক, ছোট বয়সে কত লোকের কাছে যে শুনেছি যে তারা শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছে। অবশ্য এখানে শিলিগুড়ি মানে শিলিগুড়ি এবং তার কাছাকাছি অঞ্চল। এখনও শিলিগুড়ি এলে ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ খুঁজি, ৫০ বছর আগের মুখগুলি মেলাতে পারি না। শতাব্দীর ঘূর্ণিঝড়ে ঝরা পাতার মতো সেইসব মানুষেরা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, থাকলেও এতদিন পরে সেদিনের সেই মানুষটিকে আর চেনা সম্ভব নয়।

কিন্তু একটা নাড়ির টান, একটা মায়ার বন্ধন কোথায় থেকে যায়। মাঝে মাঝে কোনও মানুষের উচ্চারণ শুনে মাঝে মাঝে কোথাও ভাত-মাছ খেতে গিয়ে আমার শৈশবের স্মৃতি ফিরে আসে।

শিলিগুড়ি বইমেলার কর্মকর্তারা যখন আমাকে অনুরোধ করলেন বইমেলা উদ্বোধন করতে আসার জন্য, এই নাড়ির টানেই আমি সেই অনুরোধে সায় দিয়েছিলাম। এসে ভালই হল, ভালই লাগল। অন্য দশ জায়গায় যেমন বইমেলা হয় এখানেও প্রায় একই রকম ভিড়ের চেহারা। বইয়ের দোকানের চেহারায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। তবে এখানে কর্মকর্তাদের মধ্যে লক্ষ করলাম বেশ একটা ভাল বোঝাবুঝির সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণ বইমেলা জাতীয় অনুষ্ঠানে নানা ধরনের ঝগড়া, ঝামেলা দেখা দেয়, নানারকম স্বার্থ কাজ করে, রাজনৈতিক জটিলতাও কখনও কখনও সৃষ্টি হয়। এবার কলকাতা বইমেলাই হাইকোর্টের ডকে উঠেছে। বইমেলা বন্ধ হচ্ছে না, কিন্তু যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা বোধহয় শিলিগুড়ির বইমেলায় কখনও হবে না। তবে একটা কথা জানলাম, এখানে দুটো বইমেলা হয়। একটি সরকারি প্রসাদপুষ্ট, যার জন-আকর্ষণ ক্ষমতা খুবই কম। অন্যটি এই বইমেলা যা গত দুই দশক ধরে চমৎকার চলে আসছে। এই শীতের রাতেও বেশ ভিড় হচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে, ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে উত্তুরে হাওয়া অগ্রাহ্য করে আবালবৃদ্ধবনিতা বক্তৃতা শুনছে, গান শুনছে, কবিতা শুনছে, বই দেখছে, বই কিনছে। মায়েরা তাদের শিশুপুত্র-কন্যার হাত ধরে মেলায় এসেছে। মায়ের হাত ধরে শিশুরা বইয়ের স্টলে স্টলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ বছর মার্কিন দেশে একটা নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। শব্দটা হল 'সকার মম', সকার

মানে ফুটবল, মম মানে মা। যুগ্ম শব্দটির অর্থ হল ফুটবল জননী। মার্কিনি তরুণী মায়েরা তাদের শিশুদের ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে ফুটবলের মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন ফুটবল খেলা শেখাতে। অথচ কয়েক বছর আগে মার্কিন দেশে ফুটবল খেলা ছিলই না। মার্কিনিরা এখন খুব আশান্বিত যে, যেভাবে মায়েরা শিশুদের মাঠে নিয়ে যাচ্ছে তার ফল এক দশকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আমেরিকান ফুটবল দল এমন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে যা এখন কল্পনাও করা যায় না।

বইমেলায় শিশুর হাত ধরে মাকে দেখে আমারও মনে হয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অন্যান্য আকর্ষণ সত্ত্বেও এই বইমেলাগুলি বইকে ওই শিশুদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। আমি বইমেলা জননীদের নমস্কার জানাই, তারা নিজেদের অজ্ঞাতে সামাজিক কল্যাণের কাজ করছেন।

এবার দু'-একটা হালকা কথা বলি। শিলিগুড়ি বইমেলা শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালে। সেই অর্থে ২৩ বছর আগে। কিন্তু এরা নাম দিয়েছেন ২০তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা। আমি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম অরক্ষণীয়া কন্যার মতো বয়স কমিয়েছেন কেন? আপনাদের কল্পনাদুহিতা এই বইমেলা সালঙ্কারা সুন্দরী, তার বয়স কমানোর প্রয়োজন নেই। তাকে যে কেউ বরণ করে নেবে। এই বইমেলাতে কলকাতার অনেক প্রকাশক এসেছেন। আমি অন্তত চারজন প্রকাশককে দেখতে পেলাম। দে'জ, সাহিত্যম, উজ্জ্বল, পত্রভারতী। অন্যান্য প্রকাশকরা এলেও ভাল করতেন। বহু লোক বহু দোকানে বহু রকম বই খুঁজছেন। কলকাতা বইমেলায় গতবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি দোকানে দোকানে একটি অসম্ভব বইয়ের খোঁজ করছেন, বইটির নাম 'পিপীলিকার যৌন জীবন'। আমাকে দেখে তিনি কেমন যেন চিনতে পারলেন। বললেন দাদা, সেই বইটাতো এবারো প্রকাশিত হয়নি। সে বই হয়তো কোনওদিনই প্রকাশিত হবে না। কিন্তু যে বই কলকাতায় প্রকাশিত হয়, সেসব ভাল বইয়ের চাহিদা আছে সুদূর উত্তরের এই মেলাতে, সেগুলি যাতে আসে সে ব্যাপারে কর্মকর্তাদের সচেষ্ট হতে হবে। কলকাতার নামী-দামি প্রকাশকদের আকর্ষণ করতে হবে। ইংরেজির ২০০৩ সালে এই আমার প্রথম বইমেলা দর্শন।

সেদিন বেঙ্গল ক্লাবে

বেঙ্গল ক্লাবের আমি সদস্য নই। বেঙ্গল ক্লাব কেন, দুয়েকটা ঘরোয়া ক্লাব বা পাড়ার ক্লাব বাদ দিলে, তেমন মান্যগণ্য কোনও ক্লাবের সদস্যপদ আমার নেই। তবুও বন্ধুবান্ধব এবং আপনজনের দৌলতে বেঙ্গল ক্লাব সহ অনেক ক্লাবেই আমার প্রবেশাধিকার ঘটে।

বেঙ্গল ক্লাব খুবই প্রাচীন এবং অভিজাত সংস্থা। ব্রিটিশ উপনিবেশ সংস্কৃতির শেষ চিহ্নগুলির একটি। এই জাতীয় সাহেবি ক্লাব পৃথিবীতে ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে।

সে যা হোক কয়েক দিন আগে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় বেঙ্গল ক্লাবে এক জমজমাট আড্ডা দিয়ে এলাম। আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন ক্ষুরধার, বঙ্কিম বুদ্ধি গদ্যকার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'ভাল?' তিনি বলেন, 'হাতে সময় আছে তো, আপনার প্রশ্নের উত্তর একটু ভেবে বলতে হবে।'

বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এখন আবার আধা-সাংবাদিক। কিন্তু সাংবাদিক বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা বেশ একটু ব্যতিক্রমী। তিনি একটা সাংঘাতিক গল্প বললেন।

রেললাইনের লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ভীষণ ভিড়। কী ব্যাপার? কে একজন এই মাত্র রেলে কাটা পড়েছে।

হাতের কাছে এমন টাটকা খবর পেয়ে সাংবাদিক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি অকুস্থলে প্রবেশের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্যি।

তখন ভদ্রলোক একটা সাংবাদিকসুলভ চালাকি করলেন। তিনি ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করতে করতে উদভ্রান্তের মতো বলতে লাগলেন, 'আমার বাবা রেলে কাটা পড়েছেন, দয়া করা আমাকে একটু সামনে যেতে দিন।'

একথা শুনে ভিড়ের মধ্যে একটা সংকীর্ণ পথ তৈরি হয়ে গেল, সাংবাদিক যখন রেললাইনের কাছে পৌঁছলেন, সামনের সারির এক ব্যক্তি সাংবাদিককে বললেন, 'এই দেখুন আপনার বাবার কী অবস্থা হয়েছে।' স্তম্ভিত সাংবাদিক দেখলেন রক্তে-চর্বিতে মাখামাখি একটা বড় শুয়োর রেলে কাটা পড়েছে।

কোনও নৈশ আড্ডার গল্প এত তাড়াতাড়ি শেষ হয় না।

আমাদের ওভাল টেবিলের সুদূর পশ্চিম দিগন্তে এক মারাঠি মহিলা, মিসেস তলোয়ারকর একদা মহারাষ্ট্র সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। এখন স্বামীর সুবাদে এবং দৌলতে সরকারি চাকরি ছেড়ে তথ্য-প্রযুক্তির দুই নম্বর কোম্পানির এক নম্বর জনসংযোগ আধিকারিক। বাঁকা সিঁথি, বুদ্ধি ভরা চোখ-মুখ, শীর্ণা, লম্বা মহিলাটি বললেন, 'এক গেলাস রাম পেলে একটা গল্প বলি।' সবাই হুইস্কি খাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি বেয়ারাকে ডেকে রাম আনা হল।

ভদ্রমহিলা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সামান্য এক চুমুক রাম খেয়ে বললেন, ...অল্প কিছুদিন আগে আমি চাকরিতে ঢুকেছি। তখনও প্রশাসন আর বিচার বিভাগ আলাদা হয়নি। তখনকার বোম্বাইয়ের একটা নিম্ন ফৌজদারি আদালতে আমি ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেট, লঘু পাপে লঘু দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা।

একদিন স্থানীয় পুলিশ সি ভিউ নাকি ওসেন ভিউ নামের এক হোটেল থেকে এক গাট্টাগোট্টা ব্যক্তিকে আমার আদালতে চালান দিল। অভিযোগ, এই আসামি গতকাল রাতে হোটেলের ঘরে তার বউকে বেধড়ক পিটিয়েছে।

আমি অভিযোগ শুনে আসামিকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাজতে চালান দিলাম। পরবর্তী বিচারের দিন দু' সপ্তাহ পরে।

আমার আদেশ শুনে লোকটি হাতজোড় করে বলল, 'ম্যাডাম, এটা ভাল করলেন না। হানিমুনের সময় বউ থাকবে হোটেলে একা, আর স্বামী থাকবে পুলিশ হাজতে?'

হানিমুনের সময় বউকে মারধর করা উচিত কি না, এ নিয়ে যখন তুমুল আলোচনা চলছে, সন্দীপন বললেন, 'ওহে তারাপদ, তুমি চুপ কেন, তুমি কিছু বল।'

আমি আর কী বলব?

এ রকম আড্ডায় গল্পের ধারাবাহিক রক্ষার কোনও নিয়ম নেই। আমার মাথায় আজ কিছুদিন হল একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই প্রশ্নটা সবাইকে করলাম—

'আমরা যেসব পাখির ডিম খাই, যেমন হাঁস, মুরগি সেগুলো প্রায় নিয়মিত প্রতিদিন ডিম পাড়ে, কিন্তু যেসব পাখির ডিম আমরা খাই না, যেমন কাক, চড়ুই, শালিক, ঘুঘু বছরে একবার মাত্র একজোড়া ডিম পাড়ে। এর কি কোনও ব্যাখ্যা আছে?'

বেয়ারা

বাংলা ভাষায় প্রায় এই একই উচ্চারণে দুটি শব্দ আছে। প্রথমটি 'ড়' দিয়ে, বেয়াড়া। অভিধানে এই শব্দের অর্থ বিকট, বেঢপ, বিশ্রী। বদ, মন্দ।

আমরা কথায় কথায় বলি লোকটা খুব বেয়াড়া কিংবা অত্যন্ত বেয়াড়া সময় যাচ্ছে। অনেকে অবশ্য এই বেয়াড়াতেও 'র' ব্যবহার করেন, আজকাল বিকট বা বদ বোঝাতে বেয়ারা শব্দটি বেশ চালু আছে।

আমরা কিন্তু অনুভব করি বেয়াড়া মানে বদ, মন্দ যাই হোক বেয়াড়াপনার মধ্যে একটা অনর্থক একগুঁয়েমি আছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় অবশ্য একটু আলাদা। এই বেয়াড়া নিয়ে ব্যাকরণবিদ এবং আভিধানিক মাথা ঘামাতে থাকুন আমরা আসল বেয়ারায় যাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিই, এ বেয়ারা সে বেয়াড়া নয়। 'র' দিয়ে যে বেয়ারার বানান সেটা এসেছে ইংরেজি থেকে। Bearer এই ইংরেজি শব্দটি থেকে বেয়ারা। ইংরেজি বেয়ারার-এর খুব ভাল উদাহরণ বেয়ারার চেক। এখানে বেয়ারার মানে বাহক, চেক যে বহন করে নিয়ে যাবে ব্যাঙ্ক তাকেই টাকা দেবে।

আমরা এখন যে বেয়ারা নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি, রাজশেখর বসুর চলন্তিকা অনুযায়ী সেই বেয়ারা শব্দের মানে বাহক, পিয়ন, চাকর।

কিন্তু সাদা বাংলায় এখন বেয়ারা শব্দটির একটিই মানে হোটেল-রেস্তোরাঁর বেয়ারা। ইনি হলেন সেই ব্যক্তি সারা জীবনে যাঁর সঙ্গে সহস্র বার আমাকে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। সমস্ত জীবনে অদ্যাবধি মাত্র একবার সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছি।

তখনও আমার পৌরুষ ছিল। তেজস্বিতা ছিল। ক্রোধ ছিল। হুঙ্কার ছিল। বান্ধবী ছিল। বান্ধবীর জন্যে প্রতীক্ষা ছিল। পার্ক স্ট্রিটের এক তথাকথিত পশ রেস্তোরাঁয় সুন্দরীর জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি জানেন, তিনি যত দেরি করবেন তাঁর মূল্য তত বাড়বে।

এদিকে রেস্তোরাঁয় বিনা অর্ডারে কতক্ষণ বসা যায়। বাধ্য হয়ে আমি এক কাপ কফির অর্ডার দিলাম। এক পেয়ালা কফি এল, দুধ দেওয়া কফি সঙ্গে নকল রুপোর বাটিতে সুগার কিউব। বান্ধবী না আসার শোকে পরপর তিনটে সুগার কিউব কফিতে মেশালাম, তারপর চুমুক দিতে যাচ্ছি, দেখি একটা মাছি ভাসছে। বেয়ারাকে ডেকে মাছিটা দেখালাম। খুবই বেয়াড়া বেয়ারা। যেন কিছুই নয় এমনভাবে সে মাছিটা দেখল। প্রায় ফিরে যাচ্ছিল, তার হাতে কাপটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা পালটে নিয়ে এসো।'

একটু পরে সে কাপটা পালটিয়ে আনল, সে রেখে ফিরে যাচ্ছে। এমন সময় চায়ে চুমুক দিতেই বুঝতে পারলাম, অতিরিক্ত চিনির স্বাদে, এটা সেই আগের চা-টাই। আমি সে কথা বলতে সে প্রায় তেড়ে এল। কিন্তু যখন তাকে বললাম, 'চায়ে চিনি কে মেশালো', সে বোকা সেজে দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে মাত্র সেই একবার বেয়ারাকে জব্দ করতে পেরেছিলাম।

তবে বেয়ারারা সবাই হৃদয়হীন হয় না। অনেকদিন আগে পাকিস্তানি ঢাকা শহরে 'নিউইয়র্ক হোটেল' নামে একটি ভাতের হোটেল ছিল। সেই হোটেলের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল এখানে

আড়াই টাকায় গোস্তভাত পাওয়া যায়। সেটা সেই আট-আনা সের চালের যুগ, আড়াই টাকায় পাঁচ সের চাল হত। এখনকার একশো টাকার সমান।

তা সেই গোস্তভাত অর্থাৎ মাংসভাত খেতে গিয়ে দেখি একদম পচা, মুখে তোলা যায় না, খেলে অসুখ অনিবার্য। বেয়ারাকে আর কী বলব, তাকে ডেকে বললাম, 'মালিককে ডাকো। এ মাংস কে খাবে?'

সেই দয়াবান বেয়ারা হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, আপনে জোয়ান লোক আপনেই খাইতে সাহস পান না, মালিক বুড়া মানুষ, উনি এই মাংস খাইলে কি বাঁচবেন?'

এই গল্পটি অন্য খোলসে সম্প্রতি আরেকবার বলেছি। আরেকটা পুরনো গল্পে ফিরে আসছি। তা না হলে বেয়ারা-কাহিনী অপূর্ণ থাকবে।

কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলের একটি রেস্তোরাঁ। একগাল না কামানো দাড়ি, অবিন্যস্ত কেশরাজি, হলুদের ছোপ লাগা ময়লা সাদা কোট—বেয়ারা আমার টেবিলের পাশে। এক কাপ চায়ের জন্যে ঢুকেছি, কিন্তু সে সাপের মন্ত্রের মতো গুনগুন করে বলে যাচ্ছে, ...ফিশ কাটলেট, ডেভিল, ভেজিটেবিল চপ...; এমন সময় আমি দেখলাম, লোকটির হাতের পাতায় চাকা-চাকা, লাল কী সব ঘায়ের মতো।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি একজিমা আছে?' সে বলল, 'না, হুজুর ফিশ ফ্রাই হবে, কবিরাজি হবে, একজিমা হবে না।'

এত কঠিন অঙ্ক

আমার একটি পুরনো গাড়ি আছে। গাড়িটা নিয়ে একটা গল্পও আছে, সে গল্পটা বোধহয় অনেকেই জানেন। গল্পটা তেল-খরচ নিয়ে।

এই জ্বালানি দুর্মূল্যের যুগে গাড়িওলা গৃহস্থেরা মাঝে মধ্যেই আলোচনা করেন কার গাড়ি কত লিটার তেলে কত কিলোমিটার যায়। আমি চুপ করে শুনি, তারপর সবার শেষে বলি, "আমার গাড়ি প্রতি লিটার তেলে ত্রিশ কিলোমিটার যায়।"

সবাই হইচই করে ওঠে, ত্রিশ কিলোমিটার প্রতি লিটারে, ইয়ার্কি না কি? এমনিতেই ফিয়াট গাড়ি পুরনো মডেলের তার উপরে চল্লিশ বছরের ঝরঝরে, এ গাড়ি তো তেল খাওয়ার যম, তোমার গাড়ি এক লিটার পেট্রলে বড় জোর পাঁচ কিলোমিটার যাবে। তার বেশি এক মিটারও নয়।

আমতা-আমতা করে আমি স্বীকার করি, "ওই পাঁচ কিলোমিটার যায়।" সবাই চেপে ধরে, "তা হলে বাড়াবাড়ি করে ত্রিশ কিলোমিটার বললে কেন?" আমি বলি, "দ্যাখো আমার গাড়ি তো একটু পরে পরেই ঠেলতে হয়, এক লিটার পেট্রলে গাড়ি ত্রিশ কিলোমিটার ঠিকই যায়। তবে পাঁচ কিলোমিটার তেলে আর পঁচিশ কিলোমিটার ঠেলে।"

সুতরাং এ-গাড়ি আজকাল আমি আর চড়ি না বা চড়ার চেষ্টা করি না। টায়ার চুপসে, মাথা নিচু করে গ্যারাজে পড়ে আছে।

শুভানুধ্যায়ীরা কেউ কেউ পরামর্শ দেয়, এবার বেচে দাও। গাড়ি গ্যারাজে পড়ে থাকলে দাম পড়ে যাবে, অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে, যখন আর গাড়ি হিসেবে নয়, পুরনো লোহা-লক্করের মতো বিক্রি করতে হবে।

আমি তা জানি। কিন্তু আমার একটু দুর্বুদ্ধি আছে।

পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। পুরনো গাড়ি অ্যান্টিক হলে দাম বহুগুণ চড়ে যায়। আমার বাষট্টি সালের মডেলের গাড়ির এখনও অ্যান্টিক মর্যাদা পেতে বহু বছর লাগবে। কিন্তু এটি একটি বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির গাড়ি (এখনও ব্লু বুকে তাঁরই নাম), কর্মজীবনের প্রথম ভাগে স্বহস্তে তিনি এ-গাড়ি চালাতেন। এবং এই কারণে দেশে বা বিদেশে কেউ হয়তো কোনও প্রতিষ্ঠান হয়তো এই গাড়িটি সংগ্রহ করতে পারে এবং সংগ্রহমূল্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে—এই আশায় গাড়িটি আমি ধরে আছি।

গ্যারাজ আমার একটাই। এই গাড়ির কোনও ব্যবস্থা না করে দ্বিতীয় কোনও গাড়ির কথা আমি ভাবছি না।

ট্রামে-বাসে ওঠা-নামা আমার স্থূল দেহ নিয়ে অসম্ভব। সুতরাং কোথাও যাতায়াত করতে হলে আর কারও গাড়ি কিংবা ভাড়াটে গাড়ির সাহায্য নিতে হয়। ভাড়াটে গাড়ি আগে থেকে বলে রাখতে হয়, আশু প্রয়োজনে কখনও কখনও ট্যাক্সিও ব্যবহার করতে হয়। অবশ্য যদি ট্যাক্সি মেলে।

সেদিন কলেজ স্ট্রিটে কী একটা কাজ ছিল। রাস্তায় বেরিয়েছিলাম একটা ট্যাক্সি ধরব বলে। একেবারে মুখোমুখি গঙ্গারামের সঙ্গে দেখা, সে আমারই কাছে আসছিল।

আমাকে দেখে গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

আমি বলাম, "কলেজ স্ট্রিট।"

গঙ্গারাম বলল, "গাড়ি কোথায়? পায়ে হেঁটে যাবেন? অনেকটা পথ কিন্তু।"

আমি বললাম, "পায়ে হেঁটে যেতে হবে কেন? একটা ট্যাক্সি নেব।"

গঙ্গারাম বলল,"ট্যাক্সির ভাড়া দিতে পারবেন?"

আমার খুব অপমানবোধ হল। রেগে গিয়ে বললাম, "তুমি কী ভাব? আমার ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই?"

গঙ্গারাম বলল, "দাদা, রাগ করবেন না। ভাড়ার টাকায় বলছি না। ভাড়ার হিসেবের কথা বলছি।"

"ভাড়ার হিসেব? সে আবার কী?" আমি অবাক হয়ে বলি।

গঙ্গারাম পালটা প্রশ্ন করে, "এর মধ্যে ট্যাক্সিতে চড়েছেন।'

আমি ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো সেই কালীপুজোর পরে দেশে ফিরেছি, তার আগে চার মাস, পরে আড়াই মাস, সবসুদ্ধ সাড়ে ছয় মাস, অন্তত এই সময়টুকু কলকাতার ট্যাক্সি চড়িনি। এসব না বলে আমি প্রশ্ন করি, "চড়ি না চড়ি, তাতে কী হয়েছে?"

গঙ্গারাম বলল, "আপনি পারবেন সাতাশকে মনে মনে দুই দিয়ে গুণ করে, তার সঙ্গে শতকরা চল্লিশ যোগ করে তার থেকে দুই বিয়োগ করতে?"

আমি হতবাক হয়ে বললাম, "এত কঠিন অঙ্ক আমাকে কষতে হবে কেন?"

গঙ্গারাম বলল, "না করলে ভাড়া দেবেন কী করে? ট্যাক্সির মিটারে যা উঠবে তাকে ডবল করে তার সঙ্গে চল্লিশ পারসেন্ট যোগ করে দুই বিয়োগ করে ভাড়া দিতে হবে। পারবেন হিসেবটা করতে?"

আমি জানি আমি পারব না। গঙ্গারামকে বললাম, "তা হলে তুমি সঙ্গে চলো।" গঙ্গারাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল।

বাড়িওয়ালা

গল্পটা অনেক দিনের পুরনো।

তখনও পেপসি-কোকাকোলার যুগ আসেনি। সেটা ছিল লেমোনেড, সোডা ওয়াটারের যুগ। সেই সময় ঘোরতর বৃষ্টির দিনে ফুটো ছাদ দিয়ে প্রচুর জল পড়ায় বিপন্ন ভাড়াটে বাড়িওয়ালাকে অভিযোগ করেছিলেন, 'আপনার ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে।'

এই অভিযোগ শুনে বাড়িওয়ালা রেগে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিলেন বৃষ্টি হলে জল পড়বে না তো লেমোনেড পড়বে নাকি?

গল্পটা পুরনো কিন্তু বোধ হয় সত্যি নয়, একটা উদাহরণ মাত্র, আর তা ছাড়া পুরনো মানেই সত্যি একথাও ঠিক নয়।

যাই হোক বাড়িওয়ালা ভাড়াটের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে অতি-জটিল। বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটে, ভাড়াটে বনাম ভাড়াটে ইত্যাদি বিষয় সিনেমা-থিয়েটার থেকে একালের দূরদর্শন সিরিয়ালে গড়িয়েছে।

এই মুহূর্তে হিন্দি এবং বাংলা মিলিয়ে অন্তত চারটি ধারাবাহিক চলছে, যার উপজীব্য হচ্ছে ভাড়াটে বাড়িওয়ালা সম্পর্ক, কখনও কখনও ভাড়াটে অর্থে মেসবাড়ির বাসিন্দারা।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত ডায়ালগ 'মাসিমা মালপুয়া খামু'— সাড়ে চুয়াত্তর নামে অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্রের থেকে শুরু করে এই হাল আমলের 'এক যে আছে কন্যা' এই সব কাহিনীর শিকড় রয়েছে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্কে।

'সিঁড়ি দিয়ে শুতে যাই ছাতে',...প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই বিখ্যাত 'ভাড়াটে' কবিতা যেখানে ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল নাগরিক জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পাশাপাশি শোয়া-থাকা কিন্তু পরস্পরের কোনও যোগাযোগ নেই। এক হৃদয়হীন জগত।

পুরনো ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে এমন হত—অনেকে দশ-বিশ বছর ধরে বাস করছে কেউ-কাউকে ভাল করে জানেন না।

আজকাল অবশ্য হাউজিং এস্টেটের কল্যাণে সমবৃত্তি-সমসংস্কার এবং সমমানসিকতার কারণে একই এস্টেটের অধিকাংশ বাসিন্দাই পরস্পর পরিচিত। কেউ কেউ বিশেষ পরিচিত, ঘনিষ্ঠ।

সামাজিক আনন্দ-উৎসবের মারফতে বিভিন্ন খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে এদের নিয়মিত যোগাযোগ। হাউজিং এস্টেটের মধ্যে কোন্দল বিবাদ ঈর্ষা রেষারেষি কিছু কম নয়। কিন্তু সে তো মানব ধর্ম।

হাউজিং থাকুক আমরা বাড়িওয়ালা ভাড়াটের দুটো পুরনো গল্প বলি।

স্বামী-স্ত্রী সাত বছরের ছেলেকে সঙ্গে করে বাড়ি ভাড়া করতে বেরিয়েছেন। বাড়িওয়ালা অবশ্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন,—'ঝামেলাহীন নিঃসন্তান দম্পতি ভাড়াটে চাই।' বাড়িওয়ালা আট বছরের ছেলেটিকে দেখে বললেন—না আমি তো বিজ্ঞাপনেই বলে দিয়েছি ছোট ছেলে থাকলে বাড়ি ভাড়া দেব না।

নিরাশ হয়ে দম্পতি ফিরে আসছিলেন এমন সময় ছেলেটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'আচ্ছা আপনি আমাকে বাড়ি ভাড়া দেবেন?' অবাক হয়ে বাড়িওয়ালা বললেন, 'তোমাকে?' ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ।'

বাড়িওয়ালা অবাক হয়ে তাকাতে ছেলেটি বলল, 'আমার কোনও ছেলেপুলে নেই। আমার শুধু একটা বাবা আছে আর একটা মা আছে।'

ভাড়াটে কাহিনীর একটি দুঃখের গল্প দিয়ে শেষ করি, এ গল্প আগেও বলেছি কিন্তু বারবার বলার মতো।

শ্রীযুক্ত চপল লাল পাল এক জন প্রগতিশীল কবি, বহু কষ্ট করেও বিশেষ কিছু উপার্জন করতে পারেন না। একটা বাড়ির একতলার ছোট ঘরে ভাড়ায় থাকেন, সে ভাড়াও ছ'মাস বাকি। বাড়িওয়ালা এসে তাগাদা দেওয়ায় চপল লাল তাঁকে বললেন, দেখুন আমি যে আপনার বাড়িতে আছি এটা সামান্য কথা নয়। ভবিষ্যতে বাড়ির সামনে পাথরে লেখা থাকবে, 'কবি চপল পাল এখানে থাকিতেন।' বাড়িওয়ালা শুনে বললেন, ভবিষ্যতে নয় আগামীকাল থেকেই লেখা থাকবে—'কবি চপল পাল এখানে থাকিতেন'— যদি আজ ভাড়া না মেটান।

সুনীলের সঙ্গে

দিনে দিনে কত কী যে হল। বাংলা শতাব্দী পেরিয়ে গেল, ইংরেজি শতাব্দী পেরিয়ে গেল, 'কৃত্তিবাস'-এর জন্মের পর পঞ্চাশ বছর চলে গেল, অবশেষে সুনীলের বয়সও সত্তর হল। ঠিক ৭০ অবশ্য নয় ছোট্ট ছেলেদের যেমন বলে, তিন পেরিয়ে চারে পড়ল—কিংবা নয় পেরিয়ে দশ। তেমনি সুনীল এই সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে ঊনসত্তর পেরিয়ে সত্তরে পড়ল। আগে অবশ্য একটা ভুল ছিল সুনীলের জন্মসাল কোথাও কোথাও ভুল করে ১৯৩৩ ছাপা হয়েছিল আসল ছিল ১৯৩৪। ১৯৩৩ হলে অবশ্য এ-বছরই সুনীল সত্যি ৭০ পূর্ণ করল।

আমার সঙ্গে সুনীলের বন্ধুত্বের সম্পর্কের আলোচনায় উপরোক্ত তথ্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনওদিন হয়তো বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা ওই '৩৩-'৩৪ নিয়ে মাথা ঘামাবেন তাই একটু লিখে রাখলাম।

সুনীলের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫৮ সালের এক মেঘমেদুর সকালে। আমি তখন অজ্ঞাত পরিচয় কবি-যশোপ্রার্থী এক এলেবেলে যুবক। মফস্বলে শিক্ষকতা করি, সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছি, পাজামার ওপরে ফুলপ্যান্ট, কাঁধের ঝোলায় জামাকাপড়, টর্চ, সপ্তাহে পাঁচদিন কর্মস্থল হাবড়ার কল্যাণগড়ে থাকি, দু'দিন কলকাতায় কালীঘাটে পুরনো বাসাবাড়িতে পাগল দাদার সঙ্গে। আমি সুনীলের বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম একটি কবিতা জমা দিতে 'কৃত্তিবাস'-এ ছাপার জন্যে—সেই সময় যেমন যেতাম নতুন সাহিত্য পরিচয় অগ্রণী কিংবা পূর্বাশার দরবারে।

সেসব জায়গায় অবশ্য খুব বেশি প্রশ্রয় পাইনি, কদাচিৎ দু'একটি কবিতা ছাপানোর সুযোগ পেয়েছি; আমার কোনও পাত্তা পাওয়া হয়নি।

'কৃত্তিবাস'-এ এসে কিন্তু একেবারে ভিড়ে গেলাম, সুনীলদের বৃন্দাবন পাল লেনের একতলার বাইরের ঘরের তক্তোপোশের ওপর বিছানায় বসে চুটিয়ে তাস খেলছে কয়েকজন যুবক আবার ব্রিজ খেলা হচ্ছে। আমাকে দেখে তারা ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল—এই সময়ে একজনের সাময়িক

অনুপস্থিতির সুযোগে আমি তার তাসের হাতটা ধরলাম। আমি তাস খেলা জানি বলে এরা বোধহয় একটু খুশি হল। এরা মানে—সুনীল ছাড়া ভাস্কর দত্ত এবং আশুতোষ চতুর্থজনের নাম মনে করতে পারছি না।

আমার অনেক কিছু মনে নেই, থাকার কথাও নয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। সুনীলের লেখায় পড়েছি আমি নাকি প্রথম দানেই 'সেভেন নো ট্রাম্পস' থেকে তারপর ডবল রিডবল করে এক হাজার ডাউন খেলেছিলাম। বৃন্দাবন পাল লেনের তাস খেলার ইতিহাসে সে নাকি একটা রেকর্ড। সে যাই হোক, সুনীলের সঙ্গে মিশে গেলাম। আড্ডা দিতে দিতে গভীর রাত্রি হয়ে গেলে সুনীল অনেকদিন বাড়িতে না ফিরে আমাদের কালীঘাটের বাড়িতে রাত্রিবাস করেছে। এরও কিছু পরে সুনীলের বাবা তখন মারা গেছেন বৃন্দাবন পাল লেনের পরে শ্যামপুকুর বাড়ি হয়ে সুনীলরা উঠে গেল দমদমে। সে বাড়িতে রাত্রিবাস আমার বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুনীলের মা'র হাতের রান্না আমি যে কত খেয়েছি, কোনওদিনই সে বাড়িতে আমার অন্নের অভাব হয়নি।

সুনীলের থেকে বয়েসে আমি সামান্য ছোট। সেই সুযোগ নিয়ে আমি কখনও কখনও সুনীলকে কটুকথা বলেছি হয়তো দুর্ব্যবহার করেছি, (লিখিতভাবে নয়) কিন্তু সুনীল সেটা গায়ে মাখেনি। অন্যদিকে সুনীল তার পদ্যে, গদ্যে, আত্মজীবনীতে এমনকী একাধিক উপন্যাসে তারাপদ রায় নামে এক প্রায় অসফল, অর্ধখ্যাত ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু এত কথা এসব আমি কী লিখছি! সুনীল সপক্ষে আমার যা কিছু বলার আমি একদিন যদি সুযোগ পাই এসব কথা সবিস্তারে আমার আত্মজীবনীতে লিখব।

কিন্তু তার কি কোনও প্রয়োজন আছে? ইতিমধ্যেই সুনীল প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। এই তো আজ শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০০৩ আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় সম্পত্তি বিজ্ঞাপনে দেখছি (তৃতীয় কলাম ওপরের দিকে) 'বোলপুর...ফুলডাঙ্গা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে এক বিঘা দশ কাটা জমি বিক্রয় আছে।' হয়তো সেই জমি কেনা নিয়ে এতক্ষণ মারামারি-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে।

পুলিশ এবং রবীন্দ্রসংগীত

'কুচকাওয়াজ অন্তে পুলিশও গাইল রবীন্দ্রসংগীত।' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি বোধহয় এ রকমই ছিল। বোধহয় বলছি এই কারণে যে, স্মৃতিশক্তির ওপর এখন আর তেমন ভরসা নেই।

কত স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তি স্মৃতির গভীরে তলিয়ে গিয়েছে। তা যা হোক, এই পঙ্‌ক্তিটি, বড় জোর একটু রকম-সকম হতে পারে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রায় এই কথাই লিখেছিলেন। বেশ কয়েক দশক আগেকার কবিতা। লোকেরা পড়ে বেশ হাসাহাসি করেছিল।

পুলিশ এবং রবীন্দ্রসংগীত সেকালে মেলানো কঠিন ছিল। আজকাল অবশ্য পুলিশ খুব

সংস্কৃতিবান হয়েছে। এই তো সেদিন মফস্বলে বেড়াতে গিয়ে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে মাইকে গান শুনলাম—

'আরও আরও প্রভু, আরও আরও এমনি করেই আমায় মারো...'

শক্তির এই কবিতার কাছাকাছি সময়ে অকালমৃত কবি তুষার রায় তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে আর একটি চমৎকার কবিতায় পুলিশের সঙ্গে 'খুলিস' মিল দিয়ে পুলিশকে অনুরোধ করেছিলেন,

'ও ভাই পুলিশ।
কবির সঙ্গে দেখা হলে
টুপিটা তোর খুলিস।'

কী জানি, এই পঙ্‌ক্তিটিও ভুল উদ্ধৃতি হল কি না। বাসা বদল করার পর সব বইপত্র একাকার হয়ে গিয়েছে। কোথায় তুষার রায়, কোথায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেদিন দেখলাম মধুসূদনের ঘাড়ে জীবনানন্দ উঠে বসে আছেন। বইগুলো মিলিয়ে দেখা সম্ভব হল না। পুলিশ সম্পর্কে এত কথা মনে পড়ছে, পাড়ার মেলায় 'তিন পয়সার পালা' নাটক হচ্ছে দেখে। সেই কবেকার 'তিন পয়সা', যখন তিন পয়সায় তিনটে চারমিনার সিগারেট পাওয়া যেত। সে যুগে অজিতেশ-কেয়ার তিন পয়সার পালা আমরা দল বেঁধে দেখেছি। সেই 'তিন পয়সার পালা'য় মহাদেবের ত্রিশূল হাতে রুদ্রপ্রসাদের ধেই ধেই নাচ, 'অর্ধেক দেবতা তুমি, অর্ধেক পুলিশ', সে কি ভোলা যায়!' পুলিশকে নিয়ে আমরা যাই ভাবি না কেন, পুলিশ নিজেও কম ভাবে না।

বছর-পনেরো আগে তখনও আমি সরকারি কর্মচারী। হাওড়ার এক তরুণ পুলিশসাহেব আমাকে বললেন, 'জানেন দাদা, পুলিশকে কেউ মানুষ বলে গণ্য করে না।' আমি বললাম, 'প্রমাণ দাও।' পুলিশসাহেব বললেন, 'সেদিন দায়রার একটা গোলমেলে মামলার ব্যাপারে সরকারি উকিলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে আরও দু'জন সহকারী সরকারি উকিল ছিলেন। এঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে-বাড়িতে গিয়ে ডোর বেল টিপতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সে আমাদের দেখে কিছু জিজ্ঞেস না করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে সরবে ঘোষণা করল, 'দু'জন মানুষ আর একজন পুলিশ এয়েচেন।' আমি চট করে কিছু ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাতে কী হয়েছে?' প্রশ্ন শুনে তরুণ পুলিশসাহেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনিও বুঝতে পারছেন না, পুলিশ কি মানুষ নয়? বলতে পারত না তিনজন মানুষ এসেছেন?'

পুনশ্চ : বিবাদী বাগে একটা কাজে গিয়েছিলাম, দেখি লালবাজারের সামনে ফুটপাতে একজন ভিখিরি শীতের রোদে চিত হয়ে শুয়ে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান গাইছে। 'অনেক কিছু ছেড়েছ তো জিলিপি ও সন্দেশ।' কিছুক্ষণ পরে কাজ সেরে ফেরার পথে দেখি লোকটি উপুড় হয়ে শুয়ে গাইছে, সুমনেরই অন্য একটা গান। তাকে জিজ্ঞেস করলাম; 'আগে চিত হয়ে গাইছিলে, এখন উপুড় হয়ে গাইছ কেন?' তখন সে বলল, 'দাদা এটা ক্যাসেটের উলটো পিঠ।' এটা লালবাজারের সামনেই সম্ভব।

দিশি-বিলিতি পুলিশের বৃত্তান্ত

পুলিশ বৃত্তান্ত সহজে শেষ হওয়ার নয়। ভেবেছিলাম যা লিখেছি তাই যথেষ্ট। কিন্তু হঠাৎ পরশুদিন সন্ধেবেলা শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে হঠাৎ একটা ম্যাটাডোর ট্রাকের পেছনে লেখা দেখলাম—

'আমি সমুদ্র তুমি ঢেউ
আমি কুত্তা তুমি ঘেউ
আমি পুলিশ তুমি ফেউ।'

এখানে ফেউ অর্থে স্পাই বা পুলিশের গুপ্তচর। নকশাল আমলে বিপ্লবীরা যাদের 'খোচড়' বলতেন। 'খোচড়' সন্দেহে বহু পরিচিত, অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে বীরপুরুষেরা হত্যা করেছিলেন। তার দায়ভার বহু পরিবারকে এখনও বহন করতে হচ্ছে।

এই হালকা রচনায় সেই মর্মান্তিক দিনগুলিকে ডেকে আনা উচিত হবে না। শুধু আমার একটা কথা মনে আছে যে প্রথমে নির্বিচার সন্ত্রাস, পুলিশ দেখলেই মারো, জোতদার দেখলেই মারো— এ রকম ছিল না। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে যেতে আমাকে সুনীল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেখিয়েছিল রেললাইনের পাশের দেয়ালে আলকাতরার অক্ষরে বড় বড় করে লেখা—

'পুলিশ তুমি যতই মারো
মাইনে তোমার একশো বারো।'

এই স্লোগানে নিশ্চয় পুলিশের প্রতি কিঞ্চিৎ সমবেদনাও ছিল।

যাইহোক, আর মারামারি নয়। এবার হাসাহাসি।

অবশ্য পুলিশ নিয়ে হাসাহাসিও কম বিপজ্জনক নয়। সম্প্রতি শোনা তিনটি গল্প বলছি।

প্রথম গল্পটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য।

এক গুণ্ডাকে ধরতে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে এসেছে সেপাই। দারোগার প্রায় সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে। সেপাইটি হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে আসায় দারোগা ধমকাতে লাগলেন, 'তুমি কী? এতদিন পুলিশে চাকরি করছ, ওই লোকটাকে ধরতে পারলে না।' সেপাই বলল, 'না স্যার। পালিয়ে গেল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবে না।' দারোগা বললেন, 'কেন?' সেপাইটি বলল, 'আমি ওর হাতের ছাপ রেখে দিয়েছি।' দারোগা অবাক হয়ে বললেন, 'হাতের ছাপ কখন রাখলে?' 'এই দেখুন স্যার, এই দেখুন আমার গালে। যা একটা থাপ্পড় কষিয়েছে।' সেপাই তার বাঁ গালটা দারোগাকে দেখাল।

এর পরের গল্পটি বিলিতি। বিলেতের এক শহরে কুকুরের খুব উৎপাত। পুরসভা নির্দেশ জারি করেছে, সব কুকুরের লাইসেন্স লাগবে। পুলিশকে অনুরোধ করেছে লাইসেন্সহীন কুকুরের মালিকদের ধরতে।

একদিন সন্ধেবেলা এক ব্যক্তি তার কুকুরটিকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। কুকুরটি তার পিছু পিছু যাচ্ছে। পুলিশ কিছুক্ষণ তাকে অনুসরণ করল। তারপর যখন বুঝল কুকুরটি সত্যি লোকটির সঙ্গে সঙ্গে থাকছে, পিছু পিছু যাচ্ছে তখন পুলিশ বলল, 'এটা কি তোমার পোষা কুকুর?'

লোকটি বলল, 'না। এটা যে আমার পোষা কুকুর, তা তুমি বুঝছ কী করে?' পুলিশ বলল, 'ও তো তোমার পিছু পিছু আসছে।' তখন লোকটি বলল, 'তুমিও তো আমার পিছু পিছু আসছ। তুমি কি আমার পোষা পুলিশ?'

এর পরে একটি ঘরোয়া গল্প।

দারোগাবাবুর পকেট থেকে স্ত্রী পঞ্চাশ টাকা চুরি করেছে। ব্যাপারটা ধরে ফেলে দারোগাবাবু স্ত্রীকে বললেন, 'আমি পুলিশের লোক, তোমাকে ছাড়ব না, তোমাকে হাজতে দেব।'

স্ত্রী ঘুষখোর দারোগা স্বামীর হাতে একটা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার ভাগ দিয়ে দিলাম, আর কথা বাড়িও না।'

রসলক্ষ্মীর সাধনা

কে এক আধুনিক কবি যেন লিখেছিলেন, কপালের চুল ছিঁড়ে ইটের দেয়ালে মাথা ঠুকে কবিতা লেখার কোনও মানে হয় না। তা, কাব্যলক্ষ্মী তো বহুদিন আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আজকাল আমার রসলক্ষ্মীর সাধনা।

কিন্তু প্রবঞ্চনায় রসলক্ষ্মী কিছু কম যান না, সেদিন সন্ধ্যা থেকে অনেক চেষ্টা করলাম, লক্ষ্মীর কৃপা হল না। এক পঙ্‌ক্তিও লিখতে পারলাম না।

এমন সময় গঙ্গারাম এসে হাজির। তার হাতে একটা বোতল তোয়ালে দিয়ে জড়ানো। দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। মদ আমার দু'চক্ষের বিষ। গঙ্গারাম সেটা জানে, সে কী করে এত সাহস পেল।

আমার মনোভাব গঙ্গারাম হয়তো মুখ দেখে টের পেয়েছিল। সে বলল, 'দাদা আপনি যা ভাবছেন তা নয়।' আমি বললাম, 'কী ভাবছি? কী নয়?' গঙ্গারাম বলল, 'আপনি ভাবছেন আপনার জন্যে মদের বোতল নিয়ে এসেছি নিউ ইয়ারের ভেট হিসেবে। তা কিন্তু নয়।'

আমার খেয়াল হল দিনটা, দোসরা জানুয়ারি গতকালই ইংরেজি নতুন বছর শুরু হয়েছে। তোয়ালে ঢাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা জিনিসটা কী?' গঙ্গারাম বলল, 'এটা পৌষ কালীর প্রসাদ।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পৌষ কালী?' গঙ্গারাম বলল, 'জানেন না, পৌষ মাসের অমাবস্যায় পৌষ কালীর পুজো হয়। সেদিন লোকেরা সারাদিন চড়ুইভাতি করে, বিকেলে প্রসাদ পায়। এই এক বোতল টাটকা প্রসাদ আপনার জন্য নিয়ে এলাম। দু'-এক চামচ খেয়ে দেখুন, মাথা সাফ হয়ে যাবে। কলমের মুখ দিয়ে সরস সব গল্প বেরুবে।' এই বন্ধ্যা সন্ধ্যায় গঙ্গারামের কথা শুনে একটু ভরসা পেলাম। তবু আমার মনের খটকা যায় না। আমি বললাম, 'কোথায় পেলে এ মহামূল্য প্রসাদ?' গঙ্গারাম বলল, 'বনহুগলির ধাঙড়পাড়ায়।' আর বিস্তৃত জানতে চাইলাম না। গঙ্গারাম পকেটে করে দুটো চা খাওয়ার খুরি নিয়ে এসেছিল, এঁটো কি না কে জানে। গঙ্গারাম ভিতরের বারান্দায় গিয়ে খুরি দুটো জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে এল, তারপর সেই বোতল থেকে টকটকে লাল রঙের কী একটা ঘন পানীয় ভাঁড় দুটোয়

ভরল। তারপর একটা আমাকে এগিয়ে দিল। আমি ভয়ে ভয়ে পানীয়টির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা লেহ্য, না পেয়? মানে এটা চেটে খেতে হবে, না চুমুক দিয়ে খেতে হবে?' গঙ্গারাম বলল, 'ভয় পাবেন না, খাঁটি শাস্ত্র মেনে তৈরি। পরশুরাম তাঁর গল্পে যে চাঙ্গায়ণী সুধার কথা বলেছিলেন, এ তার চেয়ে অনেক বেশি কড়া, স্বর্ণভস্ম থেকে স্কচ, মোদকানন্দ মোদক থেকে আফিং, সব মিলিয়ে এটা তৈরি।' ভয়ে ভয়ে এক চুমুক ঠোঁটে ঠেকালাম। ছোট শিশু হাঁটতে শিখলে লোকে যেমন বলে আর একটু আর একটু, গঙ্গারাম তাই করতে লাগল। কিন্তু আমার পক্ষে আর একটু সম্ভব হল না। ততক্ষণে গঙ্গারাম এক খুরি শেষ করে পরের খুরি ঢেলেছে। সে খাতার উপর ফেলে রাখা কলমটা আমার হাতে ধরিয়ে বলল, 'এবার লিখে যা দেখি, আমি বলছি।'

গঙ্গারামের সাহস দেখে আমার রাগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু একটু নেশা হয়তো হয়ে গিয়েছিল, রাগ সামলে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, কী গল্প বলবে বলো।' গঙ্গারাম বলল, 'আমাদের পাড়ায় শিবনাথ বিয়ে করেছে। বিয়ে করে বাড়িতে বউ নিয়ে এসেছে। বাড়িতে থাকার মধ্যে শিবনাথের প্রৌঢ়া বিধবা মা। তিনি নতুন বউ দেখে একদম হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'শিবু এ কী করেছিস? চোখ দুটো ট্যারা, দাঁতগুলো পোকায় কাটা, কালো, গায়ের রংও কালো। মাথায় চুল প্রায় নেই। এ কী বউ নিয়ে এলি?' নববধূ যাতে শুনতে না পায় শিবুর মা নববধূকে আশীর্বাদ করতে করতে ফিস ফিস করে এইসব কথা শিবুকে বলছিলেন। মায়ের কথা শুনে শিবনাথ মাকে বলল, 'মা, বউ কানে একদম কালা। তোমাকে ফিসফিস করে কথা বলতে হবে না।'

সব শুনে আমি বললাম, 'এ তো বাজে গল্প।' গঙ্গারাম আহত হয়ে বলল, 'তা হলে আপনার বউমার একটা গল্প বলি। কাল একচোট খুব ঝগড়া করল। আমি বাধ্য হয়ে বললাম, তুমি এ রকম করলে বাড়িতে শান্তি থাকবে না।' আমার কথা শুনে আপনার বউমা আমাকে তেড়ে এল। বলল, 'আমি বাপের বাড়ি যাচ্ছি, তুমি থাক তোমার শান্তিকে নিয়ে।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শান্তি? শান্তি আবার কে?' উদ্যত ঝাঁটা হাতে বউ বলল, 'ন্যাকামি করো না, এ বাড়িতে শান্তি আসবে না, এ বাড়িতে শান্তি থাকবে না—আমি কিছু বুঝি না বুঝি!'

জানলা পড়ল মাথায়

ঘটনাটা সত্যি ঘটেছিল কি না তা আমি হলফ করে বলতে পারব না, কারণ গল্পটা আমি গঙ্গারামের কাছে শুনেছিলাম।

গঙ্গারামের এক সহকর্মী বাগুইআটিতে একটি বাড়ি করেছেন। অফিস থেকে গৃহনির্মাণ ঋণ নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে বাড়িটি বানিয়ে দিয়েছেন এক ঠিকাদার।

গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ গঙ্গারামও পেয়েছিল, সহকর্মী সুকুমারবাবু গঙ্গারামের মুখোমুখি উলটো টেবিলে বসেন, সেই থেকে হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব।

গৃহপ্রবেশের দিন আত্মীয়-বন্ধু অনেকেই এসেছেন, ঠিকাদারবাবুও। তাঁকে দেখে সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন, এমনকী সুকুমারবাবু পর্যন্ত।

বাড়িটা বড় দায়সারাভাবে বানিয়েছেন। দোতলায় দক্ষিণমুখী বেশ বড় একটা ঘর রয়েছে। সেই ঘরে বন্ধুদের নিয়ে গেলেন সুকুমারবাবু। ঘরের সামনের দিকের দুটো জানলাই বন্ধ। কাঁচা রং শুকিয়ে আটকে গিয়েছে। অনেক টানাটানির পর সুকুমারবাবুর কেমন রোখ চেপে গেল। সেখানে ঠিকাদারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে সমস্যাটা বলতে তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'আপনার টাকা কম হয়ে গেল, ভাল রং দিতে পারলাম না, শস্তার রং কাঁচা অবস্থায় লেগে গিয়ে একটু টাইট হয়, ভাল করে শুকোলেই খুলে যাবে। তবে খুব টানাটানি করবেন না। সিমেন্টও কাঁচা রয়েছে।' এসব কথা সুকুমারবাবুর কানে ঢুকল না। একটু কড়াভাবে তিনি সিঁড়ির এক পাশ থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে আবার দোতলার ঘরে ঢুকলেন। সে-ঘরে এখনও নিমন্ত্রিতদের জটলা। জানলা বন্ধ ঘরের মধ্যে গুমোট বলে, ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

এদিকে ঘরের মধ্যে এখনও একজন জানলা ধরে টানাটানি করছে। তাকে সরিয়ে দিয়ে সুকুমারবাবু হাতের ইটটা দিয়ে পর পর দু'বার সর্বশক্তি দিয়ে জানলার পাল্লায় দুমদাম আঘাত করলেন, মনোভাব, ভাঙে তো ভাঙুক।

জানলা ভাঙল না, খুললও না।

কিন্তু তার চেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল, দেয়াল থেকে খুলে গিয়ে জানলাটা অনেকটা ইট, পলেস্তারা সমেত দড়াম করে নীচে পড়ল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওই সময়ে ওই জানলার সরাসরি নীচে ঠিকাদার ভদ্রলোক আপনমনে সিগারেট টানছিলেন। জানলা তাঁর মাথায় পড়ে। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এরপরে কী হয়েছিল গঙ্গারাম আমাকে বলেনি। এ-গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও আমি কিছু বলতে পারব না। গৃহপ্রবেশ সমাসবদ্ধ পদ, গৃহে প্রবেশ গৃহপ্রবেশ, বোধহয় তৎপুরুষ সমাস।

অবশ্য গৃহপ্রবেশ মানে গৃহে প্রবেশ—একথার কোনও মানে নেই, ভারী অস্পষ্ট। স্পষ্ট কথাটা হল গৃহপ্রবেশ মানে নবনির্মিত গৃহে গৃহমালিকের বসবাসের জন্য প্রথম প্রবেশ।

পাঁজিতে গৃহপ্রবেশের তারিখ থাকে। বছরে অন্তত দশ-বারো দিন থাকে। এ ছাড়া গৃহারম্ভ, দেবগৃহারম্ভ, দেবগৃহ প্রবেশের তারিখ পাঁজিতে পাওয়া যায়।

মানুষ এক জীবনে আর কটা বাড়ি করে? সুতরাং নতুন ঠিকানায় প্রবেশের দিনে অনুষ্ঠান সে তো ভালই। সাহেবদেরও হাউস ওয়ার্মিং পার্টি আছে। নতুন বাড়িতে প্রবেশ করে আনন্দফুর্তি, পান-ভোজন এই উপলক্ষে পুজো তথা উৎসব সবারই পছন্দ।

সেদিনের চুম্বনের পরে

কেউ বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে আমার হাতে এ ব্যাপারে অনেক সাক্ষী আছে।

আমার এই উদ্ভিন্ন বার্ধক্যে সেদিন এক নৈশ আসরের অবসানে প্রায় মধ্যরাতে আড্ডা থেকে বেরনোর মুখে সিঁড়িতে আমাকে আলিঙ্গন করে এক প্রমত্তা যুবতী নিবিড় ভাবে চুমু খেয়েছিল। সেই আসরে যুবজনের খুব অভাব ছিল না। নবীন প্রৌঢ়দের সংখ্যাও অনেক, তার মধ্যে প্রাচীনতম এই ব্যক্তিটিকে বরণ করে নেওয়ায় আমি অবশ্যই একই সঙ্গে আনন্দিত এবং গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমেই সেই চুমুর কথা মনে পড়ল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক দিন পরে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখলাম। গত রজনীর চুম্বনাভিষিক্ত ঠোঁট দুটোয় আলতো করে হাত বোলালাম।

সহসা আয়নায় ছবিতে দেখি ঘরের ওপাশে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে শ্রীযুক্তা মিনতি। ওষ্ঠদ্বয় সমেত আমার সম্পূর্ণ মরদেহের এবং অমর আত্মার যিনি যদিদং হৃদয়ংয়ের সূত্রে চিরকালীন লিজগ্রহীতা।

মিনতিদেবী মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? ঠোঁটে হাত বোলাচ্ছ কেন? কেউ ঠোঁটে কামড়ে দিয়েছে?' আমি বললাম, 'কামড়াবে কেন? চুমু খেয়েছে। কাল শ্রীমতী আমাকে একটা চুমু খেয়েছে।'

মিনতি বললেন, 'একটা নয় অনেকগুলো।'

আমি বললাম, 'সর্বনাশ।'

মিনতি বলল, 'সর্বনাশ কেন? সিঁড়ির নীচে অন্ধকারে শ্রীমতীর বর দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে জাপটে ধরে বেশ কয়েকটা চুমু খেয়েছি।'

আমি বললাম, 'চমৎকার।'

এই চমৎকার পর্বে কল্যাণীয়া দেবযানীর প্রবেশ, সে আমাদের নতুন বন্ধু কিন্তু একেক সময় এমন ভাব করে যেন জন্ম-জন্মান্তর থেকে চেনে।

গতকাল মধ্যরাতে আমাকে সিঁড়ি দিয়ে হাত ধরে নামিয়ে আনছিল, সেই সময়ে শ্রীমতী তাকে অতিক্রম করে আমাকে চুমুতে চুমুতে ছেয়ে দেয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় দেবযানী দ্রুত নীচে নেমে আসে, সেখানে এসে সে আরও তাজ্জব বনে যায়। শ্রীমতীর বরকে মিনতি বউদি অক্লেশে একের পর এক চুমু খেয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী দেবযানী নতুন যুগের নবীনা রমণী, সে তো ভাল করে এখনও চেনে না আমাদের। অগ্নিযুগের কবি এবং কবি ঘরণীর সম্পর্কে কে আর কতটুকু জানে। তাকে বলতে পারতাম, আমাদের দু'জনকে কয়েকটা করে চুমু খাও। তা বলিনি, কারণ তার যদি চুমু খাওয়ার নেশা হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত কথা আপাতত থাক। সাহিত্যের কথা একটু বলি।

বাংলা সাহিত্যে চুম্বনের ছোঁয়া কদাচিৎ লেগেছে। সঙ্গম বা যৌনতা অনেক ছোট বড় মাঝারি লেখক বুঝে কিংবা না বুঝে গল্পে উপন্যাসে ঢুকিয়েছেন।

কিন্তু চুম্বন কোথায়?

শরৎচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হবে। তবু রবীন্দ্রনাথ আছেন অন্তত রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাঁর কবিতার অর্ধপঙ্‌ক্তি দিয়ে এই নিবন্ধের নামকরণ। জীবনানন্দে চুম্বন নেই। তাঁর কাজ অতীন্দ্রিয়। তবে বুদ্ধদেববাবু চুম্বনের ভক্ত ছিলেন, তাঁর প্রথম যুগের কবিতায় ভালভাবেই চুম্বনের স্পর্শ আছে। আর আমাদের সুনীল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় তাঁর নায়িকা অরুন্ধতী (জীবন সর্বস্ব), সেই মেয়ের আলজিব ছোঁয়া চুম্বনের প্রগাঢ় আশ্লেষ অবিস্মরণীয়। সুনীলই ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে লিখেছিল, তোমার ওই শুকনো ঠোঁট কতদিন সেখানে চুম্বন পড়েনি। সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার এবং বুদ্ধদেব গুহের কামনামদির গল্প-উপন্যাসেও চুম্বনের ছোঁয়া আছে।

মহানায়ক উত্তমকুমার একদা এক সাক্ষাৎকারে এক ছলবলে মহিলা রিপোর্টারকে নাকি বলেছিলেন, 'আমি সবচেয়ে ভালবাসি যে দুটো জিনিস, তা হল চুমু এবং গলদা চিংড়ি।'

সাহসিকা রিপোর্টার তরুণী এর পর যোগ করেছিলেন, 'শাবাশ! এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কী হতে পারে?

চুম্বনপর্ব এখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু দুটো গল্প না বলে উপায় নেই।

একটি তরুণ তার বান্ধবীকে বলেছিল, 'জানো, তোমাকে না ছুঁয়ে চুমু খেতে পারি।'

বান্ধবী অবাক হয়ে বলে, 'সেটা কী করে সম্ভব?' ছেলেটি বলে, 'খুবই সম্ভব। দশ টাকা বাজি রাখবে?' মেয়েটি রাজি হল, 'হ্যাঁ, দশ টাকা বাজি।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তাকে জাপটিয়ে ধরে চুমু খেল। মেয়েটি কোনও রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওটা কী হল?'

ছেলেটি বলল, 'কী আর হবে? আমি হারলাম। এই নাও বাজির দশ টাকা' বলে পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল।

দ্বিতীয় গল্পটি কিন্তু বেদনাময়। মিসেস সান্যাল তাঁর বরকে বললেন, 'ওগো, সামনের ফ্ল্যাটের মিসেস ভক্তকে মিস্টার ভক্ত দৈনিক অফিস যাওয়ার আগে চুমু খেয়ে যান। তুমিও তো ও রকম করতে পারো।'

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিড়ম্বিত কণ্ঠে মিস্টার সান্যাল বললেন, 'তা তো পারি, কিন্তু মিসেস ভক্ত কি রাজি হবেন? শেষে একটা গোলমাল না হয়ে যায়।'

রবীন্দ্রনাথ শিরোধার্য করে এই চপল রচনা শুরু করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শেষ করি— 'অধরের কানে যেন অধরের ভাষা, / দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—/ গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা / তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।'

হাসির উপন্যাস

কবিতা দিয়ে নয়, আমার সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল উপন্যাস রচনা করে। যতদূর মনে পড়ে, সেটা ছিল হাসির উপন্যাস, এই অর্থে যে, সেটি পাঠ করে লোকের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হত। অন্তত আমার মাতৃঠাকুরানি সেই অভিমত দিয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয়, আমার সেই রচনা আমার মা ছাড়া আর কারও পাঠ করার সৌভাগ্য হয়নি।

তখন আমার বয়স ষোলো, আমার পরের ভাই বিজনের দশ-এগারো। একদিন আমি গভীর মনোযোগ সহকারে উপন্যাস লিখছিলাম, এমন সময় বিজন কী একটা গোলমাল করে। আমি তাকে কানে ধরে একটা থাপ্পড় মেরেছিলাম। একটু পরে আমি যখন লেখা বন্ধ করে একটু উঠে গিয়েছিলাম, বিজন আমার সেই পাণ্ডুলিপি তুলে নিয়ে রান্নাঘরে কাঠের উনুনের মধ্যে ফেলে দেয়। আমি মা-কে গিয়ে নালিশ জানাতে মা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'সে কি, বিজন কি উপন্যাস পড়তে শিখেছে?'

এই উপন্যাসটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু একথা বলা চলে বাংলায় হাসির উপন্যাস প্রায় নেই।

পরশুরামের মতো হাসির গল্পের লেখক পৃথিবীর যে-কোনও ভাষাতেই বিরল। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী থেকে নবনীতা দেবসেন, ইন্দ্র মিত্র—এঁরা সব অসামান্য, অতুলনীয় হাসির গল্প লিখেছেন। কিন্তু উপন্যাস। নৈব নৈব চ।

এমনকী, সেই অর্থে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও কোনও হাসির উপন্যাস লেখেননি। অসামান্য

ব্যঙ্গতির্যককে ভরা উপন্যাসগোত্রীয় গ্রন্থগুলি আসলে উপন্যাস নয়। দুই শতাব্দীর ইতিহাসে একমাত্র ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'কঙ্কাবতী' শুধু হাসির উপন্যাস নয়, ও রকম মানবিক গুণসম্পন্ন মর্মস্পর্শী রচনা যে-কোনও ভাষাতেই বিরল। এরই কিছু পরে কেদারনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের রচনা অবশ্য আমার খুব প্রিয় নয়।

আর-একটি উপন্যাসোপম রচনামালার উল্লেখ না করা অনুচিত হবে। সেটি হিমানীশ গোস্বামীর 'সাধু সিরিজ' যথা, লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়, লন্ডন শহরে সাধু ঘটক ইত্যাদি। কেন যে হিমানীশ গোস্বামীর লন্ডন অমনিবাস কোনও প্রকাশক আজও ছাপেননি সে রহস্য আমার জানা নেই।

অবশেষে আমার নিজের কথায় আসি। এতকাল ধরে কত লোক যে আমাকে হাসির উপন্যাস লিখতে বলেছেন, তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি যে সত্যি কোনও হাসির উপন্যাস লিখিনি, তা নয়। একবার এক পুজো সংখ্যায় 'কবিতা ও ফুটবল' নামে একটি সম্পাদক-ঠকানো উপন্যাসিকা লিখেছিলাম।

কেউ কেউ সে-কাহিনী পড়ে হেসেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি ধোপে টেকেনি।

অন্যদিকে মাত্র কয়েক বছর আগে একটি বিখ্যাত বাংলা মাসিক পত্রে বৎসরাধিককাল একটি ধারাবাহিক হাসির উপন্যাস লিখেছিলাম। উপন্যাসটির নাম ছিল 'সর্বনাশ'। বাংলা সাহিত্যের এক নম্বর প্রকাশকের গদি থেকে সেটি বই হয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা খুব আদর করে সে-বই গ্রহণ করেছেন এমন মনে হয় না।

তবু, উপন্যাস লেখার স্বপ্ন আমি ছাড়িনি। হাসির উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে না হোক, পর্বে পর্বে দু'-একটি করে মোক্ষম রসিকতা থাকবে। উপন্যাস লেখা আরম্ভ করার আগেই সেই রসিকতাগুলি আমি সাজিয়ে ফেলেছি।

তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

(এক) কাহিনীর নায়ক একটি পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করছে। সে একটি বাঁশের খুঁটি ধরে ডুব দিচ্ছে। বাঁশের খুঁটিটির উপর একটি সাইনবোর্ড লাগানো—'এই পুকুরের জলে সাঁতার কাটা নিষেধ।' জনৈক পাহারারত পুলিশ তাকে বলল, 'আপনি নোটিশে কী লেখা আছে দেখেননি?' নায়ক জবাব দিল, 'হ্যাঁ তা দেখেছি।' পাহারাদার বলল, 'তা হলে?' নায়ক বলল, 'লেখা আছে সাঁতার কাটা নিষেধ, আমি তো সাঁতার কাটছি না, ডুব দিচ্ছি।'

(দুই) অসুস্থ নায়িকার বিছানার পাশে নায়ক বসে আছে। নায়িকা বলছে, 'আমি মরে গেলে তুমি কী করবে?' 'আমি সারাজীবন ধরে কাঁদব।' নায়িকা, 'কেমন করে কাঁদবে একটু দেখাও।' নায়ক, 'তুমি আগে মরে দেখাও।'

(তিন) শেষপর্বের আগের পর্ব। নায়ক উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

সে তার জামাকাপড় হাতে উলঙ্গ হয়ে একটা পার্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নায়কের এক বন্ধু নায়কের এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী ব্যাপার?'

নায়ক বলল, 'একটা ঝোপঝাড় কোথাও পাচ্ছি না, যার পিছনে গিয়ে এই জামাকাপড়গুলি পরতে পারি।'

এরপরে আমি অবশ্য কবুল করতে পারি যে, হাসির উপন্যাস লেখার মাল-মশলা সংগ্রহ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু উপন্যাসাকারে পরিবেশন করলেই হবে।

ভুল (২)

মানুষ ভুল করে।

মানুষ মাত্রেই ভুল করে।

পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কখনও ভুল করেনি। মানুষ চিরকাল ভুল করেছে। এখনও ভুল করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও ভুল করবে।

পরীক্ষার খাতায় চেনা অঙ্ক ভুল হয়ে যায়। অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যুঞ্জয় সার্জন ভুল করেন, মোক্ষম মুহূর্তে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ ভুল করেন। ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে প্রশ্নের জবাবে প্রার্থী প্রথম মুঘল সম্রাটের নাম মনে করতে পারে না।

এইসব ধরনের ভুল কখনও হালকা হাসির, কখনও বিপজ্জনক।

মজার ভুলের গল্প আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের। এক ব্যক্তি সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে বিছানায় নিজে না শুয়ে সেখানে তাঁর হাতের লাঠিটি শুইয়ে নিজেকে লাঠিভ্রমে দরজার পাশে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখেন।

একদা ভুলে ভরা কলকাতার গান গেয়ে দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত কলকাতা শহর মাতিয়েছিলেন।

সবই সামান্য সাধারণ কথা। ভুলে ভরা শহর কলকাতা। এখানে গোলদিঘি গোল নয়। মুরগিহাটায় মুরগি কিনতে পাওয়া যায় না। বউবাজারে বউ পাওয়া যায় না। এখানে চোরবাগানে সাধুদের বাস। এ রকম সব বালকোচিত ভুলের তালিকায় ভরা সেই গান জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছিল।

ভুলের আদি-অন্ত নেই। ভুল করার দুঃখে ভরা কত গান, কত কবিতা। মুম্বইয়ের হিন্দি সিনেমার অধিকাংশ গল্প ভুলের পরিণাম নিয়ে। স্বামী-স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী-স্বামীকে ভুল সন্দেহ করে। বন্ধু বন্ধুকে ভুল বোঝে—এইসব নিয়ে কাহিনী।

এগুলি গোঁজামিল ভুল। আসল ভুলের কথায় যাই।

প্রথমেই আদিকবি বাল্মীকি।

রামায়ণ মহাকাব্যের সেই অংশটি তো সকলের জানা। ইন্দ্রজিতের শক্তি শেলে লক্ষ্মণ যখন মূর্ছাহত, মৃতপ্রায় সেই সময় রামচন্দ্র বিলাপ করেছিলেন,

দেশে দেশে কলত্রানি,
দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
ত্বং তু দেশম ন পশ্যামি
যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥

ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে বিখ্যাত এই শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ হল :

দেশে দেশে স্ত্রী পাওয়া যাবে, দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যাবে, কিন্তু এমন কোনও দেশ নেই যেখানে সহোদর ভাই পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্মণ কী করে রামের সহোদর হলেন? লক্ষ্মণের সহোদর ভাই শত্রুঘ্ন, তাঁদের মা সুমিত্রা।

রাম কৌশল্যার পুত্র। রাম-লক্ষ্মণ সহোদর নন, বৈমাত্রেয় ভাই। অথচ এই শ্লোকে রাম-লক্ষ্মণকে সহোদর ভাই বলছেন।

আমার কেমন মনে হয়, এই পঙ্‌ক্তিটি প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে কোনও আবেগাকুল কবির দ্বারা সংযোজিত। আমি বাল্মীকি মূল রামায়ণে খুঁজে দেখেছি পঙ্‌ক্তি দুটি দেখতে পাইনি। আমার অনিশ্চিত দৃষ্টির জন্য অবশ্য তা হতে পারে।

আদিকবির পর বিশ্বকবি। ভাবাই যায় না যে, রবীন্দ্রনাথের ভুল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও একটি অস্বাভাবিক ভুল করেছিলেন। এটি একটি বিখ্যাত ভুল, অনেকেই জানেন।

অনেকের কাছে ভুলটি সামান্য হলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ রকম ভুল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভব ভুলটি তিনি করেছিলেন। সকালবেলায় সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, তখন ছায়া খুব লম্বা হয়। তারপর সূর্য যেমন যেমন মাথার উপরে উঠতে থাকে, ছায়া তেমনই হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হতে থাকে। সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন হ্রস্বতম ছায়া। এর পর সূর্য যেমন নামতে থাকে ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এর বিপরীত বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেখানে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া বড় হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের এই ভুল সজনীকান্ত দাশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভুল স্বীকার করে দীর্ঘতর ছায়াকে পরবর্তী সংস্করণে হ্রস্বতর করেছিলেন।

অতঃপর পরশুরাম। অর্থাৎ, রাজশেখর বসু। 'চলন্তিকা' বাংলা ভাষার একটি বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় অভিধান। ভাবা যায়, সেই অভিধানের রচনাকার নিজে ভুল বানান লিখছেন।

কয়েকবছর আগে এম সি সরকারের পুস্তক প্রকাশালয় থেকে একটি চটিবই বেরিয়েছিল, 'অপ্রকাশিত রাজশেখর' এই নামে। সেই বইয়ের প্রথম দিকে রাজশেখরবাবুর হাতে লেখা একটি পৃষ্ঠার ছবি ব্লক করে মুদ্রিত আছে। গল্পের চরিত্রগুলির কোনটার চেহারা কী রকম হবে স্বয়ং পরশুরাম স্বহস্তে এঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশাবলির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন হাসি মুখ, স্পষ্টই হাসি বানানে তিনি দীর্ঘ ঈকার দিয়েছেন।

এই ঘটনা অবশ্য চলন্তিকা প্রকাশের এক দশক আগের। আমার কেমন মনে হয়, বাংলা বানানে দুর্বলতা ছিল জেনেই নিজেকে সংশোধন করার জন্য অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বা পরশুরাম শুধু নন, ভুল সত্যজিৎ রায়-ও করেছিলেন। ফেলুদা কাহিনীতে কলিংবেল বেজেছিল লোডশেডিংয়ের সময়। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুল করছেন এই পত্রিকার সম্পাদক, যিনি আমার মতো ভেজাল লেখকের গোঁজামিল লেখা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছেপে চলেছেন।

মহিলা কবিরা

এক জন্ম-রোমান্টিক মরমি পুরুষ কবি একদা লিখেছিলেন,

'রমণীর মন
সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।'

এ রকম কোনও কথা মহিলা কবিরা আজকাল একেবারে বলেন না। এক কালে অপরাজিতা দেবী (রাধারানি দেবী), গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী এবং এই তো সেদিন 'ভাব ভাব কদমের ফুল' রচয়িতা রাজলক্ষ্মী দেবী সুন্দর সুন্দর ভালবাসার কথা লিখেছেন।

এখন আর সেদিন নেই। যেসব পুরুষমানুষের মন একটু নরম প্রকৃতির হয়, তারাই কেউ কেউ কবি হন।

তার তুলনায় একালের মহিলা কবিরা খুব শক্ত মনের মানুষ। তাঁরা পুরুষ জাতিকে তঞ্চক, শোষক ইত্যাদি ভাবতে ভালবাসেন।

একবার এইরকম এক জ্বলন্ত সাহিত্যসভার শেষে আমাকে জনৈকা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নারীবাদিনীদের সম্পর্কে আমার কী অভিমত।

আমি অভিমত দেওয়ার কে? এ ব্যাপারে আমার কতটুকু অধিকার আছে? তবু, হালকাভাবে একটা উত্তর দিয়েছিলাম, অনেকেই সেটা শুনেছেন এবং জানেন, আমি লিখিতভাবে বলেছি।

আমি বলেছিলাম, 'এ ব্যাপারে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত।'

প্রশ্ন উঠল, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসেন কীভাবে? নারীবাদীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কবে কী বলেছেন?

আমি বললাম, বলার আর কী আছে? রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর গানেই লিখেছেন,

'তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
নারীবাদিনীর শতদলতলে করিছে
সে টলমল।'

আমার সেই কথা শুনে সবাই হই হই করে উঠল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

তারপরে কোনওদিন-ভালবাসলেও-বাসতে পারতাম, এমন এক প্রৌঢ়া বললেন, 'যত বুড়ো হচ্ছিস তত ফাজিল হচ্ছিস।' ইতিমধ্যে এক তরুণী কবি আমাকে চেপে ধরলেন, বললেন, 'আপনার কোটেশন ভুল। রবীন্দ্রনাথ ও রকম বলেননি।' আমি অসহায়ের মতো জিজ্ঞাসা করলাম, 'রবীন্দ্রনাথ তা হলে কী বলেছিলেন?' সবাই চেষ্টা করতে লাগল। কেউ কেউ মনের মধ্যে গানের সুর ভেঁজে গুনগুন করতে লাগল। কিন্তু বারবার কই মাছের মতো আসল শব্দটি পিছলিয়ে গেল।

সংস্কৃত ছাত্র-পাঠ্য গল্পগুলিতে 'হা হতোস্মি' বলে একটা কথা আছে। যার মানে হল, 'হায়, আমি হতভাগ্য মরিলাম।' এই পর্যন্ত লেখার পর আমার মনে হচ্ছে, আমাকে হয়তো এবার 'হা হতোস্মি' বলতে হবে। নিতান্ত বোকা বলে আমি প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারে নারীবাদের মতো জটিল বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছি।

অনেকদিন আগে এ রকম একটা বিষয় নিয়ে রচনা লিখে খুব গোলযোগে পড়েছিলাম। সেটা ছিল 'কাণ্ডজ্ঞানের' যুগ। আমার মধ্য যৌবন, গায়ে প্রহৃত হওয়ার মতো শক্তি ছিল। পায়ে দৌড়ে পালানোর মতো জোর ছিল।

এখন আর তত সাহস নেই। তবু, প্রসঙ্গটা বলি। আধুনিকা বিবাহোত্তরা মহিলারা পিতৃগৃহের পদবির সঙ্গে স্বামীর পদবি যোগ করেন। পিতৃগৃহের পদবিটি প্রথমে, স্বামীর পদবিটি পরে।

এতে আপত্তি নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে আগামী দিনের একটা ভয়াবহ সমস্যার কথা উঁকি দেবে।

রাম চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে রমা ভট্টাচার্য হলেন—রমা ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী। গোলাম হোসেনকে বিয়ে করে মালতী দাশগুপ্ত হলেন—মালতী দাশগুপ্ত-হোসেন।

পরবর্তী প্রজন্ম মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে—ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী পুত্রের বিয়ে হল দাশগুপ্ত-হোসেনের কন্যার সঙ্গে। তাদের উপাধি হল দাশগুপ্ত-হোসেন-ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গোকুলে অন্যেরাও বাড়ছে। রমাদেবীর নাতনির সঙ্গে জনৈক যুবকের ভালবাসা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। একইভাবে সেই যুবকের এখন উপাধি ফোর্ড-সুব্রহ্মণ্যম-পট্টনায়ক-মিত্র এবং পৃথিবী ঠিকমতো ঘুরতে থাকলে, চন্দ্র, সূর্য ঠিকমতো নামা-ওঠা করতে থাকলে একদিন এদেরও সন্তানাদির বিয়ে হবে, পদবি আবার ডবল হয়ে যাবে। এ হল পাটিগণিতের জিয়োমেট্রিক প্রগ্রেশন, এর কোনও অন্ত নেই। পরীক্ষা সার্টিফিকেটে নাম লিখতে গেলে এক পাতা দেড় পাতা চলে যাবে। তেমনি সমস্যা হবে ভোটার লিস্টে, খামের ঠিকানায়।

এর কোনও সমাধান নেই। অনেকে বলেছেন, তা হলে পদবি উঠে যাক। সেটা এক দিক থেকে মন্দ নয়।

নাম আর পদবি দুয়ে মিলে একটি মানুষকে বিশিষ্ট করে তোলে। সবাই যদি 'সুনীল' হয়ে যায়, সবাই যদি আরতি হয়ে যায়, তখন হাজার হাজার সুনীল, হাজার হাজার আরতির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সুনীল কিংবা আরতি খুঁজে বার করতে গলদঘর্ম হতে হবে। পাড়ায় গিয়ে সুনীলবাবুর বাড়ি কোনটা জিজ্ঞাসা করলে, লোকে বলবে, 'কোন সুনীল, বেঁটে সুনীল না লম্বা সুনীল, মোটা সুনীল না তোতলা সুনীল, কবি সুনীল না গায়ক সুনীল, ফরসা সুনীল না কালো সুনীল।'

পুরনো কলকাতা

সকলেই অবগত আছেন যে কলম্বাস সমুদ্রপথে আরব সাগর হইয়া ভারত মহাসাগরের অপর প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের খাঁড়ি পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। তাহার পর সেখান হইতে ফিরিয়ে যান। এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছান।

ধুরন্ধর নাবিক কলম্বাস একটি মারাত্মক ভুল বুঝিয়েছিলেন। তিনি বঙ্গোপাসগরের উপকূলে গিয়া যখন জায়গাটা কী তাহা অনুসন্ধান করেন, তখন জানিতে পারেন জায়গাটার নাম কলকাতা। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল তাঁহার নাম কলম্বাস হইতে এই স্থানের নাম কলকাতা হইয়াছে। তিনি ধরিয়া লন যে এই স্থানে আমি পুর্বে আসিয়াছিলাম, সুতরাং আবার নতুন করিয়া অবতরণের দরকার

নাই। সুতরাং আবার হারা-উদ্দেশ্য সমুদ্রপথে রওনা হন এবং আমেরিকায় পদার্পণ করেন।

কিন্তু কলম্বাস তো মাত্র কয়েক শতাব্দী আগের কথা। ইহারও পূর্বে কলকাতা বিদ্যমান ছিল। কয়েক সহস্র বৎসর আগের কথা বলিতেছি। ইহা মহাভারতের যুগের কথা।

কপট পাশা খেলায় পরাজিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হয়।

স্ত্রী দ্রৌপদী এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া অজ্ঞাতবাসের সময় যুধিষ্ঠিরকে নানা জায়গা লুক্কায়িত থাকিতে হয়। ধরা পড়িলে আবার প্রথম হইতে বনবাস আরম্ভ করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা বন পথে আত্মগোপন করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ত্রয়োদশ বৎসরটি আত্মগোপন করিয়া থাকেন।

কথায় আছে, পাণ্ডব বর্জিত বঙ্গদেশ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আত্মগোপনের সময় একবার তাঁহারা গঙ্গা নদীর প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হন।

গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে ক্লান্ত যুধিষ্ঠির নদীর তীরে আসিয়া স্থির করেন, নদীর ওপারে রাত্রিবাস করা যাইতে পারে। ওপারে খোলা মাঠ আছে। শ্বাপদসংকুল অপরিচিত অঞ্চলে খোলা মাঠে রাত্রিবাস করা কিঞ্চিৎ নিরাপদ।

যুধিষ্ঠির তাহার বলবান ভ্রাতা ভীমচন্দ্রকে বলিলেন, 'মধ্যম পাণ্ডব, ওই পারে গিয়া দেখ স্থানটি বাসযোগ্য কি না?'

আদেশ পাইবামাত্র মধ্যম পাণ্ডব গদা হস্তে লইয়া নদী সাঁতরাইয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। ওপারে গিয়া তাঁহার মধ্যে কীরকম পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি খোলা মাঠের জমি পায়ে হাঁটিয়া পরিমাপ করিতে লাগলেন এবং গদার খোঁচায় জমি চিহ্নিত করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির দেখিলেন আর দেরি করা যায় না। সন্ধ্যা সমাগত। অচেনা জায়গায় অন্ধকারে বিপদ হইতে পারে, তিনি চিৎকার করিয়া ভীমকে বলিলেন, 'অত মাপঝোপ করিতে হইবে না। তুমি জানাও আমরা আসিব কি না।'

ভীম এই প্রশ্নের জবাবে যুধিষ্ঠিরের দিকে ঘুরিয়া তাহাকে কয়েকবার 'থামস আপ' দেখাইলেন।

যুধিষ্ঠির তখন ভাবিলেন প্রবল গ্রীষ্মে মধ্যম ভ্রাতার মস্তিষ্কে বিকার হইয়াছে। তিনি বলিলেন, 'ভীম আর দেরি করা যায় না। আমরা আসিতেছি।'

যুধিষ্ঠির সকলকে সাঁতার দিয়া ওপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া ওপারে ভীম দাঁত কিড়মিড় করিয়া গদা উঁচাইয়া বলিল, 'এদিকে যে আসিবে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিব।' অবস্থার গতিক দেখিয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, 'সব্যসাচী তুমি অবিলম্বে ওপারে গিয়া ভীমকে পাগলামি হইতে নিবৃত্ত কর।' আজ্ঞাবহ অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়া দ্রুত সাঁতরাইয়া ওপারে গিয়া উঠিল। ততক্ষণে ভীম দৌড়াইয়া আসিয়া গদা তুলিয়া অর্জুনকে বার বার বলিতে লাগিল, 'এইসব ভূমি আমার, এইখানে কেউ আসিবে না। ভাগো হিঁয়াসে।'

ওপারে পৌঁছিয়া অর্জুনেরও কী যেন ভাবান্তর হইয়াছিল। অর্জুনও ভীমকে বলিতে লাগিল, 'ভাগো হিঁয়াসে। এইসব জমি আমার।'

মহা বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। নকুল সহদেব ওপারে দুই ভাইয়ের ঝগড়া থামাইবার জন্য জলে নামিতে যাইতেছিল, যুধিষ্ঠির তাহাদের থামাইলেন, এবং উচ্চস্বরে বলিলেন, 'ওহে ভীম, ওহে অর্জুন ওইদিকের ওই সামান্য ভূখণ্ড লইয়া তোমরা কলহ করিতে থাক। কিন্তু এই দিকের এই আসমুদ্র হিমাচল ভূমিখণ্ড ইহা আমাদের রহিল।'

এই কথা শুনিবামাত্র ভীম ও অর্জুন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু মধ্যগঙ্গায় আসিয়া তাহারা কেমন বদলাইয়া গেল। দুইজনার মুখের মধ্যে পূর্বের মতো শান্ত ভাব। দুইজনাই লজ্জিত। তাহারা তীরে উঠিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। বলিতে লাগিল, 'আমাদিগের যে কী হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছি না।' যুধিষ্ঠির মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাদের কোনও দোষ নেই। আমরা ভয়ংকর জায়গায় আসিয়াছি। ওই পার হইতেই

পুরাণোক্ত কলকাতা জনপদ শুরু হইয়াছে। ওইখানে বিনা কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, মারামারি, রক্তারক্তি হয়। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা সমীচীন নয়।' এই বলিয়া সন্ধ্যার আগেই যুধিষ্ঠির স্ত্রী ও ভ্রাতাদের লইয়া যতদূর সম্ভব পশ্চিমে সরিয়া গেলেন।

শুধু মহাভারত নয়, কলকাতার প্রাচীনত্ব অন্যত্রও জানা যায়। মহাপ্লাবনের কালে মহামতি নোয়া যে বিশাল জলযান তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহাতে সবরকম জীবজন্তু তরুলতা তুলিয়াছিলেন যাহাতে ভূমণ্ডল সম্পূর্ণ জলমগ্ন হওয়ার পরেও অন্তত এক জোড়া করিয়া জীবজন্তু রক্ষা পায়, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিলুপ্ত না হইয়া যায়।

সেই সময় মহাপ্লাবনের কয়েকদিন পূর্বে একজন পরিদর্শক নোয়াকে জানাইলেন, প্রায় সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে শুধু বাংলার রাজা বাঘ ব্যতীত। নোয়া প্রশ্ন করিলেন, 'বাংলার রাজা বাঘ কোথায় পাওয়া যাইবে?' পরিদর্শক খোঁজখবর লইয়া জানাইলেন বঙ্গোপসাগরের প্রান্তে কলকাতা জনপদ আছে। সেই জনপদের উপকণ্ঠে এইসব রাজা বাঘের বাসস্থান। দ্রুত ধাবমান নৌকা করিয়া তখনই নোয়ার নৌ সেনাপতি কলকাতায় আসিয়া পশ্চাদবর্তী জঙ্গল হইতে এক জোড়া ব্যাঘ্র শিশু সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন।

বলাবাহুল্য শাস্ত্রোক্ত সেই মহাপ্লাবনে কলকাতা নামক জনপদও সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়াছিল। জল নামিয়া গেলে নোয়ার লোকেরা আসিয়া সুন্দরী গাছ দেখিয়া কোনও রকমে কলকাতাকে চিহ্নিত করেন এবং পার্শ্ববর্তী নবজায়মান অরণ্যে বাঘের বাচ্চা দুইটিকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন অবশ্য তাহারা আর বাচ্চা নাই। রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঘ্র যুবক আর ব্যাঘ্র যুবতী।

পুনশ্চ : কলকাতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আর কোনও উদাহরণ প্রয়োজন আছে কি থাকিলে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের পূর্ব মেঘ অংশে, আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে, এমনকী আইন-ই-আকবরিতে এবং মঙ্গলকাব্যে কলকাতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। যাচাই করিয়া দেখিবেন।

হাড়হাভাতে জোব চার্নক তথা জব চার্নককে যাঁহারা কলকাতার জনক বলিয়া ভাবেন তাঁহারা নিজেরাই জানেন না যে তাঁহাদের এই পরম পিতার নাম জব না জোব, জব চার্নক না জোব চার্নক? যাহাই হউক বৈঠকখানা রোডের খালের পাশের বাদামতলায় হুক্কাসেবী এই সাহেবকে আমাদের কল্লোলিনী কলকাতার জন্মদাতা পিতা হিসাবে ভাবিতে পারি না। সুবে বাংলায় একদা একটি কথা ছিল 'ম্লেচ্ছ দোষ'। যাঁহাদের ম্লেচ্ছ দোষ আছে তাঁহারা ভাবেন তো ভাবিবেন।

প্রথমেই পঞ্চম সংস্করণ

এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই যে 'অচলপত্র' নামক অধুনালুপ্ত এবং প্রায় বিস্মৃত পত্রিকাটি নিয়ে আমি আগেও লিখেছি, যেমন লিখেছি 'শনিবারের চিঠি' কিংবা 'সচিত্র ভারত' নিয়ে। এগুলো আমার মনের মতো পত্রিকা। এখনকার সময়ে প্রকাশিত হলে হয়তো আমি এই পত্রিকাগুলোতে লিখতাম কিংবা লেখার চেষ্টা করতাম।

তথাকথিত প্রগতিশীল, সংস্কৃতিবান, আধুনিকমনা সাহিত্য পত্রিকাগুলোর প্রতি আমার দুর্বলতা খুব কম, লিখতে হয় লিখি, লেখার জন্য জায়গা নেই বলে লিখি।

কিন্তু অচলপত্র অনেকদিন উঠে গিয়েছে। শনিবারের চিঠি কিংবা সচিত্র ভারতও তাই। কুমারেশ ঘোষের 'যষ্টিমধু'ও কুমারেশবাবুর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হচ্ছে না। একটি নতুন কাগজ এখন বাজারে এসেছে, শেখর আহমেদের 'পত্রপাঠ' কিন্তু সে পত্রিকা এখনও জমজমাট হয়ে ওঠেনি।

এসব কথা মনে হচ্ছে 'অচলপত্র সংকলন' দেখে। অচলপত্র শেষ বেরয় উনিশশো একাত্তর সালে। দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল, সংক্ষেপে দী. কু. সা. সম্পাদিত অচলপত্রের প্রথম প্রকাশ উনিশশো আটচল্লিশ সালে।

তখন আমি নিতান্তই পূর্ব পাকিস্তান নামক এক অধুনালুপ্ত ভূখণ্ডের এক অজ শহরে স্কুলের ছাত্র, ক্লাস এইটের। পরে উনিশশো একান্ন সালে কলেজে পড়তে কলকাতা এসে প্রথম অচলপত্র দেখি।

অচলপত্র তখন মাসিক পত্রিকা ছিল। মলাটে কাঁটামনসার ছবি। বিজ্ঞাপনে বড় করে লেখা,

বড়দের পড়বার এবং
ছেলেদের দুধ গরম করবার
একমাত্র মাসিক

আরও বলা ছিল,

'অচলপত্র আপনি যত কম ছাপা হচ্ছে ভাবছেন তা নয়,...আসলে আপনারা যা ভাবছেন তার চেয়েও অনেক কম ছাপা হচ্ছে।'

এখানেই দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের নিজের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, 'প্রথমেই পঞ্চম সংস্করণ বেরচ্ছে পরে চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম সংস্করণ বেরতে থাকবে।'

আমাকে অবশ্যি আকৃষ্ট করেছিল। অচলপত্র ছিল হালকা হাসির কাগজ। তবে খুব উচ্চমানের নয়।

সিনেমা, রাজনীতি, চিঠিপত্তরের জঞ্জাল, সাহিত্য দুঃসংবাদ, রম্যরচনা, কার্টুন—অচলপত্রে সব কিছুই পরিবেশন করা হত। ঠিক নির্দোষ হাসি নয়, অনেক রচনাতেই ছিল কষায় স্বাদ, তিক্ততা।

দীপ্তেন্দ্রকুমারের শাণিত কলম সবচেয়ে বেশি ঝলসিয়ে উঠত ব্যক্তিগত আক্রমণে, মহাত্মা গান্ধী, বিধান রায় থেকে আরম্ভ করে সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত রেহাই পাননি তাঁর আক্রমণ থেকে। তবে, সবচেয়ে অসামান্য ছিল দী. কু. সা. স্বাক্ষরিত চিত্র সমালোচনা।

'চিঠি পত্তরের জঞ্জাল'-এর সব উত্তরই সম্পাদকের স্বরচিত কি না বলার উপায় নেই, কিন্তু এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেক হীরকখণ্ড। একটি উদাহরণ :

প্রশ্ন : শ্বশুরমশাইরা জামাইদের বাবাজীবন বলেন কেন?

উত্তর : ঠেলার নাম বাবাজীবন, জানেন না।

আর একটি প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্ন : আপনার লেখা সবচেয়ে কাদের ভাল লাগে, জানেন?

উত্তর : হ্যাঁ, জানি যারা আমার লেখা পড়ে না।

এতকাল পরে এখনও এসব জবাব রীতিমতো শানিত, পঞ্চাশ বছরেও মরচে পড়েনি।

অচলপত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল কার্টুন। নির্দোষ, অরাজনৈতিক কার্টুন একালে দেখাই যায় না, এখনও দুয়েকটা যা কদাচিৎ অমল আঁকেন 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পৃষ্ঠায়।

এক ঝাঁক অসামান্য কার্টুনিস্ট পি সি এল, রেবতীভূষণ থেকে প্রমথ সমাদ্দার, অমিয় (Omio), রবীন গত শতকের চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকে কাছাকাছি সময়ে দেখা দিয়েছিলেন।

অসংখ্য, অসামান্য কার্টুন ছাপা হয়েছিল অচলপত্রে। অচলপত্র সংকলনে গোটা পনেরো কার্টুন আছে। অনেকগুলো রবীনের আঁকা, তার মধ্যে একটিতে আছে, মেয়ে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে বাড়িতে বাবার কাছে এসেছে আর বাবাকে বলছে, 'বাবা! এই সেই ভদ্রলোক যে রোজ আমাকে ফলো করে—আজ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি, শিগগির একটা পুরুত ডাকো।'

রবীনেরই আর একটা কার্টুনে আছে, এক ভদ্রলোক মুচি দিয়ে জুতো মেরামত করেছেন। মুচি মেরামতের দাম চাইতে তিনি মুচিকে বলছেন, 'আরে পাবি বাবা পাবি। জুতোর আসল দামই দেওয়া হয়নি তো তোর মেরামতের দাম।'

নাথ ব্রাদার্স পরিবেশিত এই সংকলনের একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন পিনাকী ভাদুড়ী। পিনাকীবাবু অচলপত্র পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী।

এ রকম একটি সংকলনের প্রয়োজন ছিল। শ্রীযুক্ত পিনাকী ভাদুড়ীর ভূমিকায় উদ্ধৃত দীপ্তেন্দ্রকুমারের একটি কবিতাংশ অবশেষে উপহার দিচ্ছি :

'আমরা যারা এলাম গেলাম
কেউ কখনও দিইনি সেলাম
শুধুই বিউটিফুলকে ছাড়া।'

ঘুষ

ঘুষ অতি প্রাচীন ব্যাপার, বোধহয় মানব সভ্যতার সমান বয়েসি। যেদিন থেকে সমাজে বিধিনিষেধ তৈরি হয়েছে, লাভ-লোকসান, লোভ-লালসা এসেছে, তারপর থেকেই ঘুষও শুরু হয়েছে। ক্ষমতাবান অথচ দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুরুষকে কিছু উৎকোচ দিয়ে কার্যোদ্ধার করা, লাভবান হওয়া কখনও কখনও খুব কঠিন নয়। তবে এর জন্যে উৎকোচ প্রদানকারীকে কিঞ্চিৎ সাহসী এবং যথেষ্ট নীতিহীন হতে হবে।

সেই কবে মহামতি চাণক্য বলেছিলেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ খায় এটা বোঝা সহজ কাজ নয়।

এত প্রাচীন যুগে গিয়ে লাভ নেই। নিবন্ধের পরিসরে কুলোবে না। বরং আধুনিককালে আসি।

'খাই খাই' কবিতায় সুকুমার রায় নানারকম খাওয়ার সঙ্গে 'ঘুষ খায় দারোগায়' একথাও বলেছিলেন।

'উৎকোচ তত্ত্ব' লিখেছিলেন পরশুরাম, তাঁর 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প' নামক গ্রন্থে এই নামের কাহিনীটি আছে।

'উৎকোচ তত্ত্ব' গল্পের নায়ক শ্রীযুক্ত লোকনাথ পাল জেলা জজ, অতি ধর্মভীরু খুঁতখুঁতে লোক। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন, পাছে ধূর্ত লোকে তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়।

শুধু তাই নয়, উৎকোচতত্ত্ব বিষয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছে আছে লোকনাথবাবুর। সময় পেলেই তার জন্যে তিনি একটি খাতায় নোট লিখে রাখেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না সে ঘুষ নিচ্ছে। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সবসময় করা যায় না।'

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, নিষ্কাম উপহার ভেবে লোকনাথবাবু এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারফত

যেসব দ্রব্য পেয়েছিলেন সেগুলো ছিল প্রচ্ছন্ন ঘুষ। কাশ্মীরী শাল, মেওয়া, বুক-কেস এইসব শৌখিন জিনিস পেয়ে লোকনাথবাবু এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু লোকনাথবাবু ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে তাঁরই আদালতে একটি দায়রা মামলার আসামির পক্ষ থেকে এগুলি উপঢৌকন।

ন্যায়পরায়ণ, নীতিসিদ্ধ বিচারক লোকনাথবাবু ব্যাপারটি টের পাওয়া মাত্র দুটি কাজ করেছিলেন। প্রথমটি হল, তাঁর নিজের এজলাস থেকে মামলাটি সরিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হল যা উপহার পেয়েছিলেন কড়ায় গণ্ডায় দাম ধরে, হিসেব কষে তার দাম উপঢৌকনদাতাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো দাম একটু বেশিই দিতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উক্ত উপঢৌকনদাতা অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন উৎকোচদাতা লোকনাথ পালকে অবসর গ্রহণের পরে একটি চমৎকার চাকরির প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। লোকনাথবাবুর সে সময় রিটায়ারমেন্টের মাত্র ছয় মাস বাকি। সরকারি চাকুরেরা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এ সময়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু লোকনাথ পাল এই দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি নমস্য।

স্বনামধন্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে বিচার বিভাগে কাজ করতেন, জজিয়তি করতেন। জজের ঘুষ খাওয়া নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের এমন একটি জটিল গল্প ছিল। গল্পটি চমৎকার। অচিন্ত্যকুমার যেমন লিখতেন ছিমছাম, গোছানো অথচ তির্যক রচনা। গল্পটা হাতের কাছে নেই, আমি নিজের মতো করে মন থেকে বলছি।

ওই লোকনাথবাবুর মতোই এক জজসাহেব, নীতিবাগীশ, দুর্নীতিবিরোধী। সেই জজসাহেবকে ঘুষ দেওয়া অসম্ভব। ঘুষ কেন, ভেট উপহার কিছুই তাঁকে দেওয়া যায় না।

কিন্তু জগৎসংসারে ধুরন্ধর লোকের অভাব নেই। এক মামলায়, সেটা ওই জজসাহেবের এজলাসে, এক পক্ষ জজসাহেবের এই নীতিপরায়ণতা মাথায় রেখে মামলায় রায়দানের আগের দিন তাঁকে বিশাল ভেট পাঠিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, জজসাহেব সে ভেট গ্রহণ করেননি। তবে ফেরত দেওয়ার সময় কে ভেট পাঠিয়েছে সেটা দেখে নিয়েছিলেন।

এর ফলে যা হল সেটা মর্মান্তিক। ওই ধুরন্ধর ব্যক্তিটি বিপরীত পক্ষের নাম লিখে মূল্যবান ভেটটি পাঠিয়েছিলেন, যাতে জজসাহেব ওই পক্ষের উপর খেপে যান।

এবং সম্ভবত সেই জন্যেই সেই মামলার রায় উক্ত বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

পরশুরাম এবং অচিন্ত্যকুমারের কাহিনী হয়তো কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমার দীর্ঘ সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এঁদের গল্পের চরিত্র দুটি খুব একটা ব্যতিক্রমী নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, ঘুষখোর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দুয়েকটি ক্ষেত্র বাদ দিলে সর্বত্রই এদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

কলকাতা এখনও দিল্লি হয়ে উঠতে পারেনি। ঘুষের মানসিকতা সাধারণভাবে বঙ্গীয় সমাজে গড়ে ওঠেনি, প্রশ্রয় পায়নি। ঘুষখোর মানুষ এখনও সমাজে একটি ঘৃণিত চরিত্র। পাড়ায় পাড়ায় এবং সরকারি আবাসনে তারা চিহ্নিত ব্যক্তি এবং মোটামুটি সবাই তাদের এড়িয়ে চলে। ঘুষখোরকে বেপাড়ায় গিয়ে বসবাস করতে হয়।

আমি ঘোষ উপাধিধারী এক দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি ডাক্তারকে জানতাম। ভাল ডাক্তার ছিলেন তিনি। অমায়িক, হাসিমুখ, পরিশ্রমী। কিন্তু ঘুষ খাওয়া তাঁর জলভাত ছিল। মিথ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতেন। দূরদুরান্ত—এ-জেলা ও-জেলা থেকে তাঁর কাছে লোক আসত সার্টিফিকেট নিতে। ভয়াবহ সেইসব সার্টিফিকেট। তার জন্যে ডাক্তার ঘোষকে কখনও কখনও ফৌজদারি আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতে হত। তবে সে ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না, কারণ সেজন্যে তিনি বহু টাকা পেতেন।

দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকের কোনও সামাজিক সম্মান ছিল না। অফিসার্স ক্লাবে দুয়েকজন ছাড়া

অন্যদের কাছে তিনি অবাঞ্ছিত ছিলেন। উৎসবে-ব্যসনে তিনি দামি উপহার দিতেন, কিন্তু বিয়ে-অন্নপ্রাশনে কদাচিৎ তাঁর নেমন্তন্ন হত। সবচেয়ে মর্মান্তিক, তাঁর অধীনস্থ জুনিয়র ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড-বয় এমনকী রোগি-রোগিনী, সাধারণ লোকজন তাঁকে ডাক্তার ঘোষ না বলে ডাক্তার ঘুষ বলত। তিনি কিছু মনে করতেন তা মনে হত না, তাঁর মুখভাব দেখে মনে হত, তিনি ভাবছেন বক্তার উচ্চারণে দোষ আছে, যেমন কোথাও কোথাও, কেউ কেউ পোকাকে পুকা বলে, মোয়াকে মুয়া বলে—তেমনিই এরা ঘোষকে ঘুষ বলছে।

গোরাচাঁদ নামে (পদবি জানি, কিন্তু বলা ভাল হবে না) এক বড়বাবুকে জানতাম, তিনি উলটোপালটা ঘুষ খেতেন, টাকা দেখলেই বাঁ হাত বাড়াতেন। লোকে প্রায় প্রকাশ্যে তাঁকে চোরা-গোরা বলত। এমনকী অফিসে তাঁর কোনও ফোন এলে, তিনি নিজে না ধরে সে ফোন অন্য কেউ ধরলে স্পষ্টই শোনা যেত, 'চোরাগোরাকে একটু ডেকে দিন তো।'

এতদসত্ত্বেও বলব, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ঘুষ একটা মার্জিনাল ব্যাপার। গত বছর পাঁচেক ঘুষের রমরমা চলছিল দিল্লিতে। আমার এক বাল্যবন্ধু নৃপতি এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করে, সে বলে—'ইধারকা মাল উধার আর উধার কা মাল ইধারের ব্যবসা।' নৃপতি সকাল-বিকেল দিল্লি-কলকাতা করে। সে বলে আগে ছিল হাজারি-হাজরাদের যুগ, এখন সবাই লাখুভাই। হাজারি হাজরা মানে যাঁরা হাজার টাকায় সন্তুষ্ট থাকত, আর লাখুভাই মানে এখনকার লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। দিল্লির ঘুষকালচারই আলাদা। সেখানে অনেক ফ্ল্যাটে এমন অনেক বাথরুম আছে যার সোনার ট্যাপ, রুপোর শাওয়ার, দরজার নবে মুক্তো লাগানো। পুরোপুরি ঘুষের টাকায় দক্ষিণতম দিল্লি এবং ট্রান্স যমুনার অসংখ্য বিলাসপুরী তৈরি। সেই সঙ্গে হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে দেহাতে খামারবাড়ি।

এ বিষয়ে যথেষ্ট জানি না, বরং আমাদের গরিব শহরের একটা অবাস্তব ঘুষের কথা বলি।

আদালতে গিয়েছিলাম একটা সাধারণ এফিডেভিট করতে। কলকাতার মধ্যেই সেই আদালত, কিন্তু তার নাম করব না, অবমাননার দায়ে ফেঁসে যেতে পারি।

এফিডেভিটের কাজ সাঙ্গ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, পুরনো আমলের লোহার রেলিং দেওয়া কাঠের সিঁড়ি—আমার সামনে ময়লা ধুতি, ফুলশার্ট পরা কেমন হেরে যাওয়ার চেহারার এক ভদ্রলোক ঘামতে ঘামতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। বোধহয় ঘর্মাক্ত কপাল মুছবার জন্যে ভদ্রলোক পকেট থেকে রুমাল বার করছিলেন, রুমালের সঙ্গে এক টাকা কি দু'টাকার একটা কয়েন বেরিয়ে কাঠের সিঁড়ির উপরে পড়ে গড়িয়ে গেল। এবং সিঁড়ির ফাঁকে গলিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের এই টাকাটাই বোধহয় শেষ সম্বল। তিনি উবু হয়ে বসে সিঁড়ির ফাক থেকে কয়েনটি উদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কাজটা সহজ নয়। হাতের আঙুলে টাকাটার নাগাল পেলেন না। তখন সিঁড়ির উপর থেকে একটা পোড়া দেশলাই কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে টাকাটাকে তুলতে গেলেন। ফল হল বিপরীত, সিঁড়ির ফাঁকে টাকাটা আরও তলিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বেচারা ভদ্রলোক রণে ভঙ্গ দিলেন।

আমি খুব কৌতূহল সহকারে ব্যাপারটি লক্ষ করছিলাম। যাঁরা আমাকে চেনেন তাঁরা জানেন অপরিমিত কৌতূহল আমার একটা খারাপ ও প্রাচীন দোষ।

সে যা হোক, অতঃপর ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন যে আমি তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ করছি।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের জামার হাতায় ডান হাতের ধুলো এবং ডান হাতের জামার হাতায় বাঁ হাতের ধুলো ঝেড়ে আমাকে বললেন, 'দেখলেন তো ব্যাপারটা?'

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যাপার আর কী, এই কোর্টের সিঁড়ি পর্যন্ত ঘুষ খায়! শেষ টাকা দুটো খেয়ে নিল। বহু কষ্টে বাঁচিয়েছিলাম। এখন হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে।'

ভদ্রলোক বাড়ি ফিরুন। ততক্ষণ একটু ইতিহাস চর্চা করি। ঐতিহাসিক ঘুষের কাহিনীতে যাই। একটা অবশ্য গল্পগাথা নয়। খাঁটি ইতিহাস। একথা আজ যতই অসম্ভব শোনাক, এটা সত্যি যে ধনবান মার্কিন দেশের ভুবনবিদিত রাজধানী ওয়াশিংটন শহর একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব ভারতের রায়ত ও সামন্তদের দেওয়া ঘুষের টাকায়।

ঘটনাটা পরিষ্কার করে বলি।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে টমাস ল নামে এক ব্রিটিশ সিভিলিয়ান এসেছিলেন। তিনি খুবই কর্মপটু ছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাঁরা হাতেকলমে রূপায়ণ করেছিলেন, টমাস ল সাহেব তাঁদের অন্যতম।

এই ল সাহেব বিবাহসূত্রে আত্মীয় ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের।

টমাস ল যদিও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তাঁর ছিল হাতটানেরও অভ্যেস, উৎকোচ গ্রহণে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। অবশ্য সেকালের ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

খুব অরাজকতার সময় ছিল সেটা। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। পূর্ব ভারতে চলছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে, বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।

এ সেই শর্বরীকালের অন্ধকার সময়ের কথা। ইংরেজ রাজপুরুষদের নীতিজ্ঞান ছিল না। চুরি করা, উৎকোচ গ্রহণ শাসককুলের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে এসব খবর যখন বিলেতে পৌঁছাল সেখানে খুব কড়াকড়ি শুরু হল। নতুন সিভিলিয়ান যাঁরা বিলেত থেকে আসছিলেন তাঁদের দেশ থেকে, রওনা হওয়ার আগে ধনসম্পত্তির হিসেব দিতে বলা হল। চাকুরি-শেষে ফিরে আসার পর মিলিয়ে দেখা হবে অবৈধ সম্পদ কিছু আছে কী না।

আমাদের এই টমাস ল সাহেব যেন-তেন প্রকারেণ নানা অনাচার, অত্যাচার করে দেশি প্রজাদের রক্ত শুষে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অধিক্ষেত্র ছিল সাবেকি বাংলা-বিহার।

বিলেতে ভারতীয় রাজপুরুষদের ধনসম্পত্তির হিসেব নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে এই সংবাদ যথাসময়ে এদেশে এসে পৌঁছাল। টমাস ল ভাবলেন আমি তো আসার সময় ধনসম্পত্তির হিসেব দিয়ে আসিনি, এখন তাড়াতাড়ি ফিরে গেলে ঝামেলা হবে না। তিনি দেশের দিকে রওনা হলেন।

কিন্তু এডেন বন্দরে পৌঁছে তিনি এক দুঃসংবাদ পেলেন। এখন থেকে দেশের বন্দরে নামার সময়ও কী ধনদৌলত সঙ্গে আছে তার ফিরিস্তি দিতে হবে। অসংগতি দেখলে সেসব বাজেয়াপ্ত করা হবে। এত কষ্টের এই চুরির ধন এত সহজে কেউ ছাড়তে চায়?

টমাস ল করিতকর্মা পুরুষ। তিনি এডেন বন্দরে জাহাজ বদল করে এক আমেরিকাগামী জাহাজে উঠে বসলেন। এবং ধনদৌলতসহ যথাকালে নিরাপদে আমেরিকা পৌঁছালেন।

তিনি তাঁর সমস্ত ধনদৌলত বিনিয়োগ করলেন একটি জনপদ পত্তনে এবং তার পাশে একটি চিনির কারখানা স্থাপনে। পরবর্তীকালে ওই ভূসম্পত্তি মার্কিন সরকারের কাছে তিনি প্রভূত অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং সেখানেই মার্কিন সরকার নতুন রাজধানী গড়ে তোলে।

আমাদেরই অত্যাচারিত পূর্বপুরুষদের রক্ত জল করা ঘুষের টাকায় একদিন মার্কিন রাজধানী তৈরি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ঘুষের ইতিহাসে এমন ঘটনা বোধহয় আর একটিও নেই।

আর নয়।

এ রকম নোংরা বিষয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার প্রবৃত্তি নেই।

বরং দুটো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করি। দুটো কাহিনীই পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো।

ঘুষ খাওয়ার চেয়ে ঘুষ দেওয়া কম কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন বা তাগিদ যতই হোক, কাকে ঘুষ দিতে হবে, কীভাবে দিতে হবে, কত দিতে হবে—এগুলি খুবই জটিল সমস্যা। সাধারণ নাগরিকেরা ঠিক এগুলো ধরে উঠতে পারেন না, সাহসও পান না।

কিন্তু আমি নিজে একবার ঘুষ দিয়েছিলাম। শুধু একবার নয়, নিয়মিত মাসে মাসে ঘুষ দিয়েছি। সে যে আমি খুব দুঃসাহসী বলে কিংবা বিশেষ বেকায়দায় পড়েছিলাম বলে তা কিন্তু নয়।

ঘটনাটি একটি দৈনিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক কলমে কিছুদিন আগেও লিখেছি, কিন্তু পুনরায় প্রণিধানযোগ্য।

তখন আমি কালীঘাটে মহিম হালদার স্ট্রিটে আমাদের পুরনো বাড়িতে থাকি। সদ্য সরকারি চাকরি পেয়েছি, রাইটার্সে অফিস। সেই সময়ে অফিস টাইমে ডবল-ডেকার টু-সি বাসের এক্সপ্রেস সার্ভিস চালু হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসিগামী সেই বাস আমাদের হাজরার মোড়ে দাঁড়াত না। রাসবিহারীর পর হাজরা, হরিশ মুখার্জি রোড, ময়দান পার হয়ে সরাসরি প্রথম স্টপ রাজভবন। টিকিটের দাম ছয় পয়সার জায়গায় দু' আনা, দু'পয়সা বেশি কিন্তু পনেরো মিনিট সাশ্রয় হয়। সেই দু' পয়সার দাম একালের পাঠকেরা বুঝতে পারবেন না, দু'পয়সা হল ডালহৌসি (বি বা দী বাগ) থেকে হাইকোর্ট সেকেন্ড ক্লাস ট্রামভাড়া, এলাচ-যষ্টিমধু-মিষ্টি সুপুরি দেওয়া একটা গালভরা পান, দুটো চারমিনার সিগারেট সবই দু'-পয়সা।

সে যা হোক, আমি ছিলাম অলস এবং আড্ডাবাজ। সকালবেলায় পনেরো মিনিট ছিল আমার কাছে অমূল্য। আমি ভাবতাম যদি এক্সপ্রেস বাসটা হাজরার মোড়ে দাঁড়াত!

আমার এই সমস্যার একদিন সমাধান হয়েছিল। আমার প্রতিবেশী রমেনদাকে একদিন দেখলাম হাজরার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশকে একটা টাকা দিতে। রমেনদার গাড়ি নেই, স্কুটার নেই, সাইকেল নেই। রাজপথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ট্রাম-বাসের মাধ্যমে, ট্রাফিক পুলিশকে তিনি কেন তোয়াজ করছেন!

পরদিনই রমেনদার কাছে এই রহস্য নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, 'মাসে এক টাকা করে দিই। ট্রাফিকের সেপাই অফিসের সময় যখন আমাকে বাসস্টপে দেখে হাত তুলে এক্সপ্রেস বাসটা আটকিয়ে দেয়, আমি উঠে পড়ি।'

রমেনদার পন্থা অনুসরণ করে আমিও এরপরে মাসে মাসে ট্রাফিক সেপাইকে এক টাকা করে দিয়েছি।

জানি, এই পাপ সহজে স্খালন হওয়ার মতো নয়। তবু পাঠক-পাঠিকাকে সবিনয় অনুরোধ, দয়া করে মাফ করে দেবেন, মনে রাখবেন তখন আমার বয়েস তেইশ-চব্বিশ, করি সরকারি চাকরি, লিখি কবিতা। এক বিশাল সংসারের প্রাচীন উনুনে আগুন জ্বালিয়ে রাখার ইন্ধন জোগাতে হয়।

এরপরে আমার একটা সার্টিফিকেট লাগবে। সেটাই দ্বিতীয় কাহিনী। এটাও সেই এক্সপ্রেস বাসের সমকালীন গল্প।

সরকারি চাকরি শুরু করেছিলাম সম্প্রতি লুপ্ত ইতিহাসবাসী বঙ্গীয় রাজস্ব পর্ষদের সনাতন রাইটার্স বিল্ডিংসের অনন্ত পশ্চিম প্রান্তে দোতলায় ধূলিধূসর অন্ধকার হলঘরে।

রাজস্ব পর্ষদের কাজ তখন প্রায় শেষের পর্যায়ে। জমিদারি ব্যবস্থা তৈরি থেকে জমিদারির অবসান, দুই শতাব্দী চলে গেছে। আমার প্রথম পোস্টিং হল জমিদারির ক্ষতিপূরণ শাখায়।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, নতুন শাখা। প্রায় সবাই আমার মতো আনকোরা। সহকর্মীদের সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা জন্মে যাওয়ার আগেই একদিন এক ভদ্রলোক অফিসে এলেন, তাঁর হাতে একটা পোস্টকার্ড। তিনি একটা ক্ষতিপূরণ মামলার তদ্বির করতে এসেছেন। তাঁর মামা তাঁকে লিখেছেন। ভদ্রলোক সিউড়ি থেকে আনা পোস্টকার্ডটা শক্ত করে ধরে আমাকে কেস নম্বর ইত্যাদি বললেন।

আমার কেমন একটা খটকা লাগল, ভদ্রলোক এত শক্ত করে পোস্টকার্ডটা ধরে আছেন কেন?

তদ্বিরকারী ভাগিনেয় কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগে আমি পোস্টকার্ডটা তুলে উলটো দিকটায় কী লেখা আছে দেখলাম। দেখলাম সেখানে লেখা আছে,

'পুনশ্চঃ

এই বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের নতুন ছেলেগুলি, ইহাদের মোটেই বিশ্বাস করিও না। ইহারা ঘুষও খাইবে না, কাজও করিবে না। সর্বদা ইহাদের পিছনে লাগিয়া থাকিতে হইবে।'

ইতি
আশীর্বাদক
বড়মামা।

আইনমাফিক

আজকাল একটা কথা খুব চলছে, যা হবার আইনমাফিক হবে। দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অধুনালুপ্ত এবং একদা বিখ্যাত 'অচলপত্র' পত্রিকায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, "রেল স্টেশনগুলিতে ফেরিওয়ালারা 'গরম চা, গরম চা' করে চেঁচায় কেন? চা তো গরমই হয়, গরমই হওয়া নিয়ম।" উত্তরটা দীপ্তেন্দ্রকুমার নিজেই দিয়েছিলেন, "হকারেরা 'গরম চা, গরম চা' বলে চেঁচায় কারণ চা-টা মোটেই গরম নয়, বেশ ঠান্ডা, তাই চেঁচাতে হয় গরম গরম বলে।"

এই আইনমাফিক ব্যাপারটাও প্রায় তাই দাঁড়িয়েছে। যাঁরা বলছেন, তাঁরা ভঙ্গ করেননি এমন কোনও গুরুতর দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইন নেই। খুন-রাহাজানি, জাল-জোচ্চুরি, হাওলা-গাওলা-ঘুষ এমনকী ব্যভিচার, ধর্ষণ,—সভ্য সংসারে এমন কোনও অপরাধ নেই যা এঁরা এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে করেননি।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহামহিম ব্যক্তিগণ, ভারতীয় রাজনীতির কান্ডারিবৃন্দ, যাঁদের আমার-আপনার মতো নির্বোধেরা রোদে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে, তর্জনী কালিমালিপ্ত করে ক্ষমতায় পাঠাই, তাঁরা যখন সাফাই গান 'সবকিছু আইনমাফিক হবে' তার পরিষ্কার অর্থ হল কিছুই আইনমাফিক হবে না। কোনওদিন কিছুই আইনমাফিক হয়নি। এখনও হবে না। কখনও হবে না। আইন অতি জটিল ব্যাপার। অসংখ্যবার দেখা গেছে, নীচের আদালতে কোনও মামলায় যে পক্ষ হারল, জেলা আদালতে তারাই আপিলে জিতল। এরপর আবার আপিলের আপিল। হাইকোর্ট আছে, সুপ্রিম কোর্ট আছে। ইংরেজ আমলে সুপ্রিম কোর্টের স্থলে ছিল ফেডারাল কোর্ট। তারও পরে ছিল প্রিভি কাউন্সিল, সে সেই খোদ বিলেতে। তিমি একটা বিশাল প্রাণী, সেই তিমি মাছকে গিলে খেতে পারে এমন জলচর প্রাণী সমুদ্রে আছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি কাহিনীতে সেই অতিকায় প্রাণীর কথা বলেছিলেন, যার নাম নাকি 'তিমিঙ্গিল' এবং সেই তিমিঙ্গিলকে গিলে

খেতে পারে এমন প্রাণীও মহাসমুদ্রের গভীরে আছে তার নাম হল তিমিঙ্গিল গিল। এখানেই শেষ নয়, তিমিঙ্গিল গিলকে গ্রাস করতে পারে তিমিঙ্গিল গিলগিল, এইভাবে অনন্ত তিমিঙ্গিল গিলগিল গিল...।

আইনের আঙিনাতেও তাই প্রথমে ছোট আদালত। সুলেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিজে বিচারক ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ছোট আদালত মানে ছোটো আর ছোটো, ছুটতে ছুটতে কালঘাম বেরিয়ে যাবে। তা সেই ছোট আদালতের পরে সেজ, মেজ কত আদালত, বড় আদালতে পৌঁছে মামলার নিষ্পত্তি হতে একটা জীবন বরবাদ হয়ে যায়। মামলার ঘাড়ে মামলা, আপিলের পিঠে আপিল। একবার এ পক্ষ জেতে, ও পক্ষ জেতে পরের বার। ততদিনে সর্বনাশ হয়ে যায়,—অর্থনাশ, কর্মনাশ, ধর্মনাশ। এসব কথা তো পাঠক-পাঠিকারা সবাই জানেন। একথাও সকলেরই জানা যে মামলা করে কোনও লাভ হয় না। উত্তেজনা বাড়ে, রক্তচাপ বাড়ে, রক্তে শর্করা বাড়ে, হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়। এদিকে টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, বাড়ি-জমি সব যায় মামলার গহ্বরে। সাধে কি গ্রামবৃদ্ধেরা কারও ওপরে কুপিত হলে অভিসম্পাত করেন, 'তোর ঘরে যেন মামলা ঢোকে।' ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর হয় না।

এক মহিলার কথা জানি। তিনি আমার দূর-সম্পর্কের বউদি, অত্যন্ত দজ্জাল রমণী। আমার সেই সম্পর্কিত দাদার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। বউদির সৌভাগ্যবশত উক্ত দাদা একদিন পথ দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। বউদি প্রথামতো কাঁদাকাটি, শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি সাঙ্গ করে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, স্বামীর সম্পত্তি, জীবনবিমা, অফিসের প্রাপ্যাদি সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু আদালতের দরজা দিয়ে সহজে প্রাপ্য আদায় করা যায় না। সেইসময় একদিন সামাজিক ভদ্রতার কারণে বউদির সঙ্গে বিজয়াদশমীর পরে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বউদি কেমন চুপসিয়ে গেছেন, তাঁর সেই তেলে-বেগুনে ভাব আর নেই, নিতান্ত নিষ্প্রভ। আমি একথা সেকথার পর বউদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বউদি, দাদার টাকাপয়সা কিছু উদ্ধার হল?'

বউদি বললেন, 'এক পয়সাও নয়।' তারপরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'দ্যাখ খোকন, কী যে ঝামেলা তুই ভাবতে পারবি না! আমার একেক সময় মনে হচ্ছে যে তোর দাদা না মরলেই ভাল হত।'

সত্যের খাতিরে বলা ভাল, আমার এই বউদি এই সময়েই এক মামলায় এক গোলমেলে প্রশ্ন শুনে উকিলবাবুকে বলেছিলেন, 'আপনার মতো উকিলকে আমি আমার ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে রাখতে পারি!'

বউদি অবশ্য স্বীকার করেন না, কিন্তু শুনেছি, সেদিন সদাসতর্ক উকিলবাবু বউদিকে বলেছিলেন, 'মেমসাহেব, তখন কিন্তু আপনার ভ্যানিটি ব্যাগে আপনার মাথার থেকে অনেক বেশি ঘিলু থাকবে।'

মাননীয়া বউদি যাই বলুন, উকিলবাবুর এই কথা কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। আইনের পুরো ব্যাপারটাই ঘিলু তথা বুদ্ধির ব্যাপার। যে উকিলবাবুর যতটা ঘিলু, তাঁর মক্কেল ততটা নিরাপদ।

এক বিদেশি হাস্যরসিক একদা বলেছিলেন, 'তুমি সাধু না চোর, জোচ্চোর না সৎ সবকিছু নির্ভর করছে যে উকিলবাবু তোমার হয়ে মামলা লড়ছেন, তাঁর ওপরে।'

এই সুযোগে উকিলবাবুদের বুদ্ধির একটা গল্প বলি। খুব পুরনো গল্প।

বুদ্ধির গল্পে খুনের মামলাই প্রকৃষ্ট। পিনাল কোডের দুটি ধারা তিনশো দুই এবং তিনশো চার। তিনশো দুই ধারায় ফাঁসি হতে পারে। তিনশো চার ধারায় মৃত্যুদণ্ড হয় না, দীর্ঘ কারাদন্ড হয়। আইনঘটিত ভয়াবহ টেকনিক্যাল বিষয়, পিনাল কোডের ভাষায় Culpable homicide amounting to murder, এটা হল তিনশো দুই এবং Culpable homicide not amounting to murder—এটা হল তিনশো চার।

এক উকিলবাবু দায়রা আদালতে মামলায় হেরে গেলেন, তাঁর মক্কেলের ফাঁসির হুকুম হল। কিন্তু উকিলবাবু তাতেও দমে যাননি। মক্কেলের আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে এসে যখন জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হল?'

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'মামলা খুব খারাপ ছিল, তিনশো দুই ধারায় আদেশ নামিয়ে এনেছি, তিনশো চার ধারাতেও সাজা হতে পারত।'

তা হলে খুন ও ফাঁসির গল্পে এসে গেলাম। কোনও গত্যন্তর নেই, আইনমাফিক এই বিষয়টি একটু ছুঁয়ে যেতেই হবে।

বিলিতি জোক-বুকে এক যুবকের গল্প আছে, সে তার মা-বাবাকে খুন করেছিল। সেই খুনের মামলায় যুবকের ব্যবহারজীবী আদালতকে বলেছিল, 'মাননীয় ধর্মাবতার, আমার মক্কেল, ওই কাঠগড়ায় সরল ছেলেটি আজ অনাথ, এই মামলা একটু অনুকম্পাভরে বিবেচনা করবেন।' প্রসঙ্গত সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর, জনচিত্ত আলোড়নকারী নোয়াপাড়া হত্যা মামলার প্রসঙ্গ আসতেই পারে।

প্রিয় পাঠিকা ঠাকুরানি, আপনি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়, আমি সুদীপার প্রসঙ্গে যাচ্ছি। সদ্য টিন-এজ-অতিক্রান্তা এই নবীনা যুবতী, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি, যে বয়েসটাকে ইংরেজিতে টিন-এজ বলে, তেরো থেকে উনিশ, (থার্টিন থেকে নাইনটিন) তার অধিকাংশ সময় এই কাণ্ডজ্ঞানরহিতা কারাগার প্রাচীরের অভ্যন্তরে কাটিয়েছে। আপাতত দেখা যাচ্ছে, নোয়াপাড়ার এই হত্যা মামলায় জেলা আদালতের রায় জনসাধারণের মনঃপূত হয়নি। আইনগত এবং নীতিগত উভয় কারণেই আদালতে রায় নিয়ে মন্তব্য বা আলোচনা করা অবশ্যই সমীচীন নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সংবাদমাধ্যম তথা জনসাধারণ দুটো জিনিস ভালভাবে নেয়নি।

প্রথম হল, রাজসাক্ষী হয়ে সুদীপার খালাস হয়ে যাওয়া। এই মামলায় সে-ই মূল অভিযুক্ত। খুনের মামলার প্রধান অপরাধীকে রাজসাক্ষী করা খুব নীতিসংগত নয়। দ্বিতীয় হল, কেমিস্ট কৃষ্ণেন্দু জানার ফাঁসির হুকুম। বেশি কথা না বলে কৃষ্ণেন্দু জানার একটি বক্তব্য একটি পত্রিকায় বেরিয়েছে, সেটি নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে। কৃষ্ণেন্দু বলেছে, 'যারা মারা গেছে তাদের আমি জীবিত বা মৃত কোনও অবস্থাতেই কখনও দেখিনি। অকুস্থল নোয়াপাড়া কোথায় সেটাও আমি জানি না। আর আমার হল ফাঁসির হুকুম!' মামলাটি এখন হাইকোর্টে এসেছে। জল অনেক দূর গড়াবে মনে হয়। জেফারসন বলেছিলেন, আইনের চেয়ে আইনের প্রয়োগ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওই মামলার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়েছে, আইনের প্রয়োগ, মনে হচ্ছে, ঠিকমতো হয়নি। এখনও বিচারাধীন এই মামলার বিষয়ে এর বেশি বলতে গেলে আদালত অবমাননার পর্যায়ে চলে যাবে। তার চেয়ে আইনঘটিত হাসির গল্পই ভাল। চুরির মামলার আসামি এক মক্কেল এসেছে উকিলবাবুর কাছে। উকিলবাবু তুখোড় ব্যক্তি, অল্প একটু কথা বলেই বুঝলেন মক্কেলের খুবই দুরবস্থা, টাকাপয়সা কিচ্ছু নেই। তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ফি দিতে পারবে? মামলার খরচ চালাতে পারবে?' মক্কেল হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, আমার টাকাপয়সা কিছুই নেই।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'তবে একটা গোরু আছে।' উকিলবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'তবে আর কী? ওই গোরুটা বেচেই মামলার খরচ চালাবে, আমার ফি দেবে।' লোকটা একথায় রাজি হয়ে যেতে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে এবার বলো কী চুরির মামলা? পুলিশ তোমার নামে কী চুরির মামলা দিয়েছে?' মক্কেল কাঁচুমাচু বলল, 'ওই যে গোরুটার কথা বললাম, ওই গোরু চুরির মামলা আমার বিরুদ্ধে।'

বয়েস হয়েছে। এসব পচা গল্প লিখতে আর ভাল লাগে না। বরং আমার ব্যক্তিগত খোলামেলা অভিজ্ঞতার কথা বলি। অনেকদিন আগের কথা। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এক সাহিত্য সম্পর্কিত মামলায় সম্প্রতি প্রয়াত আমার এক বিখ্যাত বন্ধু কাঠগড়ায় উঠেছিলেন। সেদিন আদালতকক্ষে আরও অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সরকারি উকিল আমার সেই বন্ধুকে জেরা

করছিলেন, প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী করেন?' বন্ধুটি বললেন, 'আমি একজন কবি।' সরকারি উকিল বললেন, 'কীরকম কবি।' বন্ধু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি।' মামলার শেষে আদালতে বারান্দায় বন্ধুকে বললাম, 'সব সময়ে বিনীত হয়ে থাকিস, আর আদালতে বলে এলি, আমিই শ্রেষ্ঠ কবি।' তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'কী করব? সত্যি কথাটা বলে ফেললাম। আদালতে শপথ নিয়ে মিথ্যে কথা তো আর বলতে পারি না!'

অধুনালুপ্ত বোম্বাই শহরে বেশ কিছুকাল আগে 'চুপ, আদালত চলছে' নামে একটি নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বহুশত রজনী অতিক্রান্ত সেই নাটক কলকাতায়ও মঞ্চস্থ হয়েছিল। ওই নাটকের নামের অনুকরণ করে সে সময়ে আমি একটা হালকা রচনা লিখেছিলাম। সেই রচনার গল্পগুলি এখনও যথেষ্ট যুক্তিবহ। একেবারে নার্সারি থেকে শুরু করা যাক। এক প্রাইমারি স্কুলে টিফিনের সময় বাচ্চারা খেলছে। হঠাৎ দুটো বাচ্চা, কৌটিল্যলাল এবং আশ্বিনকুমার (আজকাল এ রকমই নামকরণ হচ্ছে শিশুদের, বিশ্বাস না হলে যে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাজিরার খাতা খুলে দেখে নেবেন), মারামারি শুরু করল এবং পরিণামে দু'জনেই কাঁদতে লাগল। দিদিমনি ছুটে এলেন। ততক্ষণে চতুরানন বলে অন্য একটি ছেলে ওদের মারামারি থামিয়েছে। দিদিমনি এসে দেখলেন কৌটিল্য আর আশ্বিন চোখ মুছছে, আর চতুরানন একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে ধীরেসুস্থে খাচ্ছে।

'কী হয়েছে? মারামারি কেন?' দিদিমনি প্রশ্ন করায় চতুরানন জানাল, 'কৌটিল্য আশ্বিনের কাছে ওর কমলালেবুর অর্ধেক চেয়েছিল।' দিদিমনি বললেন, 'কেন?' চতুরানন বলল, 'কৌটিল্য বলছে গতকাল ওর আপেলের অর্ধেক আশ্বিনকে দিয়েছিল, তাই সে আজ আশ্বিনের কমলালেবুর অর্ধেক চেয়েছিল। কিন্তু আশ্বিন দেবে না। তাই নিয়ে ঝগড়া, মারামারি।' দিদিমনি বললেন, 'আশ্বিনের সেই কমলালেবুটা কোথায়?' নিজের হাতের নিশ্চিহ্নপ্রায় লেবুটা দেখিয়ে চতুরানন বলল, 'এই তো আমি খাচ্ছি!' দিদিমনি বললেন, 'যে কমলালেবু নিয়ে ওদের দু'জনের এত ঝগড়া, তুমি খাচ্ছ সেই কমলালেবু?' চতুরানন দাঁত বার করে হেসে বলল, 'আমি যে ওদের উকিল।'

এক বিবাহবিচ্ছেদের মামলার বিষয়েও অনুরূপ গল্প আছে। অলক এবং অলকার দুই ছেলে। তাদের দশ বছরের বিয়ের তিন বছর ধরে ডিভোর্সের মামলার শেষে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটল। অলকা বলল, 'অলকের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আমি রক্ষা পেয়েছি। সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়েছি। এক ছেলে এখন আমার কাছে, আরেক ছেলে তার বাবার কাছে।' একজন শুভানুধ্যায়ী বললেন, 'কিন্তু তোমরা দু'জনে যে অফিস থেকে টাকা ধার করে সুন্দর ফ্ল্যাটটা কিনেছিলে বেহালায়, সেটার কীভাবে ভাগ হল?' অলকা বলল, 'সেটা ভাগ করতে হয়নি। সেটা উকিলবাবু নিয়েছেন।'

ডিভোর্সের ভাগাভাগি নিয়ে আরও একটা গল্প আছে, সেটা একটু মোটা দাগের। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার পর আদালতের নির্দেশে স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত বিষয়সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ করা হল। কিন্তু বিচারক একটা জায়গায় আটকিয়ে গেলেন, প্রাক্তন দম্পতিকে বললেন, 'কিন্তু আপনাদের তো তিনটি সন্তান, সেটা কীভাবে ভাগ হবে?' পুরুষটি ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু মহিলা বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। ডিভোর্স একবছর মুলতুবি রাখুন। আরেক বছর ঘর করি, তখন আরেকটা বাচ্চা নিয়ে চারটে বাচ্চা হয়ে যাবে। সে সময় দু'জনের ভাগে দুটো দুটো করে বাচ্চা দিয়ে দেবেন।'

দাম্পত্য-বিচ্ছেদ নিয়ে আর রসিকতা নয়। এবার আমরা উকিলবাবুর কাছে আবার ফিরে যাই। এক ভদ্রলোক উকিল থেকে হাকিম হয়েছিলেন। তাঁর আদালতে এক প্রতারণার মামলায় আসামিকে কেমন চেনা চেনা মনে হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রতারণার মামলায় এর আগেও তো আপনার সাজা হয়েছিল!'

আসামি বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর। বিনা দোষে আমার উকিলের জন্যে আমার সাজা হয়েছিল।'

হাকিম বললেন, 'উকিলের জন্যে সাজা হয়েছিল? বুঝব কী রে?'
'বুঝবেন না কেন স্যার?' আসামি মলিন হেসে বলল, 'সে মামলায় তো আপনিই আমার উকিল ছিলেন।'

এইরকম অন্য একটি মামলায় হাকিম সাহেব বিবাদীকে বলেছিলেন, 'আপনি বড় উলটোপালটা মিথ্যে কথা বলেছেন, আমার কথা শুনুন, একজন উকিল রাখুন।' খুবই অর্থপূর্ণ পরামর্শ। মিথ্যে কথাটুকু উকিলবাবুই গুছিয়ে বলবেন, বিবাদীকে উলটোপালটা বলতে হবে না। জানি না আদালতকক্ষে কোনও ব্যবহারজীবী সেইক্ষণে উপস্থিত ছিলেন কিনা, তিনি এই ব্যাপারে কোনও প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা। তবে হাকিম সাহেবরাও বিপদে পড়েন। একটু আগের গল্পে তার উদাহরণ আছে। পরবর্তী উদাহরণটি বিশ্ববিদিত।

সুদীর্ঘ ফৌজদারি মামলার শুনানি ও সাক্ষ্যের অবসানে রায়দানের আগে যথারীতি পোড়খাওয়া, ঝুনো আসামিকে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি দোষী না নির্দোষ?' আতার বিচির মতো কালো ঝকঝকে পান-খাওয়া দাঁত, কাঁচা করমচার আধফালির মতো চোখ, হুলো বেড়ালের লেজের মতো গোঁফ কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিবাহবিশারদ যোগীলাল ব্রহ্মচারী, ক্রমাগত বিবাহ করে যাওয়াই যাঁর পেশা, এবারও যিনি সেই পেশাগত কারণে গ্রেফতার হয়েছেন, সেই যোগীলাল অবিচল কণ্ঠে হাকিমকে বললেন, 'হুজুর, হাকিমসাহেব, আমি দোষী না নির্দোষ সেটা নির্ণয় করার জন্যেই জনদরদি সরকার আপনাকে মাসে মাসে এত টাকা মাইনে দিয়ে পুষছেন। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনিই বলুন আমি দোষী না নির্দোষ? ভুলে যাবেন না, এর জন্যে আপনি মাইনে পান।'

পুনশ্চ: লম্বা রম্যরচনা এক বিড়ম্বিত ব্যাপার। বিড়ম্বনা শুধু লেখকের নয়, পাঠকের বিড়ম্বনাও কিছু কম নয়। এলেবেলে লেখা কেইবা লিখতে চায়, আর কেইবা পড়তে চায়! আর হাসির লেখা বড় হলেই এলেবেলে হয়ে যায়। অবশেষে আইনমাফিক একটি ঐতিহাসিক কাহিনী দিয়ে বিদায় গ্রহণ করছি।

চার্লস ডিকেন্স শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের একজন। তাঁর ছেলে হেনরি বিচারবিভাগে কাজ করতেন। হেনরি এক মামলায় এক দাগী আসামিকে সাজা দেওয়ার পরে সেই আসামিটি চেঁচিয়ে বলে, 'হেনরি, তোমার বাবার পায়ের নখের যুগ্যিও তুমি নও।'

হতভম্ব হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার বাবার বিষয়ে কী জানো?'

লোকটি বলল, 'আমি তোমার বাবার অনেক বই পড়েছি।'

হেনরি বললেন, 'নথিপত্রে দেখছি তুমি সর্বদা হইহল্লা, গুণ্ডামি, মাতলামি করে বেড়াও। বই পড়লে কখন?'

লোকটি বলল, 'জেলে থাকার সময় জেল লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েছি। আমি তোমার বাবার লেখা প্রায় অর্ধেক বই পড়ে ফেলেছি।'

হেনরি বললেন, 'তোমাকে আবার জেলে পাঠাচ্ছি। বাবার বাকি বইগুলো পড়ে শেষ করে ফেলো।'

বাঁকা কথা

আজকাল বাঁকা কথা খুব চলছে। আজকাল সোজা কথা কেউ সোজা করে বলতে চায় না।

সেই সুকুমারের রায়ের অবাক জলপান নাটকে ঘোর গ্রীষ্মে এক পিপাসার্ত ব্যক্তি 'জল পাই কোথায়?' জানতে চেয়ে বেকায়দায় পড়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল এটা জলপাইয়ের সময় নয়, কাঁচা আম চাইলে পেতে পারেন। ওই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যখন বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, তিনি জলপাই নয় জলের খোঁজ করছেন, তাঁকে শুনতে হল,

'জল চাচ্ছেন তো জল বললেই হয়, জলপাই বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন?' ...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভয়ানক ব্যাপার! এ অবশ্য আজকের নয়, আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে সুকুমার রায় এইরকম বাতচিতের বা কথোপকথনের কথা ভেবেছিলেন।

কী গেরো বাবা! দারুণ অগ্নিবাণে জর্জরিত এক ব্যক্তি তৃষিত হৃদয়ে জলের খোঁজ করছেন, আর তাকে জলপাই থেকে আলুবোখরার কথা বলা হচ্ছে!

সুকুমার রায় চিরস্মরণীয়। তাঁকে আমরা অবিলম্বে আবার স্মরণ করব। আপাতত নিকট কথায় আসি।

নিকট কথা মানে অতি নিকট ব্যাপার। আমার প্রধানা শ্যালিকা অনন্তকাল পরে অতি দূর দেশ থেকে সেদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাবেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি তার ভগিনীকে বললেন, 'খুব ভাল খেলাম। তোরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।'

আমার স্ত্রী খুবই ভালভাবে তাঁর অগ্রজাকে জানেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত পরিষ্কার-পরিষ্কার করছ কেন?'

দিদি বললেন, 'ডাল-ভাত, চচ্চড়ি-তরকারি, মাছ-মাংস সব কিছুতে সাবানের গন্ধ পেলাম। তবু পরিষ্কার পরিষ্কার বলা চলবে না!'

এইসব তুচ্ছ পারিবারিক ব্যাপার থেকে এবার আমরা আদালতের খোলা সীমানায় যাব।

আদালতের কথাবার্তার ধরনধারণই আলাদা। মাননীয় বিচারক উকিল মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে কীসের অভিযোগ?'

উকিলবাবু বললেন, 'ইয়োর অনার, অতি সামান্য ব্যাপার। আমার মক্কেল একটা দোকান খুলেছিলেন।'

বিচারক বললেন, 'দোকান খোলার মধ্যে দোষের কী হল?'

এবার আসামির উকিলবাবু কিছু বলার আগেই সরকারি প্রসিকিউটর বললেন, 'হুজুর, সে দোকানটা ওর নিজের দোকান নয়।' অর্থটা প্রাঞ্জল করে বলা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তিটি একটি দোকান খুলে চুরি করতে ঢুকেছিল।

অতঃপর একটু সংবাদপত্রের ভাষায় আসি। 'শীর্ষ সম্মেলন' কথাটা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রায়ই দেখি। সেই শীর্ষ সম্মেলনের কথা বলি।

সম্প্রতি এক পর্বত অভিযাত্রী দল প্রচণ্ড কষ্ট করে ভয়াবহ তুষারঝড়, বরফ-ধস পার হয়ে অবশেষে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছাল। কিন্তু সেখানে তাদের আগেই একদল লোক উঠে বসে আছে।

একটু এগিয়ে যেতে অভিযাত্রী দল বুঝতে পারল, যাঁরা পর্বতচূড়ায় বসে আছেন তাঁরা সবাই কেউকেটা লোক, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান।

এঁদের দেখে বিস্মিত হয়ে অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক বললেন, 'মান্যবরগণ, আপনারা এখানে এই পর্বতশীর্ষে কী করছেন?' উত্তর পাওয়া গেল, 'কেন, বুঝতে পারছেন না! শীর্ষে সম্মেলন চলছে!'

বাঁকা কথার প্রসঙ্গ উঠলেই সর্বপ্রথমে সকলের মাননীয় উকিলবাবুদের কথাই মনে আসে।

উকিলবাবুরা নমস্য, তাঁদের কথা একটু পরে তেমন সুযোগ ও সাহস করে বলা যাবে। কিন্তু একটা কথা পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বাঁকা কথার ব্যাপারে ডাক্তারসাহেবরাও কম যান না। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এক গোলমেলে এবং বেশ খারাপ দেখতে রোগিণীর বুকের অসুখ এবং শ্লেষ্মার ধাত, ডাক্তারসাহেব তাঁর এক্স-রে তুলিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা খুব পরিষ্কার স্বভাবের নন। অন্তত ডাক্তারসাহেবের তাই মনে হয়েছে। রোগিণীটি নানারকম বায়নাক্কা তুলে, ঝগড়া করে ডাক্তারকে তাতিয়ে তুলেছেন। সুতরাং ভদ্রমহিলা যখন ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলেন, 'আমার এক্স-রে'-টা কেমন দেখলেন?'...

...ডাক্তারবাবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, 'দেখুন একটা কথা বলছি, ভেতরে বাইরে এত কুৎসিত—আজ পর্যন্ত এত রোগী দেখলাম, এমন আর দেখিনি।'

এবার দ্বিতীয় উদাহরণে যাই। সেটি অবশ্য এত সরেস এবং সরস নয়। তাই সংক্ষিপ্ত করে বলি এবং ডালপালা ছেঁটে কথোপকথনের আদলে বলি:—

রোগী: ডাক্তারবাবু, আমার ডান পায়ের হাঁটুতে খুব ব্যথা হয়েছে।

ডাক্তারবাবু: এ রকম ব্যথা কি আপনার আগে কখনও হয়েছিল?

রোগী: হ্যাঁ, গত বছরেও ঠিক এই বর্ষার সময়ে ডান পায়ের হাঁটুতে এই ব্যথাটা হয়েছিল।

ডাক্তারবাবু: তা হলে আপনার সেই ব্যথাটাই ফিরে এসেছে।

বলাবাহুল্য, সব ডাক্তারবাবু ঠিক এ রকম উচ্চাঙ্গের ডায়গনসিস করেন না। যে ডাক্তারবাবু দম্ভভরে বলেছিলেন যে, 'আমি যদি কারও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করি সে ম্যালেরিয়াতেই মারা যাবে—টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক বা নিউমোনিয়ায় নয়। কখনও ভুল ডায়গনসিস আমি করি না।' সেই চিকিৎসক মহোদয়ও এই সূত্রে স্মরণীয়।

ডাক্তারবাবুদের সম্পর্কে না বুঝে একটু কড়া কথা বলা হয়ে গেল। ডাক্তার-উকিল চটানো উচিত নয়। এবার চিকিৎসকদের সম্পর্কে একটা নরম-নরম গল্প বলি।

যেমন হয়, হয়ে থাকে। এক ডাক্তারবাবুর চেম্বারে প্রতি সকালবেলায় প্রায় নিয়মিত এক পরিচিত বিনা ভিজিটের রোগী গিয়ে অত্যাচার করেন। এই রোগী ভদ্রলোক খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, ঘুরছেন-ফিরছেন আর মুখে সর্বদা কাতরোক্তি করছেন, 'মরে গেলাম, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাথাব্যথায় মরে গেলাম।'

ডাক্তারবাবু জানেন পুরো ব্যাপারটা মানসিক। এর তেমন কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু প্রতি সকালবেলা এই ভদ্রলোকের অত্যাচার তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে। অবশেষে একদিন তিনি মুখ খুললেন। সেই রোগী এসে যেই বলেছে, 'ডাক্তার, আমার মাথাব্যথা...' ডাক্তারবাবু তাঁকে বাক্য সম্পূর্ণ না করতে দিয়ে বললেন, 'আমারও মাথাব্যথা।'

বয়োঃজ্যেষ্ঠ পূর্বপরিচিত রোগী বললেন, 'সে কী হে? তোমার আবার মাথাব্যথা কীসের?'

ডাক্তারবাবু নির্বিকার মুখে ঘোষণা করলেন, 'আপনিই আমার মাথাব্যথা, বুঝতে পারছেন?'

তবে সব ডাক্তারবাবু এ ধরনের কথা স্বজ্ঞানে বলেন না। ডাক্তারবাবুদের কারও কারও অনেকরকম খারাপ অভ্যাস থাকে—নেশা, ভাং, ড্রাগ ইত্যাদি তো হাতের আমলকী। পঞ্চ ম'কার তদুপরি রেস, জুয়া, শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি—বিপদ আর নেশা চিরদিন জোট বেঁধে আসে।

আসলে অনেক ডাক্তারই প্রকৃতঅর্থে ডা. জেকিল এবং মি. হাইড। এইরকম এক ডাক্তারকে এক জ্বরকাতর রোগী মধ্যসন্ধ্যায় ফোন করেছিলেন, 'স্যার, প্রচণ্ড জ্বর এসেছে, এখন একশো দুই চলছে, কী করব?' শেয়ার বাজারের অঙ্ক চোখের সামনে, হাতে হুইস্কির গেলাস, কানে টেলিফোন, ডাক্তারবাবু বললেন, 'কত? একশো দুই? চুপচাপ থাকুন—একশো পাঁচ হলেই বেচে দেবেন।'

পুনশ্চ:

বাঁকা কথার শেষে ডাক্তারবাবুকে এবার একটু নির্বাক করে দিই।

স্মৃতিভ্রংশের এক রোগী ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছিলেন। ডাক্তারবাবু যথারীতি তাঁকে কয়েকটি মেমোরি পিল খেতে দেন। কয়েকদিন পরে ডাক্তারবাবুর কাছে রোগীটি ফিরে আসতে ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'পিলগুলো খেয়েছেন?'

রোগী মাথা চুলকিয়ে বলল, 'না ডাক্তারবাবু, ভুলে গেছি।'

বাঁকা কথার অবশেষে আইনের আঙিনায় যেতে হচ্ছে। না হলে বাঁকা কথা অপূর্ণ থেকে যাবে।

কাঠগড়ায় জনৈক সাক্ষী আবোলতাবোল, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে থাকায় হাকিম সাহেব তাঁকে ধমকিয়ে দেন, 'বাজে কথা বলবেন না। এই মামলা সম্পর্কে আপনি সত্যি সত্যি যেটুকু জানেন সেটুকু বলুন।'

সাক্ষী বিনীতভাবে জানালেন, 'হুজুর, সে আমি পারব না।'

হাকিম অবাক হয়ে বললেন, 'কেন পারবেন না?'

সাক্ষী বললেন, 'হুজুর, এর আগেও আমি কয়েকবার আদালতে সাক্ষী হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখেছি, যেই সত্যি কথা বলতে গেছি, হয় এই পক্ষের উকিলবাবু না হয় ওই পক্ষের উকিলবাবু আমাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়েছেন।'

বলাবাহুল্য, এই সাক্ষীর মতো অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। উকিলবাবুদের সামনে সত্যি কথা বলে পার পাওয়া কঠিন।

কিন্তু এর চেয়েও সেই সাক্ষী ভদ্রলোক যাঁকে জজসাহেব ধমকিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি শপথ নিয়েছেন সত্যি কথা বলবেন বলে, এখন সত্যি কথা না বললে আপনার কী হতে পারে জানেন?'

নির্বিকার মুখে সাক্ষী বললেন, 'হ্যাঁ, জানি।'

জজসাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কী জানেন?'

সাক্ষী বললেন, 'আমি সত্যি বললে আমার পক্ষ হারবে। সত্যি না বললে আমার পক্ষ জিতবে।'

অন্য একটি জটিল মামলায় এক ডাক্তার সাক্ষীর কথায় তিতিবিরক্ত হয়ে রাগী উকিলবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানুষের মাথায় ঘিলু কতটা থাকে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তার ঠিক নেই। একেক জনের একেক রকম।'

উকিলবাবু বাধ্য হয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মাথায় কতটা ঘিলু আছে?'

আদালত বাধা দেওয়ার আগেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার চেয়ে কিছুটা বেশি।'

আমরা বাঁকা কথার শেষ প্রান্তে এসেছি। আদালত কক্ষে শেষবার ঘুরে যাই।

উকিল আদালতকে জানালেন, 'স্যার, আমার পক্ষের দু'জন সাক্ষী অনুপস্থিত। আজকের মামলা মুলতবি রাখা হোক। আমাকে পরে একটা তারিখ দিন।'

জজসাহেব আদালতের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার মামলা মুলতবি রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। ওই দেখুন সাক্ষী দু'জন এসে গেছে।'

উকিলবাবু মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন সত্যিই সাক্ষী দু'জন এসে গেছে, কিন্তু তিনি তবুও মামলা মুলতবি রাখতে চাইলেন। বিস্মিত জজসাহেব বললেন, 'কিন্তু, কেন?'

উকিলবাবু বললেন, 'এই সাক্ষী দু'জন মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরা আমাকে কথা দিয়েছিল যে আদালতে আসবে না।'

শিশু বিষয়ে

ছাদের ওপরে ঠাকুরমা আমের আচার রোদে দিয়েছেন। বারবার ছাদে উঠে গিয়ে দেখে আসছেন কাকে মুখ দিচ্ছে কি না। তিনি প্রত্যেকবারই দেখলেন তাঁর প্রিয় বালক নাতিটি আচারের বয়ামের কাছ ঘেঁষে বসে আছে। ঠাকুরমা ভাবলেন, ভালই তো, থাকুক না এখানে—কাক আসতে সাহস পাবে না।

কিন্তু নাতিটি একেবারে বয়াম ঘেঁষে বসে আছে। ঠাকুরমা সিঁড়ির ওপরে থেকেই বললেন, 'দাদু, অত বয়ামের কাছ ঘেঁষে বসতে হবে না।'

পরেরবার ছাদে উঠেও ঠাকুরমা দেখলেন নাতিটি বয়ামের কাছ ছাড়েনি, বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এবার ঠাকুরমা বললেন, 'দাদু, তোমাকে না বললাম বয়ামের কাছ ঘেঁষে বসবে না!'

নাতি বলল, 'আর বসব না ঠাকুরমা, আর বসে লাভ নেই।'

ঠাকুরমা বললেন, 'কী লাভ নেই?'

নাতি বলল, 'বয়ামে আর এক ফোঁটা আচারও নেই।'

অন্য একটা গল্প বলি।

দুই ভাই, জগাই এবং মাধাই। আগে অবশ্য তাদের নাম জগা এবং মধু ছিল, তবে সামান্য বয়েস বাড়তে তারা এত দুষ্ট হয়েছে যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নামবদল হয়ে তারা এখন জগাই, মাধাই হয়েছে।

জগাই-মাধাইয়ের বাবা একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখেন বাড়ির বাইরের ঘরে কাচের শার্শি ভাঙা, বাইরের ঘরে জগাই-মাধাই দু'জনায় পরস্পর ধুন্ধুমার লড়াই করছে। তাদের মা বোধহয় আশেপাশের কোনও বাড়িতে গল্পগুজব করতে গেছেন, সেই সুযোগ দু'ভাই সদ্ব্যবহার করছে।

দুই হাতে দুই ভাইয়ের কান ধরে পিতৃদেব প্রশ্ন করলেন, 'জানলার কাচ কে ভেঙেছে?'

জগাই বলল, 'মাধাই।'

মাধাই বলল, 'জগাই।'

দুই ভাইকে কষে দুটো করে থাপ্পড় লাগালেন, পরে জানা গেল, প্রকৃত অর্থে কেউই মিথ্যে বলেনি। জগাই মাধাইয়ের মাথা লক্ষ করে একটা পেপার ওয়েট ছুড়েছিল। মাধাই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার মাথা সরিয়ে নেয়, ওটা গিয়ে জানালার কাচে লাগে, কাচ ভাঙে। জগাই অবশ্যই দায়ি,

কারণ সেই ঢিলটা ছোড়ে। আবার মাধাইও দায়ি, কারণ সে তার মাথা সরিয়ে না নিলে ঢিলটা কাচে লাগত না।

এই জগাই একবার ক্লাসের পরীক্ষায় অত্যন্ত কম নম্বর পেয়েছিল। বাবা ধরলেন, 'তুমি এত কম নম্বর পেলে কী করে?'

জগাই অম্লান বদনে জবাব দিল, 'আমি যে ক্লাসের সবার শেষে, লাস্ট বেঞ্চের লাস্টে বসেছিলাম।'

জগাইয়ের পিতৃদেব অবাক, 'তার জন্য কী হয়েছে?'

জগাই ব্যাখ্যা দিল, 'সবার নম্বর দিতে দিতে আমার পর্যন্ত এসে মাস্টারমশাইয়ের নম্বর কম পড়ে গিয়েছিল।'

আর মাধাই হল সেই শিশু যাকে 'কাক কেন কালো?' জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, 'কাক আর কী করবে? ওর যে মা কালো, বাবাও কালো, তাই ও নিজেও এত কালো হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।'

শুধু জগৎপারাবারের তীরেই নয় শিশুরা মাঠে-ঘাটে, রাস্তায়-ফুটপাথে, ঘরে-বারান্দায়, ছাদের কার্নিশে, জানালার রেলিংয়ে—এমনকী গাছের ডালে, পুকুরের জলে খেলা করে। তাদের খেলার কোনও সময় অসময় নেই। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমোনো পর্যন্ত সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা তারা সবসময় খেলা করে। শিশুরা খাওয়া নিয়েও খেলা করে।

এই আমারই ছোটবেলার কথা মনে পড়েছে। ভাতের থালা সামনে, কিন্তু ভাত খাচ্ছি না। মা তখন এসে ভাত-ডাল-তরকারি ঘন করে মেখে ছোট ছোট দলা বানাচ্ছেন, গোল গোল ডিমের মতো দলা। তারপর বলতেন, 'এই হল হাঁসের ডিম', আমি হাঁসের ডিম খেতাম, তারপর 'এই বাঘের ডিম', 'এই ঈগলের ডিম', 'এই গণ্ডারের ডিম' ... এইভাবে চলত—আমিও খেয়ে নিতাম।

আমি কি আর জানতাম না যে ওগুলো ভাতের দলা, বাঘের বা ঈগলের ডিম নয়! সব শিশুই যেমন জানে আমিও জানতাম। কিন্তু সেও ছিল একটা খেলা, খাওয়া-খাওয়া খেলা।

শিশুদের নিয়ে আরও বেশ কয়েকটা গল্প হাতের কাছে রয়েছে। পরে কোথায় হারিয়ে ফেলব, তার থেকে আরেক দফা লিখে রাখি।

শিশুরা কী জন্য যে কী চায়, সেটা সবসময়ে জানা যায় না। তারা ঠাকুরদার মোটা কাচের চশমা নিয়ে রোদ্দুরে আতস কাচের মতো করে ধরে শুকনো ঘাসে কিংবা ছেঁড়া কাগজে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে। ফলে সে ঠাকুরদার কাছে যখন তাঁর চশমাটা অল্পক্ষণের জন্য চায়, সে বৃদ্ধ বুঝতে পারেন না ওই হাই পাওয়ারের চশমা ওইটুকু শিশুর কী কাজে লাগবে।

একটি শিশু যখন গামছা চায়, ধরে নেওয়া যায় সে স্নান করার জন্য গামছা চাইছে না—সে বাড়ির সামনের সদ্য জমা হাঁটুজলে ওই গামছা দিয়ে জালের মতো করে মাছ ধরবে, তা সে জলে মাছ থাকুক বা না থাকুক।

শিশুরা পেনসিলকাটা ছুরি চায় পেনসিল কাটার জন্য নয়, বাড়ির জানলা-দরজা অথবা স্কুলের বেঞ্চে কাঠ কেটে নিজের নাম খোদাই করবে বলে।

তালিকা বিস্তৃত করে লাভ নেই। এবার আমি যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি, সেটি খুবই বিপজ্জনক।

সন্ধ্যাবেলা। লোডশেডিং চলছে। শোবার ঘরে একটি বালক মোমবাতি জ্বালিয়ে স্কুলের পড়া করছে। তার মা রান্নাঘরে রান্না করছেন।

হঠাৎ বালকটি রান্নাঘরে ছুটে এল, 'মা, তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল দাও।'

মা জল দিলেন, ছেলেটি জল নিয়ে শোবার ঘরে ছুটে গেল। তারপর এক মিনিট পরে বালকটি আবার ছুটে এল, 'মা, আরেক গ্লাস জল দাও।'

আবার বালকটি জল নিয়ে ছুটে গেল। তারপর আবার জল চাইতে এল। চারবারের বার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়াশুনো না করে এত জল দিয়ে কী করছ?'

বালকটি বলল, 'কী করব! মোমবাতিটা উলটিয়ে গিয়ে বিছানায় আগুন ধরে গেছে, কিছুতেই নিবছে না।'

এই বালকটি খুবই সরল। এবার এক ধূর্ত বালকের কাহিনী বলি।

এই ধূর্তটিকে মাস্টারমশাইরা সবাই ভাল করে চেনেন। তাঁদের সব ক্লাসেই এ রকম বালক বা বালিকা দুয়েকটি সবসময়েই থাকে।

মাস্টারমশাই ক্লাসে বাক্যরচনার পাঠ নিচ্ছেন। বাক্যরচনার ক্লাসে অনেকরকম মজার মজার ব্যাপার ঘটে। হয়তো কোনও ছাত্র বাক্যরচনা করল, 'কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটি তুলসীবনের বাঘ আছে।' আরেকজন বলল, 'সুখের পায়রার মাংস অতি সুস্বাদু।' এমনকী এও দেখা গেছে যে, 'বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি দু'জনেই বিধবা।'

এসবের মধ্যে যথেষ্টই হাসির ব্যাপার আছে। কিন্তু যে বালকটিকে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' দিয়ে বাক্যরচনা করতে দেওয়া হয়েছিল, সে যা করেছিল সেটা তার ধূর্ততার নিদর্শন। সে অনেক ভেবেচিন্তে লিখেছিল, 'শিক্ষক মহাশয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় শব্দটি দিয়ে বাক্যরচনা করতে দিয়েছেন।'

এই বাক্যরচনার জন্য ধূর্ত বালকটি কি নম্বর পাবে? শুধু মাস্টারমশাই এবং ঈশ্বর বলতে পারবেন।

শিশুদের নিয়ে অনেক হল। এবার শেষ করি যমজ শিশু দিয়ে।

দুই যমজ ভাই। বছর পাঁচেক বয়স। তাদের বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। বাইরের ঘরে দু'জনে খেলছে, তাদের ভদ্রলোক বললেন, 'এই যে খোকারা, তোমাদের মা-বাবা কোথায়?'

ভাইদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, 'আমার মা রান্নাঘরে রান্না করছে আর ওর বাবা শোয়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে।'

ভদ্রলোক তাজ্জব হয়ে গেলেন। দুই যমজ ভাই নিজেদের মধ্যে মা-বাবা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। একজনের ভাগে বাবা, একজনের ভাগে মা।

শিশুকাহিনী সহজে ফুরবার নয়। অন্যসব উলটো-পালটা লেখার চেয়ে এ অবশ্য অনেক সরল ব্যাপার।

সর্বত্রই শিশু খুব সহজলভ্য। কিন্তু তাদের সব থেকে বেশি ঝোঁক সভা-সমিতির প্রতি। গ্রামগঞ্জে, মফস্বলে—এমনকী কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যেখানেই কোনও অনুষ্ঠান, জলসা বা সভা-সমিতি হোক, শিশুরা অবশ্যই ভিড় জমাবে। সে সভা রবীন্দ্রজয়ন্তীর জলসা হতে পারে কিংবা পরিবার পরিকল্পনার সরকারি প্রচারের জমায়েত হতে পারে। মাইক-প্যান্ডেল-মঞ্চ এসব থাকলেই ঝাঁকে ঝাঁকে শিশু এসে যাবে—ঠেকানো যাবে না।

তাই অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা ঠিক মঞ্চের সামনে কয়েক হাত জায়গা শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট করে ফরাস পেতে রাখেন, বালখিল্যদের জন্যে ঢালাও বন্দোবস্ত।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি এমন অনেক সভা দেখেছি, যেখানে বয়স্ক শ্রোতার সংখ্যা বড়জোর দশ-পনেরো। তাঁরা সামনের দুই সারি কাঠের চেয়ারে ইতস্তত অবিন্যস্তভাবে বসে আছেন। আর তাঁদের ঠিক সামনেই ফরাসের ওপর শ'আড়াই শিশু খলবল করছে।

আমার এক সুরসিক বক্তৃতাবাজ বন্ধু যখন কোনও সভায় যেতেন, বলতেন, 'যাই, শিশুপাল বধ করে আসি।'

এ শিশুপাল মহাভারতের চরিত্র নয়, এ হল শিশুর পাল—শিশুপাল। ষষ্ঠী তৎপুরুষ। যারা সভামঞ্চের সামনে ফরাসে বসে থাকে।

শিশুদের বিষয়ে দু'-একটা পুরনো গল্প মনে পড়ছে।

'কান্ডজ্ঞানে' এক যুগ আগে দু'টি শিশুর কথা বলেছিলাম। বলা বাহুল্য, তারা আর শিশুটি নেই। দু'জনই এখন সরকারি হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক। গত নির্বাচনে সাতসকালে গিয়ে পরমোৎসাহে ভোট দিয়ে এসেছে। এবং তারা এখন এতই সাবালক যে, কাকে কিংবা কোন দলকে ভোট দিয়েছে, সেকথা ফাঁস করেনি। কিছু প্রশ্ন করলে মিটিমিটি হেসেছে।

এর মধ্যে প্রথমজন ছিল প্রকৃত বিচ্ছু। তখন তার চার-পাঁচ বছর বয়স। তাদের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাবেলা আড্ডা দিতে গেছি, শিশুটির বাবার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছি, এমন সময় সে ঘরে প্রবেশ করল, আর আমাকে দেখেই বাড়ির মধ্যে ছুটে গিয়ে একটা বাটি নিয়ে এল।

তারপর হাতের বাটিটা আমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'এটা কী?'

আমি সরলভাবে বললাম, 'বাটি।'

শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলল—'তোর বউয়ের সঙ্গে সাঁতার কাটি।'

ক্ষুদ্র শিশুটির এই দূরাভিলাষ দেখে সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় শিশুটি অবশ্য এতটা গোলমেলে ছিল না। তার একটা বাঁধা গৎ ছিল। তাদের বাড়িতে কোনও অবিবাহিত বা অবিবাহিতা ছেলেমেয়ে এলে সে প্রশ্ন করত, 'আচ্ছা বাটা (Bata) বানান কী?'

যেই উত্তর আসত 'বি এ টি এ'—সে বলত, 'তুমি বিয়ে-টিয়ে কিছু করবে না?'

পুনশ্চ:

এক দুরন্ত শিশুর পিতৃদেবকে তার এক প্রতিবেশী সেই শিশুর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন। নালিশের বিষয়বস্তু হল, 'আপনার ছেলেটি আজ দুপুরে ঢিল ছুড়ে আমার সামনের বারান্দার কাচের জানলা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।'

একথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই উক্ত পিতৃদেব জানতে চাইলেন, 'আপনার জানালার কাচ ভেঙেছে কী?'

প্রতিবেশী বললেন, 'না ভাঙেনি—ভাঙতে পারেনি।'

পিতৃদেব একথা শুনে নিশ্চিতভাবে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি ভুল করেছেন, আমার ছেলে কিছুতেই ঢিল ছোড়েনি। সে ঢিল ছুড়লে আপনার জানলার কাচ ভাঙতই ভাঙত।'

শব্দকল্পদ্রুম

এই রম্য নিবন্ধটির বিষয় শব্দদূষণ। এ রকম একটি গুরুতর বিষয়কে প্রথমেই হালকা করে নিলাম মহামহিম সুকুমার রায়ের সাহায্যে নামকরণ করে।

সুকুমার রায় এক কাল্পনিক শব্দদূষণের জগৎ তৈরি করেছিলেন।

ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম শুনে লাগে খটকা—
ফুল ফোটে? তাই বল আমি ভাবি পটকা!

সেই ফুল তো ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম করে ফুটল। তারপর সে ফুলের গন্ধ সাঁই সাঁই পন পন করে

ছুটতে লাগল, হুড়মুড় ধুপধাপ করে হিম পড়তে লাগল। অবশেষে ঝুপ-ঝুপ-ঝপাস, গব-গব-গবাস—চাঁদ ডুবে গেল।

আসল শব্দদূষণের ব্যাপারটা অবশ্য এত মজার নয়। দূষণ নানারকম আছে। বায়ুদুষণ, জলদূষণ, সমাজদূষণ, খাদ্যদূষণ— এইরকমই একটি হল শব্দদূষণ।

তবে সবচেয়ে আদি দূষণ হল একটি রাক্ষস। রামায়ণ মহাকাব্যে আরণ্যকাণ্ডে তার কথা আছে, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণের ওই আরণ্যকাণ্ডে একবিংশ থেকে ষড়বিংশ সর্গ দ্রষ্টব্য।

দূষণ ছিলেন রাবণ রাজার মাসতুতো ভাই। বলতে গেলে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং লঙ্কাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল দূষণ এবং তার অন্য ভাই খর রাক্ষসের দ্বারা। এই খর এবং দুষণ পঞ্চবটি বনে তাদের বোন সুপর্ণখার কারণে রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে এবং সদলবলে নিহত হয়।

আদি দূষণকে রাম-লক্ষ্মণ নিহত করেছিলেন, কিন্তু একালের দূষণগুলিকে নির্মূল করার ক্ষমতা বোধহয় কোনও রাম-লক্ষ্মণের নেই।

অন্য দূষণের কথা থাক, শব্দদূষণের কথাই বলি। প্রথমে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।

দক্ষিণ কলকাতায় পণ্ডিতিয়া রোডে আমি এক যুগেরও বেশি কাল অতিবাহিত করেছি। রাস্তার ওপরে একতলার ফ্ল্যাটে থাকতাম। আমি যখন ও-পাড়ায় যাই সে ছিল শান্ত নির্জন পল্লী। ক্রমশ তার চেহারা বদলাতে লাগল। পুরো রাস্তা মোটর সারাইয়ের গ্যারেজ আর কারখানায় ভরে উঠল।

সেসব কারখানার কোনওটায় পুরনো গাড়ি চেঁচে রং করা হয়, কোনওটায় ইঞ্জিন ওভারহলিং হয়, সবচেয়ে অসহ্য ও মর্মান্তিক ব্যাপার হল শেষের দিকে, এক ভদ্রলোক ঠিক আমাদের ফ্ল্যাটের উলটোদিকে গাড়ির হর্ন সারাইয়ের আস্তানা করলেন। এই ভদ্রলোকের অধিকাংশ খদ্দেরই ছিল ট্যাক্সিওয়ালা।

ট্যাক্সিওয়ালারা গভীর রাতে নিজেদের ভাড়া খাটা শেষ করে ওইখানে হর্ন সারাতে আসত। আবার ওই সময়টা ভদ্রলোকের পক্ষেও সুবিধাজনক ছিল। ভদ্রলোক বোধহয় দিনের বেলায় কোথাও চাকরি-বাকরি করতেন। তিনি সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এক ঘুম দিয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে কারখানায় এসে কাজ শুরু করতেন।

শিবরাম চক্রবর্তী এক অলৌকিক গাড়ির কথা বলেছিলেন, যে গাড়ির হর্ন ছাড়া আর সবই বাজে। এখানে বাজে শব্দের দু'রকম মানে, এই দু'রকম মানেই ভদ্রলোকের কারখানায় আগত গাড়িগুলি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়। সারারাত ধরে চলত হর্ন সারানোর কাজ। আমাদের রাতের ঘুম চলে গিয়েছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। প্রতি রাতে এ জিনিস সহ্য করা অসম্ভব।

কিন্তু এ জিনিস আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। একদিন বা দু'দিন নয়, একমাস বা দু' মাস নয়, বছরের পর বছর। চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা এসব প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করতে রাজি হন না। এরাও বৎসরান্তে কালীপুজো, শীতলাপুজোয় হাজার টাকা চাঁদা দেয়, দুর্গাপুজোয় পাঁচ হাজার। অবশ্য থানা পুলিশ করতে পারতাম। কিন্তু মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, তাতে তেমন কোনও লাভ হবে না। মধ্যে থেকে একজন খারাপ শত্রু তৈরি হবে।

স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা মনে ছিল। সেই সময় তিনি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নাল' লিখতেন। তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাসায় বিছানায় শয্যাসঙ্গী। তাঁর শোয়ার ঘরের জানলার সামনে সে সময় বারোয়ারি মাইকে হিন্দি গান বাজছে তারস্বরে। আবেদন-নিবেদনে কোনও কাজ হয়নি। মাইক দিনের পর দিন বেজেছে এবং এই অত্যাচারেই তিনি শেষ পর্যন্ত মারা যান। এবং সেটাই যে তাঁর পরিণতি হবে শেষ কিস্তি 'সুনন্দর জার্নাল'-এ সেটা তিনি আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন।

শব্দের একটি মোহ আছে। পুরাণের ঋষিরা বলেছেন শব্দব্রহ্ম।

আপনি কখনও ক্যানেস্তারা বাজিয়ে দেখেছেন? দেখবেন, কিছুক্ষণ বাজানোর পর মন বেশ মজে যায়, মনে হয় আরও জোরে জোরে বাজাই।

বাদ্যযন্ত্র বাজানোর এবং গানের সঙ্গতের ব্যাপারে কথিত আছে যে, শিক্ষানবিশদের এ ব্যাপারে সুরের দেবতার আশীর্বাদ আছে, যাতে তারা নিজেরা বেসুরো বাজালে বা বেসুরো গাইলেও তাদের নিজের কানে সেটা ধরা না পড়ে বরং মধুর শোনায়। তা না হলে নতুন আনাড়ি শিক্ষার্থীরা কখনও গান শিখতে বা বাজনা বাজানো শিখতে চাইবে না। নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে পেরে সংগীতের সাধনা থেকে বিরত হবে, কিংবা সুরচর্চা ছেড়ে দেবে।

তা এই বেসুরো গান বা বাজনা যে গাইছে বা বাজাচ্ছে তার কানে সুমধুর শোনালেও তার প্রতিবেশীদের, তার বাড়ির লোকজনের কথা একবার ভাবুন।

তবু বেসুরো গান সাধা সহ্য করা যায়, কিন্তু যতই সুরেলা ও মধুর হোক না, গান যদি অসময়ে বেজায়গায় উচ্চনাদে গীত হয়, সে অনেক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে।

আমার এক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর বাড়িতে পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটিই গান প্রায় সাতদিন ধরে মাইকে সজোরে বাজানো হয়েছিল এবং সেই গানটি হল, 'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ভরা।' একটি শিশুর মুখেভাতের উপযুক্ত গানই বটে। আসলে গান বাজানো হচ্ছে তো হচ্ছেই—কী গান, কেন গান, অন্যদের অসুবিধে হচ্ছে কি না কে খেয়াল করে, কে তোয়াক্কা করে!

সম্প্রতি মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট মাইক বাজানোর ব্যাপারে কয়েকটি নির্দেশ জারি করেছেন।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনগামী জাহাজে এক ভয়াবহ শব্দ বিপর্যয়ে পড়েছিলেন। স্কুলপাঠ্য রচনায় শ্রীকান্ত উপন্যাসের সেই অংশটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাঙালি পাঠকের সুপরিচিত। তবুও শব্দদূষণসূত্রে কিঞ্চিৎ প্রক্ষিপ্ত অংশ স্মরণ করা যেতে পারে:—

...একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছল, যাহার সঙ্গে তুলনা করি এমন অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যতবড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে তো সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে...

...কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চিনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুরব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে। এ মহাসংগীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে...

...মহাকবি শেক্সপিয়ার নাকি বলিয়াছেন, সংগীতে যে মুগ্ধ না হয় সে খুন করিতে পারে—কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায় এমন সংগীতের খবর বোধকরি তাঁহার জানা ছিল না।

তবু ভাগ্য ভাল, শরৎচন্দ্রের সেই আমলে মাইক ছিল না। এই মহাসংগীত যদি মাইকে গীত হত, তা হলে কী অবস্থা হত, সেটা কল্পনা করাও কঠিন।

মহামান্য আদালত অবশ্য মাইক ব্যবহারের সময়কাল এবং শব্দাঙ্ক (অর্থাৎ কতটা জোরে মাইক বাজাবে) সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। হয়তো এতে কিছুটা সুফল পাওয়া যাবে।

কিন্তু শব্দরাক্ষস শুধু মাইকনির্ভর নয়। বাড়ির পাশের কারখানায় হাতুড়ি পেটার শব্দ আছে, টিন, ঘন্টার শব্দ আছে। মোটর গাড়ির হর্ন, সে যে কত রকমের গোলমেলে হতে পারে তার কোনও তুলনা নেই।

সর্বোপরি আছে বাজি, বোমা ও পটকা। পুজো-পার্বণে, খেলার মাঠে, বিসর্জনের ঘাটে, বিয়ের মিছিলে এবং আত্মকলহে বাজি-বোমার অফুরন্ত ব্যবহার। এগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তা না হলে রক্ষা নেই।

জামাইষষ্ঠী

কয়েকদিন আগে জামাইষষ্ঠী গেছে। কোনও পঞ্জিকা বা নতুন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার না দেখেই সেটা আমরা টের পেয়েছি। বিশেষ করে আমাদের মতো ঘরগৃহস্থী-করা গৃহকর্তারা, যারা বাড়ির বাজার এখনও নিজের হাতেই করি, প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও জামাইষষ্ঠীর ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

আমার নিজের কোনও কন্যা নেই। সুতরাং জামাতাও নেই। কিন্তু জামাতার মূল্য মোক্ষম অনুভব করি এই জষ্টি-ষষ্ঠীতে। কাটা পোনা একশো, মাংস সোয়াশো, ইলিশ দেড়শো। বেগুন-পটল পনেরো। আম-লিচু পঞ্চাশ। সামান্য তালশাঁস তিনটে পাঁচ টাকা।

এসব জিনিস আজকাল আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। তবু জামাইষষ্ঠীর অব্যবহিত পরে রাস্তাঘাটে, অফিস কাছারিতে যখনই কোনও তাঁতের ধুতি, নতুন পাঞ্জাবিপরা যুবক-বয়েসিকে দেখি, বুঝতে পারি, সেদিনের মূল্যবৃদ্ধির জন্যে ইনিই দায়ি।

একদা, বেশ বহুকাল আগে, এই শতকের অনেকদিন পর্যন্ত কলকাতার অফিস আদালত জামাইষষ্ঠীতে ছুটি থাকত। আমার আমলে দেখেছি, সেও প্রায় চার দশক হয়ে গেল। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল। জামাইষষ্ঠীর দিন অফিস খোলা, কিন্তু যারা শ্বশুরবাড়িতে ষষ্ঠীর নেমন্তন্নে যাবে তারা অফিসে একবার এসে হাজিরা খাতায় সই করে যে-কোনও সময় চলে যেতে পারবে।

(লিখে রাখি পরে খেয়াল থাকবে না, তা ছাড়া আর কেউ লিখবে এমন ভরসা দেখছি না। শিবরাত্রির সময়েও ঠিক এইরকম হত। যারা উপোস করেছে তাদের এসেই ছুটি। শিবরাত্রির দিন ছুটি থাকত না, ছুটি থাকত পরের দিন, তার নাম ছিল বোধহয় পারণ। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসব বিধি বছর পঁচিশ আগেও চালু ছিল। বাংলা ও ইংরেজি বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভ দু'দিন করে ছুটি, এমনকী দশহরাতেও ছুটি থাকত। দুর্গাপুজোয় তো লম্বা ছুটি। আরও দুটো লম্বা ছুটি ইস্টার, গুডফ্রাইডে, বাংলা নতুন বছর ইত্যাদি মিলিয়ে এবং বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছর জুড়ে। কালীপুজো, সরস্বতীপুজো এইসব বড় বড় পুজোর পরদিন হাফ ডে বিসর্জন উপলক্ষে।

অনেক খোঁজখবর নিয়ে পুরনো নথিপত্র, খবরের কাগজ ঘেঁটে পরিশ্রম করে লেখার বিষয় এটা। পুরনো ছুটির দিনের এই নির্ঘন্টের মধ্যে, ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্যে দশহরার স্থলে পয়লা মে, চৈত্র সংক্রান্তির স্থলে পঁচিশে বৈশাখ, একটা সমাজ-চিত্র ফুটে উঠবে। কেউ চান এ বিষয়ে ডক্টরেট করতে পারেন।)

সে যা হোক, আবার জামাইষষ্ঠীতে ফিরে আসি। তার আগে জামাতা বাবাজিদের সামাজিক অবস্থানটা একটু বিবেচনা করি।

প্রথমে সেই পুরনো গ্রাম্য শ্লোকটি স্মরণ করি,

'যম জামাই ভাগনা
কেউ নয় আপনা।'

অতি বিপজ্জনক বক্তব্য এই শ্লোকের। এত আদরের কন্যা, তার বর—যতই স্নেহের পাত্র সে হোক, সে কখনও আপনজন নয়।

এই আপনত্বের বাধা ঘোচাতে একদা ঘরজামাই প্রথা চালু হয়েছিল। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বর সমেত নিজের বাড়িতেই রেখে দেওয়া।

একালে এর নমুনা অবশ্য ঘরে ঘরে। নতুন যুগের উদাহরণটি এইরকম:

এক গৃহিণী তাঁর প্রতিবেশিনীর কাছে বললেন, 'ছেলের বিয়েটা ভাল হয়নি, ছেলেটা বউয়ের কথায় ওঠে-বসে, প্রত্যেক শনি-রবিবার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। এখন যত টান শ্বশুরবাড়ির দিকে। তবে মেয়ের বিয়ে খুব ভাল হয়েছে। জামাই মেয়ের অতি অনুগত, তারই কথায় ওঠে-বসে। প্রত্যেক শনিবার-রবিবার মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আসে। বড় ভাল জামাই।'

জামাইষষ্ঠী মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গীয় অনুষ্ঠান। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা এলাকায় এই ষষ্ঠী পালিত হয়।

গ্রীষ্মকালে শুক্লপক্ষে দশহরার তিনদিন আগের এই তিথিটি। যাঁরা পঞ্জিকা মানেন, তাঁদের কাছে খুবই পবিত্র দিন। নববস্ত্র পরিধান থেকে ধান্যরোপণ পর্যন্ত সবকিছু সামাজিক অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত।

আমাদের ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গের যে অঞ্চলে আমরা বড় হয়েছি, দেখেছি এই তিথিটি আমষষ্ঠী বা অশোকষষ্ঠী রূপে পালিত হত। কিন্তু সেই অর্থে জামাইষষ্ঠীর কোনও ব্যাপার ছিল না।

বিবাহঘটিত সামাজিক দেয়াথোয়া, তত্ত্বতালাশ খুব একটা ছিল না সেই কৃষিসমাজে। এখন যেমন নববিবাহিত কন্যাদের অভিভাবকদের একটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে জামাইষষ্ঠী কিংবা পুজোর তত্ত্ব পাঠানো, সেটা আমার বাল্যকালে আমার পরিমণ্ডলে দেখিনি।

'জামাই-আদর' বলে একটা প্রচলিত কথা আছে। এ সম্পর্কে শিশু বয়সে আমরা একটা শ্লোক শুনেছিলাম, যার শেষ অংশটি সকলেই জানেন।

এই শেষ অংশটি হল 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'। পুরো শ্লোকটি হল—

হবির্বিনা হরি যাতি
বিনা পীঠেন মাধবঃ
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষ
প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

বলাবাহুল্য, এই শ্লোকটির সঙ্গে একটি কাহিনী জড়িত। যে কাহিনীটির নামকরণ করা যেতে পারে 'চার জামাতার গল্প।

চার জামাতা শ্বশুরবাড়ি এসেছেন। খুব সম্ভব জামাইষষ্ঠী উপলক্ষেই এসেছেন। জামাইষষ্ঠীতে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন হয়েছে তাঁদের। কিন্তু তারপরে আর তাঁরা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে কিছুতেই যান না।

জামাতা বাবাজীবনদের নাম যথাক্রমে হরি, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ এবং ধনঞ্জয়। এঁদের কারও কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। চমৎকার পায়ের ওপর পা তুলে, আয়েস করে শ্বশুরবাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন।

অবশেষে শ্বশুরালয়ের লোকেরা এঁদের বিতাড়নের বন্দোবস্ত করল। প্রথমে অনাদর শুরু হল। ভাত খাওয়ার পাতে ঘি দেওয়া হল না। অপমানিত বোধ করে বড় জামাতা হরি চলে গেলেন।

এরপরে খাওয়ার সময়ে পিঁড়ি দেওয়া বন্ধ হল। মেজো জামাতা শ্রীমান মাধবও বিদায় নিলেন। তখনও দু' জামাই রয়েছেন। খাওয়ার সময় তাঁদের পচা-গলা ভাত দেওয়া হল। এবার তৃতীয় জামাতা পুন্ডরীকাক্ষ শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করলেন।

কিন্তু কনিষ্ঠ জামাতা ধনঞ্জয় আর কিছুতেই যান না। তখন তাঁকে পিটিয়ে তাড়ানো হল— 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।

কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক এবং উপদেশাত্মক। এই সঙ্গে অন্য একটি কাহিনী বলছি, সেটি এত নির্মম নয়।

জামাইষষ্ঠীতে জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে পূজনীয় শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। শ্বশুরমশায় শৌখিন মানুষ। তাঁর পায়ে একজোড়া দামি এবং খুব সুন্দর চপ্পল।

জামাইকেও ধুতি-পাঞ্জাবি ইত্যাদির সঙ্গে একজোড়া জুতো দেওয়া হয়েছে। সেটা কিনতে গিয়েই শ্বশুরমশায় নিজের চটিজোড়াও কিনে এনেছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের চটিজোড়া দেখে জামাইবাবাজি মুগ্ধ। ঘুরে ফিরে চটি জোড়ার প্রশংসা করছেন। অবশেষে শ্বশুরমশাই বললেন, 'তোমার যদি চটিজোড়া এতই ভাল লেগে থাকে তুমি এ জোড়া নিয়ে নাও।'

জামাই প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছিলেন না, তবু মুখে বললেন, 'কিন্তু যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে আপনার নতুন চটিজোড়া কী হল, তা হলে কী বলবেন?'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কী আর বলব, বলব কুকুরে নিয়ে গেছে।'

আইরিশ রসিকতা

না। আর কাছাকাছি নয়। পথচলতি চুটকি, উদ্ভট শ্লোক অনেক হল। একটু বিদেশ থেকে ঘুরে আসি। আর রসিকতার খোঁজে যদি বাইরেই যেতে হয়, প্রথমে আয়ারল্যান্ডেই যাওয়া উচিত।

অবশ্য এই রসিকতাগুলোর উদ্ভব খুব সরলভাবে, হাসাহাসি করতে করতে বা হাসাহাসি করার জন্যে নয়, এগুলি মোটামুটিভাবে অসূয়াপ্রসূত।

এই রসিকতাগুলো, অধিকাংশ কেন, প্রায় সর্বাংশেই ইংরেজদের সৃষ্টি। ইংরেজরা আইরিশদের দু'চোখে দেখতে পারে না। এই রসিকতাগুলোর উদ্দেশ্য হল বোঝানো যে আইরিশরা মাথামোটা এবং ধান্দাবাজ।

বাস্তব জীবনে আইরিশমাত্রই যে সেরকম, এমন ভাবা অবশ্যই উচিত হবে না। রাজনৈতিক শত্রুতাবশত প্রতিবেশীকে ইংরেজরা এভাবে ভেবে হেয় মনে করে। সে যাক গে, আমাদের বিবেচ্য হল আইরিশ রসিকতা।

লন্ডনের এক খবরের কাগজের সম্পাদক মহোদয় আইরিশম্যান। তাঁর পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। নতুন পাসপোর্ট করাবেন। ফটো লাগবে। অফিসের ফটোগ্রাফারকে ডেকে বললেন, ফটো তুলে দিতে।

এই আদেশে ফটোগ্রাফার সাহেব একটু বেকায়দায় পড়লেন। সম্পাদক মহোদয় স্বজাতিসুলভ কাঠখোট্টা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, মুখে হাসি নেই—তার ওপরে পাসপোর্ট ফটো সবসময়েই খারাপ ওঠে। সেই ছবি দেখে সম্পাদক নিজেই খেপে উঠবেন, তখন তো আর তাঁকে বলা যাবে না, 'স্যার, আমার কোনও দোষ নেই। আমি কী করব, আপনার যেমন চেহারা তেমন ছবি উঠেছে।'

খবরের কাগজের বার্তা সম্পাদক ইংরেজ। তিনি ফটোগ্রাফারের সমস্যা শুনে বললেন, 'আপনাকে কবে ফটো তুলে দিতে বলেছে?'

ফটোগ্রাফার বললেন, 'সামনের সোমবার সকালে।'

বার্তা সম্পাদক বললেন, 'তা হলে তো কোনও সমস্যাই নেই। আজ শুক্রবার। ঠিক তিনদিন আছে। আজ একটু পরে একবার সম্পাদকের ঘরে গিয়ে যে-কোনও একটা নতুন রসিকতা শুনিয়ে দিয়ে আসুন। আপনি তো রসিক মানুষ।'

ফটোগ্রাফার বললেন, 'ওঁকে আর রসিকতা শুনিয়ে কী হবে, উনি তো আর হাসেন না।'

বার্তা সম্পাদক বাধা দিয়ে বললেন, 'হাসবেন, হাসবেন। আইরিশদের হাসতে তিনদিন লাগে, সোমবার সকালে যখন ছবি তুলতে যাবেন, দেখবেন ফিকফিক করে হাসছেন।'

এই গল্পটা সেই গন্ডারের কাহিনীটা মনে করিয়ে দিল। গন্ডারের চামড়া এত পুরু যে তাতে সুড়সুড়ি, কাতুকুতু দিলে লাগে না। একদা এক গন্ডারকে জোর করে ধরে আচ্ছা করে কাতুকুতু দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সাতদিন পরে গন্ডারটা হো হো করে হেসে উঠেছিল।

এই গল্পে আইরিশম্যানদের রসগ্রহণ ক্ষমতাকে গন্ডারের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে।

আইরিশম্যানের অপর গল্পটি একটু প্যাঁচালো। অবশ্য সেটা কোনও নির্বোধের গল্প নয়।

আদালতে এক আইরিশম্যানের বিচার হচ্ছে। সব শুনে-টুনে মাননীয় আদালত বললেন, 'আদালতের এখানে কাছাকাছি কোনও লোক আছেন, যিনি বলতে পারবেন যে আপনি একজন সৎ লোক?'

আদালতের মধ্যেই স্থানীয় থানার দারোগাবাবু ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে আইরিশম্যান বললেন, 'হুজুর, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। আমি ওঁর থানার এলাকায় থাকি।'

থানার দারোগা বললেন, 'আমি কিছু বলতে পারব না স্যার। এ ভদ্রলোককে আমি কখনও চোখেই দেখিনি।'

হাকিম সাহেব কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিবাদী আইরিশম্যান বললেন, 'তা হলে বুঝুন স্যার, দারোগাজি আমাকে কখনও চোখেই দেখেননি, আমাকে চেনেনই না। সৎ লোক প্রমাণের জন্যে আর কি সাক্ষী লাগবে, না সার্টিফিকেট লাগবে?'

অবশেষে মদ্যপ আইরিশম্যানের একটি সংক্ষিপ্ত গল্প।

গভীর রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ভদ্রলোক রাস্তার ধারের একটা ল্যাম্পপোস্ট জড়িয়ে ধরে একটার পর একটা পাক খাচ্ছিলেন। একজন সেপাই এসে তাঁকে ধরলেন, 'অনেক হয়েছে। এবার আমার সঙ্গে চল।'

আইরিশম্যান পুলিশের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'বলছেন কী সেপাইজি, দেখছেন না ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি! পাক খুলতে পারছি না!'

আইরিশ কথামালা সহজে শেষ হবার নয়। সহস্র এক রজনী না হলেও দিনের পর দিন এ রকম গল্প চালিয়ে যাওয়া যায়।

ডাবলিনের এক পানশালায় এক ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার আইরিশম্যান ঢুকে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে মাইকেল নামে কে আছ? সাহস থাকে তো এগিয়ে এসো।'

অতি রোগা ও ল্যাকপেকে দুর্বল চেহারার এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। সে বলল, 'কী হয়েছে, শুনি? আমার নাম মাইকেল।'

সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা লোকটি একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুষি মেরে মাইকেলকে ধরাশায়ী করে বলল, 'শালা, কী হয়েছে জান না? আমার নামে কী রটিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি?'

মাইকেল কিন্তু অদমিত। সে ভূমিশয্যা থেকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে লাগল।

'মার খেয়ে হাসির ব্যাপার কী হল?' গুণ্ডা লোকটি আরও ক্ষেপে গেল।

প্রহৃত ব্যক্তি অধিকতর হাসতে হাসতে বলল, 'আমার নাম মোটেই মাইকেল নয়। কেমন জব্দ! কেমন জব্দ!'

এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র একজন আইরিশম্যানের পক্ষে কাউকে এ ধরনের জব্দ করা সম্ভব।

এরপর এর চেয়েও গোলমেলে একটি ঘটনা বলি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় থানায় একটা ফোন এল, 'আমার নাম প্যাডি। আমি অমুক ঠিকানায় থাকি। আমি রাগের বশে সুইসাইড করার জন্যে একশো ঘুমের বড়ি খেয়েছি।'

সঙ্গে সঙ্গে অ্যামবুলেন্স জোগাড় করে থানা থেকে একটা জিপ প্যাডির বাড়িতে ছুটে গেল। থানার অফিসার প্রথমেই প্যাডিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কখন ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন?'

প্যাডি বললেন, 'কাল রাতে।'

থানার দারোগা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী? আপনি আজ রাতের কথা বলছেন। আজ শনিবার, আজ সন্ধ্যাতে আপনি ঘুমের ওষুধগুলো খেয়েছেন?'

প্যাডি বললেন, 'না। না। আমি গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ওষুধগুলো খেয়েছি।'

দারোগাবাবু বললেন, 'অসম্ভব। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা আপনি একশোটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে থাকলে এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন না।'

প্যাডি চিন্তান্বিতভাবে বলেন, 'তা হলে বোধহয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় খেয়েছি।'

আইরিশ কথামালার এবারের মতো শেষ গল্পটি সাদা বাংলায় বলি।

এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর পরলোকে গেছেন। চিরদিনই তাঁর টাকা-পয়সার দিকে ঝোঁক। মৃত্যুর পরেও তাঁর সে ঝোঁক কাটেনি।

সে যা হোক, পরলোকে গিয়ে যথারীতি তাঁর চিত্রগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি দেখলেন শুধু পরলোকের বাসিন্দাদেরই নয়, চিত্রগুপ্ত সেখানকার তোষাখানারও হিসাবরক্ষক, সে তো কোটি কোটি টাকার ব্যাপার।

আগন্তুক চিত্রগুপ্তকে তোষামোদ করার জন্যে বললেন, 'বহুকাল ধরে আপনি এইসব ঝামেলা নিজের হাতে সামলাচ্ছেন এটা কম কথা নয়।'

চিত্রগুপ্ত সাবেক দিনের ঝানু লোক, তিনি বললেন, 'বহুকাল, বহুকাল বলবেন না। পৃথিবীর এক লক্ষ বৎসর এখানে এক মিনিটের সমান। পৃথিবীর এক লক্ষ টাকা এখানকার এক টাকার সমান।'

ধূর্ত ব্যক্তিটি বললেন, 'পকেটে খুচরো টাকা-পয়সা কিছুই নেই। একটা টাকা ধার দেবেন?'

চিত্রগুপ্ত মুচকি হেসে বললেন, 'এ আর বেশি কথা কী! এক মিনিট অপেক্ষা করুন।'

এসব হাসাহাসির গল্প সহজে শেষ হতে চায় না, বিশেষত গল্পগুলো যখন এক শ্রেণীর লোকের বা কোনও এক জাতিগোষ্ঠীর কাল্পনিক বা অর্ধসত্য, বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা নিয়ে। যদি খুব একটা বিদ্বেষ বা নোংরা ভাব না থাকে, এসব খুচরো গল্প ভালই উপভোগ করা যায়।

প্যাডি নামক আইরিশ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে নানা কাহিনী। তাঁরই আর একটি কাহিনী ধরা যাক।

প্যাডি সাহেব একদিন নদীর তীরে প্রাতর্ভ্রমণ করছেন। এমন সময় দেখলেন সামনের ব্রিজের ওপর উঠে এক ব্যক্তি এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে নীচে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্যাডি সাহেব দায়িত্বশীল নাগরিক। তিনি নিজে ভাল সাঁতার জানেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবন্ত লোকটিকে উদ্ধার করলেন।

লোকটি তীরে উঠে প্যাডি সাহেবকে জানালেন, 'আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম। যা হোক আপনি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। আপনাকে বহু ধন্যবাদ।' এই বলে লোকটি চলে গেল।

কিন্তু কী সাংঘাতিক! একটু পরেই প্যাডি সাহেব দেখলেন সেই ব্যক্তি আবার ব্রিজে উঠে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্যাডি সাহেবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অত সহজ নয়। তিনিও আবার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে

ঝাঁপ দিলেন এবং আত্মহত্যাকারীকে পুনরায় মধ্যনদী থেকে উদ্ধার করলেন। এবারও লোকটি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

প্যাডি সাহেব সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন লোকটির দিকে। লোকটি কিন্তু এবার আর ব্রিজের দিকে এগোল না। নদীর ধারে লম্বা লম্বা গাছ আছে, সেসব গাছে অনেক মোটা মোটা লতা ঝুলছে। প্যাডি সাহেব দেখলেন, লোকটা একটা শক্ত লতা ছিঁড়ে সেটা পাকিয়ে গাছের ডালে ঝোলাল। তারপর নিজের মাথা সেই লতার ফাঁসে গলিয়ে ঝুলে পড়ল।

নদীর ধারে প্রাতর্ভ্রমণকারী প্যাডি সাহেবের মতো অনেকেই ছিল। এই দৃশ্য চোখে পড়তে তারা ছুটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ব্যক্তিটির অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, সে মরে গেছে।

আজ ভ্রমণকারীরা কেউ কেউ ইতিমধ্যে দেখেছিলেন যে পরপর দু'বার প্যাডি সাহেব লোকটিকে জল থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁরা স্বভাবতই এবার প্যাডি সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি জলে ডোবা থেকে এত কষ্ট করে বাঁচালেন, আর এত কাছে ছিলেন, গলায় ফাঁস দেওয়ার সময় লোকটাকে থামালেন না?'

প্যাডি সাহেব বললেন, 'আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি জলে ভিজে গেছে বলে নিজেকে গাছের ডালে ঝোলাচ্ছে, রোদ্দুরে নিজেকে শুকিয়ে নেবে বলে।'

এ অবশ্য খুবই বাড়াবাড়ির গল্প। এবার শেষ করতে হয়। তার আগে দুয়েকটা আলগা গল্প বলি।

এক আইরিশ ভদ্রলোক তাঁর নাম প্যাট্রিক তাঁর বাইরের বাগানে কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ছিলেন। এ ব্যাপারে বিশেষ অভ্যেস নেই, তাই গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। পথ দিয়ে প্রতিবেশী কোহেন সাহেব যাচ্ছিলেন, তিনি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার, প্যাট্রিক সাহেব? হঠাৎ বাগানে গর্ত খুঁড়ছেন কেন?'

প্যাট্রিক সাহেব বললেন, 'আমাদের পোষা কুকুর মারা গেছে। কবর দেওয়ার জন্য গর্ত খুঁড়ছি।'

পাশাপাশি তিনটে গর্ত খোঁড়া দেখে কোহেন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক'টা কুকুর মারা গেছে?'

প্যাট্রিক সাহেব বলনে, 'ক'টা আবার? একটা। আমার তো একটাই কুকুর ছিল।'

কোহেন সাহেব গর্ত তিনটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে তিনটে গর্ত কেন?'

প্যাট্রিক সাহেব বললেন, 'প্রথমে গর্ত দুটো ছোট করে খুঁড়ে ফেলেছিলাম। আমার কুকুরটা তো বেশ বড়। তাই শেষের গর্তটা বেশ বড় করে খুঁড়লাম।'

পূজা ও রমণী

পূজা নয়, আজকাল সাধারণত পুজোই লিখি, সেটাই এখানকার রেওয়াজ। কিন্তু এই রচনায় পূজা শব্দটিই কাম্য, পূজা ও রমণী যে শুচিস্নিগ্ধ পরিমণ্ডল রচনা করে সেই জগতে পুজো শব্দটি একটু হালকা ও খেলো।

নতুন যুগের পাঠক-পাঠিকা হয়তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু আমি যে অনেককালের লোক। পূজা-অর্চনা-আরাধনার যুগের লোক। তখনও দুর্গাপূজা দুগ্‌গোপুজো হয়নি, অন্তত লেখার ভাষায়।

শুধু লেখার ভাষাই বদলে গেছে তা তো নয়। একটা মজার অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি—'পূজা ও রমণী' শীর্ষক এই সময়োচিত নিবন্ধটির জন্য যে তরুণী সাংবাদিক ফোন করেছিলেন, তাঁকে আমি ভাল করে চিনি না, তাই 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলাম। সেই নবীনা বললেন, 'আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমাকে তুমি বলবেন।'

নতুন যুগের আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু 'হায়রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল'! 'হায়রে, কবে কেটে গেছে তারাপদর কাল'!

একদা, এই তো মাত্র চল্লিশ বছর আগে, হন্যে হয়ে তরুণীদের খুঁজেছি। এই আশায় যদি কেউ আমাকে তুমি বলে! দু'-চারজন তুই বলেছে, অন্যেরা সবাই আপনি বলেছে।

এতকাল পরে কেউ বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, বামাকণ্ঠে 'তুমি' সম্বোধন শোনার জন্যে আমাকে বিয়ে করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর এখন তরুণী নিজেই উপযাচিকা হয়ে বলছেন তাঁকে তুমি বলতে।

পাঠিকা ঠাকুরানি মনে করতে পারেন 'পূজা ও রমণী' নামক নিবন্ধে এসব কী অবান্তর কথা! পূজা ও রমণীদের বদলে এ যে রমণী পূজা!

অবান্তর কথা বাদ দিয়ে তা হলে মূল প্রসঙ্গে আসি। তবে প্রথমেই সরাসরি 'পূজা ও রমণী'তে যাচ্ছি না। ধাপে ধাপে যাব।

পূজার বদলে আরম্ভ করা যাক 'পূজা সংখ্যা ও রমণী' দিয়ে। হাতের কাছে সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি পর্বতপ্রতিম পূজা সংখ্যা রয়েছে। একটার পর একটা কাগজ তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম। সেই সঙ্গে খাতা-কলম নিয়ে গুণে অঙ্ক কষে ফেললাম।

সবসমেত একশো আটাশিটি বিজ্ঞাপন দেখলাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। তার মধ্যে একশো একান্নটি রমণীমোহন। বাকিগুলি শিশু, পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি।

এরপর বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের অলংকরণ দেখলাম। স্বাভাবিকভাবেই প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র থেকে পুরুষ-চরিত্র বহুগুণ বেশি। সেই রাম লক্ষ্মণ ও সীতা, অচলা মহিম ও সুরেশের অনুপাত আজকাল আরও ছড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু শতকরা নব্বুইটি অলংকৃত চিত্রে প্রধানা একাকিনী রমণী।

দূরদর্শনের সিরিয়ালেও পূজার নানারকম বিজ্ঞাপনে রমণীই প্রধানা। শাড়ির বিজ্ঞাপনে তো মহিলা থাকবেই কিন্তু সাবান, টুথপেস্ট সবরকম প্রসাধন দ্রব্য, কাপড়কাচা সাবান, গায়েমাখা সাবান, মিলের নামী-দামি সুটের কাপড়, পুষ্টি-পানীয় ইত্যাদি প্রায় সব বিজ্ঞাপনই নারীঘটিত।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু এটুকু সংক্ষিপ্ত করে বলা যেতে পারে মহিলারা যে পূজা-মণ্ডপেও সংখ্যাগুরু হবেন সেটা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁরাই আলপনা দেবেন, ফুল চন্দন নৈবেদ্য বন্দোবস্ত করবেন। তাঁরাই ফল কুটবেন, পুজোর শেষে প্রসাদ বিলি করবেন।

ঠাকুর মশায়ের মন্ত্র উচ্চারণ যখন তুঙ্গে উঠবে তাঁরাই যথাসময়ে শাঁখ বাজাবেন, উলুধ্বনি দেবেন।

মহাষষ্ঠীর কলাবউ বরণ থেকে, অষ্টমীর সন্ধিপুজোর সমারোহ অবশেষে বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে জগজ্জননীকে কপালে সিঁদুর দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় অনুষ্ঠান—সব কিছুতেই রমণী-মহল। সেখানে পুরুষের কোনও প্রবেশাধিকার নেই।

'পূজা ও রমণী' এই দুই শব্দের অনুষঙ্গ আমাদের মনের মধ্যে একটা ছবি এনে দেয়। সেই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের একটি সর্বপরিচিত কবিতার:

'সেদিন শারদ দিবা অবসান
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া'...

কবি জীবনানন্দ 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের কথা বলেছিলেন, শ্রীমতী নাম্নী এই পূজারিনী সেই সময়কার।'

শ্রীমতীর সাজসজ্জা, অলংকার ইত্যাদি আজকাল প্লাস্টার অব প্যারিসে নৃত্যকরা দেবদেবীর যে মূর্তি মেলায়-বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিংবা 'উৎসব' চলচ্চিত্রে লাস্যময়ী নায়িকা রেখা যে রকম পোশাক পরেছিলেন—সে রকম নাও হতে পারে।

ওই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে বলি পূজা ও রমণী অথবা সরাসরি পূজারিনী বলতে যে ইমেজ আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে সেটা সাবেকি বাংলার।

বাংলা থিয়েটারে, যাত্রাগানে, সিনেমায়—এমনকী সাম্প্রতিক দূরদর্শন ধারাবাহিকে পুজার্চনার দৃশ্যে সেই রমণীটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়।

কপালে ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুর, আর চোখ দুটি টানটান। পরনে লাল পাড় তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে লাল বা সাদা শাঁখা ও কঙ্কন। হয়তো শঙ্খ বাজাচ্ছে কিংবা হাতে তাম্রপত্রে কুসুমাঞ্জলি অথবা দীপাবলী। নম্র নেত্রপাতে আবহমতী সুন্দরী আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁকে আমরা আজন্ম জানি। তাঁর মুখের আদল আমাদের খুব চেনা। আমাদের খুব কাছের, খুব ভালবাসার নিকটজনের মতো তাঁর মুখশ্রী।

সালোয়ার কামিজ, জিন্স-টপ, ফ্রক, মিডি-মিনি-ম্যাক্সির ভিড়েও তাঁকে আমরা আজও হারিয়ে ফেলিনি। সেই সুন্দরীর সঙ্গে এখনও দেখা হয়। এই পড়ন্ত বয়সে যখন আর পুরনো দিনের সঙ্গে কিছু মেলে না, যখন সবকিছুই বদলিয়ে গেছে, শুধু সেই পূজারিনীর মুখশ্রী চিরদিনের, তাঁর পবিত্র সুষমা, তাঁর স্নেহলতার কুসুম অমলিন। এখনও তাঁকে যে কোনও ভূমিকাতেই দেখি চিনতে পারি, যে কোনও পোশাকেই দেখি চিনতে পারি। প্রাচীন মন্ত্র মনে পড়ে, সেটা একটু বদল করে বলি,

'যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।'

শঙ্খধ্বনি, উলু জোকার, ঢাকের বাজনা। তারও পরে কাঁসর ঘন্টার শব্দ সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরে তখনও থাকে ধূপের ধুনোর গন্ধ, চন্দন-অগুরুর সৌরভ, ফুল-বেলপাতা-আম্রপল্লবের আবহ। সেই প্রেক্ষাপটে কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল সেই পূজারিণীর সঙ্গে দেখা হয়।

আমি বলি, 'হে চিরদিনের রমণী, আজ এই পূজার দিনে কোথায় তোমার সেই শঙ্খবালা, কোথায় তোমার সেই অলক্তরাগ?'

'আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

'...হে পূজারিণী, এ জন্মে আমি তোমার কেউ নই, অন্য জন্মে তোমার পূজারী ছিলাম।'

প্রতিযোগিতা

এ-এস-ডি-এফ-জে কোলন এল-কে-জে-এইচ। টাইপরাইটারে যাঁরা ইংরেজি টাইপ করতে পারেন তাঁরা জানেন যে ওই টাইপরাইটিং মেশিনের কী-বোর্ডে অক্ষরগুলো ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে সাজানো নয়, সেগুলো ব্যবহার ও প্রয়োজন অনুসারে ধাপে ধাপে বাঁয়ে ডাইনে সাজানো। উদ্ধৃত বর্ণগুলি মেশিনের কী-বোর্ডের একটি ধাপ। আমি কিন্তু টাইপ করতে জানি না। তবে টাইপরাইটিং শিক্ষার এই প্রথম ধাপটি আজও আমার মনে আছে, এই ৪৫ বছর পরেও। সেটা ১৯৫১ সাল। গ্রীষ্মকাল। আমি সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট বেরবে মাস তিনেক পরে। হারুমামা এসে বাবাকে বললেন, 'জামাইবাবু, খোকনকে টাইপ শিখতে বলুন। আজকালকার দিনে টাইপ শিখলে চাকরি-বাকরি পাওয়া সহজ।'

'খোকন' মানে আমি। তখন পরীক্ষা-শেষে দীর্ঘ ছুটিতে খাই-দাই, ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা কিছুক্ষণ কালীপণ্ডিতের টোলে যাই সংস্কৃত পড়তে, সেটা সংস্কৃত শেখার আগ্রহে নয়, কালীপণ্ডিত ছাত্রপ্রতি কিছু সরকারি বৃত্তি পান, তাই তাঁর সাহায্যার্থে বাবার তাগিদে সংস্কৃত শিক্ষার চেষ্টা। হারুমামার কথা বিস্তারিত বলার কিছু নেই। তিনি এই খণ্ড রচনার সূত্রপাত কাহিনীর নায়কমাত্র। আমার ক্ষেত্রে খলনায়ক। পাকিস্তানি পূর্ববঙ্গে আমাদের ছোট শহরের বাড়ির গলির মুখে তাঁর শ্বশুরবাড়ির বৈঠকখানাঘরে হারুমামা টাইপরাইটিং স্কুল করেছিলেন। 'দি গ্রেট বেঙ্গল কমার্শিয়াল কলেজ' নাকি কী যেন নাম দিয়েছিলেন সেই শিক্ষালয়ের। পরে অবশ্য, বোধহয় রাজনৈতিক কারণেই তিনি নামটা বদল করেছিলেন বলে মনে পড়ছে, বোধহয় এবার নামকরণ হয়েছিল 'টাঙ্গাইল কমার্শিয়াল কলেজ।'

তা সেই টাইপরাইটিং স্কুলে ভর্তি হয়ে আমি টাইপ শিখতে লাগলাম, বলা উচিত, প্রবল উৎসাহে টাইপ করতে শেখায় উদ্যোগী হলাম। দুঃখের বিষয়, আমার অন্যান্য বহু প্রচেষ্টার মতোই জীবনে সফল হওয়ার এই প্রচেষ্টাও অচিরেই বাধাপ্রাপ্ত হল।

তখনও টাইপশিক্ষার প্রথম দফাতেই আটকিয়ে আছি অর্থাৎ মাত্র কয়েকদিন হয়েছে। ওই সামান্য শব্দসম্ভারেই আবদ্ধ থেকে দৈনিক একশোবার গ্ল্যাড (Glad) এবং দু'শো বার স্যাড (sad) শব্দটি তৈরি করছি। তবে টাইপমেশিনগুলো ছিল ঝরঝরে, অতি রদ্দি তথা পুরনো, কোনও কোনওটি অতিকায় আয়তনের, বোধহয় টাইপরাইটার প্রচলিত হওয়ার প্রথম যুগের জার্মান মডেলের। ওই সুদূর মফস্বলে অতগুলো জরাজীর্ণ টাইপরাইটার কী করে সংগ্রহ করেছিলেন হারুমামা সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই।

এই স্যাড-গ্ল্যাড করতে করতে একদা আমার বাঁ হাতের তর্জনী জি অক্ষরটির গোল গর্তে আটকে গেল। টাইপমেশিনের ওই জি অক্ষর-সহ অন্যান্য বহু অক্ষরচিহ্ন বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। সেখানে পিচবোর্ডে এই আকারে গোল করে অক্ষর লিখে সেঁটে দেওয়া ছিল। তার ফাঁক দিয়ে আঙুল গলে যাওয়াতেই এই বিপত্তি।

আঙুল তো আটকিয়ে গেল, সে আর খোলে না। পরে সেই টাইপরাইটার শূন্যে তুলে অনেক কসরত করে তর্জনী উদ্ধার হয়। এ গল্প আর বাড়িয়ে লাভ নেই। হারুমামার স্কুলে আমার টাইপ-শিক্ষার ওখানেই ইতি। জীবনে আর টাইপ শিখিনি, টাইপ মেশিন দেখলেই এখনও কেমন একটা আতঙ্ক হয়। টাইপ না শেখায় আমার কি কোনও ক্ষতি হয়েছিল? টাইপ না শিখেই একটা জীবন, পঁয়ত্রিশ বছরের সরকারি চাকরিসহ, মোটামুটি ভালই কাটিয়ে দিয়েছি। অফিসের কাজকর্মে টাইপ করার প্রয়োজনে টাইপিস্টরা ছিলেন। আর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে টাইপ করিয়ে নিয়েছি। আগে চার আনা, ছয় আনায় হয়ে যেত, এখন গোটা পাঁচেক টাকা লাগে। আর এ রকম টাইপিস্ট কেমন সহজলভ্য, প্রত্যেক পাড়াতে, প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। আসলে আমার নিজের কোনও ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য টাইপ-শিক্ষার কথা হারুমামা বলেননি, তাঁর বক্তব্য ছিল টাইপ শিখলে চাকরি পাওয়া সোজা হবে।

এবার চাকরিটার কথা ভাবা যাক। চাকরিটা হল টাইপিস্টের চাকরি। বলতে গেলে নিয়মমাফিক ইনক্রিমেন্ট ছাড়া সারাজীবনে কোনও উন্নতি নেই। যোগ্যতার কোনও সুবিচার নেই। ইংরেজিতে যাকে 'হোয়াইট কলার জব' অর্থাৎ বাবুপেশা বলে তারই সর্ব নিম্নস্তরের জীবিকা। সারাদিন ঘাড় গুঁজে, মেরুদন্ড বাঁকা করে পরিশ্রম। নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের কোনও সুযোগ নেই। মেধা বিকাশের প্রশ্ন তো আসেই না। তা হলে ব্যাপারটা কী হল?

এক চোদ্দো-পনেরো বছরের নাবালকের মনে যে উচ্চাশার বীজটি বপন করার চেষ্টা হয়েছিল, সেই উচ্চাশাটি বস্তুত একটি টাইপিস্টের চাকরি পাওয়া।

শুধু আমার ক্ষেত্রেই এমন হয়েছিল, একথা বলতে পারব না। সেই সময়ে শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল টাইপ-স্কুল। হাজার হাজার হারুমামা লক্ষ লক্ষ নাবালককে টাইপিস্ট হওয়ার স্বপ্নে দীক্ষিত করেছিলেন। যার অন্য কিছু যোগ্যতা নেই, কোনওরকমে মাধ্যমিক পাশ করেছে, সে যদি টাইপ শিখে কাজ পায় সে তো ভালই। কিন্তু সেজন্য গলিতে গলিতে টাইপ স্কুলের দরকার নেই। অত টাইপিস্টের চাকরি সংসারে নেই, যেমন দরকার নেই অতি হাল আমলের প্রথম বর্ষায় হঠাৎ আগাছার মতো সর্বত্র গজিয়ে ওঠা কম্পিউটার শিক্ষালয়গুলোর। এত ছেলেমেয়ে কম্পিউটার শিখে কী কাজ পাবে? সম্পূর্ণ কম্পিউটার-নির্ভরশীল অফিস সারা কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে ক'টা আছে? ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবস্থা করার আর্থিক সামর্থ্যই বা কয়জনের আছে? কম্পিউটার শিখে লাভ নেই, এই বিজ্ঞানের যুগে এমন মূর্খের মতো একথা বলব না। কিন্তু যারা শিখছে, শেখার পরে দীর্ঘদিন অনভ্যাসে এবং চর্চার অভাবে তাদের অনেকেরই অধীত জ্ঞান ঝাপসা হয়ে আসবে। জীবিকার কোনও কাজে লাগবে না। এর চেয়ে অনেক ভাল হত যদি এই সময়টা তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করত। এরই পাশাপাশি অন্য আর একটি ব্যাপার এই সূত্রে ভেবে দেখা যাক। ছেলেরা মাধ্যমিক পাশ করার পরে অভিভাবকেরা ছেলেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াবেন, তা সে যে ধরনের ছাত্রই হোক। অভিভাবকবৃন্দ এ ব্যাপারে নাছোড়বান্দা। সবাই বিজ্ঞানে সুবিধা করতে পারবে না, সবাই ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হবে না, হতে পারবেও না। অথচ সাহিত্য বা দর্শন, ইতিহাস বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভাল ফল করলে জীবিকার সুবিধে হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার ক্লাসে ভর্তির জন্য কী পরিমাণ হুড়োহুড়ি হয়, তদ্বির হয়—সেটা কারও অজানা নয়। কিন্তু বছরে কতজন নতুন সাংবাদিকের চাকরি হওয়া সম্ভব? তা ছাড়া

সাংবাদিকতার ডিপ্লোমা থাকলেই সংবাদপত্র চাকরি দেয় না। আবার ডিপ্লোমা না থাকলেও সাংবাদিকের চাকরি হয়। প্রার্থীর সাংবাদিকতার যোগ্যতা আছে কিনা, সে কতটা বুদ্ধিমান, সে কেমন লিখতে পারে, সাংবাদিকতার ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে এগুলিই প্রধান বিবেচ্য। তেমনই শত শত উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী ছেলেমেয়ে ভালভাবে এম এ পাশ করার পর বছরের পর বছর এম-ফিল করছে, ডক্টরেট করছে। কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে অধ্যাপনার চাকরির চেষ্টা করছে।

ভাল ছাত্ররা গবেষণা করবে না, ডক্টরেট করবে না, অধ্যাপনা করবে না—সেকথা বলছি না। কিন্তু তাদের সকলের জন্যে অধ্যাপনার চাকরি হবে না। দূর ভবিষ্যতেও অধ্যাপনার বৃত্তি জোটা সকলের ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইতিমধ্যে ডক্টরেট বেকারের প্রজন্ম শুরু হয়ে গেছে। রসিকতা নয়, এ হল নির্মম সত্য। যত ডক্টরেট হচ্ছে তত অধ্যাপকের শূন্য পদ দেশে নেই। বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে কয়েকশো ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাশ করে, তা সত্ত্বেও তাদের সকলের জন্য অধ্যাপনার কেন, শিক্ষকতার পদও হয়তো জুটবে না। অথচ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের, জীবনবিমার প্রথম শ্রেণীর পদগুলোর জন্য পরীক্ষা রয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে এবং জাতীয় বৃহৎ ব্যবসায় সংস্থাগুলিতেও উচ্চপদে সরাসরি নিয়োগ করা হয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। তা ছাড়া রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বাৎসরিক পরীক্ষা রয়েছে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের জন্য। এম ফিল বা ডক্টরেট করতে যতটা পড়াশোনা ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম, বেশি মনোযোগী হওয়ার দরকার পড়ে না প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য।

আসলে যেটা অভাব সেটা প্রতিযোগিতার মনোভাবের। এই মনোভাব ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা উচিত। মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকেরা যতটা বিচলিত হয়ে পড়েন, তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ উদ্দীপনা যদি ছেলেমেয়ের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যাপারে দেখান, সুফল অনেক বেশি পাওয়া যাবে।

একজন উচ্চ বা মাঝারি মানের ছাত্রের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরি পাওয়া কঠিন কিছু নয়। প্রায় সব চাকরির পরীক্ষাতেই একাধিকবার, তিনবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে, ইচ্ছে করলে ঘষেমেজে ছাত্র নিজেই নিজেকে ঠিক করে নিতে পারে। তবে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, চেষ্টাও চাই। যারা চিনেবাদাম বা ত্রিফলার চাটনি বেচে, তাদের মতো সীমিত আকাঙ্ক্ষার গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকলে কোনও লাভ নেই।

কিছুকাল ধরে একটা নতুন ধরনের হীনম্মন্যতা দেখা দিয়েছে। সেটা হল ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানের অভাব বা কথা বলতে না পারা নিয়ে। স্বভাবতই যারা বাংলা স্কুল থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছয় তারা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছেলেমেয়েদের বোলচাল, চাকচিক্য দেখে একটা কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। সেই হিন্দি বলয়ে যাকে পিছড়িবর্গ না কী যেন বলে, সেইরকম একটা শ্রেণীবিভাগ আর কী! এ প্রসঙ্গ অবশ্য বহু-আলোচিত। এ বিষয়ে আমার আর আলাদা করে কিছু বলার নেই। তবে একটা ঝকঝকে নতুন গল্প বলব।

তার আগে হীনম্মন্যতার প্রসঙ্গটা একটু ছুঁয়ে যাই। প্রথমত চেহারা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামায়। তেইশ-চব্বিশ বছরের বাঙালি যুবক, সে রকম লম্বা নয়, সে রকম ফর্সা নয়, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, হয়তো গলার কণ্ঠা ফুটে আছে, হয়তো দাঁত উঁচু, সে আয়নায় দাড়ি কামানোর সময় নিজেকে দৈনিক খুঁটিয়ে দেখে, সে ভাবতেই পারে আমাকে কি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেব হিসাবে মানাবে? এই চেহারা নিয়ে পার পাব না, চাকরির পরীক্ষাতে উতরিয়ে গেলেও ইন্টারভিউয়ের সময় বাদ পড়ে যাব। যত সব বাজে চিন্তা! সিনেমায় দূরদর্শনে রাজপুরুষদের যেমন চেহারা হয়, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা পুলিশ সাহেব যেমন দেখতে হয়, তার সঙ্গে বাস্তবের তেমন মিল নেই। অধিকাংশেরই সাধারণ চেহারা, দু'-একজন সুপুরুষ বা সুন্দরী অবশ্যই

আছে, আবার মড়াখেকো চেহারার আমলারও অভাব নেই। সাক্ষাৎকারের সময় চেহারা একটু কাজে লাগে বইকি, কিন্তু সেটাই সব নয়। বুদ্ধিমান মানুষের চেহারা নিয়ে লোকে একটা খুব মাথা ঘামায় না, ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রবীণ সদস্যরাও ঘামাবেন না।

আর একটা কথা, বড় চাকরির সাক্ষাৎকার ঠিক প্রশ্নোত্তর-পর্ব নয়। এক ধরনের আলোচনা সভার মতো। যেখানে বেশি বোলচাল না দেখিয়ে একটু গোছগাছ করে কথা বলতে পারলেই বেশি উপকার। সব জিনিস জানতে হবে, জানা থাকবে এমন কোনও কথা নেই, কিন্তু যতটুকু জানা আছে সে ব্যাপারে মনের ভাব পরিচ্ছন্ন করে প্রকাশ করতে পারলে লাভ হবে।

এরপর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথায় আসি। একথা সত্যি যে, সর্বভারতীয় এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করে তাদের অনেকেই নামকরা ভাল ছাত্র। কিন্তু একথাও ঠিক যে, বহু সাধারণ বা মাঝারি মানের ছাত্র-ছাত্রীও এ রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ভাল ফল করে ভাল চাকরি পায়। সাধারণত শিক্ষাগত নিম্নতম যোগ্যতা স্নাতক হলেই চলে। সেজন্য অনার্স বা এম এ হওয়ার দরকার নেই। প্রথম শ্রেণীরও দরকার নেই। নেহাত সাদামাটা স্নাতক—যদি তার লেখাপড়ার ভিত শক্ত থাকে—ঠিক বিষয় নির্বাচন করে বি এ পরীক্ষা পাশ করার জন্য যে পরিশ্রম করেছে, সম পরিমাণ পরিশ্রম করলে ভাল ফল অবশ্যই পাবে।

এসব ব্যাপারে ভাগ্য-টাগ্য তেমন কাজে লাগে না, যা কাজে লাগে তা হল ঠিক মনোযোগ এবং তৎসহ অধ্যবসায়, সেই সঙ্গে ইংরেজিটা একটু রপ্ত করতে হবে। সেটা চলনসই হলেও চলবে। উপদেশ দেওয়া আমার ধাতে সয় না। বুঝতে পারছি বক্তৃতাবাজি বেশি হয়ে গেল। অবশেষে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো ইংরেজি মাধ্যম, যাকে বলে ইংলিশ মিডিয়াম-সংক্রান্ত একটি আনকোরা গল্প বলে এই নিবন্ধ বন্ধ করছি।

এ ভারী দুঃখের গল্প। গভীর রাতে বাড়িতে শোওয়ার ঘরের গরাদ ভেঙে চোর ঢুকেছিল। সে তার বুদ্ধিমতো নিঃশব্দে কাচ হাসিল করছিল। কিন্তু হঠাৎ দরজা ভেবে দেওয়াল আয়নার মধ্যে দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কাচ ভেঙে রক্তারক্তি হয়ে সে আর্ত চিৎকার করে ওঠে এবং তারই পরিণতিতে বাড়ির লোকদের হাতে সে বন্দি অথবা গ্রেফতার হল। থানায় ফোন করা হল, দারোগাবাবুও এলেন—

কিন্তু চোরকে দেখে সবাই তাজ্জব! এ কী রকম চোর? নওল কিশোর! রোগা ছিমছাম, অনেক পাকা চোরের এ রকম চেহারা হয়। কিন্তু এর গলায় নেকটাই। নেকটাই গলায় বেঁধে কেউ চুরি করতে বেরোয়? জেরা করে তার কাছে যা জানা গেল তা খুবই মর্মান্তিক। ছেলেটি একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ড্রপ-আউট। এখন চুরি করে বেড়াচ্ছে।

শিশুকাল থেকে সে সারাদিন টাই পরে থাকায় অভ্যস্ত। স্কুলের ইউনিফর্মে গলায় নেকটাই-সহ সাজিয়ে তার মা তাকে অতি সকালবেলায় স্কুলবাসে তুলে দিত। বিশ্বসংসার পাক খেয়ে ঘন্টা তিনেক ধরে সেই বাস স্কুলে পৌঁছত। তারপর আবার বিকেলে ঘন্টা তিনেক পাক খেয়ে সন্ধ্যায় ছেলেটি বাড়ি ফিরত, সারাটা দিন গলায় টাই শক্ত করে বাঁধা।

সেই থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। গলায় টাই শক্ত করে বাঁধা না থাকলে সে কোনও কাজ করতে পারে না, অসহায় বোধ করে। তাই চুরি করার সময়েও টাই পরে বেরিয়েছে। এই নেকটাই পরিহিত চোরের গল্প তাদের জন্য যারা ইংরিজি শিক্ষার অভাবে হীনম্মন্যতায় ভুগছে।

কিছুই আসে যায় না। চলনসই শুদ্ধ ইংরেজি রপ্ত করতে একজন স্নাতকের খুব অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। উত্তরপত্র যখন ইংরেজিতে লেখা ছাড়া উপায় নেই, শুদ্ধ ইংরেজি শিখতেই হবে। সাধারণ জ্ঞান একটু বাড়াতে হবে। এর জন্য বই না পড়ে মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়লে কাজে লাগবে। তবে প্রতিযোগিতায় সফল হতে প্রথমত চাই পরিশ্রম করার ইচ্ছা, অন্তত কয়েক মাসের জন্য। সেইসঙ্গে নৈরাশ্যের, হীনম্মন্যতার ভাব ছাড়তে হবে। তবে সবার উপরে চাই উচ্চাশা, সফল হওয়ার প্রবল ইচ্ছা।

টকটক গন্ধ

সেই এক সীতানাথ বন্দ্যো, সুকুমার রায় তাঁর ছড়ায় পাধ্যায় উহ্য রেখেছিলেন। সেই সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ।'

আকাশের গায়ে কী না জানি না, মহামহিম সুকুমার রায়ের মতো আমার কল্পনাশক্তি নেই, কিন্তু আমি জানি সব মিথ্যে কথার গায়ে টকটক গন্ধ লেগে থাকে। তাই টোপা কুলের আচার কিংবা আমের চাটনির মতো সব মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে গল্প, বানানো কাহিনী আমার এবং আমাদের ভাল লাগে।

আমাদের এবারের উপজীব্য মিথ্যে কথা, মিথ্যে কাহিনী।

নবীনা পাঠিকা, তুমি চোখ মিটমিট করে হাসছ, ভাবছ, হায়রে তারাপদ রায়, আপনি কবে মিথ্যে ছাড়া সত্যি লিখেছেন? এবার এত ভনিতা কেন?

প্রিয় পাঠিকা, আগে সাদা কথাটা বলে নিই। এত যে ভণিতা সে সবই তোমাদের জন্যে। তোমাদের মুখে সামান্য হাসি ফোটানোর জন্যই এইসব মিথ্যের বেসাতি।

সেই আদিকালে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটিমাত্র মিথ্যে কথা বলেছিলেন। সেইজন্যে তিনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেননি। সে কাহিনী তো মহাভারতের শ্রোতারা, পাঠকেরা যুগ যুগ ধরে জানেন।

আর আমার তো পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। হাজার হাজার মিথ্যে নিয়ে আমার বছরের পর বছর কারবার। বয়স বাড়ছে, এখন চিন্তা হয়, অবশেষে আমার কী হবে?

তবে একটা কথা বলি, শাস্ত্র বলেছে—অপ্রিয় সত্যি কথা বলবে না। শাস্ত্র বলেছে, মিথ্যে কথা বলবে না। আমি দেখলাম, প্রায় সব সত্যি কথাই অপ্রিয়। অবশ্য দু'-চারটে সাদামাটা কথা ছাড়া। সুতরাং শাস্ত্রসম্মতভাবে অপ্রিয় সত্য বা মিথ্যা কথা যদি না বলা যায়, তা হলে তো বোবা হয়েই থাকতে হয়।

আবার কোনওদিন মিথ্যা কথা বলিনি, কখনও মিথ্যা কথা বলি না—এসব কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করে না।

সেই ধর্মযাজকের গল্প তো সবাই জানে। সারা পৃথিবীতে, দেশে দেশে গল্পটা ছড়িয়ে পড়েছে।

ধর্মযাজক ভদ্রলোক এক রবিবার সকালে গির্জার দিকে যাচ্ছিলেন, পথে দেখেন কয়েকটি অল্পবয়েসি ছেলে রাস্তার মোড়ের একটা সুন্দর কুকুরছানা নিয়ে জটলা করছে। ধর্মযাজক দেখলেন, ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে বাজি রেখেছে, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে চমকপ্রদ মিথ্যে কথা বলতে পারে, সেই কুকুরছানাটা পাবে।

একে রবিবারের পুণ্য প্রভাত। তার ওপরে চার্চমুখী ধর্মযাজক। তিনি তো চমকে উঠলেন। তিনি বালকদের মিথ্যে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত করতে গেলেন। তাদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমরা এই অল্প বয়সে মিথ্যে কথা বলার প্রতিযোগিতা করছ! এই দেখ আমাকে—আমি বুড়ো মানুষ। আমার প্রায় সারাজীবন চলে গেল, এই জীবনে কখনও একটাও মিথ্যে কথা বলিনি।'

এর পরের ঘটনা অবিশ্বাস্য। ছেলেরা ধর্মযাজকের কথা শুনে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তারপর কুকুরছানাটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'আপনিই এই কুকুরছানাটি জিতেছেন। আপনার মতো মিথ্যে কথা আমরা কেউ বলতে পারব না।'

ধর্মযাজকের পর ভগবান প্রসঙ্গে আসি। এটি এক বুদ্ধিমান বালকের কাহিনী। যে বালক কথায় কথায় মিথ্যে বলতে ভালবাসত, নিতান্ত নির্দোষ মিথ্যে, রং চড়িয়ে বলে সে আনন্দ পেত।

বালকটি রাস্তায় একা একা খেলছিল। হঠাৎ সে ছুটে এসে বাড়িতে ঢুকল।

তার মা তাকে দৌড়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, কী হয়েছে?'

খোকা বলল যে রাস্তায় এক ভালুক দেখে সে ভয়ে পালিয়ে এসেছে। তার মা জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন যে ভালুক-টালুক কিছু নয়, একটা বড় গোছের কালো রংয়ের কুকুর শান্তভাবে রাস্তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

খোকার মা এরপর অবশ্যই খুব রাগ করলেন। তাঁর নিজের পেটের এইটুকু ছেলে এমন জলজ্যান্ত মিথ্যেবাদী হয়ে উঠছে! এটা তাঁর পক্ষে খুবই অসহ্য। তিনি ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি একটা মিথ্যুক হয়েছ। জান না ভগবান মিথ্যে কথা বলা পছন্দ করেন না! যাও ওপরে দোতলায় পুজোর ঘরে। সেখানে গিয়ে ভগবানকে বলো, ঠাকুর আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না।'

বেশ কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখে খোকা দোতলার পুজোর ঘর থেকে নেমে এল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে খোকার মনের বেশ পরিবর্তন হয়েছে এই ভেবে খোকার মা খুব খুশি। খোকা নেমে আসতে তিনি খোকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়েছিস?'

'চেয়েছি মা', 'খোকা বলল, 'কিন্তু—।'

খোকার মা বললেন, 'কিন্তু আবার কী?'

খোকা হাসিমুখে বলল, 'ভগবান বললেন, ক্ষমার কোনও দরকার নেই খোকা, অতবড় কালো কুকুরটাকে দেখে আমিও প্রথমে ভালুক ভেবেছিলাম।'

এবার মর পৃথিবীতে আসি, ধর্ম ও ঈশ্বরের কথা আপাতত থাক।

সাধারণ মানুষেরা, যারা খুব বেশি মিথ্যে কথা বলে না, কখনও বেকায়দায় পড়লে যদি মিথ্যে কথা বলে তবে সে এক ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে যায়।

রাধেশ্যামবাবু জীবনবিমা করবার জন্যে ফর্ম পূরণ করেছিলেন। সেই ফর্মে এক জায়গায় লিখতে হয়, বাবা এবং মা কে কত বয়সে মারা গিয়েছিলেন এবং কী অসুখে?

রাধেশ্যামবাবু সত্যি কথাই লিখেছিলেন। বাবা মারা যান একচল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। আর মা মারা যান চুয়াল্লিশ বছর বয়সে। মা-র ক্যানসার হয়েছিল।

জীবনবিমার এজেন্ট যাঁর মারফত রাধেশ্যামবাবু জীবনবিমা করেছিলেন, সেই ভদ্রলোক এই দেখে বললেন, 'ফর্মটা নষ্ট হল—নিন, আরেকটা নতুন ফর্ম পূরণ করে দিন। বাবা-মা অত অল্প বয়সে ওইসব অসুখে মারা গেছেন, লিখবেন না।'

রাধেশ্যামবাবু বললেন, 'কেন?'

এজেন্ট জানালেন, 'তা হলে আপনার জীবনবিমার আবেদন নাও গৃহীত হতে পারে, তা ছাড়া প্রিমিয়াম তো অনেক বেশি লাগবেই।'

রাধেশ্যাম দ্বিধাগ্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে কী লিখব?'

এজেন্ট সাহেবের সময়ের তাড়া আছে, তিনি বললেন, 'চটপট করে যা হয় একটা লিখে দিন।'

তখন রাধেশ্যামবাবু লিখলেন—'বাবা মারা গেছেন বিরানব্বুই বছর বয়সে, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে বরফ-চাপা পড়ে। আর মা মারা গেছেন পঁচাশি বছর বয়সে, প্রসূতিসদনে সন্তান হওয়ার সময়।'

এই গল্পের সারমর্ম: লোককে মিথ্যে কথা বলতে উত্তেজিত বা প্রলুব্ধ করা উচিত নয়। তবুও বিমাপ্রসঙ্গে যখন এসেছি, আরেকটি গল্প না বললেই নয়।

গল্পটি অবশ্য কুকুর নিয়ে। ক্লাবে জোর আড্ডা হচ্ছিল। আড্ডার বিষয় কুকুরের বুদ্ধি।

একেকজন একেকরকম বলছেন, যা প্রাণে আসে প্রায় তাই।

শ্রীযুক্ত কখগ বললেন যে, তাঁর মামার বাড়িতে একটা কুকুর ছিল সেটা দু'পায়ে চলাফেরা করত এবং শুধু তাই নয়, সেই কুকুরটা বুড়ো বয়সে হাঁটার সময় লাঠি ব্যবহার করত।

আরেকজন শ্রীযুক্ত চছজ বললেন, তাঁদের জেলার পুলিশকর্তা প্যাট্রিক সাহেবের একটা লেজফোলা কানঝোলা বিলিতি কুকুর ছিল, সেটা অঙ্ক কষতে পারত। বাড়ির সামনের লনে পুলিশ সাহেব একটা ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি যেই টু প্লাস টু (2 + 2) লিখতেন কুকুরটি পর পর চারবার ঘেউ ঘেউ করত, আবার টু মাইনাস টু (2 - 2) লিখলে একবারও ঘেউ ঘেউ করত না, চুপচাপ থাকত।

সেদিন ক্লাবের নৈশ আড্ডা খুবই জমজমাট। সুতরাং গল্পের গোরু উচ্চ থেকে উচ্চতর বৃক্ষে আরোহণ করতে লাগল।

অবশেষে এল হযবরল বাবুর পালা। তিনি বললেন, 'অন্যের বাড়ির কুকুরের কথা বলতে হবে না, আমার নিজের বাড়ির কুকুরের কথা বলছি।'

কে একজন বললেন, 'আপনার কুকুর আছে নাকি, কখনও দেখিনি তো।'

হযবরলবাবু চটে গেলেন গোড়াতে বাধা পেয়ে, বললেন, 'দেখবেন কী করে? আমি কি কুকুর কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই না ক্লাবে আসি?'

দু'-একজন বুদ্ধিমান সভ্য মধ্যস্থতা করে উক্ত অনুপ্রবেশকারীকে থামিয়ে দিলেন। হযবরলবাবু বিরক্তভাবে আবার শুরু করলেন, 'বছর দুয়েক আগে একবার আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছিল'...

আবার বাধা, কে যেন বললেন, 'আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছিল? কই শুনিনি তো, আপনিও বলেননি!'

এবারে সবাই হইহই করে বাধাদানকারীকে থামিয়ে দিলেন। একটু বিরতি দিয়ে হযবরলবাবু বলতে লাগলেন, 'রাত দুটো নাগাদ ঘুম ভেঙে বুঝতে পারলাম আগুন লেগেছে। ঘরভর্তি ধোঁয়া, আগুনের আঁচ। তাড়াতাড়ি আপনাদের বউদিকে ঘুম থেকে তুলে, ছেলে-মেয়ে, কাজের লোক, সবাইকে জাগিয়ে এক বস্ত্রে সবাই ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তখন খেয়াল হল, কুকুরটাকে তো সঙ্গে নিয়ে আসিনি। এমন সময় দেখি ঘরের মধ্যে ধোঁয়া আর আগুনে ভরা জানালা দিয়ে মুখে ভেজা গামছা দিয়ে জড়ানো কী একটা জিনিস নিয়ে কুকুরটা রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল। তারপর একছুটে আমার কাছে এসে লেজ নাড়তে নাড়তে মুখের জিনিসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। ভাবতে পারেন, জিনিসটা কী হতে পারে?'

সবাই প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী?'

হযবরলবাবু বললেন, 'কুকুরের মুখ থেকে ভেজা গামছায় জড়ানো জিনিসটা নিয়ে দেখি সেটা আমার বাড়ির আর জিনিসপত্রের ফায়ার ইনসিওরেন্স। অগ্নিবিমার কাগজ।'

ঘনঘন করতালির মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দ স্বীকার করলেন, হযবরলবাবুর কুকুর তথা হযবরলবাবুর এলেম আছে বটে।

পাঠিকা দেবী, ধৈর্য ধরুন। আর ঠিক একটা গল্প বাকি আছে। খুব ছোট। কিন্তু প্রকৃত মিথ্যুকের গল্প।

শহরতলির এক বাগানবাড়ির নির্জন পুকুরে এক শৌখিন মৎস্য-শিকারি লুকিয়ে মাছ ধরছিলেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁর সম্মুখীন হলেন। ভদ্রলোক মৎস্য-শিকারিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, মাছ-টাছ কিছু ধরতে পারলেন?'

মৎস্য-শিকারি বললেন, 'প্রচুর।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কী রকম?'

মৎস্য-শিকারি বললেন, 'গোটা চারেক দু'-আড়াই কেজি কাতলা, একটা শোলমাছ, প্রায় চার কেজি হবে।'

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি জানেন—আমি কে?'

মৎস্য-শিকারি হুইল গুটোতে গুটোতে বললেন, 'না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি জানেন আমি এই বাগানবাড়ির, এই পুকুরের মালিক?'

জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা হতে হতে মৎস্য-শিকারি বললেন, 'না।'

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, 'জানেন, আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট?'

দ্রুত অন্তর্হিত হতে হতে মৎস্য-শিকারি এবার নিজেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোককে, 'আপনি কি জানেন, আমি কে?'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব থমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'না। আপনি কে?'

বাগানবাড়ির দেয়াল ডিঙোতে ডিঙোতে সেই মৎস্য-শিকারি বললেন, 'আমি এই এলাকার সেরা মিথ্যুক।'

যানবাহন

বৎসরান্তে মা দুর্গা যখন পিত্রালয়ে মানে আমাদের এই মরুভূমিতে আসেন, শূন্যে উড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে আসেন না, বছর বছর বিচিত্ররকম যান ব্যবহার করেন তিনি।

পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় অর্থাৎ শারদ শুক্লাষষ্ঠীর পাতায় দেখা যাবে এ বছরে জগজ্জননী কেমন যানে আসেন। জগজ্জননীর রুচিবৈচিত্র্য একালের অতি আধুনিকাদেরও হার মানায়, তিনি প্রত্যেক বছর একইরকম যান ব্যবহার করেন না। কোনও বছর যদি ঘোড়ার পিঠে চড়ে এলেন তো তার আগের বছরের পঞ্জিকা খুললে দেখা যাবে গতবার নৌকায় এসেছিলেন আবার পরের বছরে হয়তো দেখা যাবে যে দেবী হাতির পিঠে চড়ে আসছেন।

অবশ্য এই প্রত্যেকটি যানের আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনা আছে পঞ্জিকাকারদের কাছে। সংক্ষেপে বলা যাবে ফলং মহামারী কিংবা মন্বন্তর।

আমাদের এই রম্য নিবন্ধ যানবাহন নিয়ে। এখানে অবশ্য মা দুর্গার ওইসব হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি প্রাচীনপন্থী যান নিয়ে আলোচনা করা সংগত হবে না।

যানবাহনের নানা রকমফের—জলযান, স্থলযান, আকাশযান বা বায়ুযান। ছোট ছেলে ঠাকুরদার কাঁধে চড়ে মেলায় যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোরুর পিঠে বসে বাঁশি বাজাতেন, মেয়েরা কলসি বুকের নীচে রেখে নদী সাঁতরায়—চুলচেরা বিচারে এসবই যানবাহনের পর্যায়ে পড়ে। যেমন পড়ে কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়ি, বলগা হরিণের এক্কা কিংবা খাড়া পাহাড়ের রোপওয়ের দোদুল্যমান্য চেয়ার।

আসলে যানবাহনের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তার মধ্যে লিফট বা এলিভেটরকেও ফেলা উচিত কিনা সেটাও ভাবা যেতে পারে। একটি বাচ্চা ছেলে তো নিজে ভেবেই নিয়েছিল যে লিফট স্বর্গে যায়।

ছেলেটি বাবার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। তার বাবা তাকে চৌরঙ্গিতে জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি দেখানোর পরে চৌরঙ্গি রোডের পাশে একটি বহুতল বাড়িতে

নিয়ে গিয়ে লিফটে ওঠেন। বালকটির জীবনে এই প্রথম লিফট যাত্রা। লিফট-দর্শনও তার এর আগে কখনও ঘটেনি।

সুতরাং দরজা বন্ধ করে লিফটম্যান যখন হুল-হুল করে ওপরের দিকে রওনা করিয়ে দিল, উদ্বিগ্ন বালকটি তার পিতৃদেবকে প্রশ্ন করলেন, 'বাবা কী হচ্ছে?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'আমরা ওপরে উঠছি।'

বালকটি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, ভগবান জানে তো যে আমরা যাচ্ছি।'

এই বালকটি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। মফস্বলি কৈশোর-শেষে পনেরো বছর বয়েসে আমি কলকাতায় এসে প্রথম লিফট দেখি। চড়ার সুযোগ হয় এরও দু'বছর পরে।

তবে যানবাহনের ব্যাপারে আমার বাল্য অভিজ্ঞতা খুব বর্ণাঢ্য। জলযান বলতে আমি ভেলায় চড়েছি, ডিঙিতে চড়েছি, লঞ্চে চড়েছি, স্টিমারে চড়েছি, নৌকোতে তো চড়েইছি। আর সে নৌকোও কতরকম, ঢাকাই নৌকো, গয়নার নৌকো, পানসি, বজরা—আমরা ছিলাম নৌকোর জগতের মানুষ।

শুধু নৌকো নয়, কৈশোর বয়সে আমি মোষের পিঠে চড়ে জলে ভেসেছি, ঘোড়ার পিঠে ডাঙায় ছুটেছি। স্থলযানে চড়েছি ডুলিতে, পালকিতে, গোরুর গাড়িতে, ঘোড়ার গাড়িতে। তবে কোনও সুযোগ ছিল না রেলগাড়িতে বা মোটরগাড়িতে চড়ার।

অনেকে এখনকার সময়কে বলেন অটোমোবিল সভ্যতার যুগ, যেমন প্রাচীন গ্রামীণ সময়কে কৃষি সভ্যতা বলে চিহ্নিত করা হয়।

অটোমোবিল সভ্যতার সঙ্গে এসেছে নতুন অটোমোবিল সংস্কৃতি। সাবেকি ঘর-গৃহস্থী সমাজের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। যার গাড়ি আছে সে দমদমে আর বেহালায় একই সন্ধ্যায় দুটো বিয়েবাড়ি সেরে, তারপর হাওড়ায় একটা শ্রাদ্ধবাড়ি ঘুরে তারপরেও ক্লাবে গিয়ে মধ্যরাত অতিক্রান্ত করে আড্ডা দিতে পারে। ফেরার পথে বাঁয়ে ডাইনে দু'-চারজনকে নামিয়ে দিয়েও আসে। সে আধুনিক সামাজিক জীব।

কিন্তু যার গাড়ি নেই, তার সামাজিকতা করার ঢের বাধা। এক সন্ধ্যায় একটি বিয়ের নিমন্ত্রণ সারতে ট্যাক্সি-মিনিবাসে তার কালঘাম বেরিয়ে যায়।

অনেকদিন আগে বিখ্যাত প্রবন্ধকার বিনয় ঘোষ (কালপ্যাঁচা) অটোমোবিল সংস্কৃতি নিয়ে অতি বিদগ্ধ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'কালপ্যাঁচার বঙ্গদর্শন'খ্যাত লেখকের মৃত্যুর আগে সেটিই বোধহয় শেষ রচনা।

বড় বেশি প্রবন্ধ-প্রবন্ধ হয়ে যাচ্ছে রচনাটা। হয়তো গুরুগম্ভীর হলে এডিটর সাহেব খুশি হবেন, দু'-চার পয়সা বেশি দেবেন। কিন্তু সে আমার পোষাবে না, বরং এবার একটু হালকা হই। মোটর গাড়ির দুয়েকটা পুরনো গল্প বলি।

প্রথম দুটো গল্প প্রায় একই রকম। দুটোই পুরনো গাড়ি সংক্রান্ত।

প্রথম গল্পটি এক পুরনো ফোর্ড গাড়ির সুরসিক মালিককে নিয়ে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য এক সুপ্রাচীন মডেলের ফোর্ড গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোক নাজেহাল। প্রতিদিনই গাড়িটির কিছু না কিছু অংশ খারাপ হয়। হয় স্টার্ট নেয় না, না হয় টায়ার পাঙ্কচার। কোনওদিন চলতে চলতে স্টিয়ারিং শক্ত হয়ে আটকে যায়, অন্যদিন গিয়ার গোলমাল করে। ব্যাটারি, ইলেকট্রিকের ঝঞ্ঝাট তো সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

ভদ্রলোক গাড়িটি ঘাড় থেকে নামাতে চান। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাধা দেয়, 'ও কাজ করতে যেও না—এমন বনেদি গাড়ি, ফোর্ড গাড়ি বলে কথা! এ-গাড়ি এখন কয়জনের আছে?'

কথাটা সত্যি, কিন্তু গাড়ি যে মোটেই চলমান নয়, অবশেষে বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক একজোড়া

শক্তসমর্থ ষাঁড় কিনলেন। সে দুটো গাড়ির সঙ্গে জুতে দিয়ে গাড়ি চালাবেন এই তাঁর বাসনা।

ভদ্রলোকের কান্ড দেখে বন্ধুবান্ধব হতবাক। ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন, 'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। আগে আমার ছিল ফোর্ড গাড়ি, এখন ষাঁড় জুতে সেটা হয়ে যাবে অক্সফোর্ড গাড়ি।'

এই অক্সফোর্ড গাড়ির বৃত্তান্তের মতোই করুণ এক পুরনো মরিস মাইনর গাড়ির কাহিনী। সে গল্পটাও সংক্ষেপে বলি।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, মরিস গাড়ি বিক্রি আছে। সেই গাড়ি কিনতে গিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক। অতি লজঝরে সেই গাড়িটা যথেষ্ট খুঁটিয়ে দেখার পর ক্রেতা জিজ্ঞাসা করায় বিক্রেতা বললেন, 'এটা মরিস মেজর গাড়ি।'

ক্রেতা বললেন, 'যদিও এত বেশি জোড়াতালি, ফুটোফাটা, ঝালাই—তবুও আমার তো দেখেশুনে মনে হচ্ছে এটা মরিস মাইনর।'

বিক্রেতা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। আগে মরিস মাইনরই ছিল। কিন্তু আঠারো বছর পূর্ণ হয়ে আরও আঠারো বছর হয়ে গেছে। এখনও কি মাইনর থাকবে, কবে মেজর হয়ে গেছে।'

আমি যদি বলি যে ওই গাড়িটার ক্রেতা ছিলাম আমি স্বয়ং, জানি কেউই বিশ্বাস করবেন না। আমি যদি বলি যে ওই গাড়িটা এখন লিটারে কুড়ি কিলোমিটার যায়, সেটাও নিশ্চয় অবিশ্বাস্য।

তাই বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে সত্যি কথাটা বলছি। গাড়িটা সত্যিই লিটারে কুড়ি কিলোমিটারই যায়, তবে তার মধ্যে দু' কিলোমিটার তেলে আর বাকি আঠারো কিলোমিটার ঠেলে।

যার গাড়ি যত খারাপ, যার গাড়ি যত ঠেলতে হয় তিনি চেষ্টা করেন পরিচিত অপরিচিত আপামর জনসাধারণকে লিফট দিতে, কারণ একটাই, গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ঠেলার লোক লাগবে তো!

আমার গাড়ির ব্যাপার আরও দুঃখের। একদিন বাড়ি থেকে বেরনোর সময় দেখি আমার প্রতিবেশী খুব ব্যস্তভাবে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন, নিশ্চয় খুব তাড়া আছে। আমি গাড়িটা থামিয়ে তাঁকে তুলতে চাইলাম, কিন্তু তিনি উঠলেন না, বললেন, 'হেঁটেই যাই। আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে।'

* * *

আমাদের শৈশবে বিমান এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। তখন আকাশে এত উড়োজাহাজ উড়ত না।

আমরা শৈশব থেকে কৈশোরে অতিক্রান্ত হয়েছিলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। তখন যাত্রীবাহী বিমান আকাশপথে খুব একটা দেখা যেত না, বিশেষ করে মধ্যবাংলার আমাদের সেই সমতল মফস্বলের অসীম গগনে।

প্রথম যেসব বিমান আমরা দেখি সেসবই যুদ্ধের প্লেন, বোমারু বিমান। সেগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ে যেত বার্মা সীমান্তের দিকে, সেখানে তখন জাপানিরা এগিয়ে এসেছে।

পাড়াগাঁয়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ জগৎ আন্দোলিত করে বিহঙ্গকুলকে সচকিত করে বিমানগুলি চলে যেত। নতুন প্রজন্মের বিহঙ্গেরা আকাশের বিমানকে বুঝে ও মেনে নিয়েছে, কিন্তু তখন এমন ছিল না। দূরাকাশের প্লেন পাখিদের চঞ্চল করে তুলত।

(শহরের রাস্তার কুকুর বা গোরুদের মোটর গাড়ি সম্পর্কে যেমন কোনও ভাববৈকল্য নেই, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় একটা মোটরগাড়ি ঢুকলেই কেলেঙ্কারি ব্যাপার, গোরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটছে, দলবেঁধে কুকুরকুল নিরাপদ ব্যবধানে থেকে তাড়া করছে।)

প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করি। বিমান সম্পর্কে আমাদের সহজপাঠ প্রথমভাগ ওই যুদ্ধের প্লেন বোমারু বিমান দিয়ে। গ্রামবাংলার রসবোধ সেই যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাজারেও অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সময় জনপ্রিয় গান ছিল,

'আমি বনফুল গো।'

যতদূর মনে পড়ে, 'শেষ উত্তর' সিনেমায় কাননবালার গলায় এই গানটি গাওয়া। তার চমৎকার প্যারোডি হয়েছিল,

'আমি জাপানি বিমান গো।'

পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলে সুবিধে বা লাভ নেই। নতুন যুগের একটা রসিকতা দিয়ে শুরু করি।

ব্রেকফাস্ট দিল্লিতে, লাঞ্চ কলকাতায় আর লাগেজ মাদ্রাজে। ঠাট্টাটি বিমান পরিষেবা নিয়ে।

ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন বিমানযাত্রায় যথাস্থানে মাল ফেরত পাওয়া খুব সহজ নয়। জলখাবার খেয়ে দিল্লি থেকে প্লেনে উঠলেন, লাঞ্চের সময় কলকাতায় পৌঁছালেন, কিন্তু ইতিমধ্যে আপনার লাগেজ ভুল বিমানে চলে গেছে মাদ্রাজে।

মার্কিনি রসিকতা আছে 'Two rights (= Wrights) make a wrong'। এর মানে কিন্তু এই নয় যে দুটো ঠিক বা দুটো শুদ্ধে একটা বেঠিক বা একটা ভুল। এই রসিকতা রাইট ব্রাদার্সকে নিয়ে, সেই যাঁরা প্রথম বিমান বানিয়েছিলেন, আকাশযানের আবিষ্কর্তা। মোদ্দা কথা হল, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় একটা বেঠিক জিনিস, ভুল জিনিস বানিয়েছিলেন।

ভুল-শুদ্ধ জানি না। আমি নিজে বিমানে চড়তে ভালবাসি। বিমানের বিনিপয়সায় খাবার ভালবাসি। যদিও জানি টিকিটের দামের মধ্যেই দশগুণ করে ওই খাবারের দাম ধরা আছে। অবশ্য বিদেশি বিমানে আন্তর্জাতিক যাত্রাতেই খাদ্যের মান ভাল হয়। সেও সবসময় নয়, একবার কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে বাংলাদেশ বিমানে মাত্র দুটো লজেন্স এবং এক চামচে মৌরি দিয়েছিল।

সে যা হোক, আমার প্রথম বিমানভ্রমণের হাস্যকর অভিজ্ঞতার কথা একটু বলি। এই অভিজ্ঞতার কথা আগেও কোথাও লিখেছি, তা হোক।

জীবনে সেই প্রথম প্লেনে উঠেছি, অকুস্থল দমদম বিমানবন্দর। প্লেনের দরজা বন্ধ হল, সোঁ সোঁ শব্দ করে বিমান আকাশে উড়ল, অতি দ্রুত এত উঁচুতে উঠে গেল যে আমি জানলার পাশে বসে কাচের মধ্য দিয়ে দেখছি নীচের মানুষজনকে একদম পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। পরমোৎসাহে পাশের যাত্রীকে বললাম, 'দেখুন, মানুষগুলোকে কেমন পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে!'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধুর মশায়! প্লেন এখনও ছাড়েইনি, সবে স্টার্ট নিচ্ছে। জানলায় ওগুলো সত্যিকারের পিঁপড়ে দেখছেন!'

অতঃপর ট্রেনের প্রসঙ্গ।

শিবরাম চক্রবর্তীকে মনে আছে?

বাংলা সাহিত্যের সেই অপরাজেয় হাস্যশিল্পী, যে কোনও ঘটনাকে জটিল করে তোলার সরস ক্ষমতা ছিল তাঁর।

শিবরাম চক্রবর্তীর একটি বিখ্যাত গল্পে একই ট্রেনেই একই কামরার ওপরের বার্থ এবং নীচের বার্থ দুটি দু'দিকে যাচ্ছে। একটি বোধহয় যাচ্ছে মুম্বাই, অন্যটি দিল্লি। সে যুগে শিবরাম অবশ্য লিখেছিলেন বোম্বাই।

বলাবাহুল্য, এ রকম সম্ভব নয়, আসল ঘটনা হল, এক মুম্বাই যাত্রী ভুল করে দিল্লির ট্রেনে উঠে বসেছেন। পরে যখন শুনছেন ওই কামরাতেই তাঁর সহযাত্রী দিল্লিগামী, তিনি ভাবছেন, বিজ্ঞানের কী অপার মহিমা, একই গাড়িতে ওপরের বার্থে আমি মুম্বাই যাচ্ছি, আর নীচের বার্থে ইনি যাচ্ছেন দিল্লি!

এই যাত্রীটি তাঁর অলীক ধারণা থেকে নিশ্চয় পস্তেছিলেন, কিন্তু রেলগাড়ির ব্যাপারে আরও নানাভাবে পস্তানো যায়।

টাইম টেবিলের কথাই ধরা যাক। ট্রেন কদাচিৎ ঠিক সময়ে আসে। এ শুধু আজকের কথা নয়। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পথের পাঁচালির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবধারিতভাবে সবসময় ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা দুয়েক আগে স্টেশনে চলে যেতেন। এত আগে গিয়ে লাভ কী? এ প্রশ্ন করলে বিভূতিভূষণ বলতেন, 'ট্রেন যেমন দেরি করে আসে, তেমনি আগেও তো আসতে পারে। এর তো কিছুই স্থির নেই।' এ বক্তব্য যুক্তিহীন নয়।

একদা এক মারকুট্টে প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়মিত লেট হওয়ায় রেলের হেড অফিসে চিঠি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গাড়ি যদি ঠিক সময়েই না আসে, তবে টাইম টেবিল ছাপান কেন? টাইম টেবিল বিক্রি করেন কোন কারণে, লজ্জা করে না?'

রেল কোম্পানির সুরসিক বড়সাহেব নাকি জবাব দিয়েছিলেন—

'মাননীয় যাত্রী মহোদয়,

টাইম টেবিল না থাকলে কী করে বুঝতেন যে ট্রেন লেট আছে! ট্রেন লেট করলে শুধু যে যাত্রীদের খুব অসুবিধে হয় তা নয়, রেল কোম্পানির বিপদও কম হয় না।'

একবার এক পাড়াগাঁয়ের মানুষ রেল অফিসে তাঁর গোরুর জন্য ক্ষতিপূরণ চাইতে গিয়েছিলেন।

ক্ষতিপূরণ আধিকারিক সেই ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার গোরু কি রেলে কাটা পড়েছে?'

ক্ষতিপূরণ-প্রার্থী বললেন, 'না হুজুর, আমি একজন গোয়ালা, আমার চারটে দুধেল গাই রেললাইনের পাশে আমার খেতে চরছিল, আপনার রেলগাড়ি এত আস্তে আস্তে চলছিল যে প্যাসেঞ্জাররা ঘটি-গেলাস নিয়ে নেমে আমার গোরুগুলোর সব দুধ দুয়ে নিয়ে গেছে।'

রেলগাড়ির গল্প একটু বেলাইনে চলে গেছে, একটু বড়ও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ট্রেন ফেল করার বৃত্তান্ত বাদ দিলে রেলগাড়ি নিয়ে কিছু লেখা অনুচিত।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে দুটি ঘটনা বলছি:

১) বাগনানের আনোয়ার হোসেন এক নম্বরের লেট লতিফ। নতুন গভর্নমেন্ট বলেছেন, ঠিক সময়ে না এলে মন্ত্রীরা হাজিরা খাতা দেখবেন। সরকারি চাকুরে আনোয়ার বিপদে পড়ে গেছেন।

বাড়ি থেকে স্টেশন প্রায় পনেরো মিনিটের হাঁটাপথ। একটা শর্টকাট আছে, তাতে পনেরো মিনিট কমে বারো মিনিট হয়। প্রথম দু'-তিনদিন আনোয়ারদা পনেরো মিনিট আগেই বের হচ্ছিলেন, দীর্ঘসূত্রী মানুষ, কিন্তু আজ দেরি হয়ে গেল।

হনহন করে স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন, সামনে ডানদিকে গোপাল চক্রবর্তীর ঢ্যাঁড়শ ক্ষেত। এটাই শর্টকাট। ঢ্যাঁড়শ গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি যেতে পারলে মিনিট তিনেক সাশ্রয় হয়।

আনোয়ারদা দেখলেন গোপাল চক্রবর্তী নিজে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ঢ্যাঁড়শ খেতে তদারকি করছেন। গোপালবাবুর কাছে গিয়ে আনোয়ারদা বললেন, 'গোপালদা, আপনি যদি বলেন আমি আপনার ঢ্যাঁড়শ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে একটু শর্টকাট করি। অফিসে যা অত্যাচার শুরু করেছে, পৌনে এগারোটার মধ্যে পৌঁছাতেই হবে। শর্টকাট করতে পারলে ন'টা পনেরোর ট্রেনটা ধরতে পারতাম।'

গোপালদা বললেন, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু একটা পাগলা ষাঁড় আমার ঢ্যাঁড়শ ক্ষেতে ঢুকেছে, সে যদি তোমাকে দেখতে পায় তা হলে হয়তো তুমি ন'টা পনেরো কেন ন'টা দশের ট্রেনটাও ধরতে পারবে আনোয়ার।'

২) অতঃপর প্রকৃত ট্রেন ফেল করার গল্প।

ভুবন অগ্রবাল, হাতে ব্যাগ, কাঁধে ব্যাগ, ঘাড়ে ব্যাগ—ছুটতে ছুটতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে সামনের চা-ওলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, রাজস্থান এক্সপ্রেস কি ধরতে পারব?'

চা-ওয়ালা বললেন, 'সেটা নির্ভর করে শুধু আপনার ওপর।'

ভুবনবাবু বললেন, 'ভাই বুঝতে পারছি না।'

চা-ওয়ালা বললেন, 'বুঝতে হবে না। আপনি দৌড়নো শুরু করেন। যদি চল্লিশ কিলোমিটার

স্পিডে দৌড়াতে পারেন সামনের স্টেশনে ট্রেনটাকে ধরতে পারবেন, দু'মিনিট আগে সেটা ছেড়ে গেছে। কিন্তু তিরিশ কিলোমিটার স্পিডে দৌড়ালে দশ-বারো স্টেশনের আগে ধরতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

আমি জন্মেছিলাম রেললাইন-বর্জিত মধ্যবঙ্গের এক প্রত্যন্ত মহকুমায়, সেইজন্যেই হয়তো এই চক্রযানের প্রতি আমার দুর্বলতা খুব বেশি।

কিন্তু শুধু আমারই বা কেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'এ প্রাণ রাতের রালগাড়ি',

এবং 'সকাল বিকেল ইস্টেশন আসি'।

আর কবির সেই হঠাৎ দেখা রেলগাড়ির কামরাতেই সম্ভব হয়েছিল একদিন।

রেলগাড়িতে শরৎচন্দ্রও অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের মহীয়সী পাত্রী রেলগাড়ির কামরা রিজার্ভ করে ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত লোকজন তুলেছিলেন, যা রেল আইনে সম্ভব নয়।

এদেশে প্রথম রেলগাড়ি চালু হওয়ার পর এক শতক বহুদিন আগে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। রেলগাড়ি আমাদের জীবনের মর্মমূলে পৌঁছে গেছে, বিমান ও অটোমোবিল আগামী শতকেও রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। একশো বছরের পুরনো বাংলা শিশু ভোলানো ছড়ায় চলে গেছে,

রেলগাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।

বিমান কিংবা মোটরগাড়ি নিয়ে এমন সর্বগামী ছড়া এখনও রচিত হয়নি, হয়তো কখনও হবেও না।

এবার অযান্ত্রিক যানবাহনের কিছু কথা বলা যেতে পারে। অনেক পুরনো গ্রাম্য শ্লোক আছে,

'পরের নায়ে গমন,
পরের হাতে ধন,
জোচ্চোরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।'

একালের নগরবাসীরা পুরো শ্লোকটা জানেন না, তবে সবাই এটা জানেন যে, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

আমরা অবশ্য এই শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে আপাতত জড়িত। 'পরের নায়ে গমন' কথাটার অর্থ একালে বোঝা কঠিন। নদীনালার দেশে নৌকোই যেখানে প্রধান যান, সেখানে যার নিজের নৌকো নেই, তাকে অন্যের নৌকোর ওপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু যার নৌকো সে যদি না যায় অথবা যাওয়ার সময় না জানায় তা হলে যাওয়া যাবে না। তাই পরের নায়ে গমনের ওপর কোনও ভরসা নেই।

তা ছাড়া পরের নায়ে যাওয়ার কিছু আনুমানিক ঝামেলাও আছে। মোটর গাড়ির মতোই অল্পজলে আটকিয়ে গেলে সে নৌকো ঠেলতে হয়, আবার বাতাস অনুকূল না হলে এবং স্রোত বিপরীতমুখী হলে গুন টানতে হয়। গুন টানা মানে নদীর পার ধরে দড়ি দিয়ে নৌকো টেনে নিয়ে যাওয়া। এ দুটোই কঠিন কাজ। অন্যের নায়ে গমনে এ দুটোর ভয় আছে।

অবশ্য ভাড়াটে নৌকোও ছিল আর ছিল গয়নার বা গহনার নৌকো। গহনার নৌকো হল

পাবলিক ভিহিকল—একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে অন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান অবদি মাথা প্রতি ভাড়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা।

এর মধ্যেও অলিখিত ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস ইত্যাদি ছিল। ভাড়া বেশি দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে যেতে চাও, সেটা প্রথম শ্রেণী। এর চেয়ে একটু কম, যদি চিতল মাছের মতো সর্বদা কাত হয়ে শুয়ে যাও। আরেকটা ছিল জুতোর বাক্সের মতো, পাশাপাশি শুয়ে যাওয়া, জোড়ায় জোড়ায়, এর মাথার দিকে ওর পা, ওর মাথার দিকে এর পা।

জলযানের প্রসঙ্গে ভেলার কথাও লিখে রাখা উচিত। আমি শুধু ভেলায় চড়েছি তা নয়, ভেলা বানাতেও জানতুম। বাড়ির কলাগাছ কেটে কয়েক টুকরো বাঁশ দিয়ে গেঁথে ভেলা বানানো হত, যেমন ভেলায় একদা বেহুলা-লখিন্দর ভেসে গিয়েছিল। ভেলায় আবার উলটো-সোজা নেই, জলের মধ্যে উলটে গেলেও কোনও অসুবিধে হয় না।

নিবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এবার জল থেকে ডাঙায় উঠি। সুন্দরবনে যেমন জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, আমাদের কৈশোরে ছিল জলে ভেলা, ডাঙায় সাইকেল।

সাইকেল-সূত্রে একটা পুরনো ঘটনা বলব। সে আমার সাইকেল চালনার গল্প নয়, সাইকেল চড়া শেখার গল্প।

আমরা সাইকেল চড়া শিখতাম বাড়ির কাছে খালের ধারে সাঁকো ঘেঁষা একটা ঢালু জায়গায়। উঁচুতে উঠে প্যাডেলে দু' পা দেওয়ার পর একটু থিতু হতেই সাইকেলের পেছনে যে ধরে থাকত সে ছেড়ে দিতেই আমিও হড় হড় করে নেমে যেতাম। শিক্ষানবিশির সময় নামার পথে মাঝেমধ্যে আছড়িয়ে পড়তাম মাটিতে।

সুবিধে ছিল, ওখানে লোকজন যাতায়াত বিশেষ ছিল না। তবে এক বুড়ির বাড়ি ছিল। বুড়ি সাঁকোর বাঁধানো দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত।

সাইকেল শিক্ষানবিশরা কখনও-সখনও বুড়িকে চাপা বা ধাক্কা দিত। বুড়ি বিশেষ কিছু বলত না। নাতির বয়সি চালকদের প্রতি তারও একটু দুর্বলতা হয়তো ছিল। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর নির্বিকার চিত্তে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়ত।

কিন্তু আমার কপাল মন্দ। আমি একই দিনে বুড়িকে পরপর তিনবার চাপা দিলাম। তৃতীয়বারে বুড়ি কপাল চাপড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, 'ওগো, তোমরা সবাই দেখে যাও গো, একই খোকা আমাকে পরপর তিনবার চাপা দিল।'

* * *

যানবাহন নিয়ে কোনও আলোচনা সহজে শেষ হওয়ার নয়। ইচ্ছে করলে হাজার পৃষ্ঠা লেখা যায়। সে যাক, যানবাহন বিষয়ে কিছু লিখলে দুর্ঘটনার কথাও লেখা উচিত। দুর্ঘটনার গল্প দিয়েই শেষ করি।

নবকৃষ্ণবাবু একটি নতুন গাড়ি কিনেছেন। কেনার পর থেকে তাঁর মনটা খুঁতখুঁত করছে। গাড়িটা কিনতে এত টাকা খরচ হল, তার ওপরে নানা খরচা তেল, মবিল, ড্রাইভার, ট্যাক্স, ইন্সিওরেন্স।

গাড়ি কেনার পনেরো দিনের মাথায় গাড়িটা একটা বড়রকম দুর্ঘটনা করে বসল। কেউ হতাহত হয়নি ভাগ্যক্রমে, কিন্তু গাড়ির দফারফা।

মনে মনে কিন্তু খুশিই হলেন নবকৃষ্ণবাবু। ঠিক করলেন ইন্সিওরেন্স থেকে পুরো টাকা নেবেন, আর গাড়ি কিনতে যাবেন না।

কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। বিমা কোম্পানি বলল, 'না, নগদ টাকা নয়—ঠিক ওই মডেলের একইরকম আরেকটা গাড়ি আপনাকে দেওয়া হবে।'

নবকৃষ্ণবাবু গভীর ধন্দে পড়েছেন। ঠিক আছে, গাড়ির বদলে গাড়ি আসবে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীরও

তো জীবনবিমা করা আছে। কোনও দুর্ঘটনায় যদি তাঁর স্ত্রী তখন মারা যান, বিমা কোম্পানি কি তা হলে একইরকম বিকল্প ব্যবস্থা করবে? তাঁর স্ত্রীর মতো একই বয়েসি একইরকম দেখতে কোনও মহিলাকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে?

রস ও রমণী

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ শেষ করার পরে নাকি রসরাজ গোপাল ভাঁড় কবিকে বলেছিলেন, 'পুঁথিটা কাত করে রাখবেন না, রস গড়িয়ে পড়ে যাবে।'

গোপাল ভাঁড় বিদ্যাসুন্দরের যে রসের কথা বলেছিলেন, দুঃখের বিষয় এই পড়ন্ত যৌবনে সেই আদিরসের আলোচনায় যাওয়ার আমার সাহস নেই; রসিকা পাঠিকা আশা করি এই সামান্য কারণে রাগ করবেন না।

আসলে এই নিবন্ধের নাম হওয়া উচিত ছিল রসিকতা ও স্ত্রীলোক। কিন্তু সে বড় কাঠখোট্টা ব্যাপার হত। তার চেয়ে 'রস ও রমণী' নিশ্চয়ই ভাল।

প্রথমেই বলে রাখি মহিলাদের রসবোধ বিষয়ে যাদের মনে ক্ষীণতম সন্দেহ আছে, আমি কোনও অর্থেই সে দলের নই। আমার অকিঞ্চিৎ হালকা লেখাগুলি যাদের ভরসায়, যাদের সহাস্য সতৃপ্ত মুখশ্রী কল্পনা করে রচনা করি সেই মাননীয়াদের সরসতা সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উঁচু।

কিন্তু আমি তো পৃথিবীর একমাত্র লোক নই, আমার আগে-পরে আমার সমান বা আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান লোক না জন্মে থাকুন, আমার কাছাকাছি বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিছু কিছু জন্মেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন খারাপ কথা বলেছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি মহিলা নন এবং তিনি এদেশীয় নন।

খারাপ কথাটা হল, 'রসবোধ? মহিলাদের?' এই দুটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের পরে তিনি যোগ করেছিলেন, 'বোধই নেই, আবার রসবোধ! শুধুমাত্র মহিলারাই কেনে টেকো সেলসম্যানের কাছ থেকে চুল ওঠা বন্ধ করার সালসা।'

আর হাতের কাছেই আমাদের রসিকরঞ্জন সভার সভাপতি প্রমদারঞ্জন বালা তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ভাই, তোমাদের বউদি, আমার ভদ্রমহিলা, সত্যিই প্রতিভাবতী, এতটা নিরেস ইচ্ছে করলে হওয়া যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা প্রয়োজন।'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার সাধনা প্রয়োজন? স্বামীর না স্ত্রীর?' তিনি থমকে গিয়ে বোকা হাসি হেসে বললেন, 'দু'জনারই।'

সুদুর প্রবাসে আমার এক ফাজিল লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার কাজ ছিল মেয়েদের কাগজে হালকা তথ্য পরিবেশন করা। তার রচনায় দেখেছিলাম, সেই নাবালক প্রতিবেদক বিখ্যাত রমণীদের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস চার অঙ্কে দেয়। যেমন ৪০-৪০-২০-৪০- অথবা ৪৮-৩৬-২২-৩২, এই মাপের শেষ তিনটি মোটামুটি চেনা, সংশয় হয়েছিল প্রথম সংখ্যাটি নিয়ে। 'ওটা আবার কী, ওটা কি মাথার মাপ।'

সেই রিপোর্টার বলেছিল, 'ঠিকই ধরেছেন, ওটা মাথারই মাপ। তবে ওটা একটু সূক্ষ্ম ব্যাপার, ফিতে দিয়ে মাথার ঘের মাপা নয়, ওটা হল ওই সব মহিলাদের আই-কিউ।'

ব্যাপারটা নিতান্তই মোটা দাগের ঠাট্টা, কারণ সাধারণ বুদ্ধির যে কোনও পুরুষ মহিলার আই-কিউ (বুদ্ধির মাপ) যেখানে একশো ও তার কাছাকাছি সেখানে প্রমত্তা যৌবনবতীদের বুদ্ধির দৌড় মাত্র চল্লিশ হতে যাবে কেন? আর রসবোধের সূত্রে বুদ্ধি ব্যাপারটা কি সরাসরি আসে? বেশি বুদ্ধির বা বেশি বিদ্যার সঙ্গে সত্যিই কি রসবোধের কোনও মিল আছে? বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী অজস্র রমণী আছেন যাঁরা কখনও হাসেন না, কোনওদিন কিছুতেই হাসার কারণ খুঁজে পান না।

এই রকম এক নিরেস বিদুষী ব্যবহারজীবিনীর জেরার ধাক্কায় আমাকে পড়তে হয়েছিল একদা। উকিল মহিলার চলন-বলন, ধারালো নাক-চোখ, শ্যাম্পুলাঞ্ছিত আতেল কেশসম্ভার, চমৎকার ইংরেজি বুকনি আদালতে তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, ইনি নিশ্চয় আমারই কোনও পাঠিকা।

মামলাটা ছিল এক পথ দুর্ঘটনার, দৈবক্রমে আমি ছিলাম সরকার পক্ষের মানে পুলিশের অন্যতম সাক্ষী। রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে পণ্ডিতিয়ার মোড়ের কাছে একটা মিনিবাস ফুটপাথে উঠে গিয়েছিল অন্য একটি মিনিবাসের সঙ্গে জীবনপণ দৌড়ে; ফলে বেশ কয়েকজন পথচারী আহত হন। একটি তাম্বুলবিপণী ধরাশায়ী হয়। ভাগ্যক্রমে কয়েক মুহূর্ত আগেই আমি ওই বিপণী থেকে তাম্বুল সেবন করে, ধীরেসুস্থে সামনে এগোচ্ছিলাম। একটু এদিক-ওদিক হলে আমারও অবস্থা কাহিল হত।

আদালতের কাঠগড়ায় কঠোর দৃষ্টি হেনে মাননীয়া ব্যবহারজীবিনী আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'মিনিবাসটা যেখানে ফুটপাথে উঠেছিল বলে বলা হচ্ছে সেখান থেকে আপনি কতদূরে ছিলেন?'

বলাবাহুল্য আমি এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, 'তিন গজ এক ফুট পৌনে আট ইঞ্চি অর্থাৎ দশমিক প্রথায় তিন মিটার পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে ছিলাম।'

ভদ্রমহিলা অতি কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমি খোলসা করে বললাম, 'মেমসাহেব, ব্যাপারটা যত জটিল মনে হচ্ছে তা নয়। আপনার আর আমার উচ্চতা যোগ করলে যা হবে, প্রায় ততটাই।'

মেমসাহেব একটুও হাসলেন না, কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত সূক্ষ্ম হিসেব পেলেন কোথায়?'

আমি হাতজোড় করে বিনীতভাবে বললাম, 'আমি অনুমান করেছিলাম, আপনি ওই দূরত্বের প্রশ্নটা করবেন। তাই সামনের দর্জির দোকান থেকে ফিতে চেয়ে নিয়ে ঠিকঠাক মেপে নিয়েছি।'

আমার আশাভঙ্গ হল। ব্যবহারজীবিনী মহোদয়া বিন্দুমাত্র হাসলেন না। কঠিনতর ইস্পাতশীতল বদনে আমাকে বললেন, 'ইয়ার্কি করবেন না। এটা আদালত, ইয়ার্কি করার জায়গা এটা নয়।'

এরই পাশাপাশি মনে পড়ছে আমার এক বান্ধবীর ছোটমাসিকে। বান্ধবীর সূত্রে আমিও তাকে ছোটমাসি বলতাম। সেই সুবাদেই ছোটমাসির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেলাম। বছর দেড়েকের মাথায় ছোটমাসি হাসপাতালে গেলেন বাচ্চা হতে। আমার সেই প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে হাসপাতালেও গেলাম নবজাতককে দেখতে।

চমৎকার ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। একমাথা কুচকুচে কালো চুল, চিকন ভুরু, আবছায়া নীল চোখ, রসুনের কোয়ার মতো স্বচ্ছ ঠোঁট।

ছোটমাসিকে বললাম, 'কী মিষ্টি ছেলে হয়েছে আপনার।'

ছোটমাসি মিটমিট করে হেসে বললেন, 'আমার ছেলে মিষ্টি হবে না তো কার ছেলে মিষ্টি হবে। জানো, আমার আর নীলকান্তের, মানে তোমার মেসোমশাইয়ের, দু'জনেরই ডায়াবেটিস, রক্তে সুগার দুশো, আড়াইশো। আমাদের বাচ্চা সুইট হবে না তো কী হবে? মেয়ে হলে মিস ইন্ডিয়া হত।'

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রমণীদের রসবোধ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ছিলেন। অনবদ্য 'পঞ্চভূত' নিবন্ধমালার কৌতুকহাস্য রচনায় পঞ্চভূতের শেষ ভূত ব্যোম বলেছিলেন, 'পুরুষ জাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা

বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা।...মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে।'

বিষয়টি হাস্যময় হলেও ব্যোমের এই বক্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা সত্যি। প্রায় সমস্ত রমণী কেন হাসেন, কী কারণে হাসেন তা যেমন বোঝা যায় না তেমনই, সন্দেহ হয়, হয়তো তাঁরা নিজেরাও কখনও কখনও জানেন না।

বহুকাল, বিশেষ করে যুবক বয়সে পা দেয়ার পর থেকে আমার নিজের কেমন যেন সব সময়েই খটকা লাগত এই ভেবে যে মেয়েরা কেন আমাকে দেখলেই হাসে। আমি সব সময়ে ভেবেছি যে আমার চেহারায়, চরিত্রে বা আচরণে এমন কী আছে যে মহিলারা আমাকে দেখে হাস্য সংবরণ করতে পারেন না।

সবাই যে হো হো করে হাসেন তা নয়। কেউ কেউ বেশ সংযমী এবং রুচিশীলা, তাঁরা ঠোঁট টিপে চোখের কোণে হাসেন, অন্যেরা হয়তো শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে হাসি গোপন করার চেষ্টা করেন।

অবশেষে অনেকদিন পরে এখন কেমন করে যেন বুঝে গেছি, আমি একা কোনও ব্যতিক্রম নই, ওঁরা সকলকে দেখেই হাসেন। আমি একটি বেগুনি রঙের ফুলপ্যান্ট পরে একদিন আড্ডায় গিয়েছিলাম, বান্ধবী এবং বন্ধুপত্নীরা আমার রুচি দেখে হাসাহাসি করলেন।

পরেরবারে সাদা প্যান্ট পরে গেলাম, তাঁরা আমি বেগুনি প্যান্টটা পরে আসিনি বলে হাসলেন। এটা আমার ক্ষেত্রে এঁরা যেমন করলেন, আরও দশ জনের ক্ষেত্রেও তাই করে থাকেন, এই ধারণা আমার মনে এখন বদ্ধমূল হচ্ছে।

আমার স্বর্গতা জননীও ছিলেন সদাহাস্যময়ী। তিনি সদাসর্বদা কারণে-অকারণে হাসতেন। অত্যন্ত সব তুচ্ছ কারণে আমাদের পুরনো বাড়ির খোলা বারান্দায় আমার পিসিদের সঙ্গে, পরে কাজের লোক অথবা প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। মাছের ঝোলে নুন দিতে ভুলে যাওয়ার মধ্যে অথবা নতুন গামছা ধোয়ার সময় সমস্ত রং উঠে গেলে এবং সেই রং গায়ে মুখে লেগে গেলে এত কী হাসির ব্যাপার ছিল, আজও ভাবি।

আমার এক বাল্যসখী নিরন্তর হেসে যাচ্ছেন। তাঁর জীবনে শোক-দুঃখ, ঝড়-ঝাপটা আর দশজনের চেয়ে কিছু বেশিই এসেছে। অনেক দুঃখের দুর্দিনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তিনি আর কিছু না হোক অন্তত ম্লান হেসেছেন।

এসব হাসির জাত আলাদা। আমাদের এই নাতিশীতোষ্ণ রচনায় এসব কথা কেন যে এল, বরং রমণীয় রসিকতায় ফিরে যাই।

সেই মহিলাটির কথা নিশ্চয় সবাই জানে, যিনি আয়নার সামনে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে ছিলেন, খুব সম্ভব নিজেরই রূপে মোহিত হয়ে, কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'এটা কী করছেন?' তিনি বিলোল হাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, 'ঘুমোলে আমাকে কেমন দেখায় তাই দেখছি।'

আর এক রমণীর কথা বলি। তিনি উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের এক থিয়েটার হল থেকে নাটকের মধ্যপথে দ্বিতীয় অঙ্কের বিরতির পরে উঠে আসেন। সম্ভবত তাঁর ভাল লাগেনি নাটকটা। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'এই দুর্মূল্যের বাজারে পনেরো টাকা দামের টিকিট, নাটকটা অর্ধেক দেখে উঠে এলে?'

তিনি বললেন, 'আবার দু'সপ্তাহ পরে যাব!'

'এই নাটক দেখতে আবার দু'সপ্তাহ পরে?'

আমি অবাক হলাম। তিনি মৃদু হাস্যে থিয়েটারের প্রোগ্রামটি এগিয়ে দিয়ে এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন, সেখানে বড় অক্ষরে লেখা আছে 'দ্বিতীয় অঙ্ক বিরতি। তৃতীয় অঙ্ক দুই সপ্তাহ পরে।'

আর একটা বাজে গল্প বলি।

এক উত্তুঙ্গ নৈশ সমাহারে সেদিন গিয়েছিলাম। আজকাল এসব পার্টিতে ঘুরেফিরে একটি সোনালি দরজা এবং তার বাস্তুকার শ্রীযুক্ত বিক্রম শেঠ নামে এক যুবকের কথা ওঠে। দেখা যায় সবাই তাকে চেনে, সবাই তার বই পড়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে, যেমন হয়, বিক্রম শেঠ থেকে আলোচনা ইঙ্গভারতে পৌঁছাল, তারপর সুড়সুড় করে সেই অপূর্ব অপশ্চিম কিপলিং সাহেবে।

আমাদের ঠিক পাশেই সেই সময় একদল মহিলা এবং পুরুষ কী সব উলটোপালটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পরে জেনেছিলাম তাঁরা ব্যায়াম, শরীরচর্চা, ওজন কমানো ইত্যাদি ঐহিক বিষয়ে তর্ক করছিলেন। এই পরবর্তী জটলায় এক মহিলা প্রক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। বেশ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী চেহারা।

আমার অপরিচিতা তিনি, কিন্তু আমাদের মধ্যে এসে তিনি কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, এতে আমার একটু অস্বস্তি হল, আমি তাঁকে আলাপে প্রবৃত্ত করার জন্যে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিপলিং আপনার কেমন লাগে?'

আগের আলোচনার সুইমিং, জগিং, স্কিপিং তখনও বোধহয় মহিলার মাথায় ছিল, নাকি আমার সঙ্গে তিনি চরম রসিকতা করলেন, আমাকে সুললিত ইংরেজিতে বললেন, 'দুঃখিত। বলতে পারব না। আমি কোনওদিন কিপল করিনি। (I have never kippled)।' আমি খুব হেসেছিলাম সেদিন, যদিও মহিলা সত্যি কী বলতে চেয়েছিলেন তা আজও জানি না।

পুনশ্চ : অনেকদিন আগে সেই চিন-ভারত সংঘর্ষের যুগে কোথায় যেন অন্য এক আড্ডায় কথায় কথায় এক পরমা সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'রেড চায়না (Red China, লাল চিন) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?' তিনি সুরঞ্জিত ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্ফুরিত করে খুব ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'তা খারাপ নয়। তবে টেবলক্লথটা সাদা না হলে বড় ক্যাটকেটে দেখায়।'

অনুভব অথবা ভাল লাগা

সখি, অনুভব কাকে বলে এ বিষয়ে আমার কাছে কেন জানতে চাইছ? বিদ্যাপতি নামে এক চিরদিনের কবি লিখেছিলেন, 'সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।' বিদ্যাপতি যে অনন্ত অনুরাগ, অসীম ভাল লাগার কথা বলেছিলেন, যে অমোঘ বেদনা আমাদের সামান্য না পাওয়াকে চিরন্তনের মর্যাদা দেয় এই তরল, ক্ষণজীবী রচনায় সেই অমৃত রস পানের, অনুভবের কথা কেন? ভাল লাগার কথা কেন?

একটা গল্প বলে বিষয়টাকে একটু হালকা করে নিই। এই চিরদুঃখিনী মহানগরীর এক বাসিন্দা, আমাদেরই মতো তাড়িত, ক্লিষ্ট, জীর্ণ এক নাগরিক জুতোর দোকানে জুতো কিনতে যান। রং, চামড়া, ডিজাইন বেশ খুঁটিয়ে পছন্দ করার পরে এবং পায়ে দিয়ে যথার্থ ফিট হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে ভদ্রলোক দোকানদারকে বললেন, 'বাঃ চমৎকার। এবার এই জুতো জোড়া

রেখে দিন, এটা লাগবে না। ঠিক এই রকম, এই রঙের এক সাইজ কম নম্বরের জুতো এক জোড়া দিন।'

দোকানদার বললেন, 'সাইজ কম কেন? জুতো কি অন্য কারও পায়ের জন্যে?' ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না। আমার জন্যেই জুতো কিনছি।' বিস্মিত দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না?' দোকানদার বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে এক সাইজ কম মাপের জুতো কেনার ব্যাপারটা তাঁর মোটেই বোধগম্য নয়।

বর্ষার দুপুরবেলা এমনিতেই কেনা-বেচা কম, তা ছাড়া কয়েকদিন ধরে প্যাচপেচে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জুতোর দোকানে ক্রেতা বলতে ওই ভদ্রলোক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন দোকানদার নিজে। নতুন খদ্দের এই মুহূর্তে আসার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং কম সাইজের জুতোর এই আশ্চর্য এবং অভিনব খরিদ্দারের কাছে কারণটা জানতে দোকানদার উৎসাহী হলেন।

ক্রেতা ভদ্রলোক যা বললেন তা অবশ্য খুব অবান্তর নয়। ভদ্রলোক সকালে ঘুম থেকে উঠে দুধের ডিপোতে যান দুধ আনতে। সেখানে কখনও হাঁটুজলে, কখনও বৃষ্টিতে আবার অন্য ঋতুতে কোনও কোনও দিন বেশ বেলা পর্যন্ত রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে কখনও দুধ পান, অধিকাংশ দিন পান না। শূন্য বোতল হাতে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন গ্যাস ও কেরোসিনহীন কয়লার ধোঁয়াভর্তি রান্নাঘর থেকে গৃহিণী যে অভ্যর্থনা জানান তা শুনে মনে হয় যেন দুধটা তিনি ইচ্ছা করেই আনেননি অথবা বোতলের দুধ স্বার্থপরের মতো একা একা রাস্তায় পান করে শূন্য বোতল নিয়ে বাড়ি ঢুকেছেন। এদিকে কাল সারারাত লোডশেডিং ছিল, অসহ্য গরম এবং তীক্ষ্ণ মশার অত্যাচারে দুর্বিষহ রাত্রি গেছে। এখন সকালে কলে এক বিন্দু জল নেই। এর পরে আছে সাংঘাতিক বাজার, ভিড়ের ট্রামের রুদ্ধশ্বাস পাদানিতে অফিস যাত্রা, সেই ট্রাম বেলাইন, অফিস লেট, উপরওলার তিরস্কার। যে অফিসে তিনি কাজ করেন সেখানে তাঁকে ক্যাশ কাউন্টারে বসতে হয়। সেখানে খুচরোর অভাব, পাবলিকের বদমায়েশি, কটূক্তি, অশ্লীল গালাগাল এবং কখনও কখনও প্রহারের চেষ্টা।

ভদ্রলোক সময় পেয়ে এবং মনের মতো শ্রোতা পেয়ে জুতোওলাকে তাঁর দৈনন্দিন গ্লানির ফিরিস্তি প্রাঞ্জলভাবে বোঝালেন। দোকানদার তো বাইরের পৃথিবীর লোক নন, তিনি এসব সমস্তই জানেন, মোটামুটি এসব ঝামেলা তাঁকেও নিত্য পোহাতে হয়। তবে কখনও পর পর এভাবে সময়ানুযায়ী তালিকা করে ভেবে দেখেননি। কিন্তু তা হলেও এর সঙ্গে কম সাইজের জুতো কেনার সম্পর্কটা কী তিনি ধরে উঠতে পারলেন না। যাই হোক, তিনি উঠে গিয়ে আগের ফিট হওয়া মাপের চেয়ে এক সাইজ কম মাপের জুতোজোড়া নামিয়ে এনেছেন। বহু কষ্টে ক্রেতা ভদ্রলোক জুতোজোড়া পায়ে গলালেন। একেবারে পায়ে চেপে বসে গেছে, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

দোকানদার এতক্ষণে ধরে নিয়েছেন তাঁর এই ক্রেতা বেচারি নিতান্ত পাগল, হয়তো এবার বলবে যে এই দুর্দিনে সামান্য দু'-এক টাকা দাম বাঁচানোর জন্য তিনি এক সাইজ কম মাপের জুতো খরিদ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু দোকানদারকে স্তম্ভিত করে খদ্দের ভদ্রলোক যা বললেন, তাতে তাঁকে পাগল বলে কার সাধ্যি।

সেই ছোট জুতো পায়ে জোর করে ঢুকিয়ে প্রায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে জুতোর দোকানের কার্পেটের উপর হাঁটতে হাঁটতে ক্রেতা ভদ্রলোক দোকানদারকে বললেন, 'একবার ভেবে দেখুন তো সারা দিন কষ্ট করে এই জুতো পায়ে দেওয়ার পরে দিনের শেষে যখন এই জুতোজোড়া পায়ের থেকে খুলব তখন কী আরাম, কী শান্তি, কী আনন্দ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুধ বন্ধ, জল বন্ধ, লোডশেডিং, গাদাগাদি ভিড়, গর্ত, কাদা, গালাগাল, অপমান। কোথাও তো এক বিন্দু শান্তি, এক বিন্দু সুখ নেই, শুধু আপনার এই এক সাইজ কম মাপের জুতোজোড়াই আমাকে সন্ধ্যাবেলা এক

দণ্ড শান্তি, এক দণ্ড সুখ দেবে।' শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যায় জীবনানন্দ দাশের ক্লান্ত পথিককে শ্রীমতী বনলতা সেন দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলেন। সে বহুকাল আগের কথা। কলকাতার এই দুঃস্থ নাগরিক, বিদ্যাপতি বা জীবনানন্দ দাশের কাছে কিছু পাওয়ার অধিকারী নন, শুধু টাইট জুতো পা থেকে খুলে ফেলার যে আনন্দিত অনুভব, সারা দিনের শেষে এক দণ্ড সেটুকু পেলেই তিনি খুশি।

অনুভব বিষয়টি খুব জটিল এবং আপেক্ষিক। একই মুহূর্তে একই বিষয়ে আপনার অনুভব আর আমার অনুভব এক রকম নাও হতে পারে।

আমার এক বাল্যবন্ধু, অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা গত বছর, অনেক কথা হল, হঠাৎ সব শেষে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর লোডশেডিং ভাল লাগে না?' শুধু এই নয় আমার এক বউদির জুতোর কালির গন্ধ ভাল লাগে, আমার ভাইয়ের পোড়া পাঁউরুটি খেতে ভাল লাগে, এমনকী নিশুতি মধ্যরাতে দূরের বাড়ির ছাদে হুলো বেড়ালের লড়াই দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে পরম আনন্দের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন যে ভদ্রলোক তাঁকেও চিনি। মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, ভাল লাগা মানেই নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে যাওয়া। হয়তো এই চির-ছন্নছাড়া খামখেয়ালি লেখক নিজের জীবনে আবিষ্কার করেছিলেন যা কিছু ভাল লাগে সবই তাঁর নিজস্ব, নিতান্ত আপন। আমাদের সমস্ত জীবন চলে যায় সেই ভাললাগার অংশীদার খুঁজতে। সেই অমূল্য অংশীদার কখনও আমাদের বন্ধু, কখনও প্রিয়া বা জায়া, কখনও সন্তান, ছাত্র বা শিষ্য।

এক অসফল আধুনিক কবির ভাষায় ভাল আছি মানেই ভাল থাকা। সেই কবির ধারণা ছিল, যেভাবে সাদা মেঘের মধ্যে সন্ধ্যাতারা ভাল থাকে, যেভাবে সবুজ পাতার মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা ভাল থাকে হয়তো আমাদের ভাল থাকা কখনওই সে রকম হবে না। তবু যদি ভাবতে পার যে ভাল আছি, তা হলেই ভাল আছ।

রেডিয়ো

কীসে কী হয় কেউ জানে না। কোনও কোনও রহস্য চিরদিনই থেকে যায়, জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কোনও ব্যাখ্যাই তার সমাধান করতে পারে না।

দেশের বাড়িতে আমাদের একটা আদ্যিকালের রেডিয়ো ছিল। সেই রেডিয়োটা আমরা কী করে পেয়েছিলাম, কবে কোথায় কেনা হয়েছিল এসব সংবাদ অল্পবয়সে আমরা জানতে পারিনি। বড় হয়ে জেনেছিলাম সে রেডিয়োটা আমাদের কেনা ছিল না।

ধলেশ্বরী নদীতে একবার এক পাটের সাহেবের নৌকা ডাকাতেরা লুট করে। পরের দিন অতি ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকতেন, নদীর জলে রেডিয়োটা ভেসে যেতে দেখে উদ্ধার করেন। তারপর তিন বছর, অর্থাৎ যতদিন সেই ডাকাতির মামলা জেলার দায়রা আদালতে চলছিল, আমাদের বাড়ির রান্নাঘরের পাটকাঠির বোঝার নীচে লুকিয়ে রাখা হয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধের ঢের আগেকার আসল জার্মান মডেলের রেডিয়ো ছিল সেটা। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা

জলে চোবানির পর তিন বছর রান্নাঘরের জ্বালানির বোঝার নীচে থাকা সত্ত্বেও তার প্রাণশক্তি ছিল অদম্য।

ডাকাতির মামলা-টামলা মিটে গেলে প্রথম যখন সেটাকে চালু করা হল সে এক এলাহি ব্যাপার। ছাদের দুই প্রান্তের কার্নিশে দুই গগনচুম্বী বাঁশ, তার মাথায় দীর্ঘ এরিয়েল, বিশাল প্রায় আধমণি ওজনের ড্রাই ব্যাটারি। রেডিয়োটা খোলার পরে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে গোঁ গোঁ করে শেষে হুঙ্কার দিতে লাগল, আর সে কী হুঙ্কার! গোপনে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শেষের কোঠায় ঠাকুরঘরে সেই যন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু সেই হুঙ্কারে সারা পাড়া কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কিছুতেই বন্ধ করা যায় না, নব ঘোরালেও বন্ধ হয় না। শব্দ কমানোর জন্য শেষে দুটো তোশক চাপা দেওয়া হল রেডিয়োটাকে। শব্দ সামান্য কমল বটে কিন্তু ততক্ষণে পাড়ার বহু লোক আমাদের বাসায় ছুটে এসেছে। আর পুরনো তোশক ফেটে তুলো উড়তে লাগল—কোনও সুদক্ষ ধুনুরীও সে ভাবে তুলো ধুনতে পারে না।

সুখের বিষয়, পাড়ার অধিকাংশ লোকই আমাদের হিতৈষী ছিলেন। তাঁরা কী বুঝলেন কী জানি তবে তাঁদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিলেন কয়েক কলসি জল রেডিয়োটার উপরে ঢালবার জন্যে। কী করে শেষে সেদিন রেডিয়োটা বন্ধ করা হয়েছিল, এখন আর ঠিক বলতে পারব না, সেসবই আমাদের খুব ছোটবেলার কথা।

আমরা জ্ঞান হতে দেখেছি রেডিয়োটা আমাদের বাড়ির সঙ্গে, বাড়ির চরিত্রের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশ খেয়ে গিয়েছিল। সেই যে প্রথম দিন খোলার পরে বন্ধ করা হয়েছিল, তারপর আবার কে যেন কবে সাহস করে খুলেছিল আর বন্ধ করা যায়নি। সারা দিন রাত মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা একাই চলত। তখন নতুন ইলেকট্রিক এসেছে আমাদের শহরে। কী এক কৌশলে এক মফস্বল মিস্ত্রি সেই রেডিয়োটা থেকে একটা তার টেনে জুড়ে দিয়েছিল সরকারি পোস্টের সঙ্গে। সেই কারেন্টে সেই ড্রাই সেলের রেডিয়ো দিন-রাত্রি চলত। মাঝে মাঝে বিচিত্র সব রেডিয়ো স্টেশনের বিচিত্র সব কণ্ঠস্বর, হাসি-কান্না-গান শোনা যেত। যখন খুব অসহ্য হত, আমার এক কাকা, তিনিই আমাদের বাড়িতে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন, দূর থেকে একটা কাঠের ডান্ডা দিয়ে রেডিয়োর মিটারের চাকাটা একটু ঘুরিয়ে দিতেন। তাতে একটু একঘেয়েমি কেটে যেত কিন্তু রেডিয়োটা কিছুতেই বন্ধ হত না।

আসলে রেডিয়োটা বন্ধ করার সাহস কারও ছিল না। কী এক অজ্ঞাত এবং অনৈসর্গিক কারণে যন্ত্রটার দেড় গজের মধ্যে কেউ গেলে পরে তার ভিতর থেকে সেই প্রথম দিনের হুঙ্কার মুহুর্মুহু বেরিয়ে আসত, অতি দুঃসাহসী লোকেরও তাতে হৃৎকম্প হওয়ার কথা। আমার যে সাহসী কাকা মিটারের চাকা ঘোরাতেন, তিনি চাকা ঘোরাতে যাওয়ার আগে পায়ে গাম-বুট হাতে চামড়ার দস্তানা পরে নিতেন। তারপর সেই দস্তানা-পরা হাতে একবার গৃহদেবতাকে প্রণাম করে নিয়ে অতি সন্তর্পণে রেডিয়োটার দিকে এগোতেন। কখনও কখনও শনিবারের বারবেলা বা জন্মবার হলে ঠাকুমা বাধা দিতেন, কান্নাকাটিও করতেন, কিন্তু কাকা তাতে দমতেন না একেবারেই।

রেডিয়োটা থাকায় আমাদের একটা পারিবারিক সুবিধা হয়েছিল। লোভী শিশু এবং কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুর মুখ থেকে রক্ষা করে আচার ফল মিষ্টি ইত্যাদি লোভনীয় খাবার রাখবার জায়গা সব একান্নবর্তী পরিবারেই দরকার পড়ে। রেডিয়োর ঘরটা আমাদের পরিবারে এই কাজে লাগত। আমাদের এক বৃদ্ধা পরিচারিকা, কাকার অনুপস্থিতিতে, কাকার গাম-বুট ও দস্তানা পরে ওই রেডিয়োর ঘরে খাবার-দাবার রেখে আসত, ট্রেজারিতে রেখে এলেও কোনও জিনিস ওর চেয়ে সাবধানে রাখা যেত না।

দুঃখের বিষয় উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে আগস্ট বিপ্লবের সময় এই বেতারযন্ত্রটির জন্য আমরা ঘোরতর বিপদে পড়ি। পাড়ার আর দশটি বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়িও সার্চ হয়। সেই সময় রেডিয়োটি পুলিশের নজরে আসে, একজন সরল প্রকৃতির দারোগা রেডিয়োটায় হাত দিয়ে কী

দেখতে গিয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। একজন পেটমোটা সেপাই এই দেখে, 'বাপরে, মর গিয়ারে' ইত্যাদি বলে প্রাণপণ চেঁচাতে থাকে। তারপর আর যা যা কেলেঙ্কারি হওয়া সম্ভব সবই হয়।

একে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তায় জার্মান মডেল, তারও নেই লাইসেন্স, তার উপরে সরকারি তার থেকে অবৈধভাবে একটানা কারেন্ট চুরি—সেবার সেই বিপদ থেকে আমার জজ-কাকারা কী করে উদ্ধার পেয়েছিলেন, ঈশ্বর জানেন। কিন্তু রেডিয়োটা আর উদ্ধার করা যায়নি। উচ্চতর তদন্তের প্রয়োজনে সেটাকে কলকাতায় আই বি বিভাগের সদর দপ্তরে চালান করা হয়েছিল। তারপর কী হয়েছিল কেউ জানে না।

রিকশা

সবাই জানেন, রিকশা দুই রকম। টানা রিকশা এবং সাইকেল রিকশা। টানা রিকশা কলকাতায় চলে আর সাইকেল রিকশা চলে মফস্বলে, গ্রামে-গঞ্জে, ছোট শহরে।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক এই দুই জাতের রিকশার প্রভেদ খুব সামান্য নয়। যদিও সামনের সাইকেলটা বাদ দিলে দু'রকম রিকশার মধ্যে তফাত কেউ খুঁজে পাবেন না এবং সত্যি সত্যি তফাত নেইও কিছু। পার্থক্যটা আসলে গাড়ির নয়, গাড়ির চালকদের, বিশেষ করে গাড়ির চালকদের মেজাজ ও আচরণের।

টানা রিকশার চালক হলেন একটু প্রবীণ, গম্ভীর প্রকৃতির, জগৎ সংসারের সঙ্গে ঢিমে তেতালায় সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। সাধারণত তিনি প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, অবশ্য রিকশা ভাড়া ব্যতীত, রীতিমতো উদাসীন। রিকশা ভাড়া সম্পর্কেও তিনি উচ্চবাচ্য কম করেন। এবং এটাই তাঁর ব্যবসায়িক উন্নতির মূল সূত্র। তিনি সাধারণত একবার মাত্র কথা বলেন এবং সেটা রিকশা থেকে আরোহী বা আরোহিনী নামবার পর। এইবার যেখানে ষাট পয়সা তাঁর প্রাপ্য হওয়া উচিত তার বদলে তিনি দেড় টাকা দাবি করেন, বর্ষার দিনে হলে আড়াই টাকা। যেহেতু ভাড়া আগে ঠিক করে নেয়া হয়নি, সওয়ারি অপ্রস্তুত। অধিকাংশ সময়েই সওয়ারি হয়তো আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে দেখা করতে এসেছেন কিংবা বড় রাস্তার মোড়ে নেমেছেন, রিকশাওয়ালা ক্রমশই তাঁর ভাগলপুরি ভাষণভঙ্গি কঠিন ও অপমানজনক করে তুলেছেন—এ অবস্থায় একটা কিছু দিয়ে সওয়ারি সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় কোনও কোনও সওয়ারি তাঁর পছন্দমতো ও বিবেচনাসই ভাড়া রিকশার উপর দিয়ে দ্রুত পদে পালিয়ে যান। কিন্তু রিকশাওয়ালা সেই পলায়মান সওয়ারির দিকে তাকিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন তাতে গায়ে মানুষের চামড়া থাকলে জ্বালা ধরে এবং ফিরে এসে পালটা জবাব দিতে ইচ্ছে হয় এবং রিকশাওয়ালা এটাই চান। কারণ ততক্ষণে তিনি তাঁর চারপাশে বেশ একটা মাঝারি আকারের জনতা সংগ্রহ করে ফেলেছেন এবং সবাইকে জ্ঞাপন করা শুরু করেছেন তাঁর প্রতি এই অবিচারের নির্মম কাহিনী।

সাইকেল রিকশা চালকের প্রকৃতি কিন্তু এ রকম নয়। অধিকাংশ সাইকেল রিকশাওলাই হলেন তরুণ বা যুবা বয়সি। তাঁরা রিকশা চালাতে হিন্দি সিনেমার গান গুনগুন করেন। এমনকী কেউ বেশ উঁচু গলায় গাড়ি চালাতে চালাতে প্রাণের আনন্দে 'হম তুম এক কামরামে' কিংবা 'ঝুম পারা পার...পয়সা মিলেগা' মেজাজের সঙ্গে গেয়ে যান। আরোহীরা এ নিয়ে সাধারণত কিছু মনে করেন না। আর মনে করলেও চালকদের তাতে কিছু এসে যায় না। এই রিকশাচালকদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা মোটামুটি নিম্নবিত্ত, ভদ্র পরিবারের কেউ কেউ সামান্য বা কিছু বেশি লেখাপড়াও শিখেছেন। আমার নিজের শহরে আমার দু'জন সহপাঠী ছিলেন যাঁরা রিকশা চালাতেন। কলকাতায় টানা রিকশাওলাদের মধ্যে কিন্তু এ রকম পাওয়া যাবে না, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নিরক্ষর এবং দেহাতি। কলকাতার সঙ্গে তাঁদের চরিত্রের বা নাড়ির যোগ নেই।

কিন্তু মফস্বলে রিকশাওলা হলেন একজন প্রভাবশালী নাগরিক, শহরের মূল জীবনের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ রয়েছে। তার উত্থান-পতন আনন্দ-বিষাদের সঙ্গে তাঁরা জড়িত। তাঁরা শহরের গুনী-জ্ঞানী, চোর-বদমাস সবাইকেই এবং সবাইয়ের বাড়িঘর মোটামুটি চেনেন। কিন্তু কলকাতার রিকশাওলা বড় রাস্তার মোড় এবং বাজার ছাড়া আর কিছুই চেনেন না।

টানা রিকশার সঙ্গে সাইকেল রিকশার আরও একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। টানা রিকশা কখনও কখনও উলটে যায় কিন্তু সাইকেল রিকশা কদাচিৎ উলটোয়, যদিও কখনও-সখনও ড্রেনে বা খানাখন্দে পড়ে যায় না তা নয়।

টানা রিকশা উলটানোর ব্যাপারটি যেমন হাস্যকর তেমনিই দুঃখজনক। আমার পরিচিত অন্তত তিনটি দম্পতি টানা রিকশা উলটে পড়ে গিয়েছেন। এই তিনটি ক্ষেত্রেই অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যথেষ্ট স্থূলকায়-স্থূলকায়া। এই উলটে যাওয়ার দৃশ্যটি অদ্ভুত। আরোহী ও আরোহিনীর শরীরের যুগ্ম ওজনের চাপে হঠাৎ চলমান রিকশাচালক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং চলতে চলতে অতর্কিতে সামনের ডান্ডা ধরে শূন্যে উঠে যান এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই মুহূর্তের মধ্যে ডান্ডা ছেড়ে দিয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গে রিকশাটি উপরের দিকে একশো আশি ডিগ্রি মানে পুরো দুই সমকোণ ঘুরে সওয়ারিদের উপুড় করে মাটিতে ফেলে দেয়। সাধারণত এতে বিশেষ কোনও আঘাত লাগে না, কিন্তু পর্যুদস্ত দম্পতি মাসখানেকের জন্যে একটু কাবু হয়ে পড়েন, তাঁদের নৈতিক সাহস কমে যায়।

সাইকেল রিকশা ঠিক এভাবে কখনও উলটোয় না। তবে তার দ্রুতগতি অনেক সময় তাকে কক্ষচ্যুত করে ফেলে এবং সেটা খুব বিপজ্জনকও বটে। সাইকেল রিকশার দুর্ঘটনা প্রবণতা ভয়ংকর বেশি, সাইকেল রিকশায় আহত হননি এমন লোক দেখা যায় না। আমরা একবার একটা 'রিকশা দুর্ঘটনা দূরীকরণ সমিতি' গঠন করেছিলাম, সেই সমিতির প্রথম অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়ে আমি রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে বাঁ পায়ে একটা চোট পাই, আজও অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পা-টা টনটন করে।

পরিবার পরিকল্পনা

হালকা লেখা লিখে লিখে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে এত চপলতা পোষায়, না মানায়? অনেক ভেবেচিন্তে এবার একটা গুরুগম্ভীর বিষয় নিলাম, আরম্ভও করছি গুরুগম্ভীর ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত ও বহুপঠিত 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কালিদাসের কালের সূত্রে বলেছিলেন, 'সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে।' এই উদ্ধৃতি হয়তো এই আলোচনায় একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে কিন্তু কথাগুলি মনে পড়ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ পাঠ করে। এবার ভাষণ দিতে এসেছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার জন একল্‌স। প্রসঙ্গক্রমে জন একল্‌স একটি মারাত্মক বক্তব্য রেখেছেন, যার সারমর্ম হল, সভ্যতা ক্রমশ ইতর হয়ে যাচ্ছে, যাবে। যারা বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান তাদের ছোট পরিবার, সুখী পরিবার, তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম। ক্রমশ তুলনামূলকভাবে পৃথিবীতে রুচিশীল, শিক্ষিত লোকের বংশধরদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর বেড়ে যাচ্ছে অশিক্ষিত, রুচিহীন মানুষদের জগৎ। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে, গ্রন্থ থেকে, শিক্ষকদের কাছ থেকে যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার পাই তারই নাম সভ্যতা। সভ্যতার প্রগতিশীল বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমৃদ্ধ হয় মানবসমাজ। দুঃখের কথা, যে লোকেরা এই বিধানকে গতিশীল রাখে তারা ক্রমশ অতি নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। স্থূল রুচি, কৃষ্টিহীন মুখে ভরে যাচ্ছে মানবসমাজ।

স্যার জন একল্‌সের বক্তব্যটি আপাতদৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল মনে হতে পারে। তিনি বলেছেন এখন আর এভলিউশন নয়, ডিভলিউশন হচ্ছে, 'ইতর হইয়া আসিতেছে।'

এই জটিলতার কচকচির মধ্যে না থেকে বরং একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাই। 'কয়েকজন' নামে আমাদের একটা পারিবারিক পত্রিকা ছিল, তার দেখাশোনা করতাম আমি কিন্তু কোনও এক নৈতিক কারণে আইনত সম্পাদনা করতেন শ্রীযুক্তা মিনতি রায়, আমার বিদুষী স্ত্রী। পত্রিকার প্রিন্টার্স লাইনে ছাপা হত, সম্পাদিকা মিনতি রায়। সম্পাদিকা সমেত পত্রিকার যথাসাধ্য দেখাশোনা করেন তারাপদ রায়।

তা, এই কাগজের জন্য আমরা মাঝে মধ্যে এদিকে ওদিক দু'-একটা বিজ্ঞাপন চাইতাম। একবার একটি আবেদন পাঠিয়েছিলাম পরিবার পরিকল্পনা দফতরে। দফতরের আধিকারিক আমাদের একটি সাইক্লোস্টাইল করা সার্কুলার লেটার পাঠান এর উত্তরে। তাতে প্রশ্ন ছিল, বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে কিন্তু তার আগে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে আমরা কী করেছি সেটা জানাতে হবে।

প্রশ্নটি পেয়ে প্রথমে আমাদের বুঝতে একটু সময় লাগে। তারপর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বোঝামাত্র আমরা পরিবার পরিকল্পনা প্রচারাধিকারিককে জানাই যে, আমাদের 'কয়েকজন' কাগজে মোটামুটি নিয়মিত লেখক ষোলো-সতেরোজন। এঁদের মধ্যে সুধেন্দু মল্লিক এবং শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দু'জন ব্যাচেলার আর তা ছাড়া শরৎ-বিজয়া মুখোপাধ্যায় কবি-দম্পতি এবং সম্পাদক-সম্পাদিকা সমেত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, সন্দীপন, নবনীতা, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার বা প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এই রকম ষোলোজন লেখক-লেখিকা, তাঁদের অর্ধাঙ্গ বা অর্ধাঙ্গিনী নিয়ে মোট আটাশজন; এঁদের সকলের ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ মোট তেরোজন। আমরা বিনীতভাবে জানতে চেয়েছিলাম, পরিবার পরিকল্পনার জন্যে অথবা নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে

পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন পেতে গেলে আমাদের কী করতে হবে। এই তেরোটি শিশুকে কি গলা টিপে মেরে ফেলব। বলা বাহুল্য আমাদের এই চিঠির জবাব বা পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন কিছুই আসেনি অতঃপর।

গত সপ্তাহেই পাকিস্তানের কথা লিখেছি। পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের কথা এবারেও উল্লেখ করতে হচ্ছে। সংবাদটি কতটা নির্ভরযোগ্য জানি না, কিন্তু দেশি, বিদেশি প্রায় সমস্ত কাগজে দিন দশেক আগে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানে নাকি পরিবার নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এ নাকি ভীষণ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। অথচ এদিকে কিন্তু পুরনো পূর্ব পাকিস্তানে, এপাশের বাংলাদেশে একেবারে অন্যরকম। বাংলাদেশ বেতার খুললেই শোনা যায় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে জোর প্রচার। এর অধিকাংশ কথিকা খুবই চমৎকার, রুচিশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত। এপারে আকাশবাণীতে বা দূরদর্শনে এই রকম মানের কথিকা বিরল। সে যা হোক, পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি জিনিস ভেবে দেখার আছে। এখন যেমন অধিকাংশ শিক্ষিত দম্পতির একটি করে সন্তান, এটা যদি তিন পুরুষ ধরে চলে তা হলে কাকা, মামা, পিসি, মাসি থাকবে না। এখনই প্রায় বিরল হয়ে এসেছে এইসব ডাইনোসরেরা। খুড়তুতো কাকা কিংবা মাসতুতো মাসি এখনও জুটছে কিন্তু এক পুরুষ পরে খুড়ো না থাকায় খুড়তুতো থাকবে না, মাসি না থাকায় মাসতুতো থাকবে না। উঠে যাবে ভাইফোঁটা, মুখেভাতে মামার হাতে পায়েস খাওয়া। 'তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই' কথার কোনও মানেই থাকবে না। কোনও শিশুকেই শেখানো যাবে না,

'মাসি পিসি বনগাঁবাসী
বনের ধারে ঘর,
কখনও মাসি বলে না যে
খই মোয়াটা ধর।'

কারণ সে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে মাসি পিসি কী? বোঝানোও যাবে না কারণ মাসি-পিসি না থাকলে এ ব্যাপারটা বোঝানো সোজা নয়। মাসি থেকে যাবে শুধু পুরীধামে জগন্নাথদেবের আর কাকা থাকবে বায়সকণ্ঠে।

কাল্পনিক হাহুতাশ থাক। সত্যি কথাটা হল, অধিক সন্তানের ব্যাপারটা আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি সমাজে আর মোটেই পছন্দসই নয়। আমার এক প্রতিবেশী একটি ছোট কারখানা চালাতেন। সেখানে নয়টি ছেলেমেয়ের বাবা জগমোহন নামে এক কর্মচারীকে তিনি করুণাবশত পঁচিশ টাকা বেশি দিতেন মাস মাইনেয়। একদিন অন্য এক কর্মচারী প্রতিবাদ করে, 'আমি আর জগাদা একই কাজ করি। জগাদাকে পঁচিশ টাকা মাইনে বেশি দেন কেন?' আমার প্রতিবেশী মালিক ভদ্রলোক থমকে গেলেন, যে ছেলেটি প্রতিবাদ করছে সে বেশ ভদ্র ও শিক্ষিত, তাকে বোঝানোর জন্যেই খুব গুছিয়ে নরম করে বললেন, 'তুমি রাগ করছ কেন? তোমার মাত্র একটি মেয়ে আর তোমার জগাদার নয়টি ছেলেমেয়ে। সামান্য পঁচিশটি টাকা ওকে বেশি দিয়েছি।' এই ব্যাখ্যা উত্তেজিত প্রতিবাদকারীকে মোটেই দমিত করল না বরং সে বলে বসল, 'দেখুন দাদা, আমার ধারণা ছিল আপনি আমাদের মাইনে দেন আমরা এখানে যা উৎপাদন করি সেইজন্যে। বাড়িতে যা উৎপাদন করি সে জন্যে নয়।'

পরিবার পরিকল্পনার শেষ গল্পটি এক বধির বৃদ্ধকে নিয়ে। পথের পাশে বৃদ্ধের বেগুন ক্ষেত, তাতে কিছু কিছু বেগুন ফলেছে। বেগুন ক্ষেতের পাশে সরকারি রাস্তা। সেই রাস্তার ধারে একটা কালভার্টের উপরে বৃদ্ধ বেগুন ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। এক আধা-পরিচিত ব্যক্তি পথ দিয়ে যেতে যেতে নমস্কার করে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল?' বৃদ্ধ ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'মোটামুটি।' লোকটি তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে, জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেপিলে, মানে ছেলেপিলে কেমন আছে?' বুড়োর মন তখন বেগুন ক্ষেতে নিমগ্ন। বুড়ো ভাবলেন বেগুনের কথা জিজ্ঞেস

করছে, বললেন, 'তা, আর তেমন কই। কখনও দুটো-চারটে হয়, কখনও আট-দশটা।'

প্রশ্নকারী পথিক স্তম্ভিত, 'এত ছেলেপিলে? সে কী? এদের মানুষ করবেন কী করে?' বৃদ্ধ বললেন, 'আর বোলো না। দু'-একটাকে ভেজে খাই। দু'-একটাকে পুড়িয়ে খাই, বাকিগুলি সেদ্ধ। কোনওরকমে চলে যায়।'

স্তম্ভিত পথিক হাঁ করে সেই বেগুন-বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমরাও হাঁ করে তাকিয়ে আছি মানবসমাজের দিকে। কবে শুরু হবে পুড়িয়ে, সেদ্ধ করে, ভেজে খাওয়া।

মহিলা মহল

মহামতী গ্যেটের মূল ফাউস্ট অধ্যয়ন করার বা তার কোনও তর্জমাও পাঠ করার মতো সময় বা শিক্ষা কিছুই আমার জীবনে ঘটেনি। তবু আমার পল্লবগ্রাহী স্বভাবের দৌলতে ফাউস্ট কাব্যের দ্বিতীয়াংশের শেষ পঙ্‌ক্তিটি আমি মূল ভাষায় উদ্ধৃত করতে পারি সামান্য একটি রেফারেন্স বুকের সৌজন্যে। বইটির নাম আমি প্রকাশ করব না কিন্তু যাতে মনের মধ্যে কেউ কোনও সন্দেহ পোষণ করতে না পারেন তাই লিখে রাখছি : 'Das Ewig-Weibliche Zeiht uns hinan,' আমার অক্ষম ভাষায় যার বাংলা পদ্যান্তকরণ হল :

'আমাদের উর্ধ্বমুখী টেনে তোলে অনন্ত রমণী।' গ্যেটে সম্ভবত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনও তরুণীর কাছ থেকে এমন চিঠি পাননি যেখানে লেখা আছে,

প্রিয় তারাপদ,

তুমি নিশ্চয় রাগ করনি। কাল রাতে মনে হয়েছিল রাগ রাগ ভাব তোমার। তুমি কেন বুঝেও বুঝছ না আমি যখন বলছিলাম যে আমি কথা দেব বলে যখন বলেছি আর কথা দেব না যখন বলেছি দু'-সময়েই আমি মনে মনে যা ভেবেছি তার কোনওটাই তুমি সম্ভবত যে কারণে রাগ করেছ তা নয়। নাকি তুমি সেই যে আমি বলে ফেলেছিলাম বলব না অথচ শেষ পর্যন্ত বলি বলি করে বলেও ফেললাম, হয়তো তার জন্যেও। এই রকম একটি সাড়ে তিন পৃষ্ঠা চিঠি যার ভাবার্থ সাহিত্যে লেটার বা ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্রও করে উঠতে হিমসিম খাবে সে রকম কোনও পত্রপ্রেরিকার সঙ্গে গ্যেটে সাহেবের পরিচয় থাকলে তিনি হয়তো উর্ধ্বমুখী না হয়ে সমতল রমণীদের কথা বলতেন।

মেয়েদের কথা বোঝা খুব কঠিন। তাঁরা কখন কোন কথা বলেন তাঁরা নিজেরাও জানেন না। যে দ্রুত মসৃণতায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তাঁরা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বিচরণ করেন তার সঙ্গে বৃক্ষশীর্ষে শাখামৃগের সাবলীলতাই শুধু তুলনীয়।

কে যেন বলেছিলেন, মহিলারা শেষ কথাটি বলুন তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শেষ দশ হাজার কথাটি তাঁরাই বলবেন এটা আমি মানতে পারি না। তা এই ভদ্রলোক মানুন আর না মানুন কথা তাঁকে শুনতেই হবে। তবে এক ভদ্রলোক, আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী, বলেছিলেন যে, 'দেখুন, আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমাদের বাড়িতে সব তর্কে শেষ কথাটি আমিই বলি।'

বিশেষ জোরাজুরি করার পর অবশ্য ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে শেষ কথাটি হল, 'ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি,' অথবা সংক্ষিপ্ত সংস্করণে 'নিশ্চয়' অথবা 'হ্যাঁ'।

তবে আমার এক বন্ধুপত্নী একবার আমাকে ধমকে বলেছিলেন, 'আপনারা আমাকে যত দজ্জাল ভাবেন তত দজ্জাল মোটেই আমি নই। আমার বর আমার সব কথায় হ্যাঁ বলবে তা আমি মোটেই চাই না। আমি যখন না বলব তখন হ্যাঁ বললে আপনাদের বন্ধুকে ছাড়ব না, তখন তাকেও না বলতে হবে। বুঝতে পারছেন, আপনারা যে রটিয়ে বেড়ান আপনাদের বন্ধু আমার সব কথায় হ্যাঁ বলেন, সেটা ঠিক নয়।'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁর বিখ্যাত পুত্রের নিকট পত্রমালায় বলেছিলেন, 'আসলে মেয়েরা হল বড় সাইজের শিশু।' মাত্র দু'দিন আগে দুই প্রৌঢ়ার আলোচনা শুনে এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্যটি আবার আমার ফিক করে মনে পড়ল।

প্রথমা প্রৌঢ়া দ্বিতীয়া প্রৌঢ়াকে এক বিয়েবাড়িতে এক প্রান্তে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে, মানে আশেপাশের পঞ্চাশজনের কর্ণগোচর করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীরে উইগ পরেছিস নাকি?' দ্বিতীয়া ব্রীড়াবনতা মুখে সামনের দিকে ঘাড়টা দুলিয়ে স্বীকার করলেন, 'ঠিক তাই।' প্রথমা বললেন, 'কী চমৎকার মানানসই হয়েছে, বুঝতেই পারা যাচ্ছে না যে উইগ পরেছিস!'

নিম্ন আদালতের এক দুঁদে বিচারক জীবিকাসূত্রে একদা আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন; তিনি অপর একটি মহিলাজনিত দুর্বলতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন। ভদ্রলোক অবশ্য বানিয়ে গল্প বলায় আমার চেয়েও ওস্তাদ ছিলেন (ভাগ্যিস লেখেন না তা হলে আমার সর্বনাশ হত)। তাঁর কোর্টে একবার নাকি এক বিগতযৌবনা মহিলা সাক্ষী বলেছিলেন যে তাঁর বয়েস ছত্রিশ বছর কয়েক মাস। মহামান্য বিচারক বলেছিলেন, 'মাত্র ছত্রিশ বছর?' সাক্ষী মহিলা বললেন, 'এবং আর কয়েক মাস।' বিচারক বললেন, 'ঠিক করে বলুন। আপনি আদালতের হলফ নিয়ে বলছেন, অযথা মিথ্যা বলবেন না।' মহিলা বললেন, 'ওই তো বললুম ছত্রিশ বছর কয়েকমাস।' বিচারক বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর নোট নিতে নিতে বললেন, 'ছত্রিশ বছর কয় মাস?' এই সরাসরি সরল প্রশ্নে কাজ হল, মহিলা আমতা আমতা করে বললেন, 'ছত্রিশ বছর দুশো তিন মাস।'

বয়েসের ব্যাপারটা অবশ্য মহিলাদের চিরন্তন দুর্বলতা। বাংলা সিনেমার কিংবদন্তী যুগের নায়ক তাঁর প্রবীণা চিত্রসঙ্গিনীকে আলতো করে বলেছিলেন, 'তুমি আর বদলালে না, সেই প্রথম কুড়ি বছর আগে তোমাকে যেমন দেখেছিলাম, আজও কিছু বদলাল না।' নায়িকা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নাকি বলেছিলেন, 'বদলাল না? তুমি কী বলছ? এই কুড়ি বছরে আমার বারো বছর বয়েস বেড়ে গেল।'

এই সূত্রে অন্য এক অবিখ্যাত মহিলার কথা মনে পড়ছে। তার এক যমজ ভাই ছিল। ভাই আর বোনে শুধু ছেলে আর মেয়ে এইটুকু পার্থক্য, বাকি সব নাক চোখ মুখ, কথাবার্তা, চালচলন সব এক রকম। আরেকটা আশ্চর্য পার্থক্য, ভাইয়ের বয়েস যখন বিয়াল্লিশ যমজ বোনের বয়েস আঠাশ— চৌদ্দো বছরের ফারাক।

সে যাক, মেয়েদের বয়েস নিয়ে খুব বেশি আলোচনা ভাল নয় আর চিরচলিত কথাই তো রয়েছে যে মেয়েদের বয়েস নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, শুধু জেনে রাখো যে কোনও মহিলা জীবনের শ্রেষ্ঠ পনেরো বছর হল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত।

সুতরাং মহিলাঘটিত অন্য একটি কাহিনী বলি। আমার এক প্রতিবেশীর শ্যালক, নববিবাহিত। থাকে দক্ষিণ কলকাতায়, কাজ করে ব্যারাকপুরের কাছে এক কারখানায়। একদিন কারখানার কী একটা কাজে তার একটু দেরি হচ্ছে, সে বেশ চেষ্টা করে বাড়িতে ফোন করল। বাড়িতে নববধূ একাই থাকে, কাজের মেয়েটি সন্ধ্যার সময় বাড়ি চলে যায়। নতুন বউ ফোন ধরেছে, দু'-একটা সুখের কথা হচ্ছে, হঠাৎ হাত থেকে টেলিফোন পড়ে যাওয়ার শব্দ এবং বউয়ের আর্ত চিৎকার, 'ওরে বাবারে মেরে ফেললে রে...' শুনে ফোনের প্রান্তে স্বামী বেচারা চমকিয়ে উঠলেন। এরপর হাজার চেষ্টা করেও ফোনে ফোনে জোড়া লাগল না।

হতবিহ্বল দুশ্চিন্তিত স্বামী দু'-একজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ করলেন। ব্যারাকপুর থেকে বাড়িতে ফিরতে অন্তত দেড়-দু' ঘণ্টা লেগে যাবে, আর এই ভর সন্ধেয় রাস্তায় বা রেলগাড়িতে কোথায় কী জট পাকিয়ে আছে, বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, সব ভেবেচিন্তে থানায় ফোন করা ঠিক হল। আর তা ছাড়া থানার পাশেই বাড়ি, ইচ্ছে করলেই ছুটে যেতে পারবে পুলিশ।

সুখের বিষয় এক চেষ্টাতেই থানা পাওয়া গেল এবং থানার বড়বাবুই ফোন ধরলেন। বড়বাবু প্রতিবেশী হিসেবে মাসখানেক আগেই এ বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। ফোনে এই দুঃসংবাদ শোনামাত্র তিনি বিশাল বপু এবং অকৃত্রিম সাহসে ভর করে চারজন সশস্ত্র সেপাই ও একজন ছোটো দারোগাকে নিয়ে ছুটলেন অকুস্থলে।

গিয়ে দেখেন বারান্দায় একটা বড় টেবিলের এক প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তখনও বধূটি থরথর করে কাঁপছেন। তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই তিনি বললেন, 'এখনও ঘরের মধ্যে রয়েছে।' বড়বাবু জানতে চাইলেন, 'ঘরের মধ্যে কোথায়?' বধূটি বললেন, 'বলা কঠিন। খাটের নীচে হতে পারে, আলমারির পিছনে হতে পারে এমনকী আলনার আড়ালেও থাকতে পারে।'

বড়বাবু দু'জন সেপাইকে উদ্যত রিভলবার নিয়ে ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে নির্দেশ দিয়ে মহিলার কাছে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা কী রকম দেখতে?' নববধূটি চোখ বড় বড় করে বলল, 'কী রকম আর? আর দশটা ইঁদুর যেমন দেখতে হয় সেই রকমই।'

লালিমা পাল স্মরণে

গল্পের পটভূমিকা কলকাতার বিখ্যাত রেসকোর্স। শীত শেষের এক উজ্জ্বল অপরাহ্ণে রেসকোর্স এবং আশপাশ ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উছলিয়ে উঠেছে। রঙিন, ঝলমলে বিচিত্র সব সাজ-পোশাকে এসেছেন বিচিত্রতর পুরুষ-মহিলারা। নীল আকাশ এবং সবুজ মাঠের মধ্যে বিকেলের রোদে তাঁদের উত্তেজনা, তাঁদের উচ্ছলতা সমস্ত গ্যালারিগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

এইমাত্র একটা দৌড় শেষ হয়েছে। এই মুহূর্তে এক বাজির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, গ্যালারিতে উত্তেজনা একটু কম। আরেক বাজি না আসা পর্যন্ত সবাই এখন একটু খোলামেলা আলোচনা করছে। দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আজ পর পর তিন বাজি করে তারা দু'জনেই হেরেছে। এখন নিজেদের মধ্যে উলটোপালটা বাজি ধরছে; যেমন, আমার পকেটের রুমালটা কী রঙের অথবা সামনের মাঠের ঘাসে ওই যে কাকটা উড়ে যাচ্ছে ওটা বসবে কিনা অথবা আরও মারাত্মক, দূরের ওই ভদ্রলোকের মাথায় ওটা উইগ না সত্যিকারের নিজের চুল।

হঠাৎই এদের মধ্যে একজন একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসল, 'ওই যে গ্যালারির তৃতীয় ধাপে একেবারে বাঁদিকে, চোখে গোগো চশমা, একঘাড় শ্যাম্পু করা লম্বা চুল, গলায় চেন, লাল ঢিলে পাঞ্জাবি আর জিন্‌স পরা ওই যে হাত নাড়ছে, বলো তো ছেলে না মেয়ে?' প্রশ্ন শুনে দ্বিতীয় বন্ধুটি

ভাল করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাকানোর আগেই পাশের থেকে একজন ফ্যাসফ্যাসে কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, 'এসব কী বাজে প্রশ্ন? মেয়ে হতে যাবে কেন, ও আমার ছেলে।'

প্রশ্নকারী হকচকিয়ে গিয়ে পাশের দিকে তাকালেন। উত্তম-ছাঁট চুল, ঠোঁটে সিগারেট, প্রিন্টেড হাওয়াই শার্ট পরা ব্যক্তিটির কাছে তখনই ক্ষমা চাইলেন ওই প্রশ্নকারী, 'দাদা, কিছু মনে করবেন না, আপনি যে ওর বাবা, পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেটা বুঝতে পারিনি।' এই ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যক্তিটি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'দাদা? দাদা কী বলছেন। বাবা-টাবা নই, আমি ওর মা।'

হিন্দু ধর্মে অর্ধনারীশ্বরের কথা আছে। কোথাও কোথাও তার মূর্তি বা ছবিও দেখেছি। এক সঙ্গে, এক দেহে, বাম অংশ পার্বতী, ডান অংশ মহাদেব হরপার্বতীর বারোয়ারি পুজোও চাক্ষুষ করেছি। অর্ধনারীশ্বর কোনও নতুন, অশিক্ষিত বা অর্বাচীন চিন্তা নয়। উমা-মহেশ্বরের এই সংযুক্ত মূর্তির বর্ণনা আছে যে মণির মতো ঝকঝকে, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ এবং এই চার হাতে রয়েছে পাশ, লাল পদ্ম, নরকরোটি এবং শূল। কোনও ভক্ত পাঠকের বা ভক্তিমতী পাঠিকার ভাল লাগতেও পারে এই আশায় তন্ত্রসারে অর্ধনারীশ্বরের যে রূপধ্যান আছে সেটি লিখে দিচ্ছি—

নীলপ্রবাল রুচিরং বিল সন্ত্রিনেত্রং
পাশারুনোৎপল-কপালক-শূলহস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমণিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দু-বদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥

ব্রাহ্মণ সন্তান, কবে নমনীয় কৈশোরকালে উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছিলাম, কবে সে সব ফেলে দিয়েছি কিন্তু সংস্কারের গভীরে কোথায় কী আছে। সমাজ ইয়ার্কি, সমস্ত আধুনিকতা সত্ত্বেও শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা, তন্ত্রসার কেন? সপ্তাহান্তিক এই রসিকতার কলমে নির্বোধ কিংবা ধর্মান্ধ ছাড়া কে উমা-মহেশ্বরের রূপধ্যান লিখবে।

সুতরাং পুনরাগমন। আবার ফিরে আসি নিজের নির্দিষ্ট এলাকায়। যেমন মস্তানদের, যেমন কুকুরদের আছে নির্দিষ্ট পাড়া বা এলাকা, তেমনই কলমকারের রয়েছে নির্দিষ্ট গণ্ডি।

আজ পনেরো বিশ বছর হল মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে সংবাদ বেরয় শল্যবিদ্যার অসাধারণ কেরামতি, নিউজিল্যান্ডের অমুক মহিলা তিন ছেলের মা একটি অস্ত্রোপচার করে পুরুষ হয়ে গেছেন। অথবা কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া থেকে খবর আসে এ বি সি কোম্পানির শক্তসমর্থ, চোয়াড়ে, গোঁয়ার জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার আলেকজান্ডার আর নেই। একটি অস্ত্রোপচার করে তিনি পেলব, রূপসী, তরুণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, এখন থেকে তাঁর নাম হয়েছে মিস এলি। মিস এলির বিগত পুরুষজন্মের দুটি সন্তান, তারা তাঁকে বাবা বলবে না মা বলবে, আর তাদের আসল মাকেই বা তারা কী বলে ডাকবে, এই সব বিশাল সমস্যা নিয়ে জটিল গবেষণা চলছে বলেও খবর আসে।

চিন্তার কথা আজ কিছুদিন হল কাছাকাছি নানা জায়গা থেকে এ জাতীয় খবর আসছে। এই সেদিনই পড়লাম মধ্যপ্রদেশ না হরিয়ানা কোথায় এক সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যায়ামের শিক্ষয়িত্রী তাঁর নারীসুলভ ব্রীড়া ও বেশবাস পরিত্যাগ করে পৌরুষ গ্রহণ করেছেন।

এইসব ঘটনা যতটা চাঞ্চল্যকর এবং লোমহর্ষক ততটাই ভীতিপ্রদ। শুধু শাস্ত্রীয় অর্ধনারীশ্বরই নয়, সেই আয়ান ঘোষ, বৃহন্নলা, শিখণ্ডীর যুগ হতেই এরকম ঘটনাবলি শেষ পর্যন্ত খুবই গোলমেলে।

তবে আমি ডাক্তারি শাস্ত্র জানি না, মনোবিদ্যায় আমার জ্ঞান জিরো, তবু বলছি যদি কোথাও কোনও প্রকৃত পুরুষ মানুষ মহিলায় বা প্রকৃত মহিলা পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে থাকেন, তার সঠিক প্রমাণ মিললে আমি আমার তিন মাসের মাইনের সম পরিমাণ টাকা বাজিতে হারতে রাজি আছি।

সর্বনাশ! কলম যে আবার ভারী হয়ে গেল। একেবারে স্টার্লিং সিলভার পার্কার কলমের চেয়েও ভারী। তার চেয়ে গুরুর গুরু রসসাগর পরশুরামকে স্মরণ করি।

পুরুষমানুষের মেয়েলিপনা নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মজার গল্পটি পরশুরামের কচি সংসদ। সেই যে পেলব রায়, 'সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি টাইপিস্টের খোঁপার মতন মাথার দু'পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তারপর মুগার পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফাউন্টেনপেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মুখুজ্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। সার আশুতোষ এক ভলুম এনসাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন।' অথবা, 'লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে নামের পর পুং লিখিয়া থাকে।'

থাক, আর মানুষের মহিলা, পুরুষ বিচার করে লাভ নেই। সে বেশ কঠিন কাজ। মানুষ থেকে সরাসরি মাছিতে নেমে আসছি।

আমার এক প্রবাসী বন্ধু কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় এসে শেয়ালদা পাড়ার একটা মাঝারি হোটেলে উঠেছেন। এক রবিবারের সকাল তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। হোটেলের সিঙ্গল বেড ঘর, সামনের ড্রেসিং টেবিলের উপরে কাল রাতের আধখোলা সিগারেট, শূন্যপ্রায় মদের বোতল। এখনও ঘরে ঝাঁট পড়েনি। ঘরের মধ্যে ইতস্তত মাছি। দু'-একটি কুশল প্রশ্নের পর বন্ধুটি হঠাৎ বললেন, 'তোমাদের কলকাতায় পুরুষ মাছির চেয়ে মহিলা মাছির সংখ্যা অনেক বেশি?' আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মাছির আবার পুরুষ মহিলা আছে নাকি?'

বন্ধুটি মৃদু হেসে বললেন, 'ওই দ্যাখো ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় বসে যারা নিজেদের মুখ দেখছে, তারা সব মহিলা মাছি, তাদের সংখ্যা এগারো। আর ওই টেবিলের উপরে মদ, সিগারেটের উপর ঘুরছে পুরুষ মাছিরা। ওদের সংখ্যা আট।'

বোকার মা

রেল-ক্রসিংয়ের একটু দূরে রাস্তার মোড়ে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে।

প্রথম বন্ধু—রেলে একটা লোক কাটা পড়েছে দেখেছ?

দ্বিতীয় বন্ধু—না তো, আমি একটু আগে ওদিকের থেকে এলাম, তখন কিছু দেখলাম না। একটা গাড়ি আসছিল বটে সেই সময়।

প্রথম বন্ধু—সেই সময়েই কাটা পড়েছে, তাড়াতাড়ি করে আসতে গিয়ে মারা গেল লোকটা।

দ্বিতীয় বন্ধু—আমিও তো তাড়াতাড়ি করেই একেবারে ছুটে এলাম। লোকটা কেমন দেখতে?

প্রথম বন্ধু—তোমার মতোই দোহারা চেহারা, লম্বাও তোমার মতোই হবে।

দ্বিতীয় বন্ধু—(উত্তেজিত ভাবে) সর্বনাশ! গায়ের রং কী রকম?

প্রথম বন্ধু—ভাল করে খেয়াল করিনি, তবে মনে হয় খুব ফরসা নয়, অনেকটা তোমার মতোই হবে।

দ্বিতীয় বন্ধু—(আরও উত্তেজিত) লোকটার পরনে কী দেখলে?

প্রথম বন্ধু—তোমার মতোই সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি।

দ্বিতীয় বন্ধু—(গলার স্বর প্রায় জড়িয়ে গেছে) তা হলে?

প্রথম বন্ধু—তা হলে আর কী? লোকটা তুমি নও, তার পায়ে রয়েছে স্যান্ডেল আর তোমার পায়ে দেখছি কাবুলি চপ্পল।

দ্বিতীয় বন্ধু—(পকেটের রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে) বাঁচালে, এই কথাটা আগে বলতে হয়। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

উপরের এই কাহিনীটি অবশ্যই বাজে এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু আমরা কি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই রকম অনাবশ্যক উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হই না? অনেক দিন আগে কোথায় যেন এক বোকার মায়ের গল্প পড়েছিলাম। বোকার মা সন্তানহীনা। কিন্তু তার সবসময়েই দুশ্চিন্তা যদি তার ছেলে থাকত, যদি সেই ছেলে বোকা হত তা হলে কী সব সাংঘাতিক বিপদ হতে পারত। চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল এক চাঁদনি সন্ধ্যাবেলায় যখন বোকার মা তার বাড়ির দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, কাঁদার কারণ ছিল অনেকটা এই রকম। যদি সত্যি সত্যি বোকা থাকত, যদি বোকা বিকেলে ফুটবল খেলতে যেত, যদি সন্ধেবেলা সেই সময়ে খেলে ফিরত আর যদি কালবৈশাখীর ঝড় উঠত, যদি দাওয়ায় একটা বড় আমগাছ থাকত, যদি ঝড়ে সেই আমগাছ উলটে পড়ে যেত আর বোকা যদি সেই গাছে চাপা পড়ত তা হলে কী সর্বনাশ হত! কোথায় বা আমগাছ কোথায় বা ঝড়, কোথায় বা বোকা! বোকা জননীর করুণ ক্রন্দনে সেই জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যাবেলা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেশীরা যারা বুদ্ধি করে এই সন্তানহীনাকে বোকার মা নামকরণ করেছিল তারা সেই সন্ধ্যায় প্রথমে হতভম্ব পরে কৌতুকান্বিত এবং সর্বশেষে অতি বিরক্ত হয়েছিল।

আমাদের সমস্ত বা অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই এত অমূলক এমন কথা বলা চলবে না। কিন্তু যাঁরা রাত দুপুরে সাইকেলের ঘণ্টি শুনলেই ভাবেন কোনও অনিবার্য দুঃসংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে কিংবা বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে কোনও অচেনা লোক দাঁড়িয়ে থাকলেই আশঙ্কিত বোধ করেন যে লোকটা তাঁকে খুন করার জন্যেই অপেক্ষা করছে তাঁদের অবস্থাও আমাদের প্রথম কাহিনীর দ্বিতীয় বন্ধু এবং দ্বিতীয় কাহিনীর বোকার মা'র চেয়ে কোনও অংশে ভাল নয়।

এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যাঁদের দৈনিক সকালে একবার ক্যান্সার হয়, বিকেলে হার্ট অ্যাটাক। বুকে হাত চেপে পা টিপে টিপে বাড়ি ফিরে আসেন, এই যায় কি সেই যায়। পরের দিন সকালেই দু'বার কাশবার পর তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে তাঁর টি বি হয়েছে এবং আবার রাত দুপুরে আলো জ্বালিয়ে বলে কম্পিত বক্ষে নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কবজি ধরে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা গুণে নিজের নাড়ির গতি দেখেন। যে কোনও খাবারেই তাঁর ফুড পয়জন হতে পারে, যে কোনও যানবাহনে দুর্ঘটনা। প্রত্যেকটি লাশের বর্ণনার সঙ্গে তিনি নিজেকে মিলিয়ে দেখবেন সত্যি সত্যি বেঁচে আছেন কি না। কে তাঁকে প্রশ্ন করবে এত উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবনে বেঁচে থাকা আর না থাকায় বিশেষ কোনও তফাত আছে কি?

স্থূল ও অস্থূল

শেক্সপিয়ার নামে এক মধ্যযুগীয় নাট্যকার তাঁর এক বহুপঠিত, বহু অভিনীত নাটকের নায়ককে দিয়ে স্থূলতার সপক্ষে একটি উক্তি করিয়েছিলেন, দুর্দিনে সেই নায়ক চেয়েছিলেন তাঁর চারপাশে মোটা লোকদের, Let me have men about me that are fat. জুলিয়াস সিজার নামক সেই বিখ্যাত নায়ক একথাও পরিষ্কার করে ঘোষণা করেছিলেন যে রোগা লোকেরা বিপজ্জনক, রোগাদের দৃষ্টি শীর্ণ, ক্ষুধার্ত; তাদের চিন্তাধারা জটিল।

সভ্যতার ইতিহাসে বেদ-বাইবেলের মতোই শেক্সপিয়ার। তিনি যা বলেছেন তার আর এদিক-ওদিক নেই। মানুষ সম্পর্কে সেটাই শেষ কথা।

কিন্তু রোগা লোকেরা কেন খারাপ আর মোটা লোকেরা কেন ভাল? একজন রোগা লোক মোটা হয়ে গেলে যে আগে খারাপ বা ধূর্ত বা বিপজ্জনক ছিল মোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি সরল, ভালমানুষ হয়ে যাবে? নাকি একজন স্থূলাঙ্গিনী তন্বী হওয়া মাত্র হয়ে উঠবে হিংস্র ও কুচুটে।

এক সুরসিক রম্যরচনাকার বলেছিলেন, 'মোটারা ভাল তার একমাত্র কারণ তারা মোটা। তাদের ভাল না হয়ে কোনও উপায় নেই। তারা মোটা বলেই অন্যের সঙ্গে মারামারি করতে অক্ষম, আবার মারামারি করলেও প্রয়োজন অনুসারে দৌড়ে পালাতে পারে না। তাই তারা ভাল।'

কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, মোটা মানুষেরা ভাল মানুষ হোক আর যাই হোক, সব মোটা লোকেরই চিন্তা কী করে রোগা হওয়া যায়। মানুষের এই আধুনিক দুর্বলতার উপর নির্ভর করে আজকাল শহরের পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে শীর্ণনিকেতন, স্লিম হওয়ার ক্লিনিক। কেউ বলছে স্টিম বাথ, কেউ বলছে যোগ ব্যায়াম। আবার কেউ বা বিলিতি তুকতাক, ডায়েটিং, উপোস ইত্যাদি সম্ভার নিয়ে স্থূল দেহীদের শরীরের ভার কমানোর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

রোগা হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় বাতলে দিয়েছিলেন এক বিলিতি ডাক্তার। তাঁর প্রেসক্রিপশন ছিল, যদি রোগা হতে চাও তবে খুব বেশি খাও, যত পারো খেয়ে যাও। খেতে খেতে তুমি একেবারে মোটা হয়ে যাবে। মোটা হয়ে গেলে তুমি অলস হয়ে যাবে, তখন তুমি আর কাজ করতে চাইবে না। পারবেও না। তখন তোমার কাজ চলে যাবে, তোমার আয় বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি আর খাবার কিনতে পারবে না। খাবার কিনতে না পারার জন্যে তোমার খাওয়া হবে না। আর যখন তুমি খেতে পাবে না তখন তুমি ঠিক রোগা হয়ে যাবে।

এই সমাধানটি জটিল এবং মর্মান্তিক। আসলে খাওয়া কমালে রোগা হবে, ওজন কমবে আবার খাওয়া বাড়ালে মোটা হবে, ভুঁড়ি হবে, ওজন বাড়বে, একথা হাজারে নশো নিরানব্বুই জন সম্পর্কে সত্যি।

শারীরিক স্থূলতা একদা ঐশ্বর্য ও সচ্ছলতার প্রতীক ছিল। সেটাই স্বাভাবিক, একটি চিরক্ষুধার্ত জীর্ণ সমাজে লক্ষ রোগা লোকের মাঝে দু'-চারটি মোটা লোক অন্তত সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি হিসাবে কিছুটা খাতির পেতেই পারে।

কিন্তু কোনও এক সময়ে মোটা হওয়ার ব্যাপারটা পরিহাসের বস্তু হয়ে গেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এবং ভারতচন্দ্রে মোটাত্ব নিয়ে উপহাস আছে। আমাদের প্রিয়বন্ধু কবি উৎপলকুমার বসুর সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত ফিরোজ বসু, যাঁকে আমরা কেউ কেউ পূর্বপরিচয়ের সুযোগে কাটু বলেও

ডাকি, তিনি আমাদের বন্ধুবান্ধবের কোনও কোনও ঘরোয়া আসরে অসামান্য সংগীতসুধা পরিবেশন করে তৃপ্ত করেন। ফিরোজবাবুর একটি প্রিয় গান, 'যিসকা বিবি মোটি।' অর্থাৎ যার স্ত্রী মোটা। অমিতাভ বচ্চনের এই হিন্দি গানটি শুধু ফিরোজবাবুর মুখে নয়, রেকর্ডে, রেডিয়োতে, বাজারে, গঞ্জে, প্যান্ডেলে, বিয়েবাড়িতে, বিচিত্র স্থানে, বিচিত্র অবস্থায় শুনেছি। গানটি অশ্লীল এবং নারী জাতির প্রতি অপমানকর, গানটিকে বন্ধ করা হোক—এই দাবি নিয়ে দিল্লি এবং বেনারসে মহিলারা নাকি প্রতিবাদ মিছিল পর্যন্ত বের করেছিলেন। কিন্তু গোপনে বলি, আমাদের স্থূল রুচির জন্যেই হোক অথবা ফিরোজবাবুর প্রসাদগুণেই হোক কিংবা আমাদের স্ত্রীরা তন্বী বলেই হোক আমাদের কিন্তু গানটা ভালই লেগেছে। তা ছাড়া মজার গানে নারীমুক্তি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি, মান-অপমান হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এসব নিতান্তই অন্য কথা বরং মোটা মানুষের কথা বলি। নিউ ইয়র্কার পত্রিকার কার্টুনে দেখেছি এক স্থূলোদর স্লিমিং ক্লিনিকে রোগা হতে গেছেন। প্রথম সপ্তাহে তিনি হারিয়েছেন এগারো পাউন্ড ওজন, দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও ন পাউন্ড ওজন আর তৃতীয় সপ্তাহে ভুঁড়ি তখন এত চুপসে গেছে ক্লিনিক থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে রাস্তার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন নিজের পরনের ফুলপ্যান্টটি।

অন্য এক স্থূলোদর ব্যক্তি ডাক্তারকে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আর কিছু না হোক শরীরের যেখানটা সবচেয়ে বেশি চর্বি, বেশি মোটা সেখানটায় কমিয়ে দিন।' সরল প্রকৃতির রোগীটি হয়তো তাঁর ভুঁড়ির কথাই বলেছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু কী বুঝলেন কে জানে, মৃদু হেসে বললেন, 'কবন্ধ হলে আপনাকে মোটেই ভাল দেখাবে না।' ডাক্তারবাবুর বক্তব্য, আপনার মাথাটাই সবচেয়ে মোটা। কমাতে হলে মাথাটাই কমাতে হয়।

এই গল্পের শেষ অংশ বলতে পারি না, বোধহয় মানহানির মামলা ছিল কাহিনীর শেষে।

ডাক্তারের কথা, ডাক্তারের নির্দেশ অনেকেই ভাল করে বুঝতে পারে না। এক অসম্ভব স্থূলদেহী ভদ্রলোক যথারীতি মেদ কমানোর জন্যে ডাক্তারের নিকটে পরামর্শ নিয়েছিলেন। ডাক্তার তাঁকে দেখেশুনে বলেছিলেন, 'কোনও ওষুধ দরকার নেই। একটা ডায়েট চার্ট করে দিচ্ছি। সেই ভাবে এক মাস খান তারপরে আসবেন।' পরের মাসে ভদ্রলোকের ওজন আরও বেড়েছে। ডাক্তারবাবু বিস্মিত, 'সে কী আপনি আমার ডায়েট মেনে চলেননি?' স্থূলদেহী জবাব দিলেন, 'কেন মানব না? অক্ষরে অক্ষরে মেনেছি।' ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চন করলেন, 'ডায়েটে যা ছিল তাই খেয়েছেন?' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'খেয়েছি। কিন্তু খেতে খুব কষ্ট হয়েছে। এমনিতেই তো জানেন আমি বেশি খাই। আবার সেই খাওয়ার উপরে আপনার এই ডায়েট খাওয়া প্রথম কয়েকদিন রীতিমতো আইঢাই লাগত।'

অন্যদিকে এক রোগা ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ডাক্তারবাবু একটি লোভনীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যতালিকা করে দিয়েছিলেন যেটা খেলে ভদ্রমহিলার স্বামীর স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হবে। কিন্তু স্বামীর স্বাস্থ্য আর ভাল হয় না। অবশেষে ডাক্তারবাবু ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্বামীর জন্যে যেসব খাবারের কথা বলেছিলাম সেগুলো করেন না?' ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই তো নারকেল ভাজা কিসমিস দিয়ে ছোলার ডাল, ডিমের বড়া, আলু-কড়াইশুঁটি দিয়ে মাংস—সবই করি।' এই পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলা কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তবে?' ভদ্রমহিলা বললেন, 'তবে আর কী? খাবারগুলো এত ভাল হয় যে লোভে পড়ে আমি নিজেই খেয়ে ফেলি। কর্তাকে আর কিছু দেয়া হয় না।' নিজের বিপুল দেহভারের উপর একবার লজ্জিতভাবে চোখ বুলিয়ে ভদ্রমহিলা মাথা নিচু করে জানালেন, 'মধ্যে থেকে আমার ওজন সাংঘাতিক বেড়ে গেছে।' উদ্ভ্রান্ত ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত কেজি?' ভদ্রমহিলা স্মিত হেসে বললেন, 'আরও বারো।'

দম্পতি, দম্পতী

দম্পতি বানানে হ্রস্ব ই-কার এবং দীর্ঘ ঈ-কার দুই-ই চলে। একবার এক বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম এর মধ্যে কোন বানানটা বেশি ঠিক বা বেশি শুদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, দুটোই শুদ্ধ, দুটোই ঠিক আছে; যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা জমজমাট, প্রগাঢ় তখন অবশ্যি দম্পতি বানানের শেষে দীর্ঘ-ঈ দিতে হবে আর যখন ক্ষীণ হয়ে আসবে সেই ভালবাসা, প্রেম যখন সংকীর্ণ তখন নিতান্ত হ্রস্ব-ই-তেই চলবে। প্রথমে হ্রস্ব-ই-কারের একটি প্রান্তিক কাহিনী বলে নিই। কলকাতার উপকণ্ঠে তিলজলা উপনগরীর এক ভদ্রলোক ওই অঞ্চলেই অবস্থিত সরকারি মানসিক চিকিৎসালয় লুম্বিনি উদ্যানে একদিন সকালে জানতে গিয়েছিলেন যে উদ্যানের পাগলাগারদ থেকে দু'-একদিনের মধ্যে কোনও উন্মাদ পালিয়ে গেছে কি না। উন্মাদাগারের লোকদের প্রকৃত পাগলাদের কাছ থেকে নানা রকম উলটোপালটা প্রশ্ন, যুক্তি, বিশ্লেষণ শোনার নিয়মিত অভ্যাস থাকে, সে তাদের পরিচিত রোগীদের ব্যাপার। কিন্তু বাইরের কোনও ভদ্রলোক যাকে আপাত প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে এইরকম প্রশ্ন পেয়ে পাগলাগারদের কর্তৃপক্ষ একটু অবাক হলেন এবং জানতে চাইলেন, কেন এই ভদ্রলোক খোঁজ করছেন দু'-একদিনের মধ্যে কোনও পাগল পালিয়েছে কি না?

তখন সেই জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, আজ দু'দিন হল আমার স্ত্রীকে বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি না। পাড়ায় কানাঘুযো শুনছি সে নাকি কার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। তাই আপনাদের এখানে জানতে এসেছি, এখান থেকে কোনও পাগল পালিয়েছে কি না?' উন্মাদাগার কর্তৃপক্ষ কিছু বুঝতে না পেরে বিব্রত বোধ করে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানে?' ভদ্রলোক ম্লান হেসে বললেন, 'মানে আর কী? পাগল ছাড়া কে আর আমার বউকে নিয়ে পালাবে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না?'

সংস্কৃতে একটা কী যেন কথা আছে, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' কালিদাস নামে এক সরল প্রকৃতির কবি বোধ হয় অনন্তকাল আগে এ রকম কথা বলেছিলেন। কথাটার ব্যঞ্জনা একটু গভীর, গৃহিণী মানেই গৃহ, ঘরসংসার, স্বামীর চেয়ে সংসারে স্ত্রী কিছু কম নন, এই কথাটা বলারই অভিপ্রায় ছিল মহাকবির। সরল বাংলায় গৃহিণী গৃহমুচ্যতের অনুবাদ করেছিলেন এক বাঙালি গৃহস্থ, গৃহিণী গৃহ মুছছে অর্থাৎ বউ ঘর মুছছে, মুছবে।

অবশ্য এর চেয়ে অনেক বিপজ্জনক হলেন পুরনো দিনের ইংরেজি কবি জন ড্রাইডেন। ড্রাইডেন লিখেছিলেন তাঁর সহধর্মিণীর সম্ভাব্য এপিটাফ, স্ত্রীর কবরের উপরে মর্মর ফলকে লেখা থাকবে এই দুই পঙ্‌ক্তি :

> 'এইখানে শায়িত আমার স্ত্রী, থাকুন তিনি শান্তিতে,
> আর আমিও থাকি, আমিও থাকি শান্তিতে।'

অবশ্য প্রথমা মৃত অবস্থায় শান্তিতে থাকছেন বলেই দ্বিতীয় জন অর্থাৎ স্বামী দেবতা জীবনে শান্তি পাচ্ছেন।

যা হোক, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার নিয়ে তুচ্ছ রসিকতা থেকে বৃহৎ বিশ্লেষণ—সমস্ত ভাষায়, সাহিত্যে,

হাজার হাজার তার উদাহরণ। বর বড় না কনে বড়, বিয়েবাড়ির বাসরঘরে এ নিয়ে ঠানদিদিদের রসিকতা আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে একথা বলা যায় না।

ইতিপূর্বে স্বামী-স্ত্রীর কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে এই কলমে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলাম। আমার এক বন্ধুপত্নী তথা বান্ধবী অনুযোগ করেছেন সেটা নাকি ছিল বড়ই পুরুষঘেঁষা, পক্ষপাতদুষ্ট। এবার আমার চেষ্টা হবে এই পক্ষপাতের অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া।

সুতরাং আমি সেই গল্পটা কিছুতেই বলতে পারব না যেখানে ক্লান্ত ও অসুস্থ স্বামীর ডাক্তারি পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'বেশ কিছুদিনের জন্যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন,' এবং তারপরে একটি কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্ত্রীকে সেটা নিয়মিত খেতে কারণ স্ত্রীর স্নায়ুশান্তি না হলে স্বামীর বিশ্রাম হবে না। আরেকটা গল্প আছে ওই অসুস্থ স্বামীকে ডাক্তার দেখানো নিয়েই যেখানে ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ রোগীকে নানারকম প্রশ্ন-টশ্ন জিজ্ঞাসা করে অবশেষে বুঝতে পারেন যে স্বামী বেচারা বাকশক্তিরহিত, একেবারেই কথা বলতে পারে না। স্ত্রী তো একথা শুনে হতভম্ব, 'সে কী?' সে মহিলা দিনরাত নিজের কথার তোড়ে খেয়ালই রাখেননি পতিদেবতা কবে থেকে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন।

এসব গল্প থাক। পথপ্রান্তে শোনা একটি নরম কথোপকথন উদ্ধৃত করছি :

'কাল রাতে তোমাকে যে অতি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে দেখলাম, মহিলাটি কে?'

'বলতে পারি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আমার স্ত্রীকে কখনও বলবে না।'

'কী করে বলব, আমি তো তোমার স্ত্রীকে চিনিই না।'

'যদি কখনও পরিচয় হয় তা হলেও বলবে না।'

'না বলব না। নিশ্চিতভাবে তুমি আমাকে জানাতে পার ওই মহিলাটি কে?'

'ওই মহিলাটিই আমার স্ত্রী।'

সকলের স্ত্রী অবশ্য এত সুন্দরী হয় না। সুন্দরী স্ত্রী নাকি জন্ম-জন্মান্তের ভাগ্যের ব্যাপার। সহস্র বর্ষের শুধু সাধনার ধন নয়, সহস্র বর্ষের ভাগ্যের ধনও সুন্দরী ভার্যা।

(এ বিষয়ে অধিক আলোচনায় যাওয়া আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, স্বগৃহে প্রহৃত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তার চেয়ে মানে মানে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া নিশ্চয় নিরাপদ।)

সেই এক বিরহতাড়িত স্বামী দূরপ্রবাসে এক সকালবেলায় চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন, সেখানে চায়ের দোকানদারকে অনুরোধ করেছিলেন, 'ভাই, বেশ ঠান্ডা এক কাপ চা দাও, চিনি বেশি, দুটো কালো পিঁপড়ে আর দুধের সর যেন পেয়ালায় ভাসে। সঙ্গে দাও দুটো মিয়ানো বিস্কুট। আর তোমার ওই উনুনের পেছনে যে মোটা মেয়েটি কয়লা ভাঙছে তাকে একটা ছেঁড়া বাজারের ব্যাগ আমার মুখে ছুড়ে দিতে বলো। আমার বড় বাড়ির কথা, বউ-এর কথা মনে পড়ছে। আমি হোম-সিক, মন হু হু করছে। এটুকু এই বিদেশি মেহমানের জন্যে দয়া করে করো।'

এই ভদ্রলোককে আমরা কি স্ত্রৈণ বলব? নাকি তাঁর স্ত্রীর প্রতি মমতাপরায়ণ হব? অথবা সত্যিই মমতাপরায়ণ হতে পারি সেই কৃপণ ও সাংঘাতিক হিসেবি যুবকের নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি, যে যুবক বিয়ের পর পয়সা সাশ্রয় করার জন্যে স্ত্রীকে ফেলে রেখে নিজে একাই মধুচন্দ্র অর্থাৎ হানিমুন যাপন করতে গিয়েছিলেন।

আর অবশ্যই মমতা দেখাব সেই মার্কিন সাহেবকে যাঁর স্ত্রী প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর স্বামী কাজ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর স্বামীর কোটে জামায়, অন্য রমণীর কেশ সংগ্রহ করতেন। সোনালি পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘ কেশ যদি সেই মহিলা কোনওদিন আবিষ্কার করতে পারতেন স্বামীর পরিচ্ছদে তা হলে স্বভাবতই উত্তেজিত হতেন। তবে যেসব দিন অনেক খুঁজেও কোনও পররমণীর সন্দেহজনক কেশই উদ্ধার করতে পারতেন না, সেদিন অধিকতর উত্তেজিত হয়ে স্বামীকে গালাগাল করতেন, 'ছিঃ, ছিঃ, তোমার এত অধঃপতন হয়েছে, তোমার রুচি এত নেমে গেছে! সারাদিন একটা টেকো ন্যাড়া মেয়েছেলের সঙ্গে কাটিয়ে এলে।'

অনেক স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ করে পিত্রালয়ে বা অন্যত্র চলে যান। গিয়ে বুঝতে পারেন এর ফলে তাঁর বর অনেক শান্তিতে বসবাস করা আরম্ভ করেছে এবং তখন সেটা সহ্য করতে না পেরে আবার ফিরে আসেন। যারা ভাবে রাগ কমে গেছে, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে অথবা স্বামী-সংসারের প্রতি মায়াবশত ফিরে এসেছে তারা স্ত্রী-মনস্তত্ত্বের কিছুই জানে না।

ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, সহধর্মিণী হলেন যৌবনের প্রেমিকা, মধ্যজীবনের সঙ্গিনী আর বার্ধক্যের সেবিকা। এদিকে অস্কার ওয়াইল্ড স্ত্রীদের সমবেদনা জানিয়ে বলেছিলেন, যে কোনও মহিলার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, তার অতীত হল তার প্রেমিকের আর তার ভবিষ্যৎ হল তার স্বামীর।

আমরা এত গোলমেলে কথার কচকচিতে নেই। দাম্পত্য প্রেম সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ভাষণ শুনেছিলাম, আমাদেরই এই শহরের এক ক্লাবের ঝুল বারান্দায়। এক অশ্রুময়ী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে, দাঁড়িয়ে স্বামীকে অভিযোগ করছিলেন, 'তুমি এখনও বলছ আমাকে ভালবাস? যদি সত্যিসত্যিই আমাকে ভালবাস, তবে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?'

* * *

কিপলিং, ভারতরত্ন রুডইয়ার্ড কিপলিং, গদ্যে-পদ্যে অনেক উলটোপালটা গোলমেলে কথা বলেছেন, তবে বিয়ে করার বিষয়ে একদা একটা মারাত্মক কথা বলেছিলেন, 'He travels the fastest who travels alone,' অর্থাৎ 'একলা চলো রে', যে একলা যাবে সেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাবে।

এই একলা-দোকলার ব্যাপারে বেশ বড় সমস্যা সিনেমা-থিয়েটার-রেস্টুরেন্টগুলির। দম্পতির জন্য সেখানে পাশাপাশি জোড়া চেয়ার, জোড়া আসন চাই। প্যারিসের একটা বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে দম্পতির জন্যে একটা অদ্ভুত বন্দোবস্ত আছে। না, কোনও আলাদা ছোট খুপচি অন্ধকার কেবিন বা ঘর নয়, যেমন এই শহরে বা যে কোনও শহরেই কোনও কোনও দোকানে আছে। প্যারিসের রেস্টুরেন্টটির আয়োজন খুব মজার এবং স্বামীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক ও সম্মানজনক। রেস্টুরেন্টে চেয়ারে বসার পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনের হাতে তারা দুটি একই রকম দেখতে মেনু ধরিয়ে দেয়। কিন্তু স্ত্রীর মেনুটিতে সব বাড়ানো, ফাঁপানো মারাত্মক দাম। আর যা আসল দাম, দোকানের যা প্রকৃত মেনু বা খাদ্যমূল্যতালিকা সেটা ধরিয়ে দেওয়া হয় স্বামীকে। মানে সহধর্মিণী যখন ভাবছেন তিনি আটাশ টাকা দামের চিলি চিকেন খাচ্ছেন স্বামীর মেনু ও দোকানের বিল অনুযায়ী তার প্রকৃত দাম সাড়ে বারো টাকা মাত্র।

স্বামীদের চিরদিনের চেষ্টা স্ত্রীকে ঠকানো। এইরকম রেস্টুরেন্টে দোকানদারের সহায়তায় বিনা চেষ্টায় স্ত্রীকে ঠকিয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই আত্মসুখ বোধ করেন। তবে সুখের কথা পৃথিবীর সব স্বামী একরকম নয়।

অনেকদিন আগে উঠে যাওয়া ধর্মতলা স্ট্রিটের একদা বিখ্যাত ও জমজমাট কমলালয় স্টোর্সে একদিন শেষ রাতে এক চোর ধরা পড়েছিলেন। পুলিশের অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় তস্কর ব্যক্তিটি ওই রাতে চারবার পরপর কমলালয় স্টোর্সের পেছনের জানলার গরাদ ভেঙে ঢোকেন এবং তাঁর স্ত্রীর জন্যে একে একে চারবার পর পর চারটি ভাল শাড়ি চুরি করে আনেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তস্করপ্রিয়ার কোনওটাই পছন্দ হয় না। কোনওটার পাড় বড় বেশি চওড়া, সেকেলে, আবার কোনওটা বড়দির ননদের একটা শাড়ির মতো অবিকল; যে শাড়িটা কিছুটা পছন্দ হয়েছিল তার রং বড় বেশি পানসে, ট্যালটেলে। তস্কর বেচারা আর দশজন পুরুষমানুষের মতোই শাড়ির এত রকমসকম মোটেই বোঝে না। সুতরাং চতুর্থবারের পর পঞ্চমবার যখন তিনি শাড়ি পালটাতে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন কাক-ডাকা শুরু হয়ে গেছে; ফার্স্ট ট্রাম ধর্মতলা স্ট্রিটে ঘটাং ঘটাং চলছে

গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে, আর এই মহানগরীর অধুনা অবলুপ্ত ফরাসেরা হাইড্রান্ট থেকে পাইপ দিয়ে জল তুলে রাস্তা ধুচ্ছে। এই পঞ্চমবারে প্রবেশের মুখে প্রায় প্রকাশ্য দিবালোকে তস্কর স্বামী সদ্যনিদ্রোত্থিত ভোজপুরী দারোয়ানের হাতে ধরা পড়ে যান।

তবে এর চেয়েও মর্মান্তিক কাহিনী অন্য এক দম্পতির। এই দম্পতির স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই পূর্ব বিবাহ ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তাদের বর্তমান বিবাহ সংঘটিত হয়। এদিকে ভদ্রমহিলার আগের এক পুত্র, ভদ্রলোকের আগের স্ত্রীর এক পুত্র। এই দুই পুত্রই আলোচ্য দম্পতির সঙ্গে থাকে। ইতিমধ্যে বিধির বিধানে এই স্বামী-স্ত্রীরও একটি পুত্র হল। আগের দুই পক্ষের দুই পুত্র কিন্তু তাদের অর্ধভ্রাতা অর্থাৎ এই নবাগত তৃতীয়টিকে দু'চোখে দেখতে পারে না। এই পরিবার আমাদের পুরনো পাড়ার শেষপ্রান্তে একটা একতলা বাড়িতে থাকতেন। বিয়ের বছর পাঁচ-সাত পর থেকে এই বাড়ি থেকে অনবরত গৃহিণীর আর্ত আবেদন শোনা যেত স্বামীর উদ্দেশে, 'ওগো তাড়াতাড়ি এসো। এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল। তোমার ছেলে আর আমার ছেলে দু'জনে মিলে আমাদের ছেলেকে মেরে ফেললে।'

মজার কথা যথেষ্ট হল, এবার অন্তত একটা গুরুগম্ভীর কথা না বললে সুধী পাঠক কলকে দেবেন না। আর বলবই যদি সামান্য বলব কেন? ইউরোপীয় প্রবন্ধ সাহিত্যের জনক যাঁকে বলা হয়, সেই ফরাসি গদ্যকার যার ছায়ায় ইংরেজি গদ্য অনেকখানি লালিত, সেই মাইকেল ইকুয়েম দ্য মনটেইন (অথবা মিলেল মতে অথবা মনটে, অথবা মনটেগ, অথবা ইত্যাদি ইত্যাদি, ফরাসিবিদরা নিজগুণে মুর্খ কলমকারকে ক্ষমা করবেন) যা লিখেছিলেন আদর্শ দম্পতি সম্পর্কে সেকথাটা বলা যাক। কথাটা ভদ্রলোক কিন্তু আজকে বা গতকাল বলেননি, বলেছিলেন চারশো বছর আগে। এই সুপ্রাচীন ফরাসি সাহেবের মতে আদর্শ দম্পতি হল সেই পরিবার যেখানে স্ত্রী অন্ধ এবং স্বামী কালা। স্বামী যা করছে স্ত্রী দেখতে পাবে না, স্ত্রী যা বলছে স্বামী শুনতে পাবে না, তা হলেই সংসার সুখের হবে।

এককালে পানের দোকানে দোকানে কাচের মধ্যে লেখা থাকত, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' সেসব রোমান্টিক পানের দোকান, সেই সব রঙিন কাচ আর সেইসব সুখপ্রদ রমণীরা যাদের মুখচ্ছবি ফুটে থাকত প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের মাঝখানে; তারা কোথায় গেল, কবে গেল?

কয়েক সপ্তাহ আগে আমাদের এক গ্রাম সম্পর্কের আত্মীয় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম সত্যিই শেষ নিশ্বাসের অপেক্ষায় রয়েছেন, তবে জ্ঞান রয়েছে টনটনে। বিছানার পাশেই বসে রয়েছেন তাঁর পঞ্চাশ বছরের সঙ্গিনী সতীসাধ্বী স্ত্রী। আমাকে দেখে আমার সেই গ্রামদাদার মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'তুমি এসে ভাল করেছ, মৃত্যুর আগে তোমাকে দু'-চারটে কথা জানিয়ে যেতে চাই। দ্যাখো পশ্চিমবাড়ির নগেনের কাছে আজ প্রায় চার বছর হল তিনশো টাকা পাই। কিছুতেই দেয়নি, আমার মৃত্যুর পর অন্তত যাতে তোমার বউদিকে টাকাটা দেয়, তুমি একটু দেখো। আর সামনের ঘরের ভাড়াটে দু'মাস ভাড়া দেয়নি।...' এইভাবে তিনি বিশদভাবে বলে যেতে লাগলেন কোথায় তাঁর কী পাওনাগণ্ডা আছে তার কথা। মধ্যে মধ্যেই তাঁর স্ত্রী স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, 'সত্যি দ্যাখো ভাই, তোমার দাদার কী বিচক্ষণ বুদ্ধি। সব কথা মনে রেখেছেন, শরীরের এই অবস্থাতেও খুঁটিনাটি কিছু ভোলেননি।' কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সেই গ্রামদাদা তাঁর মৌখিক হিসাবপত্রের ডান কলমে চলে গেছেন, সেখানে দায়দেনার কথা। তিনি সবে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'আর শোনো, আমার পিসতুতো ভাই গজেন আমার কাছে সাতশো টাকা পাবে, মাকালী ফার্নিচার পাবে বাইরের বারান্দার দুটো নতুন চেয়ারের দাম...' কিন্তু তিনি তাঁর বিবরণ সমাপ্ত করতে পারলেন না, আমার গ্রামবউদিদি ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো কী আবোলতাবোল বকছ গো, ও ভাই, তোমার দাদার বুঝি শেষ অবস্থা, এ যে প্রলাপ বকা শুরু করেছে!'

এই দাম্পত্য কাহিনীর শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি ব্যক্তিগত কাহিনীও গোপনে পাঠিকাদের নিবেদন করছি। কোনও একটি নিভৃত কারণে আমার প্রাণাধিকা গৃহিণীকে আমি একটি

ভাল সেন্ট, যাকে অধুনা পারফিউম বলে, দেব বলে আজ কিছুদিন কথা দিয়েছি। গন্ধদ্রব্য বিষয়ে আমার অজ্ঞতা অপরিসীম। তা ছাড়া শিশি বা মোড়ক দেখে সেন্টের সুবাস অনুমান করা অসম্ভব। এর মধ্যে একদিন মিনিবাসে এক সুবেশা তরুণী যাচ্ছিলেন, ঠিক আমার পাশে বসে। তাঁর সর্বাঙ্গের বিদেশি কুসুমের মৃদু গন্ধ আমাকে সচেতন করে তুলল। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'দেখুন কিছু মনে করবেন না, আমার স্ত্রীর জন্যে একটা পারফিউম কিনতে হবে। আপনার পারফিউমের সৌরভটা বড় ভাল, দয়া করে ব্র্যান্ডটা যদি বলেন।' তরুণীটি চাপা হেসে বললেন, 'না, না, এ সেন্ট স্ত্রীকে কিনে দেবেন না। রাস্তাঘাটে যত আজেবাজে লোক তা হলে জানতে চাইবে কী সেন্ট, কত দাম? কোথায় পাওয়া যায়? মিছে হয়রানি করবে। গায়ে পড়ে কথা বলবে।'

সাদা রাস্তা কালো বাড়ি

ঠিক এই রকম নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর উপন্যাস আছে। তবে সেখানে বাড়িটা সাদা এবং রাস্তাটা কালো। এবং তাই হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। কারণ আর কিছুই নয় আমি রঙকানা, বর্ণান্ধ। মনুষ্যেতর জীবজন্তুরা নাকি সাদা-কালো এই দুটি রঙ ছাড়া দেখতে পায় না। স্পেনের যে বিখ্যাত ষাঁড় লাল চাদর দেখে উত্তেজিত হয়ে আক্রমণে মেতে ওঠে, সে নাকি লাল রঙ আর নীল রঙের পার্থক্যই ধরতে পারে না। কোনও বর্ণবোধই নেই তার। যে সবুজ ঘাসের গালিচায়, শ্যামল শস্যের খেতে পাখিরা উড়ে যায় সেই সবুজ রঙ তারা বুঝতেই পারে না। তারা বোঝে শুধু সাদা আর কালো। আর বলতে গেলে এ দুটো কোনও রঙই নয়, একটা হল সব রঙের সমাহার আর অন্যটা হল যে কোনও রঙের অনুপস্থিতি।

আমার অবশ্য ঠিক পশুপাখির অবস্থা নয়। সাদা-কালো ছাড়াও আমি লাল, নীল ইত্যাদি রঙ মোটামুটি ধরতে পারি। কিন্তু হলুদ, সবুজ এগুলো সব ঘুলিয়ে যায়। বহুকাল আগে এক বৃষ্টির দিনে আমাদের কালীঘাট বাড়ির জানলা দিয়ে আমি দেখেছিলাম পাশের বাড়ির ছাদের থেকে রঙিন শাড়ি পরিহিতা জনৈকা সুন্দরী অন্য একটি রঙিন শাড়ি তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনছেন। আমার কল্পনাশক্তির খুব অভাব। সুতরাং যা দেখেছিলাম বা দেখেছি বলে ভেবেছিলাম, সেই ভাবে একটা পদ্য লিখেছিলাম, 'ছাদে সবুজ, গায়ে হলুদ।' আমার রচনা চিরকালই হাস্যকর, কিন্তু সেই জনৈকা সুন্দরীকে তাঁর উদ্দেশে রচিত কবিতাটি শোনাতেই তিনি হাসিতে মুখরা হয়ে উঠলেন। যৎসামান্য একটি স্তব্ধ প্রেমের কবিতায় এত হাসির কী আছে প্রশ্ন করায় তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি রঙকানা, আসলে ওই পঙ্‌ক্তিটি হবে 'ছাদে হলুদ; গায়ে সবুজ।' তারে মেলা এবং শরীরে জড়ানো শাড়িদ্বয়ের রঙ ছিল যথাক্রমে ওই রকম।

এর পরে আমি অনেক চিন্তা করেছি। একজন বর্ণান্ধের পক্ষে কবি যশঃপ্রার্থী হওয়া উচিত কিনা, সম্ভব কি না—এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। পরে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে মিলটন থেকে হেমচন্দ্র যদি পুরোপুরি অন্ধ হয়েও কবি হতে পারেন আমিও বর্ণান্ধ দশায় পার পেয়ে যাব।

পরবর্তী জীবনে এতে আমার কিছু কিছু সুবিধে হয়েছে। যেমন আমার স্ত্রী কখনও আমাকে কোনও রঙিন জিনিস, শাড়ি, জামাকাপড় ইত্যাদি কিনতে পাঠান না। আমার ছেলে তার ইস্কুলের খাতায় ছবি কোনওদিন আমাকে এঁকে দিতে বলেনি। বর্ণান্ধতার দোষে আমি অবশ্য প্লেনের পাইলট অথবা রেলগাড়ির সিগন্যালারের কাজ পেতাম না। অন্যদিকে আমি রঙকানা বলে বাড়িতে কেউ রঙিন টি. ভি. কেনার দাবি তুলতে পারছে না। আমার কাছে সাদা-কালো আর রঙিন টি.ভি. একই। আমি কেন কিনতে যাব? তার চেয়ে একটা জীবন সাদা-কালোতেই কেটে যাবে। ভগবান আমাকে দেননি, আমি কেন নিতে যাব?

একদা এক বিমানযাত্রায় এক বিদেশি উড়োজাহাজের সমীরণ-সেবিকা স্বভাবোচিত নম্রতা সহকারে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমি রেড ওয়াইন খাব কি না। আমি তাঁকে বিনীত ভাবে বলেছিলাম, 'দিদি, আমি রঙকানা, লাল মদ সাদা মদে আমি কোন তফাত করতে পারি না।' আমার এই বক্তব্যে ভদ্রমহিলা কেন গম্ভীর হয়ে আমাকে শুধু এক গেলাস বরফজল দিয়েছিলেন তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

এর চেয়ে গভীরতর হৃদয়বিদারক একটি ঘটনার কথা আমি জানি। সেই ঘটনার নায়ক আমি নই। অন্য এক ব্যক্তি, তিনিও বর্ণান্ধ। তবে তিনি সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত রঙকানা। দিনের আলোয় বোঝেন, কিন্তু রাতের বেলায় বোঝেন না। অর্থাৎ, এক ধরনের রাতকানা। এই রাত-রঙকানা ব্যক্তিটির একটি খেদোক্তি আমি একবার কার্জনপার্কের বেঞ্চিতে বসে শুনেছিলাম। ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুকে বলছিলেন।

তার আগে একটু বলি। আমাদের এই কলকাতা শহর। এই আপাত নির্লিপ্ত উদাসীন মহানগর কয়েক বছর পর পর সহসা সাময়িক জ্বরবিকারে ভোগে। এই রকম হয়েছিল, উনিশশো বাষট্টি সালের শেষাশেষি। সীমান্তে ভারত-চিন সংঘর্ষ। ম্যাকমোহন রেখা, যুদ্ধ, উত্তেজনা, আতঙ্ক, চারদিকে নানা রকম গুজব। কলকাতা শহর হঠাৎ একদিন কী রকম গোলমাল করে ফেলল। এক সন্ধ্যায় একদল লোক বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে চিনেবাজারে বেশ কয়েকটা চিনেদের জুতোর দোকান লুঠ করল।

আমার ওই কার্জনপার্কের ভদ্রলোকটি এই নিয়েই দুঃখ করছিলেন। তাঁর দুঃখের কারণটা অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা আরও দশজনের সঙ্গে একটি জুতোর দোকান লুঠে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পেশাদার লুঠেরা নন, শৌখিন মানে কালেভদ্রে, কখনও-কখনও টুকটাক লুঠে অংশ নেন। তাই বিশেষ কিছু হস্তগত করতে পারেননি। মাত্র একজোড়া জুতো বাড়ি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি রাত-রঙকানা হওয়ায় কাল সন্ধ্যায় ধরতে পারেননি আজ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দিনের আলোয় দেখেন একপাটি জুতো ব্রাউন আর অন্যপাটি ব্ল্যাক। তবে তাঁর আশা যে শিগগিরই একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে অন্য কোনও চিনের জুতোর দোকান অন্তত চিনে লন্ড্রি লুঠ হবেই, সেদিন তিনি অবশ্যই রঙ মিলিয়ে জিনিস নিয়ে বাড়ি যাবেন এবং সেই আশাতেই এখন প্রতিদিন কার্জনপার্কে এসে বসে প্রতীক্ষা করেন। কোথায়, কখন লুঠ হয়।

ইস্কুলের মাঝারি ক্লাসে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা শব্দঘটিত ধাঁধা ছিল। তার প্রথম কিংবা দ্বিতীয়টি ছিল যদি কালো কুচকুচে, সাদা ধবধবে, লাল টুকটুকে, তবে নীল কী, হলুদ কী, সবুজ কী? কেউ কেউ সরাসরি বলত ক্যাটকেটে নীল, ক্যাটকেটে হলুদ, এগুলো সবই ক্যাটকেটে। কিন্তু নীল কিংবা হলুদ, সবুজ রঙটা খারাপ হলেই তো ক্যাটকেটে, ভাল হলে আর এই বাজে শব্দটা দেব কী করে। অবশ্য একটি ফাজিল জবাব ছিল একটু অন্যরকম। ক্যাটকেটে (মানে বেড়াল কেটে) লাল হবে। বেড়ালের রঙ আবার হলুদ বা নীল হল কবে? মনে আছে, আমাদের এক স্বভাবকবি মাস্টারমশায় খুব যত্ন করে আমাদের পরে শিখিয়েছিলেন, ছিমছাম সবুজ, হিমহিম হলুদ ইত্যাদি। তখন কি ছাই আমি জানতাম যে সবুজ আর হলুদের পার্থক্য আমি ধরতে পারি না।

দুঃখের কথা থাক। নিজের অযোগ্যতার ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং অনেকদিন পরে একটা সাহেব মেমদের গল্প বলি। বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী (পঞ্চাশ বছর) পূর্ণ হয়েছে এমন কয়েকটি বিরল দম্পতির মার্কিন দূরদর্শনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। অনেক প্রশ্নের মধ্যে একজন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনার কী রকম চুলের মহিলা পছন্দ— স্বর্ণকেশী না কৃষ্ণকেশী?' বুড়ো সাহেব অর্ধশতাব্দীর সঙ্গিনী বুড়ি মেমের সাদা হয়ে যাওয়া একমাথা ধবধবে চুলের দিকে তাকিয়ে তোবড়ানো গালে আলতো হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'শুভ্রকেশী।'

লক্ষপতি

আমরা সকলেই লক্ষপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। চোখের সামনে কেউ কেউ লক্ষপতি হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা ঈর্ষা করি। তার অর্থাগমের পথটি যে ক্লেদাক্ত এবং কালিমালিপ্ত, সে লোকটি যে জোচ্চোর এবং প্রতারক সেটা যে ধনবান হওয়ামাত্র আমরা বুঝে ফেলি।

লক্ষপতি কথাটা কথার কথা। আসলে লাখ টাকার আজকাল আর কোনও দাম নেই। বাড়ি তৈরির দু' কাঠা ভাল জমি লাখ টাকায় পাওয়া যায় না। এমনকী ভাল করে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে এক লাখ টাকায় গায়ের সোনার গয়না হওয়াই কঠিন। যদি আপনি কোনও গর্হিত ফৌজদারি অপরাধ করে ফেলেন, তবে আজকের বাজারে লাখ টাকা ঘুষ দিলে খালাস হওয়া দূরের কথা জামিনের বন্দোবস্ত করতে পর্যন্ত পারবেন না। এ বক্তব্য আমার নয়, এ বিষয়ে প্রকৃত ভুক্তভোগীর কথা।

অনেকদিন আগে আমারই মতো হতদরিদ্র আমার এক সুহৃদ পরিহাস করে বলেছিলেন, 'লাখপতি কোনও ব্যাপার নয়! এক লাখ টাকা ব্যাপারটা বোঝো?' আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকায় তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'তুমি যদি দৈনিক তিনশো টাকা করে ব্যাঙ্কে রেখে যাও, এক বছরে তুমি লাখপতি হয়ে যাবে।'

অবশ্য এর চেয়ে অনেক ভাল বুঝেছিলেন এক সাংবাদিক। কী এক সংবাদের গোলমালে কে এক মাননীয় ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা এনেছিলেন এক লাখ টাকা খেসারত দাবি করে। আদালতের কাঠগড়ায় বিপক্ষের উকিলবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এক লাখ টাকা? বোঝেন?' রীতিমতো আঁতে ঘা দিয়ে প্রশ্ন, কিন্তু সেই সাংবাদিক মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'খুব ভাল বুঝি। আমি যদি আজ আমার স্ত্রীকে এক লাখ টাকা দিই আর তিনি যদি তার থেকে দৈনিক শ পাঁচেক টাকা নিয়ে এই টুকিটাকি, শাড়ি, সেন্ট, আমার হাফ ডজন রুমাল, তাঁর ভাইপোর দুটো টিনটিনের বই, সেই সঙ্গে একটু ট্যাক্সি, সামান্য চিনেখাবার, কোল্ড ড্রিঙ্ক, বেশি দূর নয় এই গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট,...' বিপক্ষের উকিলবাবু ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন, 'আপনি কী আবোলতাবোল বলছেন। এটা আদালত।' সাংবাদিক অধিকতর মোলায়েম হেসে বললেন, 'আগে শেষ করতে দিন কথাটা। আমার স্ত্রী যদি ওই রকম নিউমার্কেট-গড়িয়াহাট, এই সামান্য শ-পাঁচেক টাকা সকালে বা বিকেলে, দু'বেলা নয় একবেলাই, বেরোন তা হলে ঠিক ছয় মাস কুড়ি দিন পরে,

মানে আজ হল তিরিশে মার্চ তিনি অক্টোবর মাসের থার্ড উইকে আমার কাছে আবার টাকা চাইবেন।'

প্রথমে যে কথা বলছিলাম, এই চূড়ান্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দুর্দিনে লাখপতি কথাটা বেশ খেলো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর প্রবল মুদ্রাস্ফীতির ইতালি দেশে একটা গল্প চালু হয়েছিল যে, আগে পকেটভরতি টাকা নিয়ে এসে ব্যাগভরতি বাজার করে নিয়ে যেতাম আর এখন ব্যাগভরতি টাকা নিয়ে এসে পকেটভর্তি বাজার নিয়ে যাই। অবশ্য আমাদের টাকার অবস্থা এখনও ও রকম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়নি কিন্তু লাখপতি কথাটার আর কোনও গুরুত্ব নেই, এখন বলা উচিত ক্রোড়পতি বা কোটিপতি।

সাহেবরা বলেন মিলিওনের, বিলিওনের। মিলিওনের মানে দশ লক্ষের মালিক, তাও দশ লক্ষ টাকা নয়, দশ লক্ষ পাউন্ড অথবা ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রামূল্যে দেড় কোটি বা এক কোটি টাকা। আর বিলিওনের তো সাংঘাতিক, আমেরিকায় আর ফ্রান্সে এক হাজার মিলিয়নে অর্থাৎ একশো কোটিতে এক বিলিয়ন। আর ইংরেজরা তো বাহাদুর, এক মিলিয়ন এক মিলিয়নে অর্থাৎ এক লক্ষ কোটিতে হবে এক বিলিয়ন। যদি কোনওদিন কোথাও কোনও ইংরেজ বিলিওনের চাক্ষুষ করেন, জানবেন যে এঁর অন্তত পনেরো লক্ষ কোটি টাকা আছে।

হিসেবটা বড় গোলমেলে হয়ে গেল। তার চেয়েও গোলমেলে ব্যাপার হল লোকে এত টাকা করে কী করে এবং করেই বা কী? ঈশ্বর জানেন আর জানে সেই উপকথার ভিখারি যে বলেছিল, 'আমি যদি বড়লোক হতাম দৈনিক সব ভাত গুড় দিয়ে খেতাম।'

কলকাতা ময়দানে প্রাতঃভ্রমণের সুযোগে আমার সঙ্গে এক কুবেরলালের আলাপ হয়েছে। তিনি বিলিওনের কিনা জানি না, কিন্তু মিলিওনের নিশ্চয়ই, অবশ্যই ক্রোড়পতি।

শীতের এক কুয়াশাভরা সকালে সেদিন উত্তর থেকে হিমসিম হাওয়া বইছে, দূরে টাটা সেন্টারের মাথা ছুঁয়ে সাদা চাঁদের মতো ঠান্ডা সূর্য কলকাতার আকাশে উঠে আসছে, ময়দানে ঘাসের উপর ব্রিগ্রেড প্যারেডের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের সবুজ আঙিনায় আমি কুবেরলালজি। সেই শীতপ্রভাতের শিহরণে, কী যেন ছিল না হলে এক প্রৌঢ় ধনকুবের পাকা ব্যবসায়ী তাঁর সাফল্যের মূলসূত্রটি আমার মতো হাভাতের কাছে বলে বসলেন কেন? কুবেরলালজি হঠাৎই কথায় কথায় বললেন, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রম ছাড়াও প্রখর ব্যবসায়বুদ্ধিই তাঁর উন্নতির প্রধান কারণ। তিনি বললেন, কপর্দকশূন্য অবস্থায় আরম্ভ করেছিলেন আজ গণেশ ঠাকুর আর মা লছমির দয়ায় তাঁর কোনও রকমে বেশ চলে যাচ্ছে। আমাকে বললেন যে বছর পনেরো-কুড়ি আগে একদিন ক্যামাক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল মালটিস্টোরিড বিল্ডিং বানানো আরম্ভ করলে কেমন হয়, এসব পাড়ায় ফ্ল্যাট চাইলে ফ্ল্যাট, অফিস চাইলে অফিস, দোকান চাইলে দোকান দারুণ চলবে। বানিয়ে ফেললাম কয়েকটা হাইরাইজ বাড়ি, ক্রেতারা বাড়ি বয়ে কাঁচা টাকা পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম, একবারও প্রশ্ন করতে সাহস পেলাম না অত হাইরাইজ বিল্ডিং বানানোর টাকাটা কোথায় পেলেন। কুবেরলালজির আত্মজীবনী তখনও শেষ হয়নি। তিনি বললেন, 'এখন আমি এমন জিনিস ধরেছি যে কেউ ভাবতেই পারবে না। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল ব্যাপারটা, এবার যা করছি তার আর কোনও মার নেই।' এই বলে তিনি মৃদু রহস্যময় হাসি হাসতে লাগলেন, তারপর তিনি যেন তাঁর কোনও গোপন মূল্যবান কথা আমাকে, শুধুমাত্র আমাকেই ফাঁস করে দিচ্ছেন, এই রকম মুখ চোখ করে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'এবার পাঁচতারা হোটেল। ভারতবর্ষের সব বড় শহরে একটা করে পাঁচতারা হোটেল। পাঁচতারা হোটেলের বড় অভাব দেশে, পাবলিক লুফে নেবে।'

তারপর আমাকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনিও দু'-একটা হোটেল বানান, পাঁচতারা না পারেন চারতারা, তিনতারা।' এসব করতে গেলে যে টাকা লাগে, কুবেরলালজির কপর্দকশূন্যতা আর আমার কপর্দকশূন্যতা যে এক ব্যাপার নয়, সেটা তাঁকে কে বোঝাবে?

দু'-চারজন লোক নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে যে বড় হয় না, তা নয়। তাদের সংখ্যা নগণ্য। এক জন্মে এক ধাপ ওঠা যায়। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত, বড়জোর উচ্চবিত্ত। কিন্তু নিতান্ত হাঘরে অবস্থা থেকে কোটিপতি হওয়া, জালজোচ্চুরি বা ডাকাতি না করে, শুধু বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা অসম্ভব। সেই যে এক হঠাৎ ধনবান ব্যক্তি বলেছিলেন, 'আমার এই আর্থিক উন্নতির মূলে রয়েছে ন্যায়নীতি, সততা, কঠোর পরিশ্রম আর বিপত্নীক এবং অপুত্রক অবস্থায় আমার বড়মামার মৃত্যু, যাঁর পঞ্চাশ লাখ টাকার সম্পত্তি আমি একাই পেয়েছি', কথাটা খুবই খাঁটি।

এক বণিকসভার অধিবেশনে এক বিখ্যাত ধনপতি তাঁর কাল্পনিক কষ্টের জীবনের কথা বলছিলেন, 'আমি যেদিন এই শহরে প্রথম আসি সেদিন কী দুর্যোগ, শীতের ঠান্ডা রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টি, কনকনে হাওয়া, আমি কাউকে চিনি না, জানি না, গায়ে জামাকাপড় নেই, শুধু কেঁদে যাচ্ছি ...', এমন সময় এক প্রগল্‌ভ শ্রোতা বাধা দিলেন, 'কিন্তু স্যার, আমরা যে শুনেছি আপনি এই শহরেই জন্মেছেন।' থতমত খেয়ে বক্তা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি আমার জন্মদিনের কথাই বলছি।'

গল্পের গতি

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় একদা এক কাল্পনিক কবির উদ্দেশে ছড়া লিখেছিলেন,—

> শ্রীমান সমরেশ সেন,
> পড়েছি যা লিখেছেন।
> লিখেছেন যা পড়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর যাঁর কথা লিখেছিলেন, মনে হচ্ছে তাঁর বোধহয় কিছু লেখাপড়া ছিল। অথবা বলা উচিত পড়ালেখা ছিল যা পড়তেন তাই লিখতেন।

আমার বিদ্যার দৌড় কিন্তু অনেকেরই জানা। খারাপ ডিগ্রি, পড়াশোনা যৎসামান্য। অদ্যাবধি এমন কিছু পড়ে উঠতে পারিনি যা আত্মস্থ করে লিখলে পাঠক-পাঠিকারা আত্মহারা হয়ে হাততালি দিয়ে বাহবা দেবেন। খেলো ও চটুল রচনায় আমার চিরদিনের আসক্তি। তবে যতটা পড়েছি তার চেয়ে শুনেছি অনেক বেশি, এবং এইসব মজার কথা, হাস্যকর গল্প শোনার ব্যাপারে আমার খ্যাতি ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে কেউ কেউ বাড়ি বয়ে আমাকে হাসির গল্প শোনাতে আসে।

উপরের এই ভণিতাটুকু প্রয়োজন পড়ল এই কারণে যে আমার এই সামান্য কলমে কোনও প্রাজ্ঞ পাঠক কিংবা সুচতুরা পাঠিকা যদি কোনও চোরাই কাহিনী কিংবা বহুশ্রুত গল্প ধরে ফেলেন, আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আমার নিজের কোনও মজার গল্প নেই। সবই শোনা অথবা পড়া। একথা অন্যত্র আগেও বহুবার মাথা নিচু করে স্বীকার করেছি, এবারেও করছি।

তবে এই স্বীকার করাটাই সব কথা নয়। আসল অসুবিধা একেবারে অন্যরকম। অনেক কষ্টের

চুরি করা গল্পটিতে হয়তো একটু আপন মনের মাধুরী মেশালাম। পরিশ্রম কিছু কম হল না কিন্তু গল্পটি দু' লাইন পড়েই কেউ আর এগোলেন না, কারণ সবাই জানেন এ গল্পটা। আমার অজ্ঞাতসারে গল্পটা কবে যে মুখে মুখে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তা কি আমি আর জানি!

হনলুলু প্রেস ক্লাবের সদর ঘরটিতে সেদিন ছুটির দিনের সন্ধ্যায় বহু লোকের ভিড়। লোকজনের আনাগোনা, আলাপ-পরিহাস। এর মধ্যে দুটি টেলিফোন ঘরের দুই প্রান্তে মাঝে মধ্যে বেজে উঠছে। কেউ গিয়ে ধরছে, কেউ কাউকে ডেকে দিচ্ছে। যেমন হয় আর কী এইরকম আড্ডার আসরে।

এমন সময় একটা ফোন এল, লং ডিসট্যান্স কল, নিউইর্য়ক থেকে। ফোনের নিকটতম ব্যক্তিটি টেলিফোনটি ধরলেন, 'হ্যালো, হ্যাঁ হনলুলু প্রেস ক্লাব। কাকে চাই?'

একটু পরেই যিনি টেলিফোন ধরলেন সেই ভদ্রলোকের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, 'কী বলছেন? ও নিউইয়র্ক থেকে? কাকে চাইছেন?... কী বলছেন। কাউকে না, সে কী!' অতঃপর সামান্য বিরতি, 'ও যে কোনও একজনকে হলেই হবে। ঠিক আছে আমাকেই বলুন।'

ফোন গ্রহণকারী ভদ্রলোক এরপরে ফোনে মন দিয়ে কথা শুনতে শুনতে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন, তারপর বললেন, 'বাঃ চমৎকার! দাঁড়ান, আরেকজনকে ডেকে দিচ্ছি।' এরপর তিনি পাশের ব্যক্তিকে ফোনটি দিলেন। কিঞ্চিৎ বিস্মিত পাশের ব্যক্তিটি ফোন ধরে তারপর কিছুক্ষণ পরে তিনিও হো হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর তৃতীয় চতুর্থ এবং শেষ পর্যন্ত ঘরের শেষ ব্যক্তিটি ফোনে কী সব শুনলেন এবং সবাই যে যার মতো প্রাণ খুলে হাসলেন।

ব্যাপারটি কী? নিউইয়র্ক থেকে ভদ্রলোক ফোন করেছেন, ধরা যাক তাঁর নাম জিম, আগের দিন রাত্রেই এক নৈশভোজের আসরে একটি চমৎকার রসিকতা শুনে এসেছেন জিম সাহেব। শুনে তাঁর এত ভাল লেগেছে যে পরদিন সকালে কাজে গিয়েই তিনি তাঁর সহকর্মীকে গল্পটি আনুপূর্বিক বলেছেন। সহকর্মীটি গম্ভীর ও বিরস মুখে গল্পটি শুনেছেন এবং শেষে জানিয়েছেন যে এ গল্পটি তিনি আগে বেশ কয়েকবার শুনেছেন, তাই এখন শুনলে আর হাসি পায় না বরং রাগ হয়, মাথা গরম হয়ে যায়।

বিফল মনোরথ জিম সাহেব এরপর অন্যান্য কর্মীদের গল্পটি শোনানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই গল্পটি শুনেছে। বিকেলে পাড়ায় ফিরে প্রতিবেশীদের এবং সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে বন্ধুদের গল্পটি শোনানোর চেষ্টা করতে গিয়েও ব্যর্থ হলেন জিম সাহেব। অনেকে গল্পটি শেষ করতেই দিল না, অনেক আগেই গল্পটি তাদের শোনা।

জিম সাহেবের ভাই কিম সাহেব থাকেন ওয়াশিংটনে, ভায়রাভাই টিম সাহেব থাকেন ফিলাডেলফিয়ায়, কাছাকাছি মধ্যেই বলা চলে। পয়সা খরচ করে এই দু'জায়গায় দুই আত্মীয়কে ফোন করে গল্পটি শোনাতে গেলেন। কিন্তু হতভাগ্য জিম সাহেবের ইচ্ছা এবারেও অপূর্ণ রইল। দু'জনেই ঘুমভাঙা গলায় স্পষ্ট বিরক্তি সহকারে জানালেন এই রদ্দি গল্পটি তাঁদের জানা আছে।

অবশেষে নিতান্ত মরীয়া ও নিরুপায় শ্রীযুক্ত জিম টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে খুঁজে সুদূরতম প্রান্তে ওই হনলুলু প্রেস ক্লাবে ফোন করেছেন, হয়তো ওখানে এখনও গল্পটি পৌঁছোয়নি, যদি ওখানে এমন কাউকে পাওয়া যায় যে, এখনও জিম সাহেবের গল্পটা শোনেনি। জিম সাহেবের প্রয়াস সফল হয়েছিল। সারাদিন ব্যর্থতার পরে পরপর একুশজনকে ওই প্রেস ক্লাবের ফোনে গল্পটি শোনাতে পেরে নিশ্চয়ই তিনি আন্তরিক খুশি এবং কৃতার্থ হয়েছিলেন। তবে সে মাসে তাঁর টেলিফোন বিলে ওই দূর মাত্রার একুশে গল্প কতটা ভার বাড়িয়েছিল তা বলতে পারব না। আমি জানি, জিম সাহেবের এই ফোন করার গল্পটা অনেকেই জানেন, কেউ কেউ প্রকারান্তরে অন্যত্র পড়েও ফেলেছেন। সুতরাং এ নিয়ে আমি বাহাদুরি করব না। আমার বাহাদুরি অন্যত্র। জিম সাহেব ফোনে যে গল্পটা বলেছিলেন সে গল্পটা আমিও জানি।

গতকাল রাত্রেই গল্পটি হনলুলু-টোকিও হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। হয়তো

পাঠক-পাঠিকারা সবাই এখনও গল্পটি শোনেননি। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পটি পেশ করছি, অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরে কাহিনীটির কিঞ্চিৎ জাতীয়করণ করতে হল। গল্প এক মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে। শেষ নিশ্বাসের কাছাকাছি সময়, সাদা বাংলায় বলা যায় টান উঠেছে। ছেলে মেয়ে, আত্মীয় বন্ধু সব বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মারা যাওয়ার পর কীভাবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে হঠাৎ তাই নিয়ে বিবাদ বাধল। বড় ছেলের ইচ্ছে সাবেকি মতে সবাই মিলে কাঁধে করে হরিধ্বনি করে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যায়। ছোট ছেলে কিঞ্চিৎ আধুনিক, তার ইচ্ছা হিন্দু সৎকার সমিতির ঢাকা কাচের গাড়িতে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া। বৃদ্ধের এক ভাগ্নে ছিল ঘরের মধ্যে, তার ট্রাকের ব্যবসা। সে বলল, 'আমার নতুন ট্রাকটায় মামাকে নিয়ে যাব। সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

এর মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী চোখ মেলে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছেন মনে হল। ছেলেরা বলল, 'কী চাইছ বাবা?' বাবা বললেন, 'আমার শার্টটা দাও।' বড় ছেলে বিচলিত হয়ে বলল, 'সে কী?' বাবা বললেন, 'সময় নেই, দেরি কোরো না। শার্টটা দাও, চটিজোড়া দাও। কারওর কিছু করতে হবে না। আমি হেঁটেই শ্মশানে যাচ্ছি।'

পাকিস্তান

পাকিস্তান বিষয়ে আমি লেখার কথা ভেবেছি খুশবন্ত সিংয়ের একটি মন্তব্য পাঠ করে। আমি পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু উদ্বাস্তু, পাকিস্তান শব্দটি আমার সমাজের সকলের কাছেই অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাবহ— ছিন্নমূল এবং স্মৃতিবিদারক। বলাবাহুল্য পাকিস্তান সম্পর্কে আমার নিজের কোনও রসিকতা নেই।

সর্দার খুশবন্ত সিং কৃতবিদ্য ব্যক্তি। যে কোনও গোলমেলে অথবা সাধারণ ঘটনা নিয়ে চমকপ্রদ উক্তি করায় অথবা সেটাকে একটি সর্দারি গল্পে দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় তাঁর জুড়ি বিরল। আর, পাকিস্তান সম্পর্কে বলতে গেলে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু হিন্দুর মতো তিনিও জাতিগতভাবে উদ্বাস্তু শিখ, ওই দেশটি সম্পর্কে দু'-চারটি হক কথা বলার বা খাঁটি গল্প বলার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে। খুশবন্ত সিংয়ের শেষতম মন্তব্যটি অবশ্য শুধু পাকিস্তানীদের গায়েই লাগেনি। আমাদের মোটা চামড়াতেও তার উত্তাপ একটু লেগেছে। খুশবন্ত বলেছেন যে ভারত এবং পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য একটাই। সেই পার্থক্যটা হল পাকিস্তানী কুকুরগুলো ভাল খেতে পরতে পায় কিন্তু তাদের ঘেউ ঘেউ করতে দেওয়া হয় না, আর ভারতীয় কুকুরগুলো ঠিকমতো খেতে পায় না বটে কিন্তু তাদের ঘেউ ঘেউ করার স্বাধীনতা রয়েছে।

উক্তিটি অন্যান্য এ জাতীয় উক্তির মতোই অবশ্য খুশবন্ত সিংয়ের নিজস্ব নয়। পশ্চিমি দেশগুলি ভিজাভি (vis-a-vis) কমিউনিস্ট দেশগুলি সংক্রান্ত অজস্র রসিকতা ইউরোপে গত পঞ্চাশ বছর চালু রয়েছে। তার মধ্যে এই রসিকতাটিও আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সেই কথিকায় মোটা নির্বাক কুকুরটি লাল এবং রোগা ঘেউ ঘেউ বিলাসী কুকুরটি সাদা।

পাকিস্তান সম্পর্কে দ্বিতীয় গল্পটিতে যাই। এই দ্বিতীয় গল্পটিও খুশবন্ত সিংয়ের। এবং পড়লেই বুঝতে পারবেন অসামান্য গল্প এটি। শুধু লিখবার আগে একটা ছোট খটকা আছে, জিষ্ণু উপাধ্যায় অথবা বাহারউদ্দিন এটা ইতিমধ্যে লিখে ফেলেননি তো? কিংবা মদন মিত্র তাঁর পাকিস্তান পরিক্রমায়?

সে যা হোক, খুশবন্ত সিংয়ের জবানিতে গল্পটি বেরিয়েছিল বছর দেড়েক আগে হিন্দুস্থান টাইমস কাগজে। নাপিত এবং রাজা নিয়ে অনেক গল্প আছে নানা উপকথায়, খুশবন্ত সিংয়ের গল্পটিও সেই লাইনের।

কাহিনীর নায়ক পাকিস্তানের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রেসিডেন্ট। প্রধানত তাঁদের নিরাপত্তার কারণেই হোক অথবা অন্য যে কোনও কারণে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা আর দশজনের মতো চুল কাটতে বা দাড়ি কামাতে রাস্তাঘাটের দোকানে বা সেলুনে যেতে পারেন না। সরকারি বা তাঁদের স্ব-নির্বাচিত নাপিত দিয়েই কাজটি সমাধা করতে হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়ারও নিজের নাপিত রয়েছে। বহুকালের পুরনো বশংবদ নাপিত। বহুদিনের পরিচয়ে নাপিত মহোদয়ের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ হৃদ্যতাও স্থাপিত হয়েছে প্রেসিডেন্ট সাহেবের। দাড়ি কামাতে কামাতে দু'জনের মধ্যে নানারকম সুখ-দুঃখের গল্প হয়।

কিন্তু আজ কিছুদিন হল জিয়া লক্ষ করছেন যে তাঁর নাপিতটি দু'-একটা গোলমেলে কথা বলছে। আগে লোকটি বৃষ্টি কম হচ্ছে, পেশোয়ারি চালে এখন আর সেরকম গন্ধ নেই, কিংবা এখানকার ছেলেরা খুব বেশি গাঁজা খাচ্ছে এই সব নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু আজকাল হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই দুম করে জিজ্ঞেস করে বসে, 'তা হলে কর্তা, নির্বাচনটা কবে করছেন?' সঙ্গে সঙ্গে জিয়ার মাথায় রক্ত উঠে যায়, কোনওক্রমে ক্রোধ দমন করে চুপ করে থাকেন। কিন্তু লোকটি বে-আক্কেলে, আবারও ওই একই প্রশ্ন, 'তা হলে নির্বাচনটা...?' জিয়ার ইচ্ছা হয়, 'লোকটাকে এখনি ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিই, অথবা বড় রাস্তার মোড়ে পঞ্চাশ ঘা বেত লাগাই।'

কিন্তু পুরনো লোক, আর লোকটার এই বাজে প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোনও দোষই নেই, চমৎকার মোলায়েম হাতে দাড়ি কামায়, ঝরঝরে চুল কাটে।

পরের দিন দাড়ি কামাতে কামাতে নাপিতের আবার একই প্রশ্ন, 'আচ্ছা, নির্বাচনটা...?'

জিয়া ফের উত্তেজিত। জিয়া এবারও ক্রোধ দমন করে ঠান্ডা হন, পরে ধীর ভাবে ভাবতে লাগেন, এই বোকা লোকটা কি কোনও বিরোধী দলে নাকি কোনও গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থায় যোগদান করেছে? নাপিত হয়ে নির্বাচন নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে কেন? নাকি কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের কাফেরদের বা কমিউনিস্টদের গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেছে এই নাপিতটা।

অবশেষে একদিন ওই নির্বাচনের প্রশ্নটা করতেই জিয়া সাহেব চেপে ধরলেন নাপিতকে, 'কেন তুমি বার বার এই প্রশ্ন করছ? নির্বাচন কবে হবে বা না হবে তাতে তোমার কী?'

প্রেসিডেন্টের এই অগ্নিমূর্তি দেখে নাপিতটি ঘাবড়িয়ে গেল, তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললে, 'সাহেব ব্যাপারটা হল...'

জিয়া ধমকে উঠলেন, 'কী ব্যাপার?' নাপিত বলল, 'আপনার দাড়ি তো খুব কড়া, কাটা খুব কঠিন। কিন্তু আমি দেখেছি যে ভোটের কথা বললেই আপনার দাড়িগুলো একেবারে খাড়াখাড়া টানটান হয়ে ওঠে। আমারও কামানোর সুবিধে হয়, আপনারও গালে লাগে না। তাই দাড়ি কামাতে কামাতে আমি ওই ভোটের কথাটা তুলি, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার দাড়ি খাড়া হয়ে যায়।'

এ গল্প একালের পাকিস্তানের। আমার শেষ গল্প সেকালের পাকিস্তানের মানে সাঁইত্রিশ বছর আগের, সেই যখন পাকিস্তান হয়েছিল, গল্পটি খুব সম্ভব সৈয়দ মুজতবা আলির। বহু চেষ্টা করেও, বহু পাতা উলটিয়ে আমি সেই গল্পটি খুঁজে পেলাম না। তবু গল্পটি এত মর্মান্তিক যে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আমার নিজের অক্ষম ভাষায় উপস্থাপন করছি।

দেশবিভাগের পর দলে দলে হিন্দুরা সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসছিলেন। এঁরা যে

সবাই দাঙ্গাহাঙ্গামায় অথবা উৎপীড়নে চলে আসেন তা নয়, অনেকেই আসেন কিছুটা নিরাপত্তাবোধের অভাবে আর কিছুটা সামাজিক কারণে। সেই সময় কিন্তু বহু শুভবুদ্ধি সুহৃদ মুসলমান অনেক হিন্দু পরিবারকে চলে না আসতে অনুরোধ করেছেন।

এই রকম একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন মুজতবা আলি। নদীর ঘাটে নৌকোয় বাক্স-বিছানা তোলা হচ্ছে, একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় এক মুসলমান ভদ্রলোক তখনও সেই পরিবারকে বোঝাচ্ছেন, 'যাবেন না। পাকিস্তান হয়েছে তো কী হয়েছে। এই তো ফ্ল্যাগটা দেখুন। এর মধ্যেও হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। এই যে তিনভাগ সবুজ মুসলমানের জন্যে, আর এই একভাগ সাদা হিন্দুর জন্যে।' (পাঠক, পাকিস্তানের পতাকা স্মরণ করুন।)

হিন্দু পরিবারটি এই শেষ মুহূর্তেও একটু দোমনা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সম্বিৎ ফিরল, যে কুট্টি গাড়োয়ানের ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মালপত্র নিয়ে এসেছেন নদীর ঘাটে, তার কথায়, সে বলল, 'কর্তা আর থাকবেন না। পালাইয়া যান। দেখছেন না, নিশানের বাঁশটা দিছে ওই সাদারই মধ্যে।'

ইঁদুর

প্রাতঃস্মরণীয় বাক্যবাগীশ র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সন সাহেব তাঁর এক বিখ্যাত বক্তৃতায় ভাল বই লেখা, সুধর্ম প্রচার করা ইত্যাদি মহৎ কাজের সমগোত্রীয় হিসেবে উল্লেখ করছিলেন ইঁদুর ধরার খাঁচা তৈরির কুশলতাকে।

এই সর্বজ্ঞানী কেন যে সামান্য ইঁদুরের কল বানানোর যোগ্যতাকে সাহিত্য রচনা বা ধর্মপ্রচারের সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটা আমি কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারি।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার আগে ইঁদুর সম্পর্কে দু'-একটা জ্ঞানের কথা বলে নিই। ইঁদুর দেবতার বাহন। যে কোনও দুর্গা প্রতিমার পাশে গণেশ ঠাকুরের পায়ের নীচে একটি ছোট মাটির ইঁদুর থাকবেই। সব মূর্তিতেই যে ইঁদুর ছোট তা অবশ্য নয়। আধুনিক দুর্গা প্রতিমায় দেখেছি দুর্গা যেমন সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে আছেন তেমনিই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ যে যার বাহনে আসীন। সেখানে বিশালকায় ইঁদুরের পিঠে ক্ষুদ্র উপবীত, উন্নত ভুঁড়ি, সুঠাম শুঁড়সহ গজানন দণ্ডায়মান। সেই ইঁদুর প্রায় সিংহের সমান।

র‍্যাট, রোডেন্ড, মাউস ইত্যাদি আকৃতি-প্রকৃতিগত নানা নাম ইঁদুরের ইংরেজিতে। কিন্তু বাংলায় শুধুই ইঁদুর। বিশেষণ যোগ করে নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, ধানী ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর পার্থক্য বোঝানো হয়। বাংলায় পাড়াগাঁয়ের মাঠের ইঁদুর, ধানী ইঁদুর; যে 'ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ', কিংবা যে 'মেঠো ইঁদুরের চোখ ধানের নরম শিষে নক্ষত্রের দিকে আজো চায়' জীবনানন্দ তাকে কবিতায় অমর করে গেছেন।

আপাতত, কাব্য বা অমরত্ব থাকে। গণেশ আমাদের কুকুরের নাম। কোনও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মনে আঘাত দেবার জন্যে বা ওই নামের কোনও পরিচিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে আমাদের

কুকুরের এই নামকরণ নয়। আসলে গণেশের মা, সেও আমাদের বাড়িতেই ছিল। তার এক সঙ্গে চারটি বাচ্চা হয়েছিল দুর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিনে সকালে। চারটি বাচ্চার দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। পণ্ডিতিয়া সন্ধ্যা সঙ্ঘের বারোয়ারি পুজোর ব্যান্ডেল ছিল আমাদের বাড়ির সামনেই, সেখানে তখন জগজ্জননী পুত্রকন্যা নিয়ে এসে গেছেন। মাইকে মাতৃস্তোত্র বাজছে, আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা বাক্যব্যয়ে কুকুর শিশুদের নামকরণ করলাম, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী।

এর মধ্যে বাকিরা অন্য বাড়িতে গেল। গণেশ রইল আমাদের বাড়িতে। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি গণেশের এই নামকরণ ঠিক হয়নি।

গণেশ নামটি যতটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, গণেশ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকলাপ ততোধিক অশাস্ত্রীয় হয়ে উঠল। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মনে সংশয় দেখা দিল গণেশ কুকুর না বিড়াল? সে নির্বিচারে, নির্মমভাবে তার বাহনদের অর্থাৎ ইঁদুর মারতে শুরু করল। অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে, খাওয়া-দাওয়া ঘুম বন্ধ করে ঘণ্টায় পর ঘণ্টা সে ইঁদুরের প্রতীক্ষায় দরজার আড়ালে বা আলমারির নীচে নাক গলিয়ে অতিবাহিত করতে লাগল। পণ্ডিতিয়ার বাড়িতে তত ইঁদুর ছিল না। তার খুব সুবিধে হয়েছে আমাদের বাসা বদলের পর। বর্তমানে যে জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে আমি বসবাস করার চেষ্টা করি সেটা বোধহয় কলকাতায় ইঁদুর সাম্রাজ্যের রাজধানী। কৃষ্ণ, শুভ্র, ধূসর, পিঙ্গল, রক্তাভ, নীলাভ ইত্যাদি সহস্রবর্ণের এবং পিপীলিকা থেকে সামান্য বৃহৎ ও মার্জার থেকে সামান্য ক্ষুদ্র আয়তনের সহস্র ইঁদুরের লীলাভূমি এই গৃহ। বাড়িতে কোনও বিড়াল নেই, সব জানলায় জাল দেওয়া, বাইরে থেকে আসবার কোনও সম্ভাবনাই নেই, ইঁদুরেরা এ-বাড়িতে প্রাণের সুখে পান-ভোজন, নৃত্য-গীত, ক্রীড়াকৌতুক এবং বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। তদুপরি তারা অকুতোভয়। আলনা বেয়ে উঠে যাচ্ছে, সকলের চোখের সামনে রান্নাঘরের তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা নিটোল গোল আলু নিয়ে কয়েকজন মিলে ফুটবল কাম ভলিবল খেলছে। পোষা বেড়ালছানার মতো খাবারের থালার সামনে চুপচাপ অপেক্ষা করছে। অনেক সময় যে খাচ্ছে তার উঠে যাওয়ার আগেই থালায় উঠে পড়ছে। রাত্রে বিছানায় উঠে দল বেঁধে কুচকাওয়াজ করছে। জামার পকেটে, জুতোর গহ্বরে বাচ্চা পাড়ছে— এই রকম চলছিল ইঁদুরদের দিনকাল। পন্ডিতিয়া থেকে গণেশ এসে এ সমস্ত ভেস্তে দিয়েছে। ইঁদুরেরা অনেকেই এখনও আছে কিন্তু তাদের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন। অসংখ্য ইঁদুর শহিদ হয়েছে; গণেশ আবার ইঁদুর খায় না, মূষিক নিধনেই তার আনন্দ আর প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পর নিহত জীবটিকে মুখে করে এনে বাড়ির যে কারওর পদপ্রান্তে উপঢৌকন দেয়, বোধহয় আমাদের আর্থিক অবস্থা অনুমান করে সে এই ভাবে পরিবারের খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করতে চায়। প্রসঙ্গত এই কাহিনীর একটি উপকাহিনী এখানে লিখে না রাখলে অন্যায় হবে। গণেশকে নিয়ে সকালে ময়দানে বেড়াতে যাই। শিকল খুলে দিলে সে মাঠের মধ্যে অনেকদূরে চলে যায়। তখন 'গণেশ, গণেশ' করে তাকে ডাকাডাকি করে ফিরিয়ে আনতে হয়। ময়দানের ভ্রমণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ বড়বাজারি ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী। হঠাৎ একদিন এই রকম এক ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, 'বাবুজি, গণেশ নামটা ভাল নয়, আমি ওর জন্যে নাম ঠিক করেছি, টমি।' আমি বাধা দিলাম না, শুধু মুখে বললাম, 'টমি চমৎকার নাম।'

দিন সাতেক পরে গণেশ অন্য একটা কুকুরকে শুঁকতে শুঁকতে বহুদুর চলে যায়; আমি 'গণেশ-গণেশ' করে ডেকে তাকে ফেরানোর চেষ্টা করছি, এমন সময় আবার সেই ভদ্রলোক, 'কী হল বাবুজি, ওকে টমি নামে ডাকছেন না?' আমি কী আর বলব, তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতে কাটাতে বললাম, 'আমি তো ডাকতেই চাই। কিন্তু গণেশ কিছুতেই নাম বদলাতে রাজি নয়।' (প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি এক শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে দেখলাম বসিরহাটের এক ভদ্রলোক সপরিবারে নাম বদল করে তারাপদ রায় নাম গ্রহণ করেছেন। আজকাল, ৫.৭.৮৪।)

আবার ইঁদুরে ফিরছি। বাংলাদেশে যাদের মারোয়াড়ি বলা হয় তাদের এক গরিষ্ঠ অংশ এসেছেন রাজস্থানের দেশনক অঞ্চল থেকে। থর মরুভূমির এক প্রান্তে দেশনকে রয়েছে কাণিমাতার মন্দির।

কাণিমাতার মন্দিরে যত ইঁদুর আছে কলকাতার কার্জনপার্কে তার এক শতাংশ ছুঁচো নেই। গণেশের মতোই কাণিমাতার বাহন ইঁদুর। একটা দুটো নয়, লক্ষ লক্ষ ইঁদুর। গাদাগাদি ঘুরছে, ফিরছে ঘুমোচ্ছে। তীর্থযাত্রীরা পা টিপে টিপে আলতো করে ইঁদুরদের সরিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকছে।

কোনও কারণে একটি ইঁদুর যদি মারা যায় পায়ের চাপে তবে ওই ওজনের সোনার ইঁদুর গড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অভয়ারণ্য নয়, ইঁদুরের অভয় মন্দির।

এরই সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা ওয়ালট ডিসনির স্টুডিওতে। ঈশপের গল্পের মতো ডিসনির মিকি মাউস এই শতাব্দীতে জীবজন্তুকে মনুষ্যধর্ম দিয়েছে। এই তো সেদিন ডিসনির কার্টুন ইঁদুর মিকি মাউসের রজতজয়ন্তী মহা ধূমধামে প্রতিপালিত হল।

রোজার মিলার নামক এক খ্যাতনামা গায়ক গিয়েছিলেন ডিসনি স্টুডিওতে। চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় দেখলেন দরজার আড়ালে কয়েকটা অদ্ভুত আকারের জিনিস, গর্ত কাটা বাক্সের মতো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলো কী?' যে গাইড ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, 'দারুণ ইঁদুরের উৎপাত তাই ইঁদুরের খাঁচা করানো হয়েছে। এগুলো ইঁদুরের খাঁচা।' 'সর্বনাশ, মিকি মাউসের জন্মভূমিতে ইঁদুর ধরার খাঁচা? ডিসনি স্টুডিওতে ইঁদুর মারা হয়?' চমকে উঠলেন গায়ক।

আমরা অবশ্য চমকাব না। কারণ আমরা আবাল্য মূষিকবিরোধী। আমরা পাঠশালায় পড়ে এসেছি, 'উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।'

পুনশ্চ— ইঁদুরের কথা অনেক হল। অবশেষে ছুঁচো মেরে একটু হাত গন্ধ করি। এক ব্যক্তি ছুঁচো দেখে একদা বলেছিলেন, 'বাবা, কত বড় ইঁদুর!' ভদ্রলোক বন্ধুর সঙ্গে কার্জনপার্কে গাছের আড়ালে বসে লুকিয়ে মদ খাচ্ছিলেন। তখন রাত বেশ হয়েছে। ভদ্রলোকের বন্ধু বললেন, 'আরে, এগুলো ইঁদুর নয়।' প্রথম ব্যক্তি জানতে চাইলেন, 'তা হলে এগুলো কী?' বন্ধুবর বললেন, 'এখন তুমি বাড়ি ফিরলে তোমার স্ত্রী তোমাকে যে নামে সম্বোধন করবেন এগুলো সেই জন্তু।' প্রথম ব্যক্তি ঢোঁক গিলে বললেন, 'ও, ছুঁচো।'

এ হর্স ফর মাই কিংডম

এবার একটা ঘোড়ার গল্প বলি। গল্পটা বহুকাল কেউ বলেননি। সুতরাং ইতিপূর্বে যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও নিশ্চয় ভুলে গেছেন। গল্পটা প্রায় দুই দশকের পুরনো। কাহিনীর সূত্রপাত তারও বহু বছর আগে।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের গান্ধী-মূর্তির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। পাতাল রেল কলকাতায় প্রথম যাদের উৎখাত করে তার মধ্যে ওই মূর্তিটি আছে। গত দশকের শেষাশেষি কোনও সময় মূর্তিটিকে সরিয়ে পুরনো জায়গা থেকে প্রায় দু'-ফার্লং দূরে ময়দানে রেড রোডের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সব সময় ঠিক নজরে পড়ে না, ন্যুব্জ দেহ, লাঠি হাতে চলমান বৃদ্ধ গান্ধী একটু চোখের আড়াল হয়ে গেছেন আজকাল।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের গান্ধী-স্ট্যাচু নিয়ে চমৎকার কবিতা ছিল কবি জগন্নাথ চক্রবর্তীর। বিলাসী, বিহ্বল, প্রমোদপরায়ণ পার্ক স্ট্রিট, নাগরিক সভ্যতার এই গ্লানিমুক্তি কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। কবিতাটি এই মুহূর্তে আমি উল্লেখ করলাম শুধু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যে গান্ধী-মূর্তির প্রথম অধিষ্ঠান কোথায় ছিল। কারণ আলোচ্য কাহিনীটি পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের মূর্তি নিয়ে।

এই সূত্রে প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হবে ওই মোড়ে গান্ধী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক জবরদস্ত সেনাপতিকে উদ্বাস্তু করে। কারও কারও হয়তো এখনও জেনারেল আউটরামের কথা মনে আছে। দুরন্ত অশ্বপৃষ্ঠে দৃপ্ত আউটরাম বহুকাল পার্ক স্ট্রিটের মুখে অধিষ্ঠান করেছিলেন। উপনিবেশের বিদেশি সেনাপতি আউটরাম তাঁর দোষ-গুণ যাই থাকুক, তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘোড়সওয়ার আউটরামের মূর্তিটি ছিল অসামান্য। তার দিকে তাকালে তেজি ঘোড়ার উদ্ধত নাসার উষ্ণ নিশ্বাসের আঁচ গায়ে এসে লাগত। সাম্প্রতিক কালেই ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ ও রেসকোর্সের কোনাকোনিতে ঘোড়ার পিঠে বাঘাযতীনের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বাঘাযতীনের ঘোড়ার সে গতি নেই, দৃপ্ততা নেই।

সম্ভবত অশ্বপৃষ্ঠে আউটরামের মূর্তিটি এখনও ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের উদ্যানে রয়েছে। ময়দানের দিক থেকে ঢুকে বাঁদিকে পুকুর-পারের বাগানের মধ্যে যেন কবে দেখেছিলাম অস্ত্রসমেত উদ্যানবন্দি সেনাপতিকে, ওই পরিবেশে ওই ভাস্কর্যের মহিমা ঠিক বিকশিত হয় না।

গান্ধী-মূর্তিতে ফিরে আসার আগে ওই আউটরামের মূর্তি সম্পর্কে একটা পুরনো গল্প বলে নিই। যখন আউটরামের মূর্তিটি ওই চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ছিল সেই সময় মোড়ের কাছেই সদর স্ট্রিটের এক বাড়িতে একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবার এসেছিল। কিছুদিনের জন্য এই শহরে বেড়াতে। তখন সাহেবসুবোদের কাছে কলকাতা এত অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়নি।

সে যা হোক সেই ট্যুরিস্ট পরিবারে, ট্যুরিস্ট কথাটা তখনও অবশ্য চালু হয়নি, একটি বাচ্চা ছেলে ছিল। এই পরিবারটি এসেছিল ইংল্যান্ডের এমন একটা অঞ্চল থেকে জেনারেল আউটরামের বংশও সেখানকার। ইংরেজের স্বাভাবিক স্বজাতিপ্রিয়তাবশত সেই বাচ্চা ছেলেটিকে তার বাপ আসার পরেই আউটরামের মূর্তিটি দেখান, এবং বুঝিয়ে বলেন যে এই আউটরাম আমাদের দেশের, এ খুব সাহসী ছিল। আমাদের জন্য অনেক করেছে।

কী কারণে যেন বাচ্চা-সাহেবটি মূর্তিটির খুব ভক্ত হয়ে পড়ে। সকাল-সন্ধ্যায় সে অবসর পেলেই চৌরঙ্গি পার হয়ে মূর্তিটির পাদদেশে (ছয় পায়ের নীচে, ঘোড়ার চার + আউটরামের দুই) চলে আসত। মূর্তিটির চারপাশে ঘুরে খেলা করত, কখনও মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

বিদায়ের দিনে বাচ্চাটি কান্নায় ভেঙে পড়ল, মূর্তিটি ছেড়ে যেতে তার মন ভেঙে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে তার বাবা মূর্তিটির সামনে তাকে নিয়ে এলেন গুডবাই জানানোর জন্যে। ছেলেটি চোখের জল মুছে হাত তুলে শেষবারের মতো টা-টা জানাল। চলে আসতে আসতে বারবার পিছনে ফিরে তাকাতে লাগল, হাত তুলে বলতে লাগল, 'বাই বাই আউটরাম, বিদায়, বিদায় আউটরাম।' অবশেষে যখন আউটরামকে আর দেখা গেল না, তখন বাচ্চাটি তার বাপকে একটি সরল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বাবা, আউটরামের পিঠে ও পাজি লোকটা কে?' পিতৃদেবের স্বপ্নভঙ্গ হল, তিনি যেটা ভেবেছিলেন তাঁর পুত্রের স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সেনাপতির প্রতি শ্রদ্ধা, সেটা যে নিছক অশ্বপ্রেম তা অবহিত হয়ে তিনি নিশ্চয় মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু কী আর করা যাবে তখন চিরসূর্য সাম্রাজ্যের অস্তাচলের দিন ঘনিয়ে এসেছেন।

আমাদের গান্ধী-মূর্তির গল্প আবার ওই আউটরামকে নিয়েই। যুদ্ধের সময় এক মার্কিন ব্যবসায়ী কলকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলে কিছুকাল ছিলেন। খিদিরপুরে বোমা পড়েছে, যুদ্ধের ফাঁসে দমবন্ধ কলকাতা। সন্ধ্যা হতে না হতেই নির্জন, থমথমে ব্ল্যাক-আউটের কলকাতা।

মার্কিনি ভদ্রলোক চৌরঙ্গির ফুটপাথ ধরে বিকেলের দিকে অল্প একটু হাঁটাহাঁটি করে সন্ধের মধ্যেই হোটেলে ফিরে যেতেন। এই সময়েই তাঁর নজরে পড়ে রাস্তার মোড়ে আউটরামের অসামান্য মূর্তিটি। কোনও কাজ না থাকলে কখনও কখনও তিনি চুপচাপ মূর্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করতেন। আসা যাওয়ার পথেও দেখতেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সাহেব দেশে ফিরে গেছেন। এর প্রায় বিশ বছর পরে তিনি আরেকবার এসেছেন কলকাতায়। কলকাতা তখন প্রায় এখন যে রকম, তিনি যেমন দেখেছিলেন তার থেকে একদম আলাদা। রাস্তায় সাহেব-মেম নেই, গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে ভিখিরি, পথে পথে জঞ্জাল; তখন কলকাতার অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের বাজারেও একটা শৃঙ্খলা ছিল শহরে। বিশ বছর বাদে সাহেব এসে দেখলেন এ কলকাতা সে কলকাতা নয়। তার আগে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরেও একই অবস্থা দেখে এসেছেন তিনি।

ভারতবর্ষের এই পরিণতি দেখে দু'-একদিন মনের দুঃখ কাটানোর পর একদিন সাহেবের তার পুরানো সুহৃদ আউটরামের কথা মনে পড়ল। তিনি দেখতে গেলেন পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে সেই দৃপ্ত অশ্বারোহীকে। কিন্তু ততদিনে আউটরাম সবাহন অপসারিত হয়েছেন, সেখানে এসেছেন হাতে লাঠি, বৃদ্ধ গান্ধী।

সাহেব দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, মার্কিনি ইংরেজিতে তিনি যেসব স্বগতোক্তি করেছিলেন, তার মোদ্দাকথা, 'সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ, এখানে মূর্তি পর্যন্ত বুড়ো হয়ে যায়, সময়ের সঙ্গে যুবক অশ্বারোহী বৃদ্ধ পদযাত্রীতে পরিণত। স্ট্রেঞ্জ, রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ, ইভেন স্ট্যাচুস গ্রো ওলড ইন ইন্ডিয়া।'

আরেকটা ঘোড়ার গল্প আছে। ঠিক ঘোড়ার গল্প নয়, ঘোড়ার অভাবের গল্প।

মহারাষ্ট্রের এক মফস্বল শহরের চৌমাথায় দেখেছিলাম ছত্রপতি শিবাজির এক প্রস্তর মূর্তি। ছত্রপতির মুখ-চোখ, পাগড়ি ইত্যাদি যথাযথ, কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি কেমন যেন অবাস্তব, বিসদৃশ। দুটি পা দু'দিকে ছড়ানো, দুটি হাত নামানো-ওঠানো দু'রকম, পিঠের দিক থেকে শিবাজি কেমন যেন একটু ঝুঁকে আছেন। স্থানীয় এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কী?' তিনি মৃদু মৃদু হেসে বললেন, 'মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এই মূর্তিটা বসিয়েছে। অশ্বারোহী ছত্রপতির মূর্তির বায়না দেওয়া হয়েছিল। পরে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং টাকা কম পড়ায় ঘোড়াটিকে ছেঁটে দিতে হয়েছে কিন্তু ততদিনে ছত্রপতির মূর্তি অশ্বারোহীর ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে গেছে। তাই এই অবস্থা। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ঘোড়া বানিয়ে ছত্রপতির নীচে দিয়ে দেওয়ার।'

হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি

কোন এক প্রাচীন গ্রন্থে নাকি লেখা আছে, 'শিল্প হল জীবনের নকল।' কথাটা কথাটা অবশ্যই খুব দামি। তারাপদ রায়ের তুচ্ছ রচনায় এত মূল্যবান আলোচনা তরলমতি পাঠক-পাঠিকার পছন্দ নাও হতে পারে। সুতরাং শুরুতেই ব্যাপারটাকে সোজা রাস্তায় নিয়ে আসতে চাই।

কলকাতার এক খ্যাতনামা আধুনিক শিল্পী একদিন সন্ধ্যার অন্তিম পর্বে ওই সোজা রাস্তায় বাড়ি ফিরছিলেন। যেমন হয়, ফাঁকা রাস্তায়, এই মহানগরীর শেষতম ফ্যাশন, ট্যাক্সিবাহী ছিনতাইকারীরা তাঁর পাশে ট্যাক্সিটি দাঁড় করিয়ে তারপর ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নামে। চারজন তথাকথিত ডাকাত ছোরা, বোমা, পাইপগান এবং রিভলবার এইরকম চারটি বিভিন্ন অস্ত্র দেখিয়ে নিরীহ শিল্পীর হাতের আঙুল থেকে পলা-বাঁধানো রুপোর আংটি, কনুইয়ের ওপর থেকে অষ্টধাতুর মাদুলি, গলা থেকে গুরুদেবের ছবি লটকানো সোনার হার, এমনকী হাতের অন্য এক আঙুলের সাদা শঙ্খের আংটি সব সার্চ করে কেড়ে নেয়। সাধারণত এত জিনিস একজনের কাছে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই শিল্পী আধুনিক হলেও ভাগ্যচর্চা ও জ্যোতিষে আস্থাবান। তাঁর হাতে কোনও ঘড়ি বা পকেটে একটিও পয়সা ছিল না। সেজন্যে যাওয়ার সময় ট্যাক্সি-ডাকাতেরা টাকাপয়সা না পেলেও মারধর না করে শুধু একটি গলাধাক্কা দিয়ে যায়।

মাদুলি, আংটি ইত্যাদি ভাগ্যদায়ী এবং জীবন-রক্ষাকারী সাজসরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হয়ে তদুপরি গলাধাক্কার অপমানে শিল্পী মহোদয় কিছু হবে না জেনেও থানায় যান। সেখান থেকে পুলিশ সদর গোয়েন্দা দফতর। সেখানে গোয়েন্দারা যখন তাঁর নাম শুনে ধরতে পারে যে তিনি একজন খ্যাতনামা ছবি আঁকিয়ে তখন গোয়েন্দারা তাঁকে অনুরোধ করে যদি তিনি ডাকাতদের দু'-একজনের ছবি এঁকে দেন তাহলে হয়তো গ্রেপ্তার করা সহজ হবে। ভদ্রলোক বির্মূত শিল্পের সাধক, গোয়েন্দারা সেটা খেয়াল করেননি। ভদ্রলোকের আঁকা ডাকাতদের ছবি থেকে পুলিশেরা মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারে না। এমনকী কোন দিকটা সোজা, কোন দিকটা উলটো তা পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। সামনের দিক দিয়ে দেখলে চারটে টিভির অ্যান্টেনা বালির উপর পোঁতা রয়েছে। আবার উলটিয়ে দেখলে দুটো ভাঙা ছাতা। এক সরল প্রকৃতির কনস্টেবল ভুল করে সেটা উত্তর দক্ষিণে না ধরে পূব-পশ্চিমে পাশাপাশি ধরে দেখছিলেন, তিনি উপরওয়ালাকে বললেন, 'স্যার, এটা মনে হচ্ছে ইনকমপ্লিট সেকেন্ড হাওড়ার পুল। বোধহয় ডাকাতদের ওখানে খুঁজতে হবে।' টেবিলের ওপার থেকে উপরওয়ালা দারোগা সাহেব পূব-পশ্চিমের বদলে পশ্চিম-পূবে দেখছেন। তিনি বললেন, 'ইডিয়েট, সত্যরঞ্জন তুমি ইডিয়েট, এটা হল খালাসি-টোলার বন্ধ গেটের ছবি, ডাকাতেরা নিশ্চয়ই ভেতরে বসে বাংলা খাচ্ছে।'

অবশ্য সব ছবি যে এ রকম জটিল হয় তা নয়। শিশুও বুঝতে পারে। এক বাড়িতে যামিনী রায়ের অরিজিন্যাল দেখে একটি বাচ্চা মেয়ে বলেছিল, 'এটা কি আবার ছবি নাকি এটা তো ক্যালেন্ডার দেখে টুকে করেছে।' অন্যত্র এক প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম একটি বর্ষার ছবি। নদীতে নৌকো, ওপারে সবুজ গ্রাম, আকাশে মেঘ, খুব সম্ভব ইন্দ্র দুগারের আঁকা। সেই বর্ষার ছবির সামনে এক ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর পাশে দণ্ডায়মানা ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'কী গো শরৎকালের জন্যে অপেক্ষা করছ নাকি?'

ছবির বর্ষার আকাশে মেঘ চিরদিনই একরকম থেকে যায় যে সে কোনওদিনই শারদীয়ায় পৌঁছবে না। বরং জটিলতার কথা বলি।

পাবলো পিকাসো একদা বলেছিলেন, 'লোকেরা আজকাল আর শিল্পের মধ্যে সান্ত্বনা বা প্রেরণা খুঁজে পেতে চায় না। অলস, বড়লোক তারাই এখনকার রুচির মালিক, তারা চায় অসাধারণ কিছু অভিনব, উত্তেজক, এলোমেলো। আর আমি এইসব লোকদের তৃপ্তিবিধান করে এসেছি যা কিছু অসংলগ্ন, উলটোপালটা আমার মাথায় এসেছে তাই দিয়ে। আর এরা সেসব যত কম বুঝেছে ততই বেশি প্রশংসা করেছে।'

পিকাসো অকপটে স্বীকার করেছেন যে তিনি এই হাস্যকর খেলায়, এই মনমাতানো পাগলামিতে জড়িয়ে রচনা করেছেন যত সব ধাঁধা আর প্রহেলিকা। 'ফলে আমি বিখ্যাত হলাম, দ্রুত বিখ্যাত হলাম। আর খ্যাতি, আজকের যুগের একজন শিল্পীর প্রতিষ্ঠা মানেই বিক্রি, লাভ, সম্পদ। তোমরা জান আমি আজ বিখ্যাত এবং বিরাট বড়লোক।'

যদিও কলম একটু ভারী হয়ে যাচ্ছে পিকাসোর এর পরের কথাগুলো না লিখলে অন্যায় হবে। পিকাসো বলেছেন, 'যখন আমি একা একা নিজের সঙ্গে থাকি তখন আমার ভরসা হয় না নিজেকে শিল্পী বলে বিবেচনা করতে। যে মহৎ অর্থে রেমব্রাঁট বা গয়াকে গিয়োটো বা টিটিয়ানকে শিল্পী ধরা হয়। আমি আসলে সামান্য পাবলিক এন্টারটেনার, যে তার সময়কে বুঝতে পেরেছে।'

এবার একটু নরম জায়গায় ফিরে যাই। প্রথমে একটা ছবির কথা বলি। নীল আকাশের নীচে নীল সমুদ্র, সমুদ্র যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে সেখানে একটি লাল সূর্য। ফিকে নীলের নীচে ঘন নীল, মধ্যে রক্তসূর্য, সূর্যরশ্মির লোহিত তরঙ্গ এবং সমুদ্রের নীল তরঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ছবিটিতে কোনও নাম লেখা নেই, শুধু নম্বর লাগানো আছে। এই রকম কাঁচা ছবি আমাকে খুব টানে। অনেকক্ষণ ছবিটা দেখে আমি ভাবলাম, এটা সূর্যোদয়ের ছবি না সূর্যাস্তের ছবি? প্রদর্শনীতে ছবিটা দেখছিলাম, পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তিনিও ছবিটার পাশে অল্প সময় মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'বাঃ, চমৎকার সূর্যাস্তের ছবি।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে ধরে ফেললাম, 'কী করে বুঝলেন সূর্যাস্ত? সূর্যোদয় নয় কেন? সূর্য উঠছে না ডুবছে কী করে বোঝা যায়?' ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'যে এঁকেছে তাকে আমি চিনি, সে জীবনে কোনওদিন সকাল সাড়ে নটার আগে ঘুম থেকে ওঠেনি। সূর্যোদয় দেখেছে কবে, আঁকবে যে?'

আমি কিন্তু নিজে বিশ্বাস করি না যে সূর্যোদয়ের ছবি আঁকবার জন্যে সূর্যোদয়ের অভিজ্ঞতা দরকার। এ নিয়ে এখনই প্রচুর বাদবিতণ্ডা করা যেতে পারে। আমি নিজে বাদবিতণ্ডায় যাব না, বরং বিখ্যাত কার্টুনিস্ট লক্ষ্মণ মধ্যে মধ্যে গোলমাল বাঁধান, তাঁকে স্মরণ করছি। লক্ষ্মণের একটা কার্টুনে আছে, শিল্পী দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে কোট-প্যান্ট-টাই পরা এক ভদ্রলোক ইজেলে তুলি বোলাচ্ছেন, আর শিল্পী হাসিমুখে বলছেন, 'ইনি শিল্পসমালোচক, ইনি আমার ছবি এত ভাল বোঝেন যে এখন থেকে আমার সব ছবি উনিই আঁকবেন।' জীবনানন্দ দাশের সেই সমালোচক যাঁকে জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা', লক্ষ্মণ তাঁকেই কার্টুনস্থ করেছেন।

লক্ষ্মণের আরেকটি কার্টুনে আছে, চিত্রপ্রদর্শনীতে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়ে গেল শিল্পীর তুলি মোছার ক্যানভাসটি। হতভম্ব শিল্পী অবাক হয়ে রূপসী ক্রেতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আর পরিহাস নয়, অবশেষে একটা দুঃখের কথা বলি। এক শিল্পী তাঁর নবপরিচিত বন্ধুকে বলছিলেন, 'দশ বছর ছবি আঁকার পর আমি ধরতে পারি আমার ছবি আঁকার প্রতিভা নেই, ক্ষমতাই নেই।' বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তখন কী করলেন, ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন?' শিল্পী করুণ হেসে বললেন, 'কী করে ছাড়ব? তখন আমার নাম হয়ে গেছে, প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।'

প্রজাপতয়ে

এক সরলমতি যুবককে বিয়ের আগে তার প্রেমিকা বুঝিয়েছিল যে সে গান জানে না বটে তবে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে। বিয়ের পরে সেই যুবক আবিষ্কার করে যে তার প্রাক্তন প্রেমিকা মানে বর্তমান স্ত্রী যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে সেগুলি হল, রেডিও, গ্রামোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি। এই প্রবঞ্চিত যুবকটি এর পর কতটা আহত এবং ব্যথিত হয়েছিল, সেই পরিণয় সুখের হয়েছিল কিনা সে তথ্য আমার জানা নেই।

বিয়ের ব্যাপারে লোকেরা বড় উলটোপালটা প্রত্যাশা করে। ছেলেরা যেমন, মেয়েরাও তেমনি। যে কোনও রবিবারের খবরের কাগজে পাত্রপাত্রীর কলম দেখলেই দেখা যাবে শব্দ ও পঙ্‌ক্তির মধ্যে ফাঁকগুলি অলীক দুরাশায় ভরা। এগুলি শুধুই যে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকের রচনা তা নয়, পাত্রপাত্রীর মৌন বা স্পষ্ট দাবি অনুসরণ করেই এই সব বিজ্ঞাপন।

শুধু বিজ্ঞাপন বা সম্বন্ধ করে বিয়েতে নয়, ভালবাসার বা পছন্দের বিয়েতে, যাকে এককালে লভ ম্যারেজ বলা হত, তাতেও এ সমস্যা কম নয়। সোনা গয়না, আসবাবপত্র, প্রণামী, ননদ পুঁটলি, তত্ত্ব ইত্যাদির কথায় আসছি না, আইন-আদালতের বধূনির্যাতন কলমে যে কেউ তার বিশদ বিবরণ পাবেন। বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে কিছু বলার নেই, তবু বিবাহের মতো মধুর বিষয়কে বিষণ্ণ করার চেয়ে একটু অন্য কথায় যাই।

শিবরাম চক্রবর্তী একবার তাঁর বিখ্যাত 'অল্পবিস্তর' কলমে একটি কাল্পনিক বিয়ের বিজ্ঞাপনের অংশবিশেষ ছেপেছিলেন। হুবহু মনে পড়ছে না, কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনের অনেকটা এই রকম, 'পাত্রীর বাড়ি থাকা প্রয়োজন, বাড়ির ফটো সহ আবেদন করুন।'

বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, সোনা-দানা মোটামুটি দাবির বহর হয়তো কোনও ক্ষেত্রে ভালভাবেই অনুমান করা যায়। আসল বিপদ রক্তমাংসের মানুষ বা মানুষী, আসল যে পাত্রপাত্রী তাদের নিয়ে। সে সম্পর্কে অর্থাৎ ভাবী স্ত্রী বা ভাবী স্বামী সম্পর্কে বহু বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতীও ভুল কল্পনায় ডুবে থাকে।

পরশুরামের দাঁড়কাগ গল্পে কাঞ্চন মজুমদার বলেছিল, 'বিয়ের জন্য আমি সত্যিই চেষ্টা করছি। কিন্তু যাকে তাকে ত চিরকালের সঙ্গিনী করতে পারি না। হঠাৎ প্রেমে পড়ার লোক আমি নই, আমার একটা আদর্শ, একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড আছে। রূপ অবশ্যই চাই, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি কালচারও বাদ দিতে পারি না। ... মনের মতন স্ত্রী আবিষ্কার কি সোজা কথা?'

কেবল স্ত্রী আবিষ্কার নয় স্বামী আবিষ্কার করাও যথেষ্ট কঠিন। এক বিদেশি গল্পের নায়িকা বলেছিল, 'আমি যাকে বিয়ে করব সে হবে সুন্দর, মার্জিত, ঝকঝকে, আধুনিক। সে নাচতে পারবে, গাইতে পারবে। সব সময়ে ঘরে থাকবে, অসময়ে চা চাইবে না, মেঝেতে সিগারেটের ছাই ফেলে নোংরা করবে না, বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়িতে আড্ডা বসাবে না।' এই কথা শুনে তার প্রেমিকেরা সবাই এই প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষমতা তাদের নেই জেনে চলে গিয়েছিল। শুধু শেষ প্রেমিকটি যাওয়ার সময়ে বলে যায়, 'হে সুন্দরী, তুমি তোমার মতো একলাই থাক। আসলে তুমি কোনও স্বামী চাইছ না, চাইছ একটা টেলিভিশন সেট। সুন্দর, ঝকঝকে। নাচতে পারে, গাইতে পারে, সব সময় ঘরে থাকে। তুমি যা যা চাও ঠিক তাই।'

অনেকে আবার এত চায়ও না, এমনি এমনিই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এক সুরাসক্ত যুবক এবং এক সুন্দরী রমণীকে আমি বহু বছর আগে চিনতাম। অনেককাল ধরে তারা পরস্পর প্রণয়াসক্ত ছিল কিংবা বলা উচিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিল, কিন্তু তাদের বিয়ে আর হয় না। মধ্যে অনেকদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কোনও খবরও রাখি না। হঠাৎ একদিন বিয়ের চিঠি এসে হাজির। বিয়ের বাসরে গিয়ে নবদম্পতিকে বললাম, 'বিয়ের আগে এতকাল প্রেম করা যায় জানতাম না। প্রাক বিবাহ প্রেমের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে তোমরা রেকর্ড রচনা করছে। গিনেস রেকর্ড বইতে ঠিকমতো গুছিয়ে লিখে পাঠাতে পারলে ছাপা হবে।' পাত্রীর নাম সুরমা। সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হেসে পাত্র বলল, 'বুঝলেন তারাপদদা, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। আমার যখন মদ খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে, যখনই নেশা করি, সুরমা আর আমাকে বিয়ে করতে চায় না।'

সুরমা মেয়েটি বুদ্ধিমতী। পরের অংশটুকু সে নিজেই বলল, 'আর নেশা কেটে গেলে ও আর আমাকে বিয়ে করতে চায় না।' ব্যাপারটা মারাত্মক— পাত্র নেশা করলে পাত্রী তাকে চায় না আবার নেশা কেটে গেলে পাত্র-পাত্রীকে চায় না। রীতিমতো চৈনিক ধাঁধা, আঠারো বছর লেগেছে এ ক্ষেত্রে সমাধান হতে।

এর চেয়ে অনেক সহজ সমাধানের নীচের দূরভাষ কথোপকথন।

কুমারী মালতীলতার শয়নকক্ষ, রাত বারোটা, সহসা ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। নিদ্রাজড়িত চোখ কচলিয়ে মালতীলতা টেলিফোন ধরলেন।

মালতীলতা : হ্যালো। হ্যালো।

পুরুষকণ্ঠ : কে, মালতীলতা?

মালতীলতা : হ্যাঁ, আমি মালতী বলছি।

পুরুষকণ্ঠ : মালতী, মালতী, মালতীলতা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

মালতীলতা : (একটু থেমে) কেন করব না?

পুরুষ কণ্ঠ : সত্যি, কথা দিচ্ছ? বিয়ে করবে?

মালতীলতা : হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি। বিয়ে করব।

আচ্ছা তুমি কে কথা বলছ?

এই গল্পের নায়িকা মালতীলতা বিয়ে করতে রাজি আছে, কাকে বিয়ে করবে তা নিয়ে মাথাব্যথা কম। ঠিক এরই একটি বিপরীত ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আমার আগের পাড়ার এক প্রতিবেশী, রমণীবৎসল জনৈক যুবক মাস দেড়েকের জন্যে কলকাতার বাইরে যান। ফিরে এসে আমাদের পুরানো বাড়ির বাইরের ঘর থেকে তাঁর এক বান্ধবীকে ফোন করছিলেন। আমি সামনের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। টেলিফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভদ্রলোকের চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কথা সাঙ্গ করে টেলিফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'সর্বনাশ।' অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে কৌতূহল না দেখানোই ভাল, তবু সর্বনাশটা যখন আমার সামনেই উচ্চারিত হল, আমি সমবেদনা দেখাতে বললাম, 'কী হল? সর্বনাশ কেন?' যুবকটি কপাল চাপড়ে বলল, 'আর সর্বনাশ! আমার বান্ধবীটি বিয়ে করবে ঠিক করেছে। আমি এই ছয় সপ্তাহ ছিলাম না। এরই মধ্যে এ রকম হয়ে গেল। আজকালকার দিনে কাউকে আর বিশ্বাস করা যায় না।' ভদ্রলোক রীতিমতো হা-হুতাশ শুরু করে দিলেন। আমি শান্ত করার জন্য বললাম, 'এতে মন খারাপ করবেন না। আপনার তো পরিচিত অনেক মেয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কাউকে মনস্থ করে বিয়ে করে ফেলুন।' আমার কথা শুনে ভদ্রলোক প্রমাদ গুনলেন, 'অন্য কাউকে তো আমি আর বিয়ে করতে পারব না।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী?' যুবকটি বিপদগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'আরে যার সঙ্গে ফোনে কথা বললাম, ওই বান্ধবীটিই তো আমাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে।'

পুনশ্চ: একবার আদালতে দেখেছিলাম উকিলবাবু এক বেয়াড়া সাক্ষীকে জেরা করছেন,

'আপনি বিবাহিত?' সাক্ষী জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' উকিলবাবুর আবার প্রশ্ন, 'আপনি কাকে বিয়ে করেছেন?' সাক্ষীর উত্তর, 'একজন মহিলাকে।' বিরক্ত উকিলবাবুর ফের প্রশ্ন, 'মহিলা ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিয়ে হয়?' সাক্ষীর উত্তর, 'হ্যাঁ, হয়।' উকিলবাবু উত্তেজিত, 'মানে?' সাক্ষীর সরাসরি জবাব, 'আমার বোনই এমন একজনকে বিয়ে করেছেন যে মহিলা নয়, পুরুষ মানুষ।'

একটি উড়ো কাহিনী

শ্রীলঙ্কায় তামিলদের সঙ্গে সিংহলিদের দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে। অনেক সংবাদপত্রে সেটাই মুখ্য সংবাদ। আমরা ভারতীয়রা স্বভাবতই তামিলদের প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল। কিন্তু এরই মধ্যে একটা কথা উঠল, এবং জোর আলোচনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে সিংহলিরাই আমাদের, মানে বাঙালিদের আপনজন। কয়েক হাজার বছর আগে সমুদ্রপথে সিংহল জয় করে বাঙালিরা উপনিবেশ স্থাপন করে। এই তো সেদিন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার নাম ছিল সিংহল, আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ যে হেলায় লঙ্কা জয় করে সিংহল নামে তার শৌর্যের পরিচয় রেখে গেছে এ তো বাঙালি শিশুমাত্রেই ছোটবেলায় কণ্ঠস্থ করেছে। ওই বিজয় সিংহ এবং তার অনুচরদের বংশধররাই নাকি এ যুগের সিংহলি।

সিংহলিদের ইতিহাস, ভাষা, আচার-আচরণ, নাম-গোত্র, সংস্কার-ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি গবেষণা করে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত প্রায় প্রমাণ করেই ফেললেন যে বাঙালিরাই সিংহলি। খোদ সিংহলে সিংহলি বিদ্বানেরা পর্যন্ত কবুল করে বসলেন, আমরা হলাম বাঙালিদের বংশধর।

এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, একজন বাঙালি হিসেবে আমাদের গৌরব বোধ করা উচিত, পূর্বপুরুষের এই উজ্জ্বল অভিযানের ঐতিহ্যের অধিকারী হয়ে।

এদিকে আবার কথা উঠেছে যে যাযাবার রোমারা, যাদের জিপসি বলা হয় তারাও নাকি আদি বাঙালি। তাদের দেবতার নাম কালো বা কালী, তাদের ফরাসি দেশে মানুষ বলে ডাকা হয়। তাদের সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদির মধ্যে বাংলার ছাপ নাকি স্পষ্ট।

কিছুকাল আগে চন্ডিগড়ে বিশ্ব রোমা উৎসব হয়ে গেল। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যাযাবার জিপসিরা সেই উৎসবে যোগদান করেছিল। ঠিক তখনই চন্ডিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন যে, রোমারা আসলে বাঙালি। বহুদিন আগে এরা সমুদ্রপথে ইউরোপে যায়। তারপর থেকে যাযাবর জিপসিদের জীবনযাপন করছে। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে অধ্যাপক মহোদয় যথেষ্ট নজিরও উপস্থাপন করেন।

ইতিহাসের প্রামাণ্য প্রবক্তারা, খাঁটি পণ্ডিতেরা এই সব তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ কতটা পাত্তা দেবেন কিংবা মেনে নেবেন তা আমার মতো সামান্য লোকের পক্ষে বলা কঠিন। বাঙালির এই গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কিছুকাল আগে শোনা একটি গল্প, একটি উড়ো কাহিনী।

কলকাতা থেকে দিল্লিগামী নৈশ বিমানে ঘটনাটি ঘটেছিল। নিশাকালে বিমানটি ছাড়ে বলেই

এটি নৈশ, তা নয়, বহু লোক নেশা করে এই বিমানে ওঠে বলেও এটি প্রকৃত অর্থে নৈশ বিমান। এই বিমানে কলকাতা থেকে একজন বিখ্যাত ভদ্রলোক যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের নাম ধরা যাক ঙ বাবু। তিনি যাচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত দরকারি কাজে। ভদ্রলোকের হাতে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা বাঁশের চুপড়ি। বাঁশের চুপড়িটা একটা ঢাকনা দিয়ে আটকানো, কিন্তু ভালভাবে আটকানো নয়, বেশ একটু ঢিলে।

ঙ বাবু জানলার পাশের সিটে বসে রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। প্লেন একটু আগে ছেড়েছে। ঙ বাবুর পাশের সিটের বাসিন্দা হলেন এক বুড়ি মেমসাহেব। তোবড়ানো গালে প্রসাধন, শুকনো ঠোঁটে লিপস্টিক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চোখ দুটি কিন্তু কৌতূহলী। প্লেনের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেমসাহেব সব খুঁটিয়ে দেখছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিব্রাজিকারা যেমন করেন তেমনই আর কী। সব কিছু দেখার পর পাশের সিটে ঙ বাবুর দিকে তাকিয়েই মেমসাহেবের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সর্বনাশ বাঁশের চুপড়ির ডালাটা একটু আলগা, আর সেই ফাঁকে দুটি বীভৎস কৃষ্ণবর্ণ দাঁড়া আকুলিবিকুলি নড়াচড়া করছে, বেরিয়ে আসার জন্যে বারবার ঠেলে তুলছে চুপড়ির ডালাটা।

মেমসাহেব তাঁর পিঙ্গল চক্ষুতারকাদ্বয় কপালে তুলে, 'আ আ... আ আ...আ' করে স্বরগ্রামে সাংঘাতিক আর্তনাদ করে উঠলেন।

সবে সিটবেল্ট খুলে যাত্রীরা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলেন, তাঁরা এই অকল্পিত আর্তনাদে চমকিয়ে উঠলেন। এদিক-ওদিক দুই-একটি শিশু ক্রন্দন জুড়ে দিল, এক পাঞ্জাবি মহিলা হাইজ্যাকিং হচ্ছে ভেবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। দু'-তিনজন যাত্রী দৌড়ে গেটের দিকে ছুটে গেলেন, যেন মহাশূন্যে গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই আপাতত রক্ষা।

ঘটনার আকস্মিকতা যতই হোক, এরই মধ্যে একজন ঠান্ডা মাথার এয়ার হোস্টেস ঘটনার কারণ আবিষ্কার করে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে গেলেন ঙ বাবুর রোয়ের দিকে, তারপর ঙ বাবুর হস্তধৃত চুপড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, 'ও কী! আপনার হাতে ওটা কী, ওসব কী?'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার দরকার। শ্রীযুক্ত ঙ বাবুর ওই বিপজ্জনক চুপড়িতে রয়েছে এক ডজন বড় কাঁকড়া। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এঁদো পানাপুকুরের কাদা, কচুরিপানা এবং শ্যাওলার মধ্যে এই সুস্বাদু প্রাণীগুলোর জন্ম ও বসবাস। ঙ বাবুর জামাতা বাবাজীবন দিল্লিতে চাকরি করেন। জামাতাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক এবং কাঁকড়াবিলাসী। ঙ বাবু তাই দিল্লি যাওয়ার সময় যদি সম্ভব হয় দু'-একটা কাঁকড়া জামাতার জন্যে নিয়ে যান। এইভাবে বাঁশের চুপড়িতে ভরে নিয়ে যাওয়াই সহজ, কাঁকড়াগুলো মরে না বেশ তরতাজা থাকে। আর তা ছাড়া কয়েকটা জ্যান্ত কাঁকড়া লাগেজের মধ্যে বা অ্যাটাচি কেসের মধ্যে ভরে দেওয়া যায় না।

প্রত্যেক বারই নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেছেন ঙ বাবু। কেউ খেয়ালই করেনি, এমন কী সিকিউরিটির লোকেরাও কাঁকড়ার ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আজ এ কী দুর্বিপাক, এ কী অঘটন।

প্লেনসুদ্ধ যাত্রী একসঙ্গে চেঁচামেচি করছে ঙ বাবুর উপর, পাইলট সাহেব কো-পাইলটের হাতে প্লেনের দায়িত্ব দিয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন, 'আপনি কি পাগল না কি মশাই। কাঁকড়া বিছে নিয়ে কেউ প্লেনে ওঠে!' ততক্ষণে পার্শ্ববর্তী বুড়ি মেমসাহেবকে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে দূরবর্তী একটা শূন্য সিটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই মিলে আঙুল উঁচিয়ে ঙ বাবুর কাছে জানতে চাইছে, 'ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?'

থতমত ঙ বাবু উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'বন্ধুগণ আপনারা না জেনে অত উত্তেজিত হবেন না। আমার এই হাতের বাঁশের চুপড়ির মধ্যে বাঘ নয় ভালুক নয়, সাপ নয়, এমনকী কাঁকড়া বিছে নয়, আছে সামান্য কয়েকটি কাঁকড়া। নিতান্তই দিশি, ভেতো বাঙালি কাঁকড়া।'

পাইলট সাহেব নিজে বাঙালি, তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কাঁকড়ার আবার বাঙালি-অবাঙালি কী?' ঙ বাবু বললেন, 'আরে সেই কথাটাই তো বোঝাতে চাইছি। আরে মশায়রা এই যে দেখছেন এগুলো সব খাঁটি বাঙালি কাঁকড়া। এই যে দেখছেন একটা উঠে আসতে চাইছে বাকিগুলো একে নীচ থেকে দাঁড়া দিয়ে টেনে ধরেছে। কারও বাপের সাধ্যি নেই যে বেরিয়ে আসে, যতবারই উঠতে যাবে বাকিরা সবাই মিলে টেনে নামিয়ে নেবে। দয়া করে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এই বাঙালি কাঁকড়াদের একজনেরও সাধ্য নেই উঠে আসে, ওরা এই চুপড়ির মধ্যে থাকতে বাধ্য।'

এই কাহিনীর শেষ নেই, বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গেও এর কোনও যোগ নেই। শুধু বাঙালি সম্পর্কে এত কথা লেখার পর বাঙালিনী বিষয়ে তিন পঙ্‌ক্তি না লিখলে অন্যায় হবে। পঙ্‌ক্তিত্রয় আমার নয়, পরশুরামের, রাজমহিষী গল্পে আছে :-

'সোনামুখী বাঙালিনী পাগল করেছে,
যাদু করেছেরে হামায় টোনা করেছে।
ঝমঝেমে ঝঁয় ঝঁয়, ঝমে ঝমে ঝঁয়।'

সময়জ্ঞান

সময়—প্রায় মধ্যরাত্রি। শুভ-বিবাহের তিথি ছিল। কিছুক্ষণ পরে পরে বিবাহবাসর প্রত্যাগত দু'-একজন পথচারীকে দ্রুতপদে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে।

চৌমাথার কাছাকাছি একটা বেশ বড় গাছের ছায়ায়, প্রায় চার-পাঁচজন যুবক দাঁড়িয়ে। তাদের একজনের হাতে একটা ছোরা, নাপিতেরা যেভাবে কখনও কখনও হাতের তালুতে ক্ষুর অনায়াস বিদ্যুৎগতিতে ঘষে নেয়, সেই রকম ভাবে সে মধ্যে মধ্যেই ছোরাটা তালুতে বুলিয়ে নিচ্ছে। ছোরা বোলানোর সাবলীল অথচ অন্যমনস্ক ভঙ্গি দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে ছোরা ব্যবহারে তার পারদর্শিতার অভাব নেই।

বাকি কয়েকজনকে দেখেও ভালই বোঝা যায় যে এরা সকলেই এর উপযুক্ত সঙ্গী। তাদের পোশাক-চেহারা ইত্যাদি বর্ণনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শুধু একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে একজনের হাতে একটি দামি হাতঘড়ি, সে ল্যাম্প-পোস্টের আলোর ঠিক নীচে, ফুটবল খেলার শেষদিকে রেফারিরা যেমন চকিত অভিনিবেশে ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ রাখেন, সেও সেই কায়দায় বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

যদিও গভীর রাত্রি, যদিও কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তবুও একে বড় চৌমাথা তার উপরে বিয়ের লগ্ন ছিল, তাই এখনও লোকজন যাতায়াত চলছে।

যখন খুব একটা বড় দল একসঙ্গে আসছে এই যুবকবৃন্দ নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু যেই দূরে দেখা যাচ্ছে শুধু একজন লোক এগিয়ে আসছে কোনওদিক থেকে, অমনই এদের মধ্যে সেই যার হাতে ছোরা সে পূর্ববর্ণিত বিদ্যুৎগতিতে হাতের তালুতে ছোরা বোলাতে বোলাতে সেই পথচারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সেই ভদ্রলোক, যিনি এতক্ষণ একা একা আসছিলেন, এখন হঠাৎ চোখের সামনে অন্ধকার

গাছের ছায়ায় একসঙ্গে ওই কয়েকজনকে দেখে এবং তার মধ্যে আবার একজনের হাতে শাণিত অস্ত্র— এই অবস্থায় কী রকম বোধ করলেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে বুঝিয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু না, সত্যি মারাত্মক কিছু ঘটল না। ছোরাধারী একটি মাত্র নিরীহ প্রশ্ন করল, 'দাদা, ক'টা বাজে?'

ভদ্রলোক আঁতকে উঠে, কোনো রকমে দম সামলিয়ে নিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'এই সো-সো-সোয়া বারোটা।'

ছোরাধারী ধমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, 'সোয়া বারো-টারো চলবে না, মশাই, রাইট টাইম বলুন।'

ভদ্রলোক আরও ঘাবড়িয়ে গেলেন, কিছু বুঝতে পারছিলেন না তিনি। আরও আমতা আমতা করতে লাগলেন। এইবার ছোরাধারীর পিছন থেকে, যার পরনে পাজামার সঙ্গে হাওয়াই শার্ট, সম্ভবত একটু নরম চরিত্রের লোক, সামনে এগিয়ে এল, ঠান্ডা গলায় বলল, 'দাদা, ক'টা বেজে ক' মিনিট একটু ভাল করে দেখে বলুন।'

হতভম্ব ভদ্রলোক কিছুই না বুঝতে পেরে তবু গণৎকার জন্মসময় জানতে চাইলে যেমন নিখুঁত ভাবে বলার চেষ্টা করা হয় প্রায় সেই ভাবে বললেন, 'বারোটা বেজে এগারো মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ড।'

গাছের থেকে একটু দূরে ল্যাম্প-পোস্টের নীচে সেই যার হাতে দামি ঘড়ি, সে ঘড়ির দিকে এক নজরে তাকিয়ে রয়েছে, ভদ্রলোক সময় বলা মাত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে ছোরাধারী উচ্চকণ্ঠে রিলে করে দিল, 'এই জগা, বারোটা এগারো পঞ্চাশ।' জগা অর্থাৎ দামি ঘড়িওয়ালা ঘড়ির দিকে তাকিয়েই জবাব দিল, 'ছেড়ে দে।'

এই শুনে ছোরাধারী একটু যেন রেগে গেল, চাপা কণ্ঠে দাঁত ঘষে বলল, 'ভাগুন মশায়, খুব হয়েছে।'

সত্যিই এরা তাকে ছেড়ে দিল একথা বিশ্বাস করতে পথচারী ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছিল, কেন কী হল, কিছুই বুঝতে না পেরে তিনি ইতস্তত করছিলেন, এইবার ছায়ার ভিতর থেকে অন্য আরেকজন গালাগাল দিয়ে উঠল, 'ভাগ, আর ন্যাকামি করিস নে।'

বল বাহুল্য এর পর ভদ্রলোক দর্শনীয় দৌড় দিলেন, একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে।

ইতিমধ্যে মোড়ের মাথায় দ্বিতীয় একজন পথচারীর আবির্ভাব, আবার সেই একই ছমছমে নাটক, সেই ছোরাধারী, সেই টাইম, বারোটা ষোলো সাতাশ। দূরে আলোর নীচে থেকে ঘড়ি দেখে জগার নির্দেশ এল, 'ছেড়ে দে।' কিছু গালাগাল দিয়ে এই ভদ্রলোককেও এরা বিদায় করে দিল। কলকাতার মধ্যরাত্রির অভিজ্ঞতার স্মৃতিমালায় আরেকটি গল্প যোগ হল।

এই ভাবে চলল তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর কেস। কিন্তু ষষ্ঠ পথিকের ভাগ্য বোধহয় খুব খারাপ ছিল। তিনি যেই বললেন বারোটা সতেরো মিনিট দশ সেকেন্ড ছোরাধারী রিলে করার আগেই ল্যাম্পপোস্টের নীচ থেকে জগা ঘড়ি দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'রেখে দে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোরাধারী তার ছোরাটা ভদ্রলোকের নাকের ডগায় উঁচু করে বলল, 'সাবাস দাদা, ঘড়িটা খুলে দিন তো।'

এখন ঘটনা হয়েছিল যে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ পথিক দু'জনেই একসঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে বিয়েবাড়ির লাস্ট ব্যাচ সেরে ফিরছিলেন, ৫ম পথিককে এরা একটু আগেই ভাগিয়ে দিয়েছে, তিনি এখন দূরে দৌড়ে যাচ্ছেন, তাঁর ঘটনাটি ৬ষ্ঠ জনের চোখের সামনেই ঘটেছে সুতরাং ৬ষ্ঠ জন ভেবেছেন এটা কোনও হাসি তামাশা, মাতাল বা পাগলের প্রহসন। তিনি একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই কিন্তু তাঁর হাত থেকে এরা ঘড়িটা টান দিয়ে খুলে নিল। পুরো ঘটনা কিছু বুঝতে না পেরে তিনি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

বেশ দূরে আরেকজন শিকারকে আসতে দেখে ছোরাধারী তাকে ভাগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বুঝলেন দাদা রাইট টাইম, এক রাতে একশোটা ঘড়ি ছিনতাই করা যায়। কিন্তু বাজে ঘড়ি

ছেনতাই করে লাভ কী? কিনতে চায় না, পাঁচ সেকেন্ড টাইম এদিক-ওদিক হলে সে ঘড়ি আমরা ছুঁই না, এত বাজে ঘড়ি বেচবো কোথায়।' এই বলে ভদ্রলোকের ঘাড়ে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে দশ হাত পার করে দিল, সঙ্গে একটা শেষ সান্ত্বনা বাক্য, 'তবে আপনার ঘড়ি ফাস্ট ক্লাশ পাক্কা টাইম।'

আমাদের কলের গান

আধ মাইল নদীর ওপারে একজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরেছে। সন্ধ্যার উজনি বাতাসে সেই গানের সুর এপার থেকে শোনা যাচ্ছে। একটু পরে বাদাম গাছের পরের মাঠটা পার হয়ে কাঁচি সিগারেটের মেজাজি গন্ধ আসবে। নৈশভোজন শেষে সবাই বুঝতে পারবে রাত নটা বাজল। এবার বড় তরফের ছোটবাবু ঘুমোতে যাবেন এবং সত্যি কয়েক মিনিটের মধ্যে বাইরের কাছারিঘরে দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজবে তবে কেউ যদি গোনে, দেখবে নটা নয় দশটা বাজল। যারা জানে তারা একটা বাদ দিয়ে গুনবে। ঘড়িটা একটু গোলমেলে। সব সময় একবার বেশি বাজে। শুধু বারোটার সময় তেরোবার না বেজে একবার বাজে এবং এইভাবে দিনের কাজ পুষিয়ে নেয়।

এর পরে একটু করে হ্যারিকেন লণ্ঠনের সলতেগুলো নামিয়ে নিবু-নিবু করে খাটের নীচে রেখে দরজা বন্ধ করে একে একে সবাই শুয়ে পড়বে। কাল সকাল থেকে আবার ব্যস্ততা। বর্ষা এসে যাচ্ছে, বাড়ির সামনে খালটার বাতায় বেশ উঁচু আর শক্তসমর্থ করে মাচা বেঁধে রাখতে হবে। সারা বর্ষা সেখানে বসে যাতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা যায়। বর্ষার মধ্যে নদী থেকে কত বড় বড় চিতল বোয়াল খালের মধ্যে ঢুকে পড়বে, তার একটাকেও এ-বাড়ির বুড়ো কর্তা রেহাই দিতে রাজি নন, সারা বর্ষা বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ছাতা মাথায় সেই মৎসমঞ্চে পিতামহ অবস্থান করবেন। কিন্তু তাঁর পুত্রদের মাছের প্রতি আসক্তি তেমন নেই, তাঁরা মহাযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। জাপানিরা যদি এসে পড়ে তবে অব্যর্থ অস্ত্র হবে লঙ্কার গুঁড়ো এই থিয়োরিতে দুই পিতৃব্য সকাল সন্ধ্যা ছাদে উঠে হামানদিস্তায় লঙ্কার গুঁড়ো করে যাচ্ছেন, সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত এক ক্রোশের মধ্যে কাজ-কারবার সমস্ত বন্ধ, হাঁচি আর কাশি ছাড়া কথা নেই। আরেকজন নির্বিকার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এবং উচ্চাভিলাষী; বলিভিয়া না আর্জেন্টিনা কোথায় হেমন্তকালে পাতা কুড়োনোর প্রতিযোগিতা হয়। তিনি গৃহের ও প্রতিবেশীদের জন-পনেরো শিশু জোগাড় করে কার্নিশে বসে এক ধামা শুকনো কাঁঠাল পাতা উড়িয়ে দিচ্ছেন। যে যতগুলো কাঁঠাল পাতা কুড়িয়ে এনে জমা দেবে সে ততগুলো নতুন গিনির মতো ঝকঝকে ছয় নম্বর জর্জের মাথার ছাপ দেওয়া বড় তামার পয়সা পাবে।

এই রকম চমৎকার পরিবেশের মধ্যে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় কী সব কমিশনের ব্যবসা ছিল তাঁর, সেই আমলে প্রতিদিন দাড়ি কামাতেন, কোট-ফুলপ্যান্ট-টাই পরে ঘুরতেন, তিনি একটা কুকুরমার্কা চোঙা গ্রামোফোন নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তিন দিন তিন রাত্রি ধরে চলল যন্ত্র বনাম প্রকৃতির লড়াই। সেই আত্মীয় চার বেলা চর্বচোষ্য খান, বাজার ঘুরে দুধের দাম ছ' পয়সা

হয়েছে বলে আর টাকায় সাতটার বেশি ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ফিরে এসে হাত-পা ছুড়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো একা একাই রাগারাগি করেন। তারপর রাগ ঘুরিয়ে নেন আমাদের পিতামহের দিকে, যুদ্ধের বাজারে এমন জিনিস পাবেন কোথায়? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন, পরে পচবেন। আর বৃদ্ধ ক্ষেপে যান নেমে আসেন তাঁর সুপরিকল্পিত অর্ধ সমাপ্ত বর্ষাকালীন মাচা থেকে (তাঁরই এক পুত্র এটার নাম দিয়েছিল নোয়ার নৌকা) নেমে এসে লম্বা টানা বারান্দায় খড়ম খটখট করতে করতে দৌড়োদৌড়ি করেন, চিৎকার করতে থাকেন, 'লম্পট বদমায়েস কোথাকার। আমার বাড়িতে কলের গান। খুব সাহস হয়েছে তোমার, বাড়ির বউ-ঝি সব বখে যাবে, ছেলে-পিলে মানুষ হবে না। তুমি অখিল মামার নাতি তাই তোমাকে কিছু বলছি না, আর কেউ হলে সোজা পুলিশের হাতে চালান করে দিতাম।'

সেই অখিল মামার নাতি মহোদয়টি কিন্তু সত্যিই অকুতোভয়। গালাগাল রাগারাগির ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাঝেমধ্যেই যন্ত্রটির ঢাকনাটি একেকবার খুলছেন, নতুন পিন লাগাচ্ছেন, রেকর্ড পালটাচ্ছেন আর চোঙের ভিতর দিয়ে গমগমে গলায় সেই মফস্বলের বৈশাখী বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে সায়গল কিংবা পঙ্কজ মল্লিকের উদাত্ত মধুরতা। অথবা কিঞ্চিৎ আগের আঙুরবালা।

গান শুরু হতেই বাড়ির কাজকর্ম প্রায় সব বন্ধ হয়ে যেত। সে কতটা সুরের মাধুর্যে আর কতটা যন্ত্রের আকর্ষণে বলা কঠিন কিন্তু শুধু বাড়ির লোকেরাই বা কেন আশেপাশের এমন কী বাড়ির উত্তরের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার লোকেরাও কানে গানের আওয়াজ যাওয়া মাত্র ছুটে এসে ভিড় করত। শেষদিন সন্ধ্যায় জুতোর বাক্সের থেকে একটু বড় আকারের বাক্স থেকে বেরুল চোদ্দ রেকর্ডে সম্পূর্ণ নাটক 'অহল্যা পালা'। সবাই আগেভাগে কী করে জেনে গিয়েছিল বাড়িতে আর তিল ধারণের স্থান নেই, বারান্দা উপচিয়ে উঠোন ছাড়িয়ে রান্নাঘরের পিছনে কামরাঙাতলার ডোবা পর্যন্ত শ্রোতায় ছেয়ে গেল। বড় নাতির অন্নপ্রাশনের পরে বাড়িতে আর ভিড় জমেনি, চোঙা-বাদ্যের (বৃদ্ধ গৃহকর্তা এই নামকরণ করেছিলেন যন্ত্রটির) এই রকম জনপ্রিয়তা ও মাহাত্ম্য দেখে পিতামহ এতদিনে একটু নরম হলেন।

কিন্তু নরম না হলেও বিশেষ কোনও গত্যান্তর ছিল না। এই তিনদিনের মধ্যেই পাড়া ও বেপাড়ার ছেলেরা বাড়িটির নাম দিয়ে বসেছে 'দি চোঙা প্যালেস।' বাড়ির ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পুকুরঘাটে এবং খেলার মাঠে যন্ত্রটির প্রসঙ্গে আমাদের কলের গান বলা আরম্ভ করেছে। বাড়ির বউয়েরা মোটা মোটা খামে পিত্রালয়ে চিঠি লিখে সদ্যলব্ধ যন্ত্রটির গুণাগুণ এবং সুবিধা-অসুবিধা জানিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে যাদের স্বামীরা কাজে অন্যত্র রয়েছে তারা তাদের প্রবাসী স্বামীদেরও বাড়ির এমন সুদিনে এই সংগীতমুখরিত গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি একবার আসার জন্য গোলাপি কাগজে অনুরোধ জানিয়েছে।

এসব কথা এতদিন পরে মনে পড়ার কথা নয়। সেদিন চিৎপুর দিয়ে যেতে যেতে একটা বাদ্যযন্ত্র সারাইয়ের দোকানে একটা চোঙাওয়ালা পুরনো কলের গান দেখে কেমন যেন কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি এখনও চালু আছে? দোকানদার বলল, আজ্ঞে না এটা বিক্রির জন্যে আনা হয়েছে। এই ভাঙা পুরনো জিনিস কিনবে কে? আমি প্রশ্ন করতেই দোকানদার হেসে উঠলেন, জানেন এটার দাম উঠেছে বিশ হাজার টাকা। সাহেব-মেমরা কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাগল!

সাহেব-মেমদের অনেক রকম পাগলামির কথা জানি কিন্তু আমাদের বাল্যস্মৃতি যে এত দামি তা জানতাম না।

থানা পুলিশ

বাড়িতে একটা ছোটমতো চুরি হয়ে গিয়েছিল, তাই নিয়ে থানার ডায়েরি করতে গিয়েছিলাম। পাড়ার মধ্যে থানা, কর্মচারীরা অনেকেই আমার পরিচিত। কাজ শেষ হওয়ার পরেও বসে গল্প করছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। খুব সন্ত্রস্তভাবে তিনি থানায় প্রবেশ করলেন, ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে একটা কোনা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন, এই রকম প্রায় দু'-তিন মিনিট।

'থানায় ঢুকলেই লোকগুলো এমন সব ঘাবড়িয়ে যায়। যেন আমরা খেয়ে ফেলব।' আমার সম্মুখস্থ দারোগাবাবু অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে স্বগতোক্তি করলেন, তারপরে সদ্য প্রবেশকারী ব্যক্তিটিকে ডাকলেন, 'ও মশাই, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। কাকে চাই? চুরি-ডাকাতি-খুন কী হয়েছে?

দারোগাবাবুর প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন বটে কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মুখের রং যাকে বলে চকখড়ির মতো সাদা, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কথাকলি নাচে অত্যন্ত দক্ষ নটীরা যেভাবে সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করে প্রায় সেইভাবে মিনিটে অন্তত তিরিশের গতিতে সমস্ত শরীর কাঁপছে।

এসে টেবিলের উপর হাতে রেখে দাঁড়ালেন। হাতের পাতা দুটো পদ্মপত্রে জলের মতো টলমল করছে, কিছুতেই স্থির থাকছে না। চিরটাকাল সসম্ভ্রমে বাইরে থেকে থানা পুলিশের সীমানা এড়িয়ে গেছেন, আজ খুবই দুর্বিপাকে পড়ে এখানে হাজির হতে বাধ্য হয়েছেন। ভদ্রলোকের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হত। এ-আমার-কর্ম-নয়, এই গোছের একটা ভঙ্গি তাঁর আন্দোলিত, কম্পিত মুখের ছাপে অত্যন্ত স্পষ্ট।

দারোগাবাবু লোক খারাপ নন বরং বলা যেতে পারে বেশ ভাল লোক। পুলিশের লোক বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নন, হৃদয়ে বেশ মায়াদয়া আছে। তিনিও আগন্তুক ভদ্রলোকের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন, 'বসুন।'

ভদ্রলোক কাঁপতে কাঁপতেই বসে পড়লেন। স্থির হওয়ার জন্যেই বোধহয় মিনিট খানেক সময় দিয়ে দারোগাবাবু ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক গ্লাস জল খাবেন?'

'জল', অকূল সমুদ্রে দ্বীপ দেখতে পেলে পুরাকালের নাবিকেরা যেমন আকুল হয়ে উঠত, আগন্তুকের কণ্ঠে সেই আকুলতা ফুটে উঠল। জল এল, হাতের কাঁপুনি এখনও থামেনি। সবটা জল ঠোঁটের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেল না, কিছু বাইরেও ছড়াল। জল খেয়ে নিজের অজান্তেই অত্যধিক উত্তেজনায় ভদ্রলোক কাচের গেলাস টেবিলের ওপর এত জোরে নামালেন যে, আর দেখতে হল না, গেলাসটা চৌচির হয়ে গেল।

'দাম, আমি দাম...' ভদ্রলোক বোধহয় বোঝাতে চাইলেন, গেলাসের দামটা তিনি দিয়ে দেবেন, কিন্তু গলা ফুটে এর বেশি কিছু শব্দ বের হল না।

অসীম নিস্তব্ধতা, একটা পুলিশ ফাঁড়ির অফিস-ঘরের পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব বলেই বোধহয়, তারই মধ্যে মিনিট দুয়েক অতিবাহিত হল। সবাই চুপচাপ। ঘরের মধ্যে যারা ছিল সবাই আগন্তুক দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

দারোগাবাবুই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, দায়িত্বও তাঁর। তিনি সরকারিভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম?'

ভদ্রলোকের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, কী যেন বিড়বিড় করলেন, আমি পাশেই বসেছিলাম, আমার কানে এল, 'জনার্দন পাল, ২৬ গোপাল মুখার্জি লেন'।

দারোগাবাবু বোধহয় ভাল শুনতে পাননি, 'জোরে বলুন, কানে শুনতে পাচ্ছি না।'

এইবার ভদ্রলোক প্রায় স্পষ্ট করে বললেন, 'গোবর্ধন পাল', অবশ্য ঠোঁট তেমনই কেঁপে চলেছে।

আমার কেমন যেন মনে হল, আমি বললাম, 'আপনি এইমাত্র জনার্দন পাল বললেন না?'

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, 'আজ্ঞে ওটা আমার বাবার নাম। এর পরেই দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করবেন তো, তাই বাবার নাম আর বাড়ির ঠিকানা মনে আছে কিনা, একটু ঝালিয়ে নিলাম।'

ভ্রমণকাহিনী (৩)

জনৈক সরলমতি ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে। এক সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি একটা সুভেনির কিনেছিলেন। প্রত্যেকটি সুভেনিরে একটি করে ক্রমিক নম্বর দেওয়া ছিল। অনুষ্ঠানের শেষে সেই নম্বর নিয়ে লটারি ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওই লটারিতে এই ভদ্রলোকের নম্বরই প্রথম উঠল। আর প্রথম পুরস্কার খুবই আকর্ষণীয়। একটি রাউন্ড দি ওয়ার্লড বিমান যাত্রার টিকিট, সারা বিশ্ব চক্রাকারে ঘুরে আসার ফ্রি পাস।

পুরস্কার পাওয়ার পর ভদ্রলোককে মঞ্চে ডাকা হল। তাঁকে অনুরোধ করা হল মাইকে বলতে যে এই পুরস্কার পেয়ে তাঁর কেমন লাগছে। তিনি একটু ইতস্তত করে, তারপর একটু থেমে বললেন, 'টিকিটটা পেয়ে ভালই লাগছে, তবে অন্য কোথাও যেতে পারলে আরও ভাল হত।'

অন্য কোথাও মানে কী? ভদ্রলোক মনে মনে চাঁদ কি মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন! রাউন্ড দি ওয়ার্লড টিকিটে কোথায় যাওয়া যায় না, প্লেনে চড়ে যে কোনও শহরে গেলেই হয়।

তা হয়তো হয়। কিন্তু যেখানে নদীর তীরে সাদা বালুচরের মধ্যে কাশবন ধূ ধূ করছে, আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে গাংচিল তারই একপাশে প্রাচীন কদম গাছের নীচে নদীর ভাঙা ঘাট থেকে উঠে গেছে কাঁচা রাস্তা, দু'পাশের সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সেই রাস্তা গ্রামে, গ্রামান্তরে। কোনও এয়ার টিকিট সেই হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে আমাদের আর কখনও পৌঁছে দিতে পারবে না।

দূরে ঢাকের শব্দ। কাশবনে জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। আকাশ চাঁদ আর মেঘের ছায়া ছায়া খেলা। গহনার নৌকো এসে লাগল ঘাটে। লণ্ঠন হাতে বাড়ির লোকেরা পারে দাঁড়িয়ে আছে; চিৎকার করে ডাকছে, 'রমেশ, রমেশ এলে নাকি নৌকায়?'

শারদ ভ্রমণের সেই অনাবিল ঘরে ফেরার পৃথিবী থেকে আমরা বহুদিন নির্বাসিত হয়েছি।

* * *

সেই হারিয়ে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ভ্রমণগুলের দুঃখের গল্প থাক, আমরা এখনকার কথায় আসি।

এখনকার কথা মানে কয়েকমাস আগের কথা। দক্ষিণ ভারতের একটা পুরনো শহরে বেড়াতে

গিয়েছিলাম। কাছেই একটা পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দির। বহু প্রাচীন, এবং পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ। তেমন জাঁকজমক নেই। তবে এখনও দু'বেলা পুজো হয়। ভোগ নৈবেদ্য যৎকিঞ্চিৎ হয়। কিছু কিছু তীর্থযাত্রী আসে।

মন্দির দেখতে গিয়ে চারদিক ঘুরে ফিরে যেমন হয় কৌতূহল আর কী, মন্দিরের সেবাইতের কাছে জানতে চাইলাম মন্দিরটার বয়স কত? ভদ্রলোক মোটামুটি ইংরেজি জানেন, তাই কথাবার্তা বলার সুবিধে রয়েছিল। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, 'আজ্ঞে, তা বেশ বয়স হয়েছে, সাতশো দেড় বছর বয়েস হল এই মন্দিরের।'

এই রকম সূক্ষ্ম হিসেব দেখে আমি অবশ্যই অবাক হলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাতশো দেড় বছর? এত চুলচেরা হিসেব করলেন কী করে?' সেবাইত ভদ্রলোক বললেন, 'দেড় বছর আগে এক আমেরিকান সাহেব এসেছিলেন, তিনি দেখেশুনে বলেছিলেন যে মন্দিরের বয়েস সাতশো বছর হবে। সেই সঙ্গে মধ্যের দেড় যোগ করে এখন হল সাতশো দেড় বছর।'

আমেরিকান সাহেবের কথাই যখন এল একবার আমেরিকা ঘুরে আসি। আমরা যাব ভূ-বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ওখানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক রাজ্যের আর কানাডার সীমান্তে।

একবার না কি একদল রাশিয়ান বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ওই নায়াগ্রা প্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন। অবিরাম, অফুরন্ত প্রবল জলকল্লোল উপর থেকে নীচে শতসহস্র ঐরাবতের মতো একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে স্বভাবতই রাশিয়ানরা চমকিত হবেন তাই গাইড জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখছেন? আপনাদের দেশে এ রকম কিছু আছে?' প্রশ্ন শুনে রাশিয়ানরা বললেন, 'তা নেই হয়তো, কিন্তু আমাদের মস্কো শহরে এমন জলের কলের মিস্ত্রি আছে যে এই লিক এক ঘণ্টার মধ্যে সারিয়ে দিতে পারে।'

নায়াগ্রা বিষয়ক আরেকটা গল্প আরও গোলমেলে। পূর্বদেশীয় এক শহর থেকে (কলকাতা নয়) জনৈক পর্যটক গিয়েছিলেন নায়াগ্রায়। তিনি যে শহর থেকে গিয়েছিলেন, সেখানে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আলো জল সব কিছুর টানাটানি, বিদ্যুতের বড় অভাব। তিনি নায়াগ্রা জলপ্রপাতে সেই বিপুল, উচ্ছল জলরাশি দেখে খুবই পুলকিত হলেন এবং অনেকক্ষণ দেখার পরে অবশেষে তাঁর সঙ্গীকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এটা কি রাতের বেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়, না কি রাতের বেলাও চালু থাকে?' সঙ্গীটি মার্কিন দেশে বেশ কিছুকাল আছেন। তিনি বেশ ভেবে বললেন, 'ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

এঁরা নায়াগ্রা প্রপাত নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে থাকুন, ইত্যবসরে, এই পুজোর মরশুমে, আমরা কাছাকাছি একটা জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে ঘুরে আসি।

দূরপাল্লার ট্রেনগুলো একটাও ঠিক সময়ে আসছে না, বাক্সবিছানা নিয়ে ক্লান্ত যাত্রীসাধারণ গাড়ির অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে প্রতীক্ষা করছেন। অবশেষে তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন, স্টেশন মাস্টারের ঘরে প্রতিবাদ জানাতে গেলেন।

অনেক কথা কাটাকাটির পর একজন উত্তেজিত হয়ে স্টেশন মাস্টারের টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন, 'টাইম টেবল সব পুড়িয়ে ফেলুন। ট্রেন যদি ঠিক সময়ে না আসে তবে টাইম টেবল দিয়ে কী হবে?'

বিচক্ষণ স্টেশন মাস্টার মশায় মৃদু হেসে বললেন, 'অত উত্তেজিত হবেন না। বিবেচনা করে দেখুন, টাইম টেবল যদি সত্যি সত্যি না থাকত তা হলে কী করে ধরতে পারতেন, ট্রেন ঠিক সময়ে আসছে না দেরি করে আসছে!'

ঠিক সেই মুহূর্তে মেল ট্রেন হুসহুস করে স্টেশনে ঢুকে পড়ল। ঘর থেকে যাত্রীবৃন্দ দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ট্রেন ধরতে।

পুনশ্চঃ ভ্রমণকাহিনীর অবশেষে মেল ট্রেনের আসল গল্পটি বলি। কিংবা মনে করিয়ে দিই। কারণ গল্পটি অতি পুরনো, সবাই আগে শুনেছেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এক ভদ্রলোক হাওড়া স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক ট্রেন চলে যাচ্ছে, তিনি কোনওটাতেই উঠছেন না। এক রেলকর্মীর কেমন সন্দেহ হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে, আসানসোল।' রেলকর্মী বললেন, 'এইতো কালকা মেল ছাড়ছে। এতে উঠে যান।' ভদ্রলোক বললেন, 'সবই তো দেখছি মেল ট্রেন। কিন্তু আমি তো এতে যেতে পারব না। আমার সঙ্গে ফিমেল আছে।' বলে পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

বয়স বাড়ছে

গল্পটা মোটামুটিভাবে প্রচলিত আছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে। তবে গল্পটির একাধিক রকম-ফের আমি শুনেছি এবং একবার একটা পুরনো বাংলা সিনেমাতেও ব্যবহৃত হয়েছিল এই গল্প।

শরৎচন্দ্র-জড়িত গল্পটি লেখাই ভাল। শরৎচন্দ্র গ্রামে নতুন বাড়ি করেছেন, কলকাতা থেকে কিছু বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী ভক্তজন গিয়েছেন শরৎচন্দ্রের সেই গ্রামের বাড়িতে। যেমন হয়, একথা-সেকথার পরে বাড়ি-ঘর দেখেশুনে, সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে অতঃপর অতিথিরা শরৎচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন, 'কলকাতা থেকে এত দূরে এই পল্লীগ্রামে এসে যে এত কষ্ট করে বাড়ি করে বসবাস আরম্ভ করলেন, তা এখানকার, আপনাদের এই গ্রামের জলবায়ু, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য কী রকম?'

শরৎচন্দ্রের তখন প্রবীণ বয়স। প্রৌঢ়ত্ব সমাপ্ত করে বার্ধক্যের সোনার সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, তিনি মৃদু হেসে স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আর বোলো না। এই যে আমার এত বয়স হল, এখনও এ গাঁয়ে এলে আমাকে লুকিয়ে হুঁকো খেতে হয়।'

কথাসাহিত্যিকের এই উক্তিটির ব্যঞ্জনাটি লক্ষণীয়। গ্রামে তাঁর চেয়েও বয়স্ক লোকের সংখ্যা এত বেশি যে গুরুজনদের আড়াল করার জন্যে হুঁকো টানার সময় লুকিয়ে টানতে হয়, যাতে প্রবীণদের সম্মানহানি না হয়। সুতরাং যে গ্রামে প্রবীণের সংখ্যা এত বেশি সেখানকার স্বাস্থ্য বা আবহাওয়া ভাল বলেই তো সেটা সম্ভব।

দীর্ঘায়ু হওয়া সব মানুষেরই স্বপ্ন। স্নেহাস্পদদের দীর্ঘজীবী হও অথবা শতায়ু হও বলে আশীর্বাদ করা শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রীতি।

দীর্ঘায়ু হওয়া বা শতায়ু হওয়া নিয়ে আমি কোনও রসিকতা করব না। আমি নিজে এখন যে বয়সে এসে পৌঁছেছি, উনপঞ্চাশী পবন আমার বয়সের নৌকোর পাল প্রায় ছুঁতে চলেছে, অথচ শুনছি এটাই নাকি মধ্যবয়স।

কেন যে এই পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের লোক মধ্যবয়সি হবে তা আমার হিসেবের মধ্যে পড়ছে না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে সব মানুষকে শতায়ু ধরে নিয়ে এই হিসেবটা করা হয়েছে।

এক ইংরেজ বাচাল বলেছিলেন, মধ্যবয়েস হল সেই বয়স যে বয়সে তোমার বন্ধুদের মাথায় বিশাল টাক পড়ে যায়, তারা মোটা হয়ে যায়, তারা এমন বদলে যায় যে তারা আর তোমাকে চিনতে

পারে না। যখন টেলিফোন বেজে উঠলে মনে হয়, এ ফোনটা আমার নয় অন্য কারও জন্যে বাজছে কিংবা রং নম্বর।

কুড়ি বছর বয়সে আমরা যা ইচ্ছে করি, কোনওদিন মাথা ঘামাই না অন্যেরা আমাদের নিয়ে কী ভাবছে সে বিষয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে আমরা ভাবতে শুরু করি সত্যি সত্যি অন্যেরা কী ভাবছে আমাদের নিয়ে, খারাপ কিছু ভাবছে না তো। তারপর একদিন আমরা পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে পৌঁছে যাই এবং তখন টের পাই, আবিষ্কার করে বিস্মিত হই, কেউ কখনও আমাদের নিয়ে ভাবেনি, মাথা ঘামায়নি; কেউ কখনও কোথাও কোনওদিন মাথা ঘামায় না।

আর অন্য কেউ যদি কখনও মাথা ঘামিয়েই থাকে, তা হলেই বা শেষ পর্যন্ত কী আসে যায়? আমার এক প্রবীণ আত্মীয়ের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, এই মাত্র কয়েকদিন আগে। বয়স বাড়ার অনেক সুবিধে। তার একটা সেদিন জানা গেল তাঁর কাছে। বৃদ্ধদের যে ধরনের বিশিষ্ট একটা সূক্ষ্ম হাসি আছে, যার মধ্যে মেশানো থাকে কিছুটা বোধ, কিছুটা অভিজ্ঞতা আর অনেকটা পরিহাস আমার সেই প্রবীণ আত্মীয় সেই হাসি ঠোঁটে টেনে কথায় কথায় আমাকে জানালেন, 'আমার কোনও শত্রু নেই।' কথাটা শুনে চুপ রইলাম, কিন্তু বৃদ্ধ ছাড়লেন না, হাসি ঠোঁটেই জোর করলেন, 'বলো তো কেন?'

কী আর বলব? বললে বলতে হয়, আপনি ভাল মানুষ, কোনওদিন কারও ক্ষতি করেননি, কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেননি; আপনার কেন শত্রু থাকবে? কিন্তু এসব তোষামোদি কথা শুধু শুধু বলতে যাব কেন?

অবশ্য আমাকে নিজে থেকে কিছুই বলতে হল না। বৃদ্ধ নিজেই বললেন, 'সব মরে গেছে। যত ব্যাটা শত্রু ছিল সব মরে ভূত হয়ে গেছে। বেঁচেই থাকল না, তা আর শত্রুতা করবে কী?' তবে বহুদিন বেঁচে থাকলে শুধু শত্রুদের হাত থেকেই যে অব্যাহতি পাওয়া যাবে তা নয়, বন্ধুদের হাত থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এমন একদিন হয়তো এসে যাবে যখন নাম ধরে ডাকার কোনও লোক তো থাকবেই না এমনকী অমুকদা বলে ডাকারও লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

তা হোক তবু বলি বয়স বাড়ার একটা মাধুর্য আছে। লোলচর্মা, শুভ্রকেশী এক আদিবাসী বৃদ্ধার এক ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম অনেকদিন আগে, বোধহয় সুনীল জানার তোলা। মানুষ বৃদ্ধ না হলে যে সুন্দর হয় না এই কথা ওই আলোকচিত্র দেখে অনুভব করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে বয়স বাড়া সম্পর্কে একটি ফরাসি প্রবাদ অন্য কারণে স্মরণীয়। এই প্রবাদটি অনুসারে মানুষেরা নাকি ব্যারেলবন্দি মদের মতো, যদি ভাল হয় তবে যত পুরনো হয় তত ভাল হয় আর যদি খারাপ হয় তবে যত দিন যায় ততই খারাপ হতে থাকে।

বয়স বেড়ে যাচ্ছে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—এসব নিয়ে দুঃখ করার অবশ্য কোনও মানে হয় না। একথা সর্বদাই স্মরণীয় যে এই মরপৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ, আমাদের চেনাজানা, আত্মীয় বন্ধু, আপন-পর হাজার হাজার লোক সুযোগ পেল না, সুযোগ পায় না, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি এই দুঃখ করার। তার ঢের আগে তারা সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে চলে যায়।

আর শেষ পর্যন্ত বুড়ো হওয়া ব্যাপারটা অনেকটাই মানসিক। সেই যে একটা কথা হয়েছে, তোমার বয়স ঠিক ততটা যতটা তুমি বোধ কর; যতটা তোমাকে দেখায় তা নয়। এই সূত্রে একটি মজার কথা বলেছিলেন উনিশ শতকের এক জনপ্রিয় লেখক, কলম্বাসের জীবনীকার ওয়াশিংটন আরভিং। তিনি বলেছিলেন, 'যখনই দেখবে লোকেরা তোমাকে বলছে আপনাকে খুব কমবয়সি, খুব কাঁচা, খুব ইয়াং দেখাচ্ছে, বুঝে নেবে বয়স বাড়ছে, বুড়ো হচ্ছ।'

তা বুড়ো হতে আপত্তি কী? মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। কিন্তু তাই বলে বুড়ো বয়সে বুড়ো হব না। তিরিশ বছর বয়সে আমার মাথার চুল নাই পাকল তাই বলে পঞ্চাশে পাকলে কলপ দিতে হবে কেন? পঁচিশ বছর বয়সে দাঁত তুলে ফেলতে হলে নিশ্চয়ই দুঃখের তাই বলে চল্লিশে, পঞ্চাশে দু'-একটা দাঁত নড়বে না, চোখে উঠবে না পজিটিভ চশমা?

ছোটদের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার বয়স ও উচ্চতার সীমা দেওয়া থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই কবে লিখেছিলেন।

'বয়েস দাঁড়ায়ে থাকে
কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হাতে
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়
বালকেরা হাসে।'

কাব্যের কথা আপাতত থাক। একটা সরল গল্প দিয়ে এ যাত্রা শেষ করি।

হাওড়া হাটের প্রবেশমুখে বিশাল ভিড়। এক প্রাচীন সাধু মৃতসঞ্জীবনী বটিকা বেচছেন, সাধুর দীর্ঘ চুলদাড়ি, সবল স্বাস্থ্য, তিনি মন্দ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, 'এই বটিকা দু'বেলা দুটো করে খেয়ে আজ সোয়া তিনশো বছর আমি এইরকম স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছি।' আলখাল্লার আস্তিন গুটিয়ে নিজের বাহুর মাংসপেশি দেখিয়ে সন্ন্যাসী সবাইকে প্রভাবান্বিত করতে লাগলেন। একটা কৌটোর মধ্যে গোল গোল কালো বড়ি নাচাতে নাচাতে সন্ন্যাসীর সহকারী অন্য এক গাট্টাগোট্টা মধ্যবয়সি আলখাল্লাধারী সমবেত দর্শকদের সামনে ঘুরছেন। আমি তাঁকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা! সন্ন্যাসী ঠাকুর যে বলছেন ওঁর সোয়া তিনশো বছর বয়স, তার কি কোনও প্রমাণ আছে?

অম্লানবদনে সহকারীটি জবাব দিলেন, 'তা আমি বলতে পারব না, আমি তো মাত্র দুশো পনেরো বছর ওঁর কাছে কাজ করছি।'

ভুল, ভূল

না। 'ভূল' লেখা উচিত হবে না। কোনও অজুহাতেই ভুলকে ভূল লেখা চলবে না। সেটা ডাহা ভুল হবে। পূজা এবং পুজো চলবে, বধূ যখন বউ হবে হ্রস্ব উ হতে বাধা নেই।

আমাদের ছোটবেলায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার টেস্ট পেপারে বাংলা ব্যাকরণের সাজেশনের অধ্যায়ে বহু প্রচলিত বানান ভুলগুলোর একটা তালিকা ছিল। সেই তালিকার নীচে একটি অসামান্য পঙ্‌ক্তি বোল্ড পয়েন্টে ছাপা ছিল, যে পঙ্‌ক্তিটি আমি এই এতকাল পরেও ভুলিনি। পঙ্‌ক্তিটি হল,

'ভুল বানান কিন্তু ভুল করিয়ো না।'

ভুলে যাওয়া আর ভুল করা এক ব্যাপার নয়। আমরা চিঠিতে ঠিকানা লেখার সময় ভুল করি, তারপর সেই ভুল-ঠিকানার চিঠি ডাকে ফেলতে ভুলে যাই।

বোধহয় এইচ জি ওয়েলসই বলেছিলেন যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ভাল মতন একটা ভুল করা। এবং এই বুদ্ধিতেই অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে একটা ভুল রেখে দেন, এতে লোকের নজর কাড়ে, গ্রাহক ভুলটা মনে রাখে না কিন্তু দোকান বা দ্রব্যের কথা মনে রাখে। কোনও ঘৃত ব্যবসায়ী যদি দোকানের সাইনবোর্ডে লেখেন, 'এখানে বিযুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যায়।' এতে সত্যিই ব্যবসাবৃদ্ধি হয় কি না তা অবশ্য বলা কঠিন।

একদা ভুল নিয়ে রসসাগর শিবরাম চক্রবর্তী একটা মজার গল্প লিখেছিলেন। একজনের পায়ে

একজোড়া মোজার একটা লাল রঙের, অন্যটা কালো রঙের। তাঁর এক বন্ধু এ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেছিলেন, 'এ এক মোজার ব্যাপার হয়েছে মোশায়। আমার বাসায় আরো এক জোড়া মোজা আছে, সে জোড়ারও একটা লাল, একটা কালো।' সে ভদ্রলোককে বোঝানো অসম্ভব হয়েছিল যে তিনি দু'জোড়া মোজা ঘুলিয়ে ফেলে এই অসামান্য ভুলটি করেছেন।

ছাপাখানার ভুত বলে একটা অদৃশ্য জীব আছে। কেউ কখনও তাকে চোখে দেখেনি বটে কিন্তু ছাপার ব্যাপারের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা জানেন সে আছে, যথেষ্টই আছে, সব রকম মুদ্রণ প্রমাদের জন্যে সে দায়ি। বাংলায় তাকে ভূত বলা হয় বটে কিন্তু সাহেবদের কাছে সে সাক্ষাৎ শয়তান, যাকে বলে ডেভিল, প্রিন্টারস ডেভিল।

এক উকিল সাহেবের কথা বলি। খুঁতখুঁতে স্বভাবের এই বিখ্যাত আইনজ্ঞ একটা বড় মামলার কাগজপত্র নিজের হাতে রচনা করে ছাপতে দিয়েছিলেন আদালতে পেশ করার আগে। অত্যন্ত বনেদি ও বিখ্যাত ছাপাখানা থেকে চূড়ান্ত প্রুফ এল তাঁর কাছে প্রিন্ট অর্ডার মানে ছাপবার অনুমতির জন্যে।

উকিলসাহেব তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে সেই পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার ম্যাটার অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, গোটা চল্লিশেক ভুল রয়েছে। সংশোধন করে তিনি আবার প্রুফ পাঠাতে বললেন। পরেরবার প্রুফ এলে তিনি নিজে না দেখে তাঁর সেরেস্তার লোকজনকে দেখতে বললেন। সঙ্গে লোভ দেখালেন, কেউ যদি ভুল বার করতে পারে প্রত্যেকটি ভুলের জন্যে তিনি এক ডলার করে পারিশ্রমিক দেবেন।

ব্যাপার দাঁড়াল গুরুতর। তাঁকে প্রায় একশো ডলার দিতে হল। এবারেও তিনি প্রিন্ট অর্ডার না দিয়ে বললেন আবার প্রুফ পাঠাতে। পরেরবার প্রুফ এল। এবার আর নিজের অফিসের কর্মচারী নয়, উকিল সাহেব অফিসের দরজায় বিল বোর্ডে পুরো ম্যাটার ঝুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে নোটিশ দিলেন, 'প্রতিটি ভুল সংশোধনের জন্যে দশ ডলার করে দেওয়া হবে।'

দুঃখের বিষয়, এবারও আইনজীবী ভদ্রলোকের একশো দশ ডলার ক্ষতি হল, অর্থাৎ তখনও এগারোটা ভুল ছিল।

ভুক্তভোগীরা জানেন, ছাপাখানায় এ রকম এবং এর থেকে ঢের বেশি ভুল হয়ে থাকে। সুখের বিষয়, পাঠকেরাও জানেন। তাঁরা ক্ষমাঘেন্না করে এসব মেনে নেন। তার প্রমাণ ভূরিভূরি ভুলে ভরা কত বই বেস্টসেলার হয়। এ বিষয়ে আমি নিজেও হলফ করে বলতে পারি।

এই মুহূর্তে দুটি মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদের কথা মনে পড়ছে।

সেই বিখ্যাত সবুজপত্র, সেই অবিস্মরণীয় প্রমথ চৌধুরী, নিরঙ্কুশ, ঝকঝকে, ত্রুটিহীন। তাঁর কাগজেই তাঁর নাম ছাপা হয়েছিল প্রথম চৌধুরী।

আর, বিলেতের টাইম কাগজ মহামান্যবতী ইংলন্ডেশ্বরীর সন্তানজন্মের সংবাদে বাকিংহাম প্যালেস লিখতে লিখেছিল ফাকিংহাম প্যালেস (Fuckingham Palace)।

ভুলের গল্প এত সহজে শেষ হবে না।

বিলিতি প্রবাদ আছে, ভুল করার জন্যেই এই মানবজন্ম। আর আমাদের বাবু মোহনদাস, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমাদের ভুল আর ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই আমরা সব জানতে পারি।'

আপনারা জীবনে কী কী ভুল করেছেন?

এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল পাঁচ হাজার জন লোকের কাছে। বলা বাহুল্য আমাদের দেশে নয় আমেরিকায়। প্রশ্নটির উত্তরে এক বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক বলেছিলেন, 'শুধু শুধু এতদিন ধরে এতসব বই পড়েছি, এত না পড়লেও চলত। রাত জেগে, চোখ নষ্ট করে দরকারি কাজ ফেলে বই পড়েছি, বই আর বই। এত জেনে কী লাভ?'

বিপরীত দিকে এক মধ্যবয়সি ব্যবসায়ী বলেছিলেন, 'স্কুলজীবনে ভাল করে পড়াশুনা না করে বড় ভুল করেছি। এখন আর শোধরাবার কোনও উপায় নেই।'

কেউ বলেছিলেন, 'অল্প বয়েসে বিয়ে করে খুব ভুল করেছিলাম।' আবার অন্য কেউ বলেছেন, 'বেশি বয়েসে বিয়ে করে খুবই ভুল করেছি।'

বলা বাহুল্য, ভুলের আরও অনেক নমুনা ছিল এই সব জবাবে। কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

(এক) বাবার কথা না শুনে বড় ভুল করেছি।

(দুই) টাকাপয়সা ভাল করে উপার্জন করার চেষ্টা করিনি।

(তিন) টাকাপয়সা হিসেব করে খরচ করিনি।

(চার) গির্জায় যাইনি।

(পাঁচ) নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভুল করেছিলাম।

এই তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। যে কেউ এই তালিকায় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি যোগ করতে পারেন। তার মধ্যে, 'আমার পক্ষে চাকরি করা ভুল হয়েছে', 'ব্যবসা করা ভুল হয়েছে', 'সাহিত্য করতে যাওয়া ভুল হয়েছে', 'মোটা হয়ে যাওয়া ভুল হয়েছে', 'সময়মতো সল্টলেকে জমির জন্যে চেষ্টা না করা ভুল হয়েছে'— এ রকম অবশ্যই থাকতে পারে।

আবার এ রকম থাকতে পারে যে 'গত সপ্তাহে নগেন ডেন্টিস্টকে দিয়ে দাঁত তুলতে যাওয়া আমার সবচেয়ে বড় ভুল বড় আহাম্মকি হয়েছে'। এমনকী কারাগারবাসী কেউ হয়তো কবুল করতে পারেন, 'থানার সামনে ছিনতাই করতে যাওয়া, তাও আবার বুঝতে না পেরে বড়বাবুর শালির গলার হার, খুবই ভুল করেছিলাম।'

এসব স্বীকারোক্তির প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ নেই, বরং ভুলের গল্পে, মজার ভুলের গল্পে যাই। এক ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে গেছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিল চুকিয়ে রাস্তায় এসে মহিলার খেয়াল হল খাওয়ার টেবিলে তাঁর হাতের রুমালটা ফেলে এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁর মধ্যে ফিরে গেলেন। তখন বেয়ারা তাদের টেবিল পরিষ্কার করছিল। মহিলা দেখলেন রুমালটা বেয়ারার ট্রেতে কিংবা টেবিলের ওপরে কোথাও নেই। তখন তিনি উবু হয়ে টেবিলের নীচে উঁকি দিয়ে দেখলেন, তাঁকে এই ভাবে দেখে বেয়ারা একটু বাইরের দরজার দিকে তাকাল, কাচ লাগানো প্রশস্ত দরজা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মহিলার স্বামী সেখানে অধীর, অস্থিরভাবে দণ্ডায়মান।

অতঃপর বেয়ারাটি যথাসাধ্য নম্র কণ্ঠে বলল, 'মেমসাহেব আপনি ভুল করেছেন। আপনার স্বামী এখানে নয়, ওই দেখুন দরজার বাইরে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ভুলের পর ভুলভুলাইয়ার কথা বলা যেতে পারে। রাজা বাদশাদের শখ ছিল ভুলভুলাইয়ার। প্রাসাদের মধ্যে বা অন্যত্র ভুলভুলাইয়ার মহল বানাতেন। সেই মহলে একবার প্রবেশ করলে বেরনো কঠিন, অথবা বলা চলে প্রায় অসম্ভব। বাতায়নহীন আধো-অন্ধকার গলিঘুঁজিতে সব পথ (প্যাসেজ), সব দরজা এক রকম। বারবার ভুল হয় এই বুঝি ঠিক রাস্তা, অবরুদ্ধ দেওয়ালে ব্যাহত হয়ে আবার ভুলভুলাইয়ার গলি ধরে বেরিয়ে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা। আমি যদি পোড়খাওয়া মানুষ না হয়ে হাফ কবি কিংবা অসফল দার্শনিক হতাম, অনায়াসে কম্প্রকণ্ঠে নিবেদন করতে পারতাম, 'জীবনটাও বুঝলেন কিনা, একটা ভুলভুলাইয়ার গলি।'

কিন্তু আপনারা জানেন এ ধরনের ছেঁদো কথা বলা আমার স্বভাব নয়। আমি ভালবাসি ছেঁদোগল্প বলতে। এবং অবশেষে তাই হোক।

শীতের দিনে দূরপাল্লার ট্রেনে দু'জন যাত্রী পাশাপাশি বার্থে দু'দিন দু'রাত্রি কাটিয়েছিলেন। প্রথমজন শিক্ষিত অধ্যাপক, দ্বিতীয়জন সরকারি অফিসের সামান্য একজন কর্মচারী, পিয়নগোছের চাকরি, ভ্রমণভাতা পেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামার সময় খেয়াল করলেন এ দু'দিন রেলগাড়িতে যে বালাপোশটা তিনি শীত নিবারণের জন্যে ব্যবহার করেছেন সেটা নেই। কাল

রাতেও গায়ে দিয়েছেন, আজ সকালে নেই। ইতিমধ্যে এই এক্সপ্রেস ট্রেনে একজন নতুন যাত্রীও ওঠেনি। সুতরাং অধ্যাপক সাহেবের সন্দেহ গেল গরিব পিওন সহযাত্রীটির প্রতি। তিনি তাঁকে জেরা করলেন, নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা শতরঞ্চি মোড়ানো তাঁর বিছানা খোলালেন এবং অবশেষে দেখা গেল বালাপোশটি এসব জায়গায় নেই। তারপর দেখা গেল সেটা লোয়ার বার্থের নীচে ট্রেনের মেঝেতে অন্ধকারে পড়ে আছে।

বালাপোশটা ফেরত পেয়ে অধ্যাপক খুশি মনে সেটা লাগেজে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি ভুল করেছিলাম।'

পিওনটি বললেন, 'আমিও ভুল করেছিলাম।'

অধ্যাপক বললেন, 'আপনি আবার কী ভুল করলেন?'

পিওন বললেন, 'আপনি ভুল করেছিলেন আমাকে চোর ভেবে। আমি ভুল করেছিলাম আপনাকে ভদ্রলোক ভেবে।'

জীবজন্তু

এই ধারাবাহিক রচনার নাম 'শেষমেশ'। এটা তৃতীয় পর্ব। কাউকে মুখে বলেছি কেউ চোখে দেখেছেন, মোটমাট অনেকেই জেনে গেছেন যে শেষমেশ আমি 'শেষমেশ' নামে একটি ধারাবাহিক রম্য নিবন্ধমালা রচনার চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করেছি।

আমার অন্য সব কাজের মতোই এই নামকরণের কাজটা আমি যে খুব ভেবে-চিন্তে করেছি তা নয়।

আর তা ছাড়া এই নামটার মধ্যে এত যে প্যাঁচ আছে তাই জানতাম না।

সেদিন এক বন্ধু এসে বললেন, 'তাহলে এটাই তোমার শেষ পাঁঠা?' রীতিমতো জিজ্ঞাসা। মেষ শব্দটির অর্থ যে ভেড়া বা পাঁঠা সেটাই বন্ধুর বিদ্রূপের বিষয়। বলা বাহুল্য, ইনি আমার সেই রকমের বন্ধু যে রকম সম্পর্কে রসিককুলতিলক গৌরকিশোর ঘোষ বলেছিলেন, 'এ রকম এক-আধটি বন্ধু থাকলে জীবনে শত্রুর দরকার পড়ে না।'

এমতাবস্থায় আমাকে অবশ্যই ভেড়া কিংবা পাঁঠা নিয়ে কিছু লিখতে হয়।

তার আগে আমি অবশ্য বন্ধুবরকে প্রচলিত রীতিতে রহস্য করে বলতে পারতাম, 'যদি পাঁঠাই হয় বা ভেড়াই হয় তাতে তোমার কী? আমার পাঁঠা, আমার ভেড়া আমি লেজের দিক থেকেই হোক আর ঘাড়ের দিক থেকেই হোক, যে দিক দিয়ে ইচ্ছে কাটব, তাতে তোমার কী?'

তা বলিনি। বরং আপাতত ভেড়া সমেত কয়েকটা জীবজন্তুর কথা বলি।

এই জীবজন্তুর গল্পগুলো মোটেই বানানো নয়। বরং যথেষ্ট সাম্প্রতিক। এর প্রথমটি 'আজকাল' পত্রিকার পৃষ্ঠাতে কিছুদিন আগে বেরিয়েছে।

বোমাতঙ্কগ্রস্ত কলকাতার পুলিশ এখন চারদিকে শিক্ষিত কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিক্ষিত

মানে সুশিক্ষিত। বিশেষরূপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সারমেয়, যারা গন্ধ শুঁকে বোমা খুঁজে বার করতে পারে। এতকাল ভেস্পা নামে একটি কুকুরে কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তা হচ্ছে না। এত বোমা বিস্ফোরণের সত্যি ঘটনায় ও গুজবে চারদিক শুঁকে শুঁকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ভেস্পাকে সাহায্য করতে অন্যান্য কুকুরের খোঁজ করা হচ্ছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে যে ভেস্পা গোয়ালিয়রের ন্যাশনাল ট্রেনিং কলেজ ফর ডগসের অনার্স গ্র্যাজুয়েট।

ভেস্পা বোমা বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়াও আছে মাদক বিশেষজ্ঞ কুকুর। তবে এই মুহূর্তে কলকাতায় বিশেষ প্রয়োজন বোমা বিশেষজ্ঞ কুকুরের। তারই খোঁজ চলছে। শুধু গোয়ালিয়র কলেজে নয়, দিল্লির ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড দপ্তরেও অনার্স গ্র্যাজুয়েট বোমা বিশেষজ্ঞ কুকুর রয়েছে, এখন তাদেরই খোঁজ চলছে।

অন্যদিকে ওই একই দিনে খাস বিলেত লন্ডন থেকে একটা মোরগের খবর এসেছে।

মোরগটির নাম 'করকি'। করকির গলার স্বর খুবই কর্কশ এবং উচ্চগ্রামের। অন্যান্য মোরগের মতোই সে শেষরাত থেকে চেঁচানো শুরু করে।

করকির মালিকের নাম মি. ফিলিপ জনস। জনস সাহেবের প্রতিবেশী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন যাতে করকি সকাল সাতটার আগে না ডাকে এবং তাঁর প্রভাতনিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটায়।

এই আবেদন অনুসারে মহামান্য আদালত আদেশ জারি করেছেন যে, করকি সকাল সাতটার আগে ডাকতে পারবে না। কিন্তু, বলা বাহুল্য, করকি সে আদেশ মান্য করেনি।

এরপরে মামলা বহুদূর গড়িয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেও জনস সাহেব আদালতের নির্দেশ তাঁর পক্ষে আনতে পারেননি। এখন তিনি দূর গ্রামের এক খামারে, যেখানে শেষরাতে করকির চিৎকারে কেউ আপত্তি তুলবে না, সেখানে করকিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

গল্পটি ভাল, কিন্তু জনস সাহেব করকিকে কেন কেটে খেলেন না। আড়াই লাখ টাকাও বাঁচত, সুখাদ্যও পেতেন, সেটা কিন্তু সংবাদে কোথাও নেই।

কুকুর বা মোরগ আপাতত আর নয়, একটা ভেড়ার গল্পে যাই। গল্পটা অবশ্য গাধার নামেও চলে, আমিও একদা সেভাবেই লিখেছিলাম।

বাবা ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। মাঠে একটা ভেড়া চরছে।

ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল,

'বাবা, এটা কী?'

বাবা বললেন, 'এটা হল ভেড়া।'

ছেলে একটু পরে আরেকটা ভেড়া দেখিয়ে বলল, 'বাবা, ওটা কী?'

বাবা বললেন, 'ওটাও ভেড়া।'

ছেলে বলল, 'বাবা দুটোই ভেড়া?'

বাবা এবার একটু কায়দা করে বললেন, 'একটা হল ভেড়া আর অন্যটা ভেড়ার বৌ।'

ছেলে বলল, 'বাবা, ভেড়ারা বিয়ে করে?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ করে। ভেড়ারাই শুধু বিয়ে করে।'

সে যা হোক, এই ভেড়ার ব্যাপারটার একটা ভদ্রসম্মত কাব্যিক ফয়সালা করি।

সেদিন নবীন ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায় এলেন আমাদের বাড়িতে।

তিনি এসেই আমাদের বাইরের ঘরে বসে ক্রমাগত 'ব্যা-ব্যা, ব্যা-ব্যা' করতে লাগলেন। ভেড়ায় কামড়ালে নাকি সেই বিষের প্রকোপে অনেকে এ রকম করে, কিন্তু সমস্ত সংশয় ছিন্ন করে সে পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে চোখ বুজে বলতে লাগল,

'ব্যা-ব্যা, ব্যা-ব্যা'
ব্যা-ব্যা, ব্যা-ব্যা, ব্যা-ব্যা
খাচ্ছিলো ঘাস মনের সুখে
করছিলো যে কানদোলন
দশটা ভেড়া গড়ের মাঠে
হঠাৎ করে আন্দোলন'...

ব্যবসা-বাণিজ্য

এ বিষয়ে লেখার ক্ষমতা আমার নেই। তবু, তুমি তো জানো, খেলাচ্ছলে এ যাবৎ এমন কত বিষয়ে লিখলাম, যার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

তখন আমি একটা ছোট কবিতার কাগজের দেখাশোনা করি। হঠাৎ ভাগ্যদোষে এক এমব্যাসির পার্টিতে এক তালেবরের সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, আমার কাগজ অঙ্গুলি হেলনে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

লোভে পড়ে, আমি তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম, পরের রবিবার সকালে। শাহেনশা ব্যক্তি, তাঁকে তো আমার দীনকুটিরে আসতে বলা যায় না। সকাল দশটার সময় তাঁকে চৌরঙ্গি এলাকার একটা মহার্ঘ্য ও অভিজাত চায়ের দোকানে নিমন্ত্রণ করলাম। যথেষ্ট লাভের আশা আছে— এই ভরসা দিয়ে, গৃহিণীর কাছ থেকে অভিজাত রেস্তোরাঁয় ব্যয় করার জন্য কিছু টাকা নিলাম। তারপর সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা ১২টা পর্যন্ত তিনি এলেন না। তিন কাপ চা, দুটো কফি, দুটো কোল্ড ড্রিঙ্ক সবই মহামূল্য দোকানে বসে থাকার খেসারত হিসেবে খেতে হল।

হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসার পর গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন হল?' গৃহিণীকে হতাশ হতে দিলাম না। তাঁকে বললাম, 'ফিফটি-ফিফটি, আধা-আধি'। গৃহিণী জোর করলেন, 'আধা-আধি' বুঝিয়ে বলতে। পেটের মধ্যে তখন উথালপাতাল করছে বাজার খরচ থেকে সরানো গৃহিণীর কষ্টার্জিত অর্থে খাওয়া তরল ও উষ্ণ পানীয়। মিথ্যে বলতে পারলাম না। বললাম, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিকই ছিল। আমি গিয়েছিলাম, তিনি আসেননি। তাই বলছি ফিফটি-ফিফটি, আধা-আধি।'

এই হাফ-হাফ, আধা-আধি ব্যাপারটা ব্যবসায়ীরা কিন্তু খুব বিশ্বাস করেন। এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাঁর কিশোরপুত্রকে ব্যবসায়ে সততার শিক্ষা দিচ্ছিলেন উদাহরণ সহযোগে— 'মনে করো, একটা দোকান দিয়েছ তুমি আর তোমার বন্ধু দু'জনে মিলে। একদিন বন্ধু দোকানে নেই, এমন সময় একজন খদ্দের এল, জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গেল। তখন দেখলে খদ্দের হিসেবে ভুল করে একশো টাকা বেশি দিয়ে গিয়েছে। কী করবে?' অপাপবিদ্ধা সরল কিশোর বলল, 'কী আর করব? সেই খদ্দেরকে খুঁজে বের করে টাকা ফেরত দিয়ে দেব।'

বাবা বললেন, 'খোকা, খদ্দের একবার দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া কঠিন

কাজ। তা ছাড়া...।' বাবা কথা শেষ করার আগেই খোকা বলল, 'তা হলে ওই টাকা রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দেব!'

বাবা বললেন, 'রামকৃষ্ণ মিশন?'

খোকা বলল, 'তা না হলে মাদার টেরিজা?'

বাবা বললেন, 'মাদার টেরিজা?'

খোকা বলল, 'মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দিয়ে দেব।'

বাবা বললেন, 'এসব কিছু ঠিক কথা নয়। শোনো, খদ্দেরকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য কখনও খুঁজতে যাবে না। সে যদি নিজেই ফিরে আসে, কখনও স্বীকার করবে না যে, সে একশো টাকা বেশি দিয়েছে, আর ওইসব ধর্মকর্মেও টাকাটা দেবে না।'

খোকা বলল, 'তা হলে ওই একশো টাকা আমি নিজে নিয়ে নেব?

বাবা বললেন, 'খোকা, অসৎ হয়ো না।'

বাবার কথা শুনে থমকিয়ে গেল খোকা। সে জানে না ওই উপরি একশো টাকা নিয়ে কী করতে হবে। তখন তার পিতৃদেব বললেন, 'ব্যবসা সৎভাবে করতে হয়। আমি বলে দিচ্ছি, সেই বেশি টাকা-দেওয়া খদ্দেরকে খুঁজতে যাবে না, দয়া-দান, ধর্মকর্ম করতে যাবে না, কিন্তু টাকাটা তুমি নিজেও নেবে না। সেটা ব্যবসায়িক অসাধুতা হবে। তুমি পঞ্চাশ টাকা নেবে, আর পঞ্চাশ টাকা তোমার সেই অংশীদার বন্ধুকে দেবে। সে দোকানে উপস্থিত নেই বলে, তাকে ঠকাতে যাবে না।'

একেবারে মোক্ষম উপদেশ। খদ্দেরকে ঠকাতে নিষেধ নেই। তবে, অংশীদারকে বঞ্চিত করবে না।

এই যে ব্যবসা-বুদ্ধি, এই বুদ্ধি ব্যবসায়ীর সারাজীবন বর্তমান থাকে, সেই মৃত্যু পর্যন্ত। এক ব্যবসায়ী তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে তাঁর সব ছেলেকে দণ্ডায়মান দেখে মৃত্যুশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন, 'সবাই এখানে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছ, তা হলে দোকান দেখছে কে?' শোনা যায়, ওই মুমূর্ষু নিজেই দোকানে রওনা হতে গিয়ে ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যু-সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসা-বুদ্ধির একটি রক্ত হিম-করা গল্প শেষমেশের সুবাদে পাঠকেরা জানেন।

এক মাথাগরম ব্যবসায়ীর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। তিনি তাঁর এক অবুঝ খদ্দেরের সঙ্গে একই রকম দামদর করতে করতে শেষে এত উত্তেজিত হয়ে যান যে, দোকানের ব্যবহারের ভোঁতা কাঁচি খদ্দেরের বুকে বসিয়ে দেন। খদ্দের বেচারা মারা যান। বিচারে দোকানদারের ফাঁসির আদেশ হয়। ফাঁসির দু'দিন আগে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জানতে পারেন, তাঁর ফাঁসির বাবদ সরকারের হাজার তিনেক টাকা খরচ হবে। ফাঁসির মঞ্চ ঠিকঠাক করা, দড়ি মোম দিয়ে পাকানো, ডাক্তার-পুরুত অনেক রকম খরচ।

এই সংবাদ শুনে ওই ব্যবসায়ী জেল-কর্তৃপক্ষকে জানালেন, 'আমার ফাঁসির জন্যে অত খরচ করতে হবে না। আমাকে এক হাজার টাকা দিন, তার থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা পাটের দড়ি কিনে এনে আমি আত্মহত্যা করছি। সরকারেরও দু'হাজার টাকা বাঁচে, আমার নয়শো নব্বুই টাকা লাভ হয়।'

এক ঘড়ির দোকানদার তাঁর দোকানের অনেকগুলি ঘড়ি অত্যন্ত কম দামে বেচে দিলেন। প্রায় জলের দামেই বলা চলে। সাতশো টাকার ঘড়ি তিনশো টাকায়, পাঁচশো টাকার ঘড়ি দুশো টাকায়। গ্রাহকেরাও খবর পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘড়িগুলো কিনে নিয়ে চলে গেল।

এই সব দেখে ঘড়ির দোকানির এক শুভানুধ্যায়ী জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, 'এত শস্তায় ঘড়ি সব বেচে দিলে, তোমার ক্ষতি হল না?

দোকানি বললেন, 'অনেকদিন পড়েছিল দোকানে, বেচে দিয়ে ভালই হয়েছে, কিছু নগদ টাকা

হাতে এল। তা ছাড়া ঘড়িগুলো সুবিধের নয়, ওগুলো সারিয়ে আমি ক্ষতি উসুল করে নেব।'

ব্যবসা-বাণিজ্যের এসব গূঢ়তত্ত্ব আমার মোটেই বোঝার কথা নয়। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত একটা জটিল উপাখ্যান আমার জানা আছে, সেটি আমি কাহিনীর আকারে পেশ করছি, তবে গল্পটা পুরোপুরি বানানো নয়।

মনুমামা আজ কয়েকদিন হল কলকাতায় কী একটা কাজে এসেছেন, আমার বাসায় এসে উঠেছেন। তাঁকে বুকে অসুখের জন্যে ডাক্তার সিগারেট খেতে বারণ করে দিয়েছেন। তাই মনুমামা নিজের বুদ্ধিতে বিড়ি খাওয়া ধরেছেন। তবে ভাল তামাকে হাতে তৈরি বিড়ি চাই।

আমাদের পাড়ায় একটা গলির মুখে থাকেন রামবাবু। তাঁর বিড়ির ব্যবসা আছে। সারাক্ষণে বসে বিড়ি পাকান। বিড়ি পাকিয়ে রঙিন সুতো দিয়ে পঁচিশটার এককেটা বান্ডিল করে বেচেন।

রামবাবু ভাল গল্প করেন। কথা বলতে বেশ ভালবাসেন। মনুমামার বিড়ি কেনার জন্যে দু'-চারদিন যাতায়াতে রামবাবুর সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা হয়ে গেল।

বিড়ি কিনতে তাঁর কাছে গেলে আমাকে দু'দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। জীবিকার জন্যে নানারকম কাজ করেছেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় প্রথম ধর্মতলা অঞ্চলে কাচের বয়ামে ফিরি করে ত্রিফলার চাটনি বিক্রি করা আরম্ভ করেন। তিনি সরষের তেলের ভেজালের জন্যে হাতিবাগানের কয়েকটা তেল কলে শেয়ালকাঁটার বীজ আর সজনে গাছের ছাল সরবরাহ করেছেন বেশ কয়েক বছর। পরে অবশ্য বিবেকের অমোঘ দংশনে সে ব্যবসা ছেড়ে দেন।

এর পরে রামবাবু জানান, তবে সবচেয়ে বেশি লাভ ছিল মধুর ব্যবসায়। সুন্দরবনের জঙ্গলের গভীর থেকে মধু কিনে আনতেন, কলকাতার বাজারে ডবল দামে সেই মধু বিক্রি করতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে ব্যবসাটা করাই উচিত ছিল আপনার, সেই কারবারটা ছাড়তে গেলেন কেন?'

রামবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'মধুর কারবার কি সাধ করে ছেড়েছি আপনার মনে হয়। সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।'

এ রকম ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিবরণ না শুনে আসা যায় না। আমাকেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রামবাবুর কথা শুনে যেতে হল। এদিকে, বিড়ি কিনে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। মনুমামা কিন্তু... কী করা যাবে। তবে রামবাবু দ্রুত হাতে বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে যা বললেন তা মর্মান্তিকের চেয়েও বেশি।

একদিন তিনি মধুর সন্ধানে জঙ্গলের গভীরে চলে গেছেন। নৌকোয় বসে আছেন, কখন মৌচাক কেটে মধু নিয়ে ব্যাপারিরা আসবে, তাদের কাছ থেকে মধু কিনে নিয়ে আসবেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন রামবাবু, মধুর নৌকো আসছে না, রামবাবু সামনের গলুইয়ের ওপরে বসে আছেন। হঠাৎ পিছনে খালের ধারে শুকনো সুঁদরি পাতার মধ্যে খচমচ শব্দ শুনে তিনি তাকিয়ে দেখেন একটা বিরাট রয়াল বেঙ্গল টাইগার সামনের পা দুটো নিচু করে তাঁর দিকে তাক করে লাফানোর জন্যে উদ্যত হয়েছে।

এই পর্যন্ত শুনে আমি স্তম্ভিত, মিনমিন করে জানতে চাইলাম, 'তারপর কী হল?' রামবাবু বললেন, 'বুঝতে পারছেন না কী হল? আমাকে দেখেও বুঝতে পারছেন না?'

আমার বোঝার ক্ষমতা চিরদিনই কম, সেকথা কবুল করে বললাম, 'পরিষ্কার করে বলুন না, সত্যি কী হয়েছিল? বাঘটা আপনাকে মাথা ঘোরাতে দেখে লাফ না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল?'

রামবাবু বললেন, 'এ রকম হলেই খুব ভাল হত। কিন্তু মাথা ঘোরানো এবং মাথা ঘুরিয়ে রয়াল বেঙ্গলকে দেখতে পাওয়ার মধ্যে যে খণ্ডমুহূর্ত, সেই ক্ষণে আমি কিছু বোঝবার, অনুমান করবার আগে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সেই ডোরা ডোরা হলুদ বাঘটা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

এই অবস্থায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'বাঘ নিশ্চয় আপনার মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গিয়েছিল।'

রামবাবু বললেন, 'রয়াল বেঙ্গল কখনও তাক ভুল করে না।'

আমি বললাম, 'তা হলে?'

তিনি বললেন, 'তা হলে কী? বাঘটা খালের এপার থেকে লাফিয়ে পড়ে আমার ঘাড় মটকিয়ে মুখে করে ওপারে গিয়ে পড়ল।'

এই পর্যন্ত শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'তা হলে আপনি বেঁচে রইলেন কী করে?'

'বেঁচে কি আছি দাদা?' রঙিন সুতো দিয়ে পঁচিশটা বিড়ির একটা বান্ডিল বেঁধে আমার হাতে দিয়ে রামবাবু বললেন, 'একে কি বেঁচে থাকা বলে দাদা?'

বিজ্ঞাপন

এ যুগের কবি লিখেছেন, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।'

সেও তো বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তারপরে জল আরও গড়িয়েছে। ঘোলা জল ঢুকে গেছে গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে, শোয়ার ঘরের মধ্যে।

খবরের কাগজের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন, দূরদর্শনে, বেতারে চ্যানেলের পর চ্যানেল, ব্যান্ডের পর ব্যান্ড সংবাদের মধ্যে বিজ্ঞাপন, খেলার মধ্যে বিজ্ঞাপন, ধারাবাহিকের পরতে পরতে বিজ্ঞাপন, নাচগানের আগে-পিছে-মধ্যে বিজ্ঞাপন। শুধু মুখ নয়, এখন সমস্ত শরীর ছেয়ে গেছে বিজ্ঞাপনে।

কিংবা বলা চলে, সমস্ত শরীর খুলে গেছে বিজ্ঞাপনে। নগ্নতার এমন নির্লজ্জ সমারোহ উনিশ শতকের কোনও সামন্তের রঙমহলে, দেবদাসী মন্দিরের নিভৃত গর্ভগৃহেও হয়তো অসম্ভব ছিল।

তাই এই প্রসঙ্গে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন' বিজ্ঞাপনের পুরনো জগতে। সেই কালে বিজ্ঞাপনে লেখা হত, 'পুজায় স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবেন না' স্নেহ মানে স্নেহ পদার্থ, ঘি, গব্যঘৃতের শারদীয় বিজ্ঞাপন, খুব সম্ভব প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা। এই সময়েই ঘিয়ের আরেকটি বিজ্ঞাপন, 'বাসি লুচি শ্রীঘৃতে ভাজা হইলেও খাইবেন না।'

কিংবা মনে করুন, ম্যালেরিয়ার ওষুধ প্যালুড্রিনের সেই ঢাক বাজানো ঘোষণা অথবা ও সি গাঙ্গুলির আঁকা জবাকুসুমের বিজ্ঞাপনের সুখের সংসার। আজ আর ভাবা যায় সেই বইয়ের বিজ্ঞাপন :

উপনিষদ বলেছেন
তুষ্ট হয়ো না অল্পে।
শৈলর আঁকা ছবি আর
শিবরামের গল্পে।

এই সূত্রে হয়তো আরও অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে। তার

বদলে এবার আমরা একাধিক ছোটখাটো অনতিখ্যাত বিজ্ঞাপন তথা বিজ্ঞপ্তির কথা স্মরণ করি।

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের একটা চায়ের দোকানের কথা মনে পড়ছে। সে দোকানে ছাত্র-যুবকদের খুব ভিড়, প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া, প্রচুর হইচই। সাধারণত এসব দোকানে যা হয়ে থাকে, খদ্দেররা চায়ের ফাঁকা পেয়ালায় সিগারেটের দগ্ধ ভগ্নাংশ ফেলেন, নোংরা করেন।

দোকানদার আপত্তি করেও, বাধা দিয়েও এর কোনও বিহিত করতে পারেননি। অবশেষে বাধ্য হয়ে দোকানের ভিতরের দু'দিকের দেওয়ালে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন টানিয়ে দিয়েছিলেন।

যাঁরা চায়ের পেয়ালায় সিগারেটের ছাই না ঝেড়ে থাকতে পারেন না, যাঁরা পোড়া সিগারেটের টুকরো চায়ের পেয়ালায় ফেলতে ভালবাসেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে চায়ের অর্ডার দেওয়ার সময়ে বেয়ারাকে সেটা জানিয়ে দেবেন, তাঁদের কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তাঁদের জন্যে ছাইদানিতে চা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আরও দুটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমটি একটি রাস্তার ধারের ম্যাগাজিন স্টলের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল।

আপনি যদি আমাদের দোকানের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমাদের পত্রপত্রিকাগুলি পাঠ করেন, তাতে আমরা রাগ করব না। এমনকী আপত্তিও করব না। কিন্তু আমরা প্রকৃতই খুশি হব এবং আপনিও আরাম পাবেন যদি পত্রপত্রিকাগুলি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শুয়ে বসে পাঠ করেন।

পরের বিজ্ঞাপনটি মদের দোকানের, পানশালার :

যদি পান গ্রাহকদের প্রতি আবেদন করতে করতে কখনও আপনি টের পান যে, পৃথিবীটা দুলছে, টেবিল-চেয়ার কাঁপছে, দেওয়ালগুলো এগিয়ে এগিয়ে আসছে, জানলা দরজাগুলো কাত হয়ে যাচ্ছে, সাবধান, নড়াচড়া করতে যাবেন না, টেবিল ছেড়ে উঠবেন না, যতক্ষণ না কাঁপুনি, দুলুনি এই সব থেমে জগৎ সংসার আবার স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত টেবিলে চুপচাপ ঠায় বসে থাকুন।

পুনশ্চ :

নিবন্ধ শেষে এই কাল্পনিক বিজ্ঞাপনটি শুধুমাত্র ধীমান ও ধীমতীদের জন্যে। বড় রাস্তায় একটি সুসজ্জিত দোকানের সাইনবোর্ড

বিষের দোকান

আমাদের দোকানের বিষ খরিদ করার পর অদ্যাবধি কোনও খরিদ্দার অভিযোগ করিতে আসেন নাই।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কবিতার ভাল-খারাপ

পাগলামি এবং আলসেমি করা ছাড়া আর প্রায় সব কাজেরই একটা বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। পাগলামি, আলসেমিও কখনও কখনও উদ্দেশ্যপরায়ণ হতে পারে, তবে সেটা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

একজন মানুষ হাঁটছে। সে কোথাও যাওয়ার জন্য হাঁটছে। অথবা কিছু করার নেই বলে হাঁটতে বেরিয়েছে। এমনও হতে পারে সে হন্টন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে চায়। হেঁটে হেঁটে হাঁটার গতি বাড়াচ্ছে। কিংবা সে খুব সমাজ সচেতন। দল বেঁধে সাক্ষরতা, মাদকমুক্তি, নর্মদারক্ষা কিংবা বইয়ের জন্য হাঁটছে। আরও কতরকম ভাবা যায়, সে হয়তো কোনও অভীষ্ট জনের সঙ্গে দেখা হবে এই আশায় হাঁটছে, পাওনাদারের হাত এড়ানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে।

তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। হাঁটার মতোই, যে কোনও কাজেরই অভিপ্রায় থাকে। আমাদের কাজকর্ম, চলা-ফেরা, ভাব-ভালবাসা সবই উদ্দেশ্যমূলক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, ফল আশা করবে না কাজ করে যাও। সেই অতি ক্লিশে সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত না করেই বলি, পৃথিবীর মানুষেরা যা কিছু করে সবই ফলের জন্যে, মরজগতে উদ্দেশ্যই বিধেয়।

যে কোনও ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, 'এটা কেন করেছ?' সত্যি মিথ্যা সে একটা কারণ দেখাবে, হয়তো একটা বিশেষ প্রয়োগ দর্শাবে।

পাহাড়ে ওঠার ব্যাকুলতা যাদের আছে, সেই খেয়ালি পর্বতারোহীদের এবং এই জাতীয় অ্যাডভেঞ্চারকামীদের উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। বোঝা যায় না তারা কেন অত কষ্ট করে পাহাড় বেয়ে ওঠেন। কী লাভ? কী প্রয়োজন?

পর্বতোরোহীদের কিন্তু এ বিষয়ে একটা চমৎকার বাঁধা উত্তর আছে, 'পাহাড়ে উঠি, পাহাড় আছে বলে।'

সবাই এভারেস্টে ওঠে না, যে কোনও দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে খবরের কাগজে নাম বেরয় না, সমতল পৃথিবীর লোকেরা হাততালি দেয় না। তবু পাহাড় পাগলেরা পাহাড়ে উঠবেই, বর্ষে বর্ষে দলে দলে।

এবার কবিতার কথায় আসি।

যে মানুষ কবিতা লেখে, ভাষার লঙ্ঘন ভেঙে ভাবের চূড়ায় উঠতে চায় সে কি ওই পর্বত লঙ্ঘনকারীদের মতো বলতে পারবে, 'কবিতা আছে, তাই লিখি।'

আসলে এই সব প্রশ্ন, 'কবিতা কেন লেখো, কবিতা কী জন্যে লেখ, কবিতা লিখে কী হবে?'... অনেক সময়েই ওঠে। একজন কবিকে তাঁর পরিবেশ ও সমাজ, তাঁর বস্তুবাদী, শুভানুধ্যায়ীরা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করতে পারে 'কবিতা লিখে কী চাও? কবিতা লিখে কী লাভ?'

একটি ষোলো বছরের ছেলে বয়সকালের নিয়মে ধাঁই ধাঁই করে লম্বা হচ্ছে, হয়তো একটু অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে, তাকে যদি বলা যায়, 'আর লম্বা হয়ো না, বেশি লম্বা হয়ে লাভ কী?'

ছেলেটি কী করবে লম্বা হওয়া বন্ধ করে দেবে? সেটা কি তার নিজের আয়ত্তের মধ্যে আছে? তা ছাড়া বেশি লম্বা হয়ে লাভ নেই এ কথারই বা প্রমাণ কী।

অনেকদিন আগে কবিতা লেখার একটা স্পষ্ট কারণ দেখিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি

কবিতা লিখে প্রাসাদ বানাতে চেয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি।' তারও বেশ কিছুকাল আগে অন্যযুগের এক বিদ্রোহী কবি কবিতাকে অবলম্বন করেই কবিতাকে ছুটি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর কিশোর কল্পনায় পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির সঙ্গে উপমা দিয়ে কবিতাকে জলাঞ্জলি দিতে চেয়েছিলেন। এসব অবশ্য পুরনো কথা। আসল সমস্যা কবিকে নিয়ে নয়, কবিতাকে নিয়ে। কবিতা কী এবং কেন এর কোনও সহজিয়া ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

অনেকদিন আগে এক চতুর পণ্ডিত রাজাকে কবিতা শেখানোর নাম করে ঠকিয়েছিলেন। তিনি একটি পঙ্‌ক্তি লিখে রাজার কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা উপহার পেয়েছিলেন। পঙ্‌ক্তিটি ছিল 'মার্জার ক্ষীরং পিবর্তি'। রাজামশায় পুরস্কার দিলেন বটে কিন্তু সভাপণ্ডিত ছাড়বেন কেন। তিনি কবিকে বললেন, 'এটা আবার কী কবিতা হল?' কবি বলেন, 'কেন কবিতা হবে না?' সভাপণ্ডিত বললেন, 'কবিতা যদি হবেই তবে এর চারচরণ কই?' সপ্রতিভ কবি জবাব দিলেন, 'ওই যে মার্জার, ওর চার চরণ।' সভাপণ্ডিত থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি কাব্যই হবে তবে রস কোথায়?' কবি বললেন, 'ওই তো ক্ষীরের মধ্যে রস রয়েছে।' অবশেষে বিমূঢ় সভাপণ্ডিত জানতে চাইলেন, 'এর অর্থ কী?' কবি বললেন, 'দেখলেন না, এর অর্থ রাজামশাই দিলেন।'

আসল কবিতার চেয়ে এ রকম গোঁজামিলের কবিতা কখনওই কম নয় এবং রাজ-অনুগ্রহ, পুরস্কার পৃষ্ঠপোষকতা এইরকম কবিরাও পেয়ে থাকেন। হয়তো একটু বেশিই পান।

তা হোক। এই সূত্রে আমরা মূল প্রশ্নে ফিরে যাই। একজন কেন কবিতা লিখবে? সারাজীবনে একটা কি দুটো দশ-পনেরো হাজার টাকার পুরস্কার, সম পরিমাণ কবিতার বইয়ের রয়্যালটি— এতে কোনও ভদ্রলোকের এক বছরও সংসার চালানো কঠিন। সুতরাং অর্থের জন্য কোনও বুদ্ধিমান লোকই কবিতা লেখে না। তবে এ বাবদ যদি কিছু অর্থাগম হয়, তবে সেটা উপরি পাওনা।

উপরি পাওনা ব্যাপারটা না হয় একটু বোঝা গেল। কিন্তু আসল পাওনাটা কী। কাগজকলম নিয়ে বসে পাতার পর পাতা কবিতা লিখে যাওয়াটা কঠিন নয়। সে কবিতা ভাল কি খারাপ সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা। ধরা যাক, ভাল কবিতা লিখেছেন একজন। কিন্তু কবিতা ছাপানো সোজা নয়। সে পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই হোক বা বইতেই হোক। সম্পাদক-প্রকাশকের স্নেহ বা অনুগ্রহ পাওয়া সহস্র বর্ষের সাধনার ধন। কারও কারও ভাগ্যে যে হঠাৎ শিকে ছেঁড়ে না তা নয়, কিন্তু সে তো নিতান্ত ব্যতিক্রম।

সব ভাল কবি একদিন মনে মনে টের পান, আর সবাই যে রকম লিখছে বা লিখেছে, লিখে নাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তিনি তা পাননি। তাঁর মনে ক্ষোভ দেখা দেয়। তিনি ভাবেন তাঁকে বঞ্চনা করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কারা তাঁকে বঞ্চনা করেছে সে বিষয়ে তাঁর কোনও পরিষ্কার ধারণা নেই। এক অদৃশ্য শত্রু-শিবির তিনি মনে মনে রচনা করেন। ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, চোখের জ্যোতি কমে যায়। পড়ে যায়। তিনি বিস্মৃত হয়ে যান।

খারাপ কবিতার সমস্যা আলাদা। অনেকে জানে না সে কবিতা লিখতে পারে না। কখনও বুঝতেই পারে না। একবার, পাড়ার এক উঠতি কবি মধ্যরাতে মদ খেয়ে পাড়ার পাশের ড্রেনে পড়েছিল। তাকে স্থানীয় মস্তান ঘণ্টাদা চুলের মুঠি ধরে তুলে গালে দুটি থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, 'ওমুক-দার কাছে মদ খাওয়াটা শিখলি। পদ্য লেখাটা শিখতে পারলি না।' এর চেয়েও একটি করুণ কাহিনী আমি জানি। তরুণ কবিদের এক পানের আসরে যথারীতি কবিতা নিয়ে চেঁচামেচি হচ্ছিল। যে সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করছিল, বন্ধুরা একমত হয়ে তার মদের গেলাস ভেঙে দিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যা, মোড়ের দোকানে গিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খা। তুই যা কবিতা লিখিস, তাতে মদ খাওয়া হয় না।'

বুদ্ধিমতী পাঠিকা, আপনি বুঝতে পারছেন আমি প্রৌঢ়জনোচিত কূট কৌশলে মূল প্রশ্নটি

এড়িয়ে গিয়ে কয়েকটি আপাত অবান্তর কেচ্ছা-কথার মধ্যে আবদ্ধ রইলাম। আসলে মূল প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। কবিতা লেখার কোনও কারণ নেই, শর্ত নেই। যে লেখার সে লিখবে।

যে ভাল লেখার,সে ভাল লিখবে। যে খারাপ লেখার সে-ও লিখবে।

জোচ্চোর

অভিধানে দেখা যাবে যে জোচ্চোর এবং জুয়াচোর শব্দ দুটি সমার্থক। তবে এর মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেছে। জোচ্চোর মানে আমরা সবাই জানি, এর অর্থ হল প্রবঞ্চক। জুয়াচোর শব্দটির অর্থও তাই কিন্তু সমাস ভাঙলে এর ব্যাসবাক্য 'জুয়ায় যে চুরি করে'—জুয়াচোর। এ ক্ষেত্রে অর্থটা কিন্তু বেশ একপেশে।

সে যা হোক, আগের দফায় জুয়া নিয়ে লিখেছি, সুতরাং এ দফায় জুয়াচোর স্বভাবতই এসে যাচ্ছে। এবং আপাতত আমরা জুয়াচোর বলতে জোচ্চোরকেই বোঝাচ্ছি।

গত শতকের নৈরাশ্যবাদী জার্মান দার্শনিক শ্যপেনহাওয়ার, যিনি মনীষী হেগেলকে জোচ্চোর (charlatan) বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রবঞ্চনা বিষয়ে তিনি একটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন। শ্যপেনহাওয়ারের অন্য অধিকাংশ উক্তির মতোই এই উক্তিটিও চমকপ্রদ। উক্তিটি হল, যখন তুমি প্রবঞ্চিত হলে, তোমার আর্থিক ক্ষতি হল তখন জানবে তোমার টাকা সব চেয়ে ভাল কাজে এবার খরচ হল, কারণ এবার অর্থের বিনিময়ে তুমি কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করলে, অভিজ্ঞতা লাভ করলে। একটি সমজাতীয় কথা বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে বহুকাল ধরেই চালু আছে, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'। ঠিক একই অর্থ প্রতারিত বা প্রবঞ্চিত হলে জ্ঞান বাড়ে। অভিজ্ঞতা বাড়ে। আর মার্ক টোয়েন সাহেবের মতে অভিজ্ঞতা হল সেই পদার্থ যা কোনও ব্যাপারে দ্বিতীয়বার ঠকবার পরে স্মরণ করিয়ে দেয় আগেও একবার একই ভাবে ঠকেছিলাম।

সামান্য আলোচনা, শুরুতেই খটমট হয়ে গেল। শ্যপেনহাওয়ার এবং মার্ক টোয়েন, গত শতকের এই দুই বাক্যবাগীশ সাহেবের কথা উঠল। জোচ্চুরির নিবন্ধে কী আর করা যাবে, সাহেবদের দেশের দুয়েকটা কথা বলে স্বদেশি জোচ্চুরিতে আসছি।

জোচ্চোর বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় কথা আছে যে, অমুক লোকটা জোচ্চোর, ওর সঙ্গে করমর্দন অর্থাৎ হ্যান্ডশেক করার পর গুনে দেখতে হয় নিজের হাতের আঙুল সব কয়টি যথাযথ আছে কি না। এক বিধবা মেমসাহেবের গল্প জানি। মেমদের তো আর সধবা-বিধবা-কুমারী বোঝা যায় না। জ্যোতিষী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, 'আপনার বড় একটা ক্ষতি সামনে আছে।' মেম বললেন, 'কী ক্ষতি?' জ্যোতিষী একটু ভেবে বললেন, 'আপনার স্বামী মারা যাবেন।' বিধবা বললেন, 'কিন্তু আমার তো স্বামী নেই। এবার জ্যোতিষী একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার ছাতা হারাবে।'

এ হল পুরনো জোচ্চুরি। নতুন জোচ্চুরির কথা বলি। তার আগে আরেকটা গল্প।

অনেকদিন আগে, নিতান্ত অল্প বয়সে। সন্তোষ রাজবাড়ির রথের মেলায় মাত্র আট আনা দিয়ে

একটা বই কিনেছিলাম, বইটার নাম 'সচিত্র গোপাল ভাঁড়'। সেই প্রায় আধ শতক আগে সেই বইতে একটা গল্প পড়েছিলাম।

গোপাল ভাঁড় এক ব্যক্তির কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করেছিল। কিন্তু কিছুতেই শোধ দিচ্ছে না। লোকটি তখন জোর তাগাদা শুরু করে, গোপাল ভাঁড়ও এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। লোকটা আর গোপাল ভাঁড়কে ধরতে পারে না। অবশেষে একদিন সে খুব ভোরের বেলায় গোপাল ভাঁড়ের বাড়িতে এসে হাঁকাহাঁকি-চেঁচামেচি শুরু করল। লোকটির হাঁক-ডাকে গোপাল ঘরের মধ্যে থেকে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে এল। তার হাতের মুঠোর মধ্যে যেন কী ধরা রয়েছে। পাওনাদারকে দেখে এগিয়ে এসে গোপাল বলল, 'এত চেঁচামেচির কিছু নেই। দাঁড়াও আজ এখনই আমি তোমার ঋণশোধের বন্দোবস্ত করছি।'

এই বলে গোপাল ভাঁড় বারান্দা থেকে বাড়ির উঠোনে নেমে উঠোনের একপাশে হাতের মুঠো খুলে কয়েকটি তেঁতুলের বিচি ছড়িয়ে দিল। পাওনাদারকে এর পর কোনও প্রশ্ন করার ফুরসত না দিয়ে গোপাল বুঝিয়ে বলল, 'এই তেঁতুল বিচি লাগালাম। এইবার বড় বড় গাছ হবে, সেই সব গাছে মণ-মণ তেঁতুল ফলবে। সেই তেঁতুল বেচে তোমার সব ধার শোধ করে দেব। যাও এবার খুশি তো।' আজ কিছুদিন হল খবরের কাগজে এক ধরনের বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে। এই জায়গায় কিংবা সেই জায়গায় ইউক্যালিপটাস বা মেহগনির চাষ হচ্ছে। আপনি যদি সামান্য দেড় বা দু' হাজার টাকা দরে এখন কয়েকটি চারা কিনে রাখেন তবে পনেরো-বিশ বছর পরে আপনি তিন বা পাঁচ লক্ষ টাকা দামের গাছের অধিকারী হবেন। গাছগুলি যেখানে চাষ হবে সেখানকার কাব্যিক বর্ণনা, প্রতিটি গাছের বাজার মূল্য, কৃষিবিমার সুরক্ষা, সেই সঙ্গে ঝলমলে ছবি সহকারে বিজ্ঞাপনগুলি লোভনীয় ও চমকপ্রদ। অঙ্কে কোনও ভুল নেই, গোপাল ভাঁড়ের অঙ্কেও ভুল ছিল না। কিন্তু উলটো দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে পাঁচ-দশটি গাছের চারার দাম বড় জোর একশো-দুশো টাকা, এ ধরনের কিছু গাছ বৃক্ষরোপণ উৎসবে সরকার বিনামূল্যেও বিতরণ করেন। আর এই গাছ লাগানোর জন্যে যেটুকু জমি, সেটা যে অঞ্চলে চাষবাসহীন সেই বুনো জায়গায় পতিত জমিটুকুর বাজার দর কিছুতেই দুশো টাকাও নয়। কিন্তু আপনি যদি প্রলুব্ধ হন, মাত্র হাজার পনেরো টাকা গচ্চা দিয়ে ভবিষ্যতে কোটিপতি হওয়ার অলীক স্বপ্ন দেখেন, তা হলে আপনাকে ঠেকাবে কে? আপনার টাকাটা যাবে।

ভয় এবং লোভ, মানুষের এই দুই প্রবৃত্তি নিয়ে জোচ্চোরদের কারবার। অসহায় বিধবাকে এরা বলে তোমার একমাত্র সন্তানের মৃত্যুযোগ সামনে রয়েছে। সন্ত্রস্তা রমণী তাঁর শেষ সম্বল গলার সোনার হারটি খুলে দেন শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্যে। কালোবাজারি কিংবা এমনিই সাধারণ ব্যবসায়ীকে গিয়ে বলে, 'তোমার কাগজপত্র, হিসেব বার কর। আমরা পুলিশ (কিংবা আয়কর দপ্তর) থেকে এসেছি।' ঝামেলার ভয়ে ব্যবসায়ী কিছু টাকা ছাড়ে। এরা গৃহস্থকে সস্তায় ফ্ল্যাটবাড়ি বা জমির লোভ দেখায়। বেকারকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়। অসুস্থ রোগীকে সুচিকিৎসা। এরাই চোখের সামনে টাকা ডবল করে, সোনা বানায়। হিংটিং ছট মন্ত্র দিয়ে স্বর্গের স্থায়ী ইজারার বন্দোবস্ত করে।

সাধু সাবধান!

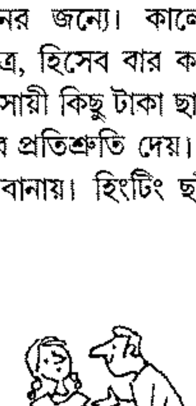

বলাই বাহুল্য

কানাই এবং বলাই দু'জন সমবয়সি যুবক, পরস্পর বন্ধু এবং প্রতিযোগী। যেমন সাধারণত হয়ে থাকে আর কী।

সমবয়সি বন্ধু হলেও দু'জনের মধ্যে প্রায় কোনও বিষয়েই মিল নেই। কানাই ধনী, বলাই গরিব। কানাই উচ্চশিক্ষিত, বলাইয়ের লেখাপড়া তেমন নয়। কানাই দেখতে ভাল, লম্বা, ফর্সা। বলাই মোটেই দেখতে ভাল নয়, মোটা, বেঁটে, গায়ের রঙ কালো।

তবে বলাইয়ের সঙ্গে একটা ব্যাপারে কানাই পিছিয়ে আছে। ব্যাপারটা প্রেমঘটিত, বলাই একজন সফল প্রেমিক, তার একজন সুন্দরী তরুণী প্রেমিকা আছে, কিন্তু কানাই এ লাইনে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।

অবশেষে যা ঘটার তাই ঘটল। বলাই একদিন বন্ধু কানাইয়ের সঙ্গে তার প্রেমিকার আলাপ করিয়ে দিল। সেই আলাপই কাল হল।

অতঃপর বলাই বাহুল্য।

সবাই জানেন এ গল্পটা। এটি একজন অসামান্য লেখকের বিখ্যাত গল্প। বনফুল লিখেছিলেন গল্পটা, সেও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে। আমি শুধু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য রকম করে লিখলাম। গল্পটা হাতের কাছে নেই, সুতরাং এত কাল পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে হয়তো কিছুটা উলটোপালটা হয়ে গেল।

সে যা হোক, এই গল্পটির কিন্তু অন্য একটা দিক আছে। মনে রাখতে হবে গল্পটার নাম, 'বলাই বাহুল্য', গল্পের লেখক বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শুধু বলাইচাঁদই পারেন নিজের বাহুল্য ঘোষণা করতে।

ইতিহাসে গল্প আছে, আরব খলিফাদের যুগে খলিফার সৈন্যদল আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করতে যায়, সেখান থেকে দূত গিয়েছিল খলিফার কাছে গ্রন্থাগারটি যাতে পুড়িয়ে না ফেলা হয় এই অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু খলিফা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এই বলে যে গ্রন্থাগারের বইগুলো যদি কোরান বিরোধী হয় সেগুলো পোড়াতেই হবে; আর যদি কোরানসম্মত হয় তা হলে সেগুলো রাখার প্রয়োজন নেই, সেগুলো বাহুল্য মাত্র, পুড়িয়ে ফেললে কিছুই এসে যায় না।

সম্ভবত এটা নিতান্ত একটা গল্প, একটা গোলমেলে গল্প। তবে সেই প্রাচীন গ্রন্থাগার সৈন্যেরা ধ্বংস করেছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। এ রকম অন্ধতা, ধর্মীয় অন্ধতা, সাংস্কৃতিক অন্ধতা, এই এতকাল পরে এই আজকের যুগেও যে টিকে আছে, সে তো আমরা মর্মে মর্মে জানি।

হালকা ভাবে আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল রচনাটা। আমি আবার আমার নিজের এলাকায় প্রত্যাবর্তন করছি। আবার বাহুল্যের গল্প বলি। বাড়িতেও বাগান ছিল। ভদ্রলোক নিজের বাগানের পরিচর্যা নিজেই করতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে বড় অত্যাচার করত, কেউ কোদাল ধার নিয়ে ফেরত দিতে ভুলে যেত, কেউ খুরপি ধার নিয়ে দিনের পর দিন রেখে দিত, ভদ্রলোকের বাগানের কাজে খুব অসুবিধে হত।

সেবার বর্ষার পরে এই ভদ্রলোকের বাগানে খুব লম্বা লম্বা ঘাস হয়েছে সেগুলো কেটে সমান

করতে হবে। তিনি বাজারে গেলেন ঘাস-কাটা কল কিনতে। দোকানে গিয়ে তিনটে ঘাসকাটা কল অর্ডার দিলেন।

দোকানদার অবাক। বহুদিন হল কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা তাঁর, জীবনে কোনও দিন কাউকে এক সঙ্গে তিনটে ঘাসকাটা কল কিনতে দেখেননি। কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, আপনার কি তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় তিনটে বাড়ি আছে?'

স্যার শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আমার বাড়ি একটাই। একটা কলেই আমার হয়ে যাবে। বাকি দুটো বাহুল্য মাত্র, আমার দু' পাশের দুই প্রতিবেশীর জন্যে। তারা ধার নিলে আমার যাতে অসুবিধে না হয় সেই জন্যে।'

বাহুল্যের অন্য রকম একটা গল্প জানি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে দল বেঁধে এসেছে। পাত্র-পাত্রী এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবী সব।

কপালে চন্দনের ফোঁটা নেই, টোপর নেই, ফুলের মালা নেই, কনের পরনে বেনারসি দূরের কথা শাড়িই নেই। প্যান্ট-শার্ট, শালোয়ার-কামিজ। এদের মধ্যে কে যে বর আর কে যে কনে বোঝাই দায়।

সামনে একটি ধোপদুরস্ত, সুদর্শন যুবককে দেখে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বললেন 'আপনিই কি বর?' ছেলেটি ম্লান হেসে বলল, 'না আমি বর নই। আমি সেমিফাইনালে বিদায় নিয়েছি। আমি এখন বাহুল্যমাত্র।'

সর্বশেষে অন্য এক বলাইয়ের গল্প।

এই বলাইয়ের প্রেম ছিল মালতীর সঙ্গে। বহুদিন প্রেম চলার পর একটা বিপত্তি ঘটল। বলাইয়ের মুখের ভাষাতেই বলা যাক, 'মালতীকে একদিন আমার কাকার কথা বলেছিলাম।'

খাঁটি ব্যাচেলার, মধ্য চল্লিশ, সুপুরুষ, অত্যন্ত বিত্তবান আমার কাকা। বালিগঞ্জে বাড়ি, দুটো গাড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কাকা মারা গেলে সেসব টাকা আমিই পাব।'

এ পর্যন্ত শুনে, সবাই বলল, 'তাতে কী হল?'

বলাই দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কী আর হবে? বলাই বাহুল্য। মালতী এখন আমার কাকিমা।'

গোলমাল

গোলমাল শব্দের অর্থ গণ্ডগোল। গণ্ডগোল শব্দের অর্থ গোলমাল।

আসলে গোল, গণ্ডগোল, গোলযোগ, গোলমাল সবগুলি শব্দেরই প্রায় একই অর্থ, ব্যবহারও একই রকম। এর সব কয়টিই বাংলায় সমান চালু। কিন্তু শব্দগুলির ব্যুৎপত্তির ইতিহাস খুবই গোলমেলে।

মূল 'গোল' শব্দটি ফারসি। তার তিন রকম মানে। তিন রকম অর্থেই বাংলা ভাষায় এর ব্যবহার।

প্রথম অর্থ হল, উচ্চ রব। আধুনিক বাংলা নাটকের গানে আছে, 'গোল কোরো না, কথা বোলো না, ভগবান ঘুমিয়ে আছেন।'

দ্বিতীয় অর্থ হল, জটিলতা, প্যাঁচ, সারল্যের অভাব। যেমন লোকে বলে, 'এম এল এ সাহেবের মনে গোল আছে।'

তৃতীয় অর্থ হল, ফ্যাসাদ। আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকোয় চড়তাম না। না বুঝে গোলে জড়িয়ে পড়া।

এত উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই। এই স্বল্প পরিসর রচনায় আমাকে গোলমালের গল্পে যেতে হবে। যাওয়ার পথে আরও দুয়েকটা জ্ঞানের কথা বলে নিই।

গণ্ড মানে বড়। গণ্ডগ্রাম মানে সচরাচর যা ভাবা হয়, তা নয়। গণ্ডগ্রাম ছোট গ্রাম নয়, বেশ বড় গ্রাম। তেমনই গণ্ডগোল খুব বড় গোল।

গণ্ডগোল শব্দটির গঠনও লক্ষণীয়। প্রথম অংশ গণ্ড সংস্কৃত, দ্বিতীয় অংশ গোল ফারসি। গোলযোগে ঠিক এর বিপরীত প্রথমে ফারসি, পরে সংস্কৃত।

আর গোলমাল শব্দটি? সে নিয়ে খুবই গোলমাল। গোল শব্দটি ফারসি থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে কিন্তু গোলমাল এসেছে হিন্দি কিংবা উর্দু হয়ে উত্তর ভারতের রাস্তা ধরে কাজির আদালত, ফৌজি শিবির কিংবা জরিপি তাঁবু মারফত।

কবি বলেছিলেন, শব্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কথা, শব্দের কথা থাক, আপাতত থাক; এবার বাচ্যে যাই। বাচ্য থেকে অনুচ্ছেদে। একেকটি অনুচ্ছেদে একেকটি গল্প নয়। সব মিলে এটি আরেকটি, গোলমেলে কথিকা।

গোলমালের এই গল্পটি বারবার বলার মতো। তাই বারবার বলছি।

প্রকৃতপক্ষে এটা ঠিক কোনও গল্প নয়।

চল্লিশের দশকের একটি অতি ফ্লপ হলিউডি ছবির চিত্রনাট্যের একটি অংশ। বলা বাহুল্য, সেই যুদ্ধের এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাজারে এতটা হালকা ব্যাপার মোটেই প্রশ্রয় পায়নি। চার্লি চ্যাপলিনই প্রায় বাতিল হতে বসেছিলেন।

গল্পটা বলি, তারপর অন্য কথা।

একটা বড় হোটেলের পানশালায় এক ভদ্রলোক হাঁফাতে হাঁফাতে, দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই হাতের বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার সহযোগে উচ্চরবে তুড়ি দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ভাই, আমাকে ডবল পেগ ব্র্যান্ডি দু'গেলাস চট করে দাও। তাড়াতাড়ি দিও, গোলমাল হওয়ার আগে দিয়ে দিয়ো।'

বেয়ারা ছুটে গিয়ে দু' গেলাসে দুই-দুই চার পেগ ব্র্যান্ডি এনে দিল। ভদ্রলোক পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'তোমাদের এখানে চিকেন তন্দুরি, ফিশ ফিঙ্গার পাওয়া যাবে?' বেয়ারা বলল, 'যাবে। খুব ভাল বানায় এসব এখানে।' ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে দেরি করছ কেন? তাড়াতাড়ি যাও, গোলমাল লাগার আগে দু' প্লেট নিয়ে এসো।'

বেয়ারা খাবার আনতে গেল। এসব খাবার নিয়ে আসতে একটু সময় লাগে। বানাতে সময় লাগে, আগের লোকদের আগে দিতে হয়।

মিনিট পনেরো পরে বেয়ারা যখন খাবারের প্লেট নিয়ে এল, তখন ভদ্রলোকের পানীয় শেষ। তিনি আবার অর্ডার দিলেন, 'দু' গেলাসে দুটো দুটো করে মোট চারটে ব্র্যান্ডি তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি করো, কখন গোলমাল লাগবে। এখনই নিয়ে এসো।'

বেয়ারা আজ্ঞা পালন করল। কিন্তু তার মনে একটা খটকা লেগেছে। সাহেব বারবার 'গোলমাল-গোলমাল' করছেন কিন্তু গোলমাল কোথায়? কীসের গোলমাল?

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বেয়ারাটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, গোলমাল হবে, গোলমাল হবে তখন থেকে বলে যাচ্ছেন, কিন্তু কী গোলমাল, কীসের গোলমাল, কোনও গোলমাল তো দেখতে পাচ্ছি না।'

পানীয়ের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'গোলমাল কাকে বলে এখনই দেখতে

পাবে। এই যে এত খাবার পেলাম, মদ খেলাম—কিন্তু আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। এখনই তুমি নিজে, তোমার ম্যানেজার গোলমাল শুরু করে দেবে।'

এই গোলমাল কাহিনীটির দুটি পরিণতি আমার জানা আছে।

প্রথম ক্ষেত্রে, বারের ম্যানেজারকে বেয়ারা গিয়ে ডেকে নিয়ে এল। ম্যানেজারসাহেব সব শুনে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? আপনার কাছে এখন টাকা না থাকতে পারে, পরে এসে কোনওসময় বকেয়াটা মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।'

এ রকম সুপ্রস্তাবে বর্তমান ভদ্রলোক খুবই খুশি হলেন। তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন, ম্যানেজারসাহেব বললেন, 'আপনার নামটা বলে যান।'

ভদ্রলোক নিজের নাম বলে তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' ম্যানেজারসাহেব বললেন, 'আমাদের বারের দেয়ালের একপাশে আপনার নামটা লিখে রাখব।'

ভদ্রলোক ছদ্ম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, 'সে কী কথা? তা হলে যে সবাই আমার নামটা দেখে ফেলবে।' বলা বাহুল্য, দেয়ালে নাম লিখে রাখলে তাঁর যে কিছু আসে যায় না, সেটা ইনি ভালভাবেই জানেন, এখন একবার এ জায়গা থেকে বেরতে পারলে বাঁচেন, নেশাটা মাটি হতে চলেছে।

ম্যানেজারসাহেব এবার আশ্বাস দিলেন, 'এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনার নাম স্যার কেউ দেখতে পাবে না। যেখানে নাম লেখা হবে তার ওপরে একটা পেরেক লাগিয়ে আপনার জামাটা খুলে সেই পেরেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছি। নামটা ঢাকা পড়ে যাবে।'

এই বলে দেয়ালে নাম লিখতে লিখতে ম্যানেজারসাহেব বেয়ারাকে কড়া গলায় আদেশ দিলেন, 'এই উল্লু, দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? স্যারের গায়ের জামাটা তাড়াতাড়ি খুলে নে।'

অতঃপর দ্বিতীয় পরিণতিটি।

ওই একই ঘটনা। ওই একই বার, একই ভদ্রলোক। সেই বেয়ারা, সেই ম্যানেজার।

বিলের টাকা মেটাতে না পারায় ভদ্রলোককে খুব মারধর খেতে হল ম্যানেজারের হাতে।

চুলের মুঠি ধরে দুই গালে দুটি থাপ্পড় কষিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে ভদ্রলোককে ম্যানেজারসাহেব বার থেকে বিতাড়িত করলেন।

গলাধাক্কা খেয়ে বারের দরজা থেকে সামনের রাস্তায় ফুটপাতে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে ভদ্রলোক যখন ওঠার চেষ্টা করছেন, সেই সময় বেয়ারাটা এসে তাঁকে এক লাথি মারল।

ব্যথিত ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন, 'ম্যানেজারই যথেষ্ট মারল, তুমি কেন?'

বেয়ারা বলল, 'ম্যানেজার মারলেন বিলের জন্য, আর এই লাথিটা আমার বকশিশের জন্যে।'

বিপদ

গুরুতর বিপদে পড়েছিলাম এই পুজোর মধ্যে মহাসপ্তমীর দিন।

ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় পার্ক সার্কাসের মোড়ের কাছে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ে ডা. মুরলী বিশ্বাসের বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল।

মুরলীবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি, বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সুরসিক, সদাশয় ভদ্রলোক। তিনি মাঝেমধ্যেই এ রকম নিমন্ত্রণ করে থাকেন।

মহাসপ্তমীর দিন ডা. বিশ্বাসের গৃহে কস্তুরীরও নিমন্ত্রণ ছিল। কস্তুরী আমাদের পুরনো বন্ধু, তার গাড়ি আছে। সে নিজে থেকেই ফোন করে জানাল সে আমাদের সঙ্গে যাবে। কস্তুরীর গাড়ি আছে। সে গাড়ি করে আমাদের বাসায় আসবে, তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। আমরা মানে, আমি ও আমার স্ত্রী মিনতি এবং কস্তুরী।

কস্তুরী গাড়ি নিয়ে আসবে জেনে আমরা স্বামী-স্ত্রী খুব আশ্বস্ত হলাম, কারণ এই পুজোর বাজারে ট্যাক্সি পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার, তা ছাড়া ফেরার ব্যাপারটাও নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

যথা সময়ে কস্তুরী এল। কস্তুরী একটা পুরনো গাড়ি কিনে ভাল করে সারিয়ে রঙ করে নিয়েছে। দেখলাম গাড়িটা বেশ ঝকঝকে, নতুনের মতোই মনে হয়।

আমরা সবাই মিলে গাড়িতে উঠলাম। পিছনের সিটে কস্তুরী ও মিনতি, সামনের সিটে আমাদের পূর্বপরিচিত ড্রাইভার শিবুর বাঁপাশে আমি। গাড়িটা চলতে শুরু করলে দেখলাম গাড়িটার মতিগতিও ভাল, বেশ স্বচ্ছন্দে যাচ্ছে, বিশেষ ঝাঁকি-টাকি লাগছে না।

আমরা ডা. বিশ্বাসের বাড়ির সামনে এসে গেলাম। মহাপুজোর প্রথম সন্ধ্যা, অদূরেই পার্ক সার্কাসের বিখ্যাত পুজোমণ্ডপ। রাস্তাঘাট আলোয় আলোময়, লোকে লোকারণ্য।

মিনতি ও কস্তুরী গাড়ি থেকে নেমে গেল। কিন্তু আমি আর নামতে পারি না। আমার বাঁ হাতি দরজাটা কিছুতেই খুলল না অনেক টানাটানি, হেঁচকা-হেঁচকি, ধাক্কা-ধাক্কি করলাম, কিন্তু গাড়ির দরজা এক সেন্টিমিটারও খুলল না।

আমার বন্দিদশা এবং দরজা খুলতে অক্ষমতা দেখে ডানদিকে ড্রাইভারের সিট থেকে শিবু বলল, 'ও কিছু নয়। আমি দেখছি।' এই বলে শিবু ড্রাইভারের সিট থেকে দ্রুত নেমে গাড়ির সামনের দিক দিয়ে ঘুরে বাঁদিকে আমার দরজার পাশে এসে হাতল টিপতে লাগল। কিন্তু তাতেও দরজা খুলল না।

ইতিমধ্যে পুজোর দিনের রাস্তায় লোকজনের মধ্যে থেকে একটি ছোটখাটো কৌতূহলী জনতা তৈরি হয়েছে গাড়িটিকে ঘিরে। তারা আমার কার্যকলাপ লক্ষ করছে এবং পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে।

মিনিট পাঁচেক ধরে শিবু বহু মেহনতি করল। ধাক্কাধাক্কি, এমনকী দরজায় লাথি পর্যন্ত মারল, কিন্তু আলিবাবার গুহার দরজার মতো কপাট বন্ধ রইল।

অবশেষে শিবু ঘোষণা করল, 'গাড়ির দরজা লক হয়ে গেছে।' পথচারীদের মধ্যে একজন দয়াল ব্যক্তি তাঁর পকেট থেকে এক তোড়া চাবি এগিয়ে দিলেন। শিবু একটার পর একটা চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল, দরজা তো খুললই না, মাঝখান থেকে একটা চাবি বেঁকে গিয়ে

দরজার লকের সঙ্গে পুরো চাবির তোড়াটা আটকিয়ে গেল। যার চাবি সে হায় হায় করতে লাগল।

অবশেষে উপস্থিত জনতা একটা সহজ সিদ্ধান্তে এল। বাঁদিক দিয়েই গাড়ি থেকে নামতে হবে এমন কোনও কথা নেই, ডান পাশে ড্রাইভারের দিক দিয়েও তো নামা যায়।

আমি এতক্ষণ এই আশঙ্কাই করছিলাম। স্টিয়ারিং এবং সিটের মধ্যে যে ফাঁকটুকু আছে, যার মধ্যে গাড়ির ড্রাইভার দেহ গলিয়ে দেয়, সেখান দিয়ে আমার মতো ভুঁড়িওয়ালা লোকের বেরনো সম্ভব নয়।

তথাপি সমবেত জনতার সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি প্রাণপণে দম বন্ধ করে ভুঁড়ি চেপে স্টিয়ারিংয়ের নীচ দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হলাম।

কিন্তু চেষ্টাটাই সার। ঠিক মাঝপথে ভুঁড়ি আটকিয়ে গেল।

শক্ত, মেদবহুল অনেকদিনের লালিত আমার মধ্যদেশ হাজার চাপেও বিন্দুমাত্র সংকুচিত হল না, বরং স্টিয়ারিংটা আমার ভুঁড়ির ওপর চেপে বসে গেল, জাঁতাকলে বন্দি হওয়া ইঁদুরের মতো আমি আটকে গেলাম, ইঁদুরের মতোই ক্ষীণকণ্ঠে চিঁচিঁ করতে লাগলাম।

আমার মারাত্মক অবস্থা দেখে ভিড়ের মধ্যে থেকে জনা দুই বলবান ব্যক্তি এগিয়ে এলেন, তাঁদের মুখেচোখে পরোপকারের বাসনা ফুটে উঠেছে। আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলাম, 'দয়া করে, টানা-হ্যাঁচড়া করবেন না। আমি বেশ আছি।'

আমার কথা শুনে জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'বেশ আছেন কী মশায়? দেখছেন না আটকে গেছেন। আপনাকে টেনে বার না করলে বেরবেন কী করে?' আমি বললাম, 'কয়েকঘণ্টা এ রকম থাকলে ক্ষিদেয় পেট একটু চুপসোবে, এখন না পারি, তখন পারব।' কিন্তু আমার অনুরোধ বিফলে গেল। দু'জন পালোয়ান আমার কাঁধ ও কোমর ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সত্যিই আমাকে ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার করল।

আমার পুজোর নতুন পাঞ্জাবিটা ফেঁসে গেল। ভুঁড়িটায় একটা টনটনে ব্যথা হল, সেই সঙ্গে একটা মোটা কালো দাগ।

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস হয়েছে। ব্যথাটা এখন নেই, কিন্তু দাগটা রয়ে গেছে। বোধহয় সারা জীবন থাকবে।

সিনেমা হল

ঝুপড়ির ভিডিও হলে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরতলিতে আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ভিডিও-পারলার নামের নরককুণ্ডগুলি।

শহরের সিনেমা হলগুলির অবস্থাও অতিশয় শোচনীয়। হতগৌরব, জরাজীর্ণ, রক্ষণাবেক্ষণহীন পোড়োবাড়ির মতো এক‌েকটা হল। দমবন্ধ, অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পাখা ঘোরে না, ঠান্ডা মেশিন চলে না, ছেঁড়া গদি, ভাঙা চেয়ার, হলের মধ্যে দুঃসাহসী ইঁদুর ও আরশোলাদের রাজত্ব। কাউন্টারে টিকিট নেই, টিকিট দালালের হাতে কালোবাজারি দরে বিক্রি হয়।

অথচ এই তো সেদিনের কথা, সিনেমা হলগুলি ছিল সাধারণ মধ্যবিত্তের বিলাসের জায়গা। নরম গদি, রঙিন আলো, সুগন্ধ উর্দি-পরা সুসজ্জিত দ্বাররক্ষী। পুরনো দিনের মেট্রো বা এলিটে, বীণা বা ভারতীতে সিনেমা ভাল হোক বা খারাপ হোক, সিনেমা দেখার আনন্দই ছিল আলাদা।

এমনকী ছোট ছোট শহরে, সেই আশ্চর্য, স্মৃতিবিধুর নামের সেই প্রেক্ষাগৃহগুলি—ছায়াবাণী, অলকা, চম্পা, নীলা, বাণীচিত্র—তাদের চেহারাই ছিল আলাদা। একেকটা নতুন বই আসত, পুরো শহর উত্তাল হয়ে উঠত। লাল-নীল কাগজে ছাপা হ্যান্ডবিল ঘোড়ার গাড়িতে করে বিলি করা হত পাড়ায় পাড়ায়।

এখন আর সেদিন নেই। সিনেমা হল আর মানুষকে টানে না। কখনও-সখনও দুয়েকটা মারকাটারি বই এল তো ভিড়, হুড়োহুড়ি, আর সেই ভিড়ও ভদ্রজনতা নয়। বাকি সময় টিমটিম করে কোনওরকমে টিকে আছে পুরনো হলগুলি। নতুন হল তো চোখেই পড়ে না।

সেদিন এক ভদ্রলোক রসিকতা করে বললেন, কোন একটা হলে একটা পুরনো দিনের নামকরা বই এসেছে শুনে দেখতে গিয়েছিলেন। হলে লোকজন মোটেই নেই। পুরো ফাঁকা হল। বইও সময়মতো আরম্ভ হচ্ছে না। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে হলের অফিসঘরে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, সিনেমাটা কখন আরম্ভ করবেন?' ম্যানেজারবাবু করুণ হেসে বললেন, 'দেখছেন তো অবস্থা। তা যখন বলবেন তখনই আরম্ভ করব।'

একালের সিনেমা হলের কথা বলে মন খারাপ করে লাভ নেই, পুরনো দিনের গল্পে যাই।

দুই অল্পবয়সি ভাই-বোন সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল। হলের সামনে দেখা গেল, ভাইয়ের চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা, কানামাছি খেলায় যেমন হয়। সিনেমা হলের গেটকিপার জিজ্ঞাসা করল, 'এ ছেলেটির চোখ বাঁধা কেন, ও সিনেমা দেখবে না?'

বোন হেসে বলল, 'না, তা নয়। হলের মধ্যে গিয়ে ওর চোখের রুমাল খুলে দেব।' গেটকিপার অবাক হয়ে বলল, 'কেন?' বোন বুঝিয়ে বলল, 'বাইরের রোদ্দুর থেকে হলে ঢুকলে অন্ধকার নামে। সিটে যেতে গিয়ে হোঁচট খাই সেই জন্যে ভাইয়ের চোখ বেঁধে এনেছি, হলে ঢুকে চোখ খুলে দিলেই ও পরিষ্কার দেখতে পাবে। তখন আর অসুবিধে হবে না।'

অনেক দিন আগে বিলিতি জোক বুকে একটা কুকুরের গল্প পড়েছিলাম। কুকুরটা টিকিট কেটে একটা সিনেমা হলে ছবি দেখতে গিয়েছিল। ছবিটা একটা বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ।

ইন্টারভ্যালের সময় একজন কৌতূহলী দর্শক কুকুরটিকে বলল, 'কোনও কুকুরকে আমি কোনও দিন কোনও সিনেমা দেখতে আসতে দেখিনি।' কুকুরটি জবাবে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও সিনেমা দেখি না। তবে এই বইটা যখন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল, আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই ভাবলাম, যাই দেখে আসি সিনেমাটা কেমন হয়েছে!'

আরেকটা গল্প মনে পড়ছে।

অত্যন্ত স্থূলদেহী এক ভদ্রলোক দুটো টিকিট কেটে হলে ঢুকলেন। গেটকিপার টিকিট দুটো ছিঁড়ে কাউন্টারফয়েল ফেরত দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'আরেকজন কোথায়?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ভাই, আমার নিজের জন্যই দুটো টিকিট কিনেছি। মোটা মানুষ তো, নিজের জন্যেই দুটো নিয়েছি, একটায় যে কুলোয় না।' গেটকিপার বলল, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু একটা টিকিটের নম্বর এম ২৩ আর অন্য টিকিটের নম্বর আই ১৪ এই দুটো সিটে আপনি একসঙ্গে কী করে বসবেন?'

অবশেষে একটা অবাস্তব গল্প দিয়ে এই প্রেক্ষাগৃহ-পরিক্রমা সাঙ্গ করি।

অন্ধকার হলে শো চলছে। এমন সময় দেখা গেল, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সিটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে কী যেন খুঁজছেন। যে দর্শকের পায়ের তলায় বৃদ্ধ খোঁজাখুঁজি করছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কী করছেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'একটা জিনিস খুঁজছি।'

দর্শকটি জানতে চাইলেন, 'কী জিনিস?'

বৃদ্ধ বললেন, 'চুইংগাম।' দর্শকটি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সামান্য চুইংগামের জন্যে অন্ধকার মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সামান্য নয়। ওই চুইংগামের সঙ্গে আমার বাঁধানো দাঁতজোড়া আটকিয়ে আছে।'

বাসাবাড়ি

বাসা এবং বাড়ি এই শব্দ দুটির মানে, সরলভাবে বলা যায় প্রায় একই। কিন্তু শব্দ দুটির ব্যবহারিক প্রয়োগজনিত অর্থ যথেষ্ট আলাদা।

বাসা শব্দটির মধ্যে একটা সাময়িক, ক্ষণিক ব্যাপার আছে, কিন্তু বাড়ি একটা ধারাবাহিক ব্যাপার। বহু ক্ষেত্রেই বাড়ি বলতে মাতৃভূমি বা জন্মস্থান বোঝায়। যেমন আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে কিংবা ময়মনসিংহ জেলায় অথবা এলাসিন গ্রামে। বাসা শব্দের ব্যবহার অন্যরকম, কলকাতার বাসায় এখন অনেক লোক, এখানকার বাসা এবার উঠল। আবার কখনও চোরের বাসা, বাঘের বাসা। এ রকম ক্ষেত্রে চোরের বাড়ি বা বাঘের বাড়ি বললে কোনও অর্থ হবে না।

আমাদের কবির মনে একটা এতটুকু বাসার স্বপ্ন ছিল, রহিব আপনমনে ধরণীর এক কোণে, ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা। একা কবি নন সব মানুষই স্বপ্ন দেখে একটা স্বপ্ননীড়ের, সারা জীবন মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়ায়। এই বাসা খোঁজার ব্যাপারে অতি সাম্প্রতিক একটা গল্প বলি। বলা বাহুল্য, গল্পটা মোটেই আমার নিজের নয় কিন্তু সে জন্যে বলতে বাধা কোথায়?

বেশি গৌরচন্দ্রিকা করার অবকাশ নেই। মজার গল্পটা সরাসরি বলি।

অজিত ফুকন বলে একটি গুয়াহাটির ঝলমলে তরুণ একটি সর্বভারতীয় ব্যাঙ্কে স্টাফ অফিসার। সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু কিছুদিন আগে তিনি একটি বিয়ে করেছেন, উমা নামে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে। দুঃখের কথা মধুযামিনী শেষ হতে না হতে বদলির নির্দেশ পেয়ে তাঁকে গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। অজিত আপাতত টালিগঞ্জের দিকে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে বাইরের ঘরে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকছেন, সেই সঙ্গে অফিসে যাচ্ছেন আর অবসর মতো প্রাণপণে ফ্ল্যাট খুঁজছেন। একটা ফ্ল্যাট না পেলে উমাকে নিয়ে আসা যাচ্ছে না। কত দালাল, বিজ্ঞাপন, কতরকম চেষ্টা করছেন অজিত, কিন্তু কোথাও একটা ভদ্রমতো বাসস্থান, ছোট একটা এক বা দু' ঘরের ফ্ল্যাট জোগাড় করতে পারছেন না।

এরই মধ্যে একদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে উমাকে একটা সুদীর্ঘ প্রণয়পত্র লিখে অজিত সেই চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে রবীন্দ্র সরোবরে লেকের পাশে একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে বিরহ বিলাসে বিজড়িত হলেন।

একটু পরেই তাঁর ঝিমুনি এল, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে অজিতবাবু দেখলেন, চারদিক শুনশান, কোথাও কেউ নেই। ঘুম ঘোরে হাতঘড়ি দেখে তিনি দেখলেন ঘড়িতে রাত দুটো বাজে।

তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলেন অজিত, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল রবীন্দ্র সরোবরের সীমাবদ্ধ পুষ্করিণী সমুদ্রের মতো ফুঁসছে। বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়িয়ে পড়ছে রবীন্দ্র সরোবেরের তটে।

ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও কোনও গোলমাল আছে অনুমান করে অজিতবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখলেন একটা বেশ মোটা কাচের রঙিন বোতল ঢেউয়ের ধাক্কায় পারে উঠে এসেছে। বোতলটার গড়ন একটু অন্য রকমের, সচরাচর এমন দেখা যায় না। কৌতূহলবশত অজিতবাবু বোতলটি কুড়িয়ে নিলেন।

বোতলটির মুখে একটি সুদৃশ্য কাচের ছিপি, বোতলের মধ্যেও যেন কী একটা আছে, নড়াচড়া করছে মনে হল। কী ভেবে অজিতবাবু ছিপিটা খুলে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বোতলের গলা দিয়ে ধোঁয়া বেরতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটা দৈত্যে রূপান্তরিত হল। যাকে বলে একেবারে খাঁটি আরব উপন্যাসের জিন। এবং এর পরে হুবহু সেই একই প্রাচীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। দৈত্যটি আভূমি কুর্নিশ করে অজিতবাবুকে বলল, 'হুজুর, হুকুম করুন, আপনার কী চাই। যা চাই আজ্ঞা করুন, এখনই এনে দিচ্ছি।'

ঘটনার আকস্মিকতায় অজিতবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এই আধুনিক যুগে খাস কলকাতার বুকে এ রকম একটা ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে এ তো সুদূর কল্পনাতেও আসে না। ধাতস্থ হতে কিঞ্চিৎ সময় লাগল, তারপর তিনি মনে মনে ভাবলেন, দেখাই যাক না, দৈত্যটার কতখানি ক্ষমতা। আমার যা দরকার, যা হন্যে হয়ে রাতদিন খুঁজছি, একটা ছোট বাসা, ফ্ল্যাট বাড়ি দৈত্যটার কাছে চাই।

এইরকম ভেবে অজিতবাবু দৈত্যটাকে বললেন, 'দ্যাখো আমি নতুন বিয়ে করেছি। থাকার জায়গা নেই বলে বউকে নিজের কাছে আনতে পারছি না। তুমি একটা ছোট ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পার কলকাতার মধ্যে কোথাও।'

অজিতবাবুর প্রার্থনা শুনে সেই বিশালকায় দৈত্য কেমন যেন কুঁকড়িয়ে গেল, হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর মাফ করবেন। ওই একটা জিনিসই পারব না। ফ্ল্যাট জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর ভেবে দেখুন হুজুর, আমি যদি ফ্ল্যাটই জোগাড় করতে পারতাম তাহলে কি আমি নিজে এত বড় শরীর নিয়ে এত কষ্ট করে একটা বোতলের মধ্যে থাকতাম।'

পুনশ্চ: একটি কথোপকথন:—

বাড়িওয়ালা—ঘনশ্যামবাবু, আজ দেড় বছর আপনি বাড়িভাড়া দেননি। আর নয়, আপনি আমার ঘর ছেড়ে দিন।

ঘনশ্যামবাবু—বলছেন কী মশায়? আপনার ভাড়া না মিটিয়ে বাড়ি ছেড়ে দেব? জোচ্চোর পেয়েছেন?

বাড়ির কথা কখনওই সহজে শেষ হবার নয়। বিশেষ করে আগের বাসাবাড়িতে একটা আরব্য উপন্যাসের জিন মাথা গলিয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলোকে হটিয়ে দিয়েছিল। ভাল ভাল কয়েকটা গল্প লেখাই হয়নি, স্বল্প পরিসরে বাদ পড়ে গেছে।

যেমন, এই গল্পটা। এক ভদ্রলোক দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। ভ্রমণকালে তিনি এক প্রাচীন, পরিত্যক্ত, জীর্ণ প্রাসাদ দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গে গাইড রয়েছে, সে প্রাসাদ দেখিয়ে বুঝিয়ে বলছে, 'এই যে প্রাসাদ দেখছেন স্যার, সাতমহলা প্রাসাদ ছিল এটা। পাঁচশো বছর ধরে এইরকম দাঁড়িয়ে আছে। খানখানান্ আহাম্মক জং এই প্রাসাদ বানিয়ে ছিলেন। তারপর এই পাঁচশো বছরে একটু মেরামত করা হয়নি। একটু রঙ করা হয়নি, একটা পাথর বদলানো হয়নি। কোনও কিছু টাচ করা হয়নি।'

ভদ্রলোক এতক্ষণ নিবিষ্টমনে ভগ্ন-প্রাসাদটি নিরীক্ষণ করছিলেন, অতঃপর মন্তব্য করলেন,

'বুঝলেন গাইড-সাহেব আমাদের বাড়িওয়ালাও ঠিক এইরকম। কিছু সারায় না, মেরামত করে না, রঙ করে না। একই বাড়িওয়ালা নাকি কে জানে?'

আমরা অনেকেই ভুক্তভোগী। এ-জাতীয় বাড়িওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের অনেকেরই আছে। তিক্ত অভিজ্ঞতাও কিছু কম নেই।

সেই যে এক বাড়িওয়ালা বলেছিলেন, 'বাড়িতে জলের প্রচুর ব্যবস্থা আছে।'

বাড়িতে উঠে যাওয়ার কয়েকদিন পরে একদিন মাঝারি বৃষ্টিতে শোওয়ার ঘরের, বসার ঘরের, রান্নাঘরের ছাদ দিয়ে প্রথমে ঝরঝর করে, তারপর হুড়হুড় করে বৃষ্টির জল পড়তে লাগল। এরপর বাড়িওয়ালার কাছে এ ব্যাপারে নালিশ জানাতে তিনি নাকি ফেঁপে-হাসি হেসে বলেছিলেন, 'বলেছিলাম না, জলের প্রচুর ব্যবস্থা।' এ ব্যাপারে আরও একটা পুরনো গল্প আছে, সেটা আরও নিষ্ঠুর। এইরকমই এক ভাড়াটে বাড়িতে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির সময় অঝোরে জল পড়ত। ভাড়াটে ভদ্রলোক বাড়ির মালিককে সেকথা জানাতে তিনি বলেছিলেন, তিনশো টাকা ভাড়ায় ছাদ দিয়ে জল পড়বে না তো লেমনেড পড়বে!'

বাড়িওয়ালাদের নিন্দেমন্দ বেশি করা উচিত হবে না। তার আগে এক সরল বাড়িওয়ালার কথা বলি।

আর্ট কলেজের পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা মাঝেমধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, যে-কোনও একটা বিষয় বেছে নিয়ে ছবি আঁকে, স্কেচ করে। এইরকম একদল ছেলেমেয়ে একটা রাস্তার মোড়ে একটা পুরনো দিনের থাম-লাগানো, বারান্দা-ঘেরা বাড়ির ছবি আঁকছিল। সকাল থেকে আঁকার পর্ব চলছে। বাড়ির বারান্দায় বসে বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা দেখলেন সারাদিন ধরে। দিনের শেষে যখন ছেলেমেয়েরা ক্যানভাস গুটিয়ে তুলি মুছে বাড়ির দিকে রওনা হবে, বুড়ো এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বাড়ির ছবি দিয়ে কী করবে বাবা তোমরা?' ছেলেমেয়েরা জানাল, 'আমাদের মধ্যে যার যার ছবি ভাল হবে সেগুলো আমাদের বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। কত লোক দেখবে আপনার বাড়ির ছবি।'

একথা শুনে বৃদ্ধ বললেন, 'এ তো ভাল কথা। খুব ভাল কথা। কিন্তু বাবারা, তোমরা যদি আমার বাড়িটার ছবির গায়ে লিখে দাও যে, 'ভাড়া দেওয়া হইবে', তা হলে আরও ভাল হয়।'

কথায় কথায় ভাড়াবাড়ির প্রসঙ্গেই যখন রয়ে গেলাম, যে কয়েকটি প্রচলিত গল্প এ সম্পর্কে রয়েছে তার দু'-একটি মনে করা যাক।

নতুন বাড়ি ভাড়া করেছেন এক দম্পতি। বাড়িটি শহরতলিতে, ছিমছাম, চমৎকার। তবে, একটি দোষ রয়েছে, বাড়ির পাশেই রেললাইন, সেই লাইনে সারারাত ধরে ট্রেন আসে যায়।

বাড়ি দেখে ফেরার পথে স্বামী-স্ত্রী আলোচনা করছিলেন, যেমন হয় আর কী, বাড়িটার সুবিধে-অসুবিধের কথা। অনেক কথার পর স্বামী স্ত্রীকে বললেন, 'দ্যাখো, সবই ভাল। আলো-হাওয়া, বাথরুম, রান্নাঘর বেশ চমৎকার। কিন্তু ওই একটাই অসুবিধে। সারারাত বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রেন যাবে আসবে। প্রথম দু'-চারদিন রাতে ভাল করে ঘুম হবে না।'

স্ত্রী বেচারিনীর কিন্তু বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি স্বামীর কথা শুনে বললেন, 'তার জন্য কী হয়েছে? প্রথম দু'-চারদিন না হয় হোটেলে থাকব।' স্বামী ভদ্রলোক এ রকম প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত বোধ করায় স্ত্রী বললেন, 'ইচ্ছে করলে আমরা দু'জনায় কিন্তু বড়দির বাড়িতেও থাকতে পারি, প্রথম দু'-চারদিন।'

আমার জানা নেই, এই দু'-চারদিনের সমস্যা এত সহজে স্বামী ভদ্রলোক সমাধান করেছিলেন কি না।

পরের গল্পটির প্রেক্ষাপট একইরকম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আলাদা আলাদাভাবে বাড়ি দেখেছেন। অবশ্য একই বাড়ি। স্ত্রী আগে দেখে গেছেন, বিকেলে স্বামী দেখতে এসেছেন।

এর পরের ঘটনা কথাবার্তার মাধ্যমে বোঝানো সহজ। সুতরাং কথাবার্তাই হোক:

ভাবী ভাড়াটে: ফ্ল্যাটটা আমার বেশ লাগছে। সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে আসতে চাই।

ভাবী বাড়িওয়ালা: আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আজ দুপুরে দেখা হয়েছে?

ভাবী ভাড়াটে: কেন?

ভাবী বাড়িওয়ালা: আপনার স্ত্রী আজ দুপুরে বাড়ি দেখতে এসেছিলেন। তাঁর একদম ভাল লাগেনি। আমার বাড়ির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে তিনি বড় যাচ্ছেতাই করলেন।

ভাবী ভাড়াটে: তাতে কী হয়েছে? আজ পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছেন। তবুও তো আমাকে ত্যাগ করেননি। আপনি ভাববেন না। আমরা আপনার বাড়িতে আসছি।

তবুও মাতাল

পাঠক-পাঠিকা আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আমার মদের নেশা ধরে গেছে। শুকনো রুলটানা কাগজে নীরস ডটপেনে মাত্র দু'-দশ অনুচ্ছেদ লিখে যদি এত নেশায় চুরচুর হয়ে যাই, তাহলে যাঁরা প্রকৃত নেশারস পিপাসু, তাঁদের গতি কী হবে।

আপাতত দুটো চরম দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। গভীর রাতে নেশা সাঙ্গ করে বাসে উঠেছেন এক মদ্যপ ভদ্রলোক। ফাঁকা বাস। উঠে একটা সিটে বসে পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আমি কি বাসে উঠেছি?' মাতালের সঙ্গে কেউ কথা বাড়াতে চায় না, সহযাত্রীটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'হুঁ।' তখন মদ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আপনি কি আমাকে চেনেন?' সহযাত্রী আবার সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'না।' এবার মাতাল ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'যদি আপনি আমাকে নাই চেনেন, তাহলে কী করে বুঝলেন যে, আমিই বাসে উঠেছি?'

এ প্রশ্নের অবশ্য কোনও জবাব হয় না। কিন্তু মাতালদের আত্মপ্রবঞ্চনার শেষ নেই। এক পানশালায় এক ভদ্রলোক প্রতিবারে দু'-গেলাস করে পানীয় নিতেন। কৌতূহলী কেউ যদি জানতে চাইত, 'এক সঙ্গে দু'-গেলাস কেন?' ভদ্রলোক বলতেন, 'এক গেলাস আমার নিজের জন্যে, আর, আরেক গেলাস আমার বন্ধুর জন্যে।' এর পরে যদি প্রশ্ন করা হত, 'কিন্তু আপনাকে যে একা দেখছি আপনার বন্ধুকে তো দেখতে পাচ্ছি না।' ভদ্রলোক জবাব দিতেন, 'দেখবেন কী করে? সে তো বেঁচে নেই।' এর পর আর কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না, তবুও যদি প্রশ্নকারী বলতেন, 'তা হলে?' ভদ্রলোক উত্তর দিতেন, 'এক গেলাস আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, আর অন্য গেলাস আমার বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্যে।'

এ রকম বেশ কিছুদিন চলেছিল। তারপরে একদিন দেখা গেল উক্ত ভদ্রলোক অন্য দশজনের মতোই এক গেলাস করে পানীয় নিচ্ছেন, আগের মতো দু'-গেলাস নয়। এবার সেই পুরনো প্রশ্নকারী স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল দু'-গেলাস থেকে এক গেলাসে নেমে এলেন কেন?' ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে জানালেন, 'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, ডাক্তার আমার মদ খাওয়া বারণ করে দিয়েছেন। আমি আর মদ খাচ্ছি না, শুধু বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য তার গেলাসটা খাচ্ছি।

নেশাতুর ব্যক্তিরা যে কতরকম ভুল করে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। সেই ঘটনার কথা আমি আপনাদের আগে বলেছি। নেশায় চুরচুর এক মদ্যপ ভদ্রলোক মধ্যরাত অতিক্রম করে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছেন। এর পর পকেট থেকে একটা চাবি বার করে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে সেটা লাগাতে গেলেন। উলটো দিকের ফুটপাতে থানার পুরনো জমাদারসাহেব ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। এই নিরীহ মাতালকে তিনি বহুকাল চেনেন, কিন্তু আজ চাবি দিয়ে ল্যাম্পপোস্ট খোলার চেষ্টা করতে দেখে তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী? করছেন কী?' মাতাল ভদ্রলোক অমায়িক হাসি হেসে বললেন, 'দেখছেন না জমাদারসাহেব, নিজের বাড়িতে তালা খুলে ঢোকার চেষ্টা করছি। শালা, এই চাবিটা কিছুতে লাগছে না।' জমাদার সাহেব নিজেও সন্ধ্যার দিকে কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা সেবন করেছিলেন। তিনি রঙিন চোখে ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই আপনার বাড়ি!' মত্ত ভদ্রলোক রীতিমতো আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার নয় কি আপনার বাড়ি নাকি?' তারপরে ল্যাম্পপোস্টের চূড়ায় যেখানে লাইট জ্বলছে, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না, দোতলায় আলো জ্বলছে। আমার বউ আমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছে ওখানে।'

এ রকম একটা করুণ গল্পের পরে একটা মধুর গল্প অনায়াসেই বলা যায় প্রেক্ষাপট ওই একই। মধ্যরাত অতিক্রান্ত করে বাড়ি ফিরেছেন মত্ত ভদ্রলোক। শোয়ার ঘরে ঢুকে বিছানায় উঠতে গিয়ে ভদ্রলোক থমকিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'এই যে আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিতবসনা সুন্দরী মহিলা, এত রাতে আমার বিছানায় শুয়ে আপনি কী করছেন বলতে পারেন।'

সদ্য নিদ্রোত্থিতা যুবতী রমণী আলগোছে পাশ ফিরে মুখোমুখি হয়ে ঢুলঢুল নয়নে বললেন, 'দেখুন এই বিছানাটা খুব নরম, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, টেবিলের ফুলদানি থেকে কী মধুর সৌরভ আসছে রজনীগন্ধার, এই রজনীগন্ধাগুলি আমিই রেখেছি, তা ছাড়া এই ঘরটাও আমার খুব ভাল লাগে, অবশ্য ভাল না লাগার কথা নয়, এই ঘরটা আমিই সাজিয়েছি। সামনের জানলার ওই দিকে নীল রঙের ফরফরে পর্দা আমিই কিনে এনেছি।' মাতাল ভদ্রলোক এত কথা শোনার লোক নন, শোনার মতো অবস্থাও নয়। তিনি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা এত সব আপনি করতে গেলেন কেন?'

নয়ন ধনুকে শর সংযোজন করে যুবতী রমণী আধো-আধো গলায় বললেন, 'কেন করলাম? এমনিই করলাম। আর তা ছাড়া কী বলব, জানেন কি আমি আপনারই বিবাহিত স্ত্রী?'

পুনশ্চ:

এবার আমরা শেষবার বারে যেতে পারি। না, আমরা কোনও টেবিলে বসব না। বরং একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু কী আলোচনা করছে মন দিয়ে শুনি। আমরা মোক্ষম মুহূর্তে এসে গেছি। এখনই আসল আলোচনাটা হচ্ছে। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে মণিলাল, বেশি মদ খেলে তোর শরীরটা কি জ্বলে?' মণিলাল বললেন, 'আমি মদ খেয়ে কখনও এমন বেহুঁশ হই না যে, শরীরে আগুন লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখব যে, শরীরটা জ্বলে কি না।'

মাতালের হাত থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। একবার মাতালের পাল্লায় পড়লে তাকে দ্রুত এড়ানো যে কত কঠিন ভুক্তভোগী মাত্রেই সেটা সম্যক জানেন। সুতরাং আমারও পরিত্রাণ নেই, আরেকবার মাতালের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা তাজ বেঙ্গলের লাউঞ্জে একজনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সহসা আশপাশের কোনও একটা বার থেকে এক বিখ্যাত মদ্যপ টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। সুখের বিষয় তিনি আমাকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু সামনেই পেলেন এক ইউনিফর্ম পরিহিত

বায়ুসেনার অফিসারকে, যাঁকে তিনি হোটেলের উর্দিপরা দারোয়ান বলে ভ্রম করলেন এবং সেই ভ্রমবশত আদেশ করলেন, 'ওহে, যাও তো তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো তো।'

এবার আকাশপথের থেকে জলপথে যাই। ভবনাথবাবু আউটরাম ঘাটের দক্ষিণে গঙ্গার ধারে একটা চুল্লুর ঠেকে তরল অগ্নি পান করছিলেন সন্ধ্যা থেকে। নদীর ঘাটে ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে, নদীর জলে পূর্ণ শশীর ছায়া, আবেগে চোখ বুজে ঘাটের ধারের রেলিংয়ে গা এলিয়ে দিলেন ভবনাথবাবু এবং সঙ্গে সঙ্গে নিচু রেলিং টপকিয়ে ঝপাৎ গঙ্গাজলে। ভাগ্যিস বর্ষার নদী, জল ঘাটের গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে তাই বেশিদূর পড়তে হয়নি। তা ছাড়া ভবনাথবাবু সাঁতার জানেন।

কিন্তু প্রথম ধাক্কায় জলে পড়ে যথেষ্টই হাবুডুবু খেলেন ভবনাথবাবু। তারপর বহু কষ্টে সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত শরীরে তদুপরি জলপূর্ণ উদর নিয়ে পাড়ে উঠে ভবনাথবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল সেই চুল্লুর ঠেকের মালিকের বিরুদ্ধে, তিনি ঘাটের ধাপ ধরে ধরে উঠে গেলেন সেই চুল্লুর দোকানে এবং গিয়ে সরাসরি চার্জ করলেন, 'এত ভাল চুল্লুতে এতটা জল মিশিয়ে দিলে। চুল্লু মামা, তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই।'

মাতালের একটা বড় কাজ হল পড়ে যাওয়া। সে টলতে টলতে রাস্তায় পড়ে যায়, ঘরে বারান্দায়, পথে-ঘাটে সে কেবলই পড়ে যায়, কখনও বা দলবদ্ধভাবে পড়ে গড়াগড়ি খায়, গায়ে ধুলো-কাদা মাখে। হুঁশ ফিরতে ওইভাবেই বাড়ি ফেরে, ওটাই তার ট্রেড মার্ক। একদা এক মদ্যপ ব্যক্তি নেশা করে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন, 'কেমন হল কবিতা লেখা?' একথা তার কাছে জানতে চাওয়ায়, সে বলল, 'মদ খেয়ে এত মাথা টলছিল, পারলাম না, দু'-চরণ না যেতে যেতেই একেবারে পপাত।'

তবে মাতালের খুব প্রিয় জায়গা হল রাস্তার ধারের ড্রেন, সেখানে পড়ে থাকতে সে খুব ভালবাসে। এ বিষয়ে অবশ্য তার একটা নিজস্ব বক্তব্য আছে, সেটা তার মুখেই শোনা যাক। ড্রেনে পতিত এক মাতাল ড্রেনের উদ্দেশে বলছে, 'ও ভাই ড্রেন, এ তোমার কেমন ব্যবহার? দিনের বেলায় থাক রাস্তার ধারে আর রাতের বেলা চলে আস একেবারে রাস্তার মধ্যিখানে, এটা তো মোটেই ভাল নয়।'

কী যে ভাল, কী যে খারাপ, মাতালের অভিধান আর আমাদের অভিধানে সব শব্দের অর্থ এক নয়। এক ঢাকাই মাতালের কথা শুনেছিলাম, সে বাড়ি ফেরার জন্যে বেরিয়ে রাস্তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তার মাথা এত ঘুরত যে দাঁড়ানো অবস্থায় তার মনে হত ঢাকা শহরটা তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। সে বলেছিল, 'দাঁড়িয়ে থাকি এই আশায় যে আমার নিজের বাড়ির দরজাটা যখন সামনে চলে আসবে, ঝপ করে ঢুকে পড়ব। কিন্তু সে-বাড়িটা যে কোথা থেকে হুট করে পালিয়ে যায় বুঝতে পারি না।' গোপাল ভাঁড়ের গল্প ছিল, ছেলে মধ্যরাতে মাতাল হয়ে বাড়িতে এসে বাবাকে 'গোপালবাবু' বলে চেঁচিয়ে ডাকছে। বাবা তো রেগে আগুন, 'বদমায়েশ ছেলে, বাবাকে বাবা না বলে গোপালবাবু বলে ডাকছ?' বুদ্ধিমান মদ্যপ ছেলে বলল, 'আপনাকে যদি বাবা বলে ডেকে মাতলামি করি, পাড়ার লোকে ছিঃ ছিঃ করবে, বলবে গোপালবাবুর ছেলে মাতাল হয়ে এসেছে। আর আমি যদি আপনাকে 'গোপালবাবু' বলে ডাকি লোকে ভাববে আপনার কোনও ইয়ার-বক্সি-মাতাল হয়ে এসেছে, তাতে আপনার কী আসে যায়।'

গতবার ঢাকায় গিয়ে অনুরূপ একটি ঢাকাই গল্প শুনে এলাম। গভীর রাতে পাঁচ মাতাল আনোয়ার আলির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন আনোয়ার আলি স্বয়ং। কিন্তু তারা সকলেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, 'আনোয়ার আলি, আনোয়ার আলি' বলে চেঁচাতে লাগল। ফলত আনোয়ার আলির স্ত্রী ঘুম জড়ানো চোখে বাড়ির সদর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটাই আনোয়ার আলির বাড়ি কিন্তু আপনারা কী চাইছেন?' বলা বাহুল্য বউটি মাতালদের দঙ্গলে বরকে লক্ষ করেনি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, মাতালদের মুখপাত্র হাতজোড় করে বলল, 'ভাবি,

আমাদের মধ্যে কেউ আনোয়ার আলি, কিন্তু আমরা ঠিক ধরতে পারছি না। আপনি আসল আনোয়ার আলিকে বেছে নিন।'

আনোয়ার আলির স্ত্রী সেদিন স্বামীকে বেছে নিতে পেরেছিলেন কি না এবং তারপরে সেই স্বামী বেচারার কী পরিণতি হয়েছিল সেটা চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে মাতাল হলে মানুষেরা চেহারা পালটিয়ে যায়, তাকে আর চেনাই যায় না। সাধে কি আর গল্পের সেই মাতাল তার সঙ্গীকে মদ খেতে নিষেধ করে বলেছিল, 'ওরে তুই আর মদ খাসনে, তোর মুখ না কী রকম ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।'

ঢাকঢাক-গুড়গুড়

সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

আর ঢাকঢাক-গুড়গুড় করে লাভ নেই। কিছুই আর গোপন নেই, সবাই সব-কিছু জেনে ফেলেছে।

সবাই জেনে গেছে যে, আমার এই সব তাৎক্ষণিক রচনা সবই টুকে লেখা। লিখেছি, যা পড়েছি।

সবাই জেনে গেছে যে, আমার সব রসিকতাই শোনা কথা। লিখেছি, যা শুনেছি।

এসবই মেনে নিচ্ছি।

তবে একটা কথা আমি জানাই, এই ঢাকঢাক-গুড়গুড় শব্দটির মানে আমি মোটেই জানি না। তদুপরি এই শব্দটির অর্থ জানার প্রয়াসে আমাকে কেউ সাহায্য করেনি, সাহায্য করতে পারেনি।

ঢাকঢাক-গুড়গুড় শব্দটি সবাই জানে, এর মানেটা পরিষ্কার না জানলেও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার অভিধানে শব্দটি নেই; ব্যাকরণ-বইয়ের বাগ্বিধি, বিশিষ্টার্থক বাক্য, প্রবাদবাক্য ইত্যাদি পরিচ্ছেদেও ঢাকঢাক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

অতঃপর আমার মতো মূর্খের এ ব্যাপারে আর বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না, বরং আমার যা কাজ তাই করি। ঢাকঢাক-গুড়গুড়—ঢাক আর গুড়ের প্রসঙ্গে দুটো কথা বলি। দুটো কথা, অর্থাৎ ঢাকের বিষয়ে দুটো এবং গুড়ের বিষয়ে দুটো। যথারীতি, ঢাক এবং গুড়-বিষয়ক যে দু'-চার পঙ্ক্তিই আমি লিখি না কেন পুরোটাই ধার করা।

প্রথম ঋণ, গৌড়রত্ন স্বর্গবাসী শিবরাম চক্রবর্তীর কাছে।

শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন আক্ষরিক অর্থে মালদার লোক। অনেক ভাল ভাল গল্প তিনি লিখে গেছেন শুধু তাই নয়, অনেক ভাল ভাল উপদেশও দিয়ে গেছেন।

ঢাক-বিষয়ক শিব্রামীয় উপদেশটি স্মরণ করা যাক।

মনে করুন, আপনি কোথাও বেড়াতে গেছেন। উঠেছেন কোনও বন্ধু বা নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, তাঁদের আতিথেয়তা আপনার ভাল লাগেনি; কেমন কাটাকাটা ছেঁড়াছেঁড়া কোথায় যেন আন্তরিকতার অভাব।

এবার আপনি কী করবেন? আপনি একজন ভদ্রলোক, এসব কথা তো মুখ ফুটে বলতে পারবেন না। কিন্তু এদের একটু শিক্ষা দেওয়াও তো উচিত।

সুতরাং, শিবরাম চক্রবর্তীর পরামর্শ, ফিরে আসার আগের দিন কাছাকাছি একটা বাজারে যান, সেখানে একটা খেলনা বাদ্যযন্ত্রের দোকান থেকে একটা ঢাক কিনে ফেলুন; অবশ্য সে-বাড়িতে যদি একাধিক বাচ্চা থাকে, প্রতিটি বাচ্চার জন্যে একটা করে ঢাক কিনবেন। ভয়ের কিছু নেই, খেলনা ঢাকের দাম বেশি নয়। এরপর আসার দিন রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে বাচ্চাদের একটা করে ঢাক উপহার দিন। খুব বেশি আগে দেবেন না; কারণ ঢাক বাজিয়ে ওরা আপনার কান ঝালাপালা, জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে।

সে ঝামেলা আপনি চলে আসার পরে ওদের মা-বাবা বুঝবে, হাড়ে হাড়ে, কানের পর্দায়-পর্দায় টের পাবে।

আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যদি ওদের গুরুজনেরা ঢাকগুলো কেড়ে নেয়, তা হলেও অব্যাহতি নেই। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, যে শিশু একবার ঢাক বাজানোর আনন্দ উপভোগ করেছে, তাদের কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত করা অসম্ভব। ঢাক কেড়ে নিলে শিশুটি থালা-বাসন বাজাবে, ক্যানেস্তারা পেটাবে।

ঢাকের দ্বিতীয় গল্পটি এত বিপজ্জনক নয়, বরং বিপদমোচনের কাহিনী।

এন্টালির জগন্নাথবাবু নাগাল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে একটা সুদৃশ্য ঢাক কিনে এনেছেন। ঢাকটি শুধুই যে সুদৃশ্য তাই নয়, মন্ত্রপূত ঢাক এটা। এই ঢাকের বাদ্যি কানে গেলে হিংস্র জন্তুরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না।

ঢাক নিয়ে কলকাতায় এন্টালির বাড়িতে ফিরে এসে জগন্নাথবাবু সারারাত ঢাক বাজাতে লাগলেন, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সকলের ঘুম শিকেয় উঠল। দিনের পর দিন এই রকম চলতে লাগল। কিন্তু কেউ জগন্নাথবাবুকে ঢাক বাজানো থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না। অগত্যা পাগলের ডাক্তার ডেকে আনা হল। ডাক্তারবাবুকে জগন্নাথ স্পষ্টই বললেন, হিংস্র জন্তুরা যাতে কাছে না আসে সেই জন্যে তিনি এই ঢাক বাজান। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু খাস কলকাতায় বুনো জানোয়ার কোথায়? খুব কাছে হলেও সেই পঞ্চাশ মাইল দূরে সুন্দরবনে বাঘ।' একগাল হেসে জগন্নাথ বললেন, 'তা হলে ঢাকের তেজ ভেবে দেখুন। কোনও বাঘ পঞ্চাশ মাইলের এপাশে আসতে সাহস পাচ্ছে না।'

ঢাক বিষয়ে এই বস্তাপচা গল্পটি বলার পরে, এবার গুড়ের ব্যাপারটা একটু মহৎ পর্যায়ে নিয়ে যাই।

পুরনো গল্প। কখনও হজরত মহম্মদের নামে, কখনও খ্রিস্টের নামে, কখনও গান্ধীর নামে এ গল্প চলেছে।

এক গরিব মানুষ তার ছেলেকে নিয়ে মহাত্মার কাছে এসেছে। অভিযোগ, তার ছেলেটি খুব গুড় খেতে চায়। কিন্তু সে গরিব, ছেলের গুড় কেনার পয়সা পাবে কোথায়? একথা শুনে মহাত্মা বললেন, 'সামনের সপ্তাহে এসো। ছেলেকে সঙ্গে এনো।' পরের সপ্তাহে যেতে মহাত্মা ছেলেটিকে খুব বোঝালেন, গুড় খাওয়া ভাল নয়, গুড় খেয়ো না ইত্যাদি। সেদিন চলে আসার সময় শিশুটির বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি গত সপ্তাহেই তো এই সব কথা বলতে পারতেন?' মহাত্মা বললেন, 'পারতাম না। তখন আমি নিজেই খুব গুড় খেতাম। এই এক হপ্তায় গুড় খাওয়া ছেড়ে দিয়ে তারপর এত উপদেশ দিতে পারলাম।'

গুড়ের দ্বিতীয় এবং এ-যাত্রার শেষ গল্পটি একটু ছমছমে। পুলিশের গল্প। সেই যে একবার পাঁচকড়ি নামে এক আসামিকে ধরতে না পেরে পুলিশ তিনকড়ি আর দুকড়ি নামে দু'জন নিরীহ লোককে বেঁধে এনেছিল—এ গল্প তারই আধুনিক সংস্করণ। এক লাইনের গল্প। মধুপদ-গুরুপদ দুই ভাই, মধু খুন করে পালিয়েছে, গুরুকে চালান দিল পুলিশ। 'কেন এমন হল', প্রশ্ন করায় দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'জানেন না, মধ্যাভাবে গুড়ং দদেৎ।'

জলাঞ্জলি

এই রচনার নাম জলাঞ্জলি।

জলাঞ্জলি শব্দটির অর্থ মোটামুটিভাবে সকলের কাছেই বোধগম্য। জলাঞ্জলি মানে বিসর্জন দেওয়া, সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা।

আমরা আশা জলাঞ্জলি দিই, লজ্জা জলাঞ্জলি দিই, লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিই। টাকাকড়ি জলাঞ্জলি দিই।

অভিধানগতভাবে জলাঞ্জলি শব্দের সরাসরি অর্থ, সুবলচন্দ্রের বাঙ্গালা অভিধানমতে, জলপূর্ণ অঞ্জলি, এক অঞ্জলি জল। দাহের পর প্রেতাত্মার উদ্দেশে প্রদত্ত আঁজলাপূর্ণ জল হল জলাঞ্জলি। এই অঞ্জলির মাধ্যমেই মৃতের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিসর্জন।

জলাঞ্জলি সন্ধিবদ্ধ শব্দ, জল+অঞ্জলি= জলাঞ্জলি, সরল স্বরসন্ধি। সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াও জানে।

সমাসবদ্ধ জলাঞ্জলি কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাস নয়। জল ও অঞ্জলি, দুই শব্দ মিলে সরাসরি জলাঞ্জলি নয়। জলাঞ্জলি হল মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ব্যাসবাক্য হল জলপূর্ণ অঞ্জলি।

সে যা হোক, ব্যাকরণঘটিত কচকচি ছেড়ে এবার সরাসরি জলে যাই। সেই যে একটা গান ছিল না—

'সখি বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।'

নদী কিংবা দিঘি থেকে কলসি কাঁখে যে মেয়েরা সকাল-সন্ধ্যায় জল নিয়ে আসত কবির মোহিত দৃষ্টির সামনে থেকে তারা বহুকালই অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের পৌত্রী দৌহিত্রীরা এখন রাস্তার মোড়ে নোংরা কলতলায় রঙিন প্লাস্টিকের বালতি হাতে ঝগড়া করে। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় গান গাইতে গাইতে তাদের জল নিয়ে ঘরে ফেরার ছবি চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

জলই জীবন। মানুষ অনশন করে দু'-তিন মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে, গান্ধীজি থেকে শুরু করে অনেক রাজনৈতিক নেতাই দীর্ঘদিন ধরে টানা অনশন করেছেন। কিন্তু জলগ্রহণ না করে মানুষের পক্ষে কয়েকদিন বাঁচাও কঠিন। একদা হিন্দু বিধবারা নির্জলা একাদশীর উপবাস করতেন, সে ছিল ভয়াবহ কষ্টের ব্যাপার, বিশেষ করে এই দীর্ঘ গ্রীষ্মের দেশে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া কথাটার উৎপত্তি এখানেই। এমনিতে জল পান না করে স্নানের সময় লোকচক্ষুর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এই গ্রাম্য প্রবাদে।

সব ধর্মেই জল অতি পবিত্র জিনিস। গঙ্গার জল কিংবা ফোরাতের পানি ধর্মপিপাসুদের কণ্ঠের তৃষ্ণা না মেটালেও ভক্তিতৃষ্ণা মেটায়। তার শাস্ত্রীয় আচরণকে পবিত্র করে।

অতঃপর জলের আসল গল্পে যাই। জলের আসল মজা সেখানেই।

যাঁরা মদ্যপান করেন, নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় তাঁরা পরস্পরের কাছে জানতে চান, 'কী আজ সন্ধ্যায় একটু জলপথে ভ্রমণ হবে নাকি?'

জলাদেশে, এমনকী কলকাতা শহরেও জলপুলিশ আছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এরা আবগারি পুলিশ, মদ ও মাতাল নিয়ে এদের কারবার। তা নয়। স্থল এলাকায় যেমন সাধারণ পুলিশ আছে, তেমনি জল এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জলপুলিশ।

গোপাল ভাঁড়ের হেঁয়ালির বইয়ে এ ব্যাপারে একটি মজার গল্প আছে।

এক ভদ্রলোক অত্যধিক মদ্যপান করে রাস্তা থেকে গড়িয়ে রাস্তার ধারে একটা খালের জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। রাজপথে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে বলে, 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।' ভদ্রলোক নেশায় চুরচুর হয়ে থাকলেও তাঁর জ্ঞান যথেষ্টই ছিল এবং তিনি যথেষ্টই সেয়ানা, পুলিশের ধমক খেয়েও তিনি খালের জল থেকে উঠে এলেন না, বরং ওই পুলিশকেই বললেন, 'হুঁহুঁ বাবা। আমি তো জলে আছি, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করবে কী করে? যাও, এখন গিয়ে জলপুলিশ ডেকে নিয়ে এসো।'

প্রবাদ আছে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। মদ বেচা একটা সুপ্রাচীন ব্যবসা। মদ্য ব্যবসায়ীকে সংস্কৃতে বলে শৌণ্ডিক। শৌণ্ডিক মানে শুঁড়ি।

এই রকম এক শুঁড়ি শুধু মদ বেচতেন তাই নয়, নিজেও প্রচুর মদ্যপান করতেন। বলতে গেলে সমস্ত জীবনে, সাবালক হওয়ার পরে, একমাত্র কারণবারি ছাড়া আর কোনও পানীয়ই গ্রহণ করেননি।

মৃত্যুকালে তাঁর বড় ছেলে তাঁর মুখে জল দিয়েছিলেন। তিনি সেই জল 'ওয়াক, থুঃ' করে ফেলে দেন। তারপর শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করার আগে ছেলেকে উপদেশ দিলেন, 'বাবা, এইমাত্র আমার মুখে যে জিনিসটা দিয়েছিলে সেটা কিন্তু অতি জঘন্য জিনিস। এটা কেউ খাবে না। এ জিনিস বেচতে যেয়ো না। ব্যবসা লাটে উঠবে।'

এর প্রায় বিপরীত একটি ঘটনার আমি নিজে সাক্ষী। আমার এক তরুণ বন্ধু নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল। তার বুকে জল জমে গিয়েছিল।

আমার সেই বন্ধুটা কড়া মদ্যপায়ী। নির্জলা মদ সে সরাসরি টকটক করে গিলে খায়।

আমি তাকে নার্সিংহোমে দেখতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে দেখে অভিযোগ করল, 'তারাপদদা আমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্য আপনি দায়ি।' তার এই অভিযোগ শুনে আমি বিস্মিত বোধ করায় সে বলল, 'যখনই মদ খাই, আপনি জোর করেন জল মিশিয়ে খাও, জোর করে গেলাসে জল ঢেলে দেন। মদটা শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। আপনার সেই জলটা বুকে জমে আছে।'

অবশেষে, নিবন্ধ প্রান্তে একটি আপ্তবাক্য স্মরণ করি, 'আমরা জলের মূল্য কখনওই বুঝতে পারি না, যতক্ষণ না কুয়ো শুকিয়ে যায়।'

টাকাপয়সা

সবাই তো জানেন সেই পুরনো ধাঁধাটা, 'পৃথিবীটা কার বশ?'

এর উত্তর ওই ধাঁধা প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উত্তরটা হল পৃথিবী টাকার বশ। ব্যাপারটা বোধগম্য হবে যদি এর প্রতিবেশী ধাঁধাটিকে স্মরণ করি। সূর্যমুখীর বাপের বাড়ি কোন্‌নগর?' যার সরাসরি সাদা উত্তর হল, 'কোন্নগর।'

পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' উনিশ শতকের সেই মহাপুরুষ যা বলতেন তাই আপ্তবাক্য। সব ফলেছে। সব সত্য হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশে এক বিঘে জমির দাম ছিল তখন আশি টাকা। এখন সেই জমির দাম আশি লক্ষ টাকা।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই টাকাপয়সা নিয়ে শ্লোকের, প্রবাদ বাক্যের ছড়াছড়ি।

অর্থই অনর্থ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু এর কোনও শেষ নেই। পাতার পর পাতা ভরে যাবে সব লিখতে।

বরং দুয়েকটি মূল্যবান মহাজন বাক্য স্মরণ করি টাকা নিয়ে।

এক মহাপুরুষ বলেছিলেন যে যখন তুমি বুঝতে পারবে টাকা গাছে ফলে না তুমি দেখবে যে তুমি গাছের ডালে উঠে বসে আছ, আর নেমে আসার সুযোগ নেই।

একটা খুবই দামি কথা বলেছিলেন আঠারো শতকের মার্কিন দার্শনিক বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। কথাটা হল, 'যে মনে করে যে টাকা দিয়ে সব কিছু করানো যায়, আর কেউ না হোক সে টাকার জন্য সব কিছু করতে পারে।'

অনেকদিন আগে একবার এক অর্থনীতিবিদের বক্তৃতায় একটা অতি প্যাঁচালো কথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি টাকাই সব নয়। টাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের অভাব নেই এই পৃথিবীতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলো পাওয়ার জন্য টাকা লাগে।'

যতদুর মনে আছে, এই খ্যাতনামা ইংরেজ অধ্যাপক সেদিন আরও বলেছিলেন, 'এই জগতের অর্ধেক পাপকার্যের মূলে রয়েছে অর্থের লালসা।' তারপর একটু থেমে থেকে যোগ করেছিলেন, 'বাকি অর্ধেক পাপকার্যের মূলে রয়েছে অর্থের অভাব।'

অধ্যাপক মহোদয়দের কচকচির মধ্যে না গিয়ে সরাসরি গল্পের মধ্যে চলে যাওয়া বোধহয় ভাল হবে।

আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত দুঃখের গল্প বলি। গল্পটা আমার পক্ষে অপমানজনক, তবু অনেক কাল আগের কথা বলে এখন আর বলতে দ্বিধা নেই।

সেই আমার কপর্দকহীন, ছেঁড়াতালি চপ্পল, ময়লা জামা, প্রথম যৌবন। দৈনিক হলুদ প্যাকেটের কড়া তামাকের পাঁচ প্যাকেট মানে পঞ্চাশটা সিগারেট খাই। নয়া পয়সার নয়া যুগ। পাঁচ প্যাকেটের পাইকারি দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা। একেকটা একপয়সা। এর কিছু ওপরে ছিল দশ নম্বর সিগারেট, খাঁটি টিনের কৌটোয় এক কৌটো পঞ্চাশটা নরম সিগারেট, এক টাকা দাম।

হাতে পয়সা কম থাকলে বা বেশি থাকলে, যখন যেমন, ওই পঞ্চাশ পয়সার কিংবা এক টাকার পঞ্চাশটা সিগারেট কিনতাম। সিগারেটের দোকানটা ছিল আমাদের বাড়ির রাস্তার মোড়ে, একটা ব্যাঙ্কের পাশে।

একদিন হাতে একদম টাকা ছিল না। সেই সিগারেটের দোকানে গিয়ে পঞ্চাশ পয়সার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট ধার চেয়েছিলাম। ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই পানওয়ালা বলেছিল, 'ধার দিতে পারব না, ব্যাঙ্কের বারণ আছে।'

আমি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এর মধ্যে ব্যাঙ্কের বারণ করার কী আছে? দোকানদার জানাল, 'ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি আছে।'

আমি আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাঙ্কের সঙ্গে তোমার আবার কী চুক্তি?' দোকানদার বলল, 'খুবই সোজা চুক্তি, আমি ধারের কারবার করব না। ব্যাঙ্কও পান সিগারেটের কারবার করবে না।'

পুনশ্চ:

টাকা পয়সার ব্যাপারে নিজের একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতার কথা বলি।

শহরতলিতে একটা বাড়ি ছিল আমাদের। বাড়ির পাশে এক চিলতে জমি। তখন খুব টানাটানি যাচ্ছে। ঠিক করলাম এখানে তরকারির চাষ করব। তাতে সংসারের কিছু সাশ্রয় হবে।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা কোদাল চেয়ে এক শুভ প্রভাতে বাগান কোপানোর কাজে লেগে গেলাম। তখন বয়েস কম ছিল। মোটামুটি কায়িক পরিশ্রম করতে পারতাম।

অনেকটা জমি ভাল করে কোপানোর পরে দেখি কোপানো মাটির ওপরে আমার পায়ের কাছে একটা সিকি পড়ে রয়েছে। সিকিটা কুড়িয়ে নিয়ে জামার পকেটে রাখলাম।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার কোপানো শুরু করলাম। আরেকটু কোপাতেই দেখি পায়ের কাছে একটা আধুলি পড়ে রয়েছে।

মাটি কোপাতে কোপাতে চটপট পয়সা পেয়ে যাচ্ছি, খুশি মনে আধুলিটাও তুলে নিয়ে পকেটে রাখলাম। তারপর আবার একটা সিকি পেলাম। আবার একটা আধুলি। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে একটু খটকা লাগল। এই পোড়ো জমিতে এত খুচরো পয়সা আসছে কোথা থেকে? তা ছাড়া পকেটে এত পয়সা রাখছি পকেট যে ভারী হচ্ছে না।

একটু পরেই আবিষ্কার করলাম যে আমার জামার পকেটটা ফুটো। সেই ফুটো গলিয়ে পয়সাগুলো পড়ে যাচ্ছে। আর আমি কুড়িয়ে যাচ্ছি। কুড়িয়ে পকেটে রাখছি, আবার পড়ে যাচ্ছে। আবার কুড়োচ্ছি।

ঘুম (২)

ঘুমের মতো এমন বেদনাহর, শান্তিদায়ক আর কিছুই নয়। রোগী-ভোগী, শিশু-বৃদ্ধ, সুখী-দুঃখী সকলেই ঘুম চায়। গাঢ়, গভীর ঘুম মনকে প্রশান্ত করে, শরীরকে ঝরঝরে করে তোলে।

কম হোক, বেশি হোক সবাই ঘুমোয়। না ঘুমোলে চলে না। কেউ বেশি ঘুমোয়। আট-দশ ঘণ্টা এমনকী তারও বেশি। সদ্যোজাত শিশুরা প্রায় সারাক্ষণই ঘুমোয়। তারা ঘুমোতে ঘুমোতে বড় হয়। ঘুমের ব্যাপারে এমন বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির কথাও শোনা যায়, যিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ সেরে আবার স্লিপিং পিল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

আবার অনেকে খুব কম ঘুমোন। বেশি ঘুম তাঁদের দরকার পড়ে না। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এঁরা নাকি রাতে তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতেন না।

ঘুমের ব্যাপারে নেপোলিয়ন ছিলেন অদ্বিতীয়। শোনা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে ফাঁক ফুরসত পেলে তিনি ঘোড়ার পিঠেই পাঁচ-দশ মিনিট ঘুমিয়ে নিতেন।

জীবনের সব দুঃখ, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা থেকে মৃত্যু মানুষকে চিরতরে পরিত্রাণ দেয়, তাই মৃত্যুর আরেক নাম চিরনিদ্রা। ঘুমও সাময়িকভাবে মানুষকে দুশ্চিন্তা, দুঃখ-ক্লেশ থেকে রেহাই দেয়।

ঘুম নিয়ে যুগে যুগে কবি ও দার্শনিকেরা ভূরি ভূরি কথা লিখেছেন। তার সামান্য অংশও উদ্ধৃত করতে গেলে সে এক মহাভারত হবে।

মনোবিদ্যা এবং ডাক্তারি শাস্ত্রও ঘুম নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছে, এখনও ঘামাচ্ছে। অনিদ্রা রোগের রোগী পৃথিবীতে অসংখ্য।

এক অনিদ্রা রোগী চিকিৎসককে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু রাতে ঘুমোতে পারি না। পাশের বাড়ির হুলো বেড়ালটা আমাদের বারান্দায় এসে এমন ম্যাঁও-ম্যাঁও করে প্রত্যেক রাতে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঢিল মেরে কিংবা লাঠি দেখিয়ে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলেই পারেন।'

রোগী বললেন, 'তাড়াই তো, তারপর ঘুম যে চটে যায়, সারা রাত আর ঘুম আসতে চায় না।'

ডাক্তারবাবু তখন বললেন, 'ঠিক আছে ওষুধ দিচ্ছি।' এই বলে কয়েকটা ট্যাবলেট রোগীর হাতে দিতে রোগী বললেন, 'কখন খাব? রাতে শোয়ার আগে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আরে না, না। আপনার জন্য নয়, আপনি খাবেন না। সন্ধ্যাবেলা এক বাটি দুধে একটা ট্যাবলেট দিয়ে বারান্দায় রেখে দেবেন। বেড়ালটা খেলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। সারা রাত জ্বালাতে পারবে না।'

ঠিক এর বিপরীত সমস্যা নিয়ে এক মহিলা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমার স্বামী ঘুমের মধ্যে অনর্গল কথা বলেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এর খুবই ভাল ওষুধ আছে। আমি এখনই দিচ্ছি। আপনার স্বামীর ঘুম পাতলা, ওষুধটা খাইয়ে দিলে গভীর হবে, ঘুমের মধ্যে কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না ডাক্তারবাবু, আপনি ভুল করবেন। আমি আমার স্বামীর কথা বলা বন্ধ করতে চাইছি না। ঘুমের মধ্যে ও অনেক রকম ইন্টারেস্টিং কথা বলে। আমার শুনতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমার নিজের ঘুম এসে যায়, সব শুনতে পারি না। আপনি আমাকে এমন একটা ওষুধ দিন, যাতে আমার ঘুম না আসে।'

এই গল্পেরই আরও একটা দিক আছে। সকালবেলা চায়ের টেবিলে স্ত্রী স্বামীকে বললেন, 'তুমি কালকে ঘুমের মধ্যে আমাকে যাচ্ছেতাই সব খারাপ কথা বলেছ।' স্বামী বললেন, 'তুমি ঠিক বলছ না।' স্ত্রী বললেন, 'সে কী? আমি স্বজ্ঞানে শুনেছি।' 'ঠিকই শুনেছ', স্বামী বললেন, 'কিন্তু কথাগুলো আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলিনি। চোখ বুজে ছিলাম বটে, কিন্তু সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় বলেছি।'

অনিদ্রা রোগের বহু রকম চিকিৎসা আছে। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক থেকে ওষুধ, ডাক্তার, মনস্তত্ত্ববিদ থেরাপি। নিদ্রাকাতর ব্যক্তি বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভেড়া গোনে, হাজার হাজার ভেড়া গোনা শেষ হয়ে যায়, তবু চোখে ঘুম আসে না। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট, মিক্সচার, গেলাস গেলাস ঘুমের ওষুধ খায় কিছুতেই কিছু হয় না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুম আসবে না, এই ভয়ে এই দুশ্চিন্তাতেই ঘুম আসে না। এইরকম এক ভদ্রলোক দীর্ঘদিন অনিদ্রা রোগে ভুগেছিলেন, ডাক্তার ওষুধ অনেক কিছু করেও কিছু হয়নি। অবশেষে তাঁর ছেলেরা অনেক খুঁজেপেতে একজন লোককে নিয়ে আসে, সে নাকি জাদুবলে, হিপনোটিক মতে ঘুম পাড়াতে পারে।

সেই লোকটি এসে বৃদ্ধের চারপাশ ঘুরে চামর দিয়ে বাতাস করে, গালবাদ্য করে, প্রচুর অং-বং হিং-টিং-ছট এবং অঙ্গভঙ্গি করে ঘণ্টাখানেক ব্যয় করল। বৃদ্ধ চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন। সবাই বুঝতে পারল অনেকদিন পরে তার ঘুম এসেছে।

ভেলকিওয়ালা প্রচুর বকশিশ নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে যেই ঘরের বাইরে বেরিয়েছে, বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে বিছানায় উঠে বসে বললেন, 'খ্যাপাটা বিদায় হয়েছে? আচ্ছা পাগলার পাল্লায় পড়েছিলাম বাবা।'

পুনশ্চ: অনিদ্রা বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি সুচিকিৎসা আছে। ঘুম না এলে খাটের মাঝামাঝি থেকে সরে এসে একেবারে একপ্রান্তে এসে চোখ বুজে শুয়ে পড়ুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন এবং ছ' মিনিটের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় ধপাস করে মেঝেতে পড়ে যাবেন। মেঝেতে একটা তোশক রাখবেন, না হলে আঘাত গুরুতর হতে পারে।

ওগো বধূ সুন্দরী

অল্প বয়সে সর্বাণীর চেহারায় একটা আলগা চটক ছিল। যেটা দেখে সর্বানন্দ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে সর্বাণীর সেই চটকটা এখন আর তেমন কার্যকরী নেই, যদিও মোটের ওপর দেখতে সর্বাণী খারাপ নন।

রং শ্যামলা হলেও যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রীতিমতো ফরসা ঘেঁষা। সেই উজ্জ্বল শ্যামলিমার সঙ্গে মানিয়ে গেছে একটু চাপা নাক, পাতলা ঠোঁট, শালিক পাখির মতো উড়ু উড়ু চোখ।

নবযৌবনের ভালবাসার চোখে সর্বাণীকে সর্বানন্দের একদা যেমন অতুলনীয়া মনে হয়েছিল, এখন আর তেমন হয় না। এটা অবশ্য পুরোপুরি সর্বানন্দের দোষ নয়, সেই মায়া অঞ্জন এখন আর তার চোখে মাখানো নেই।

তাই বলে, একথা বলা উচিত হবে না যে এখন সর্বানন্দ সর্বাণীকে পছন্দ করেন না, কিংবা কুৎসিত মনে করেন।

দাম্পত্যজীবনে যেমন হয়, ধীরে ধীরে মোহ কেটে যায়। কিন্তু তাতে কোনও সর্বনাশ হয় না। ধীরে ধীরে মানিয়েও যায়। দাম্পত্য জীবন মানিয়ে নিয়েই চলে। সর্বানন্দ এবং সর্বাণী, এই দত্ত দম্পত্তির জীবনযাত্রাও মানিয়ে নিয়েই চলছে। একটু আধটু ঝগড়া বা খুনসুটি, অল্পবিস্তর মনোমালিন্য সে তো থাকবেই, তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে কিছু নয়।

সে যা হোক, এবার আমরা এবারকার ঘটনার মধ্যে যাই। ঘটনাটি সামান্য হলেও গোলমেলে।

সর্বাণী কোনওদিন সর্বানন্দের অফিসে আসেননি। আসার প্রয়োজন পড়েনি। সর্বানন্দ নিজের মতো অফিসে চলে আসেন, সর্বাণী বাসায় থাকেন।

সর্বানন্দের অফিসের দু'-চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব যাঁরা সর্বানন্দের বাড়িতে আসেন, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন তাঁদের কারও কারও সঙ্গে অবশ্য সর্বাণীর ভালই পরিচয় আছে। তবুও সর্বানন্দের অফিসে এসে গল্পগুজব, আড্ডার কথা সর্বাণী কখনও ভাবেননি। বরং বলা চলে এ ব্যাপারে তাঁর একটু সংকোচই আছে।

কিন্তু আজ সর্বাণীকে বাধ্য হয়েই তাঁর স্বামীর অফিসে আসতে হয়েছে। সর্বাণীর এক দিদি-জামাইবাবু লন্ডনে থাকেন। তাঁদের দুয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় আসার কথা। কিন্তু আজ দুপুরেই বাসায় ফোন এসেছে, দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে, তাঁরা এই বিকেলেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। এর আগে এ খবর জানিয়ে লন্ডন থেকে তাঁরা একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটাও আজ দুপুরেই এসেছে। এবং দুটোই সর্বানন্দ অফিসে বেরিয়ে আসার পর।

এর পরে যেমন হয়ে থাকে তাই হয়েছে। প্রথমে বাড়ি থেকে, তারপর পাশের বাড়ি থেকে, তারপর পাড়ার ফোন বুথ থেকে হাজার চেষ্টা করেও সর্বাণী সর্বানন্দের অফিসের লাইন পাননি। অবেশেষে মরিয়া হয়ে তাঁকে স্বামীর অফিসে ছুটে আসতে হয়েছে। খবরটা দিতে হবে যাতে সর্বানন্দ সময়মতো এয়ারপোর্টে যেতে পারেন, না হলে বাচ্চা-কাচ্চা, মালপত্র নিয়ে দিদি-জামাইবাবু খুবই বেকায়দায় পড়বেন, তা ছাড়া এটা খুব অভদ্রতাও হবে।

অফিসে এসে কিন্তু সর্বানন্দের সঙ্গে সর্বাণীর দেখা হল না। সর্বানন্দ কোথায় বেরিয়েছেন, একটু পরেই আসবেন।

সর্বানন্দের যে সহকর্মী এই খবরটা দিলেন, তিনি অবশ্য সর্বাণীকে বসতে বলেছিলেন, কিন্তু সর্বাণী বসেননি। ভাগ্য ভাল চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি, সর্বাণী অফিস থেকে বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই সর্বানন্দকে দেখা গেল রাস্তা পেরিয়ে আসছেন। সর্বাণীকে দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তারপর সর্বাণীর কাছে সব শুনে তাঁকে বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। আমি এয়ারপোর্ট হয়ে দিদি জামাইবাবুদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরব।'

অফিসে ফিরে আসতে তাঁর সেই সহকর্মী বন্ধু জানালেন, 'আপনার কাছে এক সুন্দরী মহিলা এসেছিলেন।

সর্বানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ দেখা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে সুন্দরী এ কথা আপনাকে কে বলল। আপনার সৌন্দর্যবোধকে বলিহারি যাই মশাই।'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম উনি বোধহয় আপনার স্ত্রী, তাই বলছিলাম।'

সর্বানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আপনার অনুমান ভুল নয়। উনিই আমার স্ত্রী।'

প্রবাসে দৈবের বশে

সর্বাণীকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।

বহু কষ্টে অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি সংগ্রহ করেছেন সর্বানন্দ। তাঁর প্রাণের ইচ্ছে এই এক সপ্তাহ কলকাতায় শুয়ে-বসে চুটিয়ে আড্ডা দেন, পান ভোজন করেন।

কিন্তু বাদ সেধেছেন সর্বাণী। তিনি ছুটির মধ্যে কলকাতায় থাকবেন না। একদিনের জন্যেও।

অনেক দাম্পত্য কলহ, ধ্বস্তাধ্বস্তি, রীতিমতো দর কষাকষির পর রফা হল যে ছুটির প্রথম ভাগ কলকাতায় এবং শেষ কয়েকটা দিন বাইরে কাটানো যাবে।

বাইরে মানে খুব একটা বাইরে নয়। চির নবীন, পরম পবিত্র পুরী। মন্দির, সমুদ্র, বাজার নিয়ে পুরীর আকর্ষণ আলাদা।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এখন স্বর্গে ধান ভানার খুব ধূম। কারণ পৃথিবীর সব ঢেঁকিই স্বর্গে চলে গেছে।

সে যা হোক, অবান্তর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সোজা কথা, সর্বানন্দ পুরী গিয়েও প্রাণের আনন্দে মদ্যপান করতে লাগলেন তবে সর্বাণীর পক্ষে এখানে একটা স্বস্তি এই যে সর্বানন্দের মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরার সমস্যা নেই। যে হোটেলে তাঁরা আছেন তারই নীচতলায় বার কাম হোটেল।

দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ভোজনের ঘণ্টাখানেক আগে সর্বানন্দ নীচে নেমে যান। তাঁরা পাঁচতলায় সমুদ্রের দিকে একটা ঘর পেয়েছেন। লিফটে করে নেমে গিয়ে সর্বানন্দ পান শুরু করেন। এই অবসরে সর্বাণী সাজগোজ, গোছগাছ করেন। জানালায় দাঁড়িয়ে লবণাম্বুরাশি পর্যবেক্ষণ করেন, মধ্য

সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খাওয়া নৌকোর দিকে তাকিয়ে রজনীকান্তের গান গুনগুন করেন, 'শাল কাঠের সেই অক্ষয় বজরা যাবে আপন বলে।' তারপর ধীরে সুস্থে নীচে নেমে যান।

ততক্ষণে সর্বানন্দের রংয়ের উপর রং চড়েছে। সর্বাণী এসে যাওয়ার পরে আরও এক পাত্র পানীয় নিয়ে খাবারের অর্ডার দেন তিনি। অনেকদিন খাওয়া শেষ হওয়ার বাদে সর্বাণী চলে যাওয়ার পরেও সর্বানন্দ একাই টেবিলে বসে আরও একটু পান করেন।

এই বারেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই পরিচয় হল। সর্বাণী চলে যাওয়ার পরে পাশের টেবিল থেকে নিজের গেলাস নিয়ে উঠে এসে পরিচয় করেন। নিজের নাম বললেন, হৃদয় নাগ।

হৃদয়বাবুকে সর্বানন্দের ভালই লাগল। হৃদয়বাবু লোক খারাপ নয়, তদুপরি সুরসিক এবং পানরসিক। প্রথম দিনেই নৈশ ভোজনের শেষে দু'জনে মুখোমুখি বসে প্রায় ঘণ্টাখানেক আকণ্ঠ করলেন। তারপর টলতে টলতে লিফটে উঠে যে যাঁর ঘরে ফিরলেন টইটম্বুর অবস্থায়।

হৃদয়বাবুও সস্ত্রীক এই একই হোটেলে উঠেছেন। সর্বানন্দের তলাতেই আশেপাশে তাঁর ঘর। তবে হৃদয়বাবুর হৃদয়েশ্বরী ঘোরতর মদ্যপান বিরোধী। তিনি সর্বাণীরও এক কাঠি ওপরে। তিনি বারে মাতালদের সঙ্গে খাবার খেতে রাজি নন। তাঁর খাবার ঘরে নিয়ে যায় বেয়ারা। তবে হৃদয়েশ্বরীর একটা গুণ আছে, তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, হৃদয়বাবুর পান করা নিয়ে মাথা ঘামান না।

হৃদয়বাবুর মুখে তাঁর হৃদয়েশ্বরীর কথা শুনে সর্বানন্দের খুব কৌতূহল হল। পরের দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় এই কৌতূহল আরও বেড়ে গেল যখন হৃদয়বাবু বললেন, 'ও মশায়, আমার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন। আপনাদেরই চেতলার মেয়ে। বলল, আপনি নাকি একবার চোর ভেবে একটা সাদা পোশাকের পুলিশকে বেধড়ক পিটিয়ে ছয়মাস পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন।'

'দশ-বারো বছর আগের কথা, কিন্তু কথাটা পুরো সত্যি। আপনার স্ত্রীর নামটা বলবেন?'

বিকেলে ব্যাপারটা আরও জটিল হল। ইতিমধ্যে সর্বাণীর সঙ্গে হৃদয়েশ্বরীর আলাপ পরিচয় হয়েছে। সর্বাণী জানালেন, 'ওগো তোমার নতুন বন্ধুর স্ত্রী তো তোমার গুণমুগ্ধ ফ্যান। তোমার সেই ধ্যাড়ধেড়ে চেতলার বাল্য সখী।' সর্বানন্দ বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, 'নামটা কী?' সর্বাণী বললে, 'নাম? বিয়েওলা মেয়ের আবার নাম আছে নাকি? মিসেস নাগই যথেষ্ট। দেখো আবার নতুন করে লটঘট করে বোসো না।'

সেদিনই নৈশভোজের পরে পান করতে করতে প্রায় অন্যরূপ ইঙ্গিত দিলেন হৃদয় নাগ, 'আমার স্ত্রী খুব উতলা হয়ে পড়েছেন আপনার জন্যে, আপনিও কি তাই?' কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না সর্বানন্দবাবু, তিনি কে, তাঁর কী নাম কিছুই জানা নেই, কী বলবেন।

আসল মজাটা হল গভীর রাতে। প্রচুর পরিমাণ পান করার পরেও হৃদয় মদ খেয়ে যাচ্ছেন, কোনও উপায় না দেখে সর্বানন্দ 'গুড নাইট' বলে বিদায় নিলেন। কিন্তু লিফটে উঠে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় নেমে গুলিয়ে ফেললেন কোনটা তাঁর ঘর। কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি চেষ্টা করার পর তিনি বারান্দার একমাথা থেকে প্রত্যেক ঘরের দরজায় হোটেলের চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন, যেটা খুলবে সেটাই তাঁর ঘর।

এই সময় অঘটন ঘটল। একটা ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছেন, এমন সময় পিঠে একটা চাপড় খেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, টলটলায়মান হৃদয়বাবু দাঁড়িয়ে।

একটু ঢোঁক গিলে, চিবিয়ে চিবিয়ে হৃদয়বাবু সর্বানন্দকে বললেন, 'আপনার এই চাবি যদি এই দরজায় লাগে তা হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হবে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'কী কেলেঙ্কারি?'

হৃদয়বাবু বললেন, 'এটা আমার ঘর। আপনার চাবি দিয়ে যদি আমার ঘর খোলে তবে আমার স্ত্রী এবং আপনাকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনার স্ত্রী আর আমার কাছে।'

তিন পুলিশের গল্প

মাননীয়া সম্পাদিকা মহোদয়া আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। পুজোয় বড় করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখতে হবে, না হলে নাকি পুজো সংখ্যার পক্ষে মানানসই হবে না।

কিন্তু কোনও কিছু বড় করে লিখতে গেলে আমার কলমে কালি শুকিয়ে যায়, ডান হাতে কবজিতে ব্যথা হয়, বুড়ো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়।

সুতরাং প্রাণের দায়ে রচনাটি তেমন বড় না করে দুই থেকে তিনে যাচ্ছি। তবে এবারের বিষয় খুব জবরদস্ত। রীতিমতো পুলিশ নিয়ে এবারের এই রচনামালা, এই মারাত্মক বিষয় নিয়ে রসিকতা করতে রীতিমতো ভয় ভয় করছে। কিন্তু এই পুজোর বাজারে এর কমে আর কী করা যেতে পারে।

গল্পগুলোর প্রথমে একটা দুঃখের কাহিনী বলে নিই। বছর কয়েক আগে, আমি তখন হুগলিতে, সেখানে এক দারোগাবাবু আমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, 'দেখুন, লোকে আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না।'

আমি বলেছিলাম, 'সে কী? তা কেন হবে?'

দারোগাবাবু বললেন, 'আজকে সকালবেলার কথাটাই তা হলে বলি আপনাকে। এক পাড়ায় একটা ছোটখাটো গোলমালের এনকোয়ারি করতে গেছি। সেই সূত্রে পাড়ারই এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতে হল। সঙ্গে ওখানকারই আরও দু'জন ভদ্রলোক। সেই বাসায় গিয়ে বাইরের দরজায় বেল দিয়েছি। সেই বাড়ির কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিয়ে আমাদের দেখে সেই দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে খবর দিতে গেল। ভিতরের ঘরেই বাড়ির কর্তা ছিলেন, শুনলাম তাঁকে কাজের মেয়েটি বলছে, বাইরে দু'জন ভদ্রলোক আর একজন পুলিশ এসেছে।'

অতঃপর দুঃখের গল্পের পরে হাসির গল্প।

পুলিশের জমাদার এক ব্যক্তিকে ধরেছেন। লোকটি রাস্তায় মাতলামি করছিল।

জমাদারজি তাকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাম তোমার?'

লোকটি একে মাতাল তার ওপরে তোতলা এবং দেহাতি কী যে অংবং নাম বলল জমাদার সাহেব মোটেই বুঝতে পারলেন না।

জমাদারজি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'লেখাপড়া জানো? পড়াশুনো করেছ?'

অনেক তোতলামি করে লোকটি যা বলল তার মানে দাঁড়াল, সে লেখাপড়া জানে না কিন্তু নাম সই করা শিখেছে।

জমাদারজির এতেই কাজ হবে। নামটা জানতে পারলেই লোকটিকে চালান করে দেওয়া যাবে। তিনি এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল লোকটিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে এখানে তোমার নাম লেখো।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে পেনসিলটা ধরল তারপর পুরো পাতা জুড়ে লম্বা, হিজিবিজি কয়েকটি টান দিল।

জমাদারজি অনেক চেষ্টা করেও সেই লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না, কোনও একটি অক্ষরও স্পষ্ট নয়। এ কী নাম সইরে বাবা।

অনেক চেষ্টা করার পর ক্লান্ত জমাদারজি লোকটিকে বললেন, 'এখানে কী লিখেছ, পড়ে দাও দেখি।'

এবার লোকটি বোকার মতো হেসে ফেলল, তারপর বলল, 'পড়ব কী করে? আপনাকে যে আগেই বললাম আমি মোটেই লিখতে পড়তে জানি না।'

এরপর সেই বেনামা আসামিকে নিয়ে জমাদার সাহেব কতটা নাজেহাল হয়েছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে এটা জানি যে সাধারণত আসামির নাম নিয়ে পুলিশ খুব একটা মাথা ঘামায় না। সব সময় আসামিরা সত্যি নাম বলেও না। আর নাম না মিললে আসল নাম জানার পরে আগের নামটা ওরফে করে দিলেই হবে।

তা ছাড়া অনেক কাল আগে একটা গল্প শুনেছিলাম, সে গল্পটাও সম্ভবত খুব বানানো নয়।

সাতকড়ি নামে এক ব্যক্তির নামে একটি ওয়ারেন্ট বেরোয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে খুঁজে পায়নি। কিন্তু পুলিশ সেটা পুষিয়ে নেয় সেই এলাকারই পাঁচকড়ি এবং দুকড়ি নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পাঁচ এবং দুই মিলে সাত, সাতকড়ির ওয়ারেন্টে এই দু'জনকে চালান দেওয়া হয়।

এরই পাশাপাশি একটু আধুনিক গল্পের কথা মনে পড়ছে। আজকাল পলাতক অপরাধীর ফটো, হাতে আঁকা ছবি মিলিয়ে পলাতক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হয়।

বহু নিরপরাধ লোক এর জন্যে যথেষ্ট বিপদে পড়ে। শুধু ফটো বা ছবির চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে অনেককে থানায় বা লক-আপে যেতে হয়। হয়তো শেষে সে ছাড়া পায়, কিন্তু হয়রানি কিছু কম হয় না।

যে যা হোক, বাঘে ছুঁলে যে আঠারো ঘা সে সবাই জানে। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বরং ফটো মিলিয়ে আসামি ধরার প্রচলিত গল্পটা বলি।

যখন কোনও পলাতক আসামির ফটো প্রচার করা হয় তখন চেনার সুবিধের জন্যে সম্ভব হলে মুখের বাঁ এবং ডানদিকের প্রোফাইল এবং সামনাসামনি ছবি দেওয়া হয়, এতে পুরোটা মিলিয়ে লোকটিকে শনাক্তকরণের সুবিধে হয়।

দু'দিকের প্রোফাইল এবং সামনাসামনি এই তিনটি ফটো এক বাঘা দারোগার হাতে পৌঁছায়। হেড কোয়ার্টারের ধারণা ওই দারোগা সাহেবের থানার এলাকাতেই আসামি লুকিয়ে আছে।

পরের দিনই তিন ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে দারোগাসাহেব হেড কোয়ার্টারে এসে বড় সাহেবকে সেলাম দিয়ে জানালেন, 'স্যার তিন ব্যাটাকেই ধরেছি।'

তিন পুলিশের গল্পের কথা বলেছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই তিনের অধিক গল্প হয়ে গেল, লেখা কিন্তু বড় হল না। তাই আমাকে আরেকটু লিখতে হচ্ছে।

আমার এই শেষ গল্পের ঘটনাটি মাত্র দু'দিন আগে ঘটেছে।

মধ্য ভাদ্রের গনগনে দুপুর। পরপর দু'দিন দু'রাত্রি মেঘবৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার পরে একেবারে যাকে রাঢ়ভূমিতে বাবা-খাই, মা-খাই রোদ্দুর বলে সেই চাঁদিফাটা রোদ উঠেছে কলকাতায়।

আগস্টের চতুর্থ সপ্তাহের দুপুর দুটো। বাৎসরিক গ্রাফে এটাই কলকাতায় মিটিং-প্রসেশন মিছিলের মাহেন্দ্রক্ষণ। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে প্রায় দশ মিনিট একটি মাঝারি মাপের মিছিলের ধাক্কায় ট্রাফিক আটকিয়ে রয়েছে।

সাধারণত মোটর সাইকেলের আরোহীরা এর মধ্যেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু আজকের মিছিলের প্রহরা খুব কড়া। মিছিল অতিক্রম করে একটি মাছি পর্যন্ত গলতে পারছে না।

যেমন হয়, মিছিলে অবরুদ্ধ ট্রাফিকের ঠিক প্রথম ভাগেই রয়েছে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদির ফাঁক দিয়ে নাক বাড়িয়ে কয়েকটি স্কুটার, মোটর সাইকেল, টু হুইলার।

এরই মধ্যে একটা ভারী, প্রাচীন, পাকাপোক্ত মোটর সাইকেলে বসে আছেন রমারঞ্জন। তিনি একজন পাকা মোটর সাইক্লিস্ট, বয়েস বাড়বার আগে মাথার চুলগুলো পেকে ধবধবে হয়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে, বিবাহ-বিচ্ছেদ জনিত খোরপোষের মামলায় আংশিক জয়লাভ করে, গভীর উত্তেজনা সহকারে বর্তমান বান্ধবী শ্রীমতী জয়প্রভাকে তাঁর রবীন্দ্র সরণির পোদ্দার কোর্টের অফিসে রমারঞ্জন খবরটা দিতে যাচ্ছিলেন।

পথে আটকিয়ে গেলেন। এ রকম আটকিয়ে যাওয়া রমারঞ্জনবাবুর এই প্রথম নয়। তাঁর প্রথম যৌবনের এবং মধ্য যৌবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে মোটর সাইকেলের সিটের ওপর বসে। আজও তিনি ধৈর্য ধরে সিটের ওপরে স্থির হয়ে বসেছিলেন যতক্ষণ না মিছিলটা পার হয়ে যায়।

সব প্রতীক্ষারই অবসান আছে। মিছিলও এক সময় এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গাড়িগুলো অস্থির হয়ে উঠল। ড্রাইভাররা এক সঙ্গে সমবেত ভাবে অধৈর্য হয়ে উচ্চনিনাদে তাদের গাড়িতে হর্ন বাজাতে লাগল।

কিন্তু চৌরাস্তার দু'দিকের, মানে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের পথ তো একসঙ্গে খুলে দেওয়া যায় না। রমারঞ্জনের দুর্ভাগ্য, ট্রাফিক পুলিশ তাদের দিকটা আগে না ছেড়ে পার্ক স্ট্রিট মেয়ো রোডের ট্রাফিক আগে ছেড়ে দিল।

এই অবিচারে এদিকের দুই পাশের গাড়িগুলো উদ্দাম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। শুধু গাড়ির হর্ন বাজানো নয় তারা চেঁচামেচি, গালাগাল শুরু করে দিল। বলা বাহুল্য সবই পথে কর্তব্যরত ট্রাফিকের পুলিশ এবং হোমগার্ডের বিরুদ্ধে।

তালপাকা গরমে এতক্ষণ তীব্র রোদে রাস্তায় আটকিয়ে থেকে চালকদের মাথা গরম হয়ে গেছে। অন্য দিকে রাস্তায় ঘামতে ঘামতে, রোদে পুড়তে পুড়তে ডিউটিতে ব্যস্ত পুলিশদেরও মাথা গরমে গনগন করে জ্বলছে।

এই সময়ে কী একটা খারাপ গালাগাল শুনে আর সহ্য করতে না পেরে ঠিক সামনের ট্রাফিক সেপাই এসে রমারঞ্জনকে ধরল।

রমারঞ্জন কিন্তু গালাগাল দেননি, অত নিম্নমানের, নিচু রুচির মানুষ তিনি নন। কিন্তু কেন যেন সেই ভোজপুরি সেপাইয়ের সন্দেহ হল যে সমস্ত খিস্তির উৎস হলেন রমারঞ্জন।

ইতিমধ্যে রমারঞ্জনের একটা গাফিলতিও সেপাই পেয়ে গেছে। রমারঞ্জনের মাথায় হেলমেট নেই। মোটর সাইকেল আরোহীদের শক্ত, গোল টুপি মাথায় দেওয়া আবশ্যিক, অন্যথায় এটি একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

সুতরাং সেপাই এসে রমারঞ্জনকে ধরল, লোকটাকে এই অজুহাতে শিক্ষা দেওয়া যাক।

কিন্তু হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরনোর মতো বোকা রমারঞ্জন মোটেই নন। এই গরমে মাথার হেলমেট রোদে তেতে গেছে। তাই তিনি সেটা খুলে দুই হাঁটুর মধ্যে রেখেছেন।

সেপাই এসে রমারঞ্জনকে ধরল; 'আপনার মাথায় কিছু নেই কেন?' তাঁর শূন্য মস্তকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল সে।

রমারঞ্জন নির্বিকার ভাবে কোমরের সামনে রাখা হেলমেটটা দেখালেন।

না, তা চলবে না। আইনে বলা আছে মাথায় হেলমেট রাখতে হবে।

রমারঞ্জন বললেন, 'আধঘণ্টা আটকিয়ে আছি। গাড়ি চালানোর সময় মাথায় টুপি পরে নেব।'

সেপাই বলল, 'তা হবে না। আইন ভঙ্গ হয়েছে, জরিমানা দিতে হবে।'

রমারঞ্জন চুপ করে রইলেন।

এবার ট্রাফিক পুলিশের মোক্ষম অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ হল, 'দেখি আপনার লাইসেন্স।'

রমারঞ্জন লাইসেন্স দেখালেন না। বরং উলটে আইন রক্ষককে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মাথায় কী আছে?'

সেপাইটি আরও রেগে গেল।

রমারঞ্জন বললেন, 'আপনার মাথায় কিছু নেই। একদম ফাঁকা।'

অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে রমারঞ্জন এই কথা বলায় সেপাইটি নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'এই তো টুপি রয়েছে।'

'না কিছু নেই। একদম ফাঁকা।' এই বলে রমারঞ্জন মোটর সাইকেলটা হুশ করে ছেড়ে দিলেন। এদিকের ট্রাফিক এই মাত্র খুলে গেছে।

দুই শ্রাদ্ধের গল্প

সব ধর্মেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠান।

শ্রাদ্ধ শব্দটি এসেছে শ্রদ্ধা থেকে। যদিও লোকে কথায় কথায় অন্যের মুণ্ডপাত করে, শ্রাদ্ধ করে, শ্রাদ্ধ একটা প্রাচীন ও পবিত্র সামাজিক অনুষ্ঠান। হেলাফেলায় ইয়ারকি-ঠাট্টার বিষয় নয়।

আমরাও অন্তত এবার রঙ্গতামাশায় যাব না। দুটি শিক্ষামূলক গল্প বলব।

প্রথম গল্পটি বহুকালের পুরনো, একদা স্বয়ং বিদ্যাসাগর, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র এই গল্পটি বলেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ঝুলিতে গ্রাম্য ধর্মকর্ম, পুরুত-পণ্ডিত অনেক উপাখ্যান ছিল, এই গল্পটি তার মধ্যে আমার মতে সরসতম।

সেই জন্যেই এই গল্পটির জন্যে আমার খুব দুর্বলতা। না হলে, একই গল্প দু'বার লিখি।

একদা পৌনঃপুনিক রসিকতার প্রসঙ্গে একটি প্রবাদের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমি ভাবছিলাম, যেমন একই নদীর জলে দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনই একই ঠোঁটে দু'বার চুমু খাওয়া যায় না, একই রসিকতা দু'বার করা যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় দ্বিতীয়বার একই গল্প বলার মতো দুঃসাহসী আমি নই। আমি নিজেও এর আগে কী ভাবে লিখেছিলাম, সে আমার মনে নেই। আমার সহস্রাধিক রম্য রচনার মধ্যে সেই বিশিষ্টি রচনাটি খুঁজে বার করতে পারব এমন ভরসাও আমার নেই।

সুতরাং সেই শ্রাদ্ধের গল্পটা এবার আমি নিজের মতো করে বলি।

গ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থ পরলোক গমন করেছেন। তিনি একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা ছিলেন। খুব ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ হচ্ছে ভদ্রলোকের। বহু দূর দূর থেকে আত্মীয়বান্ধব সব এসেছেন। উঠোনে বড় বড় গর্ত করে উনুন কাটা হয়েছে। ভিয়েন বসেছে। থরে থরে পাহাড় বানিয়ে তরিতরকারি ফেলা হয়েছে। লোকজনে বাড়ি গিজগিজ করছে।

শুধু শ্রাদ্ধের ভোজের আয়োজন নয়। শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারটাও খুব নিষ্ঠাভরে, আন্তরিকতা সহকারে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও হেঁজিপেঁজি সাধারণ গ্রাম্য পুরুত নয়, অনেক দূরে ভট্টপল্লি থেকে দিকপাল পুরোহিত আনা হয়েছে। প্রবীণ পুরোহিতেরা এইকম বড় কাজের সময়ে দু'-চারজন শিষ্য সঙ্গে করে আসেন। শিষ্যেরা সহকারীর কাজ করে, ওরই মধ্যে যারা একটু

লেখাপড়া জানে, একটু পাকাপোক্ত তারা এই রকম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুরুতগিরির যোগ্য হয়ে ওঠে।

এবার প্রবীণ পুরোহিত মহোদয়ের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে একটি বয়স্ক শিষ্যও এসেছেন। শিষ্যটির মনে খুব দুঃখ। তিনি অনেকদিন গুরুদেবের সঙ্গে আছেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁকে কাজেকর্মে কোথাও নিয়ে যান না। পুরুতগিরির তিনি কিছুই শিখতে পারছেন না।

একদিন গুরুদেবের কাছে মনের দুঃখ ব্যক্ত করায় গুরুদেব ঠিক করলেন এবার এই শিষ্যকে সঙ্গে নেবেন। কিন্তু সংগত কারণই তিনি শিষ্যকে বাদ রাখতেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির ওপর খুব আস্থা নেই গুরুদেবের।

যা হোক এবার গুরুদেব এই শিষ্যটিকে প্রধান সহকারী করেছেন, তাঁকে বলেছেন, 'আমি কখন কী করি, কীভাবে করি, ভালভাবে লক্ষ রাখবে। এই ভাবে দেখতে দেখতে পুজো-আর্চার কাজ শিখে যাবে।'

শিষ্য খুব মনোযোগ দিয়ে গুরুদেবের পাশে পাশে থেকে তাঁকে সব কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। কাজের বাড়ি হইচই হট্টগোল চলছে। উঠোনে সামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার নীচে গুরুদেব শ্রাদ্ধের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। প্রথমে যজ্ঞ করতে হবে। তার আগে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করতে বসেছেন।

এদিকে হয়েছে কী যেমন বড় বাড়ি, অনেক মানুষজন তেমনই এক গাদা কুকুর-বেড়াল রয়েছে। আজ বাড়িতে ভিড় দেখে সেগুলো একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। উঠোনের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গুরুদেবের আদেশে একজন শিষ্য একটা বাখারির লাঠি নিয়ে কুকুরগুলোকে তাড়িয়েছে। কিন্তু বেড়াল নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বেড়ালগুলো সহজে বাগ মানার নয়। একটা বেড়াল তো সামিয়ানার নীচে এসে পুরুতমশায়ের আসনের কোষাকুষি উলটিয়ে দিয়ে চলে গেল। অন্য একটা বেড়াল শিকার ধরার ভঙ্গিতে গুটিগুটি শালগ্রাম শিলার দিকে এগোচ্ছিল। গুরুদেব দুটো বেড়ালকেই ধরে ফেললেন। তারপর এক শিষ্যকে আদেশ দিলেন, সে দুটোকে উঠোনের এক কোণে একটি খুঁটিতে বাঁধতে বললেন। এদিক ওদিকে আরও কয়েকটা বেড়াল ছিল, সবগুলোকে ধরে মোটমাট, সাতটা বেড়াল খুঁটিতে বাঁধা হল।

গুরুদেবের প্রধান সহকারী তখন কলাপাতা কাটতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন উঠোনের এক পাশে সাতটা বেড়াল বাঁধা হয়েছে।

যা হোক, সেদিন শ্রাদ্ধকর্ম মোটামুটি ভালভাবেই মিটল। ফেরার পথে গুরুদেব প্রধান সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজকর্ম সব ভাল ভাবে বুঝে নিয়েছ তো?' শিষ্যটি বললেন, 'হ্যাঁ, সব বুঝে নিয়েছি।'

সাতদিনের মাথায় পুরুতমশায়ের আবার ডাক এল। একদিনে দুটো কাজ। এক গ্রামে অন্নপ্রাশন, অন্য গ্রামে শ্রাদ্ধ। দু'ক্ষেত্রেই তেমন ঘটা করে কিছু হচ্ছে না, যজমানদের অবস্থা তেমন ভাল নয়।

গুরুদেব প্রধান সহকারীকে নিয়ে ধর্মকর্মে বেরলেন। তিনি ঠিক করলেন নিজে আগে অন্নপ্রাশনের বাড়িতে যাবেন। সহকারী যাবে শ্রাদ্ধের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে উদ্যোগ, আয়োজন করবে। তিনি তাড়াতাড়ি অন্নপ্রাশন সেরে শ্রাদ্ধের বাড়িতে চলে যাবেন।

অন্নপ্রাশন সেরে গুরুদেব শ্রাদ্ধের বাড়িতে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখেন অব্যবস্থার চূড়ান্ত। সহকারীকে ধারে কাছে কোথাও দেখতে পেলেন না। এদিকে জোগাড়যন্ত্র প্রায় কিছুই হয়নি। উঠোনের একপাশে দেখলেন চারটে বেড়াল খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে।

এমন সময় প্রধান সহকারী, সেই শিষ্যটি বাড়ির পিছনের বাঁশবনের ভেতর থেকে এলেন। তাঁর দুই হাত রক্তাক্ত। গুরুদেব কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একী? বাঁশবনের মধ্যে কী করছিলে? তোমার হাতে রক্ত কীসের?'

রক্তাক্ত হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে শিষ্যটি বললেন, 'ভয়ংকর পাজি বেড়াল। কিছুতেই ধরতে পারলাম না। উলটে আঁচড়িয়ে ছালাফালা করে দিল।'

গুরুদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেড়াল ধরতে গিয়েছিলে কেন?'

শিষ্য বললেন, 'আগের শ্রাদ্ধে আপনিই তো সাতটা বেড়াল খুঁটিতে বাঁধলেন। কিন্তু এখানে সাতটা বেড়াল জোগাড় করা অসম্ভব। এ-বাড়ির দুটো পাশের বাড়ির দুটো চারটেকে বেঁধেছি। আর তিনটে ধরতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে গেলাম।'

অতঃপর এই বুদ্ধিদিগ্‌গজ সহকারীকে নিয়ে আর কখনও অন্য কোনও ক্রিয়াকর্মে গিয়েছিলেন কি না ওই গুরুদেব সে কথা বিদ্যাসাগর মশায় অবশ্য কিছু বলেননি।

এবার একটা আধুনিক শ্রাদ্ধের গল্প বলি। কলকাতা শহরের এক ধনাঢ্যব্যক্তি মারা গিয়েছেন। তাঁর উপযুক্ত ছেলে খুব ধূমধাম করে বাবার শ্রাদ্ধ করছে।

পারিবারিক গুরুদেব এসেছেন। এসব তাঁর খুব মওকার সময়। লম্বা লিস্ট ধরিয়েছেন যজমান পুত্রের হাতে। সেই তালিকায় ধান-দূর্বা থেকে, সোনা-হীরক, খাট-পালঙ্ক, ধুতি-ছাতা এমনকী পাদুকা-গামছা পর্যন্ত রয়েছে।

এদিকে গুরুঠাকুরেরা যেমন হয়ে থাকেন, ইনিও খুব লোভী ব্যক্তি। এ লোভ জিভের লোভ, জিনিসপত্রের পরেও খাদ্যদ্রব্যের লোভ। তিনি সাত্ত্বিক মানুষ, সত্যিসত্যিই মাছ-মাংস খান না, ডিম ছোঁন না। তাঁর লোভের বস্তু হল দই, রাবড়ি, কাঁচাগোল্লা ইত্যাদি মহার্ঘ জিনিস।

সুতরাং গুরুঠাকুর পরমানন্দে মনে মনে জিব চেটে যজমানপুত্রকে বললেন, 'তোমার বাবা, কর্তাঠাকুর, বড় সাত্ত্বিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা যা খেতে ভালবাসতেন, সে সবের একটা বন্দোবস্ত রাখবে। শ্রাদ্ধের দিন সায়াহ্নে কর্তাঠাকুরের আত্মার শান্তির জন্যে আমাকেই সেটা খেতে হবে।'

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর সেদিন সন্ধ্যায় গুরুদেব যজমানপুত্রের কাছে এলেন।

যজমানপুত্র বিনীতভাবে গুরুদেবকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে এক বোতল স্কচ হুইস্কি, একটা তন্দুরি চিকেন আর একটা প্লেট বিফ-স্টেক দিয়ে, তারপরে শুয়োরের মাংসের সেলামি আর সসেজ পরিবেশন করে বললেন, 'বাবা, এইসব বড় ভালবাসতেন। আপনি না খেলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না। আপনি না খেলে আমি আপনাকে ছাড়ছি না।'

দুই বাঘের গল্প

কেউ জানেন না।

জানার কথাও নয়। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে এক জোড়া বাঘ, চিতা বাঘ বা বনবেড়াল নয়, একেবারে আসল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার উধাও হয়েছিল, এই মাত্র মাস দেড়েক আগে।

চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার পাহারাদারের শৈথিল্য ও অনবধানতাবশত ব্যাপারটা ঘটেছিল। সে অনেক সময়েই খাঁচার দরজা ভেজিয়ে রাখত। তালা না দিয়ে। অবশ্য কোনওদিন কোনও বাঘ দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেনি, তারা বীরদর্পে নিজেদের খাঁচার মধ্যে পায়চারি

করেছে। ইচ্ছে হলে নিরীহ দর্শক সাধারণকে ভয় দেখানোর জন্যে, শিশুদের আমোদ দেওয়ার জন্যে হালুম হুলুম করেছে।

কিন্তু এই বাঘ দুটো ঠিক সে জাতের নয়। এরা দু'জনে এক খাঁচায় ছিল। এক সঙ্গে সাঁট করেছিল, চিড়িয়াখানা থেকে পালাতে হবে।

গল্পের সুবিধের জন্য আমাদের আলোচ্য বাঘ দুটির নাম বলে দেওয়া ভাল। দুটিই প্রায় একইরকম দেখতে। পুরুষ বাঘ। শুধু একজনের নাকের ওপরে একটা কাটা দাগ; শিশুকালে কুমিরে আঁচড়ে দিয়েছিল। এই বাঘটার নাম আচরণ। অন্য বাঘটার কোনও 'ভিজিবল ডিস্টিংগুইশিং মার্ক' নেই, সে দেখতে অন্যান্য আর দশটা বাঘের মতো। তার নাম বিলক্ষণ।

একদিন কেলেঙ্কারি হল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেও, দর্শকরা চিড়িয়াখানা থেকে চলে যাওয়ার পরেও বাঘের খাঁচার দরজায় তালা লাগানো হল না। খাঁচার পাহারাদারের সেটা খেয়ালই ছিল না, সে তখন চিড়িয়াখানার মাঠে একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে বসে 'বিনোদন বিচিত্রা' পত্রিকা পড়ছিল।

চিড়িয়াখানার বড় বড় প্রাগৈতিকহাসিক গাছপালার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসার পর বিলক্ষণ খুব সাবধানে তার ডান পায়ের থাবা দিয়ে খাঁচার দরজাটা ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে হাঁ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ খাঁচার ভিতরে বসে চারদিক লক্ষ করে তারপর একে একে বিলক্ষণ ও আচরণ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল।

বাঘ দুটোকে দেখে এবং তাদের গন্ধ পেয়ে হরিণেরা ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। পাখিরা চেঁচামেচি আরম্ভ করল। চিড়িয়াখানায় রাতের দিকে হঠাৎ হঠাৎ এ রকম ছুটোছুটি চেঁচামেচি হয়— ব্যাপারটা কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না।

আজকেও তাই হল। কেউ কিছু খেয়াল করল না। আচরণ আর বিলক্ষণ চুপিসারে দেওয়াল আর কাঁটা মনসার ঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। রাত গভীর হলে, যখন ওপাশের খিদিরপুরের খালধারে রাস্তায় গাড়িঘোড়া, মানুষজনের শব্দ একেবারে থেমে এল, বাঘ দু'জনে এক লাফে পাঁচিল পেরিয়ে চিড়িয়াখানার বাইরে চলে এল। সেখান থেকে আচরণ রওনা হল দক্ষিণমুখী, সরাসরি সুন্দরবনের দিকে। আর বিলক্ষণ রওনা হল উত্তরমুখী গড়ের মাঠের ময়দান ধরে, ওদিকে যদি কোনও জঙ্গল থাকে এই আশায়।

দেড়মাস পরে গতকালকেই আচরণ আর বিলক্ষণ ধরা পড়েছে। আজ তাদের আবার সেই পুরনো খাঁচায় পোরা হয়েছে।

এই দেড়মাস বিলক্ষণ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, তার গায়ে গত্তি লেগেছে। কিন্তু আচরণের অবস্থা অতি শোচনীয়। হাড় জিরজিরে চেহারা হয়েছে তার, সে খুব রুগ্ন, কথায় কথায় হাঁপাচ্ছে।

আচরণের অবস্থা দেখে বিলক্ষণ জিজ্ঞাসা করল, 'একী তোমার এ রকম হাল হল কী করে?'

আচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভাই, তুমি তো জানো সুন্দরবন যাব বলে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু পথের মধ্যে পড়লাম ঘোর বিপদে।'

বিলক্ষণ জিজ্ঞাসা করল, 'কী বিপদ?'

আচরণ বলল, 'আমি ভেবেছিলাম খরার মরশুম, খটখটে বোশেখ মাস। খাল-বিল-নালা লাফিয়ে লাফিয়ে একরাতে সুন্দরবনে চলে যাব। কিন্তু তোমার কি মনে আছে আমরা যেদিন পালালাম সেদিন রাতে কী ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি এল। তারপর এক নাগাড়ে অকাল বর্ষা, দিনের পর দিন।'

বিলক্ষণ বলল, 'ঝড় বাদলায় আমিও খুব বেকায়দায় পড়েছিলাম।'

আচরণ বলল, 'তোমার কথা পরে শুনব। আগে আমার কথা শেষ করি।'

বিলক্ষণ দেখল এই দেড় মাসে আচরণের প্রকৃতি একটু খিটখিটে হয়েছে, সে আর বাধা না দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। বলো।'

আচরণ আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে বলল, 'কী বিপদে যে পড়েছিলাম, বৃষ্টিতে নদীর বাঁধ ভেঙে গেল। গ্রামকে গ্রাম পথঘাট জলে ডুবে একাকার। একটা উঁচু ঢিবি মতন জায়গা দেখে সেখানে একটা তালগাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। হঠাৎ পরের দিন সকালে মানুষের চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি চারপাশ থেকে দলে দলে মানুষেরা মাথায় বোঁচকা নিয়ে জলে সাঁতরিয়ে সেই ঢিবির দিকে আসছে। আমি এক লাফে তালগাছের মাথায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে পাক্কা পনেরো দিন। এর মধ্যে প্রথম কয়েকদিন বাবুইয়ের বাসা থেকে দু'-চারটে করে ডিম খেয়েছি। তারপরে সেও ফুরিয়ে গেল। পনেরো দিনের মাথায় মাথা ঘুরে নীচে পড়ে গেলাম।'

বিলক্ষণ অবাক হয়ে বন্ধুর কথা শুনছিল, এবার বলল, 'তারপর।'

আচরণ বলল, 'তারপর আবার কী?' বোধহয় তালগাছ থেকে নীচে পড়ার পরে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, ঘুমপাড়ানি গুলি-টুলি মেরেছিল। এতদিন পরে দেখছি এই খাঁচার মধ্যে ফিরে এসেছি। সে যাক, এবার তোমার খবর বলো।'

বিলক্ষণ বলল, 'আমার খবর তো ভালই ছিল গত পরশু পর্যন্ত। খেয়ে-দেয়ে ভালই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজের দোষে মারা পড়লাম।

আচরণ বলল, 'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

বিলক্ষণ বলল, 'বলছি। সংক্ষেপ করে বলছি। সেই ঝড়ের রাতে চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে আমি তো উত্তর দিকে রওনা হলাম। তুমুল ঝড় বাদলে আটকে গেলাম ময়দানে। এদিকে ভোর হয়ে এল। তাড়াতাড়ি লাট সাহেবের বাড়ির মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করে তারপর লালদিঘি পেরিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে ঢুকে গেলাম। পুরনো বিশাল বাড়ি, পেল্লায় কাঠের সিঁড়ি। তারই একটার পিছনে লুকিয়ে রইলাম। সন্ধ্যাবেলায় যখন লোকজন কাজ করে ফিরে যাচ্ছে একেবারে শেষের লোকটাকে ধরে খেলাম। কেউ কিছু টের পেল না। এত হাজার হাজার লোক, কেউ কিছু টের পেল না। এইভাবে মাস দেড়েক ভালই চলছিল। নির্বিবাদে একটা একটা করে লোক খেয়ে যাচ্ছিলাম। ভুলটা করলাম পরশু দিন। ভুল করে যে লোকটা চা দেয় তাকে খেয়ে ফেলি। সকালবেলায় বাবুরা এসে চা খান। যখন চায়ের লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁরা খেপে গেলেন। খোঁজ শুরু হয়ে গেল। সিঁড়ির পিছন থেকে আমাকে ধরে ফেলল। তারপর চালান হয়ে আবার এখানে ফিরে এলাম।'

বিলক্ষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আচরণ বলল, 'সত্যি, বড় দুঃখের কথা।'

ঢাকাই রসিকতা

কলকাতা থেকে যেমন কলকাতিয়া কিংবা কলকাত্তাই, ঢাকা থেকে তেমন ঢাকাই। ঢাকাই মানে ঢাকার, অভিধান বলছে ঢাকা সম্পর্কিত। কিন্তু মানেটা আরও একটু বেশি। ঢাকাই বিশেষণপদটি সম্ভ্রমবহ।

দুয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আগে কলকাতা দিয়ে শুরু করি। কলকাতিয়া কথা, কলকাত্তাই বোলচাল। বিশেষণ দুটোয় কোথায় যেন একটা হেয়ভাব লুকোনো আছে।

'ঢাকাই' শব্দটিতে কিন্তু একটা উৎকর্ষের আভাস আছে। পরতে পরতে মুচমুচে ঢাকাই পরোটা। ঢাকাই শাড়ির কদরও কিছু কম নয়। তা ছাড়া আছে লেজফোলা ঢাকাই বিড়াল, পূর্ববঙ্গে সে বিড়াল কাবুলি বা শ্যামদেশীয় বিড়ালের মতোই বিখ্যাত। বোধহয় কাবুলি বিড়ালেরই বংশোদ্ভব এই বিড়ালকুল কোনও একসময়ে নবাবি আমলে ঢাকা বাসিন্দা হয়েছিল।

সে যা হোক, আমাদের বিষয় হল ঢাকাই রসিকতা। ভূমিকা হিসেবে বলতে পারি, অন্যান্য ঢাকাই দ্রব্যের মতোই ঢাকাই রসিকতাও অতি উচ্চমানের।

হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার বলে একটা কথা আছে না? সরাসরি উদাহরণে চলে যাই। তবে একটা কথা বলে রাখি, সাধারণত এসব রসিকতা ঢাকার স্থানীয় ভাষায় বলা হয়। তবে সে ভাষা খুবই জটিল এবং খোদ ঢাকা শহরেই সে রকম ভাষায় কথা বলা লোক এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া এইসব রসিকতার উৎস যে কুট্টি সমাজ তারাও সকলের অগোচরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নবাবি জমানায় কুট্টিরা ওই ঢাকাই বিড়ালের মতোই ঢাকায় বাস করতে শুরু করে। তাদের বিষয়ে অনেক রকম উলটোপালটা ইতিহাস আছে। শেষপর্যন্ত এদের পেশা হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি চালানো। ফলের বাজারে ব্যাপারি বা ফেরিওয়ালার কাজও করত। স্বভাবত সুরসিক প্রখর বুদ্ধিমান এই কুট্টিসমাজ পূর্ববঙ্গীয় গালগল্পে অমর হয়ে আছে।

এবার সহজবোধ্য করার জন্যে আমি আমার ভাষায় কুট্টিদের গল্প বলি।

বাজারে এক ভদ্রলোক আম কিনতে গেছেন। আমওয়ালা একজন কুট্টি। যে কোনও ফলওয়ালার মতোই সে পছন্দ করে না যে খদ্দের ফল নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি করুক বা টিপেটিপে পরীক্ষা করে দেখুক।

এই খদ্দের ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি কুট্টির বাধা সত্ত্বেও ফল টিপে টিপে দেখতে লাগলেন। তখন সেই কুট্টি চেঁচিয়ে অন্য আমওয়ালাদের বলতে লাগল, 'ওরে তোরা আয়। তোদের আমের কোনও রোগ-বালাই থাকলে এখানে নিয়ে আয়। বাজারে আমের ডাক্তার এসেছে। তাকে দিয়ে টিপিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে যা।'

এর চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক হল কুট্টি মাছওয়ালা।

মাছওয়ালা যে মাছগুলি নিয়ে বাজারে এসেছে সেগুলো বিশেষ তাজা নয়।

এক ভদ্রলোক মাছগুলো উলটেপালটে দেখে অবশেষে কুট্টিকে বললেন, 'মাছগুলো টাটকা নয় বলে মনে হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কুট্টির প্রতিবাদ, 'বলেন কী কর্তা? এই মাছ এখনই খালের জলে ছেড়ে দিলে সাঁতরিয়ে চলে যাবে।'

কিন্তু একথা খদ্দের বিশ্বাস করবেন কেন? তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন, 'মরা মাছ জলে সাঁতরাবে?'

কুট্টি বলল, 'কর্তা, আপনি ওই খালপারের টিনের বাড়িটায় থাকেন না?' কর্তা বললেন, 'তাতে কী হল?'

কুট্টি বলল, 'আপনি দাম দিয়ে এই মাছটার গায়ে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান। আমি জলে ছেড়ে দেব। দেখবেন ঠিকানা দেখে সাঁতরিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবে।'

সৈয়দ মুজতবা আলি, আমার দেবাদিদেব, মহাগুরু। ঢাকার লোক ছিলেন না। একথাটা বলছি এই কারণে যে পূর্ববঙ্গ বা অধুনাতন বাংলাদেশ কিংবা সেই কায়েদে আজমি পূর্ব-পাকিস্তান বলতে চিরকাল সবাই ভাবেন ঢাকা। ঢাকার নয় শ্রীহট্টের লোক হয়েও কিন্তু সৈয়দ সাহেব একটি স্মরণীয় ঢাকাই রসিকতার উল্লেখ করেছিলেন। রসিকতাটি রাজনৈতিক এবং মর্মান্তিক।

তখন সদ্য পাকিস্তান হয়েছে। দলে দলে হিন্দু ভদ্রলোকেরা ঢাকা ছাড়ছেন, ভারতে চলে আসার জন্যে। অনেক সহৃদয় মুসলমান ছিলেন, যাঁদের হিন্দুদের এই চলে যাওয়াটা ভাল লাগেনি।

স্টিমারঘাটে এক হিন্দু পরিবার কুট্টির ঘোড়ার গাড়িতে চলে এসেছে, মালপত্র নামাচ্ছে। এমন সময় পরিচিত এক মুসলমান ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। হিন্দু পরিবারের কর্তাকে বোঝাতে লাগলেন দেশত্যাগ না করার জন্যে। অনেক অনুরোধ করার পরে বললেন, 'দেখুন, এ দেশ শুধু মুসলমানদের নয়। পাকিস্তানের পতাকা দেখুন। তিনভাগ সবুজ, একভাগ সাদা। সবুজ হল মুসলমান, সাদা হল হিন্দু। আপনি দেশ ছাড়বেন কোন দুঃখে। আপনার জায়গাও তো এখানে রয়েছে।'

এমন সময় কুট্টি সেই হিন্দু পরিবারের কর্তাকে একটু আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল, 'কর্তা, বাঁচতে চান তো পালান। দেখছেন না, ফ্ল্যাগের ওই সাদা জায়গাটিতেই বাঁশটা দিয়েছে।'

পাঠক, একবার পাকিস্তানের পতাকা স্মরণ করুন। চাঁদতারা শোভিত তিনভাগ সবুজ, পাশে একভাগ সাদা— যার মধ্য দিয়ে বংশদণ্ড ঢুকিয়ে পতাকা ওড়ানো হয়। অতঃপর সেই কুট্টির ভবিষ্যৎ জ্ঞানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করুন।

ঢাকাই কুট্টির গল্পগুলির অধিকাংশই কোচম্যান কুট্টিকে নিয়ে। সব উল্লেখ করতে গেলে কাগজ কাবার হয়ে যাবে। আর সবই কি আমি জানি?

যা জানি তার থেকে দুটো গল্পের উল্লেখ করছি।

সে সময় ঢাকা শহরের তদানীন্তন মেয়র সাহেবের উদ্যোগে পশুক্লেশ নিবারণী আইনের খুব কড়াকড়ি। খাকি পোশাক, হাতে ছড়ি নিয়ে ইনস্পেক্টররা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। রাস্তায় কোনও গোরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি দেখলেই ইনস্পেক্টর সেটাকে দাঁড় করান, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভারবাহী জন্তুটাকে দেখেন; সেটা রুগণ কিনা, দুর্বল কিনা। সেটার কোনও অসুখ আছে কি না। কোনও গাফিলতি ধরা পড়লেই ফাইন, দু'টাকা, পাঁচ টাকা।

এক কুট্টি কোচম্যানের ঘোড়ার গাড়ি আটকিয়েছেন ইনস্পেক্টর। দেখা গেল ঘোড়াটার পিঠের দু'দিকে যেখানে ঘোড়া জুতবার কাঠের দণ্ড দুটো থাকে সেখানে ঘা হয়েছে। এ রকম ঘা কাঠে অনবরত পিঠ ঘষে যাওয়ায় সব ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার পিঠেই প্রায় থাকে।

এক্ষেত্রে কুট্টি ধরা পড়ে গেছে। তার ফাইন হয় আর কী? কিন্তু কুট্টিকে কায়দা করা অত সহজ নয়। সে বলল, 'ও পিঠের দু'দিকে ও দুটো মোটেই ঘা নয়। আমার এটা পক্ষীরাজ ঘোড়া। ডানাদুটো ছেঁটে দিয়েছি, তাই ডানার জায়গাটায় ঘায়ের মতো ওই দাগ দুটো হয়েছে।'

এরপরে কী হয়েছিল, এতকাল পরে আমরা আর বলতে পারব না। বরং এবার শেষ গল্পটা বলি।

এটি অবশ্য বহুপ্রচলিত, বহু বিখ্যাত গল্প। খদ্দের কুট্টিকে বলেছে, 'রমনা যেতে কত লাগবে'। কুট্টি অবিশ্বাস্য বেশি দর হেঁকে বলল, 'পাঁচ টাকা'।

খদ্দের ভদ্রলোক পুরনো যাত্রী, তিনি আসল ভাড়া ভালই জানেন, তিনি বললেন, 'আট আনা'। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেকালের পুরনো ঢাকায় এ রকম দামদর মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। লোকের হাতে ছিল অঢেল সময়, দামদর করা একটা আর্টের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, এখনও কলকাতার হকার্স কর্নারগুলিতে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। চিরকালই বেশ কিছু লোক দামদর না করে কেনাকাটা করা পছন্দ করে না।

সে যাক হোক, কুট্টির গল্পটা শেষ করি। পাঁচ টাকার বদলে যখন যাত্রী আট আনা বলল, কুট্টি হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'আস্তে বলেন স্যার, আমার ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

কুট্টির এই উক্তিটি ঢাকায় আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে।

ওয়ার্ক কালচার

১

কোনও অফিসের বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার অফিসে কতজন লোক কাজ করে?'

প্রশ্নটা সরল প্রকৃতির, নিতান্তই সংখ্যানৈতিক। বললেই চুকে যেত, 'আশি, একশো কী দেড়শো লোক কাজ করে।'

বড়কর্তা কিন্তু এমন সোজা উত্তর দেননি। সাধে কি আর তিনি বড়কর্তা। তিনি বলেছিলেন, 'তা প্রায় শতকরা পঞ্চাশজন কাজ করে।' মানে দাঁড়াল, তাঁর অফিসে যতজন লোক আছেন, তার অর্ধেক কাজ করেন আর বাকি অর্ধেক কোনও কাজ করেন না।

একথা জানার পরে কেউ হয়তো বলতে পারেন, 'এই বড়কর্তা অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি এমন অনেক অফিস আছে যেখানে শতকরা পঁচিশজন লোকও মানে এক-চতুর্থাংশ লোক কোনও কাজ করেন না।'

অবশ্য এরও ব্যতিক্রম আছে। এমন অনেক অফিস আছে যেখানে একজনও কোনও কাজ করেন না। কিন্তু সেটা তাঁদের দোষ তা বলা যাবে না, কার্যকারণবশত সেখানে কোনও কাজ নেই। কলকাতায় প্লেগের অফিসে তিরিশ বছর কোনও কাজ ছিল না। ম্যালেরিয়া অফিস বেকার ছিল প্রায় কুড়ি বছর। কিন্তু অফিস, পদ, মাস শেষের বেতনাদি সবই ছিল, এমনকী ভাল কাজের জন্য এইসব কাজহীন অফিসে প্রমোশনও হয়েছে।

হঠাৎ বহুকাল বাদে প্লেগভীতি এবং তারপরে ম্যালেরিয়া আতঙ্ক এসে এইসব অফিসে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। সবাই অবাক হয়ে জেনেছে, এইসব অফিস এতকাল ধরে দেশে ছিল। প্রশ্ন উঠেছে, এঁরা এইসব অফিসের কর্মচারীরা এতদিন কী করতেন।

অনেক জেলায় এখনও আছে কি না জানি না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাংকি অফিসার (Monkey Officer) কিংবা ওই জাতীয় নামের একটা পদ ছিল। পদের একজন রীতিমতো গাদাবন্দুকধারী অধিকারীও ছিলেন।

মাংকি অফিসার কোনও প্রতীকী পদার্থ নয়, সত্যিই বানরের অফিসার। না, বানরের দেখাশোনা, দেখভাল, পরিবার-পরিকল্পনা, পুনর্বাসন এসব এই অধিকারীর কাজ নয়, এই ব্যক্তি বানর সংহার অফিসার। শস্যখেতে বা জনপদে কোথাও অতিরিক্ত বানরের উৎপাত দেখা দিলে এঁর কাজ হল সেই বানরকে গুলি করে হত্যা করে বিনাশ করা। বলা বাহুল্য, কাজ করার সুযোগ এঁদের জীবনে কদাচিৎ আসে। আমি একবার এক বানর অধিকারীর দেখা পেয়েছিলাম, যাঁর গাদাবন্দুকের চওড়া নলে বোলতা বাসা বেঁধেছিল।

তাই বলে কি এই ভদ্রলোকের কোনও কাজ ছিল না। না, তা নয়। প্রত্যেক সপ্তাহে ওপরওয়ালা মারফত হেড অফিসে রিটার্ন পাঠাতে হত। আগের সপ্তাহ, আগের মাস পর্যন্ত কতগুলো বানর নিধন করা হয়েছে। এ সপ্তাহে বানরের অত্যাচারের খবর কতগুলো এসেছে। এ সপ্তাহে ঠিক কতগুলো বানর মারা গেছে কি না এবং সেক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এইরকম চতুর্দশপদী রিটার্ন।

স্বাভাবিক কারণেই ভদ্রলোক জিরো রিটার্ন পাঠাতেন, মানে সবই শূন্য, শূন্য। ভদ্রলোকের ওপরওয়ালারা চোখবুজে আরও পঞ্চাশটা সাপ্তাহিক রিটার্নের সঙ্গে সেটার নীচেও একটা সই করে দিতেন।

সেই রিটার্ন হেড অফিসে যেত। কোনওটার রিটার্ন পাঠাতে গাফিলতি হলে, কখনও কখনও মাস তিনেকের মাথায় রিমাইন্ডার আসত। কালেভদ্রে গুরুতর গাফিলতি হলে অর্থাৎ একাধিকবার রিটার্ন না গেলে হেড অফিসের বড় সাহেব ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে হুমকি দিতেন, 'ভবিষ্যতে এ ধরনের গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না।'

দুঃখের বিষয়, কেউ কখনও খতিয়ে দেখতেন না ব্যাপারটা কী, কীসেরই বা রিটার্ন? দায়সারা গড্ডালিকাপ্রবাহ চলছে তো চলছেই।

টাক্কাভি ঋণ নামে এক প্রাগৈতিহাসিক কৃষিঋণ ছিল, বহুকাল হল সে আপদ চুকেছে। কিন্তু দশ বছর আগেও একটা অফিসে দেখেছি, সেই ঋণদানের ও আদায়ের পৌনঃপুনিক অতি জটিল মাসিক রিটার্ন অফিস ছুটির পর বড়বাবুর সঙ্গে বসে কেরানিবাবু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই রিটার্ন মেলাচ্ছেন। মেলাচ্ছেন মানে বহু পুরনো বাতিল হিসেবের সঙ্গে সাম্প্রতিক একগাদা শূন্য যোগ দিয়ে একটা বেশ বড় গোল্লা।

এই উদাহরণগুলো এই জন্যে এসে গেল যে, আসলে কাজ করাটাই সব কথা নয়, কাজটা সঠিক কাজ কি না সেটাও কাউকে দেখতে হবে। ডিসেম্বর মাসে কেউ জীবিত থাকলে সে নভেম্বর বা অক্টোবরেও জীবিত ছিল এর প্রমাণ চাওয়ার সমস্যা শুধু পেনশন অফিসেরই নয়, সব অফিসেরই অল্পবিস্তর রয়েছে।

২

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থাক। এবার ওয়ার্ক কালচার বিষয়ক কয়েকটি উড়ো কাহিনী বলি।

এসব গল্প শুনে কেউ কেউ হয়তো বলবেন সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি কথাবার্তা। আমি তাঁদের জানাতে চাই, এসব গল্প আমি রচনা করিনি, আমি শুধু নতুন পরিবেশন করছি।

প্রথম গল্পটা সত্যিই খুব পুরনো। আমি নিজের নামে এটা একাধিকবার চালিয়েছি। এবারও তাই করি।

আগেরদিন রাত্রিতে গভীর ও দীর্ঘ আড্ডা দিয়ে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠেছি। সে অনেকদিন আগের কথা, প্রায় তিরিশ বছর হবে। আমি তখন কিনু গোয়ালার গলি কবিতার সেই দুখিসুখী নায়ক হরিপদর মতো সরকারি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি।

সেই সময়ে আমার এক অতি বিপজ্জনক ওপরওয়ালা ছিলেন। তাঁর মতো গোলমেলে লোক বিশ্বসংসারে বিরল।

সে যাক হোক, সেদিন বেশি বেলায় ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে অফিস যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু আগের রাত্রির অনিদ্রা এবং ক্লান্তির জন্যে খাওয়া-দাওয়ার পরে বিছানায় একটু শরীর এলিয়ে দিতেই চোখ বুজে এল এবং ক্রমশ ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বেলা প্রায় দুপুর। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে অফিস অভিমুখে রওনা হলাম। অফিসে পৌঁছে ঢোকার মুখে দেখি আমার সেই গোলমেলে ওপরওয়ালা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখোমুখি হতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী এত দেরি?'

আমি আর কী বলব, সত্যি কথাই বললাম, 'স্যার, বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঠিক অফিস আসার মুখে।'

এই কথা শুনে আমার সেই ওপরওলা যৎপরোনাস্তি অবাক হয়ে গেলেন, 'সে কী মশায়, আপনি বাড়িতেও ঘুমোন নাকি?'

ইঙ্গিতটি অবশ্যই স্পষ্ট। আমি অফিসেই যথেষ্ট ঘুমোই, আমার আবার বাড়িতে ঘুমোনোর প্রয়োজন কি?

এই কাহিনীর সূত্রে অন্য একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

সেও অনেকদিন আগের কথা। তখন আমি মহাকরণে একটি দপ্তরে উপসচিব। আমার এক সহকর্মী, তিনিও উপসচিব, আমার সঙ্গে একই ঘরে বসেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই জনৈক সহায়কের বিষয়ে গজগজ করতেন, আমার কাছে অনুযোগও করতেন।

ওই সহায়কটিকে আমিও হাড়েচাড়ে চিনতাম। অমন অকর্মণ্য, সময় অচেতন, মিথ্যাবাদী সরকারি কর্মচারী সহজলভ্য নয়। আমার ভাগ্য ভাল, সে আমার শাখায় কাজ করত না।

আমার সহকর্মীর ভাগ্যও ভাল। কারণ এর মধ্যেই জানা গেল, ওই কর্মচারীটি অন্যত্র কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাওয়ার আগে সহায়কটি যথারীতি তার অফিসার, মানে আমার উপসচিব বন্ধুটিকে একটা ভাল ক্যারেক্টর সার্টিফিকেটের জন্যে অনুরোধ জানাল। অগত্যা রাজি না হওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না।

কিন্তু কী সার্টিফিকেট তিনি দেবেন। কাজকর্ম, উপস্থিতি, আচারব্যবহার কোনওটাই জ্ঞানত, ধর্মত ভাল বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত অনেক কাটাকুটি করে মাত্র আড়াই পঙ্ক্তির একটা সার্টিফিকেট হয়েছিল, তার মধ্যে কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কথা নেই। তবে ভাল বলা হয়েছে, 'ভাল ঘুমোতে পারে'।

অবশেষে একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিই। সদা তৎপর হলেই ওয়ার্ক কালচার উন্নত করা যায় না।

এটা এক পোস্ট অফিসের ঘটনা। যেমন হয়, কাউন্টারে এক ভদ্রলোক কিছু বলেছেন। তার জবাবে কাউন্টারে কর্মরত কেরানিবাবু বললেন, 'না নেই। প্রায় মাসখানেক নেই।'

এই কথা তৎপর নতুন পোস্টমাস্টার মশায়ের কানে যেতে তিনি ছুটে সেই ভদ্রলোককে বললেন, 'না, নেই কেন? আপনি ওই নয় নম্বর কাউন্টারে যান, ওখানে পাবেন।'

মাস্টারমশাই ভেবেছিলেন বেশ কিছুদিন পোস্টকার্ডের অভাব যাচ্ছে, এই ভদ্রলোক বোধহয় পোস্টকার্ডের খোঁজ করছেন।

আসলে তিনি অন্য জায়গার লোক। পোস্টঅফিসে টিকিট কিনতে এসে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কি না। তারই জবাবে কেরানিবাবুটি জানান, না, চার সপ্তাহ নেই।

সুতরাং এবার যখন মাস্টারমশায়ের কাছে জানতে পারলেন, নয় নম্বর কাউন্টারে বৃষ্টি আছে, তিনি একটু অবাক হলে কারও কিছু করার নেই।

ইংরেজি সরস সাহিত্যের গুরুদেব, অবিস্মরণীয় জেরোম কে জেরোম তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'থ্রি মেন ইন এ বোট' বইতে লিখেছিলেন,

'আমি কাজ ভালবাসি। কাজ আমাকে আকর্ষণ করে। আমি কাজের কাছে বসে থাকি এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি ভালবাসি কাজটাকে নিজের কাছে ধরে রাখতে। কাজ ছাড়া হতে আমার হৃদয় ভেঙে যায়।'

রসিকতাটি খুবই উচ্চমানের এবং সে জন্যেই স্পষ্ট। কাজ করতে না চাওয়া লোকের পক্ষেই শুধু এ রকম যুক্তির অবতারণা করা সম্ভব। কাজ করি না কারণ কাজকে ভালবাসি আর তাই কাজ ধরে রাখি।

যে কোনও কাজ ফাঁকি দেওয়া লোক, তিনি যাই হোন না কেন, এ রকম একটি সরস যুক্তির আড়ালে অনায়াসেই আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু তা তিনি নেন না। সাধারণত কাজ পড়ে থাকার জন্যে যে কারণগুলি দেখানো হয়, তা হল,

(এক) স্ত্রীর শরীর খারাপ। স্ত্রী নাম্নী ভদ্রমহিলা এসব ব্যাপারে খুব কাজে আসেন। তিনি হয়তো জানেন না কী সব দুরারোগ্য অসুখে তিনি ভুগছেন, যার জন্যে তাঁর স্বামী অফিসের কাজ ঠিক সময়ে তুলতে পারছেন না।

(আজকাল অবশ্য অফিসের মহিলা কর্মীরা স্বামীর অসুখের সুবাদে একই পদ্ধতিতে কাজ এড়িয়ে যাচ্ছেন।)

(দুই) রাস্তায় যানবাহনের অভাব। সেইজন্য অফিস আসতে দেরি হয়ে যায়। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরতে হয়।

(এই যুক্তিটা অবশ্য আপাতগ্রাহ্য। কিন্তু তাঁকে যদি বলা হয়, আপনি সকাল-সকাল এলে এবং দেরি করে অফিস থেকে বেরলে ভিড় এড়াতে পারেন, তিনি যা যা বলতে পারেন সেটা অকল্পনীয়।)

(তিন) ছেলে বা মেয়ের পরীক্ষা চলছে। সুতরাং তাঁকে হলে ছেলেকে পৌঁছে দিয়ে অফিসে আসতে হয়। এসেই বেরিয়ে যান পরীক্ষার্থীর টিফিন দিতে। দ্বিতীয় বেলার পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর অফিসে এসে মিনিট পনেরো থেকে আবার পরীক্ষা কেন্দ্রে যাত্রা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছেলে বা মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে।

অবশ্য এসবের বিপরীতে আমি অন্য একটি গল্প জানি, সেটি খুবই মর্মান্তিক।

কোনও এক অফিসে এক দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি গত পনেরো বছর ধরে কাজ করছেন। কখনও অনিয়মিতভাবে অফিসে আসেননি। বিনা অনুমতিতে কামাই করেননি। ঠিকঠাক দশটার মধ্যে অফিসে এসেছেন। সারাদিন ঘাড় গুঁজে কাজ করেছেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটির পরে বাড়ি রওনা হয়েছেন।

একদিন সেই ভদ্রলোক বেলা সাড়ে বারোটায় এসে অফিসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু একী চেহারা তাঁর। মাথা ফাটা, কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা। চুল উসকোখুসকো। ছেঁড়া জামাকাপড় ধুলো মাখামাখি। হাত ছড়ে গিয়েছে। কোনওরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এসে অফিস পৌঁছালেন।

তাঁকে দেখে ওপরওয়ালা খেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, এত বেলায় সং সেজে কোথা থেকে এলেন?'

ভদ্রলোক কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমার কোনও দোষ নেই স্যার।'

ওপরওলা আবার খেঁচিয়ে উঠলেন, 'তা হলে আমার দোষ?'

ভদ্রলোক অনুনয় করে বললেন, 'স্যার, আমার কথাটা একবার শুনুন।'

অতঃপর ওপরওলা গম্ভীর হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে থেকে চোখটা

নামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার অফিসে আসার জন্যে দৌড়ে মিনিবাসে উঠতে গেছি এমন সময় পেছন থেকে একটা গাড়ি এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে ফুটপাথের ওপরে পড়ে গিয়েছিলাম, মাথাটা ফেটে গেল, কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলাম।'

ওপরওলা এতক্ষণে অস্থির হয়ে পড়েছেন, তিনি হুমকি দিলেন, 'কথা সংক্ষিপ্ত করুন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বলছি স্যার, আর একটু। রাস্তা থেকে লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে ব্যান্ডেজ করল, ইঞ্জেকশন দিল। বুঝতেই পারছেন স্যার।'

অবশেষে ওপরওলা বললেন, 'তাই বলে এত দেরি!'

৪

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। কী যেন একটা চাকরির জন্যে অফিসে একটি ইন্টারভিউ নিতে হচ্ছিল। খুব দুঃখজনক কাজ, যতজনের ইন্টারভিউ নেয়া হবে তার মধ্যে শতকরা দশজনও কাজ পাবে কি না বলা কঠিন। আবার যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে, তাদের অধিকাংশরই যোগ্যতা সন্দেহজনক।

এরই মধ্যে এক চাকরি প্রার্থীকে পেলাম যার আবেদনপত্রে দেখা গেল, সে লিখেছে এর আগে সে আরও তিন জায়গায় কাজ করেছে।

স্বভাবতই তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এই যে তিন জায়গায় তুমি এর আগে কাজ করেছ লিখেছ দরখাস্তে, তা সেসব জায়গা থেকে তোমাকে কোনও সার্টিফিকেট দেয়নি?'

উত্তরে চাকরি প্রার্থী জানান, 'হ্যাঁ, দিয়েছিল।'

তখন তাকে বলা হল, 'দেখি সার্টিফিকেটগুলো দাও তো।'

সে এবার জানাল, সার্টিফিকেটগুলো নেই, সে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

একথা শুনে আমরা যারা সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম সবাই অবাক হয়ে গেলাম। সে কী কথা!

এরপরে সে যা বলল সে খুবই মর্মান্তিক। তার বক্তব্য হল, সেই সার্টিফিকেটগুলোয় তার সম্পর্কে যা লেখা ছিল তা দেখলে তাকে আর কেউ চাকরি দিত না।

বলাবাহুল্য, আমাদের ওখানেও তার চাকরি হয়নি।

পরিহাসের কথা থাক। এবার একটু কঠিন বাস্তবে আশা যাক।

অফিসগুলোতে অনেকেই কাজ করে না। ঠিকমতো অফিসে আসে না। ধুমধাড়াক্কা ছুটি নেয়। দরকারি কাগজপত্র, নথি ফেলে রাখে। কাজ ফেলে আড্ডা দেয়। খেলার মাঠে, সিনেমায় যায়। প্রেম করে।

মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে দেখা যায়, লোকমুখে আলোচনাও শোনা যায়। অমুক অফিসে একজন ডিরেক্টর বা কমিশনার এসেছেন। নাম বজ্রপানি চক্রবর্তী কিংবা কৃতান্ত বাগ। তিনি এসেই অফিসে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছেন। সাংঘাতিক কড়াকড়ি শুরু করেছেন। সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে হবে, সিটে থাকতে হবে, টিফিনের সময় কোনও কারণেই আধঘণ্টার বেশি অফিসের বাইরে বা টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে না।

বেশ একটা কাজ-কাজ হইচই পড়ে যায়। কিছু পুরনো নথির ওঠানামা শুরু হয়। ধুলোময়লা, মাকড়শার জালের নীচ থেকে অনেক পুরনো কাগজ বেরিয়ে আসে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা কেমন যেন অল্পদিন পরেই থিতিয়ে যায়। আবার ঢিলেমি, কাজে ফাঁকি শুরু হয়। সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ বড় কর্তাও ইতিমধ্যে যথা নিয়মে বদলি হয়ে যান। আবার যে কে সেই। সেই ভূতাবস্থা।

আসলে কোনও একক অফিসে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু করা যায় না। দু'-চার দিন বিধি নিয়ম প্রয়োগ করে ভয় দেখিয়ে কিছুটা কাজ হয়তো হয়, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না।

কোথাও কোনও অফিসে ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। তার মধ্যে একটি অফিস যথাযথ চলবে এ রকম হতে পারে না।

ওয়ার্ক কালচার অনেক বড় ব্যাপার। যে কাজ করবে তার যদি কাজ করার মনোভাব না থাকে, সদিচ্ছা ও দায়িত্ববোধ না থাকে, তা হলে ভয় দেখিয়ে, জোর করে কাজ করানো কঠিন।

কলু তার ঘানির বলদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেয়, যাতে তার অসাক্ষাতে বলদ যদি ঘানিতে পাক না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘণ্টা বাজা থেমে যেতেই সে বুঝতে পারবে। এক পণ্ডিতমশায় এই দেখে কলুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু তোমার বলদ যদি ঘানিতে পাক না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা দুলিয়ে ঘণ্টা নাড়ে, তা হলে তুমি তো বুঝতে পারবে না যে সে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে।'

এ কথা শুনে কলু রেগে গিয়ে পণ্ডিতমশায়কে বলেছিল, 'আমার বলদের অত বুদ্ধি নেই। সে তো আর আপনার পাঠশালায় পড়েনি।'

ওয়ার্ক কালচারের সমস্যা যাদের নিয়ে তারা সবাই কিন্তু ওই পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালার ছাত্র।

আমি কবি হয়েছিলাম গায়ের জোরে

একান্ত কলমে এই বয়েসে আর কার কথা লিখব? এতকাল পরে তবে তার কথাই লিখি। আমার সই বাল্যসখী পদ্যরানির কথা।

শক্তি বলত পদ্য। পদ্যরানির ভালবাসা সে খুব পেয়েছিল। অত ভালবাসা তার সইল না।

আমরা, পদ্যরানির ছোটখাটো ভালবাসার লোকেরা সব সময়ে তাকে পদ্য ডাক-নামে ডাকতে সাহস পাই না, কেমন সংকোচ হয়, একটু ভয় ভয় করে। আমরা বলি কবিতা, শ্রীমতী কবিতা। আবার কখনও সম্ভ্রম করে শ্রীলা শ্রীযুক্তেশ্বরী বাক্যসুন্দরী ঠাকুরানি। কখনও বা পদ্যবেগম সাহেবা। সেই কতকাল হয়ে গেল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। এই সজ্ঞান মর জীবনের প্রায় সব সময়টাই তার সঙ্গে ওঠাবসা, চলাফেরা।

না। শোয়া হয়নি। অতটা সাহস হয়নি। একটু দূর থেকে পদ্যরানির চরণপদ্মের ভজনা করেছি। তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' নয়, পুণ্যশ্লোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'অজ-আম-ইট' নয়, সমতল ছায়াচ্ছন্ন মধ্যবঙ্গের এক গঞ্জ শহরের পাঠশালায় আমাদের শৈশব ছন্দের শুরু কর-কর, খর-খর দিয়ে। এবং সেখানেই শেষ নয় তারও পরে গর-গর, ঘর-ঘর।

এইভাবে বছর শেষে একদা রাত্রি শেষ হল। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ পাঠ শেষ। আমি ওয়ান থেকে টুতে উঠলাম। আমার বয়েস সাকুল্যে ছয়। পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, সেই আমার পদ্যরানির সঙ্গে প্রথম দেখা।

সুন্দর নির্মল প্রভাত কাল, কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটেছে। পদ্যরানির সঙ্গে সেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

আভাসে-ইঙ্গিতে আর দশজনেরই মতো তার ছোঁয়া পেয়েছিলাম ঘুমপাড়ানি ছড়ায়, যখন সে

ঘুমসুন্দরীর সঙ্গে দত্তপাড়া দিয়ে চলে যেত। তাকে আর পেয়েছিলাম রূপকথায়, দিদিমার মুখে, সাত ভাই চম্পা জাগো রে, পারুল বোনের সঙ্গে পদ্যরানিও ভাইদের ডাকত। কে জাগে, লালকমল জাগে, নীলকমল জাগে, লালকমল আর নীলকমল জাগে, রূপকথার সেই প্রাসাদে লালকমল আর নীলকমলের পাশাপাশি পদ্যরানিও জেগে থাকত।

আমার শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের বছরে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করলেন। সেই ছয়-সাত বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি শোকগাঁথা লিখেছিলাম, এখনও স্পষ্ট মনে আছে, সেই কবিতায় বাইশে শ্রাবণের সঙ্গে দুঃখের প্লাবনের মিল দেয়া ছিল। শহরগঞ্জের অনেক পত্র-পত্রিকায় অনেক মাস্টারমশায়, বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখনও এ ধরনের কবিতা লিখে থাকেন। সুতরাং পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পরে আজ আর সেই শিশুটিকে দোষ দেয়া উচিত হবে না।

অবশ্য এই আমার প্রথম পদ্যভজনা নয়। মহাকবিদের মতো যথারীতি সন্ধ্যাসংগীত দিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলাম, ভাবা যায়, বিশ্বাস করা যায় সেই অস্ফুট শৈশবে 'তাই-তাই-তাই, মামার বাড়ি যাই', নয়; এমনকী 'আমসত্ত্ব দুধেতে ফেলি' নয়। আমি লিখেছিলাম

এখন হয়েছে সন্ধ্যা
ফুটেছে রজনীগন্ধা
আর ফুটেছে সন্ধ্যামালতী

আমার শৈশব প্রতিভার কথা আরেকটু বলি। আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব আসেজন বসেজন অধ্যুষিত বিশাল দোমহলা বাড়িতে অগুন্তি পুষ্যি ছিল, তার মধ্যে অনেকগুলি ছিল কুকুর ও বেড়াল। এর মধ্যে সাদা বেড়ালদের সাহেবি নাম দেওয়া হত লিঙ্গ নির্বিচারে। শুধু সাহেবি নাম নয়, এই সব বেড়ালদের সাধ্য কবিনামে ভূষিত করা হত। বিভিন্ন বেড়ালের নাম ছিল শেকসপিয়ার, মিলটন, শেলি ইত্যাদি।

বেড়ালেরা অমর নয়। আমার বাল্যকালেই এরা একে একে পরলোক গমন করে। দুয়েকটি পালিয়েও যায়। ওই বয়সেই এই বেড়ালদের উদ্দেশ্য আমি একটি মর্মস্পর্শী পদ্যরচনা করেছিলাম:

'শেক্সপিয়ার বায়রন,
মিলটন, শেলি (ওরে) তোরা সব কোথায় চলে গেলি।'

বলা বাহুল্য, আমার শৈশবের এই কাব্যসাধনা বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র অনেক কিছু লিখেছি। সুতরাং বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক।

পদ্যদেবীর যতই ভজনা করে থাকি কবি হওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আমি কবি হয়েছিলাম গায়ের জোরে। রীতিমতো ধস্তাধস্তি করে।

আধুনিক কবিতার কায়দা-টেকনিক কিছুই জানতাম না। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে মফস্বল থেকে এই শহর কলকাতায় এসে মাথায় ভূত চাপল কবিতা ছাপাতে হবে। দু'হাতে কবিতা লিখতে লাগলাম।

নিজের কবিতা পড়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। সে কী কবিতা লেখার ধুম। রাতদিন বুকে বালিশ চাপা দিয়ে কাব্যরচনা করে যাচ্ছি, সম্বল অকূল উচ্ছ্বাস আর বিপুল আবেগ।

খবরের কাগজের স্টলে যে পত্রিকা দেখছি, উলটে পালটে সেই পত্রিকার ঠিকানা দেখে মনে মনে মুখস্থ করে ফেলছি। বাসায় ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করে খামে ঠিকানা লিখে দেদার কবিতা পাঠাচ্ছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কখনও নিজে হাতে দিয়ে আসছি, কখনও ডাকে পাঠাচ্ছি।

কোনও বাছ-বিচার নেই। রামকৃষ্ণ মঠের উদ্বোধন থেকে সে যুগের রসালো সিনেমা পত্রিকা সুধাংশু বক্সির রূপাঞ্জলি কিংবা প্রবেশিকা। কিছুই বাদ যায়নি।

সবই পণ্ডশ্রম ছিল। একটি অক্ষরও কোথাও ছাপার অক্ষরে বেরয়নি। মনে আছে, প্রথম যখন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হল তিনি তখন 'দেশ' পত্রিকার কবিতা বাছাই করেন। নীরেন্দ্রনাথ আমার নাম শুনে বলেছিলেন, 'আপনার নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে।' আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'সেটা অস্বাভাবিক নয়। গত ছয় মাসে আমার অন্তত একশোটা কবিতা আপনি অমনোনীত করেছেন।'

তখন আমি থাকি কালীঘাটে। সন্ধ্যার দিকে মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমার পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি আর কালো হাতকাটা গেঞ্জি। হঠাৎ সুমার্জিত ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত সুবেশ এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে এক বন্ধু বললেন, 'মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।' মানে পরিচয় পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক কবি মঙ্গলাচরণ।

আমি মঙ্গলাচরণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে দেখে একটু ভ্রূ-কুঞ্চন করলেন। ওই পোশাক, তার ওপরে মারকুটে চেহারা— আমাকে দেখে তিনি বোধহয় উঠতি গুণ্ডা ভেবেছিলেন।

আমি তাঁকে দেখে বলেছিলাম, 'আমার একটা কবিতা সামনের সংখ্যা পরিচয়ে ছাপা হবে।' মঙ্গলাচরণ একটু চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বাভাবিক প্রশ্ন, 'কী নাম যেন আপনার?' আমি বলেছিলাম, 'কবি তারাপদ রায়।'

সামান্য ভেবে নিয়ে মঙ্গলাচরণ তখন বলেছিলেন। 'কই আপনার কোনও কবিতা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

আমি বলেছিলাম, 'একটু দাঁড়ান, বাসা থেকে ভাল দেখে একটা কবিতা এনে দিচ্ছি।' মঙ্গলাচরণ অবশ্য আর দাঁড়াননি, তবে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার সময়ে পিছন ফিরে ঘুরে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

পদ্যসুন্দরী বারংবার আমার দিকে তাকিয়ে আমার আচার-আচরণ দেখে মুচকি মুচকি হেসেছেন। আমার অক্ষম কলমে সেই মুচকি হাসি আমি যথাসাধ্য ছড়িয়ে দিয়েছি আমার সারা জীবনের রচনায়। তাঁকে নিয়ে আমি অনেক রঙ্গতামাশা করেছি। যখন যেমন পেরেছি তেমনভাবে তাঁর আহ্বান করেছি। এই সূত্রে এই একান্ত কলমের ইতি টানছি আমার একটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি দিয়ে,

কয়েকটি শব্দের পায়ের শব্দ
ক্রমশ এগিয়ে আসছে
বুঝতে পারছি, পদ্যবেগম আসছেন।
সালাম, বেগম সাহেবা, সালাম।

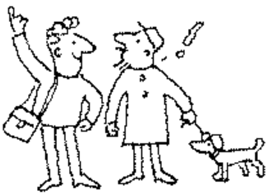

যাহা পাই, তাহা চাই না

সৈকত আর মধুময় একসঙ্গে একই স্কুলে পড়াশুনা করত। দু'জনের মধ্যে যেমন ভাব ছিল, তেমন ঝগড়াঝাঁটিও ছিল। তবে উঁচু ক্লাসে উঠতে দেখা গেল সৈকত মধুময়ের চেয়ে অনেক ভাল ছাত্র। সৈকত তরতর করে উঁচু ক্লাসে উঠে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে স্কুল পেরিয়ে গেল। মধুময় কিন্তু সেই স্কুলের গণ্ডিতেই আটকিয়ে রইল।

তদবধি মধুময়ের বাড়ির লোকেরা বিশেষ করে মধুময়ের বাবা শ্যামময় সৈকতকে দুই চোখে দেখতে পারেন না। তাঁর স্থির ধারণা সৈকত মধুময়ের চেয়ে অনেক মাঠো, সে কোনও চালাকি করে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে।

এদিকে সৈকত কিন্তু অত্যন্ত ভালভাবে বি এ, এম এ পাশ করে গেল। মধুময় বহু কষ্টে তৃতীয় কি চতুর্থ বারে মাধ্যমিক তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করে আর পড়াশুনো করলে না। করার কথাও নয়। আর কী পড়াশোনা করবে, সে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল।

সৈকত চাকরির চেষ্টা করছে দুয়েকটা পরীক্ষা-টরিক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদি দিয়ে সে একটা চাকরি পেয়েও গেল।

একথা মধুময়দের বাসায় পৌঁছতে শ্যামময় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, বললেন, 'এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। ওই গাধা ছেলে সৈকত ও আবার কী চাকরি পাবে?' তারপর একটু চুপ করে থেকে গজরাতে গজরাতে বললেন, 'দেখিস, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-ফেটার আসবে না।'

সত্যিই কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কুরিয়রের পিয়ন এসে নিয়োগপত্র দিয়ে গেল। সে খবর শ্যামময়ের কাছে পৌঁছতে তিনি বললেন, 'ওসব ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। ওটা নিয়ে বোকা চাকরিতে জয়েন করতে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবে।'

বলাবাহুল্য, সে রকম কিছু কিন্তু হল না। সৈকত চাকরিতে যোগদান করে বহাল তবিয়তে বাস করতে লাগল। এমনকী একদিন মধুময় নিজেও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তার অফিসে গিয়ে কাজের জায়গা দেখে এল।

এ খবর মধুময় এসে তার বাপকে বলতে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তারপর শ্যামময় ভবিষ্যৎবাণী করলেন, 'ওসব বিনি মাইনের কাজ, দেখিস মাইনে-টাইনে পাবে না।'

পরের মাসের পয়লা তারিখে কিন্তু সৈকত অফিসের অন্যদের মতোই মাইনে পেল। মাইনে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা যখন সৈকত বাসায় এল তখন তাদের বাসায় মধুময়ও রয়েছে। মধুময় সরল প্রকৃতির লোক, তাকে আগের দিন সৈকত বলেছিল, কাল সন্ধেবেলা আসিস। কাল মাইনে পাব, দু'জনে মিলে সন্ধ্যাবেলা আমিনিয়ায় গিয়ে পরটা আর মটন রেজালা খাব।'

সন্ধ্যার বেশ পরে পুরনো সুহৃদের পয়সায় মটন রেজালা খেয়ে খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে মধুময় বাড়ি ফিরল। শ্যামময় তখন বাইরের ঘরে বসে রয়েছেন। বাপকে দেখে মধুময় বলল, 'সৈকত কিন্তু আজ মাইনে পেয়েছে।'

শ্যামময় দাঁত খিচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জানলে কী করে?'

আমিনিয়ায় খাওয়ার কথা না বলে মধুময় বলল, 'আমি দেখেছি। ও যখন বাড়ি ফিরে মাইনের

টাকা ওর মাকে দেয় আমি সেখানে ছিলাম। দেখলাম অনেকগুলো টাকা, তার মধ্যে অন্তত চার-পাঁচটা পাঁচশো টাকার নোট।'

'পাঁচশো টাকার নোট?' শ্যামময় এবার যেন আশ্বস্ত হলেন, 'ওসব জালি, দু'নম্বরি নোট। কাগজে দেখিসনি, পাঁচশো টাকার নোট সব জাল। ওসব নোট ভাঙাতে গেলেই তোমার বোকা বন্ধুটি পুলিশের হাতে পড়বে। জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে, তা কম করেও অন্তত পাঁচ বছর।'

পাঠক, শ্যামময়বাবুকে আপনি ভালই চেনেন। তিনি আপনার পাশের বাড়িতে থাকেন। হয়তো আপনার অফিসেই কাজ করেন। কখন কখন আয়নার মধ্যেও তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তখন অবশ্য চিনতে পারেন না।

অতঃপর এই নিবন্ধের দীর্ঘ নামকরণটি একটু খেয়াল করুন।

'শুনেছি সোনার গাঁ, গিয়ে দেখি শুধুই মাটি', এই অমূল্য পঙ্‌ক্তিটি আমার রচনা নয়, এটি ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি প্রাচীন প্রবাদ।

সোনার গাঁ ছিল দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ঈশা খাঁর রাজধানী, পরবর্তীকালের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত। এই নামে অবশ্য আধুনিক ঢাকা শহরে একটি পাঁচতারার হোটেল হয়েছে।

সে যা হোক, আমাদের এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার। সোনার গ্রাম শুনে এসেছিলাম, এসে দেখছি সোনা নয় মাটি।

বাঙালির চিরকালীন খুঁত ধরা স্বভাবের সঙ্গে এই প্রবচনটি চমৎকার মানিয়ে গেছে।

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে বিশ্বকাপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে এই প্রবচনটি মনে পড়ল। তবে সেই ছোটবেলায় শুনেছিলাম এখনও দেখছি ভুলিনি।

ইডেন উদ্যানে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমরা কী কী আশা করেছিলাম?

(এক) সর্বাপেক্ষা প্রচারধন্যা খ্যাতনাম্নী বঙ্গ দুহিতা শ্রীমতী সুস্মিতা সেন আকাশ থেকে স্বর্গের অপ্সরার মতো আসরে নেমে আসবে হেলিকপ্টারের দড়ির মই বেয়ে।

অতি অবাস্তব বাসনা। সুস্মিতা সেন কেন মুম্বাইয়ের কোনও এক নম্বর মহিলা ডামিও একাজ করতে সাহস পাবে না।

তা ছাড়া অঘটন যদি কিছু ঘটত? সুস্মিতা যদি পড়ে যেতেন। তাঁকে চিকিৎসা করা হত। প্রাণে বেঁচে থাকলে খঞ্জ ও পঙ্গু, থ্যাঁতা ঠোঁট, ফাটা নাক বিশ্বসুন্দরীকে নিয়ে বিশাল ঝামেলা ছিল। সুস্মিতা সেন যে সাহস করেননি তার কারণ তিনি বুদ্ধিমতী।

(দুই) অ্যালিসা চিনয় চারদিকে ঘুরে ঘুরে গাইবেন 'মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া'।

না। তিনি আসেননি। সম্ভবত তাঁর আসার কথা ছিল না। তবে ঘুরে ফিরে অ্যালিসা চিনয়ের 'মেড ইন ইন্ডিয়া' বেজেছে, যে গান রাস্তার মোড়ে পুজো মণ্ডপে, পানের দোকানে গত মরশুমে বেজে বেজে আমাদের কানের পোকা বার করে দিয়েছে।

(তৃতীয়) আনন্দ শঙ্করের আত্মত্যাগ। উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্করের ছেলে, রবিশঙ্করের ভাইপো এমনকী শ্রীমতী মমতাশঙ্করের দাদা যার রক্তে শোম্যানশিপ রয়েছে, সে এমনভাবে নিজেকে জবাই হতে দিল।

এবং শুধু নিজে একা নয়, সস্ত্রীক।

(চার) সৈয়দ জাফরির অতুল কীর্তি। এ সম্পর্কে এই নিবন্ধের শেষে কিছু বলেছি। এখানে সংক্ষেপে বলি, যে ভদ্রলোক অ্যামনেশিয়ায় ভুগছেন, যিনি পানপরাগ নামক সুপুরি মশলার বিজ্ঞাপনে মুখোজ্জ্বল করে দেখা দেন, যাঁর নত্ব-ষত্ব জ্ঞান নেই, তিনি কেন এখানে।

এ কাজ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনেক ভাল করতে পারতেন। অন্যথায় অপর্ণা সেন। সেটা এই শহরের পক্ষে অনেক বেশি মানানসই, সম্মানজনক হত। এ রকম কেলেঙ্কারিও হত না।

(পাঁচ) চন্দননগর বনাম ইতালি।

এর মধ্যেই ভুলে গেলাম। কী নাম যেন সেই রোম্যানের। ' লুঠে-নে-দাদা' কিংবা এইরকম, বিলিতি নাম আবার আমার মনে থাকে না।

ডালমিয়া সাহেব দেশে বা বিদেশে ইংরেজি ইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন। বাংলা ইস্কুলে লেখাপড়া করলে তাঁকে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি পড়তে হত, যার আরম্ভই হয়েছিল।

'বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস'... দিয়ে।

বাংলা ইস্কুলে পড়লে সবসময়ে যে ক্ষতি হয় তা নয়। অন্তত এ ক্ষেত্রে ডালমিয়া সাহেবের উপকার হত, তাঁর জানা থাকত মাঘ মাসে শীতের বাতাস বয়।

'ফ্রান্সের বাজি'র অবশ্য নিন্দা করা যাচ্ছে না। তবে দু'জনে বলাবলি করছে হাওড়া বালির বুড়িমার বাজির কারখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগের দুই সপ্তাহ নাকি ওভারটাইম কাজ করেছে।

আর নিন্দা-মন্দ বাড়িয়ে লাভ নেই। থাকলে সেই সোনার গাঁয়ের ব্যাপার।

প্রত্যাশা ছিল সোনার, এসে দেখলাম মাটি। একেবারে প্রকৃত অর্থে মাটি, অনুষ্ঠানটাই মাটি করে গেল।

তবে এ রকম ঘটনা কিন্তু এই প্রথম নয়। কলকাতায় এ জাতীয় কেলেঙ্কারি আগেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এবং আমরা প্রত্যেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করব কোথায় কী ত্রুটি, কার কতটুকু দোষ। আমাদের মনে হবে আগেকার দিনে এ রকম কিছু হত না।

তখন সবই ঠিকঠাক হত। যা দোষত্রুটি সবই এখনকার সময়ের। এই সূত্রে গল্পটা বলি।

সেদিন এক পার্কের বেঞ্চিতে বসে দুই পরস্পর পরিচিত বৃদ্ধের মধ্যে কথাবার্তা শুনছিলাম।

প্রথম বৃদ্ধ দ্বিতীয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খগেনদা, আপনি নরকে বিশ্বাস করেন?'

খগেন নামধারী সেই দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন, 'দ্যাখো নগেন, বয়েস বেড়েছে, বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে ওই নরক-ফরক বুজরুকিতে বিশ্বাস করতে বোলো না।'

নগেন বললেন, 'তা হলে আমাদের অল্প বয়েসে যেসব ভাল জিনিস ছিল, সেসব গেল কোথায়?'

খগেনবাবু একথা শুনে বললেন, 'খগেন মনে হচ্ছে তোমার কথাটা খুব ফেলনা নয়। সবই তো দেখছি জাহান্নামে গেছে। জাহান্নাম না থাকলে গেল কী করে।'

এর পরে দুই বুড়ো বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুর নিন্দায় মুখর হলেন। তার মধ্যে ইডেনের অনুষ্ঠান যেমন আছে, তেমনিই হাওলার মামলা।

সব সময়ে যে আমরা সবকিছুর নিন্দায় মুখর হই, তা কিন্তু নয়। নিঃশব্দ নিন্দাও আছে, সে খুবই উচ্চবর্ণের আর্ট।

আমার এক খুল্লমাতামহের কাহিনী মনে আছে। তিনি একটি বিলিতি সওদাগরি অফিসে কাজ করতেন, সেই অফিসের কাজ শুরু হত সকাল নটায়। তিনিই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আগে খেয়ে অফিসে বেরতেন। নিঃশব্দে খেয়ে যেতেন, কোনওদিন রান্না-বান্না নিয়ে কাউকে কিছু বলতেন না।

একদিন তিনি খেয়ে অফিস চলে গেছেন। তারপর অন্যেরা খেতে বসেছে। তরকারি দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়ে একজন বলল, 'কাকিমা, তরকারিতে নুন দাওনি?'

কাকিমা মানে আমার খুল্লমাতামহী অন্য একজন ভোজনকারীকে দিয়ে যাচাই করে নিলেন এবং তারপর নিশ্চিত হলেন যে সত্যিই ব্যঞ্জনে নুন দেওয়া হয়নি। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'শয়তান।'

এই স্বগতোক্তিটি তাঁর স্বামীর সম্পর্কে, যিনি একটু আগে নিঃশব্দে ওই নুন ছাড়া তরকারি অম্লানমুখে খেয়ে গেছেন এবং একবারও নুন না হওয়ার ব্যাপারটা জানান দেননি।

এ ধরনের নীরব সমালোচনা করার যোগ্য প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। আমাদের সকলের সেটা নেই বলেই আমরা চেঁচামেচি করে গলা ফাটাই, তিক্ত সমালোচনা করি।

নীরব সমালোচনার পরে নিরপেক্ষ সমালোচনা। এ ব্যাপারটা আরও বেশি গোলমেলে।

সম্প্রতি আমার বাড়িতে আমার এক বহু দিনের পুরনো বন্ধু এসেছিলেন। তাঁর মতো বিশ্বনিন্দুকে আমার এই ষাট বছর বয়সের জীবনে দ্বিতীয়টি আর দেখলাম না। এবার তিনি অনেকদিন পরে এসেছেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর জিবের ধার, তাঁর চিন্তার বক্রতা এখন একটু কমেনি।

বলাবাহুল্য তিনি এবার এসেই ওই বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে পড়লেন, 'সৈয়দ জাফরি একটা অগা।'

বন্ধুকে উসকিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি বললাম, 'এই সৈয়দ জাফরি লোকটা কে?'

বন্ধুটি এবার কামান দাগবার সুযোগ পেলেন, বললেন, 'তাও জানিস না, খুব বড় ফুটবলার ছিল। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক টিমের হয়ে লন্ডন অলিম্পিকে কানাডার বিরুদ্ধে গোল করেছিল।'

আর নয়, এবার থামাতে হয়। বাধ্য হয়ে আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি শুনেছিলাম সৈয়দ জাফরি হলিউডের ফিল্মস্টার।'

বন্ধু এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি গভর্নর হতে পারেন, ফিল্মস্টার ফুটবলার হতে পারে না?'

বাজে তর্ক করে লাভ নেই। আমি বন্ধুকে বোঝালাম এ বয়েসে আর অত উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। বরং আমরা ঠান্ডা মাথায়, নিরপেক্ষভাবে যদি সব বিচার করি।

বন্ধু বললেন, 'নিরপেক্ষ? কিন্তু সকলের আগে ঠিক করতে হবে কীসের পক্ষে নিরপেক্ষ হব আর কীসের বিপক্ষে নিরপেক্ষ হব।'

পক্ষ বিপক্ষ থাকলে আর নিরপেক্ষ হবে কী করে? একথাটা বন্ধুকে বোঝাতে পারলাম না।

পথে পথে কবিতা

কলকাতাকে অনেক সময় কবিতার শহর বলা হয়। বিশেষ করে পঁচিশে বৈশাখের আগে ও পরে বেশ কয়েকদিন রবীন্দ্রসদন ও আশেপাশে কবির হাট বসে যায়, কবিতার মেলা।

কলকাতার মতো এত কবি বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও শহরে নেই। পঁচিশে বৈশাখে বা পুজোর সময় শহর ও শহরতলি থেকে যে পরিমাণ কবিতার কাগজ বের হয়, বইমেলার সময় যে সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় অন্যান্য ভাষার কবিবৃন্দ তা শুনলে অবাক হয়ে যান, এসব তাঁদের কল্পনার অতীত।

অবশ্য প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় কবিতা উৎসবে ঢাকা শহর যেভাবে মেতে ওঠে তার কোনও তুলনা হয় না। কবিতা উৎসবের অব্যবহিত পরে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে আমজনতা যেভাবে অংশগ্রহণ করে, কবিতার ছন্দে-তালে-লয়ে একটা প্রাচীন নগরী যে রকম আলোকিত হয়, পৃথিবীতে কোথাও সম্ভবত তার তুলনা নেই।

তবে কবিতার ব্যাপারে একদিক থেকে মেক্সিকো শহর সারা পৃথিবীকে টেক্কা দিয়েছে।

আমরা ইংরেজি বানান দেখে বলি মেক্সিকো। মেক্সিকো দেশের রাজধানী মেক্সিকো নগর। পৃথিবীর বৃহত্তম নগরগুলির প্রথম সারিতে মেক্সিকো।

মেক্সিকোর লোকেরা কিন্তু তাদের দেশ বা শহরকে মেক্সিকো বলে না। স্থানীয় উচ্চারণে মেক্সিকো হল মেহিকো। মার্কিনিরাও দেখলাম মেক্সিকানদের বলে মেহিকান।

সে যা হোক, মেহিকো বা মেহিকান নয়, আমরা মেক্সিকো বা মেক্সিকান বলব।

মেক্সিকোর লোকেরাও কিন্তু ঠিক আমাদের কলকাতা বা ঢাকা শহরের মতো ভাবেন যে তাদের শহরও কবিতার শহর।

মেক্সিকোর কবি অক্তাভিয়ো পাজ সাহিত্যে নোবেল জয়ী। তিনি একদা ভারতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

কিন্তু এ রকম নোবেলজয়ী বা তদনুরূপ জগৎ বিখ্যাত কবি জগৎ সংসারের বহু শহরেই আছেন। তার জন্য নয়, আসলে কবিতা ছড়িয়ে আছে মেক্সিকোর রাস্তায় রাস্তায়, এই শহরের রাজপথগুলির নামকরণে।

মেক্সিকোর পাশেই মার্কিন দেশ। সেখানে নিউইয়র্ক শহরের প্রধান অঞ্চলে রাস্তার নামকরণ নম্বর দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে ইস্ট এবং ওয়েস্ট স্ট্রিট। আর উত্তর দক্ষিণে অ্যাভিনিউ তৃতীয় অ্যাভিনিউ পঞ্চম অ্যাভিনিউ ইত্যাদি। দুয়েকটি অ্যাভিনিউয়ের সঙ্গে লোকনায়ক, সেনাপতি, বিখ্যাত ব্যক্তি এদের নাম জড়িত, যেমন ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ। আমি একবার ডোরালস ইন নামে একটা হোটেলে ছিলাম, ঠিকানা ছিল ফরটি নাইনথ অন লেক্সিংটন, অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তা এবং লেক্সিংটন অ্যাভিনিউয়ের মোড়।

মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনেও রাস্তার নাম অনেক অংশেই নম্বর দিয়ে। আমাদের সল্টলেক উপনগরীতেও সম্প্রতি নম্বর দিয়ে নামকরণ চালু হয়েছে।

এবার মেক্সিকোর রাস্তার নামকরণে আসি। এই শহরটি বাড়ছে তো বাড়ছেই, কলকাতার মতো ক্রমাগত ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ শতকের গোড়ায় মেক্সিকো নগরে অধিবাসী ছিল লাখ দশেক। এখন অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দু' কোটি।

নতুন জনপদ, নতুন শহরতলি বাড়ছে। বাড়ছে রাস্তা। এতসব রাস্তার নতুন নাম দেওয়া সোজা কাজ নয়। সেনাপতিদের নাম, রাষ্ট্রনায়কদের নাম, মহাপুরুষ বা গণ্যমান্যদের তালিকা সব ফুরিয়ে গেছে। ফলে এখন রাস্তার নাম রাখতে গিয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে।

মেক্সিকোর নাগরিকরা এখন যেসব রাস্তায় বসবাস করেন, কাজকর্ম করেন, বাজারহাট করেন তার অনেকগুলির নাম এইরকম:

আলোর অরণ্য, জলের আয়না, স্মৃতির উদ্যান, স্বপনের সমুদ্র।

এইরকম অসংখ্য সব নাম। রহস্য বনানী এবং অলৌকিক অরণ্য কাছাকাছি দুটি রাস্তা। আশাপথ গিয়ে শেষ হয়েছে সৌভাগ্য সরণিতে।

শুধু এই নয়।

পৃথিবীর মানচিত্র একাকার হয়ে গেছে মেক্সিকোর রাজপথে। হিমালয় পর্বত নেমেছে আল্পস পাহাড়ে। রাশিয়ার ভলগা নদী মিশে গেছে মিশরের নীলনদে।

কাব্য ও কল্পনার, বাস্তব ও অলৌকিকের সমাহার ঘটেছে এইসব রাস্তার নামকরণে।

যতরকম ফুল আছে, পাখি আছে, বিচিত্র উদ্ভিদ আছে, রাশি-নক্ষত্রেরা আছে, রূপকথার উপকথার চরিত্রেরা আছে—কে নেই মেক্সিকোর রাস্তায়।

আছেন কালজয়ী লেখক এবং কবিবৃন্দ, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা। ভিক্টর হুগো স্ট্রিটকে কেটে বেরিয়ে গেছে শেক্সপিয়ার সরণি। বেটোফেন গিয়ে পড়েছে বাখে।

আছেন টলস্টয় এবং দান্তে, ডিকেনস এবং মলেয়ার, সক্রেটিস এবং ডারউইন।

এর পরেও আছে বছরের প্রত্যেকটি মাসের নামে একেকটি রাস্তা, জানুয়ারি মার্গ থেকে ডিসেম্বর মার্গ।

এত সবের পরেও যখন জনাকীর্ণ একটি আধুনিক শহরের রাজপথে পৌঁছে দেখি রাস্তার

নাম 'ধানের খেত' কিংবা 'গমের পথ', একটু থামতে হয় বইকি। কারণ একটু সামনেই কবুতর সরণিতে আমার বাল্যবন্ধু ইয়াসিন থাকে, শালিকডাঙার হোটেল থেকে তার ওখানেই যাচ্ছি নৈশ আহারে।

হাং সাং টাঙ্গাইল

'দেশ কোথায়?'

'টাঙ্গাইল।'

'বাড়ি কোথায়?'

'টাঙ্গাইল।'

হিন্দিতে বলা হয় মুলুক আর ঘর। যথা মুলুক দ্বারভাঙা, ঘর মধুবনী। আর আমাদের হল দেশ আর বাড়ি। দুইই এক, দেশ যদি টাঙ্গাইল, বাড়িও টাঙ্গাইল।

দেশ বলতে যা বুঝি, বাড়ি বলতেও তাই বুঝি। তবু দেশের বাড়ি কথাটার একটা আলাদা মানে আছে। আলাদা স্বাদ গন্ধ। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সে এক ভিন্ন কালের ভিন্ন পৃথিবীর, অনেক দূরের দেশ। দেশের বাড়িতে এখনও হয়তো যাওয়া যায়। কিন্তু সেই পৃথিবী আর কোথাও এখন নেই। ঘাসের শীতের ওপরে শিশির বিন্দুর মতো, শরৎকালের নীল আকাশের সাদা মেঘের মতো, শীতের সকালের বিষণ্ণ কুয়াশার মতো, বউ-কথা-কও পাখির মতো সেই পৃথিবী, সেইসব দিন কবে ফুরিয়ে গেছে।

কলকাতা থেকে টানা চব্বিশ ঘন্টার পথ। অনে সময় তার থেকে বেশি সময়ও লাগে।

সন্ধেবেলায় শেয়ালদা মেইন স্টেশন থেকে সুরমা মেল। এই সুরমা মেল পদ্মার ওপারের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পেরিয়ে ঈশ্বরদি জংশন হয়ে উত্তরবঙ্গ-আসামের দিকে চলে যায়। এই ট্রেনের সঙ্গে জোড়া থাকে, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস সমেত কয়েকটি সম্পূর্ণ কোচ, তার সঙ্গে মালগাড়িও আছে। এই কোচগুলি ঈশ্বরদিতে কেটে রেখে জুড়ে দেওয়া হয় সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে।

ইঞ্জিন বদলানো কোচ জুড়ে দেওয়া, জল তোলা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার মিটে যাওয়ার পর সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঘন্টা দুয়েক বাদে রওনা হবে সিরাজগঞ্জের দিকে।

সন্ধ্যায় রওনা হয়ে, মধ্যরাত পেরিয়ে যাওয়ার পর শেয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর, রানাঘাট, পোড়াদহ এবং পদ্মার দুই পারে দুই স্টেশন ভেড়ামারা এবং পাকফিতে থেমে অবশেষে ঈশ্বরদিতে এসে পৌঁছেছে। এবার গন্তব্য সিরাজগঞ্জ, ভোর ভোর পৌঁছে যাবে সেখানে।

এ সেই সিরাজগঞ্জ স্টেশন যেখানকার রুই-কাতলা-ভারি মৃগেল যার একডাকে নাম ছিল সিরাজগঞ্জের রুই, দশকের পর দশক কলকাতার বাঙালি হেঁসেলে আমিষ জুগিয়েছে। সিরাজগঞ্জের রুইমাছ কলকাতায় এসে কাটাপোনা হয়েছে। শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জের বাঙালিবাবুরা, মাস্টারমশাই, কেরানিবাবু, উকিল-মোক্তার এক টুকরো করে কাটাপোনার ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বংশানুক্রমে আপিস ছুটেছেন।

ওই যে সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার সকাল বেলায় এসে সিরাজগঞ্জ পৌঁছল সেটাই সন্ধ্যাবেলা আবার ঈশ্বরদির দিকে ফিরবে। সারাদিন ফিশভ্যানে বড় বড় বাঁশের ঝাঁকায় গাদা গাদা মাছ উঠবে, পাকা রুই, চিতল-আড়, বর্ষাকালে নদীর উজ্জ্বল শস্য ইলিশ বাঙালি রসনার প্রধান উপাদান।

সে যা হোক, এ রেলগাড়ির যাতায়াত ছিল চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া রূপকথার জগৎ নিয়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র ভুবন থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর পৃথিবী এই রেলপথের চারপাশে। ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম, সেই গ্রাম সিরাজগঞ্জের নদীর ওপারেই। এ অঞ্চলে ধলেশ্বরী যমুনার সহচরী।

রেললাইন সিরাজগঞ্জেই শেষ। সিরাজগঞ্জে তিনটি স্টেশন। সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ বাজার এবং সিরাজগঞ্জ ঘাট। প্রথম দুটি স্থায়ী স্টেশন। তৃতীয়টি নদীর মুখে, নদীর সঙ্গে এগোয় আর পিছোয়।

সিরাজগঞ্জের পর শুধু নদী আর নদী। ছোট নদী, বড় নদী, নালা, খাল, বিল। সেসব বিল হ্রদের মতো অতিকায়, কোথাও কোথাও বলা হয় হাওড়। পুরোটাই জলের এলাকা। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি দূরের কথা, ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ির রাস্তাও বিরল। রিকশাও ছিল না, দুয়েকটা টুং টাং সাইকেল, ডুলি, পালকি। বড় জোর এক ঘোড়ার টমটম গাড়ি।

স্থলপথে সত্যিই তেমন কোনও বাহন ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

শুধু জল আর জল। শরীরের শিরা উপশিরার মতো চারিদিকে ছড়ানো নদী, উপনদী, শাখানদী, তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দু'দিকের দুটি নদীকে যুক্ত করেছে মানুষের তৈরি খাল। সেইসব জলে নানা আকারের নানা প্রকারের নৌকা, ছোটবড় ডিঙি থেকে পানসি পর্যন্ত, বাঁশের খোলে ঢাকা ছোট ঢাকাই নৌকো থেকে প্রকাণ্ড বজরা, মানোয়ারি তরী।

ট্রেন থেকে সিরাজগঞ্জে নেমে আমাদের সময়ে অবশ্য স্টিমার ছিল। শীতে-বর্ষায় নদী পিছোত, এগোত। স্টিমার ঘাটও সেইসঙ্গে এগিয়ে যেত পিছিয়ে আসত। সিরাজগঞ্জ ঘাট রেলস্টেশনও তাই।

তখন কলেজে গরমের ছুটি হত মে-জুন এই দুই মাস। কলেজে পড়ার সময়ে মে মাসের প্রথমে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন ট্রেন থেকে নেমে বাক্স-বিছানা নিয়ে প্রায় একমাইল হাঁটতে হত স্টিমারে ওঠার জন্যে। আবার এর পরেই ভাদ্রের শেষে যখন পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরতাম তখন সিরাজগঞ্জের যমুনা নদী টইটম্বুর। ট্রেন থেকে নেমে অল্প দূরে স্টিমার।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলা শেয়ালদা স্টেশন থেকে সুরমা মেলে পরের দিন সকালে সিরাজগঞ্জ ঘাটে এসে স্টিমার ধরতে হয়।

সিরাজগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ জেলায় দু'দিকে স্টিমার যেত। একটা রেল কোম্পানির স্টিমার। অতিকায় জাহাজের আকারের। সিরাজগঞ্জ থেকে জগন্নাথগঞ্জ পর্যন্ত স্টিমার, সেখানে গিয়ে আবার রেলগাড়ি, যার যাত্রাপথ ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। এই স্টিমারের টিকিটের দাম রেলের টিকিটের সঙ্গেই নিয়ে নেওয়া হত। গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা প্রাইভেট স্টিমার সার্ভিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রেল কোম্পানি সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ স্টিমার চালাত।

কোনও বিশেষ কারণ না ঘটলে আমরা ওই জগন্নাথগঞ্জের স্টিমারে কালেভদ্রে চড়েছি। বাড়ি ও-পথেও যাওয়া যেত, কিন্তু আরও একদিনের ঝামেলা। স্টিমারে ওই জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে বিকেলে নেমে ময়মনসিংহ ট্রেনে পৌঁছতে সন্ধ্যা। সেখানে রাত্রিবাস। পরের দিন সকালে ডাক ধরে দুপুর নাগাদ টাঙ্গাইল।

আমাদের ছিল ছোট স্টিমার। জগন্নাথগঞ্জের স্টিমারের মতো তার লক্ষ্য ঢাকা-ময়মনসিংহের মতো বিখ্যাত জায়গা নয়, সে স্টিমার যাবে চারাবাড়ি, পোড়াবাড়ি। অবশ্য তার আগে পটল।

সবসময়ে যে স্টিমারে যেতাম তা নয়। অনেক সময় স্টিমার থাকত না। সে ছিল ভাড়াটে স্টিমার। কখনও বিয়ের বরযাত্রী নিয়ে চলে যেত কিংবা কোনও নদীর চরের গ্রামে আইনশৃঙ্খলার

প্রশ্নে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট রিকুইজিশন করে নিয়ে যেত। আবার অনেক সময় সারাই হতে ঢাকা-কলকাতা পাঠানো হত।

তখন লঞ্চ চলত। বেশ বড়, ফেরি লঞ্চ। ফার্স্ট ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। সেকেন্ড ক্লাস ছিল না।

দোতলায় সারেঙ সাহেবের ঘরের সামনে একটু ঢাকা জায়গা, সেখানে কয়েকটা কাঠের চেয়ারের সঙ্গে একটা ছোট টেবিল। সেটা ফার্স্টক্লাস। বাকি আর সব থার্ড ক্লাস।

অনেক সময় এই লঞ্চও থাকত না। তখন গহনার নৌকো। গহনার বা গয়নার নৌকো, এর মানে কী জানি না। আসলে এটা ছিল বিশাল আকারের শক্ত, সমর্থ, ভাল করে বাঁশের ছই দেওয়া যাত্রী নৌকো। প্যাসেঞ্জার বোট। আজকাল যেমন প্যাসেঞ্জার বাস তেমনি প্যাসেঞ্জার বোট।

সিরাজগঞ্জ ঘাটের বাঁক থেকে যত দূরেই তাকাই কূল-কিনারা দেখা যেত না। গহন, উত্তাল নদী। এপারে সিরাজগঞ্জ, ওপারে টাঙ্গাইল। মধ্যে অতল অকূল জল।

প্রথম স্টিমার স্টেশন পড়ত পটল। পুরনো দিনের বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দু'-চারজন লোক, যারা কলকাতার দিক থেকে গ্রামে আসছে তারা নামত। আবার যাদের টাঙ্গাইল শহরে মামলা-মোকদ্দমা, কেনা-কাটা আছে তারা উঠত।

এরপরে পোড়াবাড়ির ঘাট। পূর্ববঙ্গের জলপথে যারা যাতায়াত করেছেন পোড়াবাড়ি নামটি তাদের কাছে বহু পরিচিত এখানকার বিখ্যাত মিষ্টির কারণে, যা পোড়াবাড়ির চমচম নামে বিখ্যাত।

আমরা দেশের বাড়ির কাছে এসে গেছি। স্টিমার বা লঞ্চ টাঙ্গাইল পর্যন্ত যাবে না। টাঙ্গাইল শহরের পাশ দিয়ে যে ছোট নদী গেছে, লৌহজঙ্গ, তাতে জল কম, সে জলে নৌকো চলে কিন্তু স্টিমার আটকিয়ে যায়, ফেরি লঞ্চও সাবলীলভাবে যেতে পারে না।

অবশ্য কোনও কোনও বছর বেশি জল হলে অথবা সিরাজগঞ্জ থেকে যদি আমরা গয়নার নৌকোয় করে আসতাম তা হলে সরাসরি টাঙ্গাইল ঘাটের পাশে মানদায়িনী সিনেমাহলের ঘাটে নামতাম।

এ রকম অবশ্য কদাচিৎ হয়েছে।

সাধারণত আমরা চারাবাড়ি হয়েই নামতাম। সিরাজগঞ্জের স্টিমার ওখানেই শেষ।

চারাবাড়ি ঘাটে লণ্ঠন নিয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে, তারা তাদের বাড়ির লোক নিতে এসেছে।

আমাদের জন্যেও নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।

অন্য যাত্রীদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি করে আমরা নেমে আসি ঘাটে। অতুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, অতুলহরি দত্ত, আমাদের মুহুরিবাবু, ফিটফাট পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক।

অতুলবাবু সঙ্গে রাধু গাড়োয়ানের ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছেন। এক-ঘোড়ার গাড়ি, আমাদের অঞ্চলে বলে টমটম গাড়ি।

রাধু গাড়োয়ানকে তো ছোটবেলা থেকে চিনি। এই টমটম গাড়িটা, এই ঘোড়া পর্যন্ত আমার চেনা।

এবড়ো-খেবড়ো কাঁচামাটির রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি রওনা হল। বাক্স-বিছানা নিয়ে আমি গাড়িতে উঠে বসার পর অতুলবাবু ঘাট থেকে বড় এক হাঁড়ি চমচম কিনে এনেছেন। সেই হাঁড়িটা কোলে নিয়ে তিনি আমার পাশে বসেছেন।

নদীর ধারের পথ ছেড়ে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রাস্তায় উঠলাম। সামনেই টাঙ্গাইল শহর।

অবশেষে আমরা বাড়ি এসে গেছি।

আমরা থাকব বলেই পুরনো দালানের বাইরের বারান্দায় একটা ডে-লাইট জ্বালানো হয়েছে। বারান্দায় একটা তক্তপোশ তার ওপরে শীতলপাটি, একটা ইজিচেয়ার। মা-বাবা-পিসিমা বাড়ির আর সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

যদি বাড়ির কথা ঠিকমতো বলতে হয়, তা হলে বলতে হবে আমাদের দুটো দেশের বাড়ি ছিল, একটা বাড়ি, আর অন্যটা বাসাবাড়ি।

আমাদের বাসাবাড়ি টাঙ্গাইল
আর বাড়ি এলাসিন। সেটাই আসল বাড়ি।
সেকালের আদালতের ভাষায়,
সাকিন এলাসিন
হাল সাকিন টাঙ্গাইল।
মনে পড়ছে, সংক্ষিপ্ত করে লেখা হত,
সাং এলাসিন
হাং সাং টাঙ্গাইল।

এলাসিনের কথা পরে কখনও বলব। আপাতত এলাসিন সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে এলাসিনে আমাদের গ্রামের বাড়ি। ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ, মোগলের অত্যাচারে কিংবা তারও কিছু পরে, বর্গির হামলার ভয়ে আমরা যশোহর অঞ্চল থেকে মধ্য-বাংলার নদী-নালা দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত, সমতল এবং উর্বর কৃষি অঞ্চলে চলে আসি। আমাদের মতোই আরও অনেক পরিবার নদীর তীরে বিভিন্ন গ্রামে নতুন আস্তানা পাতে।

একটা পুরনো গ্রামের বাড়ি, সেটা হল আসল বাড়ি। আরেকটা শহরের পাকাবাড়ি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন বাংলার মফস্বল শহরগুলির পত্তন হল জেলা ও মহকুমা সদর হিসেবে তখন থেকেই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কিছু পরিবারের দুটো করে বাড়ি। একটা গ্রামে, একটা শহরে। সে শহর অবশ্য কখনও কখনও কলকাতা নগরীও হতে পারে। শহরের বাড়িটা বাসাবাড়ি।

সে যা হোক এই মুহূর্তে আমাদের টমটম গাড়ি টাঙ্গাইল বাড়ির উঠোনে এসে থেমেছে।

বাড়িসুদ্ধ লোক উঠোনে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আশেপাশের বাড়ি থেকেও লোকজন এসেছে। বেশ হইচই ব্যাপার।

আমাদের বাড়ি শহরের সবচেয়ে আয়তনে বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে বিশাল পুকুর। সেটা অবশ্য আমাদের নয়। মিউনিসিপ্যালিটির। কিন্তু সেই পুকুরের জন্য বাড়িটাকে আরও বড় মনে হয়। পুকুরের ওপারের বাড়িগুলোর আলো সেইসঙ্গে জোনাকির সতত সঞ্চারমান ছায়া ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে।

আশ্বিন মাস। দুয়েকদিন পরেই পুজো। আসার সময় দেখে এসেছি, কালীবাড়িতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে কুমোরেরা দ্রুত কাজ সারছে।

বাতাসে একটু হিম হিম ভাব। নারকেল পাতার মধ্যে ঝিরি ঝিরি বাতাস। সারা বাড়ি ছেয়ে আছে ঝরা শেফালির গন্ধে। একটু পরে রাতের দিকে চারদিক নিস্তব্ধ হতেই গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার শব্দ শোনা যাবে।

বাড়ির সামনের দিকে কাছারি ঘর। আমাদের ব্যবহারজীবি বংশ, পুরুষানুক্রমে আমার বাবা পর্যন্ত সবাই উকিল। কাছারি ঘরের বারান্দায় মক্কেলরা বসে রয়েছে। তাদের দুয়েকজন হয়তো আমাদের বাড়িতে থাকবে।

একেবারে পূর্বদিকে একটা বিশালাকার কাঠের দোতলা ঘর। আগে মুহুরিবাবুরা এবং অতিথিরা থাকতেন, এখন সেটায় একটা পাঠশালা বসে। সেই পাঠশালায় একদা আমিও পড়েছি।

সামনে আমাদের পুজোর দালান। ঘরের পর ঘর। থাম লাগানো আট হাত চওড়া টানা বারান্দা পুরো দালানটাকে ঘিরে। আমাদের ভাষায় বাইরের বারান্দা আর ভিতরের বারান্দা। দুই বারান্দায় একসঙ্গে আড়াইশো লোক পাতা পেড়ে খেতে পারে।

বাইরের উঠোন থেকে লম্বা, টানা সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দায়। ভিতরের দিকে গোল সিঁড়ি। একটু সামনে পর পর তিনটে টিনের ঘর।

বড় ঘরটায় থাকতেন আমার পাগল কাকা, তারপর সমান আকারের দুটো দোচালা টিনের ঘর। একটা হবিষ্যি ঘর, একটা রান্নাঘর।

হবিষ্যি ঘর, রান্নাঘরের পিছনে পুরনো ফুলবাগান। জবা, শেফালি, রঙ্গন, টগর, কাঠচাঁপা, অযত্নের গোলাপ।

বাড়ির চারপাশে কত রকমের গাছ। আম, কাঁঠাল, সুপুরি, নারকেল তো আছেই কামরাঙ্গা, চালতে এমনকী সেই আমলের পক্ষে অস্বাভাবিক দুটি ইউক্যালিপটাস গাছ।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পুরো বাড়িটা একবার পাক দিয়ে আসি। ততক্ষণে ডে-লাইটটা বাইরের বারান্দা থেকে রান্নাঘরের বারান্দায় নিয়ে আসা হয়েছে।

একটু পরে পুকুরের ঘাটে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর কাপড়-চোপড় ছেড়ে গোলবারান্দায় গিয়ে ভিতরের উঠোনে নেমে এসে দেখি চারদিক ম-ম করছে গরম ভাতের গন্ধে। একটু পরে মাছ-ভাজার গন্ধও পাওয়া গেল।

ওপাশে ফুলবাগানের পাশে তুলসীমঞ্চে সলতে ফুরিয়ে গিয়ে প্রদীপের বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা কাঠি দিয়ে প্রদীপের সলতে উসকিয়ে দিলাম।

এরই মধ্যে রান্নাঘরের বারান্দায় সারি সারি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পাতা হয়ে গেছে। এখনই সবাইকে খেতে ডাকা হবে। দু'বেলা ভাত খাওয়া হয়নি। আমি ডাক পাড়ার আগেই বারান্দায় গিয়ে পিঁড়ির ওপরে বসে পড়ি।

একটা টিকটিকি দালানের বারান্দা থেকে আমাকে সায় দেয়, 'ঠিক, ঠিক, ঠিক।'

পত্রের উত্তর

কল্যাণীয়াসু,

পরিচারিকা বাহিত তোমার নিদারুণ পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি পাঠ করে ফেলেছি।

এত রাগ? আমার লেখার ওপরে তোমার এত রাগ?

আমি তোমাকে কখনও দেখিনি। তবু তোমার ক্রোধান্বিতা মুখশ্রী কল্পনা করার চেষ্টা করছি। তোমার তো অভিযোগ একটাই আমি কেন পুরনো দিনের ভাঙা রেকর্ডের মতো একই কথা বারবার বলে যাচ্ছি, একই গল্প শতবার শোনাচ্ছি।

কিন্তু ঠাকুরানি, আমার যদি অনুমান ভুল না হয়, তুমি মোড়ের তিনতলা বাড়ির নতুন বউ। তুমি যে গত চার মাস ধরে রাতদিন সকাল-সন্ধ্যা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'আসছে শতাব্দীতে, আসব ফিরে তোমার খবর নিতে' বাজিয়ে বাজিয়ে পাড়ার লোকের কানের পোকা বার করে দিয়েছ, তার বেলা? নেতারা যে বছরের পর বছর বলে যাচ্ছেন, 'ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ', সেই একই কথা। তার বেলা?

এই প্রশ্নে আমি পরে ফিরে আসব। তার আগে তোমাকে খুশি করার জন্যে এবার শুধু গল্প আর গল্প।

কয়েকটি পুরনো গল্প যার মজা এখনও ফুরিয়ে যায়নি, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমারও সুবিধে, বানিয়ে বানিয়ে বাজে গল্প লেখার হাত থেকে ক্ষণিক অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

তা, সেই ভয়াবহ গল্পটা দিয়েই শুরু করি। কোনও এক অফিসে, যেমন হয়, হয়ে থাকে, এক সহকর্মী আর এক সহকর্মিণীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া, বাদানুবাদ।

এ রকম প্রায় প্রতিদিনই চলে। একদিন সেই ঝগড়া তুঙ্গে উঠল।

বলাবাহুল্য, কী নিয়ে ঝগড়া তা আমরা কেউ জানি না। তোমরা কেউ অনুমান করতে যেও না।

সেই উচ্চকণ্ঠে কলহের সর্বশেষে শোনা গিয়েছিল, 'আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম, আমি তোমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতাম।' ভদ্রমহিলা তাঁর সহকর্মীকে চিৎকার করে একথা বলেছিলেন।

এ রকম ভয় দেখানোয় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'আমি যদি তোমার স্বামী হতাম আমি সেই বিষ খেতাম।'

কথাটা গোলমেলে। অর্থাৎ তোমার মতো স্ত্রীর স্বামী হয়ে বেঁচে থাকার থেকে বিষ খেয়ে মরা ভাল। ভয়াবহ গোলমেলে কথা। অবশ্য গোলমেলে না হলেই মশকরা জমে না।

আরেকটি গোলমেলে কথা মনে পড়ছে।

এক নির্বোধ প্রেমিক গদগদ কণ্ঠে তার ভালবাসার প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওগো, একবার মুখ ফুটে বল না, আমি কি তোমার যোগ্য?'

সেই প্রেমিকা বলেছিল, 'না। সত্যি কথাটা হল তুমি আমার যোগ্য মোটেই নও।' তারপর, একটু পরে সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় বলল, 'তবে তুমি অন্য যে কোনও মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট যোগ্য।'

পুনশ্চ:

কল্যাণীয়াসু,

কোপান্বিতা হওয়ার পথে সামান্য মশলা এবারও এগিয়ে দিলাম। দেখি তোমার প্রতিক্রিয়া কী হয়।

আমি বলি কি, রাগ করে লাভ কী? তার চেয়ে হাসো, আরও হাসো।

ইতি
তোমার অপ্রিয় লেখক।

আবার উত্তর

আবার কল্যাণীয়াসু,

পত্রের আড়ালে আরও দুটো গল্প অবশ্যই এবার বলব। তবে তার আগে একটু নিজের সাফাই গাইছি।

দার্শনিকেরা বলেন, একই নদীর জলে দু'বার ডুব দেওয়া যায় না। একটি ডুবের থেকে পরের ডুবের মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে যায় নদীস্রোতে, পিছনের জল এগিয়ে আসে। দ্বিতীয়বার ডুবের সময় একই জল থাকে না।

ঠিক সেইরকমই একই গল্প দু'বার বলা যায় না। একই রসিকতা দু'বার করা যায় না। সময় এবং

পরিবেশ অনুযায়ী, রচনার সময় লেখকের মনোভাব অনুযায়ী কাহিনী বদলিয়ে যায়। বদলিয়ে যায় নাম-ধাম, স্থান, কাল, চরিত্রের লিঙ্গ ও বয়েস।

তবে সব কাহিনীর খোল-নলচে কিন্তু আগাগোড়া বদলিয়ে দেওয়া যায় না।

এই পুরনো গল্পটা ধরা যাক। সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে নতুন বউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে। স্বামী অফিস থেকে ফিরে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে বউয়ের গান শুনে বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

পাড়ার একটি ছেলে বলল, 'দাদা, বাড়ি যাবেন না?' দাদা বললেন, 'তোমার বউদির গানটা শেষ হোক।'

'বউদির গান গাওয়ার সময় ডিস্টার্ব করার মানা আছে বুঝি?' ছেলেটির সরল প্রশ্ন।

দাদা বললেন, 'আরে তা নয়। বউদির ওই নাকি সুরে গান শুনছ না? আমি বাড়ির মধ্যে থাকলে তোমরাই বলবে, দাদা বউদিকে পেটাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বধূ নির্যাতনের মামলায় পুলিশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

এই গল্পের রং বদল করা খুব কঠিন। পাত্রকে পাত্রীর ভূমিকায় এবং পাত্রীকে পাত্রের ভূমিকায় দেখালে গল্পের দফারফা হয়ে যাবে।

বিপরীতক্রমে এই গল্পটি দেখুন। এক সুবেশ ভদ্রলোককে তাঁর বন্ধু বলেছিলেন, 'ভাই তোমার দর্জির ঠিকানাটা আমাকে একটু দেবে?' দ্বিধাগ্রস্ত সুবেশ ভদ্রলোক বললেন, 'তা দিতে পারি শুধু এক শর্তে, আমার ঠিকানা তুমি ওকে দেবে না।'

বলা বাহুল্য, দর্জির কাছে ভদ্রলোকের প্রচুর ধার। দর্জিকে গয়নার দোকান করে, সুবেশ ভদ্রলোককে সালংকারা মহিলা করে এ-গল্প ওলট পালট করা যায়। যেমন আরেকটা গল্প।

বনমালী তার দয়িতাকে বলেছিল, 'দ্যাখো, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা তুমি কিন্তু গোপন রেখো। খুব বেশি চাউর করতে যেও না।'

দয়িতা বলল, 'আমি কাউকেই কিছু বলব না। শুধু আমার বন্ধু মালতীকে বলব।'

বনমালী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আবার মালতী কেন?'

দয়িতা বলল, 'মালতী বলেছিল, বিশ্বসংসারে এমন কোনও উল্লু নেই যে তোকে বিয়ে করবে। এবার বিয়ের খবরটা দিয়ে মালতীর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।'

এ গল্প কিন্তু যত ইচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা যায়।

বিদূষক

বিদূষক মানে ভাঁড়, নানারকম কৌতুক রসিকতা ইত্যাদি করে যিনি রাজার মনোরঞ্জন করেন। যেমন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে ছিলেন গোপাল ভাঁড়।

অবশ্য গোপাল প্রামাণ্য ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এটা কোনও আনুমানিক সন্দেহ নয় সুপণ্ডিত সুকুমার সেন মহোদয় পর্যন্ত গোপাল ভাঁড়ের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন।

গোপাল ভাঁড়ের প্রসঙ্গে যথা সময়ে আসা যাবে, তার আগে এই প্রাচীন তথ্য উত্থাপনের কারণটা বলি।

আমার তরলমতি সুবিদিত। এবার বিদেশে থাকাকালীন আমার এক পুরনো বন্ধু আমাকে কয়েকটি সরস গ্রন্থ পড়তে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি বই ছিল, জনৈক হুইটমোর গ্রন্থিত 'দ্য কোর্ট জেস্টারস' (The Court Jesters)। নামকরণের মধ্যে একটু বাহুল্য আছে, এখানে কোর্ট মানে রাজসভা। বইটির মানে দাঁড়ায় রাজসভার বিদূষক। বিদূষক মানেই রাজার সভাসদ, আলাদা করে রাজসভার বিদূষক বলার প্রয়োজন কী?

সে যা হোক প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সাবলীল ভাষায় লেখা এই বইটি আমার পক্ষে চমৎকার এইজন্যে যে আমার আবাল্য পরিচিত তিনজন বিদূষক, আরও সত্তর-আশিজন ইউরোপীয় এবং এশীয় ভাঁড়ের সঙ্গে আলোচিত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কিন লেখক, মার্কিন প্রকাশক কিন্তু কোনও মার্কিন বিদূষকের সন্ধান পেলাম না।

এই বইতে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছেন মহামতি আকবরের সভাসদ বীরবল। ভাঁড়দের জগতে বীরবলের মতো শিক্ষিত, রুচিবান ব্যক্তি বিরল। তিনি শুধু সামান্য বিদূষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি ও দার্শনিক, সভাসদ ও সৈনিক। বুন্দেলখণ্ডের সামান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মহেশ চন্দ্র ভারতেশ্বরের রাজদরবারে বীরবল হয়েছিলেন।

পারস্য সম্রাট একদা শুনেছিলেন যে, মোগল সম্রাটের পরশমণি আছে, যা ছোঁয়ালে সব কিছু সোনা হয়। তিনি নাকি পরশমণি সম্পর্কে আকবরের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। আকবর পারস্যদূতকে বলেছিলেন, 'এই যে বীরবলকে দেখছেন, ইনি আমার পরশমণি।'

ঠিক এরই আগে একবার আকবর বীরবলকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সূর্য উঠলে চারিদিকে আলো হয়ে যায়। সব কিছু দেখা যায়। কিন্তু কী দেখা যায় না বলো তো বীরবল।'

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বীরবল বলেছিলেন, 'সূর্য উঠলে অন্ধকার দেখা যায় না।'

বীরবলের বুদ্ধিমত্তার একটি নিদর্শন রয়েছে তাঁর একটি অসামান্য উপদেশে।

মোগল সম্রাটের মা যেদিন পরলোক গমন করেছিলেন, ঠিক সেদিনই তাঁর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

সভাসদেরা জানেন না এমন অবস্থায় কী করতে হবে। আকবরের মুখোমুখি হলে হাসবেন না কাঁদবেন।

অনেক ভাবনাচিন্তা করে তাঁরা বীরবলের শরণাপন্ন হলেন।

সব শুনে বীরবল যে পরামর্শ দিলেন, সেটা অদ্যাবধি শিরোধার্য।

বীরবল বলেছিলেন, 'সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। যদি দেখেন মহামতি হাসছেন, আপনিও হাসবেন। যদি দেখেন সম্রাটের চোখে জল, আপনারাও পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছবেন, চোখে জল থাক বা না থাক।'

আকবর একবার বীরবলকে পরিহাসচ্ছলে আগ্রার কাক গুনতে বলেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বীরবল কাক গোনা শেষ করে বললেন, 'আগ্রার কাকের সংখ্যা আশি হাজার তিনশো তিন।'

আকবর অবাক হয়ে বললেন, 'এ হিসেব বার করলে কী করে?' বীরবল মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'হঠাৎ কম-বেশি হতে পারে। যদি কম হয় জানবেন কিছু কাক বাইরে গেছে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কাছে কিংবা তীর্থ করতে। আর যদি বেশি হয় বুঝবেন, বাইরের কাকেরা আগ্রায় বেড়াতে এসেছে।'

পুনশ্চ:

একদা সম্রাট আকবর নাকি বীরবলকে সরাসরি বলেছিলেন, 'বীরবল তুমি বোকা, তুমি মূর্খ, তুমি গাধা।'

বীরবল বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হুজুর আগে আমি এমন ছিলাম না, তা হলে আপনি আমাকে কখনওই সভাসদ করতেন না, মন্ত্রী করতেন।'

সম্রাট ভ্রূকুঞ্চন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে?'

একটু এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে একটু হাত কচলিয়ে বীরবল বললেন, 'সঙ্গদোষে আমার এই পরিণতি।'

হায়! আমরা যদি আমাদের ওপরওয়ালাদের এমন কথা কখনও বলতে পারতাম।

হুইটমোর সাহেবের কোর্ট জেস্টার বইতে বীরবল ছাড়াও, আমার এবং আপনাদের সকলেরই পূর্ব পরিচিত দু'জন বিদূষক আছেন।

গোপাল ভাঁড় এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিন। গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে বেশি তথ্য নেই তবে সবিস্তারে মোল্লা নাসিরউদ্দিন কাহিনী আছে।

আগে গোপাল ভাঁড়ের কথাই বলি। পুরনো গল্প যথাসম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছি।

কয়েকটা আধচেনা গল্প পেলাম। তার একটি হল কুকুর নিয়ে।

গোপাল নিয়মিত মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। একদিন তাঁর পিছু পিছু একটা পথের কুকুর মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছে।

মন্দিরের পুরোহিত কিঞ্চিৎ তফাতে আসছিলেন। তিনি পিছন থেকে এটা দেখে চেঁচিয়ে গোপালকে বললেন, 'গোপাল, তোমার কুকুরকে আটকাও, কুকুর নিয়ে মন্দিরের উঠোনে ঢুকবে না।'

গোপাল পিছন ফিরে দেখলেন সত্যিই একটা পথের কুকুর তাঁর পিছে আসছে আর আরেকটু পিছনে কুকুরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে মন্দিরের প্রধান পূজারি খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছেন।

গোপাল পূজারি ঠাকুরকে বললেন, 'কিন্তু ঠাকুরমশায়, আপনি কী করে বুঝলেন যে এই কুকুরটা আমার? আমি এই কুকুরের মালিক?'

ঠাকুরমশায় বললেন, 'কুকুরটা যে তোমার পিছনেই রয়েছে গোপাল।'

গোপাল বললেন, 'কী আর বলব? আপনি কুকুরের পিছনে রয়েছেন। আপনার কথা মানলে বলতে হয় যে, কুকুরটা আপনার মালিক, আপনি এর পিছে পিছে থাকছেন।'

বলাবাহুল্য, সাধারণ বাজার প্রচলিত গোপাল ভাঁড় কাহিনীতে এ গল্পটা ঠিক এভাবে আমি পাইনি।

অন্য একটি গল্প একটু অন্যরকমভাবে রয়েছে।

সাধারণ মানুষ গোপাল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ নিযুক্ত হয়েছেন। সুতরাং তদানুযায়ী চলতে হবে।

নতুন ঘোড়া কিনতে হল গোপালকে। সুন্দর আরবি টাট্টু ঘোড়া। তার সঙ্গে রাজন্যজনোচিত লাগাম, চাবুক থেকে সাজপোশাক সাজসরঞ্জাম।

ঘোড়ার সঙ্গে নতুন সহিস এসেছে। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গোপাল মনের সাধে ইচ্ছেমতো করে সাজপোশাকে ঘোড়া সাজালেন। নিজেই নিজেকে বাহবা দিতে লাগলেন।

কিন্তু আরবি ঘোড়ার উজবেক দেশীয় সহিস বলল, 'জাঁহাপনা, আপনার সব গোলমাল হয়ে গেছে, আপনি সামনের দিকের সাজ পিছনে পরিয়েছেন, পিছনের সাজ সামনে। একদম উলটো হয়ে গেছে।'

গোপাল উত্তেজিত হয়ে সহিসকে বললেন, 'উজবুক কাঁহাকা। তুই জানিস, আমি ঘোড়ার কোনদিকে মুখ করে বসব। আমি ঘোড়ার লেজের দিকে মুখ করে বসব, সেইভাবে সাজিয়েছি।'

হুইটমোর সাহেবের বইতে সভাসদ গোপালের সমাজ জীবনের আর একটা গল্প আছে।

সভাসদ হিসেবে গোপালের ওপরে দায়িত্ব পড়েছিল, রাজধানী কৃষ্ণনগরের অন্ধদের একটি তালিকা প্রণয়নের।

গোপাল লোকজন পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্ধের তালিকা তৈরি করেছিলেন। সেই তালিকা গোপাল তাঁর নিজের জামার পকেটে রাখতেন, যদি স্বচক্ষে কোনও অন্ধের দেখা পেতেন যার নাম ওই তালিকায় নেই তিনি ওই তালিকায় নামটি লিপিবদ্ধ করতেন।

তা, একদিন সকালে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে একটা গাছতলায় বসে গোপাল একটা পুরনো খাটিয়া মেরামত করছিলেন। সেই পথ দিয়েই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর সভাসদের এই কাজ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'গোপাল, তুমি কী করছ?'

গোপাল বললেন, 'আজ্ঞে খাটিয়া সারাচ্ছি।'

এরপর তাঁর জোব্বার পকেট থেকে অন্ধের তালিকাটি বের করে তাতে মহারাজের নামটি লিপিবদ্ধ করে আবার পকেটে রাখলেন।

কৌতূহলী মহারাজ বললেন, 'ওই কাগজটা কীসের?'

গোপাল বললেন, 'ওটা অন্ধের তালিকা।'

মহারাজ বললেন, 'ওটায় কী লিখলে?'

গোপাল বললেন, 'তালিকায় আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করলাম। আপনি পরিষ্কার দেখলেন আমি খাটিয়া সারাচ্ছি, অথচ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী করছি, আমার হিসেবে আপনি অন্ধ।'

অবশেষে নাসিরউদ্দিন। হুইটমোর সাহেবের 'কোর্ট জেস্টার' বইতে যে নাসিরউদ্দিনের কথা বলা আছে, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেককাল পরে, বলা উচিত, এই সেদিন।

সত্যজিত রায় নাসিরউদ্দিন রসিকতাসমূহ বাঙালি পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করলেন। তারই অনতিকাল পরে ইন্দ্র মিত্র দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায় নাসিরউদ্দিনকে ধারাবাহিক করলেন। অবশ্য ইংরেজিতে নানা সংকলনে এবং আলাদা করেও নাসিরউদ্দিনের রঙ্গরসিকতা বেশ কিছুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল। পেপার-ব্যাকে প্রকাশিত হয়ে সেই বইগুলো বেশ সহজলভ্য হয়েছিল।

হুইটমোর 'কোর্ট জেস্টার' গ্রন্থে নাসির সংক্রান্ত অজস্র তথ্য এবং বহু গল্প আছে। গল্পগুলি অধিকাংশই বাঙালি পাঠকের পরিচিত।

আমি স্বল্পপরিচিত দু'-একটি গল্পের কথা উল্লেখ করছি।

নাসির তখন শিশু। যেমন অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকে, তেমনই এক ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা কয় ভাই?'

নাসির বললেন, 'দুই'।

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে বড়?'

নাসির বললেন, 'সমান সমান।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ও তোমরা বুঝি দু'-ভাই যমজ?'

নাসিরের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'না।'

কিছু বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে?'

এবার নাসির বুঝিয়ে বললেন, 'এক বছর আগে আমার মা বলেছিলেন, যে আমার ভাই আমার চেয়ে এক বছরের বড়। এক বছর তো কেটে গেছে, এখন নিশ্চয়ই আমাদের দুই ভাইয়ের বয়স সমান সমান হয়েছে।'

এই নাসিরই একদা বড় হয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহকে বলেছিলেন যে, 'আপনার মূল্য শূন্য।'

দোষটা বাদশাহেরই হয়েছিল, নাসিরের মতো ধুরন্ধর লোককে কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করে, 'বলো দেখি আমি কত মূল্যবান?'

বাদশাহের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে তারপর মনে মনে কী হিসেব করে নাসির বললেন, 'কত আর মূল্য হবে আপনার, এই বড় জোর দশ মুদ্রা।'

বাদশাহ হো হো করে হেসে বললেন, 'তুমি তো দেখছি আচ্ছা বোকা হে। আমার গায়ে এই জরির কাজ করা জামাটা দেখেছ, এরই দাম হবে কম-সে-কম দশ মুদ্রা।'

বিনীতভাবে নাসির বললেন, 'হুজুর, ওই জামাসুদ্ধই আপনার দাম ধরেছি।'

এর মানে হল, বাদশাহের মুল্য শূন্য। প্রগলভ এবং দুঃসাহসী নাসিরের এর পরে কী পরিণতি হয়েছিল হুইটমোর সাহেব সে বিষয়ে কিছু কিন্তু লেখেননি।

পরিণতির ভয় নাসির করতেন না। বীরবল বা গোপাল ভাঁড়ও করেননি। কী বললে কী হবে, একথা ভাবতে গেলে বিদূষকবৃত্তি করা যায় না। মন জুগিয়ে কথা বলে মো-সাহেবরা। তারা বিদূষকদের চেয়ে কয়েক ধাপ নীচের সারির লোক।

একবার বাদশাহ নাসিরের বাসায় হঠাৎ কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সামনের দরজা বন্ধ, বাড়ির মধ্যে নাসির তো নেই-ই, কেউ-ই নেই।

বাদশাহ পরিহাস করে চকখড়ি দিয়ে নাসিরের কাঠের দরজায় বড় বড় হরফে লিখে দিয়ে এলেন 'গাধা'। বাড়ি ফিরেই নাসিরের চোখে পড়ল সেটা।

পরদিন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে স্বয়ং বাদশাহ তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন একথা শুনে নাসির ছুটলেন বাদশাহের প্রাসাদে। গিয়ে বললেন, 'হুজুর, আপনি আমার বাসায় গিয়েছিলেন, আমি ছিলাম না, আমি খুবই দুঃখিত।'

বাদশাহ মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি বুঝলে কী করে যে আমি গিয়েছিলাম?'

নাসির বললেন, 'তা বুঝব না কেন হুজুর? আপনি যে আমার বাড়ির দরজায় অতবড় করে আপনার নাম লিখে রেখে এসেছেন।'

বারবার তিনবার গঙ্গারামকে এড়ানো গেছে। এবার আর যাবে না। গঙ্গারামকে ডাকতেই হবে। সে অবশ্যই কোনও রাজরাজড়ার না হোক, মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত তারাপদ দেবশর্মনের বিদূষক।

কিন্তু গঙ্গারাম বিলক্ষণ চটে যাচ্ছে। আমি উপেক্ষা করলে আর সে অভিমান করবে না, সে হতেই পারে না।

গঙ্গারামকে খবর পাঠাই, সে জানায়, 'কেন, আমাকে আবার কেন? গোপালকে ডাকুন।' কখনও বলে, 'বীরবল কি ছুটিতে গেছে?' অথবা, 'নাসির মোল্লা পালাল কোথায়? স্টক ফুরিয়েছে বুঝি।'

অনেক সাধাসাধি, টেলিফোনে বহু অনুনয়-বিনয় অবশেষে টেলিফোনে বিরিয়ানি এবং চিকেন

রেজালার লোভ দেখালেও—কিছুতেই গঙ্গারাম আসে না। শেষে একটি যন্ত্রস্থ রম্যরচনা গ্রন্থ তাকে উৎসর্গ করব এই প্রলোভনে গঙ্গারাম আমার কাছে এল।

আমার ঘরে ঢুকেই সামনের চেয়ারে বসে সে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রথমেই একটা গল্প বলল।

গল্পটা সেই গোরু তাড়ানোর কৃষকের। সেই ব্যক্তি সারাদিন ঝোপে-ঝাড়ে, খেতে-মাঠে পলাতক গোরুটির অনুসন্ধান করে গোরুটি না পেয়ে ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসা নিজের ছেলেকে বলেছিল, 'ভাই এক গেলাস জল দাও তো।'

অদূরে রান্নাঘরে রন্ধনরত কৃষক পত্নী স্বামীর এই আচরণ, নিজের পুত্রকে ভাই বলা শুনে রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। নিজের ছেলেকে ভাই বলছ।'

এইকথা শুনে কৃষক তার স্ত্রীকে মা সম্বোধন করে বলেন, 'মা, মানুষের গোরু হারালে যে কী অবস্থা হয়, আপনি কী করে বুঝবেন।'

দুঃসাহসী গঙ্গারাম নির্জলা আমার বহু পুরনো গল্প আমাকেই শোনাল। গল্পটা বিস্তারিতভাবে কাণ্ডজ্ঞানের যুগে লিখেছিলাম, গল্পটা শুনেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে।

গঙ্গারামকে একথা বলতে, সে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কার কাছে শুনেছিলেন?'

আমি বললাম, 'সেটা সুনীলকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবে তার মনে আছে কি না বলতে পারব না।'

গঙ্গারাম তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটি পুরনো, হলদে হয়ে যাওয়া জীর্ণ গ্রন্থ বার করল। বেশ মোটা বই, বছর সত্তর আগে চিৎপুরের বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির নাম 'গোপাল ভাঁড় রহস্য লহরী'।

পেজ-মার্ক দেওয়া ছিল। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে গঙ্গারাম দেখাল সেখানে এই একই গল্প একটু দীর্ঘাকারে, সাধুভাষায় লেখা আছে।

দুই ঠোঁট কুঞ্চিত করে, পোষা কুকুরকে যেভাবে ডাকে, সেইভাবে চু-চু-চু করতে করতে গঙ্গারাম বলল, 'কেন যে আপনি ছাই-ভস্ম এইসব হাসির লেখা লেখেন, সবই তো আগে লেখা হয়ে গেছে। আপনি ভাল করে পড়াশুনো করে আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে কিছু লিখুন তো।'

রীতিমতো অপমানিত বোধ করছিলাম। গঙ্গারামকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। তাকে বললাম, 'আর কিছু বলার আছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'হ্যাঁ আরেকটা গল্প। একটা সাংঘাতিক মোটা মতন লোক কোনওরকমে গড়াতে গড়াতে বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে গেছে নিজেকে দেখাতে। বিধান রায় অল্প একটু রোগীকে দেখে, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বললেন, 'আপনার তো খুব খারাপ অবস্থা। ওষুধ, চিকিৎসায় আর কিছু হবে না। মাস দেড়েকের মধ্যে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।'

রোগীটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে গেল। দেড় মাস পরে আবার সেই রোগীটি ডাক্তার রায়ের কাছে এসেছে, এই দেড়মাস প্রাণান্ত দুশ্চিন্তায় তার ওজন অর্ধেক হয়ে গেছে, ভুঁড়ি অদৃশ্য হয়েছে। চেহারা ছিমছাম হয়েছে, চলনে থলথলে ভাব নেই।'

রোগী এসে বিধান রায়কে বলল, 'আমার নির্ঘাৎ মৃত্যু, কিন্তু...', ডাক্তার রায় তাঁকে বলেছিলেন, 'মৃত্যুভয় দেখিয়েছিলাম তাতেই তো তুমি রক্ষা পেলে, নতুন জীবন ফিরে পেলে।'

আমি বললাম, 'এ গল্প তো সবাই জানে, এমনকী আমি নিজেও একবার লিখেছি।'

হাসতে হাসতে ঝোলা থেকে একটা বোর্ড বাউন্ড ইংরেজি বই বার করে গঙ্গারাম বলল, 'নাসিরুদ্দিনের গল্পের এটা প্রামাণ্য সংকলন। এই গল্পটা এই বইতে রয়েছে।'

মশা

অনেকদিন আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর খোঁজে বেহালায় তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন বেহালায় সাংঘাতিক মশা। ঝোপঝাড়, ডোবা, পানাপুকুর, কাঁচা নর্দমা—এগুলোর জন্যই বেহালায় মশা ছিল। সেসময় মূল কলকাতায় কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত কোনও মশা ছিল না।

কালীঘাটের বাড়িতে আমাদের কোনও মশারি ছিল না। যত মশা ছিল, বেহালা, যাদবপুর, টালিগঞ্জে এমনকী বালিগঞ্জেও।

সে যা হোক, বন্ধুটির বাড়িতে গিয়ে বেল দিয়েছি। একটি অল্পবয়সি কাজের মেয়ে এসে দরজা খুলল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অমুক বাড়ি আছে?' মেয়েটি নীরবে ঘাড় নেড়ে জানাল 'না, নেই।'

অতদূরে কষ্ট করে গিয়ে দেখা হল না, অথচ আমার ধারণা ছিল, বন্ধুটি সন্ধ্যাবেলা বাসায় থাকে।

পরদিন বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'তুই কাল বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বেল দিয়ে তারপর চলে এলি। কাজের মেয়েটি বাড়ির মধ্যে গিয়ে বলতে আমি বেরিয়ে এসে দেখি, তুই নেই, চলে গেছিস।'

আমি বললাম, 'তোদের মেয়েটি যে ঘাড় নেড়ে জানাল যে তুই নেই।'

বন্ধুটি বলল, 'আরে মশার জন্য ও ওরকম ঘাড় নাড়াচ্ছিল যাতে মশা মুখে না কামড়াতে পারে। আমি বাসায় না থাকলে ও সেকথা মুখে বলত। বাসায় আছি বলেই তোকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাকে বাড়ির মধ্যে ডাকতে গিয়েছিল।'

শুধু বেহালার দোষ দিয়ে লাভ নেই। একসময়ে সারা বাংলায় মশার অত্যাচারে থরহরি কম্প দেখা দিয়েছিল। প্রকৃত অর্থেই থরহরি কম্প। চল্লিশের দশকে মহাযুদ্ধ-মন্বন্তরের যুগে ম্যালেরিয়ায় ভুগে থরহরি কম্প বাঙালি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। চারদিকের খবর শুনে কেমন যেন একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে আসছে, বাঙালির ইতিহাসে সেই স্ফীত প্লীহা, অস্থলে-কুস্থলে অসময়ে কম্পমান, শুষ্ক জিহ্বা, কোটরগত চক্ষুর কুইনিনতিক্ত দিনগুলি আবার কি ফিরে এল?

সেই কবে, সেও পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন,

'মশায়
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।'

এই কেশনগর হল কেষ্টনগর বা কৃষ্ণনগর, যেখানে অন্নদাশঙ্কর চাকরিসূত্রে কিছুদিন ছিলেন। সম্প্রতি কোথায় যেন অন্নদাশঙ্করের স্মৃতিকথায় পড়লাম এই ছড়াটি তিনি লিখেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে চলে আসার পরে।

অন্নদাশঙ্করই পারেন মশক দংশনের বিষাক্ত স্মৃতিকে এমন সরস ও সুললিত ছড়ায় উপহার দিতে, আমরা পারি না।

আমরা তা পারি না। কিন্তু আমি একটা জিনিস পেরেছিলাম, সেও পঁচিশ বছর আগে, ডোডো-তাতাই গল্পমালায় মশার হাত থেকে বাঁচার উপায় বলেছিলাম।

ব্যাপারটা খুবই সোজা। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

প্রথমে পঞ্চাশ-ষাটটা মশা ধরতে হবে। ভয় পাবেন না, মশা ধরা, মশা মারার চেয়ে অনেক সোজা। ঘরের মধ্যে বিছানার কাছে একটা ফুটো মশারি টাঙিয়ে দেবেন। সেই মশারির মধ্যে কাউকে শুতে হবে না। কিন্তু ভোরবেলা দেখবেন মশারির মধ্যে বেশ কিছু মশা।

একটা কাচের বোতল নিয়ে এর মধ্যে যে ক'টা মশা সম্ভব ধরে ভেতরে পুরবেন। অনেক ধরতে পারবেন না, অনেক মরে যাবে। তাতে কিছু আসে যায় না। পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে বোতলে গোটা পঞ্চাশ মশা জমা পড়বে।

এবার বোতলের মধ্যে এককোঁটা আলতা ঢেলে ঝাঁকাবেন। এই আন্দোলনে কিছু কিছু মশা মরে যাবে। তা যাক।

বাকি যেগুলো জীবিত, জীবন্মৃত থাকবে, সেগুলো সন্ধ্যাবেলা ঘরে ছেড়ে দিন। এবার জীবনপণ লড়াই শুরু হবে লাল মশাদের সঙ্গে কালো মশাদের। এরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে যাবে। আপনাদের কোনও মশাই কামড়াবে না।

পরদিন সকালে দেখতে পাবেন ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে লাল ও কালো মশাদের অগুনতি মৃতদেহ।

খাদ্য সমস্যা

খাদ্য সমস্যা নিয়ে নিবন্ধ রচনার অনুরোধ আমার কাছে আসতে পারে একথা আমি কখনও ভাবিনি।

দেশ ও সমাজের খাদ্যের সমস্যা, সে অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। নাবালক বয়সে পঞ্চাশের মহামন্বন্তর দেখেছি, ষাট বছরের জীবনের পঞ্চান্ন বছর রেশনের তণ্ডুল খেয়ে জীবন ধারণ করছি। খাদ্য সমস্যা কাকে বলে সেটা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি। কিন্তু তা নিয়ে নিবন্ধ রচনার যোগ্যতা আমার নেই। মাস মাইনের 'নুন-আনতে-পান্তা ফুরোয়' সংসারের খাদ্য সংগ্রহ করতে উচাটন হয়ে আছি সারা জীবন। আমাকে কি না খাদ্য সমস্যা নিয়ে লিখতে বলা!

কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম। টেলিফোনের অপর প্রান্তে অনুরোধকারিণী তাঁর সুললিত কণ্ঠে বললেন, 'না। না। খাদ্য সমস্যার মতো জটিল ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আমরা মাথা ঘামাতে বলছি না। সে জন্য ভাল ভাল লোক আছে। আপনি বরং হালকা করে লিখুন দেশে, বিদেশে, ঘরে, বাইরে খাদ্য নিয়ে আপনার নিজের কখনও কোনও সমস্যা হয়েছে কি না?'

আমি বললাম, 'তা বহুবার হয়েছে। পয়সার অভাবে সুখাদ্য কিনতে পারিনি। সে অসুবিধে এখনও নিয়মিত হয়।'

অনুরোধকারিণী তরল হাসিতে আমার অক্ষমতা ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্যাঁচালো কথা মোটেই নয়। আমি জানি আপনি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছেন আমরা কী বিষয়ে কী ধরনের লেখা আপনার কাছে চাইছি।'

* * *

অগত্যা আমি যেমন বুঝেছি তেমনই লিখছি।

কলকাতা দিয়েই শুরু করি। বড় হোটেলের পশ রেস্তোরাঁগুলো বাদ দিলে উত্তরে শ্যামবাজার পাঁচমাথার গোল বাড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণে সুতৃপ্তি, পানীয়ন পর্যন্ত এমন কোনও উল্লেখযোগ্য রেস্তোরাঁ নেই যেখানে আমি আমার এই মহামূল্য জীবনের অমূল্য দু'দশ ঘণ্টা ব্যয় করিনি।

আমার পাইস হোটেলের অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়।

একক অবিবাহিত জীবনে আমাদের সাবেক কালীঘাটের বাড়িতে আমাদের রাঁধুনি রাধাদিদি পাগল হয়ে যান। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি ধোবানি। রান্না-বান্না ছেড়ে সেই রাধাদিদি সকাল-সন্ধ্যা কাপড় কাচতেন। সকালবেলা উঠে কর্পোরেশনের গঙ্গাজলে আলনার সমস্ত জামাকাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, এমনকী শতরঞ্চি, পাপোশ পর্যন্ত যা কিছু হাতের কাছে পেতেন সব কাচতেন। দুপুরে ছাদে সেগুলো শুকোত। আবার সন্ধ্যাবেলা সেগুলো কাচা হত। জামাকাপড় ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে কাচা হয়ে যেত। তখন আমি বহুদিন এক বস্ত্রে এবং পাইস হোটেলে খেয়ে কাটিয়েছি।

রাধাদিদি, তিনি আবার নিজের নাম বলতেন আধা আনি (রাধারানী), বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁকে নিয়ে উপন্যাস লিখব। আপাতত ফরমায়েসি খাদ্যের গল্প।

কলকাতার আর হাওড়ার রেস্তোরাঁর দুটি স্মরণীয় ঘটনা, পুরনো ব্যক্তিগত কাহিনী, তবু আরেকবার বলি।

ধর্মতলায় একটা প্রাচীন চায়ের দোকানে, (অধুনা অবলুপ্ত) একবার চা খেতে গিয়েছিলাম। স্রেফ চা। কিন্তু মাংসের ঝোল আর হলুদের দাগ লাগা ময়লা অ্যাপ্রন পরা বেয়ারা নাছোড়বান্দা। ঘর্ম মলিন, জীর্ণ প্রায় একটা মেনু এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, কিছু খাবেন না।'

মেনুটা তার হাতের থেকে নিতে গিয়ে লক্ষ করলাম, বেয়ারাটির হাতের আঙুলে কেমন চাকা-চাকা দাগ। ঘায়ের মতো। সভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি একজিমা আছে?'

লোকটি লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'না স্যার। একজিমা হবে না। ফিশ ফ্রাই হবে, কাটলেট হবে।'

কাটলেটের প্রসঙ্গে অন্য অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বলি।

ঘটনাটা বহুকাল আগের, ঘটেছিল হাওড়ার রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে। একটা কাটলেটের অর্ডার দিয়েছিলাম। যথারীতি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে সেই কাটলেটটি এল, বেশ বড় সাইজের।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাজার রকম চেষ্টা করেও, শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও কাটলেটটি ছুরি-কাঁটা দিয়ে কাটতে পারলাম না। তখন বাধ্য হয়ে বেয়ারাকে ডাকলাম। সে এলে অবিভক্ত কাটলেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম এর দ্বারা হবে না।

তখন বললাম, 'যাও ম্যানেজারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।'

অম্লান বদনে বেয়ারাটি জবাব দিল, 'ম্যানেজারবাবুও এ কাটলেট খেতে পারবেন না।'

খেপে গিয়ে বললাম, 'তুমি ওই কাটলেট ফেরত নিয়ে যাও।'

লোকটি অনেকক্ষণ ধরে উলটিয়ে-পালটিয়ে, খুব অভিনিবেশ সহকারে কাটলেটটি পর্যবেক্ষণ করল, তারপর বলল, 'এটা ফেরত হবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

লোকটি বলল, 'আপনি এটা বেঁকিয়ে ফেলেছেন।'

হাসির গল্প নয়। অন্য দশজনের মতোই আমার এই জীবনে উলটোপালটা খাবারের মুখোমুখি হতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

অবশ্য উলটো-পালটাই বা বলি কী করে? ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়ে কচুশাক আমার কাছে পরম উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু কোনও শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গিনীকে এ জিনিস দিলে স্পর্শ করতেও সাহস পাবে না। ছোটবেলায় দেশের বাড়িতে ঢ্যাপের মোয়া খেয়েছি। অসামান্য সুখাদ্য। ঢ্যাপ হল, শালুকের

বিচির খই। পদ্মবিচির খইয়েও মোয়া হয়। তাকে বলে এইচার মোয়া। জলের জায়গায়, শালুক-পদ্মের পৃথিবীতে এই খাদ্য সম্ভব। অন্যত্র কল্পনা করা কঠিন।

ব্যাংককে টুরিস্ট এলাকা খাউলান রোডের আশপাশের গলিতে পাইস হোটেলের ছড়াছড়ি। এক প্লেট গরম ভাত তার সঙ্গে কোনও কিছুর ঝোল। নাম শুনে বোঝার উপায় নেই কীসের ঝোল। সেখানে চিকেন ভেবে যে ঝোলটা কয়েকদিন খেয়েছি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন সেটা সাপ-ব্যাঙ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বিলেতে এক পাবে এক সন্ধ্যায় কালো বিয়ারের সঙ্গে আইরিশ সসেজ খেয়েছিলাম। এই সসেজও কালো ঝোলের মধ্যে চোবানো। সে যে কী ভয়ংকর ঝাল। ব্রহ্মতালু পর্যন্ত আগুন লেগে গিয়েছিল। সাতদিন মুখে জ্বালা, পেটে চিনচিনানি।

তালিকা দীর্ঘ করব না। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে শেষ করি।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় কয়েকদিন ছিলাম। অতিথিশালার ডাইনিং রুমের দেওয়ালে নোটিশ বোর্ডে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট করা আছে।

বোধহয় বছর দশ-পনেরো আগের মূল্য তালিকা। এর মধ্যে সেই দাম আর বাড়ানো হয়নি। অর্ডার দিলে বিরিয়ানি পাওয়া যাবে, আট টাকা প্লেট। চিকেন কাটলেট তিন টাকা। চা তিরিশ পয়সা, কফি চল্লিশ পয়সা, ভাত-মাছ সাড়ে চার টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম দিনই কৌতূহলভরে আমি ক্যান্টিনের ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এসব খাবার পাওয়া যাবে?'

ম্যানেজারবাবু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যাবে, কিন্তু খাওয়া যাবে না।'

আমি বললাম, 'তা হলে কী খাব?'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আপনি চাইলে আমি বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে দেব।'

আমার কিন্তু জেদ হল, আমি বললাম, 'আমি সরকারি দামেই খাব। ওই যে দেখছি পরোটা পঁচিশ পয়সা করে ওই দুটো আর এক টাকার সবজি দেবেন।'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'খেতে পারবেন না। সরকারি গমের পরোটা। খাওয়া অসম্ভব।'

আমি বললাম, 'দিন না খেয়ে দেখি। রাত ন'টার সময় ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।'

মফস্বলের ফাঁকা অতিথিশালা। ডাইনিং হলেও সাড়ে আটটা-ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ। রাত ন'টার একটু পরে আমার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়ে ম্যানেজার চলে গেলেন।

খিদে লেগেছে। আমিও খেতে বসলাম। সবজি বলতে এক টুকরো আলুসেদ্ধ, তেল ছাড়া শুধু নুন আর লঙ্কা দিয়ে মাখা। সঙ্গে সন্দেহজনক চেহারার দুটো পরোটা।

একটা পরোটা ছিঁড়ে এক টুকরো টেস্ট করতে যাচ্ছিলাম। ছিঁড়তে পারলাম না। দাঁত দিয়ে কামড়ালাম, দন্তস্ফুট করতে পারলাম না। তখন আমার রোখ চেপে গেছে। টেনে টেনে দু'হাতের বুড়ো আঙুল টনটন করছে। পায়ের জুতো দিয়ে চেপে ধরে, দরজার কপাটের ভাঁজে চিপে ধরে, জলে ভিজিয়ে বহুরকম চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সরকারি গমের পঁচিশ পয়সার অসূচীভেদ্য পরোটার গতি করতে পারলাম না।

শীতের রাতে দরদর করে ঘামছিলাম। আলুসেদ্ধটুকু মুখে দিয়ে দু'গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার আগে জানলা দিয়ে পরোটা দুটো উঠোনে ছুড়ে দিলাম। উঠোনের একপাশে বেশ কয়েকটা নেড়ি কুকুর ছিল, তারা সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পরোটার উপরে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রবল বাদ-বিতণ্ডা মারামারি চলল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, সেই পরোটা দুটো উঠোনের মধ্যখানে অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। আত্মকলহে ক্লান্ত কুকুরগুলি উঠোনের একপাশে শুয়ে আছে।

বউ কথা কও

এই রচনার নাম হওয়া উচিত 'বর কথা কও'। কিন্তু যেহেতু 'বউ কথা কও' একটি সর্বজনবিদিত সুকণ্ঠী পাখি আছে, তাই নামকরণে সেই বিখ্যাত বিহঙ্গকে উড়িয়ে আনলাম।

ভণিতা বেশি করে লাভ নেই।

মূল খবরটি রীতিমতো ফলাও করে প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না।

সংবাদটি এসেছে খোদ চিন দেশ থেকে, সেখানকার রাজধানী পিকিং তথা বেজিং থেকে প্রেরিত সংবাদ এটা। সমাজতান্ত্রিক দেশের থেকে আসা সুতরাং বিশ্বাস করতেই হবে। সংবাদটি প্রথম বেরিয়েছে, বেজিং ইভনিং নিউজ নামক দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকায়, সেখান থেকে উদ্ধৃত করেছে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া।

সংবাদটির বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্কে কারও মনে কোনও সন্দেহ না দেখা দেয় তাই এত কথা বলতে হল।

এবার মূল ঘটনায় যাই। দুঃখ ও আনন্দ মেশানো এমন চমকপ্রদ কাহিনী গল্প-উপন্যাসেও মিলবে না। বলিউডি সিনেমায় কিংবা চিৎপুরের যাত্রায় হয়তো এর কাছাকাছি গল্প পাওয়া যেতে পরে।

ঘটনাস্থল হল পূর্ব চিনের জেসিয়াং প্রদেশের একটি মফস্বল শহর। কাহিনীর নায়ক হলেন শ্রীযুক্ত লি নেংলৌ।

নেংলৌ সাহেবের ঘটনাটি অতি সংক্ষিপ্ত করে বলছি।

একদা, সে বহুকাল আগে নেংলৌ সাহেবের বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়ে কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, কিংবা কী কারণে ভেঙে যায় সেসব কিছু জানা যাচ্ছে না, তবে খবর পাওয়া গেছে, আজ থেকে একুশ বছর আগে সেই উনিশশো ছিয়াত্তর সালে শ্রীযুক্ত লি নেংলৌর আগের বিয়ে ভেঙে যায়।

এই প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর শ্রীযুক্ত নেংলৌ শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। বোধহয় বিবাহ-বিচ্ছেদের বেদনাতেই তিনি মূক হয়ে যান। সেই উনিশশো ছিয়াত্তর সালের পরে নেংলৌকে কেউ কখনও কথা বলতে দেখেনি। কথা বলেনওনি তিনি, সেই যাকে বলে শোকে পাথর হয়ে যাওয়া, নেংলৌ সাহেবের তাই হয়ে গিয়েছিল। তিনি বাকশক্তিরহিত হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি ঘটনা এক রোমাঞ্চকর বাঁক নিয়েছে। নেংলৌ পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই বিয়ের দিন বিয়ের আসরে এতদিনের শোকভার লাঘব করতে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নেংলৌ সাহেব প্রচুর মদ্যপান করেন।

মদ্যপান করতে করতে হঠাৎ নেংলৌ সাহেব উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সুদীর্ঘ একুশ বছর পরে কথা বলতে শুরু করেন। ঝরঝর করে কথা বলে যান তিনি, সঙ্গে অঝোরে কান্না।

নেংলৌ সাহেব আবার কখনও কথা বলতে পারবেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন শুভানুধ্যায়ীরা একথা কখনও আশা করেনি। সাশ্রুলোচন, সবাক নেংলৌকে এতটা আবেগবিহ্বল আগে কখনও দেখা যায়নি।

এই ঘটনায় প্রতিবেদক প্রশ্ন করেছেন, কারণটা কী হতে পারে :—

(১) অতিরিক্ত মদ্যপান।

(২) বিবাহবিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি।

(৩) পুনর্বিবাহের আনন্দ।

আমার মনে হয় এই তিনটি কারণই একত্র হয়েছিল এই ক্ষেত্রে।

তবে এক অর্থে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বিবাহিত জীবনে অনেকে রুদ্ধবাক হয়ে যায় কিন্তু বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। আর ফিরে পেয়েই বা ফয়দা কী? বিয়ের পর কয়জন পুরুষমানুষই বা কথা বলার স্বাধীনতা পায়।

ফরাসি দেশে এ রকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বিয়ের পরে প্রথম দিকে স্বামী কথা বলবে স্ত্রী শুনবে। তারপর শুধু স্ত্রী কথা বলবে স্বামী শুনবে। তারপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কথা বলবে। কেউ কারও কথা শুনবে না। এবং অবশেষে স্বামী-স্ত্রী কেউই কিছু বলবে না, কেউই কিছু শুনবে না।

একটু অন্যরকম একটা গল্প একদা শুনেছিলাম।

স্বামী বেচারা বিছানায় শয্যাশায়ী। চোখ লাল, জিব শুকনো, নাক দিয়ে অনর্গল ধারায় জল পড়ছে, গায়ে বেশ জ্বর।

ডাক্তারবাবু এসেছেন। তিনি যথারীতি কয়েকটা নিয়মমাফিক প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক কোনও জবাব না দিয়ে বোবার মতো 'আঁ'-'আঁ' করলেন। ডাক্তারবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ রকম কথা বলতে পারছেন না কতদিন?' রোগী হাতের আঙুল তুলে দেখালেন আটদিন।

অতঃপর ডাক্তারবাবু রোগীর স্ত্রীকে বললেন, 'আপনার স্বামী যে কথা বলতে পারছেন না।'

শুনে ভদ্রমহিলা অবাক, 'সে কী? উনি তো একবারো আমাকে বলেননি যে উনি কথা বলতে পারছেন না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আজ আটদিন আপনার স্বামীর এই অবস্থা চলছে। ওঁর কাছে এইমাত্র জানলাম। আর আপনি জানতে পারেননি।'

ভদ্রমহিলা কপালে করাঘাত করে উচ্চস্বরে বললেন, 'হায় রে, আমার কপাল! কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু আপনি নিজের চোখে দেখে নিজের কানে শুনে গেলেন, আজ আটদিন আমার স্বামী কথা বলতে পারছেন না। এই আটদিন এত কথা আমি তাঁকে বলেছি এই কথাটা উনি আমাকে একবারের জন্যও বলেননি।'

শেফালি

তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের বাংলা শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে কবিতার পাতার একটা অনিবার্য আকর্ষণ ছিল। প্রধান কবিরা সেইসব পুজো সংখ্যায় লিখতেন, আমরা তরুণ কবিরা হা পিত্যেশ করতাম তাঁদের পাশে আমাদের কবিতা দেখার জন্যে। এবং কখনও কখনও বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত।

বেড়ালের কথা নয়। ফুলের কথা বলি।

অনেককাল, অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর আগের একটা শারদীয়া সংখ্যা, খুব সম্ভব কোনও দৈনিক কিংবা তখনকার সাপ্তাহিক পুজো সংখ্যা। কবির নাম খুব সম্ভব কিংবা নিশ্চয় দীনেশ দাস। সেই

কবিতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি, এতদিন পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি, যদি ভুল হয়, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

'শরৎ শেফালি পড়ে ঝরে,
তার সাথে কোনদিন ঝরিনি অঝোরে।'

এতকালের কথা, অবশ্যই আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারণা করতে পারে। এমনও হতে পারে উদ্ধৃত প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় শব্দটি শেফালি ছিল না, ছিল শিশির।

কিন্তু এতকাল পরে এতে আর কিছু আসে যায় না। এতদিন বাদে, এই তিনযুগ পরে শেফালি ফুলের অমল সৌরভ হঠাৎ ফিরে আসে। রবীন্দ্রনাথ এক সাহসিকার কথা বলেছিলেন। আকুল আশ্বিনে, মেঘে ঢাকা দারুণ দুর্দিনে সেই সাহসিকা পায়ে নুপুর বেঁধে ঝঞ্ঝার মধ্যে পথে বেরিয়েছিলেন। কবি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে কবরীর শেফালি মালিকা?'

মহাকবির ভুল প্রশ্ন। শেফালি বাঁধা থাকে না, শেফালি ঝরে যায়, প্রতি রাতে শয়নে-স্বপনে ঝরে যায়। বকুল ছাড়া আর কোনও ফুল এমন অঝোরে ঝরে না।

কিন্তু বকুল সারাদিনই ঝরে। আর শেফালি ঝরে রাতের গভীরে, গোপনে, অগোচরে। ভোরের সূর্য ওঠার আগে শরৎ বা হেমন্তরজনীর শিশিরবিন্দুর সঙ্গে।

তা ছাড়া বকুল পোড়খাওয়া ফুল। ঝরে যাওয়ার পরেও সে টিকে থাকে। বাসি বকুলের গন্ধ আমাদের উন্মনা করে ফেলে।

শেফালি ক্ষীণায়ু। কোমলতনু। সংস্কৃতে শেফালি ফুলের সমাসজাত অর্থ হল যাতে ভ্রমর শয়ন করে। শেফ মানে হল শয়নকারী আর অলি হল ভ্রমর। শেফালি ফুল হল অলির বিছানা। এমন ব্যঞ্জনা শুধু সংস্কৃত শব্দেই সম্ভব।

শুনেছি আমাদের উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে গুজরাটে, পুরনো সিন্ধু প্রদেশে শেফালি ফুলকে বলা হয় পারিজাত ফুল। পারিজাত কোনও সাধারণ ফুল নয়। সমুদ্র মন্থনে সেই আদি যুগে দেব-দানবের মিলিত প্রয়াসে দেবতরু পারিজাত উঠে এসেছিল। পারি হল সমুদ্র, সেই সমুদ্র থেকে জাত, পারিজাত, পরিষ্কার পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস।

শেফালিকে আমরা পূর্ববঙ্গে, আমাদের গ্রামদেশে শেফালিই বলতাম। পশ্চিমবঙ্গে শিউলি বলে। আমি বলি না। শিউলি কেমন যেন সাদামাটা, ঘরগৃহস্থ। কেমন যেন বাড়িউলি, মুড়িউলির মতো মনে হয়। আমার বাঙাল কানে একটু খটকা লাগে।

এবার শেফালি ফুলের বর্তমানে চলে আসি। নিউ ইয়র্কে পূর্বী নদীর তীরে পূর্বপাড়া, ইস্ট রিভারকে পূর্বী নদী বলেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী, সেই বিখ্যাত কবিতা 'ডুবে যাওয়া মানহাটানের পাশে। এক ধারা অশ্রুজল।' ঘরের কাছে শান্তিনিকেতনে রয়েছে পূর্বপল্লী। অনেক গ্রামে, মফস্বল শহরেও আছে পূর্বপাড়া অথবা পুবের পাড়া। ঠিক সেই রকম কলকাতায়ও সম্প্রতি একটা পূর্বপল্লী গজিয়ে উঠেছে, যার সরকারি নাম বিধাননগর, খবরের কাগজে লবণহ্রদ আর লোকমুখে সল্টলেক।

আমার বর্তমান বসবাস এইখানে। এই কথাটা এখানে এল এই কারণে যে এত শেফালি ফুলের গাছ আর কোথাও দেখিনি। পাড়ায় পাড়ায়। বাড়িতে বাড়িতে, পার্কের মধ্যে। রাস্তার ধারে শুধু শেফালি আর শেফালি, অগুনতি শেফালি।

বর্ষার শুরুতেই দুয়েকটি গাছে ফুল ফুটতে শুরু করেছিল, আর আজ এই শেষ হেমন্তেও অধিকাংশ গাছই ফুলবন্তী।

সারারাত টুপটুপ শেফালি ঝরে পড়ে। ভোরবেলায় ঘাসের ওপরে শিশিরভেজা শেফালি,

হিমেল হাওয়ায় তার সৌরভ। হিন্দি ভাষায় শেফালিকে বলে হরশৃঙ্গার, দেবাদিদেবের পুষ্প সজ্জার জন্যে প্রকৃতি এই ফুল রচনা করেছিল। সেই সৌরভে মহাদেবের পুষ্পশৃঙ্গারের আভাস মেলে।

সকালবেলায় শেফালি ফুলের গন্ধে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব। কত কালের পুরনো স্মৃতি ফিরে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। আমার প্রতিবেশীরা প্রায় সবাই প্রৌঢ়, অবসরপ্রাপ্ত। ঝরে পড়া শেফালির ঘ্রাণে অবসরের দিন ভরে ওঠে। রোদ বাড়তে ঘাসের ওপর ফুলগুলোর ওপরে শিশির শুকিয়ে যায়, ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ে। মৃদু করুণ গন্ধ ভাসে কাছাকাছি বাতাসে।

ছোট বয়েসে এই ফুলগুলো কুড়িয়ে আমরা মালা গাঁথতাম। শেফালি ফুলের বোঁটা ছিঁড়ে হলুদ রঙে কাপড় রাঙাতাম। শেফালি ফুলের গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সে যে এই তো সেদিন।

এই লেখাটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। দোষ শেফালির। দোষ আমার নয়। দোষ প্রকৃতির, দোষ বাতাসের। গত বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বর্ষায় এসে পুরবৈয়া হয়েছিল এখন সে উত্তরে ঘুরছে। তবে এখনও মন স্থির করতে পারেনি। কখনও আমার বাঁদিকের জানলার ওপাশে শেফালি গাছের পাতাগুলোর আলতো করে বিলি কেটে দিচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই জোরে ঝাঁকি দিয়ে কয়েকটা ফুল মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই হাওয়া, ঝরা শেফালির হাওয়া, এই লেখাতেও এসে একটু লেগেছে।

ভালবাসার সন্ধানে

আচ্ছা, মধুমিতা তোমার তো বয়েস একুশ-বাইশ মতান্তরে সাতাশ-আটাশ হল। তুমি বিয়ে করোনি কেন?

বর কোথায়?

কেন? মা-বাপ কখনও কোনও সম্বন্ধ করেননি?

সম্বন্ধের বিয়ে আমার পছন্দ নয়। সেই সেজেগুজে যেতে হবে। আগুনের পরশমণি গাইতে হবে। মোচার ঘন্টে আদা দিতে হয় কি না, আলাস্কার রাজধানী কোথায়—এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

খবরের কাগজে তো নানা রকম বিজ্ঞাপন বেরয়, তার থেকে নিজেই বাছতে পারো।

পাত্র-পাত্রীর কলমের সবই তো আসলে সেই শিবরাম চক্রবর্তীর বিজ্ঞাপন।

শিবরাম চক্রবর্তীর বিজ্ঞাপনটা আবার কী? তিনি তো ব্যাচেলর ছিলেন। তিনিও কি নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি।

তা দেবেন কেন? বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি।

তা হলে বিজ্ঞাপনটা কীসের?

সপ্তাহে সপ্তাহে খবরের কাগজে মজার মজার কলাম লিখতেন শিবরাম। তা সেই কলামে শিবরাম একবার একটা বিয়ের বিজ্ঞাপনের খসড়া দিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, 'পাত্রীর নিজস্ব বাড়ি থাকা প্রয়োজন। বাড়ির ফটোসহ আবেদন করুন।'

বুঝতে পেরেছি, তুমি কী বলতে চাও। তা হলে বিয়ে করতে গেলে তোমাকে প্রেমের পথে যেতে হবে।

সে তো চেষ্টা করে যাচ্ছি, কোনও সুবিধে হচ্ছে না।

হেঁজি-পেঁজি, রানী-বানী, সবিতা-কবিতা সকলের হিল্লে হয়ে যাচ্ছে। আর তোমার সুবিধে হচ্ছে না।

চেষ্টায় তো ত্রুটি করছি না।

তা কী রকম চেষ্টা করছ, শুনি।

শেষেরটাই বলছি।

বলো। মন দিয়ে শুনছি।

আমাদের পাড়ার মোড়ে একটা নতুন বইয়ের দোকান হয়েছে না। সেই দোকানের মালিকের ছেলে দোকানে বসে। দেখতে চমৎকার, স্মার্ট, লেখাপড়া করা ছেলে।

তুমি তাকে গিয়ে সরাসরি প্রেম নিবেদন করলে?

আমি কি বোকা নাকি? আমি করলাম কি ওর ওখান থেকে 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনলাম। ছেলেটি কিন্তু নির্বিকার। একবারও আমার দিকে তাকাল না। নিঃশব্দে বইটা প্যাকেট করে দিল।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলছেন। শুনুন না। দু'দিন পর ওই দোকান থেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেছে কিনলাম 'যৌবনের গোপন তথ্য'। ছেলেটির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'দিন গেল। তারপর কিনলাম 'সুখী ও সার্থক বিবাহিত জীবন'। ছেলেটির দিকে কোনও পরিবর্তন দেখতে পেলাম না।

তারপর?

তারপর, আর কী? ওই দোকানে আর কখনও যাব না। ওই ছেলেটি আমাকে অপমান করেছে। কাল ওই দোকানে বই ঘাঁটছি এমন সময় ছেলেটি একটি বই এগিয়ে দিয়ে বলল, এবার আপনার বোধহয় এই বইটির প্রয়োজন পড়বে।

কী বইটি?

বইটির নাম হল, 'সহজ শিশু পালন পদ্ধতি'।

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে

যে কবি এমন চমৎকার একটি জিজ্ঞাসা রচনা করেছিলেন, তিনি নিশ্চয় জানতেন যে স্বর্গ কোথায়।

অবশ্য অতি শিশুকালে পাঠশালায় পড়ার সময় অন্য এক ছাত্র-পাঠ্য কবিতা পাঠ করে আমরা জেনে গিয়েছিলাম, স্বর্গ বা নরক বহু দূরে নয়, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-নরক রয়েছে।

এখানে এসব কবিকথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, বরং আমরা আসল স্বর্গ নরকের গল্পে যাই।

সবাই জানেন স্বর্গ ও নরকে প্রবেশ পথের পাশে একটি অফিস ঘর আছে। অফিস ঘরটি বড়,

এর একপাশে যমরাজা ও চিত্রগুপ্ত বসেন। আগে নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সব অবিন্যস্ত ছিল। অনেকটা সরকারি অফিসের মতো। প্রয়োজনে দরকারি রেকর্ড খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল। ফলে কখনও-সখনও ভুল হত, অবিচার হয়ে যেত।

আজকাল আর তা সম্ভব নয়। যমরাজের দপ্তর পুরোপুরি কম্পিউটার ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার অকালে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়ে কলকাতা থেকে পরলোকে এসেছিলেন। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি অফিস-কলিগের সঙ্গে নিয়মিত ফস্টি-নস্টি ইত্যাদি করতেন। তাঁর তিন মাস নরকবাস প্রাপ্য ছিল। তাঁর নরকবাস মুকুব করে যমরাজা তাঁকে কম্পিউটারের দায়িত্ব দিয়েছেন।

চিত্রগুপ্ত পুরনো ঘুঘু। দেখে দেখে অনেকটাই শিখে গিয়েছেন। সব মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে নম্বর দেওয়া আছে, প্রয়োজনানুসারে চিত্রগুপ্ত বোতাম টিপলেই নির্দিষ্ট লোকটির কাজকর্মের রেকর্ড বেরিয়ে আসে, তাই দেখে যমরাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালেও যমরাজা অফিস ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে সারা পৃথিবীর হাজার-হাজার সংবাদপত্র। আলগোছে, দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন তিনি। এখনকার মানুষের পাপকার্যাদির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

যমরাজার চোখে পড়ল কলকাতার কাগজগুলোয় বড় বড় হেডিং, 'শিক্ষা সম্মেলনে বজ্রপাত'। কলকাতার কাছেই কোথায় এক খোলা মাঠে শিক্ষা সম্মেলন হচ্ছিল, শিশুরা অজ আম ইট শিখবে নাকি বি এল এ ব্লে, সি এল এ ক্লে শিখবে কিংবা দুটোই, তাই নিয়ে কুটতর্ক। সেই কুটতর্কের মধ্যখানে বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়। ভয়াবহ ব্যাপার। কতজন হতাহত হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ এখনও সংবাদপত্র দিয়ে উঠতে পারেনি।

যমরাজা খোঁজ নিলেন। বজ্রপাত সভার মধ্যে হয়নি, মঞ্চে হয়েছিল। নিহতের সংখ্যা তিন-চারজনের বেশি নয়। তাঁদের মধ্যে দু'জন বলাইবাবু এবং কানাইবাবু যমালয়ে এসে গেছেন।

বলাইবাবু এবং কানাইবাবু দু'জনেই মরজীবনে মানে গতকাল পর্যন্ত কলকাতার শহরতলির দুটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

যমরাজা প্রথম বলাইবাবুকে ডেকে পাঠালেন। চিত্রগুপ্ত কম্পিউটারে রেকর্ড চেক করে বলল, 'ভদ্রলোক অধ্যাপক ছিলেন, শেষ বয়েসে, দু'বছর আগে কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন।'

যমরাজা সুবিবেচক, সব কিছু খোঁজখবর রাখেন, বললেন, 'গত দু'বছর তা হলে ভদ্রলোকের খুব ভোগান্তি হয়েছে। খুব কষ্ট করেছেন। কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি দু'বছর করা, সে তো সাক্ষাৎ নরকবাস। বলাইবাবুর আর কোনও রেকর্ড দেখতে হবে না। ওঁর অক্ষয় স্বর্গবাস আমি মঞ্জুর করলাম।'

বলাইবাবুর পাশেই ছিলেন কানাইবাবু। তিনি কুড়ি বছর কলেজের অধ্যক্ষতা করেছেন, যমরাজার এই কথার পরে তিনিও বলাইবাবুর সঙ্গে স্বর্গের পথে রওনা হলেন।

চিত্রগুপ্ত তাঁকে থামালেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন।' কানাইবাবু বললেন, 'বলাইদা মাত্র দু'বছর প্রিন্সিপালগিরি করেছেন তাই স্বর্গবাস। আমি ওঁর দশগুণ, কুড়ি বছর প্রিন্সিপাল ছিলাম, আমি তো স্বর্গেই যাব।'

চিত্রগুপ্ত যমরাজার দিকে তাকালেন। যম এতক্ষণ সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার ঠান্ডা গলায় বললেন, 'কানাইবাবু, আপনি কুড়ি বছর প্রিন্সিপালি করেছেন। আপনার নরকযন্ত্রণা অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনাকে নরকেই যেতে হবে।'

তারি লাগি যত

সব মহিলাই পুরুষ বিরোধী নয়। সব পুরুষই মহিলা বিরোধী নয়।

সবাই বাদী বা বিবাদীও নয়। নরবাদী কিংবা নারীবাদী, নরবাদিনী কিংবা নারীবাদিনী এদের সংখ্যা যত তার হাজার গুণ বেশি মানুষ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এ বিষয়ে আমাকে কেউ প্রশ্ন করলে আমি ব্যাপারটা কায়দা করে এড়িয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গোঁজামিল দিয়ে বলি,

'তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
নারীবাদিনীর শতদলতলে
করিতেছে টলমল।'

এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত হালকাভাবে নেয়া আমার উচিত হচ্ছে না, আমি আশঙ্কান্বিত বোধ করছি। বরং স্বামী-স্ত্রীর পুরনো গল্পে ফিরে যাই।

আদালত দিয়ে শুরু করি।

এক মহিলা বিচারালয়ের শরণাপন্ন হয়েছেন, তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকবেন না, বিবাহ বিচ্ছেদ চান।

কিন্তু আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের একটা কারণ দর্শাতে হবে। আদালত সে প্রশ্ন তোলায় মহিলাটি বললেন, 'আমার স্বামী আমার প্রতি বিশ্বস্ত নন।'

আদালত যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার প্রমাণ কী?'

একটু ইতস্তত করে মহিলা বললেন, 'দেখুন গত বছর আমার যে ছেলে হয়েছে, আমার ধারণা আমার স্বামী তার বাবা নয়।'

আদালতে আর একটা বিবাহ বিচ্ছেদের গল্প পুরনো এবং বহু কথিত। খুবই গোলমেলে গল্প। বলাও যায় না আবার না বলে থাকাও যায় না।

বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ হল। বাড়ি, ঘর, টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না সব কিছু সমান সমান।

কিন্তু গোলমাল বাধল মোক্ষম জায়গায়। এই দম্পতির তিনটি ছেলে। তিনটি মানবশিশুকে তো আর সমান ভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়।

চিন্তিত বিচারক ভ্রূ কুঞ্চন করে দুই পক্ষের উকিলকে বললেন, 'কী করব বলুন তো? আপনারা কোনও পরামর্শ দিতে পারেন?'

দুই উকিল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারপর বাদিনী ও বিবাদীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, তারপর বাদিনীর উকিল আদালতকে বললেন, 'হুজুর, একটা সমাধান হয়েছে।'

আদালত খুশি হয়ে বললেন, 'কী সমাধান?'

উকিলবাবু বললেন, 'আপনি এই বিবাহবিচ্ছেদ এক বৎসর স্থগিত রাখুন। এরা দু'জনে এখন একসঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবে। এক সঙ্গে থাকবে। সামনের বছর এই সময়ে এরা তিনটের স্থলে চারটে সন্তান নিয়ে এখানে আসবে। তখন আপনি ন্যায়সংগতভাবে বাচ্চাদের দু'জন-দু'জন করে ভাগ করে দেবেন।'

এর পরের কাহিনী রেলস্টেশনে। একেবারে রেলের কামরার মধ্যে।

লেডিস কামরা। এক প্রৌঢ়া বসে আছেন। কামরার দরজায় পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ এক যুগল। ট্রেন ছাড়তে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হল। ছেলেটি প্ল্যাটফর্মে ছুটতে ছুটতে হাত নেড়ে বিদায় বার্তা জানাতে লাগল।

অবশেষে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ট্রেনটি বেরিয়ে আসার পর মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে এসে সিটে বসল। কপালে, সিঁথিতে ডগমগ করছে সিঁদুর। গায়ে নতুন গয়না নিশ্চয় অল্পদিন আগে বিয়ে হয়েছে।

মেয়েটি আসনে বসার পর তাকে ওই প্রৌঢ়া বললেন, 'বাবা কাঁদাকাটি করতে নেই। বরের সঙ্গে তো আবার দেখা হবে। জীবনে বরকে ছেড়ে কত থাকতে হয়।'

চোখ মুছে, গম্ভীর মুখে নবোঢ়া মেয়েটি বলল, 'আপনি ভুল করেছেন, আমি বরকে ছেড়ে যাচ্ছি না, বরের কাছে যাচ্ছি।'

জাহাজ

আমরা জলের দেশের লোক। আমাদের ছোট শহরের চারপাশে নদী-নালা, খাল-বিল। জল আর জল। কাছেই দু'দিকে একটু এগিয়ে পিছিয়ে দুটো স্টিমার ঘাট, চারাবাড়ি আর পোড়াবাড়ি।

সামনে দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরী নদী দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এলাসিন, স্টিমারের জংশন স্টেশন। চারাবাড়ি পোড়াবাড়িতে স্টিমার আসে সিরাজগঞ্জ থেকে আর এলাসিনে সিরাজগঞ্জের স্টিমার ছাড়াও ঢাকার স্টিমার আসে, যায়।

এলাসিন আমার গ্রাম, আমার জন্মভূমি। এখনও সেখানে গৃহদেবতা আছেন, ভদ্রাসন আছে।

আমাদের এই জলভূমিতে রেলগাড়ি পৌঁছায়নি। শেষতম রেলপথ ছিল পঞ্চাশ মাইল দূরে। একটা নড়বড়ে বাসরাস্তা ছিল জেলা সদর পর্যন্ত কিন্তু সে পথও বর্ষাবাদলে খুব সচল থাকত না।

যাতায়াতের জন্য আমাদের প্রধান ভরসা ছিল জলপথ, নৌকো ও স্টিমার।

আমাদের অঞ্চলে স্টিমারকে বলা হত জাহাজ। প্রাচীন গ্রামবৃদ্ধেরা কেউ কেউ বলতেন কলের নৌকো বা কলের জাহাজ।

জাহাজ বাংলা শব্দ নয়। মূল আরবি শব্দটি হল জহাজ। বহুকাল আগে আরব সাগর বেয়ে এই শব্দটি বঙ্গোপসাগরে ভেসে এসেছে।

জাহাজ প্যাটার্ন বাড়ি, জাহাজ মার্কা বিড়ি। জাহাজ বাঙালির খুব নিজের শব্দ হয়ে গেছে। সংস্কৃত অর্ণবপোত টেঁকেনি। এমনকী বাংলা প্রবাদে ঢুকে এই আরবি শব্দটি বুদ্ধির জাহাজ হয়ে গেছে।

সে যা হোক, জাহাজের দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। মালবাহী জাহাজ এখনও আছে, যাত্রীবাহী জাহাজ বিরল। তার জায়গা নিয়েছে উড়োজাহাজ।

কলকাতা বন্দর থেকে একদা দেশ-দেশান্তরে যাত্রীবাহী জাহাজ যেত। এখন শুধুই কালেভদ্রে আন্দামান যাওয়ার জাহাজ ছাড়ে।

জাহাজ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্পকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী আছে। মনসামঙ্গল থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে অন্নদাশংকর রায় পর্যন্ত সে কাহিনীর বিস্তার।

জাহাজযুগের অবসানে একটা পুরনো দিনের কাহিনী স্মরণ করি।

বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) বন্দর থেকে শেষ বিলেতগামী জাহাজ ছেড়েছিল ষাটের দশকের গোড়ায়। সেই জাহাজে কলকাতার তখনকার প্রবীণ ব্যবহারজীবী ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন গিয়েছিলেন। বর্তমান গল্পটি তিনিই আমাকে বলেছিলেন। গল্পের খাতিরে ব্যারিস্টার সাহেবকে মি. চৌধুরী বলে অভিহিত করছি।

জাহাজের ডাইনিং হলে প্রথম দিন রাতে ডিনারের সময়ে মি. চৌধুরীর সঙ্গে এক ফরাসি সাহেবের পরিচয় হয়। নিতান্ত মুখ পরিচয়, কারণ মি. চৌধুরী ফরাসি ভাষা জানেন না। ওদিকে ফরাসি সাহেবও ইংরেজিতে সড়গড় নন, বিশেষ বলার চেষ্টাও করেন না।

ফরাসি সাহেব ডাইনিং টেবিলে ফরাসি কেতায় অভিনন্দন জানালেন, 'Bon Appetit'। মি. চৌধুরী ভাবলেন ভদ্রলোক নিজের নাম বলে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন, সেটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং বিনিময়ে তিনিও বললেন, 'এইচ. এস. চৌধুরী।' কিন্তু মনে খটকা রয়ে গেল।

এই রকম বেশ কয়েকদিন চলল। এর মধ্যে মি. চৌধুরীর জাহাজেই এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল যিনি ভাল ফরাসি জানেন। তাঁকে মি. চৌধুরী নিজের সমস্যাটা বললেন।

ভদ্রলোক মি. চৌধুরিকে বললেন, 'Bon appetit' ভদ্রলোকের নাম নয়। 'Bon Voyage' যেমন 'যাত্রা মধুর হোক', তেমনি 'Bon Appetit' একটা শুভেচ্ছা, 'আহার মধুর হোক।'

এর পরের ঘটনা অবশ্য অতীব হাস্যকর। এই জ্ঞান লাভ করার পরে ডাইনিং টেবিলে সেই ফরাসি সাহেবকে তাঁরই কেতায় মি. চৌধুরী শুভেচ্ছা জানালেন, 'Bon Appetit'।

এই শুনে ফরাসি ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এইচ. এস. চৌধুরী।' কারণ এতদিনে ওই ভদ্রলোক ধরে নিয়েছেন এইচ. এস. চৌধুরী হল কোনও ভারতীয় ভাষায় শুভেচ্ছা, ভোজন শুভেচ্ছা।

পুনশ্চ :

জাহাজ কাহিনীর শেষে একটা জাহাজডুবির গল্প।

জাহাজ নিয়ে যত গল্প জাহাজডুবি নিয়ে গল্পের সংখ্যাও তার চেয়ে কম নয়। জাহাজডুবি নিয়ে, বিশেষত ইংরেজি তথা ইউরোপীয় ভাষায় রচিত রোমাঞ্চকর স্মরণীয় কাহিনীর সংখ্যা অনেক।

এ গল্পটা অবশ্য রোমাঞ্চকর নয় বরং বলা চলে নীতিমূলক।

জাহাজডুবির পর সমুদ্র সাঁতরিয়ে এক নাবিক এক নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোথাও মানুষজন, জনপদ, সভ্যতার চিহ্ন কিছু নেই।

এই শূন্য দ্বীপে নাবিকটির মাস কয়েক কাটল। হঠাৎ একদিন একটা জাহাজ দেখা গেল। নাবিকটি উল্লসিত হয়ে দৌড়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে নিজের জামা খুলে একটা গাছের ডালের মাথায় পতাকার মতো উড়িয়ে জাহাজটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

জাহাজটি তীরে এসে দাঁড়াতে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন ডেকে এসে দাঁড়িয়ে নাবিকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এখানে কতদিন আছেন?'

নাবিকটি বলল, 'মাস কয়েক হবে।'

ডেক থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভালই তো আছেন মনে হচ্ছে।'

নাবিকটি চুপ করে রইল।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমি জাহাজ থেকে গত ছয় মাসের কিছু কিছু খবরের কাগজ আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি। পড়ে দেখুন, তারপরে বলুন পৃথিবীতে ফিরতে ইচ্ছে করে কি-না।'

এই গল্পটা এই পর্যন্তই জানি। এর পরে ঠিক কী হয়েছিল বলতে পারব না।

স্ত্রী রত্ন

মহাকবি গ্যেটে বলেছিলেন, মানুষ যে স্বর্গলোক থেকে নির্বাসিত হয়েছে সেই নির্বাসনে ক্ষতিপূরণ হল তার সহধর্মিণী।

মহাকবি কালিদাস গৃহিণী, সখী ও সচিবের কথা বলেছিলেন, আদর্শ সহধর্মিণী হল একাধারে এই তিনটি।

সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে স্ত্রী রত্ন বিষয়ে ভূরিভূরি কথা বলা আছে। সেখানে বলা আছে স্ত্রী রত্ন খারাপ বংশ থেকেও সংগ্রহ করা চলে। এবং এও বলা আছে যে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। প্রবাদ-প্রবচনে বলা আছে যে, বাড়ির বাইরে পথে বেরনোর সময় নারীকে বর্জন করা ভাল। অর্থাৎ স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে যেয়ো।

এইসব প্রাচীন প্রবচনে আমাদের অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে লাভ নেই। বরং আধুনিক গল্পে আসি।

সম্প্রতি একটা গল্প শুনলাম। এক ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে অনবরত ঝগড়া করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে স্বামীকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো এভাবে ঝগড়া করার কোনও মানে হয় না।'

পতিদেবতা নাকি স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে জানতে চেয়েছিলেন, 'তা হলে, আর কীভাবে ঝগড়া করা যাবে?'

এই প্রশ্নের উত্তর শুনেছি পত্নীঠাকুরানি দেননি এবং এর উত্তর আমরাও দিতে পারব না। তবে বাদ-বিসম্বাদ-কলহ পঁচিশ বছর ধরে লাগাতার চালিয়ে গেছেন এমন একটি দম্পতিকে আমি জানি।

পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীর দিন স্ত্রী স্বামীকে বলেছিলেন, 'ওগো, আমাদের এই বিয়ের রজতজয়ন্তী আমরা কীভাবে উদযাপন করতে পারি।' একটুও চিন্তা না করে স্বামী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, 'পাঁচ মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করে।'

এবার স্বামী নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসি। আমি সেই তরুণীর কথা বহুকাল আগে লিখেছিলাম। যে বলেছিল, 'আমার স্বামী হবে ঝকঝকে, স্মার্ট, আধুনিক, গান-বাজনা, কথাবার্তায় নিপুণ, সবজান্তা এবং বর্ণোজ্জ্বল।' তরুণীটির এই আবদার শুনে তাকে কে যেন বলেছিল, 'আসলে তুমি একটা রঙিন টিভি সেটের কথা বলছ। কোনও মানুষের কথা বলছ না।'

হয়তো তাই। এ বিষয়ে আরও একটা অন্যরকম জটিল গল্প শুনেছি।

দুই বান্ধবী চিড়িয়াখানায় গেছেন। তাঁরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খাঁচায় জীবজন্তু দেখছেন। অবশেষে তাঁরা পাখির খাঁচার সামনে এসেছেন। সেখানে চিড়িয়াখানার এক কর্মচারী তাঁদের একটা বড়সড়, ল্যাজঝোলা পাখি দেখালেন। পাখিটা গুটিসুটি মেরে খাঁচার এক প্রান্তে লুকিয়ে রয়েছে।

পাখিটাকে দেখে মহিলাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাখিটা ও রকম জড়সড় হয়ে গুটিয়ে আছে কেন?' কর্মচারীটি বললেন, 'এ পাখিটা খুব ভিতু স্বভাবের। সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকে। তার ওপরে কানে ভাল করে শুনতে পায় না। চোখেও ভাল দেখে না। তবে এর একটা ভাল গুণ আছে। এই পাখিটাকে হাবিজাবি, ছাইভস্ম যাই দেওয়া হোক তাই খায়। কোনও আপত্তি করে না। আর বেশ হজমও করতে পারে।'

এই কথা শুনে প্রশ্নকারিণী তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন, 'চমৎকার! এই পাখিটার দেখছি আদর্শ স্বামী হওয়ার পক্ষে সমস্ত গুণই রয়েছে।'

অতঃপর একটি প্রাক-পরিণয় প্রণয়কাহিনী বলা যেতে পারে।

কমলের সঙ্গে কমলার গভীর প্রেম। গলায় গলায় ভাব। বন্ধুবান্ধব সবাই সেটা জানে। হঠাৎ একদিন কমলকে ক্লাবে দেখা গেল অত্যন্ত বিমর্ষভাবে, চিন্তান্বিত মুখে বসে রয়েছে। কমলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামল। সে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার, এত চিন্তা কীসের?'

কমল করুণ কণ্ঠে বলল, 'কমলা সব ঠিক করে ফেলেছে।'

শ্যামল প্রশ্ন করল, 'কী ঠিক করে ফেলেছে?'

কমল খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'কমলা বিয়ে করছে।'

শ্যামল একথা শুনে যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তাতে কী হয়েছে? কমলার মতো, কমলার চেয়ে ভাল আরও কত মেয়ে আছে। এতে চিন্তার কী আছে?'

কমল বলল, 'চিন্তার যথেষ্ট ব্যাপার আছে। কমলা আমাকেই বিয়ে করছে।'

পুনশ্চ:

অনেক গাড়িতে নাম্বার প্লেটের পাশে 'এল' (L) লেখা একটা অতিরিক্ত প্লেট থাকে। এই 'এল' (L)-এর মানে হল লার্নার, শিক্ষার্থী। যারা গাড়ি চড়া শেখে তারা লার্নার লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালায়।

সে যা হোক, দুটি সতেরো-আঠারো বছরের নাবালক-নাবালিকা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গেছে বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে। বলা বাহুল্য, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মহোদয় তাদের বলেছেন, 'তোমরা বিয়ের উপযুক্ত হওনি। প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের বিয়ে হতে পারে না।'

অনেক ভেবেচিন্তে ছেলেমেয়ে দুটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি আপাতত লার্নার লাইসেন্স পেতে পারি?'

আদ্যনারায়ণ

আজ যখন চতুর্দিকে সমস্তই বিশৃঙ্খল এবং বেনিয়ম, বার বার আদ্যনারায়ণবাবুর কথা মনে পড়ে।

অতি বাল্যকালেই তিনি লক্ষ করেছিলেন যে ধোঁয়া তা উনুনের ধোঁয়াই হোক আর তামাকের ধোঁয়াই হোক কখনও সোজা লম্বালম্বি উপরের দিকে ওঠে না, গোল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে। তাই প্রথম যৌবনে তিনি তখন তামাক ধরলেন, গড়গড়া থেকে সোজাসুজি নল দিয়ে ধোঁয়া টানতেন না, এতে নাকি ধোঁয়া ঠিকমতো বেরিয়ে আসতে পারে না, ধোঁয়ার খুব অসুবিধে হয়।

বিশাল লম্বা গড়গড়ার নল নিজে অর্ডার দিয়ে মোরাদাবাদ থেকে তৈরি করিয়ে আনিয়েছিলেন। সেই আমলের মোরাদাবাদী বাইশ-ইঞ্চি হাতের ত্রিশ হাত।

কলকের টিকেতে আগুন দেওয়ার পর নল মুখে করে উঠে দাঁড়াতেন আদ্যনারায়ণ। তারপর গড়গড়ার চারদিকে বিশাল হলঘরের মতো বড় বাইরের বসবার ঘরে, কখনও উঁচু হয়ে চৌপায়ার

উপর দিয়ে উঠে কখনও নিচু হয়ে টেবিলের পায়ায় গোল হয়ে নিজেকে নামিয়ে উঠিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে তাঁর ধূমপান চলত।

সত্তর বছর বয়েস হয়ে যাওয়ার পর এতটা আর পেরে উঠতেন না আদ্যনারায়ণ। তখন একটা লম্বা শালগাছের গুঁড়ি বসবার ঘরে ছাদ ও মেঝের মধ্যে আড়াআড়িভাবে ফেলে নিয়েছিলেন; পুরো নলটা উপরে নীচে জড়িয়ে পেঁচিয়ে তাঁর মুখের কাছে ইজিচেয়ারে এসে পৌঁছাত, তাতে চোখ বুজে একটা করে সুখটান দিতেন, আর স্বগতোক্তি করতেন, 'এভাবে কি ধোঁয়ার স্বাদ থাকে?'

একবার কলকাতায় এসে, তখন তাঁর প্রৌঢ় বয়েস, তিনি ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে সবচেয়ে সামনের সারিতে বসে লক্ষ করেছিলেন, ট্রাম চালানো কাজটা খুব কঠিন নয় শুধু পা দিয়ে ঘন্টা বাজানো আর হাত দিয়ে হ্যান্ডেল চালানো তা হলেই ট্রামগাড়ি লাইন-বরাবর চলবে।

আদ্যনারায়ণ অনেক ভেবেচিন্তে বুঝতে পারলেন, প্রথম শ্রেণীর সামনের দিকটা একটু এগিয়ে দিলেই সেই সিটে বসে যে-কোনও যাত্রী ট্রাম চালিয়ে নিতে পারবে।

ট্রাম কোম্পানিকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন তিনি। গাড়ি যখন এত সহজ পদ্ধতিতেই চালানো সম্ভব, শুধু শুধু মাইনে দিয়ে একগাদা ড্রাইভার পুষে লাভ কী? ট্রাম কোম্পানি আদ্যনারায়ণের চিঠির উত্তরে বিনীতভাবে জানিয়েছিল যে, যাত্রীরা কি গাড়ি চালাতে রাজি হবে। আদ্যনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'যে যাত্রী চালাবে তার কাছ থেকে ভাড়া নেবেন না; তা হলেই যাত্রীর অভাব হবে না।' ট্রাম কোম্পানি কয়েকদিন পরে প্রশ্ন পাঠাল, 'কিন্তু স্যার, যখন গাড়ি খালি থাকবে, কোনও যাত্রী থাকবে না?' আদ্যনারায়ণ জবাবে জানালেন, তখন তো কন্ডাক্টর বেকার, সেই চালাবে। তারপর একজন যাত্রী উঠলেই সে চালাবে, তার কাছ থেকে টিকিট নেওয়া হবে না, পরের যাত্রীরা উঠলে তখন টিকিট নেওয়া হবে, শুধু আগের যাত্রী-চালক নেমে গেলে আরেকজন চালাবে, তারও ভাড়া লাগবে না। এইভাবে চলবে, লাস্ট স্টপ পর্যন্ত যদি কোনও প্যাসেঞ্জার না থাকে কন্ডাক্টর নিজেই চালিয়ে গাড়ি ডিপোতে ঢুকিয়ে দেবে।

দুঃখের বিষয়, আদ্যনারায়ণের সঙ্গে তখনকার ট্রাম কোম্পানির ইংরেজ পরিচালকমণ্ডলী আর পত্রালাপ বা অন্য কোনওরকম আলোচনায় যাননি। আদ্যনারায়ণ এই নিয়ে সারাজীবন ধরে আক্ষেপ করে গেছেন, 'তখনই বুঝেছিলাম, ব্রিটিশ জাতটা একেবারে অধঃপাতে গেছে, ওদের আর সাম্রাজ্য চালাতে হবে না।'

এসব প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। ট্রাম কোম্পানির সদর দপ্তরের পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে হয়তো এখনও এই যুগান্তকারী প্রস্তাবটি এই দুর্দিনে পুনর্বিবেচনার জন্যে উদ্ধার করা যায় এবং এখনও কার্যকর করতে পারলে হয়তো ট্রামের ভাড়া বাড়াতেই হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রেল দপ্তরকে অনুরোধ করব তাঁদের দপ্তরেও আদ্যনারায়ণের একটি পুরনো প্রস্তাব পড়ে রয়েছে, সেটি যদি বিবেচনা করেন। অবশ্য অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন বিদ্যুৎরেল চালু হয়েছে, এখন হয়তো সেই প্রস্তাব কার্যকরী করা যাবে না। তবুও বহু অঞ্চলে এখনও তো কয়লায় ট্রেন চলছে এবং অনেকদিন চলবে।

আদ্যনারায়ণের মূল প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্তভাবে আমরাও বিবেচনা করে দেখতে পারি:

'কয়লার সাহায্যে যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলে সেই কয়লার উত্তাপ অনেকটাই অব্যবহৃত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ইঞ্জিনের এবং বয়লারের গায়ে উপরে-নীচে তিন সারি করে দুই দিকে একেক সারিতে টানা ছয় ইঞ্চি পরপর এক-একটা দশ ইঞ্চি ব্যাসের বেশ বড় সাইজের উনুন করা চলে। এতে প্রত্যেক সারিতে কমবেশি চল্লিশটা করে উনুন ধরবে; তা হলে দুই দিকে তিন সারি করে সবসুদ্ধ মোট দুশো চল্লিশটা। একটা লাইনে সকালের দিকে যদি যাত্রীগাড়ি আর মালগাড়ি মিলিয়ে চারটে আর চারটে আটটা ট্রেন যাতায়াত করে তা হলে প্রায় দু'হাজার উনুন হয়ে যাচ্ছে। এই উনুনগুলোর জন্যে কোনও আলাদা কয়লায় দরকার নেই, ইঞ্জিনের উত্তাপেই এদের যথেষ্ট হয়ে যাবে।

এখন এই উনুনগুলোর পাশ দিয়ে লম্বা রেলিং করে রান্না করার জন্যে দাঁড়ানোর জায়গা করে দিতে হবে। তারপর পার্শ্ববর্তী স্টেশন এলাকাগুলির গৃহস্থদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। যার যে স্টেশনে বাড়ি সেখান থেকে রান্নার জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে উঠবে। রান্নার বিস্তৃতি ও পরিমাণের উপরে নির্ভর করে যার যে কয় স্টেশন পরে সম্ভব হবে রান্না শেষ করে সেখানে নেমে ফিরতি ট্রেনে ফিরে আসবে। এক টাকার মান্থলিতে বেশ কয়েক স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া-আসা চলে (সেই আমলে), কিন্তু এক টাকার কয়লা বা অন্য জ্বালানিতে সারা মাস রান্না করা যায় না বাড়িতে। ফলে অনেকেই এই প্রস্তাবে রাজি হবে।'

জানি না, আদ্যনারায়ণের এই প্রস্তাবে রেলগাড়ি কেন সায় দেয়নি, তাতে অন্তত ট্রেন প্রতি আড়াইশো মান্থলি বেশি বিক্রি হবে, জাতীয় সম্পদ কয়লা তারও অপচয় কমবে। রেল-দপ্তর এর চেয়ে অনেক জটিল ও স্বাভাবিক সব পরিকল্পনা ইতিমধ্যে করেছেন, আদ্যনারায়ণের প্রস্তাবটিও খুঁজে বের করে একবার বিবেচনা করুন।

আমার ভাগ্য

আমাদের পাড়া থেকে ফুটবল খেলার মাঠে যেতে পথে একটা বাজার পড়ত। সেই বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটা কাপড়ের দোকানের ঝাঁপের নীচ দিয়ে খেলার মাঠ যাতায়াতের পথে শর্ট-কাট করতাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুই দলের খেলোয়াড়, রেফারি ইত্যাদি সমেত প্রায় আঠারো উনিশজন আমরা একসঙ্গে ফিরছি, আমার হাতেই ফুটবল, আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে গমগমে। যখন সেই কাপড়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক বুড়ো মুসলমান ভদ্রলোক এত ছেলের মধ্যে তীক্ষ্ণ চোখে যাচাই করে নিয়ে আমাকে ডাকলেন। তিনি দোকানদার নন, ক্রেতা। একগাদা ছোট বহরের ডুরে শাড়ি সামনে নিয়ে বাছাই করছেন। তিনি আমাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে ভাল করে দেখে দোকানিকে বললেন, 'হ্যাঁ, এইরকমই লম্বা হবে' এবং এই বলে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে আমার কোমরের কাছে ধরে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখলেন; 'আরেক সাইজ বড় চাই' বলতেই দোকানদার আরেক রঙিন ডুরে শাড়ি এগিয়ে দিলেন, এটা একটু বড়। আবার বুড়ো ভদ্রলোক আমার কোমরের কাছ থেকে মাপ নিলেন এবং খুশি হয়ে সেটাই পছন্দ করলেন।

এতক্ষণ আমি ফুটবল হাতে বিমূঢ় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুরো ঘটনাটা মিনিট দেড়েকের মধ্যে ঘটে গেল। কোনও এক দূর গ্রামের অপরিচিতা বালিকার সঙ্গে সম-উচ্চতাসম্পন্ন হওয়ার জন্যে তার শাড়ির মাপ দেওয়ার কাজে আমাকে ব্যবহার করা হল; আমার চার পাশে তখন দেড়-ডজন বন্ধু আমাকে ঘিরে রয়েছে, অনেকেই মুখ টিপে হাসছে।

তখন আমার বারো-তেরো বছর বয়েস হয়েছে। বালকত্ব পার হয়ে প্রায় প্রথম যৌবনই বলা যায়। এই সময়ে এই ঘটনায় আমার পৌরুষ যেভাবে আহত হয়েছিল, বিশেষ করে বান্ধব-সমাজে আমার মর্যাদা যেভাবে পতিত হয়েছিল, তা হয়তো এখন আর কাউকে বোঝানো যাবে না।

আমার জীবনে চিরকালই এইরকম হয়ে আসছে। চিরকাল আমার আশেপাশের লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এমন সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিয়েছে যা কল্পনা করাই কঠিন।

একবার আমার বারান্দায় রাত বারোটা থেকে শুরু করে একেবারে ভোর হওয়া পর্যন্ত দুটো হুলো-বেড়াল এমন ঝগড়া করল, তিনবার বিছানা থেকে উঠে দরজার বার হাতে নিয়ে তাড়িয়ে দিলাম, তবু আবার ফিরে এসে ঘুরে ঘুরে সারারাত ধরে কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া করেই চলল; সেই রাতে একবিন্দু ঘুম হল না। কিন্তু ভেবে দেখুন পরদিন সকালবেলায় শুনলাম বাড়িসুদ্ধ লোক, এমনকী পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিনী পর্যন্ত বললেন যে কাল রাতে আমি নাকি এমন মাতলামি করেছি যে পাড়াসুদ্ধ লোকের সারা রাত ঘুম হয়নি।

হায় ঈশ্বর, কী করে বোঝাব! কী করে বোঝাব যে, কালীপুজোর রাতে মুখে ভুষো কালি মেখে, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে পাড়ার মোড়ে যে লোকটা থানার জমাদারসাহেবকে ভয় দেখিয়েছিল সে আর যেই হোক আমি নই, সে রকম যোগ্যতাই আমার নেই। কী করে বোঝাব যে, যে-কুকুরটা পাগল হয়ে ধনপতিবাবুকে কামড়িয়ে দেয়, সেই কুকুরকে আমি মাঝে মাঝে সকালবেলা বাসি রুটি খাওয়াতাম বটে কিন্তু সেই জন্যে সে পাগল হয়নি; কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমি কখনও জানতামই না যে কুকুরটা ভবিষ্যতে পাগল হতে পারে, পাগল হয়ে ধনপতিবাবুকে কামড়াতে পারে। এ ব্যাপারে আমার যে কোনও প্ররোচনা, অভিসন্ধি, কলাকৌশল ছিল না, পাড়ার কেউই বিশ্বাস করতে চায় না, আমাকে আড়ালে পেলেই হেঁ হেঁ করে হেসে বলে, 'দাদা, আপনার মতো তুখোড়...।'

সেই কবে এক সরল গ্রাম্য ভদ্রলোক শাড়ির মাপ দিয়ে শুরু করেছিলেন, তারপর থেকে সারাজীবন ধরে যা নয় তাই। চিরকাল আমি শিশুদের ভালবেসেছি, আর স্বকর্ণে আড়াল থেকে শুনেছি, শিশুর মায়েরা শিশুদের ভয় দেখাচ্ছে, 'সাবধান, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, না হলে এখুনি তারাপদকে ডেকে আনব', এবং তারপর স্বচক্ষে পর্দার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি, ভয়ে নীল হয়ে শিশুরা প্রাণপণ খেয়ে নিচ্ছে। একবার দু'বার নয়, এ রকম ঘটনা পৌনঃপুনিক দশমিকের মতো আমার জীবনে ঘুরে ঘুরে বারবার।

না হলে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, এই কয়েকদিন আগে চিৎপুর আর লালবাজারের মোড়ে সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম আবার সেই একই ঘটনা ঘটল। কিংবা বলা উচিত, তার চেয়েও মারাত্মক।

চিৎপুরের এই মোড়টায় কয়েকটা দোকান আছে যেখানে চামড়ার বেল্টে লাগানো ঘুঙুর বেচে। আমি জানতাম এগুলো নর্তকীরা নাচবার সময় পায়ে পরে নেয়। সেইখানে এক দোকানে এক অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক ওইরকম একটা ঘুঙুর লাগানো বেল্ট কিনছিলেন, হঠাৎ তাঁর কী মনে হল, তিনি বেল্টটা হাতে করে নিজের গলায় একবার লাগিয়ে নিয়ে তারপর আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই ঘুঙুরটা শক্ত করে ধরে, 'দাদা, কিছু মনে করবেন না', শুধু এইটুকু ভূমিকা করে আমার গলায় লাগিয়ে গর্দানের মাপ নিলেন। আমি তো বিস্মিত, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই মোটা ঘাড়ের মাপের গোদা পায়ের নর্তকী কেমন করে নাচবে? আমার বিস্মিত ভাব দেখে ভদ্রলোক নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর প্রিয় ছাগলের গলার মাপটা নাকি তাঁর নিজের গলার চেয়ে একটু চওড়া, প্রায় আমার গর্দানের মতো।

পরোপকার

অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে আমার মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ খারাপ।

আমার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে দুপুরের দিকে, অর্থাৎ আমি যখন বাড়িতে থাকি না, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিতে আসেন। আমি কেমন আছি, আমার পরিবারবর্গের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কাচের গেলাস, আয়না, চশমা ইত্যাদি ভঙ্গুর দ্রব্য ছুড়ে ফেলার প্রবণতা আমার কীরকম—এই জাতীয় বহুবিধ প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, পরামর্শ ও উপদেশে আমার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে।

একজন সুহৃদ নিজের পকেটের এক টাকা একত্রিশ পয়সা ব্যয় করে একগাছা তিরুলির বিখ্যাত পাগলের বালা আমার স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, নিকটবর্তী কৃষ্ণপক্ষ মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে সেটা পরাতে হবে, তা হলে আর ভয় অথবা চিন্তার কোনও কারণ থাকবে না। পাগলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে কিংবা এবং বালা পরতে আমি বাধা দিতে পারি; আমার স্ত্রী যদি প্রয়োজন বোধ করেন তা হলে সেই বিশিষ্ট দিনে যথাসময়ে কয়েকজন বলশালী লোক নিয়ে আমার সেই সুহৃদ আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে আসবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

আরেকজন একটি দাতব্য মানসিক চিকিৎসালয়ের দরখাস্ত ফর্ম রেখে গেছেন। সেই ফর্মে কিছুই করতে হবে না, শুধু আমার স্ত্রী ও ভাই এবং দু'জন প্রতিবেশী মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করবেন যে সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে অবিলম্বে আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কোনও মানসিক ওয়ার্ডে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এর জন্যে বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন হবে না। যে-কোনও দুই বা তিন কিস্তি 'কথায় কথায়' আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই কমিশনার সাহেব আবেদনের যৌক্তিকতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিতান্ত বেপরোয়া। যেদিন দরখাস্ত ফর্ম এনেছিলেন, তার পরদিনই খোঁজ নিতে এলেন কতদূর কী হল। যখন আমার স্ত্রীর কাছে শুনলেন যে, আমি সেই দরখাস্ত ফর্ম দেখে রেগে গিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তিনি কপাল চাপড়িয়ে 'হায়-হায়' করে উঠলেন এবং 'আর দেরি নয়, আর দেরি নয়' এই বলে দ্বিতীয় ফর্ম সংগ্রহের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। বোধহয় ইচ্ছা ছিল সেদিনই আরেকটি ফর্ম নিয়ে আসবেন।

দুঃখের বিষয়, সেদিন উলটো রথের জন্য আমাদের অফিস কয়েক ঘন্টা আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। উনি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমিও ট্রাম থেকে নেমে ফিরছি। একেবারে মুখোমুখি দেখা। তিনি আমাকে দেখে একেবারে ভূত দেখার মতো চমকিয়ে উঠলেন। আমি ঠিক করে ফেললাম এঁকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

সোজাসুজি বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?' ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'এই তোমার বাড়িতে।' আমি বললাম, 'আমিও আপনার বাড়ি হয়েই আসছি।'

ভদ্রলোক কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন, 'আমার বাড়িতে, এই ভরদুপুরে আমার বাড়িতে কী জন্যে?' তাঁর গলা কেমন যেন শুকিয়ে এল। আমি বললাম, 'আপনার গলা কেমন শুকিয়ে গেছে,

একটু জল খেয়ে নিন।' বলে তাঁকে পাশেই মোড়ের মুখে টিউবওয়েলের কাছে প্রায় ঠেলে নিয়ে গেলাম। বহুদিন অভ্যাস নেই মনে হল, ঘাড় গুঁজে মুখে মুখ লাগিয়ে জল খেতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না, কর্কশ গলায় 'আরও খান, আরও খান' হুকুম করে প্রায় এক গ্যালন জল খাওয়ালাম। যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন টইটম্বুর জল খেয়ে ঢকঢক করে টলছেন, সাদা জল খেয়ে কাউকে এর আগে এত বেসামাল হতে দেখিনি।

অবশ্য একটু পরে সামলিয়ে নিলেন এবং ঠিক তখনই আবার হুঁশ হল তাঁর 'আমার বাড়িতে কেন গিয়েছিলে?'

আমি তাঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। গল্পে-উপন্যাসে পড়েছি পাগলেরা মারাত্মক কিছু করার আগে এইভাবেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। তিনি বেশিক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সমর্থ হলেন না, ভয়ে ভয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন। এইবার আমি তাঁর একটু আগের প্রশ্নের জবাব দিলাম। হিমশীতল কণ্ঠে বললাম, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পেটানোর জন্যে।'

'পেটানোর জন্যে', সদাশয় পরোপকারী বন্ধু, হার্টফেল করেন আর কী, 'কাকে পেটানোর জন্যে?'

ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠা দেখে বড় আনন্দ হল, মৃদু হেসে বললাম, 'কাকে আর? আপনিও বাড়ির বাইরে, আপনার স্ত্রীও অফিসে। প্রথমে ঠেঙালাম আপনার চাকরকে, সে দরজা খুলে দিতেই তাতে ল্যাং মেরে ফেলে দিলাম, কিন্তু সে ব্যাটা মহা ধড়িবাজ। সে উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের উপর থেকে যেই তাকে আপনার টাইমপিসটা ছুড়ে মারলাম, ব্যাটা ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে দরজা আটকিয়ে চেঁচাতে লাগল। তারপরে পেটালাম আপনার ছোট ছেলেটিকে। কিন্তু যাই বলুন আপনার বড় ছেলেটি বড় তুখোড়, রেডিয়োটা ছুড়ে মারতেই সে ছোকরা সামনের চারতলা বাড়িটার কার্নিশে উঠে বসে রইল, কিছুতেই ধরতে পারলাম না।'

আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন হল না, ভদ্রলোক বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

অফিস

আমার অফিসে ঢুকবার তিনদিনের মধ্যে বন্ধু এসে বড়বাবুকে অনুরোধ করেছিলেন টেবিল সরাতে পিকক ড্যান্স নাচবার জায়গার বন্দোবস্ত করার জন্যে। তবুও আমার চাকরি যায়নি।

অবশ্য এ চাকরি যদি যাওয়ার হত তবে অনেক আগেই যেতে পারত, যেদিন যোগদান করেছিলাম কাজে সেইদিনই যাওয়ার কথা ছিল! কিন্তু তা যায়নি।

এর আগে মফস্বলে কাজ করতাম এক শিক্ষায়তনে। সেখান থেকে কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছিল না। আমার এ অফিস যত তাগাদা দেয় আমাকে তাড়াতাড়ি কাজে যোগদান করার জন্যে, আমার পুরনো শিক্ষায়তন ততই আটকিয়ে দেয়। অবশেষে দুই প্রান্তে যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করে একটা দিন কোনওরকমে স্থির করা গেল।

এ অফিসে বলে গেলাম, আমি তা হলে অমুক তারিখে আসছি, তবে আসতে একটু দেরি হবে। আর সেখানে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডে কিছু টাকা জমে রয়েছে যদি আসার দিন না নিয়ে আসি পরে নিয়ে আসতে খুবই অসুবিধা হবে।

আমার এ অফিস একটু আমতা আমতা করেই রাজি হয়ে গেলেন, 'ঠিক আছে, ওই প্রথমদিন একটু লেটেই আসবেন।'

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা হাতে পেতে পেতে বেলা সাড়ে বারোটা হয়ে গেল। আমার সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে ছিল। ট্রেনে আসতে শেয়ালদা পৌঁছাতে প্রায় দু' ঘণ্টার ধাক্কা, তাও অনেক পরে পরে ট্রেন। আমার এর পরের ট্রেন ছিল সোয়া দু'টার সময়। সেটা সোয়া চারটেয় এসে শেয়ালদায় পৌঁছানোর কথা, কিন্তু পৌঁছাল আরও আধঘণ্টা লেটে। তার মানে পৌনে পাঁচটায়। তারপর ট্রেন থেকে নেমে আর ভাববার অবসর নেই। মফস্বল থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে আসছি, সঙ্গে হ্যারিকেন, কুঁজো, শতরঞ্জি মোড়া বিছানা, কালো ট্রাঙ্ক, স্বল্পকালীন আবাসের জন্যে যা যা কিনেছিলাম কিছুই ফেলে আসিনি।

ভেবেছিলাম এই সমস্ত জিনিস কালীঘাটে আমার বাসায় রেখে এসে তারপর অফিসে যাব। কিন্তু এখন আর হাতে সময় কোথায়, পাঁচটা বাজতে চলল। যথাকালে একটি ট্যাক্সি সংগ্রহ করে তাতে মালপত্র উঠিয়ে নিলুম, তারপর সোজা এসে নামলুম আমার অফিসের সামনে।

এখন সমস্যা হল এই মালপত্র কোথায় রেখে যাই, কার জিম্মায়? কিছুই ঠিক করতে না পেরে একটা ঝাঁকামুটে রাস্তা থেকে সংগ্রহ করে ফেললুম। তার মাথায় আমার জিনিসপত্র চাপিয়ে দিয়ে অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

তখন পাঁচটা বেজে দু'-এক মিনিট হয়ে গেছে। সবাই বেরচ্ছে অফিস থেকে আর আমি বাক্স-বিছানা-ছাতা-লণ্ঠন নিয়ে অফিসে প্রবেশ করছি। নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র দৃশ্য, সবাই খুব অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

সোজা প্রধান কর্তার যাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলুম তাঁর ঘরে ঢুকে গেলুম। হাফডোরের বাইরে ঝাঁকামুটে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রধান কর্তা আমাকে দেখে বললেন, 'তা হলে আপনি এসে গেছেন, কেমন লাগল আজকের কাজ?' তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন আমি আগে কোনও সময়ে দুপুর নাগাদ জয়েন করেছি, এখন ছুটির সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি।

সুতরাং তাঁকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করতে হল, 'আমি স্যার কিছুতেই আগে আসতে পারলাম না, এই মিনিট পাঁচেক লেট হয়ে গেল, এই এইমাত্রই এলাম।'

শুনে ভদ্রলোক তাজ্জব, 'একে আপনি পাঁচ মিনিট লেট বলছেন। পাঁচ মিনিট লেট হয় দশটা পাঁচে, পাঁচটা পাঁচে নয়। আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করছি, এ রকম কোথাও কখনও শুনিনি।' ভদ্রলোক একটু থেমে নিলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আজকেই তো আপনার জয়েন করার লাস্ট ডেট ছিল?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে যথেষ্ট হয়েছে, আপনি জয়েন করতে পারেননি, আর তাই আপনার চাকরি খতম, মানে চাকরি এখানে হল না।' ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে টেবিল গোছাতে লাগলেন বোধহয় অফিস ছাড়বার প্রস্তুতি হিসেবে। আমি কী বলব ভেবে হাত কচলাচ্ছি, হঠাৎ ঝাঁকামুটেটি আর অপেক্ষা করতে রাজি নয় বলে হাফডোর ক্রশ করে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

বাক্স-বিছানা ইত্যাদি দেখে আঁতকে উঠলেন প্রধান কর্তা, 'এগুলো কার, এগুলো কী?' তিনি আমাকেই উত্তরদাতা জেনে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে, আমার বাক্স-বিছানা।' আমার বিনীত উত্তরে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, 'মানে এই অফিসে থাকবেন মনস্থ করে এসেছেন নাকি?'

সব বুঝিয়ে তাঁর উত্তেজনা প্রশমন করে সেদিন রাত্রিতে চাকরি রক্ষা করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত ন'টা। কিন্তু আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে বেরতে পারলাম না। ঢোকবার সময় কিছু বলেনি

কিন্তু বেরনোর সময় দারোয়ান কেয়ারটেকারের বিনানুমতিতে ওগুলো নিয়ে বেরতে দিল না। কেয়ারটেকারের অনুমতি আজও মেলেনি। অফিসের সদর দরজার একপাশে আমার বাক্স-বিছানা সাড়ে চার বছর পড়ে ছিল।

ভদ্রলোক

আসল ভদ্রতা হল মুখ না খুলে হাই তুলতে পারা। এত দামি কথা, সবাই বুঝতে পারছেন, মোটেই আমার নয়। এক ফাজিল মনীষী এই উক্তি করেছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব। মুখ না খুলে হাই তোলা যায় না। কেউ পারবে না। তবু চূড়ান্ত এটিকেটের সেটাই নাকি নিদর্শন।

অবশ্য এটিকেট ঠিক ভদ্রতা নয়। সেটা একটা অন্য জিনিস, পুরোপুরি বিলিতি ব্যাপার। ভরা গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় দুঃসহ লোডশেডিংয়ের গরমে নিজের বাসায় অন্য লোকের সামনে জামা গায়ে দিয়ে বসে থাকা, নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভরপেট না খাওয়া, সামনে সুস্বাদু খাবার থাকা সত্ত্বেও এবং হঠাৎ কখনও ভরপেট খেয়ে ফেললে ঢেকুর না তোলা—এইসব হল এটিকেট, যে-শব্দের কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নেই, ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে বিলিতি ভদ্রতা।

ভদ্রতার কথা পরে হবে। আগে ভদ্রলোকের কথা বলি। এটিকেটগ্রস্ত ভদ্রলোকের কথা।

ভদ্রলোকের সমস্যা অনেক। তাকে পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরতে হয়, জুতো পায়ে দিতে হয়, হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেউ খাবার দিলে তাকে টাকা দিতে হয় অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও। সে বাসে উঠলে চেনা লোকের মুখোমুখি হলে তার টিকিট নিজের সঙ্গে কাটে, সে সবার আগে সিট থেকে উঠে মহিলা বা বৃদ্ধ-যাত্রীকে জায়গা ছেড়ে দেয়।

প্রিয় পাঠিকা, আপনার কি এই ভদ্রলোককে বেশ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? তবে অনেকদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে—তাই নয়? এই ভদ্রলোককে আমি শেষবার দেখেছিলাম এক অগ্নিকাণ্ডের রাত্রিতে।

আমাদের পাশের গলিতে একটা পুরনো দোতলা বাড়িতে আগুন লেগেছিল। যতটা আগুন তার চেয়ে ধোঁয়া অনেক বেশি। বাড়ির পিছনে একটা খড় কাটার কল ছিল একটা খাটালের পাশে। ভেজা খড়ে আগুন লেগে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, ফলে চরাচর অন্ধকার।

ধোঁয়ার আশে-পাশে দু'-একটি লেলিহান শিখা। আমরা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই বাড়ির সামনে, নিরুপায় দর্শক। তবে একটা সান্ত্বনা ছিল যে বাড়ির সবাই অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

কিন্তু একটু পরে শোনা গেল সান্ত্বনাটা সঠিক নয়। দোতলার উপরে একটা চিলেকোঠা ঘর আছে, সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা থাকেন, বাড়িওয়ালার পিসিমা তিনি, গোলমালে নেমে আসতে পারেননি। বাড়ির যে পাশটায় আগুন লেগেছে তার অন্যপাশে ছাদ থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি রয়েছে। সেই সিঁড়ির দিকে আগুন এখনও যায়নি, যদিও বেশ ধোঁয়া রয়েছে। বৃদ্ধ

মহিলার পক্ষে সেই ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে এই ধোঁয়ার অন্ধকারের মধ্যে নেমে আসা অসম্ভব।

কী করা যায়, দমকল কখন আসবে, এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম আমাদের মধ্য থেকে সেই ভদ্রলোক নাক পর্যন্ত মুখ রুমালে ঢেকে দ্রুত লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন এবং অল্প পরেই তিনি ভদ্রমহিলাকে টেনে নিয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে আসতে আসতে আচমকা ভদ্রলোক একটা হোঁচট খেয়ে সিঁড়ি টপকিয়ে নীচে পড়ে গেলেন! তখন অবশ্য মাত্র চার-পাঁচ ধাপ বাকি ছিল। বৃদ্ধা মহিলা সামলে নিয়েছিলেন। তিনি সিঁড়ির পাশের একটা লোহার রেলিং আঁকড়িয়ে কোনওরকমে ধাক্কা বাঁচালেন। অন্য একজন দৌড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে নিয়ে এল।

আমরা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ভূপতিত ভদ্রলোককে তুললাম। আমাদের কিছু করতে হল না, তিনি নিজেই উঠলেন। বিশেষ চোট লাগেনি।

আমরা তখন গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাঁর সাহসের গুণগান করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি একবাক্যে আমাদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'সাহসী-ফাহসি যাই বলুন এটা কি ভদ্রলোকের কাজ করলাম, ভদ্রমহিলার আগে নেমে এলাম।' তাঁর পা হড়কিয়ে নীচে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা যাতে সহানুভূতি না দেখাই তাই তিনি ঘুরিয়ে একথাটা বললেন, সেটা আমরা বুঝলাম এবং বুঝতে পারলাম যে তিনি ভদ্রলোক।

অন্য এক ভদ্রলোকের গল্প বলি। একটা পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে তিনি দেখলেন দোকানের পাশে কোথাও সিগারেটে আগুন ধরানোর জন্যে জ্বলন্ত দড়ি নেই। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'না, দড়ি রাখি না।'

তখন ভদ্রলোক দোকানদারকে বললেন, 'তা হলে দেশলাইটা দিন।' দোকানি গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর দ্বিতীয়বার চাইতে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'দেশলাই নেই।'

এবার ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা সিকি বার করে বললেন, 'আমাকে একটা নতুন দেশলাই দিন।' সিকির বিনিময়ে দোকানদার নির্বিকারভাবে একটা দেশলাই ভদ্রলোককে দিলেন।

তখন ভদ্রলোক সেই দেশলাই খুলে একটা কাঠি বার করে জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরালেন। তারপর দেশলাইটা হতবাক দোকানদারকে দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দিন। এরপর আমার মতো কোনও ভদ্রলোক যদি সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই চায় তাঁকে দেবেন দেশলাইটা।'

ভদ্রলোকের কাহিনী ভদ্রমহিলাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এর পরের আখ্যানে দু'জন ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক আছে।

এক তন্বী যুবতী ট্রামে যাচ্ছিলেন। তন্বী বললে কম বলা হয়, তিনি রীতিমতো রোগা। তখন সকাল সাতটা, সাড়ে সাতটা। ট্রামে-বাসে তেমন ভিড় শুরু হওয়ার সময় হয়নি। ডিপোয় উঠে একটা লম্বা সিটে যুবতী একাই বসেছিলেন। একটু পরে লোক উঠতে লাগল, দুই বিশালবপু ভদ্রলোক যথাসময়ে যুবতীর দুই পাশে বসলেন। তাঁদের দেহের চাপে যুবতীর বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, একদম কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

হঠাৎ মুশকিল আসান হল। এক আধ-চেনা স্থূলকায়া মহিলা, শহরতলির কোনও একটা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা, তিনি এই সময়ে ট্রামে উঠেছেন।

প্রধানা শিক্ষিকাকে দেখে যুবতী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দিদি এখানে আসুন, আমার সিটে বসুন।' যুবতী উঠে দাঁড়াতে সামান্য যে ফাঁকটুকু তিনি কায়ক্লেশে দখল করে আসীন ছিলেন সেটুকু বুজে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

প্রধানা শিক্ষিকা সেই অপসৃয়মাণ বসার জায়গার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসব নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে কার কোলে বসেছিলে এতক্ষণ, সেটা বলে দাও।'

অবশেষে ভদ্রতার প্রশ্নে অল্প বয়সের একটা দুঃখের কথা মনে পড়ছে।

সাল ১৯৫০। স্থান টাঙ্গাইল টাউন, সদর রাস্তা (কোনও অজ্ঞাত কারণে যার নাম ভিক্টোরিয়া

রোড)। সময় খারাপ। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর সবচেয়ে খারাপ সময়।

আমি ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি, কৈশোর প্রায় শেষ। সদর রাস্তা দিয়ে আপনমনে যাচ্ছি। উলটো দিক থেকে আসছে মাছের বাজারের প্রাক্তন নিকারি বর্তমানে আনসার অ্যাডজুটান্ট আসগর মিঞা। তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু খেয়াল করিনি। খেয়াল করার বয়েস সেটা নয়।

কিন্তু আসগর নিকারি খেয়াল করেছিল। তখন তার আঙুল ফুলে কলাগাছ, তখন তার পুঁটিমাছ ফুলে রুইমাছ।

আসগর নিকারি রাস্তায় আমাকে ধরল এবং সগর্জনে জানতে চাইল তাকে আদাব না দিয়ে আমি কোন সাহসে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি, আমার মতো বেয়াদপ, বেতমিজেরা পাকিস্তানের শত্রু।

এইসব কটুবাক্য বলে আসগর নিকারি আমাকে নির্দেশ দিল তাকে দু'শোবার আদাব জানাতে। আমার বেয়াদপির সেটাই সাজা।

আমাকে রক্ষা করলেন স্থানীয় মুসলিম লিগের কর্মকর্তা সফিউল্লা সাহেব। তাঁরও তখন খুব রমরমা, কিন্তু তাঁর চক্ষুলজ্জা ছিল, এতদিন পরে মনে হয় তিনি ভদ্রলোকও ছিলেন।

সেই ডামাডোলের বাজারেও মুসলিম লিগ কর্তা সফিউল্লা সাহেবকে আসগর নিকারি রীতিমতো সমীহ করত।

সফিউল্লা সাহেব আমার দুর্গতি দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আসগর যখন আমাকে দু'শোবার আদাব দেবার নির্দেশ দিল, তিনি ব্যাপারটায় মাথা গলালেন। আসগরকে বললেন, 'ও যদি দু'শোবার তোমাকে আদাব দেয়, তোমাকেও সঙ্গে সঙ্গে দু'শোবারই আদাব ফেরত দিতে হবে, আদাবের সহবত মানতে হবে।'

এরপরে সেদিন নিকারি নিরস্ত হয়েছিল। একজন কিশোরের পক্ষে দু'শোবার কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব অভিবাদন জানানো তেমন দুঃসহ হয়তো নয়, কিন্তু প্রৌঢ় আসগরের সহবত মেনে সেটা ফিরিয়ে দিতে জিব বেরিয়ে যেত।

এই 'সহবত' শব্দটা আজকাল শুনি না। আগে শুনতাম এ লোকটা সহবত জানে না, ও বাড়ির ছেলেদের সহবত খুব ভাল। শব্দটার সঠিক মানে জানি না। তবে অনুমান করতে পারি সহবতই ইংরেজিতে এটিকেট।

মনে সন্দেহ হওয়াতে অভিধানের পাতা খুলে দেখছি সহবত শব্দের মানে হল 'সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা।' শব্দটি বাংলায় এসেছে নবাবি আমলে আরবি শব্দ সোহ্‌বৎ থেকে।

অপরদিকে এটিকেট শব্দটি ইংরেজিতে এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে। ফরাসি আর ইংরেজিতে শব্দটির একই বানান (etiquette) এবং অভিধানগত অর্থ হল সভ্যসমাজে ব্যক্তিগত আচরণবিধি।

এটিকেট ব্যাপারটা বোঝানো খুব সোজা না। বিশেষ করে আমার মতো একজন আধাবর্বর, মফস্বল চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে। আমার কোনও এটিকেট নেই। আমি কোনওদিন কেউ এলে উঠে দাঁড়াই না। প্রকাশ্য ভদ্র সমাজে হাই তুলতে হলে হাই তুলি, হাঁচতে হলে হাঁচি। গরমের দিনে বাসায় খালি গায়ে থাকি; কোনও ভদ্রমহিলা ভাদ্রবধূ, শালাজ বা প্রতিবেশিনী কেউ এলেই জামা বা গেঞ্জি গায়ে দিই না; মুনমুন সেন কিংবা শ্রীদেবী এলেও গায়ে দেব না। শুধু আমার যৌবনস্বপ্ন এক রমণীরতন আছেন, তিনি এই অধমের গৃহে যদি কখনও আসেন সেজন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার একটা ড্রেসিং গাউন আছে, সেটা জীবনে প্রথম গায়ে চড়াব।

ভদ্রতাবোধের চূড়ান্ত ঘটেছিল পুরানো চৈনিক সমাজে। একটা নমুনাই যথেষ্ট।

এক লেখকের রচনা সম্পাদকের পছন্দ হয়নি। তিনি লেখককে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাচ্ছেন, সঙ্গে এই বিনীত পত্র: হে সুমহান লেখক, হে বাণীর বরপুত্র, চন্দ্রকিরণের মতো স্নিগ্ধ ও কোমল, সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল আপনার প্রতিভা। আপনার রচনাসমূহ আপনার প্রতিভার মতোই ভাস্বর। আমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং অভিনিবেশ সহকারে আপনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি, পুলকিত হয়েছি, চমকিত হয়েছি। আমরা এই বিশাল ত্রিভুবনের তেত্রিশ

কোটি দেবতার নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি যে এ রকম মহৎ রচনা আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও পাঠ করার সুযোগ পাইনি। ভবিষ্যতে আর কখনও সে রকম সুযোগ আসবে কিনা তাও জানি না।

অথচ আপনার এই অসামান্য রচনা আজ আপনাকে আমাদের ফেরত দিতে হচ্ছে। তার কারণও বড় সাংঘাতিক। আপনার এই রচনা আমাদের পত্রিকায় যদি আমরা এখন ছাপি, ভবিষ্যতে আমাদের পাঠকেরা প্রত্যেক সংখ্যায় সর্বদাই এইরকম উচ্চমানের লেখা প্রত্যাশা করবে। আমরা তাদের সে প্রত্যাশা সহস্র বৎসরেও আর পূরণ করতে পারব না।

অতএব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, আশাহত মনে ও ভগ্নহৃদয়ে আপনার এই অমূল্য রচনা আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি। আপনার কাছে আমরা শতকোটি ক্ষমাপ্রার্থী। আশাকরি আপনার মহৎ হৃদয়ের গভীরতম উদারতায় আপনি আমাদের অবশ্যই মার্জনা করবেন।

ইতি
আপনার শ্রীচরণে চিরকৃপা প্রার্থী
আপনার ক্রীতদাসের দাসানুদাস
হতভাগ্য সম্পাদক

এটিকেট নিয়ে সাহেবরাও কিছু কম মাথা ঘামান না। হাঁটা-চলা, কথাবার্তা সমস্ত আচরণ সবই এটিকেটের আওতায় পড়ে। বিলিতি পত্রিকাগুলোতে এটিকেট-বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের নিয়মিত ধারাবাহিক কলম আছে, যেখানে জাঁদরেল ভদ্রলোকেরা এবং অভিজাত সুন্দরীরা 'একেই কি বলে সভ্যতা' বিষয়ে পাঠকদের জিজ্ঞাসার জবাব দেন।

খাওয়ার টেবিলে কাঁটা-চামচের সুষ্ঠু ব্যবহার, মাথার টুপি কখন খুলতে হবে, মহিলাদের সামনে কীভাবে হাঁচতে বা কাশতে হবে, ঘরে মহিলা প্রবেশ করলে কী করতে হবে, কতটা উঠে দাঁড়াতে হবে, কতটুকু এগিয়ে যেতে হবে, দরজা পর্যন্ত গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আবার দরজা আড়াল না করে কীভাবে সেই ভদ্রমহিলাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে ভেতরে আসার জন্যে এবং কী করতে হবে তিনি যখন আবার যাবেন—এ সমস্তই সৌজন্য বিধির পর্যায়ে পড়ে।

এখনও আছে কিনা জানি না, আগেরকালে বিলেতে এটিকেট শিক্ষার ইস্কুল পর্যন্ত ছিল। এইরকম এক ইস্কুলে প্রাচ্যদেশীয় এক মহারাজপুত্রকে অনেকদিন আগে একসময়ে ভর্তি করা হয়েছিল।

সে ছিল বেশ কিছুটা নির্বোধ এবং ততোধিক বেয়াড়া। চার সপ্তাহের কষ্টকর পাঠক্রমে সে প্রায় কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি। দেশে ফিরে আসার পর তার মহামান্য বাবা তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কুমার কী শিখলে এটিকেট ইস্কুলে?' কুমার অনেক চিন্তা করে, অনেক মাথা চুলকিয়ে অবশেষে বলল, 'খুব কঠিন ব্যাপার মহারাজ, সব গুলিয়ে গেছে।'

মহারাজ নিরাশ হয়ে বললেন, 'কিছুই মনে পড়ছে না তোমার?' কুমার বলল, 'শুধু একটা জিনিস মনে পড়েছে। মেমসাহেব বলেছিলেন শীর্ষাসনের সময় টুপি মাথায় না দিতে।'

ভদ্রতা সৌজন্য তথা এটিকেটের ভাল উদাহরণ হল নীচের চিঠিটি, এই উদাহরণটি দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র জানাচ্ছেন যে শ্রীমতী কমলেকামিনীর আমন্ত্রণ তিনি বিশেষ ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যে গ্রহণ করতে পারছেন না এবং এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র শ্রীমতী কমলেকামিনীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।'...

কাকের মাংস

নগর বিশ্রুত এক মদ্যপের কথা অনেকেই জানেন। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় গেলাসে একটু একটু করে পানীয় ঢালতেন আর অল্প পরেই কাঁদতে শুরু করতেন, 'আমার কী যে হয়েছে, যত খাই তবু আমার কিছুতেই নেশা হয় না!' অল্প খাওয়ার পরেই তাঁর এই দুঃখ শুরু হত এবং তারপরে ক্রমশ খেয়ে যেতেন, ফলত নেশা বেড়ে যেত আর 'নেশা হয় না' বলে আরও বিলাপ জুড়ে দিতেন।

যখনই নটবর হালদারের কথা মনে পড়ে, আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরের কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। নটবর হালদার পাগল হতে চেয়েছিলেন। তাঁকে কে যেন বলেছিল কাকের মাংস খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। বহু কষ্টে তিনি একটি কাক সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর যথারীতি সেটাকে কেটে মাংস রান্না করে খেয়েছিলেন। খেতে কেমন লেগেছিল ভগবান জানেন, কিন্তু তারপর থেকে দৈনিকই তিনি যেভাবে হোক একটি কাক ধরে এনে তার মাংস খেতেন। আর কেবলই আক্ষেপ করতেন, 'কী করে যে পাগল হব বলুন দেখি? কাকের মাংস খেলে নাকি পাগল হয়? কত যে কাকের মাংস খেলাম, ধরতে গেলে প্রতিদিনই একটা করে কাক রান্না করে খাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না আমার।'

নটবরবাবুর কিছু হল না বটে, কিন্তু নটবরবাবুর পাড়ার লোকেরা পাগল হয়ে উঠলেন। জবাই করা কাকের পালক রাস্তায় ফেলে দিতেই জগৎসংসারের যেখানে যত কাক ছিল নটবরবাবুদের পাড়া মনোহরপুকুরে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। আর সে কী চেঁচামেচি, হাজার হাজার কাকের চিৎকারে কান পাতা যায় না। ছাদে ছাদে কাক, প্রত্যেক জানলার আলসেয় কাক, ল্যাম্পপোস্টে আষ্টেপৃষ্ঠে কাক সব তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কাকের চিৎকার ছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা কিছু শোনা যাচ্ছে না; আর যত কোলাহল বাড়ছে দুর দূর থেকে আরও আরও কাক চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে।

দিনের পর দিন এইরকম চলল। পাড়ার লোকে অস্থির, শুধু নটবরবাবুরই ভ্রুক্ষেপ নেই। বহু লোক পাড়া ছেড়ে চলে গেল, পাড়ার মধ্যে দুটো স্কুল ছিল বন্ধ হয়ে গেল, মনোহরপুকুরে বাড়ি ভাড়া কমতে কমতে দুই কামরার ফ্ল্যাট পনেরো টাকা মাসিক এসে দাঁড়াল। পাড়ার দু'-একজন প্রভাবশালী লোক ওপর মহলে নালিশ জানাল। কিন্তু তাঁরা কেউই কিছু করতে সক্ষম হলেন না।

কোথাও এমন কোনও আইন নেই যার বলে কাকের মাংস খাওয়ায় বা রাস্তায় কাকের পালক ফেলায় বাধা দেওয়া যেতে পারে। একজন পরামর্শ দিলেন, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির কাছে যান। কিন্তু পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি কী করবে? তাঁরা একটা চিঠি দিলেন নটবরবাবুকে, 'কাকের মতন এমন নিরীহ পাখিকে প্রত্যহ হত্যা করা অতি গর্হিত কাজ। অন্তত আপনার মতো সদাশয় ব্যক্তির পক্ষে!'

নটবরবাবু পরদিনই জবাব দিলেন, 'আমি মোটেই সদাশয় নই। আমাকে ঘাঁটাবেন না মশায়রা, আমি পাগল হতে চাই, তাই কাকের মাংস খাই। আর কাক মোটেই নিরীহ পাখি নয়, তা হলে তাদের অত্যাচারে আমাদের পাড়ার লোকেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেত না। তা ছাড়া বহুদিন ধরে মানুষ হাঁস-মুরগি এসব কেটে খাচ্ছে, আগে সেটা প্রতিরোধ করুন, তারপর আমাকে বলবেন।'

বলা বাহুল্য, এরপর পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি আর একটুও এগোয়নি। তবে পাড়ার লোকের

পীড়াপীড়িতে থানা থেকে একদিন লোক এসেছিল। ঠিক একদিন নয়, দু'দিন এসেছিল। একদিন দিনের বেলায়, কিন্তু সেদিন কাকের ভিড় ঠেলে হরকিষেণ জমাদার এবং তাঁর সঙ্গীরা মনোহরপুকুরে ঢুকতে না পেরে ফিরে যায়। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় এল।

কিন্তু পুলিশই বা কী করবে? তারা নটবরবাবুকে অনেকরকম ভয় দেখাল। তিনিও নাছোড়বান্দা, ভয় পাবার লোক নন। আর পুলিশের কী ক্ষমতা আছে এ ব্যাপারে। কেউ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কেউ পাগল হওয়ার চেষ্টা করছে, তার জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিধান কোনও পুলিশ-সংহিতায় নেই।

স্বর্গ নরক

এই বিশ্বসংসারে যত কিছু বিষয় আছে, কুকুর-বিড়াল, মাতাল, উকিল-ডাক্তার এমনকী ছাতা-তালা কিংবা টর্চলাইট-প্রেসারকুকার ইত্যাদি সমস্ত প্রাণী ও দ্রব্য নিয়ে আমার পক্ষে যা সম্ভব উলটো-পালটা সবই লিখে ফেলেছি এবং তাও কোনও সদুদ্দেশ্য বা সাহিত্যের আদর্শের তাড়নায় নয় নিতান্ত অর্থ ও তাৎক্ষণিক খ্যাতির লোভে।

সুতরাং এবার আমাকে পরমার্থের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। এদিকে বয়েসও বাড়ছে, হাসি-ঠাট্টা আর কতদিন করা যায়। এবার স্বর্গের দিকে হাত বাড়াই। বামনদের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর একটা অক্ষম প্রয়াস থাকে। আমার এই চেষ্টাও তাই।

এই আলোচনার গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে স্বর্গ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবইতে সকলের সঙ্গে সেই সরল কপিটি আমিও কণ্ঠস্থ করেছিলাম, যেখানে কবি বলেছিলেন অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জবাব দিয়েছিলেন যে সে বহুদূর নয়। মানুষের মধ্যেই স্বর্গ-নরক রয়েছে। স্বর্গ-নরক মানুষ তার নিজের ব্যবহারে রচনা করে।

এসব কাব্যকথা থাক, স্বর্গ-সংক্রান্ত যে-কোনও আলোচনা ধর্মকথার সূত্রেই যাওয়া উচিত।

হিন্দুর স্বর্গে পারিজাত কানন আছে, আছে মন্দাকিনী নদী, আছে অনন্ত যৌবনা উর্বশী-রম্ভা-মেনকা এইসব সুরসুন্দরীরা। সেখানে অমৃতের ফোয়ারা। সুস্বাদু পানীয় ও খাদ্য স্বর্গবাসীদের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। এবং সংগত কারণেই স্বর্গবাসীরা অজয় এবং অমর।

খ্রিস্টানের স্বর্গ অর্থাৎ যাকে বাইবেলে প্রমিসড ল্যান্ড বলা হয়েছে, সেখানে মধু ও দুধের বন্যা বয়ে চলেছে। এ বিষয়ে গল্প আছে, এক পাদরি এক বালিকাকে নিষেধ করেছিলেন যাতে সে কুকুর-বিড়াল না ভালবাসে। তিনি মেয়েটিকে বলেন, তোমার বিড়াল বা কুকুর যখন মরে যাবে, তুমি মনে কষ্ট পাবে, তাদের আর কোনওদিন দেখতে পাবে না।

পাকা মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, কেন, আমি যখন মরে যাব তারপর স্বর্গে যাব, তখন ওদের সঙ্গে আমার স্বর্গে দেখা হবে। পাদরি তখন বললেন, তা সম্ভব নয়, কারণ জীবজন্তু কোনওদিন স্বর্গে যেতে পারবে না। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, বাঃ, তা কেন হবে? স্বর্গে যে

দুধ আর মধুর বন্যা বয়ে যায়, সেখানে যদি গোরু আর মৌমাছি না থাকে তা হলে ওই দুধ আর মধু আসে কী করে?

স্বর্গের বা পরলোকের বিষয়ে হজরত মুহম্মদের একটি কাহিনী স্মরণীয়। হজরত একদিন একটি খেজুরের পাতার চাটাইয়ের উপরে ঘুমিয়েছিলেন। তিনি ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁর এক ভক্ত তাঁকে বলেছিলেন, আপনি যদি অনুমতি করেন আমি তা হলে একটা ভাল বিছানা আপনার জন্যে তৈরি করে দিই। শুনে হজরত মুহম্মদ বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে আমার কীসের প্রয়োজন? একজন অশ্বারোহী যেমন ক্ষণিকের জন্যে গাছতলায় দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই তা পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেইরকম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পবিত্র হাদিস শরিফে আছে, পৃথিবী আত্মম্ভরিতার স্থান এবং স্বর্গ সুখের স্থান। পৃথিবী বিশ্ববাসীদের জন্যে কারাগার ও দুর্ভিক্ষ, যখন তারা পৃথিবী পরিত্যাগ করে তখন তারা যেন কারাগার এবং দুর্ভিক্ষ ত্যাগ করে। (রেফিক উল্লাহ সংকলিত এবং সম্পাদিত হাদিস শরিফের বাংলা অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মহাকবি মিলটন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' নামক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন, স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা শ্রেয়।

রবীন্দ্রনাথেরও স্বর্গ ব্যাপারটা সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা ছিল বলেই মনে হয়। এক অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে। আর 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, শোকহীন, হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন চেয়ে আছে এবং শেষ বিচ্ছেদের ক্ষীণ লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে দেখা যাবে না।

ধর্ম এবং কাব্য নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা মোটেই নয়। এবার আমরা স্বর্গসম্পর্কিত হাস্যকর উপাখ্যানে প্রবেশ করছি।

প্রথমে সেই গ্রাম্য বালকটির কথা বলি, যে তার বাবার সঙ্গে প্রথম একটা বড় শহরে বেড়াতে এসেছিল। সেই শহরে এসে সে জীবনে প্রথম বহুতল অট্টালিকা দেখে এবং লিফটে চড়ে। বাবার সঙ্গে লিফটে চড়ে সে যখন সর্বোচ্চ তলে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছিল, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে বাবাকে প্রশ্ন করে, বাবা, ভগবান কি জানে যে আমরা যাচ্ছি?

স্বর্গ বিষয়ে পরের কাহিনীটি এক গোঁড়া ক্যাথলিককে নিয়ে। ক্যাথলিক ভদ্রলোকটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি করুণ কণ্ঠে পার্শ্বে উপবিষ্টা স্ত্রীকে বললেন, ওগো, তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করছে। এই কথা শুনে সাধ্বী স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না, এত সহজে মন ভেঙে ফেলো না। আমার একটা পরামর্শ শোনো।

পরামর্শের প্রস্তাব শুনে ভদ্রমহিলা কান্না একটু থামালেন। তখন ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে দু'বার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, আমি মরে যাওয়ার পরে তুমি আবার বিয়ে করো।' এই প্রস্তাবে ভদ্রমহিলা আঁতকিয়ে উঠলেন, 'না, না। দুই স্বামীর কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

ভদ্রলোক তখন বললেন, 'আরে আমি তো আর একসঙ্গে দুই স্বামীর কথা বলছি না। আমার মৃত্যুর পরে তুমি বিয়ে করছ। তোমার এখনও এক স্বামী রয়েছে, তখনও এক স্বামী থাকবে।'

ভদ্রমহিলা অনেক চিন্তা করে বললেন, 'কিন্তু যখন আমরা সবাই মারা যাব, তখন স্বর্গে গিয়ে তো আমার আবার সমস্যা দেখা দেবে। সেখানে আমার দু'জন স্বামী হয়ে যাবে।'

মুমূর্ষু ভদ্রলোক এবার সত্যিই চিন্তায় পড়লেন। এটা ভাববারই কথা, স্বর্গে তাঁর স্ত্রীর তিনি ছাড়া আরও একজন স্বামী থাকবে এটা অকল্পনীয় এবং খুব অনৈতিক হবে। তিনি বেশ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁর মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল; তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো, তুমি আমার মৃত্যুর পরে পাশের গ্রামের জন সাহেবকে বিয়ে কোরো।' স্ত্রী অবাক হলেন, 'কেন জন সাহেবকে বিয়ে করলে সুবিধে কী?' স্বামী বললেন, 'খুব সুবিধে। জন সাহেব যে ক্যাথলিক নয়!

ও তো আর স্বর্গে যাবে না। তুমি পৃথিবীতে জন সাহেবের বউ হবে, তারপর মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে আবার আমারই বউ হবে।'

এই ক্যাথলিক ভদ্রলোকের মতো স্বর্গ সম্পর্কে সকলের ধারণা কিন্তু এত পরিষ্কার নয়।

স্বর্গে যাওয়ার সহজ পন্থা এই বিরল শতকের শেষেও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বহুকাল আগে ত্রেতাযুগে লঙ্কেশ্বর দশানন সরাসরি স্বর্গে চলে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করে যেতে পারেননি। তাঁর সেই মহান পরিকল্পনা পৌরাণিক প্রবাদে রাবণের সিঁড়ি নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। যদি রাজা দশানন সত্যি সত্যি সিঁড়িটা বানিয়ে যেতে পারতেন, এই ধরাধামের পাপীতাপীদের খুব উপকার হত। তাঁদের আর খারাপ কাজ করে মৃত্যুর পরে কষ্ট করে নরকবাস করতে হত না। তাঁরা সোজা সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে চলে যেতেন।

অন্য একটা পুরনো গল্প আছে স্বর্গের সিঁড়ি নিয়ে। পৃথিবীর মানুষেরা একবার ঠিক করল যে সবাই মিলে একসঙ্গে পরিশ্রম করে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি বানাবে যাতে মর্ত্যলোক থেকে সিঁড়ি বেয়ে সকলেই স্বর্গে চলে যেতে পারে।

সেটা ছিল পৃথিবীর আদিম যুগ। তখন ছিল সব মানুষেরই এক ভাষা। মানুষে মানুষে তখনও ভাষার ব্যবধান তৈরি হয়নি। সিঁড়ি গাঁথার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। আকাশ ফুঁড়ে স্বর্গের দিকে ক্রমাগত এগোচ্ছে সেই সিঁড়ি।

অবশেষে ভগবান কিংবা স্বর্গের দেবতারা প্রমাদ গণলেন। সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! এই সিঁড়ি সম্পূর্ণ হলে তো দেবতা আর মানুষে, স্বর্গে-মর্ত্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। যে-কোনও মানুষ সোজাসুজি স্বর্গে উঠে আসবে; কোথায় তখন থাকবে স্বর্গের পবিত্রতা।

অনেক ভেবেচিন্তে মহামান্য ঈশ্বর অবশেষে একটা বুদ্ধি বার করলেন। বলা বাহুল্য, কূট কচালে বুদ্ধির তাঁর কখনওই অভাব হয়নি। তিনি ভাষার সৃষ্টি করলেন। একেক গোষ্ঠী মানুষের মুখে একেক রকম ভাষা।

ফল দাঁড়াল অতি ভয়াবহ। আগে যেমন সবাই সবাইয়ের কথা বুঝতে পারছিল, সবাই নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি তৈরিতে সহযোগিতা করছিল, অতঃপর তার আর সম্ভব হল না।

সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপের লোক হয়তো চাইছে ইট; যেহেতু তার ভাষা পরের ধাপের লোকের বোধগম্য নয়, সে এগিয়ে দিল বালি। আবার এর পরের ধাপের লোক যখন বালি চাইছে, তার নীচের ধাপের লোকেরা তাকে এগিয়ে দিল চুন।

অনতিবিলম্বে দেখা দিল চূড়ান্ত হইচই, গোলমাল, সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। মানুষের স্বর্গের সিঁড়ির স্বপ্ন সেখানেই ভেস্তে গেল।

সেই আদিম যুগ থেকে শুরু হয়েছে। মানুষের স্বর্গের স্বপ্ন চিরদিনই এইভাবে ভেস্তে গেছে। আত্মকলহ এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝির অভাবে এই মর পৃথিবী থেকে স্বর্গ আজও বহুদূরে।

নন্দনবন ও পারিজাত কানন, রম্ভা ও উর্বশী, অমৃতরসের অধিকার থেকে মানুষ চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হয়েছে।

অবশেষে এই স্বর্গ-নরকের সামান্য নিবন্ধটি একটি অবিশ্বাস্য গল্প দিয়ে শেষ করি। বলা বাহুল্য, গল্পটি পুরোপুরি আমার নয়, এর মূল কৃতিত্ব এক বিদেশি লেখকের।

মাত্র তিরিশ সেকেন্ড আগে সুবিমলবাবু ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। এরই মধ্যে তিনি পরলোকে এসে গেছেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি সাধনোচিত ধামে পৌঁছে যাবেন একথা ইহজীবনে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

সুবিমলবাবু চোখ খুলে দেখতে পেলেন সামনেই দেয়ালে একটা ঘড়ি ঝুলছে, এখন সময় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। এই তো আধ ঘণ্টা আগে সকাল দশটার সময় তিনি নিজের বাড়ির বাইরের

ঘরে আরাম কেদারায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা দমবন্ধ ভাব এবং তীব্র যন্ত্রণা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপরে ঠিক সাড়ে ঊনত্রিশ মিনিটের মাথায় তিনি অক্কাপ্রাপ্ত হলেন এবং অবিলম্বে আধ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

স্বর্গের দূরত্ব পৃথিবী থেকে মোটেই কম নয়। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি গ্রহ এবং তাদের চাঁদ-টাদ উপগ্রহ সমেত সূর্যের সৌরমণ্ডল। আবার অনেকগুলি সূর্যের অনেকগুলি সৌরমণ্ডল নিয়ে মহাসূর্যের মহাসৌরমণ্ডল। এখানেই শেষ হলে ভাল ছিল। কিন্তু বিশাল তিমি মাছের পরে বিশালতর তিমিঙ্গিল, তারও পরে তিমিঙ্গিলগিল যেমন আছে, তেমনই মহাসূর্যের পরে আছে প্রমহাসূর্য, এইরকমভাবে ক্রমশ প্রপ্রপ্র...মহাসূর্য, এইসব চাকার উপরে চাকা, তার উপর চাকা ইত্যাদি। যেখানে শেষ হয়েছে তারও শেষে কিংবা শুরুতে রয়েছে পরলোক।

এই অনন্ত পথ মাত্র তিরিশ সেকেন্ডে চলে এসে সুবিমলবাবু অতিশয় বিস্মিত হলেন, তার চেয়েও বিস্মিত হলেন একটি আধুনিক রুচিসম্মত, সুসজ্জিত পথে প্রবেশ করে। সুবিমলবাবু মনে মনে ভাবলেন, স্বর্গ জায়গাটা তা হলে এইরকম। সেই যে পারিজাত বন, নন্দনকানন ইত্যাদির কথা তাঁর শোনা ছিল, তার সঙ্গে খুব মিল নেই কিন্তু এই ঘরটা ভাল। ভগবান তাকে ভাল ঘরই দিয়েছেন স্বর্গবাসের জন্যে।

সুবিমলবাবু একবার তাঁর সদ্য অতীত মানবজীবনের দিকে ফিরে তাকালেন। নিজের হাতে খুন করা ছাড়া পৃথিবীতে আর যত রকমের খারাপ কাজ করা সম্ভব জীবদ্দশায় তিনি তার সবই করেছেন। তাঁর ছিল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ লোকে যাকে বলে, ইধারকা মাল উধার আর উধারকা মাল ইধার। জাল-জুয়াচুরি, পঞ্চ মকার, জীবনে দু'পয়সা কামানোর জন্যে এবং নিজের তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্যে তিনি করেননি বা করতে পারতেন না এমন কোনও কুকর্ম নেই।

সুবিমলবাবু কিন্তু তাঁর পার্থিব জীবনে একবারও ঘুণাক্ষরে কল্পনা করতে পারেননি যে মৃত্যুর পরে তাঁর স্বর্গবাস হবে। চিরদিন তাঁর বিশ্বাস ছিল ওসব স্বর্গ-ফর্গ নেহাত গাঁজাখোর মূর্খের আজগুবি চিন্তা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। স্বর্গও নেই, নরকও নেই, যা হবে তা পৃথিবীতে জীবনকালেই হবে। মরে যাওয়ার পরে পুরো ব্যাপারটা একদম শূন্য, যাকে বলে ফক্কা।

কিন্তু এখন মৃত্যুর তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে সজ্ঞানে এইরকম একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করে সুবিমলবাবু বুঝতে পারলেন, স্বর্গ-নরক ব্যাপারটা মিথ্যে নয়।

দশটা তিরিশ মিনিটে অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় তিনি এই ঘরে প্রবেশ করেছেন, সামনের ডিসটেম্পার করা দেয়ালে ইলেকট্রনিক ঘড়িতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন দশটা বত্রিশ। মাত্র দু'মিনিট, এরই মধ্যে তিনি তাঁর লবণহ্রদের নবনির্মিত বাড়ির দোতলার ড্রয়িংরুম থেকে প্রমহাসৌরমণ্ডল অতিক্রম করে এখানে এসে গেছেন এবং শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে একজন জাপানি গেইসা বালিকা নৃত্যরতা অবস্থায় তাঁর পদপ্রান্তে এক প্লেট মাংসের বড়া রেখে গেছে, আর একটি দক্ষিণী দেবদাসী বিলোল অঙ্গ-বিভঙ্গে এক বোতল হুইস্কি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

সবদিক থেকে সব ব্যবস্থাই সুবিমলবাবুর মনোমতো। ঘরের দেয়ালে ফিকে নীল রংয়ের ডিসটেম্পার, একটা সুন্দর বিদেশি ক্যালেন্ডার, ভিতরে একটি ছিমছাম মণিপুরী চাদরঢাকা নরম বিছানা, বিছানার পাশে টিপয়ে সুদৃশ্য কাচের গেলাসে জল। এপাশে জানলার ধারে একটা হাফ-ডেকচেয়ার, ভাল বেতের জিনিস, আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না।

এখন আরাম করে এই ডেকচেয়ারে বসে গেলাসে একটু হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সুবিমলবাবু ভাবতে লাগলেন, একটু সোডা আর বরফ থাকলে ভাল হত। যেমন চিন্তা তেমন কাজ; সুবিমলবাবু ভাববার মুহূর্তের মধ্যে কোথা থাকে একটি মদালসা রক্ষী একটি নিঃশব্দ ট্রলির উপর রুপোর ট্রেতে সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে কয়েক বোতল সোডা আর একটা বরফের তাপনিয়ন্ত্রিত বাটি এনে রেখে গেল।

ডেকচেয়ারে বসে অল্প অল্প চুমুক দিয়ে নিজের ঠোঁট আর গলাটা ভিজিয়ে নিলেন সুবিমলবাবু।

মাংসের বড়ায় কামড় দিয়ে বুঝলেন এ জিনিসও অতি উপাদেয়, কোনওরকম ছাঁট বা চর্বি দিয়ে ভেজাল মাংসের বড়া নয় প্রকৃতই ভাল নরম মাংস, এ রকম জিনিস ভাল জায়গায় অর্ডার দিলেও সচরাচর পাওয়া যায় না।

পৃথিবী থেকে এখান পর্যন্ত আসতে সুবিমলবাবুর কোনও পরিশ্রমই হয়নি, হাওয়ায় পাখির পালকের মতো ভেসে তিনি চলে এসেছেন। কিন্তু এত দীর্ঘ দূরত্ব পলকের মধ্যে পাড়ি দিলেও কেমন যেন একটা মানসিক ক্লান্তি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। আর তা ছাড়া মাত্র আধঘণ্টা আগের সেই হার্ট স্ট্রোকের মর্মান্তিক আঘাত এবং যন্ত্রণা সুবিমলবাবু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করার পরে এখনও যেন অনুভব করতে পারছেন।

কিঞ্চিৎ পানভোজনের পরে সামনের খাটের উপরে পাতা বিছানায় গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। আপাতত একটু বিশ্রাম দরকার। কোথা থেকে কোথায় এলেন, এখানে কী করবেন, কতদিন থাকতে হবে, এসব বিষয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করার দরকার।

ঠান্ডা মাথা কথাটা মনে আসতে এবার সুবিমলবাবুর মনে একটু খটকা লাগল। মৃত্যুর পরেও এখন কি তাঁর মাথা আছে, তাঁর সেই চকচকে, গোলগাল, মসৃণ কুবুদ্ধিভরা টাকওলা মাথাটা। হাত তুলে মাথায় দিয়ে তিনি স্পষ্ট সেটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চ হল তাঁর, তা হলে তিনি সশরীরে এখানে এসেছেন। এত দূর পথ এত ভারী শরীরটা নিয়ে সাবলীলভাবে চলে আসা সোজা কথা নয়।

এবার আসল চিন্তা শুরু হল সুবিমলবাবুর। সামান্য কিছুক্ষণ আগে পৃথিবীতে ফেলে আসা তাঁর সংসার, নিজের হাতে তৈরি গাড়ি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ব্যবসা, ধনদৌলত, ফস্টিনস্টি কোনও কিছুর জন্যেই তিনি এখন আর কোনও টান অনুভব করছেন না।

সুবিমলবাবু ঠিক করলেন এত দূরে এখানে যখন এসেই পড়েছেন, এখানেই নতুন করে সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। ধীরে ধীরে এই স্বর্গ জায়গাটাকে ভাল করে বুঝে নিয়ে কবজা করতে হবে। যদি পার্টিশনের পর শূন্য হাতে এবং হাজারো দায়িত্ব কাঁধে নোয়াখালি থেকে কলকাতায় এসে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা, প্রতিষ্ঠা সব আয়ত্ত করতে পারেন তবে এখানেও পারবেন।

কীভাবে কী করবেন নানারকম ভাবতে ভাবতে সুবিমলবাবু গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

বহুক্ষণ পরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, সামনের দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন দশটা বেজে চৌত্রিশ। সুবিমলবাবু ধড়মড় করে জেগে উঠলেন। সর্বনাশ! একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমোলাম নাকি?

এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগতেই এক ব্যক্তি, যাত্রাদলের প্রতিহারীর মতো পোশাক তার, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সুবিমলবাবুর চিন্তার সূত্র ধরে বলল, না, মোটেই বারো ঘণ্টা নয়, দশটা বত্রিশ থেকে দশটা চৌত্রিশ, আপনি মাত্র দু'মিনিট ঘুমিয়েছেন। তার মধ্যে ঘুমোনোর আগে আপনি চল্লিশ সেকেন্ড ব্যয় করেছেন চিন্তা করার জন্য। অর্থাৎ ঘুমের জন্য মোটমাট আপনার আশি সেকেন্ড সময় গেছে।

সুবিমলবাবুর মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় বিস্ময়ের ভাব দেখে প্রতিহারী বলল, আপনার পানীয়ের গেলাসে দেখুন, বরফ একটুও গলেনি। বারো ঘন্টা হলে বরফ গলে জল হয়ে যেত।

অতঃপর প্রতিহারী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বিমূঢ় সুবিমলবাবুকে বলল, এবার আপনার আহারের আয়োজন করছি।

সঙ্গে সঙ্গে গেইসা, দেবদাসী ইত্যাদি দেবভোগ্যা রমণীরা সোনার থালায়, সোনার বাটিতে থরে থরে হাজার রকম সুখাদ্য এনে উপস্থিত করল, সঙ্গে উত্তম সুরা ও মধুর পানীয়। তারা বিলোল ভঙ্গিতে পরিবেশনে ব্যস্ত হল।

সুবিমলবাবু একটু আগেই কয়েকটা মাংসের বড়া খেয়েছেন। তবু ভাল খাবারের গন্ধে তাঁর আবার ক্ষুধার উদ্রেক হল। তিনি যথাসাধ্য ভোজন করার চেষ্টা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে

রসিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর একটি সুন্দরী বালিকা হাত মোছার ধবধবে তোয়ালে এবং সুগন্ধি উষ্ণজল এনে নিজেই সুবিমলবাবুর হাত-মুখ মুছিয়ে দিল।

ক্রমাগত সুন্দরী রমণীর সাহচর্যে সুবিমলবাবু একটু বিহ্বল বোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সম্পূর্ণ অচেনা এই জায়গায় সদ্য এসে দুম করে কোনওরকম হঠকারিতা করে ফেলা বিপজ্জনক হতে পারে। কেউ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, একটু ধীরেসুস্থে রয়েবসে এগোতে হবে।

এদিকে কিন্তু দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ কপালে উঠল, এতক্ষণে দশটা ছত্রিশ হল। মাত্র ছ' মিনিট। এরই মধ্যে বিশ্রাম, দীর্ঘ ঘুম, পানাহার সব হয়ে গেল। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।

সুবিমলবাবুর মনে আরেকবার সন্দেহের ভাব দেখা দিতেই সেই আগের প্রতিহারী এসে উপস্থিত হল এবং বিনা প্রশ্নেই বলল, না, ঘড়িটা খারাপ নয়। মহাজাগতিক বৈদ্যুতিক চুম্বক সবকিছুর সঙ্গে ওকে চালাচ্ছে। ওটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একসঙ্গে বাঁধা আছে। ওটা যদি থেমে যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও থেমে যাবে।

প্রতিহারী আরও বলল, এখানে সময়টা একটু আস্তে কাটে বলে প্রথম প্রথম মনে হয়। আপনি যদি পান, আহার, বিশ্রাম বা ঘুম অথবা অন্য কিছু ইচ্ছা করেন বলুন, তার আয়োজন করছি।

একটা লম্বা হাই তুলে সুবিমলবাবু বললেন, আর কত খাব, ঘুমাব। একটা কিছু করে তো সময় কাটাতে হবে। এত লম্বা সময়।

প্রতিহারী বলল, করার মতো কিছু তো এখানে নেই। বলে সে নিঃশব্দে চলে গেল।

বিরক্ত হয়ে সুবিমলবাবু আরেকটু সুরা পান করলেন, তারপরে আরও একটু। এইভাবে প্রচুর পান করে আবার নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

তারপর ঘুম থেকে উঠে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন দু' মিনিটও যায়নি। এখন সবে দশটা চল্লিশ। সুবিমলবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন, এখানে কতদিন থাকতে হবে, এই দীর্ঘ সময় কী করে কাটবে?

মনে প্রশ্ন জাগা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিহারী এসে উদয় হল, বলল, কী হল, ফুর্তিতে থাকুন। আরাম করুন।

সুবিমলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আর কত আরাম করব? এখানে আমাকে কতদিন থাকতে হবে?

প্রতিহারী ধীরকণ্ঠে বলল, চিরদিন। অনন্তকাল।

সুবিমলবাবু বিছানায় উঠে বসে সামনের শূন্য বোতল আর গেলাসটা মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিলেন। সে দুটো তুলোর খেলনার মতো মেঝেতে গিয়ে পড়ল, সামান্য শব্দ হল না, ভাঙল না, চুরল না।

এতে তিনি আরও খেপে গেলেন, প্রতিহারীর দিকে ছুটে গেলেন। প্রতিহারী বাতাসের মতো হালকা শরীর নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

পরাজিত সুবিমলবাবু গতিক সুবিধের নয় দেখে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, এর চেয়ে আমার নরকে যাওয়াই ভাল ছিল।

সেই একইরকম মৃদু হাসতে হাসতে প্রতিহারী ঠান্ডা গলায় বলল, এটাই নরক।

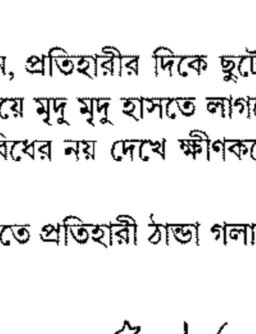

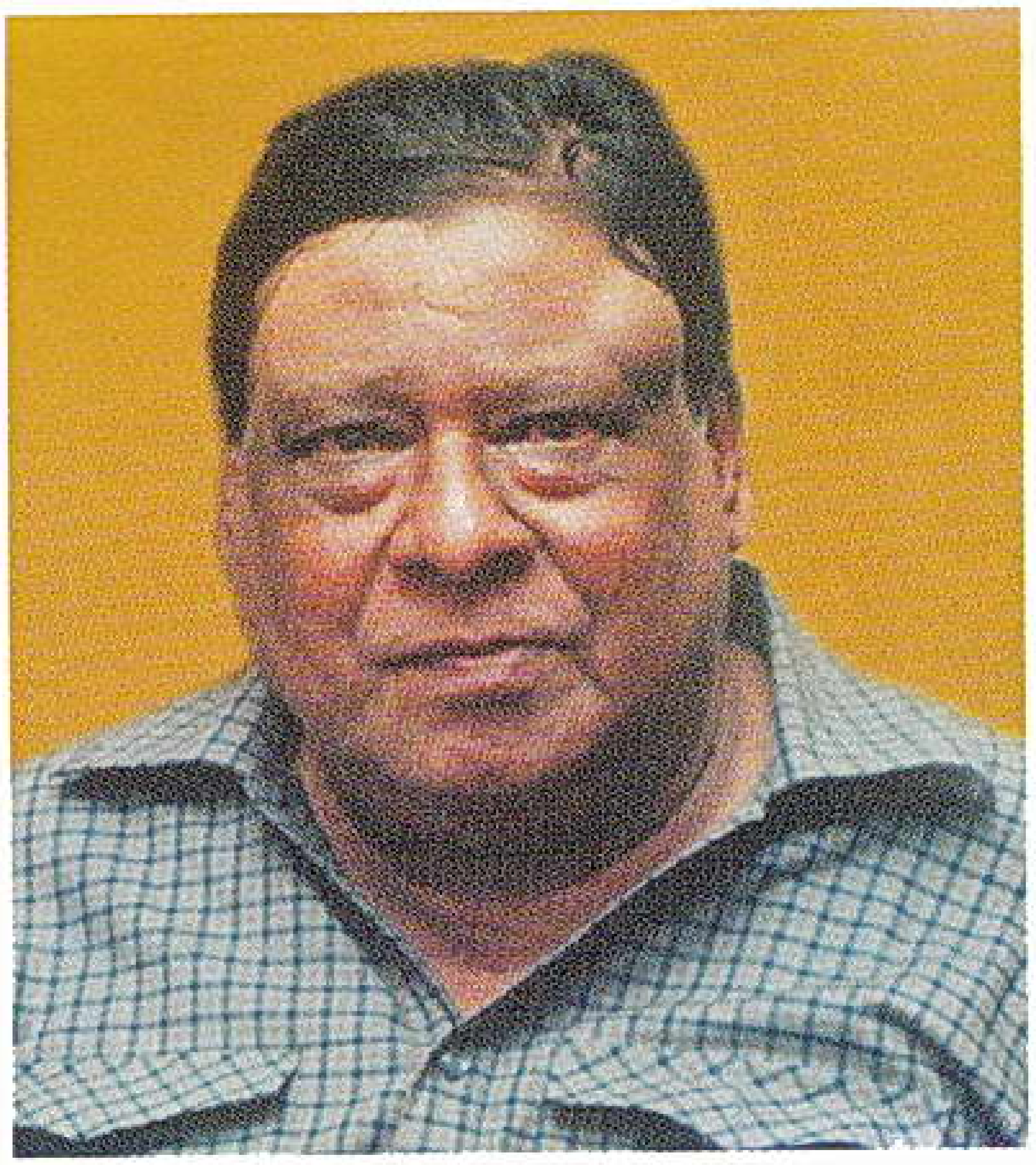

তারাপদ রায়ের জন্ম নভেম্বর ১৯৩৬,
বাংলাদেশের টাঙাইলে।
শিক্ষা: প্রথমে বাংলাদেশে, পরে ১৯৫১ সালে কলকাতায় কলেজে পড়তে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন, তারপর সরকারি চাকরি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নিয়েছেন, ১৯৯৪ সালে।
কবিতা লিখেছেন নাবালক বয়স থেকে। অদ্যাবধি প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা সহস্রাধিক। সম্পাদনা করেছেন ‘পূর্বমেঘ’ ও ‘কয়েকজন’ নামের দুটি লিটল ম্যাগাজিন। কবিতার পাশাপাশি রম্যরচনা লিখেছেন অজস্র, সঙ্গে গল্প, ছোট উপন্যাস, শিশুসাহিত্য।

প্রচ্ছদ দেবাশীষ দেব

এই বইয়ে বাছাই করা তিনশো পঁয়ষট্টিটি রম্যরচনা সংকলিত হয়েছে। লেখক রহস্য করে বলেছেন: 'বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে পাঠকের জন্য একটি করে রম্যরচনা।' অর্থাৎ সমগ্র বছর জুড়ে পাঠক প্রাণ খুলে প্রতিদিন অন্তত একবার হাসবেন। মানুষের জীবন থেকে যারা হাসি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের চেষ্টা এবার বিফল হবে।

9 788177 564464